ISSN : 2582-3841 (O)
2348-487X (P)

এবং প্রান্তিক

Ebong Prantik

বর্ষ ৯, সংখ্যা ২০, মে, ২০২২

এবং প্রান্তিক

A Peer-Reviewed Multi-Disciplinary Academic Journal
SJIF Approved Impact Factor : 7.309
Vol. 9th Issue 20th, May, 2022

সম্পাদক
আশিস রায়

কার্যকরী সম্পাদক
সৌরভ বর্মন

এবং প্রান্তিক
চণ্ডিবেড়িয়া, সারদাপল্লী, পোঃ - কেষ্টপুর, কলকাতা - ৭০০১০২

Ebong Prantik
A Peer-Reviewed Multi-Disciplinary Academic Journal
SJIF Approved Impact Factor : 7.309
[ISSN : 2582-3841(O), 2348-487X(P)],
Published & Edited by Dr. Ashis Roy, Chandiberiya,
Saradapalli, Kestopur, Kolkata - 700102, and
Printed by Ananya, Burobattala, Sonarpur, Kolkata - 150,
Vol. 9th Issue 20th, 23rd May, 2022, Rs. 800/-
E-mail : ebongprantik@gmail.com
Website : www.ebongprantik.in

প্রকাশ
৯ ম বর্ষ ও ২০ তম সংখ্যা
২৩ মে, ২০২২

ISSN : 2582-3841 (Online)
2348-487X (Print)

কপিরাইট
সম্পাদক, এবং প্রান্তিক

প্রকাশক
এবং প্রান্তিক
আশিস রায়
রেজিষ্টার্ড অফিস
চণ্ডিবেড়িয়া, সারদাপল্লী, পোঃ - কেষ্টপুর, কলকাতা - ৭০০ ১০২
ফোন - ৯৮০৪৯২৩১৮২
সার্বিক সহয়তা - সৌরভ বর্মন
ফোন - ৮২৫০৫৯৫৬৪৭

মুদ্রণ
অনন্যা
বুড়ো বটতলা, সোনারপুর, কলকাতা - ৭০০ ১৫০
ফোন - ৯১৬৩৯৩১৪৬৫

মূল্য : ৮০০ টাকা

এবং প্রান্তিক

উপদেষ্টামণ্ডলী

ড. মানস মজুমদার, ড. ব্রততী চক্রবর্তী, স্বামী তত্ত্বসারানন্দ, স্বামী শাস্ত্রজ্ঞানন্দ, ড. অমলেন্দু চক্রবর্তী, ড. মোনালিসা দাস, ড. সেলিম বক্স মণ্ডল, ড. মনোজ মণ্ডল, সুজয় সরকার

বিশেষজ্ঞমণ্ডলী

ড. মুনমুন গঙ্গোপাধ্যায় (বাংলা বিভাগ, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়)
ড. সৌমিত্র শেখর (উপাচার্য, জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়)
ড. সুমন গুণ (তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগ, আসাম বিশ্ববিদ্যালয়)
ড. সুব্রত জ্যোতি নেওগ (অসমীয়া বিভাগ, তেজপুর বিশ্ববিদ্যালয়)
ড. অচিন্ত কুমার ব্যানার্জী (বাংলা বিভাগ, গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়)
ড. অজন্তা বিশ্বাস (ইতিহাস বিভাগ, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়)
ড. হোসনে আরা জলী (বাংলা বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়)
ড. সুমিতা চ্যাটার্জি (বাংলা বিভাগ, বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়)
ড. দীপঙ্কর মল্লিক (বাংলা বিভাগ, রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দির)
ড. বিনায়ক রায় (ইংরাজি বিভাগ, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়)
ড. অজিত মণ্ডল (শিক্ষাবিজ্ঞান বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ রাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়)
ড. অনির্বাণ সাহু (বাংলা বিভাগ, ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী বিশ্ববিদ্যালয়)
ড. মাখন চন্দ্র রায় (বাংলা বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়)
ড. মৃণ্ময় প্রামাণিক (তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়)
ড. ইনতাজ আলী (ইংরেজি বিভাগ, নেতাজী সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়)

সম্পাদকমণ্ডলী

ড. রচনা রায় (বাংলা বিভাগ, আমডাঙ্গা যুগল কিশোর মহাবিদ্যালয়)
ড. অজয় কুমার দাস (বাংলা বিভাগ, বিবেকানন্দ মিশন মহাবিদ্যালয়)
ড. শর্মিষ্ঠা সিন্‌হা (বাংলা বিভাগ, ক্ষুদিরাম বোস সেন্ট্রাল কলেজ)
ড. অজয় ঘোষ (শিক্ষাবিজ্ঞান বিভাগ, সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ)
ড. আশীষ কুমার সাউ (আর্য মহিলা পি. জি. কলেজ, বারাণসী)

কার্যকরী সম্পাদক - সৌরভ বর্মন

সহ-সম্পাদক - ড. টুম্পা রায়

প্রধান সম্পাদক - ড. আশিস রায়

লেখা পাঠানোর বিষয়ে কয়েকটি জ্ঞাতব্য বিষয়

১. সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক গবেষণাধর্মী প্রবন্ধ পাঠাতে হবে। অনধিক ৪০০০ শব্দ সংখ্যা এবং সঙ্গে ৪০০/৫০০ শব্দের সারাৎসার পাঠাতে হবে।
২. পেজমেকার/ওয়ার্ড ফাইলে লেখা পাঠানো যাবে। ১৪ ফন্টে লেখা পাঠাতে হবে এবং সঙ্গে পি ডিএফ ও সফট কপি (লেখা নির্বাচিত হলে) পাঠাতে হবে। হাতে লেখা হলে মার্জিনসহ পরিচ্ছন্ন লেখা পাঠাবেন।
৩. অমনোনীত লেখা ফেরৎ পাঠানো হবে না। লেখার কপি রেখে লেখা পাঠাবেন।
৪. পূর্বে প্রকাশিত কোনো লেখা প্রকাশ করা হয় না।
৫. কোনো লেখা ছাপার জন্যে নির্বাচিত হয়েছে কিনা তা জানতে ৩/৪ মাস সময় লাগতে পারে।

লেখা পাঠানোর ঠিকানা

প্রধান কার্যালয়
চণ্ডিবেড়িয়া, সারদাপল্লী, পোঃ - কেষ্টপুর, কলকাতা - ৭০০১০২
ফোন : ৯৮০৪৯২৩১৮২

Registered Address
Ebong Prantik, Chandiberiya, Saradapalli,
Kestopur, Kolkata - 700102
Ph. No. : 9804923182
E-mail : ebongprantik@gmail.com

ব্রাঞ্চ অফিস
ভগবানপুর, বি. এইচ. ইউ, বারাণসী - ২২১০০৫ / বুড়ো বটতলা, সোনারপুর, কলকাতা - ৭০০১৫০

পত্রিকার বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ১৫০০ টাকা এবং
ডাকযোগে পত্রিকা পাঠাতে হলে ডাক খরচ গ্রাহককে বহন করতে হবে

প্রাপ্তিস্থান
দে'জ পাবলিশার্স, কলকাতা / পাতিরাম বুকস্টল, কলেজ স্ট্রিট / ধ্যানবিন্দু, কলকাতা / এবং পত্রিকা দপ্তর

বিস্তারিত জানতে দেখুন
Website : www.ebongprantik.in

সূচিপত্র

ভারতীয় মনীষীগণের দৃষ্টিতে উপনিষদের প্রেক্ষাপট-পর্যালোচনা

নীলকান্ত বিশ্বাস ১৫

'কবি, সমাজ-সংস্কারক ও প্রশাসক মদনমোহন তর্কালঙ্কার'

বিশ্বজিৎ পোদ্দার ২৭

ঔপনিবেশিক বাংলার বর্ধমান জ্বর ও সমকালীন শিক্ষাব্যবস্থায় তার প্রভাব: একটি প্রাথমিক অন্বেষণ

অরিজিৎ প্রামাণিক ৩৪

নারীর শরীর; নারীর ভাষা

মনীষা নস্কর ৪৩

উইলিয়াম জেমসের মতে অভিজ্ঞতার স্বরূপ

মিজানুর রহমান ৫৪

আশাপূর্ণা দেবীর তাসের ঘর : বিশ্বাস-অবিশ্বাসের দ্বন্দ্ব

মৃত্যুঞ্জয় মণ্ডল ৬৪

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের 'রানীরঘাটের বৃত্তান্ত' : এক জীবনের অপচয়

নকুলচন্দ্র বাইন ৭৮

সুকুমার রায়ের 'আবোল-তাবোল': শতবর্ষে ফিরে দেখা

পীরুপদ মালিক ৮৬

ভারতীয় আদর্শ সমাজ গঠনে বীর সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দের দর্শন ভাবনা : তাত্ত্বিক আলোচনা

জ্যোতি মিত্র ৯৪

ঊনবিংশ শতকে নারীর ক্ষমতায়নে বিদ্যাসাগর ও বিধবা ভাতা

অক্ষয় দত্ত ১০৭

জনস্বাস্থ্যে মেদিনীপুর জেলার মহিলাদের অবস্থান (১৯৭০-২০০১)

সুশান্ত দে ১১৪

নুনবাড়ি : অন্ত্যজ শ্রেণির সমাজ-সংস্কৃতির স্বরূপ সন্ধান

সৌভিক পাঁজা ১২১

বৈষ্ণবীয় তত্ত্ব-দর্শনগত চেতনার আলোকে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের
'মঞ্জরী অপেরা' উপন্যাস
সুবর্ণা সেন ১২৬

নজরুলের শিশুসাহিত্য
স্বপ্না বন্দ্যোপাধ্যায় ১৩৬

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়ের ছোটোগল্প: অলৌকিকতার সন্ধানে
সঞ্চিতা সাহা ১৪৬

ভবভূতির প্রেমভাবনা এবং বর্তমানে তার বিবর্তন
সুদীপ চক্রবর্তী ১৫৪

'চিলেকোঠার সেপাই': আধুনিক সাহিত্যে দ্বন্দ্বমুখর বাস্তবতার বিনির্মাণ
স্নিগ্ধা চক্রবর্তী ১৬২

অহিংসা ও সত্যের উত্তরাধিকার : ভারতীয় সমাজ ও গান্ধিজি
অজয় কুমার দাস ১৬৯

ইতিহাসের আলোকে মুর্শিদাবাদের বেরা উৎসব
এমিলি রুমি ১৮৬

বিশ্বায়ন, প্রযুক্তি জগতের বদল, বিনোদনের জগৎ ও লোকসংস্কৃতি
সৈকত মিস্ত্রী ১৯১

অভিজ্ঞানশকুন্তলম্ ও হাস্যরস:
অমৃতা দাম ১৯৮

প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসের সাহিত্য : বিষ্ণুস্মৃতি
অনুশ্রিতা মণ্ডল ২০৬

বাংলা উপন্যাসে পরকীয়া প্রেম (নির্বাচিত উপন্যাস অবলম্বনে)
মোহাম্মদ বদিয়ত জামান ২১২

তারাশঙ্করের 'কালিন্দী' উপন্যাসে প্রান্তিক জীবন
মহাদেব সরেন ২২১

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্পে পঞ্চাশের মন্বন্তর প্রসঙ্গ: নির্বাচিত গল্প অবলম্বনে
জয় সরকার ২২৯

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ছোটগল্প : সমকালীন সমাজবাস্তবতা
রেণুকা অধিকারী ২৩৫

আহমদ ছফার *ওঙ্কার* : জাগৃতির আদিস্বর
মাখন চন্দ্র রায় ২৪৪
নিসর্গচেতনার মহাকাব্য : পথের পাঁচালী
সাগর দাস ২৫১
শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত: গল্পকথায় বৃহৎকথা
কেয়া মুস্তাফী ২৬০
তিলোত্তমা মজুমদারের উপন্যাসে স্বনির্ভর নারীর উত্থান
সীমা মণ্ডল ২৬৭
লোকশিল্পে নারী : প্রসঙ্গ বাঁকুড়া জেলা
সুমন্ত মন্ডল ২৭৮
স্বাধিকার প্রতিষ্ঠা ও নিরাপত্তা প্রদান: ‘শ্রম আইন’ পরিপ্রেক্ষিতে
ড. বি. আর. আম্বেদকর
তুষার কান্তি সাহা ২৮৬
বাংলার বিপ্লবী আন্দোলনে অরবিন্দ ঘোষের ভূমিকা
সম্বুদ্ধ চক্রবর্তী ২৯৬
প্রোফেসর শঙ্কু
রানু বিশ্বাস ৩০২
পরিবেশবাদী সাহিত্যতত্ত্ব ও লীলা মজুমদারের নির্বাচিত উপন্যাস
ব্রতবাণী ঠাকুর ৩০৬
দ্বিজ কবিচন্দ্র শঙ্কর চক্রবর্তীর বিভিন্ন রচনা ও বিষ্ণুপুরী রামায়ণ
মিতালী বিশ্বাস ৩১৬
ঔপনিবেশিক আমলে বাংলায় জাতিকাঠামোয় ভূমিজ
উপজাতির উৎস সংক্রান্ত পর্যালোচনা
পিন্টু চৌধুরী ৩২৯
পুরুলিয়া জেলার আঞ্চলিক ভাষার কবিতার উত্থান,
ক্রমবিকাশ ও ‘ছত্রাক’ পত্রিকার ভূমিকা
কার্তিক নাগ ৩৩৬

চারের দশকের প্রগতি-চেতনার নিরিখে বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের
কবিতার প্রাসঙ্গিকতা
সীমা পুরকাইত ৩৫১
জীবনানন্দের ‘ক্যাম্পে’ ও রবিশংকরের ‘ক্যাম্পে’: একটি প্রতিতুলনা
লাল্টু মাইতি ৩৬৪
জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর ‘নদী ও নারী’ : পুরানো কাসুন্দি এবং কিছু বিশ্লেষণ
সারমিন রহমান ৩৭৩
দয়ারসাগর ঈশ্বরচন্দ্র : প্রেক্ষাপট শ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত
রুবেল পাল ৩৭৮
নৈতিকতার মানদন্ড রূপে সর্বমুক্তিবাদ
নৃপেন বিশ্বাস ৩৯০
‘নতুন ইহুদী’ : উদ্বাস্তু সমস্যার বাস্তব প্রতিরূপ
শিল্পী অধিকারী ৩৯৫
মতি নন্দীর ‘ননীদা নট আউট’ : ময়দানি সমাজের ক্রাইসিস
মহঃ রেজ্জাক আনসারি ৪০৩
গণনাট্য আন্দোলন ও সমসাময়িক সমাজ-পরিস্থিতি : প্রসঙ্গ ‘নবান্ন’
সুকুমার বর্মন ৪১০
বাংলা চলচ্চিত্র ও নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়
অন্তরা দাস ৪১৮
বাংলা ভাষায় ‘স্ল্যাং’ ও তার সাহিত্যিক প্রয়োগ
রেজমান মল্লিক ৪৩২
বাংলা মঙ্গলকাব্যে মাতৃত্বের পরিসর : একটি অন্বেষণ
সৌমিত্র বাগ ৪৪২
মানবদরদী স্বাধীনতা সংগ্রামী নজরুল
শিল্পী পাঁজা ৪৫৪
সংস্কৃতি বিবর্তিত এক জাতি : ক্যানিং মহকুমার আদিবাসী
মুরারী মোহন মিস্ত্রী ৪৬৪
রবীন্দ্রনাথ ও বৌদ্ধ দর্শন এবং সাহিত্য
সুপর্ণা কুণ্ডু চ্যাটার্জী ৪৭৪

শব্দতত্ত্বে ব্যুৎপত্তিবিদ হিসাবে নিরুক্তকার আচার্য যাস্কের মূল্যায়ন
রফিকুল আলম ৪৮২

সাপ্তাহিক 'অমৃত' ও 'দেশ': বিশ্বভারতী এবং রবীন্দ্রনাথ
সন্ধ্যা মন্ডল ৪৮৯

সাম্প্রতিক বাংলা উপন্যাসে শ্রীচৈতন্যদেব
রবীন্দ্রনাথ মণ্ডল ৫০৫

সেলিম আল দীনের 'হাত হদাই' : প্রসঙ্গ লোকজ উপাদান
কমল রায় ৫১৩

সাধন চট্টোপাধ্যায় নদীকেন্দ্রিক উপন্যাস "গহিন গাঙ": সুন্দরবনের মালো সম্প্রদায়ের জীবন ইতিহাস
রণজিৎকুমার বাউলিয়া ৫২৬

সুন্দরবনাঞ্চলে হ্যামিলটনের আবাদভূমি; বর্তমানে হয়ে উঠেছে গোসাবা—একটি ঐতিহাসিক পর্যালোচনা
দীপক মণ্ডল ৫৩৯

'বেহুলা গীতাভিনয়' : প্রচলিত কাহিনিতে মৌলিকতা
অভিজিৎকুমার ঘোষ ৫৪৩

সুবোধ ঘোষের নির্বাচিত ছোটগল্পে চারিত্রিক মনস্তত্ত্বের দ্বান্দ্বিক ঝঞ্ঝা ও চেতনার অন্তর্প্রবাহ
অপূর্ব পাহাড় ৫৫১

শ্রমিক কবির দর্শনে শ্রম ও সময়ের দলিল: কেষ্ট চট্টোপাধ্যায়
স্বপন প্রামাণিক ৫৬৬

নদীয়ায় বামপন্থী ছাত্র আন্দোলন (1947-1960) : একটি ঐতিহাসিক অনুসন্ধান
ভবানন্দ রায় ৫৭৫

গিরিশচন্দ্র ঘোষের 'চন্দ্রা' : সিপাহি বিদ্রোহ কেন্দ্রিক উপন্যাস
বাসব দাস ৫৮৪

কালের প্রতিমা, নির্মাণ বিনির্মাণ সুবোধ ঘোষের ছোটোগল্প
তপন কুমার মণ্ডল ৫৯২

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের 'অঘ্রানে অন্নের ঘ্রাণ', 'বুঢ়াপিরের দরগাতলায়',
'সোনার পিদিম' : শ্রেণি সমাজের আড়ালে নিম্নবর্গের অব্যক্ত যন্ত্রণা
প্রতাপ বিশ্বাস ৬১২
উনিশ শতকের নারীনির্মাণ ও জনমানসে তার প্রতিক্রিয়া:
স্ত্রীশিক্ষা, বিবাহ ও দাম্পত্য প্রসঙ্গ
সঙ্গীতা সাহা ৬২০
ভারতবর্ষের জাতীয়তাবাদী আন্দোলন ও অনগ্রসর সম্প্রদায়ের
উন্নয়নের পরিপ্রেক্ষিতে মহাত্মাগান্ধী ও আম্বেদকরের ভাবনা:
একটি সংক্ষিপ্ত বিশ্লেষণ
প্রভাস মণ্ডল ৬৩২
হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় : জীবন ও সাহিত্য
ইমরান আলী মুনশী ৬৪০
'সাজাহান' : দু-একটি কথা
হেনা বিশ্বাস ৬৫০
বাংলাদেশের ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতা প্রতিরোধে গোবিন্দচন্দ্র দেবের
অসাম্প্রদায়িক, মানবতাবাদী ও সমন্বয়ী দর্শন: একটি শান্তির বার্তা
আসাদুজ্জামান ৬৫৫
জ্বলন্ত বাস্তবতার প্রতীক : 'শনিবারের ছড়া'
শর্মিষ্ঠা সিন্‌হা ৬৬৫
ঔপনিবেশিক নবচেতনার ভাষ্যে রামকাহিনির বিবর্তন :
প্রসঙ্গ মেঘনাদবধ কাব্য
সুব্রত মণ্ডল ৬৭৫
রূপক সংকেতের অন্তরালে 'চাঁদ বণিকের পালা'
মিঠুন রায় ৬৮২
প্রত্নতাত্ত্বিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়:
আঞ্চলিক ইতিহাসচর্চার আলোকে স্বদেশভাবনা
তপন ঘোষ ৬৮৮
মনোজ বসুর রাজনৈতিক চেতনা ও 'ভুলিনাই'
দেবজ্যোতি শীট ৬৯৯

শর্মিষ্ঠা সিন্‌হার কাব্যগ্রন্থ 'প্রত্যয়'ঃ একটি আদ্যন্ত অনুভব
রামকৃষ্ণ ঘোষ ৭০৮

বাংলা সমালোচনা সাহিত্য বিকাশে তিন প্রতিবেশী রাজ্য :
অসম, ঝাড়খণ্ড ও ত্রিপুরা
অনির্বাণ সাহু ৭১৬

রাভা জনজাতি : উৎস ও পরিচয় সংক্রান্ত মতবাদসমূহ
শঙ্করী অধিকারী চন্দ্র ৭২৬

নবদ্বীপের কাঁসা শিল্পের সমস্যা ও সম্ভাবনা
সুমিত কুমার মণ্ডল ৭৩৪

ভগীরথ মিশ্রের উপন্যাস
প্রভাস চন্দ্র দেহুরী ৭৪০

মানভূমের ভাষা আন্দোলনে লোকসেবক সংঘের অবদান
পূর্ণচন্দ্র মহাপাত্র ৭৫০

ব্রাত্যজনের গল্পকার হরিশংকর জলদাস
তরুণকান্তি মন্ডল ৭৫৯

মার্কসবাদী 'প্রোপাগাণ্ডিস্ট' উৎপল দত্ত
কমলেশ মণ্ডল ৭৬৩

সুব্রতা ঘোষ রায়ের কবিতা ঃ 'জল যেন কবিতা' স্বগতোক্তির বহিঃপ্রকাশ
দেবাশিস ঘোষ ৭৭২

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় ঃ অনন্য মনীষা, শিক্ষাদান ও বিজ্ঞান সাধনা
মনোজ কুমার পাত্র ৭৮১

Women In Nineteenth Century Bengal: An Analysis
Through The Prism of The Kartabhaja Sect
Chanchal Chowdhury ৭৯২

Discussion on Some Aspects of Tribal Migration and
Their Engagement of Modern Economic Sectors in
North-East India during the British Regime
Shipra Mondal ৮০২

Preventive conservation of the traditional fishing tools by the
fishermen of sunderban in West Bengal
Ashis Majumdar ৮১৩

A Study of Diasporic Writing of Indian Women Novelist
Somnath Kar ৮২৪
Music of the Root: Staging of Devotional Folksongs in the Theatres of Birbhum
Bidhan Mondal ৮৩০
Resource Conflicts In South Asia Securitizing The Transboundary Waters
Adil Qayoom Mallah
Mahamudul Hasan Gayen ৮৩৯
Environmental Dynamics Of Santali language : Ol-Chiki
Partha Mondal ৮৫০
Using Health Communication in Advertising as a mean of Brand Image
Jyoti Dutta
Manali Bhattacharya ৮৬১

সম্পাদকীয়

চিন্তাশ্রীত আলোকে বিশ্লেষীত করতে কে না চায়। নিজের মতো করে। কথার পিঠে দুটো কথা জুড়ে। হোক না গভীর অথবা গভীরে না গিয়ে। কিন্তু বাসনা থেকেই যায়। বিচার বিশ্লেষণ করার। সবটা মধুরতা ছড়ায় না। মাঝে মাঝে অমধুরতার ছোঁওয়াও মেলে। প্রয়োজন বোধে গ্রহণ বা বর্জন। ঠিক ভুলের হিসাবটাও কোন সময় হয়ে পড়ে বেঠিক। আলোকোজ্জ্বল জীবনেও ছায়ার প্রাদুর্ভাব ঘটে কখনো কখনো। সবটা নিয়েই পরিপূর্ণতা। এবারের সংখ্যাতে আপনাদের সেই স্বাদই মিলবে।

ভারতীয় মনীষীগণের দৃষ্টিতে উপনিষদের প্রেক্ষাপট-পর্যালোচনা

নীলকান্ত বিশ্বাস
প্রভাষক, সংস্কৃত বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়,
চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ

সারসংক্ষেপ: উপনিষদ প্রাচীনকালের মনীষীদের এক বিস্ময়কর সৃষ্টি। ভারত সংস্কৃতির যা শ্রেষ্ঠ দান অহিংসা ও সত্যভাষণ,তা সেই প্রাচীন কালের ঋষি প্রদত্ত বাণী থেকেই লব্ধ। বাণীর তাৎপর্য কোনো কালেই ভারতবর্ষ বিস্মৃত হয়নি এবং হবেও না।সে কারণেই বোধ করি, আজও উপনিষদের বাণী সমানভাবে মানবসমাজে আদৃত। উপনিষদ বেদের ন্যায় ধর্মগ্রন্থের আশ্রয়ে জন্মলাভ করেও স্বাধীন মননশীলতার পরিচয় দিয়েছেন। উপনিষদ মানুষের প্রথম দার্শনিক চিন্তনের নিদর্শন।উপনিষদের মহিমা শুধু ভারতের নহে, ইহা মানবজাতির শ্রেষ্ঠ সম্পদ।ভারতীয় মনীষীগণের সকল কর্মচেষ্টা, সকল ধ্যান- ধারণা,সকল চিন্তা-ভাবনা উপনিষদকে কেন্দ্র করে। উপনিষদে মনীষীদের বাণী উদীয়মান- সূর্যের মত স্বতঃপ্রমাণ,হিমাচলের মত সুদৃঢ় সুমহান,মহাসাগরের মত প্রশান্ত উদারপ্রাণ।এমনই ভাবধারার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে বিভিন্ন বিদগ্ধ মনীষীগণ বিভিন্নভাবে তাঁদের মতামত প্রদান করেন।কিন্তু তাঁদের মতামতের সঙ্গে সাদৃশ্যতা রেখে আরো পাঁচজন বিদগ্ধ মনীষী তাঁদের তত্ত্বজ্ঞান প্রকাশ করেন যথাক্রমে রাজা রামমোহন রায়,দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর,স্বামী বিবেকানন্দ,রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং শ্রীঅরবিন্দ।উপনিষদের প্রেক্ষাপট আলোচনায় এই পাঁচ মনীষীর গুড়তত্ত্ব গুরুত্বের সাথে বিবেচ্য।তাঁদের তত্ত্ব এবং চিন্তা বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে উপনিষদে প্রেক্ষাপটের ইতিহাস আরো স্বচ্ছ হয়ে উঠবে।সুতরাং বিষয়টি ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের প্রয়াস রাখে ।]

মূল শব্দঃ উপনিষদ,মনীষী,সমাজ ও সংস্কৃতি,ধর্ম,দার্শনিক চিন্তা।

ভূমিকা: বৈদিক যুগের শেষভাগে বেদকে আশ্রয় করে উপনিষদগুলি ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছিল। বেদের সংহিতা অংশে তার জন্ম , আরণ্যক অংশে তার পরিবর্ধন। বেদের যজ্ঞকে কেন্দ্র করে যে আনুষ্ঠানিক পর্ব গড়ে উঠেছে, তা থেকে উপনিষদকে পৃথক করবার জন্য তাকে কর্মকান্ড বলে সূচিত করে উপনিষদকে জ্ঞান কান্ড বলা হয়েছে। বেদের অভ্যন্তরে যেন দুইটি প্রবাহ পরস্পরের পাশে কাছাকাছি বা একত্র হইয়া গড়ে উঠেছিল - একটি বেদ সম্বন্ধীয় বা বৈদিক দেব-দেবীর গুণকীর্তন নিবেদনে ব্যাপৃত, অপরটি সর্বলোক বা ব্রহ্মান্ড গুপ্ত তথ্য বা রহস্যকে ছেদন করবার ব্যাকুলতা হতে উৎপন্ন তীক্ষ্ণ জ্ঞানতৃষ্ণা। ফলে এই জ্ঞানতৃষ্ণাই অব্যবহিত পরবর্তীকালে অরণ্যের অংশভুক্ত বা আরণ্যকের যুগে বা সময়ে শ্রেষ্ঠত্ব পেয়েছিল এবং অতি শুদ্ধ বা নির্মল

অর্থাৎ বিশুদ্ধ দার্শনিক জ্ঞানের অনুসন্ধানে পরিপূর্ণ আত্ম -নিয়োগ করেছিল। তাই বলা যায়,তারই পরিসমাপ্তি বা পরিণতি হল উপনিষদ। [অতুল ও অন্যান্য,১৯৯৪:১৭]

উপনিষদ কী : আরণ্যকে যে অধ্যাত্মবিদ্যার সূচনা হয়,উপনিষদে এসে তা পূর্ণতা লাভ করে।আর্য ঋষিরা অনুধাবন করলেন,যাগ যজ্ঞের মাধ্যমে যে পূণ্য অর্জন হয় তাতে স্বর্গ লাভ হয়, কিন্তু পূণ্যফল ক্ষয় হয়ে গেলে আবার তাকে পৃথিবীতে জন্ম মৃত্যুর আবর্তে ফিরে আসতে হয়।জ্ঞানের মাধ্যমেই ঈশ্বরকে পরিপূর্ণভাবে লাভ করা যায় অর্থাৎ মোক্ষলাভ হয়।উপ- নি- সদ্+ ক্বিপ = উপনিষদ।এখানে 'উপ' অর্থ নিকটে, 'নি' অর্থ নিশ্চয়রূপে এবং 'সদ' ধাতুর অর্থ বসা।প্রাচীনকালে শিষ্যরা গুরুর নিকট উপবেশন করে ব্রহ্মবিদ্যা অধ্যয়ন করতেন। মূলত সেই সব ছোট ছোট বৈঠকের নামই ছিল উপনিষদ।সদ্ ধাতুর অর্থ জীর্ণ করা বা বিনাশ করা।নি উপসর্গের অর্থ নিশ্চিত রূপে বা নিঃশেষ আর উপ শব্দের অর্থ নিকটে।অর্থাৎ যে বিদ্যা অজ্ঞানকে নাশ করে মুমুক্ষু জীবকে পরব্রহ্মের নিকট নিয়ে যায় সেই পরাবিদ্যার নামই উপনিষদ। ঋক, যজু, সাম, ও অর্থব সংহিতা থেকে ব্রাহ্মণ আরণ্যক উপনিষদ পর্যন্ত বিস্তৃত বিশাল প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে সাধারণভাবে 'বৈদিক সাহিত্য' নামে পরিচিত।অনুমান করা হয়ে থাকে যে, এর রচনাকাল খ্রিষ্টপূর্ব ৪০০০- ৩৫০০ অব্দ থেকে খ্রিষ্টপূর্ব ১৫০০- ১০০০ অব্দ পর্যন্ত ব্যাপ্ত।তাই বলা হয়ে থাকে,উপনিষদসমূহ রচিত হতে শুরু করে এক হাজার খ্রিষ্টপূর্বাব্দ থেকে।উপনিষদই সর্বশেষ রচিত হয়েছে বলে ধরা হয়।এজন্য উপনিষদ সাহিত্যকে 'বেদান্ত' নামেও অভিহিত করা হয়ে থাকে।ভগবদ্গীতা ও পুরাণভিত্তিক আধুনিক হিন্দু , বা সনাতন ধর্ম বলতে যা বোঝায়, বেদান্ত বা উপনিষদের চিন্তাধারা এ থেকে স্বতন্ত্র এবং অনেক বেশি উচ্চমার্গীয় দর্শনসমৃদ্ধ।বর্তমানে দুই শতের অধিক উপনিষদের নাম জানা যায়।কিন্তু প্রাচীন ও প্রধান উপনিষদ বারখানা।যথাক্রমে: ১.ঐতরেয় ২.কৌষীতকি ৩.ছান্দোগ্য ৪.কেন ৫.তৈত্তিরীয় ৬.কঠ ৭.শ্বেতাশ্বতর ৮.বৃহদারণ্যক ৯.ঈশ ১০.প্রশ্ন ১১.মুন্ডক ও ১২.মান্ডূক্য।[রায়,২০১১:১৬] ।

ভারতীয় মনীষীগণের দৃষ্টিতে উপনিষদের প্রেক্ষাপট :

ভারত জননীকে সম্বোধন করে রবীন্দ্রনাথ গেয়েছেনঃ

> "প্রথম প্রভাত উদয় তব গগনে
> প্রথম সম রব তব তপোবনে,
> প্রথম প্রচারিত তব বন -ভবনে
> জ্ঞান- ধর্ম কত কাব্যকাহিনী ।।" ভৈরবী, রবীন্দ্র রচনাবলী

তপোবন হচ্ছে ভারতের আদি সভ্যতার কেন্দ্র অর্থাৎ বাস্তবিক তপোবন থেকেই প্রথম ভারতীয় সভ্যতার অভ্যুদয় হয়েছিল। আর বিশ্বের জ্ঞান ভান্ডারে তথা অধ্যাত্মসাধনার ক্ষেত্রে ভারতের এই তপোবন সভ্যতার শ্রেষ্ঠ দান হচ্ছে বৈদিক উপনিষদসমূহ।

উপনিষদে মর্মবাণীর মধ্যে যে মাহাত্ম ভারতের সে সময়ের ও বর্তমান অনেক মণীষীই অনুপ্রবিষ্ট হয়েছেন। [অতুল ও অন্যান্য,১৯৯৪:৪১] বাদরায়ণ অক্লান্ত পরিশ্রম করে উপনিষদের দার্শনিক তত্ত্বকে সূত্রাকারে স্থাপন করার জন্য ব্রহ্মসূত্র রচনা করেন।সুতরাং সহজেই অনুমান করা হয়, যাঁরা বেদান্ত পাঠে আগ্রহী তাঁরা ব্রহ্মসূত্র পাঠেই মনোনিবেশ করতেন। তবে উপনিষদগুলি তখনও পরিপূর্ণ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল। অনুমান করা হয় পুরাণের যুগেও তাদের মহিমা ক্ষুণ্ণ হয় নি । তাই যদি না হবে অষ্টম ও নবম শতাব্দীর সঙ্কটমুহূর্তের মানুষ হয়েও শংকরাচার্য কেন প্রাচীন উপনিষদগুলির ওপর ভাষ্য লিখবেন ? মধ্যযুগের ভক্তিবাদের সঙ্গে অদ্বৈতবাদের পরস্পর বিরোধী দার্শনিকদের একমাত্র আকর্ষণের বস্তু হয়ে গিয়েছিল। তবু মনে হয় উপনিষদের নিজস্ব দ্যূতি বিশেষ মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারত। তার সুন্দর নিদর্শন ‘সম্রাট সাজাহানের জ্যেষ্ঠ পুত্র দারা শিকোর উপনিষদের প্রতি আকর্ষণ’।

উপনিষদগুলি তাঁকে এমন মুগ্ধ করেছিল যে তিনি তাদের ফারসী ভাষায় অনুবাদের ব্যবস্থা করেন। “এই অনুবাদ সম্পাদিত হয় ১৬৫৭ খ্রীষ্টাব্দে।”তার তাৎপর্য ছিল সুদূরপ্রসারী। কারণ অধিক দীর্ঘকাল পরে হলেও সেই অনুবাদের উদ্দেশ্য করেই উপনিষদের সঙ্গে দেশের বাইরের জগৎ অর্থাৎ বহির্বিশ্বে আত্মপ্রকাশের পথ অতি সহজেই উন্মুক্ত হয়। আঁকেতিল দ্যী পেরঁ নামে, একজন ফরাসী পর্যটক ছিলেন তিনি যখন নিজ দেশে গমন করেন তখন সেই পুঁথি দেশে নিয়ে যান এবং তাকে অবলম্বন করার ফলে পুঁথির এক লাটিন অনুবাদ প্রকাশ করেন ১৮০১-২ খ্রীষ্টাব্দে। আঁকেতিল দ্যী পেরঁ নামে যে পর্যটক ছিলেন তাঁর সঙ্গে শোপেন হাউএর পরিচয় হয়। তিনি এই পুঁথির এক লাটিন অনুবাদকে পাশ্চাত্য জগতের পক্ষে ঊনবিংশ শতাব্দীর সব থেকে মূল্যবান অধিকার বলে সকলের কাছে দাবী করে। [অতুল ও অন্যান্য,১৯৯৪:১৮]ভারতের আধুনিক যুগপ্রবর্তক রাজা রামমোহন রায় তাঁর অসাধারণত্ব প্রতিভা ও প্রবল সক্রিয়তার প্রভাব ভারত ইতিহাসে চিরচিহ্নিত রেখে গেছেন। রাজা রামমোহন রায়ের কর্মধারা তাঁর সমসাময়িক কালের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল কিন্তু তাঁর অমরচিন্তা উপনিষদের চিন্তা ধারায়।[ঘোষ,১৯৭৩:ভূমিকাংশ]

রাজা রামমোহন রায়: প্রাচী ও প্রাতীচীর অর্থাৎ পূর্বদিক ও পশ্চিমে মিলনের উদ্গাতা, ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠাতা রাজা রামমোহনই সর্বপ্রথম এই পুরাণ ও তন্ত্রপ্লাবিত দেশে নব্য করে উপনিষদের মাহাত্ম্য প্রচার করেন। ‘ভট্টাচার্যের সহিত বিচার’ -এ তিনি তার যুক্তি দ্বারা সমর্থিত করেন যে, উপনিষদের পাঠ - শিক্ষাদান শুধু সন্ন্যাসীদের জন্যেই বিধান নয়, গৃহিগণও উপনিষদের অনুশীলনের মাধ্যমে শ্রেষ্ঠ কল্যাণ লাভ করতে পারেন। মহানির্বাণ - তন্ত্রে ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থের কি কর্তব্য, তার উল্লেখ আছে।

“ব্রহ্মনিষ্ঠো গৃহস্থঃ স্যাৎ তত্ত্বজ্ঞানপরায়ণঃ
যদ্ যৎ কর্ম প্রকুর্বীত তদ্ব্রহ্মণি সমর্পয়েৎ ।।”

ভট্টাচার্যের সহিত বিচার অর্থাৎ এই আদর্শই রাজা রামমোহনকে বিশেষভাবে আকর্ষণ করেছিল। তাই ‘ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থের লক্ষণ’ বিষয়ে রামমোহনই এই সময়ে নবরূপে সকলের শিক্ষা দিয়েছিলেন।[অতুল ও অন্যান্য,১৯৯৪:৪১] ব্রহ্মসূত্রকে নির্ভর করে রাজা রামমোহন নিরাকার উপাসনা - রীতির উপর সমর্থন করেন এবং ‘বেদান্ত গ্রন্থ’ রচনা করতে উৎসাহিত হন সেই সঙ্গে ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা করেন। সংস্কৃত ভাষাতে পারদর্শি নয় সে সকল বাঙালীদের উপনিষদের বাণীর সাথে যোগসূত্র অর্থাৎ পরিচয় করার জন্য রাজা রামমোহন পাঁচটি উপনিষদের (ঈশ,কেন,কঠ,মুন্ডক ও মান্ডূক্য) বাংলাতে অনুবাদের ব্যবস্থা করেন। [অতুল ও অন্যান্য,১৯৯৪:১৮]

রামমোহন প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মসমাজের সাপ্তাহিক অধিবেশন হতো সেখানে দেখা যায় আচার্য রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশও উপনিষদের উদ্ভাসনে আচার্য শংকরকে অনুসরন করেছেন। রাজা রামমোহন রায় তাঁর শ্রূতিপ্রস্থান বা উপনিষদ,স্মৃতিপ্রস্থান বা ভগবদ্গীতা ও ন্যায়প্রস্থান বা বেদান্তের ওপর ভিত্তি করে যে বেদান্ত - প্রতিপাদ্য ধর্ম স্থাপন করেছিলেন, তা ছিল মূলত শাস্ত্র ও সংযোগ বা যুক্তির ওপর নির্ভর করে প্রতিষ্ঠিত। [অতুল ও অন্যান্য,১৯৯৪:৪২]

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর: মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর কেবলমাত্র একজন ধ্যানপরায়ণ সাধকই ছিলেন না,তাঁর অসাধারণ মনীষা ও চিত্তক্ষেত্রের বিশ্বব্যাপী প্রসার ছিল।ধর্ম্মতত্ত্ব সম্বন্ধে, সমাজতত্ত্ব সম্বন্ধে তাঁর সেই চিত্তশক্তির এবং মনীষার ক্রিয়া বেশ ভাল করিয়া লক্ষ্য করা যায় এবং দেখা যায় যে পূর্ব ও পশ্চিম সভ্যতার ধারার মোহানায় যাঁরা এযুগে যুগসম্প্রদায় প্রতিষ্ঠাতা ও যুগসমস্যামীমাংসক হইয়া সকল তত্ত্বকে সার্বভৌমিক তত্ত্ব করিয়া বিশ্বমানবের অখন্ড স্বরূপবোধে উর্ত্তীণ হয়েছেন, তাঁদের মধ্যে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ একজন অন্যতম। [চক্রবর্ত্তী,১৯১৬:৯-১০] মহর্ষি দীক্ষা গ্রহণের আগে ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই অক্টোবর তিনি যে তত্ত্ববোধিনী সভার প্রতিষ্ঠা করেন, তারও উদ্দেশ্য ছিল ‘সমুদয় শাস্ত্রের নিগূঢ় তত্ত্ব এবং বেদান্ত - প্রতিপাদ্য ব্রহ্মবিদ্যার প্রচার’।দেবেন্দ্রনাথের স্বাজাত্যাভিমান অত্যন্ত প্রবল ছিল, তাই তিনি একদিকে উপনিষদ অবলম্বন করে খ্রীষ্টধর্মের প্রচার ও প্রসারকে বাধা দেন এবং এই উদ্দেশ্যে দেবেন্দ্রনাথ নিজ উদ্যোগে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার প্রতিষ্ঠা করেন এবং অন্য দিকে তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা,বেতন নেওয়া হয় না এমন কল্যাণকর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ বিভিন্ন স্থাপনা করেন, এসকল কাজ করার একটাই উদ্দেশ্য যাতে এদেশের বালকেরা অতি সহজেই ভারতের সনাতন ঐতিহ্যের দিকে আকৃষ্ট হন।দেবেন্দ্রনাথ লিখেছেন, আমি নিজ হতে এই হিন্দুস্থানের হিন্দুজাতির আসক্তি দ্বারা আবদ্ধ হইয়া ইহাকে পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম দ্বারা সংস্কৃতও উন্নত করিতে অতিশয় আকুল আছি। ঠাকুরদাদার মৃত্যুর পর বয়সে নবীন দেবেন্দ্রেনাথের বুকের অভ্যন্তর ভাগ অর্থাৎ হৃদয় যখন বিভিন্ন সমস্যায় সমাচ্ছন্ন, তখন ঈশোপনিষদের একখানা ছিন্নপত্রের অর্থ ধারণ করে তিনি জীবন -পথে চলার নির্দেশ

পেয়ে থাকেন। কিন্তু উপনিষদ বা ব্রহ্মসূত্র যে 'আদ্যোপান্ত ভ্রম-প্রমাদ -রহিত' দেবেন্দ্রনাথ যখন প্রাপ্ত বয়স্ক হয় তাঁর অন্তরে যে বিশ্বাস ছিল তা অনেকাংশে শৈথিল্য হয়ে যায়। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর রামমোহনের মতো 'বেদান্তের অদ্বৈতবাদে' গ্রহণ করেন নি, গুণহীন বা গুণশূন্য ব্রহ্মবাদ গ্রহণ করেন নি, বেদান্তের নির্বাণমুক্তির পরিবর্তে আত্মার অসীম উন্নতিতে সত্য বলে স্বীকার করেছেন। উপনিষদের নির্বাণ সম্পর্কে দেবেন্দ্রনাথ লিখেছেনঃ "আবার যখন তাহাতে দেখিলাম, ব্রহ্মজ্ঞ ব্রহ্মপরায়ণ ব্যক্তিদিগের মুক্তি নির্বাণমুক্তির তখন আমার আত্মা তাহাতে ভয় দর্শন করল।"সুতরাং তিনি উপনিষদকে ব্রাহ্মধর্মের ভিত্তিরূপে গ্রহণ না করে, তিনি বললেন - "আত্মপ্রত্যয়সিদ্ধ জ্ঞানোঙজ্বলিত বিশুদ্ধ হৃদয়ই ধর্মের উৎস।" তথাপি দেবেন্দ্রনাথ বিভিন্ন উপনিষদ থেকে বাণী চয়ন করে 'ব্রাহ্মধর্ম ' (প্রথম খন্ড উপনিষদ) প্রকাশ করেন। "ব্রাহ্মধর্মের দ্বিতীয় খন্ড হচ্ছে অনুশাসন।" তাই বলা হয়, দেবেন্দ্রনাথের প্রচারিত ব্রাহ্মধর্মের বীজ হচ্ছেঃ "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" 'আনন্দরূপম্ অমৃতং যদ্বিভাতি" 'শান্তম্ শিবমদ্বৈতম' ,'শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্'।আলেকজান্ডার ডাফ 'India and Indian Missions' গ্রন্থে হিন্দুধর্মকে আক্রমণ করলে দেবেন্দ্রনাথ উপনিষদ বা বেদান্তকে অবলম্বন করেই তার জবাব দেন। রামমোহনের মতো দেবেন্দ্রনাথও বিশ্বাস করেছিলেন, তাঁর প্রচারিত বেদান্ত - প্রতিপাদ্য ধর্মের স্নিগ্ধচ্ছায়ায় একদিন নিখিল ভারতবাসী মিলিত হবে।

দেবেন্দ্রনাথের চিন্তাধারায় উপনিষদের ঋষিগণের ও সুফী সাধকগণের , বিশেষত হাফিজের প্রভার ছিল লক্ষ্যণীয়। ভারতীয় ঋষির নিকট থেকে পারিবারিকভাবে ব্রহ্মোপাসনার মন্ত্র গ্রহণ করেন, আবার প্রকৃতির নানাভাবে চিত্রিত বস্তু বা বিষয় দেখে, ঘ্রাণ ও সংগীতে তিনি 'অরূপের রূপের' বিলাস দর্শন করতেন, কখনো কখনো নিজে দীবানা হাফিজের ভাবে মগ্ন হয়ে থাকতেন।[অতুল ও অন্যান্য,,১৯৯৪:৪২-৪৩]দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর উপনিষদকে কতখানি শ্রদ্ধা ও ভালোবাসতেন তা বোঝা যায় তাঁর আচরনগত দিক হতে। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে একটি গ্রন্থ রচনা করেন এবং গ্রন্থের নাম দেন ব্রাহ্মধর্ম গ্রন্থ। গ্রন্থটির মূল উপাদান ছিল উপনিষদের বচন। 'ব্রাহ্মী উপনিষদ' নামে গ্রন্থটির প্রথম খন্ডের নামকরণ করেন।[অতুল ও অন্যান্য,১৯৯৪:১৯]

স্বামী বিবেকানন্দ: আহিতাগ্নিক সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের আত্মাহুতি ব্যর্থ হয় নি। সেই মহাতাপসের হাড় এখনো বজ্রের মতোন বেজে ওঠে। তাঁর হাতে যেমন ছিল "শঙ্খ - পদ্ম, তেমনি ছিল ঝড় - বিদ্যুৎ।রণবিপ্লব তিনি যেমন এসেছিলেন, তেমনি এসেছিলেন শান্তির কুসুমদাম্।" স্বামী বিবেকানন্দের অবতরণ যেন বাংলার নীলাকার মহাশূন্যে পূর্বতোরণে নব্য সূর্যোদয়। স্বামী বিবেকানন্দের জীবনের জ্যোতি রাঙিয়ে গিয়েছিল ভারতবর্ষ, এশিয়া,সমগ্র পৃথিবী। সভ্যসাচীর মতোই মহান সে অভ্যুদয়। তাঁরই শরাসন টঙ্কারে দিকে দিকে রণিত হয়েছিল ভারতের জয়ধ্বনি।[বাগচি,১৯৯০:ভুমিকাংশ] উনিশ শতকের শেষ পর্ব, বিশ শতকের আরম্ভ। যাকে বাংলার নবজাগরণ বলি, তার

তৃতীয় পর্যায়। এই সন্ধিক্ষণে স্বামী বিবেকানন্দের বিস্ময়কর আবির্ভাব। তিনি একাধারে অদ্বৈতবাদী, ধ্যানযোগী, কর্মযোগী, সমাজ সংস্কারক, সমাজবিপ্লবী, সংস্কারমুক্ত বিদ্রোহী দেশপ্রেমিক, মানবতাবাদী ও বৈজ্ঞানিক সাম্যবাদের প্রবক্তা। [চট্ট্রোপাধ্যায়,১৯৮৮:৭-৮]শাশ্বত জ্ঞানের অসীম ভান্ডার যে বেদ ,তার নির্যাস বিধৃত রয়েছে বেদান্ত বা উপনিষদে। স্বামী বিবেকানন্দ মানবের নিকট ছিলেন রহস্যময়। নির্ভীক মানবের বাস্তব স্বরূপ বন্ধন বা আবরণ অবারিত করে উপনিষদ মানুষকে সর্বোচ্চ স্থানে সম্মান দিয়েছে। উপনিষদ থেকে জানতে পারি বা উপনিষদের ভাষায় প্রত্যেক মানুষই প্রকৃতপক্ষে দেবতা। মানুষ নিজের পরিচয় সম্বন্ধে যতটুকু সচেতন, তার থেকে অনেক বেশি সুন্দর তার বাস্তব পরিচয় বর্ণনাতে। “সসীম মানুষ আসলে অসীম।” উপনিষদ মানুষকে দেয় অহংকার ও বিশ্বের সমগ্র সৃষ্টির সাথে একনিষ্ঠ অনুভব। তাই বলা যায় , প্রীতি ও ভক্তি উপনিষদের বাণী। স্বামী বিবেকানন্দ উপনিষদকে ভবিষ্যৎ পৃথিবীর সর্বজনীন জীবনদর্শন বলে মনে করেছেন, যা মানুষে মানুষে সকল ভুলবোঝাবুঝির সমাপ্ত ঘটাতে পারে। উপনিষদের যে দর্শন কোনও রাষ্ট্র বা জাতির একক স্বত্বাধিকারী নয়, সমস্ত মানবজাতিরই তা সাধারণ মহিমা। আচার্য শঙ্কর তাঁর অনন্যসাধারণ মনীষায় এর পুনঃপ্রকাশ ঘটিয়েছিলেন সন্ন্যাসীর মঠে , যোগীর তপোবনে আর স্বামী বিবেকানন্দ সেই সীমা ভেদ করে একে ছড়িয়ে দিতে চেয়েছেন এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তরে মানুষের ঘরে ঘরে। স্বামী বিবেকানন্দ মনে করতেন, উপনিষদের মাহাত্ম প্রতিদিন পালন করতে পারলে অর্থাৎ প্রাত্যহিক জীবনে ব্যবহার করলে,মৎস্যজীবী হয়ে উঠতে পারে অতি সহজেই উত্তম মৎস্যজীবী, আইনজীবী হতে পারে আরো ভালো আইনজীবী এবং শিক্ষক আরো ভালো শিক্ষক হয়ে সমাজ ও দেশ গঠনে সঠিক ভূমিকা রাখতে পারে। কারণ, আমাদের মানব জীবনের সর্ব ক্ষেত্রেই উপনিষদ মানুষের হৃদয়ে বা অভ্যন্তরে স্থাপিত শক্তি সম্পর্কে চেতনাযুক্ত করে তোলে ও শেষে তাকে ভিন্ন আকার বা অবস্থায় পরিণত করে দেবমানবে।[লোকেশ্বরানন্দ, ২০০২:১] উপনিষদে অদ্বৈত ভাবের প্রতিপাদক হিসেবে বিভিন্ন রকমের বচন পাওয়া যায়। ব্রহ্ম যে গুণাতীত এবং জগৎ যে ইন্দ্রজাল -কল্পিত, এ কথাও বলা হয়েছে। এ কারণেই স্বামী বিবেকানন্দ উপনিষদের বিভিন্ন প্রকারের বচন উদ্ধৃত করেছেন এবং সেগুলি তাঁর নিজের মতামত সম্পাদন করেছেন। উপনিষদের ‘অভীঃ’ মন্ত্রই স্বামীজী সর্বদিকে প্রচার করেছেন। বিবেকানন্দের মতে, ধর্ম -সাধনার বা ঈপ্সিত বস্তুত লাভ বা উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য প্রচেষ্টার লক্ষ্যই হচ্ছে -ভয়শূন্য হওয়া। কঠোপনিষদের বীর্যবান ও শ্রদ্ধাবান নচিকেতার চরিত্রই বিবেকানন্দকে নানাভাবে আকৃষ্ট করেছিল। কঠোপনিষদে বলা হযেছে , পিতার যখন যজ্ঞকার্য আরম্ভ তখনই বালকের সম্মান বা শ্রদ্ধার সঞ্চার হয়েছিল। এখানে শ্রদ্ধা বলতে বোঝায়, সংকল্পসাধনে দৃঢ় ও অটল থাকা যা মানুষকে হাজারো প্রলোভন জয় করার জন্য শিক্ষা প্রদান করে, আর যে সততার ফলে মানুষ ধর্মের বা সত্যের পথ থেকে, সাধনার পথ

থেকে ধর্মভ্রষ্ট না হয়। এই আত্মাকেই অবলোকন করতে হবে , অনুমান করতে হবে, একাগ্রভাবে মনন ও স্মরণ করতে হবে। ইহা শ্রবণ করতে হবে,অনুমান ও নিদিধ্যাসনের অর্থাৎ শ্রুত বিষয়ের মনন ও ধ্যান দ্বারাই আত্মাকে বা ব্রহ্মাকে জানতে পারা যায়। এবং যে ব্যক্তি ব্রহ্মকে জানেন , তিনি ব্রহ্মই হন, ‘ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মৈব ভবতি’। এই অদ্বৈত বেদান্তরেও সিদ্ধান্ত। বৃহদারণ্যক উপনিষদে যে জীবন্মুক্তিবাদ স্বীকৃত, বৈদান্তিকগণও সেই জীবন্মুক্তির কথায় বলেছেন। স্বামী বিবেকানন্দও তিন প্রকার সাধনার দ্বারা আত্মোপলব্ধির কথা বলেছেন। দেখা যায়,ঈশোপনিষদের মতো বৃহদারণ্যক উপনিষদেও অদ্বৈতবাদের মূল সূত্রে রয়েছেঃ

“নৈনেন কিঞ্চনানাবৃতং নৈনেন কিঞ্চনাসংবৃতম্ ।।” ২/৫/১৮

এমন কোন কিছুই পাওয়া যাবে না যাহা ঈশ্বর কর্তৃক বেষ্টিত নয় , পৃথিবীর সমস্ত কিছুতেই ঈশ্বরের অনুপ্রবেশ রয়েছে।স্বামী বিবেকানন্দ উপনিষদের বাণীর ওপর নব্য আলোচনা করেছেন। স্বামীজী আমাদের উপদেশ বা শিক্ষা দিয়েছেন, উপনিষদ বা বেদান্ত আমাদের শুধু গভীর জ্ঞান প্রদান করে না, আমাদের শৌর্যপূর্ণ ও সর্বশক্তিধর করে তোলে। আর যিনি দৈবন্তিক, তিনিই প্রকৃত কর্মযোগী হতে পারেন। [অতুল ও অন্যান্য, ১৯৯৪ : ৪৪-৪৫]

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর: অনেকে মনে করেন , রবীন্দ্রসাহিত্যে দুটি দর্শনের অসাধারন শক্তি অতিশয় স্পষ্ট। একটি ভারতীয় দর্শন -সমাজ-সংস্কৃতি , যার মূল কারণ রয়েছে ঐপনিষদক অভিপ্রায় বা ধারণা , আর অপরটি হল সামাজিক নিয়ম নীতি বা লোকজ বাউল দর্শন। অবশ্য অনেকে ধারণা করেন এই দুই ভাবনা উৎপত্তির কারণ এক। বাউল সাধনার অর্থাৎ ঈপ্সিত বস্তুত লাভ বা উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য প্রচেষ্টা অনেক দিক সুফি সাধনার দ্বারা-সঞ্জাত। আর সুফিবাদের আদিকারণ রয়েছে, অপ্রকাশিতভাবে হলেও , উপনিষদ- দর্শন , বিশেষ করে এর- আত্মা -তত্ত্ব। রবীন্দ্র ভাবনায় বহুকথিত ‘আমি’ ও ‘তুমির “প্রত্যয় বা ধারণা কবিকে উপনিষদের কবি হিসেবে অনেকের কাছে প্রতিষ্ঠিত করেছে ,তা সঠিক হোক বা না হোক।”[রায়,২০১১:১৩] রবীন্দ্রনাথের যখন তরুণ বয়স অতিক্রম করে প্রায় প্রৌঢ়ত্বের সীমায় এসেছেন তখন তিনি উপনিষদের এবং প্রাচীন তপোবনভিত্তিক অধ্যাত্মসাধনার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছেন। তপোবনের ঋষি এবং উপনিষদে ধারণ করা হয়েছে এমন তাঁদের উক্তি উভয়ে তাঁর সুগভীর শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা আকর্ষণ করেছিল তার সুন্দর পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর নৈবেদ্য কাব্যগ্রন্থে। এই সাধনার প্রতি তিনি কতখানি গভীর শ্রদ্ধা পোষণ করতেন নিচের ক্যাবাংশে তার অসাধারণ পরিচয় পাওয়া যায়ঃ

“হে সকল ঈশ্বরের পরম - ঈশ্বর
তপোবন তরুচ্ছায়ে মেঘমন্দ্রস্বর
ঘোষণা করিয়াছিল সবার উপরে
অগ্নিতে, জলেতে, এই বিশ্বচরাচরে,

বনস্পতি -ওষধিতে এক দেবতার
অখন্ড অক্ষয় ঐক্য। সে বাক্য উদার
এই ভারতেরই।” নৈবেদ্য ,৫৭

উপনিষদের মধ্যে যে, গুপ্ত তত্ত্ব রবীন্দ্রনাথের মনকে আরও প্রচন্ডভাবে আকর্ষণ করেছে অর্থাৎ যে গুণের দ্বারা মনকে প্রলুব্ধ করেছে;এবং এর ফলে তিনি যে উপনিষদের মধ্যে গভীরভাবে প্রবেশ করেছেন তার প্রমাণও আমরা পাই। এমনই তো হয়ে থাকে, প্রথমে আমাদের শ্রদ্ধা আসে তারপর যার প্রতি শ্রদ্ধা আসে তাঁকে ভালোভাবে জানতে ইচ্ছা করে অর্থাৎ শ্রদ্ধা আসলে তবেই ভালোবাসা আসতে পারে। এর সুন্দর প্রমান পাওয়া যায় 'শান্তি নিকেতনের ভাষণমালার মধ্যে। এই ভাষণগুলি প্রদত্ত হয় বাংলা '১৩১৫ হতে ১৩২১' সালের মধ্যে। তাতে নিজের সম্পর্কে যেমন তুলে ধরা হযেছে , ঠিক তেমনভাবে উপনিষদের বাণী উদ্ধৃত করে তার সমর্থনও নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এমনও ভাষণ পাওয়া যায় যা উপনিষদের ব্যাখ্যার স্বরূপ ধারণ করেছে। এই আলোচনায় 'বিশ্ববোধ' শীর্ষক ভাষণটির বিষয়বস্তু অনুভবযোগ্য। এই সময়ের মধেই, নোবেল পাবার অব্যবহিত আগে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আমেরিকায় বিভিন্ন স্থানে বক্তৃতা দেওয়ার আমন্ত্রণ জানানো হয়। সেখানে রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতা দেওয়ার মূল বিষয় ছিল উপনিষদের বাণীর ব্যাখ্যা। এখানে ,বলা বাহুল্য, এই ভাষণগুলি ইংরেজিতে প্রদান করা হয় এবং পরে 'সাধনা' নামে প্রকাশ হয়। এদের মধ্যে দি রিয়ালাইজেশন অব দি ইনফিনিট' শীর্ষক ভাষণটি বিশেষ করে উল্লেখযোগ্য। সুতরাং এটি অনিবার্য সত্য যে, রবীন্দ্রনাথ উপনিষদের বাণীর সঙ্গে শিশুকাল হতে পরিচিত ছিলেন এবং পরবর্তী জীবনে তার প্রতি গভীরভাবে শ্রদ্ধাশীল হয়ে, তা সযত্নে পাঠ করেন, তার মর্ম হৃদয়সঙ্গম করেছিলেন।[বন্দোপাধ্যায়,১৯৬৯:২৫-২৭]পন্ডিতদের মধ্যস্থলে ও রবীন্দ্র গবেষকদের ভিতর একটি অসামান্য বিশ্বাস প্রচলন আছে যে,রবীন্দ্রনাথের পদ সাহিত্যে বা কাব্যে ,গীত- বাদ্য নৃত্যে এবং সমপূর্ণ বুদ্ধিবৃত্তিক অনুশীলনে উপনিষদের অসাধারণ শক্তি অপরিসীম। গবেষকেরা বিভিন্ন পদ্য বা শ্লোকের ও গীত বাদ্য কোন রচনা বা উক্তি হইতে আহৃত অংশ দিয়ে এ স্মরণশক্তি প্রতিষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন দীর্ঘকাল ধরে। ফলে সাধারণ পাঠকসমাজে এই বিশ্বাস দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত। এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের 'প্রভাত সংগীত” এর 'অনন্ত জীবন' কবিতাটির কয়েকটি ছত্র উল্লেখ করা হলঃ

“এই জগতের মাঝে একটি সাগর আছে
নিস্তব্ধ তাহার জলরাশি,
চারি দিক হতে সেথা অবিরাম অবিশ্রাম
জীবনের স্রোত মিশে আসি।
সূর্য হতে ঝরে ধারা, চন্দ্র হতে ঝরে ধারা,
কোটি কোটি তারা হতে ঝরে,

জগতের যত হাসি, যত গান, যত প্রাণ
ভেসে আসে সেই স্রোতোভরে
মেশে আসি সেই সিন্ধু-' পরে।"

প্রভাত সংগীত/ ৪, অনন্ত জীবন/ ২৪

কবিতা পড়লেই বোঝা যায় এটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অপরিণত বয়সের অপরিপক্ক রচনা। সুতরাং সহজেই বলতে পারি রবীন্দ্রনাথের অপরিপক্ক ভাবনার সাথে উপনিষদের ভাবনার মিলকে অনুসন্ধানও বলতে পারি। উপনিষদের যে বাণী সমগ্র মানুষের হৃদয়কে ঊর্ধ্বমুখী করবার শক্তির বিষয় তিনি অবহিত হন ,পরবর্তীতে তা প্রচারকের ভূমিকাও তিনি গ্রহণ করেছিলেন। [রায়,২০১১:৫৯-৬০]

আমরা শুধু রবীন্দ্রনাথের ধর্মচেতনায়ই উপনিষদের বিপুল প্রভাব লক্ষ করি না , "তাঁর সমাজ- চিন্তা ,ইতিহাস -চিন্তা , শিক্ষা -চিন্তা"এক কথায় বলতে গেলে তাঁর পরিপূর্ণ ব্যক্তির মূল বা বিশুদ্ধ অস্তিত্ব উপনিষদের সত্যদর্শী ব্রহ্মজ্ঞ ঋষিগণের চিরন্তন কল্যাণ বাণীর দ্বারা অনুপ্রাণিত। রবীন্দ্রনাথের রচনাবলীতে একটি মূল সুর বিভিন্নভাবে ধ্বনিত হয়েছে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। সুরটি হচ্ছে "অসীম সে চাহে সীমার নিবিড় সঙ্গ, সীমা চায় হতে অসীমের মাঝে হারা।" উপনিষদের ঋষি ও মহর্ষিদের মিল পাওয়া যায়। কারন দুইজনই ছিলেন শান্তরসের উপাসক। মাত্রাতিরিক্ত আবেগময় ও শক্তিহীন মানুষের ভিতরও অশ্রু, স্বেদ, লোকহর্ষক প্রভৃতি প্রকাশিত হতে পারে। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন-

"যে ভক্তি তোমারে লয়ে ধৈর্য নাহি মানে
মুহূর্তে বিহ্বল হয় নৃত্য -গীত-গানে
ভাবোন্মাদমত্ততায়, সেই জ্ঞানহারা
উদ্ভ্রান্ত উচ্ছলফেন ভক্তিমদধারা
নাহি চাহি নাথ ।" নৈবেদ্য/৪৫

স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন : উপনিষদ আমাদের 'অভী' মন্ত্রে দীক্ষা দিয়েছে। রবীন্দ্রনাথও এই অভয়ের সাধনাই করেছেন ।

".......অস্ত্রে দীক্ষা দেহো
রণগুরু! তোমার প্রবল পিতৃস্নেহ
ধ্বনিয়া উঠুক আজি কঠিন আদেশে।" নৈবেদ্য/৪৭

পুনশ্চ :

"এ দুর্ভাগ্য দেশ হতে, হে মঙ্গলময়,
দূর করে দাও তুমি সর্ব তুচ্ছ ভয়-
লোকভয় , রাজভয় ,মৃত্যুভয় আর ।।" নৈবেদ্য/৪৮

একটি বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে উপনিষদের ঋষি দেখেছেন , 'ভয়াদস্যাগ্নিস্তপতি' ইত্যাদি। রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠেও আমরা ঋষিবাণীর প্রতিধ্বনি কথা শুনতে পাই :

"অগ্নির প্রত্যেক শিখা ভয়ে তব কাঁপে,
বায়ুর প্রত্যেক শ্বাস তোমারি প্রতাপে,
তোমারি আদেশ বহি মৃত্যু দিবারাত
চরাচর মর্মরিয়া করে যাতায়াত ।" নৈবেদ্য/ ৫৮

উপনিষদের ঋষি উদাত্ত ভাষায় মানুষকে অমৃতের পুত্র বলে অভিভাষণ করেছেন। তিনি বলেছেন : আমি সেই আদিত্যবর্ণ মহান পুরুষকে অনুভব করতে পেরেছি। যে কোনো ব্যক্তি আর একমাত্র তাঁকে সঠিকভাবে জেনেই মানুষ সহজেই অমৃততত্ত্ব লাভ করতে পারে।' ঋষির এই দিব্যচেতনা ও দিব্যশ্রবণ রবীন্দ্রনাথকে বিশেষভাবে আসক্ত করেছে। 'নৈবেদ্য '-এ তিনি লিখেছেন :

"একদা এ ভারতের কোন্ বনতলে
কে তুমি মহানপ্রাণ, কী আনন্দবলে
উচ্চারি উঠিলে উচ্চে, 'শোনো বিশ্বজন ,
শোনো অমৃতের পুত্র যত দেবগণ
দিব্যধামবাসী, আমি জেনেছি তাঁহারে ,
মহান্ত পুরুষ যিনি আঁধারের পারে,
জ্যোতির্ময়। তাঁরে জেনে ,তাঁর পাণে চাহি
মৃত্যুরে লঙ্ঘিতে পারো ,অন্য পথ নাহি'।"

নৈবেদ্য/৬০ [অতুল ও অন্যান্য,১৯৯৪:৪৫-৪৬]

ভারতীয় ঋষিরা তাদের ধ্যানদৃষ্টিতে যে সকল সত্য জ্ঞানদ্বারা উপলব্ধি করেছেন, প্রামাণ্য উপনিষদ-সমূহে সেই সব চিরন্তন সত্যই ধারণ করা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঋষিদের হৃদয়কন্দর থেকে নির্গত এই সকল বাণীর ওপর নব্য আলোচনা বা দৃষ্টিপাত করেছেন।বাস্তবিক অর্থে, ব্রহ্ম যে 'আনন্দরূপমমৃতম্'এ উপলব্ধির বস্তু। এই সত্য উপলব্ধি করেই গীতাঞ্জলিতে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন :

"জগতে আনন্দ - যজ্ঞে আমার নিমন্ত্রণ,
ধন্য হল, ধন্য হল মানব- জীবন।" গীতাঞ্জলি/৪৫

এই আনন্দবাদ উপনিষদের ঋষিগণের মননের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এই আনন্দেও বা প্রীতি মন্ত্রে যিনি দীক্ষা প্রদান করেন, যিনি আনন্দ স্বরূপকে জানতে পেরেছেন, তিনি নির্ভীক ও দুঃখহীন হয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর বিভিন্ন রচনায় এই কথা বারবার উদাত্ত কণ্ঠে আহবান করেছেন।[অতুল ও অন্যান্য,১৯৯৪:৪৭-৪৮]

বাস্তবিক উপনিষদকে অবলম্বন করে এমন একটি ভাবধারা বিকাশ লাভ করেছিল যা সত্য, প্রেম ও মঙ্গলকে পরস্পরের সঙ্গে সংযুক্ত করেছে। তাই তার মধ্যে যেমন একটি পাবনীশক্তি আছে ,তেমন অনন্ত আনন্দের স্পর্শ আছে। সেই কারনেই তা রবীন্দ্রনাথের অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছিল।[বন্দোপাধ্যায়,২০১৯:১-২]

শ্রীঅরবিন্দ: শ্রীঅরবিন্দ এ যুগের বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ, যোগী ও দার্শনিক। মহাকবি,সমাজতাত্ত্বিক,রাষ্ট্রবিৎ, সাহিত্য-রসিক, বিজ্ঞানের মর্মজ্ঞ, প্রবন্ধকার, বেদ-উপনিষদ -গীতার ভাষ্যকার, অতীতের অভ্রান্ত যাচনদার, ভবিষ্যতের আর্যদ্রষ্টা - আরো কত উপাধিই না তাঁকে দেওয়া চলে! [রায়,২০১৫:ভূমিকাংশ] তিনি জেল থেকে মুক্তি পাবার পর তাঁর আধ্যাত্মিক জীবন আরম্ভ করেন এবং পন্ডিচেরিতে আশ্রম গঠন করে পাকা পোক্তভাবে বসবাস শুরু করেন। দার্শনিক ও ঋষি অরবিন্দ তাঁর শিক্ষাজীবনের তত্ত্বসমূহ 'The life divine' নামক পুস্তকে প্রকাশ করেন। তাঁর রচিত 'Eassays on the Gita' গীতাসাহিত্যের এক অনবদ্য অবদান। শ্রীঅরবিন্দ যখন পন্ডিচেরী ছিলেন **১৯১৪** সালে তখন পল ও মীরা রিশারের সঙ্গে সম্মিলিতভাবে 'আর্য ' নামে ইংরেজি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। তাঁর এই কাগজে তিনি পর্যায়ক্রমে বেদ ও উপনিষদের গূঢ় তাৎপর্য বা মর্ম ,গীতার শিক্ষা, যোগ-সমন্বয় দীব্যজীবনতত্ত্ব ইত্যাদি বিষয়ে প্রবন্ধ লিখতে থাকেন। তিনি বিশ্বাস করতেন ভারতীয় সভ্যতায় উপনিষদের স্থান খুব উচ্চে - এই তাঁর মত ছিল। শ্রীঅরবিন্দ আটখানি প্রধান উপনিষদ ইংরেজিতে অনুবাদ করেন যথা : "ঈশ ,কেন ,কঠ ,প্রশ্ন ,মুন্ডক, মান্ডূক্য ,ঐতরেয়, ও তৈত্তিরেয়।" পুরাতন ব্যাখ্যাকারদের মতবাদ বাদ দিলে বর্তমানকালে শ্রীঅরবিন্দই নিজের দার্শনিক মতবাদের ভিত্তিতে উপনিষদের বিবরণ বা বর্ণনা করেন। শ্রী অরবিন্দ বিশ্বাস করতেন , ভারতের অধ্যাত্ম ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞানের অন্তিম কথা ঋষিগণ এই উপনিষদ -মন্ত্রের মধ্য দিয়ে ব্যক্ত করেছেন। তাঁর মতে, উপনিষদের ঋষিগণ আলোকিত জীবন লাভের উপায় উল্লেখ করে অতিমানসিক আধ্যাত্মসত্যের সাথে মানব জীবনের অবিরোধ বা মিলন কিরূপ হবে সেই সকল ইঙ্গিত দিয়েছেন।[অতুল ও অন্যান্য,১৯৯৪:৪৮]

উপসংহার : উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায় উপনিষদের বাণী চিরন্তন , এর আবেদন শাশ্বত। কালপ্রবাহে এর ক্ষয় নেই, লয় নেই। উপনিষদের বাণীতেই ভারতবর্ষের চিরন্তন আত্মাটি বাঙময় হয়ে উঠেছে। ভারতীয় দর্শন , ধর্ম ও সংস্কৃতির আকর গ্রন্থ এই উপনিষদ। উপনিষদের দার্শনিক উৎকর্ষ বিশ্বের সকল মনীষীর শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে। উপনিষদের মাধুর্য কবির কল্পলোকেও দুর্লভ। উপনিষদের শিক্ষা মানুষকে জীবনবিমুখ করে না , World and life negation-এর কথা বলে না ;বলে এক পরিপূর্ণ জীবনের কথা। যে জীবন জ্ঞান , কর্ম , ও ভক্তি বা প্রেমের দ্বারা ব্রহ্মের সাথে সর্বদাই যুক্ত। উপনিষদের শিক্ষাকে এভাবে জীবনে প্রয়োগ করার কথাই আমরা শুনতে পাই রামমোহন হতে অরবিন্দ পর্যন্ত আধুনিক কালের মনীষীদের কণ্ঠে।

গ্রন্থপঞ্জি:

১. ঘোষ , অজিতকুমার ,রামমোহন রচনাবলী , কলকাতা, হরফ প্রকাশনী, ১৯৭৩।

২. চক্রবর্ত্তী, অজিতকুমার, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, এলাহাবাদ, ইন্ডিয়া প্রেস, ১৯১৬।

৩. চট্টোপাধ্যায়, ভবতোষ, বিবেকানন্দ সময় ও ইতিহাস চেতনা , কলিকাতা, সিকদার প্রিন্টার্স, ১৯৮৮।
৪. বাগচি, মনি, সেই বিশ্ববরেণ্য সন্ন্যাসী, কলিকাতা, সুতপা প্রকাশনী, ১৯৯০ ।
৫. বন্দোপাধ্যায়, হিরণ্ময় , উপনিষদের দর্শন, কলকাতা, শিশু সাহিত্য সংসদ, প্রাইভেট লিমিটেড, ২০১৯।
৬. রায় ,অজয় , রবীন্দ্রনাথ ও উপনিষদ , ঢাকা, ২০১১।
৭. লোকেশ্বরানন্দ, স্বামী , উপনিষদ ,দ্বিতীয় ভাগ, কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২০০২।
৮. অতুল ও অন্যান্য, উপনিষদ , অখন্ড সংস্করণ, কলকাতা,হরফ প্রকাশনী, ১৯৯৪।

‘কবি, সমাজ-সংস্কারক ও প্রশাসক মদনমোহন তর্কালঙ্কার’

বিশ্বজিৎ পোদ্দার
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
আসানানগর মদনমোহন তর্কালঙ্কার কলেজ

সারসংক্ষেপ : নদীয়া জেলার নাকাশীপাড়ার বিল্বগ্রামের ঠাকুরপাড়ার এক ব্রাহ্মণ বংশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন মদনমোহন তর্কালঙ্কার। পিতা রামধন চট্টোপাধ্যায় এবং মা বিশ্বেশ্বরী দেবীর পাঁচ সন্তানের জ্যেষ্ঠ পুত্র মদনমোহন। বাল্যকাল থেকেই অত্যন্ত মেধাবী ও ধী-শক্তি সম্পন্ন ছাত্র ছিলেন তিনি। সংস্কৃত কলেজে বিদ্যাসাগরের সহপাঠী মদনমোহন, বিদ্যাসাগরের নানা সামাজিক আন্দোলনের সর্বক্ষণের সঙ্গী ছিলেন। বিধবা বিবাহ আন্দোলন, স্ত্রী শিক্ষার প্রসার, শিশুপাঠ্য রচনা ইত্যাদি বিষয়ে যুক্ত ছিলেন তিনি। শেষ জীবনে নিষ্ঠাভরে নানা প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন করেছেন তিনি। তাঁর নীতিশিক্ষা ও মূল্যবোধ গঠনমূলক শিশুপাঠ্য ‘শিশুশিক্ষা’ গ্রন্থের ‘পাখী সব করে রব’, ‘সকালে উঠিয়া আমি মনে মনে বলি’, বা ‘লেখাপড়া করে যে, গাড়ি ঘোড়া চড়ে সে’ ইত্যাদি কবিতাগুলি আজও শিশুদের প্রাতঃপাঠ্য কবিতা হিসাবে স্বীকৃত। শেষজীবনে চাকুরী সূত্রে কান্দীতে থাকার সময়ে কলেরা রোগে ভুগে এই মহান কবি, সমাজ সংস্কারক এবং প্রশাসক ব্যক্তিত্ব অকালে মৃত্যুবরণ করেন।

শব্দ বন্ধন : বিধবা বিবাহ আন্দোলন, স্ত্রী শিক্ষার প্রসার, বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন, দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন, ‘রসতরঙ্গিনী’ (অনুবাদ), ‘বাসবদত্তা’ (অনুবাদ) ‘শিশুশিক্ষা’ (৩ খন্ড); স্ত্রী শিক্ষা বিষয়ক প্রবন্ধ রচনা ইত্যাদি।

প্রতিপাদ্য বিষয় :

১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দের ৩রা জানুয়ারী নদীয়া জেলার নাকাশীপাড়ার বিল্বগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন পন্ডিত মদনমোহন তর্কালঙ্কার। মদনমোহনের জন্মসময় নিয়ে অবশ্য মতবিরোধ আছে। কালীময় ঘটকের তথ্যানুসারে তাঁর জন্ম হয় **১৮১৫** খ্রীষ্টাব্দে। অবশ্য অধিকাংশ আলোচকরা **১৮১৭** খ্রীষ্টাব্দকে মদনমোহনের জন্ম-বছর বলে ধরে নিয়েছেন। বিল্বগ্রামের ঠাকুর-পাড়ার গ্রাম্যদেবতা মদনমোহনের নামে শিশুর নামকরণ করা হয় মদনমোহন । বাবা রামধন চট্টোপাধ্যায় ও মা বিশ্বেশ্বরী দেবীর পাঁচ সন্তানের বড় পুত্র মদনমোহন। মদনমোহনের এক কন্যা বিনোদমালা দেবীর কন্যা ছিলেন রত্নমালা দেবী (তত্ত্ববোধিনী পত্রের ‘শোক সংবাদ’-এ ১৮৫৪ আষাঢ়, পৃ ১০২ তথ্যানুসারে)! রত্নমালা দেবীর ‘প্রবন্ধ মুকুল’ গ্রন্থের মুখবন্ধে রত্নমালা দেবী লিখেছেন –

> “সাধারণ গৃহস্থ হিন্দু-কন্যার সুশিক্ষার সমুচিৎ ব্যবস্থা আজিও এদেশে অনুষ্ঠিত হয় নাই একথা বলাই বাহুল্য; ৩০, ৪০ বৎসর পূর্বে এই শিক্ষার অবস্থা কত

> শোচনীয় ছিল তাহা সহজেই অনুমিত হইতে পারে। আমার খ্যাতনামা মাতামহ ৺মদনমোহন তর্কালঙ্কার এবং পূজনীয় পন্ডিত ৺ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় তখন বাঙ্গালা দেশে স্ত্রীশিক্ষা সূত্রপাত করিবার চেষ্টায় উপহাসিত ব্যর্থ হস্ত হইতেছিলেন। ... পূজনীয় মাতামহদেবের প্রভাবে এবং নিজের ক্ষুদ্র চেষ্টায় বাল্যে যৎসামান্য শিক্ষালাভ করিয়াছিলাম মাত্র।...'[১]

এই স্বীকারোক্তি থেকে স্পষ্ট হয় রত্নমালা দেবী বা তার পরবর্তীকালে এদেশে স্ত্রীশিক্ষার কি অবস্থা ছিল !সেই যুগের উপর দাঁড়িয়ে স্ত্রীশিক্ষার প্রসারে মদনমোহনের যে প্রচেষ্টা তা অর্থনৈতিক দিক থেকে যতটা বাধার সম্মুখীন হয়েছিল ততখানি বাধার সম্মুখীন হয়েছিল সামাজিক ক্ষেত্রেও । সমাজ যাদের দ্বারা চালিত হয় সেই ব্রাহ্মণ সমাজপতিগণের কাছে পর্দানশীন নারীদের বিদ্যালয় অভিমুখী হওয়া ব্যাপারটাই ছিল একটা অবৈধ বিষয়, অসামাজিক বিষয়। মদনমোহনকে রুখে দাঁড়াতে হয়েছিল এ সবের বিরুদ্ধেও।

মদনমোহন জন্মলগ্ন থেকেই একটা মোটামুটি সাংস্কৃতিক পরিমন্ডল পেয়েছেন তার চারপাশে। বর্ধিষ্ণু এক শিক্ষাচর্চার কেন্দ্র বিল্বগ্রাম এবং আশেপাশের অখ্যাত স্থানগুলি। কেবল শিক্ষাচর্চা নয় ইংরেজবিরোধী স্বাধীনতার আন্দোলন এবং দেশসেবার মন্ত্রে অনেকে এগিয়ে এসেছেন এই অঞ্চল থেকে। বিল্বগ্রামের পার্শ্ববর্তী ধর্মদার উপানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়, রামপদ রাহা, গৌর ব্রহ্মচারী, ঋষিপদ নন্দী, দহকুলার বিমলেন্দু বিশ্বাস, বিল্বগ্রামের সুদর্শন চক্রবর্তী, মুড়াগাছার ক্ষীরোদ গাঙ্গুলী, বসন্ত বিশ্বাস (হার্ডিঞ্জকে মারার চেষ্টায় পাঞ্জাবের আম্বালা জেলে ফাঁসি) প্রমুখ স্বাধীনতা সংগ্রামীদের নাম এই অঞ্চল থেকে উঠে এসেছে। লক্ষ্মণ সেনের সভাকবি 'গীতগোবিন্দ'কার জয়দেবের পদধূলি-ধন্য এই বিল্বগ্রাম। গঙ্গাতীরস্থ রুকুনপুর,সাহেবনগর, কাঁচকুলি, ধর্মদা, কিছুটা দূরবর্তী কৃষ্ণনগর, মায়াপুর,শান্তিপুর তখন বিদ্যাচর্চা, শাস্ত্রচর্চা, ভক্তিচর্চা, দেশাত্মবোধক আন্দোলনের পীঠস্থান। কৃত্তিবাস, শ্রীচৈতন্য, ভারতচন্দ্র, লালন শাহ ফকির, কার্তিকেয় চন্দ্র রায়, কাঙাল হরিনাথ, দীনবন্ধু প্রমুখ নামের পাশে নদীয়া জেলার অপর এক কৃতী সন্তান মদনমোহন তর্কালঙ্কারের নাম স্বমহিমায় ভাস্বর। শান্তিপুর তখন বাংলার কেমব্রিজ, নবদ্বীপ অক্সফোর্ড। 'মদনমোহন তর্কালঙ্কার' গ্রন্থে বিমলেন্দু সিংহরায় মহাশয় এর পাশাপাশি বিল্বগ্রামকে লিডস ইউনিভার্সিটির সঙ্গে তুলনা করেছেন। সুতরাং জন্মলগ্ন থেকেই মদনমোহন তাঁর চারপাশে এক চমৎকার সাংস্কৃতিক পরিমন্ডল পেয়েছিলেন।

মদনমোহনের পিতা রামধন চট্টোপাধ্যায় ছিলেন সংস্কৃত কলেজের লিপিকর। রামধন অবসর গ্রহণের পর ভাই রামরতন দাদার ঐ পদ অলঙ্কৃত করতেন। এই রামরতনই ভাইপো মদনমোহনকে সংস্কৃত কলেজে ভর্তি করেছিলেন। শিশু মদনমোহনের অসাধারণ স্মৃতিশক্তি ও মেধা দেখে তাঁর পাঠশালার গুরুমশাইরা বিস্মিত

হয়ে যেতেন। গ্রামের পাঠশালায় ভরত শিরোমণি নামক গুরুমশাইয়ের কাছে তিনি দুই বছর ব্যাকরণ পাঠ নিয়েছিলেন। সংস্কৃত কলেজে ব্যাকরণ পাঠ নিতেন রামদাস ন্যায়রত্ন, বনমালী বিদ্যারত্ন এবং শিবনাথ সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয়দের কাছে। উদরাময় রোগের কারণে তাঁকে ফিরে আসতে হয় বিল্বগ্রামে । পরে আবার যখন সংস্কৃত কলেজে ভর্তি হন তখন সেখানে সহপাঠী হিসাবে পান বিদ্যাসাগরকে। ঈশ্বরচন্দ্রের মতোই মেধাবী ছাত্র ছিলেন মদনমোহন। দুজনের পারস্পরিক সম্পর্কও ছিল গভীর এবং অটুট। সংস্কৃত কলেজের সাহিত্যের অধ্যাপক জয়গোপাল তর্করত্ন মহাশয় মদনমোহনের ভূয়সী প্রশংসা করতেন। ১৬ বছর বয়স থেকেই কবিতা রচনার দিকে ঝোঁক ছিল মদনমোহনের। নদীয়ার ধর্মদার বহিরগাছির শ্যামাচরণ ভট্টাচার্যের ১০ বছরের কন্যা মুক্তকেশীর সঙ্গে ১৪ বছর বয়সে তাঁর বিয়ে হয় । এই মুক্তকেশীর বাল্যনাম সম্ভবত নৃত্যকালী দেবী। ১৭ বছর বয়সে মদনমোহন ‘রসতরঙ্গিনী’ নামক অনুবাদমূলক উৎকৃষ্ট গীতিকাব্যটি লেখেন। ব্যাকরণ, সাহিত্য, অলঙ্কার, জ্যোতিষ, দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়নের পর ১৮৩৬ খ্রী. মদনমোহন ‘বাসবদত্তা’ নামক অনুবাদমূলক গ্রন্থটি প্রকাশ করেন। ভারতচন্দ্রের ‘বিদ্যাসুন্দর’ গোত্রের কাব্য ‘বাসবদত্তা’। চেয়েছিলেন এই কাব্য লিখে ভারতচন্দ্রকে পরাজিত করতে। তাঁর এই অনুবাদমূলক কাব্য দুটি আদি-রসাত্মক বলে অনেকের কাছে সমাদৃত হয়নি। সহপাঠী বিদ্যাসাগরের সঙ্গে প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশের কাছে অলঙ্কার শাস্ত্র শিখেছিলেন তিনি। সেই শিক্ষার ফল তাঁর ‘রস তরঙ্গিনী’ অনুবাদ।

মদনমোহনের পিতা রামধনবাবু ছিলেন সুন্দর সুপুরুষ, নীতিনিষ্ঠ মানুষ। মা ছিলেন অত্যন্ত ভীরু প্রকৃতির, পতিপরায়ণা নারী। বড় হয়ে মদনমোহনও হয়ে উঠলেন গম্ভীর, অমায়িক ধী-শক্তি সম্পন্ন নীতিনিষ্ঠ মানুষ। বিদ্যাসাগরের সঙ্গে মদনমোহনের সখ্যতা ছিল অটুট, একথা পূর্বেই বলেছি। সংস্কৃত কলেজের সম্পাদক রসময় দত্তের সঙ্গে বিদ্যাসাগরের একবার বিরোধ তৈরি হয় । অপমানিত বিদ্যাসাগর সহ-সম্পাদকের পদ থেকে ইস্তফা দেন ।মদনমোহন বারো জন শিক্ষককে নিয়ে মোয়াট সাহেবের সঙ্গে দেখা করে তাকে স্বপদে বহাল রাখতে স্মারকলিপি জমা করেছিলেন। এই মদনমোহনের অনুরোধে পরে বিদ্যাসাগরও বন্ধুর সম্মান রেখে মহেশপুর, ভজনঘাট ও কৃষ্ণনগরের নানা জায়গায় অনেক বিদ্যালয় স্থাপন করে দিয়েছিলেন শিক্ষার বিস্তারের উদ্দেশ্যে। বন্ধুর সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য বিদ্যাসাগর বিল্বগ্রামেও এসেছেন। পথে দশ টাকা অনুদানও দিয়েছেন মুড়াগাছা স্কুলকে। বিদ্যাসাগরের বিধবা বিবাহ আন্দোলনের সর্বক্ষণের সঙ্গী বলা যায় মদনমোহনকে। বহরমপুর কলেজের অধ্যাপক মৃণালকান্তি চক্রবর্তী মহাশয়ের স্বীকারোক্তি থেকে জানা যায় – ১৮৫৭ খ্রী. প্রথম বিধবা বিবাহের পাত্র খাঁটুরার রামধন বিদ্যারত্নের পুত্র শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন ও পলাশডাঙার ব্রহ্মবান্ধব মুখোপাধ্যায়ের বিধবা কন্যা কালীমতির বিবাহের যোগসূত্র স্থাপন করেছিলেন মদনমোহন। শোনা যায় এক বিধবা কন্যার সঙ্গে নিজের পুত্রের বিবাহ দিয়েছিলেন

বিদ্যাসাগর । বিদ্যাসাগর এবং মদনমোহন উভয়কেই সমাজপতিদের রক্তচক্ষুর মুখোমুখি হতে হয়েছিল। 'প্রভাকর' পত্রে অনেক গালি দেওয়া হয় মদনমোহনকে। এমনকি তাকে এক ঘরেও করা হয়েছিল তখন । এই শ্রীশচন্দ্র ছিলেন সংস্কৃত কলেজে বিদ্যাসাগরের ছাত্র। ১৮৪৭ খ্রী. বিদ্যাসাগর এবং মদনমোহন যৌথ উদ্যোগে 'সংস্কৃত যন্ত্র' নামক ছাপাখানা প্রতিষ্ঠা করেন। মদনমোহনের এক অভাবী বোন আর্থিক সাহায্যের জন্য বিদ্যাসাগরের দারস্থ হলে বিদ্যাসাগর তাকে এই ছাপাখানা থেকে মাসিক দশ টাকা অনুদানের ব্যবস্থা করে দেন। কেবল সহপাঠী বিদ্যাসাগরের সঙ্গে নয় অন্য সহপাঠী রামগোপাল ঘোষ, মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশ এবং রাজকৃষ্ণ বন্দোপাধ্যায়ের সঙ্গেও আন্তরিক সম্পর্ক ছিল মদনমোহনের । মারণ কলেরা রোগে মাত্র ৪১ বছর বয়সে মদনমোহনের অকাল মৃত্যুর পর তাঁর অস্বচ্ছল পরিবারকে বিদ্যাসাগর আর্থিক সাহায্য করতেন বলে শোনা যায়।

অধ্যয়নকাল শেষ হবার পর মদনমোহন কর্মজীবনে প্রবেশ করেন ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দে। প্রথমে হিন্দু কলেজ পাঠশালায় বাংলা শিক্ষক তারপর ক্রমে বারাসাত ইংরেজী পাঠশালার প্রধান পন্ডিত, ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে সাহেবদের বাংলা পাঠদান, কৃষ্ণনগর কলেজের পন্ডিত শেষে সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক । এই ছিল তাঁর একজীবনের বিদ্যাদানের অধ্যায়। আর জীবনের শেষ অধ্যায় ছিল প্রশাসক জীবন। এই অধ্যায়ে ছিলেন মুর্শিদাবাদ কোর্টের জজ পন্ডিত, বহরমপুরের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও কান্দি মহাকুমার ডেপুটি মেজিস্ট্রেট। বন্ধু বেথুন সাহেব তাঁর অনুরোধে কান্দিকে মহকুমা বানিয়ে তাঁকে সেখানকার ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট করেছিলেন।

মদনমোহন বেশ গম্ভীর প্রকৃতির এক মানুষ ছিলেন একথা আগে বলেছি। তবে তাঁর চরিত্রে রসবোধ কিন্তু কম ছিল না। এখানে একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করা যাক। একবার তিনি ক্লাসে শিক্ষার্থীদের মেঘদূত কাব্য পড়াচ্ছিলেন। শিক্ষার্থীরা শ্রেণীকক্ষের জানালা দিয়ে পাশের বাড়ির মেয়েদের দিকে কৌতুকপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখছিল। এ ঘটনায় পাশের বাড়ির গৃহকর্তা অসন্তুষ্ট হয়ে স্বয়ং বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কাছে এ ব্যাপারে নালিশ জানায়। বিদ্যাসাগর মহাশয় মদনমোহন তর্কালঙ্কারকে ঘটনা জিজ্ঞাসা করলে তিনি তাঁর উত্তরে বলেন, শোনো ঈশ্বর –

"ভবন্তি পাঠকাঃ নব্যাঃ পাঠ্যং মেঘদূতং তথা।
অধ্যাপকঃ মদনশ্চ মধুমাসে সমাগতে।।
ভবতি চিত্তবৈকল্যং পরিবেশপ্রভাবেন।
ন তত্র দোষঃ ছাত্রানাং ণ চ তথা মম দোষঃ।।

একে তো বসন্তকাল, তাতে মেঘদূত কাব্য পড়ানো হচ্ছে এবং পড়াচ্ছেন মদনমোহন তর্কালঙ্কার। সুতরাং ছাত্রদের মন তো চঞ্চল হয়ে উঠবেই।'২

বঙ্গনারীগণের পরম সুহৃদ ছিলেন জন ইলিয়ট ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুন সাহেব। মদনমোহন তাঁর বন্ধু ছিলেন। স্ত্রী শিক্ষার প্রসারে তাদের উভয়ের ভূমিকা ছিল অসামান্য। বঙ্গললনাদের বিদ্যা-শিক্ষার জন্য বেথুন স্কুল তৈরী করা হল। প্রথমে গোঁড়া বাঙালীরা কেউ সেখানে নিজেদের কন্যাকে ভর্তি করতেন না। উল্টে সাহায্য করার অপরাধে রক্ষণশীল সমাজপতিরা মদনমোহন, শম্ভুনাথ পন্ডিত, রামগোপাল ঘোষকে হিন্দু সমাজ থেকে বিতাড়িত করেন। Young Bengal Society-র লোকেদের সঙ্গে মিশতেন মদনবাবু। তিনি সেই সমাজচ্যুতিতে দমলেন না। বরং সেখানে নিজের দুই কন্যা ভুবনমালা ও কুন্দমালাকে পাঠালেন বিদ্যাশিক্ষার জন্য। একে একে রামগোপাল ঘোষ, শম্ভুনাথ, তারানাথ তর্কবাচস্পতিরাও তাদের নিজেদের কন্যাদের সেখানে শিক্ষালাভে নিযুক্ত করলেন। বেথুন এমনকি লেডি ডালহৌসি অত্যন্ত স্নেহ করতেন ভুবনমালা ও কুন্দমালাকে। নিজে অবৈতনিক শিক্ষক হিসাবে এখানে যোগ দিলেন মদনমোহন। তাঁর অনুরোধে বেথুন সাহেব বিদ্যাসাগরকে সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত করেছিলেন। জীবনের সায়াহ্নে এসে মদনমোহন ‘সর্ব্বশুভকরী’ পত্রে স্ত্রী শিক্ষা নিয়ে লিখলেন বিশেষ প্রবন্ধ ‘স্ত্রী শিক্ষা’ (১৮৫০)। রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, শম্ভুনাথ পন্ডিত, প্যারীমোহন মিত্র, রাজা দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে বিদ্যাসাগরের সহযোগী হিসাবে বিধবা বিবাহ আন্দোলনে যোগ দেন মদনমোহন। কলকাতার পথে বিদ্যাসাগরের দেখা কলেরা রোগীকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে তার সেবার ভার নিয়েছিলেন মদনমোহন। মুর্শিদাবাদে প্রশাসক থাকাকালীন বিধবা-অনাথদের জন্য দাতব্য সমিতি গড়ে দিয়েছিলেন। আত্মসুখ বিসর্জন দিয়ে পরার্থে জীবন ব্যয়ের সাধনা নিয়েছিলেন তিনি। কান্দিতে বালিকা বিদ্যালয়, ইংরেজী বিদ্যালয় স্থাপন, দাতব্য চিকিৎসালয় খোলা, মৃতদেহ সৎকারের স্থান নির্বাচন করেছিলেন মদনমোহন। ডালহৌসীকে লেখা চিঠিতে বেথুন কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেছিলেন এদেশের তিন মহান ব্যক্তিত্ব – বাবু রামগোপাল ঘোষ, বাবু দক্ষিণারঞ্জন মুখার্জী ও পন্ডিত মদনমোহন তর্কালঙ্কারকে। ইংরেজরা সিপাহী বিদ্রোহের সময় সংস্কৃত কলেজে সামরিক শিবির স্থাপন করলে মুর্শিদাবাদ থেকে তিনি পত্র লিখে প্রতিবাদ জানাতে ভোলেননি। এমন দক্ষ এক কবি, সমাজ-সংস্কারক ও প্রশাসক কেন এতখানি প্রচারের আবডালে থেকে গেলেন বোঝা গেল না। এই অংশে তাঁর আর দু-একটি প্রতিবাদী সত্ত্বার পরিচয় তুলে ধরার চেষ্টা করছি। ১৮৫৪ খ্রী. তদানীন্তন সরকার প্রবর্তিত শিক্ষানীতিতে প্রাথমিকের গুরুত্ব হ্রাস ও মাতৃভাষার সঙ্কোচনের বিরুদ্ধে সরব হয়েছিলেন মদনমোহন। বড়লাটের লাটভবনে ভারতীয়দের টুপি, জুতা খুলে ভিতরে যাবার আদেশনামার বিরুদ্ধেও সোচ্চার হয়েছিলেন মদনমোহন। ইংরেজরা এখানে যে ঔপনিবেশিক অর্থনীতি প্রতিষ্ঠা করতে চাইছেন তার বিরুদ্ধে সচেতনতা গড়ে তোলার জন্য অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলেন তিনি।

মদনমোহনের 'শিশুশিক্ষা' গ্রন্থখানি ঈশ্বরচন্দ্রের বর্ণপরিচয়েরও পূর্বে রচিত। আলোচ্য কাব্যগ্রন্থের বিখ্যাত কবিতা 'পাখী সব করে রব', 'সকালে উঠিয়া আমি মনে মনে বলি', 'লেখা পড়া করে যেই', 'মান রাখা দায়' ইত্যাদি। দ্বিতীয় ভাগে প্রাধান্য পেয়েছে সংযুক্ত বর্ণ পরিচয়। আর তৃতীয় ভাগে সুশীল শিশু ও সুবোধ বালকের লেখা-পড়া, গুরুপ্রীতি ইত্যাদি নীতিকথা ব্যক্ত হয়েছে। বেণী ও মাধবের গদ্যধর্মী বর্ণনায় নীতিশিক্ষা, মূল্যবোধের জাগরণ ঘটানো হয়েছে। এই ভাগে একটি উল্লেখযোগ্য রচনা 'ধার্মিক লোক পৃথিবীর অলঙ্কার'। মদনমোহনের 'প্রভাতবর্ণন' অর্থাৎ 'পাখী সব করে রব' কবিতাটির সমালোচনা করেছিলেন অক্ষয়কুমার দত্ত। সকালেই সব ফুল ফোটে না বা সকালে পাখীর রব শোনার সাথে সাথে রাখাল গরুর পাল নিয়ে মাঠে যায় না। এ ধরণের সমালোচনা হয়তো থাকে কিন্তু তাতেই কবিতাটির নীতিবোধ বা শিশুদের মূল্যবোধ বিকাশের উপদেশ, value কিছু খর্ব হয় না। মদনমোহনের লেখায় ছিল 'মধুকর মধু লোভে আসিয়া জুটিল' লাইনটি । বিদ্যাসাগরকে বইটি দেওয়া হয়। তিনি লাইনটি কেটে করেন 'পরিমল লোভে অলি আসিয়া জুটিল'। এই পরিবর্তনের যথার্থ কারণ জিজ্ঞাসায় তিনি নাকি অপ্রস্তুত হয়ে পড়েছিলেন। এবার মদনমোহনের 'লেখাপড়া করে যেই' কবিতাটি একটু উদ্ধৃত করছি –

লেখা পড়া করে যেই।
গাড়ী ঘোড়া চড়ে সেই।।
লেখা পড়া যেই জানে।
সব লোকে তারে মানে।।

এমন নৈতিক উপদেশে শিশুর চরিত্র গঠনের কথা বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁর 'বর্ণ পরিচয়', 'আদর্শ লিপি' গ্রন্থে দেখিয়েছেন। নইলে এমন নৈতিক শিক্ষার বই বাংলা শিশুসাহিত্যে বিরল। মদনমোহনের আরেকটি বিখ্যাত কবিতা 'আমার পণ' যেখানে ঘুমভাঙা শিশুর প্রার্থনা বাণী উচ্চারিত হয়েছে। এই অংশে 'শিশুশিক্ষার সেকাল-একাল' প্রবন্ধের লেখক অমিতাভ মুখোপাধ্যায়ের উক্তিটি স্মরণ করে এই আলোচনা স্থগিত করা যেতে পারেঃ-

> 'মদনমোহন তাঁর 'শিশুশিক্ষা'য় শব্দচয়নে লক্ষ রেখেছেন সচরাচর বাংলায় ব্যবহৃত শব্দাবলির প্রতি। অপ্রচলিত সংস্কৃত শব্দ সযত্নে পরিহার করেছেন। পাঠের মধ্যে তিনি ছন্দের স্পর্শ নিয়ে এলেন। পন্ডিতি বাতাবরণে লেখাপড়া শুরুর কষ্টকর অবস্থা থেকে শিশুশিক্ষার্থীর মুক্তি ঘটল তর্কালঙ্কারের এই পাঠ্যপুস্তকে।'৩

তথ্যসূত্র :

১. রত্নমালা দেবী, ‘মদনমোহন তর্কালঙ্কার’, সংকলন ও সম্পাদনা : প্রত্যুষকুমার রীত, দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭০০০৭৩, প্রথম প্রকাশ : আগস্ট ২০১৩, শ্রাবণ ১৪২০, পৃ. ১০ (নিবেদন অংশ)

২. বিমলেন্দু সিংহরায়, ‘মদনমোহন তর্কালঙ্কার’, গ্রন্থতীর্থ, ৬৫/৩এ কলেজ স্ট্রিট, কলকাতা – ৭০০০৭৩, প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারি ২০১২, পৃ. ৫৫

৩. অমিতাভ মুখোপাধ্যায়, ‘শিশুশিক্ষার সেকাল-একাল’ (প্রবন্ধ), মূলগ্রন্থঃ মদনমোহন তর্কালঙ্কার স্মারক গ্রন্থ, সম্পাদনাঃ ড. নির্মল দাশ, পারুল প্রকাশনীর পক্ষে ৮/৩ চিন্তামণি দাস লেন কলকাতা ৭০০০০৯ থেকে রত্না সাহা কর্তৃক প্রকাশিত, প্রথম প্রকাশ : ২০০৮, পৃ. ৩০২

ঔপনিবেশিক বাংলার বর্ধমান জ্বর ও সমকালীন শিক্ষাব্যবস্থায় তার প্রভাব: একটি প্রাথমিক অন্বেষণ

অরিজিৎ প্রামাণিক
সহকারী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ,
গভর্নমেন্ট জেনারেল ডিগ্রী কলেজ, নারায়ণগড়, পশ্চিম মেদিনীপুর

সারসংক্ষেপ: ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলায় বিভিন্ন স্থানে সময়ে সময়ে ম্যালেরিয়া জ্বরের প্রাদুর্ভাব ঘটেছিল। কখনও সেই জ্বর কিছুদিনের জন্য স্থায়ী হলেও কোন কোন সময় দেখা গেছে এই জ্বর দীর্ঘস্থায়ী হয়েছে এবং অনেক মানুষকে একসাথে অসুস্থ করে মড়কে রুপান্তরিত হয়েছে। বর্ধমান ও তার পার্শ্ববর্তী জেলায় ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ম্যালেরিয়া জ্বরের লক্ষণগুলি ক্রমে প্রকাশিত হচ্ছিল। পরের চার পাঁচ বছরের মধ্যে এই জ্বর বহুসংখ্যক মানুষের মৃত্যুর কারণ হয়ে ওঠে। বাংলায় সেই সময়কার সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনচর্যার পাশাপাশি শিক্ষাব্যবস্থার উপরে এর কুপ্রভাব পড়েছিল। নিম্নালোচিত প্রবন্ধে 'বর্ধমান জ্বর' নামে সমধিক পরিচিত এই জ্বর বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বিশেষত বিদ্যালয়গুলির উপর এবং সেখানে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের উপর কীরকম প্রভাব ফেলেছিল তা দেখানোর প্রচেষ্টা করা হয়েছে।

সূচক শব্দ: ম্যালেরিয়া, বর্ধমান জ্বর, মহামারী, মৃত্যু, বিদ্যালয়, শিক্ষাবর্ষ, রিপোর্ট, জেলা।

মূল আলোচনা: মানবশরীরে জ্বর হওয়া আপাতদৃষ্টিতে একটি সাধারণ ঘটনা। অতিসরলীকৃত অর্থে জ্বর বলতে বোঝানো হয় দেহের তাপমাত্রার কোন কারণে স্বাভাবিকের থেকে বৃদ্ধি পাওয়া। একাধিক কারণে এই তাপমাত্রা বৃদ্ধি ঘটতে পারে যেমন শরীরে কোন রোগ-জীবাণুর সংক্রমণ অথবা শরীরের কোন স্থানে প্রবল ব্যথার উদ্রেক ইত্যাদি। সঠিক ও সময়োপযোগী চিকিৎসার অভাব হলে জ্বরের প্রকোপে রোগীর মৃত্যুও ঘটতে পারে।[১] বাহ্যিক ভাবে দেখলে ব্যক্তিমানুষের জ্বরে আক্রান্ত হওয়া ও তা থেকে সুস্থ হয়ে যাওয়া কোন শঙ্কার সৃষ্টি না করলেও যখন এই জ্বর জনসংখ্যার একটি বৃহত্তর অংশের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে এবং অগণিত মানুষের প্রাণহানির কারণ হয়ে দাঁড়ায় তখন স্বভাবতই তা মহামারীর আকার ধারণ করে। জ্বরের এভাবে মহামারীতে পরিণত হওয়ার ভয়াবহ পরিস্থিতি উনিশ শতকের ষাট ও সত্তরের দশকে ব্রিটিশ শাসিত বাংলায় পরিলক্ষিত হয়েছিল। এর প্রভাব এতটাই ক্ষতিকর ছিল যে পশ্চিম ও মধ্য বাংলার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে এই দুই দশকে প্রায় ২০ লক্ষ মানুষ এতে প্রাণ হারিয়েছিল।[২]

ব্রিটিশ সরকারের ভাষ্যে এই জ্বর 'বর্ধমান জ্বর' নামে পরিচিত ছিল। তবে অনেক সময় একে নিম্ন বঙ্গের স্থানীয় জ্বর (Endemic Fever of Lower Bengal) বা কখনো কখনো যে অঞ্চলে এই জ্বরের প্রকোপ বেশি দেখা দিত সেই জায়গার

নামানুসারে একে ছোটনাগপুর বা পাটনা জ্বর এমনকি আসাম জ্বর ইত্যাদি বলেও আখ্যায়িত করা হতো।[৩] প্রকৃতপক্ষে ম্যালেরিয়া রোগের কারণে এই জ্বরের প্রাদুর্ভাব ঘটেছিল। ম্যালেরিয়া মশার দ্বারা সংক্রমিত হয়। মশার লালাগ্রন্থীতে প্লাসমোডিয়াম নামক একপ্রকার প্রোটোজোয়া থাকে যা কামড়ানোর সময় কোন সুস্থ মানুষের দেহে অনুপ্রবেশ করে। পরে এই প্রোটোজোয়া মানবদেহে বংশবিস্তার করে এবং লোহিত রক্ত কণিকাকে ধ্বংস করতে থাকে। ফলত রোগীর কাঁপুনি দিয়ে জ্বর আসে। একসময় আসাম অঞ্চলের কালা-আজারকে এই জ্বরের প্রকারভেদ বলে মনে করা হতো। কিন্তু পরবর্তী সময়ে ম্যালেরিয়া ও কালা-আজার রোগের বিভিন্নতা তথ্যসহকারে প্রমাণিত হয়েছিল।[৪]

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাংলায় যে ম্যালেরিয়া জ্বরের প্রাদুর্ভাব ঘটেছিল তা রাঢ়বঙ্গের বেশিরভাগ জেলাকেই কমবেশি বিদ্ধস্ত করেছিল। অবশ্য এই জ্বরের উৎপত্তি স্থল ছিল পূর্ববঙ্গের যশোর জেলা। ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে মহম্মদপুরের কাছে যশোর থেকে ঢাকা যাওয়ার রাস্তা নির্মাণে নিযুক্ত ৩০০ থেকে ৭০০ জন আসামীর মধ্যে ১৫০ জন জ্বরে আক্রান্ত হয়ে মারা যায়। ৭ বছর টানা চলতে থাকার পর ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে হঠাৎ এই মহামারীর তাৎক্ষণিক সমাপ্তি হলেও ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দে পুনরায় এর আবির্ভাব ঘটে এবং পরবর্তী দুবছরের মধ্যে সমগ্র জেলায় ছড়িয়ে পড়ে। কয়েক বছর স্তিমিত থাকার পর ১৮৫৪ থেকে ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে এই জ্বর পশ্চিম দিকে নদীয়া ও চব্বিশ পরগণাতে ছড়িয়ে পড়তে থাকে এবং ১৮৫৭ থেকে ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে উক্ত জেলাগুলিকে মহামারীর আকারে তছনচ করে ফেলে। এরপর প্রেসিডেন্সি ডিভিশনে এর প্রকোপ ক্রমশ কমে যায়। কিন্তু ধীরে ধীরে আরও পশ্চিমে অগ্রসর হয়ে এই জ্বর বর্ধমান ডিভিশনে প্রবেশ করে এবং ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে চরম আকার ধারণ করে। ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বর্ধমান ও তৎসংলগ্ন এলাকায় এর প্রভাব লক্ষ্য করা গিয়েছিল।[৫] খোদ বর্ধমান জেলার পশ্চিমাঞ্চলের সমস্ত থানা এবং বর্ধমান, কালনা, কাটোয়ার মতো শহরে এই মহামারী জ্বর ছড়িয়ে পড়েছিল।[৬] পার্শ্ববর্তী জেলা বীরভূমে ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবরের মধ্যে বীরভূম থেকে বর্ধমানের যোগাযোগকারী রেলপথের পূর্ব ও দক্ষিণ-পশ্চিমের গ্রামগুলিতে এবং উত্তরে লাভপুর থানায় এই জ্বরের বিস্তার ঘটে। ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দের জুলাইয়ে জেলার দক্ষিণাংশে এই জ্বরের পুনরাবির্ভাব ঘটে আর সেপ্টেম্বর আসতে আসতে উত্তরে ময়ূরেশ্বর ও পশ্চিমে পুরন্দরপুর মারণ জ্বরে আক্রান্ত হয়ে যায়।[৭] হুগলী জেলায় বর্ধমান জ্বরের স্থায়িত্ব ছিল ১৮৫৭ থেকে ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত। নদীয়া জেলা হয়ে এই মহামারী হুগলীতে প্রবেশ করে এবং একের পর এক পান্ডুয়া, দ্বারবাসিনী, সরস্বতী নদীর তীরবর্তী অঞ্চল, কানা দামোদর ও দামোদর নদের পূর্বতীর, জাহানাবাদ (আরামবাগ), গোঘাট, এবং শ্রীরামপুর মহকুমাকে সংক্রমিত করে।[৮] বাঁকুড়া জেলার ক্ষেত্রে ম্যালেরিয়ার জ্বর এর পশ্চিমাংশে অবস্থিত বর্ধমান সংলগ্ন কোতুলপুর ও ইন্দাস থানাতে বেশি প্রভাব ফেলেছিল।[৯]

কী কারণে বর্ধমান জ্বরের সৃষ্টি হয়েছিল সেই নিয়ে একাধিক ব্যাখ্যা দেখানো হয়েছে।[১০] কিন্তু সম্ভবত সবথেকে বেশি চর্চিত ব্যাখ্যা ছিল বাঁধ নির্মাণের তত্ত্ব। এর মূল কথা ছিল রাস্তা ও রেলপথ তৈরির জন্য যখন বাঁধ নির্মাণ করা হয়েছিল তখন সেই বাঁধের জমা জল থেকে ম্যালেরিয়ার উৎপত্তি হয়েছে। ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে ম্যালেরিয়ার বিষয়ে অনুসন্ধানের জন্য যে সরকারি কমিটি স্থাপন করা হয় সেখানে ভারতীয় প্রতিনিধি রাজা দিগম্বর মিত্র সহ অন্যান্যরা ম্যালেরিয়ার জন্য রাস্তা তৈরির কাজকে দায়ী করেছিলেন। বিংশ শতাব্দির এক পরিসংখ্যান থেকে দেখা গিয়েছিল ১৯২০-এর দশকে বাংলার পশ্চিম, মধ্য ও উত্তর অংশে রেলপথ তৈরির কাজ বেশি হওয়ার কারণে ম্যালেরিয়ার সংক্রমণ পূর্ব অংশের থেকে তুলনামূলকভাবে প্রবলতর হয়েছিল।[১১]

বর্ধমান জ্বরের সরাসরি আঘাত নেমে এসেছিল মানুষের প্রাণের উপর। বর্ধমান জেলার মোট জনসংখ্যার প্রায় এক-তৃতীয়াংশ এই জ্বরের কারণে মারা গিয়েছিল। ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে যেখানে বর্ধমান শহরের জনসংখ্যা ছিল ৪৬,১২১ জন, ম্যালেরিয়া জ্বরের পরে ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দের জনগণনায় সেই সংখ্যা কমে দাঁড়ায় ৩২,৬৮৭ জন। কাটোয়া মহকুমার ১৭টি গ্রামের জনসংখ্যা মহামারী শুরু হওয়ার আগে ছিল ১৪,৯৮২ জন। মহামারী জ্বরের পর থেকে ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তার মধ্যে কম করে ৬,২৪৩ জন এই জ্বরে মারা যায়। মহামারী চলাকালীন প্রথম জনগণনায় জেলায় ১,৪৮৬,৪০০ জন মানুষের বাস ছিল। ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দের জনগণনায় সেই সংখ্যা আরও কমে হয় ১,৩৯৪,২২০ জন। ব্রিটিশ কতৃপক্ষের কাছে এর প্রধান কারণ ছিল ম্যালেরিয়ার জ্বর। পাশাপাশি এর থেকে এটাও স্পষ্ট হয়ে যায় যে ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দের পর থেকে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ ক্রমহ্রাসমান হলেও কালনা ও আউসগ্রাম থানা অঞ্চলে তখনও জ্বরের উপস্থিতি লক্ষণীয় ভাবে বজায় ছিল।[১২] বীরভূম জেলার জনসংখ্যার গ্রাফ মূলত বর্ধমান জ্বরের কারণেই নিম্নমুখী ছিল। এই জেলার জনসংখ্যা ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দের ৮৫১,২৩৫ জন থেকে অনেকটা কমে(প্রায় ৬০ হাজার) ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দ নাগদ এসে দাঁড়ায় ৭৯২,০৩১ জনে।[১৩] বীরভূমে মহামারীর প্রথম তিন বছর এই জ্বরের ফলে মৃত্যুহার উত্তোরোত্তর বৃদ্ধি পেলেও পরের তিন বছর জ্বরে আক্রান্তের সংখ্যা কমে আসছিল। এছাড়া জ্বর স্বল্পস্থায়ী ও কম মারাত্মক হওয়ায় এতে মৃত্যুর পরিমাণও কমেছিল।[১৪] হুগলী জেলাতেও ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দের জনসংখ্যা ১৮৭২-এর থেকে প্রায় ১৩ শতাংশ হ্রাস পেয়েছিল। ম্যালেরিয়া জ্বর ছিল এর কারণ। ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে ম্যালেরিয়ার ভয়াবহতা কিছুটা কমলে এখানকার জনসংখ্যা ৬ শতাংশ বৃদ্ধি পায়।[১৫] যেহেতু বাঁকুড়া জেলার বর্ধমান লাগোয়া অংশে ম্যালেরিয়ার প্রভাব বেশি লক্ষণীয় ছিল সুতরাং জেলার পূর্বদিকের বিষ্ণুপুর মহকুমার জনসংখ্যা ১৮৭২ থেকে ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে ৮ শতাংশেরও বেশি কমে যায়। এখানে জমির গুনগত মান উর্বর থাকার ফলে চাষবাসের সম্বৃদ্ধি ও জনসংখ্যা বৃদ্ধির সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু নিম্ন ভূমিরূপ ও জলনিকাশী ব্যবস্থার সমস্যা ম্যালেরিয়ার মশা জন্মানোর

উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি করেছিল যা পক্ষান্তরে রোগাক্রান্ত মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি ও তাদের মৃত্যুর সহায়ক হয়।[১৬]

মানুষের সামাজিক ও আর্থিক জীবনে বর্ধমান জ্বরের যে সর্বাত্মক প্রভাব পড়েছিল তা সংশয়াতীত। একই সাথে জ্বর কবলিত এলাকার শিক্ষাব্যবস্থার উপরও এর করাল আঘাত নেমে এসেছিল। দুর্ভাগ্যজনকভাবে এর প্রথম শিকার হয়েছিল বিদ্যালয়যাত্রী পড়ুয়ারা। ১৮৬০ ও ৭০-এর দশকে ভারতের শিক্ষাকাঠামোয় অনুদান ব্যবস্থা (Grants-in-aid) পুরোদমে বাস্তবায়িত হচ্ছিল। ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দের উডের ডেসপ্যাচে এই ব্যবস্থার অনুমোদন করা হয়। এর ফলে বাংলা সহ আরও চারটি প্রদেশে মাধ্যমিক শিক্ষার অভূতপূর্ব অগ্রগতি ঘটে। ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে এই সব প্রদেশে সরকারি বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল ১৬৯টি যেখানে ১৮,৩৩৫ জন শিক্ষার্থী পড়াশোনা করত। ১৮৮২ তে সেই সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে হয় ১,৩৬২ যেখানে ৪৪,৬০৫ জন শিক্ষার্থী শিক্ষার্জন করত।[১৭] পাঁচ বছর পর ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম ভারতসচিব লর্ড স্ট্যানলি তাঁর এক নির্দেশনামায় প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে অনুদান ব্যবস্থার পরিবর্তে সরকারি উদ্যোগে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কাজে খরচ বহনের জন্য স্থানীয় হার (local rates) আরোপ করার কথা বলেন যাতে গণশিক্ষার প্রয়াস কার্যকরী হয়। এই নির্দেশের ফলে বিভিন্ন প্রাদেশিক সরকারের শিক্ষা বিষয়ক কাজকর্মে উভয়সংকট দেখা দিয়েছিল। কিছু প্রদেশ দেশীয় শিক্ষাকে সম্পূর্ণভাবে বর্জন করে। তবে বাংলা সহ অন্যান্য স্থানে দেশীয় বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছিল। একই সাথে অনুদান প্রথার মাধ্যমে স্থানীয় প্রচেষ্টাকে উৎসাহিত করা এবং সরকারি বিদ্যালয়গুলিকে মডেল বিদ্যালয় হিসেবে স্থাপন করার কাজ চলতে থাকে। বাংলার ক্ষেত্রে অবশ্য চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ব্যবস্থার উপস্থিতির জন্য ভূমি রাজস্বের উপর অতিরিক্ত সেস আরোপ করে সেই অর্থ গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের দেখভালের উদ্দেশ্যে ব্যয় করা অতটা সহজ হয় নি।[১৮]

যে বছর বর্ধমান জ্বরের প্রাদুর্ভাব ঘটেছিল সেই বছর অর্থাৎ ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে বিদ্যালয়ে আগত শিক্ষার্থীদের সাথে পরবর্তী বছরের ছাত্রছাত্রীদের সংখ্যার একটা তুলনা করলেই এই মহামারীর কীরকম প্রভাব শিক্ষাব্যবস্থার উপর পড়েছিল তা বোঝা যাবে। প্রসঙ্গত বলা যায় উক্ত বছরে পূর্ববঙ্গের বহু জেলাতে কলেরা, গুটিবসন্ত ও ম্যালেরিয়া জ্বরের কারণে অনেক ছাত্রের মৃত্যু হয়েছিল, শিক্ষকরা আক্রান্ত হয়েছিলেন এবং অনেক বিদ্যালয় বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। যেমন সিলেটের কেশবপুর গ্রামে প্রায় দুশোর কাছাকাছি মানুষ কলেরায় মারা গিয়েছিল। দুমাসের জন্য সেখানকার স্কুল বন্ধ করে দেওয়া হয় এবং বছরের শেষে স্কুলে ছাত্র উপস্থিতির হার ৩০ থেকে ৪০ শতাংশ মতো হ্রাস পায়। চট্টগ্রামের বিদ্যালয়গুলিতে ছাত্রের মোট সংখ্যা ১,৫৮২ থেকে কমে ১,৪৭৫ হওয়ার কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ডেপুটি বিদ্যালয় পরিদর্শক সেই জেলায় চলতে থাকা কলেরা, জ্বর ও গুটিবসন্তের প্রকোপের দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করেন।[১৯] বর্ধমান জেলা যেখানে এই জ্বরের সবথেকে বেশি প্রভাব ছিল সেখানে ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দের

৩১শে মার্চের হিসেব অনুসারে ৩০০টি বিদ্যালয়ে ১২,৮৮৬ জন শিক্ষার্থীর হাজিরা ছিল।[২০] বীরভূমে ১৮৭০-এর ৩১শে মার্চ ৯৩টি বিদ্যালয়ে মোট ৩,৮৬১ জন ছাত্র শিক্ষালাভ করত।[২১]

ধীরে ধীরে এই ম্যালেরিয়া জ্বরের সংক্রমণ বৃদ্ধি পেতে থাকলে ছাত্রদের আক্রান্তের সংখ্যাও বাড়তে থাকে। সরকারি মত অনুযায়ী বর্ধমান জেলায় ১৮৭০-৭১ খ্রীষ্টাব্দের শিক্ষাবর্ষে বিদ্যালয়ের সংখ্যা না কমলেও ছাত্রদের সংখ্যা খুব অল্প পরিমাণে কমেছিল।[২২] বীরভূম জেলাতে এই একই শিক্ষাবর্ষে ৭৬টি স্কুলে ২,৯৩৫ জন ছাত্র লেখাপড়া করত। এই ছাত্র সংখ্যা কমার কারণ হিসেবে মহামারীর উল্লেখ করা হয় নি। বীরভূম জেলা স্কুলেও এইসময় ছাত্রসংখ্যা কমে ১৩৮-এ দাঁড়িয়েছিল।[২৩] কিন্তু পরের শিক্ষাবর্ষে থেকে বর্ধমান জ্বর বিধ্বংসী চেহারা ধারণ করতে থাকে।

হান্টারের বিবরণ পর্যবেক্ষন করলে লক্ষ্য করা যাবে বর্ধমানে সরকারি ও সাহায্যপ্রাপ্ত বিদ্যালয় ও সেখানে পাঠরত শিক্ষার্থীদের সংখ্যা উডের ঘোষনার পর থেকে দ্রুত গতিতে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছিল। ১৮৫৬-৫৭ খ্রীষ্টাব্দে জেলার ২৩টি স্কুলে পড়াশোনা করত ১,৬৮১ জন ছাত্র। প্রায় ১৫ বছরের মধ্যে ১৮৭০-৭১-এ স্কুল ও ছাত্রদের সংখ্যা বেড়ে হয় যথাক্রমে ৩২৫টি ও ১২,৮৫৫ জন।[২৪] পরের বছর স্কুলের সংখ্যা দুটি বাড়লেও ম্যালেরিয়া জ্বরের প্রাদুর্ভাব ঘটায় ২৬টি স্কুল বন্ধ করে দেওয়া হয়। এতে ছাত্রসংখ্যা কমে পৌঁছায় ১০,৯৭০ জনে।[২৫] অন্য একটি রিপোর্ট থেকে জানা যাচ্ছে ১৮৭১-৭২-এর শিক্ষাবর্ষের প্রথম দিকে ৩০২টি স্কুলে শিক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ১২,৫৪২ জন যা বছরের শেষে ৩২৩টি স্কুলের মধ্যে কমে হয় ১১,৪২৬ জন। জেলার দক্ষিণ ও পূর্ব দিকের বিদ্যালয়গুলিতে ছাত্র সংখ্যা হ্রাসের পরিমাণ উত্তর ও পশ্চিম দিকের বিদ্যালয়গুলির তুলনায় বেশি ছিল। কাটোয়া ও পশ্চিম মধ্য অঞ্চলের (circles) প্রতিটি স্কুলে ৪ জন করে ছাত্র কমে গিয়েছিল। উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের সব স্কুলে ছাত্র কমেছিল ৩ জন করে। পূর্ব মধ্য অঞ্চলের প্রতিটি বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী হ্রাস পায় ৭ জন, কালনা অঞ্চলে এই সংখ্যা ছিল ৮ জনেরও বেশি এবং দক্ষিণ বর্ধমানের প্রত্যেকটি স্কুলে প্রায় ১০ জন করে ছাত্র সংখ্যা হ্রাস হয়েছিল। ১৮৭০-এর মার্চ থেকে ১৮৭২-এর মার্চ পর্যন্ত দক্ষিণ বর্ধমান অঞ্চলের বিদ্যালয়ের সংখ্যার মধ্যে সেরকম কোন হেরফের দেখা যায় নি। কিন্তু ১৮৬৯-৭০ খ্রীষ্টাব্দের পরের বছরগুলিতে এই সকল বিদ্যালয়ে মাসিক ছাত্র উপস্থিতির হার কমতে থাকে। ১৮৬৯-৭০-এ ম্যালেরিয়া জ্বরের প্রভাব থাকা সত্ত্বেও প্রতি মাসের শেষ দিনে গড়ে ২,৩৯৮ জন ছাত্রের উপস্থিতির কথা নথীভুক্ত করা হয়েছিল। পরের বছর এই গড় উপস্থিতির সংখ্যা কমে হয় ১,৯৮৯ জন। ১৮৭১-৭২ খ্রীষ্টাব্দে তা আরও কমে গিয়ে হয় ১,৬২৩ জন। এই তিন বছরে বিদ্যালয়ে দৈনিক গড় ছাত্র উপস্থিতির হার ছিল যথাক্রমে ১,৬৭৬, ১,৪৯৭, ১,১৬৫ জন যা বিদ্যালয়মুখী ছাত্রসংখ্যার ক্রমাবনতির দিকে নির্দেশ করছে। স্কুল পরিদর্শকের রিপোর্টে ১৮৭১-৭২-এ

দক্ষিন বর্ধমানে ৫১টি স্কুলে গড়ে ১,৬২৩ জন ছাত্রের উপস্থিতির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। একটি তালিকা প্রস্তুত করে দেখানো হয়েছিল মহামারী শুরু হওয়ার আগে তাদের মধ্যে ৪২টি স্কুলে ১,৮৫৫ জন ছাত্র উপস্থিত ছিল। ১৮৭১-এর সেপ্টেম্বর মাসে মহামারীর পুনরাবির্ভাব ঘটার পূর্বে ছাত্র সংখ্যা ছিল ১,৬১১ জন। মহামারীর চরমতম স্তরে মাত্র ৪৪৫ জন ছাত্র স্কুলে হাজির থাকতে পেরেছিল। ৫১টির মধ্যে ৩৮টি স্কুলের ১,২০৯ জন ছাত্র ম্যালেরিয়ায় অসুস্থ হয়ে পড়ে এবং ১৪৫ জন মারা যায়। অসুস্থদের মধ্যে আবার ৬১৮ জন ১৮৭২-এর মার্চ পর্যন্ত জ্বরে ভুগেছিল।[২৬] বাঁকুড়া জেলার স্কুল পরিদর্শক ৭টি মিডিল ইংরেজি স্কুলের মধ্যে ৩টি স্কুল পরিদর্শন করেছিলেন। এই স্কুলগুলিতে তিনি ২৭৭ জন বালকের উপস্থিতি লক্ষ্য করেন। ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দের প্রথমদিকে এদের সংখ্যা ছিল ৩৭৮। এই সংখ্যা কমতির মুখ্য কারণ ছিল মহামারী জ্বর। একটা সময় জেলার দক্ষিণ পূর্বে অবস্থিত জিবতা, কোতুলপুর ও তালসাগারার স্কুলগুলি মহামারীর জন্য ছাত্রশূন্য হয়ে পড়েছিল। একইভাবে ১৯টি মিডিল ভার্নাকুলার স্কুলের ক্ষেত্রে বর্ধমান জ্বরের জন্য পূর্বোক্ত বছরের প্রথমে ছেলেদের সংখ্যা ১,২৫২ থেকে কমে হয় ১,১০৫ জন।[২৭] বীরভূমে এই জ্বরের ফলে বিদ্যালয়গামী শিক্ষার্থীর সংখ্যা যথেষ্ট কমে গিয়েছিল এবং সাধারন মানুষের মধ্যে বিদ্যালয় নিয়ে অনীহা প্রকাশ পেয়েছিল।[২৮]

১৮৭২-৭৩ খ্রীষ্টাব্দের শিক্ষাবর্ষে বর্ধমান জেলার স্কুলগুলির অবস্থা মহামারীর ধাক্কা সামলে কিছুটা উন্নতির দিকে এগিয়েছিল। স্কুল পরিদর্শকের রিপোর্টে বলা হয়েছে সাঁকারি (Sanakari) স্কুলের ছাত্র সংখ্যা ৬৩ থেকে কমে ৩২ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু এখন গড় ছাত্র উপস্থিতির সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৫২ জন। বামিনে (Bamine) আর খন্ডঘোষ স্কুল আস্তে আস্তে আগের অবস্থায় ফিরে আসছিল। কিন্তু জেহানাবাদ মহকুমা খুব ধীরে ধীরে জ্বর থেকে আরোগ্য লাভ করছিল। কাটোয়া মহকুমার মঙ্গলকোট ও সাকুলিপুর থানা এলাকার গ্রামীন বিদ্যালয়গুলি সবথেকে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সহ বিদ্যালয় পরিদর্শকের মতে এখানকার ১১টি স্কুল একবছরের মধ্যে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। কালনা, বুদবুদ ও রানিগঞ্জ মহকুমা ম্যালেরিয়া জ্বরের দ্বারা খুব বেশি প্রভাবিত হয় নি। জেহানাবাদ ও বর্ধমান মহকুমার ৮৮টি নতুন পাঠশালার ছাত্র হাজিরার কথা ব্যতিরেকেও অন্যান্য স্কুলে আগের বছরের ছাত্র সংখ্যা ১১,৪২৬ থেকে অনেকটা বেড়ে এই বছর হয়েছিল প্রায় ১৩,৫০০ জন।[২৯] বাঁকুড়ার কোন কোন স্কুলে ছাত্রসংখ্যা অল্প কিছুটা কমলেও তার জন্য বর্ধমান জ্বরকে কারণ হিসেবে দেখানো হয় নি। যেমন বাঁকুড়া জেলা স্কুলে ছাত্রের পরিমান পূর্ববর্তী বছরের ২২২ থেকে ১৮৭২-৭৩-এ কমে ১৮৬ জন হওয়ার অন্যতম কারণ ছিল বছরের একটা সময় জুড়ে চলা কলেরা মহামারীর প্রবল প্রকোপ। একইভাবে এই কলেরার জন্যই আগের বছরে এখানকার ১৯টি ভার্নাকুলার স্কুলে আগত শিক্ষার্থীর সংখ্যা ১,১০৫ থেকে হ্রাস পেয়ে আলোচ্য বছরে ১৪টি স্কুলে ৭০৫ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়েছিল।[৩০] বীরভূম জেলার শিক্ষাব্যবস্থা আপাতদৃষ্টিতে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরছিল বলেই মনে হচ্ছিল। মহামারী

কবলিত জায়গা থেকে অনেক বিদ্যালয়কে অপেক্ষাকৃত স্বাস্থ্যকর স্থানে সরিয়ে আনা হয়েছিল। অনেক স্কুল যেমন পর্বতপুর মডেল স্কুল ও সুরুল হায়ার ক্লাস ইংরেজি স্কুলের ছেলেদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছিল। তবে অনেক বিদ্যালয় তখনও জ্বরের হাত থেকে রেহাই পায় নি। পুরন্দরপুর সরকারি মডেল স্কুলে মহামারী জ্বরের প্রভাবে ছাত্র সংখ্যা ৩০ থেকে কমে ৫ কি ৬ জনে নেমে এসেছিল। মিডিল ক্লাস ইংরেজি স্কুলের মধ্যে দ্বারকা স্কুল জ্বরের কারণে বন্ধ হয়ে যায়। রাইপুর স্কুলও এই জ্বরের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল।[৩১] হুগলি জেলার ডেপুটি স্কুল পরিদর্শকের বিবরণ অনুয়ায়ী ১৮৭২-এর অক্টোবর থেকে ১৮৭৩-এর ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত মহামারী জ্বর জেলার কমবেশী সব বিদ্যালয়কে আক্রান্ত করেছিল। অনেক বিদ্যালয় অস্থায়ীভাবে বন্ধ হয়ে পড়েছিল। অন্যদিকে স্কুল পরিদর্শকের অনুসন্ধান থেকে জানা যায় এই মহামারী জেলার কিছু কিছু এলাকাকে মারাত্মকভাবে প্রভাবিত করেছিল। যেখানে এর প্রভাব পড়ে নি সেখানকার সরকারি স্কুলগুলিতে ১৮৭২-৭৩-এর শিক্ষাবর্ষে প্রতি মাসে গড় ছাত্র হাজিরা থাকত ১,২৩৯ জন এবং প্রতিদিন গড়ে ছাত্র উপস্থিত থাকত ৯৮০ জন।[৩২]

ইংরেজ সরকারের পরবর্তী শিক্ষা সংক্রান্ত প্রতিবেদনে বর্ধমান জ্বরের খুব কম উল্লেখ থাকায় অন্তত এই বিষয়টি প্রমাণিত হয় যে এই জ্বরের প্রভাব ধীরে ধীরে ক্ষয়িষ্ণু হচ্ছিল। ১৮৭৩-৭৪ খ্রীষ্টাব্দের শিক্ষাবর্ষে বর্ধমান ডিভিশনের গ্রামগুলিতে প্রাথমিক শিক্ষায় ছাত্রদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পেয়েছিল। আগের বছরে পুরোনো পাঠশালাগুলিতে ছাত্র ছিল ১৭,৪১৩ জন। এখন তা বেড়ে হয় ১৮,৫৪৩ জন। নতুন পাঠশালার সংখ্যা ৮৮০ থেকে অনেকটাই বেড়ে হয়েছিল ২,২৯৪টি।[৩৩] মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে এই ডিভিশনে ছাত্রের সংখ্যা কিছুটা কমলেও সেক্ষেত্রে বর্ধমান জ্বরের ফলে ছাত্রের মৃত্যুকে কারণ বলে না ব্যক্ত করে বলা হয়েছে মহামারী জ্বরের ফলে অনেক স্কুল বন্ধ হয়ে যাওয়ায় তারা অন্যত্র ভর্তি হয়েছে।[৩৪] সুতরাং জ্বর ও তৎজনিত কারণে ছাত্রদের প্রাণ সংশয়ের সম্ভাবনা কমে এসেছিল। অবশ্য স্কুল পড়ুয়াদের মধ্যে মহামারী জ্বরের সংক্রমিত হওয়াকে প্রশমিত করতে ইংরেজ কর্তৃপক্ষ কী বিশেষ পদক্ষেপ নিয়েছিল এবং তা কতটা ঔপনিবেশিক স্বার্থের দ্বারা চালিত হয়েছিল তা পৃথক আলোচনার দাবি রাখে। এ প্রসঙ্গে দেশীয় ব্যক্তিরা কী ভূমিকা নিয়েছিলেন তাও বিবেচনার বিষয় হতে পারে। বর্ধমান জ্বর বাংলার শিক্ষাকাঠামোকে যে বিপর্যয়ের সম্মুখে ফেলেছিল তাকে নিছকই অগণিত ছেলেমেয়েদের জীবনহানির পরিসংখ্যানগত তথ্যের নিরিখে না দেখে বৃহত্তর সামাজিক অবক্ষয়ের দৃষ্টান্ত স্বরূপ দেখা উচিৎ। এতে সমাজ জীবনের উপর বর্ধমান জ্বরের বহুমাত্রিক প্রভাব আরও সম্বৃদ্ধ হবে।

তথ্যসূত্র:

১. জ্বর সম্পর্কে সাধারণ ধারণার জন্য দেখুন Elisha Atkins, Fever: The Old and The New in *The Journal of Infectious Disease, Vol. 149, No. 3, March 1984.* pp. 339-348

২. Ira Klein, Malaria and Mortality in Bengal, 1840-1921 in *The Indian Economic and Social History Review,* First Published June 1, 1972, p. 139

৩. Surgeon-Major John Gay Franch, *Epidemic Fever in Lower Bengal,* Calcutta: Thacker, Spink and Co. 1874, pp. 1-2

৪. Captain S.P. James, *Scientific Memoirs by Officers of the Medical and Sanitary Department of the Government of India on Kala Azar, Malaria and Malarial Cachexia*, Calcutta, Office of The Superintendent of Government Printing, India, 1905, pp. 1-9

৫. L.S.S. O'Malley, *Bengal District Gazetters, Jessor*, Calcutta, Bengal Secretariat Book Deport, 1912, pp. 61-62

৬. J.C.K.Peterson, *Bengal District Gazetters, Burdwan*, Calcutta, Bengal Secretariat Book Deport, 1910, p. 78

৭. L.S.S. O'Malley, *Bengal District Gazetters, Birbhum*, Calcutta, Bengal Secretariat Book Deport, 1910, pp. 43-44

৮. L.S.S. O'Malley and Manmohan Chakrabarty, *Bengal District Gazetters, Hooghly*, The Bengal Secretariat Book Deport, 1912, pp. 127-128

৯. L.S.S. O'Malley, *Bengal District Gazetters, Bankura,* Calcutta, The Bengal Secretariat Book Deport, 1908, p. 80

১০. অরবিন্দ সামন্ত, *রোগ রোগী রাষ্ট্র: উনিশ শতকের বাংলা,* প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, জুন, ২০০৪, পৃ. ৭০-৮২।

১১. Ira Klein, op. cit, pp. 140-141

১২. *Bengal District Gazetters, Burdwan,* op. cit, pp. 40-41

১৩. *Bengal District Gazetters, Birbhum,* op. cit, p. 29

১৪. ibid, pp. 44-45

১৫. *Bengal District Gazetters, Hooghly*, op. cit, p. 92

১৬. *Bengal District Gazetters, Bankura*, op. cit, pp. 43-44

১৭. Suresh Chandra Ghosh, *The History of Education in Modern India, 1757-2012*, Fourth Edition, Orient Blackswan, First Published 1995, Fourth Edition 2013, p. 88

১৮. ibid, pp. 83-84, 90-91

১৯. *General Report on Public Instruction in The Lower Provinces of Bengal for 1869-70 with Appendices*, Calcutta, The Bengal Secretariat Office, 1870, Appendix A, pp. 103-105.

২০. ibid, p. 92

২১. ibid, p. 238

২২. *General Report on Public Instruction in The Lower Provinces of Bengal for 1870-71 with Appendices*, Calcutta, The Bengal Secretariat Press, 1871, Appendix A, p. 133

২৩. ibid, p. 5, 18

২৪. W.W.Hunter, *A Statistical Account of Bengal, Volume IV, Districts of Bardwan, Bankura and Birbhum,* Trubner & Co, London, 1876, p. 157

২৫. ibid, p. 160

২৬. *General Report on Public Instruction in Bengal for 1871-72 with Appendices*, Calcutta, Calcutta Central Press Company Limited, 1873, Appendix A, pp. 15-16

২৭. ibid, pp. 24-25

২৮. ibid, p. 26

২৯. *General Report on Public Instruction in Bengal for 1872-73 with Appendix,* Calcutta, The Bengal Secretariat Press, 1874, Appendix A, pp. 284-85

৩০. ibid, pp. 291-292

৩১. ibid, p. 296, 298

৩২. ibid, p. 316

৩৩. *General Report on Public Instruction in Bengal for 1873-74*, Calcutta, The Bengal Secretariat Press, 1875, p. 2

৩৪. ibid, p. 28

নারীর শরীর; নারীর ভাষা

মনীষা নস্কর
গবেষক, বাংলা বিভাগ,
রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ : সমাজের প্রান্তিক মানুষদের কণ্ঠস্বর গিয়ে পৌঁছয় না ঊর্ধ্বতনদের কান পর্যন্ত। এক হিসেবে প্রান্তিক এ সমাজের মেয়েরাও। বহুযুগ ধরে সমাজ 'অপর' করে রেখেছে তাদের। নিজের কথাটুকু সোচ্চারে জানানোর জন্য তাদের প্রয়োজন হয়েছে অন্য এক ভাষার, ভিন্ন এক বাচনভঙ্গির। সেই 'অন্য' ভাষার মাধ্যম কখনও কখনও হয়ে উঠেছে তাদের শরীর। যে সমাজ তাদের দেখে কেবলমাত্র একটা 'শরীর' হিসেবে, সেই শরীরকেই তারা করেছে নিজেদের হাতিয়ার। পিতৃতন্ত্র মনে করে, এই শরীরটার ওপর আঘাত হানতে পারলেই, এই শরীরটাকে বেআব্রু করলেই বুঝি আক্রমণের চূড়ান্ত হবে। এই পিতৃতন্ত্রকেই বুড়ো আঙুল দেখিয়ে দোপদি মেঝেন-রা প্রতিবাদের আগুনে ঝলসে ওঠে। 'সতীত্ব' শব্দটার নির্মাণ যে শুধুমাত্র পিতৃতন্ত্রের সুবিধার্থে, তা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় এই চরিত্ররাই। পাশাপাশি উঠে এসেছে আরও কিছু চরিত্র, যাদের মুখের ভাষার চেয়ে জোরালো হয়ে উঠেছে তাদের শরীরের বলতে চাওয়া কথাগুলি।

সূচক শব্দ : শরীর, নারীত্ব, সতীত্ব, ভাষা, পিতৃতন্ত্র

নারীর শরীর : নারীর ভাষা

গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাকের বিখ্যাত প্রবন্ধ সংকলন— 'Can the subaltern speak?' অনেকখানি পর্ব জুড়ে গড়ে উঠেছে। পরবর্তীকালে স্পিভাক সেটির একটি ভূমিকা লেখেন— 'In response, looking back, looking forward' নামে। সেখানে 'Can the subaltern speak?'-এর ভাবনাটি গড়ে ওঠার প্রসঙ্গে তিনি কিছু কথা বলেন। প্রথমে এটি একটা প্রবন্ধকে ঘিরে গড়ে ওঠে— 'Power and desire', ১৮৮৩-তে এই বিষয় নিয়ে কাজ করতে গিয়ে তিনি মহাশ্বেতা দেবীর কিছু গল্প অনুবাদ করেন। স্পিভাক এর আগে দেরিদা, মার্ক্সের ওপরে কাজ করেছেন। তারপরে তাঁর কাছে ফেমিনিস্ট ভাবনা নিয়ে কিছু লেখার প্রস্তাব আসে। সেসময় দুটো বিষয় তাঁকে অনুপ্রাণিত করে— এক, মহাশ্বেতা দেবীর কিছু গল্প যা তিনি অনুবাদ করবেন বলে পড়তে শুরু করেন, দুই, তাঁদের নিজেদের পারিবারিক স্মৃতি, যা তিনি ছেলেবেলায় শুনেছিলেন, যার কেন্দ্রে রয়েছে ভুবনেশ্বরী ভাদুড়ী নামে এক মেয়ের আত্মহত্যার ঘটনা। Colonial period এর একটি প্রথা সতীদাহ-কে তুলে এনে তাঁর ভাবনাটা সাজাচ্ছেন তিনি। মহাশ্বেতা দেবীর গল্প অনুবাদ করতে গিয়ে স্পিভাক বিষয়টাকে নতুনভাবে দেখেন।

১৯ শতকে সতীদাহ প্রথাটি রদ হয়। প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন রাজা রামমোহন রায়। বৃটিশ সরকারের সাহায্য নিয়ে এই নারকীয় কুপ্রথাটি তিনি বন্ধ করেন। এখানে গায়ত্রী বলছেন— সতীদাহ প্রথা রদটিকে কেন্দ্র করে একদিকে পিতৃতান্ত্রিক সদাচার, অন্যদিকে উপনিবেশের অন্তর্গত একটা সামাজিক সংস্কার— এই দুইয়ের জাঁতাকলে পড়ে যে মেয়েরা 'সতী' হতে বাধ্য হত, তারা মাঝখানে আটকে পড়ল। তিনি বলতে চাইছেন, 'সতী' ভারতীয় (কু)সংস্কার, বহুদিন ধরে সমাজে বিদ্যমান। মহাকাব্যে, পুরাণে, ইতিহাসে সর্বত্র এর উপস্থিতি। রাণী পদ্মিনীকে নিয়ে হাল আমলেও চলচ্চিত্র বানানো হচ্ছে, যা কোটিটাকার ব্যবসা করেছে বক্স অফিসে। একটি মেয়ে তার সতীত্ব বজায় রাখতে আগুনে পুড়ে আত্মহত্যা করছে— এই ঘৃণ্য, নারকীয় ঘটনাটিকে 'glorify' করা হচ্ছে। এই glorification-এর চেষ্টাটি ভারতীয় সমাজে ভীষণভাবে ছিল। এর পেছনে একাধিক উদ্দেশ্য ছিল— বিধবাটিকে সম্পত্তির অধিকার যাতে না দিতে হয়, সে যেন অন্য পুরুষ সঙ্গী বেছে না নেয়, তাই তাকে হত্যা করো! রামমোহন উদ্যোগ নিয়ে এই কুপ্রথা বন্ধ তো করলেন। কিন্তু আমরা যদি ভারতীয় সাহিত্য সংস্কৃতির দিকে দৃষ্টিপাত করি, তাহলে দেখবো রাজস্থানের মতো কিছুটা রক্ষণশীল সমাজে আজও 'সতী'দের একটা অসম্ভব শ্রদ্ধার জায়গা রয়েছে। সেখানে বিভিন্ন কেল্লায়, দুর্গে হাতের ছাপ থাকে। স্থানীয় মানুষ তাতে কপাল ঠেকান, সেগুলো 'সতীমায়ের' হাতের ছাপ! সাহিত্যে, দর্শনে এই নারকীয় হত্যালীলাটিকে নানাভাবে মহিমান্বিত করা হয়েছে। বাংলা সাহিত্যেও নারীর সতীত্বের প্রতি সম্ভ্রম, শ্রদ্ধার স্থান রয়েছে। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছবিতেও সতীপ্রথাকে মহান ব্যাপার বলে চালানোর চেষ্টা শৈল্পিক প্রকাশের মধ্যে বারবার ধ্বনিত হয়েছে। ইংরেজরা এই প্রথাটি বন্ধ করেছিল— তাদের উদ্দেশ্য ছিল প্রাচ্যের বর্বর, অসভ্য মানুষগুলোকে সভ্যতা শেখানো। তাদের ধারণা প্রাচ্য অন্ধকারে আচ্ছন্ন, পাশ্চাত্য অনেক বেশি আলোকপ্রাপ্ত। দুটো শব্দবন্ধ ব্যবহার করছেন গায়ত্রী; এই যে সতীপ্রথা, এটা কোনও 'আত্মঘাত' বা 'হত্যা' নয়, এটা 'আত্মোৎসর্গ'— ভারতীয় ঐতিহ্য বলছে, 'women wants to die', তারা নিজেদের 'উৎসর্গ' করতে চায়। বিপরীতে আরেকটি বাক্যবন্ধ— 'white men are saving brown women from brown men.' এখানে গায়ের রংটি তাৎপর্যপূর্ণ। গায়ত্রী বলছেন— 'These are two dialectically interlocking sentences.' দ্বান্দ্বিকভাবে আটকে থাকা দুটো বাক্যবন্ধ— একটা দিকে মনে করা হচ্ছে, মেয়েরা আত্মোৎসর্গ করতে চায়, আরেকদিকে বলা হচ্ছে, মেয়েরা উদ্ধার পেতে চায় এই ভয়ংকর মৃত্যুর হাত থেকে। আত্মোৎসর্গের কথাটা ভাবছে প্রাচ্য পিতৃতন্ত্র, উদ্ধারের কথাটা ভাবছে পাশ্চাত্য পিতৃতন্ত্র। এর মাঝখানে মেয়েরা কী চাইছে, সেটাই উপেক্ষিত প্রবলভাবে। সেটাই গায়ত্রী বলার চেষ্টা করছেন। সেই সূত্রে একটা পুরনো স্মৃতি ফিরিয়ে আনছেন। মেয়েদের কথা বলতে দেওয়া হয় না, তাই তারা নতুন বয়ান খুঁজে

নেয় তাদের শরীরকে দিয়ে। কীভাবে, তা বোঝাতে গিয়ে ‘Can the subaltern speak?’এর দ্বিতীয় ভাগে তিনি তাঁর ব্যক্তিগত স্মৃতি থেকে একটা গল্প বলেন। তাঁর পরিবারের একটি মেয়ের গল্প। ১৯২৬ সালে উত্তর কলকাতার মধ্যবিত্ত পরিবারের অবিবাহিতা এক মেয়ে, নাম তার ভুবনেশ্বরী ভাদুড়ী। সে আত্মহত্যা করে। আত্মহত্যার ঘটনা তো প্রচুরই ঘটে থাকে, কিন্তু এই আত্মহত্যাটি একটু আলাদা। ভুবনেশ্বরী নামে বছর সতেরোর অবিবাহিতা মেয়েটি আত্মহত্যার একটি বিশেষ সময় নির্বাচন করেছিল, যেখানে সে চেয়েছিল তার মৃত শরীর কথা বলুক। সেই সময়ে মেয়েটি রজঃস্বলা ছিল। স্পিভাক বলছেন, বহুদিন পর্যন্ত এই ঘটনাটির কথা পরিবারে অনুচ্চারিত ছিল। কমবেশি সকলেই এটা জানতো। কেউ আলোচনা করত না। স্পিভাক কারণগুলো খুঁজতে শুরু করেন— কেন মেয়েটি ওই বিশেষ সময় বেছে নিয়েছিল? একটি চরমপন্থী সন্ত্রাসবাদী দলের সঙ্গে মেয়েটি যুক্ত হয়। সেই দলের তরফ থেকে মেয়েটিকে একটি রাজনৈতিক হত্যার দায়িত্ব দেওয়া হয়, যেটি সেই মেয়েটি কিছুতেই করে উঠতে পারেনি। বিবেকের দংশন, দলের প্রতি কর্তব্যবোধ থেকে চ্যুত হওয়া— সব মিলিয়ে সে আত্মহত্যার সিদ্ধান্ত নেয়। সে সময়ে কোনও অবিবাহিতা মেয়ে আত্মহত্যা করলে ধরেই নেওয়া হত, সে গর্ভবতী হয়ে পড়েছে, তাই তাকে আত্মহত্যা করতে হয়েছে। আত্মহত্যার সব ঘটনাই চাপা দিয়ে দেওয়া হত, লাশ মর্গে নিয়ে গিয়ে ময়নাতদন্ত অধিকাংশ ক্ষেত্রেই হত না। সুতরাং মেয়েটি যে গর্ভবতী নয়, সেটি বোঝার বা পরীক্ষা করানোর চিন্তা কারোর মাথাতেই আসতো না। ধরেই নেওয়া হত, সে অবৈধ সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েছিল। মেয়েটি বলতে পারছে না, কোথাও লিখে যেতে পারছে না তার মৃত্যুর কারণ। অথচ তার মৃত্যুর পর সমাজ তার আত্মহত্যার কী অর্থ বের করবে, তা সে জানে। তাই সে তার মৃত শরীরকে ভাষা দেয় এটা বোঝানোর জন্য যে, সে গর্ভবতী ছিল না। রজঃস্বলা থাকার সময় কোনও সতীনারীকে চিতায় তোলা হত না। তাকে ‘স্নাত, শুদ্ধ, পবিত্র’ হতে হবে— এমনটাই ছিল নিয়ম। কারণ মনে করা হত, ঋতুকালীন সময়ে নারীদেহ ‘অপবিত্র’ থাকে। সেই অপবিত্রতাকে ব্যবহার করে ভুবনেশ্বরী ভাদুড়ী তার নিজের মৃত্যুর সত্যিটা তুলে ধরতে— ‘by turning her body into a text of women's right.’ ভুবনেশ্বরী যদি নিজের মুখে বলেও যেত কথাটা, কেউ বিশ্বাস করতো না। তাই সে এমন একটা পদ্ধতি বেছে নিল, যাতে সবাই নিশ্চিত হয় যে সে অন্তঃসত্ত্বা ছিল না। যে ক্ষমতায় নেই, তার কণ্ঠ পৌঁছয় না অন্যদের কানে। তার জন্য প্রয়োজন অন্য ভাষা, অন্য অভিব্যক্তি।

এই জায়গা থেকে গুরুত্বপূর্ণ মহাশ্বেতা দেবীর উপন্যাস ‘হাজার চুরাশির মা’, তাঁর লেখা একটি বড়গল্প ‘স্তনদায়িনী’ এবং একটি ছোটগল্প ‘দ্রৌপদী’। ‘হাজার চুরাশির মা’ উপন্যাসে দেখি এক অভিজাত বনেদী পরিবার, যার কেন্দ্রীয় চরিত্র সুজাতা। সুজাতা ব্রতী চ্যাটার্জীর মা। পরিবারে ভয়ংকর পিতৃতন্ত্র। স্বামীর সঙ্গে সুজাতার মানসিক যোগ নেই। স্বামী পরনারীগমন করে ও এটাকে সে পৌরুষের পরিচয় বলে মনে করে।

সুজাতা সব মেনে নিয়েছিলেন। ব্রতী যে নকশাল, সুজাতা জানতে পারেননি। ব্রতী 'এনকাউন্টারে' মারা যায়। তার বাবা পরিবারের 'কলঙ্ক' মুছতে তৎপর হয়। ব্রতী চ্যাটার্জী হারিয়ে যায়, সে শুধুই হাজার চুরাশি নম্বর লাশ। পরিবারের বাকিরাও আপত্তি জানায়নি। ভুলতে পারেননি শুধু সুজাতা। ছেলে কাদের সঙ্গে মিশত, জীবনের শেষ মুহূর্তগুলোয় সে কোথায় ছিল— সুজাতা জানার চেষ্টা করতে শুরু করেন। একটু একটু করে চিনতে থাকেন তাঁর ছেলে ব্রতীকে। এই ব্রতী তাঁর একার। পরিবারের বাকি মানুষগুলোর সঙ্গে মানসিক দূরত্ব এতই বেশি ছিল, তিনি তাঁর মনের অভিব্যক্তিগুলো কোনওদিনই প্রকাশ করতে পারেননি, বা বলা ভালো, প্রকাশ করতে দেওয়া হয়নি। ক্ষোভ, অভিমানের পরত জমতে জমতে সুজাতা কবেই যেন নির্লিপ্ত হয়ে গিয়েছেন, হয়তো নিজেও তা বোঝেননি। ব্রতী হয়তো তার মা'কে বুঝতো। কিন্তু সেই ব্রতীও চলে গেল। জোর করে ব্রতীর বেঁচে থাকার চিহ্নগুলোও সরিয়ে দেওয়া হল। যেন ব্রতী বলে ও বাড়িতে কেউ কোনওকালে ছিলই না। সুজাতা প্রতিবাদ করতে পারেননি। অসহ্য কষ্টে নিঃশব্দে গুমরেছেন ভেতরে ভেতরে। এদিকে শরীরে তাঁর বাসা বেঁধেছে রোগ, অ্যাপেনডিক্স ফুলছে। সুজাতার মনে হয় তিনি যেন বহন করছেন এক নতুন ব্রতীর ভ্রুণ। উপন্যাসের শেষে সুজাতার অ্যাপেনডিক্স ফেটে যায়। "দীর্ঘ আর্ত হৃৎপিণ্ডচেরা বিলাপ বিস্ফোরণের মত, প্রশ্নের মত, ফেটে পড়ল, ছড়িয়ে গেল কলকাতার প্রতি বাড়ি— শহরের ভিতের নিচে ঢুকে গেল, আকাশপানে উঠে গেল।"— শরীর এখানে ভাষা পাচ্ছে। প্রতিবাদের মাধ্যম এখানে 'গর্ভ'।

'স্তনদায়িনী' গল্পে যশোদা পেশাদারী মা— হালদারবাড়ির দুধ-মা। দুধের যোগান দিতে তাকে সবসময় গর্ভবতী থাকতে হয়েছে। নিজের কুড়িটি সন্তান এবং হালদারবাড়ির জনা তিরিশেক বাচ্চাকে বুকের দুধ খাইয়েছে সে। একসময় তার গর্ভধারণের ক্ষমতা শেষ হল। যশোদার স্তনে ক্যানসার ধরা পড়ল। পঞ্চাশটা শিশুকে যে নিজের বুকের দুধ খাইয়েছে, তার পাশে কেউ থাকে না। 'ক্রমে যশোদার বামস্তন ফেটে আগ্নেয়গিরির ক্রেটারসদৃশ হল'। যশোদাকে বেওয়ারিশ লাশ বানিয়ে দিল বিশ্বসংসার। 'যশোদা ঈশ্বর-স্বরূপিনী'। 'এ সংসারে মানুষ ঈশ্বর সেজে বসলে তাকে সকলে ত্যাগ করে এবং তাকে সতত একলা মরতে হয়।'

মহাশ্বেতা দেবীর ছোটগল্প 'দ্রৌপদী'তে প্রতিবাদের মাধ্যম হয়ে উঠেছে যোনি। যশোদা, সুজাতা-রা প্রতিবাদ করতে শেখেনি। তাদের শরীর তাদের হয়ে কথা বলেছে। কিন্তু এ গল্পের দোপদি মেঝেন প্রতিবাদটা করতে পেরেছে। কমরেড দোপদি মেঝেনকে ধরার পর সেনানায়কের হুকুম হয় 'ওকে বানিয়ে নিয়ে এস।' খুঁটোয় দুটো হাত, দুটো পা বেঁধে রেখে রাতভোর তাকে ধর্ষণ করে একাধিক মানুষরূপী জানোয়ার। আসলে পিতৃতন্ত্র ধরেই নেয়, একটি মেয়ের মনের জোর ভাঙতে হলে তার শরীরকে বেআব্রু করলেই যথেষ্ট। সকালে দ্রৌপদীর গায়ের ওপর ছুঁড়ে দেওয়া হয় তার কাপড়।

মহাভারতের দ্রৌপদীর লজ্জা ঢাকতে প্রয়োজন হয়েছিল মধুসূদনের। মহাশ্বেতা দেবীর দ্রৌপদী বস্ত্র পরতেই অস্বীকার করে। তার প্রয়োজন নেই কোনও লজ্জাহর মধুসূদনের। উরু যোনিকেশে চাপ চাপ রক্ত, ক্ষতবিক্ষত স্তন নিয়ে উলঙ্গ দ্রৌপদী মাথা সোজা রেখে হেঁটে এগিয়ে যায় সেনানায়কের দিকে। "চারদিকে চেয়ে দ্রৌপদী রক্তমাখা থুতু ফেলতে সেনানায়কের সাদা বুশ শার্টটি বেছে নেয় এবং সেখানে থুতু ফেলে বলে, হেথা কেও পুরুষ নাই যে লাজ করব। কাপড় মোরে পরাতে দিব না। আর কী করবি? লেঃ কাঁউটার কর্ লেঃ কাঁউটার কর্—?" এই নগ্ন, নগ্নিকার চেহারা দেখে কেঁপে ওঠে পুরুষেরা। "এই প্রথম সেনানায়ক নিরস্ত্র টার্গেটের সামনে দাঁড়াতে ভয় পান, ভীষণ ভয়।"

প্রসঙ্গক্রমে বলা যেতে পারে, দুটি চলচ্চিত্রের কথা— ঋতুপর্ণ ঘোষ পরিচালিত 'Chitrangada : The crowning wish' এবং অপর্ণা সেন পরিচালিত 'সতী'। ঋতুপর্ণ ঘোষের 'চিত্রাঙ্গদা'-য় রুদ্র ভালোবাসে পার্থকে। সমলিঙ্গ দম্পতি বাচ্চা দত্তক নিতে পারবে না জেনে রুদ্র সিদ্ধান্ত নেয় সে তার শরীরটাকে 'নারী'শরীরে রূপান্তরিত করবে। অপারেশনের দীর্ঘ প্রস্তুতিপর্ব চলে, রুদ্রর মনেও চলে নানা টানাপোড়েন। ছবির শেষে কিন্তু রুদ্র আর চায়নি তার শরীরটা নিয়ে কাটাছেঁড়া করতে। সে যে মনেপ্রাণে একজন নারী, সমাজের কাছে তাকে নতুন করে নারীত্বের প্রমাণ দেওয়ার তো দরকার নেই। সমাজের টেনে দেওয়া গণ্ডীর মধ্যে কেন তাকে থাকতে হবে? সমাজের চোখে একটা আদর্শ নারীশরীর যা, তেমন করে তাকে কেন সাজতে হবে? নিজেকে রুদ্র ভালোবেসেছে, নিজের শরীররকে সে মান্যতা দিয়েছে। সে যেমন, তেমনটাই সমাজ গ্রহণ করুক— এটাই রুদ্র চেয়েছে। ছবিটি শেষ হয়েছে এই সুন্দর কথাটি দিয়ে— "Be What You Wish To Be." আত্মপরিচয়, নিজের কথাটুকু সোচ্চারে বলা— এসবের চেয়েও জরুরি হয়ে উঠেছে নিজের সঙ্গে নিজের বোঝাপড়া। আমি কি শুধুই চিৎকার করে আমার কথা বলতে চাই নাকি নিজের মধ্যে যে পরিচয় বহন করছি, যাপন করছি তাকে মান্যতা দিতে চাই?— এই প্রশ্নই এই চলচ্চিত্রে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

১৯৮৯ সালে নির্মিত 'সতী' চলচ্চিত্রে উনবিংশ শতকের প্রেক্ষাপট ব্যবহার করে ভীষণ আধুনিক বক্তব্য তুলে আনতে চেয়েছেন পরিচালক অপর্ণা সেন। এ ছবিতে পাশ্চাত্যের নারী আন্দোলনগুলোর প্রভাব অবশ্যই পড়েছে। এর আগে বাংলায় মহিলা পরিচালক সেভাবে পাই না। ১৮২৭ খ্রিঃ, ১২৩৪ বঙ্গাব্দ— এভাবে সময়টা title-এ দিয়েই সিনেমাটি শুরু হয়েছে। শুরু হয়েছে এক সতীর ঘটনা দিয়ে, শেষও হয়েছে আর এক সতীর ঘটনা দিয়ে। শুরুর ঘটনায় গ্রামের পুরোহিত বাচস্পতি মহাশয় ও আরও অন্যান্যরা মিছিল করে যাচ্ছে। সতী হতে যাওয়া মেয়েটির অর্ধসচেতন অবস্থা। শেষপর্যন্ত মিছিল পৌঁছল নদীর ঘাটে, মেয়েটিকে জীবন্ত চিতায় তুলে দেওয়া হল। সেখানেই দেখা যাচ্ছে, দূর থেকে আরেকটি মেয়ে অদ্ভুত ভীরু-কৌতূহলী দৃষ্টিতে গাছের আড়াল থেকে ঘটনাটা দেখছে। অন্য মেয়েরা যেমন দৌড়ে দৌড়ে এসে সতীমায়ের

পায়ের ধুলো নিচ্ছে, কপালে সিঁদুর পরাচ্ছে, এই মেয়েটি তা করছে না। মেয়েটি উমা— কুলীন ব্রাহ্মণ গঙ্গাচরণ চট্টোপাধ্যায়ের আশ্রিতা। গঙ্গাচরণের পরিবারে স্ত্রী, দুই ছেলে, এক মেয়ে। বড় ছেলে বিবাহিত, তার স্ত্রী ছেলেমেয়ে আছে। ছোটছেলে অবিবাহিত, তার বিয়ে করার ইচ্ছা নেই, সে কীর্তনের দল চালায়। মেয়েটি অবিবাহিতা, তার বিয়ের জন্য উদ্বেগ রয়েছে। আর একটি মানুষ রয়েছে এই পরিবারে, যদিও তাকে মানুষ বলে গণ্য করা হয় না— সে উমা, অনাথা। গঙ্গাচরণের বোনের মেয়ে। উমা মূক, কিন্তু বধির নয়। সে শুনতে পায়, কিন্তু বলতে পারে না— এখানেই অপর্ণা সেন একটি অন্যরকম ভাবনা এনেছেন— স্পিভাকের 'Can the subaltern speak?'-এর দৃষ্টিকোণ থেকে উমা-র কথা বলতে না পারা-টা গুরুত্বপূর্ণ। বোবা মেয়েদের যন্ত্রণা, নানাভাবে তাদের সুযোগ নেওয়া হয়— রবীন্দ্রনাথের 'সুভা' গল্পে দেখা গেছে। কিন্তু অপর্ণা সেন উমা-কে তৈরি করলেন সম্পূর্ণ ভিন্ন উদ্দেশ্যে।

উমা অনাথা, পরগাছার মতো বড় হয়ে উঠেছে। মামীমা তাকে তিনমাসেরটি কোলে নিয়ে বড় করে তুলেছেন, এটা তিনি জোরগলায় সবসময় বললেও এটা বেশ বোঝা যায় তাঁর ব্যবহার থেকে যে তিনি তাকে বাড়িতে একটি বিনামাইনের কাজের দাসী ছাড়া আর কিছু মনে করেন না। এই ব্রাহ্মণ পরিবারটি মোটেই ধনী নয়, অর্থনৈতিকভাবে দুঃস্থ-ই বলা যেতে পারে। তাদের আলাদা কোনও পেশা নেই, তাদের কাজ হল বিয়ে করা ও শ্বশুরবাড়িতে সময়ে সময়ে দেখা দিয়ে অর্থ আদায় করা। তারা যেহেতু কুলীন ব্রাহ্মণ, তাই এই বিবাহ পেশাটিকে যথেষ্ট সম্মানজনক বলে মনে করে থাকে। গঙ্গাচরণের বয়স হয়েছে। বড় ছেলে বিবাহিত, তবে বোঝা যায় আবার বিয়ে করতে তার আপত্তি নেই, পিতার পথ-ই সে অনুসরণ করবে। অন্য ছেলেটি যে আলাদারকম বা প্রতিবাদী মনোভাবাপন্ন, এমনটি ভাবার কোনও কারণ নেই। সে বিয়ে করতে চায় না কারণ তার এখন বিয়ে করার মর্জি নেই। সে আপাতত কীর্তনের দল চালাচ্ছে। দাদা, বাবারাও তাকে বিয়ের জন্য জোর করে না। একসঙ্গে দুটো বিয়ের কথা বাড়িতে চলছে— এক, বড়ছেলে হরিচরণের দ্বিতীয় বিয়ে, আরেকটা বিয়ে হল গঙ্গাচরণের মেয়ে শশীর বিয়ে। শশীর বিয়েতে দেওয়া-থোওয়ার ব্যাপার আছে। হরিচরণের বিয়েতে যা আদায় হবে, তা দিয়ে শশীর বিয়ে হবে। কোথায় বেশি পাওয়া যাবে, কোথায় কম দিতে হবে, দিয়েথুয়েও লাভ বেশি থাকবে— তা নিয়ে দরদাম চলছে। দ্বিতীয় ছেলের বিয়ের কথা উঠলে ঘটক বলছে— 'আপাতত ওকে বিরক্ত করবেন না। প্রথম বিয়ে! ভালো আদায় হবে!' আমরা যেমন বিপদ-আপদের জন্য fixed deposit রেখে দিই, সেরকম কুলীন ব্রাহ্মণ পরিবারে অবিবাহিত পুত্র fixed deposit-এর মতো। আগে বিবাহ হয়নি, এমন কুলীন পাত্র পেলে কন্যার পিতারা আরও বেশি খরচা করতে আগ্রহী হবেন। গঙ্গাচরণের একটি খেরোর খাতা আছে, তাতে তিনি লিখে রাখেন তাঁর স্ত্রী-দের নাম, কবে কোথায় বিবাহ হয়েছে, একবার

যাবার পর আবার কতদিন পর যাওয়া যায়, গেলে ঠিকমত আদায়পত্র হবে। তাঁকে এও বলতে শোনা যায়— 'এখন আর ভালো আদায়পত্র নেই।' কুলীন স্বামী এই যে স্ত্রী-দের কাছে গিয়ে গিয়ে 'ভিজিট' দেন, সহবাস করেন, এতে স্ত্রী-রা গর্ভবতী হন। তাঁদের কাছে তো সন্তানবতী হতে পারাটাই ইহজীবনের একমাত্র লক্ষ্য। গঙ্গাচরণের যেমন বয়েস হয়েছে, তাঁর স্ত্রীদেরও হয়তো নতুন করে সন্তানধারণের ক্ষমতা ফুরিয়েছে। সেই সন্তানদের সংসারেই হয়তো এখন তাঁরা রয়েছেন। সুতরাং কে-ই বা এখন গঙ্গাচরণ আদর করে বসাবে? কে-ই বা আদায়পত্র-র ব্যবস্থা করবে? এখন স্বাভাবিক ভাবেই 'আদায়পত্র' কমে গেছে। তাই গঙ্গাচরণের পরিবারটির ভরসা এ পরিবারের ছেলেদুটি।

উমার স্থানটা এখানে কেমন? উমা এই বাড়ির মেয়ে হয়েও সে বিনে মাইনের ঝি। মামীমা ইচ্ছামতো তাকে মারেন, অকথ্য গালিগালাজ করেন। বোবা উমা কোনও উত্তর দিতে পারে না। তার বিয়েও কেউ ভাবে না। উমা যৌবনে পৌঁছেও মুক্ত। মুক্ত এই অর্থে, সে যখন তখন বাড়ি থেকে বেরিয়ে নদীর পাড়ে যেতে পারে। যখন তখন বটগাছের তলায় বসে থাকতে পারে। বাড়িতে থেকেও উমা যেন চৌকাঠের ওপর থাকা এক মানুষ। পরিবারে থেকেও সে পরিবারের কেউ নয়। সবাই শুয়ে পড়লে সে রান্নাঘরে ছেঁড়া মাদুর বিছিয়ে শোয়। নিজের জিনিসপত্র রাখার জায়গা বলতে বটগাছের কোটর। সমাজের ধার্য্য করে দেওয়া নারীসুলভ সুশীলতা তাকে শেখানোর প্রয়োজন কেউ বোধ করেনি, কারণ উমা-র তো বিয়ে হবে না, উমা তো বোবা। সে 'বাইরের' কাজগুলো করবে। বাসন মাজবে। গরু চড়াবে। ঘুঁটে দেবে। আর মার খাবে, গালিগালাজ শুনবে। এই নিয়েই বেশ ছিল উমা। কিন্তু শশীর বিয়ের সম্বন্ধ যে উমার জন্যই ভেঙে যাচ্ছে বারবার। যেই পাত্রপক্ষ শুনছে বাড়িতে একটি অবিবাহিতা মেয়ে আছে, তারা পিছিয়ে যাচ্ছে। কারণ শাস্ত্রে নাকি আছে, অবিবাহিতা মেয়ে থাকলে পরিবার পতিত হয়। তাই উমার বিয়ে দিতে হবে। সিনেমাটির শুরু হচ্ছে এই সময়টি থেকে। যে মেয়ে সতী হচ্ছে, তার বরের সাথেই উমার বিয়ে হবার কথা হয়েছিল। কোনও কারণে সেটি বানচাল হয়। তাই পরিবারস্থ মেয়েরা আফশোস করে, আজ উমাও সতী হতে পারতো ঐ বুড়োর সাথে বিয়ে হলে! উমার মামীমাকে বলতে শোনা যায়— "বুড়োরও বলিহারি, আর দুটো দিন সবুর সইল না! একেবারে মেয়েটাকে সঙ্গে নিয়ে চিতায় উঠতিস। ওইতো মুখুজ্যিদের অমন জলজ্যান্ত মেয়েটা কেমন ড্যাং ড্যাং করে চলে গেল, আর তুই? মরেই তো আছিস মা, তবু সতী হয়ে বাঁচতিস! তবু বংশের একটা গতি হত।" উমার যেহেতু পুরুষ অভিভাবক নেই, পুরুষ অভিভাবকের অস্তিত্বের চিহ্নস্বরূপ মাথায় সিঁদুর ওঠেনি, তাই উমার বেঁচে থাকা যেন মরার-ই সামিল বলে মনে করছেন মামীমা। যদি সে সতী হতে পারতো, তার পরিবারকেও গৌরবান্বিত করতে পারতো। যার বেঁচে থাকাটা তার পরিবারের কাছে মূল্যহীন, সতী হয়ে মরলে তার জন্মটা কিছুটা হলেও নাকি তাৎপর্য পেত! এইসব কথা কে বলছে? না, সেই মামীমা যার স্বামী স্ত্রী বর্তমানে একাধিক বিয়ে করেন, দফায় দফায় তাদের কাছে গিয়ে সন্তান

উৎপাদন করে টাকা নিয়ে এসেছেন! এতে মামীমার দুঃখ নেই! এসব স্বাভাবিক তাঁর চোখে!

একটি কিশোর একদিন আসে। অমুক জায়গার নিস্তারিণী দেবীর ছেলে। তার মা মরেছে। গঙ্গাচরণকে খেরোর খাতা খুলে নাম মিলিয়ে চিনে নিতে হয়, এই কিশোর তাঁরই ঔরসজাত পুত্র! তাঁর ঝাপসা স্মৃতির মধ্যে ভেসে আসে পুরনো তথ্য, তিনি জিজ্ঞেস করেন, 'তুমি কি পটল?' এই অদ্ভুত ঘটনাও তাদের কাছে নিতান্তই স্বাভাবিক! মামীমা তার হবিষ্যির বন্দোবস্ত করেন। ছেলেটিকে পরিবারে গ্রহণ করা হয়, কারণ সে যে 'পুত্রসন্তান'— এই ছেলেও একদিন বিয়ে করা শুরু করবে, পরিবারে অর্থাগম হবে! কিন্তু তাদের এই আশা পূরণ হয় না। উমা-কে বেধড়ক মার খেতে দেখে ছেলেটি নিঃশব্দে সকলের কাছে বিদায় নিয়ে বেরিয়ে যায়। গোটা ছবিতে এটিই একমাত্র প্রতিবাদ পুরুষের তরফ থেকে উমার জন্য। উমা মার খায়, সবাই নীরবে দাঁড়িয়ে দেখে। কারণ উমা মার খাবে, এটাই তো দস্তুর। কারণ উমা যে উমা! সে তো পুরুষের কোনও কাজে লাগেনি। ওর আর কী মূল্য? এই কিশোরও একভাবে প্রান্তিক, সে জীবনের সতেরো আঠেরোটা বছর কাটিয়েছে পিতার অভিভাবকত্ব ছাড়াই। সে জানে অনাথ হবার যন্ত্রণা, আশ্রিত হবার যন্ত্রণা। তাই উমার সঙ্গে সে নিজেকে একাত্ম করতে পারে।

বোবা উমার কুষ্ঠীতে বৈধব্যযোগ আছে। ফলে তার জন্য পাত্র পাওয়া আরও দুষ্কর। গ্রামের বাচস্পতি মহাশয় বিধান দেন, অবিবাহিতা কন্যার গাছের সঙ্গে বিবাহ দিতে হবে। তাতে তার আইবুড়ো নাম ঘুচবে। গাছের সাথে বিয়ে দেওয়া নিয়ে একটু কিন্তু কিন্তু ভাব দেখা যায় পরিবারের কারওর কারওর। কিন্তু মামীমা বলেন, 'রাখো তো! ওই হাবা মেয়ের সাড় আছে নাকি? গাছ না মানুষ!' বাচস্পতির বিধান অনুযায়ী রজঃস্বলা মেয়ের বিবাহ দিতেই হবে কারণ সে নাকি তখন তৈরি জমির মতো হয়ে যায়! কাকের মুখে বীজ এসে পড়লেও সে জমিতে তখন ফসল ফলতে পারে। তাই তার একটা 'মালিক' ঠিক করে দিতে হবে। তার যখন সন্তান জন্মাবে, সে যেন একটা পিতৃপরিচয় পায়। এই অবস্থান থেকেও উমা চ্যুত, সে যে 'নারী' এই কথাটাই মামীমা ভুলে গেছেন। উমা সময় পেলেই যে বটগাছের ছায়ায় বসে থাকতো, তাকেই উমার ভাবী বর হিসেবে নির্বাচন করা হল। উমাকে কেউ কখনও কিছু দেয়নি। উমার মৃতা মায়ের কিছু গয়না গচ্ছিত ছিল তার মামার কাছে। মামা তাকে ডেকে গয়নাগুলো দিতে গেলে সে প্রথমে বিশ্বাসই করতে পারে না, এই জিনিসগুলো তাকেই দেওয়া হচ্ছে। উমা-র মামা গাছের শক্ত বাকল খুঁটে ফেলে দেন 'বড় রুক্ষ' বলে। গাছের বাকলে সিঁদুর লেপে উমা-র মাথাটা চেপে ধরে ঘষে দেওয়া হয়, ব্যথায় জ্বালায় উমা জান্তব চিৎকার করতে থাকে। এইভাবেই সাঙ্গ হয় উমার বিবাহপর্ব! কাকতালীয়ভাবে, এ গাছটাই তার ব্যক্তিগত মুহূর্তের একমাত্র সাক্ষী। এ গাছের কোটরেই উমার নিজস্ব

দেরাজ। এ গাছের আড়ালে বসেই উমা লুকিয়ে সিঁদুরের টিপ পরে আয়নায় নিজেকে দেখে। বিয়ের সময়ে বিয়ের কোনও বোধ না থাকলেও পরে উমার মধ্যে যেন অল্প অল্প বদল লক্ষ্য করা যায়।

ছবিতে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক তুলে ধরা হয়েছে। গোয়ালঘরের পাশেই আঁতুড়ঘর। কন্যাসন্তান ভূমিষ্ঠ হলে মুখ বেঁকিয়ে ঘোষণা করা হয়, 'আবার মেয়ে!' হাতের শাঁখ হাতেই থেকে যায়, 'সুখবর'এর প্রত্যাশায় বসে থাকা মামীমা হতাশ হয়ে মাথা নাড়তে নাড়তে উঠে যান। বাড়ির গাভী গর্ভবতী হলে তার যত্ন নেওয়া থেকে শুরু করে প্রসব পর্যন্ত সমস্তটাই হয় সুষ্ঠুভাবে। বকনা-বাছুর ভূমিষ্ঠ হলে সকলে উল্লসিত হয়। স্পষ্টই বোঝা যায়, বকনা বাছুরের চেয়েও মেয়েরা হীন অবস্থায় রয়েছে। তাই তো হরিচরণ দ্বিতীয় বিয়ে করতে যাবার আগে মা'কে প্রণাম করে বলে, 'মা তোমার জন্য দাসী আনতে যাচ্ছি।' মা তাকে আশীর্বচন দেয়, 'সাবধানে যেও। লক্ষ্মী স্ত্রী ঘরে আনো। বছর বছর পুত্রসন্তানের পিতা হও।' ফ্রেমের আরেক পাশে দেখা যায়, হরিচরণের প্রথমা স্ত্রী অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে রেখে সদ্যোজাত শিশুকন্যাটিকে দোলনায় দোল দিচ্ছেন। মামীমা নিজে 'মেয়ে' হয়েও এহেন বিসদৃশ ঘটনা স্বাভাবিক বলে মনে করেন। প্রতিটি নারীচরিত্র একই রূদ্ধমধ্যস্থ অবস্থানে ঘোরাফেরা করছে। গ্রামের নবীন মাস্টারের স্ত্রী বড়মানুষের আদুরে মেয়ে, স্বামীর কাছে মাঝে মাঝে বেড়াতে আসে, থাকে সে পিতৃগৃহেই। ঘোরা বেড়ানো, গয়নাগাঁটি— এই ঘিরেই তার জগৎ, সেখানেও অন্য আলো নেই। নবীন মাস্টার তাকে তোয়াজ করে চলে। বেশ বোঝা যায়, কারণটা পুরোপুরি অর্থনৈতিক, শ্বশুরের দেওয়া মাসোহারাটি তার কাছে গুরুত্বপূর্ণ। এই নবীন মাস্টারের সাথেই উমার গড়ে ওঠে যৌনসম্পর্ক। বোবা মেয়ে কাউকে কিছু বলবে না জেনেই নবীন মাস্টার হাত বাড়িয়েছিল তার দিকে। উমা মুখে কিছু বলে না, কিন্তু তার শরীর কথা বলে। অনভিজ্ঞ উমা এতদিন দেখেছে লোকে তাকে মারার জন্যই হাত তোলে। নবীন মাস্টারের কাছে এগিয়ে আসা ও তার উদ্যত হাতের একটাই অর্থ উমা বুঝেছিল। এই বুঝি মারতে আসে, এই ভয়ে উমা মার ঠেকানোর ভঙ্গিমায় দাঁড়িয়ে পড়েছিল। পরে উমা নিজে থেকেই গিয়ে দাঁড়িয়েছে নবীন মাস্টারের দরজায়। খুব স্বাভাবিকভাবেই উমা অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়ে। বাড়ির মহিলাদের চোখে ধরা পড়ে সমস্ত লক্ষণ। কিছু সাংঘাতিক মন্তব্য শোনা যায়— "ওই হয়! কুলীন ঘরে অমন হয়। তা মিনসেটা কে জানতে পারলে? ভালো ভালো, না জানাই ভালো। শেষে কেঁচো খুঁড়তে কেউটে বেইড়ে পড়বে। অত বড় সোমত্ত মেয়ে! বে দিলে গাছের সঙ্গে, মনিষ্যির সঙ্গে দিলে তবু রাখঢাক থাকতো। লোকে শুধুলি অন্তত বলতি পারতে রেতে জামাই এয়েচিল!" জড়িবুটি খাইয়ে উমার গর্ভপাত করানো হয়। জড়িবুটি দিতে আসা ক্যাওড়াবুড়িই কিছু নিয়মকানুন বাতলে গিয়েছিল। উমার সদ্য গর্ভপাত হয়েছে, তাই তাকে ছেলেপুলেদের কাছে ঘেঁষতে না দেওয়াই ভালো। ঝড়জলের রাতে উমার জায়গা হয় গোয়ালে। গোয়ালের চালা ভেঙে পড়লে উমা গিয়ে আশ্রয় নেয় তার বটগাছের

কোটরে। এরপর আর কোনও সংলাপ নেই। সকাল হলে বাড়ির খুদে নদীর পাড়ে গিয়ে কিছু একটা দেখে এবং ছুটে এসে বাড়িতে খবর দেয়। এরপর দেখা যায় গ্রামসুদ্ধু লোক দল বেঁধে চলেছে নদীর পাড়ে। সেখানে তারা এমন ভয়ানক কিছু একটা দেখতে পাচ্ছে, তারা ভয়ে-বিস্ময়ে হতবাক হয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে। ক্যামেরা ঘুরলে দেখা যায়, ঝড়ে বটগাছ ভেঙে পড়েছে। উমার মৃত শরীরের পাশে তার গয়না ছড়িয়ে। মাথাভর্তি রক্ত যেন সিঁদুরের মত লেপ্টে আছে। বিয়ে করা বটগাছের সঙ্গেই যেন সহমরণে গেছে উমা। নির্বাক হয়ে যায় পুরুষতন্ত্র তাদের বানানো মেকি নিদানের এই পরিণাম দেখে। এভাবেই কথা বলতে না পারা উমার নিথর শরীর হয়ে ওঠে একটা text, সে শরীর ভাষা পায়।

সুজাতার গর্ভের বিস্ফোরণ, যশোদার পচন ধরে যাওয়া স্তন, দ্রৌপদীর রক্তাক্ত যোনি— সমাজ নারীর যে অঙ্গগুলিকে চিনিয়েছে ‘গোপনাঙ্গ’ হিসেবে, সেই গোপন অঙ্গগুলিই যেন ভাষা পেয়ে মুখর হয়ে উঠেছে মহাশ্বেতা দেবীর গল্পে। যে ভাষা তাঁর মৃত শরীরটাকে দিতে চেয়েছিলেন ভুবনেশ্বরী ভাদুড়ী, সে ভাষার খোঁজ কি আজও চলছে? আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় উচ্চশিক্ষার সুযোগ, আইনকানুনে একাধিক রদবদল বুঝি এনে দিয়েছে কাঙ্ক্ষিত মুক্তির যুগ। তবু মালুম হয়, প্রদীপের তলাটাই বড় বেশি অন্ধকার। যে অন্ধকার টেনে নিয়েছে দিল্লীর জ্যোতি সিং, কামদুনির শিপ্রা ঘোষেদের। উন্নাও, হাথরাস, কাঠুয়া-র নাম পরপর বললেই যে মর্মান্তিক ছবিগুলি স্মৃতিতে ভেসে ওঠে, তা একেবারেই কাম্য ছিল না। কিছুদিন মোমবাতি মিছিল, রাজনৈতিক চাপানউতোরের পর আবার সবকিছু থিতিয়ে পড়ে স্বাভাবিক হয়ে যায়। হাজার চুরাশি নম্বর লাশ ব্রতী চ্যাটার্জীর মতো যারা নিজেদের সাধ, আশা, আকাঙ্ক্ষা অপূর্ণ রেখে মর্গে চলে যেতে বাধ্য হয়, তাদের কেউ আর মনে রাখে না। তারা থেকে যায় স্রেফ কতকগুলো পরিসংখ্যান হয়ে। হয়তো তাদের কণ্ঠস্বর পৌঁছে দিতে প্রয়োজন এখন অন্য এক ভাষার। অন্য এক প্রতিবাদের।

তথ্যসূত্র :

১. ‘নারীর শরীর, শরীরের ভাষা : প্রান্তিকতার ভিন্ন বয়ান’, সুমনা দাস সুর, অধ্যাপিকা, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলা বিভাগ।

২. Can the Subaltern Speak?' appears as the closing section of a chapter entitled 'History' in Gaytri Chakraborty Spivak's A Critique of Postcolonial Reasons : Toward a History of the Vanishing Present, Cambridge: Havard University Press, 1999, pp. 244-311

৩. হাজার চুরাশির মা, মহাশ্বেতা দেবী, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ আগস্ট ১৯৭৪, বিংশ মুদ্রণ জানুয়ারি ২০১৪, পুনর্মুদ্রণ ডিসেম্বর ২০২০

৪. গল্পসমগ্র ২, মহাশ্বেতা দেবী, দে'জ পাবলিশিং, প্রথম প্রকাশ এপ্রিল ২০১২, পুনর্মুদ্রণ ডিসেম্বর, ২০১৯

৫. গল্পসমগ্র ৩, মহাশ্বেতা দেবী, দে'জ পাবলিশিং, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০১৪, পুনর্মুদ্রণ সেপ্টেম্বর, ২০১৯

উইলিয়াম জেমসের মতে অভিজ্ঞতার স্বরূপ

মিজানুর রহমান
সহকারী অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ
প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ মহাবিদ্যালয়, কলকাতা

সারাংশ : উইলিয়াম জেমস দর্শনের জগতে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন তাঁর প্রয়োগবাদ (ব্যাপক অর্থে) নামক মতবাদের উদ্ভাবনের দ্বারা। প্রয়োগবাদের সূচনা করার জন্য জেমস দুটো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে পূর্বস্বীকৃতি হিসাবে স্বীকার করে নিয়েছিলেন তার মধ্যে অভিজ্ঞতার নীতি অন্যতম। প্রথাগত দর্শন তথা দার্শনিকদের কিছু পারস্পরিক বিরোধী তত্ত্বকে তিনি সম্পূর্ণ ভাবে বর্জন না করে তাদের মধ্যে কিভাবে সামঞ্জস্য বিধান করা যায় তার চেষ্টা করেছিলেন। সেটা করতে গিয়ে তিনি কিছু ধারণা কে বিশেষ অর্থে প্রয়োগ করেছিলেন তার মধ্যে *অভিজ্ঞতা* নামক ধারণাটি উল্লেখযোগ্য। জেমসের মূলতত্ত্বকে বুঝতে গেলে তাঁর অভিজ্ঞতার তত্ত্বকে সঠিকভাবে বুঝতে হবে। কিছু জেমস গবেষক যার মধ্যে এল্যান ক্যাপি সাকেল অন্যতম তিনি এই 'অভিজ্ঞতার' ধারণাটিকে বোঝার চেষ্টা করেছেন এবং দেখানোর চেষ্টা করেছেন যে জেমস নানান সময়ে তাঁর লেখনীর মধ্যে এই ধারণাটিকে তিনটি ভিন্ন ভিন্ন অর্থে ব্যবহার করেছেন এবং এই অর্থ গুলো পরস্পর অসামঞ্জস্যপূর্ণ। জেমস তাঁর লেখার প্রথমের দিকে *অভিজ্ঞতা* শব্দটিকে বিষয়ীগত (সাব্জেক্টিভ) অর্থে ব্যবহার করেছেন আর পরবর্তী লেখার মধ্যে তিনি বিষয়গত (অবজেক্টিভ) বা অধিবিদ্যক অর্থে ব্যবহার করেছেন। একটা বিষয়ীগত আর একটা বিষয়গত ফলে এই বিরোধী ধারণার মধ্যে সামঞ্জস্য কি ভাবে দেখানো যায় সেটা অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন বলে সাকেল মনে করেন। সাকেল এই বিষয়ে প্রশ্ন তুললেও এর কোন উত্তর তিনি দেন নি। কিন্তু এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়াটা প্রয়োজন বলে সাকেল মনে করেন। আমি আমার এই প্রবন্ধে এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করবো।

মূলশব্দ : বিষয়ীগত অভিজ্ঞতা,বিষয়গত অভিজ্ঞতা, বিশুদ্ধ অভিজ্ঞতা, প্রয়োগবাদ।

I

কেমব্রিজ ডিকশনারি অনুসারে 'কোন বস্তু দেখা বা কোন কিছু করা থেকে বা কোন কিছু অনুভব থেকে জ্ঞান বা দক্ষতা লাভের প্রক্রিয়া হল অভিজ্ঞতা'। 'অভিজ্ঞতা' দার্শনিকদের কাছে একটা জনপ্রিয় শব্দ এই কারণে যে জ্ঞানতাত্ত্বিক আলোচনায় অভিজ্ঞতার ভুমিকা অপরিসীম। জ্ঞানের উৎস তথা জ্ঞানের উপাদান হিসাবে অভিজ্ঞতার আলোচনা দার্শনিকগণ করে থাকেন। ঠিক একই রকমভাবে অভিজ্ঞতার স্বরূপ বিষয়ে অধিবিদ্যক আলোচনা দার্শনিকগণ করেছেন যথা অভিজ্ঞতা বলতে কী বোঝায়, অভিজ্ঞতার সঙ্গে সত্তার সম্পর্ক কী, এই দুটি কি অভিন্ন নাকি এরা পৃথক ইত্যাদি।

কোন কোন দার্শনিক মনে করেন অভিজ্ঞতা হল সত্তা (বিশেষ অর্থে যেমন ব্রেডলি) , কেউ কেউ মনে করেন অভিজ্ঞতার যেটা পূর্বশর্ত যেটা অভিজ্ঞতাকে সম্ভব করে তোলে বা বিভিন্ন ধরনের অভিজ্ঞতার মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করে সেটাই সত্তা (বুদ্ধিবাদি দার্শনিক)। এই বিষয়ে দার্শনিকদের আলোচনা লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু অভিজ্ঞতার স্বরূপ বিষয়ে আলোচনার সময় দার্শনিকগণ সাধারণত 'অভিজ্ঞতা' কথাটিকে ব্যক্তিগত অর্থেই অর্থাৎ মানসিক অর্থে ব্যবহার করেন। জেমস কিন্তু শুধু মানসিক অর্থে 'অভিজ্ঞতার' ধারণাটিকে ব্যবহার করেন নি। প্রথাগত অর্থে অভিজ্ঞতার ধারণাটিকে যে ভাবে ব্যবহার করা হয় প্রয়োগবাদীগণ সেই অর্থে ব্যবহার করেন না, বিশেষ অর্থে ব্যবহার করেন। এই বিষয়ে ফন্টিনেল জন ডিউই এর বক্তব্য উপস্থাপিত করে পাঁচটি পার্থক্যের কথা বলেছেন সেই গুলো হল প্রথমত – প্রথাগত দার্শনিকদের কাছে অভিজ্ঞতা হল জ্ঞানীয় ব্যাপার কিন্তু প্রয়োগবাদীদের কাছে জীবের সাথে দৈহিক ও সামাজিক পরিবেশের আদান প্রদানের বিষয়, দ্বিতীয়ত - প্রথাগত অর্থে অভিজ্ঞতা হল মানসিক বিষয় এবং বিষয়ীর দ্বারা অনুমোদিত কিন্তু প্রয়োগবাদীদের অভিজ্ঞতা বিষয়গত জগতকে নির্দেশিত করে যা মানবিক ক্রিয়া দ্বারা পরিবর্তনশীল এবং পরিবর্তিত, তৃতীয়ত - প্রথাগত অর্থে অভিজ্ঞতা হল অতীত ও বর্তমানের সঙ্গে যুক্ত কিন্তু অন্য দিকে প্রয়োগবাদীগণ অভিজ্ঞতাকে পরীক্ষণমূলক অর্থে গ্রহণ করে যেখানে প্রদত্ত অভিজ্ঞতার মধ্যেও পরিবর্তনের কথা বলা হয় এবং ভবিষ্যৎ এর সঙ্গে সম্পর্কিত করা হয় , চতুর্থত – প্রথাগতভাবে অভিজ্ঞতা সাধারণত বিশেষীকরণবাদকে বোঝায় কিন্তু প্রয়োগবাদে অভিজ্ঞতা 'সম্পর্ক' গুলোকে অন্তর্ভুক্ত করে থাকে সেগুলো বিছিন্ন কিছু নয়। পঞ্চমত – প্রথাগত অর্থে অভিজ্ঞতা আর চিন্তন পরস্পর অসামঞ্জস্য শব্দ কিন্তু প্রয়োগবাদে এদের একই সঙ্গে স্বীকার করতে কোন সমস্যা নেই।

কাজেই প্রয়োগবাদীদের অভিজ্ঞতার ধারণা বিশেষ অর্থে ব্যবহার হয়েছে সেটা আমরা লক্ষ্য করতে পারি। কিন্তু প্রয়োগবাদীরা যে সবসময় একই অর্থে 'অভিজ্ঞতার' ধারণা টিকে ব্যবহার করেছেন সেটা নয়। প্রয়োগবাদী হিসাবে উইলিয়াম জেমস তাঁর আলোচনায় কী কী অর্থে এই ধারণা টিকে ব্যবহার করেছেন সেটা আমরা পর্যালোচনা করবো। সেই আলোচনা প্রসঙ্গে সাকেল কি প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন এবং তার কোন উত্তর দিয়েছেন কিনা সেটা মূলত আলোচনার বিষয়।

II

জেমসের দর্শনে *অভিজ্ঞতা* শব্দটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার হয়েছে। কিন্তু অভিজ্ঞতার এই বিভিন্ন অর্থ গুলির মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক কি সে বিষয়ে প্রশ্ন থেকে যায় বলে অনেক জেমস গবেষক বলার চেষ্টা করেছেন। তাঁদের মধ্যে ডেভিড সি ল্যাম্বার্থ, ইজিন ফন্টিনেল, এল্যান ক্যাপি সাকেল অন্যতম। এদের মধ্যে বিশেষ করে সাকেল অভিজ্ঞতার অর্থ গুলিকে ব্যাপক অর্থে দুটি ভাগে ভাগ করেছেন। একটা বিষয়ীগত আর একটা বিষয়গত। কিন্তু এদের মধ্যে সম্পর্ক কি সেটা বোঝা যায় না বলে সাকেল

বলেন। অভিজ্ঞতার যে বিভিন্ন অর্থ জেমসের লেখার মধ্যে প্রকাশ হয়েছে বলে জেমস গবেষকগণ দাবী করেন সে গুলোকে এবার আমি উপস্থাপনা করছি এবং সাকেলের যে দাবী, যে অভিজ্ঞতার ধারণার দুটো অর্থে নেওয়া হয়েছে এবং এদের মধ্যে সম্পর্ক বিষয়ে সমস্যা রয়েছে সেটাও আমরা বোঝার চেষ্টা করবো।

ডেভিড ল্যামবার্থ তাঁর 'উইলিয়াম জেমস অ্যান্ড দ্য মেটাফিজিক্স অফ এক্সপেরিএন্স' নামক গ্রন্থে বলেছেন 'অভিজ্ঞতার' ধারণার মধ্যে দব্যার্থকতা রয়েছে। জেমস 'অভিজ্ঞতা' শব্দটিকে দুটো অর্থে ব্যবহার করেছেন একটা হল অধিবিদ্যক অর্থে আর একটা হল ফেনমেনোলজিকাল অর্থে। অধিবিদ্যক অর্থে বা ধারণাগত অর্থে যখন তিনি অভিজ্ঞতা কে ব্যবহার করেছেন তখন সেটা বিষয়গত, যেখানে জগতের মধ্যে যেমন নানান ধরনের জটিল বস্তু স্বীকার করা হয় তার সঙ্গে সঙ্গে সেখানে বিভিন্ন সম্পর্ক আছে বলে মনে করা হয়।বিভিন্ন বস্তু ও সম্পর্ক এই অভিজ্ঞতার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। এই বিষয়গত অধিবিদ্যক উপাদানের তিনি নাম দিয়েছেন বিশুদ্ধ অভিজ্ঞতা। এই অভিজ্ঞতা রূপান্তরযোগ্য নয় কারণ এর মধ্যে যে উপাদানগুলো থাকে সেগুলো সমপর্যায়ের , তাদের মধ্যে আবার কেউ মৌলিক হয় না। ফলে এই অভিজ্ঞতা কে আমরা আরও মৌল উপাদানে রূপান্তরিত করতে পারি না। অভিজ্ঞতাকে যখন অধিবিদ্যক অর্থে গ্রহণ করা হয় তখন তার অতিবর্তী কোন অতীন্দ্রিয় সত্তার অস্তিত্ব স্বীকার করা হয় না যা অভিজ্ঞতার বিষয়কে আরও বিমূর্তভাবে বর্ণনা করতে পারে। বিশুদ্ধ অভিজ্ঞতার স্বরূপ আমরা পরে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করবো। "অভিজ্ঞতা" কে মৌলিক অধিবিদ্যক শব্দ হিসাবে গ্রহণ করলে এর চারটি সুবিধা আছে বলে ডেভিড ল্যামবার্থ ব্যাখ্যা করেছেন। প্রথমত- অভিজ্ঞতা শব্দটি ব্যবহার করলে 'নিরপেক্ষতা'র সুবিধা আছে। প্রথাগত অধিবিদগণদের মধ্যে জড় না চিন্তা কোনটা বেশি গুরুত্বপূর্ণ, কে বেশি মৌলিক এই নিয়ে যে বিবাদ লক্ষ্য করা যায় তাতে কিছু কিছু দার্শনিক চিন্তার দিকে পক্ষপাত করেন আবার অনেকে জড়ের দিকে পক্ষপাত করে, ফলে দ্বৈত বাদের সমস্যা দেখা দেয়। কিন্তু চিন্তা বা জড় না বলে যদি 'অভিজ্ঞতা' শব্দটিকে ব্যবহার করা হয় তাহলে এই পক্ষপাতের দোষ থেকে দার্শনিকগণ বেরিয়ে আসতে পারবেন কেননা অভিজ্ঞতা শব্দটি দ্বৈত অর্থে গ্রহণ করা যায় অর্থাৎ একে একদিক থেকে যেমন চিন্তা হিসাবেও বর্ণনা করা যায় তেমনি জড় হিসাবে ও বর্ণনা করা যায়। যেহেতু স্বরূপত সেটা চিন্তা বা জড় নয় তাই সেটা নিরপেক্ষ। দ্বিতীয়ত- অভিজ্ঞতা বললে স্পষ্ট ও মূর্ততাকে বোঝায় কেননা সেটা সাক্ষাৎ ভাবে আমাদের কাছে বা আমাদের সংবেদনে উপস্থিত হয়। অন্যদিকে যদি চিন্তা বা জড় বলা হয় তাহলে সেটা মৌলিক ভাবে বিমূর্ত এবং আমাদের সংবেদনের অতীত। এই গুলোর সাথে আমরা সাক্ষাৎ ভাবে পরিচিত হতে পারিনা। তৃতীয়ত- অভিজ্ঞতা শব্দটি প্রয়োগবাদের দিক থেকেও সুবিধাজনক অর্থাৎ প্রয়োগবাদ অভিজ্ঞতার প্রসঙ্গ উপস্থাপিত করে তার আলোচনায়, বিশেষ করে

সত্যতার ক্রিয়াশীলতার ক্ষেত্রে, ফলে অভিজ্ঞতা এবং প্রয়োগবাদ যেন মিলে যায় তাদের আলোচনায়। চতুর্থত- অভিজ্ঞতা শব্দটিকে জেমস এই জন্যই বেশি ব্যবহার করেছেন কারণ এটা অন্তর্ভুক্তি(ইনক্লুসিভনেস) কে বোঝায়। শুধু চেতনা বা শুধু জড়কে গ্রহণ না করে, এটা দুটোকেই অন্তর্ভুক্ত করে যেটা জীবনের সমৃদ্ধি ও জটিলতাকে বোঝাতে সাহায্য করে।

অন্যদিকে অভিজ্ঞতা শব্দটিকে তিনি অবভাসবিদ্যক বা ফেনমেনোলজিকাল অর্থে ব্যবহার করেছেন। এই অর্থে অভিজ্ঞতা হল একটা বিষয়ীগত অবস্থা। যার উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল বিশেষত্ব, মূর্ততা ইত্যাদি। ফলে এই অবভাসবিদ্যক এবং অধিবিদ্যক অভিজ্ঞতা আসলে বিষয়ীগত ও বিষয়গত। এই দ্বৈতবাদ জেমসের দর্শনে একটা অন্যতম সমস্যা কারণ জেমস বরাবর দ্বৈতবাদকে এড়িয়ে যেতে চেয়েছেন তাঁর দর্শনে।

বিশুদ্ধ অভিজ্ঞতা কে যখন অধিবিদ্যক অর্থে ল্যামবার্থ ব্যবহার করেছেন তখন এই 'বিশুদ্ধ ' কথাটির আবার দুটি ব্যবহার তিনি করেছেন। এই 'বিশুদ্ধ' শব্দটির একটা ব্যবহার হল সমষ্টিগত অর্থ আর একটা হল বিচ্ছিন্নগত অর্থ। সমষ্টিগত অর্থে বিশুদ্ধ অভিজ্ঞতা যে কোন বিশেষ অভিজ্ঞতার মৌলিক বৈশিষ্ট্যে সে অংশগ্রহণ করে, যদিও বাস্তবিক অভিজ্ঞতায় মূর্ত ও বিশেষ হিসাবে পরিণত হয় না। এই ক্ষেত্রে বিশুদ্ধ অভিজ্ঞতা অপরিমাণগত, অনির্ধারিত নাম পদ হিসাবে ব্যবহৃত হয়। 'বিশুদ্ধ ' শব্দটির দ্বিতীয় ব্যবহারে বিশুদ্ধ অভিজ্ঞতা কে বিচ্ছিন্ন অর্থে গ্রহণ করা হয়। এখানে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্র বা পরিস্থিতির উপর সেটা নির্ভরশীল। সমষ্টিগতঅর্থে এটা অধিবিদ্যক মৌল উপাদান আবার বিছিন্নঅর্থে এটা ক্রিয়ার প্রবর্তক অর্থাৎ অভিজ্ঞতার বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে এমন ভাবে আদান প্রদান হয় যেটা বিশেষ ক্রিয়া রূপে পরিগণিত হয়। তিনি একটা উদাহরনের সাহায্যে 'বিশুদ্ধ' শব্দের দুটি ব্যবহারকে বুঝিয়েছেন। যেমন যখন 'জমি' কথাটি ব্যবহার করা হয় তখন সেটা সমষ্টিগত অর্থে আমরা বুঝি, কিন্তু যখন জমির অংশের কথা বলা হয় তখন সেটা বিছিন্নঅর্থে ব্যবহৃত হয়। একইরকমভাবে বিশুদ্ধ অভিজ্ঞতা যেমন সমষ্টিগত অর্থে ব্যবহৃত হয় তেমনি বিছিন্ন অর্থেও ব্যবহৃত হয়। এই দুটি ব্যবহারই অধিবিদ্যক অর্থে।

এর পরেই ল্যামবার্থ বিশুদ্ধ অভিজ্ঞতাকে অবভাসবিদ্যক বা ফেনমেনোলজিকাল অর্থে গ্রহণ করা যায় বলে মন্তব্য করেছেন। যার বর্ণনায় তিনি বলেছেন যেটা সাক্ষাৎ ভাবে আমাদের সামনে প্রদত্ত সেটাই অভিজ্ঞতা। এখানে তিনি বিশুদ্ধ অভিজ্ঞতার দুটি অর্থ করলেন একটা অধিবিদ্যক অন্যটা অবভাসবিদ্যক। ফলে এই দুই ধরনের অভিজ্ঞতার মধ্যে সম্পর্ক কি হতে পারে সেটা একটা উল্লেখযোগ্য দার্শনিক সমস্যা হয়ে উঠবে।

ইউজিন ফন্টিনেল তাঁর 'সেলফ,গড,অ্যান্ড ইম্মরটালিটি অ্যা জেমসিয়ান ইনভেস্টিগেশান' নামক গ্রন্থে বলেছেন যে, জেমস তাঁর দর্শনে বিভিন্ন অভিজ্ঞতার কথা বলেছেন। যাদের গুণ ও পরিধি ভিন্ন ভিন্ন। তাদের মধ্যে জ্ঞানাত্মক অভিজ্ঞতা , ধর্মীয়

অভিজ্ঞতা, নান্দনিক অভিজ্ঞতা, অনুভুতিমুলক অভিজ্ঞতা , ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা , বিশুদ্ধ অভিজ্ঞতা উল্লেখযোগ্য। এই অভিজ্ঞতাগুলোকে যখন পৃথকভাবে আলোচনা করা হয় তখন সেগুলোকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রভাবে আলোচনা করা যায় না। এই বিভিন্ন ধরনের অভিজ্ঞতাগুলো কিভাবে পরস্পর সম্পর্কিত সেটা খুব জটিল প্রশ্ন বলে ফন্টিনেল মনে করেন। কিন্তু এই অভিজ্ঞতাগুলোকে যদি আমরা বিশ্লেষণ করি তাহলে দেখা যাবে অভিজ্ঞতা এক্ষেত্রে দুটি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে বিষয়ীগত এবং বিষয়গত অর্থে । জ্ঞানাত্মক, ধর্মীয় , নান্দনিক, ব্যক্তিগত ইত্যাদি অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে ব্যক্তির আগ্রহ ও চাহিদা খুব গুরুত্বপূর্ণ যার উপর এই ধরণের অভিজ্ঞতা নির্ভরশীল। ফলে এই গুলোকে আমরা বিষয়ীগত অভিজ্ঞতা বলতে পারি। অন্যদিকে বিশুদ্ধ অভিজ্ঞতা হল বিষয়গত যেটা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু এই দুই ধরনের অভিজ্ঞতার মধ্যে সম্পর্ক কি পরিস্কারভাবে এই প্রশ্নের নির্দিষ্ট কোন উত্তর পাওয়া যায় না বলে ফন্টিনেল মনে করেন।

প্রসঙ্গক্রমে সাকেলের বক্তব্য এবার আলোচ্য বিষয়। সাকেলের মতে জেমসের প্রয়োগবাদী দর্শনে দুটি ধারণা গুরুত্বপূর্ণ একটা হল কর্তার উদ্দেশ্য, প্রয়োজন অর্থাৎ কর্তার উদ্দেশ্যমুখী ধারণা আর একটা হল অভিজ্ঞতার নীতি। এই দুটো ধারণা এই কারণে গুরুত্বপূর্ণ যে এটা জেমসের দর্শনকে নির্ভুল ভাবে বুঝতে সাহায্য করে। অভিজ্ঞতার সঙ্গে সত্তার সম্পর্ক প্রসঙ্গে জেমস বলেন যে, যা কিছু সৎ তা অভিজ্ঞতায় অনুভবযোগ্য আর যা কিছু অনুভবযোগ্য সেটাই সৎ। এটাই জেমসের একটি মূল অধিবিদ্যক নীতি বলে সাকেল ব্যাখ্যা করেন। প্রশ্ন হবে এখানে কি জেমস সত্তা ও অভিজ্ঞতা শব্দ দুটিকে একই অর্থে ব্যবহার করলেন নাকি পৃথক অর্থে ব্যবহার করলেন? সাকেল মনে করেন যেকোন অবভাসসমূহকে বুঝতে গেলে অভিজ্ঞতা হল আবশ্যিক ও পর্যাপ্ত শর্ত। এমনকি এই অভিজ্ঞতার নীতিটা জেমসের অর্থতত্ত্বের ভিত্তি। কোন ধারণা বা প্রকল্পের যদি অভিজ্ঞতায় প্রভাব না থাকে তাহলে সেটা অর্থহীন। প্রথাগত অভিজ্ঞতাবাদীরা যে অর্থে ‘অভিজ্ঞতার’ ধারণাটি ব্যবহার করেছে সেটা জেমস স্বীকার করেন এবং তার অতিরিক্তভাবে এর কিছু বৈশিষ্ট্য ও স্বীকার করেন। অভিজ্ঞতাবাদীরা মনে করেন অভিজ্ঞতা গড়ে ওঠে এক একটি পৃথক পারমাণবিক একক দ্বারা। কিন্তু জেমস মনে করেন যে পৃথক পৃথক কোন একক দ্বারা অভিজ্ঞতা গড়ে ওঠে না। তিনি বলেন অভিজ্ঞতা হল একটা প্রবাহ যার মধ্যে কোন পৃথক পৃথক একক নেই। যা কিছু আছে সব অভিজ্ঞতার মধ্যেই আছে। তিনি মনে করেন অভিজ্ঞতাকে এই প্রবাহ অর্থে গ্রহণ করলে পুরনো যে বহুল প্রচলিত দ্বৈতবাদ রয়েছে সেটা আর থাকবে না।

অভিজ্ঞতার ধারণা জেমসের দর্শনে জটিল এবং পরিবর্তনশীল ভুমিকা পালন করে। অভিজ্ঞতা হল জেমসের দর্শনে মুখ্য একটা সত্তাতাত্ত্বিক, জ্ঞানতাত্ত্বিক,পদ্ধতিগত

একটা নীতি। বিভিন্ন গ্রন্থে জেমস অভিজ্ঞতার ধারণাটিকে পৃথক পৃথক অর্থে ব্যবহার করেছেন। তিনি অভিজ্ঞতার ধারণাটিকে মুলত তিনটে ভিন্ন ভিন্ন অর্থে ব্যবহার করেছেন বলে সাকেল ব্যাখ্যা করেছেন। 'দ্য প্রিন্সিপালস অফ সাইকোলজি' নামক গ্রন্থের দ্বিতীয় ভলিউমে জেমস অভিজ্ঞতা কথাটিকে বিষয়ীগত অর্থে গ্রহণ করেছেন যাকে অন্তর্দর্শনে জানা যায় বলে সাকেল ব্যাখ্যা করেন। যা কিছু আমাদের প্রভাবিত করে সেটা আমাদের চিন্তাকে প্রভাবিত করতে পারে, আমাদের অনুভুতিকে প্রভাবিত করতে পারে এমনকি আমদের ক্রিয়াতেও প্রভাব ফেলতে পারে সেটাই অভিজ্ঞতা। এক্ষেত্রে অভিজ্ঞতা মানেই কারো না কারো অভিজ্ঞতা। এই অভিজ্ঞতার সঙ্গে কিন্তু ব্যক্তির ইচ্ছা, আগ্রহ, প্রয়োজন ইত্যাদি জড়িত থাকে যেটা একজন মানুষ কি অভিজ্ঞতা করবে সেটা নির্ধারণ করে দেয়। অর্থাৎ যা কিছু আমদের সামনে প্রদত্ত সেটাকে আমরা আমাদের প্রয়োজন, আগ্রহ অনুসারে পরিবর্তন করে গ্রহণ করি সেটাই আমদের কাছে অভিজ্ঞতা তথা অভিজ্ঞতার বিষয় হিসাবে উঠে আসে। এই অর্থে অভিজ্ঞতা হল বিষয়ীগত ব্যাপার। এটা হল অভিজ্ঞতার প্রথম অর্থ।

এর পর তিনি বলেছেন অভিজ্ঞতার দ্বিতীয় অর্থ জেমস তাঁর 'প্লুরালিস্টিক ইউনিভারস' আর 'দ্য ভ্যারাইটিজ অফ রিলিজিয়াস এক্সপেরিএন্স' নামক গ্রন্থে করেছেন। এই ক্ষেত্রে তিনি দৈবিক সত্তার বৈশিষ্ট্যকে উপস্থাপিত করার জন্য অভিজ্ঞতার ধারণাটিকে ব্যবহার করেছেন। দৈবিক সত্তা হল এমন এক অভিজ্ঞতার ক্ষেত্র যেখানে অন্য সমস্ত অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রগুলো অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকে। ঈশ্বর বা দৈব সত্তা হল অভিজ্ঞতার একটা বিস্তৃত ক্রম যেখানে ব্যক্তিগণ ধর্মীয় অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে অংশ গ্রহণ করে। সাকেল বলেন "James posited that the divine is a field of experience in which all other fields of experience are encompassed"(p.34) । সাকেলকে অনুসরণ করে আমরা বলতে পারি অভিজ্ঞতা হওয়া বলতে এখানে দৈব সত্তার প্রতি সচেতনতা হওয়াকে বোঝায়। দৈব সত্তার ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতার ক্ষেত্র অনেক ব্যাপক যার মধ্যে আমাদের অভিজ্ঞতা অংশ গ্রহণ করে। এই ধর্মীয় অভিজ্ঞতা কেও আমরা বিষয়ীগত অর্থে ব্যবহার করতে পারি। কেননা জেমস দৈবিক সত্তার অস্তিত্ব স্বীকার করবেন আমাদের জীবনে তাঁর প্রভাবের উপর। যদি বাস্তবে দৈবিক সত্তার কোন প্রভাব না থাকে তাহলে তাঁর অস্তিত্ব জেমস স্বীকার করবেন না। আমাদের উপর প্রভাব পড়লো কিনা সেটা নির্ভর করে আমাদের উপর। ফলে বলতে পারি ধর্মীয় অভিজ্ঞতা ও এক অর্থে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা বা বিষয়ীগত অভিজ্ঞতা। 'এসেজ ইন রেডিকাল এম্পিরিসিস্ম' নামক গ্রন্থে জেমস 'অভিজ্ঞতা' শব্দটিকে একটি বিশেষ অর্থে গ্রহণ করেছেন। অভিজ্ঞতার ধারণাকে তিনি এখানে অধিবিদ্যক অর্থে বা তৃতীয় অর্থে গ্রহণ করেছেন এবং যার নাম দিয়েছেন 'বিশুদ্ধ অভিজ্ঞতা'। এই বিশুদ্ধ অভিজ্ঞতা হচ্ছে একটা মৌলিক পদার্থ। এই বিশুদ্ধ অভিজ্ঞতা তথা অধিবিদ্যক উপাদান থেকে জগতের যাবতীয় বস্তু তথা বিষয় নিঃসৃত হয়। এই বিশুদ্ধ অভিজ্ঞতার বাইরে

কিছু নেই। তাঁর মতে বিশুদ্ধ অভিজ্ঞতা হল ধারণার বা অভিজ্ঞতার একটা প্রবাহ। যে প্রবাহের মধ্যে থেকে ক্রিয়াগত কারণে নানা ধরণের সত্তা তৈরি হয়। সাকেলের ভাষায় "... James considered experience to be the sole ontologically basic category, within which the merely functional distinctions between subject and object are made"(p.34) । এই ভাবে সাকেল দেখানোর চেষ্টা করেছেন যে জেমস অভিজ্ঞতার ধারণাটিকে তাঁর বিভিন্ন গ্রন্থে মূলত তিনটি অর্থে ব্যবহার করেছেন। কিন্তু এই ভিন্ন ভিন্ন অভিজ্ঞতাগুলোর মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক আদৌ আছে কিনা, যদি থাকে সেই গুলো পরস্পর সামঞ্জস্যপূর্ণ কিনা সেটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। কেননা আমরা যদি এই তিন রকমের অভিজ্ঞতার অর্থ গুলো দেখি তাহলে মূলত এদের দুটি ভাগে ভাগ করা যাবে। একটা হল বিষয়ীগত আর একটা হল বিষয়গত। প্রথম দুটো অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে ব্যক্তির অবদান অস্বীকার করা যায় না। কারণ অন্তর্দর্শনে যাকে জানছি সেটা আগে আমার সামনে উপস্থিত হচ্ছে তার পর আমরা তাকে আমাদের প্রয়োজন অনুযায়ী গ্রহণ করছি তারপর সেটা আমাদের কাছে অভিজ্ঞতা হিসাবে উঠে আসছে। আবার ধর্মীয় অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে যাকে আমরা দৈবিক সত্তা হিসাবে মানবো তাঁর একটা প্রভাব আমাদের জীবনে থাকতে হবে। যদি না থাকে তাহলে তাঁর অস্তিত্ব জেমস অস্বীকার করবেন। দৈবিক সত্তা আসলে অভিজ্ঞতার একটা ক্ষেত্র যে ক্ষেত্রটা মানবিক অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রের চেয়ে ব্যাপক। এই দৈবিক সত্তায় বিশ্বাসটাও বিষয়ীগত এই কারণে যে যারা দৈবিক সত্তায় বিশ্বাস করবেন তারা এটা আশা করেন যে ভবিষ্যতে তারা বিশেষ অভিজ্ঞতা লাভ করবে। ফলে শেষ পর্যন্ত বিষয়ীর অভিজ্ঞতা দৈবিক সত্তার অস্তিত্বে প্রমাণ। কিন্তু তৃতীয় অর্থ হল সম্পূর্ণ অধিবিদ্যক যাকে আমরা বিষয়গত বলি। ফলে দুটি পারস্পরিক বিরোধী ধারণা হয়ে যাচ্ছে অভিজ্ঞতার অর্থের মধ্যে। এই বিরোধী ধারণাগুলোকে সঙ্গতিপূর্ণ ভাবে রেখে আলোচনা করাটা খুবই জটিল। সাকেল তাঁর আলোচনায় এই সমস্যা কে উপস্থাপিত করেছেন।

III

আমি আমার আলোচনায় প্রথমে জেমসের লেখাকে বিশ্লেষণ করে দেখার চেষ্টা করবো তিনি কি অর্থে অভিজ্ঞতার ধারণা কে ব্যবহার করেছেন এবং সেই সম্ভাব্য অর্থ গুলির মধ্যে থেকে এই প্রশ্নের সম্ভাব্য সমাধান খুঁজে পাওয়া যায় কিনা।

'দ্য প্রিন্সিপালস অফ সাইকোলজি' নামক গ্রন্থের প্রথম ভলিউমে জেমস 'অভিজ্ঞতার' লক্ষণ দিয়ে বলেছেন – "অভিজ্ঞতা হল সেটাই যেটা আমাদের কাছে প্রদত্ত" (পৃষ্ঠা ৬১৯) অর্থাৎ যেটা আমাদের সামনে উপস্থিত হয়, যার উপস্থিতি হওয়াটা আমার উপর নির্ভর করে না । কিন্ত জেমস এটাও বলেছেন যে, কোন কিছু আমাদের সামনে উপস্থিত হলেই সেটা আমাদের অভিজ্ঞতার বিষয় নাও হতে পারে। অসংখ্য

জিনিস আমাদের ইন্দ্রিয়ের সামনে উপস্থিত হতে পারে কিন্তু সবগুলোই আমার অভিজ্ঞতার মধ্যে প্রবেশ করে না। যেগুলো আমাদের আগ্রহের বিষয় সেগুলোই আমাদের অভিজ্ঞতার মধ্যে প্রবেশ করে। ফলে অভিজ্ঞতার মধ্যে বিষয়ীর উপাদান যুক্ত থাকে। 'দ্য প্রিন্সিপালস অফ সাইকোলজি' নামক গ্রন্থের দ্বিতীয় ভলিউমে তিনি 'অভিজ্ঞতার' লক্ষণ দিয়ে বলেছেন "অভিজ্ঞতা মানেই কোন না কোন কিছুর অভিজ্ঞতা যেগুলো আমাদের উপর প্রভাব বিস্তার করে অর্থাৎ কোন কিছু যখন আমাদের উপর ছাপ ফেলে সেটা স্বতস্ফূর্ত ভাবে হতে পারে আবার আমাদের নিজেদের কোন ক্রিয়ার ফলেও হতে পারে সেটাই অভিজ্ঞতা"(পৃষ্ঠা ৬১৯)।

এই দুটি ক্ষেত্রেই আমার বলতে পারি প্রথাগত দার্শনিকগণ যে অর্থে অভিজ্ঞতার ধারণাটিকে ব্যবহার করেন জেমস সেই একই অর্থে ব্যবহার করছেন কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গে এর মধ্যে মানবিক উপাদান জড়িত থাকে বলে স্বীকার করছেন যেটা প্রথাগত দার্শনিকদের থেকে জেমসকে আলাদা করে। এই ক্ষেত্রগুলোতে জেমস বিষয়ীগত অর্থেই অভিজ্ঞতার প্রয়োগ করেছেন।

জেমস তাঁর পরবর্তী গ্রন্থে 'অভিজ্ঞতা' শব্দটিকে ভিন্ন অর্থে ব্যবহার করেছেন। তাঁর মতে এই জগতে একটামাত্রই উপাদান আছে যার নাম হল 'বিশুদ্ধ অভিজ্ঞতা' যা দিয়ে জগতের বাকি সব কিছু তৈরি। বিশুদ্ধ অভিজ্ঞতা কোন কিছু দিয়ে তৈরী নয়। যার বর্ণনা দিতে গিয়ে তিনি বলেছেন আমাদের জীবনের সাক্ষাৎ যে প্রবাহ যেটা থেকে পরবর্তী সময়ে নানান রকমের ধারণা তৈরী হয়। শুধুমাত্র শিশুদের, অর্ধেক সচেতন ব্যাক্তিদের, ড্রাগস সেবনকারী ব্যক্তিদের, অসুস্থতায় দুর্বল ব্যক্তিদের এই ধরনের অভিজ্ঞতা হয়ে থাকে যারা কিসের অভিজ্ঞতা হচ্ছে জানে না, সেটা নির্দিষ্ট কিছু নয় কিন্তু যে কোন কিছু হতে পারে।এই ক্ষেত্রগুলোতে বিশুদ্ধ অভিজ্ঞতাকে একটা অনুভুতি বলা যায়। এর আভাস পাই মাত্র কিন্তু কখনই একে পরিপূর্ণ ভাবে জানতে পারি না। আমরা অভিজ্ঞতায় যেটা জানি সেটা আসলে এই বিশুদ্ধ অভিজ্ঞতার ব্যাখ্যাত রূপ মাত্র। এটি হল আদিম উপাদান , ব্যাখ্যাত হওয়ার পূর্বে পর্যন্ত এর বিশুদ্ধতা অক্ষুণ্ণ থাকে। এই আদি অভিজ্ঞতা বিষয়ীগত নয় এটা হল বিষয়গত। জেমস বলেছেন সমস্ত কিছু বিশুদ্ধ অভিজ্ঞতা থেকে সৃষ্টি হলেও, সমস্ত কিছুর মূল ভিত্তি হলেও বিশুদ্ধ অভিজ্ঞতা কোন কিছু দিয়ে তৈরি নয় এই অর্থে সেটা মৌল উপাদান তথা অধিবিদ্যক।

এই বিশুদ্ধ অভিজ্ঞতার স্বরূপ এমন যে একে যেমন চেতন বলা যায় আবার একে জড় ও বলা যায়। একটা দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে এটা চেতন আবার অন্য দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে এটা জড়। ফলে কে বেশি গুরুত্বপূর্ণ জড় না চেতন, কে বেশি মৌলিক জড় না চেতন এই যে বিতর্ক সেটা আর ওঠে না। উদাহরণ হিসাবে বলা যায় – রঙের দোকানে একজন শিল্পীর আঁকা একটা ছবি। সেটা যখন অন্যান্য ছবির সাথে রাখা থাকে তখন এটা বিক্রির জিনিস, এটা এমন কিছু যেটা কেনা যাবে। কিন্তু যখন

সেই একই ছবি একটা ক্যানভাসে থাকে তখন সেটা আমাদের নান্দনিক অভিজ্ঞতার বিষয়। একই রকমভাবে বিশুদ্ধ অভিজ্ঞতা এক প্রেক্ষিতে চেতন অন্য প্রেক্ষিতে জড়। কিন্তু এবার প্রশ্ন হবে এই দুই পরস্পর বিরোধী ধারণার মধ্যে সম্পর্ক কি ? এদের মধ্যে আদৌ কোন সম্পর্ক দেখানো যায় কিনা ? এর উত্তর আমরা জেমসের লেখাকে বিশ্লেষণ করে পাই। জেমস তাঁর 'দ্য প্রিন্সিপালস অফ সাইকোলজি' নামক গ্রন্থের প্রথম ভলিউমে অভিজ্ঞতার তৃতীয় আর এক ধরণ মেনেছেন যাকে তিনি বলেছেন 'অবিশ্লেষিত অভিজ্ঞতা'। এই অবিশ্লেষিত অভিজ্ঞতা বিষয়ীগত আর বিষয়গত এই দুই ধরণের অভিজ্ঞতার মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করতে পারে। একে বিষয়ীগত যেমন বলা যায় তেমনি বিষয়গত বলা যায়। যখন কোন কিছু আমাদের সামনে প্রদত্ত হয় তখন সেটা অভিজ্ঞতা হিসাবে পরিগণিত হয় না। আমাদের মনোযোগ, আগ্রহ ব্যতিরেকে সেটা শুধুই অবিশ্লেষিত। অবিশ্লেষিত অবস্থায় থাকাকালীন এই অবস্থাকে বিষয়ীগত বলা যায় না কিন্তু সব বিষয়ীর কাছে ওটা একই ভাবে আসছে তখন ব্যক্তি তাঁর মনোযোগ, আগ্রহকে ব্যবহার করে তাঁর কাজে লাগায় এবং তখন সেটা বিষয়ীগত হয়ে উঠে। তার আগে পর্যন্ত এই অবিশ্লেষিত অবস্থাকে বিষয়ীগত বলার অর্থ হয় না। অর্থাৎ প্রথম অবস্থায় বিষয়ীগত না হলেও পরবর্তীকালীন সেটা বিষয়ীগত হয়ে ওঠে এই অর্থে অবিশ্লেষিত অভিজ্ঞতাটা বিষয়ীর অভিজ্ঞতার অংশ বলা যায় যদিও এটা স্বরূপত বিষয়ীগত অভিজ্ঞতা নয়।

এই অবিশ্লেষিত অভিজ্ঞতার অবস্থাকে একটা সত্তাতাত্ত্বিক অবস্থা হিসাবেও ব্যবহার বা ব্যাখ্যা করতে পারি। এই অবিশ্লেষিত অভিজ্ঞতাকে বিশুদ্ধ অভিজ্ঞতার প্রকৃতি হিসাবে ব্যাখ্যা করা যায়। বিশুদ্ধ অভিজ্ঞতা হল অভিজ্ঞতার এমন এক প্রবাহ যার মধ্যে প্রাথমিক অবস্থায় কোন রকম মানবীয় উপাদান জড়িত থাকে না, সেটা অবিশ্লেষিত অবস্থায় থাকে। এই অবিশ্লেষিত অভিজ্ঞতা হল অভিজ্ঞতার তৃতীয় ধরণ যার মধ্যে বিষয়গত আর বিষয়ীগত অভিজ্ঞতা সম্পর্কযুক্ত হয়। এই সম্পর্কিত হওয়ার কারণটা আবার ঐ বিষয়তার মধ্যেই আছে কারণ ওটার মধ্যেই বিষয়ী যুক্ত হয়ে থাকছে। এখান থেকে জেমসের তত্ত্ব থেকে আর একটা জিনিস নিঃসৃত হয় যে বিষয়ীগত অভিজ্ঞতা স্বপ্রতিফলিত কারণ সে নিজেই নিজেকে পর্যালোচনা করতে পারে। এই অভিজ্ঞতাকে অধিবিদ্যক বলা হচ্ছে কারণ এটা বিষয়ীগত অভিজ্ঞতার ভিত্তি। এই অবিশ্লেষিত অভিজ্ঞতা প্রথমে বিষয়ীগত রূপে না থাকলেও পরে সেটা বিষয়ী গত হয়ে ওঠে। যতক্ষণ পর্যন্ত এটা বিষয়ী গত হয়ে ওঠে না ততক্ষণ পর্যন্ত একে অধিবিদ্যক অবস্থা বলা যাবে। ফলে এটা একটা অধিবিদ্যক অবস্থা হিসাবেই থাকলো কিন্তু পরে ব্যক্তির প্রয়োজন, চাহিদার সঙ্গে যুক্ত হওয়ার মধ্য দিয়ে সম্পর্কিত হল।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী :

১. Collin Mcintosh. Edt, 2013. *Cambridge Advanced learner's dictionary*, 4th Edition. Cambridge University Press. UK.

২. Fontinell, Eugene. 2000.*Self, God, and Immortality A Jamesian Investigation.* Fordham University Press , New York,

৩. ইমাম,পারভেজ।২০০২।*প্রয়োগবাদের রূপরেখা* । অনন্যা , ঢাকা।

৪. ইসলাম, ড নজরুল ।২০০৩ । *আমেরিকান প্রয়োগবাদ পারস,জেমস ও ডিউই*। সাহিত্যিকা , ঢাকা।

৫. James, William.1912.*Essays in Radical Empiricism.* Longmans, Green, and Co, New York.

৬. James, William.1920. *A Pluralistic Universe.* Longmans, Green, and Co, New York.

৭. James, William. 1943. *Pragmatism and four essays from The Meaning of Truth.* The World Publishing Company, NewYork.

৮. James, William. 1950.*The Principles of Psychology.* Volume I, Dover Publications,Inc., New York.

৯. James, William. 1950. *The Principles of Psychology.* Volume II, Dover Publications,Inc., New York.

১০. Lamberth,David C. 1999. *William James and The Metaphysics of Experience.* Cambridge University Press, New York.

১১. Suckiel,Ellen Kappy. *William James* 2006. *A Companion to Pragmatism*, Edited by John R Shook and Joseph Margolis. Blackwell Publishing. UK.

আশাপূর্ণা দেবীর তাসের ঘর : বিশ্বাস-অবিশ্বাসের দ্বন্দ্ব

মৃত্যুঞ্জয় মণ্ডল
স্যাক্ট-১, শ্রী চৈতন্য কলেজ, হাবড়া

আশাপূর্ণা দেবীর 'তাসের ঘর' নারীর মর্যাদা প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম-পর্যায়ের গল্প। নারীর অন্তর্বেদনা, পুরুষতান্ত্রিক আভিজাত্যে পুরুষের আচ্ছন্ন বুদ্ধিতে তার অবমাননার রূপায়ন 'তাসের ঘর'। যেখানে আছে নায়িকা মমতার নিরবচ্ছিন্ন মানসিক যন্ত্রণা। আর এই যন্ত্রণার অনুঘটক রূপে কাজ করেছে বিশ্বাস-অবিশ্বাসের দ্বন্দ্বে সুধাংশুর নিজের স্ত্রী মমতাকে না চিনতে পারার অভিব্যক্তি। আর শাশুড়ি যেন পিতৃতন্ত্রের রক্ষাকবচ। আসলে বাংলাদেশের সমাজ-ব্যবস্থায় মমতার মত আধুনিকাদের কেউ চেনার চেষ্টা করেনি। চিনবে কী করে, সমাজটা তো আজও পিতৃতান্ত্রিক রসে জারিত। তাই সত্যকে মিথ্যা করে, মমতাকে উপলক্ষ করে আমাদের পুরুষশাসিত সমাজের যে উপেক্ষা, অনাদর, স্থূল স্বার্থপরতা ও অসহ্য ইতরতা মমতা প্রত্যক্ষ করেছে, তা শেষপর্যন্ত নতমস্তকে সে মেনে নিতে চায়নি। এ সমাজে স্ত্রীজাতির মর্যাদাহীনতায় সে ক্ষুব্ধ অপমানিত। তাই 'তাসের ঘর' বস্তুতপক্ষে বিশ্বাস-অবিশ্বাসের দ্বন্দ্বে অপমানিতা এক নারীর সংসার ত্যাগ করে নতুন পৃথিবীতে একটু ঠাঁই হয় কিনা সেই পথ আবিষ্কারের গল্প। মমতার এই গৃহত্যাগের এক এবং একমাত্র অর্থ পুরুষ-শাসিত সমাজের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। সেই সময় ও সমাজের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর নিরব প্রতিবাদ হয়ে উঠেছে শব্দের চেয়ে ধারালো।

(১)

আশাপূর্ণা দেবী (১৯০৯-১৯৯৫) শুধু বাংলা সাহিত্যে নয়, ভারতীয় ভাষাসাহিত্যে কথাসাহিত্যিকদের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্পী হিসেবে আজ স্বীকৃত। আমরা যাকে কথাসাহিত্য বলি তার উপকরণ যথার্থ জীবনের ইতিহাস থেকেই সংগ্রহ করতে হয়। আশাপূর্ণার ছোটগল্পের উপাদান-উপকরণ সেই চিরচেনা জগৎ থেকেই সংগৃহীত। তাই তাঁর গল্পগুলি আমাদের জীবনেতিহাসেরই গুরুত্বপূর্ণ দলিল। ছোটগল্প তাঁর 'প্রথম প্রেম'। আশাপূর্ণার ছোটগল্পের প্রাণ নিহিত আছে তাঁর তীক্ষ্ণ অন্তর্দৃষ্টির মধ্যে, সেই সঙ্গে ঈর্ষণীয় তাঁর গল্প বলার ভঙ্গি, তাঁর গল্পগুলিতে কাহিনি সহজ হলেও নিটোল। ছোটগল্পেই তিনি বেশি স্বচ্ছন্দ এবং এই প্রকরণেই তাঁর মনন ও মেধার উজ্জ্বলতম ও বৈচিত্র্যময় প্রতিফলন। তাঁর ছোটগল্পে মধ্যবিত্ত বাঙালির স্বপ্ন এবং ইতিহাস দুটোই ধরা আছে, কিন্তু নেতাদের মত শ্লোগান নেই, পোস্টার নেই। জীবনের নিষ্ঠুরতম সত্যগুলি, বঞ্চনা, লাঞ্ছনা, বিড়ম্বনার কাহিনিগুলি তিনি যেন দারুশিল্পীদের মত সূক্ষ্মভাবে খোদাই করে জীবনের কালস্রোতে ছড়িয়ে দিয়েছেন। বড়ো কথা ছোট করে বলায় তিনি যেন ওস্তাদ, মনুষ্যজীবনের বড়ো বড়ো ধাক্কাগুলিকে ছোটগল্পের ছোট পরিসরের মধ্যে ধরে

ফেলায় তাঁর অনায়াস নৈপুণ্য। আমাদের পরিচিত জীবনকেই এমন আশ্চর্য কৌশলে উন্মোচিত করেন যে, মুহূর্তে প্রকাশিত হয়ে যায় আমাদের অনেক আদর্শ, মহত্ত্ব, উদারতা ত্যাগের অন্তরালবর্তী ফাঁকি, আত্মপ্রবঞ্চনা, মিথ্যাচার। আশাপূর্ণা দেবীর ছোটগল্প তাই আসলে আমাদের মধ্যবিত্ত জীবনের আত্ম-উন্মোচনের গল্প। তাঁর লেখার প্রধান উপজীব্য মধ্যবিত্ত ঘরোয়া মানুষ; সে মানুষ প্রতিদিন তাঁর চোখের সামনে হাসি-কান্না নিয়ে উপস্থিত, সে মানুষ তাঁর একান্ত চেনা। কিন্তু চেনা বললেই কি চেনা যায়? নিজের লেখা আলোচনা করতে গিয়ে আশাপূর্ণা দেবী নিজেই লিখেছেন—

"... এই মানুষ জাতটাকে কে কবে চিনেছে? এ কত উল্টোপাল্টা উপাদান দিয়েই তৈরী। এর মধ্যে কত রঙ, কত লীলা, কত বিস্ময়! সে নিজেই জানে না কী জন্যে কী করে বসে। জানে না তার চেতনা অবচেতনে কোথায় কী আছে, তাঁর 'মন' নামক বস্তুটা কী জটিলতার জালে আবদ্ধ। ... মনে হতে পারে সমাজবদ্ধ মানুষের মধ্যে যে সম্পর্কের বন্ধন, তার অনেকটাই অভ্যাসের অনুশাসন মাত্র। যে বস্তুগুলির প্রতি মানুষের পরম মূল্যবোধ, স্নেহ প্রেম ভালোবাসা এক কথায় যা জীবনের বনেদ বলে মনে হয়, সে বস্তু হয় তো মুহূর্তে শূন্যের অঙ্কে পরিণত হয়ে যেতে পারে। তবুও মানুষ ওই অভ্যাসের সংস্কারটাকেই পরম মূল্যবান বলে আঁকড়ে ধরে থাকতে চায়।"[১] [দেশ, সাহিত্য সংখ্যা, ১৩৮২]

(২)

আগেই বলেছি মধ্যবিত্ত জীবনের নানা পারিবারিক ঘাত-প্রতিঘাত, পারিবারিক মানুষের মনস্তত্ত্বের টানা পোড়েন তাঁর গল্পের প্রধান আলোচ্য বিষয়। চাক্ষুষভাবে একটু সতর্ক থাকলেই বুঝতে পারি, তার সাহিত্যে পারিবারিক মেয়েদের সমস্যাই প্রধান। এমন কিছু সাংসারিক মানুষের বিশ্বাস-অবিশ্বাসের দ্বন্দ্ব নিয়ে ঘরভাঙার গল্প 'তাসের ঘর'। আশাপূর্ণা দেবীর 'পঞ্চাশটি প্রিয় গল্প' গ্রন্থের অন্যতম বিখ্যাত গল্প 'তাসের ঘর'। আশাপূর্ণা দেবীর গল্প স্বভাবের নানা মাত্রিক উপাদান-উপকরণে এ গল্প জারিত। গল্পটিতে গল্পকারের স্বরূপ স্বভাবের যে যে বৈশিষ্ট্য বহুমাত্রিক ভাবনায় বিশিষ্টতা লাভ করেছে সেগুলিকে তুলে ধরাই নিবন্ধের মূল লক্ষ্য।

আশাপূর্ণার ছোটগল্পে মধ্যবিত্ত বাঙালির স্বপ্ন ও স্বপ্নভঙ্গের ইতিহাস দুটোই ধরা পড়ে। সাংসারিক জীবনের কত তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে কত সামান্য ঠোকাঠুকি, কত বিচিত্র তার সমস্যা; তুচ্ছ যে কোন ঘটনাই হোক না কেন তাকে কেন্দ্র করে কত দীর্ঘশ্বাস, কত চোখের জলপড়ে আশাপূর্ণা দেবীর 'তাসের ঘর' সে কথাই বলে। মূলত, মমতা আঠার বছর সাংসারিক জীবনে নানা কর্তব্য নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করলেও সুধাংশু নামক স্বামী পুরুষটি সামান্য কারণে মমতাকে অবিশ্বাস করে এবং সেখানেই নারীর পুরুষতান্ত্রিক সমাজে মূল্যবোধের ভাঙন প্রকাশ পায়। কলঙ্কের বোঝা মাথায় নিয়ে, নীরব প্রতিবাদ জানিয়ে "এত বড়ো পৃথিবীতে একটি মেয়ে মানুষের ঠাঁই হয় কিনা" সেটাই দেখবার জন্য মমতা ছেলে-মেয়ে-স্বামী সংসার ছেড়ে পথে বেরিয়ে পড়ে।

আশাপূর্ণা দেবীর ছোটগল্প আসলে আমাদের মধ্যবিত্ত জীবনের আত্ম-উন্মোচনের গল্প। আমাদের পরিচিত জীবনকেই এমন আশ্চর্য কৌশলে উন্মোচিত করেন আশাপূর্ণা যে, মুহূর্তে প্রকাশিত হয়ে যায় আমাদের বহুদিনের লালিত আদর্শ, মহত্ত্ব, উদারতা, ত্যাগের অন্তরালবর্তী ফাঁকি। এভাবেই সত্য-মিথ্যার দ্বন্দ্বে মমতা-সুধাংশুর আঠার বছরের মধুর সম্পর্কটিও মুহূর্তে বদলে যায়, উন্মোচিত হয়ে পড়ে সুধাংশুর মমতার প্রতি ভালোবাসার অন্তরালবর্তী ফাঁকি।

লেখিকার শিল্প স্বভাবের মূলে কোথাও যেন তির্যক ব্যঙ্গ সমাজ বাস্তবতাকে চোখে আঙুল দিয়ে সহজ সরল ভাষায় পাঠকের মনে ধরার চেষ্টা করেন। আসলে তির্যকতার আড়ালে আমাদের জীবনের চরম সত্যকে ধরার আন্বেষণ করেন মাত্র। তাই মমতা দেখি নারীর ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যরক্ষার্থে সুধাংশুর মুখোমুখি যথার্থ উত্তর দিচ্ছে—

"মমতা উত্তর করিয়াছিল-পারছি, কিন্তু ও জিনিসটা যে শুধু তোমাদের একলারই নেই, সেটাও ভুলতে পারছিনা।"[২]

'ও জিনিসটা' আসলে পুরুষতান্ত্রিক সমাজে দাঁড়িয়ে একটি নারীর 'মান সম্ভ্রম' কে বাঁচিয়ে রাখার চরম প্রয়াস।

বাস্তবতার আবিলতা থেকেই লেখিকা গল্পের রসদকে খুঁজে বের করার পক্ষপাতি, এর জন্য যুগসন্ধিক্ষণের কোন সমস্যা তাকে বেশি ভাবায় না; বরং সংসারের চারদেয়ালের মধ্যে থেকেই তিনি খুঁজে নেন গল্পের পটভূমি। বাস্তবতার সঙ্গে কল্পনার যুগ্ম রসায়নে এক চক্ষু হরিণের মত লক্ষ্যে স্থির থেকে সহজ সরল ভঙ্গিতে জীবনের চরম সত্যকে প্রকাশ করেন। বাস্তবের আদালতে নিয়ম-কানুন বড়ো কঠিন, বড়ো অদ্ভুত। সেখানে কোন তর্ক খাটে না; সব নিয়মের বড়ো নিয়ম বাস্তবের আদালত। আমাদের চাওয়ার সব বিপরীত চাওয়াই সেখানে নির্মমভাবে সত্য, কখনো সখনো চরমভাবে মূর্তও বটে! জীবনের প্রত্যেকটা পরতে পরতে স্বপ্ন ও স্বপ্ন ভঙ্গের সংজ্ঞা। সময়ের বৈপরীত্যই সময়ের প্রধান লক্ষণ। যে মেয়েটি সংসার নামক পৃথিবীর সক্কলের কথা ভেবেছে, স্বামীকে বসিয়েছে দেবতার আসনে; তারই এক আত্মীয়—

"ব্যাধতাড়িত পশুর মতো পুলিশের তাড়া খাইয়া যে ছেলেটা গতরাত্রে কয়েক ঘন্টার জন্য এঘরে আশ্রয় লইয়াছিল, সে যে নিজেকে নিরাপদ করিতে এক ফাঁকে পরিচ্ছদগুলো বদলাইয়া লইয়াছিল সেই খবরটাই মমতার জানা ছিল না।"[৩]

এভাবেই নিজের ভালোমন্দ বিচার না করে যে মানুষটা সংসারে সকলের পাশে দাঁড়াতে চায়, সংসার সমুদ্রে বিগত আঠারো বছর নানা কর্তব্যে নিষ্ঠার সঙ্গে নিজেকে ব্যস্ত রেখেছে; অথচ মমতা কি জানতো বাস্তবের পৃথিবী বড়ো নির্মম, পান থেকে চুন খসলেই চেনা পৃথিবী হয়ে যায় অচেনা, সত্য হয়ে যায় মিথ্যা? আজ আঠারো বছর পর মমতার জীবনে নির্মম সত্য সুধাংশুর চোখে সে মিথ্যা, বিশ্বাস-অবিশ্বাসের দ্বন্দ্বে ছলনাময়ী নারী। যে সত্যকে মমতা এতদিন প্রাধান্য দিয়ে এসেছে, যার জন্যে এই

সংসার, এত ত্যাগ স্বীকার, সামান্য কারণে নিজের অজান্তে এক আত্মীয় তাঁর ঘরে এসে পোষক পরিবর্তন করে যাওয়ায় তারই স্বামী কিনা তাঁকে কলঙ্কিনী ভেবে সন্দেহ করে? তাঁকে নিয়ে এত কিছু আর নয়! এরপরই মমতা ঘর ছাড়ে। মমতার মত দৃপ্ত ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যময়ী মহিলার কাছে আঠার বছরের ‘ঘর-সংসার’ মুহূর্তে ‘তাসের ঘর’ বলে মনে হয়। মমতার এই ঘর ছাড়ার গান আসলে একটি নারীর এই পৃথিবীর কাছে নিজের ব্যক্তিগত ‘আইডেনটিটি’খোঁজার প্রেশক্রিপ্সন। যে প্রেশক্রিপ্সনে নেই কোন ঝগড়া-মনোমালিন্য। অথচ খুব স্বাভাবিক ভাবেই সহজ সরল সূত্রধরে লেখিকা কোথাও যেন মমতাকে সামনে রেখেই নারীর ব্যক্তিগত ‘আইডেনটিটি’ খোঁজার মেসেজটা পুরুষতান্ত্রিক সমাজের মর্মে নিমর্মভাবে গেঁথে দিতে সচেষ্ট হন।

আশাপূর্ণা দেবীর বেশিরভাগ গল্প উপন্যাসে নারীরা একান্ত ব্যক্তিগত ক্যাম্পাসে, ব্যক্তিগত ক্যালিডোসকোপে ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য নিয়ে ঘরোয়া আলাপচারিতায় নিজেদের মেলে ধরে নিজেদের মত করে। তাদের ব্যক্তিগত ক্যাম্পাসের ক্যালিডোস্কোপে তাঁদের নিজস্ব একটা ভুবন গড়ে ওঠে। ভালোলাগা-মন্দলাগা সব মিলিয়েই তাদের ঘর-দুয়ার। এই সংসারে কোন নারী প্রেমের দোলাচলতায় অস্থির আবার কখনো বা চিরন্তন প্রেমিকা প্রেমিকের অপেক্ষায় অধীর আগ্রহে বসে আছে। আবার কখনো বা কোন নারী সামাজিক ভাবে লাঞ্ছিতা হয়ে প্রকৃত বিচারের অপেক্ষায় আজও দিন গুনছে। সব মিলিয়ে সমাজ-সংসারে নারীর মূল্যবোধের অবনমনই লেখিকার বেশি করে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। আমাদের আলোচ্য গল্প ‘তাসের ঘর’ মূলত নারীর সেই মূল্যবোধ খোঁজার কথা বলে।

(৩)

‘তাসের ঘর’ গল্পের কাহিনি অংশ খুব সামান্যই। গল্প কাহিনিতে দেখা যায়, মমতা তার ছেলেমেয়ে, শাশুড়ি-ঠাকুরঝি, স্বামী-সংসার নিয়ে বেশ সুখেই দিন কাটায়। সারাদিন নিজের কাজের মধ্যেই ডুবে থাকাই মমতার স্বভাব। সেদিক থেকে বাড়ির অন্যান্য সদস্যদের চেয়ে মমতার কাজের পরিধিটা একটু বেশি, সকালে আটটার মধ্যে দেওরের ভাত, আবার হিমুর স্কুলের বাস সাড়ে আটটায়। সাড়ে দশটা পর্যন্ত মমতার নিশ্বাস ফেলিবার সময় থাকেনা। তাই এহেন বাড়ির বড়ো বৌকে কেনা ভালোবাসে। শাশুড়ি সুশীলাবালার তাই মেয়ের চেয়ে বড়ো বৌমার উপর টানটি অধিক। শুধু শাশুড়ি নয়—

“সদা হাস্যময়ী, নিরলস, কর্তব্যপরায়ণা, বধূটিরও যেমন গুণের সীমা ছিল না, তেমনই ঘরে পরে এমন কেহ ছিল না যে, তাহাকে ভালো না বাসিয়া থাকিতে পারে।হাসিয়া গল্প করিতে, যত্ন করিয়া খাওয়াইতে, রোগের সেবা করিতে, তাহার জুড়ি ছিল না। লজ্জা-সরমের হয়তো একটু কমতি ছিল, কিন্তু তাহার সরল নিঃসঙ্কোচ ব্যবহারের কাছে ‘বেহায়া’ নামটা ঘেঁসিতে সাহস পাইত না।”[৪]

কিন্তু এই সংসার নামক জগৎটা বড়ো কঠিন। তাই, সংসারের সবাই যখন একজন মানুষকে মাথায় তুলে রাখে, তার ভালোবাসার আনন্দে মাতে তখন কারুর না

কারুরও ঈর্ষাও হয়। গল্পে তরঙ্গিনীর ঈর্ষাই বুঝিয়ে দেয় নারীই নারীর শত্রু। তাই তরঙ্গিনীর ঈর্ষার পথ ধরেই মমতার জীবনসংসারে নেমে আসে 'ঝড়-ঝঞ্ঝা'। সুধাংশুর 'রেলের রাস্তায় নেমন্তন্নে যাওয়া এবং অধিক রাত্রে সুধাংশুর বাড়ি ফেরা না ফেরাকে কেন্দ্র করে মমতা ও ঠাকুরঝির মধ্যেকার মতবিরোধ, একে অপরের প্রতি ঈর্ষা থেকেই সন্দেহের রহস্য জটিল থেকে জটিলতর হতে থাকে। তরঙ্গিনীকে প্রকৃত সত্যটাকে না বলতে চাওয়া, আর তখনই ঠাকুরঝির মনে সন্দেহ দানা বাঁধে, তাহলে প্রকৃত সত্যটা কী? এরপর সকালে প্রায় নটার সময় সুধাংশু ঘরে ফিরে স্নান, খাওয়া-দাওয়া সেরে উর্ধ্বশ্বাসে দৌড়; মমতার নিজের কাজ নিয়ে এতটাই ব্যস্ত যে, স্বামীর সঙ্গে বাক্যালাপ করার তারও সুযোগ হয়ে ওঠে না। হবেই বা কি করে তাকে ঘর-বাহির সবাইকে নিয়েই চলতে হয়। এই মুহূর্তে মমতা নিমাইয়ের কাছে বোনের অসুস্থতার কথা শুনে হাতের কাজ ফেলে ছুটে বেরিয়ে আসে সবিতার ছোট দেওরের গাড়িতে ডাক্তারখানায়। এই সুযোগে বড়ো বৌয়ের গুণের কথা সারা বাড়ি হয়ে গেল। সারাদিন ধরে মমতার অনুপস্থিতির সুযোগে বাড়িতে ঝড় বইতে লাগিল। সে ঝড় আর থামিল না, এবং বিজলী ছাড়া প্রত্যেকের বিশ্বাস করিতে কষ্ট হইলেও বিশ্বাস করিল—

"বড় বৌয়ের স্বভাব চরিত্র সন্দেহজনক। দুর্ভাগ্যবশত এমন অকাট্য প্রমাণ পাওয়া গেল যাহার উপর আর কথা চলে না। আঠারো বৎসর যাবৎ মমতা যে শ্রদ্ধা-ভক্তি, সুনাম অর্জন করিয়া আসিতেছে, মুহূর্তের অবিবেচনায় তাহার ভরাডুবি করিয়া বসিল।"[৫]

বাড়ির একটি মাত্র মানুষ বিজলী কেবল বড়দিদির প্রতি বিশ্বাস রেখে উত্তেজিত হয়ে বললে :

"মাগো তোমরা বাড়িসুদ্ধ সব পাগল হয়ে গেলে নাকি?এই কথা বিশ্বাস করতে প্রবৃত্তি হচ্ছে?"[৬]

মা সুশীলাবালার হয়তো প্রবৃত্তি নেই, কিন্তু মা হয়ে তিনিও মেয়ে মানুষকে বিশ্বাস করতে পারলেন না। বিজলীও তাঁর সর্বস্ব দিয়েও বড়দিদি মমতাকে রক্ষা করতে অপারগ। আসলে অকাট্য প্রমাণ হিসেবে ফেলে যাওয়া 'কাপড় জামাগুলো' সব কিছুকে ওলোট পালোট করে দেয়। আবার মেজবৌ বিজলীর কাছে সেগুলি রহস্যই বটে। এভাবেই মুহূর্তের মধ্যেই শাশুড়ি মা সুশীলাবালার কাছে 'বাড়ির লক্ষ্মী বৌ' হয়ে গেল অলক্ষ্মী—

"আমি তখনি জানি ও মেয়ে একদিন কি সর্বনাশ ঘটাবে। মেয়ে মানুষ অত বাচাল। মাথার কাপড় ফেলে রাজ্যির লোকের সঙ্গে পাটি পেড়ে গল্প 'হ্যা, হ্যা' করে হাসি, কে বা জানে আপন, কে বা জানে পর। যে আসছে তাকেই চা খাওয়ান, জল খাওয়ান, আদর উথলে পড়ে। মেয়ে মানুষ অত লোকমজানে হওয়া কি আর সুলক্ষণ?"[৭]

আসলে বিশ্বাস-অবিশ্বাসের দ্বন্দ্বে শাশুড়ি চরিত্রের প্রকৃত মানসিকতা এখানে প্রকট হয়ে ওঠে। যাহাকে নিয়ে এত তুমুল আন্দোলন, সে যখন বাড়ি ফিরিল, তখন অনেক কিছুই বদল হয়ে গেছে। স্বামীকে বাইরের খোলা প্রাঙ্গণে ঘুমোতে দেখায় মমতা প্রথমে অবাকই হয়। বিস্মিত মমতা স্বামীর বিছানায় একপ্রান্তে বসে স্বামীর হাতখানা কোলের ওপর টেনে সস্নেহ প্রশ্নের যখন কোন উত্তর পায়না, তখন মমতা আহত হয়ে উঠে দাঁড়ায়। আঠারো বছর ধরে যে সত্যকে মমতা বিশ্বাস করে এসেছে তার প্রতিদান এই বুঝি—

"ও ঘরে ঢোকবার প্রবৃত্তি আমার নেই, তোমার সঙ্গে কথা কইবারও নয়, যাও সরে যাও। অনাহার শ্রান্ত শরীরে স্বামীর এরূপ অভূতপূর্ব নিষ্ঠুর আচরণে মমতার চোখে জল অসিল, ধরা পড়িতে না দিয়া কহিল, অপরাধটা শুনতে পাই না? অপরাধের প্রমাণ ঘরে পুষে রেখে যে ন্যাকামির ভান করে, তার সঙ্গে তর্ক করার রুচি আমার নেই। চালাকি শিখেছিলে বটে, তবে শেষ রক্ষা হল না।"[৮]

এরপর অপরাধের প্রমাণ খুঁজতে মমতার হঠাৎ চোখে পড়ে কাদা মাখা আধময়লা ধুতি ও তদনুরূপ একটি পাঞ্জাবি জড় হয়ে পড়ে আছে। ব্যাধতাড়িত পশুর মতো তাড়া খেয়ে যে ছেলেটা গতরাত্রে কয়েক ঘন্টার জন্য তার ঘরে আশ্রয় নিয়েছিল, ধুতি পাঞ্জাবিটা তারই! ছেলেটি অন্য কেউ নয়, মমতার মামাতো ভাই নিখিলেশ, বোমার মামলায় সে জেল ভেঙে পালিয়ে এসেছে। এ গল্প বিজলী মমতার মুখে শুনতে শুনতে অবাকই হয়। দিদিকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে কেঁদে উঠে এর প্রতিকার করতে বলে, প্রকৃত সত্যটা সকলের সামনে তুলে ধরতে বলে। সময় অনেক পেরিয়ে গেছে, বড় বৌয়ের কাছে সবই মিথ্যা প্রতিপন্ন হয় :

"কোনটা সত্যি, কোনটা মিথ্যে, বুদ্ধি দিয়ে বিচার করা সব সময় সহজ নয় মেজবৌ! এতদিন যাকে পরম সত্য বলে জেনে এসেছি, দেখছি কি মিথ্যেই সেটা! আজ যদি মিথ্যেটাই সত্যি হয়ে দাঁড়ায় ক্ষতি কি?"[৯]

যে হতভাগ্য ছেলেটা দুদন্ড আশ্রয় নিতে এসে মমতার চিরদিনের আশ্রয় ভেঙে দিয়ে গেল, বিজলীর মতো মমতা তার উপর রাগ করতে পারে না। "যে ভঙ্গুর ঘরখানা নিয়মিত একটি ফুৎকারে ধুলি গুড়ি হইয়া গিয়াছে, তাহার উপর মমতার আর মমতা নাই।" গল্পটা এখানে শেষ হলে কথা ছিল না, কিন্তু আশাপূর্ণা দেবীর সহজাত প্রবৃত্তি হয়তো অন্যকথা বলে। মমতার সংসার ত্যাগ করে যাওয়ার সময় সুধাংশু বলেছিল—

"এরকম ভাবে চলে গেলে আমাদের মান সম্ভ্রম কোথায় থাকবে বুঝতে পারছো?"[১০]

সেকাল-একালের দ্বন্দ্বে মমতার মত মহিলারা বোধহয় একটু এগিয়ে। তাই সেকালের মহিলাদের মত পিছন ফিরে না তাকিয়ে মমতা স্বামীর প্রশ্নের জবাব দিতে একবারও ভাবেনি। বরং উত্তর করেছিল, 'মান সম্ভ্রম' নামক জিনিসটা যে শুধু পুরুষদের একলারই নেই, 'সেটাও ভুলতে পারছি না'। এরপর মমতা নতুন পৃথিবীর

আশায় ঘরের বাইরে পা রাখে। গল্প কাহিনির এখানেই শেষ। কাহিনি অংশের মধ্যে এমন কোন জটিলতা নেই। একেবারে আশাপূর্ণা সুলভ ভঙ্গিতে সহজ সরলভাবে সাংসারিক জীবনের ঘটনা নিয়েই প্লট পরিকল্পনা। তবে ক্ষুদ্র কাহিনিতেই লেখিকা তুলে ধরতে চেয়েছেন চিরন্তন সত্যকে। বিশ্বাস-অবিশ্বাসের দ্বন্দ্বে যে সত্য নারীর ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যকেই চিহ্নিত করে। যুগ যুগ ধরে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সত্য-মিথ্যার দ্বন্দ্বে, সম্পর্কের টানাপোড়েন বাঙালি পারিবারিক সমস্যার অন্যতম কারণ। এই সত্য-মিথ্যা নামক জারণ-বিজারণের ঘূর্ণায়মান চাকায় পারিবারিক সম্পর্কের বন্ধন হচ্ছে শিথীল। বাড়ছে কাছের মানুষের মধ্যে সম্পর্কের দূরত্ব। 'তাসের ঘর'-র নায়ক নায়িকা সেই দূরত্বকেই চিহ্নিত করে।

(৪)

'তাসের ঘরে' রয়েছে বিশ্বাস-অবিশ্বাসের যুগ্ম লড়াই। প্রকৃত সত্যকে উদ্ঘাটন না করে মিথ্যাকে সত্য প্রতিপন্ন করা এবং ঘৃণায় মান-অভিমানের দ্বন্দ্বে সত্যবাদী যখন মিথ্যাকেই জীবনের সত্য বলে মনে করতে বাধ্য হয় তখনই জীবনে নেমে আসে বিস্ময় ও বিপন্নবোধ, জগৎ সংসার হয়ে যায় মিথ্যা। মানব জীবনের এমনই একটি চিত্রাঙ্কনে গল্পটি হয়েছে মুখর। মমতার স্বামী যে আঠার বছর ধরে মমতার সঙ্গে দাম্পত্য জীবন অতিবাহিত করেও নিজের স্ত্রীকে চিনতে ভুল করে। অবিবেচকের মত বাড়ির অন্যান্যদের সঙ্গে তাল মিলিয়ে মিথ্যাকেই বড় করে দেখে। প্রকৃত রহস্য বা সত্য কি একটি বারও স্ত্রীর কাছে জানবার প্রয়োজন বোধ করে না। এর পাশাপাশি তরঙ্গিনীর ঈর্ষাও 'জায়মান পরমাণু' হিসেবে কাজ করেছে সুধাংশু ও মমতার মধ্যেকার বিচ্ছেদের সীমারেখাটি দীর্ঘায়িত করতে। আর মমতার মত ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যময়ী আধুনিকা অবোধ স্বামীর বিরুদ্ধে কোনরকম বাক্যালাপ না করেই এই পৃথিবীতে একটি নারীর ঠাঁই হয় কী না তার জন্যে ঘর ছেড়েছে। এখন সমগ্র ব্যাপারটি আলোকপাত করার জন্যে আমরা ত্রিবিধ স্তর বিভাজনে গল্পটি ধরার চেষ্টা করবো। যথা—

[অ] প্রথম স্তর: নারীর একান্ত নিজস্ব ক্যাম্পাস ও ব্যাক্তিগত ক্যালিডোস্কোপ:

প্রথমস্তরে ঠাকুরঝি-ননদের কর্মে ও আচরণে প্রকাশিত হয়েছে চার দেওয়ালের মধ্যে নারীর একান্ত নিজস্ব কর্মজগৎ-র স্বাভাবিক অস্বাভাবিক রূপের প্রকাশ। এরই সাথে ঠাকুরঝি ও ননদের চিরন্তন সম্পর্কের স্বরূপটিকেও লেখিকা ইঙ্গিতে ধরার চেষ্টা করেছেন। প্রথম দিকে গল্পের শুরুতে হাবভাব চালচলনে ভিতর থেকে তরঙ্গিণীর মমতার প্রতি ঈর্ষা, গত রাতে সুধাংশুর বাড়ি আসা না আসাকে কেন্দ্র করে তরঙ্গিনীর তির্যকব্যাঙ্গ-বাক্যালাপ সব মিলিয়ে নারী মনস্তত্ত্বের জায়মান ক্রিয়া লক্ষ্য করা যায়। বিষয়টি এরকম :

ক) "তরঙ্গিনী চোখে মুখে বিস্ময় ফুটাইয়া বলিল দাদা আসেনি কাল? বল কি বৌ! আমি যে নিজের কানে শুনলাম।"[১১]

খ) "তাছাড়া স্পষ্ট দেখলাম যে বৌ, ভবানীর ঘরের দেওয়ালে তোমার জানালা থেকে ছায়া পড়েছে; দুজন মানুষের ছায়া- নারে হিমি?"[১২]

তরঙ্গিনী তার নিজের চোখকে অবিশ্বাস করবে কী করে। তাই বারে বারে হিমিকে সাক্ষ্য জানায় মমতার রাগ হয়। আসলে :

গ) "মমতার হঠাৎ খেয়াল হইল তরঙ্গিনীর ইহা নিছক কৌতুহল মাত্র নয়, খুঁচাইয়া জেরা করিবার মতো। রাগে আপাত মস্তক জ্বলিয়া যায়।"[১৩]

ঘ) "তবে বোধ করি ভূত দেখে থাকবে ঠাকুরঝি- দেখ রাম নামের মাদুলিটা হারিও না যেন- বলিয়া কঠিন মুখে রুষ্ট হাসি হাসিয়া গামলাখানা উঠাইয়া লইয়া গেল।"[১৪]

ননদ ও ঠাকুরঝির এই আবহমানকালের সম্পর্ক কোন মমত্ব ও স্নেহের আবরণে বাঁধা সম্পর্ক নয়। গল্পের দ্বিতীয় স্তরে এসে এই সম্পর্ক আরও চরমমাত্রা স্পর্শ করে, তরঙ্গিনীর সন্দেহ-প্রবণতা ও ঈর্ষা মমতার সোনার সংসারে আগুন জ্বালায়।

[আ] দ্বিতীয় স্তর: লক্ষ্মীবধূর গুণ ও গুণহীনতার পরিচয়, অনুঘটকরূপে তরঙ্গিনীসহ অন্যান্যদের ঈর্ষা:

নারীর লক্ষ্মী ও অলক্ষ্মী স্বভাবের দ্বন্দ্ব এই স্তরকে ভিন্ন মাত্রা দান করেছে। এই দ্বন্দ্বে তরঙ্গিনীসহ পারিবারিক অন্যান্য মানুষের ঈর্ষা অনুঘটকরূপে কাজ করেছে। ঈর্ষার সূত্র ধরে তরঙ্গিনীসহ সুশীলাবালা ও হিমাংশু-সুধাংশুর আচরণ এই স্তরে নিষ্ঠুরতায় পর্যবসিত। আর নিন্দা তো তারাই করে যারা নিন্দাকে ভালোবাসে, সত্যকে ভালোবাসে বলে নয়। তাই দীর্ঘ আঠার বছরের লক্ষ্মী বৌ-য়ের সমস্তগুণকে মুহূর্তে অস্বীকার করে নিন্দুকরা অলক্ষ্মীর সমালোচনায় পঞ্চমুখ হয়। বিষয়টি এভাবে ধরা যাক—

১) লক্ষ্মীবধূর পরিচয়:

ক) "সুশীলাবালার নাকি মেয়ের চাইতে বৌয়ের উপর টানটা অধিক, এমনি একটা বদনাম ছিল; বিশেষ করিয়া বড়বৌমাকে সে অত্যন্ত সুনজরে দেখিতেন একথা মিথ্যা নয়।"[১৫]

খ) শুধু সুশীলাবালা কেন:

"সদা হাস্যমুখী, নিরলস, কর্তব্যপরায়ণা বধূটিরও যেমন গুণের সীমা ছিল না, তেমনই ঘরে পরে এমন কেহ ছিল না যে, তাহাকে ভালো না বাসিয়া থাকিতে পারে।"[১৬]

গ) "হাসিয়া গল্প করিতে, যত্নকরিয়া খাওয়াইতে রোগের সেবা করিতে, তাহার জুড়ি ছিল না। লজ্জা-সরমের হয়তো একটু কমতি ছিল, কিন্তু তাহার সরল নিঃসঙ্কোচ ব্যবহারের কাছে 'বেহায়া' নামটা ঘেঁষিতে সাহস পাইত না।"[১৭]

২) লক্ষ্মীবধূর উপর আরোপিতগুণহীনতার পরিচয়:

বাঙালি সমাজের চিরকালীন বেঁধে দেওয়া লক্ষণগণ্ডীতে এহেন লক্ষ্মীবধূটি কীভাবে অলক্ষ্মী হইয়া গেল,দ্বিতীয় স্তরের কয়েকটি পংক্তি তারই উদাহরণ হতে পারে :

মেজবৌ বিজলীর উত্তরে সুশীলাবালার খেদোক্তি—

ক) "প্রবৃত্তি হয় না বটে, তবে মেয়ে মানুষকে বিশ্বাস নেই।"[১৮]

যে শাশুড়ী এক সময় বলেছিল— "বৌমা আমার লক্ষ্মী।"

খ) "সুশীলাবালা কপালে করাঘাত করিয়া কহিলেন, আমি তখনি জানি ও মেয়ে একদিন কি সর্বনাশ ঘটাবে। মেয়ে মানুষ অতবাচাল। মাথার কাপড় ফেলে রাজ্যির লোকের সঙ্গে পাটি পেড়ে গল্প, 'হ্যা, হ্যা' করে হাসি, কে বা জানে আপন, কে বা জানে পর। যে আসছে তাকেই চা খাওয়ান, আদর উথলে পড়ে। মেয়েমানুষ অত লোকমজানে হওয়া কি আর সুলক্ষণ?"[১৯]

আসলে আমাদের সমাজই গড়ে তোলে পৌরুষ ও নারীত্বের আদর্শ। যাকে**'Gender Idiology'** বা লিঙ্গ মতাদর্শ বলে। এ প্রসঙ্গে সিমোন দ্যা বোভ্য়ারের একটি কথা প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে **"One this not born but rather becomes a woman."**এটাই হল নারীর সামাজিক নির্মাণ,'কেউ নারী হয়ে জন্মায় না,বরং নারী হয়ে ওঠে'। এভাবেই দ্বিতীয় স্তরে মমতার সঙ্গে পারিবারিক মানুষগুলির সম্পর্কের তিক্ততা শেষ পর্যন্ত চরমতম নিষ্ঠুরতায় পৌঁছেছে। তাই যে লক্ষ্মী বৌমার প্রতি শাশুড়ী সুশীলাবালার দরদ উথলে পড়তো, আজ তা সম্পূর্ণভাবে ভিন্ন মেরুগামি।

একথা ভুললে চলবে না, মমতার জীবনশৈলীগত যে বির্বতন, একান্ত নিজস্ব ভাবে নিজের মত করে তার চালচলন, ঘরে বাইরে সকলের সঙ্গে তার যোগাযোগ রাখার প্রবণতা,সবকিছুর মধ্যে দিয়ে এক দৃপ্ত আধুনিকাকে আমরা পর্যবেক্ষণ করি। তাই একটি মেয়ে মানুষের চারদেয়ালের গণ্ডীর বাইরে অনায়াসেবেরিয়ে পড়া সর্বকালের সুশীলাবালার মত শাশুড়ীরা কখনও খোলা মনে মেনে নিতে পারে না। পারেনি তরঙ্গিনীর মত মহিলারাও। গল্পে তার প্রমাণ বর্তমান—

ক) "ধেই ধেই করে ছুটতে হবে যার তার সঙ্গে, তোমার আস্কারাতেই তো গোলায় গেল।"[২০] (তরঙ্গিনী)

খ) "মাথার কাপড় ফেলে রাজ্যির লোকের সঙ্গে পাটি পেড়ে গল্প 'হ্যা, হ্যা', করে হাসি, কে বা জানে আপন, কেবা জানে পর। যে আসছে তাকেই চা খাওয়ান জল খাওয়ান, আদর উথলে পড়ে। মেয়েমানুষ অত লোকমজানে হওয়া কি আর সুলক্ষণ?"[২১]

আঠারো বছর ধরে যে মমতা, শ্রদ্ধা ভক্তি ভালোবাসা, সুনাম অর্জন করে এসেছে বাড়ির বড়ো বৌ, মুহূর্তের অবিবেচনায় সমস্ত পুড়ে নষ্ট হয়ে গেল।

[ই] বিশ্বাস-অবিশ্বাসের দ্বন্দ্বে দাম্পত্যে ভাঙন, নারীর ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের প্রতিষ্ঠা :

ফুলের মতো একটি সম্পর্ক কীভাবে বিশ্বাস-অবিশ্বাসের দ্বন্দ্বে ঈর্ষায় মুহূর্তের মধ্যে ভেঙে চুরমার হয়ে যায়, ভেঙে চৌচির হয়ে যায় দাম্পত্যের নিবিড় বন্ধন, তারই চাক্ষুষ প্রমাণ এই স্তরে মূর্ত হয়ে ওঠে। যেমন—

ক) "সুধাংশু পিঠটা সরাইয়া লইল মাত্র, কথা কহিল না।"[২২]

খ) "বিরক্ত করো না, বাড়ির ভিতর যাও। হাত ছাড়াইয়া পিছন ফিরিয়া শুইল সুধাংশু।"[২৩]

মমতার অনেক অনুনয় বিনয়ের পরেও সুধাংশুর জবাব—

গ) "ওঘরে ঢোকবার প্রবৃত্তি আমার নেই, তোমার সঙ্গে কথা কইবারও নয়, যাও সরে যাও।"[২৪]

এরপর যখন মমতা অপরাধের কারণ শুনতে চাইল তখন সুধাংশু অকাট্য প্রমাণের উপর নির্ভরশীল হয়ে মুহূর্তে নিজের স্ত্রীকে অপরাধের মালা পরাতেবিন্দুমাত্র দ্বিধা করে না—

ঘ) "অপরাধের প্রমাণ ঘরে পুষে রেখে যে ন্যাকামির ভান করে, তার সঙ্গে তর্ক করবার রুচি আমার নেই। চালাকি শিখেছিলে বটে, তবে শেষরক্ষা হল না।"[২৫]

দীর্ঘ আঠারো বছরের সাংসারিক দাম্পত্য জীবনের শেষঘন্টাটি এভাবেই চিহ্নিত হয়ে গেল।হয়তো মনে হতে পারে ভিতর থেকে তরঙ্গিনীর এবং শেষ পর্যন্ত মা ও দেওরের ঈর্ষাও দাম্পত্য ভাঙনের মূল কারণ, কিন্তু বিষয়টিকে এত সহজ ভাবে ধরা যায় কী? আসলে লেখিকা একেবারে সংসার জীবনের সাদামাটা, সহজ সরল ঘটনার মধ্যে দিয়ে মানবজীবনের বৃহত্তর সমস্যাকে রূপদান করার চেষ্টা করেন। তাসের ঘর গল্পে তা আর একবার প্রমাণ হয়।বড়ো কথা ছোট করে বলার তিনি ওস্তাদ। আমাদের পরিচিত জীবন সত্যকে এমন প্রকৌশলে তুলে ধরার চেষ্টা করেন যে, মুহূর্তে প্রকাশিত হয়ে যায় চরিত্রের ভালোবাসার অন্তরালবর্তী ফাঁকি; মুহূর্তে খুলে যায় প্রকৃত মুখোশ, বেরিয়ে আসে মনের মধ্যে জমে থাকা আবিলতার গন্ধ। খুব কাছ থেকে দীর্ঘ আঠার বছরের সাংসারিক জীবনে মমতা যা কখনো বুঝে উঠতে পারিনি। অথচ সময়ের মুখোমুখি কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে দাঁড়িয়ে কোথাও আলগা হয়ে পড়ে সুধাংশুর বিশ্বস্ততার সে মুখোশ। তাই দীর্ঘ সময় ধরে যে সত্যটাকে বাড়ির বড়ো বৌ বিশ্বাস করে এসেছে,তার উদ্দেশ্যে একমাত্র সত্য মেজ বৌ এর কাছে বড়ো বৌয়ের সার্টিফিকেট এরকম—

"কোনটা সত্যি কোনটা মিথ্যে, বুদ্ধি দিয়ে বিচার করা সব সময় সহজ নয় মেজবৌ। এতদিন যাকে পরম সত্য বলে জেনে এসেছি, দেখছি কি মিথ্যেই সেটা। আজ যদি মিথ্যেটাই সত্যি হয়ে দাঁড়ায় ক্ষতি কি?"[২৬]

বিজলীল কথা মতো প্রকৃত সত্যটি সবার সামনে প্রকাশ করে মমতা হয়তো কলঙ্কিনী তকমা ঝেড়ে ফেলে পুনরায় সংসারে তার হৃতগৌরব ফিরিয়ে আনতে পারত, কিন্তু ধনুক থেকে একবার তীর নিক্ষেপ করলে সেই তীর যেমন পুনরায় শত চেষ্টা করলেও আর ধনুকে ফিরে আসে না, তেমনি 'অপমান যা হয় তা আর ফেরে না'। আর আঠার বছর ঘর করার পর মমতা সম্পর্কে একথা যাদের বিশ্বাস করতে বাঁধে না, তাদের কাছে সত্য প্রমাণ করা আর 'উলুবনে মুক্ত ছড়ানো' একই ব্যাপার। যে ভঙ্গুর ঘরখানা একটি ফুৎকারে ধূলি-গুড়ি হয়ে গিয়েছে, তার ওপর মমতার আর মমতা

নেই।তাই, মমতার মত ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যময়ী দৃপ্ত মহিলা যাওয়ার বেলায় নিজের স্বামীকে জানিয়ে যায় তাঁর আত্মপ্রতিষ্ঠার মর্মবাণী।

"এত বড়ো পৃথিবীতে একটা মেয়ে মানুষের ঠাঁই হয় কিনা সেটাই একবার দেখবো ঠিক করেছি।"[২৭]

একথা শুধু মমতার একার নয়, লেখিকা আশাপূর্ণা দেবীর কলমে আরও অসংখ্য নারীর; যারা সংসার নামক খাঁচার মধ্যে আবদ্ধ না থেকে বরং বাইরের আলোর পৃথিবীতে একটু ঠাঁই পেতে চায়। এভাবে পুরুষতান্ত্রিক সমাজের আবিলতাকে ত্যাগ করে মমতার মত নারীরা নিজেদের মত করে বাঁচতে চায়। 'তাসের ঘরের' মমতা চরিত্র এমনই এক স্পর্ধিত ব্যতিক্রম, 'খাঁচার পাখির আলোর গান'।

(৫)

"নারীকে আপন ভাগ্য জয় করিবার
কেন নাহি দিবে অধিকার
হে বিধাতা? " [মহুয়া / রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর]

নারীকে আপন ভাগ্য জয় করিবার কেন নাহি দিবে অধিকার, রবীন্দ্রকবিতায় উচ্চারিত নারীর এই বিজ্ঞাসা শুধু রবীন্দ্র যুগের নয়, আজও নারীর সম্মান, স্বাতন্ত্র্য ও অধিকার প্রতিষ্ঠা প্রসঙ্গে অত্যন্ত জরুরি। নারীর এই উচ্চকণ্ঠ প্রতিবাদ আর একবার উচ্চারিত হয়েছে 'তাসের ঘর' গল্পে, নারীত্বের অবমাননার বিরুদ্ধে মর্যাদার প্রতিষ্ঠায়। 'তাসের ঘর' সহজ ভাবের সহজ ভাবনার গল্প হলেও এর শেষাংশটি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। যেখানে আছে মমতার নিরবচ্ছিন্ন মানসিক যন্ত্রণা। আর এই যন্ত্রণার অনুঘটকরূপে কাজ করেছে সুধাংশুর নিজের স্ত্রীকে না চিনতে পারার অভিব্যক্তি। আসলে বাংলাদেশের সমাজ ব্যবস্থায় মমতার মত আধুনিকাদের কেউ চেনার চেষ্টা করে নি। চিনবে কী করে সমাজটা তো আজও পিতৃতান্ত্রিক চাঁদরে মোড়া।আর এই পিতৃতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থায় নারীর গৃহাশ্রমকে ব্যক্তিগত কাজ বলে গণ্য করার সুবাদে বৃহৎ সামাজিক উৎপাদন প্রক্রিয়া থেকে নারীকে বিচ্ছিন্ন করা হয়। নারীর দুর্ভাগ্যের চরম দিনে তার সম্মানের সঙ্গে বাঁচার অধিকার টুকুও স্বীকার করা হয়নি। সেখানে মনে করা হতো নারী শুধু রান্না-বান্না, হাতের কাজ ইত্যাদি নিয়েই থাকবে। 'তাসের ঘর' গল্পে মমতার শাশুড়ী যেন পিতৃতন্ত্রের রক্ষাকবজ। কারণ চরিত্রটিতে প্রথম পর্বে যে মাধুর্য ও সরলতা লক্ষ্য করা যায় শেষ মুহূর্তে ঘটে তার বির্বতন। সুশীলাবালা তাই কপালে করাঘাত করে বলে :

"আমি জানি ও মেয়ে একদিন সর্বনাশ ঘটাবে। মেয়েমানুষ অত বাচাল মাথার কাপড় ফেলে রাজ্যির লোকের সঙ্গে পার্টি পেড়ে গল্প, ...মেয়ে মানুষ অত লোকমজানে হওয়া কি আর সুলক্ষণ?" [২৮]

এই একই ভাবনার রসে জারিত তরঙ্গিনী ঠাকুরঝি, হিমাংশু ও সুধাংশুও।এদের চোখে নারী শুধু 'মেয়ে মানুষ' যার কোন মর্যাদা সমাজে থাকতে পারে না। এভাবে নারী যে পুরুষতান্ত্রিক বা পুরুষশাসিত সমাজ কর্তৃক আচরিত নানা বন্ধনের স্বীকার, গল্পে তারই প্রকাশ বর্তমান।বিষয়টি এভাবে দেখা যেতে পারে

ক] তরঙ্গিনী কেন্দ্রিক: নারীই নারীর শত্রু:

১) "তোমার বড় বৌমার হিসেব দিতে দিতে গেলাম। বোনাই-বাড়ি গিয়েছেন গো, বুনের দেওর আদর করে গাড়ি করে নিয়ে গেলেন।"[২৯]

২) "তবে আর কি, ধেই ধেই করে ছুটতে হবে যার তার সঙ্গে, তোমার আস্কারাতেই তো গোলায় গেল। বুকের পাটা কত।"[৩০]

খ] সুশীলাবালা কেন্দ্রিক: পিতৃতন্ত্রের রক্ষা কবজ—

১) "মেয়ে মানুষ অত বাচাল! মাথার কাপড় ফেলে রাজ্যির লোকের সঙ্গে পাটি পেড়ে গল্প হ্যা, হ্যা করে হাসি, কে বা জানে আপন, কে বা জানে পর। যে আসছে তাকেই চা খাওয়ান, আদর উথলে পড়ে। মেয়ে মানুষ অত লোকমজানে হওয়া কি সুলক্ষণ?"

২) "তবে মেয়ে মানুষকে বিশ্বাস নেই।"

গ] হিমাংশু কেন্দ্রিক : পিতৃতান্ত্রিক আভিজাত্য :

১) "দিদি, দিদি করে অত গলে পড়া চলবে না, বুঝলে? উনি যদি সাবধান না হন অগত্যা আমাকেই পথ দেখতে হবে।"[৩১]

২) "বিজলীর মুখ রাঙা হইয়া উঠিল, তবে আমাকেও ঘাড় ধরে বিদেয় করে দাও না, বিশ্বাস কি মেয়ে মানুষ বইতো নয়।"[৩২]

এ সমস্ত উদাহরণগুলি নারীর প্রতি পুরুষশাসিত সমাজের বেঁধে দেওয়া কিছু মানদণ্ডের সীমারেখাকে চিহ্নিত করে। যে সীমারেখার গণ্ডিকে অরঙ্গিনী ও সুশীলাবালার মত নারীরা আজও ত্যাগ করতে পারেনি। যাই হোক, মহাকালের নিয়মে কালের বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে নারীতার চেহারা নিল পাল্টিয়ে। তাই 'তাসের ঘর' গল্পের শেষাংশ নারীর আইডেন্টিটিকেখুঁজে নেওয়ার ছাড়পত্র। মমতা নারীত্বের মর্যাদা প্রতিষ্ঠার জন্য গৃহত্যাগ করেছে। যে সমাজে নারীর কাছে স্বামীই ধ্যান-জ্ঞান, সেখানে মমতার ব্যবহার আতি-শয্য মনে হতে পারে। কিন্তু এযেন নতুন আবহাওয়া। তাই মমতা নিজেকে সংসার নামক বরণডালার অতিরিক্ত পুষ্প মনে করতে পারেনি। পারলে সংসার ত্যাগ করতে পারত না। সে নিজেকে একটি স্বতন্ত্রসত্তা নারীরূপে দেখেছিল। তাই বিশ্বাস-অবিশ্বাসের দ্বন্দ্বে যখন নিজের আশ্রয় ভেঙে গেল, তখন সংসার ত্যাগ করা ছাড়া আর উপায় কী?

আসলে নারীর অন্তর্বেদনা ও পুরুষের আচ্ছন্ন বুদ্ধিতে নারীরই অবমাননার গল্প 'তাসের ঘর'। কিন্তু নারী সেই পুরুষের অবমাননা থেকে বেরিয়ে আসতে পেরেছে, পেরেছে মমতাও।মানসিকভাবে বিপন্ন ,রুদ্ধ জগতের মমতাও অন্য নতুন জগতের

সম্বন্ধের অন্বেষণে এক স্পর্ধিত ব্যতিক্রম। সে চায় নিজেকে পুরুষশাসিত সমাজের হাত থেকে মুক্ত করে মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হতে। তাই সংসার নামক খাঁচা থেকে বিদায় নেওয়ার পূর্বে 'সাংসারের মান সম্ভ্রম' রক্ষার্থের প্রশ্নে স্বামীকেই উত্তর দিয়ে বলতে পেরেছে, 'সম্ভ্রম' শুধু পুরুষতান্ত্রিক সমাজের একার নয় নারীরও :

ক) "কিন্তু ও জিনিসটা যে শুধু তোমাদের একলারই নেই, সেটাও ভুলতে পারছিনা।"[৩৩]

সংসার ত্যাগ করার পর মমতা কোথায় যেতে চায়? সুধাংশুর এহেন প্রশ্নের উত্তরে মমতা যা বলেছে,তা নারী চরিত্রের বির্বতনকেই চিহ্নিত করে:

খ) "এত বড়ো পৃথিবীটায় একটা মেয়ে মানুষের ঠাই হয় কি না সেটাই একবার দেখব ঠিক করেছি।"[৩৪]

ফলত এভাবেই মমতা চরিত্রে দেখাদিল বিদ্রোহ। আর কতদিন নারী খাঁচার ভিতর ডানা ঝাপটে ঝাপটে মরবে?মমতার মতোনারীদের চিরদিন খাঁচায় ধরে রাখা যাবে না, সময় হলে তারা খাঁচা ভেঙে বাইরের পৃথিবীর ডাকে সাড়া দেবেই। মিথ্যা অপবাদ দিয়ে মমতার মতো নারীদের জীবন ব্যর্থ করে দেওয়া যায় না। সে ব্যক্তিত্ব ও আত্মবোধের আলোকে সব ব্যর্থতা, কলঙ্ক অতিক্রম করে গেছে। মুক্ত জগতের মমতা তাই অন্য সম্বন্ধের অন্বেষণে বৃহৎ পৃথিবীর কাছে মেয়ে মানুষের একটু ঠাঁই হবে কিনা দেখতে চায়। আশাপূর্ণা দেবীর 'তাসের ঘর' নায়িকা চরিত্রের এই দেখা এক বিশেষ তাৎপর্যে ভরপুর, উজ্জ্বল অগ্নিশিখার দৃষ্টান্ত।

তথ্যসূত্র:

১) দেশ, সাহিত্য সংখ্যা, ১৩৮২, পৃঃ ৫১
২) পঞ্চাশটি প্রিয় গল্প, আশাপূর্ণা দেবী, সাহিত্যম, কলকাতা, ২০০৯, পৃঃ ২১১
৩) পঞ্চাশটি প্রিয় গল্প, আশাপূর্ণা দেবী, সাহিত্যম, কলকাতা, ২০০৯, পৃঃ ২১০
৪) তদেব, পৃঃ ২০৮
৫) তদেব, পৃঃ ২০৮
৬) তদেব, পৃঃ ২০৮
৭) তদেব, ২০৯
৮) তদেব, ২১০
৯) তদেব, ২১১
১০) তদেব, ২১১
১১) তদেব, ২০৬
১২) তদেব, ২০৬
১৩) তদেব, ২০৬

১৪) তদেব, ২০৬
১৫) তদেব, ২০৮
১৬) তদেব, ২০৮
১৭) তদেব, ২০৮
১৮) তদেব, ২০৮
১৯) তদেব, ২০৯
২০) তদেব, ২০৮
২১) তদেব, ২০৯
২২) তদেব, ২১০
২৩) তদেব, ২১০
২৪) তদেব, ২১০
২৫) তদেব, ২১০
২৬) তদেব, ২১১
২৭) তদেব, ২১১
২৮) তদেব, ২০৯
২৯) তদেব, ২০৮
৩০) তদেব, ২০৮
৩১) তদেব, ২০৮
৩২) তদেব, ২০৮
৩৩) আশাপূর্ণাদেবী বিশেষ সংখ্যা, সমকালের জিয়নকাঠি কলকাতা, ডিসেম্বর ২০০৯,
৩৪) আশাপূর্ণা দেবী সংখ্যা, কোরক সাহিত্য পত্রিকা, কলকাতা-৫৯, জানুয়ারী-২০০৯

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের ‘রানীরঘাটের বৃত্তান্ত’ : এক জীবনের অপচয়

নকুলচন্দ্র বাইন
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
দ্বিজেন্দ্রলাল কলেজ, কৃষ্ণনগর, নদিয়া

সারসংক্ষেপ: সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের উপন্যাস ও ছোটগল্পে প্রধানতঃ গ্রামবাংলার পরিবেশ, মানুষ ও মানবিকতার কাহিনি স্থান পেয়েছে। তাঁর ‘রানীরঘাটের বৃত্তান্ত’ গল্পে মানসিকভাবে অসুস্থ অতি সাধারণ নারী সুরেশ্বরী বা ‘সুরিখেপী ও তার গর্ভজাত অথচ সঠিক পিতৃপরিচয়হীন পুত্র সন্তান ফালতু’র কাহিনি রয়েছে। ঘটনাচক্রে মানুষের বিশ্বাস ও সংস্কারের সূত্রে মাথায় জট, কপালে উজ্জ্বল সিঁদুরের ফোঁটা, হাতে শাঁখা-নোয়া নিয়ে পাগলি সুরিখেপী ‘খেপী মা’ হয়ে উঠল। ময়রাবুড়ি এই সুরি ও তার সন্তানের দেখভালের দায়িত্ব নেয়। মায়ের মৃত্যুর পর ফালতু অন্যের কৃপায় কোনরকমে বেঁচে থাকে। সে বাসের খালাসী থেকে ড্রাইভার হয়, প্রেমে পড়ে কিন্তু পিতৃপরিচয়ের অভাবে সামাজিক স্বীকৃতি পায় না। সময়ের বহমান স্রোতের ঘূর্ণিপাকে আবর্তিত হ’তে হ’তে সে শেষ পর্যন্ত সমাজে অনেকের প্রিয় হয়ে উঠলেও সূক্ষ্ম বিচারে যেন ব্রাত্যই রয়ে যায়।
সূচক শব্দ: মুস্তাফা সিরাজ, রানীরঘাট, সুরিখেপী, পিতৃপরিচয়হীন, ফালতু, শাঁখা-নোয়া, ময়রাবুড়ি, ড্রাইভার, প্রেম।

মূল আলোচনা: ছোটগল্পকার সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের উপন্যাস ও ছোটগল্পে প্রধানতঃ গ্রামবাংলার পরিবেশ ও মানুষ বিশেষভাবে স্থান পেয়েছে। জন্মসূত্রে মুর্শিদাবাদ জেলার খোসবাশপুর গ্রাম ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলকে তিনি হাতের তালুর মতো চিনতেন। মানুষের সঙ্গে সহজ মেলামেশার সুত্রে তাঁর নিজস্ব জীবন-দর্শন গড়ে উঠেছিল। তিনি বিশ্বাস করতেন মানুষ প্রকৃতির সন্তান এবং প্রকৃতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। সময়ের সুতোয় বাঁধা মানুষের জীবন পরিবর্তিত হয় সময়ের নিজস্ব নিয়মে। সেই নিয়মে কেউ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে, কেউ বা হয় অবহেলিত।

‘নির্বাসিত বৃক্ষে ফুটে আছি’ রচনায় তিনি জানিয়েছেন কীভাবে গ্রামবাংলা তথা মুর্শিদাবাদের বিশেষ একটি অঞ্চলের মানুষের জীবন তাঁর গল্প ও উপন্যাসে স্থান পেয়েছে। “এলাকার মানুষের মধ্যে আদিম স্বাধীনতাবোধের যে আবেগ ছিল, তা ইচ্ছে

করেই মন পেতে ভরে নিয়েছিলাম। প্রকৃতিসঞ্জাত এই স্বাধীনতার স্বাদ মানুষকে প্রেমিক করে, দার্শনিক করে, আবার যোদ্ধাবেশধারী হত্যাকারীও করে। ... এ জীবন আমি দেখেছি। ভালবেসেছি। তাদের কথাই লিখতে চেয়েছি।"[১]

যে জীবন ও মানুষ হাজার ঘটনা ও অগণিত মানুষের ভিড়ে হারিয়ে যায়, সিরাজ সেই জীবনের মালা গেঁথেছেন। সমাজের উপেক্ষিতরা সম্মানের স্থায়ী আসন লাভ করেছে তাঁর রচনায়। মুক্তমনা এই লেখক আজীবন মানবিকতাকেই প্রতিষ্ঠা দান করেছেন। 'রানীরঘাটের বৃত্তান্ত' গল্পেও তাঁর এই মনোভাবের সার্থক প্রতিফলন ঘটেছে।

'রানীরঘাটের বৃত্তান্ত' গল্পে মানসিকভাবে অসুস্থ এক অতি সাধারণ নারী সুরেশ্বরী বা 'সুরিখেপী ও তার গর্ভজাত পিতৃপরিচয়হীন বা বলা ভালো একাধিক পিতৃত্বের দাবীতে দিশেহারা পুত্র সন্তান ফালতু'র কাহিনি রয়েছে। ফালতু শব্দটির অর্থ 'একেবারেই গুরুত্বহীন'। "ফালতু—যা অতিরিক্ত, অধিক অনাবশ্যক। রানীরঘাটে সে বাড়তি সংযোজন, আবশ্যকতাহীন। ... নামের মধ্যেই আছে একটা অবজ্ঞার বাতাবরণ—জন্ম থেকেই সে হেলাফেলার বস্তু। তার পিতার কোনও সঠিক অস্তিত্ব নেই। আর সুরিখেপীর মতোই রানীর ঘাটের সকল পুরুষই ফালতুর বাবা।"[২]

ফালতু'র জন্ম, বেড়ে ওঠা, প্রেম, মানুষকে নিঃশর্ত ভালোবাসা এবং সব শেষে একা হয়ে যাওয়া যেন পূর্বনির্ধারিত ভবিতব্য। একটি সৃষ্টি তথা জীবন সুনির্দিষ্ট সামাজিক পরিচয়ের অভাবে কীভাবে অপচয়িত হয়, তা অত্যন্ত সহানুভূতির সঙ্গে দেখিয়েছেন লেখক। ফালতু'র জীবনকাহিনির সূত্রে সমাজের ভালো-মন্দ দু'দিক তুলে ধরেছেন সিরাজ। যে বা যারা সুরিখেপীর প্রতিরোধহীন অসহায়তার সুযোগ নিয়ে লালসা চরিতার্থ করেছে, সে বা তারা এই সমাজের বাইরের কেউ নয়, আবার ময়রাবুড়ি, ইসমাইল ড্রাইভারের মতো যারা সুরিখেপী ও তার সন্তানকে মানবিক স্নেহে আগলে রেখেছে তারাও এই সমাজেরই মানুষ।

সিরাজের এই গল্পের সূচনা হয়েছে রূপকথার আঙ্গিকে। রূপকথায় যেমন বলা হয়, 'বহুদিন আগের কথা', তেমনি এখানে লেখক সূচনাবাক্যে লিখেছেন, "সে অনেক বছর আগের কথা।" এরপরই নিরাসক্ত ভাবে বর্ণিত হয়েছে ভাগীরথীর দুই তীরকে খেয়ানৌকার পারাপার দিয়ে বেঁধে রাখা একটি ঘাটের কথা। এই ঘাটেরই নাম রানীর ঘাট। নদীর ওপারের শহরের সঙ্গে এপারের গ্রামাঞ্চলের যোগ রক্ষিত হয় এই ঘাটের দ্বারা। তাই গ্রামের মেয়েদের চোখে শহরের ঘোর লাগা ভাবটুকুও চোখে পড়ে। এভাবে গল্পে এই ঘাটের গুরুত্ব সম্পর্কে প্রথমেই জানিয়ে দেওয়া হয়েছে।

স্বল্প কয়েকটি রেখায় রানীরঘাটের রূপচিত্র অঙ্কিত হয়েছে, "একটা বাসস্ট্যাণ্ড ছিল। কয়েকটা ছোটখাট দোকান ছিল। রিকশ খান পাঁচেক। এক সময় ঘোড়ার গাড়িও ছিল। সারাদিন বাইরের মানুষের ভিড়ে হইচই বড় বেশি। তারপর সন্ধ্যা হতে না হতে ভিড় কমে যায়।"[৩]

কাহিনির এই আশ্রয়-বৃত্ত রচনার পর লেখক দেখিয়েছেন যে, এই ঘাট মায়ের মতো কোলে আশ্রয় দিয়েছে সুরেশ্বরী বা সুরিখেপীকে। এই অসহায়া অবলা নারী মানুষের আদিম লালসা বা পাশব-প্রবৃত্তির শিকার হয়েছে; তার গর্ভে সন্তান এসেছে। এই বিবরণ থেকেই গল্পের মূল কাহিনি শুরু হয়েছে। ময়রাবুড়ি পাগলি মেয়েটির প্রতি সহানুভূতিসম্পন্না। ময়রাবুড়ি এই অসহায় মেয়েটির দেহ ভোগ করা মানুষরূপী পশুকে অভিশাপ দিয়েছে, "মা-গঙ্গার চোখের সামনে এই পাপ। সইবে ভেবেছেন? দেখুন না কী হয় পেলয়কাণ্ড! রানীরঘাট ভেসে যাবে। ধুয়েমুছে যাবে।"[৪]

ময়রাবুড়ির এই ভবিষ্যৎ বাণী গল্পের পরিণতির সূত্রটি ধরিয়ে দিয়েছে। আমরা দেখতে পাই নদীর উপর ব্রীজ তৈরি হবার পর রানীরঘাটের গুরুত্ব কমতে থাকে। অনেকেই এখান থেকে ব্যবসা গুটিয়ে নদীর ওপারে যেখানে যাত্রী ওঠানামার বাসস্ট্যাণ্ড হয়েছে, সেখানে দোকান দিয়েছে; যাদের পক্ষে তা সম্ভব হয়নি, তাদেরই দু'একজন রয়ে গেছে রানীরঘাটে। এক সময় যে ঘাট মানুষের ভিড়ে গম্‌গম্‌ করত, এখন সেখানে হাতে গোনা মানুষের আনাগোনা।

কাহিনির চলমান ধারায় সুরিখেপীর সন্তানের জন্ম দেওয়া, মাথার চুলে জট ধরা, তার জন্য 'ছফুট-চারফুট-সাতফুট' মাপের তৈরি করা, ঘরে বসে থাকা সুরি'র 'ও বাবারা, ও বাবারা' ডাক শুনে অন্যের পয়সা ছুঁড়ে দেওয়া ইত্যাদির সাবলীল বর্ণনায় সিরাজ আকৃষ্ট করে রেখেছেন পাঠককে। দেখতে দেখতে সুরিখেপী 'বিশ্বাসী'দের চোখে হয়ে গেল 'খেপী মা'। মানুষের বিশ্বাস ও সংস্কারের সূত্রে সুরির এই উত্তরণ বেশ বাস্তব সম্মত। মাথায় জট, কপালে উজ্জ্বল সিঁদুরের ফোঁটা, হাতে শাঁখা-নোয়া—দেখলেই মনে হয় যেম রানীর ঘাটে গজিয়ে গেল এক দেবী। পাগলি সুরিখেপী 'খেপী মা' হয়ে উঠল।

শিবরাম চক্রবর্তী'র 'দেবতার জন্ম' গল্পের মতো 'রানীর ঘাটের বৃত্তান্ত' গল্পে হয়েছে 'দেবী'র জন্ম। অনেকে অনেক আশা নিয়ে সুরি খেপী'র কাছে আসতে থাকে। যে নারী নিজেকে রক্ষা করতে পারে না, সে অন্যের সমস্যার সমাধান কীভাবে করবে তা নিয়ে কারও কোনও মাথাব্যথা নেই।

একদিকে সুরিখেপীর দেবী'ত্বে উত্তরণ অন্যদিকে তার গর্ভজাত সন্তানের পিতা কে, তা নিয়ে অনুসন্ধান জারি রইল। মানুষ যে সহজে কোন রসাল সংবাদ ভুলতে পারে না, তার প্রমাণ দিয়েছেন লেখক। রানীরঘাটের মানুষ একসময় ধরেই নেয়, এ ঘটনা ঘটিয়েছে বাইরের কোনও লোক। রানীরঘাটের আটচালায় রাতের আশ্রয় নেয় বিভিন্ন জায়গা থেকে আসা পথিক, গাড়োয়ান, ভিখিরি, ফকির, সন্ন্যাসী—সব ধরনের মানুষ। এদের মধ্যে কার মাথায় যে আদিম লালসার 'চিহরিপোকা' কামড়েছিল, তা বলা কঠিন।

কাহিনির সময়ভিত্তির বিবর্তন বোঝাতে গিয়ে লেখক পরপর ময়রাবুড়ির মৃত্যু, সুরিখেপীর মৃত্যুর উল্লেখ করেছেন। কনকনে শীতে ময়রাবুড়ী গঙ্গা পায়, আর এক গঙ্গাপুজোর মেলার সময় খুব জল-ঝড়ের রাতে সুরিখেপী আচমকা কাপড়-চোপড়ে বমি করে ভোররাতে 'ঠাণ্ডা আর নীলবর্ণ' হয়ে মারা যায়।

এরপর কাহিনিতে এককভাবে এসেছে সুরিখেপীর ছেলে ফালতু'র কথা। রানীরঘাটের মানুষের যৌথ তত্ত্বাবধানে বড় হয়ে তার বাসের ড্রাইভার হয়ে ওঠা, টুকটুকির সঙ্গে প্রেম, জগন্নাথের পিতৃত্বের দাবিতে সেই প্রেম ব্যর্থ হয়ে যাওয়া, টুকটুকির আত্মহত্যা, সমাজের বৃহত্তর বৃত্তে পরমাত্মীয়ের মতো অন্তর্ভুক্তি সত্ত্বেও ফালতুর মানসিক নিঃসঙ্গতা—সব কিছুই শিল্পসম্মতভাবে রূপায়িত হয়েছে।

'রানীরঘাটের বৃত্তান্ত' গল্পে উল্লেখযোগ্য এক চরিত্র সুরেশ্বরী বা 'সুরিখেপী'। তার আসল পরিচয় কি তা বলা যায় না। এই খেপী বা পাগলি রানীরঘাটের আটচালায় আশ্রয় নিয়েছে। সে নিজের নোংরা ছেঁড়া শাড়িটা সামলাতে পারে না, কিন্তু মাথায় ঘোমটা থাকবেই। তার চেহারা আহামরি কিছু নয়, মুখটা ছিল গোলগাল, নাক সরু বেঁটে, নিচের ঠোঁটটা একটু পুরু। সারা গায়ে থলথলে মাংস; ময়রাবুড়ীর কথায় 'সাতশো শ্যালশকুনেও খেয়ে শেষ করতে পারবে না'। নজরে পড়ার মতো চুল ছিল সুরিখেপীর মাথায়। সে কারও কাছে কিছু চাইত না, শুধু 'ও বাবারা', 'ও বাবারা' বলে ডাকত ও মাটিতে থাপ্পড় মেরে সেই হাত কপালে ঠেকাত। অভাগিনীর কপাল ধুলায় ধূসর হয়ে যেত।

ময়রাবুড়ি ছিল বলে সুরি কিছুটা মানুষের মতো বাঁচতে পেরেছে। বুড়ি তাকে না ছুঁলেও নদীর জলে নিয়ে বসিয়ে দিয়েছে। সে নিজে নিজেই জল ছিটিয়ে কোনরকমে গা ভিজিয়েছে। বুড়ির পরামর্শে হাত দিয়ে বুক ঢেকে লুব্ধ দৃষ্টির আড়াল করেছে। এমন সুরি প্রবল বর্ষার এক রাতে আটচালায় টুকটুকে পুত্রসন্তানের জন্ম দেয়। সে মা হলো, কিন্তু মাতৃত্বের বোধশক্তি রহিত। তার সন্তান জন্মের আনন্দের অজুহাতে রানীরহাটে

'ফিস্টি' হয়েছে। ময়রাবুড়ি তাকে চান করিয়ে এনে দূর থেকে মাথার চুলে একবাটি নারকোল তেল ঢেলে দিলে ধুলোবালির দৌরাত্ম্যে সেই একরাশ ঘন চুল অল্প সময়ের মধ্যে জটের রূপ নিয়েছে। ময়রাবুড়ি তাকে সিঁদুর পরিয়ে দিয়েছে। শম্ভু মাঝি শাঁখা পট্টি থেকে শাঁখা ও নোয়া এনে দিয়েছে। মাথায় জটা, কপালে সিঁদুর হাতে শাঁখা-নোয়ায় সুরিখেপীর রূপ আরও খোলতাই হয়েছে। সেই রূপ দেখে ময়রাবুড়ির 'সাধ আর মেটে না'। এই রূপের বাড়তি কিছু সুবিধা পেয়েছে সুরি। বাইরে থেকে আসা ধর্মভীরু মানুষের ভক্তি আদায় করে নিয়েছে এই জটাধারী পাগলী। সে অচিরেই 'খেপী মা' হয়ে উঠেছে। ভক্তির বশে মানুষ যে পয়সাগুলি ছুঁড়ে দিত সুরি সেই পয়সা আবার দাতার দিকেই ছুঁড়ে দিত। অন্যরা তা কুড়িয়ে এনে তার আঁচলে বেঁধে দিত।

ফালতু একটু বড় হ'তেই এক গঙ্গাপূজার দিনে সুরিখেপীর 'গঙ্গাপ্রাপ্তি' ঘটেছে। সে নিজের উত্তরাধিকারী রেখে বিদায় নিয়েছে। সিরাজ এই চরিত্রটিকে পরিস্থিতির শিকার হিসেবে দেখিয়েছেন। মানুষের পাশবিকতার পাশাপাশি মানবিকতার দিকটিও উন্মোচিত হয়েছে সুরিকে কেন্দ্র করে। কে তাকে লালসার শিকার বানিয়েছে, তা কেউ জানে না, তবে রানীরঘাটের মানুষ তাকে দূরে সরিয়ে রাখেনি; পরম আদরে তাকে ও তার সন্তানকে আগলে রেখেছে। বর্তমান জটিল যান্ত্রিক জীবনে এমন মানবিকতার চিত্র পরম পাওয়া।

সিরাজ ময়রাবুড়িকে কেন্দ্র করে মানবিকতার ভিন্ন গল্প শুনিয়েছেন। এই বৃদ্ধা রানীরঘাটে তেলেভাজা বিক্রি করে। সে দরিদ্র হলেও মনের দিক থেকে ধনী। অসহায় সুরেশ্বরী পাগলির জন্য তার হৃদয় কাঁদে। সে মায়ের মতো যত্ন নিয়েছে এই অনাথিনীর। এই পাগলি কোন এক নররূপী পিশাচের লালসার শিকার হয়ে গর্ভবতী হলে ময়রাবুড়ির মনে হয়েছে যে, মানুষের এই পাপেই রানীর ঘাট একদিন ভেসে যাবে--ধুয়েমুছে যাবে; এই ঘাটের অস্তিত্ব থাকবে না। তার এই ভবিষ্যৎ বাণী গল্পের পরিণতির সূত্রটি ধরিয়ে দিয়েছে। আমরা দেখতে পাই নদীর উপর ব্রীজ তৈরি হবার পর রানীরঘাটের গুরুত্ব কমতে থাকে। অনেকেই এখান থেকে ব্যবসা গুটিয়ে নদীর ওপারে যেখানে যাত্রী ওঠানামার বাসস্ট্যাণ্ড হয়েছে, সেখানে দোকান দিয়েছে; যাদের পক্ষে তা সম্ভব হয়নি, তাদেরই দু'একজন রয়ে গেছে রানীরঘাটে।

সুরিখেপীর প্রতি ময়রাবুড়ির বড় মায়া। সে এই পাগলীকে জোর করে কঞ্চির ভয় দেখিয়ে চান করায়। সুরি চিৎকার করলে আক্ষেপ ও ক্ষোভ প্রকাশ করে তাকে চুপ ক'রে থাকতে বলে; গলায় গরম তেল ঢেলে দেওয়ার ভয় দেখায়। কখনও বা দূর

থেকে সন্তানের জন্মদাত্রী সুরির মাথায় তেল, কপালে সিঁদুর, হাতে শাঁখা নোয়া পরিয়ে দিয়ে স্নেহময়ী অভিভাবিকার দায়িত্ব পালন করেছে সে।

সুরিকে কেন্দ্র করে ময়রাবুড়ির জননীসত্তার জাগরণ ঘটেছে। এক 'মা' আর এক মা-এর আদর-যত্নের ভার নিয়েছে। সে জানে 'শ্যালকুকুরে' ভ'রে গেছে জগত। তাই অন্যের লালসার নজর থেকে যতখানি সম্ভব সুরিকে আগলে রেখেছিল সে। হঠাৎ করেই এক শীতে ময়রাবুড়ি এ পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করে।

রানিরঘাটের বৃত্তান্ত গল্পের প্রধান চরিত্র হয়ে উঠেছে পাগলি সুরেশ্বরীর ছেলে ফালতু। মা বেঁচে থাকতেও সে অনাথের মত বড় হয়েছে। কারণ তার পিতৃপরিচয় নেই। একটু একটু ক'রে হাঁটতে ও কথা বলতে শেখার পর থেকেই সে রানীরঘাটের সবাইকে 'বাবা' বলে ডাকত। তার মা'কে দেখেই সে এমনটা শিখেছিল। লেখক দেখিয়েছেন যে ফালতুর প্রকৃত পিতা কে, তা কেউ জানে না; তার সবাইকে 'বাবা' বলা যেন এক নাটকীয় পরিহাস। এই ছোট্ট শিশুটিকে অনেকে হালকা ভাবে আদরের ধমক দিয়েছে, কিন্তু কেউ কখনও গায়ে হাত তোলেনি; বরং অন্যে হাত তুলতে এলে সারা রানীরঘাট ঝাঁপিয়ে পড়ত।

ফালতু জীবনের কিছু বুঝে না উঠতেই মাতৃহীন হয়েছে। খেপীর মৃত্যুর পর তাকে কেউ মায়ের কথা জিজ্ঞাসা করলে এই অবোধ বালক শম্ভু মাঝির শিখিয়ে দেওয়া ছড়া কেটেছে, "হো হো! কেপী গেচে পুলতে/ ছসেল পতোল তুলতে।" মা-হারা এই শিশু পেটের দায়ে বাসের ক্লিনার হয়ে জীবন শুরু করে একসময় ড্রাইভার ইসমাইলের বদান্যতায় ড্রাইভার হয়েছে।

অনেকেই ফালতু'র পিতৃত্বের দাবি নিয়ে উপস্থিত হয়েছে। ইব্রাহিম হাজি, ঘাটোয়ারি, মদন কন্ডাকটর, চাওয়ালা জগন্নাথ—সবাই। শেষ পর্যন্ত ফালতু 'গর্জন কিংবা হাহাকার' করে বলেছে, "কী বাবা দেখাচ্ছ আমাকে সবাই মিলে? রাণীরঘাটের মড়াখেকো শেয়ালকুকুরগুলো ফালতুকে বাবা দেখাচ্ছে। আমার বাবার দরকার নেই। হুঁ, বাবা দেখাচ্ছে শালারা! আরে, আমার হাতে যে স্টিয়ারিং ধরে দিয়েছে, সেই আমার বাবা।"[৫]

রানীরঘাটের চায়ের দোকানদার জগন্নাথের মেয়ে টুকটুকির সঙ্গে তার প্রেম হয়েছে, তারা গঙ্গার চরে মিলিতও হয়েছে। পরে টুকটুকির বাবা জগন্নাথ যে কোনও কারণেই হোক হঠাৎ ফালতুকে নিজের ঔরসজাত পুত্র বলে স্বীকার করায় এই প্রেমিক-প্রেমিকার সম্পর্ক জটিল মোড় নিয়েছে। নিজের 'ভাই'য়ের সঙ্গে নদীর চরে মিলিত

হবার অপরাধবোধে টুকটুকি বিষাক্ত করবী ফল অথবা ধুতুরা ফল শিলে বেটে খেয়ে আত্মহত্যা করেছে।

টুকটুকির মৃত্যুতে ফালতু একা হয়ে গিয়ে মানুষকে আরও বেশি করে আত্মীয়ের মতো আঁকড়ে ধরার চেষ্টা করেছে। ফালতুর জীবন 'ফালতু' হ'তে হতেও যেন এভাবেই বেঁচে থাকার অবলম্বন খুঁজে নিয়েছে। মানবিক উত্তরণের এমন বিবরণে গল্পটি শিল্প সমৃদ্ধ রূপ লাভ করেছে। ফালতু তার অবহেলিত, উপেক্ষিত জীবনের বৃত্ত অতিক্রম করে সমষ্টির ভালোবাসার মধ্যে নিজেকে আবিষ্কার করেছে। পথের দুধারে যত গ্রাম আছে, যত মানুষ আছে সবাই তার মোটরগাড়ি চলা থেকে সময় আন্দাজ করে। তার বাস চলে পুরুন্দরপুর মনসুরগঞ্জো, বিনোটি মহিমাপুর। পথের পরিচয়ে কেউ তার 'বুড়ীমা' কেউ 'বোন', কেউ 'বউঠান'। ফালতুর কাছে তাদেরও আবদারের সীমা নেই, "ওরা বলবে—ফালতুদার খবর ভাল তো? বাবা ফালতু, দুটো মাথা ধরার বড়ি এনে দিস বাবা, আমার সোনার বাবা! বিনোটির মাস্টারমশাই স্কুল থেকে দৌড়ে বেরিয়ে বলবেন—ফালতু! প্রেসক্রিপশনটা নিয়ে যা বাবা! এই নে টাকা। বেশি লাগলে দিস, দোব'খন।"[৬]

জীবনের উপর ফালতুর সব অভিমান ও রাগ এভাবেই চাপা পড়ে গতিতে ছুটে চলা বাসের চাকার তলায়। সে পৃথিবীকে তার গাড়ির চাকায় মাড়িয়ে দিয়ে যেন তার প্রতি অবিচার ও অবহেলার শোধ নেয়। ফালতুকে কেন্দ্র করেই যেন এক অভাগিনী মায়ের গল্প অন্য মাত্রা পেয়েছে। মা সুরিখেপীর মতো ফালতুও একা। তার সেই একাকীত্ব সবাই মিলে ভুলিয়ে দিতে চায়, কিন্তু গোপনে হৃদয়ের কোথায় যেন চোরা রক্ত ঝরে পড়তে থাকে। ফালতুর পরিণাম যেন এক ব্রাত্য, পরিচয়হীন জীবনের ধারাবাহিকতাকেই মান্যতা দিয়েছে। গল্পের নামকরণ করা হয়েছে ঘাটের নামে কিন্তু মূল কাহিনির কেন্দ্রে রয়েছে সুরিখেপী ও তার সন্তান ফালতু। যারা জীবনের মূল স্রোতে রয়েছে, তাদের দৃষ্টিতে এক পাগলী ও তার পিতৃপরিচয়হীন সন্তান তো সত্যিই 'ফালতু'; জীবনের বড় অপচয়।

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ এই গল্পে সামান্য একটি ঘটনা ও তুচ্ছ এক জীবনকে অনন্ত সময় ও মহাজীবনের সঙ্গে জড়িয়ে দেবার চেষ্টায় সফল হয়েছেন। এক ভিন্ন সামাজিক বৃত্তের কাহিনি এখানে অন্য মাত্রা পেয়েছে। আদিম লালসার কাছে নতি স্বীকার করা কিছু মানুষের অসংযমী আচরণ সুরিখেপী ও ফালতুর জীবনকে অন্য খাতে প্রবাহিত ক'রে দিয়েছে। "ফালতুর একাধিক পিতৃপরিচয় উদ্ঘাটনের মধ্য দিয়ে

একঝাক মানুষের লকলকে লালসার বিন্দু উদঘাটিত। কিন্তু মানুষ তো আসলে তাই। অন্ধকার আর জৈব দাবির কাছে নতজানু, অসহায়ত্বের সুযোগসন্ধানী।"[৭]

সিরাজের গল্পের প্রাণসম্পদ হলো জীবন সম্পর্কে তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা। গ্রামাঞ্চলে মানুষে মানুষে সম্পর্ক, তাদের বিশ্বাস, বিনোদন, সার্বিক যাপন সবকিছুই নিখুঁতভাবে ধরা পড়েছে সিরাজের সূক্ষ্ম বীক্ষণে। 'রানীরঘাটের বৃত্তান্ত গল্পে কালের প্রভাবে নিয়ন্ত্রিত ও বিচলিত মানুষকে তুলে এনেছেন তিনি। সময় এখানে চরিত্রের মান্যতা পেয়েছে। এই সময়ের বহমান স্রোতে কত মানুষ অনাবশ্যক বস্তুর মতো ভেসে যায়, তার প্রমাণ ফালতু।

তথ্যসূত্র :

১. 'নির্বাসিত বৃক্ষে ফুটে আছি' : সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ, 'ঐক্য', সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ সংখ্যা, সম্পাদক- গৌরীশঙ্কর সরকার, অক্টোবর ২০১৩, পৃষ্ঠা-৩১)

২. 'স্বতন্ত্র ধারার গল্পকার সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ'—অর্পিতা মণ্ডল, 'সমকালের জিয়নকাঠি', সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ বিশেষ সংখ্যা, সম্পাদক-নাজিবুল ইসলাম মণ্ডল, জুলাই-ডিসেম্বর ২০১৩, পৃষ্ঠা-২৬২)

৩. সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ – গল্প সমগ্র (৩য় খণ্ড), করুণা প্রকাশনী, কলকাতা-৯, ১লা বৈশাখ, ১৪২১, পৃষ্ঠা- ১৫৪-১৫৫

৪. তদেব, পৃষ্ঠা-১৫৫

৫. তদেব, পৃষ্ঠা-১৬৭

৬. তদেব, পৃষ্ঠা-১৬৮

৭. সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের গল্প : রাঢ় বাংলার প্রকৃতি ও মানুষের চিত্রকল্প – নূর কামরুন নাহার, 'ঐক্য', সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ সংখ্যা, সম্পাদক- গৌরীশঙ্কর সরকার, অক্টোবর ২০১৩, পৃষ্ঠা-৪০১)

সুকুমার রায়ের 'আবোল-তাবোল': শতবর্ষে ফিরে দেখা

পীরুপদ মালিক
সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
রবীন্দ্র মহাবিদ্যালয়, চাঁপাডাঙা, হুগলি, পশ্চিমবঙ্গ

সারসংক্ষেপ: সুকুমার রায় সাহিত্যের বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে সাফল্য লাভ করেছেন তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছড়া। এই ছড়া থেকে কবিতা হয়ে ওঠা বা ছড়া-কবিতার গ্রন্থ 'আবোল তাবোল'। গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় আজ থেকে প্রায় একশ' বছর আগে অর্থাৎ ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দে। সুকুমার রায় যতই স্বীকারোক্তি করুন যে, আবোল তাবোল ছোটোদের জন্য লেখা বই বাস্তবে তা কিন্তু নয়, এর অনেক কবিতায় ক্রান্তদর্শী সুকুমারের পরিচয় পাওয়া যায়। পাশ্চাত্য সাহিত্যে লুইস ক্যারল, এডওয়ার্ড লিয়ার যে অদ্ভুত জগৎ গড়ে তুলেছিলেন, আমাদের দেশে সুকুমার রায় সেই জগতের প্রথম এবং সার্থক প্রতিভূ। 'আবোল তাবোল' এর প্রায় প্রত্যেকটা ছড়া আমাদের মুখস্থ। কিন্তু বড়ো হয়ে যখন ফিরে পড়ার চেষ্টা করি তখন 'আবোল তাবোল' আমাদের চোখের সামনে এক অন্য জগৎ খুলে দেয়। সমগ্র আবোল তাবোল জুড়েই আছে লেখকের হাল্কা কথার আড়ালে গভীর কথা বলার এক নিজস্ব প্রকাশ-রীতি, যা আমরা অনুক্ষণ পর্যবেক্ষণ করতে পারি। আসলে এই আপাত আজগুবি ও অসম্ভব কল্পনা তাঁর সাহিত্যে নির্মোকের ভূমিকা পালন করেছে।

সূচক শব্দ : সুকুমার রায়, আবোল তাবোল, খেয়াল রস, উদ্ভট জগত, ননসেন্স।

বাংলা শিশু-কিশোর সাহিত্যে তিন পুরুষ ধরে রাজত্ব করেছেন রায়চৌধুরী পরিবার যা পরে রায় পরিবার নামে খ্যাত। এই পরিবারে দ্বিতীয় পুরুষ হিসেবে জন্মগ্রহণ করেন সুকুমার রায় ৩০ শে অক্টোবর, ১৮৮৭ খ্রিস্টাব্দে মধ্য-কলকাতার ১৩ নং কর্নওয়ালিস স্ট্রিটে। পিতা উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, মাতা বিধুমুখী দেবী। এই পরিবারে প্রথম থেকেই প্রতিভার অভাব ছিল না। উপেন্দ্রকিশোরের সতীর্থ প্রমদাচরণ সেন প্রথম সার্থক শিশু-পত্রিকা 'সখা'(১৮৮৩) প্রকাশ করেন। এই পত্রিকাতেই উপেন্দ্রকিশোরের সাহিত্যচর্চার হাতেখড়ি হয়। তারপর বিভিন্ন পত্র-পত্রিকাতে নিয়মিত লিখতেন। তবে পেশা হিসেবে তিনি ফটোগ্রাফি চর্চা আরম্ভ করেন। তাঁর তোলা কয়েকটি ফটোগ্রাফ সেকালে যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেছিল। পরে বিদেশ থেকে 'হাফটোন' ও লাইন ব্লকে ছাপার যন্ত্রপাতি আনিয়ে তিনি প্রতিষ্ঠা করেন 'ইউ. রায় অ্যান্ড সন্স'। এই প্রতিষ্ঠান থেকেই প্রকাশিত হয় শিশু-কিশোরদের উপযোগী পত্রিকা 'সন্দেশ' যা বাংলা শিশু সাহিত্যের জগতে এক মাইল ফলক। এ হেন পরিবারেই উপেন্দ্রকিশোরের দ্বিতীয় সন্তানরূপে জন্মগ্রহণ করেন সুকুমার রায়। ক্রমশ পারিবারিক শিল্প-সংস্কৃতির ঐতিহ্যে ধীরে ধীরে বেড়ে ওঠেন। সাকুমার রায়ের বাল্যশিক্ষা শুরু হয়েছিল 'ব্রাহ্মবালিকা

শিক্ষালয়'-এ। মেয়েদের স্কুল হলেও বারো বছর বয়স পর্যন্ত ব্রাহ্মবালকেরা পড়তে পারত। ছোটো থেকেই ব্রাহ্মসমাজের নানা অনুষ্ঠানে সুকুমার রায় অংশগ্রহণ করতেন। আট বছর বয়সে তাঁর প্রথম রচনা 'নদী' কবিতা প্রকাশিত হয় শিবনাথ শাস্ত্রী সম্পাদিত 'মুকুল' পত্রিকায়।

সুকুমার রায়ের জীবনে শিল্পী পিতার প্রভাব অনেকখানি। উপেন্দ্রকিশোরের ছবি, গল্পে, সুকুমার রায়ের রচনায় যে সহজ, অনায়াস, সরল সুর ছিল তার মূলে ছিল তাঁদের পূর্বপুরুষদের গভীর পাণ্ডিত্য, রসবোধ এবং সংগীত প্রতিভা। সুকুমার রায় প্রিন্টিং ও ফটো প্রসেসিং শিল্পে উচ্চশিক্ষা লাভের উদ্দেশ্যে বিলেত যাত্রা করেন। সেখানে থাকাকালীন পিতা উপেন্দ্রকিশোর কলকাতায় 'সন্দেশ'(১ম প্রকাশ মে, ১৯১৩) পত্রিকা প্রকাশ করেন। এর কিছুদিন বাদে সন্দেশের পাতায় আবির্ভাব ঘটলো সুকুমারের। তবে লেখক হিসেবে নয়, চিত্রকর হিসেবে। ছবির পর লিখতে শুরু করেন মজার মজার গল্প ও কবিতা। সুকুমার রায়ের সাহিত্য জীবনের মূল পর্ব ছিল ১৩২১-১৩৩০ বঙ্গাব্দ পর্যন্ত। হয়তো সেই সময় দেশের অনেক নেতা 'দেশহিতে'র নামে নানা অসংগতিপূর্ণ কার্যকলাপ করছিলেন, স্বাধীনতা আন্দোলনও প্রায় স্তিমিত হয়ে গিয়েছিল, তখন হিতলাভ হচ্ছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের। সেই সময় এইসব আজগুবি, উদ্ভট দিকগুলোকে চেনবার জন্য তাঁর 'আবোল তাবোল' লেখার মধ্য দিয়ে নতুন পদ্ধতি গ্রহণ করেছিলেন। আবার এমনও হতে পারে যে, নিয়মিত লেখালেখি, ছবি আঁকা, ক্লাব সংগঠনের নিত্য নৈমিত্তিক কাজের পাশাপাশি ব্রাহ্ম সমাজের গুরুদ্বায়িত্ব বহন সুকুমার রায়কে ক্রমশ ক্লান্ত করে ফেলছিল। যাইহোক ১৯২১ খ্রিস্টাব্দে তিনি পিতৃপুরুষের ভিটে ময়মনসিংহের মসুয়া-তে গিয়েছিলেন পিতার সম্পত্তির বিলিবন্টন করতে, সেখান থেকেই নিয়ে এসেছিলেন কালাজ্বর। এই অসুখে তিনি দিন দিন বিপর্যস্ত হয়ে পড়েন। বায়ু পরিবর্তন করেও কোনো লাভ হয় নি। তিনি বুঝতে পারছেন দিন দিন কাবু হয়ে যাচ্ছেন। জীবনের দিন ফুরিয়ে আসছে বুঝতে পেরে তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করে গেছেন একটি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ করার। এতোদিন ধরে যা কিছু রচনা করেছিলেন তা বিভিন্ন পত্র-পত্রিকাতে মুদ্রিত হলেও গ্রন্থকারে একটিও প্রকাশ পায় নি। এ প্রসঙ্গে সনৎকুমার নস্কর জানিয়েছেন- "জীবন-সায়াহ্নে সম্ভবত তাঁর ইচ্ছে হয়েছিল নিজের একটি কাব্যগ্রন্থের প্রকাশ দেখে যাওয়ার। সেই প্রচেষ্টার স্মারক আবোল তাবোল। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত গ্রন্থপ্রকাশের সবকিছু আয়োজন সম্পূর্ণ হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও মৃত্যুর আগে গ্রন্থের প্রকাশটা দেখে যেতে পারলেন না সুকুমার, প্রয়াত হলেন ১০ সেপ্টেম্বর ১৯২৩। 'আবোল তাবোল' গ্রন্থকারে প্রকাশিত হল এর ঠিক ন' দিন পর ১৯ সেপ্টেম্বর ১৯২৩।"১

আজ থেকে প্রায় একশ' বছর আগে প্রকাশিত হয় সুকুমার রায়ের প্রথম মুদ্রিত গ্রন্থ 'আবোল তাবোল'(১৯২৩)। এই গ্রন্থে ছেচল্লিশটা ছড়া-কবিতা আছে। প্রথম ও শেষ ছড়ার একই নাম 'আবোল তাবোল' এবং এই নামেই গ্রন্থটির নামকরণ করা হয়েছে।

এই শব্দ দুটো শুনলেই কেমন যেন মনের মধ্যে উদ্ভট সব কল্পনা ঝাঁক বেঁধে আসে। আমরা যদি 'আবোল তাবোল' এর অভিধানগত অর্থ ধরি – যা-তা-কথা, অযৌক্তিক অসঙ্গত বাক্য, নিরর্থক কথা অর্থাৎ প্রলাপ বকা। তাহলে সত্যিই কি প্রলাপ বকেছেন সুকুমার রায়? তিনি গ্রন্থের শুরুতেই একটা কৈফিয়ৎ দিয়েছেন – "যাহা আজগুবি, যাহা উদ্ভট, যাহা অসম্ভব, তাহাদের লইয়াই এই পুস্তকের কারবার। ইহা খেয়াল রসের বই, সুতরাং সে-রস যাঁহারা উপভোগ করিতে পারেন না, এ-পুস্তক তাঁহাদের জন্য নহে।"২ অর্থাৎ সুকুমার রায় নিজেই এগুলোকে 'খেয়াল রসের ছড়া' বলেছেন। এই গ্রন্থের আবোল তাবোল এর প্রথম কবিতার প্রবেশদ্বার এর ছবি স্মরণ করা যেতে পারে, ডালপালাহীন, পাতাহীন দুটো গাছের গুঁড়ির মাথায় একটা ডাল আটকানো আর চারজন লোক গম্ভীর মুখে একটা সাইন বোর্ড টাঙাতে ব্যস্ত। সেই সাইন বোর্ডে লেখা 'আবোল তাবোল'। ভালো করে এই চারজনকে দেখলে বোঝা যাবে এদের চারজন একই শ্রেণির নয়। তিন জন ধুতি-জামা পরা ভদ্র চেহারার মানুষ আর একজন সাধারণ শ্রমজীবী শ্রেণির মানুষ যার গায়ে জামা নেই। এই ছবিটা কি শুধুই ছবি নাকি এর কোনো অর্থ আছে? এই ছবি সুকুমার রায় নিজে এঁকেছেন। ছবির নীচে বামদিকে লেখা আছে 'SR' – "অর্থাৎ বাংলাদেশের এক আধুনিক, শিক্ষিত নাগরিক কবি সুকুমার রায়। এই প্রবেশ দ্বারের এ পাশে আমাদের চেনা পৃথিবী, আর ঢুকে খেয়াল রসের আবোল তাবোল জগৎ। যা চেনা জগৎকে চেনায় নতুনভাবে।"৩

সুকুমার রায় যতই স্বীকারোক্তি করুন যে, আবোল তাবোল ছোটোদের জন্য লেখা বই বাস্তবে তা কিন্তু নয়, এর অনেক কবিতায় ক্রান্তদর্শী সুকুমারের পরিচয় পাওয়া যায়। প্রথম কবিতায়- 'আয়রে ভোলা খেয়াল-খোলা/স্বপনদোলা নাচিয়ে আয়,/আয়রে পাগল আবোল তাবোল/মত্ত মাদল বাজিয়ে আয়।' প্রথমেই তিনি মাদল বাজিয়ে সেইসব 'খেয়াল খোলা'দের আহ্বান জানিয়েছেন জগতের আনন্দ উৎসবে যোগ দিতে, যারা স্বপন দোলায় দুলতে দুলতে আবির্ভূত হবে অসম্ভবের ছন্দোময় রাজ্যে। তাঁর গান যে আপাতদৃষ্টিতে ক্ষ্যাপার গান তা বোঝাই যাচ্ছে, কিন্তু একই সঙ্গে চলতি মনের অনির্দেশ্য বেগে এগিয়ে চলাকেও বোঝানো হয়েছে। আসলে ইংরেজি সাহিত্যের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল সুকুমারের; জানতেন এডওয়ার্ড লিয়ার, লুইস ক্যারলদের। সেই ননসেন্সের ধারণা, সেই আজগুবি জগতেরই কথা প্রথম কবিতায়। পাশ্চাত্য সাহিত্যে লুইস ক্যারল, এডওয়ার্ড লিয়ার যে অদ্ভুত জগৎ গড়ে তুলেছিলেন, আমাদের দেশে সুকুমার রায় সেই জগতের প্রথম এবং সার্থক প্রতিভূ। 'খিচুড়ি' কবিতায় ভিন্নজাতীয় দুটো শব্দকে মিলিয়ে জোড়কলম শব্দ তৈরি করেছেন- হাঁসজারু, বকচ্ছপ, হাতিমি। ব্যাকরণ না মানার কথা বলেছেন তিনি। 'খিচুড়ি' কবিতা প্রকাশের তিনমাস পর 'প্রাবাসী' পত্রিকাতে তাঁর 'ভাষার অত্যাচার' নামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় – এই কবিতার বয়নে রচয়িতার ভাষার নিয়মের শাসনের নামে 'ভাষার অত্যাচারের'

বিরোধিতার মনোভাব কাজ করেছে। লক্ষ্যণীয়, কবিতার প্রথম পঙক্তিতে বন্ধনীর মধ্যে উত্তম পুরুষে রচয়িতার আবির্ভাব উপস্থিতি – 'ব্যাকরণ মানি না'।৪ 'কাঠ বুড়ো' ছড়াতে নিত্য ব্যবহৃত দুটো শব্দ- কাঠ আর বুড়ো'র সমন্বয়ে তৈরি। এর আলাদা কোনো অর্থ নেই, পাঠক পড়তে পড়তে ঠিক নিজের মতো করে একটা অর্থ বের করে নেবে যে কাঠ নিয়ে জীবন কাটায়, কাঠই যার জীবনের ধ্যান-জ্ঞান ইত্যাদি।

'আবোল তাবোল' গ্রন্থটিতে খেয়াল রসের জগতের উদ্ভট, আজগুবি কিছু মানুষকে নিয়ে তৈরি হয়েছে। খিচুড়ি, কাঠ বুড়ো, কিম্ভূত, বোম্বাগড়ের রাজা, রামগরুড়ের ছানা, হুঁকোমুখো হ্যাংলা, গোঁফচুরি, আজগুবি ইত্যাদি কবিতাগুলিতে হয় কিম্ভূতকিমাকার আজব প্রাণী বা আজব মানুষের কাণ্ডকারখানা অসংগতিজনিত হাস্যরস সৃষ্টি করেছে। 'গোঁফচুরি' কবিতায় বড়োই শান্ত হেড আফিসের বড়োবাবু তাঁর 'নোংরা ছাঁটা খ্যাংরা ঝাঁটা বিচ্ছিরি আর ময়লা' গোঁফের দিকে তাকিয়ে বুঝলেন যে, এমন গোঁফ তাঁর নিজের হতে পারে না, তাঁর আসল গোঁফ চুরি গেছে। শেষ পর্যন্ত বড়োবাবুর উপলব্ধিতে স্বত্ব-স্বত্বাধিকারীর ভূমিকা পাল্টে যায় আর তিনি এই সিদ্ধান্তে আসেন-

'গোঁফকে বলে তোমার আমার – গোঁফ কি কারো কেনা?
গোঁফের আমি গোঁফের তুমি, তাই দিয়ে যায় চেনা।'

'বোম্বাগড়ের রাজা' কবিতায় রাজা ছবির ফ্রেমে আমসত্ত্ব ভাজা বাঁধিয়ে রাখে, রাজসভায় 'হুক্কা হুয়া' বলে চেঁচায়, রাজার কোলে বসে মন্ত্রী কলসি বাজায়, রানির মাথায় অষ্ট প্রহর বালিশ বাঁধা থাকে, রানির দাদা পাঁউরুটিতে পেরেক ঠোকে। 'ছায়াবাজি' কবিতায় 'আজগুবি নয়, আজগুবি নয়, সত্যিকারের কথা' বলে যে উদ্ভট চরিত্রটির বিবরণ দেওয়া হয়েছে ছায়ার সঙ্গে কুস্তি করে তার গায়ে ব্যথা। কেনোনা তার ব্যবসা হল, 'রোদের ছায়া', 'চাঁদের ছায়া' ইত্যাদি হরেক রকমের ছায়া ধরা। অব্যর্থ সেসব ছায়ার ওষুধ খেলে ব্যামো বাপরে বলে পালায়। সেটা আবার ধরে বোতলে পুরে মাত্র চোদ্দ আনা শিশিতে তা সে বিক্রি করে। এখানেও সেই একই কথা 'কেউ জানে না এ সব কথা কেউ বোঝে না কিছু'। সত্যিই কি এই লেখাগুলোর মধ্যে থেকে কোনো অর্থ, যার গূঢ় ব্যঞ্জনা নেই? আছে, পাছে কেঁচো খুঁড়তে গিয়ে সাপ বেরিয়ে পড়ে, তাই সে সব ভুলে থাকাই ভাল। সুকুমার রায়ের মতোন প্রখর মেধাবী ও তীক্ষ্ণ রসবোধসম্পন্ন লেখক শুধুমাত্র অর্থহীন প্রলাপ লিখে যাবেন শিশু মনোরঞ্জনের জন্য – এ কথা সহজে মেনে নেওয়া যায় না। সমগ্র আবোল তাবোল জুড়েই আছে লেখকের হাল্কা কথার আড়ালে গভীর কথা বলার এক নিজস্ব প্রকাশ-রীতি, যা আমরা অনুক্ষণ পর্যবেক্ষণ করতে পারি। আসলে এই আপাত আজগুবি ও অসম্ভব কল্পনা তাঁর সাহিত্যে নির্মোকের ভূমিকা পালন করেছে।

বাংলা ছড়ার জগতে সুকুমার রায় নিজেই একটি প্রতিষ্ঠান। ছোটোবেলা থেকেই তাঁর ছড়া পড়ে আমরা বড়ো হয়েছি। 'আবোল তাবোল' এর প্রায় প্রত্যেকটা ছড়া আমাদের মুখস্থ। কিন্তু বড়ো হয়ে যখন ফিরে পড়ার চেষ্টা করি তখন 'আবোল তাবোল'

আমাদের চোখের সামনে এক অন্য জগৎ খুলে দেয়। সুকুমার রায় যে কতোটা সমাজ সচেতন ছিলেন তা পার্থজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রাসঙ্গিক মন্তব্যটি স্মরণ করা যেতে পারে – "সুকুমার রায় শুধু ছোটোদের নন, বড়োদেরও। নাবালক থেকে সাবালক – তিনি সর্বজনপাঠ্য, সকলের কাছেই উপভোগ্য। আপাতভাবে যা নন্‌সেন্স বলে মনে হয় আসলে তা নন্‌সেন্স-আজগুবি নয়। নন্‌সেন্সের মধ্যেই রয়েছে গভীর এবং গোপন সেন্স। যা কাঁচা শৈশবে, বালক-বয়সে বোধ্য-স্পষ্ট নয়, বয়স যত বাড়ে, বোধ-বুদ্ধি যত পরিপক্ক হয়, সুকুমার রায় ততই নতুন করে আমাদের কাছে আবিষ্কৃত হন।"৫ সুকুমার রায়ের ছড়ায় হাস্যরসের আড়ালে সমাজ-সচেতন গম্ভীর বক্তব্যের চোরাস্রোত নজরে পড়ে। সুকুমার রায় যখন জন্মেছিলেন তখন নারীর সামাজিক অবস্থার খুব একটা উন্নতি হয় নি। তবে নারীর অপমান তিনি কোনোদিনই সহ্য করতে পারেন নি। তাঁর সমস্ত সমাজদৃষ্টিকে অন্তর্মূল পর্যন্ত ছড়িয়ে দিয়ে দেখতে পেয়েছেন তিনি আমাদের নানা রকমের ব্যাধি, বোধ করেছেন করুণা, তারপরে তাকে প্রকাশ করেছেন একটা উলটো খেয়ালের ছাঁদে। নারীর সামাজিক মর্যাদা নিয়ে কতোটা সচেতন তা 'সৎ পাত্র' পড়লেই বোঝা যায়। প্রথমেই প্রতিবেশীর কৌতূহলধর্মী প্রশ্ন পোস্তা গিয়ে শোনা গেল তোমার না কি মেয়ের বিয়ে? এখানে আমরা জানি 'পোস্তা' হল এমন জায়গা যেখানে পণ্যদ্রব্য পাইকারি বিক্রি করা হয় ও মজুত রাখা হয়। অর্থাৎ পোস্তা আমাদের মনে করিয়ে দেয় কুলীন পাত্রের সন্ধানের কথা। সুকুমার রায়ের এই সত্যটি সম্বন্ধে জানা ছিল যে, তখনকার দিনে কৌলীন্য রক্ষার তাগিদে মোহগ্রস্ত অভিভাবকগণ সাধ্যের অতিরিক্ত পণ দিয়ে পাত্র ক্রয় করতেন। এরপর 'গঙ্গারাম' নামের পাত্রের উল্লেখ করে অযোগ্য পাত্রের বর্ণনা দেন – 'মন্দ নয়, সে পাত্র ভাল-/রঙ যদিও বেজায় কালো;/তার উপরে মুখের গঠন/অনেকটা ঠিক প্যাঁচার মতন।" এই বর্ণনা শুনে কুৎসিত পাত্র বলে মনে করা হয় কিন্তু কৌলীন্যের গুণে সে মহার্ঘ্য রূপে বিবেচিত। সৎ পাত্র গঙ্গারাম তবে উনিশবার ম্যাট্রিকে ফেল করেছে, পিলের জ্বর ও পাণ্ডু রোগে ভোগে, ভাইগুলিও তার মানুষ নয়- এসব তুচ্ছ, বংশ কৌলীন্যই মুখ্য। এই কবিতা রচনার একশ' বছর পরেও বংশ, জাতপাত আজও বিয়ের সময় বিচার্য হয়ে ওঠে। সমাজকে সচেতন করার উদ্দেশ্যে এইরকম ছড়ায় 'আবোল তাবোল' পূর্ণ।

ঔপনিবেশিক শাসনে সুকুমার রায়ের বেড়ে ওঠা। ফলত পুঁজিবাদী উৎপাদনের বিকাশ সুকুমার রায়কে শুধুই মুগ্ধ করেছিল এমনটা কিন্তু নয়। সুকুমার রায় যে মুদ্রণপ্রযুক্তি বিষয়ে শিক্ষা অর্জন করার জন্য লন্ডন গিয়েছিলেন সেই প্রযুক্তির সাম্প্রতিকতম পদ্ধতি আয়ত্ত করে পিতার প্রতিষ্ঠিত মুদ্রণশিল্পের ব্যবসাটিকে আধুনিকতম করে তোলার পরিকল্পনা তাঁর মনে কিন্তু সর্বদা কাজ করত। **১৯১২** খ্রিস্টাব্দে ৯-ই ফেব্রুয়ারি একটি চিঠিতে লেখা – "Intaglio ব্লক করে তা থেকে transfer নিয়ে ছাপলে চমৎকার result পাওয়া যায়- খুব সুন্দর collotype -এর

মতো effect –বিশেষতঃ যদি offset প্রেসে ছাপা হয়। অল্প ছাপতে হলে (৫০০ কি ১০০০) halftone-এর প্রায় ডবল খরচ পড়ে - কিন্তু ১০০০০ কি ২০০০০-এর Edition হলে অনেক শস্তা পড়ে। এখন মনে হচ্ছে বিলেতে আসায় অনেক উপকার হচ্ছে।”৬ অর্থাৎ বঙ্গভঙ্গ রদের স্বদেশি যুগ শেষ হবার পর প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ও তৎপরবর্তী কয়েকটা বছর ধরে ‘আবোল তাবোল’ সৃষ্টি হয়। সেইসময় সমকালীন রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে যে সুকুমার ওয়াকিবহাল ছিলেন সেটা ‘আবোল তাবোল’ এর একাধিক ছড়া থেকে বোঝা যায়। ‘লড়াই ক্ষ্যাপা’-তে পাই- “’এইয়ো’ বলে, ক্ষ্যাপার মতো শূন্যে মারে খোঁচা।/ চেঁচিয়ে বলে, ‘ফাঁদ পেতেছ? জগাই কি তায় পড়ে?/ সাত জার্মান, জগাই একা, তবুও জগাই লড়ে’।” প্রথম বিশ্বযুদ্ধে একা লড়ার কথা যেমন বলেছেন, তেমনি এর পাশাপাশি যদি আমরা সাজিয়ে নিই ‘ভয় পেয়ো না’ এর কথাগুলোকে – ‘ ভয় পেয়ো না, ভয় পেয়ো না, তোমায় আমি মারব না-/ সত্যি বলছি কুস্তি করে তোমার সঙ্গে পারব না।’ আর এই ছড়ার শেষে বলছেন- ‘আমি আছি, গিন্নী আছেন, আছেন আমার নয় ছেলে-/ সবাই মিলে কামড়ে দেব মিথ্যে অমন ভয় পেলে।’ আসলে এই সময় কলকাতায় স্বদেশী আন্দোলনকারীদের জানানো হয়েছিল, সন্দেহ হলে শুধু জেলে ভরে দেওয়া হবে, এতে ভয়ের কিছু নেই। এই ঘটনা শোনার পর ১৩২৫ বঙ্গাব্দের আষাঢ় মাসের ‘সন্দেশ’ পত্রিকায় যখন এই ছড়াটি প্রকাশ পায় তখন মনে হয় এটা অরাজনৈতিক ছড়া নয়।

সুকুমার রায়ের রাজনৈতিক দর্শনের পটভূমিকাতেই বিচার করা যেতে পারে ‘একুশে আইন’ কবিতাটি। তিনি বুঝেছিলেন যে ইংরেজদের হয়ে যুদ্ধ করে পরাধীন ভারতবাসীর অনেক মানুষ বলি হয়েছিলেন এবং অনেক টাকা দিয়ে দেশ দেউলে হয়ে গিয়েছিল। মনে করা হয়েছিল যুদ্ধে ইংরেজদের জয় হলে সভ্যতা টিকবে আর স্বরাজ আসবে- এই বৃথা আশা বুকে নিয়ে ভারতবাসী তখন বাঁচছিল। যা এক মুহুর্তে মিলিয়ে গেল ‘রাওলাট আইন’এর আবির্ভাবে। রাওলাট আইনের বিরুদ্ধে দেশব্যাপী অহিংস অসহযোগ আন্দোলন শুরু হল। অথচ এই আন্দোলনকে দমন করার জন্য ইংরেজরা লাঠির ব্যবহার করতে কসুর করেননি। ঠিক সেই সময় ১৩২৯ বঙ্গাব্দের ভাদ্র সংখ্যায় ‘সন্দেশ’-এ প্রকাশিত হয় এই কবিতা – ‘শিবঠাকুরের আপন দেশে,/ আইন কানুন সর্বনেশে!’ কেমন সর্বনাশী আইন-কানুন আছে বা নিয়ম-কানুন আছে, যে নিয়মের বাইরে যাওয়ার চেষ্টা করলেই, রীতিমতো শারীরিক অত্যাচার নেমে আসে রাষ্ট্রের তরফ থেকে- ‘খুঁচিয়ে পিঠে গুঁজিয়ে ঘাড়,/ সেলাম ঠোকায় একুশ বার।।’ এই গুলিয়ে যাওয়া সমাজের সন্ত্রাস, শোষণ, দমন, পীড়ন সমস্ত উঠে এসেছে উপরোক্ত কবিতায়। ‘একুশে আইন’-এর নিয়মে নিগড়বদ্ধ ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের মর্মান্তিক বাস্তব ছবিকে, উদ্ভট ননসেন্সের অপূর্ব মায়াময় তুলিতে- ‘গোবর গুলে বেলের কষে,/ একুশটি পাক ঘুরিয়ে তাকে/ একশ ঘন্টা ঝুলিয়ে রাখে।।’

'আবোল তাবোল' এর 'কুমড়োপটাশ' একটি উল্লেখযোগ্য কবিতা। যেই সময়ে এই কবিতা লিখেছেন সুকুমার রায়, সেই সময়ে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রতিক্রিয়ায় চারিদিকে রাজনৈতিক ঝড়। একদিকে জার্মানের আক্রমণ, অন্যদিকে জাপানি বোমার গুজব। সন্ত্রাসে ভয়ে সিঁটিয়ে যাওয়া বাঙালি তখন সাবধানতা অবলম্বন করে কোনোরকমে প্রাণে বেঁচে আছে। সেই কারণেই হয়তো সুকুমার রায় বাঙালিকে মানসিক প্রস্তুতি নিতে বলছিলেন এই কবিতার মধ্য দিয়ে- '(যদি) কুমড়োপটাশ ডাকে-/ সবাই যেন শামলা এঁটে গামলা চড়ে থাকে;/ ছেঁচকি শাকের ঘণ্ট বেটে মাথায় মলম মাখে;/ শক্ত ইঁটের তপ্ত ঝামা ঘষতে থাকে নাকে।' 'নারদ নারদ' কবিতায় সুকুমার রায় দেখিয়েছেন, সমসাময়িক সময়টা একটা অস্থির অনিশ্চয়তার ঘেরাটোপে বন্দি। বিশিষ্ট সমালোচক অনুপম মজুমদার এই কবিতাটি সম্পর্কে বলেছেন "ছোটোখাটো নৈমিত্তিকতার অঙ্গ এই সব ঘটনাকে ছাপিয়ে এই আড়ি-আড়ি ভাব-ভাব খেলাটা তখন সব থেকে জমেছিল কলকাতা কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচনকে কেন্দ্র করে। অ্যানি বেসান্তকে সভাপতি করার পক্ষে যাঁরা, তাঁরা তখন বলেছিলেন- 'ক্যান রে ব্যাটা ইস্টুপিড? ঠেঙিয়ে তোকে করব টিট্'। কলকাতার বামপন্থীরা তার বিরোধিতা করেছিলেন বস্তুত এই ভাষায়- 'চোপরাও তুম্ স্পিকটি নট, মারব রগে পটাপট'- এই গালিগালাজের যুদ্ধে কারা শেষ পর্যন্ত 'দাঁড়া একটা পুলিশ ডাকি' বলে বাজিটা মাত করলেন সেটা আর ততটা গুরুত্বপূর্ণ থাকে না। কারণ দু-পক্ষই অবশেষে – 'মিথ্যে কেন লড়তে যাবি?' এই যুক্তিতে মশলা বিনিময় করে আড়ি-আড়ি ভাব-ভাব খেলার সেই সর্বভারতীয় সংস্করণের পরিসমাপ্তি ঘটিয়েছিলেন।"৭ 'গন্ধবিচার' কবিতায় 'গন্ধ' শব্দটিকে একটু অন্যভাবে যদি লক্ষ করি তাহলে প্রচ্ছন্ন এক কটুসত্যের ইঙ্গিত পাই। রাজসভার শাসনব্যবস্থায় অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ থাকে, সেইসব কাজ না করে শেষে কিনা মন্ত্রীর জামায় গন্ধ কেন? তাই নিয়ে হুলুস্থুল পড়ে গেল। আর অবাক বিষয় মন্ত্রীর জামার গায়ে গন্ধ শোঁকার ক্ষমতা কারোর নেই। শেষ পর্যন্ত এক বুড়ো হুকুম এবং বকশিস্ পেলে রাজি হবে। অর্থাৎ শাসকের কাপুরুষতার মর্মান্তিক সত্য এখানে খেয়াল রসের মধ্য দিয়ে উদঘাটিত করেছেন। আসলে তিনি সমাজের এবং বাস্তব জীবনের বিভিন্ন অসঙ্গতিকে তুলে ধরেছেন সে কথাও আমরা বলতে পারি।

'আবোল তাবোল' এর শেষ কবিতাটির দিকে চোখ রাখলে আমরা দেখতে পাই যে, এই কবিতায় কবির গভীর জীবনবোধ কি অনায়াস ভঙ্গিতে এখানে উপস্থাপন করেছেন। 'রিয়ালিজম' ও 'রোমান্টিসিজম' এর মেলবন্ধনে শেষ কবিতাটি কবির জীবনের শেষকথাগুলো বলেছে যেন। আত্মজিজ্ঞাসা থেমে থাকে নি- 'হেথায় নিষেধ নাইরে দাদা,/ নাইরে বাঁধন নাইরে বাধা।' অর্থাৎ তিনি যে পৃথিবী ছেড়ে চলে যাচ্ছেন তারই ইঙ্গিত যেন তিনি দিয়ে গেলেন। এ প্রসঙ্গে সত্যজিৎ রায় বলেছেন – "...তাঁর শেষ রচনা ছিল আবোল তাবোলের শেষ কবিতা, যার বিচিত্র মিশ্র রস বাংলা সাহিত্যে

চিরকালের বিস্ময়ের বস্তু হয়ে থাকবে। এটি রচনার সময় যে তাঁর উপর মৃত্যুর ছায়া পড়েছিল তার ইঙ্গিত এর শেষ কয়েক ছত্রে আছে-

আদিম কালের চাঁদিম হিম
তোড়ায় বাঁধা ঘোড়ার ডিম
ঘনিয়ে এল ঘুমের ঘোর
গানের পালা সাঙ্গ মোর।

জীবন মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে উপস্থিত হয়ে এমন রসিকতা আর কোনো রসস্রষ্টার পক্ষে সম্ভব হয়েছে বলে আমার জানা নেই।"৮ এই কবিতার শেষে আছে ঘুমের ঘোর ঘনিয়ে আসার কথা, যে ঘুম চিরস্থায়ী। যে সরস জীবনের গান বেজে উঠেছিল তাঁর কণ্ঠে, সেই গানের শতবর্ষের প্রাক্কালে আজ 'আবোল তাবোল' কে ফিরে দেখলে মনে হয় শুধু শিশুপাঠ্য ছড়া-কবিতায় এ গ্রন্থ আটকে নেই; আছে গভীর জীবন-জিজ্ঞাসা, জটিল তত্ত্বকথা, আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক চিন্তা এমনকি বিজ্ঞান শিক্ষা। যে শিক্ষায় শিক্ষিত হতে পারলে শতবর্ষ পেরিয়েও আমাদের যথার্থ শিক্ষা লাভ হয়।

সূত্র নির্দেশ:

১. সনৎকুমার নস্কর, "সুকুমার রায়: জীবনের খুঁটিনাটি", 'সুকুমার রায়: সৃষ্টি ও স্রষ্টা' (সম্পাদিত), বিদ্যা, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ২০১৭, পৃ. ৩৫-৩৬
২. সত্যজিৎ রায় ও পার্থ বসু(সম্পাদিত), সমগ্র শিশুসাহিত্য সুকুমার রায়, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, অষ্টাদশ মুদ্রণ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৫, পৃ. ১
৩. ড. সোমদত্তা ঘোষ, সুকুমার রায় : স্রষ্টা ও সৃষ্টি, অক্ষর প্রকাশনী, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি, ২০১৭, পৃ. ৮৫
৪. পুষ্কর দাশগুপ্ত, "সুকুমার রায় : তাঁর ভাষাভাবনা ও রচনা শিল্প", 'ভাষা', সম্পাদনা- মৃণাল নাথ, এবং মুশায়েরা, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০১৮, পৃ. ৮৪
৫. পার্থজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়, "অর্থহীন আজগুবি নয়, প্রবল সমাজ-সচেতন", 'সুকুমার রায়: সৃষ্টি ও স্রষ্টা'(সম্পাদিত), বিদ্যা, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ২০১৭, পৃ. ৫২
৬. সুকুমার সাহিত্য সমগ্র(তৃতীয় খণ্ড), সম্পাদক- সত্যজিৎ রায়, আনন্দ পাবলিশার্স, ৫ম মুদ্রণ, মে ২০১১, পৃ. ১৮৭
৭. অনুপম মজুমদার ও আশীষ লাহিড়ী সম্পাদিত : প্রস্তুতিপর্ব বিশেষ সংখ্যা, সুকুমার রায়, কারিগর, কলকাতা,২০১৩, পৃ. ১৮
৮. সত্যজিৎ রায় ও পার্থ বসু(সম্পাদিত), সমগ্র শিশুসাহিত্য সুকুমার রায়, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, অষ্টাদশ মুদ্রণ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৫, ভূমিকা অংশ

ভারতীয় আদর্শ সমাজ গঠনে বীর সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দের দর্শন ভাবনা : তাত্ত্বিক আলোচনা

জ্যোতি মিত্র
সহকারী অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
মুগবেড়িয়া গঙ্গাধর মহাবিদ্যালয়, ভূপতিনগর, পূর্ব মেদিনীপুর

সারসংক্ষেপ ঃ ভারতবর্ষ এক সুমহান ঐতিহ্যবাহী ও সংস্কৃতিসম্পন্ন বৈচিত্র্যময় দেশ। কিন্তু ভারতবর্ষ সাংস্কৃতিকসম্পন্ন দেশ হওয়া সত্ত্বেও এই দেশের মূল সমস্যা হল সামাজিক বৈষম্যের অবস্থিতি। যার ফলস্বরূপ ভারতবর্ষে আদর্শ ও সুষম সমাজ গঠনের ক্ষেত্রে নানা ধরণের প্রতিবন্ধকতা লক্ষ্য করা যায়। সেহেতু তৎকালীন সময়ে এই বৈষম্য দূর করে আদর্শভিত্তিক সমাজ গঠনের জন্য বিভিন্ন সমাজসংস্কারকদের আবির্ভাব হয়েছিল। কিন্তু ভারতবর্ষে সনাতনকাল থেকে চলে আসা সামাজিক বৈষম্য যেমন দূরীভূত হয়নি, তেমনি এখানে সংস্কৃতিসম্পন্ন আদর্শ ও সুষম সমাজ গড়ে উঠতে পারেনি। এরই প্রেক্ষাপটে পরবর্তীকালে ভারতবর্ষে এমন এক সুমহান মহাপুরুষের জন্ম হয়েছিল, যাঁকে আমরা সমাজসংস্কারক, ধর্মপ্রচারক, ধর্মীয় শিক্ষক, মানবতাবাদী ও বীরসন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দ নামে অভিহিত করি। প্রাথমিক পর্বে দারিদ্র্যতার সঙ্গে নিদারুণ লড়াই করে উঠে আসার পর স্বামীজির জীবনের আমূল পরিবর্তন ঘটে। শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণের সান্নিধ্যে আসা স্বামীজির দার্শনিক ভাবনাতে প্রথম যেটা ধরা পড়ে তা হল সংস্কৃতিসম্পন্ন ভারতবর্ষে সামাজিক বৈষম্য ও জরাজীর্ণতার প্রতিচ্ছবি। প্রাথমিক অবস্থায় স্বামীজির কাছে যে বিষয়টি সবচেয়ে বেশি বেদনাদায়ক হয়ে উঠেছিল তা হল ভারতীয় সমাজে বহু মানুষ এখনো দারিদ্র্যতার কবলে নিমজ্জিত রয়েছে। সমাজে এদের উপর এক আধিপত্যকারী শ্রেণি কর্তৃক শাসন ও শোষণের ধারা যেমন অব্যাহত রয়েছে, তেমনি সমাজে রয়েছে বর্ণব্যবস্থা, জাতপাতব্যবস্থা, পরাধীনতা, ধর্মীয় অন্ধবিশ্বাস, কুসংস্কার প্রভৃতি কুপ্রথার অস্তিত্ব। ফলতঃ ভারতীয় সমাজ আদর্শ সমাজরূপে গড়ে ওঠে নি। সেক্ষেত্রে স্বামীজির দর্শন চিন্তায় আদর্শ সমাজ গঠন করার প্রয়াস তৈরী হয়েছিল। বৈদান্তিক সাম্যবাদের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি আদর্শ সমাজ গঠনের লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে গিয়েছিলেন। স্বামীজি এই লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার জন্য কতকগুলি বিশেষ দিকের প্রতি আমাদের আকৃষ্ঠ করে তোলে, যা আমাদের সংস্কৃতিসম্পন্ন ভারতবর্ষের সমাজ পরিচালনার ক্ষেত্রে বর্তমান দিনে অনেকখানি প্রাসঙ্গিকতার দাবি রাখে, এগুলি হল- সাধারণ মানুষের নেতৃত্বে ভবিষ্যতের জন্য খাঁটি, সুষম ও আদর্শ সমাজ গঠন, ধর্মভিত্তিক সমাজ গঠন, সমাজের আমূল সংস্কারসাধন, সামাজিক ও অর্থনৈতিক শক্তির বন্টন, আর্থ-সামাজিক শোষণের রূপ ও প্রকৃতি, সমাজ বিকাশের পর্যায়ে বিভিন্ন বর্ণ ও জাতি, মানবিক একাত্মবাদ, সমাজবাদ, ভারতে শূদ্রভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠা, বৈপ্লবিক দিকসমূহ, নারীশিক্ষার বিস্তার প্রভৃতি। স্বামীজির ভাবনায় সাম্যবাদ হল

একটি যথার্থই আদর্শ সমাজ। যাতে ব্রাহ্মণ যুগের জ্ঞান, ক্ষত্রিয়দের সভ্যতা, বৈশ্যের সম্প্রসারণ শক্তি এবং শূদ্রের সাম্যের আদর্শ মিলিত হয়েছে। তাই এই আদর্শ সমাজ হল সুষম মানবিক সমাজ। সুতরাং বর্তমান ও ভবিষ্যতে স্বামীজির আদর্শ সমাজ গঠন করার ভাবনা ভারতবর্ষে কতটা বাস্তবায়িত হচ্ছে বা হবে তা যুক্তিসহকারে আলোচনা করাই হল বর্তমান গবেষণামূলক প্রবন্ধের মূল আলোচ্য বিষয়।

শব্দসূচক ঃ আধ্যাত্মবাদ, ফলিত, বেদান্ত, উৎকর্ষসাধন, বিদ্ববাণ, অরাজকতা, কেন্দ্রীভূত, সুষম সমাজ, আবহমানকাল, মানবধর্ম, বর্ণচক্র, অশ্রুমোচন, স্তরবিন্যাস, বিশ্বভ্রাতৃত্ববোধ, অসীম, বিশ্বজনীন, সাম্যবাদ, প্রাদুর্ভাব, অস্পৃশ্যতা, চন্ডাল।

মূলবিষয় ঃ বীরসন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দের দার্শনিক ভাবনায় যতগুলি দিকের পরিচয় আমরা পাই তার মধ্যে অন্যতম হল ভারতীয় সমাজকে আদর্শ সমাজরূপে গড়ে তোলা। এ দিক থেকে স্বামীজিকে যেমন সমাজবাদী দার্শনিক বলা চলে, তেমনি অন্যদিক থেকে তাঁকে যথার্থ বীর সন্ন্যাসী, সমাজসংস্কারক, ধর্মসংস্কারক ও মানবতাবাদের আসনেও অধিষ্ঠিত করা যায়। পিতার মৃত্যুর পরেই স্বামীজির পরিবার দারিদ্র্যতার কবলে নিমজ্জিত হয়। পরবর্তীকালে জীবনের প্রথমপর্বে শ্রী শ্রী ঠাকুর রামকৃষ্ণদেবের সান্নিধ্যে আসেন এবং তাঁর কাছেই দীক্ষিত হয়ে সন্ন্যাস ব্রত গ্রহণ করেন।[১] এই পথ ধরে তিনি শিবজ্ঞানে জীব সেবা ও মানবমুক্তির জন্য নিরলস কর্মপ্রয়াস চালিয়ে গেছেন। যাতে ভারতীয় ঐতিহ্যবাহী ও সংস্কৃতিসম্পন্ন সমাজ আদর্শ সমাজ হিসাবে গড়ে উঠতে পারে। ভারতের ঐতিহ্যবাহী সমাজকে আদর্শভিত্তিক সুষম সমাজ হিসেবে গড়ে তুলতে তিনি সাম্রাজ্যবাদী শাসন থেকে মুক্তির জন্য জনগণকে আন্দোলন গড়ে তোলার কথা বলেন। সেইজন্য স্বামীজি নিজেকে একজন সমাজবাদী হিসাবে ব্যক্ত করেছিলেন।[২] তাঁর পত্রাবলী সূত্রে এ তথ্যও পাওয়া যায়। সমাজবাদী ভূপেন্দ্রনাথ দত্তও তাঁকে ভারতের প্রথম সমাজবাদী হিসাবে চিহ্নিত করেন।[৩] কারণ, স্বামীজির মূল লক্ষ্যই ছিল ভারতের দারিদ্র্যতার অবসান ঘটিয়ে এক খাঁটি ও আদর্শ সমাজ গঠন করা। মূলত স্বামীজির আদর্শ সমাজ গঠনের যথার্থতা লুকিয়ে আছে তাঁর আধ্যাত্মবাদ, ফলিত বেদান্ত, আর মানুষের প্রতি অসীম ও গভীর প্রেম, শ্রদ্ধা এবং মমত্ববোধের প্রত্যয়ে। 'জীবে প্রেম ও শিবজ্ঞানে জীবসেবা' করাই হল তাঁর আদর্শ সমাজ গঠনের মূল মন্ত্র।[৪] সুতরাং স্বামীজির দৃষ্টিতে সমাজে যতদিন শোষণ, শাসন ও বৈষম্য বজায় থাকবে ততদিন সেই সমাজ সংস্কৃতিসম্পন্ন আদর্শ সমাজরূপে গণ্য হতে পারে না। জীবনের প্রতি পদে পদে তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে, মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক সৌভ্রাতৃত্বমূলক না হলে আদর্শ সমাজ গড়ে ওঠা অসম্ভব। এই মানবধর্ম ও বেদান্তের সাম্য দর্শন সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য ১৮৯৩ সালে তিনি শিকাগো শহরে অনুষ্ঠিত বিশ্বধর্ম মহাসন্মেলনে বক্তব্য উপস্থাপন করেন এবং বেদান্তভিত্তিক মনুষত্বের ধর্মের চেতনাকে বিশ্ববাসীর হৃদয়ে ছড়িয়ে দেন।[৫] ১৮৯৭ সালে ভারতে ফিরে এসে তিনি রামকৃষ্ণ মিশনের প্রতিষ্ঠার মধ্যে দিয়ে দারিদ্র, নীপিড়িত মানুষের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করেন। তথাপি আদর্শ সমাজ গঠনের ক্ষেত্রে তিনি যে দার্শনিক ভাবনাগুলিকে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন; সেগুলিকে গুরুত্ব সহকারে আলোচনা করাই হল বর্তমান গবেষণামূলক প্রবন্ধের মূল উদ্দেশ্য।

তবে, গবেষণামূলক প্রবন্ধের মূল উদ্দেশে পৌঁছানোর পূর্বে একথা আলোচনা করার প্রয়োজন যে, ভারতবর্ষে স্বামীজির আদর্শ সমাজ গঠনের ভাবনা বর্তমান দিনে কতটা প্রাসঙ্গিক? স্বামীজি ছিলেন বেদান্ত দর্শনের সাম্যের আদর্শে বিশ্বাসী। এই দর্শন অনুযায়ী জগৎ ব্রহ্মময়। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে, জগৎ যখন ব্রহ্মময় তখন জগতের সকল জীব ও সকল মানুষও ব্রহ্মময়। এক্ষেত্রে মানুষের সঙ্গে মানুষের গড়ে ওঠা সম্পর্ককে কখনও বৈষম্যমুলক বলে মনে করেন নি। বরং মানুষের মধ্যে সাম্য চেতনাই হল বৈদান্তিক সাম্যবাদ। এই বৈদান্তিক সাম্যবাদের প্রেক্ষাপটেই তিনি আদর্শ সমাজ গড়ে তোলার লক্ষ্যে ধাবিত হয়েছিলেন। এই বৈদান্তিক সাম্যবাদের পরিপ্রেক্ষিতেই তিনি শ্রেণিহীন, বর্ণহীন, বিরোধহীন সাম্যবাদী সামাজ প্রতিষ্ঠার সংকল্প করেন। তাঁর কল্পিত সাম্যবাদী সমাজে কোনপ্রকার অশিক্ষা, দারিদ্র্য, কুসংস্কার, অন্ধবিশ্বাস থাকবে না,তার পরিবর্তে গড়ে উঠবে মানুষে মানুষে সমতা, সৌভ্রাতৃত্বের বন্ধন, সহযোগিতা ও সম্প্রীতি। এরই ফলশ্রুতিতে গড়ে উঠবে এক খাঁটি ও সুষম আদর্শ সমাজ। কিন্তু বর্তমান প্রেক্ষাপটে এই বিশ্লেষণ যদি করা যায় তাহলে লক্ষ্য করা যায় যে, ভারতীয় সংবিধানের তৃতীয় অধ্যায়ে সাম্যের কথা বলা হয়। ভারতীয় সংবিধানের ১৫(১)নং ধারা অনুসারে রাষ্ট্র জন্ম, বর্ণ, ধর্ম, জন্মস্থান, স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে কারুর সঙ্গে বৈষম্যমূলক আচরণ করবে না বলে বলা হয়।[৬] কিন্তু সাংবিধানিক আদর্শও ভারতবর্ষে বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে। বর্তমান ভারতবর্ষে ধর্মের, বর্ণের, জাতির প্রেক্ষাপটে মানুষের সঙ্গে মানুষের বৈষম্য তৈরী হয়েছে। ভারতবর্ষে ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে ব্যবধান বেড়েছে। ভারতে এক শ্রেণি জাতপাত ব্যাবস্থাকে টিকিয়ে রাখতে চাইছে। ধর্মের নামে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে বিশেষ করে হিন্দু ও মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে বিরোধও তৈরী হয়েছে। স্ত্রী ও পুরুষের সমানাধিকারের কথা এখানে বলা হলেও স্ত্রীদের প্রতি পুরুষদের এখনও আধিপত্য বজায় রয়েছে। সমাজে এখনো নীচু জাতিকে অবজ্ঞার চোখে দেখা হয়। ফলস্বরূপ স্বামীজির দর্শন ভাবনায় আদর্শ সমাজ গড়ার যে প্রেক্ষাপট তৈরী হয়েছিল, বর্তমান দিনে তা অনেকটা অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়েছে।

রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠা ও আদর্শ সমাজ গঠনের ভাবনা ঃ- স্বামীজি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগো শহরসহ অন্যান্য দেশে পরিভ্রমণ করার পর ভারতের কলকাতায় ফিরে আসার পরবর্তীকালে অর্থাৎ ১৮৯৭ সালে রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর এই রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠার অন্যতম লক্ষ্য হল এক সংস্কৃতিসম্পন্ন আদর্শ সমাজ গঠন করা। রামকৃষ্ণ মিশন এই লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার জন্য কতকগুলি বিষয়কে গুরুত্ব দেয়, যথা -১। বেদান্ত ও ধর্মীয় বিষয়ে মানুষকে উৎসাহিত করা; ২। মানুষের উৎকর্ষসাধনের জন্য শিক্ষাপ্রদানের ব্যবস্থা করা; ৩। শিল্প ও কারিগরি বিষয়ে শিক্ষাদানের প্রচলন করা।[৭] সুতরাং আধ্যাত্মিক জগতের মানুষ হয়েও জাগতিক বিষয় সম্পর্কেও তাঁর আগ্রহ কম ছিল না। স্বামীজি এ প্রসঙ্গে মনে করতেন যে, মানুষ তার সাধনা ও সহনশীলতার মধ্যে দিয়ে নতুন সমাজ তৈরী করতে পারে।

সমাজ বিকাশে বর্ণশাসন চক্র ঃ- স্বামী বিবেকানন্দ দেখিয়েছেন যে, সনাতনকাল থেকে ভারতবর্ষে চারটি বর্ণ বা জাত সমাজবিকাশের পর্যায়ে তাদের ভূমিকা বা ক্ষমতাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে। একটি চিত্রের মাধ্যমে বিষয়টি তুলে ধরা হল-

-----ঃচিত্রঃ-----

বর্ণশাসন চক্র

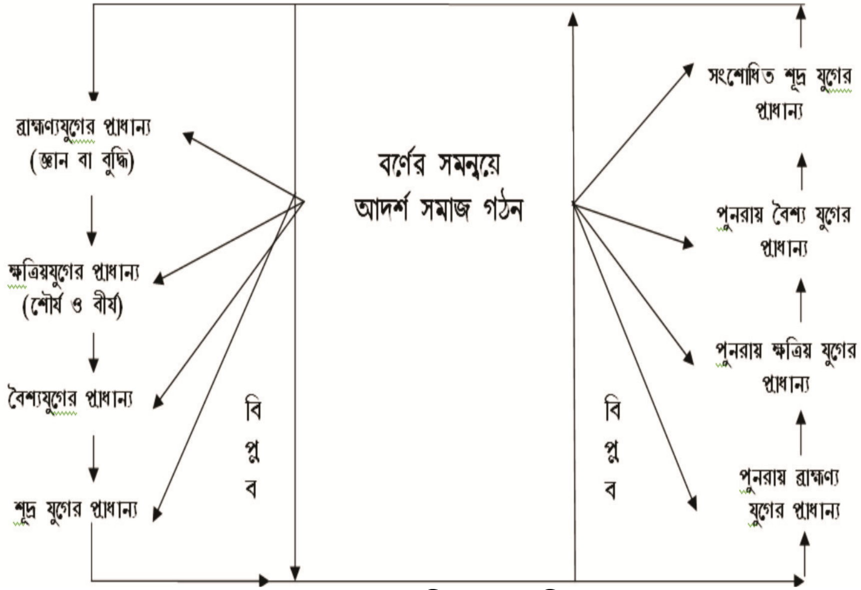

আমূল সংস্কার (অস্বীকারের অস্বীকার)

উপরিউক্ত চিত্রের মাধ্যমে দেখানো হয়েছে যে, সুপ্রাচীনকাল থেকেই জ্ঞান ও বুদ্ধির জোরে ব্রাহ্মণ পুরোহিতরা সমাজে নিজেদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। সমাজে সর্বোচ্চ মর্যাদার আসনেও তাঁরা অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন। এরই ফলশ্রুতিতে সমাজে বিভিন্ন দিক থেকে সমস্ত রকমের সুযোগ-সুবিধার অধিকারী তাঁরাই হয়েছিলেন। অর্থাৎ প্রাচীন হিন্দু সমাজ চারটি বর্ণে বিভক্ত ছিল, যথা - ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলেছেনঃ- ‘‘চতুবর্ণং ময়া সৃষ্ঠং গুণকর্ম বিভাগশঃ’’। অর্থাৎ আমি গুণ ও কর্মের বিভাগ অনুযায়ী চার বর্ণের সৃষ্ঠি করেছি।[৮] এই চারটি বর্ণের উৎপত্তি যথাক্রমে ব্রহ্মার মুখ, বাহু, উরু এবং পদযুগল থেকে। ব্রহ্মার মুখ থেকে উৎপত্তি বলে সমাজে ব্রাহ্মণের স্থান সবার উচ্চে। এই উচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত থাকার ফলে তাঁরা কখনও কখনও স্বৈরাচারী হয়ে উঠতো। এঁরা ছিল মূলত বিদ্ববান। পূজা-অর্চনা, আচার -অনুষ্ঠান ও বিভিন্ন প্রথার মধ্যে সমাজে নিজেদেরকে জড়িয়ে রেখেছিলেন। তথাপি এই যুগে ব্রাহ্মণদের স্বেচ্ছাচারিতার হাত থেকে মুক্তি পেতে এবং সুন্দর ও সুস্থ সমাজ গঠনের স্বার্থে ক্ষত্রিয়রা বিপ্লবের মধ্যে দিয়ে ক্ষত্রিয় যুগের সূচনা ঘটায়।[৯]

সমাজ বিকাশের দ্বিতীয় পর্যায়ের প্রথম দিকে শৃঙ্খলা বজায় থাকলেও এই যুগে শাসন-ক্ষমতা ক্ষত্রিয়দের হাতে চলে আসাই পরবর্তীকালে তাঁরা স্বৈরাচারী হয়ে ওঠে। এঁরা মূলত যুদ্ধ পরিচালনা ও প্রশাসনিক কাজের সঙ্গে নিজেদের যুক্ত করে রেখেছিলেন। ব্রহ্মার বাহু থেকে ক্ষত্রিয়দের উদ্ভব হয়েছে বলে তাঁরা বাহুবলে বলীয়ান ছিলেন। বাহুবলে বলীয়ান ক্ষত্রিয়দের স্বেচ্ছাচারিতার ফলস্বরূপ জনজীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়ল। এই ক্ষত্রিয়দের থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য ও সাংস্কৃতিকসম্পন্ন সুস্থ সমাজ গঠনের লক্ষ্যে সমাজবিকাশের পর্যায়ে নতুন একটি বর্ণের আবির্ভাব ঘটল। যাঁদের মূলত বৈশ্য শ্রেণি হিসাবে অভিহিত করা যায়। ব্রহ্মার ঊরু থেকে এঁদের উৎপত্তি। এঁরা ব্যবসায়িক কাজকর্মের সঙ্গে নিজেদেরকে যুক্ত করে রেখেছিলেন। এঁরা অর্থ ও সম্পদ বলে বলীয়ান হয়ে ক্ষত্রিয়দের বিরুদ্ধে বিপ্লব সংঘটিত করে বৈশ্য যুগের সূচনা করল।[১০]

বৈশ্য যুগে অর্থ-সম্পদে বলীয়ান বৈশ্যরা জনজীবন ও সমাজজীবনকে সুন্দর করে গড়ে তুলল। কিন্তু সম্পদের অধিকারী বৈশ্যরা তাদের সম্পদের গরিমায় স্বেচ্ছাচারী হয়ে উঠল। ফলতঃ সুস্থ সমাজে অরাজকতা দেখা দিল। এই অরাজকতা থেকে মুক্তির জন্য এবং সুন্দর সমাজ গড়ে তোলার প্রেক্ষাপটে সমাজে আরো একটি বর্ণের আবির্ভাব ঘটলো যাঁরা শূদ্র নামে পরিচিতি লাভ করল। এঁরাও বৈশ্য শ্রেণির বিরুদ্ধে বিপ্লব সংঘটিত করে শূদ্র যুগের প্রতিষ্ঠা করল।[১১]

স্বামীজির দৃষ্টিতে শূদ্ররা ছিল মূলত শ্রমজীবী। ব্রহ্মার পদযুগল থেকে এই বর্ণের উৎপত্তি হয়েছিল বলে সমাজে এঁদের স্থান ছিল সর্বনিম্নে। এঁরা সমাজে দাসত্বের মাধ্যমে মানুষের সেবামূলক কাজে নিজেদেরকে উৎসর্গীকৃত করেছিলেন। এঁদেরকে সমাজে অস্পৃশ্য বলে মনে করা হত এবং সেই কারণেই তাঁরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই উচ্চবর্ণের দ্বারা নিপীড়িত ও শোষিত হত। এই শোষণের ধারা বজায় থাকলেও শূদ্র শ্রেণি নিজেদের দৈহিক পরিশ্রমের দ্বারাই নিজেদের সত্তার বিকাশ ঘটিয়েছিল। মূলত বৈশ্যযুগের অর্থনৈতিক স্বেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধে তাঁরাই রুখে দাঁড়িয়েছিল এবং বিপ্লব সংঘটিত করেছিল। স্বামীজি এই বিপ্লবকেই শূদ্র জাগড়ণ বলে অভিহিত করেছেন।[১২] এই শূদ্র শ্রেণী সমাজের বিকাশের কাজে নিজেদেরকে নিয়োজিত করেছিলেন। ফলে সমাজের উন্নতি ঘটেছিল। এই সমাজে সাধারণ মানুষের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। সেক্ষেত্রে বিবেকানন্দের ভাবনায় এটাই মনে হয়েছিল যে, জনসাধারণের সাংস্কৃতিক ও নৈতিক উন্নতি ও সুস্থ জীবনে পরিপূর্ণ; এই শূদ্র সমাজই হল যথার্থ আদর্শ সমাজ।

স্বামীজির মতে, শূদ্র সমাজও ত্রুটিমুক্ত নয়। কেননা শূদ্র সমাজেও শাসন ক্ষমতা ভোগ করতে করতে কালক্রমে শাসক শূদ্রদের পক্ষ থেকে অনাচার ও অপশাসন দেখা দেবে। অর্থাৎ শূদ্রদের যেভাবে শোষণ করা হয়েছে তার বিরুদ্ধে শূদ্ররা প্রতিবাদী হয়ে উঠবে। চক্রাকারে যখন একের পর এক বর্ণ ক্ষমতাচ্যুত হয়ে নবাগত শূদ্ররা সুস্থ সমাজ গঠনের লক্ষ্যে সমাজের বিরুদ্ধে বিপ্লব সংঘটিত করবে তখন এক আদর্শ সমাজ গড়ে উঠবে বলে স্বামীজি মনে করতেন।

বিবেকানন্দের বিশ্বাস অনুযায়ী জাগতিক নিয়মে এ বিশ্বে প্রতিটি সমাজের বিকাশ একইভাবে চক্রকারে ঘটে চলেছে। প্রতিটি চক্রাকার বিকাশে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারটি বর্ণ একের পর এক ক্ষমতার আসনে অধিষ্ঠিত হয়ে চলেছে। তিনি বলেন, সত্ত্ব, রজঃ এবং তমঃ এই তিনটি গুণ মানুষের মধ্যে রয়েছে। এরই ফলস্বরূপ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এই চারটি বর্ণের অস্তিত্ব সমাজে সকল সময়ে লক্ষ্য করা গিয়েছে। এই তিনটি গুণ যে বর্ণ যখন আয়ত্ত করতে পারছে তখন তারই নেতৃত্বে সমাজ পরিচালিত হচ্ছে এবং তারই হাতে থাকছে ক্ষমতার চাবিকাঠি।[১৩] ফলতঃ এই জাত বা বর্ণ পূর্বের শাসন ক্ষমতাসম্পন্ন জাতের যুগকে অস্বীকার করে প্রতিষ্ঠা করছে নিজের আধিপত্য। একইভাবে এই অস্বীকারকারী বর্ণ বা জাতের আধিপত্যের যুগকে ঐ তিন গুণের দিক থেকে নতুন কোন শক্তিশালী জাত আবার অস্বীকার করছে এবং নিজেদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করছে। বিবেকানন্দের বক্তব্যে একে ''Neagtion of Negation'' রূপে আখ্যায়িত করা যায়।[১৪]

ভারতবর্ষে প্রাচীন জাতিগুলির সমাজবিকাশের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে সমাজজীবনকে প্রথম পর্যায়ে পরিচালনা করতে ব্রাহ্মণ পন্ডিতগণ। তাঁদের হাতেই ছিল সমাজের চাবিকাঠি। বিবর্তনের পর্যায়ে ব্রাহ্মণ্যবাদের প্রাধান্যের অবসানের পর নতুন শক্তি হিসেবে ক্ষত্রিয়দের আবির্ভাব ঘটে। বাহুবলে বলীয়ান হওয়ায় ক্ষত্রিয়দের সঙ্গে ব্রাহ্মণদের সমন্বয় না ঘটায় বিরোধ তৈরী হয়। এর ফলস্বরূপ ব্রাহ্মণরা ক্ষমতাচ্যুত হয় এবং ক্ষত্রিয়গণ ক্ষমতা লাভ করে। কালক্রমে বৈশ্যরা অর্থনৈতিক দিক থেকে শক্তিশালী হওয়ায় নতুন করে ক্ষত্রিয়দের উপর প্রভাব বিস্তার করে। ফলত তাঁরা সমাজীবনকে পরিচালিত করার দায়ভার নেয়। স্বামীজি মনে করেন বর্তমানে তাঁদের কর্তৃত্ব করার যুগের অবসান ঘটেছে। এই কর্তৃত্বের অবসানে ভবিষ্যত ভারতে নতুন করে তৈরী হয়েছে শূদ্র জনগণের আধিপত্য।[১৫] তাঁরাই হলেন মূলত শ্রমজীবী, দরিদ্র, কর্মী ও সেবক। আর তাঁদের এই প্রাধান্যের যুগে গড়ে উঠবে মানুষে মানুষে সাম্য, সকল প্রকার বৈষম্যের দূরীকরণ এবং সমাজে সম্পদ বন্টিত হবে সকলের মধ্যে। অর্থাৎ শূদ্র জাগড়ণের মধ্যে দিয়ে গড়ে উঠবে এক সুস্থ সাংস্কৃতিক চেতনাসম্পন্ন মানবিক সমাজ। অর্থাৎ দীর্ঘদিন ধরে যারা শোষিত ও বঞ্চিত হয়েছে, সেই সব মানুষ ভবিষ্যতে বিকাশমান সমাজকে পরিচালিত করবে ও নিয়ন্ত্রিত করবে এবং ভোগ করবে শাসনক্ষমতা। এই শ্রমজীবী মানুষ শোষণের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়ে নায্য অধিকার আদায় করতে সক্ষম হবে এবং এক আদর্শ সমাজ গড়ে তোলার লক্ষ্যে তাঁরা ধাবিত হবেন একথা স্বামীজি বারবার বলেছেন। কিন্তু তাঁর এই ভাবনা বর্তমান ভারতীয় সমাজ ও সংস্কৃতিতে কিছুটা যে বিচ্যুতি ঘটেছে তা হলফ করে বলা যায়।

স্বামীজির দৃষ্টিতে সমাজে প্রাধান্যকারীর শোষণ অব্যাহত থাকার জন্যই ভারতীয় সমাজ আদর্শ সমাজরূপে গড়ে উঠতে পারছে না। কারণ, সমাজে শোষণের বিভিন্ন দিক রয়েছে - যেমন জ্ঞান বা বুদ্ধির দ্বারা শোষণ, যা পুরোহিত, রাজনৈতিক গোষ্ঠী ও কিছু বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে প্রবল; অস্ত্রের সাহায্যে শোষণ, অর্থনৈতিক শোষণ এবং সংঘবদ্ধ শক্তির সাহায্যে শোষণ।[১৬] এক্ষেত্রে তিনি মনে করতেন যে, সমাজ যতদিন একটি শ্রেণীর

হাতে ক্ষমতা থাকবে ততদিন সমাজে শোষণ ও নিপীড়ণ বজায় থাকবে। ফলতঃ সামাজ আদর্শ সমাজরূপে কখনই গড়ে উঠতে পারবে না। সেজন্য স্বামীজি তাঁর দর্শন চিন্তায় শ্রমজীবী ও মেহনতি মানুষের অর্থনৈতিক অগ্রগতির পাশাপশি রাজনৈতিক অগ্রগতি যেমন ঘটাতে চেয়েছিলেন তেমনি মানসিক ও সাংস্কৃতিক দিক দিয়েও অগ্রগতি ঘটাতে চেয়েছিলেন। সত্যিকারে যদি এই অগ্রগতি হয় তাহলে সেই সমাজ হবে সুষম সমাজ। বেদান্তবাদী বিবেকানন্দের মতে, 'জগতের সৃষ্ঠি ভালমন্দের সংমিশ্রণে, সেইজন্য কোন ব্যবস্থায় এখানে ত্রুটিহীন হতে পারে না'। কিন্তু তাই বলে একটি শ্রেণী চিরকাল বঞ্চিত হবে তা কোন মতেই হতে পারে না বলে তিনি মনে করেন। তাঁর দর্শন চিন্তায় এই ধারণা ব্যক্ত হয়েছে যে, সমাজে মূল শ্রেণি হল শূদ্র শ্রেণি - যারা উৎপাদন করে। এদেরই পরিশ্রমের ফলশ্রূতিতে মানুষের উন্নতি ও সভ্যতার বিস্তার ঘটে। তারাই আবহমানকাল ধরে নীরবে কাজ করে যাচ্ছে, অথচ তাদের পরিশ্রমের ফলও তারা যথাযথভাবে পাচ্ছে না''- এই ব্যাখ্যাই তাঁকে আদর্শ সমাজ গঠনের লক্ষ্যে ধাবিত করেছিল।[১৭] কিন্তু বর্তমান ভারতীয় সমাজে লক্ষ্য করা গেছে শ্রমজীবী মানুষ চিরকাল শ্রমজীবী হিসেবে থেকে গেছে। তাদের অবস্থার খুব একটা উন্নতি সাধিত হয় নি।

জীবদেহতত্ত্বের ধারণা ঃ- সমাজে বিভিন্ন শ্রেণি কিভাবে শাসন ক্ষমতা থেকে চ্যুত হয় সে সম্পর্কে তিনি ধারণা দিতে গিয়ে জীবতত্ত্বের সাহায্য নিয়েছিলেন। হৃৎপিন্ডে রুধির সঞ্চয় যেমন প্রয়োজনীয়, তেমনি তাহার শরীরময় তা সঞ্চালন না ঘটলে মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। জীবদেহের সঙ্গে তুলনার মাধ্যমে তিনি সমাজজীবনের একান্ত সত্যটিকে অতি দক্ষতার সাথে উপস্থাপিত করেছেন।[১৮] স্বামীজি মনে করেন, কোন বিশেষ শ্রেণি যদি কোন বিদ্যা বা শক্তি অর্জন করে, কিন্তু তাতে সেই বিশেষ শ্রেণির কোন রকম একচেটিয়া অধিকার থাকবে না, সমাজের সকল স্তরের মধ্যে সেই বিশেষ শক্তিকে ছড়িয়ে দিতে হবে। এই শক্তি যদি সমাজের সকল স্তরে পৌঁছাতে না পারে, তাহলে সেই সমাজ ক্রমশঃ অবক্ষয়ের দিকে এগিয়ে যাবে। সুতরাং জৈবিক নিয়মের প্রকাশ ঘটলেই এক আদর্শ সমাজ গড়ে উঠবে বলে তিনি মনে করতেন।

সাম্যবাদী সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ঃ- পরবর্তী পর্যায়ে স্বামীজির দর্শন ভাবনায় গড়ে ওঠে অর্থনৈতিক ব্যবস্থার আদর্শ। কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে অশিক্ষা ও অজ্ঞতার অন্ধকার দূর করা এবং সামাজিক সাম্য প্রতিষ্ঠা করা - এটাই ছিল সাম্যবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বুনিয়াদ। তিনি মূলত সমস্ত রকম সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্য দূর করে সকল প্রকার সামাজিক সুবিধা ও অর্থনৈতিক শক্তির সমবন্টন করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু বর্তমান ভারতীয় সমাজে অর্থনৈতিক শক্তির বন্টন যেমন ঘটেনি, তেমনি সামাজিক সুবিধার সমবন্টন ঘটে নি। ভারতের ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে ব্যবধান থাকায় ধনী শ্রেণি অধিকতর সুবিধা ভোগ করে এবং দরিদ্র মানুষ আরও দরিদ্রতর হয়। ভারতবর্ষে ২০% মানুষ আর্থিক সুবিধা ভোগ করলেও ৮০% মানুষ সেই সুবিধা থেকে আজও বঞ্চিত। স্বামীজি মনে করেন দারিদ্র্যতাই হল ভারতবাসীর মূল শত্রূ। এই দারিদ্র্যতা দূর করা সম্ভব হলেই সকল প্রকার বৈষম্যের অবসান ঘটবে এবং গড়ে উঠবে আদর্শ সমাজ। তবে বর্তমানে আমাদের ভারতে অর্থনৈতিক পরিকল্পনার

মূল লক্ষ্য হল দারিদ্র্যতা দূরীকরণ, অর্থনৈতিক স্বয়ম্ভরতা অর্জন, বঞ্চিত ও অবহেলিত আপামর জনগণের জীবনমানের উন্নয়ন ঘটানো, সমাজে আয় ও সম্পদের বিশেষ সুযোগ-সুবিধার বৈষম্য হ্রাস করা। যদি লক্ষ্য তাই হয় তাহলে সেক্ষেত্রে ভারতীয়দের মধ্যে বিবেকানন্দ প্রথম এই কর্মসূচি গ্রহণ করার আহ্বান জানিয়েছিলেন, যাতে ভারতীয় সমাজকে এক সুষম, সভ্য এবং আদর্শ সমাজ হিসেবে গড়ে তোলা যায়।

মানবতাবাদী ধর্মভিত্তিক সমাজ ঃ- স্বামীজির দর্শন ভাবনায় ধরা পড়ে যে, একমাত্র ধর্মের পথ ধরেই শোষিত ও বঞ্চিত মানুষ শাসন ক্ষমতা পাবে এবং তখনই তারা গড়ে তুলবে আদর্শ সমাজ। এখানে ধর্ম বলতে তিনি মন্ত্র-তন্ত্র, যাগ-যজ্ঞ, পূজা-অর্চনার কথা বলেন নি। আবার, তিনি ধর্ম বলতে হিন্দু-মুসলমান, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান প্রভৃতি ধর্মের কথা বলেন নি। মূলত তিনি ধর্ম বলতে মানুষের অন্তরের দেবত্বের স্বরূপকেই বুঝিয়েছেন, যা মানুষকে প্রেম, প্রীতি, ভালবাসা, সত্য ও অহিংসা চেতনায় উদ্বুদ্ধ করে এবং তাকে সেবা ও কর্মের ব্রতে দীক্ষিত করে। এই ধর্মকে 'PractiCal Vedanta' নামে অভিহিত করা যায়।[১৯] স্বামীজি ধর্ম বলতে আবার আত্মবিশ্বাস, চরিত্রগঠন, নিষ্ঠা, সততা ও আত্মোপলব্ধিকে বুঝিয়েছেন। তাঁর ধর্ম হল- 'Man Making Religion'.[২০] স্বামীজির দৃষ্টিতে ফলিত ধর্মের মূল দিক হল এই ধর্ম কখনো মানুষে মানুষে বৈষম্য তৈরী করে না। তিনি মন্তব্য করেন শ্রেণি বিভক্ত সমাজে বৈদান্তিক ধর্ম কখনই কার্যকরি হয় না। মানুষ যদি আর্থ-সামাজিক জীবনে নীপিড়ণের শিকার হয় তাহলে সে কখনই অন্তরের দেবত্বকে উপলব্ধি করতে পারে না। তিনি সর্বদা সেই ধর্মের বিরোধিতা করেছেন, যে ধর্ম বিশেষ কোন সম্প্রদায়ের আধিপত্যকে বজায় রাখার জন্য সাধারণ মানুষকে বঞ্চনার দিকে ঠেলে দেয়। স্বামীজি এ প্রসঙ্গে উদারভাবে বলেছেন-

''আমি সেই ধর্মকে বিশ্বাস করি না, যে ধর্ম
বিধবার অশ্রুমোচন করতে পারে না, অনাথের
মুখে এক টুকরো রুটি তুলে দিতে পারে না''।[২১]

সেইজন্য স্বামীজি মনে করেন যে, যথার্থ ধর্ম গড়ে তোলার জন্য প্রয়োজন এক সুস্থ পরিবেশ। এই সুস্থ পরিবেশেই ধর্ম তার যথার্থ অর্থ খুঁজে পাবে। তিনি মন্তব্য করেছেন যে, প্রকৃত ধর্ম মানুষের জীবনে কোনরকম দুঃখ ডেকে আনে না, বরং মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্প্রীতি গড়ে তোলে। তিনি মানবধর্মের অভেদ মন্ত্র উচ্চারণ করে বলেন যে-

''ভুলিও না নীচ জাতি, অজ্ঞ, দরিদ্র, অশিক্ষিত,
মুচি, মেথর তোমার রক্ত মাংস, তোমার ভাই''।[২২]

সুতরাং, মানবধর্মের মধ্যে দিয়েই গড়ে উঠতে পারে শোষণহীন, শাসনহীন, সুন্দর ও সুস্থ সাংস্কৃতিকসম্পন্ন আদর্শ সমাজ। স্বামীজি অধ্যাত্মমুখী মানবতাবাদের মধ্যে দিয়ে বিদ্যমান সমাজকে আদর্শ সমাজে পরিবর্তন করার যে প্রচেষ্টা তিনি করেছিলেন, আজকের দিনে সমাজজীবনে তা গ্রহণযোগ্য, যেটি গবেষণামূলক প্রবন্ধের মাধ্যমে সহজেই ধরা পড়ে। তিনি শোষণমূলক, শ্রেণিবিভক্ত, কুসংস্কারাচ্ছন্ন ও জাতপাতভিত্তিক সমাজের আমূল পরিবর্তন ঘটাতে চেয়েছিলেন। স্বামীজি সমাজের সকল মানুষের মধ্যে সাম্যের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করে সামগ্রিক সমাজ পুনরায় গড়ে তোলার কথা বলেন। আবার, তিনি

উপযুক্ত শিক্ষার মধ্য দিয়ে সাধারণ জনগণের মধ্যে সচেতনতা বাড়াতে চেয়েছিলেন। মূলত তিনিই সর্বপ্রথম মানবধর্মের ভিত্তিতে সমাজজীবনের কাঠামোর আমূল পরিবর্তন ও সংস্কারসাধন করতে চেয়েছিলেন। সেই দিক থেকে স্বামীজিকে অনেকে সমাজবাদের ধারক বলে মনে করেন।

সমাজে শিক্ষাব্যবস্থা ঃ- স্বামীজি ভারতের চরম দুরবস্থা এবং জনগণের দুঃখ-কষ্ট লক্ষ্য করে ব্যথিত হন। জীবনের মূল প্রান্তে এসে তিনি বুঝেছিলেন যে, সারা দেশে যে সংকট তৈরী হয়েছে তাকে উৎখাত করতে হলে শিক্ষার বিস্তার ঘটানোর প্রয়োজন। স্বামীজি এ প্রসঙ্গে মন্তব্য করেন যে, ''ব্রাহ্মণের সন্তান যদি একজন শিক্ষকের প্রয়োজন বোধ করে, তাহলে একজন চন্ডালের সন্তান অবশ্যই দশজন শিক্ষকের প্রয়োজন বোধ করবে।''[২৩] তিনি অনুভব করেছিলেন যে, অন্ধকারে যারা রয়েছেন তাদের সেবা না করলে সমাজের মঙ্গল সাধিত হবে না। সেক্ষেত্রে স্বামীজি পুঁথিগত শিক্ষার কথা বলেন নি। তিনি কারিগরী ও যুগোপযোগী শিক্ষার কথা বলেছিলেন এবং সাথে সাথে ব্যক্তিত্ব বিকাশের কথা বলেছিলেন। শিক্ষার মাধ্যমেই ভারতবাসীরা খাঁটি মানুষ হয়ে উঠুক, নিজেদের ভাল-মন্দ নিজেরা বুঝতে শিখুক, যা ভাল বুঝবে তা জীবনে কার্যকরি করার ক্ষেত্রে যথেষ্ট মানসিক ক্ষমতাসম্পন্ন হলেই দেশের তথা সমাজের মঙ্গল সাধিত হবে বলে তিনি মনে করেন।

সমাজে নারী শিক্ষার বিস্তার ঃ- স্বামীজি, সমাজে নারী -পুরুষের মধ্যে যে বৈষম্য রয়েছে তার সক্রিয় বিরোধিতা করেছেন। নারীজাতিকে শুধুমাত্র সন্তান উৎপাদনের যন্ত্র হিসেবে তিনি দেখেন নি। তিনি নারীকে পবিত্র মাতৃরূপে মর্যাদা দেওয়ার কথা বলেছেন। সনাতনকাল থেকে নারীজাতিকে গৃহকোণে বন্দী করে রাখার যে প্রবণতা তৈরি হয়েছিল তার বিরোধিতা তিনি করেছেন। কেননা, নারীজাতিকে চিরকাল অনগ্রসর করে রাখলে কোন জাতিই উন্নতি ঘটাতে পারেন না বলে তিনি মনে করেন। তিনি নারীজাতির প্রশিক্ষণের জন্য মঠ নির্মাণ করেছিলেন। হিন্দু সমাজে বিধবা মহিলাদের প্রতি যে অমানবিক আচরণ করা হত তা থেকে মুক্তির উপায় তিনি বাতলেছেন। স্বামীজি মনে করতেন যে, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে তাঁরা যদি স্বাবলম্বী হতে পারেন তাহলে এই বিধবা মহিলাদের উন্নতি সম্ভব। সেজন্য বিভিন্ন ধরণের শিক্ষা ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তার কথাও তিনি অনুভব করেছিলেন। এই শিক্ষাই তাদেরকে আত্মনির্ভরশীল করে তুলবে একথা তিনি মনে করতেন। কারণ হিসাবে বলা যায় শিক্ষিত ও আর্থিক দিক থেকে স্বাবলম্বী মহিলারা নারী সমাজের সমস্যার সমাধান ঘটাবে।[২৪] স্বামীজির নারী শিক্ষার প্রাসঙ্গিকতা বর্তমান সমাজেও প্রভাব ফেলেছে। বর্তমানে নারীরা গৃহকোণের বাইরে বেরিয়ে আর্থিক দিক থেকে স্বাবলম্বী হতে পেরেছে। কিন্তু সামগ্রিকভাবে নারীরা সমাজে এখনও বৈষম্যের শিকার হচ্ছে। সমাজে নারী ও পুরুষদের মধ্যে আর্থিক বৈষম্য বজায় রয়েছে। তার সঙ্গে পুরুষতান্ত্রিক প্রথার অস্তিত্ব এখনও রয়েছে। বর্তমানে সাংবিধানিক দিক দিয়ে যেখানে নারী ও পুরুষের সমান কাজের সমান মজুরির কথা বলা হয়েছে সেক্ষেত্রেও বৈষম্য রয়েছে। তবে বিবেকানন্দের আদর্শকে পাথেয় করে নারীরা নিজেদের আত্মিক শক্তির উৎকর্ষসাধনের লক্ষ্যে এগিয়ে চলেছে এবং পুরুষের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করে

চলেছে। এই সাফল্যতা হল ভারতবর্ষে আদর্শ সমাজ ও সুষম সমাজ গড়ে ওঠার মূল সোপান।

জাতিগত প্রথার বিরোধিতা ঃ- স্বামীজি তাঁর দর্শন ভাবনায় ভারতের সামাজিক কাঠামোর অবক্ষয়ের মূল কারণগুলি ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি সমাজজীবনের বৈষম্যমূলক ব্যবস্থা অবসানের পক্ষপাতি ছিলেন। তাঁর প্রচেষ্টায় বর্তমান দিনে জাতপাত ব্যবস্থার প্রাদুর্ভাব কিছুটা হলেও কমেছে তা বলা যায়। বিশেষ করে জাতপাত প্রথার নামে সমাজে যে ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির সৃষ্ঠি হয়েছে, তার সম্পূর্ণ বিরোধিতা তিনি করেছেন। এই লক্ষ্যে তিনি সমাজের বিকাশে শিক্ষার ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন। কেননা, শিক্ষায় বিভিন্ন জাতিকে মৌলিক করে তোলে। এছাড়া জাতপাত ব্যবস্থাকে কেন্দ্র করে সমাজে যে কুসংস্কার দেখা দিয়েছে তার প্রতি তিনি আক্রমণাত্মক মনোভাব প্রদর্শন করেছেন। এই ধ্যান - ধারণার পরিপ্রেক্ষিতে তিনি ভারতীয় সমাজকে আদর্শ সমাজরূপে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। তাঁর মতে, বিভেদমূলক সামাজিক ব্যবস্থা হিন্দু সমাজের কাঠামোকে টুকরো টুকরো করে দিয়েছে। ফলস্বরূপ সমাজে ঐক্য ও সংহতি বিপন্ন হয়েছে। এই ব্যবস্থা থেকে মুক্তির উপায়ের নিধান দিয়েছেন। বেদান্ত এই ধারণাকে অস্বীকার করা হয়েছে যে, একজন মানুষ অন্যান্যদের থেকে বড় হয়ে জন্মেছে। বেদান্তে ব্যক্তিগত বাড়তি সুযোগ - সুবিধাকে খন্ডন করা হয়েছে। স্বামীজির মতে, বেদান্তে স্বীকৃত ব্যবস্থা সমাজজ্ঞানের যেমন বিকাশ ঘটাবে তেমনই সমাজের প্রগতি সম্ভব হবে। সনাতন হিন্দুসমাজের অস্পৃশ্যতাজনিত ব্যবস্থা স্বামীজিকে মর্মাহত করেছে। এই ব্যবস্থা থেকে সমাজকে মুক্তি দেওয়ার জন্য তিনি সারাজীবন লড়াই চালিয়ে গেছেন। ভারতীয় সংবিধানের ১৭নং ধারায় অস্পৃশ্যতার কারণে ভেদাভেদ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। ভারতীয় পার্লামেন্ট ১৯৫৫ সালে 'অস্পশ্যতাসংক্রান্ত অপরাধ আইন' গড়ে তুলেছে।[২৫] অস্পৃশ্যতাজনিত অপরাধের জন্য শাস্তিবিধানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও সমাজ থেকে এই অপরাধ দূরীভূত হয়নি। সমাজের মানুষজন যতদিন না সচেতন হচ্ছে ততদিন এর কুফল আমাদেরকেই ভোগ করতে হবে। এছাড়া, ছোঁয়াছুয়ির মত অমানবিক প্রথা সমাজে এক ব্যাধি দীর্ঘকাল ধরে বজায় ছিল। সমাজের এই ব্যাধি নিরাময়ের জন্য তিনি উদ্যোগী হয়েছিলেন। কিন্তু বর্তমান সমাজে এই ব্যাধিটির অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়।

বিশ্বজনীন মানবতা ঃ- স্বামীজি আধ্যাত্মিক চেতনার আলোকে বিশ্বভ্রাতৃত্ববোধ গড়ে তোলার জন্য সচেষ্ট হয়। তাঁর চিন্তায় বিশ্বজনীন মানবতার চেতনা প্রত্যেকের মধ্যে গড়ে তোলার প্রচেষ্টা দেখা যায়। এক্ষেত্রে তিনি মানুষের সুকুমার বৃত্তিগুলি প্রস্ফুটিত করার কথা বলেছেন। তিনি সকল জাতির সদগুণের ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন। সমাজের বিকাশ সাফল্যের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য ত্রুটিমুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করা প্রয়োজন বলে তিনি মনে করেছেন। স্বামীজির এই বিশ্বজনীন মানবতার ধারণা বর্তমান সমাজেও প্রাসঙ্গিকতার দাবি রাখে। মূলত আদর্শ সমাজ সম্পর্কিত স্বামীজির ধারণা হল মানবতাবাদী। তিনি সমাজের সকল মানুষের প্রতি পুরোপুরি বিশ্বাস বজায় রাখার কথা বলেছেন। তিনি মানুষকেই ঈশ্বর জ্ঞান করতেন। এছাড়া সমাজের মঙ্গল সাধনের জন্য ও আদর্শ সমাজ গঠনের স্বার্থে সকলকে কাজ করার আহ্বান জানিয়েছিলেন। এক্ষেত্রে কোন

ভেদাভেদকে প্রশ্রয় দেয় নি। সমাজের প্রতিটি মানুষ তার নিজের প্রকৃতিকে অনুধাবন করবে, আর এটি করতে পারলেই সমাজে মানুষ তার সম্পূর্ণতা পাবে। ফলস্বরূপ সমাজ কাঠামো আদর্শরূপে গড়ে উঠবে। সেক্ষেত্রে স্বামীজির নারী-পুরুষ, সবল-দুর্বল, জাতি-বর্ণ প্রভৃতি নির্বিশেষে প্রতিটি মানুষের মধ্যে অসীম সম্ভাবনাময় আত্মার অস্তিত্ব বর্তমান রয়েছে, এরকম মানুষকে নিয়ে যে সমাজ গঠিত হবে সে সমাজ হল পবিত্র ও আদর্শ সমাজ।

স্বামীজি দেশের সমগ্র অধিবাসীদের সমান সুযোগ-সুবিধা দানের পক্ষপাতি ছিলেন। তবে তিনি বঞ্চিত, শোষিত ও অবহেলিতদের বাড়তি সুযোগ-সুবিধাদানের কথা বলেছেন। আর তা না হলে তারা পিছিয়ে পড়বে এই মত জ্ঞাপন করেছেন। তিনি মন্তব্য করেছেন যে, দৈহিক দিক দিয়ে কিছু মানুষ বিশেষ সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে, অন্যদিকে শিক্ষিত ব্যক্তিরা কিছু বিশেষ সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে, আবার, আত্মিক শক্তিতে বলীয়ান হয়ে কিছু মানুষ সুবিধা ভোগ করে, এই তিন ধরণের সুযোগ-সুবিধার পুরোপুরি অবসান তিনি চেয়েছিলেন। তিনি মনে করেন যে, এই অবসানের প্রেক্ষাপটে গড়ে তুলতে হবে এমন এক সমাজ যেখানে সকল ব্যক্তি স্বাধীনতা যা 'বহুজন হিতায় বহুজন সুখায়'।[২৬] তাঁর এই ধারণাটি অনেকখানি দার্শনিক জন স্টুয়ার্ট মিলের ধারণার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

মূল্যায়নঃ-

বীর সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দের দার্শনিক ভাবনায় আদর্শ সমাজ গঠনের গুরুত্বকে কোনভাবেই অস্বীকার করা যায় না। তৎকালীন সমাজের বেকারত্ব, দারিদ্র, পুঁজিবাদী শোষণ, সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের বিপন্নতা, অসাম্য প্রভৃতি বিষয়সমূহ তাঁর চিন্তাধারায় ব্যাপক পরিবর্তন ঘটিয়েছিল। সেক্ষেত্রে তিনি এই সমস্ত সমস্যা থেকে মুক্তিদানের জন্য সাম্যবাদী আদর্শ সমাজ গড়ে তোলার প্রতি নজর দিয়েছিলেন। অন্ধবিশ্বাসের দ্বারা পরিচালিত ধর্মের সংস্কারসাধন করে মানুষের প্রতি সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন। জীবরূপে ঈশ্বরকে সেবা করাকেই প্রকৃত মানবধর্ম বলে মনে করেছিলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক যদি সৌভ্রাতৃত্বমূলক হয় তাহলেই মানবতাবাদ গড়ে উঠতে পারে; যা আদর্শ সমাজের প্রতিফলন ঘটাবে। স্বামীজির ভাবনায় এসেছিল যে, সমৃদ্ধশালী, ঐতিহ্যপূর্ণ ও সংস্কৃতিসম্পন্ন সমাজ গড়ে তোলার মানসিকতা থেকেই মানুষেরা প্রতিটি সমাজেই বিপ্লব সংঘটিত করবে, বিদ্যমান সমাজের পরিবর্তন ঘটাবে এবং সমাজ আরও বেশি বিকাশশীল ও উন্নত হয়ে উঠবে। আবার, তিনি হিন্দুসমাজের রক্ষণশীল বর্ণবিন্যাস ও জাতিভেদ প্রথার ভিত্তিতে গড়ে ওঠা স্তরবিন্যাসের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেছিলেন। জাতপাতের বৈষম্যভিত্তিক স্তরবিন্যাস হিন্দু সমাজ ব্যবস্থা থেকে যাবতীয় বৈষম্য দূর করে তিনি সামাজিক সাম্য প্রতিষ্ঠার কথা বলেছেন, যা আদর্শ সমাজ গড়ার মূল সোপান বলে মনে করা হত। তিনি এই মর্মে সমাজের নীচুস্তরের মানুষকে উপরে টেনে তুলে এনে সাম্য প্রতিষ্ঠা করার পক্ষপাতি ছিলেন। এছাড়া, বর্তমান ভারতবর্ষের সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, সংহতি, কৃষ্টি প্রভৃতির মধ্যে সমন্বয়সাধন করে আদর্শ সমাজ গড়ে তোলার প্রতি তিনি আকৃষ্ঠ হয়েছিলেন। এক্ষেত্রে স্বামীজির ভাবনা বর্তমান

সমাজে প্রাসঙ্গিকতার দাবি রাখে। কেননা, আদর্শ সমাজ গড়ার ভাবনা তাঁর মধ্যেই প্রথম এসেছিল। মূলত স্বামীজি আদর্শ সমাজ গঠন করার ক্ষেত্রে যে সকল কাঠামোগুলি ব্যবহার করেছিলেন, তার প্রতিফলন ভারতীয় সমাজে পুরোপুরি বাস্তবায়িত না হলেও কিছুটা বাস্তবায়িত হয়েছে। তবে, স্বামীজির ভাবনাকে বাস্তবে প্রতিফলিত করার জন্য ভারতবর্ষের সমাজ সংস্কৃতিতে মিশ্র অর্থনীতি, ধর্মনিরপেক্ষতা, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, ঐক্য, সংহতি, শিক্ষার বিস্তার, মৌলিক স্বাধীনতা ও অধিকার, ন্যায়পরায়ণতা, সাম্যভিত্তিক ব্যবস্থা প্রভৃতি সুমহান আদর্শগুলিকে গ্রহণ করা হয়েছে। মূলত এই আদর্শগুলিকে গ্রহণ করা হয়েছে সুষম সমাজ গঠনের স্বার্থে। সুতরাং আমার গবেষণামূলক প্রবন্ধের সার্থকতা তখনই লাভ করবে যখন ভারতীয় সমাজ-সংস্কৃতিতে গ্রহণ করা এই সুমহান আদর্শগুলির যথাযথ বাস্তবায়ন ঘটবে এবং তা কার্যকর করা সম্ভব হবে।

তথ্যসূত্রঃ-

১. Das, Dr. Manoranjan, God and the Universe: Religious and Scientfic Approaches, Maha Bodhi Book Agency, First Published, Kolkata, March, 2018, p. 208.

২. বসু, শঙ্করীপ্রসাদ, বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ, মন্ডল বুক হাউস, তৃতীয় খন্ড, তৃতীয় সংস্করণ, কলকাতা, এপ্রিল, ১৯৮৩, পৃ. ৩৫৫।

৩. বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রদ্যুন্ন, মহাপাত্র, অনাদিকুমার, ভারতীয় রাষ্ট্রদর্শন, সুহৃদ পাবলিকেশন, চতুর্থ সংস্করণ, কলকাতা, জানুয়ারি, ২০০৯, পৃ.. ২৩০।

৪. চক্রবর্তী, দেবাশিস, ভারতীয় রাষ্ট্রচিন্তার ধারা, সেন্ট্রাল বুক পাবলিশার্স, তৃতীয় সংস্করণ, কলিকাতা, জানুয়ারি, ২০০৯, পৃ..২৯২।

৫. সর্বভূতানন্দ, স্বামী, সবার স্বামীজি, রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার, দ্বাদশ সংস্করণ, কলকাতা, জানুয়ারি, ২০১২, পৃ.. ৫৮।

৬. ঘোষ, বিপত্তারণ, রায়, সুধীর, ভারতের সংবিধান এবং এর ক্রমবিবর্তন, প্রগতিশীল প্রকাশক, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা, জানুয়ারি, ২০১১, পৃ.. ৮০।

৭. বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রদ্যুন্ন, মহাপাত্র, অনাদিকুমার, ভারতীয় রাষ্ট্রদর্শন, সুহৃদ পাবলিকেশন, চতুর্থ সংস্করণ, কলকাতা, জানুয়ারি, ২০০৯, পৃ. ২১৫।

৮. প্রামাণিক, নিমাই, সামাজিক ও রাজনৈতিক ধারণা ও বিচার্য বিষয়সমূহের রূপরেখা, ছায়া প্রকাশনী, দ্বিতীয় সংস্করণ, কলকাতা, সেপ্টেম্বর, ২০০১, পৃ. ১৫৬।

৯. দাশগুপ্ত, অধ্যাপিকা সান্তনা, বিবেকানন্দের সমাজ দর্শন, উদ্বোধন কার্যালয়, দ্বিতীয় সংস্করণ, কলকাতা, এপ্রিল, ২০১২, পৃ.১৪১।

১০. পূর্বোক্ত, ঐ, পৃ..১৪২।

১১. পূর্বোক্ত, ঐ, পৃ..১৪৩।

১২. পূর্বোক্ত, ঐ, পৃ..১৪৩-১৪৪।

১৩. দত্ত, ড. ভূপেন্দ্রনাথ, স্বামী বিবেকানন্দ, নবভারত পাবলিশার্স, তৃতীয় সংস্করণ, কলকাতা, আশ্বিন, ১৪০০, পৃ. ২৩৭।

১৪. সরকার, কল্যাণকুমার, ভারতীয় রাষ্ট্রবিন্তার ইতিহাস, শ্রীভূমি পাবলিশিং কোম্পানী, দ্বিতীয় সংস্করণ, কলকাতা, জানুয়ারি, ২০০৭, পৃ. ২০৭।

১৫. চক্রবর্তী, সত্যব্রত, ভারতবর্ষ রাষ্ট্রভাবনা, প্রকাশন একুশে, দ্বিতীয় সংস্করণ, কলকাতা, মে, ২০০৩, পৃ. ১৬৮।

১৬. সোম, ড. সুভাষচন্দ্র, ভারতীয় রাষ্ট্রচিন্তার ইতিহাস, ক্যালকাটা বুক হাউস, দ্বিতীয় সংস্করণ, কলকাতা, ফেব্রুয়ারি, ২০০৯, পৃ. ৬৯৭।

১৭. লোকেশ্বরানন্দ, স্বামী, চিন্তানায়ক বিবেকানন্দ, রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার, দ্বিতীয় সংস্করণ, কলকাতা, সেপ্টেম্বর, ২০১৮, পৃ. ৩৭১।

১৮. সোম, ড. সুভাষচন্দ্র, ভারতীয় রাষ্ট্রচিন্তার ইতিহাস, ক্যালকাটা বুক হাউস, দ্বিতীয় সংস্করণ, কলকাতা, ফেব্রুয়ারি, ২০০৯, পৃ. ৬৩৩।

১৯. সূপর্ণানন্দ, স্বামী, আমার ভারত অমর ভারত, রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার, অষ্টাদশ প্রকাশ, কলকাতা, নভেম্বর, ২০১৭, পৃ. ৮৮-৮৯।

২০. চেতনানন্দ, স্বামী, বেদান্তঃ মুক্তির বাণী, উদ্বোধন, কার্যালয়, ১৪তম সংস্করণ, কলকাতা, ফেব্রুয়ারি, ২০১৩, পৃ. ৪৫।

২১. সরকার, কল্যাণকুমার, ভারতীয় রাষ্ট্রচিন্তার ইতিহাস, শ্রীভূমি পাবলিশিং কোম্পানী, দ্বিতীয় সংস্করণ, কলকাতা, জানুয়ারি, ২০০৯, পৃ. ১৮০।

২২. Khatua, Alok Ranjan, Dr. Chandra Subhas, Philosophical Perspectives of Rabindranath Tagore and Swami Vivekanda on Education in the Present Scenario, Redders Service, First Published, MGM, 2012, p. 108.

২৩. মুমুক্ষানন্দ, স্বামী, স্বামী বিবেকানন্দের বাণী-সঞ্চয়ন, উদ্বোধন কার্যালয়, দ্বিতীয় সংস্করণ, কলকাতা, জানুয়ারি, ২০১৩, পৃ. ৩৪।

২৪. সূপর্ণানন্দ, স্বামী, আমার ভারত অমর ভারতঃ স্বামী বিবেকানন্দ, রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার, অষ্টাদশ প্রকাশ, কলকাতা, নভেম্বর, পৃ. ৬৩-৬৫।

২৫. বসু, ড. দুর্গাদাস, ভারতের সংবিধান পরিচয়, লেকসিস নেকসিস, দ্বিতীয় সংস্করণ, হরিয়ানা, ২০১৩, পৃ. ১১৫।

২৬. মুমুক্ষানন্দ, স্বামী,ভাববার কথাঃ স্বামী বিবেকানন্দ, উদ্বোধন কার্যালয়, ত্রয়োদশ সংস্করণ, কলকাতা, ফেব্রুয়ারি ২০১২, পৃ. ১৩।

ঊনবিংশ শতকে নারীর ক্ষমতায়নে বিদ্যাসাগর ও বিধবা ভাতা

অক্ষয় দত্ত
গবেষক, ইতিহাস বিভাগ, বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ :
ক্ষমতায়ন হল এমন একটা পক্রিয়া যা ব্যক্তির নিজের জীবন, সমাজ এবং নিজের সম্প্রদায়ে ক্ষমতা সৃষ্টি করে। নারীর ক্ষমতায়ন বলতে বোঝায়, যে সমস্ত উপাদান নারীর আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনে সামাজিক প্রত্যাখ্যান বা বঞ্চনাকে সৃষ্টি ও লালন-পালন করে সেগুলির যথাযথ অপসারণ করা যাতে মহিলারা নাগরিক সমাজের সমস্ত প্রতিষ্ঠান ও কাজকর্মে স্বাধীনভাবে অংশগ্রহণ করতে পারে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাঙালী সমাজে নারীদের অবস্থান বিশেষ একটা ভালো ছিল না। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রেক্ষাপটে যে সকল বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বের কর্মপ্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে বাংলার সমাজ এক নতুন দিশা অর্জন করেছিল তাঁরা হলেন রাজা রামমোহন রায়, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, পন্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, ডিরোজিও প্রমুখ ব্যক্তিত্ব। প্রবন্ধ আলোচনায়, নারীর ক্ষমতায়নে বিদ্যাসাগরের প্রচেষ্টা, সাফল্য ও ব্যর্থতা এবং সাম্প্রতিক তথ্যপ্রাপ্ত বিধবা ভাতাও আলোচিত হবে। বিদ্যাসাগরের সংস্কার প্রচেষ্টার কেন্দ্রে ছিল নারী। তাঁর সমস্ত সংস্কার প্রচেষ্টা নারীপ্রশ্নকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়েছে। নারীকে তিনি ব্যক্তি হিসেবে ভাবতে চেয়েছিলেন এবং তাঁর সংস্কার আন্দোলনগুলোর মধ্যদিয়ে তাঁর এই ভাবনা সুস্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হয়।

সূচক শব্দ : নারীমুক্তি আন্দোলন, বিদ্যাসাগর, বিধবা বিবাহ, নারীশিক্ষা, বহুবিবাহ, বাল্যবিবাহ, বিধবা ভাতা।

মূল আলোচনা : ঊনবিংশ শতাব্দী বাংলা তথা ভারতের জাতীয় জীবনের এক গৌরবময় যুগ। এই শতাব্দীর প্রায় প্রারম্ভকাল হতে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও জ্ঞান বিজ্ঞানের চর্চা বাঙালীর প্রতিভা দীর্ঘকালব্যাপী প্রচলিত সামাজিক ও ধর্মীয় কুসংস্কারের শৃঙ্খলমুক্ত হয়ে বৈজ্ঞানিক ও মানবিক যুক্তিবাদের আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। বাংলার এই অভিনবযুগের প্রথম ব্যক্তি রামমোহন। তাঁর একজন প্রকৃত উত্তরসূরী ছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮২০-১৮৯১ খ্রিস্টাব্দ)।[১] অবশ্য তিনি শর্ম্মা পদবিতেও স্বাক্ষর করতেন। সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যে অগাধ পান্ডিত্যের জন্য প্রথম জীবনেই তিনি বিদ্যাসাগর উপাধি(১৮৩৯) লাভ করেন। বাংলা গদ্যের প্রথম সার্থক রূপকার তিনিই। তাঁকে বাংলা গদ্যের প্রথম শিল্পী বলে অভিহিত করেছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সামাজিক দিক দিয়ে নারীকে প্রতিষ্ঠিত করতে চাইলে, শিক্ষা যে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তা তিনি উপলব্ধি করেছিলেন। নারীমুক্তির বিষয়ে তাঁর প্রধান উদ্যোগই ছিল- নারীশিক্ষা, বিধবা বিবাহ প্রচলন, বাল্যবিবাহ এবং বহুবিবাহ রোধ। বিদ্যাসাগর

বিশ্বাস করতেন প্রশাসনিক ও আইনি সহায়তা ভিন্ন এই সমাজ সংস্কারের কাজগুলি সম্ভব নয়, কিন্তু তার জন্য সার্বিক উদ্যম এবং সমাজ সংস্কারক আন্দোলন ও জনমত গঠন অবশ্যই প্রয়োজন। বিদ্যাসাগরের পূর্বেও ইংরেজ প্রশাসকরা নারীশিক্ষা বিস্তার নিয়ে ভেবেছিলেন, তা মূলতঃ মিশনারীদের উদ্যোগে। তারা শিক্ষার্থীদের ধর্মান্তরিত করার চেষ্টা করত, এটাও তাদের অন্যতম উদ্দেশ্য এবং সফলও হত। সেই কারণে ইচ্ছে থাকলেও অনেকে তাদের কন্যাদের স্কুলে পাঠাতেন না। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও ড্রিংকওয়াটার বিটন উদ্যোগী হয়ে কলকাতায় হিন্দু বালিকা বিদ্যালয়(১৮৪৯) প্রতিষ্ঠা করেন। এটিই ভারতের প্রথম বালিকা বিদ্যালয়। বিদ্যাসাগর ছিলেন এই বিদ্যালয়ের সম্পাদক। এটি বর্তমানে বেথুন স্কুল নামে পরিচিত। ২১ জন ছাত্রী নিয়ে শুরু করলেও একটা সময় কমতে শুরু করেছিল ছাত্রী সংখ্যা। ১৮৫১ সালের জুলাই মাসে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তার বড় মেয়েকে এই স্কুলে ভর্তি করে দিলে অনেক ছাত্রী উৎসাহিত হল এখানে ভর্তি হতে। ১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দের ১লা আগস্ট বেথুন স্কুল বঙ্গ মহিলা বিদ্যালয়ের সঙ্গে সংযুক্ত হয়। এখানকার ছাত্রী কাদম্বিনী বসু উচ্চশিক্ষার ইচ্ছা প্রকাশ করলে তাঁর স্বীকৃতিতে বেথুন কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৭৯ খ্রিস্টাব্দে এবং পরে তিনি বিখ্যাত ডাক্তার হন। ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে বর্ধমান জেলায় মেয়েদের জন্য তিনি একটি বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। গ্রামাঞ্চলে নারীদের মধ্যে শিক্ষার প্রসারের উদ্দেশ্যে তিনি বাংলার বিভিন্ন জেলায় স্ত্রীশিক্ষা বিধায়নী সম্মেলনী প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি সম্পূর্ণ নিজের চেষ্টায় বাংলার বিভিন্ন জেলায় (হুগলিতে ২০টি, বর্ধমানে ১১টি, মেদিনীপুরে ৩টি, নদীয়ায় ১টি) মোট ৩৫টি বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন, যেগুলিতে প্রায় ১৩০০ ছাত্রী পড়াশোনার সুযোগ পেয়েছিল। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন- "যেখানে নারীরা সন্মানিত হয়, সেখানে ভগবান বাস করে।" পরবর্তীকালে সরকার এই স্কুলগুলোর কিছু আর্থিক ব্যয়ভার বহন করতে রাজি হয়। ১৮৬৪ সালে বাংলায় বালিকা বিদ্যালয়ের সংখ্যা দাঁড়ায় ২৮৮ টি। উচ্চশিক্ষার সুযোগ বাড়ানোর লক্ষ্যে তিনি কলকাতায় ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠা করেন মেট্রোপলিটন ইনস্টিটিউশন (বর্তমানে বিদ্যাসাগর কলেজ নামে পরিচিত)। এবং ১৮৯০ সালে নিজ মায়ের স্মৃতির উদ্দেশ্যে নিজ গ্রাম বীরসিংহে প্রতিষ্ঠা করেন ভগবতী বিদ্যালয়। বিদ্যাসাগরের শিক্ষা সংস্কারের প্রচেষ্টায় দেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সঙ্গে ইংরেজি ভাষা ও পাশ্চাত্য ভাবধারার মিলন ঘটে।[২]

বাঙালি মায়ের মমত্ববোধ ছিল বলেই বিধবাদের দুঃখে তাঁর চোখে জল এসে যেত। সমস্ত সামাজিক কুপ্রথাকে তিনি হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। বিধবা বিবাহ প্রচলনের প্রয়োজনীতার কথা তিনি প্রবলভাবে অনুভব করলেন। ১৮৫৫ সালের জানুয়ারি মাসে 'বিধবা বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব' প্রথম পুস্তক প্রকাশিত হয়। সেখানে তিনি 'পরাশর সংহিতার' দু'লাইনের একটি শ্লোকের ব্যাখ্যা দিয়ে বললেন বিধবাবিবাহ অশাস্ত্রীয় নয়-

নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবে চ পতিতে পতৌ।
পঞ্চস্বাপৎসু নারীণাং পতিরন্যো বিধীয়তে।।

যার অর্থ- স্বামী নিখোঁজ হলে বা তাঁর মৃত্যু হলে, নপুংসক আর পতিত হলে তাঁর স্ত্রী আবার বিবাহ করতে পারেন।[৩] এই পুস্তকে তিনি লিখছেন-
"দুর্ভাগ্যক্রমে বাল্যকালে যাহারা বিধবা হইয়া থাকে, তাহারা যাবজ্জীবন যে অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করে তাহা যাহাদের কন্যা, ভগিনী, পুত্রবধূ প্রভৃতি অল্পবয়সে বিধবা হয়েছেন, তাঁহারা বিলক্ষণ অনুভব করিতেছেন কত শত বিধবারা, ব্রহ্মচর্য্য নির্ব্বাহে অসমর্থ হইয়া ব্যভিচার দোষে দূষিত ও ভ্রূনহত্যা পাপে লিপ্ত হইতেছে; এবং পতিকুল, পিতৃকুল ও মাতৃকুল কলঙ্কিত করিতেছে। বিধবাবিবাহের প্রথা প্রচলিত হইলে অসহ্য বৈধব্য যন্ত্রণা, ব্যভিচার দোষ ও ভ্রূণহত্যা পাপের নিবারণ ও তিনকুলের কলঙ্ক নিরাকরণ হইতে পারে। যাবৎ এই শুভকরী প্রথা প্রচলিত না হইবেক, তাবৎ ব্যভিচার দোষের ও ভ্রূণহত্যা পাপের স্রোত, কলঙ্কের প্রবাহ ও বৈধব্যযন্ত্রণার অনল উত্তরোত্তর প্রবল হইতেই থাকিবে।"[৪] বিধবা বিবাহ আন্দোলনের প্রেক্ষিতে, নারীর যৌনতা যে একটি গুরুত্বপূর্ণ মাত্রা যোগ করেছিল, বিদ্যাসাগরের লেখার মধ্য দিয়ে সেটা খুব ভালোভাবেই প্রতিপন্ন হয়। বিধবাবিবাহ প্রচেষ্টার মধ্যদিয়ে নারীকে ব্যক্তি হিসেবে তুলে ধরার সব থেকে বৈপ্লবিক দিকটি হল যে এই আন্দোলন এবং তাঁর বৈধকরণের মধ্য দিয়ে অন্তত ধারণাগত স্তরে সতীত্বের যে মূল্যবোধ, তার আমূল পরিবর্তন ঘটে। সাধারণভাবে 'সতীত্ব' বা এক পুরুষের প্রতি বিশ্বস্ততা প্রায় সকল সমাজেই একটি স্বীকৃত মূল্যবোধরূপে নারীর ওপর আরোপ করা হতো এবং এখনো হয়। কিন্তু ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থায় এই মূল্যবোধের সঙ্গে জড়িত ছিল নারীর পাপ-পুণ্যের প্রশ্ন, স্বর্গপ্রাপ্তির ধারণা। বিদ্যাসাগর যখন বিধবাদের জন্য পুনর্বিবাহের প্রস্তাব করলেন, তখন এক স্বামী বা পুরুষের প্রতি আজীবন বিশ্বস্ত থাকার বিষয়টি আর প্রাসঙ্গিক থাকল না। সুতরাং সতীত্ব নামক সামাজিক মূল্যবোধের দাবি থেকে তাঁর মুক্তি ঘটল।[৫] আসলে বিদ্যাসাগরের পূর্বে বিধবাবিবাহ সংক্রান্ত যাবতীয় প্রচেষ্টা শাস্ত্রীয় ও তাত্ত্বিক স্তরেই আবর্তিত হয়েছিল। বিদ্যাসাগর সুস্পষ্টভাবে একে একটি সামাজিক আন্দোলনে পরিণত করেন। বৈধব্যযন্ত্রণার মুক্তির বিষয়টি যে বাঙালি সমাজের ভারসাম্য রক্ষার সমস্যার সঙ্গে জড়িত, তা কিন্তু এই রচনায় তিনি প্রত্যক্ষভাবেই তুলে ধরেছেন। অর্থাৎ বাঙালি সমাজে বৈধব্য সমস্যা শুধু নারীর সমস্যা নয়, তা বৃহত্তম সামাজিক সমস্যার দ্যোতক। যখনই এরকম একটি বক্তব্য তিনি এই পুস্তিকাটিতে তুলে ধরলেন, তখনই বিধবা বিবাহ আন্দোলন সমাজে গতিসঞ্চার করে।[৬]

অবশ্য বিদ্যাসাগরের পক্ষে বিধবা বিবাহকে প্রচলিত করা খুব একটা সহজ কাজ ছিল না। তাছাড়া সেই সময় হিন্দু সমাজে ধার্মিকতা, প্রচলিত দেশাচার, শাস্ত্র, ব্রাহ্মণ্য সমাজ, এবং উচ্চবিত্ত সম্ভ্রান্ত শ্রেণি ও ধর্মব্যবসায়ীদের বেশ প্রভাব ছিল। তাই এই গন্ডিকে অতিক্রম করে সাধারণ মানুষের কাছে বিধবাবিবাহের প্রয়োজনীয়তা ছড়িয়ে

দেওয়া বেশ কঠিন কাজ তা তিনি উপলব্ধি করেছিলেন। প্রচুর বিরোধিতা আসতে লাগল সম্ভ্রান্ত শ্রেণী ও পন্ডিত সমাজ থেকে। বিধবা বিবাহকে যথারীতি শাস্ত্র বিরোধী, হিন্দু বিরোধী বলে ধর্ম ব্যবসায়ীরা প্রচার করতে লাগল। রাধাকান্ত দেব বিধবা বিবাহের ঘোরতর বিরোধী। কলকাতার ধর্মসভা, যশোহরের হিন্দুধর্ম সংরক্ষণী সভা প্রভৃতি সংস্থা থেকেও বিদ্যাসাগরের বিরোধিতা করা হয়। তাঁর বিরুদ্ধে সমালোচনার জবাব দেবার জন্য বিদ্যাসাগর ১৮৫৫ সালের অক্টোবর মাসে পর্যাপ্ত শাস্ত্রীয় প্রমান সহ 'বিধবা বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব'- দ্বিতীয় পুস্তক প্রকাশ করেন। সংস্কার আন্দোলনের পুরোধা রামমোহনের মতোই বিদ্যাসাগর আইনের হস্তক্ষেপ ব্যতিরেকে সামাজিক ধ্যানধারণাকে পরিবর্তনের মধ্য দিয়েই বিধবা বিবাহের বিষয়টিকে প্রচলিত করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু সেটা হয়নি। কারণ, সাধারণ মানুষের অজ্ঞতা হেতু তাদের কাছে শাস্ত্রের অনুমোদন প্রতিপন্ন করে তোলা খুব সহজ কাজ নয়। একে প্রতিপন্ন করতে হলে রাষ্ট্র ও আইনের সর্মথন প্রয়োজন। যাইহোক অনেক যুক্তি-তর্ক চলার পর অবশেষে ১৮৫৬ খ্রিষ্টাব্দের ২৬ শে জুলাই বিধবা-বিবাহ আইনে পরিণত হয়। এই আইন প্রণয়নে বিদ্যাসাগর মহাশয় ছাড়াও ব্যবস্থাপক সভার অন্যতম সদস্য জে. পি. গ্রান্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন।[৭] ওইবছর ৭ই ডিসেম্বর প্রথম বিধবাবিবাহ অনুষ্ঠিত হয়, পাত্র শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্নের সঙ্গে বর্ধমান জেলার পলাশডাঙা নিবাসী ব্রহ্মানন্দ মুখোপাধ্যায়ের দ্বাদশবর্ষীয়া বিধবা কন্যা কালীমতী দেবীর। এছাড়া ১৮৭০ সালের ১১ই আগস্ট বিদ্যাসাগর মহাশয় নিজপুত্র নারায়নচন্দ্রের সঙ্গে কৃষ্ণনগর নিবাসী শম্ভুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের চতুর্দশবর্ষীয়া বিধবা কন্যা ভবসুন্দরীর সাথে বিবাহ দেন।

অবশ্য বিধবাবিবাহ আইন পাশ হবার পরেও গোটা ঊনিশ শতক জুড়ে একশত বিবাহ হয়েছিল কিনা সন্দেহ। বিধবাবিবাহ আইনটি ছিল সমর্থনসূচক, যা না করলে শাস্তির কোনো ব্যবস্থা নেই। অর্থাৎ বিধবাবিবাহ একান্তভাবেই ছিল ব্যক্তির ইচ্ছাসাপেক্ষ, তাই কোনো সমর্থনসূচক আইন সমাজে জনপ্রিয় হয়ে ওঠার ক্ষেত্রে বেশ কষ্টসাধ্য।[৮] সুতরাং বিধবা বিবাহের ব্যর্থতা খুঁজতে গেলে আমাদের আরো গভীরে, গোড়ায় যেতে হবে। যেখানে বিধবাদের সংখ্যাবৃদ্ধির মূল কারণ- বাল্যবিবাহ ও কুলীন বহুবিবাহ, সেখানে এই দুটি প্রথাকে সম্পূর্ণ নির্মূল না করে বিধবাবিবাহ প্রচলন কতটা যুক্তিসঙ্গত তা নিয়ে সন্দেহ থেকে যায়। আসলে এই দুটি সামাজিক প্রথাকে মোকাবিলা না করে তিনি বিধবা বিবাহের ওপর যে গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন তাঁর প্রভাব যে সীমিত হবে তা সম্ভবত বিদ্যাসাগর বুঝে উঠতে পারেননি।[৯] যদিও বিদ্যাসাগর ১৮৫০ সালে বাল্যবিবাহের প্রশ্নকে সামনে রেখেই তাঁর সংস্কার আন্দোলন শুরু করেছিলেন এবং ১৮৫০ সালে সর্ব্বশুভকরী পত্রিকায় 'বাল্যবিবাহের দোষ' শীর্ষক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়।[১০] এখানে বিদ্যাসাগর কোনো শাস্ত্রীয় যুক্তিকে অনুসরণ না করে সম্পূর্ণ মানবিক ও

যুক্তিবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে বাল্যবিবাহের সমালোচনা করেছিলেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় পরবর্তীকালে তিনি এ নিয়ে আর পুস্তিকা বা প্রবন্ধ রচনা করেননি বা সেভাবে আন্দোলন গড়ে তুলতে পারেননি। এরপর অপর একটি প্রসঙ্গ কুলীন বহুবিবাহ। বিদ্যাসাগর মহাশয় বিধবাবিবাহ আন্দোলনের পরবর্তী ধাপে বহুবিবাহবিরোধী আন্দোলনে সক্রিয় হয়ে ওঠেন এবং ১৮৫৫ সালে সরকারের কাছে আবেদন করেছিলেন কৌলিন্য প্রথাজনিত বহুবিবাহ নিষিদ্ধ করার জন্য। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রবন্ধ রচনা করে তিনি প্রমাণ করার চেষ্টা করেন যে, সনাতন হিন্দুধর্মে এবং শাস্ত্রে এইসব প্রথার নির্দেশ দেওয়া হয়নি। শাস্ত্রের ভ্রান্ত ব্যাখ্যা থেকেই এইসব জঘন্য প্রথা চালু হয়েছে। কিন্তু বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহের বাইরে বিদ্যাসাগর যেভাবে বিধবাবিবাহে শাস্ত্রীয় সমর্থন কে ব্যবহার করেছিলেন তা পরবর্তীকালে এক অদ্ভুত পরিস্থিতির জন্ম দেয়, যেখানে শাস্ত্রীয় সমর্থনের সুযোগ নেই, সেই আন্দোলনকে বিদ্যাসাগর সক্রিয়ভাবে সমর্থন করা থেকে বিরত ছিলেন। ফলস্বরূপ শাস্ত্রীয় সমর্থন সবদিক দিয়ে অনুকূল না হওয়ায় বিদ্যাসাগর বহুবিবাহকে সম্পূর্ণরূপে নির্মূল করার দাবি তুলতে পারেননি। এমনকি শাস্ত্রীয় অনুমোদন না থাকায় তিনি ১৮৯১ সালে প্রস্তাবিত সম্মতি আইনকে সমর্থন করতে পারেননি। সুতরাং বিধবাবিবাহের ক্ষেত্রে শাস্ত্রের ব্যবহার শেষপর্যন্ত শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যা এবং পুনর্ব্যাখ্যার এক জটিল আবর্তের জন্ম দেয়। এছাড়াও সাধারণ মানুষের শাস্ত্রবিষয়ক অজ্ঞতার দরুন বিদ্যাসাগর মহাশয় যখন বিধবাবিবাহকে আইনের মাধ্যমে প্রচলিত করতে চেয়েছিলেন, সেখানেও প্রবল বাঁধা হয়ে দাঁড়ালো 'দেশাচার'।[১১] এটি শাস্ত্র এবং শাস্ত্রভিত্তিতে প্রণীত আইনের চেয়েও বেশি শক্তিশালী। যেখানে দেশীয় আচরণের মধ্যে বিধবার পুনর্বিবাহ দীর্ঘকাল অপ্রচলিত ছিল, সেখানে আইন বা শাস্ত্রীয় যুক্তি দিয়ে বিধবা বিবাহ প্রচলন করা সেভাবে সম্ভব হল না। সুতরাং বিদ্যাসাগর মহাশয় যদি শাস্ত্রীয় পথে সংস্কারের প্রচেষ্টা না করে আমূল পরিবর্তনের কর্মসূচি গ্রহণ করতেন, তাহলে দেশাচার এবং অন্যান্য সামাজিক বাধাকে অতিক্রম করলেও করতে পারতেন। সাথে এটাও গুরুত্বপূর্ণ যে তাঁর সময়ে পারিপার্শ্বিক সামাজিক পরিবেশ-পরিস্থিতির উপরেও এই ব্যর্থতার দায় বর্তায়।

এই ব্যর্থতা স্বত্ত্বেও বিদ্যাসাগরের অসাধারণ চরিত্র ও সমাজ সংস্কারে তাঁর অনলস প্রচেষ্টা আমাদের স্বীকার করতেই হয়। নারী-স্বাধীনতার যে বীজ তিনি বপন করে গিয়েছিলেন পরবর্তীকালে তা মহীরূহে পরিণত হয়। এবং শিক্ষাজগতে নারীকে এগিয়ে দেবার জন্য তাঁর প্রয়াস সত্যিই তা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না, এককথায় অনবদ্য। বাস্তবিক দৃষ্টিভঙ্গিতে তিনি সমাজ ও সমাজের অগ্রগতিকে প্রাধান্য দিয়েছিলেন।

সাম্প্রতিক একটি বিষয় সামনে আসে ২০১৯ এর ২৯শে নভেম্বর, শুক্রুবার। বিদ্যাসাগর মহাশয় নাকি বিধবা ভাতারও প্রবর্তন করেছিলেন। ওইদিন সংস্কৃত কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের নজরে আসে পুরোনো দুটি সিন্দুক। প্রায় ৪ ঘন্টার চেষ্টায় একটি

সিন্দুকের তালা ভাঙা হয়। সেখান থেকে বেরিয়ে আসে মুক্তকেশী দেবী বিধবা ফান্ড নামের নথি, তিনটি মেডেল, সিল করা সাতটি খাম এবং আরও কিছু পুরোনো কাগজপত্র। সিন্দুক থেকে উদ্ধার করা কাগজপত্রে বিধবা মহিলাদের নাম উল্লেখ করা আছে, কাকে কত টাকা দিতে হবে সেটাও বলা আছে। ১৯৫৬ সালে প্রতিমাসে ২ টাকা করে দেওয়া হয়েছে ৮ জনকে,মোট আট টাকা দেওয়া হয়েছে। দু'জন মহিলা সই করে এবং বাকি ছয়'জন টিপসই দিয়ে অর্থ নিয়েছিলেন। উল্লেখ করা হয়েছে বর্ধমান ও মুর্শিদাবাদের দু'টি গ্রামের নামও। যাদেরকে এই বিধবা ভাতা দেওয়া হত, সেই সমস্ত বেশ কয়েকজন মহিলার নাম আমরা জানতে পারি। যেমন, নির্ম্মলা বালা দেবী, অমলা বালা দেবী, ঈশানী বালা দেবী, নিভাননী দেবী, প্রমিলা বালা দেবী প্রমুখ। এই বিষয়টি এখন বর্তমানে গবেষণার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। সুতরাং নারীর অগ্রগতিতে বিদ্যাসাগরের অবদান অতুলনীয়।[১২,১৩]

তথ্যসূত্র :

১) জানা, অনিল কুমার,(২০১৭), সামাজিক পরিবর্তনের অভিঘাতে নারীর ক্ষমতায়নঃ ভারতীয় পরিপ্রেক্ষিত, সমাজ জিজ্ঞাসা, দশম বর্ষ, সংখ্যা ১ ও ২য়, পৃ. ১৪৬।

২) ঘোষ, বিনয়,(১৩৩৮ বঙ্গাব্দ), বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ(৩য় খন্ড), বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, পৃ.৫০।

৩) বিদ্যাসাগর রচনা সংগ্রহ(২য় খন্ড),(১৯৭২),কলকাতা, পৃ.১২।

৪) তদৃশ, পৃ.৩২-৩৩।

৫) সরকার, সুমিত, (১৯৯৮), রাইটিং সোশ্যাল হিস্ট্রি, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, নিউ দিল্লি, পৃ. ১৫০।

৬) শীল, শেখর,বিধবাবিবাহ আন্দোলন ও বিদ্যাসাগরের সংস্কার প্রচেষ্টা, নারী ও প্রগতি, পৃ.৩৯।

৭) বসু, স্বপন,(২০০০), বাংলার নবচেতনার ইতিহাস, পুস্তক বিপনি, কলকাতা, পৃ.১৪১।

৮) চক্রবর্তী, রমাকান্ত (২০০৩),'তিন সংস্কারক (রামমোহন -বিদ্যাসাগর-বিবেকানন্দ)', পৃ.১৬৯।

৯) বসু, স্বপন,(২০০০), বাংলার নবচেতনার ইতিহাস, পুস্তক বিপনি, কলকাতা, পৃ. ১৪৭

১০) বসু, স্বপন (১৯৫৯), সমকালে বিদ্যাসাগর, পুস্তক বিপনি, পৃ.০৩।

১১) সামগ্রিকভাবে সংস্কার আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে 'দেশাচার' বা Custom-এর ভূমিকার সবিস্তার উল্লেখ করেছেন বঙ্কিমচন্দ্র।

১২) News-18 Bangla, (2019, 29November, Friday), নিয়মিত বিধবাভাতা দিতেন বিদ্যাসাগর, সংস্কৃত কলেজের ২০০ বছরের সিন্দুক খুলতেই অজানা ইতিহাসের হদিশ, https://youtu.be/nFkjkiXVUvQ

১৩) এই সময়, (২০১৯,২৯ নভেম্বর,শুক্রুবার), বিধবাদের জন্যও অর্থ বরাদ্দ করেছিলেন বিদ্যাসাগর! পুরোনো সিন্দুকে মিলল নথি, https://eisamay.com/west-bengal-news/kolkata-news/reveals-new-information-about-vidyasagar-after-locker-rescue-from-sanskrit-college/articleshow/72298444.cms

১৪) https://banglahunt.com/vidyasagar-start-bidhaba-vata/

জনস্বাস্থ্যে মেদিনীপুর জেলার মহিলাদের অবস্থান (১৯৭০-২০০১)

সুশান্ত দে
সহকারী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ
শিলদা চন্দ্রশেখর মহাবিদ্যালয়

সাম্প্রতিক ইতিহাস চর্চার একটি অন্যতম অভিমুখ হল সমাজ ও মানুষকেন্দ্রিক গবেষণা। যার পরিপ্রেক্ষিতে বিজ্ঞান ও চিকিৎসা নামে এক নতুন ধরনের ইতিহাস চর্চা ঐতিহাসিকদের কাছে গুরুত্ব লাভ করেছে। বর্তমান প্রবন্ধটি এই ধরনের ইতিহাস চর্চার একটি ক্ষুদ্রতম সংযোজন মাত্র। স্থানীয় ইতিহাস চর্চার সঙ্গে সঙ্গে স্থানীয় জনস্বাস্থ্যের বিষয়টিও ঐতিহাসিকদের সতর্ক দৃষ্টির বহির্ভূত হতে পারে নি। বিশেষ করে মেদিনীপুর জেলার মহিলাদের জনস্বাস্থ্য কেমন ছিল এই প্রবন্ধটির মূল উদ্দেশ্য কিন্তু তারই ইঙ্গিতবাহী। কেননা দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নতি ঘটলেও মহিলাদের শোষণ ও বঞ্চনা অব্যাহত। মহিলাদের মানবাধিকার লঙ্ঘিত হচ্ছে সর্বত্রই, কি ঘরে? কি বাইরে? সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রে মহিলাদের অবদান ও অংশগ্রহণ থাকা সত্বেও এরাই সর্বপেক্ষা নিপীড়িত।

১৯৭৪ সালের আগে মেদিনীপুর জেলা তথা সমগ্র ভারতবর্ষে মহিলাদের স্বাস্থ্য ব্যাপারটি ছিল একেবারেই অবহেলিত। এতটাই অবহেলিত যে বাড়ীর যে কোন গৃহপালিত পশুও মহিলাদের চেয়ে বেশি আদর-যত্ন পেত। এমনকি চিকিৎসার ব্যাপারেও মহিলারা পরিবারের মধ্যে বেশি অবহেলিত হয়। অনেক সময় মহিলারা যে অসুস্থ বা তাদের শরীর ভালো নয় এই চেতনায় তাদের থাকে না। আবার অনেক সময় বাড়ীর কাজের সুবিধা হবে বলে মহিলাদের চিকিৎসা হয় না।[১] মহিলাদের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সম্যক ধারণা পেতে যথেষ্ট পরিমাণ তথ্যের অভাব রয়েছে। এই ব্যাপারটি প্রমাণ করে দেয় সমাজে মহিলাদের স্বাস্থ্যকে কিরূপ গুরুত্ব দেয়া হয়। মহিলাদের স্বাস্থ্যের উন্নতি বলতে শুধুমাত্র প্রসবকালীন অবস্থায় মা ও শিশুর সেবার সামগ্রী দান করার ধারণায় বেশির ভাগ মানুষের মধ্যে বর্তমান, আবার দুঃখের হলেও সত্যি যে মহিলাদের সামাজিক-আইনগত অধিকার বুঝতে অনেক সমস্যা দেখা যায়। আসলে মহিলাদের স্বাস্থ্য বিষয়টি কখনই মহিলাদের পরিসরের মধ্যে আলোচনার গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে ওঠেনি।[২]

স্বাধীনতার আগে মহিলাদের স্বাস্থ্য সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ তথ্যও পাওয়া যেত না। মহিলাদের প্রতি অবিচার শুরু হয় কন্যা জন্মাবার পর থেকেই। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায় যে এক বছর থেকে পাঁচ বছরের শিশুদের মধ্যে শিশু কন্যারই মৃত্যুর হার যথেষ্ট

বেশি। প্রাকৃতিক বিপর্যয় বা দুর্ভিক্ষের সময় মহিলারাই খাদ্য গ্রহণ থেকে বঞ্চিত হয়। উদাহরণ স্বরূপ অমর্ত্য সেন দেখিয়েছেন ১৯৭৮ সালে বন্যার পর পশ্চিমবঙ্গে পাঁচ বছরের কম শিশুদের মধ্যে শিশু কন্যারাই খাদ্য ও অপুষ্টির স্বীকার হয়েছিল।[৩] জন্মনিয়ন্ত্রণ ও পরিবার পরিকল্পনার ক্ষেত্রে মহিলারা অবহেলিত। তাই বলা যায় যে এই লিঙ্গ বৈষম্য শুরু হয় জন্ম থেকে অথবা জন্মাবার আগে থেকেই। পরিবারের মধ্যে নারী-পুরুষের অসম অবস্থান গৃহশ্রম থেকে শুরু করে খাদ্যগ্রহণ, পুষ্টি এবং চিকিৎসার ক্ষেত্রেও যা বিরাজমান। এই বৈষম্য দেখা যায় বিশেষ করে মধ্যবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারেই, মূলত যারা অর্থনৈতিক দিক থেকে পিছিয়ে। স্বাভাবিক কারণেই নিম্নবর্গের পরিবার দারিদ্র যখন নিত্যসঙ্গী, সেইসব মহিলাদের শোষণের মাত্রা বৃদ্ধি হয়। সমাজের এই পিছিয়ে পড়া মহিলারা স্বাস্থ্য বিষয়ে যত্ন নিতে পারেনি, সামাজিক বঞ্চনা, অত্যাচার ও অবহেলা তাদের জীবনে নিত্যসঙ্গী।[৪] যে কোন সমাজ ব্যবস্থায় মহিলারা হলেন সমাজের মূল ভিত্তি। জেমস্ মিল তাঁর History of British India বইটিতে লিখেছেন- "মহিলাদের অবস্থা জাতীয় ক্ষেত্রে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। তা সত্ত্বেও মহিলারা নিষ্ঠুরভাবে পুরুষদের দ্বারা অত্যাচারিত হয়। এমনকি সভ্য সমাজের মহিলারাও মানসিকভাবে অত্যাচারিত হয়।[৫]

মেদিনীপুর জেলার মহিলারা বাল্য বয়স থেকেই বিভিন্ন কাজ রাত-দিন করে থাকে। কাজের কোনো সময়সীমা নেই। আসলে পরিবারের মধ্যে মহিলারা বিনা মজুরির শ্রমিক, তাদের যেকোনো কাজ করিয়ে নেওয়া যায়। আর বয়স বাড়ার সাথে সাথে বাসন মাজা, কাপড় কাচা, জল আনা, রান্নার কাজ করানো হয়। গর্ভবতী মহিলাদের ক্ষেত্রেও আট-নয় মাস পর্যন্ত ঘরের কাজ ও মাঠের কাজ উভয়ই করতে হয়। বিশেষতঃ গ্রামাঞ্চলে মহিলারা সমস্ত কাজকর্ম করে থাকে।[৬]

মেদিনীপুর জেলার মহিলাদের পূর্ণাঙ্গ স্বাস্থ্য সুরক্ষার ক্ষেত্রে যথেষ্ট বোঝাপড়ার অভাব রয়েছে। কেননা মেদিনীপুর জেলা আর্থ-সামাজিক দিক থেকে পশ্চাৎপদ থাকায় এখানে নিম্নবর্গ পরিবারের মহিলাদের খাদ্যের অভাব লক্ষ্য করা যায়। এমনকী গর্ভবতী মহিলারা পরিবারের মধ্যে অবহেলিত হন। তারা অনেক সময় উপযুক্ত পুষ্টিকর খাদ্য ও চিকিৎসা উভয় দিক থেকেই বঞ্চিত হয়। বিশেষত তাদের কাজের পরিবেশ সবসময় স্বাস্থ্যকর হয়ে ওঠে না। বেশিরভাগ মহিলাদের রান্নার কাজে নিয়োজিত থাকতে হয় কিন্তু এই রান্নাঘর গুলি প্রায়ই অ-স্বাস্থ্যকর। গ্রামাঞ্চলে রান্নার কাজে যে কাঠের আগুন জ্বালানো হয় তা থেকে কার্বন-ডাই-অক্সাইড নির্গত হয় এবং রান্নাঘরে ঝুল দেখা যায়। যা থেকে মহিলাদের শ্বাসকষ্ট জনিত রোগ, সর্দি-কাশি, হাঁপানি রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা যায়।[৭] আবার অনেক সময় মহিলারা লজ্জার কারণে অথবা কোনো আশঙ্কার কারণে তাদের অসুখ গোপন করে রাখে। তাছাড়া ধর্মীয় কারণে মহিলারা প্রায়ই উপবাস করে থাকে। খাদ্য খাওয়ার ব্যাপারেও মহিলারা পরিবারের সকলকে খাইয়ে বাড়তি অংশটুকু নিজে খাওয়ার ব্যাপারে চিন্তা করে। এছাড়া রক্ষণশীলতা ও অশিক্ষা মেদিনীপুর জেলার

মহিলাদের স্বাস্থ্যহানিতার অন্যতম কারণ। মেদিনীপুর জেলার গ্রামাঞ্চলে দরিদ্র পরিবারের মহিলারা মাঠে কৃষিকাজে নিযুক্ত হয়। এই সকল মহিলাদের মধ্যে চর্মরোগ, বিশেষতঃ হাজা-চুলকানি (Scabis), খোশ, প্যাঁচড়া প্রভৃতি রোগ প্রায়শই লেগে থাকতে দেখা যায়।[৮]

১৯৭১ সালের আদমসুমারি রিপোর্ট থেকে জানা যায় যে, মেদিনীপুর জেলায় মহিলাদের মৃত্যুহার বেশী। বিশেষত প্রসবকালীন অবস্থায় মায়ের মৃত্যুর হার উদ্বেগজনক। মহিলারা স্বাস্থ্য নিয়ে মাথা ঘামাতেন না। গর্ভবতী মায়েদের অতিরিক্ত কাজকর্ম ও অপুষ্টির কারণে মহিলাদের মৃত্যুর হার বেশি হত।[৯] ১৯০১-৮১ এর মধ্যে ভারতবর্ষে নারী ও পুরুষের অনুপাত ৯৭.২ শতাংশ থেকে ৯৩.৫ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। মহিলাদের এই অধিক মৃত্যুর প্রবণতাটি ভয়ঙ্কর। কেননা আধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতি এবং জনস্বাস্থ্যের প্রতি আগ্রহ মহিলাদের মধ্যে দেখা যায়নি। কাজেই স্বাস্থ্যে, জীবনের স্থায়িত্বে সার্বিক উন্নতিতে মহিলা সমাজের অবস্থা ক্রমশ অবনতি হয়েছে। কিন্তু এই মৃত্যুহার সমাজের উঁচু তলার মানুষের ঘুম ভাঙ্গায়নি। মহিলাদের অবস্থারও কোনো হেরফের হয়নি।[১০]

মেদিনীপুর জেলার অনেক মহিলা আর্থিক অনটনের অভাবে গৃহপরিচর্চার জন্য কাজের লোক বা ‘মাসী’ হিসেবে নিয়োজিত হয়। এরা সাধারণত সকালে বাড়ী থেকে বেরিয়ে সারাদিন বাবুদের বাড়ী বাড়ী কাজ করে অর্ধাহারে বাড়ী ফিরে সন্ধ্যার অন্ধকারে। এরা সাধারণত গ্রামাঞ্চল থেকে শহরে আসে। এদের বয়স ১০ থেকে ৬০-৬৫ বছরের মধ্যে। এই সকল মহিলারা প্রতিদিন দীর্ঘ পথ যাতায়াত করে, ফলে অপুষ্টির স্বীকার হয়। তা থেকে কেউ কেউ মাঝে মাঝে অসুস্থ হয়ে পড়ে। মেদিনীপুর জেলায় বিশেষত শহরাঞ্চলে প্রচুর সংখ্যক কাজের লোক হিসাবে মহিলাদের নিযুক্ত থাকতে দেখা যায়। এরা মূলত মেদিনীপুর শহর ঘাটাল, ঝাড়গ্রাম, খড়গপুর, গড়বেতা, কাঁথি, তামলুক, পাঁশকুড়া, এগরা, দীঘা, হলদিয়া প্রভৃতি শহরে কাজ করে থাকে। এমনকি গ্রামাঞ্চলে চাষী বা সচ্ছল মধ্যবিত্ত পরিবারেও কখনো কখনো কাজের লোক হিসেবে মহিলাদের রাখতে দেখা যায়। এরা সাধারণত বাড়ী ঘর পরিষ্কার, জল আনা ও বাসন মাজার কাজে নিযুক্ত থাকে। কোন কোন পরিবার আবার চাষের কাজের জন্য মহিলাদের নিযুক্ত রাখে। তাছাড়া মেদিনীপুর জেলাতে বেশ কিছু সংখ্যক মহিলাদের ঝাড়ুদারনী ও জমাদারণী হিসেবে কাজ করতে দেখা যায়। এরা সাধারনত উচ্চবিত্ত পরিবারের স্নানাগার, শৌচাগার, ও নর্দমা পরিষ্কার করে পরিবারের স্বাস্থ্য রক্ষা করে। অথচ মেদিনীপুর জেলার এই মহিলাদের স্বাস্থ্য ব্যবস্থাই ছিল একেবারে অবহেলিত। তারা গ্রাম ও শহরের প্রান্তিক সীমানার ঝুঁপড়িতে বসবাস করত।[১১]

আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থার সাথে সাথে মহিলাদের ধাত্রীবিদ্যা ও নার্সিং প্রশিক্ষণ শুরু হয়। এই প্রশিক্ষিত মহিলারা অসংখ্য নারী-পুরুষ রোগীর পরিচর্চাবৃত্তি গ্রহণ করে

থাকে।[১২] প্রথমের এই পেশায় মেদিনীপুর জেলাতে আর্থ-সামাজিক দিক থেকে অনগ্রসর শ্রেণীভুক্ত পরিবার থেকেই নিযুক্ত হত। পরবর্তীকালে এই পেশাকে একটি বিশেষ বৃত্তি হিসেবে গ্রহণ করে অনেকেই। এই সকল মহিলারা মেদিনীপুর জেলায় সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতালে এবং নার্সিং হোমে রোগীর সেবা করে জীবনদান করে থাকে। অথচ তারাই বিভিন্ন সময়ে নানা বৈষম্যের শিকার হয়। বেসরকারী হাসপাতাল ও নার্সিং হোমে তাদের কাজের কোন সময়সীমা থাকে না। সুতরাং দীর্ঘসময় ধরে অনেক রোগীর পরিচর্যা করার পর তারা শারীরিক ও মানসিক ভাবে দুর্বল হয়ে পড়ে।[১৩] কখনো আবার তারা নিজেরাই অসুস্থ বোধ করে। তাঁদের কাজের পরিবেশ অনেক সময় সুখকর হয় না। অনেক ক্ষেত্রে তারা পুরুষ ডাক্তার ও পুরুষ রোগীর কাছে লাঞ্ছিত হয়। এই সব পেশায় নিযুক্ত মহিলাদের কোন সম্মান বা মর্যাদা রোগীর কাছে বা তার আত্মীয়র কাছেও পায় না। অনেকে এদের বারাঙ্গনার সমান মনে করে এবং সেই মত তাদের ব্যবহার করতে প্রয়াসী হয়। নার্সদের নৈতিক চরিত্র সম্বন্ধে জনমানসে একটি ভ্রান্ত ধারণা বদ্ধমূল আছে। যে তারা অর্থের বিনিময়ে যে কোন কাজ করতে পারে। সেই অবস্থার সুযোগ নেয় বহু ডাক্তার এবং পুরুষ রোগীরা, বিশেষত ভি. আই. পি. রা। গ্রামাঞ্চলে এই নার্সদের কাজের সমস্যাটি আরো প্রকট। সেখানে নার্স ও গ্রামসেবিকাদের উপর মানসিক ও শারীরিক নির্যাতন চলে প্রধানত জাতি বর্ণের ভিত্তিতে।[১৪]

মেদিনীপুর জেলার মহিলারা খাদ্য, পুষ্টি, চিকিৎসা সহ নানা বৈষম্যের শিকার। বিশেষ করে পনজনিত হত্যা, সতীদাহ, ধর্ষণ, উৎপীড়ন, হরণ, বাধ্যতামূলক পতিতাবৃত্তি গ্রহণ, স্ত্রী পরিত্যাগ বা তালাক এবং স্ত্রীর উপর শারীরিক নির্যাতন ইত্যাদি ঘটনাগুলি ছিল স্বাভাবিক। সেই সঙ্গে স্বামীর অবহেলা, শাশুড়ির দুর্ব্যবহার, গৃহস্থলির রক্ষণাবেক্ষণ, বাড়ীর সকলের সেবা যত্ন করা তাদের জীবনের অঙ্গে পরিণত হয়েছে। আবার গ্রামাঞ্চলে আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতির কারণে মহিলারা কৃষি কাজের সাথে সাথে জঙ্গলে পাতা, কাঠ, ছাতু, নদীতে মাছ সংগ্রহের কাজে যুক্ত থাকে। অনেক ক্ষেত্রে গর্ভবতী মহিলাদেরও দীনমজুর, কৃষিকাজ ও মাটি কাটার কাজে নিযুক্ত থাকতে দেখা যায়।[১৫] কেননা কোনো কাজ না করলে তাদের বাড়ীতে হাঁড়ি চড়বে না, মেদিনীপুর জেলার জঙ্গলঘেরা বাড়ী গুলিতে গেলেই বোঝা যাবে বাড়ীগুলি একেবারেই শূন্য থাকে দিনের বেলাতে। স্বাস্থ্যকর্মীরা যখন গ্রামে যেত তাদের জিজ্ঞেস করলে তারা উত্তর দিত- "তোদের আর কি হবে! আমাদের খাটতে যেতে হবেতো।" "তোদের মতন কি?- দুবেলা খেতে পাই।"[১৬]

এইভাবে দেখা যায় যে প্রাচীনকাল থেকে পিতৃতান্ত্রিক সভ্যতা মহিলাদের কোথাও দেবী কোথাও জননী কোথাও 'শক্তিরুপা' ইত্যাদি স্তবস্তুতির শেকল পরিয়ে আটকে রেখেছে ঘরের কোণে। স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় ইতিউতি কিছু অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বেরিয়ে এসেছিল ঠিকই, কিন্তু আপামোর নারীকূল রয়ে গেছে সেই তিমিরেই। 'গোরার

সুচরিতা, ঘরে-বাইরের বিমলা কিংবা নষ্টনীড়- এর চারুলতারা ছিলেন সেই সমাজের নারী, যাঁরা শিক্ষার আলো পেলেও, কিছু করে দেখানোর কলকে পাননি, আর বাদবাকি যাঁরা তাঁরা ছেলে কোলে শাশুড়ির পদ সেবা করতে অথবা বাবুদের চাকরানি বা ঝাড়ুদারণী কাজ করতে করতেই ইহধাম ত্যাগ করেছেন।[১৭]

এই ঘটনাগুলি প্রমাণ করে দেয় যে মেদিনীপুর জেলার মহিলাদের স্বাস্থ্যকে কিরূপ গুরুত্ব দেয়া হয়। মহিলাদের স্বাস্থ্যের উন্নতি বলতে শুধুমাত্র প্রসবকালীন অবস্থায় মা ও শিশুর সেবার সামগ্রী প্রদান করা।[১৮] চিকিৎসা পরিষেবার জন্য মেদিনীপুর জেলায় প্রতিটি ব্লকে একটি করে প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও একাধিক উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র বা সাব-সেন্টার গড়ে উঠেছে। প্রাথমিক কেন্দ্রগুলিতে 'অর্ন্তবিভাগ ও বহিঃবিভাগ' দুটি ইউনিট চালু থাকে। স্থানীয় পঞ্চায়েতের সাহায্য নিয়ে স্বাস্থ্যকর্মীরা বাড়ী বাড়ী গিয়ে স্বাস্থ্য সুরক্ষার বিষয়গুলি দেখেন। কেননা নিরাপদে মা হতে পারা জনস্বাস্থ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ মাপকাঠি। এই কারণে মহিলাদের স্বাস্থ্যের সুরক্ষার জন্য নারী শিক্ষার প্রসার ও প্রজনন স্বাস্থ্যের ব্যাপারে সচেতন করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে মেদিনীপুর জেলাতে। এজন্য গর্ভবতী মায়েদের টিটেনাস ইনজেকশন দেওয়া ও আয়রন ট্যাবলেট খাওয়ানো এবং গর্ভকালীন সময়ে শিশু ও মায়ের স্বাস্থ্য পরীক্ষার উপর সাফল্য লক্ষ্যণীয়।[১৯] একটি পরিসংখ্যান থেকে বিষয়টি আরো স্পষ্ট হবে।

সাল	গর্ভবতী মা	টিটেনাস ইনজেকশন	আয়রন ট্যাবলেট	মা ও শিশুর স্বাস্থ্য পরীক্ষা	প্রসব শিশুর জন্ম
২০০০-০১ এপ্রিল-মার্চ	৯৬,২০৩	১ম ৮৮,৫৬০	৭৬,৬১০	৪৪,৬১৯	৭৬,৮৫৪
		২য় ৮০,৬৮৭			
		৩য় ৭,১২৪			
২০০১-০২ এপ্রিল-মার্চ	৯৫,১৩১	১ম ৯১,২৯৯	৭২,৮২৬	৪৯,২১১	৮২,৬৫২
		২য় ৮৪,৪৭৮			
		৩য় ৬,৮৫২			

সুত্র : জেলা স্বাস্থ্য দপ্তর-৩ (অবিভক্ত মেদিনীপুর)

এই কাজে সম্প্রতি 'আশা' নামে স্বেচ্ছাসেবী স্বাস্থ্যকর্মী যুক্ত করা হয়েছে। মেদিনীপুর জেলার স্বাস্থ্য সহায়িকাদের এই পরিসেবাকে এম. এস. স্বামীনাথ সারা ভারতের দিশারী বলে অভিহিত করেছেন।[২০]

মেদিনীপুর জেলাতে পশ্চিমী চিকিৎসা ব্যবস্থার আগমন ঘটা সত্ত্বেও বর্তমান চিকিৎসা ব্যবস্থায় তাঁর পুরানো ধ্যান-ধারণা এখনো প্রবাহমান। বেশিরভাগ মহিলারা বিচার বুদ্ধিহীন এবং স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সমস্যাগুলো মনের রোগ বলে অবহেলা করা হয়। সেই সঙ্গে মহিলাদের স্বাস্থ্য সংক্রান্ত ব্যাপারে গুরুত্বই দেওয়া হয় না। এমনকি চিকিৎসা পেশাতেও প্রথম দিন থেকেই মহিলারা বৈষম্যের শিকার। মহিলাদের কেবলমাত্র মাতৃত্বজনিত স্বাস্থ্য সমস্যা নিয়েই চিকিৎসা করা হয় বা ভাবা হয়। মহিলাদের পূর্ণাঙ্গ স্বাস্থ্য নিয়ে কোন কিছু চিন্তা করা হয় না। সেইজন্য ভবিষ্যতে মহিলাদের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে শিক্ষাদান এবং পরিবার পরিকল্পনার উপর শিক্ষাদান-সমস্তই মহিলা কেন্দ্রীক হওয়া উচিত। সেই সঙ্গে এমন পরিবেশও থাকা প্রয়োজন যাতে মহিলারা তাদের অধিকারগুলি স্বাভাবিক ভাবে ভোগ করতে পারে। তা না হলে মহিলারা স্বাস্থ্য সংক্রান্ত গোপনতা রেখে চলবে যা মহিলাদের স্বাস্থ্য পরিষেবা থেকে শত হাত দূরেই থাকবে। তাই এমন নীতি নির্ধারণ করতে হবে যাতে করে মহিলারা শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সম্পদ ইত্যাদি প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রে সাবলীলভাবে বিচরণ করতে পারে এবং তারা তাদের উন্নতি ঘটাতে পারে। কেননা অমর্ত্য সেন তাঁর গবেষণায় যথার্থই বলেছেন- "আধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতি এবং জনস্বাস্থ্যের প্রতি মনোযোগ যত বেড়েছে, তার বেশিরভাগ সুযোগ নিয়েছে পুরুষ সমাজ। নারী-পুরুষের অবস্থার চিরাচরিত পার্থক্য বেড়েছে। স্বাস্থ্যে, জীবনের স্থায়িত্বে, নারীদের আপেক্ষিক অবস্থার অবনতি হয়েছে....।" (জীবনযাত্রা ও অর্থনীতি, অমর্ত্য সেন, পৃ-১৫২)

সূত্র নির্দেশ:

১. কল্যাণী বন্দ্যোপাধ্যায়, নারী, শ্রেণী ও বর্ণ : নিম্নবর্গের নারীর আর্থ-সামাজিক অবস্থান, ম্যানাস্ক্রিপ্ট ইন্ডিয়া, হাওড়া, ২০০০,পৃ-১৭২।

২. নীরা দেশাই অ্যান্ড মৈত্রী কৃষ্ণরাজ, ওমেন অ্যান্ড সোসাইটি ইন ইন্ডিয়া, অজন্তা পাবলিকেশন, ১৯৮৭, পৃ-২২২।

৩. অমর্ত্য সেন, জীবনযাত্রা ও অর্থনীতি, আনন্দ, কলিকাতা, ১৩৯৭, পৃ-১৬৫।
কল্যাণী বন্দ্যোপাধ্যায়, তদেব, পৃ-১৭১।

৪. সুশান্ত দে, মেদিনীপুর জেলার জনস্বাস্থ্য (১৯১৯-২০০১),তপতী পাবলিকেশন, কোলকাতা-২০১৬, পৃ-৯১।

৫. দীপঙ্কর দাস, আইনজীবি ও গবেষক, মেদিনীপুর, সাক্ষাৎকার-১০.০৭.২০১১।

৬. হরেকৃষ্ণ সামন্ত, মেদিনীপুর জেলা জনস্বাস্থ্য প্রসার সমিতির আহ্বায়ক, সাক্ষাৎকার-০৭.০৮.২০১০।

৭. প্রদীপ্ত কুমার মাইতি, মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের আধিকারিক, সাক্ষাৎকার-০১.০৭.২০১০।

৮. সুশান্ত দে, মেদিনীপুর জেলার জনস্বাস্থ্য (১৯১৯-২০০১), তদেব, পৃ-১৩১।
অমর্ত্য সেন, তদেব, পৃ-১৭২।

৯. সুশান্ত দে, মেদিনীপুর জেলার আদিম অধিবাসী ও মহিলা, ইয়াসিন খান (সম্পাদনা) নারী সমসাময়িক চোখে, দেশ প্রকাশন, আগস্ট ২০১৩, পৃ-২৫৫।

১০. সুজাতা মুখোপাধ্যায়, ঔপনিবেশিক ভারতে পাশ্চাত্য চিকিৎসা বিজ্ঞান এবং মহিলা সমাজ, শেখর ভৌমিক (সম্পাদনা) সাম্প্রতিক ইতিহাস চর্চা, ইন্দরা প্রকাসনি-২০০৫, কলকাতা, পৃ. ২২০-২১।

১১. সুশান্ত দে, মেদিনীপুর জেলার জনস্বাস্থ্য (১৯১৯-২০০১), তদেব, পৃ. ১৩৬-৩৭।

১২. কল্যাণী বন্দ্যোপাধ্যায়, তদেব, পৃ. ১১০-১১৪।

১৩. সুশান্ত দে, মেদিনীপুর জেলার আদিম অধিবাসী ও মহিলা, তদেব, পৃ. ২৫৬।

১৪. সুশান্ত দে, মেদিনীপুর জেলার আদিম অধিবাসীদের সমস্যা ও ঔপনিবেশিক দৃষ্টিভঙ্গি, ইতিহাস অনুসন্ধান-২৮, পৃ. 28।

১৫. সুপর্ণা গঙ্গোপাধ্যায়, প্রগতি ও উন্নয়নে নারী, পশ্চিমবঙ্গ সংখ্যা, পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন, ফেব্রুয়ারি-মার্চ ২০০৮, পৃ-১৩১।

১৬. নীরা দেশাই অ্যান্ড মৈত্রী কৃষ্ণরাজ, তদেব, ২২২।

১৭. মেরিন মুখার্জি, জনস্বাস্থ্য ও পঞ্চায়েত, পশ্চিমবঙ্গ সংখ্যা, পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন ফেব্রুয়ারি-মার্চ ২০০৮, পৃ. ৭৭-৭৮।

১৮. প্রত্যুষ মুখোপাধ্যায়, গ্রামীণ জীবনে স্বাস্থ্য, পশ্চিমবঙ্গ গ্রামোন্নয়ন তথ্য, পৃ. ১৫৯-৬০, পশ্চিমবঙ্গ সংখ্যা, মার্চ ২০০৩।

নুনবাড়ি : অন্ত্যজ শ্রেণির সমাজ-সংস্কৃতির স্বরূপ সন্ধান

সৌভিক পাঁজা
গবেষক, বাংলা বিভাগ,
উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

অনিল ঘড়াই এর বহু গল্প-উপন্যাসে জল ও জলাশয়ের উপস্থিতি। আসলে জল ও জলাশয়ের সাথে অন্বিত হয়ে আছে অন্ত্যজ শ্রেণির মানুষের জীবন ও জীবিকা। নোনা জলের পুকুর কেটে নুন বানান মোলঙ্গীরা। দীঘার কালীনগরের মোলঙ্গীদের জীবন সংগ্রাম নিয়ে অনিল ঘড়াই এর উপন্যাস 'নুনবাড়ি'। উপন্যাসটির পরিচ্ছেদ সংখ্যা তেরো। প্রথম পরিচ্ছেদেই উপন্যাসের নায়িকা লবঙ্গ স্বামীর অত্যাচার শাশুড়ির বঞ্চনা থেকে মুক্তি পেতে একমাত্র ছেলে নোনাইকে সঙ্গে নিয়ে চিকনি শাকতোলার বাহানায় বাড়ির ছাড়ে। ফিরে আসে বাবা জটায়ুর কাছে। লবঙ্গ স্বনির্ভর হতে চেয়ে নুন বানাতে শুরু করে।ফিরে পাই বাল্যবন্ধু কন্ঠিরামকে। শুরু হয় গ্রাম্য রটনা। বাবা জটায়ু অপবাদ থেকে বাঁচার জন্য মেয়েকে নোনা স্রোতে ফেলে দিতে গিয়ে নিজে পড়ে যায়। লবঙ্গ পিতাকে উদ্ধার করে। কন্ঠিরামকে কাছে পেয়ে লবঙ্গের জীবনের পট পরিবর্তন ঘটে।তৈরি করে নুনবাড়ি।

অন্ত্যজ তথা দলিত সাহিত্য আন্দোলন শুরু হয় মহারাষ্ট্রে। বিশ শতকে পঞ্চাশের দশকে। বাংলায় আন্দোলন শুরু হয় বেশ কয়েক দশক পর। বলতে গেলে বিশ শতকের শেষভাগে। ১৯৯২খ্রিষ্ঠাব্দে 'বাঙলা দলিত সাহিত্য সংস্থা'র প্রথম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় নদীয়া জেলায় ভায়না গ্রামে।১৯৯১খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছে 'নুনবাড়ি'উপন্যাস। উপন্যাসিক জন্মগ্রহন করেন হাড়ির ঘরে।খুব ছোটো থেকেই তিনি কাছ থেকে দেখেছেন না খেতে পাওয়া মানুষের জীবন সংগ্রাম।স্বাভাবিক ভাবেই তাঁর উপন্যাসে উঠে এসেছে হাড়ি, নুনমারা, জমাদার,ঝাড়ুদার,কাকমারাদের জীবন চিত্র। সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় 'বাংলা উপন্যাসের কালান্তর' গ্রন্থে বলেছেন "উপন্যাস প্রকৃতপক্ষে জগত এবং জীবন সম্বন্ধে লেখকের ধারণার রূপক।এবং এই সুবিস্তৃত রূপকে লেখক ঘটনা, আখ্যান, চরিত্র, কথোপকথন, সমাজ প্রতিবেশ এবং রচনাশৈলী এই প্রতি বিষয়েরই ব্যবহারে তাঁর উদ্দিষ্ট রূপকার্থের প্রতিফলন ঘটে।"

পণপ্রথা আমাদের সমাজে বহুল প্রচলিত প্রাচীন প্রথা। বলিদান নাটকে আমরা তার নির্মম পরিণতি দেখি।সেখানে গিরিশচন্দ্র ঘোষ বলতে বাধ্য হন 'বাঙ্গালায় কন্যা সম্প্রদান নয় -বলিদান'(৫/৯)। 'নুনবাড়ি' উপন্যাসে আছে মলোঙ্গী সম্প্রদায়ের মেয়ে লবঙ্গের কথা।তার বিয়ে হয় কালাচাঁদের সঙ্গে।বিয়ের আগে তার বাবা বলেছিল একটা বাইক কিনে দেবে।জটায়ু তা কিনে দিতে না পাড়ায় লবঙ্গ স্বামীগৃহ ত্যাগ করতে বাধ্য হয়।শুরু হয় জীবন সংগ্রাম।মনে পড়ে যাই অন্নদাশঙ্কর রায়ের লেখা 'পারিবারিক নারী

সমস্যা' প্রবন্ধের কথা।সেখানে সুভা প্রশ্ন করে 'কেন,পুরুষের আশ্রয় ছাড়া কি স্ত্রীলোকের চলে না?'এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায় লবঙ্গের জীবন সংগ্রামে।ঠ্যাং কাটা জটায়ুর সংসারে মা লক্ষ্মী- চায়ের দোকান।জ্বরে আক্রান্ত হয়ে তা দশ দিন বন্ধ।লবঙ্গ মাঠে মাঠে গোবর কুড়িয়েছে ,মুড়ি ভেজেছে,চিড়ে কুটেছে ,ধান ঝেড়েছে কিন্তু খাটুনিই সার হয়েছে।কাজে্র কাজ কিছুই হয়নি।অবশেষে তার ছোটো বেলাকার সই অবলার পরামর্শে নুনবাড়ি তৈরি করে।

নুনবাড়ি তৈরির প্রসঙ্গে এসেছে নুন তৈরির কৌশল।চড়দাগানো নুনবাড়ির প্রথম কাজ।অর্থাৎ জোয়ারের জল নেমে যেতেই কোন কিছু পুঁতে নিজের জায়গা নিশ্চিত করা।যার মাটি ভালো হবে তার নুনবাড়ির নুনও হয় ভালো।লবঙ্গ চারটে ঢোলকলমির ডালকেটে শ্মশানের কাছের চড় দাগায়।এরপর মাটি শুকিয়ে গেলে নুনমাটি চাঁছাড় পালা শুরু হয়। এ কাজে ধৈর্যের সঙ্গে দরকার বুদ্ধি ও দেখার চোখ।নুনমাটি চেনার কৌশল জটায়ু তক্তাপোশে শুয়ে শুয়েই বলেছিল-“পা দিয়ে ঘষবি নুন মাটি,দেখবি মাটি আর পায়ের ঘষটানিতে চড়চড় করবে গোড়ালি।গুঁড়ো গুঁড়ো কাচের মতো পায়ে বিঁধবে ধার”। লবঙ্গ নিজের হাতেই নুনবাড়ির গর্ত খুঁড়েছে।পাশাপাশি দুটো গর্ত।প্রথমটির থেকে দ্বিতীয় গর্তের গভীরতা বেশি হতে হবে। দুটি গর্তের মধ্যে সংযোগ রক্ষা করে বাঁশের একটি নল।প্রথম গর্তে নুনমাটি ভর্তি করে জল ঢেলে দেওয়া হয় সেই জল বাঁশের নল দিয়ে দ্বিতীয় গর্তে রাখা পাত্রে পরে।অন্যদিকে থাকে নুনবান।নুনবান হল নুনজল থেকে জলকে পৃথক করার জন্য জ্বাল দেবার উনুন ।জল পৃথক হলেই তৈরি হয়ে যায় নুন।

মোলঙ্গী গোষ্ঠীর জীবন সুখের ছিল না। বিশেষ করে স্বামী পরিত্যক্তা লবঙ্গের জীবন।পঙ্গু জটায়ু অসুস্থতার কারণে দোকান খুলতে পারে না। দোকান খুলে লবঙ্গ। নিতাই সাঁতরা চা খেতে এসে কু ইঙ্গিত করে। চায়ের পয়সা না দিয়ে খাতায় লিখে রাখার কথা বলে আরো বলে “খাল ধারে তোমায় যেদিন খাব সেদিন কিন্তু ধার খাবনি। একেবারে নাগদা নগদি!”নিতাই পঞ্চায়েত অফিসে কাজ করে।ছোকরা গ্রাম প্রধনের সে ডান হাত।তার রক্ষিতা অবলা ।সে নরহরির মেয়ে।লবঙ্গের ছোটবেলাকার সই। সাপের কামড়ে স্বামীর মৃত্যু হয়।সুখ খুঁজতে দুখের পথ বেছে নেয়।আমাদের সমাজে নরীর অবস্থান লবঙ্গ ও অবলার মতোই। শাসকশ্রেণির চোখে নারী যেন ভোজের থালা। রক্ষকই যেন ভক্ষক।মনে করিয়ে দেয় জমিদার দর্পন নাটকে নুরুন্নেহার সংলাপ-“ আপনি সব করতে পারেন!আমি আপনার প্রজা, আমি আপনার মেয়ে, আপনি আমার বাপ,প্রাণ রক্ষা করতেও আপনি!আমি আপনার মেয়ে, আপনি আমার বাপ, (রোদন) আপনি আমার জাত কুল রক্ষা করবেন”।নুরুন্নেহার শাষকের হাত থেকে রক্ষা না পেলেও লবঙ্গ পেয়েছে।নিজোর মতো করে বাঁচতে।কিন্তু তারা দাদন নেয় পোদ্দারের কাছে।একারণে কম দামে নুন বেচতে বাধ্য হয়।এসব মেনে নিয়েও লবঙ্গ নিজের

কামনাকে সংযত করতে পারে না।কণ্ঠিরামের সন্তান তার গর্ভে আসে।নোনাই পিতার কাছে চলে যায়।অবৈধ সন্তানকে বাঁচাতে কণ্ঠিরামের হাত ধরে লবঙ্গ গ্রাম ছাড়ার সিধান্ত নেয়।

মোলঙ্গী গোষ্টীর জীবন অভিজ্ঞতা উপন্যাসের ছাত্রে-ছাত্রে প্রকাশ পেয়েছে।আমি জীবন অভিজ্ঞতা বলতে প্রবাদের কথা বলছি।কারণ প্রবাদের জন্ম ইতিহাস সম্পর্কে বলতে গিয়ে লোকসাহিত্য গবেষকরা বলেছেন প্রবাদ মানুষের দীর্ঘ দিনের জীবন অভিজ্ঞতার ফসল। উপন্যাসে ব্যবহৃত প্রবাদগুলি নিচে উল্লেখ করেছি

- যারে দেখতে নারি, তার চলন বাঁকা।(লবঙ্গ)
- যত মধু তত মিষ্টি।যত তেল তত তেলানি।(লবঙ্গ)
- বেলে মাটিতে দুর্গা প্রতিমা হয় না।(লবঙ্গের শ্বশুর)
- কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে(লবঙ্গ)
- নুনবাড়ি না তো যম বাড়ি(কণ্ঠিরাম)
- জলের মাছ জলে মিশেচে(অবলা)

নুন খাদ্য তৈরির প্রধান উপকরণ।সাধারণ মানুষ প্রয়োজন মতো নুন বাজার থেকে কিনে।কিন্তু মোলঙ্গী গোষ্ঠীর জীবন জীবিকা নুন তৈরিকে কেন্দ্র করে।তৈরি করা নুন মহাজনকে বিক্রি করে তাদের খাবার জোটে।তাদের সমাজে আছে ঐশ্বরিক অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন নরহরি বুড়ো। যে খালের জলে হাত দিয়ে বলে দিতে পারে এবার জলে কতটা নুন, কতটা কাদা, কতটা বালি। তার পাকা চোখ ও অভিজ্ঞ জীব এই কাজে ব্যবহৃত হয়। সময়ে সুযোগে নোনাখালের লোকজন তার কাছে ছুটে। কিন্তু এবার কেউ নরহরির কাছে যায়নি। কারণ নরহরিবুড়ো নিতাই সাঁতরা সঙ্গে হাত মিলিয়েছে। এ গায়ের লোকজন নিতাই সাঁতরকে দেখতে পারে না। গোষ্ঠী জীবনের এ-এক বড় বৈশিষ্ট্য। নির্লোভ অসহায় মানুষগুলো তাদের মনুষত্ব্য সম্পর্কে সচেতন। মনুষ্যত্ব বিকিয়ে তাদের সমাজের কোন মানুষ যখন স্বার্থপর হয়ে য়ায় তখন তাদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করতে তারা পিছপা হয় না।

মোলঙ্গীদের কাছে নুনবাড়ি হল শুকবাড়ি।অভাবী মানুষগুলো একটু সুখের গন্ধ পায় নুনবাড়িতে । এই নুন তৈরির সময় নোনাখালে ধারে সকালবেলা থেকে কাড়াকাড়ি লেগে যায়,নুন মাটির দখল নিয়ে। নুন বাড়িতে প্রথম দিন যায় নতুন কাপড় পরে। প্রয়োজনে কাপড় কিনতে দাদন নেয়। লবঙ্গের বাবা পোদ্দারের কাছে দাদন নিয়ে নুন তৈরির উপকরনের পাশাপাশি নতুন শাড়ি কিনে আনে।অন্যদিকে " নুনের কারবার করে পোদ্দারদেরর এখন দুটো দোতলা বাড়ি। গঞ্জের হাটে বিরাট গোডাউন খুলেছে বাবু। এ গাঁয়ে একমাত্র তার ঘরেই টিভি চলে, ব্যাটারীতে।"পোদ্দারের মতো মানুষ আমাদের সমাজে ছিল,এখনো আছে।ভবিষ্যতে যাতে না থাকে সে কারনেই অনিল ঘড়াই মতো একাধিক লেখক হাতে কলম তুলে নিয়েছেন।

'নুনবাড়ি' উপন্যাসে আছে গোষ্ঠী জীবনের রাজনৈতিক জীবন চিত্র।আছে অর্থলোভী পোদ্দারের রাজকীয় বিলাস-ব্যসনের চিত্র। পাশাপাশি আছে নায়িকা লবঙ্গের বেঁচে থাকার লড়াই।এই লড়াইয়ের সঙ্গী পিতা জটায়ু ও বাল্যবন্ধু কোন্ঠিরাম। এসবের মধ্যে উপন্যাসিক নিপুণভাবে তাদের সমাজে প্রচলিত কিছু সংস্কার আমাদের চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন।আমাদের কাছে তার কোনো বৈজ্ঞানিক ভিত্তি না থাকলেও মোলঙ্গী গোষ্ঠীর জীবনের সে গুলির মূল্য অপরিসীম।ঋতুবতী মেয়েদের নুনু বাড়িতে প্রবেশ নিষেধ। এ প্রসঙ্গে লবঙ্গের ছোটবেলার সই অবলার বলা কথা মনে আসে " মেয়ে হয়ে জন্মানোটাই যেন শতেক জ্বালার! মাসের ওই কটা দিন- অবলা বলেছে, নুনবাড়ি ছোঁয়া নিষেধ।তাহলে নাকি নুন দানা হয় না।নোনতা ভাবটা উবে পানসে হয়ে যায়"লবঙ্গ এসব নিয়ে ভাবতে চায় না,এসব কথা পুরোপুরি মানেও না।নিরন্ন লবঙ্গের প্রথম ও একমাত্র চিন্তা খাবার।কিন্তু সে যখন একটি শালিক দেখল তার মনে ভয় ঢুকে যায়-"এক শালিক অপায়া।এক শালিক দেখলে দিন খারাপ যায়, দুঃসংবাদ আসে।ভয়ে চুপসে গেল তার মুখ" ।আবার পরক্ষনেই মনে ভরসা আনার জন্য তুড়ি মেরে উড়িয়ে দেয় ভেতরের জেগে ওঠা সংস্কার।

সংস্কার না মেনে,অপবাদকে গায়ে মেখেও পুরুষতান্ত্রিক সমাজের হাত থেকে লবঙ্গ বাঁচতে চেয়েছে।"কালাচাঁদ যদি অন্য ভাবে নিজেকে বাঁচাতে পারে, তাহলে তারই বা নতুন করে বেঁচে উঠতে দোষ কোথায়? পুরুষের দ্বিতীয় নারী তৃতীয় নারী এমনকি একাধিক নারী যখন কোনো নিন্দার নয়,তখন মেয়ে হয়ে দ্বিতীয় স্পর্শ অন্য জীবন চাওয়াটা কিভুল?"একেবারেই না।এই প্রায় পুরুষ শাসিত সমাজে পুরুষের পদস্খলন স্বৈরাচার অসংযম স্বেচ্ছাচার বিধ্বংসী জীবনযাপন যদি নির্বিবাদে সকলে মেনে নেয় তাহলে একটা অসহায় আত্মসমস্যায় জর্জরিত মেয়ের বেলায় তার ব্যতিক্রম হওয়ার কথা নয়।কিন্তু লবঙ্গের অবৈধ সম্পর্ক সমাজ মেনে নেবে না।সম্পর্ক মেনে নিলেও তার সন্তানকে মেনে নেবে না।কন্ঠিরাম ও লবঙ্গ কলকাতা যেতে চেয়েও যেতে পারেনি।নুনমাটির ভালোবাসা তাদেরকে ফিরিয়ে এনেছে।জয়ি হয়েছে গোষ্ঠী জীবনের প্রেম ও ভালোবাসা।

গ্রন্থপঞ্জি :

১ অনিল ঘড়াই,*নুনবাড়ি*,প্রথম সংস্করণ, দে'জ, প্রথম প্রকাশ : বৈশাখ ১৩৯৬।

২. মনোহরমৌলি বিশ্বাস, *দলিত সাহিত্যের রূপরেখা,* দ্বিতীয় সংস্করণ, বাণীশিল্প, প্রথম প্রকাশ: ২০০৭।

৩. ড. চিত্ত মন্ডল, ড. প্রথমা রায় মণ্ডল (সম্পাদিত), *বাংলার দলিত আন্দোলনের ইতিবৃত্ত,* প্রথম সংস্করণ, একুশতক, প্রথম প্রকাশ :২০১৬।

৪. সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়,*বাংলা উপন্যাসের কালান্তর,*নবম সংস্করণ,দে'জ,প্রথম প্রকাশ : ১৯৬১।

৫. অলোক রায়,*বাংলা উপন্যাস: প্রত্যাশা ও প্রাপ্তি,* তৃতীয় সংস্করণ,অক্ষর,প্রথম প্রকাশ : ২০০০।

৬. নবেন্দু সেন,*পাশ্চাত্য সাহিত্যতত্ত্ব ও সাহিত্য ভাবনা,*পঞ্চম সংস্করণ, রত্নাবলী , প্রথম প্রকাশ:মে ২০০৯।

৭ রামচরণ শর্মা,*প্রাচীন ভারতে শূদ্র,* পুনর্মুদ্রণ, কে পি বাগচি অ্যান্ড কোম্পানী,প্রথম প্রকাশ:১৯৮৯।

৮. জয়দেব বেরা (সম্পাদিত), *দলিত,* প্রথম সংস্করণ, Nyra Book, প্রথম প্রকাশ : ২০২০।

বৈষ্ণবীয় তত্ত্ব-দর্শনগত চেতনার আলোকে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'মঞ্জরী অপেরা' উপন্যাস

সুবর্ণা সেন
গবেষক, 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিভাগ', উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ (Abstract) : কথাসাহিত্যিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন আধুনিক যুগের মৃত্তিকা সংলগ্ন মানব জীবনের আবেগদরদী ও অন্যতম সংবেদনশীল রূপকার। তাঁর লেখায় বিশেষ ভাবে ফুটে উঠেছে বীরভূম-বর্ধমান অঞ্চলের সাঁওতাল, বাগদী, বোষ্টম, বাউরি, ডোম, গ্রাম্য কবিয়াল সম্প্রদায়ের কথা। লেখক মানব জীবনের ছোট-বড় নানান খুঁটি নাটি বিষয় গুলিকে এমন মহত্ত্ব দিয়ে ফুটিয়ে তুলেছেন যেখানে তিনি সামাজিক পরিবর্তনের বিভিন্ন বাস্তব গুণান্বিত প্রতিচিত্রকে, মানব হৃদয়ের নানা পরিবর্তনকে, তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা, হতাশা, ব্যার্থতাকে তত্যন্ত সবলে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছেন। আর এই ভাবাধারায় তিনি বারম্বার স্থান দিয়েছেন বৈষ্ণবীয় চিন্তা-চেতনা, তত্ত্বসমূহের নানা সাহিত্যিক, তাত্ত্বিক ব্যাখ্যাকে। 'মঞ্জরী অপেরা' হল এমনই এক মহৎ সৃষ্টি, যেখানে তিনি বৈষ্ণব তত্ত্ব-দর্শনগত ভাবনা, অনুষঙ্গীয় রীতিকে কাহিনীর অন্তরালে প্রবাহিত করে পাঠক দর্শককে যেমন নতুন ভাবে ভাবনার জগতে বিরচরণ করিয়েছেন, তেমনি প্রত্যক্ষ করিয়েছেন অপেরার সূচনালগ্ন থেকে তাকে বাঁচিয়ে রাখার তাগিদে একটি নারীর সমগ্র জীবন ব্যাপী সংগ্রামকে।

সূচক/ মূল শব্দ (Key Word) : তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, বৈষ্ণব চিন্তা চেতনা, ঘাত-প্রতিঘাত, চরিত্রের ক্রমবিবর্তন, জীবনের গভীর অন্তর্নির্হীত তাৎপর্য অনুসন্ধান।

মূল আলোচনা (Discussion) : বিশ শতকের সাহিত্য গগনে এক দীপ্তিমান নক্ষত্র হলেন কথাসাহিত্যিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বাংলা কথাসাহিত্যের সামগ্রিক অঙ্গনে এমন কিছু উপাদানের প্রতি আসক্ত ছিলেন যা তাঁর লেখনশৈলীকে অন্যান্য সকল সাহিত্যিকদের থেকে এক পৃথক মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করতে সহায়তা করে। তাঁর রচনাগত শৈলীর মধ্যে যে দিকটি বিশেষ ভাবে ফুটে ওঠে তা হল বীরভূম, বর্ধমান অঞ্চলের মৃত্তিকা সংলগ্ন জীবন ইতিবৃত্ত; বিশেষত সাঁওতাল, বাগদি, বোষ্টম, বাউরি, ডোম, গ্রাম্য কবিয়াল সহ ছোট বড় নানা শ্রেণির জীবন বৃত্তান্ত। কথাসাহিত্যিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় এই সকল মৃত্তিকা লালিত মানুষের বিস্তৃত মানবায়নের নিখুঁত চিত্র বয়নের মাধ্যমেই তাঁর কথা সাহিত্যের বিভিন্ন পরিসরে এক আলোড়ন সৃষ্টি করেন, যা জীবনের উত্থান পতনময় প্রেক্ষাপটে, আধুনিকতার দ্বন্দ্বে, গ্রাম শহরের সুবিস্তীর্ণ পটভূমিকায় কোথাও এর ভাঙন, কোথাও বা বিকশিত রূপাঙ্গিকের বাণীকে তিনি শৈল্পিক তুলির টানে এমন পরিপূর্ণতা দিয়েছেন তা বাংলা সাহিত্যে 'বন্দ্যোপাধ্যায় ত্রয়ী'

হিসেবে তাকে এক বিশেষ মর্যাদায় অভিষিক্ত করেছে। বাংলা সাহিত্যে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের কালজয়ী সাহিত্য সম্ভারে চিরভাস্বর যে সকল সৃষ্টি সমূহ তাঁকে অমরত্ব দিয়েছে সেগুলির মধ্যে 'কবি', 'জলসাঘর', 'গণদেবতা', 'রাইকমল', 'সপ্তপদী' সহ বেশ কিছু উপন্যাস ও ছোটগল্প সমূহ বিরাজমান।

এই রকম বহু জনপ্রিয় সৃষ্টির মধ্যে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের আরো এক অনবদ্য সৃষ্টি হল 'মঞ্জরী অপেরা'। 'মঞ্জরী' নামক এক নারীর যাত্রাদলের কাহিনীকে কেন্দ্র করে তিনি যে বিস্ময়কর জীবন সংগ্রামের অনবদ্য কাহিনী গ্রন্থন করেছেন, তা জীবন সম্পৃক্ত অভিজ্ঞ সাহিত্যিক রুচিবোধের পরিচয় বহন করে। উপন্যাস প্রসঙ্গে উদ্ধৃত করছি—

> "এই উপন্যাস এক মেয়ে যাত্রার দলের জীবন সংগ্রামের ও উদ্যোগ আয়োজনের কাহিনী। যাত্রা দলের নর-নারী সাধারণ এক ছন্নছাড়া জীবন যাপন করে— ইংরেজিতে যাকে বলে 'বোহেমিয়ান'। সুরাসক্তি, যৌন আকর্ষণ ও একপ্রকার অতৃপ্ত অস্থির জীবনতৃষ্ণা— তাহাদের জীবন এই অবক্ষয়ের উপর উন্মত্তভাবে বির্ঘূনিত। ইহারই মধ্যে কলানুরাগ স্থির কেন্দ্রবিন্দুর মতো তাহাদিগকে এক লক্ষ্যাভিমূখী করিয়া রাখে, খানিকটা দলের প্রতি আনুগত্য-বিশ্বস্ততাও তাহাদের রসাতলমুখী জীবনের পতন বেগকে প্রতিহত করে।"[১]

সমালোচকের এই মন্তব্যই যেন দুটি খণ্ডে বৈশাখ ১৩৭১ বঙ্গাব্দে নির্মিত 'মঞ্জরী অপেরা' উপন্যাসটির ভিত্তিভূমি রূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সেই সঙ্গে যুক্ত হয়েছে এর অভ্যন্তরস্থ মহৎ ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী সত্তা রূপে বৈষ্ণবীয় চেতনার পরিমণ্ডল। চরিত্রের নব প্রতিষ্ঠিত ভালো মন্দ দিকের সঙ্গে মিশ্রিত হয়েছে বৈষ্ণবীয় ভক্তি সত্তার বিভিন্ন আবহচিত্র, তার সচেস্ট অনুসন্ধানই বর্তমান প্রবন্ধের অন্বেষিত বিষয়।

তৎকালীন সামাজিক প্রেক্ষাপটে এ উপন্যাসে কীর্তনের বহু প্রসঙ্গ এসেছে, যার প্রধান চালিকা শক্তি রূপে কাজ করেছে মঞ্জরী। গ্রে স্ট্রীট আর চিৎপুর জংশনের দক্ষিণ পশ্চিম কোণে যে বাড়ি তার বারান্দায় সাইনবোর্ডে লেখা 'মঞ্জরী অপেরা', বন্ধনীতে লেখা মেয়ে যাত্রা, নীচে লেখা প্রোপাইট্রেস শ্রীমতী মঞ্জরী দেবী। ১৯৪৪ সাল। উপন্যাসের প্রথমেই এই প্রাথমিক পরিচয়ে মঞ্জরী দেবীর সঙ্গে পাঠকের পরিচয় ঘটে। লেখক এই সূত্রে জানিয়েছেন বাংলাদেশে মেয়ে যাত্রা খুব বেশি হয়নি, ত্রৈলোক্যতারিণী, ভবসুন্দরী, রাধাবিনোদিনী প্রমুখদের আগে পর্যন্ত বাংলাদেশে মেয়ে যাত্রার দল বাংলাদেশ থেকে বিলুপ্ত হয়ে গেছে প্রায় বহু বছর আগে। এরপর 'মঞ্জরী অপেরা' নিঃসন্দেহে বাংলা সংস্কৃতির বুকে এক ব্যতিক্রমী স্বাদ বহন করে নিয়ে আসে— যে দলের ম্যানেজার গোরাবাবু, সহকারী ম্যানেজার গোপাল ঘোষ।

"গোরাবাবুর একটা পদ না হলে মানায় না বলেই সে নামে ম্যানেজার। গোরাবাবু দলের হিরো, পদে ম্যানেজার এবং মঞ্জরীর স্বামী। বৈষ্ণব মতে দু'জনের বিয়ে

হয়েছে। কিন্তু লোকে তা মানে না। মঞ্জরী দেহব্যবসায়িনীর কন্যা, তার আবার জাত এবং তার সঙ্গে আবার বিয়ে। কিন্তু তারা তা মানে।”[২]

এই প্রাথমিক পরিচয়ে মঞ্জরী ও গোরাবাবুর বৈষ্ণবীয় মতে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনের মধ্য দিয়ে উপন্যাসে বৈষ্ণবীয় অনুষঙ্গ আলোকিত হয়েছে। তারা আন্তরিক ভাবে সে সম্পর্কের মর্যাদা রক্ষা করে চলেছেন। যে অপেরা সঙ্গীত লেখক তাদের গানের মধ্য দিয়ে উপজীব্য করেছেন তা বীরভূম, বাঁকুড়া, মানভূম সহ সকল রাঢ় বাংলার সাংস্কৃতিক দলিল রূপে স্বীকৃত। যার ধারক বাহক হয়েছে বৈষ্ণবীয় সঙ্গীতের মহিমাময় প্রেক্ষাপট—

“এ মায়া প্রপঞ্চ মায়া, ভবের রঙ্গমঞ্চ মাঝে—
রঙ্গের নটবর হরি যারে যা সাজান সেই তা সাজে।”[৩]

এই মঞ্জরী অপেরায় কর্মরত গোপাল নামক একটি চরিত্র খুব সুন্দর বাঁশী বাজাতে পারতেন। চেহারার বহিরাঙ্গিক ঔজ্জ্বল্যে সে নারায়ণ, কৃষ্ণ, শিব সাজতেন। বাঁশী বাজানো ছাড়াও সে বিভিন্ন চরিত্রের ভূমিকায় অভিনয় করে দর্শকের মনোরঞ্জন করতো। অভিনয়ের পাশাপাশি সে দলের হয়ে অন্যান্য কর্ম পরিচালনা, দেখাশোনা করার মতো নেতৃত্ব সুলভ ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। রীতুবাবু, গোরাবাব, মঞ্জরী, অলকা, বংশী সহ অন্যান্য বিভিন্ন চরিত্রের মধ্য দিয়ে আলোচ্য উপন্যাসের কাহিনী অগ্রসারিত হয়েছে। তাদের পালাগালেও বৈষ্ণব দেহতাত্ত্বিক বা যৌবনোচ্ছল রাধার হৃদয় উৎসারিত আর্তি প্রকাশিত হয়েছে ঠিক এভাবেই—

“নন্দন বনে চন্দন বাস চন্দ্রিকা ঝলমল
মন কারে চায় থাকে সে কোথায় বল সখী বল বল
মন চঞ্চল খসে অঞ্চল সারা যৌবন কেন বিহ্বল হল সই?
কেন অতন্দ্র চন্দ্রের পানে অনিমেখে চেয়ে রই।”[৪]

এ আর্তি যেন শ্রীরাধার পূর্বরাগ জনিত কৃষ্ণ দর্শনে রূপ মুগ্ধতা ও সেই সঙ্গে তার চিত্ত চাঞ্চল্যের এক অপরূপ চিত্রকল্পকে বর্ণনা করেছে। প্রকৃতি, পুরুষ, প্রেমিক সত্তা, শ্রীরাধার রূপস্পৃহা কৃষ্ণ দর্শনের আকাঙ্খায় যে অব্যক্ততা; ঔপন্যাসিক বৈষ্ণবীয় রন্ধ্রপথে আধুনিক উপন্যাসের সঙ্গে তাকে একই পথে সম্পৃক্ত করেছেন। মঞ্জরী অপেরায় রিতুবাবুর একটি সঙ্গীতেও শ্রীহরির প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়েছে— এ মায়া প্রপঞ্চ মায়া ভবের রঙ্গমঞ্চ মাঝে গানের সরস উপস্থাপনার মধ্য দিয়ে। আর এ গানটির সঙ্গে সঙ্গে আরো একটি পালার সংলাপেও বিষ্ণুর অবতারত্ব প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়েছে—

“একদিন এরই মাঝে গন্ধর্বলোকের প্রান্তে
বিষ্ণুর মন্দির অঙ্গনে দেখিলাম
অপরূপ। এক কন্যা— বিষ্ণু নামগান
গাহি করে পূজা নিবেদন ....

..................................অভিশপ্তা
গন্ধর্বতনয়া, নাম তার কুসুমিকা।”[৫]

বিষ্ণুভক্তির এক বিশেষ প্রেক্ষাপট, ভক্তের আকৃতি, আত্মনিবেদনের প্রতিচিত্রে অপেরা মধ্যস্থ পালা থেকে উপস্থাপিত হয়েছে। ‘মঞ্জরী অপেরা’র কাহিনী এই পালা নিয়েই পরবর্তী সময়ে অগ্রসারিত হয়েছে। এই পালায় বৈষ্ণব ভক্তির প্রসঙ্গ, মানবিক সূচিতা, তার আন্তরিক ভক্তিতত্ত্বের ভাবনা, নারীত্ব যে শ্রীরাধা সমগোত্রীয় তাই যেন উপন্যাসের বহু কৌণিক অন্তরালে বর্ণিত হয়ে পাঠক চিত্তে গভীর আলোড়ন সৃষ্টিতে সক্ষম হয়েছে। উপন্যাসের কানিনীতে বর্ণিত আরও একটি প্রসঙ্গে ধর্মীয় ভাবাবেগের চিত্র পরিস্ফুট হয়েছে—

> “শুচিও যে, মালবিকাও সে, দুইয়ে মিলে ওরা সম্পূর্ণ। ধর্মকামনা, পূণ্য আর জীবন কামনা প্রেম দুইয়ে মিলে তবে নারী সম্পূর্ণ। লক্ষী আর রাধা।”[৬]

পৌরাণিক বিষয় আবর্তিত, কাহিনী নিয়ে বৈষ্ণব ভাবাশ্রিত প্রেক্ষাপটে এভাবেই অপেরার পালাগুলি বাস্তব কল্পনাকে সংমিশ্রিত করে ঔপন্যাসিক তারাশঙ্কর এগিয়ে নিয়ে গেছেন। ‘গন্ধর্ব কন্যা’, ‘সতী তুলসী’, ‘জনা’ নাটকের অদ্ভুত সাফল্যের মধ্য দিয়েই শুরু হয় ‘মঞ্জরী অপেরা’র বিজয় অভিযান। সর্বত্রই এর সুনামে চারিদিক মুখরিত হয়। দিকে দিকে অপেরার এক বিশেষ আতিথ্য প্রচারিত হয়। এই বিজয় অভিযান থেকেই মঞ্জরী অপেরা উপন্যাসের দ্বিতীয় পর্বের সূচনা হয়।

উপন্যাসের যোগা মাস্টার যোগাদা নামক চরিত্রটির মধ্যেও বৈষ্ণব ধর্মের প্রভাব মণ্ডিত একটি দিকের পরিচয় পাওয়া যায়। রমণী নামের একটি মেয়ে তাকে সুরাপানের প্রস্তাব দিলে সে বলে—

> “না ভাই। ওতে নাই। জান, কণ্ঠ মশায়ের কাছে বৈষ্ণব মন্ত্রে দীক্ষা নিয়েছিলাম। উটি খাবার জো নাই। তিনি বলেছিলেন যোগানন্দ, সব খেয়ো মদটি খেয়োনা। ওই খেয়ে প্রভুর এত বড় যদু বংশ নলখাগড়ার ঘায়ে শেষ।”[৭]

এই অংশ থেকে বৈষ্ণব ধর্মাচরণের রীতিনীতির এক বিশেষ দিক, নিষেধাজ্ঞার চিত্র প্রতিফলিত হয়েছে। এভাবে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রসঙ্গে কাহিনীতে সংমিশ্রিত হয়েছে, বৈষ্ণব ভক্তি তাত্ত্বিক রসক্রীড়া। এই অপেরায় অভিনীত ‘সতী তুলসী’, ‘জনা’র মতো নাটকের নাট্যাভিনয় কৃষ্ণ চরিত্রের মহিমান্বিত কিছু দিককে আলোকিত করেছে। যেমন ‘জনা’ নাটকে পুত্র শোকাতুরা জনা যখন গঙ্গাস্রোতে বিলীন হয়ে যাচ্ছেন তখন শ্রীকৃষ্ণের সংলাপে উদ্ধৃত হয়েছে—

“ক্ষমা— ক্ষমা করো জননী আমার। ক্ষমা !
অপরাধ করিনু স্বীকার। ক্ষমা চাই। ক্ষমা !
....

যাও সতী পূণ্যবতী গঙ্গা অংশোদ্ভূতা
মহীয়সী জননী আমার— যাও তুমি আমার স্থানে।"[৮]

এভাবেই মঞ্জরী অপেরার একটি পালার অভিনয়ের যবনিকা পতন হল হরিধ্বনি উচ্চারণের মধ্য দিয়ে, এই উক্তির উত্থাপনে কাহিনীর ছত্রে ছত্রে পৌরাণিক নাট্যাভিনয়ের মধ্য দিয়ে শ্রীকৃষ্ণের হৃদয় সত্তা তার করুণা ধর্মের প্রমাণ পাওয়া গেছে।

উপন্যাসের মূল চরিত্র মঞ্জরীর দিকে দৃষ্টিপাত করলে জানা যায়, তাদের পরিবারও বৈষ্ণব আশ্রিত পরিমণ্ডলেই আবৃত ছিল। তার দিদিমা ছিলেন বিখ্যাত কীর্তনওয়ালী। তার মেয়ে অর্থাৎ মঞ্জরীর মাও কীর্তন গাইত, এটাই ছিল তাদের একমাত্র পেশা। তবে তারা বৈষ্ণব হলেও মৎস ভক্ষণ করতো, তবে মাংস, পেঁয়াজ, ডিম ছিল তাদের পরিবারে নিষিদ্ধ। তবে ব্যক্তিগত জীবনে মঞ্জরী যাত্রাদলের মুখপাত্র গোরাবাবুর কাছে বিবাহ সূত্রে আবদ্ধ ছিলেন। ঈশ্বর স্বাক্ষী রেখে তাদের বিবাহ সম্পন্ন হয়েছে। মানুষ ব্যঙ্গ করে বলতো, দেহ ব্যবসায়িনীর কন্যার সঙ্গে শাস্ত্র সম্মত বিবাহ এ যেন অত্যাশ্চর্য বিষয়। গোরাবাবুর সঙ্গে মঞ্জরীর যে প্রণয় সম্পর্ক তা তার কৈশোরেই গড়ে ওঠে। এই সম্পর্ক পরবর্তী সময়ে পরিণতির পর্যায়ে এগিয়ে যায়। তার মা ছিলেন তুলসী, আর তার দিদিমা ছিলেন বিখ্যাত কীর্তনওয়ালী ব্রাহ্মণ কন্যা, বাল্যবিধবা, রূপসী। যাত্রাদলেরই এক তরুণের সঙ্গে সম্পর্কের সূত্রে মঞ্জরীর মাসীর বাড়িতেই তার মা তুলসীর জন্ম। জীবনের নানা ঘাত-প্রতিঘাতের আবহে এভাবেই শুরু হয় তাদের এক পঙ্কিলতম অধ্যায়ে পদার্পণের যাত্রা। পাপের প্রায়শ্চিত্ত, নরক ভোগ থেকেই মুক্তি পেতে তার হৃদয়ে অবিচলিত গোবিন্দ ভক্তিতরঙ্গের উৎস রূপ প্রবাহিত হয়েছে। তাই ঔপন্যাসিক যথার্যই লিখেছেন—

> "তার বাপের নাম কীর্তনের পুণ্য আর তার নিজের যৌবনকাল পর্যন্ত গোবিন্দ সেবা, গোবিন্দানুরাগের সুকৃতির ফল— অকস্মাৎ নরকের বন্ধ দুয়ার খুলল।"[৯]

তাই মঞ্জরীর মা নিজেকে ও তার আত্মজাকে নিয়ে এই পাপকুণ্ড থেকে মুক্তির স্বরূপ অনুসন্ধানে প্রতি মুহুর্তে শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা করেছেন। তাঁর চরণেই নিজেকে নিয়োজিত করতে চেয়েছেন, আর এভাবেই মুক্তির আত্মকামনায় মঞ্জরী অপেরার সঙ্গীতে বৈষ্ণব পদসাহিত্যের সুললিত ছন্দ মণ্ডিত গান নানা সুরে তালে তরঙ্গ হিল্লোলে স্থান দখল করে নিতে থাকে—

"কহে চণ্ডীদাস শুন বিনোদিনী সুখ দুঃখ দুটি ভাই—
সুখের লাগিয়া যে করে পীরিতি দুঃখ যায় তারই ঠাঁই।"[১০]

শ্রীরাধার মর্মবাণীই যেন 'মঞ্জরী অপেরা'র নারীদের জীবন সম্পৃক্ত প্রতিচিত্রের দাবীদার করে তুলেছে। প্রণয় বাসনায় মঞ্জরী, তুলসী শ্রীরাধার ভাবানুভূতির অনুরূপা হয়ে উঠেছেন। 'পরকীয়া প্রেমতাত্ত্বিক' ভাবনা থেকে ভক্তি মার্গের তাত্ত্বিক অবয়বে

ঔপন্যাসিক বৈষ্ণব চেতনাকে কাহিনীর অন্তরালে প্রোথিত করে তাকে ক্রমপরিণতি দিকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন। তাইতো তুলসীর মায়ের রাধারাণীর পরিচয়ে অভিনয়কালে বিরহিণী শ্রীরাধার মহিমায় চণ্ডীদাসের এক বিখ্যাত উক্তি প্রতিধ্বনিত হয়েছে—

> "অ-পূ-র্ব কীর্তন গাইতেন রাধা দিদি। গাইতেন, 'সই কেবা সুনাইল শ্যাম বা-ম!' মনে হল যেন সাক্ষাৎ রা-ধা ভাবে বি-ভোর হয়েই গাইছেন বুঝি।"[১১]

এভাবেই উপন্যাসের নায়িকা বাস্তবের রাধারাণী হয়ে উঠেছেন শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় সখী, প্রেমাস্পদে প্রকৃত শ্রীরাধা সমগোত্রীয়া। উপন্যাসের কাহিনীও এভাবে এক রোমাঞ্চকর গতিময়তা পেতে পেতে ক্রমশ এগিয়ে গেছে। ধীরে ধীরে কৃষ্ণ আরাধনার সঙ্গীত মঞ্জরী অপেরার ভিত্তিস্তম্ভ রূপে আরো এক অগ্রপদকে তরান্বিত করে। বাংলাদেশের গ্রামে শহরে 'ফাগ-খেলা'র নামে কীর্তন গানের আসরে কৃষ্ণবন্দনা, বিগ্রহের পায়ে রঙ দেওয়া, নাট মন্দিরে ফাগ ছড়ানো সবই যেন উপন্যাসের চিত্রপটে বৈষ্ণব সাহিত্যের 'রাস' উৎসবের প্রতিচিত্রকে বাস্তব প্রেক্ষাপটে স্মরণ করায়।

সহজিয়া বৈষ্ণব ধর্মমতের সাধন সন্ন্যাসিনী রূপে রাধারাণী, তুলসী, মঞ্জরী প্রত্যেকেই তাই জন্মসূত্রে সামাজিক বৈধতার রীতিতে স্থান পাননি। মঞ্জরী ও গোরাবাবুর সম্পর্কে তাই বলা হয়েছে—

> "মঞ্জরী তো তার মা-বাপের বৈধ বিবাহের সন্তান নয়। নবদ্বীপে গিয়ে তারা বৈষ্ণব শাস্ত্রমতে বৈষ্ণব হয়ে মালাচন্দন দিয়ে পরস্পরকে বরণ করেছিল। জাত কুল মান বিসর্জন দিতে গোরাবাবু একবারের জন্যও বিষণ্ণ হয় নি। বরং উল্লসিত হয়েছিল। সমাদর করে মঞ্জরীকে বলেছিল— তোমার মালা আমার মুক্তির মালা। তিলকের চন্দন আমার শান্তির প্রলেপ। দু'বছর পর দুজনে পরামর্শ করে গড়েছিল মঞ্জরী অপেরা। থিয়েটার সে ছেড়েছিল বিয়ের পরই।"[১২]

এভাবেই মঞ্জরীর জীবন পরিণতির এক বিশেষ অধ্যায়ের সূত্রপাত হয়। সে এরপর থিয়েটার থেকে কীর্তনে অধিক মনোনিবেশ করে। তাই সে তার মায়ের কীর্তনের দলকে নতুন ভাবে নির্মাণের প্রচেষ্টায় প্রবৃত্ত হন। পরিবর্তিত জীবন পথে মঞ্জরীর পদ সঞ্চারণ ও বৈষ্ণবীয় প্রেমময় বিরহ তাপিত বেদনা ক্রমশ সঞ্চারিত হতে হতে কাহিনীর গতি পরিবর্তন করে চলে। অপেরা সঙ্গীতের সুরে অনুরণিত হয়ে ওঠে—

> "ওই চলে রাধা বাহি মানে বা-ধা—
> তটিনী সাগর গামিনী যেন—; ও-ই !"[১৩]

ধীরে ধীরে মঞ্জরী হয়ে ওঠেন অভিসারিকা রাধা। তুলিসী রূপী মঞ্জরী অভিনয় কালে গোরাবাবু আর অলকার অবৈধ সম্পর্কের অনুমান করে সব বুঝেও এক বিচিত্র হাসিতে জীবনের সবদিক হারিয়ে ফকির হয়েও জেতা বড়ই দুঃসাধ্য এই ভাবনায় নিজ

মনকে সমাহিত করে। এই মনস্তাত্ত্বিক পরিকাঠামোয় অপেরার একটি দৃশ্য প্রাসঙ্গিক ভাবে প্রতিভাত হয়েছে—

> "রাধার সখী তুলসী। গোপকন্যা রাধা নয়, চিরন্তনী গোলক-বিহারিণী রাধা। ব্রজলীলায় তখনও মর্ত্যধামে আবির্ভূত হন নি। ... শ্রীকৃষ্ণ তার সঙ্গে পরিহাস করেছিলেন —... রাধা তাকে অভিশাপ দিলেন— মর্ত্যভূমে গিয়ে তুমি মানবী হয়ে জন্ম-মৃত্যুর দুঃখ ভোগ কর। শ্রীকৃষ্ণ বললেন যাও সখী— সেখানে গিয়ে তুমি আমার অংশ সম্ভূত, আমারই সখা সুদামের স্ত্রী রূপে আমাকে লাভ করবে।.... বৃন্দাবনে কৃষ্ণসখা কৃষ্ণ-অংশসম্ভূত সুদামের সঙ্গে। সুদামও অভিশপ্ত হল ব্রজ বিলাসিনী রাধা কর্তৃক।"[১৪]

এভাবেই বৈষ্ণবীয় 'সখীতত্ত্ব', 'প্রেমবিলাস বিবর্ত তত্ত্ব'-এর প্রসঙ্গ উপন্যাসের কাহিনীতে যাত্রাপালার মধ্য দিয়ে প্রবেশ করেছে। 'সখীতত্ত্ব'-এর বর্ণিত পরকীয়া প্রেমকে তুলসীর মধ্য দিয়ে অনুসন্ধিৎসু হতে দেখা যায়। তুলসী সেখানে বলেছে—

"কিশোরীর প্রাণবধূ— হে চিরকিশোর —

....

হে মুরলী বরান, একি আচরণ!
আমি দাসী শ্রীমতীর, দাসী সখি—
মোর প্রতি অনুরাগ সাজে না তোমার !"[১৫]

কৃষ্ণ বলেছেন—

"তুমি অসামান্য। তুমি অপরূপা—
রাধা আর তুমি কভু ভিন্ন নহ সখী !"[১৬]

তুলসীর স্বীকারোক্তিতে উঠে এসেছে—

"হ্যা গো। এত প্রেম ! ওই স্পর্শ
জীবনের একমাত্র কামনা আমার—
বুকে মোরে তুলে লও, তুলে লও
ওগো প্রিয়—"[১৭]

ব্রজলীলায় শ্রীকৃষ্ণের যে আশা পূরণ হয়নি, তার পূর্ণতার লক্ষ্যেই তিনি মর্ত্যধামে নানাবিধ লীলায় মত্ত হয়েছেন। বৃন্দাবনে রাধা সহ ষোল শত গোপিনীর সাহচর্যে রাসলীলা, দোললীলা, ঝুলন, দ্বারকার সহস্র মহিষী সহ অনন্ত তার প্রণয়লীলা—

"কৃষ্ণ বলেছেন আরও সাধ মহেশ্বর !
তবে ব্রজলীলা তরে আর তৃষ্ণা নাই।"[১৮]

এভাবেই লেখক বৈষ্ণবীয় প্রণয়লীলার রূপকে রাধা, কৃষ্ণ, তুলসীর প্রতিরূপে মঞ্জরী, গোরাবাবু ও অলকার সম্পর্কের মধ্যে ছায়াপাত ঘটিয়েছেন। এই ত্রিকোণ সম্পর্কের বেড়াজাল থেকে শেষ পর্যন্ত গোড়াবাবুর অন্তর্যন্ত্রণা প্রকাশিত হয়েছে। তিনি

তার ঘর স্ত্রী, সম্পদ, সব কিছুকে বিসর্জন দিয়ে যাত্রার দলে যুক্ত হয়ে যে মঞ্জরীর সঙ্গে পরিচিত হন, যেভাবে ধীরে ধীরে তাদের সম্পর্কের পরিণতি প্রণয়ে রূপান্তরিত হয়, আজ তার এই ভয়াবহ পরিণতি দেখে তিনি সত্যই মানসিক ভাবে মর্মাহত, আর সেই আবেগ তিনি নিজ স্বীকারোক্তিতে বলেছেন—

> "আমি উন্মাদ তাকে ভালো লাগল, ভালোবাসলাম। চিরকাল তাকে ভালোবাসব বলে জাত খুইয়ে বোষ্টম হয়ে বিয়ে করলাম। ভালোবাসতাম বলেই মনে করে এসেছি এতদিন আজ বলছি— না। হয়তো ভালোবাসা নেই। আজ মনে হচ্ছে অলকা সব। অলকাকেই ভালোবাসি। না দেখে তাকেই ভালোবেসে এসেছি এতকাল। অলকা মনে করেই মঞ্জরীকে ভুল করে ভালোবেসেছি।"[১৯]

গোরাবাবুর হৃদয় অন্তরস্থিত অব্যক্ত প্রেমবহ্নিকে তিনি রিতুবাবুর সম্মুখে প্রত্যক্ষ স্বীকারোক্তিতে ব্যক্ত করেছেন। একটি অপেরার উৎসব, তা থেকে নিজের দুরত্ব রচনা করা, সেখানে নির্বাচিত যাত্রার বিষয়, চরিত্রের অন্তর্দ্বন্দ্ব সব কিছুর সঙ্গে বৈষ্ণবীয় তাত্ত্বিক পটভূমি ও বাস্তবের রঙ্গভূমি মিলিত মিশ্রিত হয়ে পাঠকের কাছে উপস্থিত হয়েছে।

উপন্যাসে স্বল্প পরিসরে বর্ণিত হয়েছে 'রাধাসখী অপেরা'র কথা। শ্রীমতী রাধা নামের এক রমণী তার মুখ্য চরিত্রাভিনেত্রী রূপসী। অপেরার অন্তরালে তাদের জীবনযাত্রা এক বিশেষ সামাজিক চিত্রকে প্রতিকায়িত করেছে। এই সকল যাত্রাদলের অন্তরালে চলতে থাকা অবৈধ দেহব্যাবসা, অল্পবয়সী যুবকদের দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতালব্ধ ছলা-কলার মধ্য দিয়ে বিশেষ আকর্ষণে প্রলুব্ধ করে, বয়সের জীর্ণতা ভুলে যাত্রাদলে কীর্তনগানের অছিলায় তারা যে কামকেলীতে মত্ত হতেন, এমনই এক জীবন সংগ্রামে মুখরিত বাস্তবতাকে লেখক 'মঞ্জরী অপেরা' উপন্যাসে জীবন্ত রূপ দিয়েছেন।

অন্যদিকে 'মঞ্জরী অপেরা' থেকে গোরাবাবু নিজেকে সম্পূর্ণ রূপে বিচ্ছিন্ন করেন। মঞ্জরীকে একাকিত্ব জীবন অতিবাহিত করার পাশাপাশি অপেরার সমূহ ক্ষতিকে একা হাতে তত্ত্বাবধান করতে হয়। লেখক স্পষ্ট বলেছেন এ অবস্থায় ভদ্র পরিবারের নারীরা কৃচ্ছ্রসাধনার মধ্য দিয়ে জীবনযাপন করলেও অসহায় নারীকে জীবন রক্ষার তাগিদে সব হারিয়ে জীবনের পাপকুণ্ডে পতিত হতে হয়। মঞ্জরীর দিদিমা, মা কিছুদিন সে পথে থাকলেও তাকে তারা কোনদিন সে পথে যেতে দেননি। কিন্তু অলকার উপস্থিতিতে 'মোহিনীমায়া', 'জনা'য় অভিনয় করে মঞ্জরীর দেহভঙ্গিমায়, কটাক্ষে যে ছন্দের লীলা অনুপ্রবেশ করে গোরাবাবুর প্রিয় অলকাকে তা ছাপিয়ে যেতে পর্যাপ্ত ছিল। দোল উৎসবে মঞ্জরীকে প্রথম দেখা, পরের বছর নবদ্বীপে গোরাবাবুর সঙ্গে বৈষ্ণব মতে মালাচন্দন প্রথায় বিবাহ করা, তার জীবনের উত্থান-পতনের সবদিকেই নারীর প্রজ্জ্বলিত দিকের সঙ্গে তার সংঘর্ষ, উত্তরণকে বৈষ্ণব পন্থায় সংমিশ্রণের মধ্য দিয়ে জারিত করেছেন ঔপন্যাসিক।

তাই পরিশেষে সর্বত্যাগী হয়ে তীর্থযাত্রার মধ্য দিয়ে জাগতিক শোক-তাপকে মঞ্জরী কৃষ্ণ চরণে অর্পণ করে আত্মন্তিক মুক্তি পেতে চেয়েছেন। দেহপোজীবির কন্যা হয়ে যে মঞ্জরী ভক্তি মার্গের এত চরিত্রে সমগ্র জীবন ব্যাপী অভিনয় করে মানুষকে মনোরঞ্জন করেছেন, সেই যেন আজ সর্বত্যাগিনী যোগিনী মূর্তিমতী। তাই রিতুবাবুর সে প্রথম দিনের গাওয়া 'রঙ্গের নটবর হরিভক্তির এ মায়া প্রপঞ্চমায়া ভবের রঙ্গমঞ্চ মাঝে'— গানটি আজ তার মিথ্যে মনে হয়েছে। গোরাবাবুর সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্কের ইতি, মঞ্জরীর মতো মেয়েকে তার ত্যাগ করে চলে যাওয়া, নতুন অপেরা দল তৈরীতে আগ্রহ না দেখানো, বহু মানুষের আগমন, গোরাবাবুর প্রথম পক্ষের স্ত্রী পুত্রের উপস্থিতি, একদিকে মঞ্জরীর গোরাবাবুকে দর্শন না করা, অন্যদিকে মঞ্জরী অপেরার যবনিকার সূত্রপাতকে নটবর হরি শ্রীকৃষ্ণ যেন একই সঙ্গে রচনা করে গেলেন। প্রণয়, পরকীয়া লীলা, মঞ্জরী ও তুলসীর সখী ভাবনায় 'সখীতত্ত্ব', 'প্রেমতত্ত্ব'-এর নিবিষ্টতায় বৈষ্ণবীয় প্রসঙ্গের অবতারণায়, পরিশেষে এ কাহিনী এক বিরহ তাপিত হৃদয়গাথায় পরিপূর্ণতা পেয়েছে। মঞ্জরী তাই প্রকৃতই বৃন্দাবনের বিরহিণী রাধা হয়ে কাহিনীর বৈষ্ণব তত্ত্ব-দর্শনের উপস্থিতিকে পরিণতির দিকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন। তাই আধুনিক কালপর্বে রচিত এ উপন্যাসের বয়নশৈলী নির্মাণে মধ্য ও আধুনিক দুটি যুগের ভাবনায় মিলিত করে কথাসাহিত্যিক তারাশঙ্কর যে মর্মস্পর্শীতায় বাস্তবায়িত করেছেন, যেভাবে চরিত্রের নির্লিপ্ত মনস্তাত্ত্বিক দোলাচলতার প্রবহমান গতিতে কাহিনীকে পৃথক উচ্চাঙ্গে প্রেরণ করেছেন, পাঠককে ভাবিয়েছেন, তা নিঃসন্দেহে ব্যাপক আলোচনা তথা গবেষণার দাবী রাখে এ কথা বললে অত্যুক্তি হয় না।

তথ্যসূত্র-

১. 'বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা' : শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, ১০ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ : ১৩৪৫ বঙ্গাব্দ, সপ্তম সংস্করণ : ১৯৮৪, পুনর্মুদ্রণ : ২০০৯-২০১০, পৃষ্ঠা ৩২৪।

২. 'তারাশঙ্কর-রচনাবলী', 'ত্রয়োদশ খণ্ড' : তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ, ১৩৬০ (৩৩০০), দ্বিতীয় মুদ্রণ ১৩৯৩ (২২০০), পৃষ্ঠা ২৬২।

৩. তদেব, পৃষ্ঠা ২৬৩।

৩. তদেব, পৃষ্ঠা ৩১১।

৪. তদেব, পৃষ্ঠা ৩৪২।

৫. তদেব, পৃষ্ঠা ১৭৮।

৬. ‘তারাশঙ্কর-রচনাবলী’, ‘চতুর্দশ খণ্ড’ : তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ, কার্ত্তিক ১৩৬২, তৃতীয় মুদ্রণ, শ্রাবণ ১৩৯৩, পৃষ্ঠা ৩০১।

৭. তদেব, পৃষ্ঠা ৩১৮।

৮. তদেব, পৃষ্ঠা ৩২৬।

৯. তদেব, পৃষ্ঠা ৩২৭।

১০. তদেব, পৃষ্ঠা ৩৩২।

১১. তদেব, পৃষ্ঠা ৩৫২।

১২. তদেব, পৃষ্ঠা ৩৭১।

১৩. তদেব, পৃষ্ঠা ৩৯৯।

১৪. তদেব, পৃষ্ঠা ৪০০।

১৫. তদেব, পৃষ্ঠা ৪০০।

১৬. তদেব, পৃষ্ঠা ৪০০।

১৭. তদেব, পৃষ্ঠা ৪১১।

১৮. তদেব, পৃষ্ঠা ৪২৮-৪২৯।

১৯. তদেব, পৃষ্ঠা ৫১৬।

গ্রন্থপঞ্জি-

১. গঙ্গোপাধ্যায়, ড. সুখেন্দু সুন্দর : ‘গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের ভূমিকা’, সোনার তরী, ৪এ নর্থ নওদাপাড়া রোড, কলকাতা-৫৭, প্রথম চলিত ভাষার পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত সংস্করণ, বইমেলা, জানুয়ারি ১৯৯৭।

২. রায়, কালিদাস : ‘পদাবলী সাহিত্য’, করুণা প্রকাশনী, ১৮এ টেমার লেন, কলকাতা-৯, প্রথম সংস্করণ: আগস্ট ২০০৪।

৩. বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর : ‘তারাশঙ্কর-রচনাবলী’, ‘ত্রয়োদশ খণ্ড’, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ, ১৩৬০ (৩৩০০), দ্বিতীয় মুদ্রণ ১৩৯৩ (২২০০)।

৪. বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর : ‘তারাশঙ্কর-রচনাবলী’, ‘চতুর্দশ খণ্ড’, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ, কার্ত্তিক ১৩৬২, তৃতীয় মুদ্রণ, শ্রাবণ ১৩৯৩।

৫. বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীকুমার : ‘বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা’, মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, ১০ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ : ১৩৪৫ বঙ্গাব্দ, সপ্তম সংস্করণ : ১৯৮৪, পুনর্মুদ্রণ : ২০০৯-২০১০।

নজরুলের শিশুসাহিত্য

স্বপ্না বন্দ্যোপাধ্যায়
সহকারী অধ্যাপক, আর্য মহিলা পি. জি. কলেজ
(সম্বদ্ধযুক্ত বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়)

সংক্ষিপ্তসারঃ- কবি নজরুল ইসলাম বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় স্বচ্ছন্দে বিচরণ করেছেন। বাংলা শিশুসাহিত্যেও কবির বিশেষ অবদান রয়েছে। কবি শিশুদের খুব ভালোবাসতেন। শিশুমনের নির্মল অনুভূতিগুলিকে উপলব্ধি করতে পারতেন, তাই কবি শিশুদের প্রতি অন্তরের ভালোবাসা দিয়ে তাঁর শিশুসাহিত্যকে আবেগময় ও হৃদয়স্পর্শী করে তুলেছিলেন। তাঁর রচনাগুলির দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায় শিশুমনের সহজাত ইচ্ছা আকাঙ্ক্ষা ও দুষ্টুমির প্রকাশ ঘটেছে খুব সহজভাবে। শিশুরা হলো ভবিষ্যতের কান্ডারী, তাদের সঠিক পরিচর্যার মাধ্যমে গড়ে তুলতে হবে তাদের নৈতিক দায়িত্ব। নজরুলের শিশুসাহিত্যের দিকে দৃষ্টিপাত করলে আমরা দেখতে পাই যে তিনি শিশুদের বিভিন্ন বিষয়ে সজাগ হবার পরামর্শ দিয়েছেন. কখনো শিশুদের কর্তব্যকর্ম স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, কখনো আবার আত্ম চেতনায় উদ্বুদ্ধ হতে তাগিদ দিয়েছেন। কখনো মহৎ কর্ম ও জ্ঞানের পথে শিশুদের আহবান করেছেন।এছাড়া তাঁর লেখার মধ্যে উঠে এসেছে শিশুমনের নানা ভাবনা, কখনও তাদের মধ্যে সম্ভাবনাকেও উস্কে দিয়েছেন, আবার কখনো আগামীর স্বপ্ন দেখিয়েছেন। শিশুমনের চিরন্তন জিজ্ঞাসাগুলি কবির মায়াবী হাতের স্পর্শে কাব্য হয়ে উঠেছে। শিশুসাহিত্য রচনায় কবি নজরুল শিশুমনস্তত্ত্ববিদ এবং শিশুদের বন্ধু। শিশুসাহিত্যে নজরুলের এই অবদান কালজয়ী। শিশুদের কাছে তিনি চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

সূচক শব্দ: ঝিঙ্গে ফুল, পিলে পটকা, ফ্যাসাদ, ঠ্যাংফুলী, খাঁদু-দাদু, পুতুলের বিয়ে

বিংশ শতাব্দীর সবচেয়ে নির্ভীক ও বলিষ্ঠ সাহিত্যিক কবি নজরুল। তাঁর জীবন যেমন বিচিত্র তেমনি তাঁর প্রতিভাও ছিল বহুমুখী। গীতিকার ও সুরকার হিসাবে তিনি এক মহৎ আসনের অধিকারী। এমনকি গায়ক হিসাবে তাঁর খ্যাতি এবং অভিনেতা হিসাবে তাঁর পরিচিতি কারো অজানা নয়। এছাড়াও নজরুল প্রতিভার বিকাশ ঘটেছে উপন্যাসে, ছোটগল্পে, নাটকে, শিশুসাহিত্যে, প্রবন্ধে বিদেশী কাব্যের অনুবাদে ও সাংবাদিকতায়। নজরুলের শিশু বিষয়ক রচনা এবং তাঁর উৎকর্ষ বিচার এই প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়।

মূলত শিশুসাহিত্য বলতে বোঝায় ৫ বছরের অধিক ও ১১ বছরের অনধিক বালক বালিকাদের জন্য রচিত যে কোন সাহিত্য পদবাচ্য রচনাকে। তবে অনেকে কিশোর কিশোরীদের জন্য রচিত রচনাকেও শিশুসাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত করতে সম্মত। বাংলা সাহিত্যের শিশুসাহিত্য বিভাগ নজরুলের পূর্বে যাঁদের অসাধারণ দানে ধন্য হয়েছে, তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন অক্ষয় কুমার দত্ত, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর,

মদনমোহন তর্কালঙ্কার, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, যোগীন্দ্রনাথ সরকার, সুকুমার রায়, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত প্রমুখ। বাংলা সাহিত্যে শিশুবিষয়ক রচনাগুলিতে ভাবের দিক থেকে দুটি উদ্দেশ্য লক্ষিত হয়। প্রথম, শিশুদের সাহস, উদারতা, ত্যাগ প্রভৃতি মহৎগুণ সম্পর্কে প্রেরণা ও শিক্ষা দেবার উদ্দেশ্য। দ্বিতীয়ত, শিশুদের আনন্দ দানের উদ্দেশ্যে রচিত কল্পনাপ্রধান রচনা। প্রথম শ্রেণির রচনাগুলি লক্ষিত হয় ঊনবিংশ শতাব্দীতে, আর দ্বিতীয় শ্রেণির রচনাগুলি লক্ষ্য করা যায় রবীন্দ্রযুগে।

শিশুমন অধিক খেয়ালী, স্বপ্নময় ও কল্পনাপ্রবণ। তাই রূপকথার রাজ্যে তাদের মনের অবাধ ভ্রমণ। প্রকৃতির রহস্যময়তায় অসীম আগ্রহ, সেইজন্য যেসব রচনায় তাদের আনন্দের পরিমাণ বেশী তাতেই শিশুরা বেশী আকৃষ্ট হয়। সুকুমার রায়, দক্ষিনারঞ্জন মজুমদার, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত প্রমুখ সাহিত্যিকেরা এই ধরণের রচনায় বাংলা শিশুসাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন। নজরুলের শিশুবিষয়ক রচনায় এই শিশুসাহিত্যিকদের প্রভাব অনুভূত হয়।

শিশুসাহিত্য সৃষ্টির পরিমাণ নজরুল ইসলামের অল্প। ছোটদের কবিতার বই ‘ঝিঙেফুল’ (১৯২৬), ‘সঞ্চয়ন’ (১৯৫৯), ‘পিলে পটকা’ (১৯৬৩), ‘ঘুম জাগানো পাখি’ (১৯৬৪), ‘সাত ভাই চম্পা’ (আনুমানিক পুতুলের বিয়ের পর), ‘ঘুমপাড়ানি মাসী-পিসী’ (১৯৬৫)। দুখানি নাটিকা ‘ঝিলিমিলি’ নাটকের ‘ভূতের ভয়’ এবং ‘পুতুলের বিয়ে’। শিশুসাহিত্য রচনায় নজরুলের অসামান্য সাফল্যের কারণগুলি হল নজরুলের কবিমানসের মধ্যে একটি শৈশবলোকের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। তাঁর শিশুসুলভ খামখেয়ালীপনা, ভাবুকতা, বন্ধনহীনতা, পরিহাসপ্রিয়তা প্রকৃত শিশুমনেরই প্রকাশ।
শিশুশিক্ষামূলক কবিতায় কখনও শিশুকে তিনি তার কর্তব্যবোধ মনে করিয়ে দিয়েছেন। ঝিঙেফুল কাব্যগ্রন্থের প্রভাতী কবিতায় প্রভাতের সুন্দর সাবলীল বর্ণনা যা ছোটদের মনকে সহজেই স্পর্শ করে।

“ভোর হলো
দোর খোলো
খুকুমণি ওঠরে!
ঐ ডাকে
জুঁই শাখে
ফুল-খুকী ছোটরে!
খুকুমণি ওঠরে!”

খুকু জেগে উঠলে কবি তাকে প্রভাতের কর্তব্যকর্ম স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন।

“নাই রাত
মুখ হাত ধোও, খুকু জাগো রে
জয়গানে
ভগবানে

তুষি, বর মাগো রে!"

এখানে কবির ভাষা যেন ভোরবেলার মতই সজীব হয়ে উঠেছে। ছোটদের মধ্যে কে আগে ঘুম থেকে উঠেছে এই নিয়ে প্রায়ই নিজেদের মধ্যে কথা কাটাকাটি চলে সে কথাও কবি বিস্মৃত হননি।

উঠল ছুটল
ঐ খোকাখুকি সব
"উঠেছে আগে কে"
ঐ শোনো কলরব

'খুকু ও কাঠবিড়ালি' কবিতায় কাঠবেড়ালীর উদ্দেশ্যে খুকুর যে উক্তি তার মধ্যে শিশুহৃদয়ের কল্পনাবিলাস ও জীবজন্তুর জীবন সম্পর্কে তার কৌতূহল ও হৃদ্যতা প্রকাশিত হয়েছে। এই কবিতায় ভাষা ও ছন্দ যেন শিশুসুলভ চপলতায় ভরা।

কাঠবেড়ালি! কাঠবেড়ালি! পেয়ারা তুমি খাও?
গুড়মুড়ি খাও? দুধ-ভাত খাও? বাতাবি নেবু? লাউ?
বেড়াল-বাচ্ছা? কুকুরছানা? তাও?

কাঠবেড়ালীর কাছ থেকে একটা পেয়ারা পাওয়ার জন্য খুকীর সে কি অপরিসীম আগ্রহ, ব্যাকুলতা আর অনুনয়। জামা, ফ্রক, সে সব কিছুই কাঠবেড়ালীকে দিতে চেয়েছে। কিন্তু কাঠবেড়ালী যখন তাকে পেয়ারা দেয় না তখন খুকুমণির অভিমান, আক্রোশ, সে তখন কান্নায় ভেঙে পড়েছে। শিশুমনের এই বিচিত্র চিত্র যেন 'খুকু ও কাঠবেড়ালী' কবিতায় কবি ছায়াছবির মতো শিশু পাঠকের সামনে তুলে ধরেছেন।

'খোকার খুশী' কবিতায় দেখা যায় মামার বিয়েতে খোকার আনন্দের সীমা নেই। বিয়ের মজাতে শিশু মন স্বাভাবিক ভাবেই উল্লাসিত হয়ে উঠে। তাই শিশু চায় রোজ বিয়ে করে এই মজা উপভোগ করতে।

কি যে ধানাই পানাই-
সারাদিন বাজছে শানাই,
এদিকে কারুর গা নাই
আজি না মামার বিয়ে।
বিবাহ। বাস, কি মজা!
সারাদিন মণ্ডা গজা
গপাগপ খাও না সোজা
দেয়ালে ঠেসান দিয়ে।।
....
মামীমা আসলে এ ঘর
মোদেরও করবে আদর?

বাস, কি মজার খবর
আমি রোজ করব বিয়ে।

'নামতাপাঠ' ও 'চিঠি' কবিতায় কবিমনের সঙ্গে শিশুমনের লেনদেনের পরিচয় স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। ছোটবেলায় নামতাপাঠে (পড়াশুনা) ভুল হলে বড়রা যখন ছোটদের বকাবকি করেন তখন শিশুর মনে কি প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয় তা সুন্দর ভাষায় ব্যক্ত করেছেন এখানে শিশুর পাঠবিমুখ মনোভাবকেও চিত্রিত করেছেন।

আমি যদি বাবা হতাম বাবা হত খোকা!
না হলে তোর নামতা পড়া মারতাম মাথায় টোকা।
রোজ যদি হত রবিবার
কি মজাটাই হত না আমার
থাকত না আর নামতা পড়া লেখা আঁকা জোকা
আমি যদি বাবা হতাম, বাবা হত খোকা।

'চিঠি' কবিতাটিতেও কবির শিশুসুলভ মনোবৃত্তির সুন্দর প্রকাশ ঘটেছে। এখানে কবি নিজেকে দাদা বলে উল্লেখ করেছেন।

"মা মাসিমা'য় পেন্নাম
এখান হতেই করলাম,
স্নেহাশিস এক বস্তা,
পাঠাই, তোরা লস্‌তা
সঙ্গে পদ্য সবিটা,
ইতি তোদের কবিদা।"

'খোকার বুদ্ধি' কবিতায় নজরুল শিশুমনের সঙ্গে আত্মীয়তা স্থাপন করে হাস্য কৌতুকের মাধ্যমে তাঁর আনন্দদানের আয়োজন করেছেন।

"চুন করে মুখ প্রাচীর' পরে বসে শ্রীযুত খোকা,
কেননা তার মা বলেছেন যে এক নীরেট বোকা
ডান-পিটে সে খোকা এখন মস্ত একটা বীর,
হুংকারে তাঁর হাঁস-মুর্গীর ছানার চক্ষুস্থির"।

'খোকার গল্প বলা' কবিতায় কবি যেন শিশুমনের বিচিত্র কল্পনার রূপকথা প্রকাশিত করে হাস্যরসের সৃষ্টি করেছেন। খোকা তার মাকে যে গল্প বলেছে তা বিশেষ চিত্তাকর্ষক – একদিন এক রাজা ফড়িং শিকার করতে গেলেন রাজার ভাগ্যে জুটল পাঁপড় ভাজা রাণী সানন্দে কলমী শাক তোলার ব্রত নিল, অবশেষে রাজা হাতীর মতন একটি বেড়াল বাচ্ছা শিকার করে নিয়ে এলেন।

"একদিন না রাজা –
ফড়িং শিকার করতে গেলেন খেয়ে পাঁপড় ভাজা

....

রাজা মশাই ফিরে এলেন ঘুরে।
হাতীর মত একটা বেড়াল বাচ্চা শিকার ক’রে।”

‘খোকার বুদ্ধি’ কবিতায় এক পালোয়ান খুকুর ছবি এঁকেছেন যার একটি ফড়িং মারতে সাতটি লাঠির প্রয়োজন। এখানে কবি হাস্যরস সৃষ্টি করে শিশুমনের আনন্দের আয়োজন করেছেন।

‘সাত লাঠিতে ফড়িং মারেন এমনি পালোয়ান;
দাঁত দিয়ে সে ছিঁড়লে সেদিন মস্ত আলোয়ান!’

‘ফ্যাসাদ’ কবিতাটিতে ছোট ছেলে পেসাদের ফ্যাসাদের কথা বিশেষ উপভোগ করার মত।

“শয্যা ছেড়ে নিত্য ভাবে গোমরা-মুখো পেসাদ,
এই দুনিয়ায় বেঁচে থাকা মস্ত একটা ফ্যাসাদ!
....
সবার দেখি অনিদ্রা রোগ, রাত থাকতে ওঠে,
ব্যস্তবাগীশ ফুলগুলো সব ভোর না হতেই ফোটে”।

এই ধরণের নানা ফ্যাসাদের শেষ পেসাদের যা ইচ্ছা হয়েছে তা খুবই হাস্যকর।

“বেঁচে থাকার ফ্যাসাদ দেখে পেসাদ ভাবে মনে,
আজ বাদে কাল চলে যাব অনেক সে দূর বনে।
কিম্বা হবে তালগাছে সে দানো একানোড়ে,
রাত্রি হলে বসবে এসে সবার ঘাড়ে চড়ে।
কিলিয়ে তাদের ভূত ভাগাবে বলবে একি ফ্যাসাদ;
নাকি সুরে বলবে তখন, ফ্যাঁসাদ নয়, এঁ-পেঁসাদ।”

‘বগ দেখেছে?’ কবিতাটিও শিশুসুলভ পরিহাস প্রিয়তার সুন্দর উদাহরণ –

‘পণ্ডিতমশাই সুঁটকো-মুখো, হাতে নিয়ে থেলো হুঁকো,
দেখছ তাকে, যখন ঘুমান ঘাড়টি গুঁজে?
বগ দেখাব তেমন করে বসো চক্ষু বুজে।
হুঁকো হল বগের গলা, তুমি হলে বগ,
তোমার মাথায় আঁদা, খাঁদা ঠোকরায় ঠকঠক। ’

‘হোঁদল-কুঁৎকুঁতের বিজ্ঞাপন’, ‘ঠ্যাংফুলী’ ও ‘পিলে পটকা’ কবিতা তিনটিতেও শিশুমনের উদ্ভট কল্পনার চিত্র পাই যা খুবই কৌতুককর।

‘হোঁদল-কুঁৎকুঁতের বিজ্ঞাপন’ কবিতাটি রঙ্গরসের জন্য আকর্ষণ। এছাড়া এই কবিতার অন্ত্যমিলগুলিও খুব সুন্দর।

“মিচকে-মারা বায়না মনটি বড় খুঁতখুঁতে।
ছিঁচকাঁদুনে ভাবিয়ে ওঠেন একটু ছুতেই না ছুঁতে।।”

'ঠ্যাংফুলী' কবিতাটিতে ঠ্যাংফুলীর বর্ণনাটি ভারী মজার।

"এক ঠ্যাং তালপাতা তার
যেন বাঁট হালকা ছাতার!
আর-পা'টা তার
ভিটবে ডাগর!
যেন বাপ! গোবদা গো-সাপ
পেট-ফুলো হুম এক অজগর!"

'পিলে পটকা' কবিতায় শিশুমনের পরিহাসপ্রিয়তার ছবি সুস্পষ্টভাবে লক্ষ্য করা যায়।

"উটমুখো সুঁটকো হাসিম
পেট যেন ঠিক ভুটকো কাছিম!
চুলগুলো সব বাবুই দড়ি - "

দাদুর সঙ্গে খোকাখুকীর সম্পর্ক যেমন মধুর তেমনি সহজ ও গভীর। কেননা 'বার্ধক্যই দ্বিতীয় শৈশব'। 'খাঁদু - দাদু' কবিতায় দাদুর নাক সম্পর্কে শিশুর গবেষণা অত্যন্ত হাস্যকর।

"অ-মা! তোমার বাবার নাকে কে মেরেছে ল্যাং
খাঁদা নাকে নাচছে ন্যাদা – নাক ডেঙা ড্যাং ড্যাং
....
দাদু বুঝি চীনাম্যান, নাম বুঝি চাংচু?
তাই বুঝি ওর মুখটা অমন চ্যাপ্টা সুধাংশু।
জাপান দেশের নোটিশ উনি নাকে এঁটেছেন।
অ-মা! আমি হেসেই মরি নাক ডেঙা ড্যাং ড্যাং।"

শিশুদের নিয়ে কবিতার মধ্যে কবি যেমন শিশুদের হাসিয়েছেন, খেলিয়েছেন তেমনি খেলার ছলে উপদেশও দিয়েছেন। 'লিচুচোর' কবিতায় এমন এক অপূর্ব দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়। 'বাবুদের তালপুকুরে' লিচু চুরি করতে গিয়ে হাবুদের ডাল কুত্তার তাড়া খেয়ে মালীর পিটুনি উপভোগ করে পাঁচিলের ফোঁকর গলে কোনভাবে অর্ধমৃত অবস্থায় যে শিশু বেরিয়ে আসে সে নিশ্চয় আর চুরি করতে যাবে না। একটি বাস্তব ঘটনাকে কেন্দ্র করে কবি শিশুর চুরি করার মনোবৃত্তিকে সমূলে ধ্বংস করেছেন। তাই কবিতার শেষে যখন শিশুকে প্রশ্ন করা হয়েছে- 'কি বলিস ফের হপ্তা?' তখন সে নিজের অভিজ্ঞতা স্মরণ করে বলেছে 'তৌবা – নাক খপতা।'

"কান মলি ভাই,
চুরিতে আর যদি যাই!
তবে মোর নামই মিছা
কুকুরের চামড়া খিঁচা
সেকি ভাই যায়রে ভুলা-

মালীর ঐ পিটনী গুলা।
কি বলিস ফের হপ্তা।
তৌবা-নাক খপতা।”

এই কবিতার মধ্য দিয়ে কবি শিশুকে নিজের অভিজ্ঞতা দিয়ে উপদেশ গ্রহণ করিয়েছেন।

শিশু হল ভগবানের সুন্দর সৃষ্টি। মানুষের দৈনন্দিন জীবন শিশুর আগমনে হয়ে ওঠে মুখরিত ও আনন্দিত। তাই সংসারে নতুন শিশুর আবির্ভাব চিরকালই বহন করে নতুনতর আনন্দ। ‘শিশুর জাদুকর’ কবিতায় শিশুকে কেন্দ্র করে অনন্তলোকের অরূপ রহস্য উন্মোচন করেছেন কবি।

“কোন রূপলোকে ছিলি রূপকথা তুই
রূপ ধরে এলি এই মমতার ভুঁই

....
ছোট তোর মুঠি ভরি আনিলি মণি,
সোনার জিয়নকাঠি, মায়ার ননী,
তোর সাথে ঘরে ভরে এল ফাল্গুণ
সব হেসে খুন হোল কি জানিস গুন।”

মায়ের সঙ্গে শিশুর সম্পর্ক কত ঘনিষ্ঠ ও মধুর তার চিত্র বার বার লক্ষিত হয়েছে নজরুলের শিশু বিষয়ক কবিতায়। মায়ের স্নেহের চেয়ে বড় শিশুর কাছে আর কি হতে পারে? সুতরাং মায়ের প্রতি ভালোবাসা ও কৃতজ্ঞতাবোধ প্রকাশ করা শিশুর স্বাভাবিক প্রবণতা ‘মা’ কবিতায় মাকে ঘিরে শিশুমনের নিবিড়তম প্রকাশ ঘটেছে।

“যেখানে দেখি যাহা।
মা-এর মতন আহা।
একটি কথায় এত সুধামেশা নাই,
মায়ের মতন এত
আদর সোহাগ যে তো
আর কোনখানে কেই পাইবে না ভাই

....
মা’র বড় কেউ নাই-
কেউ নাই, কেউ নাই।
নতি করি’ বল সবে ‘মা আমার! মা আমার’।”

‘কোথায় ছিলাম আমি’ কবিতায় খোকা মাকে তার জন্মের যে কথা জিজ্ঞাসা করেছে তার মধ্যে শিশুর রঙিন কল্পনা ও মাতৃকেন্দ্রিক ভাবস্বপ্নের অপূর্ব চিত্র লক্ষিত হয় – প্রথমে খোকার প্রশ্ন –

"মাগো আমায় বলতে পারিস কোথায় ছিলাম আমি
কোন না জানা দেশ থেকে তোর কোলে এলাম নামি?"

শেষ পংক্তিতে শিশুর অনুভূতি,-

"নীড়ের পাখী যেমন মাগো আকাশ পানে ধায়,
আকাশ পেয়ে খানিক পরে নীড়কে আবার চায়
তেমনি যেন স্বপ্নে আমি ভুবন ঘুরে আমি,
মাগো, তবু সবার চেয়ে তোমায় ভালোবাসি
তুমিই তো মা ছড়িয়ে আছ বিশ্বময়ী হয়ে
তুমিই নাচাও, তুমি খেল আমায় কোলে লয়ে।"

'সাত ভাই চম্পা' কবিতাটিতে কবি শিশুমনের বিচিত্র আশা আকাঙ্ক্ষাকে প্রতিটি স্তবকে ফুটিয়ে তুলেছেন। এই কবিতায় শিশুর কল্পনাকে তিনি সুদূর প্রসারিত করে দিয়েছেন। 'সাত ভাই চম্পা' কবিতাটি বাংলার শিশুসাহিত্যের এক অমূল্যসম্পদ কারণ এখানে শিশুদের বিচিত্র কল্পনার সঙ্গে আছে বাস্তববোধ, নিজেকে সংকল্পিত করার বাসনা ও পৃথিবীকে নতুন করে আবিষ্কার করার স্পৃহা সাত ভাইয়ের মধ্যে। প্রথম ভাই হতে চেয়েছে সকাল বেলার পাখি। পাখি হয়ে সে সূর্য ওঠার আগেই নিজে জেগে পাহাড় চূড়ায় উঠে বিশ্বচরাচরকে জাগাতে চেয়েছে। এইভাবে কবি যেন শিশুদের মনে জাগরণ মন্ত্র দিয়ে কর্তব্য কর্মকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। দ্বিতীয় ভাই বলেছে একটি গাঁয়ের রাখাল ছেলে হবে। তৃতীয় ভাই বলেছে সওদাগর হয়ে সাগর পাড়ি দেবে। চতুর্থ ভাই বলেছে হবে দিনের সহচর। এইভাবে কবিতাটির মাধ্যমে কবি শিশুমনে বাস্তববোধ ও বিপুল অ্যাডভেঞ্চারের ভাব জাগিয়ে তুলেছেন। জীবনকে বিচিত্রভাবে আস্বাদন করার ইচ্ছা থেকেই এই কবিতাটির সৃষ্টি। এখানে কবি নজরুল নিপুণ শিল্পীর মতো শিশু-হৃদয়ের রহস্যময় অন্দরমহলে প্রবেশ করতে সমর্থ হয়েছেন।

'পুতুলের বিয়ে' ছোটদের জন্য লিখিত একটি কৌতুক রসের নাটিকা। এই নাটিকায় কমলির সুন্দর পুতুল ডালিমকুমার ও কুৎসিত চিনের পুতুল ফুচুং-এর সঙ্গে যথাক্রমে টুলির মেম পুতুল পুঁটুরাণী ও বেগম জাপানী পুতুল গেঁইসা-র বিয়েকে কেন্দ্র করে নজরুল হাস্যরস পরিবেশন করতে চেষ্টা করেছেন। কমলি, টুলি, পঞ্চি, খেঁদি ও বেগম এই পাঁচটি মেয়ের মধ্যে পঞ্চি ময়মনসিংহের অধিবাসী ও খেঁদি বাঁকুড়া জেলার অধিবাসী। এদের ভাষা পরিবেশনে নজরুল হাস্যরস সৃষ্টির প্রয়াস করেছেন। এই নাটিকার মধ্যে হিন্দু মুসলমান মিলন সম্পর্কেও সুন্দর মনোভাবটি ব্যক্ত করেছেন কবি নজরুল। খেঁদি যখন কমলিকে বলে যে তোর পুতুলের সঙ্গে মুসলমান বেগমের বিয়ে কেমন করে হবে তখন কমলির মুখ দিয়ে নজরুল বলিয়েছেন – 'না ভাই, ও কথা বলিস নে, বাবা বলেছেন হিন্দু মুসলমান সব সমান। অন্য ধর্মের কাউকে ঘৃণা করলে ভগবান অসন্তুষ্ট হন, ওদের আল্লা যা আমাদের ভগবানও তা।' এই ভাবে তিনি শিশুমনের ভাবনাচিন্তা ও ধ্যানধারণাকে শব্দাঙ্কিত করেছেন ছোট নাটিকাটিতে।

শিশুসাহিত্য নজরুলের সর্বাপেক্ষা দান। সাহিত্যের এই শাখাতেও তিনি তাঁর যৌবন ধর্মের বলিষ্ঠ কণ্ঠকে তুলে ধরেছেন। শিশুসাহিত্য কেবলমাত্র কল্পনারঙ্গিন হবে; বাস্তবসত্তার ছাপ থাকবে না – একথা তিনি মনে করেননি। শিশুসাহিত্যে উদ্ভট অবুঝ কল্পনাকে যেমন স্থান দিয়েছেন তেমনি কঠোর বাস্তবতাকে স্বীকার করেছেন। শিশুর ভিতরেই তিনি দেখেছেন অনাগত ভবিষ্যতের বিপুল সম্ভাবনা। তাই তাঁর সাহিত্যে দেখতে পাই পক্ষীরাজের ঘোড়া চড়ে সাত সমুদ্র পার হবার কল্পনার কথা তিনি বলেননি, সাত সমুদ্র পার হতে গেলে যে আগামী বিপদ আছে সেগুলি তিনি শিশুদের জানিয়েছেন – 'অগ্রপথিক' কবিতায়।

'আমরা চলিব পশ্চাতে ফেলি পচা অতীত
গিরিগুহা ছাড়ি খোলা প্রান্তরে গাহিব গীত।
রে নবযুগের স্রষ্টাদল। জোর কদম চল রে চল।'

তাই ভালো ছেলে হয়ে বদ্ধ ঘরে থাকার কথা নজরুল বলেননি। তিনি প্রাণশক্তিতে উদ্দীপ্ত হয়ে 'দেখব এবার জগৎটাকে' কবিতায় বলেছেন –

"থাকব নাক বদ্ধ ঘরে দেখব এবার জগৎটাকে
কেমন করে ঘুরছে মানুষ যুগান্তরের ঘূর্ণিপাকে।
....
কিসের নেশায় কেমন করে মরছে রে বীর লাখে লাখে
কিসের আশায় করছে তারা বরণ-মরণ যন্ত্রণাকে।"

এই মরণ যন্ত্রণাকে বরণ করে নিয়ে সামনে এগিয়ে যাবার মন্ত্রই হল কবির মন্ত্র। কবি শিশুদের আত্মসচেতন হতে বলেছেন। তিনি বলেছেন ছোট বলে প্রথম থেকে চুপচাপ বসে না থাকতে। তাদেরকে জীবনে বড় হতে হবে। কবি 'মায়া মুকুর' কবিতায় বলেছেন – বিরাটের জয় হোক, মুছে যাক সকল বিভেদ, নিঃশেষ হয়ে যাক ছোট ভাবার সকল চিন্তা –

"তোমরা ভাবছি, আমরা বালক অথবা বালিকা কেহ,
আমি বলি – কেহ দেখনি আজিও তোমরা নিজের দেহ।
....
তুমি ছোট নহ, ঐ যে ক্ষুদ্র দেহখানি তুমি নও
নিজেরে দেখিলে – দেখিবে – তুমিই বিপুল বিরাট হও।
....
বল ভগবানে, তুমি হতে চাও সর্বশক্তিমান,
তুমি অনন্ত যশঃ খ্যাতি চাহ, চাহ অনন্ত প্রাণ।"

কবি শিশুদের বলেছেন তোমরাই এই বাংলার ভবিষ্যৎ। তাই তাদের উদ্বুদ্ধ করেছেন মহৎ, মুক্ত, উদার জীবনের সাধনায়। তাদের ললাটে পরিয়ে দিয়েছেন গৌরবের জয়টিকা –

"ভাঙো ভাঙো এই ক্ষুদ্র গণ্ডী, এই আজানা ভালো।
তোমাতে জাগেন যে মহামানব, তাঁহারে জাগায়ে তোলো,
তুমি নহ শিশু দুর্বল, তুমি মহতো মহীয়ান
জাগো দুর্বার, বিপুল, বিরাট অমৃতের সন্তান।"

নজরুল সাহিত্যের বিদ্রোহী বলিষ্ঠ মনোভঙ্গি তাঁর শিশুসাহিত্যের মধ্যেও লক্ষিত হয়েছে। বাংলা শিশুসাহিত্যের এই নতুন দিক প্রবর্তনায় কবির আসন প্রথম সারিতে। নজরুল বড় ছোট সকলের জন্য তাঁর সেরা লেখাগুলি উপহার দিয়ে গেছেন। নজরুলের শিশুসাহিত্যগুলির অসামান্য অবদান রয়েছে। নজরুলের শিশুসাহিত্য আজও শিশুদের অপরিসীম আনন্দদান করে চলেছে। তাই শিশুদের হৃদয়ে তিনি চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

সহায়ক গ্রন্থ :

১. নজরুল রচনাসম্ভার – আব্দুল কাদির সম্পাদিত (১৩৭৬)
২. নজরুল সাহিত্যের একদিক – আব্দুল কাদির (১৯৬০)
৩. কাজী নজরুল ইসলামঃ জীবন ও কবিতা – রফিকুল ইসলাম (১৯৮২)
৪. বাংলা সাহিত্যে নজরুল – আজাহারুদ্দীন খান (১৩৬১)
৫. সাহিত্য-সঙ্গ – আব্দুল আজীজ আল-আমান (১৩৬৫)
৬. নজরুল চরিতমানস – সুশীল কুমার গুপ্ত (১৩৬৭)
৭. নজরুলের সঙ্গ ও প্রসঙ্গ – গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য (১৩৮৩)
৮. নজরুলের কাব্য পরিচয় – মধুসূদন বসু (১৯৭৫)
৯. নজরুল প্রতিভা – লায়েক আলি খান (১৯৮৮)
১০. নজরুল ইসলাম ও বাংলা সাহিত্য – শেখ আজিজুল হক (১৩৯৪)
১১. নজরুল কথা – শান্তিপদ সিংহ (১৩৭৯)

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়ের ছোটোগল্প: অলৌকিকতার সন্ধানে

সঞ্চিতা সাহা
গবেষক, বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ: সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় মূলত হাস্যরসের লেখক হিসেবেই পরিচিতি পেয়েছেন বাংলা সাহিত্য মহলে। যদিও তিনি হাস্যরসের পাশাপাশি অন্যান্য বিষয়কেও তাঁর লেখার মধ্যে স্থান দিয়েছেন। তাঁর লেখাগুলো ভীষণ হালকা চালের হলেও, আমাদের জীবনে ঘটে যাওয়া বর্তমান, অতীত ও ভবিষ্যৎ এর বেশ গুরুগম্ভীর বিষয়েরই জোগান দেয় বরাবর। সমাজে ঘটে যাওয়া নানান সঙ্গতি ও অসঙ্গতির প্রতিচ্ছবি এমন হালকা ভাবে তিনি তার লেখনির মধ্যে তুলে ধরেন, আমরা পাঠকেরা হাসির ছলে পড়তে পড়তে কখন যে একাত্ম হয়ে যাই, বুঝতেই পারিনা। সব শেষে একটু গভীর মনোযোগ দিয়ে ভাবতে গেলে বুঝতে পারি, বিষয়টা কতটা গুরুগম্ভীর ছিল। তেমনি তাঁর বেশ কয়েকটি গল্পে আমি অলৌকিকতার ছাপ খুঁজে পেয়েছি। সেই গল্প গুলিকে আলোচনার পাশাপাশি অলৌকিকতার সঙ্গে বিশ্বাস ও অবিশ্বাস শব্দটা কিভাবে জড়িয়ে আছে তাকেও মূল প্রবন্ধে দেখবো।

সূচক শব্দ: অলৌকিকতা, বিশ্বাস, দ্বন্দ্ব

মূল আলোচনা:

মনুষ্যলোকে এমন অনেক কিছুই ঘটে যা, ঘটা সম্ভব নয় বা স্বাভাবিক নয়, তবুও কখনো কখনো এমন কিছু ঘটনা আমরা ঘটতে শুনি বা দেখি, তাকেই সাধারণ অর্থে অলৌকিক বলা হয়। এই 'অলৌকিক' শব্দটি আমরা মূলত ব্যবহার করে থাকি, যা হওয়া সম্ভব নয় বা প্রাকৃতিকভাবে যা হওয়া অসম্ভব এমন কোন ঘটনার বর্ণনা দিতে গিয়ে। এর আভিধানিক অর্থ– "মনুষ্যপক্ষে বা মনুষ্যলোকে অসম্ভব, যাহা পৃথিবীর নয় এমন, লোকাতীত।"[১] সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়ের গল্পগুলি পড়তে গিয়ে তাঁর বেশ কিছু রচনার মধ্যে অলৌকিক ঘটনা পাই। তবে, এই অলৌকিক বিষয়টা সম্পূর্ণ নির্ভর করে বিশ্বাসের উপর।

সমাজে অনেক ধরণের কুসংস্কার থাকে। যা সত্যিই হয়, কি না কেউ জানে না। তবে, কিছু মানুষ সেটাকে মেনে চলে। আর কিছু মানুষ সেটাকে গুরুত্ব না দিয়েই এগিয়ে চলে তার বেঁচে থাকার পথে। এমই এক সামাজিক পরিকাঠামোর মধ্যে থেকে উঠে আসা সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়ের 'বাঘমারি' গল্প গ্রন্থের অন্তর্গত 'নিশির ডাক' গল্পটি। 'নিশির ডাক' গল্পে গল্পকার এক অলৌকিক বিষয়কে তুলে ধরেছেন। পলাশের জানা ছিল না, নিশির ডাক কি জিনিস? তার কাছে সবটাই ছিল অবিশ্বাস্য। যে সময়ের ঘটনা, তখন পলাশরা ক্লাস সেভেন এ পড়ে। বন্ধুমহলে খবর রটে গিয়েছিল আজ রাতে নিশির ডাক বেরোবে। আজ অমাবস্যা। নিশির ডাক জিনিসটা কি, তা নিয়ে যখন বন্ধুমহলে

কৌতুহল ভীষণ ভাবে বেড়েছিলো, তখন বিমানই খবরটা দিয়েছিলো, জানিয়েছিল অনাদি মল্লিকের অবস্থা সম্পর্কে। জমিদার অনাদি মল্লিকের ভীষণ খারাপ অবস্থা। তার বড় বাড়ি, বিষয়-সম্পত্তি, ঘোড়ার গাড়ি সব কিছু রয়েছে, তার পরও তাঁর এত তাড়াতাড়ি কেন মৃত্যু হবে- এ প্রশ্ন ওঠে সকলের মনে। ডাক্তার, বদ্যি সকলের জবাব দেওয়ার পরে একমাত্র চেষ্টাই তাদের বাকি ছিল, সেটা হল অন্যের পরমায়ু কেড়ে নিয়ে অনাদি মল্লিককে বাঁচাতে হবে। সেই জন্য পশুপতিনাথ পাহাড় থেকে এক তান্ত্রিক এসেছেন। সারা গায়ে তেল সিঁদুর মেখে তিনি রাত বারোটা থেকে দুটোর মধ্যে পথে বের হবেন। তিনি পল্লীবাসী সকলেরই নাকি নাম ধরে ডাকবেন। আর তাঁর হাতে থাকবে মুখখোলা ডাব। প্রত্যেকের নাম তিনি একবার নয়, মোট তিন বার করে ডাকবেন। যেই কেউ সাড়া দেবে, অমনি ডাবের খোলার মুখটা নাকি তার মুখে চাপা দিয়ে দেবে। তখনই সেই মানুষের প্রাণটা ডাবের জলে আবদ্ধ হয়ে যাবে। আর ওই জল মল্লিকমশাইকে খাওয়ালে তিনি বেঁচে উঠবেন আর যার প্রাণ সেই ডাবের জলে আবদ্ধ, তিনি মারা যাবেন। এটাই নাকি নিশির ডাক।

পলাশ তার মাকে সবটা জানালে তিনি বিষয়টা বুঝতে পারেন। কারণ তার মায়ের সাথেও এই ধরণের একটা বিষয় ঘটেছিলো। কিন্তু পলাশের বাবা, এসব বিষয়ে একদম বিশ্বাস করেন না। তাই পলাশ ও তার মায়ের মনে সংশয় ও চিন্তার রেখা ক্রমশই ফুটে ওঠে। বাবা যদি উত্তর দিয়ে ফেলে, তাহলে কি হবে। তাই সে রাতে পলাশ তার বাবার সাথেই ঘুমোয়। বাবা যদি উত্তর দিতে যান, তবে সে বাবার মুখ চিপে ধরবে। কিন্তু, গল্পে আমরা দেখতে পাই, সেই রাত কেটে যাওয়ার পরদিন সকালটা ভীষণ ঝকঝকে ছিল। যেন গতকাল রাতে কিছুই ঘটেনি। সবটাই যেন প্রতিদিনের মতোই স্বভাবিক। অনেক খোঁজ নেওয়ার পর জানা যায় যে, গল্পের শুরুতে যার কুল বাগানের কথা বলা হয়েছে, যার কুল বাগান থেকে সকলেই কুল চুরি করে খেত, সকলের প্রিয় সেই হারুদা মারা গিয়েছেন গতকাল রাতে। গল্পের একদম শেষে আমরা জানতে পারি, অনাদি মল্লিক আরও অনেক বছর বেঁচে ছিলেন এবং শেষে তিনি আত্মহত্যা করেন। সমাজে এখনো এইরকম বহু ঘটনাই ঘটে থাকে যা সম্পূর্ণই নির্ভর করে মানুষের বিশ্বাস-অবিশ্বাসের ওপর। কতটা ঠিক বা কতটা ভুল সেই বিচারে না গিয়ে সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় তাঁর ‘নিশির ডাক’ গল্পে একটা রহস্যময় অলৌকিক ঘটনার সৃষ্টি করেছেন রোচক ভাবে।

‘রাত বারোটা’ গল্প গ্রন্থের প্রকাশকাল- বইমেলা জানুয়ারি ১৯৯৬ খ্রিষ্টাব্দ। এই গল্প গ্রন্থের অন্তর্গত যে কয়েকটি গল্পের মধ্যে আমরা অলৌকিকতার সন্ধান পেয়েছি সেগুলি হল- ‘রাত বারোটা’, ‘মহাপ্রস্থান’, ‘কাচ’, ‘হাত না ডাল’। এই কয়েকটি গল্পকে নিয়ে আমি আলোচনার চেষ্টা করবো। এই গল্পগুলি আমাদেরকে কখনো ভীত করে অথবা কখনো বা রহস্যালোকে পৌঁছে দেয়।

'রাত বারোটা' গল্পটির শুরুতেই দেখতে পাই, গল্প কথকের কাছে একটি টেলিফোন আসে। সেই টেলিফোনটি ছিল তাঁর বন্ধু প্রকাশ গাঙ্গুলীর। গল্পটি কিছুক্ষণ পড়ার পরে জানতে পারি কিছুদিন আগেই প্রকাশ গাঙ্গুলি ফিরোজাবাদ রেল অ্যাক্সিডেন্টে মারা গিয়েছেন। প্রকাশ গাঙ্গুলীর মৃত্যুর কথা জানার পর পাঠকের মনে একটাই প্রশ্ন আসে যে, তাহলে গল্প কথকের কাছে প্রকাশ গাঙ্গুলীর ফোন এল কোথা থেকে? এই বিষয়টা পাঠককে ভীষণ ভাবে ভাবিয়ে তোলে। প্রকাশ গাঙ্গুলী যে তাঁর বন্ধুকে শুধুই টেলিফোন করেছিলেন, তা নয়। বন্ধুকে প্রকাশ অনেক গুলি কাজেরও দায়িত্ব দিয়েছিলেন টেলিফোনের মাধ্যমে। যে কাজগুলি তিনি মৃত্যুর আগে করে যেতে পারেননি। গল্পকথক যখন প্রকাশকে বলে ওঠেন-"মরা মানুষ ফোনে কথা বলে এমন কথা আমি শুনিনি। এসব বদমাইশি। মানুষকে ভয় দেখানো। মারা গেলে মানুষের আর কিছুই থাকে না। সে আবার টেলিফোন করবে কী করে!"[২] গল্পকথকের সমস্ত কথার উত্তর প্রকাশ দিয়েছিলেন- "এখুনি আমি তোর সামনে গিয়ে দাঁড়াতে পারি; কিন্তু তুই ভয়ে অজ্ঞান হয়ে যাবি। আমি তোর প্রাণের বন্ধু ছিলুম, তবু তুই ভয় পাবি। আমার নাম শুনেই তুই কাঁপছিস। সামনে গিয়ে দাঁড়ালে কী হবে তোর ভালোই জানা আছে।"[৩] গল্পকথক প্রকাশকে জিজ্ঞাসা করেন, সে কার ফোন থেকে ফোন করছিল? তার উত্তরে প্রকাশ বলেন- "পৃথিবীর সব ফোন এখন আমার। সব রেডিয়ো, টিভি স্টেশন এখন আমার। তোর রেডিয়োতে কলকাতা ক ধর, আমার গলা শুনতে পাবি।"[৪] এইভাবেই প্রকাশ অবিশ্বাস্যকে বিশ্বাসের জায়গায় নিয়ে এসেছিলেন এবং মৃত্যুর পরও তাঁর অস্বিত্বকে জানান দিয়েছিলেন।

প্রকাশ তার বন্ধুকে যে দুটি কাজ করতে বলেছিলেন, তার মধ্যে প্রথমটা হল চুরি। সেটা প্রকাশের বাড়িতে গিয়ে তাঁর ক্যাসেটের র‍্যাকের মধ্যে থেকে ডান দিক থেকে ষোলো নাম্বার ক্যাসেটটা নিয়ে আসতে হবে। তাতে আছে দশটা পাঁচশো টাকার নোট। আর দ্বিতীয় কাজ ছিল সেই টাকাটা ডানকুনিতে গিয়ে দিদির হাতে দেওয়া। গল্পকথক দুটো কাজই সময় মতো এবং সাবধানে করেছিলেন। শেষে যখন দিদির হাতে টাকাটা দেন, তখন দিদি বলেছিলেন- "টাকাটা আজই আমার খুব দরকার। তোমার দাদা হাসপাতালে। কাল অপারেশন।"[৫] এই কথাটা শোনা মাত্রই গল্পকথক বুঝেছিলেন টাকাটার প্রয়োজনীয়তা কতটা ছিল দিদির কাছে। মানুষের জীবনে এমন অনেক কিছুই ঘটে যায়, যা কখনো বলে হয়না। প্রকাশের জীবনেও ঠিক তেমনটাই ঘটেছিল। না করতে পারা এমন অনেক কাজই মৃত্যুর পরেও বোঝা হয়ে থাকে। তখন নিজে না করতে পারলেও অন্যকে দিয়ে সেটা করিয়ে নিতে হয়। আর সেই কারণে প্রকাশও তাঁর না করতে পারা কাজগুলো তাঁর বন্ধুকে দিয়ে করিয়ে নিয়েছিলেন। বাস্তব সমাজে সাধারণ মানুষের কাছে এই বিষয়গুলো যখন বোধশক্তির সীমার বাইরে চলে যায়, তখন সেটা আমাদের কাছে হয়ে ওঠে অলৌকিক।

'মহাপ্রস্থান' গল্পটিতে আমরা বড়োমামা ও মেজোমামাকে পাচ্ছি। তবে, উভয়ের মধ্যেই এখানে আমরা ভীষণ মিল দেখতে পাই। গল্পকারের কথায়- "দু'জনের এখন খুব ভাব। মাসিমা যখন ছিলেন, তখন কথায় কথায় লেগে যেত। এখন একেবারে হরি-হর আত্মা। এ বলছে মেজো, তো ও বলছে, বড়। পরামর্শ ছাড়া কোনো কাজই হয় না।"[৬]

বড়োমামাদের বাড়ির পুরনো কাজের লোক হরিদা দেশে চলে যাওয়ার পর, হঠাৎ একদিন বাক্স- প্যাঁটরা নিয়ে ফিরে এসেছিলেন। তিনি নাকি ফিরে এসেছিলেন বাবা কেদারনাথের আদেশে। হরিদার কথায়- "আমাদের বুড়ো শিবতলার বেলগাছের মাথা থেকে ভর সন্ধেবেলা কে যেন গম্ভীরভাবে হেঁকে বললেন, হরে, ওরা বিপদে পড়েছে, শিগগির ছুটে যা। ছেলে দুটোকে সেভ কর।"[৭] এরপর সাতদিন পরে তাঁরা তিনজনেই হরিদ্বার চলে যান। বড়মামা ধ্যানস্থ অবস্থায় ঘোষণা করেন- 'আমি আর মর্তে ফিরব না।'[৮] বড়োমামা ভেবেছিলেন, পরদিন লছমনঝুলায় গেলে তিনি আরও আনন্দ পাবেন। সেই আনন্দের কথা ভেবেই বড়োমামা বলে উঠেছিলেন- "লছমনঝুলা পেরিয়ে সোজা চলে যাব সেই জায়গায় যেখানে মৃত্যু নেই, দুঃখ নেই, ভোট নেই, বোমা নেই, হিন্দি সিনেমা নেই। সেখানে অনন্ত যৌবন। জলে জন্ডিস নেই, আন্ত্রিক নেই, অ্যান্টিবায়োটিক নেই।"[৯]

বড়মামাদের একটা পথগাইড জুটেছিল, তার নামটি ছিল রবীন্দ্রচন্দ্র দত্ত। তিনি ছিলেন হাটখোলার জমিদার বংশের ছেলে। এদিকে তিনি ছিলেন প্রচুর পয়সার মালিক, তবে ব্যবহার সত্যই অমায়িক। রবীন্দ্রচন্দ্র বলেছিল- "ভয়ডর আমার নেই। আমি যৌবনে একবার সিদ্ধান্ত করেছিলুম বাঘের সাথে লড়াই করব। মুখার্জিবাবুর সার্কাসের একটা বাঘও ঠিক করা হয়েছিল। লড়াইটা হবে পার্কসার্কাসের ময়দানে। শেষ পর্যন্ত ক্যানসেল হয়ে গেল।"[১০] রবীন্দ্রচন্দ্রের সঙ্গে কিছুদূর যাওয়ার পরই বড়োমামাদের দেখা হয়েছিল এক সন্ন্যাসীর সঙ্গে। বড়মামা তাঁকে খানিকটা ভয়ঙ্কর হিন্দিতেই জিজ্ঞাসা করেছিলেন মহাপ্রস্থানের পথ কোনটা? এই প্রশ্ন শুনে সন্ন্যাসী যা উত্তর করেছিলেন, সেটি হল- "এখানে তো সবই মহাপ্রস্থানের পথ বাবা, একটু অসাবধান হলেই খাদে পতন ও সশরীরে স্বর্গে গমন। তবে হ্যাঁ, সেকালের তীর্থযাত্রীরা যে হাঁটাপথে কেদারে যেত, সেটা ওই বাঁ দিকে। ওপথে আজকাল আর কেউ যায় না। তোমরা যাবে না কি!"[১১] এরপর যেটা হল, সেটা সত্যিই ভয়ঙ্কর। বড়মামা ভীষণ চিন্তিত গলায় বলেছিলেন- "মেজ আমরা এখন নো ম্যানস ল্যান্ডে। একেই বলে হর্নস অফ ডাইলেমা, এগোবো না পেছাবো।"[১২] এদিকে মেজোমামা সবাইকে সাহস জুগিয়ে হাঁটাতে শুরু করেছিলেন এবং সকলকে উৎসাহ দিয়ে বলেছিলেন - "পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে ভীরুরা। আমরা সাহসী, করেঙ্গে ইয়ে...।"[১৩] এ কথা বলার পর থেকে মেজোমামার আর কোন আওয়াজ পাওয়া যায় না। তিনি কি তাহলে মহাপ্রস্থানের পথে চলে গিয়েছেন? অর্থাৎ তিনি ওপর থেকে খাদে পরেছেন। অনেকক্ষণ পর মেজোমামার নিচের থেকেই

আওয়াজ আসে তিনি নাকি সেখানে খুব ভালো আছেন। এমনকি জায়গারটারও মেজোমামা সুন্দর করে বর্ণনা দিয়েছেন - "ফাসক্লাস আছি, জায়গাটা বেশ মনোরম অনেকটা নিচে একটা নদী বইছে মনে হয়। জলের আওয়াজ পাচ্ছি।"[১৪] মেজোমামার এই কথাগুলো সত্যিই পাঠককে অনেকটা ভাবিয়ে তোলে। পাঠকের মনে এই কথাটি বারবার এসেছে, মেজোমামা অত ওপর থেকে পড়ে গিয়েও কিভাবে কথা বলছেন? কিভাবে বেঁচে আছেন? মেজোমামার আওয়াজ পেয়ে বড়মামা তাঁকে উপড়ে উঠে আসতে বলেন। কিন্তু তার উত্তরে মেজোমামা বলেন- "অসম্ভব! আমার আশা ছেড়ে দাও।"[১৫] গল্পের একেবারে শেষে আমরা দেখি মেজোমামা পাহাড় থেকে পড়ে গিয়ে যে ছাদের কার্নিশে আটকে ছিলেন, সেখানে বড়োমামা সকলকে নিয়ে পৌঁছে গিয়েছেন। বড়োমামার কথায়-"বেলা দ্বিপ্রহরে আমরা তিনজন ধুঁকতে ধুঁকতে অলকানন্দার তীরে সেই সুন্দর ফরেস্ট বাংলোতে পৌঁছে গেলুম। মেজমামা যে-জায়গাটায় এক মিনিটে পৌঁছেছিলেন আমাদের সেই জায়গায় আসতে সাত ঘন্টা সময় লাগল।"[১৬] সুপারিনটেন্ডেট বড়োমামাকে তাঁরা কতজন জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলে ওঠেন তাঁরা চারজন। চারজনের মধ্যে তিনজন আছেন আর একজনের বর্ণনা দিয়েছেন বড়মামা এইভাবে- "আর একজন চালে বসে আছে; আকাশ থেকে ল্যান্ড করেছে।... ওই যে, ওকে নামাতে পারলেই আমরা চারজন। জাস্ট একটা মই পেলেই হয়ে যায়।"[১৭] মহাপ্রস্থানের পথ ধরেই মেজোমামা যে পথের দিকে এগিয়েছিলেন, সে পথটা আসলে কোথায়, সেটা বলা ভীষণ ভাবে অনিশ্চিত।

'কাচ' গল্পে আমরা বাবা-মায়ের এক আদুরে ছেলের কথা পাই। যে সবসময় প্রায় দুষ্টুমি নিয়ে ব্যস্ত থাকে। দিদি তাকে ভীষণ ভালোবাসে, তাই ভাই যখন পড়াশোনার জন্য বকুনি খেয়ে ঘুমিয়ে পড়ে, তখন দিদিই মাঝরাতে ভাইকে ডেকে তোলে এবং কিছু খাওয়ানোর চেষ্টা করে। এভাবেই চলতে চলতে হঠাৎ ভাই একদিন টেনিস বল দিয়ে খেলতে খেলতে এমন ভাবে বলটা ছোঁড়ে যে, সেটা গিয়ে বাবার বইয়ের আলমারির কাঁচকে ভেঙে চুরমার করে দেয়। ভয়ে গুটিয়ে যায় ছেলেটি। বাবার কথা অনুসারে, মাও তাকে এই অপরাধের জন্য না মেরে ছাদের ঘরে বন্ধ করে চলে আসেন। বাবা মাকে বলেছিলেন, "একদম গায়ে হাত তুলবে না। ভয় ভেঙে যাবে। অন্য শাস্তি দেবে।"[১৮]

ছাদের ঘরে বন্ধ অবস্থায় ছেলে হঠাৎই বাবার স্পর্শ অনুভব করে কিন্তু ঘুম ভেঙ্গে গেলে সে দরজা খোলা দেখতে পায় কিন্তু বাবাকে দেখতে পায় না। অথচ সে জানে, বাবা ছাড়া এই বন্ধ ঘরের দরজা কেউ খুলে দিতে পারে না। নীচে নেমে এসে সে মাকে দেখতে পায় রান্নাঘরে। বাবা ঘুঘনি খেতে ভালোবাসেন বলে মা ঘুঘনি বানাচ্ছিলেন। ছেলের কথা শোনার পর সকলে মিলে অনেক খোঁজাখুঁজির পর যখন বাবাকে ঘরে পাওয়া গেল না, তখন অফিসে ফোন করা হল। সেখান থেকে জানা যায়

যে- "কনস্ট্রাকশন সাইটে একটা লোহার বিম ক্রেন ছিঁড়ে বাবার মাথায় পড়ে গেছে। তখন বেলা ঠিক সাড়ে চারটা।"[১৯] এদিকে বাবার মৃত্যু আর ছেলের ঘরের বন্ধ দরজাকে খুলে দেওয়া এসবের মধ্যে দিয়ে আমরা আমৃত্যু এক ভালোবাসায় জড়ানো সম্পর্ককেই অনুভব করতে পারি। সেটা স্বপ্ন না কল্পনা, নাকি অলৌকিক কিছু, সত্যিই আমরা বুঝে উঠতে পারি না কিছুতেই। কিন্তু, গল্পের শেষে আমরা এটা জানতে পারি, বাবা আর নেই অর্থাৎ বাবা মৃত। আর এটাও সত্যি যে, বাবা ছাড়া সেই দরজাটি আর কেউ খুলতে পারেন না। আর যাই হোক না কেন, দরজাটি বাবাই খুলেছিলেন।

'হাত না ডাল' গল্পে সুজন ও তার বন্ধুর বরাবরারের ইচ্ছে ছিল তাদের স্কুলের ছাতটা ঘুরে দেখা। আসলে স্কুলের ছাতটা ছিল খুব সুন্দর, একেবারে গঙ্গার ধারে। কিন্তু ছাতে সবসময় তালা বন্ধ থাকতো বলে, কোন দিনও কেউ যেতে পারত না। হঠাৎই একদিন সুজন এসে তার বন্ধুকে খবর দেয়- "শোন, ছাতের দরজাটা আজ খুলেছে। ট্যাঙ্ক পরিষ্কার করছে তো। রামাধর খুলে দিয়ে তার কোয়ার্টারে খেতে চলে গেছে। এই সুযোগ।"[২০] দরজা খোলা এই কথা শুনেই দুজনে আনন্দে ছাতে যায়, এবং দুজনেই গল্প করতে করতে কখন যেন ঘুমিয়ে পরে নিজেরাও জানে না। এদিকে যখন ঘুম ভাঙে তখন দুপুর গড়িয়ে সন্ধ্যে হয়ে এসেছে, ছাদের দরজা কেউ ভিতর থেকে বন্ধ করে দিয়ে চলে গেছে, সেইসঙ্গে স্কুলের সমস্ত দরজা বন্ধ হয়ে গেছে - "কোনও সাড়া নেই। হঠাৎ খেয়াল হল, আজ শনিবার, রামধরদা দেশে চলে গেছে। মরেছে! সে তো তা হলে সোমবারের আগে আসবে না। কিছুক্ষণের মধ্যেই মনে হল, মরেছে, সোমবার তো মে দিবস, স্কুল বন্ধ।... শনি, রবি, সোম, তিনদিন এই ছাতে থাকতে হবে। নো খাবার, নো জল। সবচেয়ে কাছের বাড়িটাই এত দূরে যে, চিৎকার করে গলা ফাটিয়ে ফেললেও কেউ শুনতে পাবে না।"[২১]

রাতের অন্ধকারে খোলা ছাদে নানান ধরনের শব্দ শোনা যাচ্ছিল। সুজন ঘুমোচ্ছে। এদিক ওদিক তাকাতে তাকাতে হঠাৎ গল্পকথকের চোখটা গিয়ে আটকেছিল জলের ট্যাঙ্কের মাথায়। তারপর গল্পকথক বিবরণটা দিয়েছে এইভাবে- "ঢাকনাটা একপাশে খুলে কাত হয়ে আছে। আর ফিকে চাঁদের আলোয় স্পষ্ট দেখছি, একটা হাত বাখারির খোঁচার মতো সেই ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে এসেছে। পাঁচটা আঙুল উঁচিয়ে আছে আকাশের দিকে।"[২২] এরপর তার মনে এক অন্য শক্তি জাগ্রত হল, মনে হল, যেভাবেই হোক তাকে বেরিয়ে আসতে হবে। সে ধীরে ধীরে ছাদের দরজা ভাঙার চেষ্টা করে। দরজা ভাঙার শব্দে সুজনের ঘুম ভেঙে যায়। তাঁরা দুজনে ছাদের দরজা ভেঙে নিচে নেমে আসে এবং পুলিশের কাছে গিয়ে সমস্ত ঘটনাটা জানায়। পুলিশকে সব কিছু জানানোর পরেও গল্পকথকের মনে হয়েছিল সে ঠিক দেখেছে কি না। ওটা হাত ছিল না ডাল ! এরপর ঘটনাটা হয়েছিল এইরকম- "অফিসার পাঁচ সেলের টর্চের তীর ছুঁড়লেন ট্যাঙ্কের মাথায়। আমাদের দমবন্ধ। দু'কদম এগিয়ে গেলেন সামনে। আমরা সবাই দেখলুম, একটা হাত। পাঁচটা আঙুল ছেতরে আকাশে কী যেন খুঁজছে!"[২৩] অবশেষে

গল্পকথক চিৎকার করে বলেছিল “পাশ, পাশ!”[২৪] স্বপ্নের ছাদে ঘুরতে এসে যে দুই বন্ধু এই রকম একটা বিপদের মধ্যে আটকে যেতে পারে, তারা সেটাকে কল্পনাও করতে পারেনি।

‘অলৌকিকতা’ এমনই একটা বিষয়, যা প্রতিটি মানুষের কাছেই ভিন্ন ভিন্ন জায়গা করে নেয়। একজন বিশ্বাস করলে অপর জনকেও বিশ্বাস করতে হবে এমন কোন বাধাধরা বিষয় নেই। তাইতো ‘নিশির ডাক’ গল্পে দেখতে পাই, পলাশের মা নিশির ডাককে বিশ্বাস করেন, কারন তাঁর এ সম্পর্কে আগে থেকেই ধারনা ছিল। কিন্তু পলাশের বাবা এসবে একেবারেই বিশ্বাস করেন না। তাই মা ও সন্তানের মধ্যে দোলাচলতার সৃষ্টি হয়েছে। প্রতিটি গল্পের মধ্যেই আমি এইরকম একজন মানুষকে পেয়েছি যে অলৌকিকতায় বিশ্বাস করেছে আর অপরজন করেনি। সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়ের অসংখ্য গল্পের মাঝে মাত্র কয়েটি গল্পে আমি অলৌকিকতাকে খুঁজে পেয়েছি। তারমধ্যে কয়েকটিকে নিয়ে আলোচনা করার চেষ্টা করা হয়েছে মাত্র।

তথ্যসূত্র :

১. বিশ্বাস, শৈলেন্দ্র। ‘সংসদ বাঙ্গালা অভিধান’। শিশু সাহিত্য সংসদ প্রাইভেট লিঃ, ৩২এ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা-৯, পুনর্মুদ্রণ- মার্চ ১৯৮২। পৃ.৬১
২. চট্টোপাধ্যায়, সঞ্জীব। ‘রাত বারোটা’, ‘রাত বারোটা’। দে'জ পাবলিশিং হাউস, কলকাতা ৭০০০৭৩। প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ১৯৯৬। পৃ.১১
৩. তদেব, পৃ.১১
৪. তদেব, পৃ.১১
৫. তদেব, পৃ.১৪
৬. চট্টোপাধ্যায়, সঞ্জীব। ‘রাত বারোটা’, ‘মহাপ্রস্থান’। দে'জ পাবলিশিং হাউস, কলকাতা ৭০০০৭৩। প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ১৯৯৬। পৃ.২৩
৭. তদেব, পৃ.২৩
৮. তদেব, পৃ.২৩
৯. তদেব, পৃ.২৩
১০. তদেব, পৃ.৩০
১১. তদেব, পৃ.৩১
১২. তদেব, পৃ.৩২
১৩. তদেব, পৃ.৩২
১৪. তদেব, পৃ.৩২
১৫. তদেব, পৃ.৩২
১৬. তদেব, পৃ.৩৫

১৭. তদেব, পৃ.৩৫

১৮. চট্টোপাধ্যায়, সঞ্জীব। 'রাত বারোটা', 'কাচ'। দে'জ পাবলিশিং হাউস, কলকাতা ৭০০০৭৩। প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ১৯৯৬। পৃ.৩৭

১৯. তদেব, পৃ.৩৯

২০. চট্টোপাধ্যায়, সঞ্জীব। 'রাত বারোটা', 'হাত না ডাল'। দে'জ পাবলিশিং হাউস, কলকাতা ৭০০০৭৩। প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ১৯৯৬। পৃ.৪০

২১. তদেব, পৃ.৪২

২২. তদেব, পৃ.৪৪

২৩. তদেব, পৃ.৪৭

২৪. তদেব, পৃ.৪৭

ভবভূতির প্রেমভাবনা এবং বর্তমানে তার বিবর্তন

সুদীপ চক্রবর্ত্তী
সহকারী অধ্যাপক, সংস্কৃত বিভাগ,
সিধো কানহো বীরসা বিশ্ববিদ্যালয়

সংক্ষিপ্তসার : বিশ্ব সংসারে প্রাকৃতিক ও সামাজিক প্রেমের মূল্যবোধের বোধের বিকাশ সাধন ভবভূতির প্রেমের গোড়ার কথা। সকলের মন্ত্র, সংকল্প ও মন এক হোক। নিঃস্বার্থ ভালবাসা, প্রতিদান পরাঙ্মুখ কল্যান চেতনা যে কোনো মানব সমাজের অক্ষয় সম্পদ। প্রেমের আলোকে সমাজ উদ্ভাসিত হতে পারে, স্বর্গের সুষমা ধরা দিতে পারে সুখী দম্পতীর পার্থিব মন্দিরে। প্রেম সূর্যালোকের মত স্বতঃ উদ্ভাষিত কল্যাণময় দীপ্তি, সেখানে নাই কোনো প্রয়োজনের অপেক্ষা বা স্বার্থসিদ্ধির তাগিদ। প্রেম কেবলমাত্র মানব জগতে সীমিত নয়, বনের পশুপক্ষী বৃক্ষলতাতেও এই স্নেহ পরিব্যাপ্ত। বনদেবী বাসন্তী ও আত্রেয়ীর সাক্ষাৎকার দৃশ্যে তাদের আচার আচরনের মধ্যদিয়ে অভিব্যঞ্জিত হয়েছে প্রেমস্নিগ্ধ সৌজন্য।

শব্দসূচক: প্রেমভাবনা, মনোবিকলন, জীব-জড়-সহাবস্থান, সৌহার্দ্য, শান্তি

সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যের বা দৃশ্যকাব্যের আকাশে যেকয়েকজন কবি নিজ নিজ নাট্যপ্রতিভার বলে উজ্জ্বল জ্যোতিষ্করুপে বিরাজমান তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন মহাকবি ভবভূতি। ভবভূতি রচিত তিনটি দৃশ্যকাব্য হল – উত্তররামচরিত, মহাবীরচরিত ও মালতীমাধব। এই তিনটি দৃশ্যকাব্যেই ভবভূতির প্রেম ভাবনার প্রকাশ ঘটেছে এবং আধুনিক সমাজকে তা যথেষ্টভাবে প্রভাবিত করেছে। ভবভূতির প্রেম ভাবনা কেবলমাত্র নরনারীর তথাকথিত সঙ্কীর্ণ সীমার বাঁধনকে অতিক্রম করে মানব সমাজে সাংসারিক ও সামাজিক প্রেমের মূল্যবোধের বোধের বিকাশ ঘটায়। তাঁর প্রেম ভাবনায় মিলিত হয়েছে পুত্রের প্রতিপিতার স্নেহ, পিতার প্রতি পুত্রের ভক্তি, ভ্রাতৃভক্তি, প্রভুভক্তি, দাম্পত্যপ্রেম এবং প্রজাপ্রেম। প্রকৃতিও প্রেমের আশ্রয় হিসেবে তাঁর কাব্যে স্থান পেয়েছে। তবে নরনারীর পার্থিব প্রেমও উপেক্ষিত হয়নি। তরুন বয়সের প্রেম, আবেগ, ঔৎসুক্য, চিন্তা প্রভৃতির বর্ণণার মধ্য দিয়ে প্রেমের দুর্বার প্রভাব বর্ণিত হয়েছে। তার সাথেই আবার মানুযের সাথে মনুষ্যেতর প্রাণীকুল, জীবজগতের উদ্ভিদ ও অপরাপর প্রাকৃতিক উপাদানসমূহ এবং মাটি, জল, বাতাস ইত্যাদি জড়বস্তুসমূহের সাথে সামগ্রিক মেলবন্ধনের কথাও অনুক্ষণ ভবভূতি বলে গেছেন। ভবভূতির সেই ধারণার প্রতিধ্বনি নজরুলের ভজনাত্ও মেলে –

"দাও স্বাস্থ্য দাও আয়ু
স্বচ্ছ আলো মুক্ত বায়ু,
দাও চিত্ত অ-নিরুদ্ধ

দাও শুদ্ধ জ্ঞান
হে সর্বশক্তিমান॥
দাও দেহে দিব্যকান্তি
দাও গেহে নিত্য শান্তি,
দাও পুণ্য প্রেম ভক্তি
মঙ্গল-কল্যাণ।
হে সর্বশক্তিমান॥"

(গানের মালা, গীতিগ্রন্থ, ভজন, সন - ১৯৩৪)

ভবভূতির প্রেমভানার মূল কথা–

ক) নরনারী	⟹	দৈহিক, দেহাতীত, মানসিক ও মানব-সম্পর্ক
খ) মানুষ ও অন্য প্রাণী	⟹	সহভাবনা, সৌহার্দ্য, সম্মান, কর্তব্য ও রক্ষণ
গ) মানুষ ও উদ্ভিদ	⟹	সহভাবনা, সৌহার্দ্য, সম্মান, কর্তব্য ও রক্ষণ
ঘ) মানুষ ও জড়	⟹	আনুপাতিক রক্ষণ

উক্ত বিষয় দেখে মনে হতে পারে, এ আবার কেমন প্রেমের বহিঃপ্রকাশ – তার জন্য অর্থাৎ ভবভূতিকে প্রেমভাবনাকে সমর্থন করার জন্য তথা ভবভূতির প্রেমভাবনার অনুপ্রেরণা সরূপ বৈদিক সংজ্ঞান সূক্তের মন্ত্র অবশ্য স্মরণীয়:-

"সংগচ্ছধ্বং সংবদধ্বং সং বো মনাংসি জানতাম্।
দেবা ভাগং যথা পূর্বে সং জানানা উপাসতে॥ (ঋগ্বেদ ১০/১৯১/২)
সমানো মন্ত্রঃ সমিতিঃ সমানী সমানাং মনঃ সহ চিত্তমেষাম্।
সমানাং মন্ত্রমভিমন্ত্র য়ে বঃ সমানেন বো হবিষা জুহোসি॥"

(ঋগ্বেদ ১০/১৯১/৩)

একসঙ্গে চলা, এক চিন্তাধারায় সমবেত হয়ে সবে মিলে এক সঙ্গে বলা, সকলের মন উত্তম সংস্কারযুক্ত হওয়া,সবাইকে ভালবাসা, সকলের মত এক হওয়া, সকলে সম্মিলিত হওয়া ইত্যাদি। এই মন্ত্রের দ্রষ্টা ঋষি সংবনন। তাঁর নামটি বন্ ধাতু থেকে নিষ্পন্ন হয়েছে, যা ভালবাসা অর্থ প্রকাশ করে। যিনি সকলকে ভালবাসতে চান, সকলকে এক বলে অনুভব করেন – তিনিই সংবনন। সকলকে এক করে জানাই তাঁর সূক্তের (সংজ্ঞান) উদ্দেশ্য। বৈদিক ভাবনায় সহভাবনার এরকম আরো বহু প্রেমময় কথার উদাহরণ মেলে।[১] সকলের মন্ত্র, সংকল্প ও মন এক হোক, এক হোক, এক হোক। বৈদিক ঋষির দেখানো সেই পথ অবলম্বন করলেন ভবভূতি।

উত্তররামচরিত : ভবভূতি রচিত উত্তররামচরিতে করুণরসের আশ্রয়ে নিষ্কারণ, স্বতঃস্ফূর্ত প্রেম তার আপন সাবলীল গতিতে কখন কার দিকে প্রবাহিত হয়, তা ব্যাখ্যা করা যায় না। এ হচ্ছে অহেতুক পক্ষপাত। ভবভূতি এই নাটকের পঞ্চম অঙ্কে বলেছেন - বিনা কারণে জাত যেপ্রণয় তার প্রতিবিধান নেই, কারণ স্নেহের সেই তন্তু অন্তরের মর্মস্থানগুলিকে গ্রথিত করে দেয়[২]। ভবভূতি তাঁর রচনায় নানা প্রসঙ্গে নানাভাবে তাঁর

অভীষ্ট মহত্তম প্রেমের স্বরূপ প্রকাশ করার চেষ্টা করেছেন। উত্তররামচরিতের প্রথম অংকে আদর্শপ্রেমের স্বরূপ বর্ণনায় ভবভূতি রামকে দিয়ে বলিয়েছেন - যথার্থ দাম্পত্যপ্রেমে কোনোদ্বৈত ভূমিকা বা ভিন্নরূপতা নাই, তা সুখে এবং দুঃখে সমান। সম্পদও বিপদ এবং যৌবন ও বার্ধক্য সব অবস্থাতেই তা থাকে অনুকূল[৩]। এই নাটকের প্রথম অঙ্কে ভবভূতি রাম চরিত্রের মধ্য দিয়ে প্রজাপ্রেমের দিকটি গভীরভাবে ফুটিয়ে তোলেছেন এবং তার সাথে সীতা চরিত্রের মহানুভবতা ও শ্রেষ্ঠতাও সহজাত ভঙ্গিতে প্রতিপাদন করেছেন । যেমন-ঋষি বশিষ্ঠের আদেশকে যথোচিত মর্য্যাদার সাথে গ্রহণ করে রাম বলেছেন - প্রজাবৃন্দের কল্যাণের জন্য, তাদের সন্তোষের জন্য আমি স্নেহ, দয়া, সুখ, এমনকি প্রিয়তমা জানকীকেও অক্লেশে পরিত্যাগ করতে পারি[৪]। রামের এই উক্তিকে সীতা নির্দ্বিধায় সমর্থন করেন এবং স্বামীর জন্য গর্ব অনুভব করেন। উত্তররামচরিতে পরস্পরের অপরিচিত বনদেবী বাসন্তী ও আত্রেয়ীর সাক্ষাৎকার দৃশ্যে আমরা দেখতে পাই তাদের সংলাপ এবং আচার আচরনের মধ্য দিয়ে অভিব্যঞ্জিত হয়েছে প্রেমস্নিগ্ধ সৌজন্য। বাসন্তী মনে করেছেন আত্রেয়ীর এই সান্নিধ্য তিনি যে পেয়েছেন, তার কারণ কেবল তাঁর প্রাক্তন পুণ্য। অতএব ভবভূতির মতে প্রেম সূর্যালোকের মত স্বতঃ উদ্ভাষিত কল্যাণময় দীপ্তি, সেখানেনাই কোনো প্রয়োজনের অপেক্ষা বা স্বার্থসিদ্ধির তাগিদ। এই নাটকটির তৃতীয় অংকের বিবরণ থেকে জানা যায়, এই নায়িকা সীতার এই প্রেমপ্রীতি কেবলমাত্র মানব জগতে সীমিত নয়, বনের পশুপক্ষী বৃক্ষলতাতেও এই স্নেহ পরিব্যাপ্ত। যা আধুনিক সমাজে বিবর্তনের ছাপ বহন করে। এর থেকেই বর্তমান যুগের মানুষেরা প্রকৃতির প্রতিও প্রেমময়তাকে গুরুত্ব দেয়। ভবভূতির প্রেমভাবনার আদর্শ প্রতিমূর্তি হিসেবে সীতাচরিত্র যথার্থ কারণেই শ্রেষ্ঠত্বের দাবি রাখে। সীতার প্রেমের পরম ও চরম অভিব্যক্তি তাঁর স্বামীকে অবলম্বন করে। রামেরমত সীতার প্রেমও অলৌকিক, প্রগাঢ় এবং তুলনাহীন। এ প্রেমের চরিতার্থতা ত্যাগে। প্রিয়তমের জন্য সীতা সবকিছু বিসর্জন দিতে প্রস্তুত। এই জন্য আলংকারিক বিচারের দৃষ্টিকোন এই নাটকটি অনুধাবন করলে দেখতে পাওয়া যায় যে, নায়িকা হিসেবে সীতা চরিত্রটির পরিচয় স্বীয়া এবং মধ্যা। আর বিবাহিতা নায়িকা স্বীয়া। বয়সের দৃষ্টিকোণ থেকে মধ্যা।এদের লক্ষণ প্রসঙ্গে বিশ্বনাথ কবিরাজ তাঁর "সাহিত্যদর্পণ" গ্রন্থের তৃতীয় পরিচ্ছেদে বলেছেন -বিনয়, সরলতা, প্রভৃতি গুণে অন্বিতা, গৃহকর্মনিপুণা ও পতিব্রতা স্ত্রীই স্বীয়া[৫]। আবার মধ্যা শ্রেণীর নায়িকার লক্ষণ প্রসঙ্গে বিশ্বনাথ কবিরাজ বলেছেন - বিচিত্রসুরতা, মুগ্ধা অপেক্ষা অধিকতর স্থির যৌবনযুক্তা, ঈষৎ প্রগলভবচনা, মধ্যমব্রীড়ীতা নায়িকাকে মধ্যা নায়িকা বলে[৬]। এইভাবে উপরে উল্লিখিত স্বীয়া এবং মধ্যাশ্রেনীর নায়িকার সবগুণের প্রকাশের মাধ্যম এই নাটকের সীতা চরিত্রটিও বর্তমান নারীসমাজকে প্রভাবিত এবং অলংকৃত করেছে। রামায়ণে রামচন্দ্রের বিশেষতঃ পত্নীপ্রেম ও রাজকর্তব্যের মধ্যে দ্বন্দ্বের যে সংযত অভিব্যক্তি আছে, ভবভূতির নাটকে

সেটাই প্রধান বৈশিষ্ট্য - আকর্ষনীয় দিক। নাট্যকার সেই মানসিক দ্বন্দ্বকে বিশেষভাবে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেছেন। সীতার প্রতি রামের প্রেম তুলনাহীন, তাঁর গভীরতা অপরিমেয়। প্রিয়তমার স্পর্শ তাঁর সমস্ত শরীরে জাগায় এক অপূর্ব শিহরণ। কানের অমৃতস্বরূপ প্রিয়তমার বাক্য তাঁর জীবন কুসুমকে করে বিকশিত। সীতার প্রেম রামের কাছে সর্বোত্তম আনন্দস্বরূপ। অন্যদিকে রামচন্দ্র এক আদর্শ রাজা। প্রজাবৃন্দের কল্যানের জন্য, তাদের সন্তোষের জন্য রামচন্দ্র স্নেহ, দয়া, সুখ, এমনকি প্রিয়তমা জানকীকেও অক্লেশে পরিত্যাগ করতে পারেন। এভাবে দেখা যায় যে, রাম আদর্শ প্রেমিক এবং আদর্শ রাজা। কিন্তু দুর্মুখ যখনই সীতা চরিত্র বিষয়ে জনাপবাদের কথা রামকে জানিয়েছে, তখনই দেখা দিয়েছে রামের মানসিক দ্বন্দ্ব। একদিকে পত্নীপ্রেম, অন্যদিকে রাজকর্তব্য। রামচন্দ্র নিজে সীতার চরিত্র সম্পর্কে নিঃসন্দিগ্ধ। তাই এ আঘাত তাঁর কাছে দুর্বিসহ। তিনি মূর্ছিত হয়েছেন, কিন্তু পরক্ষণেই তাঁর হৃদয় না চাইলেও তিনি সীতা পরিত্যাগের কঠোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। কুলধর্ম ও রাজধর্ম রক্ষা করতে গিয়ে তিনি পতিত্বের ধর্মকে বলি দিয়েছেন। কিন্তু তাঁর অন্তর শতধা বিদীর্ণ। এই কাজ করতে গিয়ে তিনি নিজেকে নিষ্ঠুর ঘাতকের সাথে তুলনা করেছেন। এভাবে রামের দীর্ঘ উক্তির পরম্পরার মাধ্যমে তাঁর সুগভীর অন্তর্বেদনার মর্মস্পর্শী চিত্র আমরা দেখতে পাই। কিন্তু তা সত্বেও প্রজাদের প্রতি তাঁর কোনো ক্ষোভ নেই, আছে গভীর বিশ্বাস। ভবভূতি এই নাটকে প্রেমভাবনার যে প্রকাশ ঘটিয়েছেন, তারামকে ধীরোদাত্ত নায়ক হিসেবে মর্যাদা দিয়েছে। এই ধীরোদাত্ত নায়কের লক্ষণ প্রসঙ্গে বিশ্বনাথ কবিরাজ বলেছেন – যিনি আত্মপ্রশংসা করেন না, ক্ষমাবান, অতিশয় গম্ভীর প্রকৃতির, মহাসত্ত্ব সুখে দুঃখে অভিভূত হন না, স্থির বিপদে যিনি বিচলিতহন না, অন্তর্নিহিত গর্বকে যিনি বিনয়ে আবৃত করে রাখেন, যিনি দৃঢ়ব্রত তাঁকে ধীরেদাত্ত নায়ক বলা হয়[৭]। রামের মধ্যে এই সকলগুণের প্রকাশ ঘটেছিল এবং আধুনিক সমাজকে প্রভাবিত করেছে। ভবভূতির নাট্যরচনায় মানবিক রাজ্যে এই ব্যাপক প্রেমসত্ত্বার নানা দৃষ্টান্ত বিচ্ছিন্নভাবে ছড়িয়ে আছে এবং আধুনিক সমাজকে প্রভাবিত করেছে। লব ও চন্দ্রকেতু সংগ্রামে প্রবৃত্ত হয়েও পরস্পরের প্রতি কোনো এক অজানা আকর্ষণের কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে বলেছেন যে - তাঁরা নানা বিকল্পের সম্মুখীন হচ্ছেন। ভাবছেন আমাদের এই আকর্ষণ কি কোনো আকষ্মিক ব্যাপার, অথবা অন্যের গুণের আতিশয্য জনিত, অথবাএটা কি ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের ফল, অথবা এর মধ্যে কোনো অজ্ঞাত স্বকীয় সম্বন্ধ বিদ্যমান। জগতে বহুভাবে এটা দেখা যায় যে, কোনো প্রাণী বা কোনো ব্যক্তির প্রতি চিত্তের অনুরাগ স্বাভাবিক ভাবেই জেগে উঠল। সাধরন লোকেরা একে বলেন "দৃষ্টিপ্রেম"। বয়সের অগ্রগতিতে রাম এবং সীতার প্রেমের উজ্জ্বলতায় ওউদ্দীপনায় বিন্দুমাত্র ঘাটতি হয় নি। পরিণত বয়সেও রাম তরুণ প্রেমিকের মত সীতার স্পর্শের আনন্দে আত্মহারা হয়ে বলেছেন -একি সুখ বা দুঃখ, মোহ বা নিদ্রা, বিষক্রিয়া না মত্ততা – আমি স্থির করতে পারছি না। তোমার প্রতিটি স্পর্শে আমার সমস্ত ইন্দ্রিয় অভিভূত

হয়ে আমার চেতনাকে উদ্ভ্রান্ত করে দিচ্ছে[৮]। রামের এই উক্তির মধ্য দিয়ে ভবভূতির প্রেম ভাবনায় প্রতিফলিত হয়েছে তরুণ প্রেমিকের প্রেম সম্পর্কিত বিহ্বল অভিজ্ঞতা।

মহাবীরচরিত : ভবভূতি "মহাবীরচরিত" রাম ও সীতা এবং লক্ষণ ও উর্মিলার মধ্য দিয়ে প্রথম দর্শনজনিত ভালোবাসার বর্ণনা আছে। এখানে নাট্যকার রাম চরিত্রের মধ্য দিয়ে এক অপরূপ বীরত্বের ও মহত্ত্বের কাহিনী প্রদর্শন করে তাঁর প্রেমভাবনার দৃষ্টান্তের পরিচয় দিয়েছেন। প্রজাবৃন্দের কল্যাণ্যের জন্য, তাদের সন্তোষের জন্য রামচন্দ্র স্নেহ, দয়া, সুখ - সব বিসর্জন দিয়ে এক প্রজা প্রেমের মহনীয়তীর প্রকাশ করেছেন। তাছাড়া রামের পিতার আদেশ তথা দীর্ঘ চতুর্দশ বৎসর বনবাস সংকল্প পালনের মধ্য দিয়েও রামের পিতৃভক্তি সঞ্চারিত হয়েছে এই নাটকে। এখানে ভবভূতি রাম ও লক্ষণের মধ্য দিয়ে পরস্পর ভ্রাতৃত্ব প্রেমের উদয় ঘটিয়েছেন। এই নাটকে রামচন্দ্র মানুষ, নিজগুনে ও প্রেম নামক প্রতিভার অনির্বচনীয় রূপায়ণ ক্ষমতার বলে দেবতা হয়েছেন। তাই রামচন্দ্র হয়ে উঠেছেন চন্ডালের মিতা, বানরের দেবতা, বিভীষণের বন্ধু, শত্রুকেও প্রেম ও ভক্তি নিবেদনের ফলে আপন করে নিয়েছেন। অনুরূপভাবে এই নাটকে সীতার পাতিব্রত্য ভারতীয় রমণীগনের মধ্যে এক অপূর্ব স্বামিত্ব ভক্তির সঞ্চারিত করে। সতীত্ব বোধের জাগরণ ঘটায়। তাছাড়া এই নাটকে ভবভূতির প্রেম ভাবনায় প্রতিফলিত হয়েছে লক্ষণের ভ্রাতৃভক্তি, ভরতেরত্যাগ, হনুমানের প্রভুভক্তি। রামের মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে পুত্রের প্রতি পিতার স্নেহ, সীতার প্রতি পত্নী প্রেমের সঞ্চার। প্রকৃতিও একাত্মরূপে প্রতিভাত হয়ে থাকে।

মালতীমাধব : শৃঙ্গার রসাত্মক দশম অংক বিশিষ্ট ভবভূতি রচিত "মালতীমাধব" নামক প্রকরণে তরুণ বয়সের প্রেম, আবেগ, ঔৎসুক্য, চিন্তা প্রভৃতির বর্ণনার মধ্য দিয়ে প্রথম দর্শন নিমিত্ত প্রেমের দুর্বার প্রভাব বর্ণিত হয়েছে। সেই প্রেমের চরম সার্থকতা যে সন্তান লাভের অভীপ্সা - সে কথা বলতে ভোলেন নি নাট্যকার। এই প্রকরণে মালতী ও মাধব এবং মদয়ন্তিকা ও মকরন্দের দুটি সমান্তরাল প্রণয় কাহিনী চিত্রিত হয়েছে। এই প্রণয় কাহিনীর মধ্য দিয়ে প্রেমের বিভিন্ন দশা যেমন – নায়ক-নায়িকার অনুরাগ, বিরহ, হর্ষ, বিষাদ ও আশা-নৈরাশ্যের দ্বন্দ্বে মনোধর্মের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণের বর্ণনা পাওয়া যায়। যা বর্তমান সমাজে যুবক যুবতীর প্রেমের মধ্যে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছে। এই মালতী মাধবে কামন্দকীর মাধ্যমেও ভবভূতি দাম্পত্য প্রেমের কল্যাণময় ঐক্যের কথা বলতে গিয়ে বলেছেন -বাছা, তোমরা দুজনে একথা জানবে যে স্ত্রীলোকের পক্ষে স্বামী এবং পুরুষের পক্ষে বিবাহিতা পত্নী তাঁর প্রিয়তম মিত্র, সকল আত্মীয়জনের সমষ্টি, নিখিল কামনার বস্তু, পরম নিধি বা সামগ্রিক জীবনসত্ত্বা[৯]। দাম্পত্য প্রেমের এই যে অখণ্ড মহনীয় রূপ ভবভূতি তাঁর মধ্যে উপস্থাপিত করেছেন - সেখানে বিলুপ্ত হয়েছে সকল স্বাতন্ত্র্যবোধ, ছিন্ন হয়েছে ব্যক্তিত্বের সংঘাতময় সঙ্কীর্ণতা, নিরর্থক হয়েছে নারী বড় না পুরুষ বড়। প্রেমের আলোকে সমাজ উদ্ভাসিত হতে পারে, স্বর্গের সুষমা ধরা দিতে

পারে সুখী দম্পতীর পার্থিব মন্দিরে। ভবভূতির এই প্রেমভাবনা বিচার বিশ্লেষণ করলে বলা যেতেপারে যে, স্ত্রী লোকদের বিষয়ে ভবভূতির দৃষ্টি ছিল অনেক উদারএবং প্রাক্ প্রণয়জনিত গান্ধর্ববিবাহে তাঁর অনভিমত ছিল না। এই মালতী মাধবে আমরা পূর্ণ প্রণয়ঘটিত বিবাহের উল্লেখ দেখতে পাই। ভবভূতির নাট্যরচনাবলী বিশ্লেষণে এটা স্পষ্টভাবে প্রতীত হয়যে, সত্যি কারের ভালবাসাই মানবিক সম্বন্ধ ও আচরণকে সমুন্নত ও সুন্দর করতে পারে। পক্ষান্তরে প্রথাগত আনুগত্যসচেতন মানুষকে প্রাত্যহিক জীবনধারনের গ্লানিতে ক্লান্ত করে তোলে। তাই মহানুভাবা কামন্দকী অনভিজ্ঞা, লজ্জাশীলা মালতীকে উপদেশ ও উদাহরণের মাধ্যমে প্রেমের পথে শিক্ষিত করে তোলার চেষ্টা করেছেন। তাছাড়া মালতীমাধবে মাধব ও মকরন্দের যে বন্ধুত্বের চিত্র নাট্যকার পরিবেশিত করেছেন, তার মধ্যে আমরা পাই ত্যাগ সর্বস্বতার, পরার্থ পরতার এবং মহনীয়তার অমল দীপ্তি – যাকিনা আমাদের চিত্তকে এক অনাবিল স্বর্গীয় আনন্দে পরিব্যাপ্ত করে দেয়। কামন্দকী ও সৌদামিনীর চরিত্রের মধ্যে যে নিরাবিল প্রেমভাবনা মূর্তি পরিগ্রহ করেছে, তার মধ্যে আছে অন্যের ঐকান্তিক কল্যাণ কামনা, তরুণ তরুণীর জীবনকে সফল ও সার্থক করার শুভ্র প্রচেষ্টা। এই নিঃস্বার্থ ভালবাসা, প্রতিদান পরাঙ্মুখ কল্যান চেতনা যে কোনো মানব সমাজের অক্ষয় সম্পদ।

অতএব ভবভূতির এই প্রেমভাবনার বিচার বিশ্লেষণের সারকথা হল, ভবভূতির দৃষ্টিতে প্রেম এক বিশ্বজনীন কল্যাণময় সত্ত্বা, যার প্রভাব আধুনিক সমাজের প্রতি পদার্থে পরিব্যাপ্ত। তাছাড়া ভবভূতির প্রেমভাবনায় মিলিত হয়েছে প্রকৃতি মানবের ভালবাসা এবং প্রীতির অপরূপ সম্পর্ক। মানব জগতেরও পারস্পরিক সুস্থিতির মূলে আছে সেই প্রেমের অচ্ছেদ্য বন্ধন। লৌকিক জাগতিক পৃথিবীতে এই স্নেহময় বন্ধন সুখ, শান্তি, সমৃদ্ধি, বিশ্ব সৌভ্রাতৃত্ব রচনা করে সভ্যতার অগ্রসর সাধন করে। সেই অখন্ড প্রেমেরই একবিশেষ আকর্ষক সত্ত্বা নরনারীর প্রেম। তা আবার দেহ থেকে মনে অনাবিল সৌন্দর্যে বিপরিণমিত হয়। সেই অনাবিল সৌন্দর্যময়তার আবেদনে মানব মনো প্রকৃতি জীবজগতের সকলকে সৌহার্দ্যের অকৃত্রিম সংযোগে সংযুক্ত করে। তার ফলেই জীব-জড়, মানুষ-প্রকৃতি, মানুষ-জন্তু – সবার সম্পর্কের মধ্যে দেখা দেয় সত্য শিব ও সুন্দর। তার ফলেই প্রেমময় রূপে প্রতিভাত হয় সমগ্র জগত। প্রেমের মহান বাণী ও দুর্নিবার আকর্ষণ এই জগতে ঐক্য, শান্তি ও সংহতিকে সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর দাঁড় করাতে পারে, একথাই যেন বারংবার ভবভূতির নাট্যকৃতির মধ্য দিয়ে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়েছে। তাই আবার অনুরণিত হয়ে ধরা দিল রবিকবির গানে –

“আনন্দলোকে মঙ্গলালোকে বিরাজ সত্যসুন্দর॥
মহিমা তব উদ্ভাসিত মহাগগনমাঝে,
বিশ্বজগত মণিভূষণ বেষ্টিত চরণে॥
গ্রহতারক চন্দ্রতপন ব্যাকুল দ্রুত বেগে
করিছে পান, করিছে স্নান, অক্ষয় কিরণে॥

ধরণী'পরে ঝরে নির্ঝর, মোহন মধু শোভা
ফুলপল্লব-গীতবন্ধ-সুন্দর-বরনে॥
বহে জীবন রজনীদিন চিরনূতনধারা,
করুণা তব অবিশ্রাম জনমে মরণে॥
স্নেহ প্রেম দয়া ভক্তি কোমল করে প্রাণ,
কত সান্ত্বন করো বর্ষণ সন্তাপহরণে॥
জগতে তব কী মহোৎসব, বন্দন করে বিশ্ব
শ্রীসম্পদ ভূমাস্পদ নির্ভয়শরণে॥”

অন্ত্যটীকা (তথ্যসূত্র) :

i অজ্যেষ্ঠাসো অকনিষ্ঠাসএতে সং ভ্রাতারো তাবৃধুঃ সৌভগায়।
যুবা পিতা স্বপা রুদ্রএযাং সুদুঘা পুশ্নিঃ সুদিনা মরুদ্ভঃ ॥(ঋগ্বেদ ৫/৬০/৫)
সহৃদয়ম সমনস্যম অবিদ্বিশম কৃনোমি বঃ।
অন্যো অন্যম অভি হর্যতা বৎসম যাতমিবাঘ্ন্যা।। (অথর্ববেদ ৩/৩০/১)
সমানী প্রপা সহবোন্না ভাগহ সমানী যোক্ত্রে সহ বো যুনোমি।
সম্যঞ্চছোগ্নিম সপর্যতারা নাভিমিবভিতঃ।। (অথর্ববেদ ৩/৩০/৬)
সধ্রিছিনাবঃ সম্মনসাক্রিনোম্যেকস্নুশ্তীন্ত সম্বননেনা সর্বান্।
দেবা ইবামৃতম রক্ষামানাঃ সাযম প্রাতঃ সৌমনসো বো অস্তু।। (অথর্ববেদ ৩/৩০/৭)

ii অহেতুঃ পক্ষপাতো যস্তস্য নাস্তি প্রতিক্রিয়া ।
স হি স্নেহাত্মকস্তন্তুরন্তভূর্তানি সীব্যতি ।। (শ্লোক সংখ্যা – ৫/১৭)
আচার্য, শাস্ত্রীসীতানাথ এবং দেবকুমার দাস (সম্পা), উত্তর রামচরিত (মুদ্রিত), ভবভূতি, কলিকাতা : সংস্কৃত পুস্তকভান্ডার, এপ্রিল, ১৯৯৮, পৃষ্ঠা সংখ্যা–১৩৭

iii অদ্বৈতং সুখদুঃখয়োরনুগতং সর্বাস্ববস্থাসু যদ্
বিশ্রামৌ হৃদয়স্য যত্র জরসা যস্মিন্নহার্যৌ রসঃ।
কালেনাবরণাত্যয়াপ্তরিণতে যত্ প্রেমসারে স্থিতং
ভদ্রং তস্য সুমানুষস্য কথমপ্যেকং হি তত্ প্রার্থ্যতে।। (শ্লোক সংখ্যা – ১/৪৯)
আচার্য,শাস্ত্রীসীতানাথ এবংদেবকুমার দাস(সম্পা),উত্তররামচরিত(মুদ্রিত), ভবভূতি,কলিকাতা:সংস্কৃত পুস্তকভান্ডার,এপ্রিল,১৯৯৮,পৃষ্ঠা সংখ্যা-৩৯

iv স্নেহং দয়াং চ সৌখ্যং চ যদি বা জানকীমপি।
আরাধনায় লোকস্য মুঞ্চতো নাস্তি মে ব্যথা।। (শ্লোক সংখ্যা – ১/১২)
আচার্য,শাস্ত্রীসীতানাথ এবংদেবকুমার দাস(সম্পা),উত্তররামচরিত(মুদ্রিত), ভবভূতি,কলিকাতা:সংস্কৃত পুস্তকভান্ডার,এপ্রিল,১৯৯৮,পৃষ্ঠা সংখ্যা–১৬

v বিনয়ার্জবাদিযুক্তা গৃহকর্মপরা পতিব্রতা স্বীয়া।। (কারিকা সংখ্যা- ৩/৬৯)
বন্দোপাধ্যায়, অশোককুমার (সম্পাদিত), সাহিত্যদর্পণ (মুদ্রিত), বিশ্বনাথ কবিরাজ,কলকাতা: শ্রীবলরামপ্রকাশনী,১৪১১বঙ্গাব্দ,পৃষ্ঠাসংখ্যা-৭২

vi মধ্যা বিচিত্রসুরতা প্ররুঢ়স্মরযৌবনা।
ঈষৎ-প্রগলভবচনা মধ্যমব্রীড়িতা মতা।। (কারিকা সংখ্যা- ৩/৫৭)
বন্দোপাধ্যায়,অশোককুমার (সম্পাদিত),সাহিত্যদর্পণ (মুদ্রিত), বিশ্বনাথ কবিরাজ,কলকাতা: শ্রীবলরামপ্রকাশনী,১৪১১বঙ্গাব্দ,পৃষ্ঠাসংখ্যা-৭৪

vii অবিকত্থনঃ ক্ষমাবানতিগম্ভীরো মহাসত্ত্বঃ।
স্থেয়ান্ নিগূঢ়মানো ধীরেদাত্তো দৃঢ়ব্রতঃ কথিতঃ।। (কারিকা সংখ্যা- ৩/৩৭)
বন্দোপাধ্যায়,অশোককুমার (সম্পাদিত),সাহিত্যদর্পণ (মুদ্রিত), বিশ্বনাথ কবিরাজ,কলকাতা: শ্রীবলরামপ্রকাশনী,১৪১১বঙ্গাব্দ,পৃষ্ঠাসংখ্যা-৬১

Viii বিনিশ্চেতুং শক্যো ন সুখমিতি বা দুঃখমিতি বা
প্রমোহো নিদ্রা বা কিমু বিষবিসর্পঃ কিমু মদঃ।
তব স্পর্শে স্পর্শে মম পরিমূঢ়েন্দ্রিয়গণো
বিকারশ্চৈতন্যং ভ্রময়তি চ সম্মীলয়তি চ।। (শ্লোক সংখ্যা - ১/৩৯)
আচার্য,শাস্ত্রীসীতানাথ এবংদেবকুমার দাস(সম্পা),উত্তররামচরিত(মুদ্রিত), ভবভূতি,কলিকাতা:সংস্কৃত পুস্তকভান্ডার,এপ্রিল,১৯৯৮,পৃষ্ঠা সংখ্যা-৩৫

ix প্রেয়ো মিত্রং বন্ধুতা বা সমগ্রাসর্বে কামাঃ শেবধিজীবিতং বা।
স্ত্রীণাং ভর্তা ধর্মদারশ্চ পুংসামিত্যন্যোন্যং বৎসয়োর্জ্ঞাতমস্তু ।।
(শ্লোক সংখ্যা - ৬/১৮)
শাস্ত্রী, শেষরাজশর্মা(সম্পাদিত), মালতীমাধবম্ (মুদ্রিত), ভবভূতি, বারাণসী: চৌখম্বা সংস্কৃত সিরিজ, আফিস,২০১৮,পৃষ্ঠা সংখ্যা-২৯৩

সহায়ক গ্রন্থ-তালিকা :

i . বন্দোপাধ্যায়,অশোককুমার, সাহিত্যদর্পণ (প্রথম-দ্বিতীয়-তৃতীয়পরিচ্ছেদ), (মুদ্রিত), কলকাতা : শ্রীবলরাম প্রকাশনী,১৪১১ বঙ্গাব্দ ।

ii . আচার্য, শাস্ত্রী, সীতানাথ এবং দেবকুমার দাস, উত্তররামচরিত, (মুদ্রিত), কলিকাতা : সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার, এপ্রিল, ১৯৯৮ ।

iii. শাস্ত্রী, শেষরাজশর্মা, মালতীমাধবম্, (মুদ্রিত),বারাণসী : চৌখাম্বাসংস্কৃত সীরীজ আফিস, ২০১৮।

iv. মিশ্র, রামচন্দ্র, মহাবীরচরিতম্, (মুদ্রিত), বারাণসী : চৌখাম্বাবিদ্যাভবন,২০০৯ ।

‘চিলেকোঠার সেপাই’: আধুনিক সাহিত্যে দ্বন্দ্বমুখর বাস্তবতার বিনির্মাণ

স্নিগ্ধা চক্রবর্তী
গবেষক, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ:- বিংশ শতকের ঔপন্যাসিকদের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ কথাশিল্পী নিঃসন্দেহে আখতারুজ্জামান ইলিয়াস (১৯৪৩-১৯৯৭)। ১৯৬৯ সালের পূর্ববঙ্গের গণঅভ্যুত্থানজনিত যন্ত্রণাদগ্ধ দিনলিপি এবং ১৯৪৭ সালে দেশভাগ-পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সময়কালে সংগঠিত সন্ন্যাসী-ফকির বিদ্রোহ, তেভাগা আন্দোলন, সাম্প্রদায়িকতার রাজনীতি- দুই টালমাটাল সময়ের প্রেক্ষিতে সমসময়ের নানা ঘটনাকে কেন্দ্র করে লেখা তার দুইটি উপন্যাস যথাক্রমে ‘চিলেকোঠার সেপাই’ এবং ‘খোয়াবনামা’। সমসাময়িক সময়ের রাজনৈতিক ইতিহাসের প্রেক্ষাপটকে কেন্দ্রে রেখে আখ্যান রূপায়ণের দক্ষতাকে তিনি শিল্পের পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছিলেন। আমাদের আলোচ্য আখ্যান- ‘চিলেকোঠার সেপাই’। এই উপন্যাসকে কেন্দ্র করে মূলত আধুনিক সাহিত্যে ব্যক্তি তথা সমষ্টির রূপায়ণ, ‘আত্ম’ ও ‘অপর’ সত্তার নিরন্তর দ্বন্দ্বময় অবস্থান, এক গভীর সংকটের সম্মুখীন সময়ের আবেগবর্জিত পুঙ্খানুপুঙ্খ উপস্থাপন, একটি গণআন্দোলনকে কেন্দ্র করে শহুরে ও গ্রামীণ রাজনীতির অবক্ষয়ের চিত্রপট ও সর্বোপরি আখ্যানভাগের চরিত্রচিত্রনের মাধ্যমে আধুনিক সাহিত্যে দ্বন্দ্বমুখর বাস্তবতার বিনির্মাণের রূপটিকে দেখতে চাওয়াই এই প্রবন্ধের মূল উদ্দেশ্য।

সূচক শব্দ :- আধুনিক সাহিত্য, দ্বন্দ্বমুখরতা, বাস্তবতা, সমাজপ্রেক্ষিত

মূল প্রবন্ধ :-ইউরোপীয় সাহিত্যে সামন্ততন্ত্রের ধ্বংস এবং পুঁজিবাদের অভ্যুত্থানের মাঝামাঝি সময়ে দাঁড়িয়ে মূলত ব্যক্তির ইচ্ছা ও আকাঙ্ক্ষাকে কেন্দ্রবিন্দুতে রেখে উপন্যাসের জয়যাত্রা সূচিত হয়েছিল। ব্যক্তিকে তার সমাজপ্রেক্ষিত সহ তুলে ধরার একটা প্রয়োজনীয়তা বোধ করেছিল ইউরোপীয় সাহিত্য। আর বাংলা সাহিত্যে মোটামুটিভাবে উপন্যাসের জন্মলগ্ন থেকেই বাংলা সাহিত্য ক্রমশ আধুনিক ও প্রাপ্তমনস্ক হয়ে উঠছিল। বিশ শতকের প্রথমার্ধে দাঁড়িয়ে রবীন্দ্রনাথ একদা নদীর বাঁক নেওয়ার মতো সাহিত্যের বাঁকবদলকে ‘মর্ডান’-এর সংজ্ঞা হিসেবে নিরূপণ করেছিলেন, তারপর কেটে গেছে বেশ কয়েক দশক। উনিশ শতকের আপাত শান্ত অথচ ভিতরে উত্তাল সময়ের প্রেক্ষাপট পেরিয়ে বিশ শতক জুড়ে সময়ের ঘাত-প্রতিঘাতে আন্দোলিত গোটা বাংলা সাহিত্য এসময় থেকেই ক্রমশ হয়ে উঠল স্বাতন্ত্র্যে ভরপুর।

বিশ শতকের ষাটের দশকে উত্তাল সময়ের প্রেক্ষাপটে বাংলা কথাসাহিত্যের মর্জিবদল এবং তার ক্রমআধুনিক হয়ে ওঠার পথকে মসৃণ করে তুলেছিল কথাশিল্পী আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের ‘চিলেকোঠার সেপাই’। মননশীল এই ঔপন্যাসিকের তীক্ষ্ণ

কলমে সমাজের পটভূমিকে কেন্দ্র করে ক্রমশ একটা উপন্যাসের সর্বাধিক বর্ণময় চরিত্রই হয়ে উঠল সময়। এই উপন্যাসে একদিকে ১৯৬৯ সমকালীন বাংলাদেশের গণঅভ্যুত্থানের আগুনঝরা দিনগুলির বাস্তব বর্ণনা, আরেকদিকে এক গভীর সংকটের মুখে ভাঙাচোরা এক সমাজের প্রতিটি শ্রেণিচরিত্রের ক্রমাগত কাঁটাছেড়া, তাদের বেদনা, বিক্ষোভ, হতাশা, জটিলতা, অবক্ষয়কে টেনে যুক্তিগ্রাহ্য দৃষ্টিভঙ্গির ভিত্তিতে অতিরঞ্জনহীন, আবেগবর্জিত পরিবেশন এবং একটা আবেগরুদ্ধ গণআন্দোলনের অভ্যন্তর আদতে কতটা অন্তঃসারশূন্য, তা চোখে আঙুল দিয়ে দেখানো- এই সমস্তকিছু মিলিয়ে আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের 'চিলেকোঠার সেপাই' বাংলা উপন্যাসের এক অত্যাধুনিক মর্জিবদল। মানুষের সমগ্রতাকে ছুঁয়ে এ উপন্যাস শেষপর্যন্ত পাঠককে উপনীত করে এক ভিন্ন মাত্রায়। আধুনিক সাহিত্যের অন্যতম প্রধান একটি প্রবণতা নিঃসন্দেহে সময়ের, বাস্তবতার যুক্তিগ্রাহ্য, আবেগবর্জিত উপস্থাপন। 'চিলেকোঠার সেপাই' উপন্যাসের পাঠঅভিজ্ঞতার নিরিখে আধুনিক সাহিত্যের প্রবণতা বিচারের প্রেক্ষিতে এ প্রবন্ধে আমরা মূলত আধুনিক সাহিত্যে দ্বন্দ্বমুখর বাস্তবতার বিনির্মাণকে বিশ্লেষণাত্মক দৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ করতে চাইব।

বাংলা সাহিত্যের আধুনিকতার পথে 'চিলেকোঠার সেপাই' উপন্যাসের আনাচেকানাচে খানিক ঘুরে দেখতে চাওয়া এ উপন্যাসের আধুনিকতার প্রবণতাগুলি অনুসন্ধানের সূত্র ধরেই। একদিকে গ্রামীণ রাজনীতির প্রেক্ষাপটে নিম্নবর্গের মানুষের তত্ত্বহীনতা, কিন্তু বিপ্লবের তীব্র আকাঙ্ক্ষা, অন্যদিকে শহরের প্রেক্ষাপটে তথাকথিত শিক্ষিত মধ্যশ্রেণির স্রেফ প্রতিবাদহীন তত্ত্বের কচকচানি, সর্বোপরি এ উপন্যাসের অন্যতম লক্ষণ মধ্যবিত্তের অস্তিত্বহীনতা, বিপর্যস্ত ভাঙাচোরা পলায়নপ্রবৃত্তি- এক দ্বন্দ্বমুখর সময়ের চাপে পিষ্ট রক্তাক্ত আবেগবর্জিত বাস্তবতার নির্মাণ, যা আধুনিক সাহিত্যের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ লক্ষণ হয়ে উঠতে পারে নিঃসন্দেহে, সেই দ্বন্দ্বমুখর বাস্তবতা রয়েছে উপন্যাসের পরতে পরতে। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য গতানুগতিক আধুনিক উপন্যাসের একটি লক্ষণ। কিন্তু এ উপন্যাসে আমরা দেখব একদিকে একাধিক চরিত্র যেমন হয়ে উঠছে একই সত্তার ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন পট, আরেকদিকে তেমনি একটি ব্যক্তিচরিত্রের মধ্যে দিয়ে উৎসারিত সমাজের অনেকগুলি মানুষের সমষ্টিগত চারিত্র্যলক্ষণ- উপন্যাসের পুরো কালভাগ জুড়ে ব্যক্তি ও সমষ্টির এই দ্বন্দ্বের অভিঘাতে কোনো একক ব্যক্তিচরিত্র নয়, এ উপন্যাসের নায়ক হয়ে উঠছে ক্রমশ ১৯৬৯ সমকালীন সেই টালমাটাল সময়ের প্রেক্ষাপট, যা আধুনিক উপন্যাসের ক্ষেত্রে একটি নতুন প্রবণতাকেই সূচিত করে নিঃসন্দেহে। বাস্তব আর কল্পনার আলো-আঁধারি মনস্তাত্ত্বিক টানাপোড়েনে ছিন্নবিচ্ছিন্ন চরিত্রের হতাশা সতত ব্যক্ত হয়েছে এ উপন্যাসে। বিচ্ছিন্নতা যেন ক্রমশ এ উপন্যাসে হয়ে উঠেছে আধুনিকতার এক অনস্বীকার্য বা অনিবার্য শর্ত।গতানুগতিক উপন্যাসে যেভাবে মধ্যবিত্তের জীবনের আবেগ, হতাশা, যন্ত্রণা, দুঃখ, বেদনার রূপায়ণ দেখা যায়, সেই ধারাকে ভেঙে কথাশিল্পী ইলিয়াস স্বতন্ত্র

রীতিতে মধ্যবিত্তের মনস্তত্ত্বকে দেখতে চেয়েছেন বিশ্লেষণী দৃষ্টির আলোকে। ইলিয়াস সাহিত্যে কঠিন বাস্তবের নির্মাণ করতে চেয়েছিলেন বলেই হয়তো শান্তিকামী, নিরাপত্তাকামী পাঠকমননকে তিনি চিরপরিচিত রোমান্টিকতাময় 'মননের মধু' উপহার দিতে পারেননি, বদলে তিনি প্রচলিত উপন্যাসরীতিকে ভেঙে পাঠককে দেখিয়েছেন এক দ্বন্দ্বসংকুল, দ্বিধাবিভক্ত বিপন্ন সময়ের অভিঘাত, যেখানে দাঁড়িয়ে বিপন্ন হতে পারে স্বয়ং পাঠকের অস্তিত্বও। 'চিলেকোঠার সেপাই' উপন্যাসে দ্বন্দ্বমুখর বাস্তবতার এই নির্মাণের ক্ষেত্রে ইলিয়াস তার নিজস্ব রঙে বা ধারণায় উপন্যাসকে চালিত হতে দেননি। উপরন্তু বলা যায়, তিনি তার নির্মোহ অবলোকনের প্রেক্ষিতে প্রতিটি চরিত্রকে মূর্ত করে তুলেছেন তার সহজ স্বাভাবিক নগ্ন রূপে। আধুনিক সাহিত্যের প্রচলিত নির্মাণের সমস্ত ছকের বাঁকবদল ঘটিয়ে 'চিলেকোঠার সেপাই' উপন্যাসে নগ্ন দ্বন্দ্বমূলক বাস্তবের প্রথাবিরোধী নির্মাণ সাহিত্যে সূচিত করেছে এক নতুন পথ। অস্তিত্বহীনতাকে অস্তিত্বের মোড়কে ঢেকে উপস্থাপন করার প্রথাঅনুগত জনতোষণকে পরিহার করেছিলেন ইলিয়াস এ উপন্যাসে। তাই হয়তো ইলিয়াস এই প্রজন্মের কাছে শেষপর্যন্ত ব্যর্থ প্রাণের আবর্জনা পুড়িয়ে ফেলে আগুন জ্বালার লেখক।

'চিলেকোঠার সেপাই' উপন্যাসের আরেকটি লক্ষণ হল, ইলিয়াস এ উপন্যাসে সমাজকে বহুভাবে ব্যঙ্গবাণে জর্জরিত করেছেন। তবে ইলিয়াসের এই সচেতন সমাজআক্রমণ আদতে সমাজশোধনেরই একটি অভিনব প্রয়াস। 'চিলেকোঠার সেপাই' উপন্যাসের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ঘটনাপরম্পরার মধ্যে দেখা যায় বাস্তব ও স্বপ্নের মধ্যে গড়ে ওঠা দ্বন্দ্ব এবং সেই সূত্রে অবাধ চলাচল।কখনো বাস্তবের মাটিতে পা ছুঁইয়ে রেখেও সেখানে হঠাৎ স্বপ্নের আগমন ঘটে, আবার কখনো স্বপ্নের কথা বলতে বলতে হঠাৎ এ উপন্যাসের ঘটনাভাগ ঢুকে পড়ে নগ্ন বাস্তবভূমিতে। এভাবেই 'চিলেকোঠার সেপাই' সমস্ত চলতি সাহিত্যের মডেল ভেঙে এক নতুন বিপদসংকুল দুর্গম পাঠঅভিজ্ঞতা তৈরি করে একালের তথাকথিত আধুনিকমনস্ক পাঠকের জন্য। ইলিয়াস যেভাবে এ উপন্যাসে দ্বন্দ্বমূলক বাস্তবতার নির্মাণ ঘটিয়েছেন, তার সাথে জড়িয়ে আছে নিঃসন্দেহে 'ব্যক্তি'-র নির্মাণের ইতিহাস। গতানুগতিক আধুনিক সাহিত্যের একটি প্রধান বিষয় হল ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধের নির্মাণ।কিন্তু এ উপন্যাসে কার্যত তাকে অস্বীকার করে দেখানো হয় একটা নির্দিষ্ট সময়কে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা ব্যক্তির উত্থান-পতন, ব্যক্তির 'আত্ম'নির্মাণের জন্য সবচেয়ে বেশি করে প্রয়োজন যে 'অপর' সত্তার নির্মাণ, সেই নির্মাণের পিছনে থাকা সূক্ষ্ম রাজনীতি।'ব্যক্তি'-র পাশাপাশি উপন্যাসের পুরোভাগ জুড়ে উঠে আসে বারবার সমষ্টির কণ্ঠস্বর, তাই আখ্যানভাগে প্রবেশ করে খিজির। আধুনিক সমাজব্যবস্থায় ওসমানের মতো মধ্যবিত্ত মননের 'আত্মে'র এই স্বরূপ উদঘাটন করার জন্য প্রয়োজন ঘটে খিজিররূপী এক 'অপর' সত্তার। আধুনিক মানুষের অস্তিত্বের এক অনিবার্য অংশ হল দ্বিধা-দ্বন্দ্ব-বিচ্ছিন্নতা, স্বপ্নের সমান্তরালে চলমান বাস্তব এবং বাস্তব-

স্বপ্নের এই ক্রমাগত দোলাচলে আক্রান্ত মধ্যবিত্তের মধ্যে তৈরি হয় সমাধানহীন এক অস্তিত্বসংকট- এই বোঝাপড়াটুকু মূর্ত হয়ে আছে আলোচ্য উপন্যাসের আখ্যানভাগ জুড়ে। উপনিবেশে রচিত সাহিত্য আদতে এক ভাঙা সময়ের গল্পই বলে যায় অবিরত। এই বাস্তবকে অস্বীকার করা ইলিয়াসের পক্ষেও সম্ভব হয়না। কিন্তু তবু তিনি বানিয়ে বলেন না কোনো ইচ্ছেপূরণের গল্প।ক্ষমতাতন্ত্রের ইতিহাস যে আদতে ক্ষমতাহীনকে গিলে খাওয়ার ইতিহাস, তাকে নির্মোহ দৃষ্টিতে নগ্নভাবে তুলে ধরেন বলেই ইলিয়াস একজন সৎ সাহিত্যিক। এমনকি সমাজের শোষিত শ্রেণির নির্মাণেও চলতি লেখার মতো এ উপন্যাসে থাকেনা কোনো মহত্বের ছোঁয়া, বরং শোষিত সর্বহারা সমাজের নগ্ন, কঙ্কালসার ছবি, ভাষাগত অসংযম- এই সমগ্রতাকে ছুঁয়ে যেতে চান ইলিয়াস উপন্যাস জুড়েই।

'চিলেকোঠার সেপাই' উপন্যাসের মধ্যে দ্বন্দ্বমুখর বাস্তবতার বিনির্মাণটিকে বুঝতে গেলে এ উপন্যাসের চরিত্রগুলির নির্মাণের দিকে দৃষ্টিপাত করতে হবে।সর্বজ্ঞ কথকের বর্ণনায় উপন্যাসের আখ্যানভাগ শুরু হয় একটি মৃত্যুর স্বপ্নের মধ্য দিয়ে।পাশাপাশি উঠে আসে ওসমানের একটি আপাত 'অস্বস্তিকর' স্বমেহনের দৃশ্য। মৃত্যু এবং যৌনতা- জীবনের এই অন্যতম দুইটি নিয়ন্ত্রকের কাছে ওসমান শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ। ওসমান হল আদতে 'চিলেকোঠার সেপাই'।সে সৈনিক নয়, আক্ষরিক অর্থেই সে হল 'সেপাই'- ওসমানের মধ্যবিত্ত মানসিকতা বিশ্লেষণে এই সূক্ষ্ম ব্যঙ্গটুকু সহজেই অনুমেয়। চিলেকোঠার অবস্থানের মতোই এ উপন্যাসে ওসমান খানিক একক, বিচ্ছিন্ন, নিঃসঙ্গ, ত্রিশঙ্কু একটা অবস্থানে থাকে। ওসমানের চরিত্রে থাকা আত্মসংকট আসলে আধুনিক মধ্যবিত্তেরই 'ক্রাইসিস'। ওসমানের আত্মরতি বা আত্মমুখীনতা শেষপর্যন্ত তাকে কোনো অনৈসর্গিক আহ্লাদ দিতে পারেনা, কারণ মধ্যবিত্ত মনন শেষপর্যন্ত এক বানিয়ে তোলা বেদনার সন্তান। সামাজিক অবস্থানের দিক থেকে ওসমানের মতো মধ্যবিত্তের মনোজগৎ এক সংশয়ী, দোদুল্যমান মানসিকতায় পূর্ণ। চিলেকোঠার শৃঙ্খল অগ্রাহ্য করে সে কোথায় যেতে চায়, তা স্পষ্ট নয়। মধ্যবিত্ত মানসের কি সে অর্থে কোনো গন্তব্য থাকে আদৌ? পথচলার প্রাপ্তিটুকুই তার ভবিষ্যতের টিকে থাকার সম্বল- ওসমানের ক্ষেত্রে এই প্রাপ্তি খিজির, চেংটু, আনোয়ার, রঞ্জু। ঘটনাবৃত্তে উপস্থিত থেকেও ওসমান নৈরাশ্য, অস্তিত্বহীনতা, সর্বশূন্যতায় আক্রান্ত এক মধ্যবিত্ত মনন, শওকতের দোকানে মোরগ পোলাও খেতে খেতে যে আয়নায় নিজের প্রতিকৃতি শনাক্ত করতে পারেনা, আবার কখনো মিছিলে উপস্থিত থেকেও টের পায় তার অনস্তিত্ব। উপনিবেশে দাঁড়িয়ে জীবনের ইঁদুর দৌড়ে সামিল সুবিধাভোগী, পলায়নবাদী মধ্যবিত্ত মনন ক্রমশ উপরে ওঠার লড়াই করতে করতে শেষপর্যন্ত নিজের সত্তা থেকেই হয়ে যায় বিচ্ছিন্ন। কখনো কুয়োতলায় লেবুপাতা কচলাতে কচলাতে, আবার কখনো রঞ্জুর সূত্রে ওসমান ফিরে গেছে তার ফেলে আসা শৈশবে। এখানেও ইলিয়াস নির্মাণ করে গেছেন আধুনিক মধ্যবিত্তের স্মৃতিমেদুর অতীতে বাঁচার বিচ্ছিন্নতাকে। খিজিরের অপ্রতিরোধী বিপ্লবী

সত্তার আয়নায় ওসমান ক্রমশ তার নিজের 'আত্ম'সত্তাকে উপলব্ধি করেছে, ফলত তীব্র এক দ্বন্দ্বমুখর মানবিক বিপর্যয়ের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সে হয়ে উঠেছে 'সিজোফ্রেনিয়া'-আক্রান্ত। যথার্থ মধ্যবিত্তের মতো ওসমানও এক সর্বগ্রাসী ভীতিতে আক্রান্ত, তাই সে কোথাও থিতু হতে পারেনি। এক অস্বাস্থ্যকর যৌন অবদমন রয়েছে ওসমানের সত্তা জুড়ে। কিন্তু শেষে বৃত্তে বন্দী ওসমানও করেছে বৃত্ত ভাঙার প্রচেষ্টা। চিলেকোঠার বাইরে বেরোনোর ভয়, মৃত্যুভয় সমস্তকিছুকে তুচ্ছ করে দরজাবন্ধ নিশ্চিন্ত জীবনকে পরাস্ত করে সে মৃত খিজিরের আহ্বানে সাড়া দিয়েছে। যদিও ওসমানের এই ভেঙে বেরোনোর ইচ্ছেটা অসুস্থতা দ্বারা আক্রান্ত, তবু এখানেই মনে হয় আধুনিক উপন্যাস হিসেবে এ উপন্যাসের সার্থকতা, যে এ আখ্যান কোথাও বলেনা ইচ্ছেপূরণের 'ইউটোপিয়া'-র কথা, বরং বলে দ্বন্দ্বব্যাকুল এক বাস্তবের নির্মাণের গল্প। এক অসহনীয় আত্মঘাতী নিঃসঙ্গতার বৈনাশিক স্রোত ওসমানকে ভাসিয়ে নিয়ে যায় উপন্যাসজুড়ে। ওসমান শেষপর্যন্ত পথে বেরিয়ে আদৌ কোনো পথ খুঁজে পেয়েছে কিনা, তা আমাদের অজানা। কিন্তু এটুকু স্পষ্ট, ওসমানের মধ্যে লালিত যে দ্বিধাদ্বন্দ্বজনিত প্রতিবাদ, প্রতিরোধ, তা খানিকটা তার নিজেরই বিরুদ্ধে। এভাবেই ইলিয়াস ক্রমশ ব্যক্তি-ক্রুটির আড়ালে বলে চলেন শ্রেণিগত ক্রুটির কথা, সচেতনভাবে নির্মাণ করে চলেন আধুনিক মধ্যবিত্ত মননের উত্তরণহীন সংকট, যে সংকট পেরোতে গেলে সর্বগ্রাসী এক অসুস্থতা অস্তিত্বকে গিলে খায়। ওসমানের চিলেকোঠায় শেষপর্যন্ত ঠাঁই পায় আনোয়ার। আনোয়ার এ উপন্যাসে ওসমানেরই চরিত্রের প্রায় একটা উল্টো পিঠ, যে একটি বিশেষ রাজনৈতিক তত্ত্ব অনুযায়ী রোমান্টিক বিপ্লবের স্বপ্নে বিভোর তথাকথিত শিক্ষিত শহুরে আদর্শবাদী। তার ভিতরে আছে বটে তত্ত্বের আগ্নেয়গিরি, কিন্তু তা থেকে কোনো লাভার উদ্গীরণ হয়না। মুখে তাত্ত্বিক বুলি থাকলেও তার মধ্যে নেই কোনো সংগ্রামী মনোভাব। শুধুমাত্র মধ্যবিত্ত শ্রেণির প্রতিনিধি বলে খিজির-চেংটুর সমমানে দাঁড়িয়ে সে আন্দোলনে অংশ নিতে পারেনা। গ্রামীণ বামপন্থী নেতা আলিবক্সের উচ্চারণদোষ আনোয়ারের শহুরে শিক্ষিত সত্তায় বাঁধা হয়ে দাঁড়ায়। সে তার শ্রেণিগত কৌলীন্যকে বিস্মৃত হতে পারেনা বলেই উপন্যাসভাগ জুড়ে সে দ্বিধাদ্বন্দ্বের আবর্তে ঘুরতে থাকে। শিকড়হীন তাত্ত্বিক অবস্থানে থাকা আনোয়ার শেষপর্যন্ত চিলেকোঠার চারদেওয়ালে বন্দী শান্তির ঘুমে আচ্ছন্ন। তার এই অবস্থানও তার শ্রেণিচরিত্রের প্রতি, তার তত্ত্বসর্বস্ব রোমান্টিক বিপ্লবের ধারণার প্রতি লেখকের এক কঠিন বিদ্রূপই বটে। এ উপন্যাসে সর্বহারা শ্রেণির নির্মাণে ইলিয়াস তুলিতে নেননা কোনো মহত্বের রঙ, বরং বদলে তিনি সর্বহারাকে নির্মাণ করেন তার কঙ্কালসার রূপেই। শহরের প্রেক্ষাপটে আমরা সর্বহারা শ্রেণির প্রতিনিধি রূপে পাই হাড্ডি খিজিরকে, যার ভাষাগত অসংযম তার শ্রেণিচরিত্রকে করে তোলে মূর্ত। এখানেই এ উপন্যাসের আখ্যানভাগ সবচেয়ে বেশিমাত্রায় আধুনিক হয়ে ওঠে। কারণ, ইলিয়াস কোনো বানিয়ে তোলা মানুষের গল্প বলেননা। ইলিয়াস একেবারে সমাজসংলগ্ন

আমাদের চেনা কতগুলো চরিত্রের নির্মাণ করেন, বানানো পোশাকের আবরণে তিনি নগ্নতাকে ঢেকে রাখতে চাননা, বরং তিনি নগ্নতাকে তুলে ধরেন প্রকাশ্য দিবালোকে, যে সাহিত্যপাঠে শিউরে ওঠে পাঠককুল। খিজিরের মাধ্যমে আধুনিক সাহিত্যের চেনা ছকে 'ব্যক্তি'র নির্মাণ ছাপিয়ে উচ্চে ওঠে সমষ্টির কণ্ঠস্বর। খিজিরের প্রতিবাদ-প্রতিরোধ হয়তো আইয়ুব খান বা মোনেম খান অবধি পৌঁছায় না, কিন্তু সে গর্জে ওঠে আগ্রাসী রহমতউল্লাহর বিরুদ্ধে, ক্ষমতার বিরুদ্ধে গিয়ে সে পেতে চায় স্ত্রীর নিরাপদ গর্ভধারণের অধিকার। খিজিরের দর্পণে শেষপর্যন্ত নিজেকে চিনতে পারে ওসমান। খিজিরের সংগ্রামী চেতনা ওসমানে সংক্রমিত হলে মানসিক অসুস্থতা ছাড়া ওসমানের কোনো গত্যন্তর থাকেনা। ক্ষুধা, দারিদ্র্য, শোষণে, নির্যাতনে নিঃশেষিত হতে হতে ঘুরে দাঁড়ানো রক্তমাংসের মানবসত্তা খিজির। গ্রামীণ মানুষের প্রতিবাদের আখ্যান যাকে দিয়ে স্পষ্টতর হয়ে ওঠে, সে হল চেংটু। গ্রামীণ রাজনীতির প্রেক্ষাপটে এই চরিত্রটি এত বেশি স্পষ্ট ও বাস্তব যে, বাক্যবাগীশ আনোয়ারেরও বাস্তববাদী চেংটুর সামনে দাঁড়াতে অস্বস্তি হয়। ক্ষমতাতন্ত্রের বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর শক্তি তার মধ্যে ভরপুর। চেংটু জানে, ক্ষমতালোভী তাত্ত্বিক নেতারা কেবল নেতা হওয়ার রাজনীতি করে। চেংটুর মৃত্যুতে স্পষ্ট হয়ে ওঠে একটা গণসংগ্রামের মধ্যে থাকা অন্তঃসারশূন্যতা।সর্বহারা শ্রেণির একনায়কত্বের স্বপ্নিল বাস্তবতার নির্মাণকে অগ্রাহ্য করে এ উপন্যাসে নির্মম বাস্তবের প্রেক্ষিতে ক্রমশ ঘনিয়ে ওঠে ক্ষমতার মুক্তিহীন সর্বগ্রাস। রহমতউল্লাহ, খয়বার গাজী, আফসার গাজী, জালাল মাষ্টার- এই শোষক চরিত্রগুলি তৎকাল থেকে আজ পর্যন্ত সমাজপ্রেক্ষিতের বিচারে সত্য, কারণ- "রাজা আসে যায় আসে আর যায় / শুধু পোষাকের রঙ বদলায় / শুধু মুখোশের ঢং বদলায় / দিন বদলায় না।"

পরিশেষে বলা যায়, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী সময়ে দাঁড়িয়ে একটা উপনিবেশে বসে যে আধুনিক সাহিত্য রচিত হচ্ছে, তার মধ্যে যে ক্ষয়িষ্ণু সময়ের ইতিবৃত্ত উঠে আসবে, তা-ই স্বাভাবিক। যে জীবন বাস্তবের, যে জীবন বাস্তব সংলগ্ন স্বপ্নের হাত ধরাধরি করে চলেছে অবিরত, সে জীবনে ছড়িয়েছিটিয়ে থাকবে দ্বন্দ্ব এবং সেই দ্বন্দ্বের প্রকাশ। সেখানে সংকট থেকে উত্তরণের পথ খুঁজে চলা চলতে থাকবে অবিরত। একজন আধুনিক মানুষ যে মুহূর্তে কোনো মতাদর্শের কাছাকাছি যাবেন, সেই মুহূর্তে সেই মতাদর্শের একটা বিপরীত মতাদর্শ তৈরি হবে তার মনে এবং সেখান থেকে তৈরি হবে সংশয়, সংঘাত। জ্ঞাতা আর জ্ঞেয়'র উজ্জ্বল অনতিক্রম্য ব্যবধানে থেকে যায় জ্ঞান, যা খানিক অস্পর্শ। তেমনি সংশয় আর সমাধানের মাঝে যে অসেতুসম্ভব দূরত্ব, তার মাঝামাঝি দাঁড়িয়ে থাকেন যিনি, তিনিই একজন আধুনিক মানুষ। সময়ের আয়নায় ধরা পড়ে সাহিত্যের অবয়ব, সময়ের রূপরেখা পরিবর্তনের সাথে সাথে তাই পাল্টাতে থাকে সাহিত্যও। কথাশিল্পী আখতারুজ্জামান ইলিয়াস ১৯৬৯ সালের বাংলাদেশের এক উত্তাল সময়ের দর্পণে দাঁড়িয়ে রচনা করেছেন 'চিলেকোঠার সেপাই', আর এই আখ্যান যথার্থভাবেই হয়ে উঠতে পেরেছে সময়ের আখ্যান। আধুনিক সাহিত্যে দ্বন্দ্বমুখর

বাস্তবতার বিনির্মাণের প্রবণতা ধরা পড়ে এ উপন্যাসের প্রায় প্রতিটি পরতে পরতে। যে জীবন ফড়িঙের, দোয়েলের, মানুষের সাথে তার দেখা হয়না বটে, কিন্তু জীবনের অর্থ, কীর্তি, স্বচ্ছলতার গণিতকে পরাস্ত করে কখনো কখনো রক্তে যে খেলে যায় 'বিপন্ন বিস্ময়', সেই বিপন্ন বিস্ময় থেকে মানুষ বলেই হয়তো তার কোনো পরিত্রাণ মেলেনা। 'চিলেকোঠার সেপাই' উপন্যাসের আখ্যানভাগ মনুষ্যজীবনের এই তীব্র তীক্ষ্ণ বেদনাময় দ্বন্দ্বসংকুল বিপন্ন বাস্তবের নির্মাণ করে চলে বলেই হয়তো আধুনিক উপন্যাসের প্রবণতা বিচারে আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের 'চিলেকোঠার সেপাই' হয়ে ওঠে শতকের অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপন্যাস।

গ্রন্থপঞ্জি :

১. আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, *চিলেকোঠার সেপাই*, ষষ্ঠদশ মুদ্রণ, ঢাকা: দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ২০১২।

২. আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, *সংস্কৃতির ভাঙা সেতু*,দ্বিতীয় মুদ্রণ, ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, ১৯৯৯।

৩. তন্ময় মালাকার (সম্পা.), *চিলেকোঠার সেপাই: স্বাতন্ত্র্যের সন্ধানে*, প্রথম সংস্করণ, কলকাতা: পরম্পরা, ২০১৮।

অহিংসা ও সত্যের উত্তরাধিকার : ভারতীয় সমাজ ও গান্ধিজি

অজয় কুমার দাস
অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, বিবেকানন্দ মিশন মহাবিদ্যালয়
চৈতন্যপুর, হলদিয়া, পূর্ব মেদিনীপুর

।। এক ।।

" ন বা অরণ্যানি র্হন্তন্যশ্চেন্নাভিগচ্ছতি।

স্বাদোঃ ফলস্য জগ্ধ্বায় যথাকামং নি পদ্যতে।।
আঞ্জনগন্ধিং সুরভিং বহ্বন্নামকৃষীবলাম্।
প্রাহং মৃগাণাং মাতরমরণ্যানিমশংসিষম্।।"(১)

অরণ্যানী হিংসা করেন না। তিনি রক্ষাকর্তী। অরণ্যানী, কোন প্রাণীকে বধ করেন না। অন্যান্য পশু না এলে সেখানে কোন আশঙ্কা নেই। সেখানে সুস্বাদু ফল ভক্ষণ করে অতি সুখে কালক্ষেপ হয়। মৃগনাভির মত অরণ্যানীর অনেক সৌরভ। সেখানে আহার বিদ্যমান আছে। অরণ্যানী হরিণদের মাতৃরূপা। ঋগ্বেদে অরণ্যানী এবং বনদেবীর মধ্য থেকে প্রাচীন বৈদিক ঋষি পবিত্র অহিংসা মন্ত্র শুনিয়েছেন আবহমান জগতের সমস্ত মানবপুত্রকে।

অহিংসা ভারতীয় জীবনবোধের অন্তর্নিহিত সত্যমন্ত্র। ফল্গুধারার মত ভারতীয় সমাজের তন্ত্রীতে-তন্ত্রীতে, ধমনীতে-ধমনীতে অনুরণিত হয়। গীতায় বলা হয়েছে, হিংসা শাস্ত্রবিহিত নয়। হিংসা পরিত্যাগ করাই অহিংসা। অশাস্ত্রীয় প্রাণী পীড়ন, তার যে অভাব তার নাম অহিংসা। আর একটি শব্দ 'শৌচমার্জ্জবম্' –সোজাসুজি ভাবে যে বিহিত কর্মে প্রবৃত্ত হওয়া এবং নিষিদ্ধ কর্ম থেকে নিবৃত্ত হওয়া তাইই হচ্ছে শারীর আর্জব। আর ব্রহ্মচর্য! নিষিদ্ধ মৈথুন থেকে নিবৃত্তির নাম ব্রহ্মচর্য –

"দেব-দ্বিজ-গুরুপ্রাজ্ঞপূজনং শৌচমার্জ্জবম্।
ব্রহ্মচর্য্যমহিংসা চ শারীরং তপ উচ্যতে।।(২)

- অর্থাৎ দেব, দ্বিজ, গুরু ও তত্ত্ববিদ্গণের পূজা, শৌচ, সরলতা, ব্রহ্মচর্য ও অহিংসা – এগুলি 'শারীর তপ' বলে কথিত হয়। লোভ এবং হিংসায় কখনো মহতী লাভ হয় না। লোভ এবং হিংসায় আচ্ছন্ন দুর্যোধন মনে করেছেন, পাণ্ডবদের জয় করলে সমস্ত পৃথিবীই তিনি অধিকার করতে পারবেন। মহাভারতকার লিখেছেন –

"এতেষু বিজিতেষ্বদ্য ভবিষ্যতি মহী মম।
সর্ব্বে চ পৃথিবীপালা: সভা সা চ মহাধনা।।(৩)

হিংসা এবং অন্যায়ের পথ ধরে সমগ্র পৃথিবীকে পরাভূত করতে চেয়েছেন দুর্যোধন। পরিণামে, মহাভারতের উপসংহারে তা মান্যতা পায়নি। ঘটেছে বিনাশ। কখনো সখনো পুত্রকে যুদ্ধ থেকে নিবৃত্ত করতে চেয়েছেন ধৃতরাষ্ট্র। দুর্যোধনকে তিনি বুঝিয়েছেন, যুদ্ধ থেকে নিবৃত্ত হও। কারণ বিচক্ষণ ব্যক্তি কোন অবস্থাতেই যুদ্ধের প্রশংসা করেন না –

"দুর্য্যোধন ! নিবর্ত্তস্ব যুদ্ধাদ্ভরতসত্তম।
ন হি যুদ্ধং প্রশংসন্তি সর্ব্বাবস্থমরিন্দম !"।।[৪]

দুর্যোধন ঘোষণা করেছেন, যে তিনি জীবিত থাকতে পাণ্ডবেরা আর কখনো সে রাজ্যাংশ পাবেন না। -

"রাজ্যাংশশ্চাভ্যনুজ্ঞাতো যো মে পিত্রা পুরাহভবৎ।
ন স লভ্যঃ পুনর্জাতু ময়ি জীবতি কেশব !"[৫]

অবশেষে দুর্যোধন জানিয়েছেন, তীক্ষ্ণ সূচির অগ্রভাগ দ্বারা ভূমির যতটুকু স্থান বিদ্ধ হয়, তাও আমি পাণ্ডবদের দেব না –

"যাবদ্ধি তীক্ষ্ণয়া সূচ্যা বিধ্যেদগ্রেণ মাধব!।
তাবদপ্যপরিত্যাজং ভূমের্নঃ পাণ্ডবান্ প্রতি।।"[৬]

ভারতবর্ষে অহিংসার মন্ত্র উচ্চারিত হয়েছে বার বার। জৈন ধর্মে অহিংসার কথাই বলা হয়েছে। মহাবীর অহিংসার মন্ত্র শুনিয়েছেন পৃথিবীবাসীকে। 'The Cultural Heritage of India' (Vol. 1) – গ্রন্থের 'Jainism : Its History, Principles, and Precepts' – প্রবন্ধে Hiralal Jain (M.A.,D. Litt) লিখেছেন –" The most important vows of a householder are five, namely, he shall not do violence to other living beings; he shall speak the truth; he shall not Commit theft; he shall not Commit adultery; and he shall set a limit to his greed for worldly possessions. These are respectively called the vows of ahimsa, staya asteya, brahmacarya, and aparigraha."[৭] মহাবীর হিংসা বর্জন করার কথা বলেছেন। Hiralal Jain লিখেছেন – "Piercing, binding, overloading, and starving animals are all forms of himsa, and should be avoided."[৮]

আর ভগবান বুদ্ধের সময়ে সাধারণ মানুষ প্রাণীহত্যাকেই আত্মশুদ্ধির উপায় হিসেবে মনে করতেন। নানা কীট পতঙ্গকে মেরে তারা আত্মশুদ্ধির পথ প্রশস্ত করতেন। 'ভুরিদত্তজাতক' –এর ৯০৩ সংখ্যক শ্লোকে পাওয়া যাচ্ছে যে, কীট, পতঙ্গ, সাপ ব্যাঙ, কৃমি ও মাছি মারলে মানুষ ও প্রাণী শুদ্ধ হয়, এমন অনার্য ও মিথ্যা ধর্ম কম্বোজের সাধারণ লোকেরা মেনে থাকেন –

"কীটা পতঙ্গা উরগা চ ভেকা
হন্তা কিমিং সুজমতি মক্খিকা চ।

এতে হি ধম্মা অনরিয়রূপা
কম্বোজকানং বিতথা বহুন্নং।।”[৯]

ভগবান বুদ্ধ মনে করেছেন, হিংস্র মানুষ অপরকে হত্যা করেও নিজে সুখী হতে চায়। পৃথিবীতে দুঃখ এবং যন্ত্রণা আছে ঠিকই,কিন্তু সেই দুঃখকে দূর করার জন্য হত্যা কোন পথ নয়। ধর্মানন্দ কোসম্বী তাঁর ‘ভগবান বুদ্ধ’ গ্রন্থের ‘চারটি আর্যসত্যের ব্যাখ্যা’- অংশে লিখেছেন – “পৃথিবীতে যে দুঃখ আছে, এ কথা কেহই অস্বীকার করিতে পারে না। কিন্তু সকলেই নিজ নিজ দুঃখ কী করিয়া নষ্ট হইবে, শুধু এই চিন্তাই করে। ইহার ফল এই যে, অপরকে মারিয়াও প্রত্যেক ব্যক্তি নিজে সুখী হইতে চায়। ইহাদের মধ্যে যাহারা হিংস্র প্রকৃতি ও বুদ্ধিমান, তাহারা নেতা হয়। আর অন্য সকলকে তাহাদের অধীন হইয়া থাকিতে হয়। ইহাদের বুদ্ধ হিংসাপ্রধান বলিয়া, এইসব নেতাদের মধ্যেও একতা থাকে না। এবং তাহাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বেশি হিংস্র প্রকৃতি ও বুদ্ধিমান নেতাকে নিজেদের রাজা করিয়া, তাহারই কথামতো সকলকে চলিতে হয়।”[১০] জৈন ধর্ম এবং বৌদ্ধ ধর্মের ভিত্তি যে অহিংসা, ব্রহ্মচর্য, সংযম এবং আত্মোৎসর্গের মধ্যে নিহিত রয়েছে, তা স্পষ্ট করেছেন Damodar Dharmanand Kosmbim তাঁর ‘Indian History’ গ্রন্থে। তিনি লিখেছেন –“Even the most passive of the sects above repudiated the use of ritual sacrifice, while the most active like Jainism and Buddhism based themselves upon ahimsa, “non-killing”, as Strongly opposed to war as to ritual sacrifice.”[১১] অহিংসা বৌদ্ধধর্মের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। P.V.Bapat তাঁর ‘The Cultural Heritage of India’- গ্রন্থের ‘Schools and Sects of Buddhism;- প্রবন্ধে লিখেছেন – “The Buddha’s teaching (Dhamma) also is very simple and ethical: ‘to abstain from evil to accumulate what is good, and to purify one’s mind.”[১২]

ভারতীয় জীবন চর্যায় অহিংসার বোধ একটি মৌল প্রাণ-প্রেরণা। অহিংসা ভারতীয় সংস্কৃতির অন্তর্নিহিত শক্তি। ঐতিহ্য এবং উত্তরাধিকার সূত্রে অধীত এই প্রত্যয়ী ধারণাটি মানব সভ্যতায় মানুষের যথার্থ মানুষ হওয়ার সাধনাকে ক্রমপ্রসারিত করেছে। মানুষ আজও যথার্থ মানুষ হয়ে ওঠে নি। মানুষ মানুষ হওয়ার জন্য সাধনা করেছে। কবে যে সে সাধনা সম্পূর্ণ হবে আমরা জানি না। কিন্তু বাস্তবের এই সমাজ-সংসারে দ্বন্দ্ব-দীর্ণ কন্টকাকীর্ণ চড়াই-উৎরাইয়ে অহিংসার বোধ আজও মানুষকে শান্ত শীতলতা দেয়। অহিংসা যে সংগ্রামের সুনিপুণ তীক্ষ্ণ আয়ুধ হতে পারে, সেকথা পৃথিবীবাসীকে জানিয়েছেন ভারতীয় প্রজ্ঞা মহাত্মা গান্ধী। সংগ্রামের বিস্তৃত ভূমিতে কঠিন পথে যাত্রা করেছেন তিনি অহিংসা ব্রত দিয়ে। আর টলস্টয় যুদ্ধক্ষত ইউরোপের সমাধিভূমিতে দাঁড়িয়ে আক্রমণহীন অহিংস সংগ্রামের মধ্য দিয়ে যুদ্ধজয়ের গৌরবগাথা শুনিয়েছেন তার ‘ওয়ার অ্যাণ্ড পীস’ (‘War and Peace’) উপন্যাসে। সর্বোপরি

রবীন্দ্রনাথ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের বৈনাসিক কালবেলায় মৃত্যু সমুদ্রের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে 'বলাকা' কাব্যের ৩৭- সংখ্যক 'ঝড়ের খেয়া' কবিতায় লিখেছেন –

"বীরের এ রক্তস্রোত, মাতার এ অশ্রুধারা
এর যত মূল্য সে কি ধরার ধুলায় হবে হারা।
স্বর্গ কি হবে না কেনা।
বিশ্বের ভাণ্ডারী শুধিবে না
এত ঋণ?
রাত্রির তপস্যা সে কি আনিবে না দিন।
নিদারুণ দুঃখরাতে
মৃত্যুঘাতে
মানুষ চূর্ণিল যবে নিজ মর্তসীমা
তখন দিবে না দেখা দেবতার অমর মহিমা?"(১৩)

পাপ পুণ্যের ধারণা ভারতীয়দের অস্থি-মজ্জায় লালিত। হিংসা পাপ। অহিংসা ব্রত ঈশ্বর উপাসনার প্রশস্ত বাতায়নে মঙ্গল আলোক ফেলে। অতএব তাঁর উপাসনা করো। ধ্যানের উপাসনা করো। 'ছান্দোগ্য উপনিষদ'- এ বলা হয়েছে – ক্ষুদ্র, কলহপ্রিয়, ক্রুর, কুৎসাপ্রিয় এবং কপট ব্যক্তি মহত্ত্ব লাভ করতে পারেন না। মানুষের মধ্যে যিনি মহত্ত্ব লাভ করেন, তিনিই ধ্যান ফলের অংশ লাভ করেন। যারা শ্রেষ্ঠ তারাই ধ্যান ফলের অংশী হন। এই ধ্যানের উপাসনা করো। -"মনুষ্যাণাং মহত্ত্বাং প্রাপ্লুবন্তি ধ্যানাপাদাংশা ইবৈব ভবন্ত্যথ যে অল্পাঃ বলহিনঃ পিশুনা উপবাদিন স্থেহথ যে প্রভবো ধ্যানাপাদাংশা ইবৈব তে ভবন্তি ধ্যানমুপাসস্বেতি।"(১৪)

যুদ্ধ এবং মৃত্যুর বহ্নি উৎসবে কেবলই রক্তের হোলিখেলা। যুদ্ধক্ষত ইউরোপের বধ্যভূমিতে দাঁড়িয়ে এলিয়ট দূর ভারতবর্ষের প্রাচীন বৈদিক ঋষির শান্তিমন্ত্র শুনেছেন। যুদ্ধের রণডঙ্কা, ধ্বংস, আর্তনাদ, সৈনিকের মৃত্যু যন্ত্রণা। তবুও ভোরের সূর্যোদয় দেখেন কবি। ভারতবর্ষ থেকে উৎসারিত জ্যোতির আলোক। ঐ শোনা যাচ্ছে ঋষি মন্ত্র, 'বৃহদারণ্যক' উপনিষদ-এর বাণী; "দত্তা দয়াধ্বম-দময়ত; দান কর – দয়া কর- দমন কর – " দ দ ইতি দাম্যত দত্ত দয়ধ্বমিতি তদেতন্ত্রয়ং শিক্ষেদ্দমং দানং দয়ামিতি।"(১৫) আর ইউরোপের কবি টি.এস. এলিয়ট তাঁর 'The Waste Land' কাব্যের সমাপ্তিতে চিত্রিত করলেন পুণ্যতোয়া গঙ্গার চিত্ররূপ। গঙ্গা শুকনো হয়ে গেছে । গাছের পাতা নিস্প্রভ, প্রাণহীন। পাতাগুলি যেন বৃষ্টির জলের ধারা গ্রহণের জন্য অপেক্ষা করছে। তবুও দেখা যায় কালো মেঘের দল দূর হিমবন্তের উপর দাঁড়িয়ে। মোরগের ডাকে ঊষার পদধ্বনি। এলিয়ট লিখলেন –

"Datta, Dayadhvam, Damyata.
Shantih Shantih Shantih"(১৬)

।। দুই ।।

"This ahimsa is the basis of the search for truth. I am realizing every day that the search is vain unless it is founded on ahimsa as the basis of the search for truth. I am realizing every day that the search is vain unless it is founded on ahimsa as the basis."[১৭]

সত্য অনুসন্ধানের মূলে আছে অহিংসা। তিনি মহাত্মা গান্ধী। তিনি জাতির জনক। তিনি প্রতি মুহূর্তে অনুভব করেছেন, যদি অহিংসার ব্যবহার না হয়, তবে সত্য লাভ হয় না। ব্যক্তি সত্যাগ্রহী হয়ে ওঠেন কঠিন সাধনার দ্বারা। সত্যাগ্রহ অহিংসার বীজ, অঙ্গ বিশেষ। সুদূর দক্ষিণ আফ্রিকার জোহানেসবার্গে বসে দরিদ্র ভারতীয় অন্ত্যজ কুলি-মজুর এবং কালো মানুষদের হয়ে লড়াই করতে গিয়ে এমন উপলব্ধি হয়েছিল স্বয়ং গান্ধির। তবুও অহিংসা- ধর্মবোধ এবং সত্য –শিক্ষা গান্ধি তাঁর কৈশোরক কালেই লাভ করেছিলেন। তাঁর ধমনীতে লালিত ছিল অহিংসা মন্ত্র। পিতা মাতার প্রভাব, গ্রন্থপাঠ, বিশেষত মাতা পুতলীবাঈয়ের ব্রত পালন, সর্বোপরি সংযমের শীলিত তপশ্চর্যা তাকে সত্যধর্ম, ব্রহ্মচর্য এবং অহিংসা ব্রতে প্রাণিত করেছিল। তিনি হয়ে উঠেছিলেন অহিংসা ও আদর্শ সত্যাগ্রহী। ভারতীয় জাতির ঋষি সুলভ প্রজ্ঞা তিনি।

ভারতীয় সত্তার প্রতিনিধি হওয়ার জন্য গান্ধিকে জীবনব্যাপী তপস্যা করতে হয়েছে। তাঁর সাধনার শেকড় প্রোথিত হয়েছিল ভারতীয় সমাজের মর্মমূলে। জীবনলব্ধ সাধনায় তিনি হয়ে উঠেছিলেন জাতির জনক। তাঁর শৈশবকাল ছিল অভ্যাসযোগের শাস্ত্রীয় অনুশীলন। মহাত্মার পিতা করমচাঁদ বা কাবা গান্ধির ছিল অনেক সদ্‌গুণ। তিনি ছিলেন সত্যানুরাগী, সাহসী ও উদার। তিনি ছিলেন ন্যায় বিচারক। তিনি দুর্নীতি এবং ঘুষকে কখনো স্পর্শ করতেন না। আর গান্ধির মাতা পুতলীবাই ছিলেন সাধ্বী রমণী। তিনি ছিলেন অত্যন্ত ধর্মপরায়ণ। পুজো শেষ না করে তিনি কখনো আহার করতেন না। তিনি বৈষ্ণব মন্দিরে যেতেন। তিনি নিষ্ঠার সঙ্গে 'চাতুর্মাস্য ব্রত' পালন করতেন। গান্ধি তাঁর আত্মজীবনী গ্রন্থে লিখেছেন, তিনি চান্দ্রায়ণ ব্রত পালন করতে গিয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েন, তবুও তিনি ব্রত ভঙ্গ করেন নি। পরপর তিনি দু'তিন বার উপবাস করতেন।সূর্যদেবকে দর্শন না করে তিনি আহার করতেন না। মাতার কাছ থেকে গান্ধী শিখেছিলেন ব্রহ্মচর্যের প্রথম পাঠ।

গান্ধি প্রথম জীবনে ধর্ম শিক্ষা লাভ করেছিলেন চারপাশের সমাজ পরিবেশ থেকে। সেই ধর্ম ছিল উদার। মহাত্মা সেই ধর্মের অর্থ নির্ণয় করেছেন, আত্মোপলব্ধি – আত্মজ্ঞান – "The term 'religion' I am using in its broadest sense, meaning thereby self – realization or knowledge of self."[১৮] গান্ধি ধর্ম-দর্শনের প্রথম পাঠ নিয়েছিলেন বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের কাছ থেকে। তিনি রামায়ণ শুনতেন। রামায়ণ পাঠে আনন্দ পেতেন। তিনি মনে করতেন, তুলসীদাসের রামায়ণ ভক্তিমার্গের সর্বোত্তম গ্রন্থ। হিন্দু ধর্মের পাঠ নিয়েছিলেন তিনি পিতার কাছ থেকে। এছাড়া তাঁর

পিতার পারিবারিক বন্ধু ছিলেন জৈন ধর্মাবলম্বী, মুসলমান এবং পারসিক ধর্মাবলম্বী সহৃদয় ব্যক্তিবর্গ। পরবর্তীকালে তিনি খ্রীষ্ট ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে ওঠেন। মনু-স্মৃতি তিনি পড়েছিলেন। কিন্তু মনু-স্মৃতি থেকে তিনি অহিংসার শিক্ষা লাভ করতে পারেন নি। তাঁর আত্মজীবনী গ্রন্থে তিনি লিখেছিলেন –

" Manusmriti at any rate did not then teach me Ahimsa." (১৯)

কিন্তু একটি গুজরাটী নীতিকথা গান্ধির হৃদয়ে চিরন্তন হয়ে গেল। অপকারের বদলে অপকার ফিরিয়ে দিতে নাই। অপকারের বদলে উপকারের উপহার বিনিময়ই শ্রেয় –

"And return with gladness good for evil done."(২০)

গান্ধির অহিংসা ব্রতে গীতার প্রভাব অশেষ, গীতার একটি শ্লোকে উল্লিখিত আছে, আসক্তি থেকে কামনা হয়। কামনা থেকে ক্রোধ জন্মে, ক্রোধ থেকে মূঢ়তা, মূঢ়তা থেকে ভ্রান্তি, আর ভ্রান্তি থেকে বুদ্ধিনাশ হয়। সুতরাং বুদ্ধিভ্রংশ ব্যক্তি মৃতের সমান। গীতার শ্লোক উল্লেখ করেছেন মহাত্মাজী, শ্রীমদ্ভাগবদগীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৬৩ সংখ্যক শ্লোকে উল্লিখিত আছে –

"ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেসূ পজায়তে।
সঙ্গাৎ সংজায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধহভিজায়তে।।
ক্রোধাদ্ভবতি সংমোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ।
স্মৃতিভ্রংশাৎ বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি।।"(২১)

গান্ধিজি উক্ত শ্লোকের অনুবাদে লিখলেন –

"Lets noble purpose go, and saps the mind,
Till purpose, mind, and man are all Undone"(২২)

গান্ধিজি গীতা থেকেই ব্রহ্মচর্যের প্রেরণা লাভ করেছিলেন। ব্রহ্মচর্য ব্রত থেকে তিনি সংযমের আত্মশক্তি লাভ করেছিলেন। গান্ধিজি 'Brahmacharya I' প্রবন্ধে লিখলেন – মানুষ ব্রতের বন্ধন না লইলে মোহের বন্ধনে পড়ে – "I realized that in refusing to take a vow man was drawn into temptation." (২৩) আর গান্ধিজি ব্রহ্মচর্য বলতে বুঝিয়েছেন, সংযম। মহাত্মার কাছে ব্রহ্মচর্যের অর্থ – মন, বাক্য ও দেহের, এককথায় সর্ব-ইন্দ্রিয়ের সংযম। গান্ধিজি তাঁর আত্মজীবনী 'The Story of my Experiments with Truth' - গ্রন্থের 'Brahmacharya II' অধ্যায়ে লিখেছেন – "Brahmacharya means Control of the senses in thought, word and deed."(২৪) আমৃত্যু মহাত্মাজি মানুষের মুক্তি খুঁজেছেন অহিংসা ও সত্যকে অবলম্বন করে।

।। তিন ।।

দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ১৯১৫ সালের ৯ জানুয়ারী গান্ধিজি দেশে ফিরলেন। ঐ একই বছরে গোপালকৃষ্ণ গোখলের তত্ত্বাবধানে স্থির হয়, গান্ধির নেতৃত্বে ভারতের স্বাধীনতা

সংগ্রাম পরিচালিত হবে। ১৯১৯ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে গান্ধিজি সত্যাগ্রহ আন্দোলন শুরু করেন। ১৯২০ সালে গান্ধিজি অসহযোগ আন্দোলনের মাধ্যমে যে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম পরিচালিত হবে, তাঁর খসড়া প্রস্তুত করেন। সত্যাগ্রহ কী? গান্ধিজি ১৯২০ সালের ৯ই জানুয়ারী Disorders Enquiry Committee-র প্রেসিডেন্ট লর্ড হান্টার সাহেবের উপস্থিতিতে বলেছিলেন সত্যাগ্রহ হল সহিংস আন্দোলনের বদলে অহিংস আন্দোলনের প্রক্রিয়া। এই অহিংসা পরিপূর্ণ সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। সত্যাগ্রহীকে নিশ্চয়ই অহিংস, সত্যনিষ্ঠ এবং ঈশ্বর অনুরাগী হতে হবে। গান্ধি মনে করেছেন, সত্যাগ্রহের মাধ্যমেই অহিংস সমাজের জন্ম হতে পারে। ১৯৩১ সালে গান্ধিজি গোলটেবিল বৈঠকে যোগদান করতে গিয়ে বলেছিলেন – "আগামী দিনের পৃথিবীতে যে সমাজ হবে বা যে সমাজ হওয়া উচিত তার আধার হবে অহিংসা"[২৫]। সত্যাগ্রহ আন্দোলন মানব সমাজে সত্য ধর্ম এবং অহিংসা প্রতিষ্ঠিত করতে সমর্থ। সত্যাগ্রহী পারেন এমন আদর্শ সমাজ প্রতিষ্ঠিত করতে। কেমন হবেন সত্যাগ্রহী, তিনি হবেন ক্রোধশূন্য। তিনি সমস্ত আঘাত সহ্য করবেন। কিছু প্রতিঘাত করবেন না। কারাবরণ করবেন, কিন্তু অপমান করবেন না। ঈশ্বর নির্ভর হবেন। গান্ধি সত্যাগ্রহীদের জন্য এগারটি ব্রতের উল্লেখ করেছেন। সেগুলির মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ প্রথম তিনটি হল – সত্য, অহিংসা এবং ব্রহ্মচর্য। অহিংসা এবং সত্য পরস্পরাশ্রয়ী। মানবপ্রেমই প্রকৃত অহিংসা। অহিংসার পথেই সত্যকে লাভ করতে হয়। আবার সত্য অনুসন্ধানের পথেই ব্রহ্মকে লাভ করতে হয়। গান্ধিজি আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। সেই আশ্রমের নাম তিনি দিয়েছিলেন সত্যাগ্রহ আশ্রম। জীবনভোর অক্লান্ত সত্যান্বেষণের প্রায়োগিক রূপ হল এই আশ্রম। গান্ধিজির নির্দেশিত স্বদেশি একাদশ ব্রত পালন করতেন আশ্রমিকেরা। গান্ধিজি নির্দেশিত একাদশ ব্রতগুলিকে কবিতায় রূপ দিয়েছিলেন বিনোবাজি। শ্রদ্ধেয় চারুচন্দ্র ভাণ্ডারি মহাশয় সেই শ্লোকগুচ্ছের বাংলা অনুবাদ করেছিলেন –

"অহিংসা সত্য অস্তেয় ব্রহ্মচর্য অসংগ্রহ
শরীর- শ্রম অস্বাদ সর্বত্র ভয়-বর্জন,
সর্ব-ধর্মে সমানত্ব স্বদেশি স্পর্শ ভাবনা,
বিনম্র নিষ্ঠায় সেব্য এই একাদশ ব্রত।"[২৬]

হিংসা ব্যক্তি থেকে গোষ্ঠীতে এবং এক সম্প্রদায় থেকে ভিন্ন সম্প্রদায়ে ছড়িয়ে পড়ে। সাম্প্রদায়িক হিংসা সমগ্র সমাজ দেহকে মলিন করে। অহিংসা ব্রতই সত্যাগ্রহীর মূল মন্ত্র। অনশন হল অহিংস এবং সত্য প্রয়োগের অন্তিম আয়ুধ। শাসকের শোষণ, অবিচার এবং অন্যায়ের প্রতিবাদ হল অহিংস এই অনশন। অনশনের মধ্য দিয়েই ন্যায় প্রতিষ্ঠার মহতী স্বপ্ন রচনা করেছেন গান্ধি। হিংসার বৃহত্তর তাৎপর্যকে চিহ্নিত করেছেন তিনি। আঘাত করা তো বটেই, অপকারের চিন্তা, খারাপ পরামর্শে প্ররোচিত করা, অপরের ক্ষতি সাধন করা, মিথ্যা কথন, কু-চিন্তন, উত্তেজনা এগুলিকেও হিংসা বলে চিহ্নিত করেছেন গান্ধিজি।

।। চার ।।

মহাত্মাজির অহিংস রাজনৈতিক চিন্তার একটি মাইলস্টোন রূপে চিহ্নিত হয়ে আছে ‘হিন্দ স্বরাজ’ (Hind Swaraj’), যা ‘ইণ্ডিয়ান হোম রুল’ ‘Indian Home Rule’ – নামেও খ্যাত। দক্ষিণ আফ্রিকায় সাধারণ ভারতীয় এবং নিম্নবর্গীয় কালো মানুষদের জন্য মুক্তমনা গান্ধি সুকঠোর লড়াই করেছিলেন। ‘হিন্দ স্বরাজ’- এর প্রেক্ষাপট রচনার উৎসরূপে চিহ্নিত করা যায় তাঁর আশৈশব লালিত কঠোর তপশ্চর্যা এবং দক্ষিণ আফ্রিকার কালো মানুষদের প্রতি অসীম মমত্ববোধ। সহজ মানবপ্রেম তাকে প্রেরণা দিয়েছিল ‘হিন্দ-স্বরাজ’- এর মত তাত্ত্বিক রাজনীতি নির্ভর গ্রন্থ লিখতে। দক্ষিণ আফ্রিকায় আন্দোলন করতে গিয়ে গান্ধিজির রাজনৈতিকবোধ পূর্ণতা পায়। ইংরেজদের অসংগত কালা আইনের প্রতিবাদে গান্ধি ১৯০৯ সালে ইংল্যাণ্ড যাত্রা করেন। ইংল্যাণ্ড প্রত্যাবর্তন কালে তিনি গুজরাটিতে লিখে ফেলেছিলেন – ‘হিন্দ স্বরাজ’। ও প্রসঙ্গে মহাত্মাজি লিখেছেন – “I have been working very hard on the steamer and have given myself no rest. ...... I have translated a long letter from Tolstoy and written an original book in Gujarati.”[২৭]

‘হিন্দ স্বরাজ’ - এই ছোট্ট রাজনৈতিক তত্ত্ব-বিষয়ক পুস্তিকা রচনার পর প্রায় সুদীর্ঘ আটত্রিশ বছর সংগ্রাম আন্দোলনের পটভূমিতে গান্ধির রাজনৈতিক চিন্তনের খুব একটা পরিবর্তনের চিহ্ন লক্ষ করা যায় না। গ্রন্থ সংশোধিত বা পরিমার্জিতও করেননি তিনি। ‘হিন্দ স্বরাজ’-এর মূল কথা হল, দুঃখ বরণের তপস্যা ছাড়া কোন জাতি সম্পূর্ণ হয়ে ওঠে না। তিনি মনে করেন, দুঃখকে সাধনার বস্তু করে তবেই স্বরাজ লাভ সম্ভব। আত্ম-সংযম এবং আত্ম-উপলব্ধিই হল প্রকৃত স্বরাজ। স্বরাজ লাভের উপায়? গান্ধি সে পথও নির্দেশ করে দিয়েছিলেন সহজভাবে। অহিংসা মন্ত্র, অসহযোগিতা, আধ্যাত্মিক শক্তি এবং ভালবাসার হৃদয় – এগুলিই সত্যাগ্রহীর স্বরাজ লাভকে ত্বরান্বিত করে। কেবল আত্মনির্ভর এবং স্বদেশপ্রেমে উদ্বোধিত ভারতীয় স্বরাজের শক্তি অর্জন করতে পারেন। অন্তরে স্বদেশিয়ানা বা দেশপ্রেমের মন্ত্রে উদবুদ্ধ না হলে স্বরাজ লাভ হয় না। এই রাজনৈতিক মতামত সম্বলিত গ্রন্থলেখার কয়েকবছর পরেই ১৯১৫ সালে গান্ধিজি স্থায়ীভাবে ভারতে চলে আসেন। এই গ্রন্থে পৃথিবীর পীড়িত জাতির সংগ্রামের ইতিহাসে সংযোজিত হল নতুন অধ্যায় – ‘হিন্দ স্বরাজ’ (‘Hind Swaraj’) বা ‘ইণ্ডিয়ান হোমরুল’ (‘Indian Home Rule’)। গ্রন্থটি গান্ধির রাজনৈতিক মতামত সম্বলিত এক মহান চিন্তন গ্রন্থরূপে বিবেচিত। গান্ধি তাঁর ‘Indian Home Rule’ (‘Hind Swaraj’) – গ্রন্থে লিখলেন –“But I must frankly confess that I am not so much concerned about the stability of the Empire as I am about that of the ancient civilization of India which, in my opinion, represents the best that the world has ever seen. The British Government in India

Constitutes a struggle between the Modern Civilization, which is the Kingdom of Satan, and the Ancient Civilization, which is the Kingdom of God. The one is the God of war, the other is the God of Love."[২৮] 'হিন্দ স্বরাজ' ('Hind Swaraj') সৃষ্টির অনুপ্রেরণা স্বরূপ টলস্টয় (Talstoy), রাস্কিন (Ruskin), থোরিউ (Thoreau), এমার্সন(Emerson) প্রভৃতি সাহিত্যিক এবং মনীষীদের শ্রদ্ধার সঙ্গে উল্লেখ করেছেন গান্ধিজি। টলস্টয়ের (Tolstoy)- এর 'ওয়ার অ্যাণ্ড পীস' (War and Peace'), 'দ্য কিংডম অফ গড ইজ উইথইন ইউ' (The Kingdom of God is within you) এবং 'দি পাথওয়ে অফ লাইফ' (The Pathway of life') প্রভৃতি গ্রন্থ গান্ধিজিকে 'হিন্দ স্বরাজ' রচনায় প্রেরণা দিয়েছিল। গান্ধি টলস্টয়কে আপন গুরুপদে বরণ করে নিয়েছিলেন। চিরকালই গান্ধিজি টলস্টয়কে শ্রদ্ধা এবং সম্মান জানিয়ে এসেছেন। আর জন রাস্কিনের ছোট গ্রন্থ 'Unto This Last' – এর প্রভাব গান্ধির জীবনে অসামান্য। গান্ধিজি তাঁর 'Indian Home Rule' (Hind Swaraj') –গ্রন্থে লিখেছেন – "Whilst the views expressed in "Hind Swaraj" are held by me, I have but endeavoured humbly to follow Tolstoy, Ruskin, Thoreau, Emerson and other writters, besides the masters of Indian philosophy Tolstoy has been one of my teachers for a number of years."[২৯] গ্রন্থের মুখবন্ধেই (Preface) টলস্টয় 'হিন্দ স্বরাজ' (Hind Swaraj) – রচনার উদ্দেশ্য স্পষ্ট করেছেন। তিনি লিখেছেন, ভারতীয়দের কেন অকারণ ধড়পাকড় করা হবে, কেন গ্রেফতার করা হবে? কেন অধিকার হরণ করা হবে। তাও হিংসার পথে কোন আন্দোলন নয়। কোনভাবেই অধিকারের দাবী আদায় হিংসার পথে নয়। কেননা এভাবে মঙ্গল ও কল্যাণের পথ প্রশস্ত করে না। এই ছিল গান্ধির বিশ্বাস। তিনি লিখেছেন – "I do not know why "Hind Swaraj" has been seized in India. To me, the seizure Constitutes further condemnation of the civilisation represented by the British Government. There is in the book not a trace of approval of violence in any shape or form.[৩০]

গান্ধিজি লক্ষ করেছিলেন, ইংরেজ রাজত্বে ভারতীয়দের অবস্থা দাসদের থেকে বেশি কিছু ছিল না। বছরের পর বছর ভারতীয়দের অর্থ তারা ইংল্যাণ্ডে বয়ে নিয়ে যাচ্ছে। আর ভারতীয়রা অনাথ –আতুর নিম্নবর্গীয় অন্ত্যজ মানুষের মত জীবন কাটাচ্ছে। সহৃদয় মানবতাবাদী গান্ধি প্রত্যক্ষ করেছিলেন সুবৃহৎ আপন জাতির নিষ্করুণ দুরবস্থা। তিনি তাঁর 'Indian Home Rule (Hind Swaraj)' গ্রন্থের 'What is Swaraj?' নিবন্ধে লিখেছেন – "Because India has become impoverished by their Government. They take away our money from year to year. The most important posts are reserved for themselves. We are kept in a

state of slavery. They behave insolently towards as, and disregard our feelings ."[৩১]

ব্যক্তি যখন যথার্থ প্রাপ্তমনস্ক হয়ে ওঠেন, তখন স্বাভাবিকভাবে অন্যায়কে ভয় করেন না। কেবল ভয় করেন ঈশ্বরকে। মানুষের তৈরি নিয়মের বন্ধন তখন তত প্রয়োজন হয় না। স্বরাজ অর্জনে সত্যাগ্রহীকেও এমন ঈশ্বর বিশ্বাসী হতে হয়। গান্ধিজি তাঁর 'Indian Home Rule (Hind Swaraj)' – গ্রন্থের Passive Resistance – অধ্যায়ে লিখেছেন – "A man who has realised his manhood, who fears only God, will fear no one else. Man – made laws are not necessarily binding on him."[৩২] অসহযোগিতাই হতে পারে স্বরাজ লাভের উপায়। গান্ধিজি তাঁর গ্রন্থের 'Passive Resistance' অধ্যায়ে লিখেছেন- "Passive resistance cannot proceed a step without fearlessness. Those alone can follow the path of passive resistance who are free from fear, whether as to their Possessions, false honour, their relatives, the government, bodily injuries, death."[৩৩] গান্ধি তাঁর গ্রন্থের উপসংহারে 'হিন্দ স্বরাজ' ('Hind Swaraj')- এর স্বরাজ প্রসঙ্গে লিখেছেন, স্বরাজ হচ্ছে আত্মশাসন বা আত্মনিয়ন্ত্রণ (self-rule or self-control)। বিদেশী শক্তির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ হবে কেমন? তা হবে নিষ্ক্রিয় (passive resistance) । আর সর্বোপরি সত্যাগ্রহী হবেন স্বদেশী, ব্রহ্মচর্যের সাধনায় আত্মস্থ। তিনি হবেন মানবতাবাদী, আত্মশক্তিতে আস্থাশীল এবং প্রেমের শক্তিতে ভরপুর, প্রাণোচ্ছল, মানবতার মোহন মন্ত্রে উজ্জীবিত। গান্ধী তাঁর 'Indian Home Rule' (Hind Swaraj)' – গ্রন্থে লিখেছেন –

" 1. Real home rule is self – rule or self-control.

2. The way to it is passive resistance: that is soul - force or love-force.

3. In order to exert this force, Swadeshi in every sense is necessary."[৩৪]

গান্ধিজি মনে করেন, প্রতিযোগিতামূলক আধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর ইউরোপীয় সভ্যতায় রয়েছে কেবল শোষণ। উঁচু-নিচু ব্যবধান। নিম্নবর্গীয় অন্ত্যজ মানুষ, নির্জিত লাঞ্ছিত। বড় বড় অট্টালিকার গভীর গহ্বরে তারা চাপা পড়ে গেছে। একেবারে উপরতলার মানুষেরাই এমন সামাজিক অন্যায়ের স্রষ্টা। উকিল, ডাক্তার, বিচারালয় প্রভৃতি ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানগুলি হল সামাজিক অন্যায়ের আতুড়ঘর। তিনি মনে করেছেন, অধর্মের মধ্য থেকে আধুনিক সভ্যতা জন্ম লাভ করতে পারে না। শুধু অন্যায়কারী নন, যিনি অন্যায়কে সাহায্য করেন, তিনিও সমান অপরাধী। গান্ধিজি লিখেছেন, বন্দুক নিয়ে যিনি যুদ্ধ করেন, আর যিনি তাকে সাহায্য করেন, অহিংসার দৃষ্টিতে এই দুটি বিষয়ের মধ্যে

কোন পার্থক্য নেই। গান্ধিজি তাঁর "The Story of my Experiments with Truth An Autobiography" – গ্রন্থে লখেছেন – "I make no distinction, from the point of view of ahimsa between Combatants and non-Combatants."[৩৫] স্বয়ং গান্ধিজি সত্যাগ্রহকে অস্ত্র বলে বলেছেন। তিনি জানিয়েছেন, এই অস্ত্র হল নতুন অস্ত্র – "a novel weapon"[৩৬] হিংসাকে কোন ঘটনার চরম উপায় বলেই মনে করেছেন গান্ধিজি। সত্যাগ্রহ হল শুদ্ধ অহিংস অস্ত্র। এই অস্ত্রের ব্যবহার এবং তার সীমা বুঝিয়ে দেওয়াকে গান্ধিজি আপন ধর্ম বলেই মনে করেছেন। ইংরেজ সরকার শক্তিমান কিন্তু সত্যাগ্রহ আরো শক্তিমান অস্ত্র – "Usually they include Violence as the last remedy. Satyagraha, on the other hand, is an absolutely, non-violent weapon. I regard it as my duty to explain its practice and its limitations. I have no doubt that the British Government is a powerful Government, but I have no doubt also that Satyagraha is a sovereign remedy."[৩৭]

।। পাঁচ ।।

জীবনের সুদীর্ঘ সংগ্রামী যাত্রাপথের অন্তিম পর্যায়ে গান্ধিজি ঈশ্বরের প্রতিই আস্থাশীল থেকেছেন। তিনি লিখেছেন, সত্য ছাড়া অন্য কোন ঈশ্বর আছেন, তা তিনি অনুভব করেন নি। সত্য কেন্দ্রিক জীবনবোধের যাত্রাপথে অহিংসা একটি প্রধান অবলম্বন। সত্যের জ্যোতিলাভ যথার্থই পুণ্যলাভ – সত্যদৃষ্টি পূর্ণ দর্শন। অহিংসা ছাড়া সত্যলাভ সম্ভব নয়। গান্ধিজি তাঁর আত্মজীবনী গ্রন্থের 'Farewell' অধ্যায়ে লিখেছেন –

"My uniform experience has Convinced me that there is no other God than Truth. And if every page of these Chapters does not proclaim to the reader that the only means for the realization of Truth is ahimsa. ..... But this much I can say with assurance, as a result of all my experiments, that a perfect vision of Truth can only follow a complete realization of ahimsa."[৩৮]

সমগ্র জীবনব্যাপীই গান্ধিজি সত্যের অনুসন্ধান করেছেন। সত্যের অনুসন্ধানী তিনি অহিংসার প্রতি আস্থাশীল। গান্ধিজি স্পষ্টভাবেই বলেছেন, আত্মশুদ্ধি ছাড়া সত্যকে লাভ করা অসম্ভব। আর আত্মশুদ্ধি ছাড়া অহিংসার উৎসব ব্যর্থ হয়। গান্ধিজি লিখেছেন – "Identification with everything that lives is impossible without self – purification; without self – purification the observance of the law of ahimsa must remain an empty dream; God can never be realized by one who is not pure of heart. Self – purification therefore must mean purification in all the walks of life. .... But the path of self purification is hard and steep."[৩৯]

গান্ধিজি মনে করেন, ধর্মের সঙ্গে রাজনীতির রয়েছে গভীর যোগ। তিনি স্পষ্ট করে বলেছেন, যিনি মনে করেন, ধর্মের সঙ্গে রাজনীতির সম্পর্ক নেই, তিনি ধর্ম কি তা জানেন না। সত্যের আরাধনাই গান্ধিকে রাজনীতির বৃত্তে টেনে নিয়ে গেছে – "That is why my devotion to Truth has drawn me into the field of politics; and I can say without the slightest hesitation, and yet in all humility, that thouse who say that religion has nothing to do with politics do not know what religion means."(৪০) গান্ধি লিখেছেন, নম্রতার শেষ সীমা হল অহিংসা – "Ahimsa is the farthest limit of humility."(৪১)

গান্ধির কর্ম জীবনের প্রথম পর্বে দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়দের উপর বৈষম্যমূলক আচরণের প্রতিবাদ করেছিলেন তিনি অহিংস আন্দোলন সংঘটিত করে। যা হল 'প্যাসিভ রেজিস্ট্যানস' বা শান্তিপূর্ণ প্রতিরোধ। যা দুর্বলের অস্ত্র ছাড়া আর কিছু নয়। সত্যাগ্রহী একটি আদর্শকে বিশ্বাস করেন, তা হল মানুষ মূলত সৎ এবং প্রেমপূর্ণ। নিরস্ত্র প্রতিরোধের নিদর্শন সাহিত্যে মেলে। শেলীর কবিতায় সত্যাগ্রহ অপূর্ব কাব্যরূপ লাভ করেছে। **১৮১৯** সালে ম্যাঞ্চেস্টারে একটি হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। এই ঘটনার প্রেক্ষিতে শেলীর কলমে লেখা হল ' দ্য মাক্স অফ অ্যানার্কি' ('The Mask of Anarchy') নামের দীর্ঘ কবিতা। কবিতায় আছে সত্য উচ্চারণ, আছে অত্যাচারীর প্রতি ক্ষোভ। কিন্তু নেই - গান্ধির মত ঈশ্বর বিশ্বাসী মন। কবিতার অনুবাদ হতে পারে এরকম –

তোমরা দাঁড়াও, শান্ত প্রতিজ্ঞ, অটল অনড় চিত্তে
নম্র বনানী, ঘন রেখা মূক ভাষা
বাহু ঘেরা বুক চোখের সন্নিপাতে
বিজিত অস্ত্র যুদ্ধের হুংকারে
চকিত দৃষ্টিপাতে, ঝন্‌ঝন্‌ বাজে রণ !

কবি লিখলেন ৭৯ সংখ্যক স্তবকে –

"Stand ye calm and resolute,
Like a forest close and mute,
With folded arms and looks which are
Weapons of unvanquished war."(৪২)

আবারও শেষার্ধে ৮৫ সংখ্যক স্তবকে লিখলেন। কবিতার অনুবাদ হতে পারে এরকম –

চওড়া বুকের ওপর রাখো ভাঁজ করি দৃঢ় বাহু
পলক না ফেলে দেখ দেখ চোখে হত্যার ইতিহাস
ভয়ের কি আছে, অবাক হবে না তবু
মৃত্যু কাটায় পাস! থামাও ওদের।

কবি লিখলেন –

With folded arms and steady eyes,
And little fear, and less surprise,
Look upon them as they slay
Till their rage has died away."[৪৩]

।। ছয় ।।

গান্ধিজি মনে করতেন, প্রত্যক্ষ সংগ্রাম ছাড়া পৃথিবীতে কোন কিছু মানবকল্যাণকামী বদল হয়নি। এই অহিংস সংগ্রামের মধ্যে অসহযোগ, অহিংস আইন অমান্য (সিভিল ডিসওবিডিয়েন্স), কর বন্ধ, পিকেটিং, ধরনায় বসা, আমৃত্যু অনশন প্রভৃতি প্রধান। মনীষী রোম্যা রোল্যাঁ (Romain Rolland) তাঁর 'Mahatma Gandhi' –গ্রন্থে লিখেছেন – "Swaraj can only be attained by soul - force. This is India's real weapon, the invincible weapon love and truth. Gandhi expresses it by the term Satyagraha, which he defines as truth - force and love force."[88] গান্ধি মনে করেন, সত্যাগ্রহ সর্বশ্রেষ্ঠ মানবধর্ম। সমস্ত পৃথিবীবাসীর উদ্দেশ্যে গান্ধী মহত্তর বার্তা পাঠিয়েছেন। আত্মোৎসর্গের সেই বার্তা। মনীষী রোম্যা রোল্যাঁ তাঁর গ্রন্থে লিখেছেন –

"This is the great message to the world, or, as Gandhi puts it, india's message – self – sacrifice. .... Non –violence has come to men, and it will remain. It is the annuniciation of peace on earth. ..... In a mortal half – god the perfect incarnation of the principal of life which will lead a new humanity on to a new path."[৪৫]

মানুষ সর্বশক্তিমান। মানুষের উপরেই বিশ্বাস রাখতে হবে। গান্ধির জীবন এক অনন্ত সংগ্রাম। ভারতবর্ষের আপামর জনসাধারণের নেতা তিনি। তাঁর 'হিন্দ স্বরাজ' শুধু ভারতবাসীর স্বাধীনতা সংগ্রামের অভিমুখ রচনা করে না, সমগ্র মানবজাতির মুক্তির নতুন পথ নির্মাণ করেছেন তিনি। গান্ধিজি লিখেছেন –

'Real Home Rule is possible only where passive resistance is the guiding force of the people. Any other rule is foreign rule."[৪৬]

'বিপ্লব' সমাজ পরিবর্তন নিয়ে আসে। 'প্লব' কথাটির অর্থ লাফিয়ে লাফিয়ে অনেক দূর এগিয়ে যাওয়া। 'বি' – উপসর্গ যোগে শব্দটির অর্থ দাঁড়ায় রাষ্ট্রোপদ্রব, উচ্ছেদ, বিধ্বংস বা অরাজকতা। সাধারণভাবে 'বিপ্লব' শব্দটির অর্থ সহিংসভাবে ক্ষমতা দখল। এমন গতানুগতিক পথকে বর্জন করেছেন গান্ধি। তিনি বুঝেছেন, হিংসার পথ ধরে সমাজের প্রকৃত পরিবর্তন সম্ভব নয়। কিন্তু মানব সভ্যতায় এমনটাই যুগ যুগ ধরে ঘটে চলেছে। গতানুগতিক হিংসার পথে রাষ্ট্রক্ষমতার বদল হয়েছে, কিন্তু মানুষের অন্তর্নিহিত চেতনার পরিবর্তন হয় নি। মানুষের আত্মিক চিহ্নিত পরিবর্তনও ঘটে নি।

যুদ্ধে কারো জয় অথবা পরাজয় ঘটে না। যুদ্ধে ক্ষতি হয় মানব সভ্যতার। যুদ্ধে হিংসাকে হিংসার দ্বারা আঘাত করা হয়। হিংসাশ্রয়ী যুদ্ধ মানবসভ্যতার বড় অভিশাপ। মানবকল্যাণ এবং অহিংসার মধ্যেই গান্ধির শ্রদ্ধাশ্রয়ী বিপ্লবী সত্তার পূর্ণরূপ প্রতিফলিত। নিষ্ক্রিয় তত্ত্বকথায় আবদ্ধ না থেকে মহামানবদের মতই একটি সুবৃহৎ জাতিকে অহিংসার পুণ্যজলে অবগাহন করিয়েছেন মহাত্মাজী। কল্যাণপূত কর্ম এবং সেবাধর্মেই তাঁর সংগ্রামী চরিত্রের আলোকজ্যোতি বিচ্ছুরিত হয়েছে। মহামানবের মত তিনিও মনে করেন সমস্ত মানুষই ঈশ্বরের সন্তান – 'no man is beyond redemption'[৪৭] - কোন মানুষ মানবতা বর্জিত নয়। রুশো (Rousseau) বলেছেন – 'Man is born free and every where he is in chains.'[৪৮] তেমনি মহাত্মা গান্ধিও মনে করেন, কোন মানুষ সমাজ বিরোধী হয়ে জন্মগ্রহণ করেন না। সামাজিক পীড়ন এবং অসম সমাজই দারিদ্র্যের জন্ম দেয়। অসম ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় কোন মানুষ সৎ নয়। ধর্ম মানবসমাজ এবং মানবজাতিকে পরিশীলিত করে। সত্য এবং অহিংসা হল মানব ধর্ম। সাধনার পথে তাকে লালন করতে হয়। মহাজীবনের প্রতিটি পদক্ষেপই সাধনালব্ধ। আজকের যুদ্ধক্ষত পৃথিবীতে শীলিত মানবজাতি মহাত্মা গান্ধির মত মহাজীবনের পদধ্বনির আগমন প্রতীক্ষা করে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'শেষলেখা' কাব্যের '৬ সংখ্যক' কবিতায় লিখেছেন –

"ওই মহামানব আসে;
দিকে দিকে রোমাঞ্চ লাগে
মর্তধূলির ঘাসে ঘাসে।
সুরলোকে বেজে উঠে শঙ্খ,
নরলোকে বাজে জয়ডঙ্ক –
এল মহাজন্মের লগ্ন।"[৪৯]

তথ্যসূত্র :

১। রমেশচন্দ্র দত্ত (অনূদিত), ঋগ্বেদ – সংহিতা, দ্বিতীয় খণ্ড, দশম মণ্ডল, ১৪৬ সূক্ত, হরফ প্রকাশনী, কলকাতা, ১৩৮৫, পৃ. ৬৩৮

২। শ্রীমন মধুসূদন সরস্বতী (অনূদিত), শ্রীমদ্ ভগবদগীতা, সপ্তম অধ্যায়, শ্লোক সংখ্যা -১৪, নবভারত পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০০৬, পৃ. ১০৬১

৩। মহর্ষি – শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস, মহাভারতম্, সভাপর্ব্ব, ৫, সম্পা. - শ্রীমদ্ হরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশ, ভট্টাচার্য, বিশ্ববাণী প্রকাশনী, কলকাতা, ১৩৮৪ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৩৯৪

৪। পূর্বোক্ত, উদ্‌যোগপর্ব্ব, (১৪), পৃ. ৬২০

৫। পূর্বোক্ত, মহাভারতম্, উদ্‌যোগ পর্ব্ব (১৫), পৃ. ১০৫৫

৬। পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৫৬

৭। Hiralal Jain (M.A., D.Litt), Jainism: Its History, Principles, and Precepts, Introduction By –Dr. Sarvepalli Radhakrishnan, The Cultural Heritage of India, Volume I, The Early Phases, The Ramkrishna Mission Institute of Culture, Golpark, Kolkata, 2015, P. 408

৮। Ibid, P. 409

৯। ধর্মানন্দ কোসম্বী, ভগবান বুদ্ধ, ভুরিদত্তজাতক, শ্লোক ৯০৩, অনুবাদ – চন্দ্রোদয় ভট্টাচার্য, সাহিত্য অকাদেমি, রবীন্দ্রভবন, নতুন দিল্লি, ২০১৭, পৃ. ২৫ – গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতিটি গৃহীত

১০। পূর্বোক্ত, চারটি আর্যসত্যের ব্যাখ্যা, পৃ. ৯৩

১১। Damodar Dharmanand Kosambi, Indian History, Popular Prakashan, Bombay, 2002, PP. 166 -167

১২। P.V.Bapat, School and Sects of Buddhism, The Cultural Heritage of India, Volume I, The Early Phases, The Ramkrishna Mission Institute of Culture, Golpark, Kolkata, Introduction by – Dr. Sarvepalli Radhakrishnan, 2015, P. 462

১৩। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ঝড়ের খেয়া (৩৭ সংখ্যক কবিতা), বলাকা (কাব্যগ্রন্থ), রবীন্দ্ররচনাবলী, ষষ্ঠ খণ্ড, বিশ্বভারতী, কলকাতা, ১৪০২, পৃ. ২৮৮

১৪। অতুলচন্দ্র সেন ও অন্যান্য (সম্পা.), ছান্দোগ্য উপনিষদ, ষষ্ঠ খণ্ড, উপনিষদ (অখণ্ড সংস্করণ), হরফ প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৯৪, পৃ. ৬০৬

১৫। অতুলচন্দ্র সেন ও অন্যান্য (সম্পা।), বৃহাদারণ্যক উপনিষদ, উপনিষদ (অখণ্ড), হরফ প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৯৪, পৃ. ৮৩০

১৬। T.S.Eliot, The Waste Land, The Poems of T.S.Eliot, Volume I, II, Faber and Faber Ltd., London 2018, P.71

১৭। Mohandas Karamchand Gandhi, A Tussle with Power, The Story of my Experiments With Truth (An Autobiography), Om Books International, Noida, Uttar Pradesh, India, 2019, p. 307

১৮। ibid, Glimpses of Religion, P. 35

১৯। ibid, P.38

২০। ibid,

২১। শ্রীমদ্ ভগবদগীতা (দ্বিতীয় অধ্যায়, ৬৩), অনু. ও সম্পা. – শ্রীমদ্ মধুসূদন সরস্বতী ও অন্যান্য, নবভারত পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০০৬, পৃ. ২৬৭

২২। Mohandas Karamchand Gandhi, Acquaintance with Religions, The Story of my Experiments with Truth (An Autobiography), Om International, Noida, Uttar Pradesh, India, 2019, P. 75

২৩। ibid, Brahmachary I, P. 228

২৪। ibid, Brahmachary II, P. 233

২৫। কানাইলাল দত্ত, গান্ধী, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০১৯, পৃ. ৬৯

২৬। পূর্বোক্ত, পৃ.৭৪

২৭। M.K.Gandhi, Indian Home Rule (Hind Swaraj), Promilla and Co. Publishers, Bibliophile South Asia, New Delhi and Chicago, 2020, P. 10

২৮। ibid, P. 111

২৯। ibid, P. 110

৩০। ibid

৩১। ibid, What is Swaraj, P. 126

৩২। ibid, Passive Resistance, P.192

৩৩। ibid, P.198

৩৪। ibid, Conclusion, P. 221

৩৫। Mohandas Karamchand Gandhi, A Spiritual Dilemma, The Story of my Experiments with Truth (An Autobiography), Om Books International, Noida, Uttar Pradesh, India, 2019 P. 396

৩৬। ibid, The Rowlatt Bills and My Dilemma, P. 514

৩৭। ibid, was it a Threat? PP. 428-429

৩৮। ibid, P. 567

৩৯। ibid

৪০। ibid

৪১। ibid, P. 568

৪২। Percy Bysshe Shelley, The Mask of Anarchy, Wordsworth Poetry Library, London, 2002, P. 399

৪৩। ibid, P. 400

৪৪। Romain Rolland, Mahatma Gandhi Srishti Publishers, C.R. Park, New Delhi, 2013, P. 36

৪৫। ibid. PP. 138 -141

৪৬। Mahatma Gandhi, The essence of Satyagraha, Satyagraha and Indian self –rule, Chapter XVII, Satyagraha – Soul force . Non-violence as political action, Mahatma Gandhi – The Essential Writings, Edited by – Judith M.Brown, Oxford University Press, United States, New York, 2008, P. 322

৪৭। কানাইলাল দত্ত, গান্ধির জীবনসত্য ও স্বপ্ন, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৪২৫, পৃ. ৩৭৫

৪৮। Jean –Jacques Roussean, This Quote Made Geneva – Born Political Philosopher. The Opening sentence of Rousseau's 'The Social Contact, WWW.thegaurdian.Com Dated – 30/03/ 2022

৪৯। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শেষলেখা, '৬ সংখ্যক' –কবিতা, রবীন্দ্ররচনাবলী (ত্রয়োদশ খণ্ড), বিশ্বভারতী, কলকাতা ১৪০২, পৃ. ১১৮

ইতিহাসের আলোকে মুর্শিদাবাদের বেরা উৎসব

এমিলি রুমি
সহকারী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ
শ্রীপৎ সিং কলেজ, জিয়াগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ

"ভাদ্রমাসের শেষ বৃহস্পতিবারে মুর্শিদাবাদের প্রান্তবাহিনী ভাগীরথীবক্ষে এক অপূর্ব আলোক দৃশ্য নয়নপথে নিপতিত হয়। নিবিড় অন্ধকাররাশিকে দূরদূরান্তরে বিক্ষিপ্ত করিয়া সেই সঞ্চারিণী আলোকমালা ভাগীরথীহৃদয় প্রতিফলত করিতে করিতে, তরঙ্গে তরঙ্গে প্রতিহত হইয়া যখন গমন করিতে থাকে, তখন সে দৃশ্য বড়ই সুন্দর বলিয়া বোধ হয়। শতহস্তপরিমিত আলোকযান অসংখ্য আলোকমালায় বিভূষিত হইয়া ভাসমান, চতুর্দিকে ক্ষুদ্রাকারে সেইরূপ যান, ও শত শত কমল(ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রজ্বলিত কর্পূরপূর্ণ মৃতপাত্র) প্রস্ফুটিত কমলের ন্যায় হাসিতে হাসিতে ভাসিতে থাকে।... মধ্যে মধ্যে আলোকযান হইতে এক এক প্রকারের আতসবাজী সহসা প্রজ্বলিত হইয়া ওঠে। কেহ বা মনস্তাপে ভাগীরথীগর্ভে প্রবেশ করে, কেহ বা অনন্ত স্পর্শ করিবার আশায় নৈশান্ধকারস্তূপ ভেদ করিয়া উঠিতে উঠিতে না জানি কি মর্মবেদনায় ফাটিয়া পড়ে; কেহ বা শত শত আলোকের ফুল ফুটাইয়া চতুর্দিকে ভাসমান কমলরাশিকে উপহাস করিতে থাকে। এই সময় তীর হইতেও নানাবিধ আতসবাজী তাহাদের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় প্রবৃত্ত হয়। তাহাদের মধ্যে কাহারও কাহারও ভীষণ শব্দ নিবিড় মেঘাবৃত অম্বরের অনুহুঙ্কার করিয়া দর্শকবৃন্দকে চমকিত করিয়া তুলে। ভাসমান আলোকযান হইতে সুমধুর বাদ্যধ্বনি ভাগীরথীর জলোচ্ছ্বাসের সহিত মিলিত নীরব দিগন্তে ছড়াইয়া পড়ে।"[১] ঐতিহাসিক নিখিলনাথ রায়ের এই বর্ণনা নবাবী আমল থেকে প্রচলিত আলোক উৎসব 'বেরা' সম্পর্কে। এই উৎসবকে ঘিরে যে আনন্দের বাতাবরণ তৈরী হয়, ভাগীরথীবক্ষসহ সারা মুর্শিদাবাদ শহর সেজে ওঠে তা উপরের বর্ণনা থেকেই বোঝা যায়। এই উৎসবকে ঘিরে মুর্শিদাবাদ তথা জেলার বাইরের মানুষের মধ্যেও উৎসাহের অন্ত থাকে না। এই উৎসবের অসাম্প্রদায়িক চরিত্রই এর বিশিষ্টতা । প্রায় ৩০০ বছর আগে শুরু হওয়া এই উৎসব আজও দূর দূরান্তের সব সম্প্রদায়, সব শ্রেণীর মানুষকে আকর্ষণ করে। পূর্বের জৌলুস কমে গেলেও এই উৎসব এবং তাকে ঘিরে যে মেলার আয়োজন তার গুরুত্ব কমেনি। আলোচ্য প্রবন্ধে বেরা উৎসবের ইতিহাস এবং মুর্শিদাবাদ জেলার সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে এর গুরুত্ব সম্পর্কে আলোকপাত করার প্রয়াস করা হয়েছে।

আরবীয় পৌরাণিক দরবেশ খাজা খিজির বাংলাদেশে খোয়াজ খিজির বা খোয়াজ পীর নামে অভিহিত। খাজা খিজির পানির মালিক হিসাবেও পরিচিত ও সম্মানিত। সাধারণ মানুষের বিশ্বাস তিনি নৌকাডুবি থেকে যাত্রীদের রক্ষা করেন। ভারতীয়

হিন্দুপুরাণে বরুণ জলদেবতা। ভারতীয় মুসলমানদের কাছে খাজা খিজির মৌলিকভাবে সেই স্থান গ্রহণ করেছেন। বাঙালীরাও তাঁকে সেই মূর্তিতেই মান্য করে। পণ্ডিতগণের মতে, নবী ইলিয়াস পরবর্তীকালে রূপক চরিত্র খোয়াজ খিজিরে পরিণত হয়েছেন। খ্রিষ্টীয় অষ্টম শতকে দরবেশ ইব্রাহিম ইবন অদহম সূফী সাধনায় খোয়াজ খিজিরের অলৌকিকত্ব প্রচার করেন। তাঁর শিষ্যরাই ভারতে খিজিরিয়া সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা করেন। বাংলাদেশে খিজিরিয়া সম্প্রদায়ের মতবাদ কখন প্রবেশ করে তা সঠিকভাবে জানা যায় না। ঢাকার মোঘল সুবাদার মুকরম খান খোয়াজ খিজিরের উদ্দেশ্যে 'বেরা উৎসব' পালন করেছিলেন বলে ঐতিহাসিক তথ্য পাওয়া যায়।[২]

মুর্শিদাবাদে কে এই উৎসবের প্রবর্তক তা নিয়ে মতভেদ আছে। মুর্শিদকুলি খানের আমল থেকে এই উৎসব পালিত হত বলে অনেকে মনে করেন। অনেকে এই উৎসবের প্রবর্তক সিরাজদ্দৌলা মনে করেন। জেমেস ওয়াইজ সিরাজদ্দৌলার সময়কার বেরা উৎসবের বর্ণনা দিয়েছেন। নবাব নিজে ভাগীরথীর জলে শত শত ভেলা ভাসিয়ে এ উৎসব উপভোগ করেছিলেন এবং নদীর তীরভূমি জুড়ে মুর্শিদাবাদের অধিবাসীরা বিপুলভাবে জড় হয়েছিল।[৩]

মুর্শিদাবাদের নবাব বংশ যে এলাকায় বসবাস করেন সেই প্রাচীর বেষ্টিত অংশের নাম কেল্লা নিজামত। নবাবের প্রাসাদ এর মধ্যেই অবস্থিত। কেল্লা নিজামতের উত্তরদিকে বিশাল ইমামবাড়া, যা সারা ভারতের মধ্যে বৃহত্তর। নবাব প্রাসাদ ও ইমামবাড়ার পশ্চিমদিকে ভাগীরথী ভাদ্র মাসে বন্যার জলে প্লাবিত হয়। বেরা উৎসবের কয়েকদিন আগে থেকেই কলাগাছ কেটে বাঁশ ও দড়ির সাহায্যে কলাগাছগুলি বেঁধে একটি বিশালাকৃতি চতুষ্কোণ বেরা বা তরণী তৈরি করা হয়। বেরার উপরের দিকে নানারকম রঙিন কাগজ ও অন্যান্য জিনিসের সাহায্যে মসজিদ, মিনার, খিলান ইত্যাদি নির্মাণ করা হয় এবং সমস্ত বেরাটি মোমবাতি দিয়ে সাজানো হয়। উৎসবের দিন রাত্রি প্রায় নটার সময় নবাবের প্রাসাদ থেকে হস্তী, অশ্ব, বাদ্যযন্ত্র প্রভৃতিসহ শোভাযাত্রা বের হয়। ঐ শোভায় খাজা খিজিরের উদ্দেশ্যে সিন্নী নিয়ে যাওয়া হয়। জনৈক মৌলভি খাজা খিজিরের উদ্দেশ্যে সিন্নী নিবেদন করেন। রাত্রি প্রায় এগারোটার সময় তোপ ধ্বনির সংকেত দিয়ে দীপ শোভিত বেরাটিকে মুক্ত করা হয়। আলোকাভাসিত বেরাটি স্রোতের মুখে ভেসে চলে অন্যান্য নৌকার সাহায্যে। তীরে নানারকম বাদ্যভাণ্ড বাজতে থাকে এবং হাজার হাজার মানুষের ভিড় জমে। নিকটবর্তী গ্রাম থেকে হিন্দু-মুসলিম সকল সম্প্রদায়ের লোক জমে বেরা দেখতে। দশ বারো হাজারেরও বেশি মানুষ আসে এই উৎসব দেখতে। এই উৎসব এক রাত্রিই হয়। প্রায় তিন শতাধিক বৎসর ধরে চলে আসা এই উৎসব জেলার সর্বসম্প্রদায়ের মানুষকে উৎসব আনন্দে মাতিয়ে তোলে।[৪] মুর্শিদাবাদের বেরা ভাসানোর উৎসবে যে রকম ভিড় হয় বাংলাদেশের এই উৎসবে সেই রকম আর কোথাও হয় বলে শোনা যায় না। মুর্শিদাবাদে এই উৎসবটির সূত্রপাতে নবাব-নাজিমরাই ছিলেন এবং এই উৎসবের সঙ্গে তাঁদের বংশধরদের যোগসূত্র এখনও

ছিন্ন হয়নি। এটি শুধু নবাব বাড়ীর উৎসব নয়। অগণিত সাধারণ মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত যোগদানে এটি একটি প্রকৃত লোকৎসবে পরিণত হয়েছে।[৫]

এই বেরা উৎসবকে কেন্দ্র করে যে মেলার আয়োজন হয় তার চরিত্রও সার্বজনীন। উৎসবের দিনে আশে পাশের জেলাগুলির ষ্টেশনে ষ্টেশনে লোক থই থই করে। মেয়ে-পুরুষ, বুড়ো-বুড়ি, বাচ্চা–কাচ্চার দল গাদাগাদি করে ট্রেনে চেপে আসে। বেলডাঙ্গা, পলাশী, বহরমপুর, লালগোলা, ভগবানগোলা, জিয়াগঞ্জ ষ্টেশনে এই দৃশ্য দেখা যায়। আশে পাশের গ্রামগুলি থেকে সাইকেল, রিক্সা, অটো, ট্যাক্সিতেও লোকজন আসে। অনেকে আবার পায়ে হেঁটেও আসে। জিয়াগঞ্জ, আজিমগঞ্জ, বহরমপুর থেকে নৌকা বোঝাই করেও লোক আসে মুর্শিদাবাদের ঘাটে। নিজামত কেল্লার উত্তর দরজা থেকে ওয়াসিফমঞ্জিল পর্যন্ত গঙ্গাতীরবর্তী রাস্তায় খাবার দাবার, পুতুল-খেলনা, ঘর গেরস্থালির জিনিসপত্রের দোকান বসে। ভিড় সবচেয়ে বেশি হয় রাত্রি এগারোটার সময় যখন বেরা ভাসান হয়।[৬]

বেরা নির্মাণের কাজে এক শ্রেণীর দক্ষ কারিগর নিযুক্ত থাকে। নবাবী আমল থেকেই এদের পূর্বসূরীরা এই নির্মাণের কাজ করে থাকে। কুশলী শিল্পীদের নিয়োগ করা হত অভ্রের পাত দিয়ে তৈরি আলো চিত্রিত করার জন্য। এই সমস্ত অভ্রের তৈরি আলোকে কোরানের বাণী, মসজিদ, গাছপালা ও নানারকমের মূর্তি চিত্রিত করা হত। চিত্রণের কাজে শত শত শিল্পী নিয়োগ করা হত। বেরা ও জলযানগুলিকে বহুবর্ণের দীপালোকে সাজানো ছিল উচ্চমানের শিল্পীদের কাজ।[৭]

এই বেরা উৎসবের জৌলুস, সৌন্দর্য, উৎসবে জন সমাগমের বিবরণ সমসাময়িক পত্রিকা থেকে পাওয়া যায়। “১০ সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার বাংলার নবাব ভেলা ভাসান পরবের সময় তাবৎ ইংলণ্ডীয়দিগকে আপন ঘরে নিমন্ত্রণ করিয়া অনেক আমোদ করিয়া খাওয়াইয়াছেন। দশ দণ্ড রাত্রির সময় তাহার রাজগৃহে এক তোপ ছোড়া গেল এবং অন্য ২ স্থানে যে পাঁচ তোপ ছিল তাহাও এককালে ছোড়া গেল। তোপ ছাড়িবামাত্র গঙ্গার ওপারে রৌশনী বাগ নামে স্থানেতে যে সকল রোশনাই প্রস্তুত ছিল তাহা একেবারে জ্বলাইল এবং জলের উপর যে সকল ছোট ২ ভেলাতে রোশনাই প্রস্তুত ছিল তাহাও ওই সময় জ্বলাইল শেষে প্রধান ভেলাতে অগ্নি দিল। সে প্রধান ভেলা এই মত নির্মিত প্রথম জলের উপর মাড়বান্ধা তাহার উপর ঘর সে ঘরের চতুর্দিকে দেওয়াল ও চারি দিগে চারি দ্বার এবং চারি কোণে চারিটা চূড়া এই সকল কেবল বাতিতে নির্মিত। এবং কোন কোন স্থানে নানা প্রকার রঙ্গের অভ্রেতে বিচিত্র তাহার চারি দ্বারে চারিজন লোক গন্ধক জ্বালাইবার কারণ নিযুক্ত ছিল যখন এই সকল বাতি জ্বালাইয়া ঐ ভেলা ভাসাইয়া দিল তখন অত্যন্ত শোভা করিয়া গঙ্গার উপরে গমন করিতে লাগিল এবং নবাবের ঘরের নিকট পঁহুছিলে তাহারা যত পটকা ইত্যাদি আয়োজন করিয়া

রাখিয়াছিল সে সকল এককালে ছাড়িল। এই সকল হইলে পর নবাব আপন ঘরে অনেক লোকের সহিত একত্রে খানা খাইলেন।”[৮]

সমাচার দর্পণের অন্য একটি বর্ণনা থেকে আমরা বেরা উৎসবের জৌলুস, জাঁকজমক ও সৌন্দর্যের প্রমাণ পাই। “বেরা ভাসান ।। ২১ সেপ্তেম্বর ৭ আশ্বিন শুক্রবারের সমাচার মুরশেদাবাদ হইতে আসিয়াছে তাহাতে জানা গেল যে গত ১৩ সেপ্তেম্বর ৩০ ভাদ্র বৃহস্পতিবার শ্রীশ্রীযুক্ত নবাব সাহেব বেরা ভাসানোর সমারোহ মামুল মত করিয়াছেন তাহা হইতে কোন বিষয় ন্যূন হয় নাই তথাকার সাহেব লোক ও বিবিলোকেরদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া দিবসে ও রাত্রিতে উত্তম মত দুইবার খানা দিয়াছেন ও উৎকৃষ্টরূপ নাচ ও গান হইয়াছিল তাহাতে সাহেব লোকেরা যথোচিত আমোদ করিয়াছেন এবং গঙ্গাতে তাবৎ নৌকা সমারোহ হইয়া তাহার উপরে নানাপ্রকার নাচগান ও নানাবিধ বাজী হইয়াছিল পরে ৯ ঘণ্টা রাত্রির সময়ে বেরা ভাসানের আরম্ভের উপরে এক তোপ হইল তৎকালে রোশনাইবাগে তাবৎ বাজীতে অগ্নি দিলেক এবং মসজিদের মত একটা আশ্চর্য্য বাজী হইয়াছিল এ সকল বাজী উত্তম মত পোড়ান গেল। সাহেব লোকেরা ও বিবি লোকেরা শ্রীশ্রীযুক্ত নবাব সাহেবের সৌজন্য দেখিয়া তুষ্ট হইলেন ও অনেক রাত্রি পর্যন্ত তামাসা দেখিলেন।”[৯]

প্রায় দুশো ৩০০ বছরের পুরনো এই উৎসবের জৌলুস এখন কমে গেছে। নবাব নাজিমদের সময় লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ হত এই উৎসবে। আমির-ওমরাহ, বন্ধু-বান্ধব নিয়ে তাঁদের খানাপিনা, নাচ গান হৈ-হুল্লোড়ের আসর জমত। বেরা ভাসিয়ে দেবার পর তার সঙ্গে চলত নৌকায় নৌকায় বাইজীদের নাচ। নিজামত কেল্লার ঠিক উল্টোদিকে ভাগীরথীর পশ্চিমপারে রোশনীবাগের রোশনাই এর কথা সমসাময়িক ইতিহাসে লেখা আছে। লক্ষ লক্ষ মোমবাতিতে, সেজের আলোয়, বেলোয়ারি ঝাড়-লণ্ঠনে তৈরী আলোর মিনারে, তোরণে, রোশনীবাগ ঝলমল করে উঠত। সারারাত্রি ধরে পোড়ানো আতসবাজির আলোতে উদ্ভাসিত হত রাত্রি। প্রকাণ্ড ভেলা তৈরি হত সেই সময়। এখন ভেলার আকার ছোট হয়ে গেছে। নিজামতী ব্যান্ডের বদলে এখন ভাড়া করা ব্যান্ড আসে। সোনার প্রদীপ বদলে গেছে। আগেকার জমজমাটভাবও এখন কমে গেছে।[১০]

মুর্শিদাবাদ ছিল সুবে বাংলার রাজধানী। অষ্টাদশ শতকে এ জেলায় নানান মত, নানান ধর্মের, নানান শ্রেণীর আগমন ঘটে। উত্তর ভারতের রাজনৈতিক অনিশ্চয়তার কারণে বহু পণ্ডিত, উলেমা, রাজকর্মচারী নবাবদের দরবারে এসে হাজির হন। এই মিশ্র জনগোষ্ঠী এই অঞ্চলের অর্থনীতি, ভাষা এবং সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলকে সমৃদ্ধ করেছিল। ঐতিহাসিক সুশীল চৌধুরী বলেন নবাবি আমলে মুর্শিদাবাদে একটি ‘Composite Culture’ বা উদার ও মিশ্র সংস্কৃতি গড়ে উঠেছিল।[১১] নবাবরা বিভিন্ন হিন্দু উৎসবে যেমন যোগ দিতেন, তেমনি সৈয়দ মূর্তজার দরগায় হিন্দুরা আল্লা- হো – আকবর বলে পীরের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে এখনও। নবাবি আমল থেকে চলে আসা

এই সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল আজও জেলায় বিদ্যমান। এবং এই পরিমণ্ডলকে সজীব রাখার ক্ষেত্রে বেরা ভাসান উৎসব এবং সেই উৎসবকে ঘিরে মেলার বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। আজও ভাদ্র মাসের শেষ বৃহস্পতিবার বেরা উৎসবকে ঘিরে জেলা এবং জেলার বাইরের মানুষের উৎসাহ, উদ্দীপনা চোখে পড়ার মত যেখানে সব সম্প্রদায় মিলে মিশে এক সমন্বয়ী পরিবেশে ভাগীরথীর তীরকে আরও বেশি বেশি আলোকিত করে তোলে।

তথ্যসূত্র:

১। রায়, নিখিলনাথ, *মুর্শিদাবাদ কাহিনী,* পুথিপত্র প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ২০০৪, পৃষ্ঠা- ৩৬৬-৩৬৭

২। আহমেদ, ওয়াকিল, *বাংলার লোক- সংস্কৃতি,* গতিধারা, ঢাকা, ২০০১, পৃষ্ঠা ২২৪-২২৫

৩। এম, রহিম, *বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস,* বাংলা একাদেমি, ঢাকা, ২০১২, পৃষ্ঠা, ১৮৭

৪। মিত্র, আশোক, পশ্চিমবঙ্গের পূজা পার্বণ ও মেলা (সম্পাদিত),দ্বিতীয় খণ্ড, পশ্চিম বঙ্গ সরকার, ১৯৬১, পৃষ্ঠা ৭৭

৫। তদেব পৃষ্ঠা ৮০

৬। তদেব পৃষ্ঠা ৮০

৭। বিনয় ঘোষ, "খোজা খিজির উৎসব", *ঝড়* পত্রিকা, বহরমপুর, ২০০৪, পৃষ্ঠা ২৩৮

৮। সমাচার দর্পণ, ৯ অক্টোবর ১৮১৯

৯। সমাচার দর্পণ, ২৯ সেপ্টেম্বর ১৮২১

১০। পশ্চিম বঙ্গের পূজা পার্বণ, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৮১

১১। সুশীল চৌধুরী, *নবাবি আমলে মুর্শিদাবাদ,* আনন্দ, কলকাতা, ২০১১,পৃ – ১৫৪

বিশ্বায়ন, প্রযুক্তি জগতের বদল, বিনোদনের জগৎ ও লোকসংস্কৃতি

সৈকত মিস্ত্রী
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ,
ডায়মন্ড হারবার মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ: ভারতে মুক্ত অর্থনীতি গৃহীত হওয়ার ফলে বিদেশি পুঁজির আগমন ঘটেছে। প্রযুক্তির জগতেও এসেছে জোয়ার। একসময়ের দুর্লভ প্রযুক্তি সাধারণ মানুষের কাছে সুলভ হয়ে উঠেছে দ্রুত। রেডিয়ো থেকে টিভি কিংবা কেবল টিভি হয়ে বর্তমান দিনের স্মার্টফোনে পৌঁছে গিয়েছে প্রযুক্তির উন্নয়ন। অন্যদিকে প্রযুক্তির হাত ধরে দ্রুত বদলে গিয়েছে বিনোদনের জগতটিও। বিনোদনের আসরকেন্দ্রিকতা প্রযুক্তির অগ্রগতি সত্ত্বেও বহুদিন পর্যন্ত অনেক মানুষকে এক সূত্রে গেঁথে রাখলেও বর্তমানে সেই প্রযুক্তিই মানুষ থেকে মানুষকে দূরে সরিয়ে চলেছে। ইন্টারনেট এবং সামাজিক মাধ্যমের দ্রুত প্রসার ভার্চুয়াল সমাজ তৈরি করলেও প্রকৃতপক্ষে মানুষ হয়ে পড়ছে একা। অন্যদিকে পরিযাণ বৃদ্ধির কারণে লোকসংস্কৃতির পরিসরটিতে এসে পড়েছে তার একাধিক প্রভাব।

সূচক শব্দ: বিশ্বায়ন, প্রযুক্তি, পুঁজি, বিনোদন, পরিযাণ, লোকসংস্কৃতি।

ভারতের প্রযুক্তিনির্ভর বিনোদনের জগতটিকে অনেকাংশে রূপ দিয়েছিল বেতার ব্যবস্থা বা রেডিয়ো সম্প্রচার। যদিও প্রাথমিক অবস্থায় তা ছিল ব্যয়বহুল, কিংবা মুষ্টিমেয় মানুষের মধ্যে সীমাবদ্ধ। হয়তো সেই কারণেই বৃহত্তর ভারতের কোণে কোণে বেঁচে ছিল আঞ্চলিক বিভিন্নতাসমৃদ্ধ নিজস্ব বিনোদনের জগৎ। ১৯৯১ সালে ভারত সরকার মুক্ত অর্থনীতিকে স্বীকার করে নেওয়ার ফলে যে বিশ্বায়ন ঘটে, তার ফলে দ্রুত বদলে যায় বিনোদনের জগতটি। এই ব্যাপারে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল কেবল টিভির প্রসার। ভারতে ১৯৫৯ সালে দূরদর্শনের সূত্রপাতে কয়েকটি মাত্র টেলিভিশন নিয়ে যে বিনোদনের জগতটি গড়ে উঠেছিল, তা বিশ্বায়নের ফলে অবিশ্বাস্য হারে বাড়তে শুরু করে। কেবল টিভির মাধ্যমে দেশি বিদেশি শতাধিক চ্যানেল পৌঁছে যায় মানুষের ঘরে ঘরে। যদিও এই ঘটনা নব্বইয়ের দশকের প্রথমেই ঘটে নি, বরং তার বিস্তৃতিতে লেগে গিয়েছিল আরও একটি দশক। ততদিনে সাদা কালো টিভির যুগ পেরিয়ে গিয়ে বাজার ছেয়ে ফেলেছে রঙিন টিভি বা ‘কালার টিভি’ আর শহর কিংবা শহরতলি পেরিয়ে গ্রামের দিকেও গুটি গুটি পায়ে এগিয়ে যাচ্ছে কেবল চ্যানেলের হাতছানি। প্রথমদিকে পাড়ায় একটি দুটি বাড়িতে টিভি থাকলে মানুষের ভিড় লেগে থাকত সেই বাড়িটিকে ঘিরে। পরে ধীরে ধীরে সংখ্যায় বাড়তে বাড়তে প্রত্যেকটি বাড়ির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়ে উঠল টিভি। তা বিভিন্ন সিনেমা, সিরিয়াল বা খবরের

মাধ্যমে রূপ দিতে থাকল মানুষের চিন্তা চেতনাকে। সংসার কিংবা সমাজ —-সব ক্ষেত্রেই এর অবশ্যম্ভাবী প্রভাব পড়তে থাকল। সাধারণ মানুষ টেলিভিশনের দৌলতে অনেক বেশি রাজনীতি সচেতন বা অধিকার সচেতন হয়ে উঠতে লাগল। এর পাশাপাশি দেশি-বিদেশি টিভি চ্যানেলের দৌলতে পুঁজিসংলগ্ন সংস্কৃতির বিশ্বায়ন ঘটল খুব দ্রুত।

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে রেডিয়ো নামক যন্ত্রটি ভারতীয় বিনোদন ব্যবস্থার অন্যতম মাধ্যম হিসাবে উপস্থিত ছিল। ভারতে এর যাত্রা শুরু হয়েছিল ১৯২৩ সালে।[১] যার জায়গা পরবর্তী সময়ে দখল করে নেয় টেলিভিশন ব্যবস্থা। তবে এর পাশাপাশি বিনোদনের জগতে আরও কিছু যন্ত্রপাতি এসে হাজির হয়েছিল, যেগুলির কথা অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য। যেমন রেডিয়ো-র পরিবর্ত হিসাবে জায়গা করে নিয়েছিল টেপ রেকর্ডার। এতে করে গান ইত্যাদি শোনার পাশাপাশি রেকর্ডিংও করা যেত। ফলে ব্যক্তিমানুষ তার নিজস্ব চাহিদা অনুসারে এই যন্ত্রটিকে ব্যবহার করতে পারত। রেডিয়ো-র মতো সময় অনুযায়ী অনুষ্ঠানপ্রবাহের দায় এতে করে এড়ানো যেত এবং মানুষ তার পছন্দের শিল্পীদের গান সহজেই শুনে নিতে পারত। এই ব্যবস্থার অঙ্গ হিসাবে বাজারে ছেয়ে যায় সেলুলয়েডের ফিতের ক্যাসেট, যার দুপিঠে পনেরো থেকে কুড়িটি গান থাকতো। ফলে এই অডিও ক্যাসেটের বিপণনও বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছিল। এর পরবর্তী সময়ে মানুষ যখন বিনোদনকে আরও ব্যক্তিসাপেক্ষ কিংবা বহনযোগ্য করে তুলতে চেয়েছিল, তখন বাজারে এসে গিয়েছিল টেপরেকর্ডারের ক্ষুদ্র সংস্করণ 'ওয়াকম্যান'। নামটি শুনেই যন্ত্রটির তাৎপর্য অনেকাংশে অনুভব করা যায়। এক্ষেত্রে টেপরেকর্ডার হয়ে উঠল পকেটে বহনযোগ্য, যা শোনার জন্য হেডফোন ছিল, যা চলার পথে, যানবাহনে পার্শ্ববর্তী মানুষকে বিরক্ত না করেও শোনা যায়, এবং এর মাধ্যমে একরকম স্টাইল স্টেটমেন্টও গড়ে তোলা যায়। এই যন্ত্রটিতে টেপ রেকর্ডারের মতোই অডিও ক্যাসেট ব্যবহৃত হতো। ওয়াকম্যান প্রথম বাজারে নিয়ে আসে জাপানি কোম্পানি সোনি। ১৯৭৯ সালের ১লা জুলাই থেকে ২০১০ সাল পর্যন্ত সারা বিশ্বে ৪০ কোটি ওয়াকম্যান বিক্রি করে এই কোম্পানি।[২] এছাড়াও দেশি বিদেশি বিভিন্ন কোম্পানির ওয়াকম্যান দ্রুত বাজার ছেয়ে ফেলেছিল। যদিও খুব বেশিদিন যে এই যন্ত্রটি বাজারে জনপ্রিয় ছিল তা বলা যায় না। পরবর্তী উন্নত প্রযুক্তি দ্রুত এসে এর জায়গাটি দখল করে নেয়। ওয়াকম্যানের পাঁচবছর পর সোনি কোম্পানি বাজারে আনে 'ডিস্কম্যান', যা আসলে ছিল বহনযোগ্য সিডি প্লেয়ার, কিন্তু এই যন্ত্রটির চাহিদা সেভাবে তৈরি হয় নি।[৩] এরপর বাজারে এসেছিল দক্ষিণ কোরিয়ার উদ্ভাবন (১৯৯৭) এমপি থ্রি প্লেয়ার[৪]। কিন্তু প্রযুক্তির ঝড়ে তাও জনপ্রিয় হওয়ার বেশিদিন সময় পায় নি।

এমপি থ্রি প্লেয়ার-এর পরবর্তী ধাপে গান শোনার জন্য এসেছিল আইপড। অ্যাপেল কোম্পানি ২০০১ সালে বাজারে নিয়ে আসে এই আইপড। পরবর্তী ১৪ মাসে

ছয় লক্ষ আইপড বিক্রি হয়। ২০০৪ সালে শুধু অ্যাপেল কোম্পানি ৮২ লক্ষ আইপড বিক্রি করেছিল। অন্যান্য কোম্পানিগুলিও ততদিনে আইপড এনে ফেলেছে। আইপড হয়ে উঠেছিল এক ধরনের স্ট্যাটাস সিম্বল।[৫] ২০০৭ সালে অ্যাপেল হাজির করে আইফোন, যাতে ফোন এবং আইপড উভয়ের কাজই পাওয়া সম্ভব ছিল। এইভাবে বিশ্বের বাজারে স্মার্টফোনের যুগ শুরু হয়। প্রায় সমসময়ে সোনি কিংবা স্যামসাং কোম্পানিও স্মার্টফোন নিয়ে উপস্থিত হয়।[৬] স্মার্টফোনের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে বিনোদনের দুনিয়ায় অভূতপূর্ব সব বদল ঘটে। এরপর অসম্ভব দ্রুততায় স্মার্টফোন হয়ে উঠতে থাকে একাধারে মিউজিক, সিনেমা, গেমস এবং ক্যামেরার সমন্বয়। পাশাপাশি নিত্যনতুন অ্যাপ হাজির হয়ে স্মার্টফোনকে করে তোলে কল্পতরুর সমার্থক।

ওয়াকম্যান থেকে স্মার্টফোন আসার প্রায় সমসময়ে বিনোদনের জগতের আর একদিকে প্রযুক্তির বিপুল পরিবর্তন ঘটে গিয়েছিল। এই পরিবর্তন ঘটেছিল অপটিক্যাল কমপ্যাক্ট ডিস্ক-এর আগমনের ফলে। এর সূত্রপাত ঘটেছিল ১৯৭৭ সালে সোনি নামক বহুজাতিক কোম্পানির হাত ধরে। পরবর্তীকালে ফিলিপস ১৯৭৯ সালের ৮ই মার্চ ইউরোপের বাজারে সিডি নিয়ে আসে।[৭] এরপর বাজারে আসে বহনযোগ্য সিডি প্লেয়ার। পরবর্তীকালে কম্পিউটারের সঙ্গে সিডি প্লেয়ার জুড়ে দেওয়া হয়। বিপুল পরিমাণ গান বা অনেকখানি ভিডিও একসঙ্গে ধারণ করতে পারার ক্ষমতা থাকায় সিডি প্লেয়ার খুবই জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। দ্রুত গতির ইন্টারনেট মিউজিক ডাউনলোড করার সুযোগ নিয়ে হাজির হওয়ার আগে পর্যন্ত সিডি প্লেয়ার জনপ্রিয় ছিল। পরবর্তীকালে ২০০৩ সাল নাগাদ এই জনপ্রিয়তা হ্রাস পায়।[৮] যার অন্যতম কারণ ছিল বাজারে স্মার্টফোনের আগমন।

ওজনে খুবই হালকা, আকারে গোল চাকতির মতো কমপ্যাক্ট ডিস্কে সহজেই ধরে যেত কয়েকশো গান, বা একটি তিনঘন্টার সিনেমার অর্ধেক অংশ। উপরন্তু টেপরেকর্ডারের ক্যাসেটের মতো এতে সেলুলয়েডের ফিতে জড়িয়ে যাওয়ার সমস্যা নেই। এর ফলে এই প্রযুক্তি জনপ্রিয় হয়ে ওঠার পরবর্তী বছরগুলিতে ভারতীয় বাজারে সিডি প্লেয়ার এবং সিডি বিক্রির রমরমা দেখা যায়। এর মাধ্যমে আর এক ধরনের নতুন বিনোদন ব্যবস্থা গড়ে ওঠে। শহর কিংবা শহরতলি ছাড়িয়ে গ্রামে গঞ্জেও ছড়িয়ে পড়ে এই প্রযুক্তি। আর যাদের এই প্রযুক্তি সরাসরি কিনবার সামর্থ্য নেই, তারা ভাড়া নিয়েও এই বিনোদনকে গ্রহণ করবার রাস্তা তৈরি হয়। এজন্য শহর কিংবা শহরতলিতে তৈরি হয় প্রচুর পরিমাণে সিডি লাইব্রেরি বা সিডি পার্লার, যেখান থেকে পছন্দের সিনেমা কিংবা গানের সিডি নির্দিষ্ট অর্থের বিনিময়ে ভাড়া নিয়ে মানুষ বাড়িতে দেখবার জন্য নিয়ে যেতে পারত। এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য যে, সাধারণত শ্রেণিগত ভাবে বিনোদনের উপাদান চিরকালের মতোই এই ক্ষেত্রেও ছিল পৃথক পৃথক। গ্রামাঞ্চলের শ্রমজীবী শ্রেণির মানুষের বিনোদনের উপাদান আর শহরের অভিজাত বর্গের বিনোদনের উপাদানের তফাতসমূহও দুই ভিন্নক্ষেত্রে উপস্থিত সিডি পার্লারের

উপাদানগুলি লক্ষ করলেই বেশ বোঝা যেত। দেখা যেত যে এই সিডি পার্লারগুলি আরও একটু পরে কম্পিউটারের সাহায্যে মোবাইলে গান ভরা কিংবা চাহিদামাফিক মেমরি কার্ডে ভিডিয়ো ভরে দেওয়ার কাজ করতো। এইভাবে ইন্টারনেটের মাধ্যমে গান ডাউনলোড করে বহুল ব্যবহারের কারণে কপিরাইট আইন বা শিল্পীর ন্যায্য পারিশ্রমিকের দিকটি ভীষণভাবে লঙ্ঘিত হচ্ছিল। এর পাশাপাশি গ্রামের ক্ষেত্রে আর একধরনের চিত্র উঠে আসে। কয়েক বছর আগে যেখানে পুজো পার্বণে সেলুলয়েডের ফিতের ভিডিয়ো ক্যাসেট ভাড়া করে সমষ্টিগত ভাবে ভিডিয়ো দেখার চল ছিল, এই সময়ে সেই প্রবণতা স্থায়ী রূপ পায় গ্রামে গ্রামে ভিডিয়ো হল তৈরি হওয়ার মাধ্যমে। সাধারণত বিদ্যুৎবিহীন গ্রামে ব্যাটারি বা জেনারেটরের সাহায্যে ভিসিডি প্লেয়ারের মাধ্যমে একধরনের ভিডিয়ো চালানো হতো, যেগুলি সদ্য কিশোর কিংবা যুবকদের বেপথু মানসিক প্রবণতাসমূহকে উসকে দিয়ে অর্থোপার্জন করতো। গ্রামের কোনো একটি দিকে চাঁচের বেড়ার হলঘর বানিয়ে এই ভিডিয়ো হল তৈরি হতো এবং নির্দিষ্ট অর্থের বিনিময়ে কৌতূহলী দর্শক এই হলগুলিতে প্রবেশের অনুমতি পেত। তবে প্রায়ই সমাজের সংস্কৃতিমনস্ক মানুষদের তরফ থেকে এই হলগুলিতে নীল ছবি দেখানোর অভিযোগ উঠে আসত। এই হলগুলি গ্রামের পূর্বপ্রচলিত লোকবিনোদনের স্বাভাবিক প্রবণতাকে কোণঠাসা করে ফেলে এবং একধরনের উত্তেজক যৌন বিনোদনমূলক সংস্কৃতির প্রসার ঘটায়, যা প্রকৃতপক্ষে সমাজে নারীর বিরুদ্ধে অপরাধের মাত্রাকে বহুগুণ বৃদ্ধি করে। শেষ পর্যন্ত দেখা যায় যে, স্মার্টফোন বাজারে সুলভ হওয়ার ফলে প্রত্যেক মানুষের হাতে যখন তা পৌঁছে যায় এবং দ্রুতগতির ইন্টারনেট গ্রামেও সহজলভ্য হয়, তখন থেকে ভিডিয়ো হলগুলির দর্শক দ্রুত কমে যেতে থাকে।

ভারতে বিনোদনের সামগ্রিক যে জগতটি মূলত তথ্যপ্রযুক্তির হাত ধরে দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছিল, তার পশ্চাতে ছিল বিদেশি প্রযুক্তির বহুল আগমন, যার ফলে মোবাইল বা স্মার্টফোনের যন্ত্রাংশের দাম দ্রুত হ্রাস পাচ্ছিল। অনেক সস্তায় তা মানুষের হাতে পৌঁছে যাচ্ছিল। তবে স্মার্টফোনের যুগ আসার আগে আরও কয়েকটি ধাপ লক্ষ করা যায়। সিডি (ভিডিয়ো সিডি কিংবা অডিয়ো সিডি) প্লেয়ার আসবার কিছু পরে দ্রুত বাজার দখল করেছিল তুলনায় অনেক বেশি মেমরি সম্পন্ন ডিভিডি। এক্ষেত্রে দেখা যায় এই প্রযুক্তিকে জায়গা করে দিতে গিয়ে দ্রুত পূর্বের প্রযুক্তিগুলি পরিত্যক্ত হয়ে যায়। কারণ সেগুলিতে আর নতুন এই প্রযুক্তিকে ব্যবহার করা যাচ্ছিল না। এর ফলে ভিসিডি প্লেয়ারের জায়গায় এল ডিভিডি প্লেয়ার। এতে আরও অনেক বেশি সংখ্যায় গান কিংবা গোটা একটি বা একাধিক সিনেমা ধরে যায়। শব্দ কিংবা ছবির গুণমানও এক্ষেত্রে পূর্বের তুলনায় অনেক বেশি। তবে এখানেই শেষ হয়নি প্রযুক্তির অগ্রসরণ। মূলত দুই ধরনের পরিবর্তন যাত্রা এখান থেকে লক্ষ করা যায়। একদিকে ডিভিডির পরে আরও বেশি মেমরি সম্পন্ন পেনড্রাইভ কিংবা মেমরি কার্ড দ্রুত বাজার দখল করে, অন্যদিকে

ডিভিডির জায়গা নেয় ব্লু রে ডিস্ক, যা ডিভিডির তুলনায় অনেক বেশি মেমরি সম্পন্ন ছিল। তবে এই ব্লু রে ডিস্ক খুব জনপ্রিয় হয় নি এর উচ্চ মূল্যের কারণে, অথবা বলা যায় স্মার্টফোনের আগমন মেমরিকার্ডের উপযোগিতা এবং চাহিদাকে বহুগুণ বাড়িয়ে দেয়। পেনড্রাইভের চাহিদার জায়গাটি বজায় থাকে ডেস্কটপ কিংবা ল্যাপটপের ক্ষেত্রে এর ব্যবহারের কারণে।

ডিভিডি প্লেয়ারের পরে বাজারে আসে হোম থিয়েটার সিস্টেম।[৯] একটি ডিভিডি প্লেয়ার কিংবা ব্লু রে ডিস্ক প্লেয়ার, টিভি স্ক্রিন এবং একাধিক উচ্চ মানের স্পিকারের সমন্বয়ে গড়ে ওঠা এই ব্যবস্থাপনা উচ্চ মূল্যের কারণে উচ্চ অর্থনৈতিক স্তরের মানুষদের জগতে আবদ্ধ ছিল। সর্বোপরি বলা যায় এই ব্যবস্থাপনাটি গৃহস্থিত হওয়ার কারণে এর বিকল্পের সন্ধান করছিল মানুষ, কারণ এই দ্রুতগতির যুগে বাড়িতে বসে বিনোদন উপভোগ করা মানুষের পক্ষে সম্ভব ছিল না। আর এই চাহিদা পূরণেই দ্রুত বাজার দখল করে আইপড নামক বিনোদন যন্ত্র, যা পূর্বের ওয়াকম্যানের সমতুল্য ছিল। এতে মূলত গান শোনা যেত। আর সুবিধার বিষয় ছিল যে এটি সর্বত্র বহনযোগ্য ছিল। পরবর্তীকালে স্মার্টফোন এসে এই সমস্ত সুবিধা একটিমাত্র আধারে প্রদান করার কারণে আইপডের দিন শেষ হয়। কারণ স্মার্টফোন একাধারে রেডিও, আইপড, ভিডিও প্লেয়ার, ক্যামেরা কিংবা ল্যাপটপের গুণাগুণকে ধারণ করেছিল।

প্রযুক্তির দ্রুত প্রসার মানুষের আসরকেন্দ্রিক বিনোদনের জগতটিকে দ্রুত অপসৃত করছিল। যাত্রা-নাটকের দিন ফুরিয়েছিল আগেই। সেই জায়গা দখল করেছিল সিনেমা। তা দেখতেও অনেক মানুষ একত্রিত হতো। মুক্ত অর্থনীতির হাত ধরে বিশ্বায়নের আগমনের পর সিনেমাকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা বিনোদনের জগতটি দ্রুত পরিবর্তিত হয়। এতদিনের শহর, গ্রাম কিংবা মফসসলের সিনেমা হলগুলি মুক্ত অর্থনীতির আশীর্বাদে নতুন গড়ে ওঠা মাল্টিপ্লেক্স সিনেমার সঙ্গে প্রতিযোগিতায় পাল্লা দিতে না পেরে একে একে বন্ধ হয়ে যেতে থাকে। এগুলির সঙ্গে বিভিন্নভাবে যুক্ত মানুষেরা কর্মহীন হয়ে পড়তে শুরু করে। সেইসব সিনেমাহলের পরিত্যক্ত বাড়িগুলি প্রোমোটারদের হাতে ভাঙা পড়ে তৈরি হতে থাকে বহুতল আবাসন। এর পাশাপাশি প্রযুক্তির উন্নয়নের দ্রুততা এবং সহজলভ্যতায় বিনোদনমাধ্যমকে ঘিরে জড়ো হওয়া মানুষের সংখ্যাও দ্রুত কমে আসে। ধীরে ধীরে প্রযুক্তিকে নির্ভর করে কিংবা কেন্দ্র করে বিনোদন ব্যবস্থা আসরকেন্দ্রিকতা থেকে ব্যক্তিকেন্দ্রিকতায় পর্যবসিত হয়। এরই ফলশ্রুতিতে মানুষ একা হয়ে পড়তে থাকে। আর ঠিক এই সময়েই ইন্টারনেটের মাধ্যমে সামাজিক মাধ্যম বা সোশ্যাল মিডিয়ার আগমন ঘটে, যে মাধ্যমটিও প্রকৃতপক্ষে ছিল পুঁজি প্রসারের ক্ষেত্র। একইভাবে তৈরি হয়ে যায় 'ইউটিউব'-এর মতো ওয়েবসাইট, যেগুলিতে সারা পৃথিবীর বিনোদনের উপাদান ভরা থাকে। অফুরন্ত সেই বিনোদনের দুনিয়া দেখে একজীবনে শেষ করা যায় না। আর এইভাবে বিনোদনের দুনিয়ার এক বৈশ্বিক সাধারণীকরণ ঘটতে থাকে। ধীরে ধীরে এই মাধ্যমটি বিনোদন

বিপণনেরও একটি ক্ষেত্র হয়ে ওঠে। তবে এক্ষেত্রেও কপিরাইট আইনের লঙ্ঘন কিংবা শিল্পীর পারিশ্রমিকের প্রশ্নটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে।

বিশ্বায়ন পরবর্তী সংগীতের জগতটিও অনেক পরিবর্তিত হয়েছিল। এইসময়ে ব্যক্তি শিল্পীর একক সংগীতের পরিবর্তে একাধিক শিল্পীর সমষ্টিগত গান বা ব্যান্ড মিউজিকের চাহিদা বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। প্রকৃতপক্ষে এটি ছিল পাশ্চাত্য বিনোদন জগতের প্রভাব, যা মুক্ত অর্থনীতিকে ভর করে দ্রুত অগ্রসর হয়েছিল ভারতের মতো দেশের মাটিতে। এই সময়ে একের পর এক ব্যান্ডের আত্মপ্রকাশ, তাদের গানের বদলে যাওয়া ভাষা কিংবা বাদ্যযন্ত্র ব্যবহারের বিশেষত্ব নির্দিষ্ট সময়টিকে চিনতে সাহায্য করে। তবে একথাও অস্বীকার করা যায় না যে, ব্যান্ড মিউজিকের হাত ধরে ভারতীয় লোক ঐতিহ্যের গান প্রসারলাভ করেছিল।

একদিকে যেমন ব্যান্ড মিউজিকের বৃদ্ধি মূলত নাগরিক সংস্কৃতির উপর প্রভাব ফেলেছিল, অন্যদিকে বিশ্বায়নের ফলে গ্রামীণ বিনোদনের জগতটিরও দ্রুত বদল ঘটছিল। তবে সেক্ষেত্রে অন্তর্দেশীয় পরিযাণ অনেকখানি ভূমিকা পালন করেছিল। তুলনায় আন্তর্জাতিক প্রভাব সেক্ষেত্রে ছিল অনেক কম। কারণ হিসাবে বলা যায়, বিশ্বায়ন পরিযাণ বৃদ্ধি করেছিল। গ্রামগুলি থেকে শ্রমিকরা ছড়িয়ে পড়েছিল ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে। আর একটি অংশ সংখ্যায় কম হলেও ছড়িয়ে পড়েছিল বিদেশে। এইভাবে মূলত অন্তর্দেশীয় পরিযাণের ফলে একটি সাংস্কৃতিক মিশ্রণ ঘটে, যার ফলে সারা ভারতের সংস্কৃতির মিশ্ররূপ গ্রামীণ বিনোদনের ক্ষেত্রে লক্ষ করা যায়। উদাহরণ হিসাবে বলা যায় ভোজপুরী গান বাংলার গ্রামে গঞ্জে দ্রুত ছড়িয়ে পড়েছে। যে কোনো ধর্মীয় কিংবা সামাজিক অনুষ্ঠান অথবা বিনোদন মূলক অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে এই ভোজপুরী গানের রমরমা অন্তর্দেশীয় পরিযাণের ভূমিকাটিকে মনে করিয়ে দেয় অবধারিতভাবেই। এইভাবে বিশ্বায়নের ফলে প্রযুক্তির জগতে বদলের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত হয়েছিল বিনোদন এবং লোকসংস্কৃতি।

উল্লেখপঞ্জি

১. https://prasarbharati.gov.in/all-india-radio-2/#1588508332867-217ff0f1-f4fe Accessed On 11.04.2021 5.57 pm
২. https://timesofindia.indiatimes.com/gadgets-news/from-walkman-to-smartphones-how-portable-music-has evolved/articleshow/79791151.cmsf4fe Accessed On 11.04.2021 6.18 pm
৩. পূর্বোক্ত
৪. পূর্বোক্ত

৫. পূর্বোক্ত
৬. পূর্বোক্ত
৭. https://www.philips.com/a w/research/technologies/cd/beginning.html Accessed on 15.04.2021 8.11 pm
৮ https://lowendmac.com/2014/history-of-the-compact-disc/ Accessed on 15.04.2021 8.25 pm
৯ https://www.crutchfield.com/S-9rOa7IhXQ2B/learn/home-theater-history.html Accessed on 15.04.2021 8.56 pm

অভিজ্ঞানশকুন্তলম্ ও হাস্যরস:

অমৃতা দাম
সহকারী অধ্যাপক, সংস্কৃত বিভাগ
জামালপুর মহাবিদ্যালয়, জামালপুর, পূর্ব বর্ধমান

সারসংক্ষেপ : অলঙ্কার, রীতি, ধ্বনি, বৃত্তি, রস প্রভৃতি সম্পর্কে যে শাস্ত্রে বিশেষ আলোচনা রয়েছে সাহিত্যে তা অলঙ্কার শাস্ত্র নামে অভিহিত। ভরতের নাট্যশাস্ত্র সর্বাপেক্ষা প্রাচীন ও পূর্ণাঙ্গ অলঙ্কারশাস্ত্র নামে পরিচিত। রস প্রস্থানের প্রবক্তা আচার্য ভরতের পর থেকে প্রাক্ বিশ্বনাথ সময়সীমা পর্যন্ত বহু আলঙ্কারিক গুণতত্ত্ব রীতিতত্ত্ব, অলঙ্কার তত্ত্ব, ধ্বনিতত্ত্ব প্রভৃতিকে নিজ নিজ মতানুসারে প্রাধান্য দিলেও রসই যে কাব্যের বা নাট্যের মুখ্য ঈপ্সিত এই তত্ত্ব সর্বজনস্বীকৃত। রসের ব্যাখ্যায় আচার্য ভরত বলেছেন-" ন হি রসাদ্ ঋতে কশ্চিদ্ অর্থঃ প্রবর্ততে। তত্র বিভাবানুভাব-ব্যভিচারি-সংযোগাদ্- রসনিষ্পত্তি"। রস ছাড়া কোন বিষয় প্রবর্তিত হয় না। আচার্য বিশ্বনাথ বলেছেন-'রস্যতে আস্বাদ্যতে ইতি রসঃ'।[১]যাহা রসিত অর্থাৎ আস্বাদিত হয়, তাই রস। আস্বাদন করা এইরূপ অর্থ থেকে অনুভব এবং পরে ভালোবাসা অর্থেও রস্ ধাতু র বহুল প্রয়োগ দৃষ্ট হয়।সাধারণ স্বাদ কটু, অম্ল, কষায়, লবণ, তিক্ত ও মধুর এই ছয়রকম বিশিষ্ট স্বাদ।শৃঙ্গার প্রভৃতি আটপ্রকার নাট্য বা কাব্য রস। রস শব্দের মূল অর্থ যে স্বাদ তা থেকেই বিভিন্ন ও বিচিত্র অর্থের সৃষ্টি হয়েছে। অলঙ্কারশাস্ত্রে ও এটি সর্বদাই আস্বাদনার্থক বা আস্বাদনাত্মাক।[2] নাট্যশাস্ত্রে নাট্যরস উপলক্ষে রস শব্দের যে বিশিষ্ট প্রয়োগ করেছেন তার ব্যাখ্যানকালে স্পষ্ট ভাষায় রসের স্বাদন ধর্মের উল্লেখ করেছেন- "অত্রাহ, রস ইতি কঃ পদার্থ? আস্বাদ্যত্বাত্[৩] অর্থাৎ যা আস্বাদিত হয়, তাই রস। রস হচ্ছে আস্বাদনের ব্যাপার,রসতত্ত্ব হচ্ছে বুদ্ধি গ্রাহ্য ব্যাপার। জিহ্বার অন্য নাম যে 'রসনা' তার কারণ নাট্যশাস্ত্রে শৃঙ্গার,হাস্য,করুণ,রৌদ্র,বীর,ভয়ানক,বীভৎস ও অদ্ভুত নামক আটটি রসের আটটি স্থায়ীভাবের কথা উল্লিখিত হয়েছে-"রতির্হাসশ্চশোকশ্চ ক্রোধোৎসাহৌ ভয়ং তথা। জুগুপ্সা বিস্ময়শ্চেতি স্থায়িভাবাঃ প্রকীর্তিতাঃ [৪]।জগতসংসারে বস্তুতঃ রস আমরা আস্বাদন করি বাহ্য ইন্দ্রিয় রসনা দিয়ে,সাহিত্যের রস আস্বাদন করা হয় অন্তরিন্দ্রিয় মন দিয়ে।মহাকবি কালিদাসের বর্ণনা শক্তি অতুলনীয়। মহাকবি সৃষ্ট প্রতি চরিত্রেই রয়েছে অভিনবত্ব। 'নবরসরুচিরা' কবির বাণী। শৃঙ্গার,হাস্য,করুণ যে কোন রসই তার প্রতিভায় পরিপাক হয়ে বাগদেবীর অনর্থ নৈবেদ্যে পরিণত হয়েছে।

সূচক শব্দ : অভিজ্ঞানশকুন্তলম্, রস, স্থায়ীভাব,বিদূষক, অনসূয়া, প্রিয়ংবদা, হাস্যরস।

ভূমিকা : সহৃদয় সামাজিকগণের চিত্তই শুধুমাত্র রস আস্বাদন করতে পারে। সাহিত্যদর্পণকার বিশ্বনাথ বলেছেন যে 'রসের -আস্বাদ' বললে রস ও স্বাদের মধ্যে একটা ভেদ স্বীকার করা হয় তা কাল্পনিক। রসের প্রতীতি অনুভূতি ই হচ্ছে রস। এ

রস জিনিসটি লৌকিক নয়। শোক হচ্ছে বেদনাদায়ক ভাব। লৌকিক জগতে বাহ্যিক কারণে মানুষের মনে জাগে শোক ও তার কারণের এক অলৌকিক চিত্র কাব্যে ফুটিয়ে তোলেন তখন পাঠকের মনে অলৌকিক করুণ রসের উদয় হয়। সাহিত্য দর্পণের প্রথম পরিচ্ছেদে আচার্য বিশ্বনাথ বলেছেন-"বাক্যং রসাত্মকং কাব্যম্"। রসই কাব্যের আত্মা। নাট্যবিষয়ে বিভাব অনুভাব ও ব্যভিচারী ভাবের সংযোগে রসনিষ্পত্তি হয়ে থাকে। আচার্য ভরত উল্লিখিত 'রসনিষ্পত্তি' শব্দটি নিয়ে আলঙ্কারিকদের মধ্যে নানা মতবিরোধ দেখা যায়। সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্রে যে নয়টি রসের কথা ভরতমুনি তাঁর নাট্যশাস্ত্রে উল্লেখ করেছেন তার মধ্যে অন্যতম হল হাস্যরস। প্রাচীন ভারতীয় অলঙ্কারিকগণ নবরসের অন্যতম রূপে হাস্যরসকে স্বীকার করেছেন এবং হাস্যের বাহ্যপ্রকাশ আনন্দের মধ্যে দিয়ে হয়ে থাকে। প্রাচীন ভারতীয় আলঙ্কারিকগণ নবরসের অন্যতম রূপে হাস্যরসকে স্বীকার করেন এবং অন্যতম প্রধান মনোবৃত্তিরূপে 'হাস' স্থায়ীভাবকে অঙ্গীকার করে প্রতীচ্য মনস্তাত্ত্বিকগণ হইতে অধিক সূক্ষ্মদর্শিতার পরিচয় দিয়েছেন। ভরত বলেছেন-" অথ হাস্যো নাম হাসস্থায়িভাবাত্মকঃ।"[৫] আচার্য বিশ্বনাথ বলেছেন-"রস্যতে আস্বাদ্যতে ইতি রসঃ"।দর্পণকারের মতে রস ই কাব্যের আত্মা। সাহিত্যদর্পণের প্রথম পরিচ্ছেদে বলেছেন,আস্বাদনযোগ্য এই রস কাব্যের বীজ ও ফল দুই ই। ব্যবহারিক জগতে দৃশ্যমান যে সকল লৌকিক কারণে হাস্য সৃষ্ট হয় সাহিত্যে তারাই 'বিভাব' নামে অভিহিত হয়। সহৃদয় চিত্তে হাস্যরসাত্মক মনোভাব জাগ্রত করার মূল কারণ হচ্ছে 'আলম্বন বিভাব'।কিন্তু উদ্দীপন বিভাগগুলি সহকারি কারণ। 'উদ্দীপন বিভাব ' বলতে রসানুকূল পরিবেশ সূচিত হয়ে থাকে। অভিনবগুপ্ত বলেছেন যে শান্ত রসের আভাস ও হাস্যে পরিণত হতে পারে। হাস্যোরসোৎপাদক কারণ গুলিকে বিচার করলে দেখা যায় যে সকল রস ই হাস্যে পরিণত হতে পারে। ঔচিত্য হল রসের প্রাণ, সুতরাং অনৌচিত্য রসকে রসাভাসে পরিণত করে। আচার্য ক্ষেমেন্দ্র একটি সুন্দর উদাহরণে অনৌচিত্য থেকে কিরূপে হাস্যরস সৃষ্টি হতে পারে তা দেখিয়েছেন। যেমন-"কণ্ঠে মেখলয়া, নিতম্বফলকে তারেণ হারেণ বা পাণৌ নূপুর বন্ধনেন, চরণে কেয়ূর পাশেন বা শৌর্যেণ প্রণতে, রিপৌ করুণয়া, নায়ন্তি কে হাস্যতাম্। ঔচিত্যেন বিনা রুচিং প্রতনুতে নালংকৃতির্নো গুণাঃ"।অর্থাৎ যদি কেহ কণ্ঠে মেখলাদাম পরিধান করে, নিতম্বে মুক্তাহার ধারণ করে, হস্তদ্বয়ে নূপুর এবং চরণে কেয়ূর বন্ধন করে ও প্রণত ব্যক্তির নিকট শৌর্যপ্রকাশ এবং রিপুর প্রতি করুণা প্রকাশ করে তা হলে নিশ্চিত হাস্যাস্পদ হয়ে দাঁড়ায়। রসপ্রধান কাব্যে ঔচিত্যই কাব্যের জীবনস্বরূপ কিন্তু হাস্যরসপ্রধানকাব্যে অনৌচিত্যই তার আত্মা। শৃঙ্গার রসের ক্ষেত্রে যেমন শকুন্তলাবিষয়ক রতির আশ্রয় দুষ্যন্ত, হাস্যের ক্ষেত্রে তেমন কোন স্থায়িভাবের আশ্রয় নেই। সাহিত্যদর্পণকার বিশ্বনাথ বলেছেন- বিকৃত আকৃতি,বচন, অদ্ভুত বেশ প্রভৃতি আলম্বন ও অস্বাভাবিক যে কোন প্রকারের আচরণই উদ্দীপন। কিন্তু স্থায়িভাবাশ্রয় নায়কের কোন অস্তিত্ব নেই।[৬] সামাজিক নিজেকে নায়ক নায়িকার সাথে অভিন্ন জ্ঞান না করলে রস সৃষ্টি হয় না, অথচ

স্থায়িভাবের আশ্রয় নায়ক অবর্তমান থাকায় হাস্যরস সৃষ্টি হবে না। বিকৃত ও অস্বাভাবিক যে কোন প্রকারের আচরণই উদ্দীপন। কিন্তু স্থায়িভাবাশ্রয় নায়কের কোন অস্তিত্ব নেই। কাব্যপ্রকাশের সুধাসাগর টীকা তে বলা হয়েছে-"যস্যহাস্যস্তদনিবন্ধে হ্যপি সামর্থ্যাত্তদবসায়ঃ"। সামাজিক নিজেকে নায়ক- নায়িকার সাথে অভিন্ন জ্ঞান না করলে রস সৃষ্টি হয় না, অথচ স্থায়িভাবের আশ্রয় নায়ক অবর্তমান থাকায় হাস্যরস সৃষ্টি হবে না। দুটি হেতু অর্থাৎ হেত্বাভাস থাকলে যেরূপ হেতুর অবস্থান অসম্ভব, সেরূপ রসাভাস এবং রসের একাধিকরণস্থিতি ও অসম্ভব-"তত্র রসাদ্যাভাসত্বং রসত্বাদিনা ন সমানাধিকরণম্ নির্মলস্যৈব রসাদিত্বাত্, হেত্বাভাত্বমিব হেতুত্বেন ইত্যেকে" [৭]। শৃঙ্গাররস ও শৃঙ্গারসাভাস একত্রে থাকবে না, শৃঙ্গার রসাভাস হাস্যরস বিভাবে পরিণত হবে। স্থায়িভাবাশ্রয় সামাজিক হলে হাস্যরস প্রধান অভিনয় দর্শনে সামাজিক আপনাকে নায়কের স্থলাভিষিক্ত করে রসাস্বাদন করবে।ধন্যালোক গ্রন্থের লোচনটীকায় বলা হয়েছে-রসাভাস প্রভৃতিতে ও রসের ন্যায় ব্যঞ্জনা শক্তির কার্য বর্তমান। যে ব্যঞ্জনা শক্তির প্রভাবে রসাস্বাদ নিষ্পন্ন হয়, তাতে কিন্তু অনৌচিত্য জনিত কোন প্রতিবন্ধকের সৃষ্টি হয় না। literary Criticism in Ancient India গ্রন্থে রসতত্ত্ব সম্পর্কে উল্লিখিত হয়েছে " Rasa is a process of enjoyment of which the Vibhavas, Anubhavas and Vyabhicaribhavas constitute the means as such,unless these factors are presented clearly the comprehension of Rasa does not arise.[৮] হাস্যরসের আলম্বনবিভাব গুলির মধ্যে বিদূষক, শকার, বিট, চেট, পীঠমর্দ, ধূর্ত, পতিত, তাপস, তপস্বী প্রভৃতি নীচপাত্র প্রসিদ্ধ। এই সকল নীচপাত্রের আচরণ হাস্যরসের উদ্দীপন। হাস্যরসাত্মক নিবন্ধসমূহকে আলোচনা করলে হাস্যরস সৃষ্টি তে এদের সকলেরই প্রভাব দেখা গেলেও বিদূষক ই প্রধান আলম্বন রূপে প্রতীত হয়। আচার্য ভরত বিরচিত নাট্যশাস্ত্রে বিদূষক কে অভিনেতা কুশীলবগণের অন্যতম রূপে গ্রহণ করা হয়েছে।।[৯] পাশ্চাত্য সাহিত্যে হাস্যরসাত্মক সাহিত্যের ভান্ডার যথেষ্ট সমৃদ্ধ। পাশ্চাত্য সাহিত্যিক এবং দার্শনিকেরা হাস্যরসের বিভিন্ন শ্রেণীর কথা বলেছেন- এগুলি হল কৌতুক রস(Fun)), হিউমার (Humor), উইট (WIT), স্যাটায়ার (Satire)), কৌতুক সম্পর্কে ড. অজিত কুমার ঘোষ বলেছেন "কৌতুকময় হাস্যরসের মধ্যে উদ্ভট ও অস্বাভাবিক ঘটনা ও চরিত্রের সমাবেশ থাকে, যা সহজেই মনকে ধাক্কা দিয়ে সচকিত ও আমোদিত করে তোলে, তাই এই হাস্যরসের প্রাণ"। [১০] এই হাসি যার অবস্থান হৃদয়ের গভীরতম প্রদেশে নয়, মনের উপরিতলে এবং এর আবেদন মানুষের অনতিগভীর স্তরে, এই ধরণের হাসিকে বলা হয় কৌতুক বা Fun. হিউমার সম্পর্কে একটি প্রাচীন   মত প্রচলিত ছিল -মধ্য যুগের চিকিৎসকরা মনে করতেন মোট চারটি প্রধান রস বা হিউমার রয়েছে শরীরে। A Dictionary of Modern Critical Terms গ্রন্থে Humour বিষয়ে বলা হয়েছে-"In Medieval

medicine the four humours were the fluids whose dominance determined the nature (complexion) of men: Blood (sanguine) : phelgma (phlegmatic) choler (choleric) Black Choler or Bile (melancholic) অর্থাৎ রক্ত, শ্লেষ্মা, পিত্ত ও কৃষ্ণমেহ এই চারটি শারীরিক রস কি অনুপাতে মিশ্রিত হয়ে রয়েছে তার উপর নির্ভর করে একজন মানুষের শারীরিক ও মানসিক গুণাবলী [১১]। দ্বিজেন্দ্রলাল রায় তাঁর "কালিদাস ও ভবভূতি" প্রবন্ধে রস ই যে কাব্যের আত্মা তার যথাযথ প্রতিষ্ঠাতেই হিউমার সম্পর্কে বলেছেন-" আর এক প্রকারের রসিকতা আছে, তা অতি উচ্চ ধরণের, তা মিশ্র রসিকতা, হাস্যরসের সঙ্গে করুণ, শান্ত, রৌদ্র ইত্যাদি রস মিশাইয়া যে রসিকতা সৃষ্টি হয়, তাকে আমি মিশ্র রসিকতা বলছি। যে রসিকতা মুখে হাসি ফোটায় সঙ্গে চক্ষে জলধারা বইয়ে দেয় কিংবা যা পড়তে পড়তে আনন্দ ও বেদনা একসঙ্গে হৃদয়ে অনুভব করি, তা জগতের সাহিত্যে অতি বিরল।"[১২] ইংরাজীতে উইট শব্দটি র মূলগত অর্থ বুদ্ধি। যে হাসিতে বুদ্ধির প্রাধান্য থাকে পাশ্চাত্য সাহিত্যে তাকে wit বলা হয়। এর সৃষ্টি যেমন বুদ্ধি প্রধান মস্তিষ্কে তেমনি এর আবেদন বুদ্ধি প্রধান হৃদয়ে। এই হাস্যরসকে উপলব্ধি করার জন্য চাই শিক্ষা ও বুদ্ধি। বুদ্ধি গ্রাহ্য এবং শিক্ষাসাপেক্ষ বলে এর আবেদন স্বতঃস্ফূর্ত নয়।[১৩] স্যাটায়ারের হাসি যন্ত্রণা মিশ্রিত ও বিদ্রূপাত্মক। ইংরাজী 'satire' শব্দটি ল্যাটিন 'satura' কৌতুক ও ব্যঙ্গ প্রকৃতিগতভাবে দুটি ভিন্ন বস্তু হলেও স্যাটায়ারের উদ্দেশ্য হল হাস্যরসাত্মক ভঙ্গিতে ব্যঙ্গ্য বা শ্লেষ্মা বা বিদ্রূপের দ্বারা সমাজের বিভিন্ন অসঙ্গতি কে আঘাত করে ভালোর দিকে নিয়ে যাওয়া।[১৪]

প্রধান অংশ: মহাকবি কালিদাস বিরচিত সপ্তাঙ্ক নাটক অভিজ্ঞান শকুন্তলম্ সংস্কৃত সাহিত্য তথা বিশ্ব সাহিত্যে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। মহাভারতে বর্ণিত হস্তিনাপুররাজ দুষ্যন্ত ও আশ্রমবালিকা বিশ্বামিত্র কন্যা শকুন্তলা র প্রণয় ও পরিণয় কাহিনীই নাটকে মুখ্য উপজীব্য। ব্যাসদেব রচিত মহাভারতের আদিপর্ব থেকে মহাকবি বিষয়বস্তু সংগ্রহ করলেও নাটক টি কালিদাসের কবি কল্পনার এক অপরা সৃষ্টি। রস ই যে কাব্যের আত্মা তার যথাযথ প্রতিষ্ঠাতেই কাব্য রচনার সার্থকতা। অভিজ্ঞানশকুন্তলম্ নাটকের প্রারম্ভে ই সূত্রধরের উক্তি তর মাধ্যমে তা প্রকাশিত হয়েছে সেখানে উল্লিখিত হয়েছে "রস ও ভাবে র বিশেষ শিক্ষক মহারাজ বিক্রমাদিত্যের এই সভা, কালিদাস প্রণীত নূতন অভিজ্ঞানশকুন্তলম্ নামক নাটক দ্বারা এই সভার সভ্যগণকে আমরা সন্তুষ্ট করিব"।[১৫] নাট্যকার অভিজ্ঞানশকুন্তলম্ নাটকের চতুর্থ অঙ্কে যথার্থ ই বলেছেন "কাব্যেষু নাটকং রম্যং তত্র রম্যা শকুন্তলা"। সকল রসেরই যথার্থ রূপে বিন্যাস পরিলক্ষিত হয়ে থাকে আলোচ্য নাটকে। অভিজ্ঞানশকুন্তলম্ এই সপ্তাঙ্ক নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কে বিদূষক মাধব্য ও দুষ্যন্তের বার্তালাপের মাধ্যমে দর্শক হৃদয়ে হাস্যরসের উদ্রেক সঞ্চার করে। গৌণ রূপে দুষ্যন্তের উক্তির মাধ্যমে ও রস উপস্থাপনার নিদর্শন পাই। নাটকে উপস্থাপিত গৌণচরিত্র সমূহের মধ্যে অনসূয়া ও প্রিয়ংবদা কালিদাসের নিজস্ব

সৃষ্টি। চরিত্র দুটি মুখ্যচরিত্র শকুন্তলার চরিত্র চিত্রণে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে। প্রিয়ংবদা উচ্ছল, চপল, বাকপটু অপরদিকে অনসূয়া কিঞ্চিত সংযত। প্রিয়ংবদা তুলনামূলক আবেগপ্রবণ হলে ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব সম্পন্না। অপরদিকে অনসূয়া ধীর, বাস্তববুদ্ধি ও দূরদৃষ্টিসম্পন্না। অভিজ্ঞানশকুন্তলম্ নাটকে নবরসের ই যথার্থরূপে বিন্যাস পরিলক্ষিত হয়ে থাকে। সপ্তাঙ্ক নাটকটির দ্বিতীয় অঙ্কে বিদূষক ও দুষ্যন্তের বার্তালাপ দর্শক হৃদয়ে হাস্যরসের উদ্রেক সঞ্চার করে। অভিজ্ঞানশকুন্তলম্ নাটকে বিদূষক মাধব্য হাস্যরসের প্রধান আশ্রয় তার অঙ্গ-ভঙ্গী, দেহসংস্থান সবই মধুর হাস্যরসের জনক। মৃগয়ার রাজার সর্বক্ষণের সঙ্গী বিদূষক,একে মৃগয়ার অক্লান্ত পরিশ্রম অপরদিকে রাজা সারাদিন শকুন্তলা বিষয়ক আকুলতার মাঝে পরে প্রায় বিশ্রামহীন দিনযাপন করছিলেন। সেই সময় বিদূষক নিজের দুর্দশা অভিব্যক্ত করার জন্য অদ্ভুত অঙ্গ ভঙ্গী করে জানান যে তিনি হাত পা এর চালনা শক্তি প্রায় হারিয়ে ফেলেছেন। প্রত্যুত্তরে রাজা এই অবস্থার কারণ জানতে চাইলে ব্যঞ্জকপূর্ণ উক্তি করেছেন-“নিজের হাতে চোখে আঘাত করে জানতে চাইছ, চোখে জল কেন”। এইরূপ সরস, বুদ্ধিদীপ্ত রসিকতা গুলি দর্শক সামাজিকের হৃদয়ে হাস্যরসের সঞ্চার করে। পুনরায় নিজের এই দুর্দশার জন্য রাজা দুষ্যন্ত যে পরোক্ষ ভাবে দায়ী সেকথা জানানোর জন্য নিজের অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সরস মন্তব্য করেছেন- “নদীর মধ্যে বেতস গাছ যে নুইয়ে পড়ে, সে কি স্বেচ্ছায় নুইয়ে পড়ে, না নদীর বেগ তাকে নুইয়ে দেয়।”![১৬] আবার বিদূষক যখন মৃগয়ার ক্লান্তি কর দিনগুলির বর্ণনা করে চলেছেন, দুষ্যন্ত তখন শকুন্তলার চিন্তায় নিমগ্ন, অন্যমনস্ক রাজার প্রতি বিদূষকের মন্তব্য “ এতক্ষণ তাহলে অরণ্যে রোদন করলাম”। এই সমস্ত উক্তির মাধ্যমে কিছুটা হলেও বিদূষক দুষ্যন্তকে তার কর্তব্যের প্রতি সচেতন হওয়ার বার্তা দিয়েছেন। দ্বিতীয় অঙ্কে মৃগয়ার দৃশ্য যখনই একঘেয়েমির সৃষ্টি করেছে তখন ই বিদূষকের সরস মন্তব্য দর্শক হৃদয়ে হাস্যরসের সঞ্চার ঘটিয়েছে। বিদূষক মাধব্য চরিত্রটি মৃগয়াবিহারী রাজার সর্বক্ষণের সঙ্গী,মৃগয়ার দিনগুলি যতই ক্লান্তি কর হোক না কেন সে নিজ কর্তব্য থেকে কখন ই বিচ্যুত হয়নি। অপরদিকে শকুন্তলার জন্মবৃত্তান্ত শুনে একজন মহর্ষি কন্যার প্রতি অনুরক্ত হওয়া সমীচীন কিনা, সেইরূপ দ্বিধান্বিত চিত্ত রাজাকে দেখে বিদূষকের সরস মন্তব্য “লোকে যেমন সুমিষ্ট খেজুর খেয়ে মুখবদলানোর জন্য তেঁতুল খেতে চায়, সেরূপ অন্তঃপুরের স্ত্রী রত্ন ভোগ করে, এবার একে পাওয়ার ইচ্ছা হয়েছে। কিছুটা হলে ও রাজ পরিবারের মান মর্যাদাকে স্মরণ করিয়ে দেওয়ার প্রচেষ্টা পরিলক্ষিত হয়েছে বিদূষকের তীর্যক মন্তব্যে। শকুন্তলার প্রতি গভীর অনুরাগ উপলব্ধি করে এক প্রকৃত বন্ধু র মত পরামর্শ দিয়েছেন। শকুন্তলার স্মৃতিতে বন্ধুর আবদ্ধচিত্ত দুষ্যন্ত যখন অনাঘ্রাত অনাবিদ্ধরত্ন শকুন্তলার প্রতি মনোভাব প্রকাশে দেরী না করাই শ্রেয় অন্যথা ঈঙ্গুদী তেল মাখা কোন তপস্বীর হাতে পড়ে যাবে । রাজা দুষ্মন্তের নিজ বংশমর্যাদার, রাজার কর্তব্য, আদর্শ অপরদিকে তপস্বী কন্যা শকুন্তলার

প্রতি গভীর অনুরাগ এই দুই এর অসম্ভব টানা পোড়েনে কিংকর্তব্যবিমূঢ় ঠিক তখনই বিদূষক চরিত্রটির মাধ্যমে মহাকবি কালিদাস জীবনের বাস্তব চিত্র প্রস্ফুটিত করতে চেয়েছেন। বুদ্ধি ও হৃদয়ের দ্বন্দ্বে কখন ও কখন ও হৃদয়কে হার মানতে হয়। দুষ্যন্ত চরিত্রটি তার একজ্বলন্ত নিদর্শন। জীবন যে সুখ-দুঃখের আবর্তে আবর্তিত সেটা বোঝা তেই হয়তো মহাকবি কালিদাসের বিদূষক চরিত্র চিত্রণ। রাজার শুভবোধের উন্মেষ ঘটানোর দায়িত্ব যেমন তার ওপর বর্তায় সেই রকমই এক বন্ধু হয়ে অপর বন্ধুর কষ্ট দেখে বিরত থাকতে পারেনি। মাধব্য চরিত্রটি যথেষ্ট বুদ্ধিমান, দূরদর্শী, বিবেচক অবশ্যই স্পষ্ট বক্তা। দুষ্যন্ত শকুন্তলা তার প্রতি আদৌ অনুরক্ত কিনা সে বিষয়ে বিদূষকের পরামর্শে আশ্বস্ত হয়েছেন। বিদূষকের দুষ্যন্তের প্রতি বাণী"তুমি তপোবনকে উপবন করে ছাড়লে"ইত্যাদি রসিকতা গুলি অবশ্যই দৃশ্যকাব্যকে উপভোগ্য করে তুলতে সহায়ক হয়েছে। অপর দুটি চরিত্র অনসূয়া ও প্রিয়ংবদা চরিত্র চিত্রণ নাটকটির হাস্যরস সৃষ্টি তে অনুঘটকের ভূমিকা পালন করেছে। প্রিয়ংবদা চরিত্রটির নামকরণে মহাকবি কালিদাস অবশ্যই সার্থক বলা যেতে পারে। প্রিয়ংবদা ভাবগম্ভীর হীনা, প্রাণচঞ্চলা, সুমিষ্ট রসোক্তি শকুন্তলার হৃদয়ে দুষ্যন্তের প্রতি অনুরাগকে দৃঢ় করতে সহায়ক হয়েছে। আম্রবৃক্ষের শাখায় 'বনজ্যোৎস্না লতা'জড়িয়ে রয়েছে, শকুন্তলাকে সেদিকে উৎসুক নয়নে তাকিয়ে থাকতে দেখে রসিকতা করে প্রিয়ংবদা বলেছে "ও ভাবে, বনজ্যোৎস্না যেমন আম্রবৃক্ষের সাথে মিলন হয়েছে, তেমনি মনের মত বর যাতে পাই এই ভাবনায় ব্যাকুল হয়ে তার দিকে চেয়ে রয়েছে শকুন্তলা।[১৭] দুষ্যন্তের দেখা না পেয়ে শকুন্তলার দেহ-মন দুই ই অস্থির। প্রিয় সখী কে সুস্থ করতে দুই সখী অত্যন্ত তৎপর। নানাভাবে শকুন্তলা কে পীড়নমুক্ত করার প্রচেষ্টায় রত সেই মুহূর্তে দুষ্যন্তের আগমন দেখে প্রিয়ংবদা র সরস মন্তব্য-"এতক্ষণে এসে ঔষধ পড়ল, এবার সখী সেরে উঠবে "। শকুন্তলার সর্বক্ষণের সাথী তার দুই সখী অনসূয়া ও প্রিয়ংবদা, এই দুই সখী ব্যতিরেকে শকুন্তলা চরিত্রটি সম্পূর্ণ হতে পারে না কালিদাসের রসকল্পনার স্নিগ্ধতা ও সৌন্দর্য সৃষ্টিতে বিদূষক অনসূয়া-প্রিয়ংবদা চরিত্র গুলির ভূমিকা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। কালিদাস দাম্পত্য প্রেমের আদর্শ চিত্র পরিস্ফুট করতে চেয়েছেন, সেখানে তপস্বী কন্যার প্রতি দুষ্যন্তের কামনাময় আসক্তির প্রতি মাধব্যের ঔদাসীন্য সে বার্তা ই বহন করেছে। বিদূষকের দৃষ্টিতে রাজার তপস্বী কন্যাতে অনুরাগ বিস্ফোটকের ন্যায়ই দূষণীয়। মাধব্য চরিত্র চিত্রণের দ্বারা মহাকবি কালিদাস সামাজিক বার্তা প্রেরণ করতে চেয়েছেন।অভিজ্ঞানশকুন্তলম্ নাটকের ষষ্ঠ অঙ্কের পর মাধব্যের সাথে দর্শক সামাজিকের চাক্ষুষ পরিচয় হয়নি। হাস্যের মধ্যে এমন একটি সংবেদন রয়েছে যা মানুষের হৃদয়ের অন্তরালে আঘাত এনে বিবেকবোধ জাগ্রত করে তুলতে চায়। কবির তীব্র ব্যঙ্গ যুক্ত রচনা সৃষ্টি র অন্যতম উদ্দেশ্য সামাজিক বা ব্যক্তি বিশেষের ত্রুটি সংশোধন। অনসূয়া-প্রিয়ংবদা চরিত্র সৃষ্টিতে মহাকবি দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়েছেন। আপাত সহজ সরল অনাড়ম্বর জটিলতাহীন জীবন যাপনে অভ্যস্ত সখীর আগামী জীবন

বিপর্যয়ের ইঙ্গিত বহন করে আনে। হাস্যরসের সাথে চিন্তা ও ভাবের সমন্বয় ঘটলে তা যথার্থ হাস্যে পরিণত হয়। হাস্যরস প্রধান রচনা অনেক ক্ষেত্রে সামাজিক ত্রুটি বা ব্যক্তি বিশেষের অথবা জাতি বিশেষের অনেক ত্রুটি সংশোধন করতে পারে। হাস্যের মধ্যে এমন একটি সূক্ষ্ম সংবেদন আছে যা মানুষের নিভৃত স্থানে আঘাত করে তাকে আত্মসচেতন করে তুলতে সক্ষম হয়। হাস্যরসাত্মক সাহিত্যের উদ্দেশ্য মঙ্গল সাধন, সে সমাজেরই হোক অথবা ব্যক্তির ই হোক। মানুষের সভ্যতা যত বিবর্তন লাভ করেছে তত ই মানুষের হাসির সঙ্গে চিন্তাশীলতা যুক্ত হয়েছে এবং হাসি উদ্দেশ্য মূলক হয়ে পড়েছে। হাস্যরসের নিপুণ বিশ্লেষণ না হলেও বিভিন্ন সাহিত্য পর্যালোচনা দ্বারা সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, বিকৃত বেশভূষা, বিকৃত অঙ্গ, বিরুদ্ধ প্রলাপ এগুলির দ্বারা যে হাস্যরসের উদ্রেক হয়ে থাকে তার উপলব্ধি হৃদয় দিয়ে নয়,অবশ্যই বুদ্ধিদ্বারা।

তথ্যসূত্র :

১. সাহিত্যদর্পন (১/৩)
২. কাব্যালোক পৃ:১১
৩. নাট্যশাস্ত্র (৬/৩৫)
৪. নাট্যশাস্ত্র (৬/১৮)
৫. নাট্যশাস্ত্র (৬/৫৬)
৬. সাহিত্য দর্পণ ,পৃ:২০৭।
৭. রসগঙ্গাধর, পৃ:১২০
৮. literaray Criticism in Ancient India, Theory of Rasa, pg 303
৯. নাট্যশাস্ত্র, অধ্যায় ৩৫,শ্লোক ২০-২১
১০. বঙ্গসাহিত্যে হাস্যরসের ধারা, পৃ:৩৫
১১. Gareth Griffiths. Homours A Dictionary of Modern Critical Terms, pg 117
১২. কালিদাস ও ভবভূতি, পৃ:৬৭৫
১৩. বঙ্গসাহিত্যে হাস্যরসের ধারা, পৃ:৩০
১৪. বঙ্গসাহিত্যে হাস্যরসের ধারা, পৃ:৩২
১৫. অভিজ্ঞানশকুন্তলম্, পৃ:৬
১৬. অভিজ্ঞানশকুন্তলম্, পৃ ১১৫
১৭. অভিজ্ঞানশকুন্তলম্, পৃ ৫২

গ্রন্থপঞ্জী:

- ঘোষ, অজিত কুমার। *বঙ্গসাহিত্যে হাস্যরসের ধারা।* কলিকাতা:করুণা প্রকাশনী, ১৯৮৯ (তৃতীয় সংস্করণ)।
- গুপ্ত ,অতুলচন্দ্র। *কাব্যজিজ্ঞাসা।* কলিকাতা :কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬৮। মুদ্রিত।
- চৌধুরী, সত্যদেব। *কাব্যালংকার।* দিল্লী:পরিমল পাবলিকেশন, ১৯৯০ (দ্বিতীয় সংস্করণ)। মুদ্রিত।
- দাস, করুণাসিন্ধু। *কাব্যজিজ্ঞাসার রূপরেখা।* কলিকাতা:রত্নাবলী, ১৯৯৪। মুদ্রিত।
- দাসগুপ্ত, সুধীর কুমার। *কাব্যালোক।* কলিকাতা:দে'জ পাবলিশিং হাউস, ১৪০৫ বঙ্গাব্দ। মুদ্রিত।
- রায়, দ্বিজেন্দ্রলাল। *কালিদাস ও ভবভূতি।* দ্বিজেন্দ্র রচনাবলী। ৩২ এ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড,কলিকাতা ৯:সাহিত্য সংসদ, ডিসেম্বর ২০০৭।
- বসু, অনিল চন্দ্র। *অভিজ্ঞানশকুন্তলম্।* কলিকাতা:সংস্কৃত বুক ডিপো, ২০০৫। মুদ্রিত।
- ভট্টাচার্য, বিষ্ণুপদ। *প্রাচীন ভারতীয় অলঙ্কারশাস্ত্রের ভূমিকা।* কলিকাতা:সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার। মুদ্রিত।
- ভট্টাচার্য, সাধন কুমার। *এরিস্টটলের পোয়েটিক্স।* কলিকাতা:দে’জ পাবলিশিং হাউস। মুদ্রিত।
- মুখোপাধ্যায়, বিমলাকান্ত।*সাহিত্য দর্পণঃ।* কলিকাতা-৯।
- De, Sushil Kumar. *History of Sanskrit Poetics.* Calcutta:Firma, K. L. Mukhopadhayay, 1960.print.
- Mukherjee, Ramaranjan.*Literary Criticism in Ancient India.* Calcutta:Sanskrit Pustak Bhandar, 1990.Print.
- *The Abhigyananasakuntalam of Kalidasa*, edited by M R KALE । Delhi:Motilal Banarasidass । 1969 (Tenth Edition) ।

প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসের সাহিত্য : বিষ্ণুস্মৃতি

অনুশ্রিতা মণ্ডল
সহকারী অধ্যাপক, সংস্কৃত বিভাগ, সুরেন্দ্রনাথ কলেজ

ভূমিকা- প্রাচীন ভারতীয় সমাজশাস্ত্রের রূপ প্রতিবিম্বিত হয়েছে স্মৃতিশাস্ত্রগুলিতে। যাজ্ঞবল্ক্য প্রণীত বিংশতি ধর্মশাস্ত্রকারদের মধ্যে বিষ্ণু অন্যতম।*বিষ্ণুধর্মসূত্র* বা *বিষ্ণুধর্মশাস্ত্র* বা *বিষ্ণুস্মৃতি* নামে খ্যাত গ্রন্থটির রচয়িতা হলেন বিষ্ণু। *কৃষ্ণযজুর্বেদের* কারায়ণীয় কাঠক শাখার সাথে সম্বন্ধিত এই গ্রন্থটি ভগবান বিষ্ণু ও পৃথিবীর কথোপকথনের মাধ্যমে পরিবেশিত হয়েছে। এই স্মৃতি প্রাচীনত্বের দাবী রাখলেও, বর্তমানে প্রাপ্ত *বিষ্ণুস্মৃতি* আধুনিক গবেষক প্যাত্রিক অলিভেল এর মতে পঞ্চম থেকে সপ্তম শতকের মধ্যবর্তী সময়ে পুনরায় নবরূপে সংকলিত হয়। একশত অধ্যায়ে বিভক্ত এই গ্রন্থের রচনাস্থল হল কাশ্মীর ও সংলগ্ন অঞ্চল। এই গ্রন্থের সবচেয়ে প্রধান বৈশিষ্ট্য হল এখানে ভক্তিবাদ প্রাধান্য পেয়েছে। ১৬২২ শতকে নন্দ পণ্ডিত দ্বারা এই স্মৃতির একমাত্র টীকা হল কেশব বৈজয়ন্তী।

ধর্মশাস্ত্রে আপাতদৃষ্টিতে ধর্মশাস্ত্রীয় উপাদানই লক্ষ্য করা যায়। *বিষ্ণুস্মৃতি*ও তার ব্যতিক্রম নয়। আভ্যন্তরীণ নানা বিষয়ের আলোচনা থেকে এই স্মৃতি প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ নথি রূপে প্রতিভাত হয়েছে। তবে *বিষ্ণুস্মৃতি* ধর্মশাস্ত্রের চিরাচরিত দৃষ্টিভঙ্গিকে পুনরায় ভাবতে ইন্ধন জুগিয়েছে। ধর্মশাস্ত্র বহির্ভূত বিবিধ উপাদান এই স্মৃতি আত্মীকরণ করেছে। প্রাচীন ভারতের আর্থ-সামাজিক-ধর্মীয়-রাজনৈতিক-ভৌগলিক উপাদানের পাশাপাশি এই স্মৃতিতে বহুমাত্রায় সন্নিবিষ্ট হয়েছে ঐতিহাসিক উপাদান। প্রাচীনভারতীয় সাহিত্যধারায় ধর্মশাস্ত্র তথা স্মৃতিশাস্ত্রের আলোচ্য বিষয় বহুব্যাপক। স্থালীপুলাকন্যায় দ্বারা বর্তমান গবেষণা পত্রে *বিষ্ণুস্মৃতি*তে প্রাপ্ত ধর্মশাস্ত্রীয় ও ঐতিহাসিক উপাদানের তুলনামূলক আলোচনার মাধ্যমে প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসে '*বিষ্ণুস্মৃতির*' ঐতিহাসিক গুরুত্ব আলোচনাই এই পত্রের প্রধান আলোচ্য বিষয়। গবেষণা পত্রের প্রথমভাগে প্রাপ্ত ঐতিহাসিক উপাদানের বর্ণনা করা হয়েছে। এখানে প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদান(মূর্তি, মন্দির, বিষ্ণুপূজা এবং তৎ-সম্বন্ধীয় নানা বিষয়(প্রাণপ্রতিষ্ঠা, চক্ষুদান, পঞ্চ উপচার, ঘটস্থাপন ইত্যাদি) এবং সাহিত্যিক উপাদান(সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয়) সম্বলিত হয়েছে। এই ব্যাখ্যার ভিত্তিতে পত্রের দ্বিতীয়ভাগে প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস তথা কাশ্মীরের ইতিহাসে *বিষ্ণুস্মৃতির* গুরুত্বকে উপস্থাপন করা হয়েছে।'ইতিহাস' পদটির উল্লেখ স্মৃতিতে বহুবার উদ্ধৃত হওয়া থেকে অনুমিত হয় বিষয় রূপে ইতিহাসের প্রয়োগ সমাজে ছিল। এমনকি ইতিহাসজ্ঞকে শ্রাদ্ধের পঙক্তি পাবক মানা হত।

বিশ্লেষণ- কাশ্মীরে প্রাপ্ত মূর্তিগুলির সাথে *বিষ্ণুস্মৃতি*তে বর্ণিত সাহিত্যগত

উপাদানের উদ্ধৃতি একেবারে মিলে যায়। "কিরীটিনং কুণ্ডলিনমঙ্গদিনং বনমালাবিভূষিতোরস্কং সৌম্যরূপং চতুর্ভুজং শঙ্খচক্রগদাপদ্মধরং **চরণমধ্যগতভুবং** ধ্যায়েত্"। প্যাত্রিক অলিভেল এই মতকে স্বীকার করেছেন। বিষ্ণুস্মৃতির সমীক্ষাত্মক গ্রন্থে মধ্যপ্রদেশ থেকে চারটি পাথরের বিষ্ণুমূর্তিতে বিষ্ণুর পায়ের তলায় পৃথিবীর অবস্থান লক্ষিত হয়েছে(চিত্র ১)।কাশ্মীর তৎসংলগ্ন এলাকায় প্রাপ্ত বিষ্ণুমূর্তিতে পৃথিবীকে বিষ্ণুর দুই পায়ের মাঝে অবস্থান করতে দেখা যায়(চিত্র ২)। কাশ্মীর ভিন্ন ভারতের অন্যান্য স্থান থেকে প্রাপ্ত বিষ্ণুমূর্তিতে বিষ্ণুর পায়ের নীচে পৃথিবীর অবস্থান লক্ষ্য করা গেছে(চিত্র ৪ ও ৫)। গ্রন্থের রচনায় ভগবান বিষ্ণুর নাম সম্পৃক্ত থাকলেও রাজদরবারের পৃষ্ঠপোষকতা স্পষ্ট অনুমিত হয়। কাশ্মীরের রাজা চন্দ্রাপীড় (৬৮৬-৬৯৪ শতক) রাজত্ব করেছিলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য প্রজাদের রক্ষাকর্তা রাজার সাথে বরাহরূপী বিষ্ণুর অভেদ কল্পনা পুরাণেও দৃষ্ট হয়। রাজার বাঞ্ছিত লক্ষ্য লক্ষ্মী (ঐশ্বর্য বা রাজকোষ) এবং পৃথিবী(ভূমি বা রাজ্যের পরিধি) তাই সহজেই বিষ্ণুর সাথে রাজার সাদৃশ্য স্থাপিত হয়। এই সময় কাশ্মীরে নির্মীত বিষ্ণুমূর্তিগুলির নামকরণ রাজার নামের সাথে 'বিষ্ণু' পদ যোগ করে হত যেমন বিষ্ণুরণস্বামী, বিষ্ণুমলহনস্বামী। পরবর্তীকালে মুক্তাপীড়ের সময় বিষ্ণুর অবতারগুলির বিকাশের সাথে সাথে সেই নাম গুলি যোগ করে রাখা হত কেশবস্বামী, রামস্বামী, মহাবরাহ ইত্যাদি। *বিষ্ণুস্মৃতি*তে বিষ্ণুর প্রাথমিক অবতারগুলির উল্লেখের সাথে অনুমান করা যায় যে, বর্তমানে প্রাপ্ত *বিষ্ণুস্মৃতি*র নবরূপ ললিতাদিত্য মুক্তাপীড়ের (৬৯৯-৭৩৬ শতক) সময় তার অনুপ্রেরণায় সংকলিত হয়েছে। ইতিহাস তথ্য থেকে জানা যায়, কারকোট বংশের সময়ে কাশ্মীরে বৈষ্ণবধর্ম প্রাধান্য লাভ করে। তবে অন্যান্য প্রচলিত মতধারা যে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল, *বিষ্ণুস্মৃতি*তে 'আর্যাপথ', 'তথাগত' পদগুলির ব্যবহার থেকে তা স্পষ্ট। *বিষ্ণুস্মৃতি*তে গ্রন্থপাঠের ফল বর্ণিত আছে যা প্রমাণ করে সমাজে এরূপ কোনও গ্রন্থ নিত্যপাঠের বিষয় ছিল। *বিষ্ণুধর্মোত্তরপুরাণে*ও বৈষ্ণবী সংহিতা নামে গ্রন্থের উল্লেখ পাই যা নিত্য পাঠের বিষয় ছিল। এই গ্রন্থ পাঠ দ্বারা বিষ্ণুপ্রীতি লাভ হত। *বিষ্ণুস্মৃতি*তে এই গ্রন্থকে পাঠ্য বলা হয়েছে কারণ ইহা ভগবান বিষ্ণুর মুখ নিঃসৃত তথা দ্বিজ পাঠক ধর্মে গতি লাভ করে।

৯৫৯শতকে রাজস্থানের জগতের আম্বিকা মন্দিরে 'গুডামণ্ডপস্তম্ভ' শিলালেখে *বিষ্ণুস্মৃতি*র ৯১তম অধ্যায়ের শ্লোক উৎকীর্ণ আছে।*বিষ্ণুস্মৃতি*তে মূর্তিকে 'অর্চা' বলা হয়েছে। বিষ্ণুকে পতি ও লক্ষ্মীকে আদর্শ পত্নীরূপে দেখা হয়েছে। বিষ্ণুপূজা গৃহস্থের জন্য আবশ্যিক। অষ্টাঙ্গ নমস্কার, জীবাদান, চক্ষুদানরূপ বহু অর্বাচীন নিয়ম এখানে সংযোজিত হয়েছে। রাম শরণ শর্মার মতে ৩০০ থেকে ৬০০ শতকে রচিত স্মৃতি, পুরাণগুলির মধ্যে সাক্ষাৎ বৈষ্ণবপ্রভাব দৃষ্ট হয়, যেমন *বিষ্ণুস্মৃতি, বৃহস্পতিস্মৃতি, বিষ্ণুপুরাণ, মতস্যপুরাণ*। মৌর্য পরবর্তী যুগে এক মিশ্র সংস্কৃতির উদ্ভব হয়, যাকে কেন্দ্র করে মন্দির নির্মাণ, দান, তীর্থ, বৃষ উৎসর্গ প্রভৃতি ধারণাগুলি বিকাশ লাভ করেছিল গ্রন্থে বলা হয়েছে দেবগৃহ নির্মাণকারী ব্যক্তি সেই দেবতার লোকে গমন

করে।*মনুস্মৃতি*তে দ্বিজাতির সাধারণ ধর্ম হল দান কিন্তু *বিষ্ণুস্মৃতিতে* প্রত্যেক সাধারণের জন্য দান বিহিত হয়েছে। স্ত্রী এবং শূদ্ররা ব্রত, উপবাস, পূজা এমন কি দানেও অধিকারী ছিল তার প্রমাণ মেলে। স্ত্রীলোক যদি ফাল্গুন মাসের পূর্ণিমা উত্তর ফাল্গুনী নক্ষত্র যুক্ত হলে ব্রাহ্মণকে সুশয্যা প্রদান করলে রূপবান,ধনবান, মনোজ্ঞ স্বামী লাভ করে। এর সাথেই সম্পর্কীত হল ব্রত। বলা হয়েছে, অক্ষয় তৃতীয়ার দিন যা কিছু দান করা হয় তা অক্ষয় হয়(৯০/১৮) পি বি.কানের মতে ইহা অক্ষয় তৃতীয়ার প্রাচীন উদ্ধৃতি। সামান্যধর্মের মধ্যেই দানকে রাখা হয়েছে। বিভিন্ন করের উল্লেখ থাকলেও ভূমিদান প্রসঙ্গে করের উল্লেখ এখানে না পাওয়ার পিছনে রাজাদের পুণ্যার্জনের ইচ্ছাকে অস্বীকার করা যায় না। তবে ভূ-সম্পদ হস্তান্তরের সময় যে রাজশাসন তৈরি হত তাকে তাম্র-শাসন বা তাম্র-পট্ট বলা হত। এগুলি লেখার জন্য কায়স্থ শ্রেণীর গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়। সম্ভবতঃ সেই ভাবনাকে মাথায় রেখেই তীর্থকর মকুব করা হয়েছিল। কাশ্মীরের বিভিন্ন ঐতিহাসিক গ্রন্থেও এর প্রমাণ মেলে। সামান্যধর্মেই তীর্থানুসরণকেও রাখা হয়েছে। সমগ্র ভারতীয় উপমহাদেশের বিভিন্ন তীর্থের নাম এখানে প্রদান করা হয়েছে। *বিষ্ণুস্মৃতি*তে পঁচাশিতম অধ্যায়ে প্রাপ্ত তীর্থের চিত্র নিম্নে প্রদত্ত হল (চিত্র ৩)।

ইরাণীয় শিলালেখে প্রথম ৪৮৬ শতকে এবং পরবর্তী কালে বরাহমিহিরের *সূর্যসিদ্ধান্তে* গ্রীক দিনাঙ্কের উল্লেখ পাওয়া যায়। *বিষ্ণুস্মৃতি*তেও সপ্তাহের উল্লেখ থেকে গ্রন্থের অর্বাচীনত্ব লক্ষিত হয়। এমনকি ৫১০ শতকে হূণ আক্রমণে এরাণ অঞ্চলের শাসক গোপরাজ নিহত হওয়ার পর স্বামীর চিতায় তার পত্নীর প্রাণ বিসর্জন সতীর প্রাচীনতম নজির। শাস্ত্রে সতীপ্রথার প্রাচীনতম উল্লেখ *বিষ্ণুস্মৃতি*তেই প্রাপ্ত হয়। নারীর অবস্থান বিশ্লেষণের দ্বারা সামাজিক ইতিহাসের অনেকাংশ স্পষ্ট হয়। স্ত্রীর কোনও স্বতন্ত্রতা না থাকলেওবানপ্রস্থে গমনকালে স্ত্রীর অনুমতি নিতে হত। সমাজে পুরুষের ব্যভিচারে প্রায়শ্চিত্তের বিধান আছে। সর্বোপরি ধর্মশাস্ত্রের ইতিহাসে কোনও নারীর উল্লেখ পাওয়া যায় না। *বিষ্ণুস্মৃতি* তার ব্যতিক্রম। এখানে সমগ্র গ্রন্থের উপস্থাপনাই বিষ্ণু ও পৃথিবীর বার্তালাপের মধ্যে দিয়ে হয়েছে। সেখানে পৃথিবী হল প্রশ্নকর্ত্রী। বিষ্ণুর ভার্যা রূপে হলেও আরও একজন নারীর উল্লেখ এখানে পাওয়া যায়, তিনি হলেন লক্ষ্মী।

উপসংহার- বেদ-পুরাণাদির ধারায় ধর্মশাস্ত্রের আগমন হলেও সময়ের দাবী মেনে সমাজে প্রচলিত রীতিনীতির সংযোজন বিয়োজন ঘটেছে। আঞ্চলিকপ্রভাবও অনুপ্রবেশ করে। সাহিত্য যখন কাব্যের আড়ালে ইতিহাসের উপাদানকে তুলে ধরে তখন সেই রচনা কালজয়ী হয়ে ওঠে। এই কারণেই সম্ভবত *বিষ্ণুস্মৃতি*র প্রাচীনত্বের সাথে অর্বাচীনত্বের মেলবন্ধন স্পষ্ট পরিলক্ষিত হয়। নিত্যপাঠের গ্রন্থ হয়ে ওঠার প্রতি এই জীবন্ত ইতিহাস অন্যতম কারণ।*বিষ্ণুস্মৃতি*র অধ্যয়ন বিনা কাশ্মীর তথা প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস সত্য অসম্পূর্ণ। মূর্তিশাস্ত্রীয় উদাহরণ থেকে ইহা স্পষ্ট যে,

বিষ্ণুস্মৃতি প্রাচীন ভারত তথা কাশ্মীরের ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে আছে।গবেষণার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যেতে পারে, *বিষ্ণুস্মৃতি* নিঃসন্দেহে এক মিশ্র সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও পরম্পরার ধারক ও বাহক।ধর্মশাস্ত্র এবং ইতিহাসের মধ্যে যে স্পষ্টভেদ আমরা স্বভাবত দেখতে পাই তা স্তিমিত হয়ে সংস্কৃত সাহিত্যের এক নববিধ সাহিত্যের বিকশিত করেছে। রক্ষণশীলতার বেড়াজাল থেকে বেরিয়ে উদারনৈতিক ধারণাকে সাহিত্যে স্থান দেবার প্রবণতা পুরাণের প্রাধান্যকেও সূচিত করে।প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসের পুনরাবলোকনে সর্বদা আলোচ্য।

চিত্রাবলি- চিত্র ১ চিত্র ২

চিত্র ৩ চিত্র ৪ চিত্র ৫

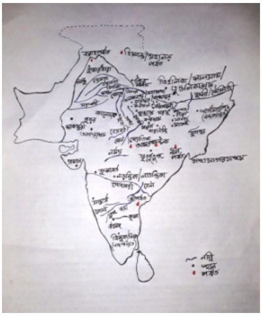

গ্রন্থপঞ্জি

১. Bhardwaj, Surinder Mohan. *Hindu places of Pilgrimage in India.* New Delhi: Munsiram Manoharlal Publishers Pvt. Ltd. 2003.

২. Chakravarti, Ranabir. *Bhārat-itihāserĀdiparva (Prathama Khaṇḍa).* Kolkata: Orient Black Swan Pvt. Ltd., 2009.

৩. Chatterjee, Heramba.*Studies in the Purāṇas and the Smṛtis* (Part I), Calcutta (Now Kolkata): Sanskrit College, 1986.

৪. Hazra, R. C. *Purāṇic Records on Hindu Rites and Custom.* Calcutta (Now Kolkata): University of Dacca, 1940.

________. *Studies in the Upapurāṇa*s. Vol. I & II. Calcutta (Now Kolkata): Sanskrit College, Rsearch Series No. II, 1958.

৫. Inden, Ronald. "Imperial Purāṇas: Kashmir as Vaiṣṇava Center of the Worlds". *Querying the Mediaval: Texts and the History of Practices in South Asia,* pp. 29-98. New York: Oxford University Press, 2000.

৬. Jha, Vivekanand. "Social Stratification in Ancient India: Some Reflections". *Social Scientist,* VOl. 19 No. ¾ (Mar.-Apr., 1991.) pp. 19-40. JSTOR.

৭. Kalahaṇa. *Rājataraṅgiṇī.* Trans. M.A. Stein, *Kalahaṇa's Rājataraṅgiṇī,*Vol I & II, Westminster: Archibald constable and company, 1900.

৮. Kane, P.V.*History of Dharma*śā*stra*, (Vol-I).Poona: BORI, 1930.

________. *History of Dharmaśāstra:* Vol-III, Poona: BORI, 1993(3rd edition)

৯. Kṣemendra. *Deśopadeśa&Narmamālā.* Ed. Madhusudana Kaul Sastri, Poona: Aryabhushan Press, Kashmir Series of texts and series No. 40, 1923.

১০. Keśavavaijayantī. Nanda Pandita. Ed. V. Krishnayaacharya. *ViṣṇuSmṛtiwith the commentary Keśavavaijayantī.*Vol. I&II. Madras: The Adyar library and research centre, 1964.

১১. MānavaDharmaśātra. Ed. Julius Jolly.London: Trubner& Co. Ludgate Hill, 1887.

১২. Olivelle, Patrick. “The date and provenance of the ViṣṇuSmṛti.” *IndologicaTaurinensia* 33. (2007): pp. 149–163.

________. *The law code of Viṣṇu* (A critical edition and annotated translation of the VaiṣṇavaDharmaśāstra). U.S.A.: Harvard University Press, 2009.

১৩. Pargiter, F.E. *Ancient Indian Historical Tradition.* London: Oxford University Press, 1922.

১৪. Shafiq, Misbah Nazir.“Buddhist temples in Kashmir”. *International Journal of fundamental & applied research*, Vol. 6+7, 2019, pp. 20-27.

১৫. Sharma, Mahesh. “Puranic Texts From Kashmir: Vitasta And River Ceremonials in The Nilamata Purana”. *South Asia Research*, Vol. 28(2), pp. 123-145.

১৬. "The date and provenance of the Viṣṇu Smṛti,." Indologica Taurinensia, 33. Olivelle, Patrick. 2007. 149–163.

১৭. Toshkani, S.S. *Rites and Rituals of Kashmiri Brahmins.* New Delhi: Pentagon Press, 2010.

১৮. Viṣṇu. *Viṣṇu Smṛti.* Ed. Julius Jolly. *The Institutes of Vishnu.* Calcutta (Now Kolkata): The Asiatic society, 1881.

১৯. Wilson, H.H. *Hindu History of Kashmir.* Calcutta (Now Kolkata): Susil Gupta (India) Private Limited, 1960.

২০. Yājñavalkya. *Yājñavalkya- Saṁhitā.* Ed. Narayana Ram Acharya. Delhi: Rastriya Sanskrit Sansthan, 2010(Rpt.).

বাংলা উপন্যাসে পরকীয়া প্রেম (নির্বাচিত উপন্যাস অবলম্বনে)

মোহাম্মদ বদিয়ত জামান
স্নাতক, রায়গঞ্জ কলেজ

সারসংক্ষেপ: মধ্যযুগের বিখ্যাত রোমান্টিক কবি সৈয়দ আলাওল তাঁর 'পদ্মাবতী' কাব্যে লিখেছেন-

"প্রেম বিনে ভাব নাহি, ভাব বিনে রস
ত্রিভুবনে যত দেখ প্রেম হন্তে বশ।"

আর এই প্রেম সর্বদা যে মন্ত্রের কঠিন অভেদ্য শিকলের দৃঢ় বন্ধনেই আটকে থাকবে তা নয়, হৃদয়ের দাবি এখানে মুখ্য। তাই সমাজে বরাবরই দেখা যায় বিবাহিত পুরুষ বা নারীর বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্ক অর্থাৎ পরকীয়া প্রেম। সাহিত্য সমাজের দর্পণ। তাই বাংলা উপন্যাসেও বারেবারে উঠে এসেছে সমাজ বিগর্হিত পরকীয়া প্রেমের কথা। কিছুদিন আগে মহামান্য সুপ্রিম কোর্ট নারী-পুরুষের সমানাধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে পরকীয়া প্রেমের স্বপক্ষে রায় দিয়েছেন। ফলে এই বিষয়টি আড্ডাপ্রিয় বাঙালির চর্চার মধ্যে আবারও উঠে এসেছে। এখন আমরা নির্বাচিত কিছু বাংলা উপন্যাসে এই পরকীয়া প্রেম কিভাবে উঠে এসেছে, তার পরিণতি বা কী হয়েছে তা আলোচনা করবো।

সূচক শব্দ: পরকীয়া প্রেম, বাংলা উপন্যাস, সমাজ বিগর্হিত প্রেম, হৃদয়ের দাবি।

মূল আলোচনা :

পরকীয়া (Adultery বা Extramarital affairs) হল বিবাহিত কোন ব্যক্তির (নারী বা পুরুষ) স্বামী বা স্ত্রী ছাড়া অন্য কোনো ব্যক্তির সাথে বিবাহোত্তর বা বিবাহ বহির্ভূত প্রেম।

কবির ভাষায়, "পৃথিবীতে প্রেম নামে একটা শব্দের চাবি দিয়ে কত দরজা খোলে।" কিন্তু তা যদি পরকীয়া প্রেম হয় তাহলে? সম্প্রতি সুপ্রিম কোর্টের রায়ে পরকীয়ার পথটাও এবার প্রশস্ত হয়ে গেছে। কোর্টের মতে, পরকীয়া আর অপরাধ নয়। অনেকে সুপ্রিম কোর্টের এই রায়কে যেমন স্বাগত জানিয়েছে তেমনি অনেকে এর নিন্দাও করেছে।

পরকীয়া নিয়ে ১৫৮ বছরের পুরোনো ৪৯৭ ধারাকে অসংবিধানিক বলে রায় দিয়েছে সর্বোচ্চ আদালত। যে আইন এত বছর আগে তৈরি হয়েছিল, তা তৎকালীন সমাজের প্রতিফলন। তাই সমানাধিকারের যুগে দাঁড়িয়ে সেই আইন সমর্থন করার অর্থ নারীকে পুরুষের ব্যক্তিগত সম্পত্তি হিসেবে ধরে নেওয়া। মূলত এই আইন পিতৃতান্ত্রিক সমাজের ফসল। বিশিষ্ট আইনজীবী অরুণাভ ঘোষ বলেন-

> "আমাদের দেশে পরকীয়া আর ফৌজদারি অপরাধ রইলো না। এতদিনে কোন বিবাহিতা নারী পরপুরুষের সঙ্গে সম্পর্ক করলে স্বামীর অভিযোগের ভিত্তিতে ওই প্রেমিকের বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা করা যেত। মহিলার বিরুদ্ধে মামলা হতো না, কিন্তু অভিযোগ প্রমাণিত হলে পরপুরুষকে সাজার মুখে পড়তে হতো। সুপ্রিম কোর্টের এই রায়ের পর আর ফৌজদারি মামলা করা যাবে না।"

তিনি জানান- "স্বামীর সম্মতি নিয়ে স্ত্রী পরকীয়া করলে অপরাধ হতো না। কিন্তু সেটা বাস্তবে সম্ভব ছিল না।" তবে তিনি বলেন, "আগের মতোই বিবাহবিচ্ছেদ মামলার ক্ষেত্রে পরকীয়া একটি জোরালো কারণ হিসেবে বিবেচিত হবে।"

ভারতীয় সংস্কৃতিতে নানাভাবে পরকীয়া উঠে এসেছে। সেখানে নারীকে নিন্দনীয় হিসেবেই দেখানো হয়েছে। এ ব্যাপারটি একেবারেই পিতৃতান্ত্রিক সমাজের ফসল বলে মনে করেন অনেকেই। নারীবাদী কবি কৃষ্ণা বসুর মতে- "স্বকীয় বা পরকীয়া কোন ব্যাপার নয়। প্রেম বা আকর্ষণটাই বড়। রাধা-কৃষ্ণের প্রেমের কাহিনী আমরা আদর করে পড়ি, তাহলে পরকীয়াতে আপত্তি করবো কেন?"

বাংলা উপন্যাসেও উঠে এসেছে এই পরকীয়া প্রেম। বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, মানিক বন্দোপাধ্যায়ের মত কালজয়ী সাহিত্যিকদের উপন্যাসে উঠে এসেছে সমাজ বিগর্হিত পরকীয়া প্রেম। আধুনিক যুগোপযোগী মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস লেখতে লেখক এই পরকীয়া প্রেমকে ইচ্ছামত বেশ কাজে লাগিয়েছেন বলা যায়। এধরনের কয়েকটি উপন্যাস আমরা এখন আলোচনা করবো।

'চোখের বালি'তে পরকীয়া প্রেম: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর উপন্যাসটির সূচনাতেই বলেছেন- "সাহিত্যের নবপর্যায়ের পদ্ধতি হচ্ছে ঘটনা পরম্পরার বিবরণ দেওয়া নয়, বিশ্লেষণ করে তাদের আঁতের কথা বের করে দেখানো।" আর এই আঁতের কথা টেনে বের করে দেখাতেই উপন্যাসে ধরা পড়েছে মহেন্দ্র-বিনোদিনীর পরকীয়া প্রেমের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিবরণ।

বিনোদিনী সুন্দরী, পড়াশোনা জানা মেয়ে, সেবাপরায়ণা, গৃহকর্মে সুনিপুণ, বিলাসিনী, পূজারতা নারী কিন্তু ভাগ্যের নির্মম পরিহাসে আজ সে যুবতী বিধবা। বিবাহের অনতিকাল পরেই বিনোদিনীর স্বামী প্লীহায় রোগাক্রান্ত হয়ে মারা যায়। তাই প্রেম-ভালোবাসা জিনিসগুলি বিনোদিনীর মনের গুপ্ত কোণে সুপ্ত অবস্থায় রয়ে গেল। বিনোদিনীর মনের এই সুপ্ত বাসনা আবার জেগে উঠলো বারাসাতে বিহারীকে পাঠানো মহেন্দ্রের একটি চিঠিতে। আশা-মহেন্দ্রের নবদাম্পত্যের নবপ্রেম নিয়ে এই চিঠি-

> "চিঠির মধ্যে বিনোদিনী কী রস পাইল, তাহা বিনোদিনীই জানে। কিন্তু তাহা কৌতুকরস নহে। বার বার করিয়া পড়িতে পড়িতে তাহার দুই চক্ষু মধ্যাহ্নের বালুকার মত জ্বলিতে লাগিল, তাহার নিঃশ্বাস মরুভূমির বাতাসের মতো উত্তপ্ত হইয়া উঠিল।"

আবার ক্ষুধিতহৃদয়া বিনোদিনী যখন রাজলক্ষ্মীর হাত ধরে আশা-মহেন্দ্রের সংসারে এসে উঠলো তখন সে- "নববধূর নবপ্রেমের ইতিহাস মাতালের জ্বালাময় মদের মতো কান পাতিয়া পান করিতে লাগিল। তাহার মস্তিষ্ক মাতিয়া শরীরের রক্ত জ্বলিয়া উঠিল।" যুবতী বিধবা বিনোদিনী কান পেতে আশা-মহেন্দ্রের দাম্পত্য জীবনের ছোট ছোট ঘটনাগুলি শুনতে লাগল। এভাবেই যেন সে তার অতৃপ্ত ভালবাসার সাধ পূরণ করতে চাইলো।

বিনোদিনী আবিষ্কার করলো মহিমের বন্ধু বিহারীও আশার প্রতি দুর্বল। বিনোদিনী রূপ-গুণ-কর্ম সবদিক থেকেই আশার চেয়ে শ্রেষ্ঠ অথচ মহেন্দ্র-বিহারী সবাই মজেছে আশাতে। আর তাই প্রতিহিংসাপরায়ণা বিনোদিনী উদ্যত হয়েছে আশার সুখের সংসার ধ্বংস করতে। দুর্বল ব্যক্তিত্বের পুরুষ মহেন্দ্রও ধরা পড়েছে বিনোদিনীর ফাঁদে। আর এখান থেকেই উপন্যাসে শুরু হয়েছে পরকীয়া প্রেম।

মহেন্দ্র পড়াশোনার অজুহাতে ছাত্রাবাসে গিয়ে উঠে। সেখানে আশারই ব-কলমে বিনোদিনীর তিনটি চিঠি এসে পৌঁছায়। আর এই চিঠিগুলির রন্ধে রন্ধে রয়েছে পরকীয়া প্রেমের বীজ। এখানে চিঠি তিনটির কিছু অংশ দেওয়া হল-

১. "প্রিয়তম, যাহাকে ভুলিবার জন্য চলিয়া গেছ, এ লেখায় তাহাকে স্মরণ করাইয়া দিব কেন।"

"নাথ, তুমি যে আমাকে ভালোবাসিয়াছিলে, সে কি আমারই অপরাধ। আমি কি স্বপ্নেও এত সৌভাগ্য প্রত্যাশা করিয়াছিলাম।"

২. "কিন্তু ভক্তের পূজা লইতে গিয়া শিবের যদি তপোভঙ্গ হয়, তবে তাহাতে রাগ করিয়ো না, হৃদয়দেব! তুমি বর দাও, বা না দাও, চোখ মেলিয়া চাও বা না চাও, জানিতে পার বা না পার, পূজা না দিয়া ভক্তের আর গতি নাই।"

মহেন্দ্র-বিনোদিনী যখন পরকীয়ার নেশায় মাতাল তখন মহেন্দ্রের কাছে "জগতে আর যে কাহারও সুখদুঃখ আছে, সে কথা তাহার নূতন নেশার কাছে স্থান পায় নাই।"

এই পরকীয়া প্রেমের কারণ হিসেবে বিধবা বিনোদিনী একটি চিঠিতে নিজেই জানিয়েছেন-

> "জগতে আমার ভালোবাসিবার এবং ভালোবাসা পাইবার কোন স্থান নাই। তাই আমি খেলা খেলিয়ে ভালোবাসার খেদ মিটাইয়া থাকি।"

উপন্যাসের ঘটনা পরম্পরায় মহেন্দ্র-বিনোদিনীর পরকীয়া প্রেমের সম্পর্ক আরো দৃঢ় হয়েছে। মহেন্দ্র বিনোদিনীর আরও কাছে আসার জন্য আশাকে কৌশলে কাশীতে অন্নপূর্ণার কাছে পাঠিয়েছে। আর আশার অবর্তমানে মহেন্দ্রের সেবাযত্নের ভার পড়ে বিনোদিনীর উপর। আর এই সময়পর্বে বিনোদিনীর নৈকট্য পেতে মহেন্দ্র "ঘুরিয়া

ঘুরিয়া বেড়ায়, মাঝে মাঝে ছুতা করিয়া সময়ে-অসময়ে তাহার মার ঘরে আসিয়া উপস্থিত হয়,"

আসলে মানবচরিত্রই এরকম; ভালবাসার কাঙ্গাল। যুবতী বিধবা বিনোদিনীও ভালবাসার কাঙ্গাল। সে চেয়েছিল বিহারীর ভালোবাসা, বিহারীর শ্রদ্ধা। কিন্তু সেও কিনা আশার ভালোবাসায় মজেছে। আর তাই বিহারীর প্রত্যাখ্যানের জ্বালায় বিনোদিনী মহেন্দ্রের ঘর জ্বালিয়েছে-

> "ক্রুদ্ধা মধুকরী যাহাকে সম্মুখে পায় তাহাকেই দংশন করে, ক্রুদ্ধা বিনোদিনী তেমনি তাহার চারিদিকের সমস্ত সংসারটাকে জ্বালাইবার জন্য প্রস্তুত হইল।"

বিহারীর পরামর্শে বিনোদিনী মহেন্দ্র-আশার সংসার ত্যাগ করে বারাসাতে গ্রামের বাড়ি উঠেছে। কিন্তু বিনোদিনীর প্রেমে মাতাল মহেন্দ্র সেখানেও পৌঁছে গেছে। লোকনিন্দা, বিহারীর বারংবার প্রত্যাখ্যান বিনোদিনীকে বাধ্য করেছে মহেন্দ্রের হাত ধরে পালিয়ে যেতে। কলকাতায় ফিরে এসে তারা পটলডাঙ্গার বাসায় উঠে, পরে পশ্চিমে ঘুরতে চলে যায়। আর উপন্যাসের পরিসমাপ্তি ঘটেছে বিধবা বিনোদিনীর কাশী যাত্রায়।

আসলে উপন্যাসটিকে যথার্থ মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস হিসেবে গড়ে তুলতে আবশ্যক ছিল মহেন্দ্র-বিনোদিনীর পরকীয়া প্রেম। ১৮২৯ খ্রিস্টাব্দে রাজা রামমোহন রায়ের উদ্যোগে লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক কর্তৃক সতীদাহ প্রথা নিষিদ্ধ হয়েছে। ১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের উদ্যোগে লর্ড ডালহৌসি কর্তৃক 'পঞ্চদশ বিধি' অনুসারে বিধবা বিবাহ আইন প্রচলন হয়েছে। আইন চালু হলেও সমাজ কি তা মেনে নিয়েছে? সাহিত্য সমাজের দর্পণ। তাই সতীদাহ প্রথা বন্ধের উত্তরকালে বিধবাদের নিয়ে যে সমস্যা দেখা দিয়েছিল তা বিভিন্ন উপন্যাসে ধরা পড়েছে। 'বিষবৃক্ষ'(১৮৭৩)তে দেখলাম বিধবা কুন্দনন্দিনী আত্মহত্যা করল, 'কৃষ্ণকান্তের উইল'(১৮৭৮)তে রোহিণীকে গুলি করে হত্যা করা হলো। বিধবা বিবাহ আইন প্রচলন হওয়ার দেড়শো বছর পরেও বিধবা বিনোদিনীর ঠাঁই কোন গৃহস্ত ঘরে হলো না, হলো কাশীতে।

'পুতুলনাচের ইতিকথা' উপন্যাসে পরকীয়া প্রেম: মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পুতুলনাচের ইতিকথা' উপন্যাসে আমরা দুটি পরকীয়া প্রেমের সম্পর্ক পাই। একটি গোপাল দাস ও যামিনী কবিরাজের স্ত্রী সেনদিদির অন্যটি শশী ও পরানের স্ত্রী কুসুমের।

খুব অল্প বয়সে সেনদিদির ভার গোপালের কাছে পড়েছিল। তারপর দেড়শ টাকার বিনিময়ে সেনদিদিকে গোপাল যামিনীর কাছে বিসর্জন দিয়েছিল। গোপালের সঙ্গে সেনদিদির যে একটা পরকীয়া সম্পর্ক রয়েছে তা আমরা প্রথম বুঝতে পারি সেনদিদির বসন্ত হলে। গোপাল বারবার ডাক্তার ছেলে শশীকে সেনদিদির চিকিৎসা করতে নিষেধ করে-

> " যুবতী স্ত্রীলোক, নানা রকম কুৎসাও শুনতে পাই "

গোপাল নানা উপদেশ, সমালোচনা ও বাধাদানের মাধ্যমে শশীকে সেনদিদির থেকে দূরে রাখতে চেয়েছে। আর কেনই বা দূরে রাখতে চাইছে? ঔপন্যাসিক স্বয়ং বলেছেন-

> " মনে পাপ থাকার এই একটা লক্ষণ। মনে হয়, সকলে বুঝি সব জানে। সাপ উঠিয়া পড়ার আশঙ্কায় কেঁচো খুঁড়িবার চেষ্টাতেও মানুষ ইতস্তত করে।" এখানেই পাঠক গোপাল-সেনদিদির পরকীয়া সম্পর্কের একটু আভাস পায়।

গোপাল-সেনদিদির পরকীয়া সম্পর্কটি পাঠকের কাছে স্পষ্ট হয় উপন্যাসের শেষ পরিচ্ছেদে। সেনদিদি সন্তান-সম্ভবা হলে গোপালের অস্থিরতা চোখে পড়ার মতো "গ্রাম ছাড়িয়া এসময় দু-একদিনের জন্যও সে কোথাও যাইত না, সর্বদা খোঁজখবর লইত। যামিনী কবিরাজের বৈঠকখানায় তার সর্বদা যাতায়াত, "
রাত দশটার সময় সেনদিদির প্রস্রবের খবর এলে-

> "ধীর স্থির থাকিবার চেষ্টা করে গোপাল কিন্তু চাঞ্চল্য চাপিতে পারে না। বাড়ির মেয়েরা মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে।"

অস্থির গোপাল সেনদিদির প্রস্রব রাতে চিকিৎসার জন্য গুটি গুটি পায়ে এগিয়েছে ডাক্তার ছেলে শশীর দরজায়। অথচ এই গোপালই একদিন সেনদিদির বসন্তের চিকিৎসায় বাঁধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

সেনদিদি মারা যাওয়ার পর আশ্চর্যরকমভাবে সেনদিদির ছেলের দায়িত্ব নেয় গোপাল-
"বাড়ির ছেলেমেয়েদের কাছে ঘেঁষতে দেন না, পরের ছেলে কোলে নেবার মামার রকম দেখে হেসে বাঁচি না।" এই শিশুটিকে মানুষ করলে কুন্দকে দশ ভরি হার দেওয়ার কথাও বলে।

গোপাল তো এত পরোপকারী উদার মনের মানুষ নয়; সে কিনা নিঃস্বার্থভাবে একটি অনাথ শিশুর দায়িত্ব নিচ্ছে। সমগ্র উপন্যাস জুড়ে তো আমরা গোপাল দাসের অন্য পরিচয় পেয়েছি-

> "গোপাল দাসের কারবার লোকে বলে গলায় ছুরি দেওয়া। আসলে সে করে সম্পত্তি কেনাবেচা ও টাকা ধার দেওয়া। অর্থাৎ দালালি ও মহাজনি। শোনা যায়, এককালে সে নাকি বার তিনেক জীবন্ত মানুষের কেনাবেচার ব্যাপারেও দালালি করিয়াছে।"

যে কিনা যাদব পণ্ডিতের হাসপাতালেও লাভ খোঁজে-

> "একজন সৎকাজে যথাসর্বস্ব দান করিয়া গিয়াছে, আর একজন তাতে কিছু ভাগ বসাইতে চায়।"

সেই গোপালের এত অনাথ-দরদ দেখে পাঠকের আর বুঝতে অসুবিধা হল না, যে সেনদিদির ছেলেটি আসলে গোপালেরই। আর গোপাল-সেনদিদির মধ্যে যে একটি পরকীয়া সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল এটা আরও স্পষ্ট হয় যখন গোপাল সর্বস্ব ত্যাগ করে কাশী যাওয়ার সময় সেনদিদির ছেলেকে নিজের সঙ্গে নিয়ে যায়। আর কুন্দকে সোনার হার কেনার জন্য ২০০ টাকা দেয়।

এই উপন্যাসে আর একটি পরকীয়া প্রেমের সম্পর্ক পাই। সেটি হল ডাক্তার শশী আর পরানের বউ কুসুমের মধ্যে। তেইশ বছরের কুসুম পরানের স্ত্রী। তবে কেউ কুসুমকে পরানের বউ বলে ডাকলে কুসুমের রাগ হয়। বুঁচির ছোট পিসি তাকে একদিন পরানের বউ বলে ডেকেছিল। এইজন্য তাকে গাল দিয়েছিল কুসুম। তবে শশী কুসুমকে বউ বলে ডাকে। রহস্যময়ী নারী কুসুমের মনে বাজে বৈষ্ণব পদাবলীর রাধার প্রেম রহস্যের বর্ণনীয় বাঁশি-

"ভিনদেশি পুরুষ দেখি চাঁদের মতন
লাজরক্ত হইলা কন্যা পরথম্ যৌবন।"

শশীর কাছে ক্ষমা চাইতে কুসুম দুপুরবেলা চুপিচুপি এসেছিল শশীর বাড়িতে। শুধু বাড়ি নয়, ঘর দেখার অজুহাতে পরস্ত্রী কুসুম শশীর ঘরেও ঢুকে। শশী বাড়ির কোন মেয়ে মানুষকে ডাকতে চাইলে কুসুম নিজেই বারণ করে-

"আপনার ঘরটা একটু দেখে যাব ছোটোবাবু?
চলো না, সিন্ধু ওদের কাউকে ডাকি,অ্যাঁ?
না। আমি একাই দেখি যাই।"

শশী জানত এটা উচিত নয়, তবুও সে বারণ করলো না-
'ভাবিল, ওর যদি বদনামের ভয় না থাকে, আমার বয়ে গেল। আমি তো ডাকিনি।' শুধু তাই নয়, দরজায় বসে থাকা গোপাল কুসুমকে দেখে নিতে পারে জেনে কুসুম শশীকে ঘরের দরজাটা বন্ধ করে দিতে বলে।

কুসুম বিবাহিতা নারী। তবুও তার মনের কোথাও যেন শশীর উপস্থিতি। আভাসে ইঙ্গিতে সে তার মনের অবস্থা শশীকে জানাতে চেয়েছে-

"এমনই চাঁদনি রাতে আপনার সঙ্গে কোথাও চলে যেতে সাধ হয় ছোটবাবু"
"আপনার কাছে দাঁড়ালে আমার শরীর এমন করে কেন ছোটবাবু?"

বৈষ্ণব সাহিত্য পড়তে গিয়ে গোবিন্দদাসের অভিসারের বর্ষার মত্ত বাদলের চিত্রে আমরা দেখেছিলাম-

"মন্দিরে বাহির কঠিন কপাট ।
চলইতে শঙ্কিল পঙ্কিল বাট।।
তঁহি অতি দর দর বাদল দোল।
বারি কি বারই নীল নিচোল।।"

এমনি দুর্যোগের রাত্রে সমস্ত বিপদ তুচ্ছ করে শ্রীমতী রাধা অভিসারে যাত্রার জন্য পূর্ব থেকে নিজেকে প্রস্তুত করছেন-

" কন্টক গাড়ি কমলসম পদতল
মঞ্জির চীরহ ঝাঁপি।
গাগরি বারি ঢারি করি পিছল
চলতহি অঙ্গুলি চাপি।।"

কণ্টকাকীর্ণ পথে তাঁকে শ্যাম-অভিসারে যেতে হবে। পাছে শব্দ হয় তাই তিনি কাপড়ে মঞ্জীর বেঁধে প্রাঙ্গণে কলসের জল ঢেলে পিচ্ছিল করে পা টিপে টিপে চলা অভ্যাস করছেন। রাধার মতোই যেন কুসুম পরকীয়া প্রেমে মাতাল হয়ে বর্ষার দিনেও অভিসারে বেরিয়েছেন-

"বর্ষা আসিয়াছে। খালে জল বাড়িল, ডোবা পুকুর ভরিয়া উঠিল। চারিদিকে কাদা, ডাঙ্গা পথে কোথাও যাওয়া মুশকিল।... পরদিন দুপুরবেলা আকাশ-ঢাকা মেঘে চারিদিক অন্ধকার হইয়া আসিয়াছিল।... নানা কথা ভাবিতে ভাবিতে জোরে বৃষ্টি নামিয়া আসিল। পরক্ষণে আসিল কুসুম।" এই বর্ণনা দেখে মনে হয় মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় কুসুমের পরকীয়া প্রেমের ছবি আঁকতে পরকীয়া প্রেমের আদর্শ প্রতিমূর্তি রাধার অভিসারকে অনুসরণ করেছেন।

কুসুম তার বাবার সঙ্গে বাড়ি যেতে না চাইলেও হঠাৎ করে শশীর চলে যাবার কথা শুনে কুসুম কিন্তু বাপের বাড়ি যেতে রাজি হয়ে গেল। কুসুম বাপের বাড়ি চলে যাবে। তাই ভোররাতে শশীর বাজিতপুর যাওয়ার জন্য বড় নৌকা বের হলো। উপলক্ষ্য বাজিতপুরে সিনিয়র উকিল রামচরণবাবুর সঙ্গে দেখা করা তবে লক্ষ্য কুসুম-

> "আড়চোখে একবার বাপের দিকে চাহিয়া কুসুম বলিল, আমার জন্য এলেন আজ, না?
> শশী বলিল, হ্যাঁ।'

কুসুম চিরদিনের জন্যে বাপের বাড়ি চলে যাবে। চিরদিনের জন্য কুসুমকে হারাতে হবে। তাই বিরহকাতর শশী কুসুমকে তালপুকুরে ডেকে নিয়ে আসে। শশী কুসুমের হাত ধরে। শশী কুসুমকে প্রস্তাব দেয় তার সঙ্গে কোথাও চলে যেতে। কিন্তু কুসুম যেতে অস্বীকার করে-

> "লাল টকটকে করে তাতানো লোহা ফেলে রাখলে তা-ও আস্তে আস্তে ঠান্ডা হয়ে যায়, যায় না? সাধ আহলাদ আমার কিছু নেই, নিজের জন্যে কোন সুখ চাই না- বাকি জীবনটা ভাত রেঁধে ঘরের লোকের সেবা করে কাটিয়ে দেব ভেবেছি- আর কোনো আশা নেই, ইচ্ছা নেই! সব ভোঁতা হয়ে গেছে ছোটবাবু।... কাকে ডাকছেন ছোটবাবু, কে যাবে আপনার সঙ্গে? কুসুম কি বেঁচে আছে? সে মরে গেছে।"

আর এভাবেই শশী-কুসুমের পরকীয়া প্রেম সম্পর্কটির ইতি ঘটলো।

'চরিত্রহীন' উপন্যাসে পরকীয়া প্রেম: শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'চরিত্রহীন', 'গৃহদাহ', ও 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসে নিষিদ্ধ সমাজবিরোধী প্রেমের চিত্র আঁকা হয়েছে। এই প্রেমে লেখক সমাজনীতি বা ধর্মনীতিকে স্বীকার না করে হৃদয়বৃত্তিকে স্বীকার করেছেন।

'চরিত্রহীন' উপন্যাসে লেখক স্বয়ং বলেছেন তৃষ্ণার সময় মানুষ যখন বিশুদ্ধ পানীয় জল পান না তখন নর্দমার নোংরা জল পান করতে বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ করেন না। উপন্যাসের প্রধান দুই যুবতী বিধবা কিরণময়ী ও সাবিত্রী চরিত্র দুটি চরিত্রহীন হিসেবে বেশি নির্দেশিত হয়েছে।

অত্যন্ত স্নেহশীল, তরুণী এবং অত্যন্ত সুন্দরী এক মহিলা কিরণময়ী কিন্তু তার ভেতরে ভালবাসা ও দৈহিক আকাঙ্ক্ষা, চাহিদা, না পাওয়ার কষ্ট ইত্যাদি তার মনটা বিষিয়ে তোলে। যুবতী বিধবা কিরণময়ী বিবাহিত বউপাগল পুরুষ উপেন্দ্রকে ভালবেসে ফেলে। সে নিজের মুখে উপেন্দ্রকে বলে কিন্তু পরিহাসে চরম কষ্ট পায়। যুবতী বিধবা কিরণময়ী উপেন্দ্রর দূর-সম্পর্কীয় ভাই দিবাকরকে নিয়ে পালায়। এভাবেই বিধবা নারী কিরণময়ীকে কেন্দ্র করে পরক্রিয়া প্রেম ঘনীভূত হয়েছে।

উপন্যাসের আরেকটি বিধবা চরিত্র সাবিত্রী। সতীশ আর কুলত্যাগিনী যুবতী বিধবা মেসের ঝি সাবিত্রীর নীরব প্রেমকাহিনী দিয়ে গল্পের শুরু। সতীশ নামে যুবকটি সাবিত্রীকে ভালোবাসে, অপরদিকে সাবিত্রীও সতীশকে ভালোবাসে। তবে তাদের ভালোবাসা দুর্বোধ্য। এভাবে উপন্যাসটিতে দুটি বিধবা চরিত্রকে কেন্দ্র করে পরকীয়া প্রেমের সম্পর্ক গড়ে উঠেছে।

উপরিউক্ত তিনটি উপন্যাস বিশ্লেষণ করে দেখলাম পরকীয়া প্রেম ও তার পরিণতি। লেখক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় কিংবা শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এরা প্রত্যেকেই আলোচিত তিনটি উপন্যাসে সমাজ নিন্দিত পরকীয়াকে সুখী সংসার ধ্বংসের কারণ রূপে দেখিয়েছেন। এর জন্য যুবতী বিধবাদের ব্যবহার করা হয়েছে। হয়তো এটা সমাজের দাবি। কিন্তু সময় পাল্টেছে। পরকীয়া প্রেমের স্বপক্ষে আইন জারি হয়েছে। তাই একবিংশ শতাব্দীর উপন্যাসগুলির কাহিনীও পাল্টাবে। হয়তো আগামীর উপন্যাসগুলিতে উপন্যাস পাঠকেরা পরকীয়া প্রেমের অন্য পরিণতি দেখবে।

তথ্যসূত্র :

আকর গ্রন্থ:

১. ঠাকুর, শ্রীরবীন্দ্রনাথ: চোখের বালি, কামিনী প্রকাশালয়, ৫, নবীনচন্দ্র পাল লেন, কলকাতা- ৭০০ ০০৯

২. বন্দোপাধ্যায়, মানিক: পুতুলনাচের ইতিকথা, প্রকাশ ভবন, ১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা- ৭৩

৩. চট্টোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্র: চরিত্রহীন, অনলাইন পাঠ

সহায়ক উপকরণ:

১. বন্দোপাধ্যায়, অসিতকুমার: বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত, মর্ডান বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা- ৭০০ ০৭৩

২. উইকিপিডিয়া

৩. www.dw.com

তারাশঙ্করের 'কালিন্দী' উপন্যাসে প্রান্তিক জীবন

মহাদেব সরেন
সহকারী অধ্যাপক, বড়জোড়া কলেজ, বাঁকুড়া

সংক্ষিপ্তসার- রাঢ় বাংলার অন্যতম কথাসাহিত্যিক হলেন তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর কথাসাহিত্যে বার বার ঘুরে ফিরে এসেছে রাঢ়ের প্রান্তিক জীবনের ইতিকথা। "কালিন্দী" (১৯৪০) উপন্যাসও তার ব্যতিক্রম নয়। যদিও উপন্যাসের মুখ্য বিষয় ক্ষয়িষ্ণু জমিদারতন্ত্রের সঙ্গে উদীয়মান বণিক সমাজের দ্বন্ধ । এই দ্বন্ধের বিষয় বর্ণনা করতে গিয়ে উপন্যাসে সাঁওতাল উপজাতির প্রসঙ্গ এসেছে । তাদের কৃষ্টি ও সংস্কৃতির বর্ণময় প্রসঙ্গগুলি সুন্দর ভাবে উপন্যাসে বর্ণিত হয়েছে। কমল মাঝির দ্বারা বর্ণিত পৃথিবীর সৃষ্টির কাহিনী আমাদেরকে মুগ্ধ করে । এই উপজাতির সহজ সরল নিষ্পাপ গুনগুলিকে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় তার উপন্যাসে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন । এই উপন্যাসের যে দ্বন্ধ তার নিরসন ঘটিয়েছে এই উপজাতি – রাত্রির গভীর নিশুতিতে কালিন্দী চরকে চির বিদায় জানিয়ে ।]

ঊনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে উপন্যাসের শুভ সূচনা হল প্রাণ-পুরুষ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের হাত ধরে, ১৮৬৫ সালে বাংলা সাহিত্যের সার্থক উপন্যাস 'দুর্গেশনন্দিনী'র আত্মপ্রকাশের মধ্য দিয়ে ।বঙ্কিম এর হাতে উপন্যাসের সূচনা হলেও তার উপন্যাসে ছিল ঐতিহাসিক পাত্র পাত্রীর ভিড় । সামাজিক উপন্যাসেও ছিল উচ্চবিত্ত মানুষের জীবন যাত্রার ছবি, অধিকাংশ প্রধান চরিত্রই গ্রামের অভিজাত ।এরা সাধারণত বর্ণ ও বিত্ত উভয় দিকে উচ্চ রবীন্দ্র উপন্যাসেও নিম্নবিত্ত তথা অন্ত্যজ শ্রেনীর মানুষেরা ছিল উপেক্ষিত । রবীন্দ্র উপন্যাসের চরিত্র গুলি মূলতঃ কোলকাতা ও তৎ সংলগ্ন সীমানার মধ্যে আবর্তিত ও বিবর্তিত । শরৎচন্দ্র এর উপন্যাসে সীমানা একটু বিস্তৃত হল । কোলকাতা কে ছাড়িয়ে গ্রামাঞ্চলের সাধারন মানুষের জীবনযাত্রার ছবি অঙ্কিত হতে শুরু করল । উচ্চ বিত্ত মানুষের পাশাপাশি নিম্নবর্গের তথা অন্ত্যজ শ্রেনীর মানুষেরাও কথাসাহিত্যের বিষয় ও চরিত্র হয়ে উঠল । সমাজের তারা কিভাবে অত্যাচারিত, শোষিত, বঞ্চিত, লাঞ্ছিত তারই ছবি অঙ্কিত হতে শুরু করল । কিন্তু তখনও সাঁওতাল জাতির কথা কথাসাহিত্যে উঠে আসেনি ।

বিদ্রোহের নিশান উড়িয়ে বাংলা সাহিত্যের আঙিনায় আবির্ভূত হয়েছিলেন কল্লোলের তরুণেরা । কালিকলম, কল্লোল ধুপছায়া প্রভৃতি পত্রিকায় উঠে আসা তরুণ লেখকদের- অচিন্ত্য সেনগুপ্ত, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, প্রেমেন্দ্রনাথ মিত্র, ঋত্বিক ঘটকের হাত ধরে নিম্নবিত্তের মানুষেরা যথা – বাগদী, ডোম, বেদে, মুচি প্রভৃতি সম্প্রদায়ের সাহিত্যের বিষয় হয়ে উঠল । তাদের সুখ দুঃখ, দ্বন্দ-হতাশা, আশা-নৈরাশ্যের জীবন কাহিনী চিত্রিত হতে শুরু করল । কল্লোল গোষ্ঠীর লেখকেরা বাংলা

কথাসাহিত্যের সীমানা প্রসারিত করেছিলেন । অচিন্ত্য সেনগুপ্ত লিখেছেন – " রবীন্দ্রনাথ থেকে সরে এসেছিল কল্লোল । সরে এসেছিল অপজাত ও অবজ্ঞাত মনুষ্যত্বের জনতায়, নিম্নগত মধ্যবিত্তের সংসারে, কয়লাকুঠিতে, খোলার বস্তিতে, ফুটপাতে, প্রতারিত ও পরিত্যক্তের এলাকায়"[১]।

অবশ্য কল্লোলের আগের বাংলা কথাসাহিত্যে 'অবজ্ঞাত মনুষ্যত্ব' যে একেবারে উপক্ষিত ছিল এ কথা বলা যায় না। কিন্তু সাঁওতাল বাংলা গল্প উপন্যাসে ছিল একেবারে উপক্ষিত। বিভুতিভূষণের বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত ধরে 'আরণ্যক' উপন্যাসের পাতায় প্রথম সাঁওতাল জীবন চিত্রিত হল ।

কিন্তু কারা এই সাঁওতাল ? সাঁওতাল শব্দের উৎপত্তি নিয়ে নানা মুনির নানা মত রয়েছে। সাঁওতাল শব্দের উৎস নিয়ে যে সংশয় আছে তা ধীরেন্দ্রনাথ বাস্কের বক্তব্যে ধরা পড়েছে-

> "সাঁওতালী পুরান সংগ্রাহক স্ক্রেফ্ররুড সাহেবের মতে, ? সাঁওতাল শব্দটি সম্ভবত 'সাওনতার' শব্দের অপভ্রংশ এবং এই নামটি তারা এদেশে কয়েক পুরুষ ধরে বাস করার পর গ্রহণ করে। ভাসাচার্য সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে, সাঁওতাল শব্দটি এসেছে সম্ভবতঃ সংস্কৃত 'সামন্তপাল' কথা থেকে। সামন্তপাল মানে 'সীমান্তরক্ষক', মধ্যযুগে এই সামন্তপাল কথাটি 'সামন্ত-আল' ও পরে সাঁওতাল এ পরিণত হয়"[২]।

'রামদাস টুডু রেস্কা'র ' খেরওয়াল বংশ ধরমপুঁথি' গ্রন্থের অনুবাদক শ্রী সারদাপ্রসাদ কিস্কুর মতে সাঁওতাল সমাজে বহুল প্রচলিত লোক কাহিনিতে যে 'সান্তা' রাজার নাম পাওয়া যায়। তার অনুগামীরাই পরবর্তীকালে 'সাঁওতাল' নামে পরিচিত হয়।

আবার কারো কারো মতে 'সাঁত-দিশম' অর্থাৎ সাঁত অঞ্চলে স্থায়ীভাবে বসবাস করার জন্য এরা 'সাঁওতাল' নামে পরিচিত হয়। প্রথমে সাঁওতালরা ছিল অনেক্ টা যাযাবর প্রকৃতির। বিভিন্ন কারনে তাদের বার বার স্থান বদল করতে হয়েছে।

সেই জন্য অনেকে মনে করেন গভীর বনজঙ্গল, গিরিগুহা ত্যাগ করে কৃষিকার্যের জন্য স্মতল ভুমিতে নেমে আসার পরই সিডিউল্ড কাস্টস অ্যান্ড সিডিউল্ড ট্রাইব অর্ডার (অ্যামেন্ডমেন্ট) অ্যাক্ট অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গে যে ৩৮তি আদিবাসী গোষ্ঠীকে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে তার মধ্যে সংখ্যা গরিষ্ঠ হল 'সাঁওতাল' জনজাতি । তবুও উনিশ শতক বা বিশ শতকের প্রথম দশক পর্যন্ত আদিবাসী চেতনার যথেষ্ট অভাব ছিল। অপরিচয় বা স্বল্প পরিচয়ের দূরত্বই বোধ হয় সাহিত্যে জনজাতিরা জীবনরূপ পায়নি। জনসংখ্যার বিচারে বৃহত্তম উপজাতি সাঁওতালরা কোলকাতা কেন্দ্রিক তথাকথিত 'বাবু' সম্প্রদায়ের কাছে দুরের মানুষ। সাঁওতাল উপজাতি নিয়ে রচিত না হলেও প্রসঙ্গক্রমে সাঁওতালরা প্রথম স্থান পায়। বিভুতিভূষণের 'আরণ্যক'(১৯৩৯) উপন্যাসে । যেখানে প্রকৃতির ক্রোড়ে লালিত পালিত সাঁওতালদের সহজ, সরল,

অনাড়ম্বর জীবনযাত্রার ছবি আমরা দেখতে পাই । সাঁওতাল উপজাতির সমাজ ও সংস্কৃতির উল্লেখযোগ্য উপাদান আমরা লক্ষ্য করি তারাশঙ্করের 'কালিন্দী' উপন্যাসে ।

তারাশঙ্করের 'কালিন্দী' (১৯৪০)উপন্যাসের মূল বিষয় ক্ষয়িষ্ণু জমিদারতন্ত্রের প্রতিভু ইন্দ্ররায় ও নবীন রুরাল ব্যবসায়ী শ্রীবাস পাল, শিল্পপতি বিম্ল মুখুজ্যের পারস্পারিক দ্বন্দ্ব।কালিন্দীতে চর উঠেছে ।সেই দুর্গম নিস্ফলা চরকে 'সুজলাং সুফলাং' করে তুলল সাঁওতাল প্রজারা । নিস্ফলা জমিকে করেছে সুফলা কিন্তু কল মালিক আর জমিদারের দ্বন্দ্বে যাযাবর সাঁওতালদের ঘর বাঁধার স্বপ্ন ভেঙে যায় । রাতের অন্ধকারে তারা কালিন্দী চরকে তারা বিদায় জানায়। 'কালিন্দী' উপন্যাসে সাঁওতাল প্রসঙ্গ সংক্ষিপ্ত হলেও তাদের সমাজ সংস্কৃতির অর্থাৎ ব্যাক্তি-পরিবার-সমাজের পারস্পারিক সম্পর্ক, বাসস্থান নির্মাণ; প্রেম-প্রনয়-বিবাহ-যৌন-ভাবনা বিশ্বাস সংস্কার, অলৌকিক ভাবনা নিয়ম রীতি নীতি, আচার আচরণ সমস্তই উপন্যাসের পাতায় প্রতিফলিত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে ডঃ ক্ষেত্রগুপ্ত তার "বাংলা উপন্যাসের ইতিহাস " গ্রন্থে বলেছেন –

> "সাঁওতালদের ভাষার গান ওদের পূজা পার্বণ রংদার উৎসব – এসবই খুব সংক্ষেপে এসেছে । কিন্তু এদের কৌম জীবনের একটি নির্ভুল স্পর্শ জমিয়ে রেখেছে "[৩]।

'কালিন্দী' উপন্যাসে সাঁওতাল উপজাতির বিশ্বাস, সংস্কার ,নাচ-গান , পরব উপস্থাপনার ফলে উপন্যাসে সাঁওতাল প্রসঙ্গটি সজীব হয়ে উঠেছে । কমল মাজি অহীন্দ্রের পৃথিবী সৃষ্টির তত্বমেনে নিতে পারেনি । উপন্যাসের দশম পরিচ্ছেদে কমল মাজি অহীন্দ্রকে শুনিয়েছে তাদের নিজেদের সৃষ্টিতত্বের কথা –

অথ জন্ম কু ধরতি লেগুং
অথ জন্ম কু মানোয়া হড়
মান মান কু মানোয়া হড়
ধরতি কু ভাবাও আ-কাদা
ধরতি সানাম কু ডাবাও কিদা[৪] ।

গান শেষে কমল মাঝি বলল '-পেথমে ছিল জল – কেবল জল , তারপর হল 'অথ জনম কু ধরতি লেগুং; লেগুং অর্থাৎ কেঁচো গায়ের থেকে মাটি বের করে ধরতিকে অর্থাৎ পৃথিবী বানালে, মাটি করলে । তারপর 'অথ জনম কু মানোয়া হড়' অর্থাৎ মানুষে পরিপূর্ণ হল এই পৃথিবী । পৃথিবীতে মাটি খুড়ে চাষ আবাদ করতে শুরু করল এবং এই পৃথিবী ফসলে পরিপূর্ণ হল ।

'কালিন্দী' উপন্যাসে কমল মাঝি যে পৃথিবীর 'সৃষ্টির তত্ব' ব্যক্ত করেছেন তা আমরা খুঁজে পাই L.O Skrefrud দ্বারা ১৮৮৭ সালে বিহারের বেনাগড়িয়া মিশন থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত 'হড়কোরেন মারে হাপড়াম কো রেয়াঃ কাথা গ্রন্থটিতে । অবশ্য গ্রন্থটির কথক ছিলেন সাঁওতাল সমাজ ও সংস্কৃতি বিষয়ক পণ্ডিত গুরু কলোয়ান হাড়াম । গ্রন্থটিতে সাঁওতাল জাতির পূর্বপুরুষের কথা এবং কিভাবে সাঁওতাল জাতির

জন্ম বা সৃষ্টি হয়েছে তা জানা যায় । কাহিনীটি হল নিম্নরূপ - সৃষ্টির আদিতে পৃথিবী ছিল জলমগ্ন । এই অনন্ত জলরাশির উপর স্বর্গের দেব-দেবীরা অর্থাৎ 'ঠাকুর' জিউ ও ঠাকরান (জিউর পত্নী) স্বর্গপুরী থেকে 'তোড়ে' সুতোতে নেমে স্নান করে আবার স্বর্গে ফিরে যায় । একদিন জিউ লক্ষ করলেন একাকী একটি কুমির । তাকে দেখে ঠাকুরের দয়া হল । তার একাকীত্ব দূর করার জন্য ঠাকুর জিউ এক এক করে কচ্ছপ, চিংড়ী , বোয়াল মাছ , কেঁচো প্রভৃতি জলচর প্রাণী সৃষ্টি করলেন ।

জলচর প্রাণীর সৃষ্টির পর ঠাকুর জিউ মানব সৃষ্টির মনঃস্থ করলেন এবং মাটি দিয়ে দুটি মানব মূর্তি তৈরি করলেন । কিন্তু স্বর্গের ঘোড়া 'সিঞ্চ সাদম' জিউ – জীবন দানের পূর্বেই পা দিয়ে মানব মূর্তি ভেঙে ফেলেন । মনস্কামনা পূর্ণ না হওয়ার জন্য জিউ স্থির করেন তিনি আর মানব সৃষ্টি করবেন না ।

কিন্তু সৃষ্টির কি অপার মহিমা । একদিন জিউ স্নান করার সময় বুকের ময়লা ঘষে বের করেন এবং ঐ ময়লা দিয়ে দুটি পাখি তৈরি করেন । একটি পুরুষ পাখি ওপরটি স্ত্রী । জিউ দুটি পাখি তৈরি করার পর ফুঁ দিয়ে জীবন দান করেন। জীবন দান করার সাথে সাথে পাখি দুটি আকাশে উড়তে থাকে । নীচে অথৈ জল নামার কোন জায়গা নেই দেখে শেষপর্যন্ত পাখি দুটি ঠাকুরের হাতে গিয়ে বসল । এই সময় স্বর্গের ঘোড়া 'সিঞ্চ সাদম' জলপান করতে আসে এবং ঘোড়ার মুখের ফেনা জলে ভাসতে থাকে। জীউ-এর কথামত ঐ পাখি দুটি ফেনার উপর আশ্রয় নেয় এবং মনের আনন্দে ভাসতে থাকে । কিন্তু আনন্দ একটু প্রে নিরানন্দে পরিণত হয় । খাদ্যাভাবে তো আর বেশীদিন থাকা যায় না এবং শেষপর্যন্ত পাখি দুটি 'হাঁস-হাসিল' ঠাকুরের শরণাপন্ন হল।

বাস্তবিকই ঠাকুরও জলমগ্ন পৃথিবীর বুকে স্থলভূমির প্রয়োজন অনুভব করেন ; তখন তার সৃষ্ট জিব গুলি কে এক এক করে ডাকলেন এবং জলের তলদেশ থেকে মাটি তুলে আনার আদেশ দেন । কিন্তু কেঁচো বাদে সকলে ব্যর্থ হয় । চিন্তিত ঠাকুর শেষ পর্যন্ত ডেকে পাঠান কেঁচোকে । কিন্তু শর্ত হল কচ্ছপকে জলের উপর ভেসে থাকতে হবে । কচ্ছপ তাই করল। কেঁচো তখন কচ্ছপের পিঠে লেজ রেখে মাটি খেতে শুরু করল এবং সেই মাটি মিলি. রূপে কচ্ছপের উপর জমতে থাকে । এইভাবে পৃথিবী ও মাটিতে ভরে যায় । এরপর ঠাকুর পৃথিবীতে 'শিরোম' নামক ঘাসের বীজ বপন করেন । পরে হাঁস-হাঁসিল শিরোম ঘাসের বাসা বাঁধে । এবং দুটি ডিম পাড়ে। সেই ডিম থেকে দুটি 'মানব' শিশুর জন্ম হয় । এইভাবে পৃথিবীতে মানুষের সৃষ্টি হয়।

আবার উপন্যাসেও অহিন্দ্রের কাছ থেকে উৎসাহ পেয়ে কমল মাজি কিভাবে জীবের সৃষ্টি হল তার কাহিনী ও শুনিয়েছে । ঠাকুর 'ভগোমান' দুটি 'হাঁস-হাঁসিল' বানালো এই পাখি থেকে মানুষের অর্থাৎ সাঁওতাল জাতির উৎপত্তি। সেইজন্য সাঁওতালকে 'খেরওয়াল' বলা হয়ে থাকে। 'খের' শব্দের অর্থ 'পাখি' । পাখি থেকে উদ্ভূত বলে খেরওয়াল।

'কালিন্দী' উপন্যাসের বিষয় সাঁওতাল সম্প্রদায় না হলেও উপজাতিটির প্রাত্যহিক জীবনচর্চা , পোষাক পরিচ্ছেদ , গ্রাম সংগঠন , উৎসব, বিশ্বাস প্রভৃতি সবই সুন্দরভাবে প্রতিফলিত হয়েছে । উপন্যাসের সুচনাতেই দেখতে পাই দুর্গম , নিষ্ফলা কালিন্দী চরে বসতি স্থাপন করেছে । পরবর্তী কালে এই উপজাতি কালিন্দী চরকে শস্য শ্যামলা করে তুলেছে । ধীরেন্দ্রনাথ বাস্কে পরিশ্রমী সাঁওতালদের সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন –

> "খেটে খাওয়া মানুষ তারা । পরিশ্রমী শক্তি তাদের মজ্জায় মজ্জায় , কৃষি-সংস্কৃতি রূপরেনু তাদের দেহমনে । তাই অনূর্বর অঞ্চলকে কৃষি ক্ষেত্রে পরিণত করতে দেরী হল না । বন্য জন্তু ও শ্বাপদ সংকুল নিবিড় অরণ্যে প্রকৃতির কোলে তারা গড়ে তুলল অসংখ্য গ্রাম । সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত পরিশ্রম করে তৈরি করল শস্য শ্যামল কৃষি ক্ষেত্র "। বিমলবাবু পর্যন্ত ছোট রায় বাড়ির নায়েব মিত্রিকে বলেছেন – "অদ্ভুত জাত মশায় এরা , যেমন স্বাস্থ্য, তেমনি খাটে ! আমাদের দেশী লোকের মত নয়, ফাঁকি দেয় না "[৫]।

সাঁওতালরা সাধারণত পরিচ্ছন্নতা প্রিয় । আর্থিক দিক দিয়ে সঙ্কটাবস্থার মধ্যে জীবন-যাপন করলেও পরিচ্ছন্নতা বোধের সঙ্গে আপস করতে চায় না । তাদের দীর্ণ কুঁড়ে ঘর গুলিকে রাখে ঝাঁ চকচকে । এই উপন্যাসেও তার অন্যথা ঘটে নি ।অহীন্দ্রের পরিচ্ছন্নতা বোধের পরিচয় পাই এভাবে – " প্রত্যেক ঘরের সম্মুখে গোবর ও মাটির পরিচ্ছন্ন উঠান" ।- আবার নবীন ও রংলাল দেখেছে কালিন্দী চরে গড়ে ওঠা সাঁওতাল পল্লী – " ঝকঝকে তকতকে পল্লী ঘরে বা ঘরের আঙিনায় এতটুকু আবর্জন নাই "।সুনিতী ও লক্ষ করেছে – " খড়িমাটির আলপনা দেওয়া ঘরগুলি যেন সুন্দর ছবির মতো"[৬]।

কথায় আছে বাঙালির বারো মাসে তেরো পার্বণ, সাঁওতাল জাতিরও তাই । আর যেখানে সাঁওতাল প্রসঙ্গ বর্তমান সেখানে সাঁওতাল পরবও অবশ্যম্ভাবী । কারন আমরা দেখেছি সাঁওতালদের ধামসা-মাদলের তাল ও তাদের মেঠো বাঁশির সুর বারবার কবি লেখকদের আকৃষ্ট করেছে । তারাশঙ্করের 'কালিন্দী'উপন্যাসে যে উৎসবের বর্ণনা পাই তা হল 'রোয়া' পরব । ফসল চাষ করার সময় যাতে ফসল ভালো হয়, নষ্ট হয়ে না যায় তার জন্য ফসল চাষ শুরু করার আগে মুরগী বলি দেয় । অবশ্য সাঁওতালদের বেশীরভাগ পুজোতেই মোরগ দেওয়ার প্রচলন আছে । এই পূজা ও উৎসব সম্পর্কে কমল মাঝি বলেছে – "......মোরগ কাটা হবে পচুই মদ দিব দেবতাকে শাক দিব দু-তিন রকম । তারপরে রাঁধা-বাড়া হবে উইদেবতা থানে লিয়ে খেয়ে দেয়ে সব নাচ গান করব"।

এই বীজবপ্ন উৎসবকে সাঁওতালরা 'এরক সিম' বলে । এই সম্পর্কে ধীরেন্দ্রনাথ বাস্কে যা লিখেছেন –

> “আষাঢ় মাসে সাঁওতালরা ‘এরক সিম’ উৎসব পালন করে। জাহের থানে পূজা হয় এবং নায় কে সেখানে মারাং বুরু, জাহের এরা, মড়েঁকো তুরুইকো, গোঁসাই এরা ও অন্যান্য দেবতাদের উদ্দেশ্যে একটি করে মুরগী উৎসর্গ করেন”[৭]।

‘রোয়া’ পরবের পরবর্তীতে ধান রোমানের আগে গাছের গোড়ায় মাটির বেদীর চারপাশে গোবর ও মাটি দিয়ে পরিষ্কার করে খড়িমাটির আলপনা আঁকা হয়েছে । মেয়েরা গান গেয়েছে –

> “ঠাকুরাহি সিরিজিলা ইনা পিরথিমা হো,
> ঠাকুরাহি সিরিজিলা গাইয়া জো ইয়ারে
> পুরুবাহি ডাহারালি গাইয়া জো ইয়ারে,
> পুরুবাহি ডাহারলি - গাইয়া জো-[৮]

সাঁওতালদের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে পচুই মদ আর তামাক বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য । পচুই তারা কিভাবে তৈরি করত আর তামাক তারা কিভাবে ব্যবহার করত তা নবেন্দু দত্ত মজুমদারের গ্রন্থে সামগ্রিকভাবে উল্লেখ আছে । পচুই মদ সম্পর্কে লিখেছেনঃ

> “ The principal beverage of the Sanatal is a kind of rice beer called handi . This drink can also be prepared from Janhoe (paspalem scroficulatam L) and other millets . They like wise make an intoxication liquor called parua, distilled from dried flower of mahua (Baisia Catifola)”[9.]

তামাক সম্পর্কে লিখছেন -

> Tobacco is used in two ways, First a dried tobacco leaf or a part of it; rolled into sal leaf, is used for smoking .Secondly , bits of dried tobacco leaves are mixed with a kind of lime, chewed and then left in a corner of the mouth between cheek and teeth, till it becomes tasteless and spat out[10].

সাঁওতালরা হল গোষ্ঠীবদ্ধ । যে গ্রামে বাস করে সেই গ্রামের প্রধানকে বলা হয় ‘মাজি হাড়াম’ । গ্রামের জন্ম , মৃত্যু ও বিবাহের বিভিন্ন রকম আচার অনুষ্ঠান তার নির্দেশ মতোই হয়ে থাকে । এই উপন্যাসে কালিন্দী চরে যে সাঁওতালর পল্লী গড়ে তুলেছে – তারই প্রতিভূ কমল মাজি । সেখানেও তার নির্দেশ মতো সবকিছু ঘটেছে । সাঁওতাল বিদ্রোহের নেতা সোমেশ্বরের নাতি অহিন্দ্রকে যে ‘রাঙাবাবু’ সম্বোধন করেছে । চরের নাম রেখেছে রাঙাবাবুর চর। কমল মাজি সাঁওতালদের অতীত ঐতিহ্যের প্রতি গভীরভাবে মুগ্ধ । তাই সে গৌরব উজ্জল অতীতের সাথে বর্তমানকে মেলাতে পারে

না – ‘‘ইয়ারা মে আর সি সাঁওতাল নাই। ইয়ারা মিছা কথা বলে, কাজ করতে গেরস্তে ঠকায়্ খাটে না লোভী হয়ে হয়েছে। পাপ হয়েছে উয়াদের । উয়ারা খেপতে পারবে না ধরম লষ্ট করলে।’’

‘কালিন্দী’ উপন্যাসে সাঁওতালদের বিবাহের কোন বর্ণনা নেই । সারীর বিবাহ বিচ্ছেদের বর্ণনা আছে । এ প্রসঙ্গে জানা যায় – কোন কারনে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বনিবনা না হলে বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে থাকে । বিচ্ছেদের সময় দুপক্ষের মাজি আর গ্রামের পাঁচজন হাজির থাকে । এক ঘটি জল রেখে তার পাশে স্বামী-স্ত্রীকে দাড় করানো হয়। ছেলে পূর্বদিকে মুখ করে দাঁড়ায় যাতে সূর্যকে দেখতে পায় । এরপর ছেলেকে তিনটি শালপাতা দেওয়া হয়। সে গলবস্ত্র হয়ে পাতা নেয় আর সূর্যদেবকে প্রণাম করে ঐ শালপাতা ছিঁড়ে ফেলে । তারপর ডান পা দিয়ে ঘটির জল উল্টে দেয়। তারপর স্ত্রীর কাছ থেকে আলাদা হয়ে যায় । এরপর ছেলে ও মেয়েটি উভয়ই মাঝি থেকে শুরু করে উপস্থিত সকলকে একে একে প্রণাম করে । গ্রামের পাঁচজনের সামনে শালপাতা ছিঁড়ে ও ঘটির জল উল্টে সাঁওতালদের বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে থাকে ।

‘কালিন্দী’ উপন্যাসে সাঁওতালদের নাচ-গানের বর্ণনা সেভাবে পাওয়া যায় নি। যদিও অহিন্দ্রের আশীর্বাদ অনুষ্ঠানে নিমন্ত্রিত হয়ে সাঁওতালরা নেচেছিল। যদিও এখানে যে গান গাওয়া হয়েছিল তা বাংলা ভাষার গান –

রাজা যাবে সোরানে সোরাণে (পাকা রাস্তা)
রানী আসছে ডুলির উপর চেপ্যে ।

....
পালতে পোলাশ জবা ফুলের মালা গো ।

এই গানের তালে তালে পরস্পরের কোমরে জড়াইয়া ধবধবে কাপড় পরা কাল মেয়েগুলি অর্ধ – চন্দ্রাকারে সরি বাঁধিয়া জলের ঢেউয়ের মতো হিল্লোলিত ভঙ্গিতে নেচেছিল ।

বাংলার রাঢ় অঞ্চল আদিবাসী প্রধান । স্ট্রিট শিলার ন্যায় রাঢ়ের লোক সংস্কৃতির স্তরে স্তরে আদিম কৌম সংস্কৃতির উপাদান নানা রূপে ও বিচিত্র বিন্যাসে প্রনিত হয়েছে । তারাশঙ্করের ‘কালিন্দী’ উপন্যাসে অনিবার্য ভাবেই সাঁওতাল প্রসঙ্গ উপস্থাপিত হয়েছে এবং উপন্যাসটিকে আরো বেশি সজীব ও বর্ণময় করে তুলেছে ।

সহায়ক গ্রন্থ :

১. দেবাশীষ ভট্টাচার্য – বিশ শতকের কথাসাহিত্যে নিম্নবর্গীয় চেতনা, অক্ষর পাবলিকেশন, ২০১০, page-52

২. ঋষিপ্রতিম ঘোষ - তিন বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা সাহিত্যে সাঁওতাল জনগোষ্ঠী, পুস্তক বিপণী, ২০১২, page-40

৩. ডঃ ক্ষেত্র গুপ্ত – বাংলা উপন্যাসের ইতিহাস

৪. তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় – তারাশঙ্কর রচনাবলী দ্বিতীয় খণ্ড, মিত্র ও ঘোষ, page-65
৫. ধীরেন্দ্রনাথ বাস্কে – পশ্চিমবঙ্গের আদিবাসী সমাজ, সুবর্ণরেখা, ২০০৭, page-240
৬. তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় – তারাশঙ্কর রচনাবলী দ্বিতীয় খণ্ড, মিত্র ও ঘোষ , page-120
৭. ধীরেন্দ্রনাথ বাস্কে – পশ্চিমবঙ্গের আদিবাসী সমাজ, সুবর্ণরেখা
৮. তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় – তারাশঙ্কর রচনাবলী দ্বিতীয় খণ্ড, মিত্র ও ঘোষ, page-220
৯. ডঃ সমরেশ মজুমদার- তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের কালিন্দী, রত্নাবলী, কোলকাতা প্রথম প্রকাশ, **১৯৯২**, Page-101
১০. ডঃ সমরেশ মজুমদার- তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের কালিন্দী, রত্নাবলী, কোলকাতা প্রথম প্রকাশ, **১৯৯২**, Page-101
১১. তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় – তারাশঙ্কর রচনাবলী দ্বিতীয় খণ্ড, মিত্র ও ঘোষ, page-182

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্পে পঞ্চাশের মন্বন্তর প্রসঙ্গ: নির্বাচিত গল্প অবলম্বনে

জয় সরকার
গবেষক, বাংলা বিভাগ, রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় বাংলায় দলে দলে সৈন্যের আগমন , যুদ্ধের সরঞ্জাম তৈরির জন্য বাংলায় গড়ে ওঠা কারখানায় হাজার হাজার অবাঙালি কর্মচারীদের আগমন, ব্রহ্মদেশে জাপানের আক্রমণে ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে বহু মানুষের আগমন প্রভৃতি কারনে বাংলার জনসংখ্যা দ্রুত বেড়ে যায়। জনসংখ্যার দ্রুত বৃদ্ধিতে বাংলায় খাদ্যদ্রব্যের চাহিদা বেড়ে যায়, সেই চাহিদা পূরণের উপযুক্ত খাদ্য বিশ্বযুদ্ধের কারণে বিদেশ থেকে আমদানি না হওয়ায় বাংলায় খাদ্যের চাহিদা পূরণ সম্ভব হয় না। অন্যদিকে ১৯৪২ সালের প্রাকৃতিক দুর্যোগের (ঘূর্ণিঝড়, বন্যা) ফলে বাংলায় খাদ্যের চাহিদা আরও ব্যাপক রূপ নেয়। ফলস্বরূপ বাংলায় দেখা দেয় দুর্ভিক্ষ, যা বাংলা তথা ভারতবর্ষের ইতিহাসে 'পঞ্চাশের মন্বন্তর' নামে পরিচিত। পঞ্চাশের মন্বন্তরের সময় বহু মানুষ মারা যায়, তাদের সৎকারের লোক পর্যন্ত ছিল না। কুকুরের সঙ্গে লড়াই করে মানুষ ডাস্টবিন থেকে খাবার খেতে শুরু করে। মানুষ তার প্রিয়জনকে মৃত্যুদশায় ফেলে রেখে বাঁচার তাগিদে বাড়ি ছাড়ে, অনেকে অভাবের তাড়নায় স্ত্রী-কন্যাকে বিক্রি করে। মন্বন্তরের সময় খাদ্যসংকটের পাশাপাশি বস্ত্রসংকটও চরম রূপ নিয়েছিল। প্রসঙ্গক্রমে বলে রাখা দরকার যে, পঞ্চাশের মন্বন্তর ততটা ব্যাপক হত না, যদি না অতি মুনাফালোভী ব্যবসায়ীকুল এবং সুসম্পন্ন জোতদাররা ঘূর্ণিঝড়,বন্যা, যুদ্ধ ইত্যাদির সুযোগ নিয়ে কৃত্রিম সংকট তৈরি করত। পঞ্চাশের মন্বন্তরকে কেন্দ্র করে বাংলা সাহিত্যে একাধিক কবিতা-নাটক-উপন্যাস-ছোটগল্প রচিত হয়েছে; তবে ছোটগল্পের সংখ্যাই বেশি। যেসমস্ত ছোটগল্পকার পঞ্চাশের মন্বন্তরকে পটভূমি করে গল্প রচনা করেছেন তাঁদের মধ্যে বিশেষভাবে স্মরণীয় মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের(১৯১০-১৯৫৬)নাম। পঞ্চাশের মন্বন্তরের পটভূমিকায় রচিত তাঁর গল্পগুলি হল-'দুঃশাসনীয়', 'আজ কাল পরশুর গল্প', 'নমুনা','রাঘব মালাকার','গোপাল শাসমল','কে বাঁচায়, কে বাঁচে' প্রভৃতি; উল্লিখিত গল্পগুলি বিশ্লেষণ করলেই 'মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্পে পঞ্চাশের মন্বন্তর প্রসঙ্গ' বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

'দুঃশাসনীয়' গল্পে মন্বন্তরকালীন বস্ত্রসংকটের ভয়াবহ রূপটি বর্ণিত হয়েছে। সমালোচক জগদীশ ভট্টাচার্য তাঁর 'আমার কালের কয়েকজন কথাশিল্পী' গ্রন্থে গল্পটি সম্পর্কে লিখেছেন- " 'দুঃশাসনীয়' গল্পটি মহাযুদ্ধ ও মন্বন্তরের বিবস্ত্র বাংলার নিঃস্ব পল্লীর নগ্নছবি।"১ গল্প বিশ্লেষণে দেখা যায়, হাতিপুর গ্রাম দুর্ভিক্ষে প্রায় নিঃশেষ, যারা বেঁচে আছে তাদের শরীরে কাপড় নেই। গ্রামের পুরুষদের পরনে সামান্য নেংটি

থাকলেও মেয়েদের পরনে কাপড় না থাকায় তারা স্ত্রীলোকসুলভ লজ্জায় সারাদিন ঘরের ভিতরে নিজেদের লুকিয়ে রাখত এবং রাতের অন্ধকারে সমস্ত সাংসারিক কর্ম সম্পন্ন করত, বিষয়টি লেখকের মন্তব্যে স্পষ্ট- "ডোবা পুকুরে বাসন মাজবে ছায়া, ঘাট থেকে কলসি কাঁখে উঠে আসবে ছায়া। ছায়া কথা কইবে ছায়ার সঙ্গে, দিদি, মাসি, খুড়ি পরস্পরকে ডেকে হাসবে কাঁদবে, অভিশাপ দেবে অদেষ্টকে,... ।"২ রাতের অন্ধকারে কর্মরত মেয়েদের বিবস্ত্র থাকার বিষয়টিও লেখকের মন্তব্যে স্পষ্ট- "কোনো ছায়ার গায়ে লটকানো থাকে একফালি ন্যাকড়া, কোনো ছায়ার কোমরে জড়ানো থাকে গাছের পাতার সেলাই করা ঘাঘরা, কোনো ছায়াকে ঘিরে থাকে শুধু সীমাহীন রাত্রির আবছা আঁধার, কুরু-সভায় দ্রৌপদীর অবর্ণনীয় রূপক বস্ত্রের মতো।"৩ পরনের কাপড়ের জন্য অনেকেই দেহব্যবসার কাজে যুক্ত হয় বিষয়টি স্পষ্ট হয়েছে গোকুলের বোন মালতীর বেনারসী পরে বিপিন সামন্তের পিছু পিছু ছ-কুনের ছাউনির দিকে যাওয়া এবং পূর্বরাত্রি পর্যন্ত ছায়া হয়ে থাকা দাসু কামারের মেয়ের সাদা থান কাপড় পরে তাদের সঙ্গে যাবার ঘটনায়। চরম বস্ত্রসংকটের দিনে যখন একদিকে দরিদ্র পরিবারের মেয়েরা বস্ত্রের অভাবে লাঞ্ছনা ভোগ করছিল তখন অন্যদিকে সম্ভ্রান্ত পরিবারের মেয়েরা বস্ত্রের অভাবে কোন লাঞ্ছনাই ভোগ করেনি, এই বৈপরীত্যপূর্ণ বিষয়টি আলোচ্য গল্পে রাবেয়ার মন্তব্যে স্পষ্ট- "কাপড় যদি নেই, ঘোষবাবুর বাড়ির মেয়েরা এবেলা ওবেলা রঙিন শাড়ি বদলে নিয়ে পরে কী করে, আজিজ সায়েবের বাড়ির মেয়েরা চুমকি বসানো হালকা শাড়ির তলার মোটা আবরণ পায় কোথায়?"৪ মন্বন্তরকালীন বস্ত্রসংকট অনেকটাই ছিল এক দল সুবিধাভোগী মানুষের প্রয়াসজাত; বিষয়টি স্বদেশসেবক তপনবাবুর খালি গুদামে অনেক'শো গাঁট ধুতি-শাড়ি জমে থাকা এবং হাতিপুর গ্রামবাসীদের জন্য পাওয়া রিলিফের কাপড় আজিজ সাহেব আর সুরেন ঘোষের মতো স্থানীয় নেতা কর্তৃক কালোবাজারে বিক্রি করে মুনাফা অর্জনের ঘটনায় স্পষ্ট। আলোচ্য গল্পে কেবলমাত্র মন্বন্তরকালীন বস্ত্রসংকটের নিদারুণ বর্ণনাই নেই পাশাপাশি তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদও ঘোষিত হয়েছে। প্রসঙ্গক্রমে সমালোচক মানস মজুমদারের মন্তব্য প্রনিধানযোগ্য- "এ গল্প প্রতিবাদের গল্প। প্রতিবাদ বিবেকহীন মানুষের বিরুদ্ধে, প্রতিবাদ দুর্বল শাসনব্যবস্থার বিরুদ্ধে। গল্পের অন্তিমে কৃষকবধূ রাবেয়ার আত্মহত্যা সেই প্রতিবাদের নিদর্শন।"৫

'আজ কাল পরশুর গল্প' প্রসঙ্গে সমালোচক জগদীশ ভট্টাচার্য তাঁর 'আমার কালের কয়েকজন কথাশিল্পী' গ্রন্থে লিখেছেন- "... মন্বন্তরের মধ্যে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় কেবল পরাজিত মানবতার ব্যর্থতাকেই দেখেননি, দুর্নীতি ও অনাচারের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ জনশক্তির অপরাজেয় প্রতিরোধকে গড়ে উঠতে দেখেছেন। 'আজ কাল পরশুর গল্প' তারই বার্তাবহ।"৬ গল্প বিশ্লেষণে দেখা যায় মানসুকিয়া গ্রামের রামপদর বউ মুক্তা মন্বন্তরের সময় বাঁচার তাগিদে বিপথে যায়। পরবর্তীকালে দেশসেবিকারা তাকে স্বামীর

ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে এলেও সমাজপতি ঘনশ্যাম ও তার সহযোগীরা তাকে সমাজে মেনে নিতে চায় না। সমাজপতি ঘনশ্যাম নিজে গ্রামের মধু কামারের মেয়ে গিরিকে শহরে নিয়ে গিয়ে সর্বনাশ করার দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত, তা গ্রামের সকলেই জানে। অথচ সেই ঘনশ্যামই রামপদর বউ মুক্তার প্রতি অবিচার করছে দেখে গ্রামের মানুষ সংঘবদ্ধভাবে প্রতিবাদ জানায়। প্রথমে বনমালীর কণ্ঠে প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছে- "কিসের বিচার? কার বিচার? রামপদ'র বৌ কোন দোষ করেনি।"৭ করালী প্রতিবাদ করে জানিয়েছে- " ... গাঁয়ে খেতে পায়নি, সোয়ামী কাছে নেই, তাই সদরে খেটে খেতে গেছে। ওর দোষটা কিসের?"৮ গ্রামবাসীর সংঘবদ্ধ প্রতিবাদে সমাজপতি ঘনশ্যাম ও তার সহযোগীরা রামপদর স্ত্রীকে সামাজিক স্বীকৃতি দিয়েছে। আলোচ্য গল্পে পঞ্চাশের মন্বন্তরকালীন জীবন্মৃত গ্রামবাসীদের চিত্র পাই লেখকের বর্ণনায়- "প্রায় সকলেই আহত, উৎপীড়িত, সমাজ পরিত্যক্ত অসহায়ের মতো। মনগুলি ভাঙা, দেহগুলিও।"৯ একইসঙ্গে মন্বন্তরকালে নারীদের লাঞ্ছিত হবার বিষয়টি বিশেষভাবে ব্যক্ত হয়েছে আলোচ্য গল্পে- "... বনমালীর বৌকে সদরের দত্ত-বাবু ভুলিয়ে ভালিয়ে ঘর ছাড়িয়ে চালান দিয়েছে ব্যবসা করার জন্য।"১০

'নমুনা' গল্পের শুরুতেই পঞ্চাশের মন্বন্তরকালে অন্ন-বস্ত্রের চাহিদা মেটাতে কন্যা বিক্রির প্রসঙ্গটি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে লেখকের মন্তব্যে- "অন্ন নেই কিন্তু অন্ন পাওয়ার একটা উপায় পাওয়া গিয়েছে মেয়ের বিনিময়ে। কয়েক বস্তা অন্ন, মেয়েটির দেহের ওজনের দু'তিন গুণ। সেই সঙ্গে কিছু নগদ টাকাও, যা দিয়ে খানকয়েক বস্ত্র কেনা যেতে পারে।"১১ আলোচ্য গল্পে দেখা যায় ৪৩ টাকা বেতনের মাস্টার কেশব তার মেয়ে শৈলকে নারী ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত কালাচাঁদের কাছে বিক্রি করেছে টাকা ও অন্নের বিনিময়ে। মন্বন্তরকালে অনেকে অন্নের জন্য কন্যা বিক্রি করেও দুর্ভিক্ষের কবল থেকে বাঁচতে পারেনি, বিষয়টি কেশব যখন নিজ কন্যা শৈলকে নারী ব্যবসায়ী কালাচাঁদের কাছে বিক্রি করে খাদ্য-বস্ত্রের অনটন দূর করার কথা ভাবছিল তখন তার ভাবনায় স্পষ্টভাবে ব্যক্ত হয়েছে- "এ গাঁয়ের রাখালের বোন আর দীনেশের মেয়ে এভাবে বিক্রি হয়েছিল। কালাচাঁদের কাছে নয়, অন্য দু'জন ভিন্ন লোকের কাছে। তবু তো শেষ পর্যন্ত রাখাল বাঁচতে পারেনি। ঘরে মরে পচে সে চারিদিকে দুর্গন্ধ ছড়িয়েছে। দীনেশও তার পরিবারের ঝড়তি পড়তি মানুষ ক'টাকে নিয়ে কোথায় যেন পাড়ি দিয়েছে তার ঠিকানা নেই।"১২ ব্রাহ্মণ ধর্মাবলম্বী কেশব কন্যা শৈলকে বিক্রি করার সময় শিলারূপী নারায়ণকে সাক্ষী রেখে কালাচাঁদের হাতে তুলে দেয়। ফলস্বরূপ ধর্মভীরু কালাচাঁদ শৈলকে ব্যবসার কাজে না লাগিয়ে বাড়িতে বউ হিসেবে নিয়ে যেতে চায়। কিন্তু বাড়িওয়ালি মন্দোদরী টাকার বিনিময়ে শৈলকে ধনী ব্যবসায়ী গজেনের শয্যাসঙ্গীনী করে। এই ঘটনায় কালাচাঁদ রেগে মন্দোদরীকে যখন জানায়- "আমার বিয়ে করা স্ত্রীর ঘরে-"১৩ তখন মন্দোদরী তার হাতে টাকা দিলে সে ঠান্ডা হয়ে যায়। অর্থাৎ

আলোচ্য গল্পে কালাচাঁদ চরিত্রের মধ্য দিয়ে পঞ্চাশের মন্বন্তরকালে মানবতার পরাজয়ের দিকটি সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন গল্পকার।

'রাঘব মালাকার' গল্পে পঞ্চাশের মন্বন্তরকালীন বস্ত্রসংকটের কথা বর্ণিত হয়েছে। গল্প বিশ্লেষণে দেখা যায় চোরাকারবারী দলের সদস্য গৌতম দাস বস্তার বোঝা বলে কাপড় চালান দিত নানা স্থানে; বিষয়টি বোঝা বহনকারী রাঘব মালাকার বুঝতে পেরে গৌতম দাসকে কাপড়ের কথা বললে সে তা অস্বীকার করে এবং তাকে জানায়- "হ্যাঁ, কাপড়! তোকে বলেছে। সদরে খাঁ খাঁ করছে লোকে কাপড়ের জন্যে, বিশ টাকা দিয়ে কাপড় পাচ্ছে না একখানা, আমি নিয়ে চলেছি!"১৪- তার এই মন্তব্য থেকে সহজেই বোঝা যায় মন্বন্তরকালে বস্ত্রসংকট কতটা ভয়াবহ রূপ নিয়েছিল। মন্বন্তরকালে চোরাকারবারী দলের কার্যকলাপের রূপটি ব্যক্ত হয়েছে রাঘব মালাকারের মন্তব্যে- "সদরেই বেচছো বাবু।গুদোম করেছ মালদিয়ায়।এপথে মাল আনছ মাসে দু'বার চারবার, পাঁচগড়ের পথে রোজ এদিকে ওদিক চালান দিচ্ছ খানিক খানিক। মোরা বলি ঠাকুরবাবু পাঁচগড়ের পথে বাসে চেপে মালদিয়া যায় না কেন, ফুলবাড়ি নেমে মজুরি নিয়ে দু'ক্রোশ হাঁটে? পাঁচগড়ের পথে ছোকরা বাবুরা পাহারা দেয়, তাই বিপদ।"১৫ মন্বন্তরকালে নারীদের বিবস্ত্র থাকার কথা ব্যক্ত হয়েছে রাঘব মালাকারের মন্তব্যে- "মোদের ঘরে মেয়ে-বৌ ন্যাংটো হয়ে আছে গো।"১৬ রাঘব মালাকার গৌতম দাসকে কাপড় দান করে যেতে বললেও সে অস্বীকার করে; ফলস্বরূপ রাঘব মালাকার গ্রামবাসীদের নিয়ে গৌতম দাসের কাছ থেকে কাপড়ের বোঝা ছিনিয়ে নেয়। অর্থাৎ আলোচ্য গল্পে শুধু মন্বন্তরকালীন বস্ত্রসংকটের ভয়াবহ রূপই নয় পাশাপাশি যে সমস্ত মানুষের প্রয়াসে বস্ত্রসংকট ভয়াবহ রূপ নিয়েছিল তাদের বিরুদ্ধে মন্বন্তরকালীন পীড়িত মানুষের সংঘবদ্ধ প্রতিবাদ ব্যক্ত হয়েছে।

'গোপাল শাসমল' গল্পে মন্বন্তরকালীন গ্রামবাসীদের জীবন্মৃত চিত্র বিশেষভাবে ব্যক্ত হয়েছে- "গাঁ প্রায় উজাড় হয়ে গিয়েছে... বেঁচে যারা আছে তারাও জীবন্ত নয়।... আজ সকলে ধীর স্থির শান্ত সুবোধ মানুষ- চোখে হতাশার পর্দা, চলনে হতাশার ভঙ্গি, কথায় হতাশার লম্বা টান, প্রতিটি মানুষ যেন- আর কেন, কি আর হবে, সব মায়া, মরা ভালো ইত্যাদির ক্ষীণ প্রাণবন্ত প্রতীক। ঘরে ঘরে ম্যালেরিয়া আর প্যাঁচড়া। এমন ব্যাপক না হলেও অন্য রোগেরও ছড়াছড়ি।"১৭ জেলে যাবার আগে ও পরে গোপাল শাসমলের বাড়ির বর্ণনায় পঞ্চাশের মন্বন্তরকালীন ও পূর্ববর্তী গ্রামীণ পরিবেশের বৈপরীত্য রূপটি ব্যক্ত হয়েছে- "জেলে যাওয়ার সময় তার বাড়িতে ছিল মণ পঁচিশেক ধান, দুটো বলদ, একটা গোরু, পুঁই-মাচা,... । বাড়ি ফিরে দেখল, ধান মোটেই নেই, একটা বলদ নেই, গোরুটা নেই, পুঁই-মাচায় নেই পুঁই, আর লাউ-মাচায় নেই লাউ।"১৮ সেই সময় মেয়েরা অন্নের জন্য দেহব্যবসায় নেমেছিল, বিষয়টি গোপালের মামাতো বোন রতনের মন্তব্যে

স্পষ্ট- "চাল এনেছো তো? আজ আগে চাল দেবে, তবে ছুঁতে দেব। মাইরি বলছি কানাইবাবু-"১৯

'কে বাঁচায়, কে বাঁচে' গল্পে মন্বন্তরকালীন বিবেকবান মানুষের অসহায়তার কথা বর্ণিত হয়েছে। গল্প বিশ্লেষণে দেখা যায় মৃত্যুঞ্জয় নামের এক ব্যক্তি অফিস যাবার পথে অনাহারে মৃত্যু দেখে এতটাই শোকগ্রস্ত হয়ে পড়ে যে মাসের শেষে সমস্ত মাইনে সহকর্মী নিখিলকে দিয়ে রিলিফ ফান্ডে দান করে। অথচ তার পারিবারিক অবস্থাও ততটা ভালো নয়, বিষয়টি নিখিলের মন্তব্যে স্পষ্ট- "বাড়িতে তোর ন-জন লোক। মাইনের টাকায় মাস চলে না। প্রতিমাসে ধার করছিস।"২০ নিখিলের কথার প্রত্যুত্তরে মৃত্যুঞ্জয়ের বলা কথায় দুর্ভিক্ষ-পীড়িত মানুষের প্রতি তৎকালীন বিবেকবান মানুষের আকর্ষণ ব্যক্ত হয়েছে- "আমায় কিছু-একটা করতেই হবে ভাই। রাতে ঘুম হয় না, খেতে বসলে খেতে পারি না। এক বেলা খাওয়া ছেড়ে দিয়েছি। আমার আর টুনুর মা-র এক বেলার ভাত বিলিয়ে দি।"২১ মৃত্যুঞ্জয় অনাহারী মানুষের চিন্তায় এতটাই মগ্ন হয়ে পড়ে যে, নিজের পরিবারের প্রতি দায়বদ্ধতার কথা ভুলে যায়, ফলস্বরূপ তার বাড়ির অবস্থা শোচনীয় হয়ে ওঠে- "টুনুর মা বিছানা নিয়েছে... ছেলেমেয়েগুলি অনাদরে অবহেলায় ক্ষুধার জ্বালায় চেঁচিয়ে কাঁদে।"২২ শেষ পর্যন্ত মৃত্যুঞ্জয়ও ভিখারী হয়ে যায়- "ছোটো একটি মগ হাতে আরও দশজনের সঙ্গে পড়ে থাকে ফুটপাথে আর কাড়াকাড়ি মারামারি করে লঙ্গরখানার খিচুড়ি খায়। বলে, গাঁ- থেকে এইছি। খেতে পাইনে বাবা। আমায় খেতে দাও!"২৩

পরিশেষে বলা যায় যে, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্পে পঞ্চাশের মন্বন্তরকালীন অন্নসংকট, বস্ত্রসংকট, অন্ন-বস্ত্রের জন্য কন্যা বিক্রি, কালোবাজারি প্রভৃতি বিষয়গুলি এমনভাবে ব্যক্ত হয়েছে যে সেগুলি তৎকালীন সমাজ ও ইতিহাসের দলিল হয়ে উঠেছে।

তথ্যসূত্র:

১. ভট্টাচার্য, জগদীশ, আমার কালের কয়েকজন কথাশিল্পী, ভারবি, প্রথম প্রকাশ মাঘ ১৪০০, জানুয়ারি ১৯৯৪, দ্বিতীয় প্রকাশ মাঘ ১৪১৩, জানুয়ারি ২০০৭, পৃ. ১৩৩।
২. বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক, শ্রেষ্ঠ গল্প, আদিত্য পুস্তকালয়, প্রথম প্রকাশ শুভ ১লা বৈশাখ ১৪২৪, পৃ.৯০।
৩. তদেব, পৃ. ৯০-৯১।
৪. তদেব, পৃ. ৯৩।
৫. মজুমদার, মানস, পঞ্চাশের মহামন্বন্তর ও বাংলা ছোটগল্প, সাহিত্য প্রকাশ, আগস্ট ১৯৯৪, পৃ. ৩৬।
৬. ভট্টাচার্য, জগদীশ, আমার কালের কয়েকজন কথাশিল্পী, ভারবি, প্রথম প্রকাশ মাঘ ১৪০০, জানুয়ারি ১৯৯৪, দ্বিতীয় প্রকাশ মাঘ ১৪১৩, জানুয়ারি ২০০৭, পৃ. ১৩৪।

৭. বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক, উত্তরকালের গল্পসংগ্রহ, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, একাদশ মুদ্রণ ডিসেম্বর ২০০১, পৃ. ৬২।

৮. তদেব, পৃ. ৬৩।

৯. তদেব, পৃ. ৫৯।

১০. তদেব, পৃ. ৬২।

১১. তদেব, পৃ. ৭২।

১২. তদেব, পৃ. ৭৪।

১৩. তদেব, পৃ. ৭৮।

১৪. তদেব, পৃ. ৮৮।

১৫. তদেব, পৃ. ৮৮।

১৬. তদেব, পৃ. ৯০।

১৭. তদেব, পৃ. ৭৯।

১৮. তদেব, পৃ. ৭৯।

১৯. তদেব, পৃ. ৮২।

২০. বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক, শ্রেষ্ঠ গল্প, আদিত্য পুস্তকালয়, প্রথম প্রকাশ শুভ ১লা বৈশাখ ১৪২৪, পৃ. ৮৪।

২১. তদেব, পৃ. ৮৪।

২২. তদেব, পৃ. ৮৫।

২৩. তদেব, পৃ. ৮৬।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ছোটগল্প : সমকালীন সমাজবাস্তবতা

রেণুকা অধিকারী
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
দুর্গাপুর সরকারি মহাবিদ্যালয়

সংক্ষিপ্তসার : বাংলা সাহিত্য জগতে কথাসাহিত্যিক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের আবির্ভাব বিশ শতকের তিরিশের দশকে। সমসাময়িক যুগের একজন প্রতিনিধিস্থানীয় কথাশিল্পী। শিল্পী মাত্রই সমাজের প্রতিনিধি। কথাসাহিত্য জন্ম লগ্ন থেকেই সমাজ জীবন নির্ভর শিল্পকর্ম। সামাজিক মানুষের যাবতীয় কার্যকলাপ, আবেগ, দ্বন্দ্ব-সংঘাত ইত্যাদি নিয়েই গল্পের অবয়ব গড়ে ওঠে। সমাজের সঙ্গে জড়িত থাকে মানুষ ও মানুষের জীবন, মানুষের সুস্থ চেতনা, মানবিক বোধবুদ্ধি। কথাসাহিত্যিকেরা জীবন-বিচ্ছিন্ন নন, বরং মানবজীবন নিয়েই তাঁদের যত কারবার। তাঁদের মানস দৃষ্টির সামনে এই বাস্তব সমাজ এবং সমাজ অভ্যন্তরে বাস্তবজীবনের যে ছবি ধরা পড়ে–তাই প্রতিফলিত হয় তাঁদের সৃষ্টির মধ্যে। সেই সঙ্গে সাহিত্য সৃষ্টিতে দেশ-কালের প্রভাব বিশেষভাবে প্রতিফলিত হয়। সাহিত্যিকের মনের উপর সমকালীন সমাজ, অর্থনীতি, রাজনীতি, সংস্কৃতি বিশেষভাবে প্রভাব ফেলে। গল্পকার ছোটগল্পের সীমিত পরিসরের মধ্যেও সমকালীন জগৎ ও সমাজ জীবনের বহুমুখী ভাবনার বিন্যাস করে থাকেন। কালে কালে শিল্পী সাহিত্যিকদের সৃষ্টিসমূহে আমরা সমকালকে খুঁজে পাই। সমকালীন অশান্ত এক সময়ে বাংলা সাহিত্যের আঙিনায় নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের আবির্ভাব ঘটে। চল্লিশের দশকের শেষ দিকে তাঁর বিখ্যাত শ্রেষ্ঠ ছোট গল্পগুলি রচিত। স্বাভাবিভাবে এই যুগ এবং সময় লেখককে সব থেকে বেশি আলোড়িত করেছিল। এইসময়, অর্থাৎ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, স্বাধীনতা আন্দোলন, মন্বন্তর ও দুর্ভিক্ষ, দাঙ্গা, দেশভাগ ইত্যাদি ঘটনার আলোড়ন নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়কে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল। এই ঐতিহাসিক ঘটনাগুলি বাংলার সমাজ জীবনেও ব্যাপক প্রভাব ফেলেছিল। এর ফলে সমাজের বাস্তব রূপের পরিবর্তন দেখা দেয়। সামাজিক জীবনে দেখা যায় অজস্র জটিলতা। বাংলা কথাসাহিত্যের ধারায় আসে জটিলতা এবং বৈচিত্র্য। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় এবং সমসাময়িক লেখক গোষ্ঠী তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, সুবোধ ঘোষ, নবেন্দু ঘোষ, নরেন্দ্রনাথ মিত্র এই সমকালীন সমাজবাস্তবতার ছবি তাঁদের গল্পের মধ্যে সার্থক ভাবে তুলে ধরেন। এই প্রসঙ্গে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের কথায় বলতে পারি- "বাংলা দেশের আরো অনেক লেখকের মতোই আমিও প্রথম কলম ধরেছিলাম পরাধীন ভারতবর্ষের দুঃসহ অগ্নিযন্ত্রণার মধ্যে।....ত্রিশ সালের সত্যাগ্রহ দেখেছি, দেখেছি চট্টগ্রামের বিস্ফোরণ।... তারপর দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের দুঃস্বপ্নের মধ্যদিয়ে কঙ্কালের একপূর্ব শোভাযাত্রা। সেদিনের সেইদিনের সেই অসহ্য আত্মগ্লানি আর যন্ত্রণার মধ্যে সমস্ত

বাঙালী লেখকের সঙ্গে আমিও গর্জন করে উঠেছি, ‘যুগান্তরে’ লিখেছি ‘নক্রচরিত’, ‘আনন্দবাজারে’ লিখেছি ‘দুঃশাসন’ ‘দেশে’ লিখেছি ‘পুষ্করা’ আর ‘ভাঙা চশমা’। আরো অনেক গল্প-কিছু কিছু উপন্যাস।” যুগ ও সময়-সচেতন লেখক সমকালের বিভিন্ন ঘটনায় বিচলিত হয়েছেন, তাঁর গল্পের পাতায় পাতায় ফুটে উঠেছে তারই প্রতিফলন।

সূচক শব্দঃ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ ও মহামারী, মন্বন্তর ও মড়ক, ব্ল্যাক-আউট, কালোবাজারী, দাঙ্গা, দেশভাগ ও উদ্বাস্তু সমস্যা।

প্রতিপাদ্য বিষয় : বিশ শতকের তিরিশের দশকের একজন প্রতিনিধিস্থানীয় কথাশিল্পী নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়। বিশ্বযুদ্ধোত্তর পরিস্থিতির রূপায়ণে, বিশুদ্ধ সময়চেতনায়, মানুষের প্রতি মমত্ববোধ ও জীবপ্রেমে তাঁর সাহিত্য সঞ্জীবিত। তিনি মনে করেন, ‘জীবনের ক্ষতি ও ক্ষতই শেষ কথা নয়, জীবনকে ভালোবাসাই একমাত্র সত্য।’ তাঁর সাহিত্যেও রয়েছে এই দৃষ্টি ভঙ্গির রূপায়ণ। তিনি নিজেই জানিয়েছেন-‘ছোটগল্প লিখে অনেক তৃপ্তি পাই’। তাঁর সামগ্রিক রচনাবলীতে তিনি যেমন অমর কিছু চরিত্রসৃষ্টি করেছেন যেমন ‘টেনিদা’ কিশোর সাহিত্যে তার অমর সৃষ্টি। তেমনই সৃষ্টি করেছেন কালজয়ী কিছু উপন্যাস এবং ছোটগল্প। প্রকৃতি ভাবনা, সময়চেতনা তাঁর গল্পের অন্যতম উপাদান। তাঁর রচিত ছোট গল্পগুলিতে সমকালীন জীবনের প্রকাশিত প্রামাণ্য তথ্যের যথাযথ প্রয়োগ, দেশের রাজনীতি ও অর্থনীতি অবস্থা, শিল্প ব্যবস্থা, উৎপাদনের সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত মানুষদের জীবন সমস্যা, সমাজে ধর্ম এবং ধর্ম সম্প্রদায়গুলির পারস্পরিক সম্পর্ক ইত্যাদি বিষয় অত্যন্ত স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ ও মন্বন্তর, ব্ল্যাক আউট, হিন্দু–মুসলমান দাঙ্গা, কালোবাজারী, দেশভাগ এর মতো ঘটনায় ওলটপালোট হয়ে গেছে সাধারণ মানুষের মূল্যবোধ, বিশ্বাস, ধ্যানধারণা, জগৎ ও জীবনের প্রতি আস্থা। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর ছোটগল্পে সমকালের সমাজ বাস্তবতার ছবি নিপুণ দক্ষতায় ফুটিয়ে তুলেছেন। বর্তমান প্রবন্ধে লেখকের সমকালীন সমাজবাস্তবতা নির্ভর ছোটগল্প গুলির উপর আলোকপাত করার চেষ্টা করেছি।

ভারতবর্ষের এক অশান্ত সময়ের পটভূমিতে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় এর রচনার সূত্রপাত। ত্রিশের দশকের শেষের দিকে তিনি সাহিত্য রচনা শুরু করেন। এই সময় স্বাধীনতা আন্দোলন, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শুরু, বিশ্বব্যাপী যুদ্ধের প্রভাব ভারতবর্ষকেও স্পর্শ করে। পৃথিবীব্যাপী অর্থনৈতিক মন্দা, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, দুর্ভিক্ষ ও মন্বন্তর, দেশভাগ ইত্যাদি ঐতিহাসিক ঘটনাগুলি বাংলার সমাজজীবনে ব্যাপক প্রভাব ফেলেছি। তারাশঙ্কর, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, সুবোধ ঘোষ, মনোজ বসু, প্রবোধকুমার সান্যাল, নরেন্দ্রনাথ মিত্র এবং নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখ গল্পকার এই সমকালীন সমাজ বাস্তবতার ছবি তাঁদের গল্পের মধ্যে সার্থকভাবে তুলে ধরেন। এই প্রসঙ্গে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় লিখেছেন-‘ বাংলা দেশের আরো অনেক লেখকের মতোই আমিও প্রথম

কলম ধরেছিলাম পরাধীন ভারতবর্ষের দুঃসহ অগ্নিযন্ত্রনার মধ্যে। আমি তখন স্কুলের ছাত্র। ত্রিশ সালের সত্যাগ্রহ দেখেছি, দেখেছি চট্টগ্রামের বিস্ফোরণ।... তারপর দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের দুঃস্বপ্নের মধ্যদিয়ে কঙ্কালের এক অপূর্ব শোভাযাত্রা। সেদিনের সেই অসহ্য আত্মগ্লানি এর যন্ত্রণার মধ্যে সমস্ত বাঙালি লেখকের সঙ্গে আমিও গর্জন করে উঠেছি।” বাংলা কথাসাহিত্যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভয়ালরূপ যুদ্ধের প্রতিক্রিয়ার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব নানাভাবে লক্ষ্য করা যায়। শহরের বুকে ব্ল্যাক আউটের রাত্রি, জাপানি বোমার আতঙ্ক, শহরের রাস্তায় মিলিটারি সেনার টহলদারি, এইসব যুদ্ধকালীন প্রত্যক্ষরূপের সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় হাত ধরাধরি করে বাংলা দেশের বুকে নেমে আসে প্রাকৃতিক দুর্যোগ আর মানুষের সৃষ্টি মহা্মন্বন্তর। গ্রামেগঞ্জে, শহরের পথে পথে হাজার হাজার নিরাশ্রয় মানুষের ভীড়। ক্ষুধার্ত মানুষের হাহাকার, মৃত্যুর মিছিল, অন্যদিকে শাসনতান্ত্রিক সহযোগিতায় সুযোগ সন্ধানী ঘুষখোর, মজুতদার, মুনাফালোভী দালাল শ্রেণীর উদ্ভব, আকাশ ছোঁয়া মূল্যবৃদ্ধি এমনকি নারীর মর্যদা লুণ্ঠিত হয়েছে এই সময়। যুগ ও সময় সচেতন লেখক সমকালের বিভিন্ন ঘটনায় বিচলিত বোধ করেছেন। তাঁর লেখা বহু গল্পের মধ্যে সমকালীন সমাজবাস্তবতার রূপ আমরা দেখতে পাই।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর কৈশোর বয়সে স্বাধীনতা আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছিলেন, ছেলেবেলার স্মৃতিকথায় তিনি নিজেই সে কথা স্বীকার করেছেন। তাঁর প্রথম দিককার কয়েকটি উপন্যাসে (তিমিরতীর্থ, বৈতালিক, শিলালিপি,মন্দ্রমুখর প্রভৃতি) ব্রিটিশ বিরোধী জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের উল্লেখ পাওয়া যায়। স্বশস্ত্র সহিংস বিপ্লববাদী আন্দোলনের অভ্যুত্থানের প্রসঙ্গ আছে ‘ইতিহাস’ও ‘বনজোৎস্না’ গল্পে। বিয়াল্লিশের আগস্ট আন্দোলনে উত্তাল দিনগুলির ছবি ফুটে উঠেছে ‘ইতিহাস’ গল্পে। লোকেশ বিশ্ববিদ্যালয় উত্তীর্ণ যুবক, ছাত্রাবস্থায় লবণ আইন অমান্য আন্দোলন ও সত্যাগ্রহ আন্দোলনে যোগ দেওয়ার অপরাধে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। শেষে সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনে যোগ দেয়, ধরা পড়ে মৃত্যুকে হাসি মুখে বরণ করে নেয়। ‘বনজ্যোৎস্না’ গল্পটিও এই সময়ের পটভূমিতে লেখা। গল্পের নায়ক মহীতোষ বিয়াল্লিশের আগস্ট আন্দোলনে যোগ দিয়েছে। পুলিশের তাড়ায়, ইংরেজদের হাতে ধরা পড়ার ভয়ে পালিয়ে এসে আশ্রয় নেয় ডুয়ার্সের জঙ্গলে। কিন্তু মন পড়ে থাকে আন্দোলনের কার্যকলাপের দিকে। শৃঙ্খলিত ভারতমাতার কথা তার মনে, পথে পথে বন্দেমাতরম ধ্বনি সে শুনতে পায়। ডুয়ার্সের জঙ্গলে ভুটানী মেয়ে শিউকুমারীর সঙ্গে তার পরিচয় ঘটে, ধীরে ধীরে প্রেমের সম্পর্কে জড়িয়ে পরে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখা যায় দলের অধিনায়কের কঠিন আদেশে দেশমাতার মুক্তির জন্য পুনরায় আন্দোলনের কাজে যোগ দেয় সে। সেই সময় বিপ্লবীদের উপর ব্রিটিশ সরকারের কড়া দমন-পীড়ন নীতি থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য এইভাবে তাদের গোপন ডেরায় আশ্রয় নিতে হত।

'নিশাচর' গল্পের পটভূমি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কোলকাতা মহানগর। রাত্রিবেলা 'ব্ল্যাক্‌আউট', 'তীব্র হুইসিলের শব্দ', জাপানী বোমার আতঙ্ক কোলকাতা শহরকে স্তব্ধ করে দিয়েছিল। গল্পের নায়ক রাজনৈতিক কর্মী পুলিশের ভয়ে রাতের অন্ধকারে পালিয়ে বেড়াতে বাধ্য হয়েছে। 'ভোগবতী' গল্পের নায়ক-নায়িকা অরণ্যের জঙ্গলে কাঠ কাটতে গিয়ে যুদ্ধ-বিমানের শব্দ শোনে। 'এমন সময় একটা বিজাতীয় শব্দে পাহাড়ের দিবাস্বপ্ন ভেঙ্গে গেল।--নায়ক সোনা বলে উঠে –'রোজই তো আসছে আজকাল, লড়াই বেঁধেছে কিনা।' কিছুদিনের মধ্যে ঐ অরণ্য অঞ্চলে মিলিটারি আসে। এই অঞ্চলের সমস্ত কৃষক, অরণ্য- জীবী সাঁওতালেরা কুলিতে পরিণত হয়। 'হাড়' গল্পে আছে দুর্ভিক্ষ ও মন্বন্তরের প্রসঙ্গ। এই গল্পে লেখক পাশাপাশি দুটি বিপরীত ছবি অঙ্কন করেছেন। একদিকে উচ্চবিত্ত মানুষের প্রাচুর্য অন্যদিকে নিরন্ন মানুষের হাহাকার। লোহার ফটকে ঘেরা এক যাদুমন্ত্রের দেশে বাস করেন রায় বাহাদুর। সুখী জীবনযাপন আর বিলাসী কল্পনার রোমন্থনে তার দিন কাটে। অন্যদিকে তার প্রাসাদের অদূরে অবস্থিত মনোহর পুকুর পাড়ের বুভুক্ষু মানুষের কলোনী। দুর্ভিক্ষপীড়িত অন্নপ্রত্যাশী একদল গ্রামের মানুষ এসে ভীড় জমিয়েছে সেখানে। তারা চিৎকার করছে, কলহ করছে, পরস্পরের মাথা থেকে উকুন ঝাড়ছে। জানোয়ারের মতো কালো জিভ দিয়ে খাচ্ছে হাইড্রেনের ময়লা জল। একদিকে অট্টালিকায় বুর্জোয়া জীবনের বিলাসিতার নমুনা রূপে কালো ভেলভেটের বাক্সে সঞ্চিত রয়েছে মিডান দ্বীপের মন্ত্রসিদ্ধ হাড়। অন্যদিকে ডাস্টবিনে বুভুক্ষিত মানুষের হাতে এসেছে হাড়। এই ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার হাত ধরে সমাজে নেমে এসেছে এই বীভৎস মন্বন্তর। আর গ্রামের নিম্নবিত্ত মানুষেরা সব হারিয়ে নিঃসহায়, নিরন্ন। মৃত্যু পথযাত্রী। পঞ্চাশের মন্বন্তরের সময় গ্রাম থেকে দলে দলে মানুষ শহরে এসেছে খাদ্যের আশায়। ডাস্টবিনে ফেলে দেওয়া খাবার নিয়ে কাড়াকাড়ি করছে মানুষ এবং কুকুর। এই প্রসঙ্গে মনে আসে 'নবান্ন' নাটকের ক্ষুধার্ত প্রধান সমাদ্দার সেই আর্তকণ্ঠ-' আর কত চেঁচাব দুটো ভাতের জন্যে। তোমরা কি সব বধির হয়ে গেছো বাবু কিছু কানে শোন না।'১ বুভুক্ষু কুঞ্জকে কুকুরের সঙ্গে একসাথে ডাস্টবিনে খাদ্যের সন্ধান করতে দেখা যায়। 'মানুষ এবং কুত্তাতে ডাস্টবিনেতে অন্ন চাটি একসাথে।' আশাপাশের গ্রামে মন্বন্তরে ফলশ্রুতিতে দেখা দিয়েছে মড়ক। 'পুষ্করা' গল্পে মন্বন্তর ও মহামারীর ভয়াবহ চিত্র অঙ্কন করেছেন লেখক। মড়কে গোটা বাংলা দেশ মহাশ্মশানে পরিণত হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে গ্রামের মহাজন তালুকদার বলাই ঘোষ তিনশো টাকা খরচ করে তর্করত্নকে দিয়ে শ্মশানকালী পূজার আয়োজন করে। মড়কের হাত থেকে বাঁচতে তার এই পূজার আয়োজন। পূজা শেষে শিবাভোগ গ্রহণকারীকে দেবী বলে যাকে মনে হলেও সে আসলে এক পাগলিনী গ্রাম্যবধূ। আকাল-মহামারীতে স্বামী আর তিনপুত্রকে হারিয়ে অপ্রকৃতিস্থ। পরের দিন যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে ধূলোয় পড়ে তার মৃত্যু হয়েছে। দীর্ঘদিনের বুভুক্ষার পর দেবভোগ্য শিবাভোগ সে সহ্য

করতে পারে নি। এখানেই নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় তীক্ষ্ম সমাজ সচেতনতার পরিচয় দিয়েছেন। 'কালোজল' গল্পে আড়িয়াল খাঁ-র মাঝি শীতল, দুর্ভিক্ষে উজাড় হয়ে যাওয়া বাংলা দেশের পরিবর্তন লক্ষ্য করে। যুদ্ধ আর দুর্ভিক্ষের করাল গ্রাসে 'উজাড় হয়ে গেল গ্রামের পর গ্রাম। আড়িয়াল খাঁর অনিবার্য ভাঙনের মতো মৃত্যুর নিষ্ঠুর হাত নির্মমভাবে চূর্ণবিচূর্ণ করে দিয়ে গেছে সমস্ত। শ্রীহীন শূণ্যপ্রায় গ্রামগুলো যেন শ্মশানের মতো দাঁড়িয়ে।....মানুষ যারা আছে তারা যেন মানুষ নয়, কতগুলো আকারহীন, অবয়বহীন ছায়ামূর্তি।' গল্পের অন্যতম চরিত্র তারাপদ অন্নের সংস্থানের জন্য পশ্চিমে চলে যায়। আর তার স্ত্রী অরুণা পেটের ভাত আর কাপড়ের অভাবে খালের জলে গলায় কলসী বেঁধে আত্মহত্যা করে। দুর্ভিক্ষের করাল গ্রাসে অন্ন ও বস্ত্রের অভাবে গ্রামের মানুষ দিশেহারা হয়ে এইভাবে আত্মহত্যার পথ বেছে নেয়।

এই সময় অন্য আর একটি সমস্যা দেখা দেয় গ্রামাঞ্চলে, মেয়ে ও বোন বাড়ি থেকে নিরুদ্দেশ হয়ে যেতে শুরু করে-'শোনা যায় কারা নাকি তাকে নিয়ে গিয়ে কলকাতায় বিক্রি করে দিয়েছে। নারীকে পণ্যের মতো বিক্রি করে দেওয়া হতো এই প্রসঙ্গ উঠে এসেছে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের বেশ কিছু গল্পে। এই সময় একশ্রেণীর মূল্যবোধহীন, নির্মম, দালাল শ্রেণীর উদ্ভব ঘটে সমাজে। এদের শোষণের মারণকাঠি দেশের সমাজ জীবনে দুঃসহ দুর্দিন নিয়ে এসেছিল। 'বীতংস' গল্পে ধূর্ত সুন্দর-লাল আসামের চা-বাগানে কুলির যোগান দেবে বলেই সংসার ছেড়ে মহাপুরুষ সন্ন্যাসীর ভেক ধারণ করে। সাঁওতাল পরগণায় সাধু সেজে জড়িবুটি, তুকতাক, মন্ত্রতন্ত্রে অশিক্ষিত, সরল সাঁওতালদের নিজের বশে আনে। কাঁচা টাকার প্রতি মোহ এবং শহর ও স্বচ্ছলতার মন্ত্রে সাঁওতাল পুরুষ-রমণীরা যখন বশীভূত, তখন মড়কের ভয় দেখিয়ে, শিংবোঙার মিথ্যে আদেশ শুনিয়ে তাদের ঘর-বাড়ি ছাড়া করে নিয়ে যায় আসামের চা-বাগানে। সুস্বাস্থ্য আর সৌন্দর্যে পরিপূর্ণ সর্দার কন্যা বুধনীকে সে শহর দেখানো, চুড়ি, তেল আর শাড়ির স্বপনে মোহিত করে। শোষক দালাল সুন্দরলাল নারী পণ্য হিসেবে বুধনীকে বেশি দামে বিক্রি করে দেয় শোষক সাহেব মালিকের কাছে। 'তীর্থযাত্রা' গল্পে এই দুর্ভিক্ষ ও মন্বন্তরের একটু ভিণ্ন ছবি দেখা যায়। 'তেরশ পঞ্চাশ সালের আশ্বিন মাস। বাংলা সীমান্তে যুদ্ধের কালো মেঘ ঘনিয়েছে.... এসেছে সর্বগ্রাসী দুর্ভিক্ষ।' এই ভয়াবহ সময়ে নারীও পণ্যতে রূপান্তরিত হয়েছে। নরোত্তম ঠাকুর তার পৈতৃক বৃত্তি ছেড়ে অর্থাৎ যাজন-যজনবৃত্তি ছেড়ে দিয়ে 'নতুন কালের হাওয়ায়' গণিকা পল্লীতে নারী সরবরাহের কাজ করে। ঠাকুর ব্রাহ্মণ থেকে একেবারে পাচারকারী দালালে রূপান্তরিত হয়েছে। গল্পে দেখা যায়, পাঁঠার নৌকায় একদল নারী বোঝাই দিয়ে নরোত্তম বিক্রি করতে চলেছে শহরে। মড়কে জর্জরিত বাংলার বুক থেকে গৃহচ্যূত গৃহলক্ষ্মীরা এইভাবে পণ্য হতে চলেছে শহরের গণিকা পল্লীতে। ব্ল্যাক-আউটের দিনেও মহানগরীর গণিকাপল্লীতে দেখা যায় আলোর রোশনাই। এর চাইতে মূল্যবোধের অবক্ষয়ের

বাস্তবচিত্র আর কি হতে পারে ? এছাড়াও 'তৃণ', 'কবর', 'ডিম', 'ভাঙা চশমা' প্রভৃতি গল্পেও দুর্ভিক্ষ ও মহামারীর বাস্তব চিত্র দেখা যায়।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের বেশ কিছু গল্পে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এবং মন্বন্তরের পটভূমিতে হঠাৎ গজিয়ে ওঠা নতুন বিত্তশালী শ্রেণীকে আমরা দেখতে পাই। রাতারাতি ভুঁইফোড় এর মতো এদের আবির্ভাব ঘটে এবং প্রচুর অর্থ সম্পদের মালিক। এরা কালোবাজারী, ব্যবসায়ী, আড়তদার, মজুতদার সম্প্রদায় যারা দেশের অর্থনৈতিক সংকটকে তীব্রতর করে তুলেছে। এই গল্পগুলিতে শ্রেণীবৈষম্য ও শোষণের রূপ নিপুণভাবে তুলে ধরেছেন গল্পকার। 'নক্রচরিত' গল্পে নিশিকান্ত কর্মকার এই শ্রেণীর মানুষ। যুদ্ধের বাজারে সে তার ব্যবসার পরিধিকে বিস্তৃত করেছে। গল্পে তার পরিচয় পাই সে গোলাপাড়া হাটের, মহাজন, আড়তদার, ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট। রাতের অন্ধকারে ডাকাতি করে, সোনাদানা সস্তায় কিনে নিজের সিন্দুকে জমিয়ে রাখে। কালো ব্যবসার অন্ধকার জগতের নিশি একচ্ছত্র সম্রাট। অন্ধকারের ব্যবসায় তার গোলায় চালের পাহাড় জমে ওঠে। মিলিটারি কন্টাক্টরের সঙ্গে যোগাযোগ করে চারগুণ পাঁচগুণ দামে সেই চাল বিক্রি করে। দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ সাধারণ মানুষকে ক্ষুধার অন্ন থেকে বঞ্চিত হয়। এই গল্পে নিশিকান্তর মতো আছে মধুসূদন কুন্ডু, নিত্যানন্দ পোদ্দার, আর জগন্নাথ চক্রবর্তী মতো মহাজনেরা। এরা সকলে দুর্নীতিগ্রস্থ শোষক শ্রেণী। এরা সকলে সমকালে গজিয়ে ওঠা নূতন শ্রেণীর উচ্চবিত্ত। প্রশাসনের সঙ্গে যোগসাজস করে দেশের সাধারণ মানুষদের নির্বিচারে শোষণ করে। ফলে সর্বহারা শোষিত মানুষ মারা যায় খিদের জ্বালায়, কেউবা গলায় দড়ি দেয়। তাই অন্ধকার পথে হাঁটতে হাঁটতে নিশিকান্ত ভয় পায়। মনে করে, 'সেই বাঁশঝাড়ের ভিতর থেকে এখুনি বেরিয়ে আসবে মাংসচর্মহীন অস্থিময় কতগুলি ছায়ামূর্তি-তিলে তিলে যারা না খেয়ে শুকিয়ে মরেছে তাদের প্রেতদেহ।– মনে হল সেই মূর্তিগুলো আর্তনাদ করে উঠবে-আমাদের খাদ্য, আমাদের জীবন নিয়ে লোভের ভান্ডারে জমা করেছ তুমি।' 'দুঃশাসন' গল্পে একই ছবি দেখা যায়। গল্পের প্রধান চরিত্র দেবীদাস। সে ছোট গাঁয়ের ছোট বন্দরের বড় ব্যাবসায়ী ও কাপড়ের আড়তদার। যুদ্ধের বাজারে অতিরিক্ত মুনাফালাভের জন্য বস্ত্রের যোগান বন্ধ করে দিয়ে কৃত্রিম বস্ত্র সংকটের সৃষ্টি করে। তার অনৈতিক ব্যবসাকে প্রশ্রয় দেয় ঘুষখোর শচীকান্ত দারোগা। দুঃশাসনের মতো গ্রাম বাংলার মানুষের বস্ত্র কেড়ে নিয়েছে সে 'সারা পৃথিবী জুড়েই যেন দ্রৌপদীর মতো আর্তনাদ উঠছে আজকে।' তাই রাতের অন্ধকারে দুঃশাসন পালার অভিনয় দেখে ফেরার পথে মুচি পাড়ার একটি ষোড়শী মেয়েকে দেখতে পায় দেবীদাস-'মেয়েটি সম্পুর্ণ নগ্ন। কোনখানে একফালি কাপড় নেই-কাপড় পাবার উপায় নেই।' গোটা গ্রাম জুড়ে বস্ত্রের অভাব অথচ সমস্ত কাপড় তার গুদামে মজুত। সাধারণ মানুষ কাপড়ের অভাবে উলঙ্গ। এর চাইতে লজ্জাজনক বিষয় আর কি হতে পারে ? একই রকম চিত্র মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'দুশাসনীয়' গল্পে দেখা

যায়। বস্ত্রের সংকট মা বোনেরা ছেঁড়া বস্তা বা চট ব্যবহার করছে, রাতের অন্ধকারে বাইরে বের হচ্ছে, ‘তেল নেই, দীপহীন অন্ধকার বাড়ি। অন্ধকার বলেই বুঝি পায়খানার ছেঁড়া চটের পর্দা জড়িয়ে নিজের কাছে রাবেয়া লজ্জা কম পায়।’২ কাপড়ের অভাবে লজ্জা নিবারণের কোন উপায় না পেয়ে পুকুরের জলে ডুবে আত্মহত্যা করে রাবেয়া। ‘লুচির উপাখ্যান’ গল্পের মালিক সিদ্ধেশ্বর তেলের কল, আটার কল, আরোও অসংখ্য কালোবাজারী কারবারের খাঁটি ব্যবসাদার মানুষ। হাজার হাজার মণ কাঁকর নৌকা ও লরী বোঝাই করে কলকাতায় সাপ্লাই করে। আর চালের সঙ্গে মিশে তা চলে যায় বাংলার শহর-গ্রামের দোকানে দোকানে। বিভিন্ন খাদ্যদ্রব্যে কাকর, ধুলো, চর্বি প্রভৃতি ভেজাল মেশানোই তার ব্যবসা। মধ্যবিত্ত শিক্ষিত যুবক একে অন্যায় এবং জোচ্চুরি বললে সে উত্তর দেয়, ‘ব্যবসা-ব্যবসাই। ধর্মপুত্তুর যুধিষ্ঠির সেজে কোন্ ব্যাটা বসে আছে?’ সেই সঙ্গে একটি মূল্যবান কথা সে জানিয়ে দেয়, ‘যুদ্ধের বাজারে আর সব জিনিসই সোনা হইয়ে গেছে-এক মানুষের প্রাণ ছাড়া।’

চল্লিশের দশকে হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা, তেভাগা আন্দোলন এর প্রসঙ্গ নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের বেশ কয়েকটি ছোট গল্পে উঠে এসেছে। ‘ইজ্জৎ’ গল্পে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার প্রত্যক্ষ ছবি দেখতে পাওয়া যায়। হিন্দু–মুসলমান অধ্যুষিত গ্রাম, চারিদিকে সহজ অশিক্ষা অজ্ঞতার শান্তিতে ঘেরা সেখানে হঠাৎ দাঙ্গার বাধে। তুচ্ছ একটা কারণে, ফাঁকা মাঠে পাশাপাশি সহাবস্থান করা ফকিরের সমাধি এবং কালীর থান নিয়ে গ্রামের হিন্দু মুসলমানের মধ্যে বিরোধ বাধে। দুই দলের মৌলবী আর পুরোহিত উসকানি দেয়। সড়কি টাঙ্গিতে শান দেওয়া শুরু হয়। ধ্বনি উঠে আল্লাহ-হু-আকবর আর কালী-মাইকি জয়। হিংস্রতার চরমরূপ প্রকাশ পায়। হাবিব মিঞা হিন্দু মুসলমানের মধ্যে দাঙ্গা বাধিয়ে নিজের আখের গোছাতে চায়। সেই গোপনে দাঙ্গা বাধিয়ে হিন্দু নেতা জগন্নাথ ঠাকুরের ধানি জমি ছিনিয়ে নেওয়ার সহজ উপায় ঠিক করে নেয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দাঙ্গা ঘটে নি। উভয় দলের সর্দার জেনে যায় তাদের শত্রু হাবিব মিঞাকে। তেভাগা কৃষক আন্দোলনের প্রতিফলন দেখা যায় ‘বন্দুক’ গল্পে। বাংলা দেশের রংপুর, মালদা, জলপাইগুড়ি, ময়মনসিংহ প্রভৃতি অঞ্চলে হিন্দু-মুসলমান একত্রে জমীদার মহাজনদের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করে। ‘বন্দুক’ গল্পে হিন্দু-মুসলিম চাষিরা সম্মিলিত ভাবে শপথ নেয়-‘জান দেব, ধান দেব না।’ নিজেদের পরিশ্রমের ফসল তারা মহাজনের গোলায় তুলে দিতে রাজী নয়। ফসল কেটে নিজেদের ঘরে তুলেছে তারা, এবং মহাজন আর জোতদারকে বলে পাঠায়, দরকার হলে তারা যেন নিজেদের ভাগ নিজেরাই এসে নিয়ে যায়। ফসলের তিনভাগের একভাগ মাত্র জমিদার–জোতদারদের দেবে। সময়ের সাথে সাথে অশিক্ষিত চাষিরাও নিজেদের জমি এবং ফসলের ভাগ সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠে।

ভারতবর্ষের স্বাধীনতা প্রাপ্তি ঘটেছিল দেশভাগের মতো কলঙ্কজনক ঘটনা দিয়ে। স্বাধীনতা পরবর্তী বছরগুলিতে পশ্চিম বাংলায় উদ্বাস্তু সমস্যা চরম আকার ধারণ করে।

দেশভাগ এবং উদ্বাস্তু সমস্যার প্রসঙ্গ নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের বেশ কয়েকটি ছোটগল্পে ফুটে উঠেছে। 'তিতির' এবং 'সীমান্ত' গল্পে দেখা যায় দেশভাগের প্রত্যক্ষ বেদনার ছবি। 'তিতির' গল্পে একই গ্রামের মানুষ জুলফিকর ও শুকলাল আজ দুই রাষ্ট্রের নাগরিক। একটিমাত্র দেশের মাঝখানে সীমান্তরেখা টেনে দুটি রাষ্ট্রে ভাগ হয়ে গেছে। ভারত-পাকিস্থানের মধ্যিখানে 'নো-ম্যানস-ল্যান্ডে' দাঁড়িয়ে জুলফিকার ও শুকলাল পুরনো দিনের স্মৃতিচারণ করে। দাঙ্গার বীভৎস স্মৃতি ওরা মন থেকে মুছে ফেলতে পারে না। মিলিত হতে পারে না। এখন তাদের মধ্যে সীমান্তের বিরাট ব্যবধান। এ ব্যবধান শুধু সীমান্তের নয় ধীরে ধীরে হৃদয়ের মধ্যেও ব্যবধান। 'সীমান্ত' গল্পে দেখা যায় পাকিস্থানে বসে ফজলে রবি দেশভাগের মতো ঘটনার কথা বার বার মনে করে। 'সত্যি সত্যি পাকিস্থান হয়ে গেল। নদীর ওপার থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে আসতে লাগল মুসলমান, এপার থেকে দলবেঁধে পালাতে লাগল হিন্দু।---আজাদীর জন্য যে মাটিতে দয়াল মন্ডল তার বুকের রক্ত ঝরিয়ে দিলে-সেই মাটি তার রইল না। সে হল ভিন দেশের বাসিন্দা।....হিন্দুস্থান আর পাকিস্থান। মাঝখানে শুধু একটা নদীর খেয়াঘাট পার হয়েই মানুষ কেমন করে এতদূরে সরে যায় কে বলবে!' দয়ালের মেয়ে ফুলমনিকে মানুষ করছিল ফজল রবি। কিন্তু পাকিস্থান হওয়ার পর গ্রামে প্রচন্ড অসন্তোষ শুরু হয় ফুলমনিকে নিয়ে। ফজলে ফুলমনিকে বিয়ে দিয়ে হিন্দুস্থানে পাঠিয়ে দেয়। আর তার জন্য চাল পৌঁছে দিতে গিয়ে সীমান্তে লাঠির আঘাতে তার মৃত্যু হয়। দেশভাগের ফলশ্রুতিতে দেখা দেয় উদ্বাস্তু সমস্যা। উদ্বাস্তু সমস্যার তীব্র সংকটে মানুষের মূল্যবোধেও চরম অবক্ষয় ঘটে গিয়েছিল সেই সময়।'বাইশে শ্রাবণ' গল্পের নায়িকা শকুন্তলার পরিবার উদ্বাস্তু হয়ে কলকাতায় আসেন। বরানগরের এক দমবন্ধ গলির ভেতর পঁচিশ টাকা ভাড়া বাড়িতে গাদাগাদিভাবে বাস করতে শুরু করে। চরম দারিদ্রতা গ্রাস করে পরিবারটিকে। দেবতার মতো বাবা বাতের ব্যাথায় যন্ত্রনায় কদর্য ভাষায় গালিগালাজ করে, ভাই অজিত পড়াশুনায় ভাল ছাত্র আজ সে পয়সা চুরি করে, দাদা জুয়া খেলে মদ খায়, বোনের অসুখের জন্য ঔষধ জোগাড় করতে পারে না। শকুন্তলা প্রচুর টিউশন করে পরিবারটকে বাঁচানোর আপ্রাণ চেষ্টা করে। সমকালীন সমাজ বাস্তবতার আর একটি উদাহরণ মেলে 'শুভক্ষণ' গল্পে। নদীপথে বিয়ে করতে গিয়ে রাত্রিবেলা ভুলপথে পথে চলে যাওয়ায় বর সময় মতো কনের বাড়িতে পৌঁছাতে না পারায়, পাড়া গাঁয়ের সমাজ, কন্যা লগ্নভ্রষ্ট হলে জাত যাবে এইভেবে গ্রামের এক নিষ্কর্মা ছেলের সঙ্গে মেয়েটির বিয়ে দেওয়া হয়। এর মধ্যে ঘটে গেছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এবং বীভৎস দাঙ্গার মধ্যদিয়ে দেশভাগ। পূর্ব পাকিস্থান থেকে উদ্বাস্তু জনস্রোত কলকাতা শহরে। নববিবাহিতা মেয়েটিও আশ্রয় নেয় উদ্বাস্তু কলোনীতে। থাকার জায়গা পেলেও খাবার জোটে না। একদিন তার স্বামী কালীঘাট যাবার নাম করে তাকে একটা তাবড় গাড়িতে তুলে দেয়। আজ তার চোখের কোনে কাজল, ফোপানো চক্রে চুল বাধা, নখে আর ঠোঁটে রং মাখা।

সময়ের সেই ঘূর্ণস্রোতে গ্রাম্য সরল মেয়েটি পূর্ব কলকাতার এক হোটেলের পাপ ব্যবসার সঙ্গে নিজের ভাগ্যকে জড়িয়ে নিতে বাধ্য হয়েছে তাই তার সাজপোষাকে এসেছে চাকচিক্য। এই গল্পটি সমকালকে স্পর্শ করেছে নির্মমভাবে এবং লেখক মানুষের মূল্যবোধের অবক্ষয়ের চিত্র তুলে ধরেছেন নিপুণ দক্ষতায়।

কথাশেষ : নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর সমকালীন সমাজবাস্তবতাকে তাঁর বিভিন্ন গল্পের মধ্যে এভাবেই ধরতে চেয়েছেন। তাঁর আরও বিভিন্ন গল্পের মধ্যে সময় চিত্রন নানান ভাবে ছড়িয়ে আছে তার পরিচয় হয়তো পাওয়া যেতে পারে। তবে চল্লিশের দশক, বিশেষ করে যুদ্ধ, মন্বন্তর ও দেশভাগের মতো ঘটনা তাঁর শিল্পী মনকে সব থেকে বেশি উদ্বেলিত করেছিল তা আমরা তাঁর গল্পগুলি পাঠ করে বুঝতে পারি। মানবদরদী লেখক তাঁর ক্ষোভ, ঘৃণা, ব্যঙ্গকে বিভিন্ন গল্পে প্রকাশ করেছেন। তবে যুগের সঙ্কট আর অবক্ষয়কে বর্ণনা করতে গিয়েও তিনি আশা হারিয়ে ফেলেননি 'দুঃশাসন' গল্পের শেষে দেখি-'ভাঙা আলের ওপর দিয়ে একদল কাজ করতে চলেছে-তাদের ধারালো হেঁসোগুলোতে সুর্যের আলো ঝিকিয়ে উঠছে। অকারণে –অত্যন্ত অকারণে–বড় বেশী ভয় করতে লাগল গৌরদাসের। অমন ঝকঝকে করে কেন হেঁসোতে শান দেয় ওরা' ? যুগের সঙ্কট, তার অন্ধকারের ঘনতমসা একদিন কেটে যাবে, লেখক সেই বাণীকেই ঘোষণা করেছেন তাঁর গল্পের ছত্রে ছত্রে।

গ্রন্থ ঋণ :

১. নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ গল্প –জগদীশ ভট্টাচার্য সম্পাদিত
২. আমার কালের কয়েকজন কথাশিল্পী'–জগদীশ ভট্টাচার্য।
৩. নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'ছোটগল্প: বিষয় ও রূপের মূল্যায়ন-ড. মৃনাল কান্তি ঘোষ ।
৪. বাংলা ছোটগল্প তত্ত্ব ও গতি-প্রকৃতি –সোহারাব হোসেন
৫. বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস– দেবেশ কুমার আচার্য
৬. কালের পুত্তলিকা-অরুণ কুমার মুখোপাধ্যায়

তথ্য সুত্র:

১. নবান্ন-বিজন ভট্টাচার্য- দ্বিতীয় অঙ্কের, তৃতীয় দৃশ্য
২. দুঃশাসনীয়- মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

আহমদ ছফার *ওঙ্কার* : জাগৃতির আদিস্বর

মাখন চন্দ্র রায়
সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ,
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ

সার-সংক্ষেপ: আধুনিক বাংলা কথাসাহিত্যের অঙ্গনে আহমদ ছফা (১৯৪৩-২০০১) একজন অনন্য শিল্পস্রষ্টা। বাঙালি জাতিসত্তার অন্যতম পরিচয় নির্ধারক হিসেবে তিনি আজীবন সাহিত্য সাধনা করে গেছেন। বঞ্চিত-অবজ্ঞাত মানুষের জীবনচিত্র তাঁর রচনায় উঠে এসেছে নানা মাত্রিকতায়। স্বীয় জীবনের বহুমাত্রিক অভিজ্ঞতার কাছে দায়বদ্ধ থেকে আহমদ ছফা সময়, সমাজ ও মানুষকে তাঁর সাহিত্যে তুলে ধরেছেন বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক বাস্তবতার প্রেক্ষাপটে। বাংলার ইতিহাস-ঐতিহ্য নিয়ে তৎপর বুদ্ধিজীবী আহমদ ছফার দ্বিতীয় উপন্যাস *ওঙ্কার* (১৯৭৫)। ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের পটভূমিতে রচিত এই উপন্যাসে একটি পরিবারকে কেন্দ্রে রেখে তৎকালীন পূর্ব বাংলার অস্থির রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থাকে উপস্থাপন করেছেন লেখক। *ওঙ্কারে* বাকশক্তিহীন বউয়ের 'বাঙলা' উচ্চারণের সমান্তরালে বাঙালি জাতিসত্তার জাগরণের অন্তর্সত্য বিধৃত হয়েছে। এই উপন্যাসে সন্নিবেশিত ঘটনাক্রমে তৎকালীন জাতীয় জাগরণের তাৎপযপূর্ণ পর্যায়সমূহ ইঙ্গিতময় হয়ে প্রকাশ লাভ করেছে।

মূল শব্দ: গণবুদ্ধিজীবী, ওঙ্কার, গণঅভ্যুত্থান, প্রতীকধর্মিতা, জাগৃতি।

আহমদ ছফা (১৯৪৩-২০০১) একজন প্রথিতযশা বাংলাদেশী কবি, ঔপন্যাসিক, চিন্তাবিদ ও গণবুদ্ধিজীবী। স্পষ্টবাদিতা ও স্বকীয় দৃষ্টিভঙ্গির জন্য লেখক ও বুদ্ধিজীবী মহলে তিনি বিশেষ আলোচিত ও বিতর্কিত ছিলেন। জীবদ্দশায় অনেকে তাঁকে বিদ্রোহী, বোহেমিয়ান, উদ্ধত, প্রচলিত ব্যবস্থার প্রতি শ্রদ্ধাহীন ও বিতর্কপ্রবণ বলে অভিহিত করেছেন। প্রথাবিরোধী লেখক আহমদ ছফা বাংলা সাহিত্য তথা বিশ্বসাহিত্যের একজন শ্রেষ্ঠ কথাকার। তাঁর লিখনশৈলীই তাঁর প্রথাবিরোধী, স্পষ্টবাদী ও স্বকীয় দৃষ্টিভঙ্গির জানান দেয়। হিন্দু পুরাণের আদি ধ্বনি 'ওঙ্কার'-এর মতো আহমদ ছফার *ওঙ্কার* (১৯৭৫) বাঙালির জাতীয় চেতনার জাগরণ আকাঙ্ক্ষাকে ব্যঞ্জিত করেছে। আহমদ ছফার *ওঙ্কার* একটি প্রতীকধর্মী উপন্যাস। স্মৃতিচারণের ভঙ্গিতে লেখা এই রচনাটিতে লেখক প্রতীকের ব্যঞ্জনায় সমাজ ও যুগ-বিবর্তনকে ভাষা দিয়েছেন। সমকালীন জীবনের পটভূমিতে রাজনৈতিক জাগরণের আলেখ্য ফুটে উঠেছে এই উপন্যাসে। ঊনসত্তরের স্বাধিকার আন্দোলন ও স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষাকে প্রতীকরূপ দিয়েছেন লেখক। একদিকে নায়কের পারিবারিক জীবনের কাহিনি অন্যদিকে দেশের রাজনৈতিক পরিবর্তন ও গণজাগরণের চিত্র এতে উদ্ভাসিত হয়েছে। চরিত্রগুলো হয়ে উঠেছে সময়ে বিচিত্রমুখী

মূল্যবোধের প্রতিনিধিস্থানীয় প্রতীক। *ওঙ্কার* উপন্যাসে দেশের রাজনৈতিক পরিবর্তন ও গণজাগরণের চিত্র শুধু আলেখ্য হিসেবেই আসেনি, এসেছে অপরিসীম প্রতীকী ব্যঞ্জনার তাৎপর্য নিয়ে।

ওঙ্কার প্রথাবিরোধী ঔপন্যাসিক আহমদ ছফার রাজনীতি-সচেতন প্রতীকধর্মী উপন্যাস। উনিশশো ঊনসত্তর সালে পূর্ব পাকিস্তানে সংঘটিত গণঅভ্যুত্থানকে কেন্দ্র করে এটি রচিত। এই উপন্যাসে একটি পারিবারিক আবহকে অবলম্বন করে বিভাগোত্তর পূর্ব বাংলার রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের চিত্র বিধৃত হয়েছে। 'পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর ক্রমাগত রাজনৈতিক ও আর্থ-সাংস্কৃতিক নিপীড়ন ও বঞ্চনায় বিপর্যস্ত পূর্ব বাংলার জনসাধারণ কীভাবে ঘুড়ে দাঁড়িয়েছিল সেই চিত্রকেই ধারণ করেছে এই উপন্যাসটি।'[১] উত্তমপুরুষে বর্ণিত এ উপন্যাসে কথকই কাহিনির নায়ক। তার পিতা উত্তরাধিকার সূত্রে একটি তালুকের সাড়ে তিন আনা অংশের মালিক হওয়ার গর্বে সামন্ত জীবনব্যবস্থা আকড়ে ধরে রেখেছিলেন। কিন্তু সময়ের বিবর্তনে, রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের সাথে সাথে কথকের পিতা আত্ম-অহমিকা বজায় রাখতে পারেনি। কথকের বর্ণনায় তার পিতার অবস্থা:

পুরনো মডেলের গাড়ি যেমন শহরের নতুন রাস্তার ঠিক মতো চলতে পারে না, ঝঞ্ঝাট লাগায়, দুর্ঘটনা বাধায়, ধোঁয়া ছড়ায়, তেমনি আমার বাবা আমার কলের পৃথিবীতে বসবাসের যোগ্যতা হারিয়ে ফেলেছেন। তিনি কেবল দুর্ঘটনার জন্ম দিয়ে যাচ্ছিলেন। সৃষ্টির বোঁটা ধরে নাড়া দিতে একটা লণ্ডভণ্ড কাণ্ড বাঁধাবার মত শক্তি কিংবা শিক্ষা কোনটিই তাঁর ছিল না। তিনি আঘাত করতে গিয়ে আহতই হচ্ছিলেন।[২]

১৯৫৪ সালে পূর্ব বাংলায় যুক্তফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় এসে জমিদারি প্রথা বিলুপ্ত করলে কথকের পিতার তালুকদারি উঠে যায়। তার এককালের মামলা মোকাদ্দমার পরামর্শদাতা আবু নসর মোক্তার হাইকোর্টের মামলায় জয়ী হয়ে তাদের ভিটে-মাটি সব নিলাম করে নেয়। বিভাগ-উত্তরকালে পূর্ব পাকিস্তানে এক শ্রেণির মানুষ পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠীর সহায়তায় প্রচুর অর্থ-বিত্তের মালিক হয়েছিল, আবু নসর মোক্তার তাদেরই প্রতিনিধি। কথকের পরিবারের দুর্দশার সুযোগ নিয়ে আবু নসর মোক্তার কথকের সঙ্গে তার বোবা মেয়ের বিয়ে দিয়ে দেন। দেশ-বিভাগের মধ্য দিয়ে পূর্ব পাকিস্তানের রাজনীতিতে ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয়। পশ্চিম পাকিস্তানের সাম্রাজ্যবাদী নীতি ও শাসনব্যবস্থা পূর্ব বাংলার চিরাচরিত জীবনধারার উপর প্রবল প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব পাকিস্তানে আর্থ-সামাজিক-সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলেও ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয়। ১৯৫৮ সালে আইয়ুব খান তাঁর স্বৈরাচারী শাসন সারা পাকিস্তানের বুকে কায়েম করে পূর্ব বাংলাসহ পাকিস্তানের অন্যান্য অঞ্চলের জনগণের কণ্ঠকে রোধ করে, 'নোতুন উদ্যমে ও নোতুন সাজে সজ্জিত হয়ে শাসকশ্রেণি পূর্ব বাংলার জনগণের উপর জাতিগত নিপীড়ন, বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির ওপর আক্রমণ হয়ে দাঁড়ায় নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার।'[৩] সামরিক শাসক আইয়ুব খানের দমন

নিপীড়নে পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক সংকট ঘণীভূত হয়ে ওঠে। কথকের বর্ণনায় তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক পরিস্থিতি স্পষ্ট হয়ে ওঠে:

দেশে ত্বরিত গতিতে সময় পাল্টাচ্ছিল। পৃথিবীর গভীর গভীরতরো অসুখের খবর সংবাদপত্রের পাতায় কালো ফুলের মতো ফুটে থাকে। দেশে আইয়ুব খান সাহেব সৈন্য-সামন্ত নিয়ে গেড়ে বসেছেন। সংবাদপত্রের ব্যানারে খান সাহেবের এক জোড়া গোঁফ হুংকার দিয়ে জেগে থাকে। দেখতে না দেখতেই দেশের জীবন প্রবাহের মধ্যে খান সাহেবের অপ্রতিহত প্রভাব প্রবল সামুদ্রিক তিমির মত ছোটাছুটি করছিল।[৪]

ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য আইয়ুব খান পূর্ব পাকিস্তানের এক শ্রেণির সুবিধাবাদী মানুষকে অনুগত করে রেখেছিল। আইয়ুব খানের শাসনামলে এইসব 'মৌলিক গণতন্ত্রী'রা পূর্ব পাকিস্তানে অসহনীয় নির্যাতন-নিপীড়নের পাশাপাশি অর্থনীতিতেও গড়ে তোলে বঞ্চনার পাহাড়। উপন্যাসে কথকের শ্বশুড় আবু নসর মোক্তার এভাবেই বিপুল পরিমাণ প্রতিপত্তি গড়ে তুলেছিলেন। ক্ষমতার দাপটে তিনি সংখ্যালঘু নিরীহ ব্রাহ্মণ পরিবারকে সীমান্তের ওপারে 'ছুড়ে ফেলে' দেন। তার আনুকূল্যে তার শালা-সম্বন্ধীরাও ব্যবসা-বাণিজ্যে রীতিমতো 'লাল হয়ে' যায়।

ওঙ্কার উপন্যাসে ঔপন্যাসিক কথকের বোবা বউ চরিত্রের প্রতীকে ষাটের দশকে পূর্ব পাকিস্তানের অস্থিরতা, টানাপড়েন ও স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় বাঙালির রাজনৈতিক জাগরণের ঐতিহাসিক ঘটনাকে চিত্রিত করেছেন। 'পারিবারিক কাহিনী হলেও, এই রচনায় নিছক পারিবারিক জীবনের ছবি এবং ভাঙা-গড়ার রূপ, দাম্পত্য-জীবনের সুখ-দুঃখের অনুভূতি ফুটিয়ে তোলাই মূল লক্ষ্য নয়। প্রতীকের আশ্রয়ে বৃহত্তর ও গভীরতর ব্যঞ্জনা দিতে চেয়েছেন বলেই লেখক সামাজিক-রাজনৈতিক পটভূমি বিধৃত করেছেন অনেকটা পরোক্ষ রীতিতে।'[৫] পাকিস্তান রাষ্ট্র সৃষ্টির পর থেকেই পূর্ব পাকিস্তানে যে শোষণ-বঞ্চনা-নির্যাতন-লুণ্ঠনের শিকার হয়, তার প্রেক্ষিতেই নিপীড়িত জনগোষ্ঠী অনিবার্যভাবেই সংগ্রামে লিপ্ত হতে বাধ্য হয়। ষাটের দশকের শুরু থেকেই পূর্ব পাকিস্তানে আন্দোলন সংগ্রামের সূত্রপাত হয়। আইয়ুব খান ক্ষমতাসীন হয়েই বাঙালির সংস্কৃতির উপর তীব্র আঘাত হানতে থাকেন। বাংলা বর্ণমালার স্থলে রোমান হরফ, কাজী নজরুলের কবিতার শব্দ পরিবর্তন, রবীন্দ্রসঙ্গীতের প্রতি নিষেধাজ্ঞা প্রভৃতি কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে তিনি বাঙালি সংস্কৃতি ধ্বংস করে সবকিছুই পাকিস্তানিকরণ করতে চান। কিন্তু বাঙালি জাতি তাদের সংস্কৃতি ধ্বংসের প্রতিটি অপচেষ্টার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়। *ওঙ্কার* উপন্যাসের শেষাংশে ষাটের দশকের উত্তাল সময়ে কথকের বোনের গান শেখা, তাঁর বন্ধুর স্ত্রীর কণ্ঠে গান শুনে বোবা স্ত্রীর গান শেখার ইচ্ছা পোষণ করা মূলত বাঙালি সংস্কৃতির প্রতি ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ। আইয়ুব খানের সামরিক শাসনে নির্যাতিত-বঞ্চিত আর অবহেলিত হতে হতে পূর্ব বাংলার জনগণ প্রতিবাদী হয়ে ওঠে:

প্রথম প্রথম গোটা দেশ আঘাতের বেদনায় গুঙিয়ে উঠত। ক্ষত থেকে রক্ত বের হত। আওয়াজে যন্ত্রণা ফুটে উঠত। প্রায় এক যুগ ধরে লাথি খেয়ে ব্যথা-জর্জর অংশ ডাঁটো হয়ে উঠেছে। এখন প্রতিবাদ করার জন্য মুখিয়ে উঠছে। যন্ত্রণা, বেদনা এবং দুঃখের কারখানা থেকেই প্রতিরোধের শাসানো আওয়াজ ফেটে ফেটে পড়ছে। তার ধার যেমন তীক্ষ্ণ, ভারও তেমনি প্রচণ্ড।[৬]

উনিশশো ছেষট্টি সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছয় ছফা দাবি উত্থাপন করলে ব্যাপক গণজাগরণ সৃষ্টি হয়। এর ফলে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় তাঁকে গ্রেফতার করা হয়। জেল-জুলুমের প্রতিবাদে ও ছয় দফার সমর্থনে রাজপথ উত্তাল হয়ে ওঠে। জনতার মিছিলে গুলিবর্ষণ করে কয়েকজনকে হত্যা করা হলে স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে বাঙালি ফুঁসে ওঠে। গণজাগরণের উত্তাল জোয়ারে প্রতিবাদ প্রতিরোধে বাঙালির কণ্ঠে উচ্চারিত হয় অগ্নিঝরা শ্লোগান। মিছিলে মিছিলে শহর-বন্দর-গ্রাম-গ্রঞ্জ মুখরিত হয়ে ওঠে:

সারাদেশে শ্লোগানের ঢল নেমেছে। পথে ঘাটে মানুষ কেবল মানুষ। চন্দ্র-কোটালের জোয়ারের জলের মতো বইছে মানুষ। বাংলাদেশের রাস্তাগুলো নদী হয়ে গেছে। তাদের চোখে আগুন, বুকে জ্বালা, কণ্ঠে আওয়াজ, হাতে লাঠি। রৌদ্রোজ্জ্বল দুপুরে শ্লোগানের ধ্বনি বাংলাদেশের আকাশমণ্ডলের কোটি কোটি বর্শাফলার মত ঝিকিমিকি খেলা করে।[৭]

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলাকে কেন্দ্র করে তখন পূর্ব বাংলা উত্তাল হয়ে উঠেছিল। শ্লোগানে মিছিলে প্রকম্পিত হয়ে উঠেছিল রাজধানী ঢাকাসহ সমস্ত পূর্ব বাংলা। মাওলানা ভাসানীর জনসভা, লাট ভবন ঘেরাও, ৭ ডিসেম্বরের অভাবনীয় হরতাল প্রভৃতি কার্যক্রমের মাধ্যমে আন্দোলন সর্বগ্রাসী রূপ নিয়ে অগ্নিময় হয়ে ওঠে। ঊনসত্তরের ১৯ জানুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্ররা ১৪৪ ধারা অমান্য করে মিছিল বের করে। পুলিশের গুলিতে আসাদ নিহত হলে বাঙালির জাতীয়তাবাদী আন্দোলন তীব্র আকার ধারণ করে। উপন্যাসে কথকের বর্ণনায় আসাদ হত্যার ঘটনা ও তৎপরবর্তী ঢাকা শহরের উত্তপ্ত পরিস্থিতি, আন্দোলনের সহিংসতা ও সেনাবাহিনীর নৃশংসতার চিত্র উঠে এসেছে। প্রতিবাদী ছাত্রনেতা আসাদ পুলিশের গুলিতে নিহত হলে জনতার স্রোত উত্তাল হয়ে ওঠে। স্বৈরাচারী আইয়ুব খানের বিরুদ্ধে, তার শাসন-শোষণের বিরুদ্ধে বাঙালির লক্ষপ্রাণ ঐক্যের মন্ত্রে উজ্জীবিত হয়। স্বাধিকার ও মুক্তির লক্ষ্যে বাঙালির অপ্রতিরোধ্য আন্দোলন এগিয়ে চলে। আত্মজাগরণের প্রত্যয়ে সকল বন্ধন-শৃঙ্খল ছিন্ন করে তারা। আহমদ ছফা বাঙালি জাতিসত্তার এই স্ফূরণের চিত্রই অঙ্কন করেছেন।

ওঙ্কার একটি পারিবারিক কাহিনিনির্ভর উপন্যাস হলেও আহমদ ছফা এই গ্রন্থে আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক তাৎপর্যকেই ব্যঞ্জিত করেছেন। নিছক অতীতের বর্ণনা কিংবা সামাজিক-রাজনৈতিক জাগরণের বহিরাঙ্গিক চিত্রায়ণ লেখকের উদ্দেশ্য ছিল না। তাই ঐতিহাসিক, সামাজিক এবং রাজনৈতিক আলেখ্য ব্যাপকভাবে এই রচনায়

উপস্থাপিত হয়নি। প্রতীকী তাৎপর্যে অনেকটা সংহত ও দৃঢ়বদ্ধভাবে লেখক সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তন ও গণমানুষের মুক্তির আকাঙ্ক্ষাকেই রূপায়িত করেছেন। কাহিনি, চরিত্র ও বক্তব্যের রুপকধর্মী উপস্থাপনা ছাড়াও পরিবেশ সৃষ্টি, চরিত্র চিত্রণ ও ঘটনার আকর্ষণীয় ও সংহত বর্ণনায় কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন। সংলাপ ব্যবহার না করেও শুধু বর্ণনা ও বিশ্লেষণের মাধ্যমেই তিনি চরিত্রসমূহকে জীবন্ত করে তুলেছেন। উপন্যাসটির কাহিনি বর্ণনায়, চরিত্র চিত্রণে, আত্মকথনে, অনুভব-উপলব্ধি-প্রতিক্রিয়ায়-সর্বত্রই লেখকের সহানুভূতিশীল ও জীবননিষ্ঠা, মন ও মননের পরিচয় সঞ্জীবিত হয়ে ওঠে।

বাঙালির স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতীকী রূপ উঠে এসেছে *ওঙ্কারে*। মূলত ঊনসত্তরের গণ-আন্দোলনের সামগ্রিক চিত্র *ওঙ্কারে* সাহিত্য আকারে প্রকাশিত হয়েছে। ষাটের দশকের শিক্ষা আন্দোলন থেকে ছয় দফার পরিপ্রেক্ষিতে ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানে তথা স্বাধীনতার সংগ্রামের মানুষের গর্জন এই উপন্যাসে ধ্বনিত হয়েছে। রক্তের বহমান স্রোতধারার গর্জনমুখর হয়ে এগিয়ে চলেছে স্বপ্নবাজ বাঙালি সমাজ। উপন্যাসে না বলা গল্পের ভিড়ে লেখক শোনাতে চেয়েছেন নির্ভীক বাঙালির দুঃসাহসী পথচলার গল্প। স্মৃতিচারণের ভঙ্গিমায় সময় ও সমাজের বিবর্তন, রাজনৈতিক অবস্থা ও গণজাগরণের খসড়া ফুটে উঠেছে এতে। পারিবারিক গল্প, সংসারে ভাঙা-গড়া, অফিসের অশান্তি, রাজনৈতিক অস্থিরতা প্রভৃতির মিশেলে *ওঙ্কার* পাঠক হৃদয়ের গহীনে নাড়া দেয়া এক শিল্পসৃষ্টি।

ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের পটভূমিতে রচিত *ওঙ্কার* উপন্যাসে বাঙালির আত্মজাগরণের তীব্র আকাঙ্ক্ষা প্রতিফলিত হয়েছে বাকশক্তিশীল নারীর চেতনার আশ্রয়ে। পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী কর্তৃক পূর্ব পাকিস্তানের নিপীড়িত জনগোষ্ঠী শাসন-শোষণে-নিষ্পেষণে নির্বাক হয়ে গিয়েছিল। নায়কের বোবা স্ত্রীর কথা বলার আকুতি ব্যক্তিমানুষের বাকশক্তি ফিরে পাওয়ার প্রয়াস মাত্র নয়, এটি বরং সমগ্র জাতির আত্মপ্রকাশ ও মর্যাদা অর্জনের আকুতি ও রক্তাক্ত সংগ্রামেরই আলেখ্য। *ওঙ্কারে* বোবা বউয়ের 'বাঙলা' উচ্চারণের সমান্তরালে জাতিসত্তার জাগরণের অন্তর্সত্য বিধৃত হয়েছে। এই উপন্যাস বোবা মেয়ের সবাক হয়ে ওঠার ঘটনাক্রম তৎকালীন বাঙালি জাতিসত্তার জাগরণের তাৎপর্য ইঙ্গিতময় হয়ে প্রকাশ লাভ করেছে। ভারতীয় পুরাণ মতে ওঙ্কার হচ্ছে সকল মন্ত্রের আদ্যবীজ। 'ঔপন্যাসিক আহমদ ছফা এই পৌরাণিক বীজকথাকে শাসন-শোষণ-নিপীড়নে স্তব্ধবাক বাঙালির মিছিলে শ্লোগানে আত্মঘোষণায় জাগৃতির শিল্পসূত্র হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে।'[৮] আবু নসর মোক্তার সাহেবের বোবা মেয়ের ধ্বনিহীন জীবন যেন আইউবী স্বৈরশাসন কালীন সময়-স্বভাবের প্রতীক। ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান কালীন উত্তাল সামাজিক-রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহে বাঙালির দীর্ঘকালীন অসাড়তা দূরীভূত হয়। মিছিলে-শ্লোগানে-রাজনৈতিক জাতি কেবল সামরিক শাসনকেই

ক্ষমতাচ্যুত করে না, স্বাধিকার ও মুক্তির লক্ষ্যে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করে। বোবা একটি মেয়ে এই পরিবর্তনের সমান্তরালে অভূতপূর্ব রূপান্তর লাভ করে। আইউব খানের সমর্থক পিতার কন্যার মধ্যে তার স্বামী এই শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থা অতিক্রমণের প্রচেষ্টা প্রত্যক্ষ করে:

আমার স্ত্রী বাকশক্তিহীন দশাটিকে স্বাভাবিকভাবে মেনে নেয়নি। তার শরীরের প্রতিটি কণা, প্রতিটি অণু-পরমাণু এই বোবাত্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ বিক্ষোভে ফেটে পড়তে চায়। আমি নিজের চোখে তা দেখলাম। তারও মনের গভীরে ফুলের স্তবকের মতো কথা স্তরে স্তরে সাজানো রয়েছে। তার মনের ভেতর সুখ-দুঃখের আকারে যা ঘটছে এবং বাইরের পৃথিবীতে সুন্দর কুৎসিত যা বিরাজমান রয়েছে, প্রতি মুহূর্তেই পরিবর্তিত হচ্ছে- সব কিছুরই একটি নাম আছে। এই নামটিকেই সে প্রকাশ করতে চায়। কিন্তু পারে না। বাক-যন্ত্রটি খারাপ এবং অকেজো বলে।[৯]

বাকশক্তিহীন এই নারীর চাকরিজীবী সুবিধাবাদী স্বামী আইউব খানের মতাই মিছিলভীরু। মিছিলের আনাগোনা দেখলেই দরজা বন্ধ রাখা এবং কানে হাত চাপা দিয়া তার স্বভাবজাত। কালের উত্তাল স্রোতকে এড়িয়ে চলার এই আশ্চর্য কৌশল সে রপ্ত করেছে। কিন্তু তার বোবা স্ত্রী 'মিছিলের ঘ্রাণ' পেলেই দরজা জানালা হাট করে খুলে রাখে। মিছিল আসতে দেখলেই উন্মুখ হয়ে কান পেতে শোনার চেষ্টা করে, ওরা কি বলছে। সূর্যমুখী যেমন সূর্যের সামনে প্রতিটি পাপড়ি মেলে ধরে আলো হতে তাপ হতে প্রাণকণা শুষে নিয়ে ফুটে ওঠে। সেও তেমনি আবেগে মিছিলের সামনে একজোড়া উৎকর্ণ শ্রবণ বিছিয়ে রাখে।

ঢাকার রাজপথে পুলিশের গুলিতে আসাদ নিহত হবার পর রাজপথে আবার মেঘনা পদ্মার স্রোতের মতো মিছিল নামে। ঢাকা মিছিলের নগরীতে পরিণত হয়। মিছিল হয়ে ওঠে 'বাংলাদেশের আগ্নেয় আত্মার জ্বালামুখ'। নবজন্মের আকুতি ধ্বনিত হয় মানুষের বুকফাটা আর্তনাদে। প্রসববেদনায় কম্পমান জাতিসত্তার দ্রোহ, যন্ত্রণা ও সম্ভাবনার নির্যাস ধারণ করে একটি ধ্বনি উচ্চারণের প্রবল বাসনায় জীবনীশক্তির সবটুকুই প্রয়োগ করে বোবা মেয়েটি:

আচানক বোবা বৌ জানলা সমান লাফিয়ে 'বাঙলা' শব্দটি অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে উচ্চারণ করলো। তার মুখ দিয়ে গলগল রক্ত বেরিয়ে আসে। তারপর মেঝেয় সংজ্ঞা হারিয়ে পড়ে থাকে। ভেতরে কী একটা বোধহয় ছিড়ে গেছে। আমি মেঝের ছোপ-ছোপ টাটকা লাল রক্তের দিকে তাকাই, আচেতন বউটির দিকে তাকাই। মন ফুঁড়েই একটা প্রশ্ন জাগে- কোন রক্ত বেশি লাল। শহীদ আসাদের- না আমার বোবা বউয়ের?[১০]

ওঙ্কার উপন্যাসের শেষাংশে বোবা মেয়ের এই রক্তাক্ত আত্মঘোষণায় যে প্রতীকী ব্যঞ্জনা আভাসিত হয়, তা একটি জাতির আত্মত্যাগ, জাগরণ এবং রক্তাক্ত অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে স্বাধীন সত্তায় উত্তরণের ইঙ্গিতবহ।

সন্তানসম্ভবা নারীর কণ্ঠে রক্তাক্ত পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে 'বাঙলা' শব্দটি উচ্চারণের মাধ্যমে লেখক রক্তাক্ত আন্দোলনের মাধ্যমে স্বাধিকার ও স্বাধীনতা অর্জনের পথে বাঙালির অগ্রযাত্রার চিত্ররূপায়ণ করেছেন। তৎকালে বাঙালি জাতিকে এক ঐক্যে এক বিন্দুতে মিলিত করার ক্ষেত্রে 'জয় বাংলা' শব্দটি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়, স্বাধীনতা যুদ্ধ ও বাঙালি জাতিসত্তার পূর্ণ বিকাশে 'জয় বাংলা' শব্দের ভূমিকা অপরিসীম। *ওঙ্কার* উপন্যাসে আহমদ ছফা বাঙালির আত্মপরিচয় ও আত্ম-উন্মোচনের উদ্ভাসন ব্যঞ্জিত করতে নায়িকার কণ্ঠে 'জয় বাংলা' শব্দের খণ্ডিত রূপ 'বাঙলা' শব্দের উচ্চারণ বাঙালি জাতির জাগরণের আদি উচ্চারণ হিসেবে তাৎপর্যপূর্ণ। ব্যক্তি জীবনের বর্ণিল অভিজ্ঞতার জারিত দেশজ আবহের বাস্তবধর্মী উপস্থাপনায় *ওঙ্কার* আহমদ ছফার শক্তিমান শিল্পীসত্তার প্রাতিস্বিকতার সাক্ষ্য বহন করে।

তথ্যসূত্র :

১. পুরনজিত মহালদার, *আহমদ ছফার কথাসাহিত্য,* হাওলাদার প্রকাশনী, ঢাকা, ২০২০, পৃ. ৫৯
২. আহমদ ছফা, *ওঙ্কার,* স্টুডেন্ট ওয়েজ, ঢাকা, ২০১৪, পৃ. ১৫
৩. বদরুদ্দীন উমর, *যুদ্ধপূর্ব বাংলাদেশ,* মুক্তধারা, ঢাকা, ১৯৭৬, পৃ. ৩১৮
৪. আহমদ ছফা, *ওঙ্কার,* পূর্বোক্ত, পৃ. ২৩
৫. মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ, 'আহমদ ছফার উপন্যাস *ওঙ্কার* : ব্যঞ্জনামর প্রতীকে সেদিনের বাংলাদেশ', *আহমদ ছফা স্মারকগ্রন্থ,* (মোরশেদ শফিউল হাসান ও সোহরাব হাসান সম্পাদিত), মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০০৩, পৃ. ৩৪০
৬. আহমদ ছফা, *ওঙ্কার,* পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৩
৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩
৮. রফিকউল্লাহ খান, *বাংলাদেশের উপন্যাস : বিষয় ও শিল্পরূপ,* বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯৭, পৃ. ৩১৬
৯. আহমদ ছফা, *ওঙ্কার,* পূর্বোক্ত, পৃ. ৩০
১০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০

নিসর্গচেতনার মহাকাব্য : পথের পাঁচালী

সাগর দাস
সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
ভৈরব গাঙ্গুলী কলেজ

সারসংক্ষেপ : 'পথের পাঁচালী' বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি অনবদ্য প্রকৃতি চেতনার উপন্যাস। বলাবাহুল্য, এই উপন্যাসটি বিভূতিভূষণের প্রথম এবং শ্রেষ্ঠ উপন্যাস। এই উপন্যাসটির একটি প্রধান পরিচয় হল এটি প্রকৃতির মহাকাব্যরূপে পরিগণিত। এখানে রয়েছে অরণ্য প্রকৃতির অকৃত্রিম খুঁটিনাটি বিবরণ। সেই প্রকৃতি-প্রীতি, প্রকৃতি-সম্ভোগ এবং ঈশ্বর সন্ধান এক মোহময় জগৎ গড়ে তুলেছে, যা উপন্যাস পাঠককে বেগবান স্রোতধারার মতো পরিণতির দিকে টেনে নিয়ে গেছে। কাহিনীর শুরু থেকে 'আম আঁটির ভেঁপু' পর্যন্ত পুরোপুরি নিশ্চিন্দিপুরের প্রকৃতি ঘেরা অপুর জীবন ও প্রকৃতি-লীলার বিচিত্রতা বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু 'অক্রুর সংবাদ'-এ সেই প্রকৃতি জগতের অপার সৌন্দর্যে ছেদ পরেছে। অপুর জীবনে নেমে এসেছে বাস্তবের কষ্ট-লাঞ্ছনার ইতিহাস। কাশিতে পর-আশ্রিত জীবনের গন্ডীতে না গেলে অপুর উপলব্ধিতে নিষ্ঠুর জীবনের ভয়ঙ্কর রূপের অভিজ্ঞতা আসতো না। আর নিজ জন্মভূমির প্রকৃতির প্রতি তার আকর্ষণ এতো গভীরভাবে পাঠকের কাছে ধরা দিত না। তাই অপুর বড় হয়ে ওঠার জন্য এবং নিসর্গের সক্রিয় তাৎপর্যময় ভূমিকা বোঝানোর জন্য 'পথের পাঁচালী'র কাহিনীগত সংযুক্তিতে তিনটি অংশের প্রয়োজন খুবই তাৎপর্যপূর্ণ ছিল। প্রকৃতি এখানে সক্রিয় ভূমিকা নিয়ে প্রতি মুহূর্তে, প্রতি ঘটনার সঙ্গে আবর্তিত হয়েছে।

সূচক শব্দ : নিসর্গচেতনা, প্রকৃতির চালচিত্র, কল্পনাপ্রবণ মন, ঈশ্বর-সন্ধান, লাঞ্ছনার ইতিহাস।

মূল আলোচনা :

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রথম এবং শ্রেষ্ঠ উপন্যাস 'পথের পাঁচালী'। যদিও তিনি 'উপেক্ষিতা'[১] গল্প রচনার মধ্য দিয়ে 'প্রবাসী'তে আত্মপ্রকাশ করেন, তবু ঔপন্যাসিকের প্রতিভা তাঁকে সাহিত্যের জগতে চির প্রতিষ্ঠা দিয়েছে। নানা বাধা পার হয়ে 'পথের পাঁচালী' ১৯২৯ সালের ২রা অক্টোবর বুধবার মহালয়ের দিন রঞ্জন প্রকাশনী থেকে গ্রন্থাকারে বার হয়। এর আগেই 'পথের পাঁচালী' উপন্যাসটি 'বিচিত্রা' পত্রিকার দ্বিতীয় বর্ষের প্রথম সংখ্যাতে ধারাবাহিকভাবে বেরিয়েছিল। এই উপন্যাসটির একটি প্রধান পরিচয় হল প্রকৃতির মহাকাব্যরূপে। এখানে রয়েছে অরণ্য প্রকৃতির অকৃত্রিম খুঁটিনাটি বিবরণ। সেই প্রকৃতি-প্রীতি প্রকৃতি-সম্ভোগ এবং ঈশ্বর সন্ধান এক মোহময় জগৎ; যা উপন্যাস পাঠককে বেগবান স্রোতধারার মতো পরিণতির দিকে টেনে নিয়ে গেছে। 'পরিচয়' পত্রিকায় বিভূতিভূষণ স্বয়ং বলেছিলেন-

> "আমি কোন বড় ঘটনায় বিশ্বাসবান নই। দৈনন্দিন ছোটখাটো সুখ-দুঃখের মধ্য দিয়ে জীবনধারা ক্ষুদ্র গ্রাম্য নদীর মতো মন্থর বেগে অথচ পরিপূর্ণ বিশ্বাসের ও আনন্দের সঙ্গে চলেছে- আসল জিনিসটা সেখানে। কোন কৃত্রিম প্লট সাজানো, প্যাঁচকষা, কৃত্রিম সিচুয়েশন তৈরী করা - আমি জানি না। নভেল কেন কৃত্রিম হবে? প্রতিদিনের অমূল্য দানকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে কৃত্রিমতার মালা গাঁথা ও তারই বেসাতি শুধু টেকনিকের বেসাতি হয়ে দাঁড়ায়। কোনো সুস্থ, সতর্ক ও অনলস মনের বিভিন্নমুখী কৌতুহল তাতে চরিতার্থ হয় না।"[২]

প্রসঙ্গত শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্তব্যটি এখানে স্মরণীয়। 'পথের পাঁচালী'র অভিনবত্ব বিচার ও বিশ্লেষণ করতে গিয়ে তিনি বলেছিলেন -

> "ইহার মৌলিকতা ও সরস নবীনতা বঙ্গ উপন্যাসের গতানুগতিশীলতার মধ্যে একটি পরম বিস্ময়াবহ আবির্ভাব। অপুর ন্যায় জীবন্ত ও পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে চিত্রিত চরিত্র বাংলা উপন্যাস-সাহিত্যে আর দ্বিতীয় নাই। শিশুমনের রহস্যময়তা সম্বন্ধে কাব্যে ও দর্শনে যে সাধারণ উক্তি আমরা শুনিতে অভ্যস্ত, এই উপন্যাস তাহা পুঞ্জীভূত উদাহরণ ও বিচিত্র প্রমাণের সাহায্যে সম্পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ব্যাপকতা ও গভীর অন্তর্দৃষ্টির দিক দিয়া এই শৈশব-রহস্যের ইতিহাস ওয়ার্ডওয়ার্থের Prelude-এর সহিত তুলনীয়- অপুর আধ্যাত্মদৃষ্টির কয়েকটি দৃষ্টান্ত অনিবার্যভাবে Prelude-এ কবির তুল্যরূপ অভিজ্ঞতার কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। শিশুর মনে যে সোনার কাঠি পরিচিত জগতের তুচ্ছতার মধ্যে এক অলৌকিক মায়ারাজ্য সৃজন করে, বিভূতিভূষণ সেই রূপকথার রাজ্যের রহস্যটি আমাদের আদর্শলোকচ্যুত বয়স্ক অভিজ্ঞতার সম্মুখে বিশ্লেষণ করিয়া তাহার ইন্দ্রজালশক্তি সর্বসাধারণের গোচরীভূত করিয়াছেন। বিশ্লেষণের মধ্যেও যে ইহার অপরূপ মায়াডোর ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয় নাই ইহাই লেখকের চরম কৃতিত্ব।"[৩]

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে রবীন্দ্রনাথ বিভূতিভূষণের 'পথের পাঁচালী' উপন্যাসের প্রশংসা করতে গিয়ে একটি পত্রে লিখেছেন যে 'পথের পাঁচালী'র আখ্যানটা অত্যন্ত দেশী। কিন্তু কাছের জিনিসের অনেক পরিচয় বাকি থাকে। যেখানে আজন্মকাল আছি সেখানেও সব জায়গায় প্রবেশ ঘটে না। 'পথের পাঁচালী' যে বাংলার পাড়াগাঁয়ের কথা, সেও অজানা রাস্তায় নতুন করে দেখতে হয়। লেখার গুণ এই যে, নতুন জিনিস ঝাপসা হয় নি, মনে হয় খুব খাঁটি, উঁচুদরের কথায় মন ভোলাবার জন্যে সস্তাদরের রাঙতার সাজ পরাবার চেষ্টা নেই। বইখানা দাঁড়িয়ে আছে আপন সত্যের জোরে। এই বইখানিতে পেয়েছি যথার্থ গল্পের স্বাদ। এর থেকে শিক্ষা হয়নি কিছুই, দেখা হয়েছে অনেক যা পূর্বে এমন

করে দেখিনি। এই গল্পে গাছপালা পথঘাট মেয়ে-পুরুষ, সুখ-দুঃখ সমস্তকে আমাদের আধুনিক অভিজ্ঞতার প্রাত্যহিক পরিবেষ্টনের থেকে দূরে প্রক্ষিপ্ত করে দেখানো হয়েছে; সাহিত্যে একটা নতুন জিনিস পাওয়া গেল অথচ পুরাতন পরিচিত জিনিসের মতো সে সুস্পষ্ট। রবীন্দ্রনাথের একথা চিরন্তন সত্য। সমালোচক গোপিকানাথ রায়চৌধুরী রবীন্দ্রনাথের এই কথার সমর্থনে বলেছেন-

> "বিভূতিভূষণ কেবল প্রকৃতির রূপ-সন্ধানী এক স্বপ্নদর্শী রোমান্টিক কবিসত্তা নন। প্রকৃতির প্রাণসত্তা অন্বেষণ কিম্বা তার মহিমা মাধুর্য আবিষ্কার করাই তার জীবনের মূল লক্ষ্য নয়। প্রকৃতি তার চোখে এই বৃহৎ বিশ্ব সৃষ্টির একটি খণ্ড অংশ মাত্র। প্রকৃতির মধ্যে দিয়ে জীবনসাধক বিভূতিভূষণ সেই আশ্চর্য সৃষ্টি মহিমাকেই উপলব্ধি করতে চেয়েছেন। প্রকৃতিকে আশ্রয় করে তিনি জীবন-পলাতকের মতো স্বপ্ন-কল্পনার অবাস্তব নীড় রচনা করতে চাননি। প্রকৃতির অন্তর্লোকে অবগাহন করে তিনি জীবন ও জগতের মহান সত্যকে অনুভব করতে চেয়েছেন।"৪

উক্ত সকল মন্তব্যে একথা প্রমাণিত যে 'পথের পাঁচালী' উপন্যাসটি তৎকালীন প্রচলিত ধারা থেকে একেবারে স্বতন্ত্র। প্রকৃতি এখানে প্রধান চরিত্র রূপে কল্পিত। অপুর কল্পনা যেন সেই প্রকতি ভাবনারই বিস্তার। বাস্তবের মাটি ছুঁয়ে সকল চরিত্রগুলি এখানে আবর্তিত। উপন্যাসের প্রতিটি চরিত্র, কাহিনী নিসর্গের সঙ্গে সম্পৃক্ত এবং সুসঙ্গতভাবে বিন্যস্ত।

কাহিনীগত নিসর্গের আধিপত্য ; 'পথের পাঁচালী'

'পথের পাঁচালী' যখন প্রথম প্রকাশ হয়, তখন মূল কাহিনীর চারটি উপ-শিরোনাম ছিল - 'বল্লালী বালাই' (১-৬), 'আম আঁটির ভেপু' (৭-১৬), 'উড়ো পায়রা' (১৭-২৮) এবং 'অক্রুর সংবাদ' (২৯-৩৪)। কিন্তু দ্বিতীয় সংস্করণের (১৯৩২) কাল থেকে 'উড়ো পায়রা' উপ-শিরোনামটি পরিত্যক্ত হয়ে 'আম আঁটির ভেপু'র সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায়। তখন থেকেই 'পথের পাঁচালী'র তিন উপ-শিরোনামই গৃহীত হয়েছে। উপন্যাসের মূল কাহিনী অপুর বড় হয়ে ওঠা হলেও প্রকৃতির লীলা-পটভূমি কাহিনীর মূল আকর্ষণ হয়ে আছে। 'বল্লালী বালাই' অংশের কাহিনীতে নিশ্চিন্দপুরের মাটিতে অপুর জন্মকথা, প্রাচীন সামাজিক ইতিহাস, রামচাঁদ-ইন্দির ঠাকুরুণ, হরিহর-দুর্গা-অপুর এবং কাজলের আগমন কাহিনীর বিস্তার ঘটেছে। সেই সঙ্গে বারংবার উঠে এসেছে প্রকৃতির নানা চালচিত্র।

কাহিনীর দ্বিতীয় অংশে 'আম আঁটির ভেপু'তে অপুর এবং দুর্গার প্রসঙ্গ বড় হয়ে দেখা দিয়েছে। এখানে অপু কৌতুহলী দুটি চোখ নিয়ে নানা প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছে। বাবার সঙ্গে পথ চলতে চলতে নানা বিষয়ে অসংখ্য প্রশ্ন করেছে, দিদি দুর্গার সঙ্গে কালবৈশাখীর ঝড়-বৃষ্টিতে আম কুড়িয়ে বেড়িয়েছে; বিদ্যুৎ চমকালে দু'জনেই ভয় পেয়েছে এবং বৃষ্টি থামার মন্ত্রপাঠ করেছে। প্রকৃতির সহজ সরল রূপ অপুর কল্পনার

জগতকে প্লাবিত করেছে। দিদির সঙ্গে চড়ুইভাতির আনন্দ অপু অনুভব করেছে এইভাবে-

> "যে জীবন কত শত পুলকের ভাণ্ডার, কত আনন্দ- মুহর্তের আলো-জ্যোৎস্নার অবদানে মণ্ডিত, ইহাদের সে মাধুরীময় জীবনযাত্রার সবে তো আরম্ভ। অনন্ত যে জীবনপথ দূর হইতে বহুদূরে দৃষ্টির কোন ওপারে বিসর্পিত, সে পথের ইহারা নিতান্ত ক্ষুদ্র পথিকদল, পথের বাঁকে ফুলে ফলে দুঃখ সুখে, ইহাদের অভ্যর্থনা একেবারে নূতন।"[৫]

নিশ্চিন্দিপুরের লোকজীবন ও প্রকৃতির খুঁটিনাটি তুচ্ছ বিবরণের মধ্যে অপু অসীম আনন্দ এবং কল্পনার উপাদান খুঁজে পেয়েছে।

'অক্রুর সংবাদ' অংশ মূলত অপুর জীবনের বেদনার অধ্যায় রূপে লিখিত। এক সময় নিশ্চিন্দপুর ছেড়ে যখন অপু পিতা হরিহর ও মাতা সর্বজয়ার সঙ্গে যাত্রা শুরু করে, তখন গ্রামের খোলা আকাশ, নদী, জন্মলগ্নের মাটি এবং হারিয়ে ফেলা দিদিকে বারংবার মনে পড়ে। অপু বেদনার সঙ্গে আপনা-আপনি বলতে থাকে- 'আমি চাইনি দিদি, আমি তোকে ভুলিনি, ইচ্ছে করে ফেলেও আসিনি-ওরা আমায় নিয়ে যাচ্ছে।'[৬] অপুর এই সবকিছু ত্যাগ করে চলে যাওয়ার সঙ্গে কৃষ্ণের বৃন্দাবন ত্যাগ করে মথুরা যাত্রার সঙ্গে তুলনা করা চলে। এ যেন একই সঙ্গে একদিকে চোখের জলে ত্যাগ, অন্যদিকে নব জগতে পদার্পণ। এরপর কাশীতে অপুর পিতৃবিয়োগ ঘটে, তখন বিধবা সর্বজয়া অপুকে নিয়ে অতি কষ্টে দিনযাপন করে পরের অনুগ্রহে। এই সময় অপুর অভিজ্ঞতায় কল্পনার পাশাপাশি যুক্ত হয় রুক্ষ বাস্তবতা। কাশিতে বসবাসকালেও নিশ্চিন্দপুরের প্রকৃতি অপুকে বার বার আকর্ষণ করেছে -

> "ওই আস্তাবলের মাথায় যে আকাশটা ওরই ওপারে পূর্বদিকে বহুদূরে তাহাদের নিশ্চিন্দিপুর।... সে জানে, নিশ্চিন্দিপুর তাহাকে দিনে-রাতে সব সময় ডাকে, শাঁখারীপুকুর ডাক দেয়, বাঁশবনটা ডাক দেয়, সোনাডাঙার মাঠ ডাক দেয়, কদমতলার সায়েবের ঘাট ডাক দেয়, দেবী বিশালাক্ষী ডাক দেন।"[৭]

তার মনে পড়ে- "এতদিনে তাহাদের সেখানে ইছামতীতে বর্ষার ঢল নামিয়াছে। ঘাটের পথে শিমূল তলায় জল উঠিয়াছে। ঝোপে ঝোপে নাটা-কাঁটা, বনকলমীর ফুল ধরিয়াছে। বন অপরাজিতার নীল ফুলে বনের মাথা ছাওয়া। তাহাদের গ্রামের ঘাটটাতে কুঁচ-ঝোপের পাশে রাজুকাকা হয়তো এতক্ষণে তাহার অভ্যাসমতো অবেলায় স্নান করিতে নামিয়াছে, চালতেপোতার বাঁকে নতুন কষার বনের ধারে ধারে অক্রুর মাঝি মাছ ধরিবার দোয়াড়ী পাতিয়াছে, আজ সেখানকার হাট-বার, ঠাকুরঝি-পুকুরের সেই বটগাছটার পিছনে দিগন্তের কোনো রাঙা আগুনের ফেনার মত সূর্য অস্ত যাইতেছে, আর

তাহারই তলাকার মেঠোপথ বাহিয়া গ্রামের ছেলে পটু, নীলু, তিনু, ভোলা সব হাট করিয়া ফিরিতেছে।"[৮]

মাথুর বিরহে অপু প্রবাসে থেকেও মনে-প্রাণে নিশ্চিন্দিপুরে ফিরে আসার জন্য ভগবানের কাছে প্রার্থনা জানিয়েছে অনুরোধের সঙ্গে-

> "নির্জন ঘরের জানালাটাতে একা-একা দাঁড়াইয়া হঠাৎ সে কাঁদিয়া আকুল হইল, উচ্ছ্বসিত চোখের জল ঝর ঝর করিয়া পড়িয়া তাহার সুন্দর কপোল ভাসাইয়া দিতেই চোখ মুছিতে হাত উঠাইয়া আকুল সুরে মনে মনে বলিল- আমাদের যেন নিশ্চিন্দিপুর ফেরা হয়-ভগবান তুমি এই কোরো, ঠিক যেন নিশ্চিন্দিপুর যাওয়া হয়- নইলে বাঁচবো না- পায়ে পড়ি তোমার-।"[৯]

নিশ্চিন্দিপুরের নিসর্গ অপুকে বারংবার হাতছানি দিয়েছে। কাহিনীর শুরু 'আম আঁটির ভেঁপু' পর্যন্ত পুরোপুরি নিশ্চিন্দিপুরের প্রকৃতি ঘেরা অপুর জীবন ও প্রকৃতির লীলার বিচিত্রতা বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু 'অক্রর সংবাদ'-এ সেই প্রকৃতি জগতের অপার সৌন্দর্যের ছেদ পড়েছে। অপুর জীবনে নেমে এসেছে বাস্তবের কষ্ট-লাঞ্ছনার ইতিহাস। আমাদের মনে হয় কাহিনীতে এর প্রয়োজন অনিবার্য ছিল। কারণ, প্রথমত, অপুর বড় হয়ে ওঠা, দ্বিতীয়ত, পল্লী-প্রকৃতির সহজ সরল রূপ এবং আনন্দ মাধুর্যের হাতছানি যে কতটা নিবিড় ছিল, সেটা বোঝানোর জন্য। কাশিতে পর-আশ্রিত জীবনের গন্ডীতে না গেলে অপুর উপলব্ধিতে নিষ্ঠুর জীবনের ভয়ঙ্কর রূপের অভিজ্ঞতা আসতো না। আর নিজ জন্মগ্রামের প্রকৃতির প্রতি তার আকর্ষণ এতো গভীরভাবে পাঠকের কাছে ধরা দিত না। তাই অপুর বড় হয়ে ওঠার জন্য এবং নিসর্গের সক্রিয় তাৎপর্যময় ভূমিকা বোঝানোর জন্য 'পথের পাঁচালী'র কাহিনীগত সংযুক্তিতে তিনটি অংশের প্রয়োজন খুবই তাৎপর্যপূর্ণ ছিল।

অপু চরিত্র : নিসর্গের আর এক বাস্তব রূপ

অপু 'পথের পাঁচালী'র প্রধান চরিত্র। তার মানসিকতার বিকাশ সাধনে প্রকৃতি মুখ্য ভূমিকা পালন করেছে। উপন্যাসের প্রাকৃতিক পরিবেশ গঠিত হয়েছে তার মানস বিকাশের পর্ব-পর্বান্তরে। একদিকে শিশু অপুর চিত্ত বিকাশ হয়েছে দিদি দুর্গার হাত ধরে এবং অন্যদিকে পিতার সঙ্গে শিষ্যবাড়ি ভ্রমণের অভিজ্ঞতা থেকে। তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অপুর স্বভাবজাত কল্পনাপ্রবণ মনোভাব এবং অনুসন্ধিৎসু মন। উপন্যাসের ষোড়শ অধ্যায়ে এ কথার প্রমাণ মেলে-

> "... বাঁশঝাড়ের উপরকার ছায়াভরা আকাশটার দিকে চাহিয়া সে দেখিতে পায়, এক তরুন বীরের উদারতার সুযোগ পাইয়া কে প্রার্থী একজন তাহার কবচ-কুণ্ডল মাগিয়া লইতে হাত পাতিয়াছে,... ঐ যে পোড়ো ভিটার বেল তলাটা- ওইখানেইতো শরশয্যাশায়িত প্রবীণ বীর ভীষ্মদেবের মরণাহত ওষ্ঠে তীক্ষ্ণবাণে পৃথিবী ফুঁড়িয়া অর্জুন

> ভোগবতীধারা সিঞ্চন করিয়াছিলেন। প্রথম যৌবনে সরযূতটের কুসুমিত কাননে মৃগয়া করিতে গিয়া দশরথ মৃগভ্রমে যে জল- আহরণরত দরিদ্র বালককে বধ করেন- সে ঘটিয়াছিল ওই রাণুদিদিদের বাগানের বড় জাম গাছটার তলায় যে ডোবা-তাহারই ধারে।"[১০]

তার এই কল্পনায় মহাকাব্যের রথী-মহারথীরা উপস্থিত হয়েছে; অতীত বাস্তবের এক মহামিলন রচিত হয়েছে। অপুর বয়স যখন বেড়েছে, তখনও তার জীবন অভিজ্ঞতার সঙ্গে কাব্যপ্রীতি ও নিসর্গপ্রীতি সমান্তরাল ভাবে চলেছে। প্রসন্নগুরু মহাশয়ের কাছে শোনা কথা তার মনে পড়েছে-

> - "এই সেই জনস্থান-মধ্যবর্তী প্রস্রবণ গিরি। ইহার শিখরদেশ আকাশপথে সতত - সমীর- সঞ্চরমাণ- জলধর- পটল সংযোগে নিরন্তর নিবিড় নীলিমায় অলঙ্কৃত।"[১১]

এই রকম সংস্কৃত তৎসম শব্দের বহুলতার মধ্যে প্রকৃতির ভাবচিত্রে কাব্যজগতকে যেমন প্লাবিত করেছে, তেমনি প্রকৃতিজগৎ অপুর হৃদয়কে আলোড়িত করেছে। কঠিন-কঠোর সংসারের মধ্যে থেকেও অপুর হৃদয় এবং কল্পনার জগৎ কখনই আঘাতপ্রাপ্ত হয়নি। সে প্রকৃতিমাতার আপন সন্তান রূপে তার কোলে চিরবিরাজমান থেকেছে।

উপন্যাসের পটভূমি সৃজনে প্রকৃতি

উপন্যাসের কাহিনীধারার মধ্যে প্রকৃতি সজীব সত্তা নিয়ে উপস্থিত হয়েছে। উপ্যাসের প্রতিটি চরিত্রের ভাবনা নিসর্গের দ্বারা প্রত্যক্ষ-পরোক্ষভাবে প্লাবিত এবং নিয়ন্ত্রিত। তবে বলাবাহুল্য এই প্রকৃতি অপুর সঙ্গে, তার ভাবনার সঙ্গে চাঞ্চল্যে এবং সারল্যে সবচেয়ে বেশি পরিমানে বিস্তৃত। অপু-কেন্দ্রিক সেই নিসর্গের কয়েকটি পরিচয় এখানে উল্লেখ করা যাক -

ক. "তাহাদের বাড়ীর ধার হইতে এ বনজঙ্গল একদিকে সেই কুঠির মাঠ, অপর দিকে নদীর ধার পর্যন্ত একটানা চলিয়াছে। অপুর কাছে এ বন অফুরন্ত ঠেকে, সে দিদির সঙ্গে কতদূর এ বনের মধ্যে তো বেড়াইয়াছে, বনের শেষ দেখিতে পায় নাই- শুধু এইরকম তিত্তিরাজ গাছের তলা দিয়া পথ, মোটা মোটা গুলঞ্চলতা-দুলানো থোলো থোলো বনচালতার ফল চারিধারে। শুঁড়ি পথটা একটা আমবাগানে আসিয়া শেষ হয়, আবার এগাছের ওগাছের তলা দিয়া বন-কলমী, নাটা-কাঁটা, ময়না- ঝোপের ভিতর দিয়া চলিতে চলিতে কোথায় কোন দিকে লইয়া গিয়া ফেলিতেছে, শুধুই বন- ধুঁধুঁলের লতা কোথায় সেই ত্রিশূন্যে দোলে, প্রাচীন শিরীষ গাছের শেওলা-ধরা ডালের গায়ে পরগাছার ঝাড় নজরে আনে!"[১২]

খ. "অপূর্ব্ব, অদ্ভুত বৈকালটা ... নিবিড় ছায়াভরা গাছপালার ধারে খেলাঘর... গুলঞ্চলতার তার টাঙানো খেজুর ডালের ঝাঁপ ..বনের দিক থেকে ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা গন্ধ বাহির হয়... রাঙা রোদটুকু জেঠামশয়দের পোড়ো ভিঠায় বাতাবীলেবু গাছের মাথায় চিক চিক

করে...চকচকে বাদামী রঙের ডানাওয়ালা তেড়ো পাখী বনকলমী ঝোপে উড়িয়া আসিয়া বসে... তাজা মাটির গন্ধ... ছেলেমানুষের জগৎ ভরপুর আনন্দে উছলিয়া ওঠে, কাহাকে সে কি করিয়া বুঝাইবে সে কি আনন্দ !”[১৩]

গ. “প্রতিদিন এই সময়- ঠিক এই ছায়া-ভরা বৈকালটিতে নির্জন বনের দিকে চাহিয়া তাহার অতি অদ্ভুত কথা সব মনে হয়। অপূর্ব খুশিতে মন ভরিয়া ওঠে, মনে হয় এ রকম লতাপাতার মধুর গন্ধভরা দিনগুলি ইহার আগে কবে একবার যেন আসিয়াছিল, সে সব দিনের অনুভূত আনন্দের অস্পষ্ট স্মৃতি আসিয়া এই দিনগুলিকে ভবিষ্যতের কোন অনির্দিষ্ট আনন্দের আশায় ভরিয়া তোলে। মনে হয় একটা যেন কিছু ঘটিবে, এ দিনগুলি বুঝি বৃথা যাইবে না- একটা বড় কোনো আনন্দ ইহাদের শেষে অপেক্ষা করিয়া আছে যেন !”[১৪]

ঔপন্যাসিক বিভূতিভূষণ এই ভাবেই স্নেহমিশ্রিত কোমল এবং রুক্ষ-কঠোর প্রকৃতিরূপের পরিচয় তুলে ধরেছেন ‘পথের পাঁচালী’ উপন্যাসে। বিশেষ করে অপুর গৃহসংলগ্ন তুচ্ছ গাছ-গাছালি পরিচয় যেন প্রকৃতির মানবিক দৃষ্টিকোনের পরিচয় বহন করেছে-

> “জানালায় বসিয়া শুধু চোখে পড়ে সবুজ সমুদ্রের ঢেউয়ের মত ভাঁটশেওড়া গাছের মাথাগুলো, এগাছে ওগাছে দোদুল্যমান কত রকমের লতা, প্রাচীন বাঁশঝাড়ের শীর্ষ বয়সের ভারে যেখানে সোঁদালি, বন-চালতা গাছের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে, তাহার নীচের কালো মাটির বুকে খঞ্জনা পাখির নাচ! বড় গাছপালার তলায় হলুদ, বনকচু কটু ওলের ঘন-সবুজ জঙ্গল ঠেলাঠেলি করিয়া সূর্যের আলোর দিকে মুখ ফিরাইতে প্রাণপণ করিতেছে, এই জীবনের যুদ্ধে যে গাছটা অপারগ হইয়া গর্ব্বদৃপ্ত প্রতিবেশীর আওতায় চাপা পড়িয়া গিয়াছে, তাহার পাতাগুলি বিবর্ণ, মৃত্যপান্ডুর ডাঁটা গলিয়া আসিল, - মরণাহত দৃষ্টির সম্মুখে শেষ - শরতের বন- ভরা পরিপূর্ণ ঝলমলে রৌদ্র, পরগাছার ফুলের আকুল আর্দ্র সুগন্ধ মাখানো পৃথিবীটা তাহার সকল সৌন্দর্য- রহস্য, বিপুলতা লইয়া ধীরে ধীরে আড়ালে মিলাইয়া চলিয়াছে।”[১৫]

ঔপন্যাসিক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ‘পথের পাঁচালী' উপন্যাসে নিসর্গ ভাবনার বিস্তার যেভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন বা যতবড় ভূমিকা দিয়েছেন, তা খুব কম উপন্যাসের মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায়। এখানে আমাদের মনে পড়ে যায় জীবনানন্দের প্রকৃতিভাবনার সঙ্গে বিভূতিভূষণের প্রকৃতিভাবনার বাস্তবতার মিল; আবার পাশ্চাত্যের কবি ওয়ার্ডসওয়ার্থের প্রকৃতিচেতনার সঙ্গে বিভূতিভূষণের নিসর্গপ্রীতির কথা। তবে কোথাও যেন বিভূতিভূষণ প্রকৃতির একান্ত আপন স্বতন্ত্র ভাবনার লেখক হয়ে আছেন। এইভাবে উপন্যাসটি বিচার-বিশ্লেষণ করলে আমাদের বলতে দ্বিধা থাকে না যে ‘পথের পাঁচালী’ প্রকৃতির মহাকাব্য হয়ে উঠেছে। সমালোচক গোপিকানাথ রায়চৌধুরী সঠিকভাবেই বলেছেন-

"পথের পাঁচালী' উপন্যাস কোন বিশেষ ঐতিহ্য বা ধারা অনুসরণ করে আবির্ভূত হয়নি। বিশ্বসাহিত্যে এর জুড়ি নেই। এ একেবারে একক, স্বতন্ত্র। এ স্বয়ং একটি শ্রেণী।"[১৬]

প্রসঙ্গ নির্দেশ:-

১. ১৩২৮ বঙ্গাব্দের মাঘ সংখ্যায় 'উপেক্ষিতা' গল্প দিয়ে বাংলা সাহিত্যে বিভূতিভূষণের পদচারণা।
২. পরিচয় পত্রিকা, প্রথম বর্ষ, মাঘ-১৩৩৪ বঙ্গাব্দ।
৩. বঙ্গ সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, মডার্ন বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, পুনর্মুদ্রণ, ১৯৯৬, পৃষ্ঠা -৬০৪।
৪. বিভূতিভূষণ: মন ও শিল্প- গোপিকানাথ রায়চৌধুরী, ১৯৭৮, পৃ -১১-১২।
৫. পথের পাঁচালী, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৩৭৯, পৃষ্ঠা -৯৫।
৬. পথের পাঁচালী, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ঐ, পৃষ্ঠা -১৪৩।
৭. পথের পাঁচালী, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৩৭৯, পৃষ্ঠা -১৭৯।
৮. পথের পাঁচালী, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ঐ, পৃষ্ঠা -১৭৯।
৯. পথের পাঁচালী, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ঐ, পৃষ্ঠা -১৮০।
১০. পথের পাঁচালী, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ঐ, পৃষ্ঠা -৭১।
১১. পথের পাঁচালী, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ঐ, পৃষ্ঠা - ৫১।
১২. পথের পাঁচালী, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ঐ, পৃষ্ঠা -৭০।
১৩. পথের পাঁচালী, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ঐ, পৃষ্ঠা -৭২।
১৪. পথের পাঁচালী, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ঐ, পৃষ্ঠা -৭১।
১৫. পথের পাঁচালী, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ঐ, পৃষ্ঠা - ৬৯-৭০।
১৬. বিভূতিভূষণ: মন ও শিল্প, গোপিকানাথ রায়চৌধুরী, ১৯৭৮, পৃষ্ঠা-৯৭।

সহায়ক গ্রন্থ তালিকা : -

১. বাংলা উপন্যাসের ইতিহাস- ক্ষেত্রগুপ্ত।
২. বঙ্গ সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা- শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (চতুর্থ সংস্করণ)।
৩. বিভূতি স্মৃতি- বারিদবরণ ঘোষ (সম্পাদনা)।
৪. বিভূতি ভূষণের আরণ্যক প্রকৃতি ও মানুষের ঐকতান- দেবেশ কুমার আচার্য।
৫. বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (তৃতীয় খন্ড)- সুকুমার সেন।
৬. বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (নবম খন্ড)- অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ।
৭. বাংলা উপন্যাসের কালান্তর- সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়।
৮. বিভূতিভূষণ: মন ও শিল্প- গোপিকানাথ রায়চৌধুরী।

৯. কালের প্রতিমা- অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়।

১০. বিভূতিভূষণ : জীবন ও সাহিত্য- শ্রী সুনীলকুমার চট্টোপাধ্যায়।

১১. সাহিত্যের রূপ-রীতি ও অন্যান্য প্রসঙ্গ- কুন্তল চট্টোপাধ্যায়।

১২. পথের পাঁচালী- বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

১৩. বিভূতি রচনাবলী - মিত্র ও ঘোষ প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত: গল্পকথায় বৃহৎকথা

কেয়া মুস্তাফী
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ,
ধূপগুড়ি গার্লস কলেজ, জলপাইগুড়ি

মূল বক্তব্য : শ্রীম কথিত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত এক জীবন পথের সন্ধান। রামকৃষ্ণ দেবের সহজ-সরল বাক্ ভঙ্গিমায় গল্পের আশ্রয়ে যে পরম সত্য পরিবেশন করেছেন, তা শুধুমাত্র ধর্মাশ্রয়ী ভক্ত শিষ্য নয় সকল সাধারণ মানুষকেই সত্যের সন্ধান দেয়। সংসারদগ্ধ চিত্তে এ যেন অমৃত পরশ। এই গ্রন্থের সর্বজনীন আবেদন অনস্বীকার্য। এ যেন জীবাত্মার শান্তিবারি স্বরূপ।

মূল শব্দ : শ্রীম মহেন্দ্র গুপ্ত, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, উপাখ্যান, লোকশিক্ষা, কঠিন কথা সহজ করা, জীবনসন্ধান,আজও প্রাসঙ্গিক ।

বিশ্ববরেণ্য শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণদেব পূর্ণব্রহ্ম স্বরূপ। তাঁর দিব্য জীবন এক আলোকময় পথের দিশা। কামারপুকুরের দরিদ্র ঘরের সন্তান এক বর্ণনাতীত আকর্ষণী শক্তি নিয়ে আবির্ভূত হয়েছিলেন মর্ত্যলোকে। তথাকথিত কাগুজে ডিগ্রির শিক্ষায় তিনি শিক্ষিত নন, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণসম তাঁর সহজাত মনোমোহিনী ক্ষমতায় আকর্ষিত,আপ্লুত ভক্তবৃন্দ। ১৬ই আগস্ট ১৮৮৬ তাঁর মর্ত্যলীলার অবসান ঘটে। শ্রীম রচিত তাঁর পুণ্যপুত জীবন ও অমৃতময় বাণীর সঙ্কলন কোটি কোটি ভক্তপ্রাণকে আজও পথসন্ধান দিচ্ছে।

১৮৮২ সালের ২৬ শে ফেব্রুয়ারি মহেন্দ্রলাল গুপ্ত ও শ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রথম সাক্ষাত ঘটে। এই দিনটি আরো স্মরণীয় কারণ এদিন থেকে এই প্রথম কোন যুগাবতারের দৈনন্দিন জীবন চরিত্র লিপিবদ্ধ হতে থাকে এক ভক্তের দিনলিপির পাতায় পাতায়। পাঁচটি বছর তিনি রামকৃষ্ণদেবের সংস্পর্শে আসেন এবং সেই সংক্ষিপ্ত সময়ের দিনপঞ্জি-ই আজ জগৎ স্বীকৃত এক পরম সম্পদ।

ছোট ছোট উপখ্যানাদির সাহায্যে পারমার্থিকতত্ত্ব উপদেশ প্রচলিত আছে বৈদিক যুগ থেকেই। আমাদের পুরান বা অন্যান্য শাস্ত্রগ্রন্থও উপাখ্যান বহুল। উপাখ্যান সর্বজন গ্রাহ্য ও জনপ্রিয় এক সাহিত্য শাখা। স্বল্প আয়তনে ও স্বল্প সময়ে পাঠক মন পর্যন্ত পৌঁছতে এর জুড়ি মেলা ভার। আবালবৃদ্ধবনিতা এর পাঠক। তাই যুগধর্ম স্থাপনার্থে অবতার পুরুষগণ বিভিন্ন বাস্তব ঘটনা ও গল্পের সাহায্য নিতেন জনসাধারণের কাছে ধর্মীয় শিক্ষা প্রদানের উদ্দেশ্যে। অবশ্য এশুধু ধর্মীয় শিক্ষা নয়, লোকশিক্ষাও বটে।

১৯০২ থেকে ১৯৩২ সালের মধ্যে প্রকাশিত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত। স্বামী বিবেকানন্দও যা পাঠে আনন্দে আপ্লুত। তিনি শ্রীময়ের প্রয়াসকে ভূয়সী প্রশংসা করেছেন বারবার, চিঠিতে লিখেছেন,"Thanks 100000 Master!" এই প্রয়াস সম্পর্কে স্বামী প্রেমানন্দ ও যা লিখেছেন তা স্মরণীয়: "কথামৃত পাঠে, হাজার হাজার

লোক প্রাণ পাচ্ছে,সহস্র সশস্ত্র ভক্ত আনন্দ উপলব্ধি করছে, শত শত লোক সংসারের তাপে তাপিত হয়ে শান্তি পাচ্ছে এই শোক মোহের সংসারে।" শ্রী রামকৃষ্ণ দেব স্বয়ং এই গল্পকথা সম্পর্কে বলেছেন, "আমি তাদের কেবল নিরামিষ দেই না। মাঝে মাঝে আঁশ ধোয়া জল একটু দিই, তা না'হলে আসবে কেন?"

কথামৃতের ৫টি খন্ডের মধ্যে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় খন্ডতেই আখ্যানমূলক গল্পের সংখ্যা বেশি চতুর্থ ও পঞ্চম খণ্ডে তুলনায় অনেক কম। কোন কোন আখ্যান বিভিন্ন খন্ডে একাধিকবার এসেছে। হয়তো এ পুনরাবৃত্তি ঘটেছে সচেতন ভাবেই। কারণ আখ্যানগুলি কোন না কোন তত্ত্ববাহী, যার মর্মার্থে ফোটে জীবনের সারসত্য, সত্যনিষ্ঠ বিশ্লেষণ। আজ থেকে ১৩০ বছর আগের এই উপস্থাপনা বিষয়ের গুরুত্বে চির প্রাসঙ্গিক।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে আবির্ভূত অবতার বরিষ্ঠায় শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মুখ নিঃসৃত অমৃত গল্প লহরী এককথায় অনবদ্য। হুগলি জেলার মেঠো সুরে বাঁধা সেই গল্প বাগাড়ম্বরে দুর্গম তো নয়ই বরং এতটাই প্রাণস্পর্শী ও সহজাত যে তা আপন করতে, আত্মস্থ করতে লাগেনা কোন প্রচলিত শিক্ষা। ছোট ছোট উদাহরণ ও একটি দুটি বাক্যে নেহাতই কথার ছলে এগুলির অবতারণা। কখনো হাস্যরসে আশ্রিত এই আখ্যানগুলির গভীর তাৎপর্যপূর্ণ, জ্ঞানগর্ভী মহাশিক্ষার প্রকাশ, চৈতন্যদায়ক। পাগল ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণদেব কঠিন কথা কে সহজ কথার ছলে বলবার অনায়াসে ভঙ্গীতে ছিলেন অনবদ্য।তাঁর যুবক ভক্তশ্রোতৃবৃন্দ বিশুদ্ধ সরল মনে তা শুনে হাস্যরস উপভোগ করতেন। তাঁর সহজ সরল গুণে পরিবেশনার গুণেও কথামৃতের গল্পগুলি মজার। মজার গল্প গুলি ছোটদের কাছেও হয়ে আছে আকর্ষণীয়।

প্রথম খন্ডে গল্পের সংখ্যা থেকে ১৭-১৮টি।দ্বিতীয় ও তৃতীয় খন্ডে ১৩ ও১৪টি। প্রথম ও অন্যান্য খন্ডের গল্পগুলি অধিকাংশই দক্ষিণেশ্বরের ভক্তসঙ্গের সাথে আলোচনা প্রসঙ্গে উঠে এসেছে। কোনটি কালীবাড়ি ও উদ্যান সংলগ্ন কোনোটি সিঁথির ব্রাহ্মসমাজ ইত্যাদি বিভিন্ন এলাকায় কথিত হয়েছে।

শ্রী রামকৃষ্ণদেবের গল্পগুলির সাহিত্যিক গুণমান বিচার করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়।বলা যায় আখ্যানগুলি আধ্যাত্মিক তত্ত্ব উপস্থাপনা ও ধর্মচেতনা মূলক হয়েও সাহিত্যের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্যবাহী। প্রথম গল্প 'মাহুত নারায়ণ' বা দ্বিতীয় গল্প 'রাখাল ও সাপ' সংশ্লিষ্ট গল্প দুটি কে যদি আমরা দেখি তবে প্রথমটির বিষয়বস্তু সামান্য হলেও জীবের মধ্যেই নারায়ণ দর্শনের সেই চিরসত্য এখানে উপস্থিত। কাউকে আঘাত করা বা ক্ষতি করা নয় অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার মনুষ্যোচিত যে বৈশিষ্ট্য হওয়া প্রয়োজন শ্রীরামকৃষ্ণ সেইদিকেই পথনির্দেশ করেছেন আমাদের। শুধু তাই নয় উচিত-অনুচিত, ব্রহ্মের স্বরূপ, ভক্তিযোগ, কর্মযোগ প্রভৃতি বিভিন্ন দুরূহ বিষয় তাঁর আখ্যানের গুণে সরলতায় বোধগম্য হয়েছে। এগুলি আমাদের অনুভূতিকে জাগায়, আমাদের ভাবায়। বিভিন্ন উপমায় হোমা পাখি বা লুনের পুতুলের প্রসঙ্গ এনেছেন তিনি বার বার

যা এই অনন্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের বৃহৎ পরিমণ্ডলে আমাদের স্বল্প জানার জগতকে, আমাদের দম্ভকে প্রশ্নচিহ্নের সামনে এনে দাঁড় করিয়ে দেয়।

কথামৃতের অন্যতম এক উপাখ্যান একই গামলায় নানা রঙের কাপড় ছোপানো। এটি প্রায় তিন বার আমরা পাই। এখানে রং যেন ঈশ্বরের সেই অসীম ধনের প্রতীক। আমরা যা অজ্ঞতাবশত বা মোহাচ্ছন্ন হয়ে ব্যক্তিস্বার্থের পাঁকে ডুবে আসল চিনে উঠতে পারিনা। ক্ষণিক সুখ বাসনা তৃপ্তিকেই আমাদের মন পূর্ণতা বলে ভুল করে। রাজার কাছে লাউ চাওয়ার মত তুচ্ছ বিষয়কে হস্তগত করতে গিয়ে আসল বস্তুকে কাছে পেয়েও আমরা না চিনে ফেলায় হারিয়ে ফেলি। যে প্রকৃত সত্যকে জানে সে কিন্তু ভুল করে না। সে তাঁর প্রকৃত স্বরূপ সন্ধান করে। আখ্যানে একজন লোকের মনেই তা জেগেছিল, সে তখন তাঁর মনের মানুষের অনুসন্ধান শুরু করে।

'এগিয়ে পড়ো' এই উপাখ্যান প্রায় চার বার রয়েছে রামকৃষ্ণদেবের নিষ্কাম কর্মতত্ত্ব সহজ ভাষায় বুঝিয়েছেন। এ যেন গীতার চিরস্মরণীয় বচনের গল্প রূপ- 'কর্মণ্যে বাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন'। ব্রহ্মচারী ঈশ্বর লাভের পথ সন্ধান দিয়েছেন। বাস্তব প্রলোভনের ঊর্ধ্বে উঠে ক্রমাগত চরৈবতি মন্ত্রে গমন করতে হবে তবেই সেই পরম লক্ষ্যে উত্তীর্ণ হওয়া সম্ভব। নিষ্কাম কর্ম সম্পাদনের পরেই পরমাত্মার সাথে ভাব ও দর্শন ঘটবে। ছোট ছোট গল্প কথা অথচ কি সহজ গভীর জ্ঞান প্রকাশিত।

শ্রী রামকৃষ্ণদেব জন্মান্তরবাদ পূর্বজন্মের সংস্কার মানতেন। শবসাধনা আখ্যানে দ্বিতীয় ভক্ত সামান্য পরিশ্রমে দেবী ভগবতীর কৃপা লাভ করেন।তিনি বলেছেন, শুনেছি জন্মান্তর আছে। ঈশ্বরের কার্য আমরা ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে কি বুঝব আছে, তাই অবিশ্বাস করতে পারিনা।

রামকৃষ্ণ কথামৃতে বহুবার রয়েছে 'গাছের ওপর বহুরূপী'র উপাখ্যান । ঈশ্বর সাকার না নিরাকার? তাঁর দর্শন কিভাবে সম্ভব? এই প্রসঙ্গে কাহিনীর উপস্থাপনা । ঈশ্বরনিষ্ঠ, ঈশ্বর আবিষ্ট মানুষই তাঁর স্বরূপ জানতে পারেন। জানতে পারেন তিনি কখনো সগুণ কখনো নির্গুণ ।

স্যাকরা দোকানের 'গোপাল গোপাল কেশব কেশব' গল্পটি একটি অনাবিল হাস্যরসাত্মক গল্প। বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে কথোপকথনের সূত্রে এই গল্পের প্রসঙ্গ। গোপাল কেশব বা হরি এখানে যমক অলংকারে দু'রকম অর্থে উপস্থিত। যে ঘৃণ্য লোক ঠকানো ব্যবসা বাস্তবে বহুল প্রচলিত এ যেন তারই এক উদাহরণ গল্পের বাতাবরণে। উদাহরণ এর নতুনত্ব।

প্রথম ও চতুর্থ খণ্ডে উপস্থিত 'চাষার খাল কেটে জল আনা'র গল্প। বৈরাগ্যের স্বরূপ বোঝাতে শ্রী শ্রী বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী কাছে তিনি এ গল্প উপস্থিত করেন। এই পরিচ্ছেদে শুরুতেই উপস্থিত করেছেন গীতায় বৈরাগ্য প্রসঙ্গে শ্লোকটি ও এখানে উদ্ধৃত। তীব্র বৈরাগ্য যাঁর হবে তাঁর প্রাণ ভগবানের জন্য ব্যাকুল। ভগবান ছাড়া সে

কিছুই চায় না। পরম লক্ষ্যকে পাওয়ার জন্য রোক নিয়ে সে হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করবে। বিশ্রাম,আরাম,আহার সব সে বিসর্জন দেবে। এই গল্পে চাষাটির তীব্র বৈরাগ্য ঈশ্বরের দর্শন ঘটিয়েছে।

'চিঠিও কুটুমবাড়ি তত্ত্ব' গল্পে চিঠি বই শাস্ত্র ইত্যাদি বাহ্যজ্ঞান বস্তু উপমা মাত্র। এগুলি পথনির্দেশ দেয় কেবল। তথ্য সংগ্রহের পর পরম বস্তু লাভের জন্য কর্ম ছাড়া আর পথ নেই। কথামৃতের প্রায় ৫ বার এই গল্পটি এসেছে।

'চিলের মুখে মাছ' নামের গল্পে অবধূত চিল রূপধারী গুরুর কাছ থেকে শিক্ষা লাভ করেছেন জীবনের সত্য। বাসনা থাকলেই কর্ম, কর্ম থেকেই ভাবনা-চিন্তা অশান্তির কারণ। এ কর্ম নিষ্কাম কর্ম নয়। বাসনার নিবৃত্তি হলেই কর্মক্ষয় ও শান্তি লাভ। রামকৃষ্ণের মতে আগে সাধনা থাকলেই নিষ্কাম কর্ম করা সম্ভব। সাধনার বল আর ঈশ্বর দর্শন এই দুইয়ের দ্বারা নিষ্কাম কর্ম অনায়াসে করানো সম্ভব। ধীরে ধীরে সে কর্মও ত্যাগ হয়ে যায়। এত গভীর তত্ত্ব বিভিন্ন উপমার আড়ালে এ গল্পে আত্মগোপন করে আছে।

'জ্ঞানী চাষার পুত্রশোক' গল্পটি দুবার আছে। যে জ্ঞান অর্জন করেছে তারই জানা সম্ভব ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা। বাস্তব জগৎ স্বপ্নবৎ। তাই একমাত্র পুত্রের মৃত্যুশোক তাকে অবিচলিত রাখতে পেরেছে। ভগবান ছাড়া আর সবকিছুই তাঁর কাছে আজ অর্থহীন মনে হয়। সদ্গুরু কাঁচা গুরু প্রসঙ্গে উপমায়িত 'ঢোড়া সাপে ব্যাঙ ধরা'র চিত্রকল্প। সদ্গুরুর সন্ধান শিষ্যের অহংকার বন্ধন কাটিয়ে দেয় কিন্তু কাঁচা গুরুর কবলে পড়লে তার ভোগ যন্ত্রণা বাড়ে বই কমবে না।

'পাহাড়ের উপর কুঁড়েঘর'এর লোকটি নিজের ঘর বাঁচানোর স্বার্থে একের পর এক নাম স্মরণ করে। কিন্তু এই ভাঙা-গড়ার খেলা ঈশ্বরের খেয়াল, তাঁর ইচ্ছেতেই সব। তাই স্থূল বস্তুর ক্ষয় কোন ক্ষতিই নয়। শুধু মন ঈশ্বরে সঁপে রাখতে হবে। ছোট আয়তনের এই গল্পে চিরসত্যের সন্ধান লুকিয়ে আছে।

সত্ত্ব-রজঃ-তমঃ এই তিন গুণের প্রতীকে 'তিন ডাকাতের গল্প' রয়েছে তিনবার। সত্ত্বগুণের আশ্রয় পেলে সংসার বন্ধন মোচন হয়, পরম ধামে যাওয়ার পথে তুলে দেয়। সংসার অরণ্যে এই তিনগুণ জীবের জ্ঞান কেড়ে নেয়। 'বারোশো ন্যাড়া ও তেরোশো নেড়ি'র গল্পে কামিনী কাঞ্চন আসক্ত হয়ে সাধকের শক্তি চলে যাওয়ার কথা রয়েছে। কামিনী কাঞ্চন সাধকের ধর্ম পথে অন্তরায় কথামৃতের সর্বাধিক এই তথ্যই উল্লেখিত। কামিনীকাঞ্চন এর মোহাবিষ্ট সাধক ঈশ্বর দর্শন লাভে বঞ্চিত হয় সাধন সম্পদ হারিয়ে ফেলে।

'ব্যাঙের টাকা'তে দেখি ধনের ভুয়ো দম্ভে বলীয়ান হয়ে মানুষ সর্বশক্তিমান ঈশ্বর কে ভুলে থাকে। অহংকার চলে গেলে তবেই তো ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয়।অহঙ্কার ভক্তি পথের বাধা।' তাঁতির রাম ভক্তি' গল্পে দেখি সবকিছু ঈশ্বরকে সমর্পণ। সংসার সন্ন্যাস ভালো মন্দ সব কিছুতেই ঈশ্বরের ইচ্ছার ওপর ছেড়ে বসে আছে।এ পরম ভক্ত পরম

ঈশ্বর বিশ্বাসী।'স্বাতী নক্ষত্রের বৃষ্টির জল" উপাখ্যানের পরিশেষে রয়েছে ব্যাকুলতা। ব্যাকুল ভাবে চাইলেই পরম দয়াময় ঈশ্বরের কৃপা লাভ করা যায় অনায়াসে।

দ্বিতীয় খন্ডে 'অন্ধের হাতি দর্শন' যে অন্ধ ব্যক্তি সে হাতের বিভিন্ন অঙ্গ স্পর্শ করেই তার আংশিক পরিচয় লাভ করে এবং তাকে সম্পূর্ণ বলে ভেবে নেয়। তেমনি ঈশ্বরের পরিচয় সম্পূর্ণ যে পায়নি, সে যতটুকু তাঁকে পায় তার সম্বন্ধে ওই সামান্য পরিচয়কেই সর্বোচ্চ বলে জানে। পূর্ণ জ্ঞানলাভ করলেই সব ভ্রান্তি কেটে যায়।

'আকবর শাহ ফকিরের' গল্পের সারকথা এই যে, মানুষ কেবল সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের দাস।যার কাছে ধনী রাজা মহারাজা বাদশা সবার ঐশ্বর্য ফিকে হয়ে যায়। জগতের সব ঐশ্বর্যের অধিকারী একমাত্র ঈশ্বর। 'কসাইয়ের গোহত্যা'র গল্পে শেষে বুঝি কর্মকাণ্ডের চেয়ে ভক্তি পথই ভালো। সংসারের শূন্যতার ছবি পাই 'গুরু-শিষ্যের জ্ঞান'গল্পে। সংসারকে যে সব বলে মনে করেছিল, সেই শিষ্যই পরে তার গুরুর আশীর্বাদে সংসারের শূন্যতা বুঝতে পারে এবং গুরুর সাথে সংসার ত্যাগ করে চলে যায়। শিষ্য বাস্তব অভিজ্ঞতায় উপলব্ধি করে তার আপনজনই একমাত্র ঈশ্বর। তাকেই 'আমার' বলে ভালবেসে ধরতে হবে আর কিছুই নয়।

সদ্গুরুর কৃপায় মুক্তি ও স্বরূপ দর্শন এর প্রসঙ্গে 'ছাগলের পালে বাঘ পড়া'র গল্পটি আছে। ছাগল পালে যে বাঘ পড়েছিল সে স্বরূপ ভুলে বদ্ধ জীবের মত বেড়াচ্ছিল। গুরুরূপী বাঘ তাকে জলের কাছে নিয়ে গিয়ে আপন রূপ চেনালো। গুরুর কৃপায় সৎ অসৎ এর বোধ শিখল তার আত্মজ্ঞান হলো তার আত্ম দর্শন হলো। ছোট গল্প কিন্তু তার মধ্যে দিয়েই নিজেকে জানার তথ্যটি কি সহজভাবেই না ব্যক্ত হয়েছে।

'জেলের মাছ চুরি' ঠিক এর পরবর্তী গল্প। কপট সাধনায় সাধু সেজে ব্যক্তির যে ভক্তি প্রীতি ঘটল, তাতে তার মনে হলো কপটে যদি এত হয় তাহলে সত্যকার সাধনে না জানে কি হবে! তারপর সাধনায় রূপান্তর ও চৈতন্যের উদয় ঘটাল।সরল বিশ্বাসে ঈশ্বরকে লাভ সহজেই সম্ভব চিরাচরিত সত্য। ঈশ্বর বালক সুলভ প্রেম চায়। চিরাচরিত সত্য বালকের নিষ্পাপ আধারে ঈশ্বরের দর্শন ঘটে এই বক্তব্যের নিরিখে কথামৃতের পরপর তিনটি গল্প রয়েছে। ১ম টি বাল্যবিধবা মেয়েটির স্বামী রূপে গোবিন্দ দর্শন, দ্বিতীয় বালকের মধুসূদন দাদার সাথে পাঠশালার পথে পৌঁছানো, তৃতীয় ব্রাহ্মণ বালকের ভোগ নিবেদন ও ঈশ্বরের তা গ্রহণ। তিনটি ক্ষেত্রেই ব্যাকুলতা আর দৃঢ় বিশ্বাস তাদের ঈশ্বর প্রেমের নিবিড় সান্নিধ্যের সৌভাগ্য দিয়েছে।

'জাহাজের মাস্তুলের পাখি'র রূপকল্পে এসেছে ঈশ্বর সান্নিধ্যে জীবাত্মার স্থির চিত্তের তুলনা। তেমনি সাধুকে কষ্ট দিয়ে মারার পাওয়ার যখন তিনি জ্ঞান ফিরে পেয়ে বলেন, যিনি আমাকে মেরেছিলেন তিনিই দুধ খাওয়াচ্ছেন। তখন আর বুঝে নিতে অসুবিধা হয়না। ঈশ্বরকে কর্তা রূপে জেনেছেন, তাঁকে পেয়েছেন। সাধুর কাছে তখন

অন্যায় অন্যায় বা অন্য কিছু নেই, সর্বত্র ঈশ্বর। ঠিক তেমনি সমবয়স্কা মেয়েদের স্বামী চেনানোর উপমাতেও সঠিক ব্রহ্মজ্ঞানের স্থির তত্ত্ব লুকিয়ে আছে।

কথামৃতের অনেক গল্পেই 'দেখানো ভক্তির' কথা ব্যক্ত হয়েছে। পাশাপাশি আন্তরিক ভক্তি ঈশ্বরের সান্নিধ্য লাভ করতে গেলে প্রয়োজন তাও গল্পের আকারে পরিবেশিত হয়েছে। আন্তরিক ভক্তিতেই খুব সহজেই তাঁকে লাভ করা যায় কিন্তু ভেক ধরা ভক্তিতে ঈশ্বরকে তো পাওয়াই যায় না। কারণ, ভগবান হৃদয় দেখেন। মনের আন্তরিকতায় বিশ্বাসে ঈশ্বরলাভ সম্ভব। সিদ্ধা থাকলে অহংকার আসে আর অহংকারীর আত্মোন্নতি হয় না। ভগবান লাভ হয় না। ঠাকুর বলেছেন, অহংকার যেন উঁচু ঢিবি, কৃষির জল জমে না, গড়িয়ে যায়। নিচু জমিতে জল জমে আর অঙ্কুর হয়,তারপর গাছ হয়, তারপর ফল হয়। একমাত্র ভালোবাসতে পারলেই অহংকার যায়, ঈশ্বর লাভ হয়।

রাজাকে ভাগবত শেখানোর ছোটগল্পে হরিপাদ পদ্মই সব, এই সারসত্য উঠে এসেছে। হৃদয় মধ্যে নারায়ণই সব-এই আছে ব্যাসদেবের যমুনা পার হওয়ার গল্প কাপরের খুঁটে রাম নাম লিখে সমুদ্র পার হওয়ার আখ্যানে। তিনি বর্ণনা করেছেন অখন্ড বিশ্বাস ভিন্ন কোন বিকল্প পথ নেই।

তৃতীয় খন্ডে সাধুর ভিক্ষা করা গল্পে ফুটে উঠেছে পরম নির্ভরতার কথা। ব্রহ্মের অনির্বচনীয় স্বরূপ ব্যাখ্যার প্রসঙ্গে এসেছে এক ব্যক্তির দুই পুত্রের ব্রহ্মবিদ্যা শেখার গল্প। যেখানে বড় পুত্র অনেক শ্লোক সহযোগে ব্রহ্মকে ব্যাখ্যা করতে চাইলেও ছোট পুত্র চুপ করেই থেকে যায়। কারণ তার মতে ব্রম্ভ কি তা মুখে বলা যায় না,একমাত্র সমাধিস্থ হলেই ব্রহ্ম জ্ঞান হয়, ব্রহ্ম দর্শন হয়। পম্পা সরোবরে 'রাম ও ব্যাঙে'র গল্প ঈশ্বরের কাছে আত্মসমর্পনের ছবিটি আবার প্রতিভাত হয় স্বয়ং ঈশ্বরের ধনুকে মরণ আসছে বলে চুপ করে সেই আঘাতকে বরণ করে নিচ্ছে এই গল্পের ভক্ত রূপী চতুষ্পদী পতঙ্গ ব্যাঙ।

'বড়বাবু ও উমেদার' আখ্যানে বড়বাবুর আসক্ত হয়ে থাকার প্রসঙ্গ রয়েছে। কামিনী কাঞ্চনের ফাঁদে আটকে সব ভুলে যাওয়াকে তিনি ঘোর অপছন্দ করতেন। অখন্ড সচ্চিদানন্দের স্বরূপ জানতে পারে খুব কম জন। যেমন বেগুনওয়ালা ও হীরার গল্প। হীরার প্রকৃত মূল্য একমাত্র সেই দিতে পারে যার রয়েছে জহুরীর চোখ। 'মাছ ধরা ও পথিক' গল্পটিও জনপ্রিয়। মনসংযোগ এর কথা এখানে বলা হয়েছে। যেকোনো কাজ মনঃসংযোগের সাথে করলে নিশ্চুপ ধ্যান হয়ে থাকলেই কাম্য বস্তুর সাথে নিবিড় সংযোগ ঘটে। বাইরের জগতের সাথে আর সকল সম্পর্ক বিলুপ্ত হয়। এই মনসংযোগ শুধু ভক্তি পথে নয় কর্মপথে ও একান্ত আবশ্যক।

সাধুসঙ্গে অনেক স্পষ্ট ধারণা জন্মায় যা পণ্ডিত সংসর্গ বা বই পড়ে আসে না। কোন ত্যাগী মানুষই তাগ্যের উপদেশ দিলে তা কার্যকারী হয়। এই প্রসঙ্গে গল্প আছে 'গুড়ের নাগরি'র। এখানে মুক্ত আত্মার নির্ভয় লীলা তত্ত্বের কথা বলা হয়েছে। 'ব্যানের সুতো লুকানো' গল্পটিতে মুক্ত আত্তার নির্ভয় নিত্যলীলা কথা বলা আছে। গল্পটি নতুনত্ব

ও হাস্য রসাত্মক। ব্রক্ষ্ম শক্তি ও সর্বধর্ম সমন্বয়ের ভক্ত হিন্দু টি জানায় আমি আল্লানাম করতে খুব চেষ্টা করছি কিন্তু আমাদের জগদম্বা আমার কণ্ঠ পর্যন্ত রয়েছেন, তোমাদের আল্লাকে ঠেলে ঠেলে দিচ্ছেন। তীব্র বৈরাগ্যের কথা বলা আছে কোন কোন গল্পে। সেখানে একটি স্বামী তার পরিবার বলামাত্রই গামছা কাঁধে করে সংসার ত্যাগ করলো একটুও চাইল না। তবে এই বৈরাগ্য আসতে গেলে চাই মনের বল। 'ভূতের চুল সোজা' করার মত গল্পে রয়েছে অহংকার ত্যাগের মত মূল্যবান প্রসঙ্গ।

কথামৃতের ছোট ছোট আখ্যান গুলির মূল উৎস মূলত বেদ, উপনিষদ, পুরান,লোক সাহিত্য লোকশ্রুতি এবং এ জাতীয় অন্যান্য উপাদান। শ্রী রামকৃষ্ণের মুখনিঃসৃত এই গল্পগুলি পরিবেশনার গুণে, প্রয়োগের গুণে এক মৌলিক সাহিত্য সৃষ্টিই হয়ে উঠেছে। আধ্যাত্মিক বক্তব্য প্রতিপাদ্য বিষয় হলেও জীবনের বাস্তবতার দিকগুলি এখানে উপেক্ষিত হয়নি। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে আধ্যাত্মিক উপলব্ধির সাথে বাস্তবধর্মী দৃষ্টি ও সহজ সুন্দর কৌতুক রস প্রয়োগের সহাবস্থান ঘটেছিল। কথামৃতে গল্পের আবরণে আখ্যান গুলির মধ্যে কাব্যধর্মীতার চিরায়ত সুরটি পাওয়া যায়। উপমা প্রয়োগে, ভাষারীতি নির্মাণে, প্রবাদ প্রয়োগে, কৌতুক রস উপস্থাপনে কথামৃতের সাহিত্যমূল্যকেও অস্বীকার করা যায় না। হয়তো অজান্তেই সাহিত্যের বিভিন্ন রসধারার সাথে এর সংযুক্তি হয়েছে। বা বলা যায়, সাহিত্যের বিভিন্ন ধারা এ অমৃত সাগরে মিশে একাকার হয়ে গেছে।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত আমাদের জীবনভিত্তি। এ গ্রন্থ আমাদের আত্মোন্নতির সোপান। আখ্যানের আবরণে পথের সন্ধান করি আমরা গ্রন্থ পাঠের মধ্য দিয়ে। একবিংশ শতকের দূষিত বর্তমানে পৃথিবীতে বিবেক যেখানে বিলুপ্তির সীমায়, মিথ্যা,স্বার্থপরতা যেখানে পদে পদে, বিকৃত আনন্দ যেখানে আমাদের বোধকে লাঞ্ছিত করছে, সেখানে সহজ সরলভাবে পরিবেশিত আখ্যান গুলি আমাদের পথ প্রদর্শন করবে শাশ্বত বিশ্বাস আমরা রাখতেই পারি। মনুষ্যত্বহীন বর্তমানে এ গ্রন্থকে আরো বেশি সঙ্গী করি আমরা। ঘটাই চিত্তশুদ্ধি। পরমপুরুষের আশীর্বাণী ঝরে পড়ুক অমৃত ধারায় জগত লোকে "তোমাদের চৈতন্য হোক"।

গ্রন্থসূত্র:

১. শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ কথামৃত (প্রথম খন্ড-পঞ্চম খন্ড) [উদ্বোধন কার্যালয়]

তিলোত্তমা মজুমদারের উপন্যাসে স্বনির্ভর নারীর উত্থান

সীমা মণ্ডল
গবেষক, বাংলা বিভাগ, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ : একুশ শতকের জনপ্রিয় কথাসাহিত্যিক তিলোত্তমা মজুমদারের প্রায় বেশিরভাগ উপন্যাসেই নারী-জীবন কেন্দ্রিক পরীক্ষণমূলক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর উপন্যাসের নারী-পরিসরের মধ্যে স্বনির্ভরতার নানা মাত্রায় মেয়েদের অগ্রগতি লক্ষ করা যায়। পুরুষতান্ত্রিক সমাজের প্রতিবন্ধকতার শেষ বন্ধনটুকু তিলোত্তমা মজুমদারের মেয়েরা ছিন্ন করে বেরিয়ে আসতে পেরেছে। তারা এগিয়ে গেছে আত্মপ্রতিষ্ঠার তাগিদে বীরদর্পে। সরকারি, বেসরকারি, অসংগঠিত কর্মী হিসাবে, অস্থায়ী কর্মী হিসাবে, কখনো বা নিজস্ব স্বাধীন ব্যবসায় নিজের যোগ্যতা প্রমাণের জন্য দৃঢ়তার সঙ্গে লড়াই চালিয়ে গেছে তিলোত্তমা মজুমদারের মেয়েরা। 'মানুষ শাবকের কথা'(২০০১) উপন্যাসের বৈদ্য চিকিৎসক চম্পাবতী, 'প্রহাণ'(২০০৩)-এর চিত্রশিল্পী রাগিনী, দিব্যাঙ্গনা, শ্রী, 'শামুকখোল'(২০০৫) উপন্যাসের গানের শিক্ষিকা চন্দ্রাবলী ও যৌনকর্মী চম্পাকলি, মালবিকারা আত্মপ্রতিষ্ঠার তাগিদে প্রতিনিয়ত লড়াই চালিয়ে গেছে। 'জর্মের চোখ'(২০০৬) উপন্যাসের পঞ্চাশোর্ধ শীলা সংসারের আর্থিক স্বচ্ছলতা ফেরাতে টিউশনি করেছেন। জীবনের চড়াই-উৎরাই পথে চলতে গিয়ে 'একতারা'(২০০৬) উপন্যাসের দেবারতি বিচিত্র পেশায় আত্মনিয়োগ করলেও শেষপর্যন্ত সাহিত্যিকরূপে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করেছে। 'এসো সেপ্টেম্বর'(২০০৮) –এর বেসরকারি কর্মী মিঠু অন্য মেয়েদের স্বাবলম্বী করে তোলার মাধ্যমে নারী-উন্নয়নের স্বপ্ন দেখে। 'চাঁদের গায়ে চাঁদ'(২০১৫) – উপন্যাসে দেবরূপা, শ্রুতি, প্রমিতাদির মতো একদল মেয়েদের দেখা যায় যারা সমাজসেবায় নিজেকে বিলিয়ে দিয়েছে। এইসব স্বনির্ভর মেয়েদের জীবন-জটিলতার নানা বাঁকের প্রতি দৃষ্টি আরোপ করা হয়েছে। দেশ-কাল-সমাজ বদলের সঙ্গে সঙ্গে স্বনির্ভর মেয়েদের উত্থান ও উন্নয়নের পথ ক্রমপ্রসারিত হয়েছে।

মূল-শব্দ : নারী, স্বনির্ভর, উপার্জন, উন্নয়ন, আত্মসচেতনতা, ক্ষমতায়ন।

১৯৬৬ খ্রিস্টাব্দের **১১** জানুয়ারি উত্তরবঙ্গের চা-বাগান ঘেরা প্রাকৃতিক পরিবেশের কোলে কালচিনিতে তিলোত্তমা মজুমদারের জন্ম। এই দশকটি খুব গুরুত্বপূর্ণ এই কারণে যে তিলোত্তমা মজুমদারের জন্মের মাত্র তিন বছর আগে অর্থাৎ **১৯৬৩** খ্রিস্টাব্দে নারীবাদী আন্দোলনের দ্বিতীয় ঢেউ সমগ্র বিশ্বকে আলোড়িত করেছিল। নারীর প্রতি ব্যাপক বৈষম্যের বিরুদ্ধে বেটি ফ্রিডান (Betty Friedan, 1921-2006) মুখর হয়েছিলেন 'The Feminine Mystique' (1963) বইতে। এছাড়া **১৯৬৬** খ্রিস্টাব্দে বেটি ফ্রিডান ও আরো অনেকে মিলে তৈরি করেন 'National Organisation for Women'(NOW) - যার মূল উদ্দেশ্যই ছিল লিঙ্গবৈষম্য দূর করা।

এছাড়া নারীর সাংবিধানিক ও অর্থনৈতিক সমতার জন্যও এই নারীবাদী সংগঠনটি আন্দোলনে সামিল হয়। এই আন্দোলনে কেট মিলেট, ফায়ারস্টোন, ভার্জিনিয়া উলফ্ প্রমুখ নারীবাদীরা সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছিলেন। নারীর অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ও নিজস্ব সত্তা স্থাপনের জন্য সমাজের সর্বস্তরের মানুষেরা মুখর হয়েছিলেন। অর্থাৎ তিলোত্তমা মজুমদারের জন্মের সময় নারীবাদী আন্দোলনের দ্বিতীয় তরঙ্গ এসেছিল; আর তাঁর লেখালেখির জগতে হাতেখড়ির সময়ে তৃতীয় তরঙ্গ আছড়ে পড়েছিল ভারতে। নারীর প্রতি মানসিক শোষণ, যৌনতা, কর্মক্ষেত্রে যৌন হেনস্থা প্রভৃতি বিষয়গুলি আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে ওঠে। যদিও নারীবাদী দৃষ্টিভঙ্গিতে তিলোত্তমা মজুমদারের উপন্যাসের বিচার-বিশ্লেষণ এ প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় নয়। কিন্তু নারীর উত্থানের সঙ্গে এবং নারীর যাবতীয় অধিকারের পাশাপাশি স্বনির্ভর চেতনার জাগৃতির সঙ্গে তা সম্পর্কিত। কারণ নারীর অধিকার সচেতনতার বোধগুলি সৃষ্টি হয়েছে নারীবাদী আন্দোলনের হাত ধরেই। সুতরাং দেশ-কাল-সমাজের চাহিদার প্রেক্ষিতেই তিলোত্তমা মজুমদারের উপন্যাসের মেয়েরা অর্থনৈতিকভাবে স্বাধিকার পেতে চায়। অর্থনৈতিক স্ব-নির্ভরতা নারীকে দেয় তার প্রত্যাশিত সম্মান। স্বোপার্জিত অর্থে জীবনধারণ করে অবস্থানগত তারতম্য ঘুচিয়ে ফেলে সমাজের ও দেশের উন্নয়নের মূল স্রোতে ফিরতে চায় তারা। স্বনির্ভর নারীরা আজ অন্য কোন ব্যক্তি বা সম্পত্তির ওপর নির্ভরশীল হয়ে থাকতে চায় না। পরজীবী কীটের মতো ঘৃণ্য জীবনের অপমান থেকে বেরোতে চায়। কিন্তু মেয়েদের সম্মানজনক উপার্জনের জন্য প্রয়োজন শিক্ষাগত যোগ্যতা, কর্মদক্ষতা ও প্রগতিশীল মানসিকতা। তিলোত্তমা মজুমদারের উপন্যাসে অল্পশিক্ষিত, কোথাও বা অশিক্ষিত মেয়েদের দেখা যায় শারীরিক শ্রমের বিনিময়ে রোজগার করতে। তবে যোগ্যতা অনুযায়ী উপার্জিত অর্থের পরিমাণে যেমন তারতম্য দেখা যায়, তেমনি সামাজিক সম্মানপ্রাপ্তির ক্ষেত্রেও পার্থক্য আসে।

বাংলা কথাসাহিত্যে বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে রোকেয়া বেগম, শান্তা দেবী, শৈলবালা ঘোষজায়া, সীতা দেবী প্রমুখ সাহিত্যিকদের হাতে জীবিকার প্রয়োজনে মেয়েদের কর্মজগতে পা রাখার দৃষ্টান্ত আছে। তাঁদের উপন্যাসের মেয়েরা বিশেষত, শৈলবালা ঘোষজায়ার 'অবাক' (১৯২৫) উপন্যাসের বেগম, শান্তা দেবীর 'চিরন্তনী' (১৯২১) উপন্যাসের করুণা, সীতা দেবীর 'রজনীগন্ধা' (১৯২১) উপন্যাসের ক্ষণিকারা পরবর্তীদের অনুপ্রেরণা হয়ে উঠেছিল। কর্মসূত্রে ঘরের বাইরে বেরোনোর জন্য যে প্রাথমিক শৃঙ্খলগুলি ভাঙা অত্যন্ত প্রয়োজন ছিল, রক্তাক্ত পায়ে তারা সেগুলি দূর করে পরবর্তীদের কিছুটা মসৃণ পথ উপহার দিতে পেরেছিলন। তাদের এই ঐতিহাসিক ভূমিকাকে অস্বীকার করা যায় না। এছাড়া দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী সময়পর্ব থেকেই ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক ও সামাজিক এমনকি মূল্যবোধগত ব্যাপক পরিবর্তনের ফলে মধ্যবিত্ত রক্ষণশীল পরিবারের মেয়েরাও কর্মজগতে পা বাড়িয়েছে। এরপর মন্বন্তর,

দেশভাগ, গণ-আন্দোলন, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা প্রভৃতির অভিঘাতে আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক পটপরিবর্তনে বাংলা কথাসাহিত্যে এসেছে আধুনিক জীবনজটিলতা। মানবিক ও নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয় দেখা গেছে। বিচিত্র পেশায় মেয়েদের আত্মনিয়োগ করতে দেখা গেছে। একুশ শতকের মেয়েদের উচ্চশিক্ষার সুযোগ ও কর্মক্ষেত্রে যোগদানের পরিসর আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। আজকের প্রায় বেশিরভাগ মেয়েরাই চায় আত্মপ্রতিষ্ঠা-সাফল্য-সম্মান ও অর্থ। ফলত, দেখা দিচ্ছে জীবিকাসংকট, বৃদ্ধি পাচ্ছে বেকার সমস্যা। এর পাশাপাশি আন্তর্জাতিক পরিসরে পারদর্শিতার সঙ্গে মেয়েদের এগিয়ে যাওয়ার দৃষ্টান্তও কম নয়।

তিলোত্তমা মজুমদারের 'মানুষ শাবকের কথা' উপন্যাসে প্রথম দিকে চম্পাবতীর উত্থান দেখানো হলেও শেষপর্যন্ত চম্পাবতী জীবিকাসংকটের সম্মুখীন হয়েছে। তবু নিজ বৃত্তিকে হারিয়েও চম্পাবতী পরনির্ভরশীল হয়ে বেঁচে থাকেনি, বরং পরিবর্তিত পরিস্থিতির সঙ্গে নিজেকে গড়ে নিয়ে চম্পাবতী বিকল্প পেশা গ্রহণ করেছে। একজন সুদক্ষ ভেষজ চিকিৎসক রূপে চম্পাবতী যোগিয়াড়া গ্রামে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছে। ভেষজ জড়িবুটি সংগ্রহ করে সে গ্রামের মানুষের অনিদ্রা দূর করেছে, মাতৃস্তন্যে দুগ্ধসঞ্চার করেছে, গর্ভসঞ্চার করেছে, নারী-পুরুষের যৌনশক্তি বর্ধন করেছে। চম্পাবতীর হাতের স্পর্শে গোটা গ্রামে বিরাজ করত সুস্বাস্থ্যের লহর। বিনা পারিশ্রমিকে অমৃতসিঞ্চনই ছিল চম্পাবতীর জীবনের একমাত্র ব্রত। যে হাতে সে অসুস্থ পীড়িতের সেবা করেছে, সেই হাতে স্বার্থপরতার গন্ধ লেগে থাকতে দেয়নি। নিজ কর্মের প্রতি তার অটল অগাধ বিশ্বাস। কিন্তু জীবনের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে চম্পাবতী হারিয়ে ফেলে তার আদি বৃত্তি। তার একমাত্র কারণ-বিজ্ঞানের প্রতি মানুষের বিশ্বাস ও ভেষজ বিদ্যার প্রতি অবহেলা ও অবিশ্বাস। স্বাধীন ভারতে পাশ্চাত্যের সৌজন্যে প্রযুক্তিনির্ভর চিকিৎসা ব্যবস্থা প্রবর্তনের ফলে দেশীয় চিকিৎসা ধ্বংসের মুখে এসে দাঁড়িয়েছে। এভাবে হারিয়ে যাচ্ছে ভেষজ চিকিৎসা; হারিয়ে যাচ্ছে চম্পাবতীরা। কিন্তু জীবন কখনো চম্পাবতীকে হারাতে পারেনি। আপন বৃত্তি হারিয়ে বৃদ্ধ বয়সেও সে ঘুঁটে দিয়ে, দুধ বিক্রি করে, দড়িশিল্পকে কাজে লাগিয়ে উপার্জন করেছে। পুত্রের সংসারে পরনির্ভরশীল হয়ে বেঁচে থাকতে চায়নি। পুত্রবধূর সঙ্গে অনিচ্ছাকৃত অন্যায়ে চম্পাবতী নিজে আত্মদ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত হয়েছে কিন্তু কখনো কারও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে আঘাত হানে নি। নীতি-নৈতিকতায়, মূল্যবোধে, আত্মসম্মানবোধে, আত্মবিশ্বাসে, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে চম্পাবতীকে ঘিরে একটি সম্ভ্রমের আবহ তৈরি হয়। যুক্তিবোধে, স্বনির্ভর মানসিকতায়, প্রগতিশীলতায়, আত্মবিশ্লেষণে চম্পাবতীকে আদর্শ নারীর মর্যাদা দেওয়া যায়।

চম্পাবতীর মতোই সম্ভ্রমের আবহ ঘিরে থাকে সুজাতাকে। 'অমৃতানি' উপন্যাসের বিখ্যাত চিকিৎসক সুজাতার পেশার প্রতি নিষ্ঠা, আদর্শ, দায়বদ্ধতা পাঠককে যেমন অভিভূত করে তেমনি চম্পাবতীকে স্মরণ করিয়ে দেয়। চম্পাবতী ও সুজাতার চিকিৎসক জীবনের আদর্শ কোথাও যেন মিলে যায়। সুজাতা বলেন-

> “আমি চিকিৎসক। আমার নীতি অনুযায়ী রোগাপন্নই শেষ কথা। তার কুল, জাতি, ধর্ম, দেশ আমার বিবেচ্য না। চিকিৎসকের এই আদর্শ।”[১]

সুজাতা, চম্পাবতী কেউ কখনো বেতনভুক হয়নি। স্বোপার্জনে জীবনধারণ করেছে। কারণ – “বৈদ্য স্বাধীনচিত্ত না হলে চিকিৎসা সম্পন্ন হয় না।”[২] চিকিৎসকের আদর্শকে সুজাতা নিজ জীবনে বরণীয় করে আবিষ্কার করেছে মরণাপন্ন রোগের ঔষধ। এ আবিষ্কার তো আসলে সুজাতার আত্মাবিষ্কার। বর্তমানে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির নতুন দিগন্তে নারীদের অভাবনীয় অংশগ্রহণ দেখা যাচ্ছে- সুজাতা তাদেরই যেন পথপ্রদর্শক। সর্বাধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর পেশাগুলিতে সৃজনশক্তির আবিষ্কারে মেয়েরা কৃতিত্বের পরিচয় দিচ্ছে।

‘বসুধারা’ উপন্যাসের নীলিমা চরিত্রের মধ্যে প্রগতিশীল মানসিকতা পরিলক্ষিত হয়। স্বামী সমরেশের সংসারবিমুখতা ও কর্মবিমুখতা নীলিমাকে কর্মজগতে এনে ফেলে। নীলিমা এ. জি. বেঙ্গলে চাকরি করত। নীলিমার চাকরি জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা ও অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতার জন্যই সামাজিক অনুশাসন, কুসংস্কার ও বিধিনিষেধকে অগ্রাহ্য করে যুক্তিবোধের দ্বারা জীবন চালনা করতে পেরেছে। স্বনির্ভরতাই নীলিমার মধ্যে প্রথাভাঙার মানসিক শক্তি সঞ্চার করেছে। বিধবা হয়েও সমাজ-মানসিকতার বিপরীতে গিয়ে সে আমিষ আহার করে, রঙিন পোশাক পরে সাজগোজ করে। তার যুক্তিবাদী মন বলে ওঠে – স্বামী অন্ন জোগালেই স্ত্রীর ইচ্ছা-অনিচ্ছার সমস্ত স্বাধিকার কেড়ে নিতে পারে না। তাই স্বাধিকার বজায় রাখতে প্রতিটি মেয়ের স্বনির্ভর হওয়া একান্ত প্রয়োজন বলে মনে করে নীলিমা। তাই দেখি পুত্রবধূ শর্মির নাচের স্কুলের শিক্ষকতা করার প্রস্তাবকে সে মেনে নেয়। কিন্তু কখনোই উগ্র স্বেচ্ছাচারিতা বা উগ্র স্বাধীনতা মেনে নিতে পারে না। অর্থনৈতিক স্বাধীনতা সত্ত্বেও জীবনযাপনে সংযম, নৈতিকতা, রুচিশীলতা অত্যন্ত প্রয়োজন। কিন্তু স্বনির্ভর মানসিকতা শর্মির মধ্যে জন্ম দিয়েছে ভোগবিলাসের ও স্বেচ্ছাচারিতার। তাই স্বাধীনতারও সঠিক ব্যবহার প্রয়োজন। তবেই নারীর প্রকৃত উন্নয়ন সম্ভব হবে। তাই শিক্ষিত হওয়া বা স্বাধীনতার অধিকার প্রাপ্তি মানেই নারীর উত্থান নয়। ‘বসুধারা’ উপন্যাসে মাথুরগড়ের ভদ্রপাড়ার লক্ষ্মী ‘আদর্শ শিশুপাঠ’ স্কুলের হেডদিদিমনি হয়েও নারীশক্তি উন্নয়নের অংশীদার হতে পারে নি। অর্থ উপার্জনের মাধ্যমে শর্মি বা লক্ষ্মীর মধ্যে আত্মসম্ভ্রমবোধ তৈরি হয় নি। আত্মোপলদ্ধি ও আত্মোবলোকন ঘটেনি তাদের। নারীর উত্থান কেবল অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতার হাত ধরেই আসে না, তার জন্য প্রয়োজন মানবিক, বুদ্ধিবৃত্তিক ও আধ্যাত্মিক সক্ষমতা।

‘বসুধারা’ উপন্যাসের ফটিক বিল বস্তিতে কয়েকজন নিম্নবিত্ত মেয়েদের পরিচয় পাওয়া যায়। যারা মাথুরগড়ের তথাকথিত ভদ্রলোকের বাড়িতে ঝি-চাকরানীর কাজ করে অন্নসংস্থান করে। তারা হয় স্বামী পরিত্যক্ত, নয় মদ্যপ স্বামীর দ্বারা লাঞ্ছিত। তাই

সংসারের দায়ভার তাদেরই নিতে হয়। মানোদা ঝি তার শ্রেণি সম্পর্কে সচেতন থেকেই ভদ্রলোকদের প্রতি ঘৃণা পোষণ করে। আজ যে ভদ্রলোক তাদের আশ্রয় দিতে চায় কালই হয়তো সে রক্ষকের পরিবর্তে নারী-মাংস লোভী ভক্ষক হয়ে ধেয়ে আসবে। এই ভদ্রবেশীদের শিকারে পরিণত হয়েছিল কপিলা। নিম্নবিত্ত পরিবারের মেয়েরা ভালো থাকার লোভ সামলাতে পারে না বলেই প্রতারিত হয় বারবার। ঝি থেকে রানী হবার স্বপ্নে মশগুল হয়ে, বিবাহের প্রতিশ্রুতিকে ভালোবাসা মনে করে কপিলা সহবাস করেছে। সহবাসের পরে যখন প্রত্যাখ্যান নেমে আসে কপিলার মতো মেয়েরা তা সহ্য করতে পারে না। তখন মৃত্যুর দরজাই তাদের জন্য খোলা থাকে। তাই ঝি-চাকরানীর কাজে মেয়েদের প্রতি পদে পদে আত্মসম্মান ও শরীর রক্ষা করে চলতে হয়। একটু অসাবধানী হলেই প্রলোভন, প্রতারণা, যৌন হেনস্থা ও ধর্ষণের শিকার হতে হয়। তবু বেঁচে থাকতে হলে প্রতিবাদী সত্ত্বাকেও বাঁচিয়ে রাখতে হয়। ময়নার মধ্যে সেই প্রতিবাদের কণ্ঠ শোনা যায়। দারিদ্র্যের মধ্যে থেকেও সে মনুষ্যত্ব, বিবেকবোধকে বিসর্জন দেয়নি। একটি অবহেলিত, বঞ্চিত, নিপীড়িত, ধর্ষিত মেয়ের মৃত আত্মার সুবিচার প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষায় আদালতে সাক্ষ্য দিতেও ভয় পায়নি। দুর্ভাগ্যপীড়িত রাধিকা দেশত্যাগের যন্ত্রণাকে বুকে বহন করে, কন্যা হারানোর দহন জ্বালায় দগ্ধ হয়েও কর্মহীন স্বামীর পাশে দাঁড়ানোর জন্য, সর্বোপরি পরিবারকে বাঁচানোর জন্য 'আদর্শ শিশুপাঠ' স্কুলে আয়াগিরির কাজ করেছে। এছাড়া এই উপন্যাসে ফুলরেণু গোবর কুড়িয়ে, গুল দিয়ে বিক্রি করে উপার্জন করে। জরাগ্রস্থ শরীরে কখনো ভিক্ষে করার কথা ভাবে না। এই উপন্যাস প্রসঙ্গে সুস্মিতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন –

> "মাথুরগড়ের উচ্চবর্ণ-নিম্নবর্ণ, উচ্চশ্রেণি–নিম্নশ্রেণি এমনকি নিম্নবর্গের প্রান্তিক মানুষের রোজগার জীবন-নামচার ভেতর দিয়েই তিলোত্তমা খুঁজে পেয়েছেন বহমান জীবনদর্শন আর তার ওপর দিয়েই মর্ত্যপৃথিবীর স্নিগ্ধধারা প্রবাহিত হয়েছে- সৃষ্টি হয়েছে 'বসুধারা'।"[৩]

একদিকে ভদ্রসমাজ তার পরিশীলিত জীবন-জীবিকা নিয়ে উপস্থিত। অন্যদিকে খেটে খাওয়া দরিদ্র মানুষেরা দু'পয়সা রোজগারের জন্য মাথার ঘাম পায়ে ফেলে ভদ্রসমাজকে আরাম দিতে বাধ্য হচ্ছে। সংসার প্রতিপালনের তাগিদে শারীরিক শ্রম বিক্রি করে এরা উপার্জন করে। এর সাথে বৌদ্ধিক উৎকর্ষতার কোনো সম্পর্ক নেই। আত্মসচেতনতার বোধ ততটা তীব্র নয়। তাই নারী সমাজের সার্বিক উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন নিম্ন-আয়ের মানুষদের পাশে দাঁড়ানো। স্বাস্থ্য, শিক্ষা, বাসস্থান, পানীয় জল, জন্ম নিয়ন্ত্রণের দিকে প্রশাসনিক হস্তক্ষেপ জরুরি। তবেই প্রকৃত নারী-উন্নয়ন সম্ভবপর হবে।

'প্রহাণ' উপন্যাসে চিত্রকলার জগতে মেয়েদের সাবলীলতার সঙ্গে বিচরণ করতে দেখা যায়। রাগিনী দেশে-বিদেশে একজন নামী চিত্রশিল্পী হিসাবে আত্মপ্রতিষ্ঠা পেতে চেয়েছে। কেরিয়ারে চূড়ান্ত সফলতার আকাঙ্ক্ষায়, শিল্পী হবার দুর্বার মোহে নৈতিকতা,

মূল্যবোধ, আদর্শ, দৈহিক শুচিতা অগ্রাহ্য করে আপন লক্ষ্যে এগিয়ে গেছে। রাগিনী আধুনিক প্রগতিশীল নারী। যে স্ব-ইচ্ছার দ্বারা চালিত হয়। স্বামী ব্যতীত অন্য পুরুষের সঙ্গে মিলনের স্বাধীনতাও তার স্বেচ্ছাকৃত সিদ্ধান্ত। উচিত-অনুচিতের বোধ তাকে পীড়িত করে না। সাফল্যের সিঁড়ি হিসাবে ব্যবহার করে ক্ষমতাসম্পন্ন পুরুষকে। রাগিনীর স্বনির্ভরতার মানসিকতা দাম্পত্য সম্পর্কে যেমন ফাটল ধরায় তেমনি তা রাগিনীকে করে তোলে উৎকট আত্মকেন্দ্রিক, স্বার্থপর ও একাকী। এর বিপরীতে দিব্যাঙ্গনা চরিত্রটি। দিব্যাঙ্গনার সততা, আত্মবিশ্বাস, ও আত্মপ্রতিষ্ঠার কঠিন লড়াই তার তুলির প্রতিটি স্পর্শে ফুটে উঠেছে। "দিব্যাঙ্গনার তুলিতে আত্মবিশ্বাস আছে। জোর আছে। ছবিগুলি সংশয়বিহীন কিন্তু দুর্বোধ্য নয়। ছবিগুলি থেকে শিল্পীর ব্যক্তিত্ব ও বিশ্বাস প্রতিফলিত হয়েছে।"[৪] – একজন প্রকৃত জাতশিল্পীর নিষ্টা, একাগ্রতা দিব্যাঙ্গনাকে প্রতিষ্ঠা দিয়েছে। কিন্তু রাগিনীর সৃজনশীলতা সহজাত নয়। সে জাতশিল্পী নয়। তাই তার "আচরণের নেপথ্যে স্বার্থসিদ্ধির দীর্ঘ পরিকল্পনা থাকে।"[৫] দাম্পত্য সম্পর্ক রাগিনীর শিল্পী প্রতিভাকে নষ্ট না করলেও দিব্যাঙ্গনার ক্ষেত্রে বৈবাহিক জীবন তার শিল্পীসত্তার বিকাশে বাধাদান করেছিল। কিন্তু কবিতা সিংহের 'পাপপুণ্য পেরিয়ে' উপন্যাসের বাসনা কিংবা নরেন্দ্রনাথ মিত্রের 'অনুরাগিনী' উপন্যাসের দীপশিখার মতো রাগিনী ও দিব্যাঙ্গনা পরিবারের কাছে শিল্পীসত্তাকে বিসর্জন দেয়নি। বরং চিত্রশিল্পী হিসাবে আত্মপ্রতিষ্ঠা করতে গিয়েই রাগিনীর দাম্পত্য সম্পর্কে চিড় ধরলেও কেরিয়ারই প্রাধান্য পেয়েছে। আর দিব্যাঙ্গনা রক্ষণশীল পরিবারের শত বাধা-বিপত্তি পেরিয়েও নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছে।

রাগিনীর কন্যা শ্রী আঠারো বছর পার হলেই নিজ জীবনের দায়িত্ব নিজে নিতে চেয়েছে। তার বিশ্বাস টাকার জন্য বাবা-মায়ের ওপর নির্ভর করলে কোনোদিনই মানসিক স্বাধীনতা আসতে পারে না। শ্রী চায় তার নিজের উপার্জনের স্বাধীন জীবন। তার উপলব্ধি-

> "আমি বুঝেছি, প্রত্যেকটি মানুষের নিজস্ব উপার্জন থাকা জরুরি। উপার্জনই মানুষকে দেয় ব্যক্তিত্ব, স্বাতন্ত্র্য, আত্মমর্যাদাবোধ এবং স্বাধীনতা।"[৬]

আধুনিক প্রজন্ম শ্রী'র মতো স্বনির্ভর হতে চায়। তবে ভোগবিলাসপূর্ণ জীবনলাভের আকাঙ্ক্ষায়। আধুনিক প্রজন্মের কাছে জীবনের মূল্যবোধ বদলে গেছে। অপরিমিত চাহিদা ও অনাকাঙ্ক্ষিতকে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা বেড়েছে। তাই স্বনির্ভর মানসিকতার অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও প্রবৃত্তির অসংযমের তাড়নায় অন্ধকারের পথে তলিয়ে গেছে।

'শামুকখোল' উপন্যাসে একদিকে একজন মধ্যবিত্ত পরিবারের এক মেয়ের জীবনে ঘুরে দাঁড়ানোর লড়াইয়ের পাশাপাশি যৌনকর্মী মেয়েদের জীবন ও জীবিকার টানাপোড়েন চিত্রিত হয়েছে। চন্দ্রাবলী স্ব-প্রতিষ্ঠিত গানের স্কুলে শিক্ষকতার পাশাপাশি টিউশনি করে অর্থ উপার্জন করে। তার উপার্জিত অর্থই তাকে স্বনির্ভরতার শক্তি

জুগিয়েছে। বহুগামী ও ভোগলোলুপ স্বামীর অন্নদাস হয়ে বাঁচার মধ্যে সে উপলব্ধি করেছে নারীত্বের অপমান। তাই নিজ সঙ্গতিতে আত্মসম্ভ্রমের সঙ্গে বাঁচার জন্য একুশ শতকের মেয়েরা অসুস্থ বৈবাহিক সম্পর্ক থেকে বেরোতে দ্বিধা করে না। অর্থনৈতিক সঙ্গতি চন্দ্রাবলীকে নিজের মতো করে বাঁচার সাহস ও প্রেরণা জুগিয়েছে। জীবনবাদী চন্দ্রাবলী তার নিজস্ব সিদ্ধান্তে, সাহসে, সক্ষমতায়, মানসিক শক্তির অফুরন্ত উদ্দীপনায় নতুন করে জীবন গড়ে নিতে চেয়েছে।

বেঁচে থাকা ও আপনজনদের বাঁচিয়ে রাখার তাগিদে প্রতিদিন নিজেকে পুড়িয়ে দেহ বিক্রি করে অর্থ উপার্জন করেছে চম্পাকলি ও মালবিকা। গরু, ছাগল, ভেড়ার মতো প্রতি রাতে দেহ বিক্রির সঙ্গে সঙ্গে বিক্রি হয়ে যায় তাদের আত্মসম্মান, ব্যক্তিত্ব। অথচ তাদেরই উপার্জিত অর্থে প্রতিপালিত সংসার তাদের আশ্রয় দেয় না। কারণ দেহব্যবসার উপার্জিত অর্থ তাদের কাছে ঘৃণ্য নয়। অর্থে কোনো পাপ থাকে না, পাপ থাকে কেবল কর্মে। পরিবার, সমাজ থেকে বঞ্চনা, অবহেলার আঘাত পেতে পেতে একসময় তারাও প্রতিবাদী হয়ে ওঠে। যৌনকর্মীরা অধিকার আন্দোলনে সামিল হয়। ১৯৯৫ সালে যৌনকর্মীদের নিজস্ব উদ্যোগে 'দুর্বার মহিলা সমন্বয় কমিটি' গড়ে ওঠে তাদের যাবতীয় অধিকারের দাবি আদায়ের জন্য। তাদের দাবি ছিল-

"শ্রমিকের সম্মান দিতে হবে-দাবি। স্বাস্থ্যের অধিকার দিতে হবে-দাবি।"[৭]

কিন্তু এসব সত্ত্বেও যৌনপ্রথার বহমানতা কী লুপ্ত হবে? চম্পাকলি, মালবিকা চায় মানুষের অধিকার। চায় গণিকাবৃত্তির বিলুপ্তি। এ পেশা টিকে থাকলে সমাজে মেয়েরা কোনোদিনই তাদের যোগ্য সম্মান পাবে না। সমাজের সার্বিক নারী উন্নয়ন সম্ভব হবে না। তারা চায় এ পেশাকে কেন্দ্র করে যে শোষণ, নিপীড়ন, বঞ্চনা অবহেলার শিকার হতে হয় মেয়েদের তা বিলুপ্ত হোক। মেয়েদের বিকল্প, ইতিবাচক কোন পেশায় নিয়োগের ক্ষেত্র প্রস্তুত করতে হবে। তারজন্য দরকার সম্পূর্ণ সরকারি সহযোগিতা।

'একতারা' উপন্যাসে দেবারতির আত্মপ্রতিষ্ঠার ও স্বনির্ভরতার জন্য মানসিক আকুলতার কথা আছে। পারিবারিক জীবনে অপমান, লাঞ্ছনা, অবহেলার মধ্যেও সে তার অস্তিত্বকে ধ্বংস হতে দেয়নি। বরং সেই অপমান, লাঞ্ছনা, অবহেলাই দেবারতিকে স্বনির্ভর নারী রূপে গড়ে উঠতে সহায়তা করেছে। আত্মবোধ থেকে সে বলেছে-

> "আমি গলগ্রহ হব না। আত্মজীবনের ব্যয়ভার বহন করতে পারার সঙ্গতি অর্জন করব স্বয়ং।"[৮]

তাই কখনো টিউশনি পড়িয়ে, কখনো নাটকে অভিনয় করে উপার্জনের চেষ্টা করেছে। যোগ্যতা বাড়াতে টাইপ ও শর্টহ্যান্ড শিখেছে। বেসরকারি অফিসে চাকরি পেয়েছে। কর্মক্ষেত্রে যৌন হেনস্থা ও কুপ্রস্তাব এসেছে। যা তার মানসিক সক্ষমতাকে দুর্বল করে দিয়েছে। স্বনির্ভর হওয়ার স্বপ্ন তার ঝাপসা মনে হয়েছে। বিবাহের চিহ্ন শরীরে এঁকে দিয়ে ভেবেছে নারী-শরীরকে অন্তত সুরক্ষিত করা গেল। কিন্তু তারপরেও এসেছে নারীত্বের প্রতি অপমান, অসম্মান। আত্মসম্মান টিকিয়ে রাখতেই দেবারতি গৃহত্যাগের

সিদ্ধান্ত নিয়েছে। কর্মরতা মেয়েদের ‘স্বনির্ভরা’ হোস্টেলে ঠাঁই হয়েছে তার। এখানে বিচিত্র পেশার সঙ্গে যুক্ত মেয়েদের দেখা যায়। কেয়া প্রাইভেট কোম্পানির রিসেপসনিস্ট, উজ্জ্বলা চক্রবর্তী এম. পি. জি রেকর্ডসে উচ্চপদস্থ কর্মচারী, পৃথা লাইব্রেরিয়ান, মধুমিতা ডাক্তার, অঙ্গনা এয়ার লাইন্সের অফিসার, শ্রীরূপা স্কুলে পড়ায়। এরা প্রত্যেকেই অর্থনৈতিক জীবনে প্রতিষ্ঠিত। এদের দেখে বুঝতে অসুবিধা হয় না যে একুশ শতকের মেয়েরা সবধরনের কাজেই যথাযথ পারদর্শী। তাদের সকলের আর্থিক সচ্ছলতা থাকলেও দেবারতির তা ছিল না। সাপ্তাহিক চিরায়ত পত্রিকায় কাজ করে সে সামান্য উপার্জন করত। ফলত পচ্ছন্দমতো ভালো চাকরি প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষায় সে ছুটে বেড়িয়েছে। কারণ সে বোঝে অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতাই মেয়েদের দেয় স্বাধীনতা, সম্মান, আনন্দ। আত্মজীবনের অপমান, অসম্মান ও যন্ত্রণার অনুভূতি থেকে তার মধ্যে জন্ম নিয়েছে কবিতা। আদি কবি বাল্মীকির বেদনাবিদ্ধ হৃদয়ের আর্তি থেকে যেমন ‘মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাশ্বতীঃ সমাঃ’ জন্ম হয়েছিল তেমনই দেবারতির হৃদয় নিংড়ানো যন্ত্রণামথিত শব্দবন্ধ কবিতারূপে ও উপন্যাসরূপে প্রকাশ লাভ করে। ক্রমে পাঠক সমাজের কাছে সমাদৃত হতে থাকে দেবারতি। সাহিত্যিক হিসাবে আত্মপ্রতিষ্ঠার পথ ক্রমপ্রসারিত হয়।

‘এসো সেপ্টেম্বর’ উপন্যাসের অমলা-কমলার সঙ্গে ‘বসুধারা’ উপন্যাসের ফটিক বিল বস্তির ঝি-চাকরানীদের পেশাগত সাদৃশ্য থাকলেও অমলা-কমলার মধ্যে মার্জিত পরিচ্ছন্নতা আছে। কিন্তু ফটিক বিল বস্তি আশ্রয়দানের পরিবর্তে রাধিকা, ময়না, কপিলার মতো মেয়েদের জীবন থেকে কেড়ে নিয়েছে সম্মান, পরিচ্ছন্নতা ও মার্জিত জীবনের স্বপ্ন। বাবার মৃত্যুর পর থেকেই কমলা মায়ের সঙ্গে সঙ্গে এ পেশায় নামে। তার মা যে তিন বাড়ি রান্না করত সেই তিন বাড়িরই বাসন মাজত কমলা। সেই থেকে তার এ জীবনের শুরু। স্বাবলম্বনই কমলার মধ্যে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও আত্মসম্মানবোধের জন্ম দিয়েছে। অমলাও স্বনির্ভর মানসিকতা থেকেই স্বামীর ওপর নির্ভরশীল না হয়ে সন্তানকে নিয়ে একা শহরে থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

এ উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র মিঠু কর্পোরেট অফিসে চাকরি করে। সম্পূর্ণ নিজস্ব প্রচেষ্ঠায় সে প্রতিষ্ঠিত। কেরিয়ারের অপরিমিত আকাঙ্ক্ষা ও অতৃপ্তি মিঠুর মধ্যে নেই। সে জীবনের প্রতি বিশ্বাসী। মিঠুর মতোই জীবনের প্রতি বিশ্বাসী থেকেছে বলেই অঞ্জনা স্বামীকে হারিয়ে নিজের মতো করে জীবনে দাঁড়াবার শক্তি অর্জন করেছে। জীবনকে অপচয়িত হতে দেয়নি। মিঠু তার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। মিঠু চায় মেয়েদের অগ্রগতি। কারণ – “এ পৃথিবীটা আজও বড় বেশি করে পুরুষদের জন্য রয়ে গেছে।”[৭] তাই মেয়েদের এগিয়ে যেতে দেখলে মিঠু আত্মশ্লাঘা বোধ করে। মেয়েদের এগিয়ে যেতে সাহায্য করে। মিঠুর বান্ধবী শিল্পী নামী লেখক হতে চায়। পত্র-পত্রিকায় তার কয়েকটি গল্প প্রকাশ পেয়েছে। শিল্পীর মধ্যে স্বনির্ভর মানসিকতার অভাব লক্ষ করা যায়। কখনো

সে মিঠু কখনো বা অমরেন্দ্র সরখেলের কাছে টাকা ধার নেয়। নির্দিষ্ট কোন চাকরিতে সে স্থিত হতে পারে না। কিন্তু তার বিশ্বাস – "প্রত্যেকের উচিত খুব শক্ত বাঁধনে আত্মসম্মান আগলে রাখা। সর্বত্র। সবার কাছে।"[১০] তাই দেখি আত্মসম্মান বজায় রাখতেই মিঠু বা অমরেন্দ্র সরখেলের কাছে ধার নেওয়া টাকার হিসাব রেখেছে। কখনো পুরুষের আধিপত্যকে নিজ জীবনে মেনে নিতে পারে নি। যখনই পুরুষের আগ্রাসী আধিপত্যকামী রাক্ষুসে প্রেমের স্বরূপ জানতে পেরেছে তখনই নিজ অস্তিত্ব বজায় রাখতে সেই সম্পর্কে ইতি টেনেছে। একটু খামখেয়ালি, বোহেমিয়ান হলেও শেষ পর্যন্ত শিল্পী তার শিল্পীসত্তাকে বাঁচিয়ে রেখেছে। লেখক হওয়ার আকাঙ্ক্ষাই শিল্পীকে বোহেমিয়ান, খামখেয়ালি করেছে।

'আজও কন্যা' উপন্যাসের কেন্দ্রেও রয়েছে এক স্বনির্ভর নারীর জীবন-জটিলতার নানান স্তর। অজন্তার স্বনির্ভরতা সমগ্র পরিবারের আশা-ভরসার অন্যতম আশ্রয় হলেও পরিবার ও সমাজের কাছে সে কখনো প্রত্যাশিত সম্মান ও মর্যাদা পায়নি। তার কারণ সে জন্মসূত্রে মেয়ে। অথচ "তার ওপর দায় বর্তায় সংসারের সকল বইবার, সকলের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য সাজিয়ে তোলবার, সে দেবে কেবল...।"[১১] পারিবারিক দায়বদ্ধতার চাপে অজন্তা কেবল টাকা উপার্জনের যন্ত্রে পরিণত হয়েছে। উপার্জনক্ষম হলেও একটি বয়সের পর অনূঢ়া অজন্তা নিজের বাড়িতেও যেন অনাকাঙ্ক্ষিত হয়ে যায়। পারিবারিক অবহেলা, অসন্তোষ থেকে বাঁচতে অজন্তা কর্মে আত্মনিয়োগ করেছে। কাজই অজন্তার সকল যন্ত্রণার ওপর মলম দিতে পারে। সমাজ এখনও একজন স্বনির্ভর নারীর সার্বিক সাফল্য দেখতে অভ্যস্ত নয় বলেই তাকে আঘাতে আঘাতে জর্জরিত করা হয়, প্রশ্ন তোলা হয় তার দায়িত্ববোধ, কর্তব্যপরায়ণতা নিয়ে। অথচ সবাই হয়তো মনে মনে স্বীকার করে যে তার সেবাপরায়ণতা, দায়িত্ববোধ, কর্তব্যবোধ পরিবারের একজন পুত্রসন্তানের থেকে কম নয়। আসলে অজন্তার যোগ্যতামানের বিচার হয় পুরুষের মাপকাঠিতে। আজও একুশ শতকের মেয়েরা লিঙ্গবৈষম্যের শিকার হয়। নামকরণে লেখিকা সেই মানসিকতাকেই ছুঁয়ে গেছেন। কিন্তু বিশ্বায়নের যুগে শত প্রতিবন্ধকতার মধ্যেও মেয়েরা 'পেশাগত নিমগ্নতা' ও দায়িত্বে ঈর্ষনীয় অবস্থানে বিরাজ করছেন। সমাজ মানসিকতার সার্বিক বদল না ঘটলেও মেয়েরা আজ একুশ শতকেও পুরুষের সঙ্গে সমান্তরালে কর্মের জগতে আত্মনিয়োগ করছে।

'শামুকখোল' উপন্যাসের মতো 'ঈশ্বরের বাসা' উপন্যাসেও পতিতাবৃত্তিতে নিযুক্ত মেয়েদের দেখা যায়। বিশ্বাসহন্তা পুরুষের দ্বারা প্রতারিত হয়ে সরমাবাঈ ও লখাইয়ের মা সন্তান প্রতিপালনের তাগিদে দেহদান করেছে। বেশ্যাবৃত্তিই লখাইয়ের মায়ের মূল পেশা। আর সরমাবাঈকে এর পাশাপাশি তিনটে হোটেলে সব্জি কাটতে, মশলা কাটতে, খাবার জল ধরে আনতে, এমনকি ঘরে তৈরি আচার বিক্রি করতেও দেখা যায়। রীনা হাড়কাটা গলির তরুণী বেশ্যা। গ্রুপ সেক্স করে সে প্রচুর অর্থ-উপার্জন করে। মছলি, হোটেলের ব্যবসার পাশাপাশি দেহব্যবসার সঙ্গে যুক্ত। আগেই বলেছি যে এ পেশাগুলি

সমাজ-স্বীকৃত পেশা নয়। সমাজের চোখে এ পেশা ঘৃণার, কলঙ্কের। তাই মেয়েদের প্রত্যাশিত সম্মান প্রাপ্তির জন্য এ পেশার বিলুপ্তিসাধন প্রয়োজন। যদিও মেয়েদের স্বাধীন পেশা নির্বাচনের আইনী স্বীকৃতি থাকায় বর্তমানে বহু মেয়ে যৌনকর্মী হিসাবে নিজেদের নাম নথিভুক্ত করছে। কারণ-এ পেশায় উপার্জিত অর্থের পরিমাণ অনেক বেশি। ফলত অভাবী মেয়েরা উন্নত জীবনধারণের তাগিদে এ পেশায় নেমে আসবে এটাই স্বাভাবিক। আদর্শহীন ভোগবাদী জীবনের প্রতি আকর্ষণই এর অন্যতম কারণ। এর পাশাপাশি এ উপন্যাসে মধুঋতাকে পাওয়া যায়, যে 'সানসাইন' নামে একটি অবাণিজ্যিক পরিসরে কর্মরত। ভারত, বাংলাদেশ, ভুটান, নেপাল, তাইল্যান্ডে সেই সংস্থার কাজ প্রসারিত। মধুঋতা ভারতের হয়ে সানসাইনের আন্তর্জাতিক কর্মপ্রয়াসের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করতে পেরেছে।

'চাঁদের গায়ে চাঁদ' উপন্যাসে N. G. O-র মাধ্যমে পথশিশুদের শিক্ষাদানের ক্ষেত্রেও মেয়েদের অগ্রাধিকার দিয়েছেন তিলোত্তমা মজুমদার। 'শামুকখোল' উপন্যাসেও এই কর্মপ্রয়াসের পরিচয় পাওয়া যায়। 'হোপ' চাইল্ড কেয়ার ইন্সটিটিউট সংস্থায় শ্রুতি, দেবরূপা, দেবিকা, প্রমিতাদি, মীনাক্ষি দি, মঞ্জুশ্রী দি প্রভৃতি মেয়েদের কর্মরত দেখা যায়। পথশিশুদের স্নেহমায়ার পরিমণ্ডল দিতে এখানে মহিলা কর্মীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। সুতরাং মেয়েরা আর শুধুমাত্র আপন সন্তান লালন-পালনের ক্ষুদ্র স্বার্থের মধ্যেই জীবন ব্যয়িত না করে মানবিক উদারতায় তারা পথশিশুদের দেখভালের মাধ্যমে দেশের বৃহত্তম স্বার্থের সঙ্গে নিজেদের যুক্ত করতে পেরেছে। এভাবেই মেয়েরা আন্তর্জাতিক পরিসরে এগিয়ে গেছে।

সুতরাং, তিলোত্তমা মজুমদারের উপন্যাসে মেয়েদের জীবিকা গ্রহণেও বৈচিত্র্য দেখা যায়। সমাজসেবায়, শিক্ষাজগতে, রাজনীতিতে, চিত্রকলার জগতে, বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে মেয়েদের সাবলীলতার সঙ্গে কাজ করত দেখা গেছে। আপন যোগ্যতায় অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে তারা নিজেদের দক্ষতা প্রমাণ করার লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে। কারণ নারীমুক্তি বা নারী-স্বাধীনতাই শেষ কথা নয়। বর্তমানে মেয়েরা সবধরনের অধিকার সম্পর্কে সচেতন ও অধিকার প্রাপ্তির প্রত্যাশী। আর স্বনির্ভরতার মানসিকতা নারীকে সেই প্রত্যাশা প্রাপ্তিতে সবধরনের মানসিক সক্ষমতা প্রদান করে। নিজের ভাগ্য নিজে তৈরি করার সাহস সঞ্চার করে। বর্তমানে গৃহবধূরাও স্বাধীন ব্যবসার মাধ্যমে যেমন স্বনির্ভরতার স্বাদ পেতে চাইছে তেমনি অল্পশিক্ষিত বা অশিক্ষিত মেয়েরাও শারীরিক শ্রম-প্রদানের বিনিময়ে স্বনির্ভর হয়ে উঠতে চাইছে। তিলোত্তমার উপন্যাসে মেয়েদের সেই প্রয়াস লক্ষ করা যায়। অর্থাৎ উচ্চবিত্ত-মধ্যবিত্ত-নিম্নবিত্তের শ্রেণিগত পার্থক্য থাকলেও সব স্তরের মেয়েদের প্রাথমিক চাহিদা হয়ে উঠছে অর্থনৈতিক স্বাধিকার। অর্থনৈতিক স্বাধীনতাই মেয়েদের দেয় প্রতাশিত সম্মান। স্বনির্ভর মানসিকতাই নারী-উন্নয়নের ধারাকে গতিদান করেছে। কিন্তু এখানেই থেমে থাকলে চলবে না, নারীকে

ক্ষমতায়নের বৃত্তে প্রবেশ করতে হবে। কিন্তু কেবলমাত্র অর্থনৈতিক স্বাবলম্বনই নারীর পূর্ণ ক্ষমতার বিকাশ ঘটাতে পারে না। তার জন্য প্রয়োজন -

> "The capacity of women to increase their own self – reliance and internal strength. This is identified as the right to determine choice in life and to influence the direction of change, through the ability to gain control over crucial material and non-material resources."[১২]

তথ্যসূত্র :

১. তিলোত্তমা মজুমদার, 'অমৃতানি', আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা-০৯,২০০৯, পৃ-১৬৫।

২. তদেব, পৃ-৬৪।

৩. সুদক্ষিণা ঘোষ, 'মেয়েদের উপন্যাসে মেয়েদের কথা', দে'জ পাবলিশার্স, কলকাতা-৭৩, জানুয়ারি ২০০৮, পৃ-২৪।

৪. তিলোত্তমা মজুমদার, 'প্রহাণ', আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা-০৯, ২০০৩, পৃ-৬৮।

৫. তদেব, পৃ-১৭৩।

৬. তদেব, পৃ-১৪৭।

৭. তিলোত্তমা মজুমদার, 'শামুকখোল', আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা-০৯, ২০০৫, পৃ-৪৩।

৮. তিলোত্তমা মজুমদার, 'একতারা', আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা-০৯, ২০০৬, পৃ-১৪।

৯. তিলোত্তমা মজুমদার, 'এসো সেপ্টেম্বর', আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা-০৯, ২০০৮, পৃ-২১।

১০. তদেব, পৃ-৪৯।

১১. তিলোত্তমা মজুমদার, 'আজও কন্যা', আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা-০৯, ২০১০, পৃ-১৯।

১২. Caroline O. N. Moser, 'Gender Planning and Development : Theory, Practice and Training', Routledge, London and New York, 1993, P-74-75.

লোকশিল্পে নারী : প্রসঙ্গ বাঁকুড়া জেলা

সুমন্ত মন্ডল
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
মানভূম মহাবিদ্যালয়,মানবাজার, পুরুলিয়া.

সারসংক্ষেপ: পৃথিবীর প্রতিটি দেশে গ্রামীণ সংস্কৃতিতে নারীর অবদান যেমন গভীর তেমনি ব্যাপক। Material and nonmaterial or spiritual উপাদানসমূহে নারী এক অনন্য ভূমিকা পালন করে এসেছে। নারী যেহেতু পারিবারিক সূত্রে সন্তান পালন, সংসার পরিচালনা,সম্পর্ক মধুরতর করার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি সম্পৃক্ত থাকে তাই লৌকিক আচার-আচরণ পরব -ব্রত- উৎসব প্রভৃতি বিষয়ে তার অংশগ্রহণ ও উৎসাহ লোক সংস্কৃতির আঙ্গিক সমূহকে পুষ্ঠ করতে সহায়ক হয়েছে। অফুরান প্রাণ ও হৃদয় সম্পদের গুনে এই ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতির প্রাণ ভোমরা উজ্জীবিত ও প্রসারিত হয়েছে নারীর দ্বারা।

সূচক শব্দ : শিল্পী, মৃৎশিল্প, নারী ও পুরুষ, নকশী কাঁথা, শিকা, আলপনা।

লোক সংস্কৃতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে নারীর অবদান অবিস্মরণীয়।লোকসাহিত্যের মেয়েলি ছড়া, ছেলেভুলানো ছড়া,প্রবাদ-প্রবচন ধাঁধা, বিবাহ সংগীত, ঘুম পাড়ানি গান, রূপকথা, ব্রতকথা, লোকসংগীত ঝুমুর, টুসু, ভাদু, শ্রম সঙ্গীত, বাউল সঙ্গীত এ নারীর অবদান পুরুষের চেয়ে কম নয় বরং সমান প্রাধান্য লাভ করে। এমনকি লোকশিল্প যথা- ডোকরা শিল্প, মৃৎশিল্প গালার পুতুল, মনসা চালি, কাঠের পুতুল, লন্ঠনশিল্প, শঙ্খশিল্প, বাঁশ বাঁশশিল্প, প্রভৃতি শিল্পে পুরুষকে সমান ভাবে সহায়তা করে নারী। এক্ষেত্রেও লোক শিল্পী হিসেবে নারীর ভূমিকা অনবদ্য।এছাড়া লোক নৃত্য, জাওয়া, গিন্নি পালন ও ঝুমুর, নাচনি, হাপু, এবং লোকক্রীড়া কানামাছি, এক্কাদোক্কা, গুটি খেলা, বন্দী খেলা, প্রভৃতিতে নারীর প্রাধান্য অত্যধিক। নারী তার নিজস্ব অস্তিত্বকে বজায় রেখে বিভিন্ন লোকউৎসব, লোকখাদ্য, লোক ঔষধ তথা ধাত্রীবিদ্যা প্রভৃতিতে তার সুনিপুণ অবদান রেখে লোকসংস্কৃতির অঙ্গনকে সমৃদ্ধ করে তুলেছে।

লোক সংস্কৃতির যে বিশিষ্ট আঙ্গিক লোকশিল্প তার গড়নের পদ্ধতি প্রক্রিয়া প্রাচীন ঐতিহ্যমণ্ডিত ও প্রথাগত। বিষয়বস্তুতে কিছু পরিবর্তন ঘটল স্টাইল ও সৃষ্টি পদ্ধতিতে তেমন তারতম্য ঘটে না। তাই আবহমান কালের পদ্ধতি অনুসরণের ফলে শিল্পকলার ব্যক্তি বৈশিষ্ট্য ও মানসিক বৈচিত্র তেমন প্রকাশ পায় না। তাই নারীর হাতের ছোঁয়ায় শিল্প রূপময়তার দিক দিয়ে উৎকর্ষ লাভ করলেও কোনো নারী স্বাতন্ত্র্য প্রকাশিত হয় না। অথচ নারীর ভূমিকা ও যে লোক সংস্কৃতির বিভিন্ন আঙ্গিকে সক্রিয় রয়েছে তা স্বীকার করতে হবে। লোকসংস্কৃতির বিশিষ্ট উপাদান লোকশিল্পের চর্চায়

নারীর ভূমিকা প্রসঙ্গে আলোচনায় দুটি ভাগে. ভাগ করা যায়- নারী-পুরুষের সহযোগী শিল্পী ও একক শিল্পী রূপে নারী।

নারী-পুরুষের সহযোগী শিল্পী : ডোকরা শিল্প-

ডোকরা শিল্পী ভ্রাম্যমান যাযাবর গোষ্ঠী ও ধাতুশিল্পী। পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলার দরিয়াপুর, আউসগ্রাম, বাঁকুড়া জেলার বিকনা,লক্ষীসাগর, পুরুলিয়া জেলার ণডিহা,আকরো প্রভৃতি স্থানে বসবাস করেন। ডোকরা শিল্পের সবচেয়ে জনপ্রিয় দ্রব্য গুলি হল- হরেক রকম ঘোড়া, ভিন্ন ভিন্ন ভঙ্গীমায় সিংহ,হাতি,পেঁচা,বাঁদর, প্রভৃতি. জীব জন্তুর মূর্তি, লক্ষীর সাজ, সরস্বতী, ভগবতী,কার্তিক, গণেশ, পেঁচা, পায়রা, ময়ূর, গরুড়, ঘট, বংশী বদন কৃষ্ণ, দশভূজা দুর্গা, আদিবাসী রমনী, বিভিন্ন ভঙ্গীমার গহনা, চুল বান্ধায় ব্যস্ত নারী, দোতারা হাতে বাউল, গরুর গাড়ি, বান্দরে টানা রিকশা, ফুলদানি গয়নার বাক্স, পানের ডিব্বা, আরো কত কি।

এই ঢালাই পদ্ধতি মূলত এক আদিবাসী প্রথা নিদর্শন বৈদিক যুগে নাম এর 'মধুচ্ছষ্ট বিধান'(১)। যে পদ্ধতিতে ডোকরা তৈরি হয় তা হলো- মাটির পুতুল তৈরি, মোম তৈরি, রজন বা মোমের মডেল তৈরি, মাটির ছাঁচ তৈরি, পিতল ভরা, শালকরা, (আগুনে জালানো ও পিতল গলানো) পিতল গলা নিশ্চয়তার পরীক্ষা করা, ঢালাই করা, ঢালায় কাজটির পরিমার্জন করা (নালী ভাঙ্গা ও ঘসা-মাজা) ডোকরা কাজ সম্পূর্ণ। এই ১০টি ধাপে কাজটি সম্পন্ন হয় তার মধ্যে তিনটি ধাপ ছাড়া অর্থাৎ চুল্লির গনগনে আগুনের সামনে মূর্তি গুলিকে প্রবেশ করানো এবং চুল্লি থেকে মূর্তিগুলি বের করার ক্ষেত্রে এবং মাটি সংগ্রহ করার ক্ষেত্র ছাড়া বাকি সম্পূর্ণ কাজটিতে নারীর ভূমিকায় প্রধান। নারীর ভূমিকা এই শিল্পে পরিব্যাপ্ত হচ্ছে নারীর দক্ষতা ও যোগ্যতা নারীর অবস্থান কে অন্য মাত্রায় তুলে ধরতে যেসব জায়গায় পুরুষের একাধিপত্য ছিল সেখানে নারী নিজেকে প্রতিষ্ঠা করেছে। যেমন রাষ্ট্রপতি পুরস্কার প্রাপ্ত শিল্পী গীতা কর্মকার এর কথা উল্লেখ করতে হয় যিনি ডোকরার সমস্ত কাজ নিজ হস্তে সম্পাদন করেন এটাই নারীর মর্যাদার আসনে আশাপ্রদ অগ্রগতি।

মৃৎশিল্প - মৃৎ শিল্পের ক্ষেত্রে নারীর সক্রিয় ভূমিকা রয়েছে। কিছু মৃৎশিল্প রয়েছে যেগুলি চাকার সাহায্যে তৈরি করা হয়। চাকা ঘোরানো যেহেতু প্রচন্ড শারীরিক পরিশ্রমের কাজ এইজন্য পুরুষেরা এই কাজ করে। তবে নকশা বানানোর ক্ষেত্রে ও কাজ টিকে সুন্দর ভাবে উপস্থাপনা করার ক্ষেত্রে নারীর ভূমিকা অনস্বীকার্য। মাটি মৃৎশিল্পের উপযোগী হওয়ার পর থেকে সব কাজে নারীরা সক্রিয় ভূমিকা পালন করে থাকে। মৃৎশিল্প তাই নারী-পুরুষের যৌথ শিল্প কর্ম।(২)

বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, বীরভূম জেলায় ভাদু পরব প্রচলিত রয়েছে। তবে সবচেয়ে বেশি প্রচলিত রয়েছে বাঁকুড়া জেলায়। নারীরাসারা ভাদ্র মাস ধরে এই উৎসব পালন করেন। ভাদু মূর্তি তৈরিতে অনেক সময় নারীকে দেখা যায়। তবে চক্ষুদান পুরুষেরা করে। এক্ষেত্রে একটি ট্যাবু কাজ করে। মনসাচালী, মনসামেড় অপরূপ মৃৎশিল্প।

ফনাযুক্ত সাপের প্রতিমূর্তি পরপর সাজিয়ে তৈরি হয় এই চালী। ঘট ও সাপের মূর্তি নারী ও পুরুষ উভয়ের তৈরি করে। বাঁকুড়ার পাঁচমুড়া, সোনামুখী, উলিয়াড়া, বিষ্ণুপুর,রাজগ্রাম এর ঘোড়া ও হাতি পুজোতে ও গৃহ সজ্জায় কাজে লাগে। এই কাজটিতে উভয়ের অবদান থাকে। বাঁকুড়ার মেটালা গ্রামের বিমুর্ত নারী মূর্তি, পাঁচমুড়ার পুতুল ও বোঙা পুতুল নির্মাণ করার ক্ষেত্রে ও নারী ও পুরুষ উভয়ের প্রচেষ্টার ফলশ্রুতি।সেই সঙ্গে কাঠের পুতুল তৈরিতে সবচেয়ে বেশি অংশগ্রহণ করে মেয়েরা। বিষ্ণুপুর ও বেলিয়াতোড় এ তৈরি হয় কাঠের পুতুল।নরম কাঠ কেটে ছেনি বাটালি ও হাতুড়ির সাহায্যে পুতুলের রূপ দান করা থেকে, রং দেওয়ার কাজ পর্যন্ত করে নারীরা।(৩)

এরপর আসি মালা শিল্পে। মালা শিল্প সুখ-দুঃখ প্রেম -অপ্রেম,স্মৃতি-বিস্মৃতির প্রতীক। মালা আবার বৈষ্ণবদের নিত্য সঙ্গী। কণ্ঠে মালা ধারণ ধর্মীয় আচার এর মধ্যে পড়ে।বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই গৃহিণীর এবং অল্প বয়সী মেয়েরা বাড়িতে বসে মালা কাটার কাজ করে। পুরুষেরা কাঁচামাল সংগ্রহ করেন। বাঁকুড়া জেলার জয়পুর থানার পিড়রাবনি, রাউতখন্ড, নতুনগ্রাম বালি যাড়া,কেয়াবতি, জামজুড়ি, বুলনপুর, মালাতোড়, সিমলাপাল,লক্ষীসাগর, তালডাংরা, বিবড়দা, গঙ্গাজলঘাটি,ইন্দপুর, খাতড়া ও অন্যান্য থানার বহু গ্রামে মালা কাটার রেওয়াজ আছে। বিশেষত মুসলমান মেয়েরা এই কাজে বিশেষ পারদর্শী ও আগ্রহী। হিন্দুমেয়েরা ও মালা কাটেন বিশেষত যারা জাতিতে বৈষ্ণব।মালার সূক্ষ্ম দানা কাটতে তারা অদ্বিতীয়।

বেলমালা আবার সবচেয়ে বেশি চালু মালা। তারপর কুড়চি মালা ও তুলসী মালা। এছাড়া মালা বা মালার দানা বসিয়ে জানালা দরজার পর্দা, দেওয়াল ঢাকা প্রভৃতি সাজানো হয়। সাবু দানার বদলে বেলের দানা বসিয়ে পাঞ্জাবিরচেকনাই বাড়ানো হয়। মানুষের জীবন-জীবিকার প্রশ্নে হিন্দু মুসলমান বাছা বাছির কোন ব্যাপার নেই। আফিয়া খাতুনরা যেমন এই কাজে সিদ্ধহস্ত,তেমনি কেয়াবতী ও পারদর্শী। কঠিন বাস্তবের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তারা মানুষের মনের খোরাক জুগিয়েছে চলেছে।

পুরুষের সহযোগী শিল্প হিসাবে **বাঁকুড়া শুশুনিয়া প্রস্তর শিল্পের** কথা উল্লেখ করতে হয়। শুশুনিয়াবাসিরা আবহমানকাল ধরে যন্ত্রপাতির নিখুঁত শৈল্পিক ব্যবহার করে চেতনার রঙে কঠিন শিলা পথে মনোমোহন মূর্তি ফুটিয়ে তুলছেন।শিলনোড়া থেকে আরম্ভ করে, গৃহস্থালি সামগ্রী, জাফরি, কলকা, দলমাদল,আদিবাসী রমনী, সাঁওতালদের বাঁধনা উৎসব, চাষী, ব্রাহ্মণী শিব দূর্গা রাস উৎসব, নৌকা বিলাস, দশমহাবিদ্যা,জন্মাষ্টমী, সুদর্শন চক্র ও মনীষীবৃন্দ প্রভৃতি নির্মাণ করে আজ শুশুনিয়া শিল্প গ্রামে পরিণত হয়েছে। শিল্পীদের রীতিসিদ্ধ শিক্ষাদীক্ষা না থাকলে ও শৈল্পিক চেতনা, স্বভাবজাত কল্পনা নৈপুণ্য, নিষ্ঠা এবং প্রচেষ্টার সম্মিলনে এখানে শিল্পীদের সৃষ্টিকর্ম প্রস্তর শিল্পের ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেছে।

শুশুনিয়ার এই প্রস্তর শিল্প পুরুষ ও নারীর যৌথ শিল্প।পুরুষ শিল্পীরা হলেন - আস্তিক সিংহ বাবু, সাগর ব্যানার্জি, মোহন দাস,জলধর বাউরি, সনাতন কর্মকার, পঞ্চানন কর্মকার, মানিক কর্মকার, ও বংশধরেরা আরো অনেকে মহিলা শিল্পীরাও কিন্তু পিছিয়ে নেই যেমন -শ্রীমতি অর্চনা কর্মকার, শ্রীমতি নয়ন কর্মকার, শ্রীমতি অঞ্জু কর্মকার, ও বংশধরেরা। এছাড়া আরো অনেক মহিলা শিল্পী আছেন। ইনারা শুশুনিয়া পাহাড়ের নিচে নিজেদের বানানো স্টলে বসে নিজেদের বানানো শিল্প সামগ্রী বিক্রি করেন।এদের হাতের শিল্প সুষমামণ্ডিত শিল্প কাজ শুশুনিয়ার প্রস্তর ভূমিতে যেন তপবনের অনুষঙ্গ নিয়ে আসে।

নারী-পুরুষের সহযোগী আরেকটি শিল্প হল কেঞ্জাকুড়ার বাঁশ শিল্প। কেঞ্জাকুরা ছাড়া বিষ্ণুপুর, সোনামুখি,রাধানগর,ময়নাপুর, বালসি,ও উলিয়াড়াই বাঁশের কাজ হয়। তবে কেঞ্জাকুড়ার শিল্প ধারাটি নান্দনিক ও বাজার বিচারে শিল্পজগতে নিজের জায়গা করে নিয়েছে। এখানে বাঁশের তৈরি ঘর সাজাবার নানা ধরনের সৌখিন জিনিস তৈরি করা হচ্ছে. যেমন -গরুর গাড়ি,পেখম তোলা ময়ূর, কলমদানি, ছোট বড় নৌকা, মনীষী, তাজমহল, দেবদেবী, ডেট ক্যালেন্ডার, ইত্যাদি সামগ্রী বাঁশ এর সাহায্যে তৈরি করা হচ্ছে।বর্তমানে কেঞ্জাকুড়া ও সন্নিহিত এলাকার বহু পরিবার শিল্পটির উপর নির্ভরশীল। এখানে এক ডজন বংশ শিল্পের প্রতিষ্ঠান রয়েছে যথা (১) উমাশ্রী শিল্প নিকেতন (2)আলোক শিল্প কুটির (৩)তারামা শিল্পশ্রম (৪)আলাপ শিল্প নিলয় (৫) হ্যান্ডিক্রাফট সেন্টার(৬) সন্তোষী মাতা শিল্পাশ্রম (৭)আশিস শিল্প নিকেতন (৮) জ্যোতির্ময়ী শিল্প নিকেতন (৯) রুপম হ্যান্ডি ক্রাফট(১০) পুষ্পশ্রী শিল্প নিকেতন (১১)হস্তশিল্প (১২) রামকৃষ্ণ শিল্প নিকেতন।এই বাঁশ এর শিল্পজাত সামগ্রীর কেনাবেচার ক্ষেত্রে সরকারি সংস্থা মঞ্জুষা ও বঙ্গশ্রী রয়েছে কলকাতায়। এছাড়া পর্যটন প্রিয় মানুষেরা খুচরো খরিদ্দার। বিভিন্ন মেলাতে ও কেনাবেচা চলে। দীর্ঘদিনের শিল্প সাধনা, জ্ঞান, নৈপুণ্য, নান্দনিক চিন্তা ও নিষ্ঠার মাধ্যমে নারী ও পুরুষ উভয়ের মিলে এই শিল্পটিকে বিশ্বের বাজারে চাহিদা যুক্ত করে তুলেছে।

লোক শিল্প ক্ষেত্রে একক শিল্পী রূপে নারী :-

বাংলার লোকশিল্পী এ সমানভাবে অংশগ্রহণ করে এসেছে নারীরা। আর্থিকভাবে অসচ্ছল নিম্নগতির গ্রামীণ নারীরা লোকশিল্প সৃষ্টির প্রাথমিক পর্যায় থেকে শেষ পর্যন্ত পরিশ্রম ও সৃষ্টিশীল চিন্তা ক্রিয়াশীল রেখেছে নারীর মধ্যে। আবার উচ্চকোটির নারীরাও আলস্যে জীবন যাপন করেনি তারাও লৌকিক শিল্পসৃষ্টির নানা পথ আবিষ্কার করেছে। একক শিল্পী হিসাবে নারীর ক্ষেত্রে যেসব ভূমিকা পায় তা হল নকশি কাঁথা, আসন, সূচিশিল্প, রান্নাবান্না, পিঠেপুলি,গয়না বড়ি আলপনা, ইত্যাদি।এইসব শিল্প এ নারীরা শিল্পী হিসেবে ঈর্ষণীয় মর্যাদার অধিকারীনী তা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

নকশি কাঁথা - লোকশিল্পের মহিমা ও বিশেষত্ব এই যে যখন শিল্পী তার প্রয়োজনের সামগ্রীকে অপরূপ শিল্প সুষমায় ফুটিয়ে তোলেন। এরকম এক শিল্পসামগ্রী

হলো নকশিকাঁথা।বাঙালি নারী তার অবসরকে বৃথা অপব্যয় না করে সৃষ্টিশীল করে তুলেছিল নকশী কাথার মাধ্যমে। তার প্রমাণ পায় গুরুসদয় দত্ত এর প্রদর্শনশালায় নকশী কাথার অপরূপ নিদর্শন এর মাধ্যমে, এর সাথে সাথে আচার্য যোগেশচন্দ্র পুরাকীর্তি ভবন, বিষ্ণুপুর শাখাতে এর নিদর্শন রয়েছে যা দেখে অভিভূত হতে হয়। নকশিকাঁথার যে অপরুপ মূর্তি, প্রকৃতি, দৈনন্দিন গৃহকর্মে ফুটে ওঠে তার পেছনে রয়েছে কাথার ফোড় এর কারুশিল্প। কাঁথা সেলাই এ ফোড় এই প্রধান। এই ফোঁড় গুলি হল বাঁশপাতা ফোঁড়, রান ফোঁড়,লহর তোলা, কবুতর খোপ,কাস্তে সেলাই,চট সেলাই, সুজনি সেলাই, ডবল রান ফোঁড়,বোতাম ঘর, পাঁচ ফোঁড়, ভরাট ফোঁড়,বরফি ফোঁড়, ডাল ফোঁড়, গাঁট ফোঁড় ইত্যাদি। এই ফোঁড় গুলির আবিষ্কারক বাংলার নারী সমাজ। এই ফোঁড় গুলির জন্য এই নকশী কাথার বৈচিত্র সৃষ্টি করে ও অপূর্ব শিল্প সুষমা লাভ করে।

কাঁথা শিল্পের কারুকর্মের নকশা কে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা চলে। (১) পুনরাবৃত্তি (২)জ্যামিতিক(বৃত্ত, ত্রিভুজ আকৃতির, আয়তাকৃতির,)(৩) প্রাকৃতিক, (৪)জীবজন্তু বা মানুষের প্রতিকৃতি(৫) প্রতীক।কাঁথায় প্রধানত উজ্জ্বল রঙ ব্যবহৃত হয়। তাই লাল, নীল, হলুদ ইত্যাদি রঙের প্রাধান্য বেশি হলে ও কমলা, গোলাপি, ইত্যাদি রঙের ব্যবহার চলে। হাটে বাজারে নানা রঙের সুতো বিক্রি হলো ও গ্রাম বাংলার নারীরা যা করে তা হল ঘরের মেঝেতে পা মেলে পায়ের আঙুলের সঙ্গে সুতোর এক কণা জড়িয়ে এক একটি আঙ্গুলের মধ্যে আটকে দুটো দুটো পাট দেওয়া সুতো একত্রে করে উল্টো পাক দেওয়া হয়।এইভাবে সুতো তৈরি হলে তাদের হাতের কব্জিতে জড়িয়ে আবার পাকিয়ে রাখা হয়। কাঁথা সেলাইয়ের সময় সুতোর গোলা খুলে ইচ্ছেমতো কাজে লাগানো হয়। কাথা সেলাই এর সময় ছুঁচ গুলো তেল দেওয়া শিশিতে পুরে রাখা হয় যাতে করে মরচে ধরে না যায়

অধিকাংশ প্রমাণ আয়তনের কাথার মধ্যভাগে প্রস্ফুটিত পদ্মের চতুর্দিকে জীবজন্তু মানুষ প্রভৃতি অঙ্কিত হয়। আর যেসব নকশা অঙ্কিত হয় তা হলো- মাছ,গাছের পাতা,ধানের ছড়া, চাঁদ, তারা, ঘোড়া,হাতি, দেবদেবী,গ্রামের প্রাকৃতিক ঘটনা, মন্দির, মসজিদ, দুষ্মন্তের সভায় শকুন্তলা, ভিখারি, সাহেব, রাম সীতার বিয়ের নকশা, যুদ্ধের দৃশ্য, রথের মেলা, রাজা রানীর দৃশ্য, বিয়ের লোকাচার, ভালোবাসার গল্প ইত্যাদি।

শীত ঋতুতে রাতে শরীরকে উষ্ণ রাখার কারণে এই কাথার উদ্ভব হলো ও কৃষিভিত্তিক গ্রাম বাংলার পরিবেশে মূলত তা কাঁথা শিল্পীর মনের প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠে(৫)। শহুরে জীবনের জটিলতা যুক্ত নারী জীবন চর্যায় গৃহ ও অন্যান্য কাজের পর অখন্ড মানসিক অবসরে দিনের পর দিন রাতের পর রাত মনের মধ্যে যা খেলা চলতে থাকে তাকে সময়ের প্রবাহমানতা নিসর্গ প্রকৃতি ও বিশ্ব প্রকৃতির সঙ্গে সুতোই বাধা মন ই তাকে সৃষ্টিকর্মের পূর্ণ রূপ দান করে। বর্তমানে কাঁথা শিল্পের স্টিচ আধুনিক সাজ

পোশাকের মধ্যে স্থান করে এক অনন্য মাধুর্য লাভ করেছে।এখানেই নারীর লোকশিল্পীর মহিমা ও বিশেষত্ব।

নকশী শিকা - গ্রাম বাংলার মেয়েরা পানের বাটা, জলপাত্র, হাঁড়ি,কাঁথা-বালিশ বই ইত্যাদি রাখার জন্য নানা শিল্প শোভিত শিকা তৈরি করে।পাট দিয়ে তৈরি শিকা হলো ও শন নারকেল দড়ি খড় বা ঘাস দিয়ে তৈরি হয়। শিকা আবার কখনও সুতো, পুতির মালা, ঝিনুক কড়ি ইত্যাদি দ্বারা শোভিত করা হয়। নানান বিনুনির মাধ্যমে নকশা তৈরি হয়। নকশাগুলি নানাবিধ ফুলের নামে চিহ্নিত হয়। যেমন টাকাফুল, তারা ফুল, পুঁতি ফুল, চড়া ফুল ইত্যাদি। নারীর মনের অনন্য সৌন্দর্যের শিল্পকর্ম এই নকশী শিকা ।

খাদ্য নির্মাণশৈলী - রান্নার কৌশল ও খাদ্য সুস্বাস্থ্য করার প্রক্রিয়া নারীরাই আবিষ্কার করেছেন। দরিদ্র উচ্চ যে কোন শ্রেণীর মানুষের কাছে খাদ্য প্রস্তুতকারী হলেন নারী। খাদ্যের স্রষ্টা ও ঐতিহ্য বহনকারী হলেন নারী। লোকখাদ্য ও গ্রামীণ নারীর সম্পর্ক হল শিশু ও মায়ের মতো। নারীর প্রতিভা ও সৃজনশীলতার পরিচয় পায় রান্না করা খাদ্য দ্রব্যের মধ্যে। তবে রান্নার দ্রব্য ও উপকরণ হলেই খাদ্য যে অনির্বচনীয় সুস্বাদু হবে তা কিন্তু নয়।চাই হাতের গুন, যে গুণ সকলের থাকে না নইলে এসব বাক্য আমরা পেতাম না। 'বড় পিসির হাতের মোচার ঘন্ট ও ছোট মাসির হাতের ধোকার ডালনা কিংবা ঠাকুমার হাতের খলসে মাছের চচ্চড়ি অথবা জেঠিমার হাতের আসকে পিঠে'। এসবই অর্জন করতে হয়েছে নারীকে অনেক অভিজ্ঞতা ও পরিশ্রমের বিনিময়ে। পিঠা-পায়েস,নাড়ু, মোয়া এসবই নারীর অভিজ্ঞতার ফসল ও হাতের গুন। বাঙালি রমণীদের. শিল্প দৃষ্টির অভিনবত্ব ও অপরূপত্ব প্রকাশিত হয় নকশা ও নানা আকার প্রকারের আম সত্ব কাঁঠালসত্ব,চাঁচে তোলা মিষ্টান্ন, চন্দ্রপুলিতে। অতি সাধারন উপকরণ থেকে আজকে পিঠে, ভাপাপুলি, দুধ পুলি, পাটিসাপটা, গোকুল পিঠে, সরু চাকলি, রস বড়া, সরা পিঠে, সূর্য পিঠে, দুধের পায়েস, ছানার পায়েস, তালের রসের ক্ষীর, নারকেলের নাড়ু, তিলের নাড়ু, মুড়ির মোয়া, খইয়ের মোয়া প্রভৃতি প্রস্তুত করে যাতে বাঙালি নারীর অনন্য নৈপুণ্য প্রকাশিত হয়।

আলপনা -বাংলার নারীদের আরেকটি সম্পূর্ণ একক শিল্প হলো আলপনা।আলপনা শিল্পরীতি কৃষিকেন্দ্রিক যাদুবিশ্বাস থেকে জাত। আলপনা প্রধানত পিটুলি গলা দিয়ে বা খড়ি মাটি দিয়ে তৈরি হয়। রঙিন আলপনার কথা মঙ্গলকাব্যে পায় -বংশীদাসের মনসামঙ্গলে। আঙ্গুলের রেখা অংকনের কৌশলের আঙিনায় মেঝে ও দেওয়ালে আলপনার রূপ ফুটে ওঠে।আদিবাসী সমাজে সাদা রঙের ব্যবহার ছাড়াও লাল-নীল প্রভৃতি রঙের ব্যবহার দেখা যায়।সাধারণত উপবাস করে আলপনা দেওয়া হয়।স্নান করে শুদ্ধ দেহ-মনে এই চিত্র অংকন করার রীতি।

ব্রতের আলপনা - বাংলার ব্রতের মধ্যে চিত্রকলার এক আদি রূপের আভাস পাওয়া যায় আল্পনাতে। শুধুমাত্র ব্রত বা পূজা-অর্চনায় নয় গ্রামীণ লোকাচারের মধ্য

আলপনা গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। যেমন বিবাহ,আঁতুড়ঘরে ষষ্ঠী পূজা, অন্নপ্রাশন এমনকি পাকা দেখা বা পাত্র পাত্রী নির্বাচন উপলক্ষে আলপনার প্রচলন গ্রামীণ জীবনের অপরিহার্য অঙ্গ।এগুলিতে যেসব মোটিফ ব্যবহৃত হয় তা যেমন প্রতীকী তেমনই তার রঙ ব্যবহার ও ব্যঞ্জনাবহ। লোকায়ত সমাজে এই আলপনা দেওয়ার নৈপুণ্য চিরকালই প্রশংসনীয়।

বাংলার ব্রতের আলপনাকে বস্তুধর্মী,সজ্জ্যাধর্মী, প্রতীকী, উৎসবকেন্দ্রিক, আচারকেন্দ্রিক, আনন্দ অনুষ্ঠান কেন্দ্রিক, এরকম বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা যায়। ব্রতে যে কামনা-বাসনা সংযুক্ত থাকে তার রূপ আলপনায় চিত্রিত হয়। সেই চিত্রিতরূপ ছড়ায় ছন্দে ও ধ্বনিত হয় সব শেষে ব্রত কথা শ্রবনে তার পূর্ণতা প্রাপ্তি ঘটে।

নগর সংস্কৃতি গ্রামীণ সংস্কৃতিকে গ্রাস করে ফেললে ও বর্তমানে আলপনার আকর্ষণ যে আজও হ্রাস পায়নি। গ্রামীণ আলপনার আধুনিকীকরণ আমরা দেখতে পাই শহুরে শিল্পীদের হাতে।তবে তার নবরূপায়নে আঙ্গিক শৈলী ও প্রয়োগ কুশলতা রং তুলিতে মূর্ত হলো ও মূল চরিত্র হঠাৎ বৃত্ত,পদ্ম,সূর্য ইত্যাদি প্রতীক বা মোটিফ গুলি অপরিবর্তিত তার শাশ্বতী চরিত্রের জন্য।তাই আমরা বলতে পারি নারীদের এই আলপনা দেওয়ার রীতি ঐতিহ্যবাহী। " প্রাচীন কাল হইতে এই যে আলপনা দেওয়ার প্রথা চলিয়া আসিতেছে, ইহাতেই আমরা বিশেষ করিয়া পল্লী বালাগণের চিত্র শিল্পের প্রতি অনুরাগ ও দক্ষতা বুঝিতে পারি । "(৬)

পরিশেষে নজরুলের উক্তি দিয়ে বলতে পারি-' বিশ্বে যা কিছু মহান সৃষ্টি, অর্ধেক তার রচিয়াছে নারী, অর্ধেক তার নর।'সুতরাং লোকশিল্পীর ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম হয়নি। নারী তার নিজস্বতায় লোকশিল্পকে শিল্প সুষমায় মণ্ডিত করে তুলেছে একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

তথ্যসূত্র :

১. প্রশান্ত দত্ত,পশ্চিমবঙ্গের ডোকরা শিল্পের আদিপর্ব, লোকশ্রুতি, প্রবন্ধ সংকলন, সম্পাদনা মিহির ভট্টাচার্য,লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, প. ব. সরকার,কলকাতা, নভেম্বর ১৯৯৯. পৃষ্ঠা-৮২

২. তুলিকা মজুমদার,বাংলার লোকসংস্কৃতি ও গ্রামীণ নারী, লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার অক্টোবর ২০০৬, পৃষ্ঠা -৪৯.

৩. দীপঙ্কর ঘোষ, পশ্চিমবঙ্গের মৃৎশিল্প, লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, প. ব.সরকার, কলকাতা ডিসেম্বর ২০০২, পৃষ্ঠা-৩৫

৪. জসিম উদ্দিন,পূর্ববঙ্গের নকশী কাঁথা ও শাড়ি, বাংলার লোকসংস্কৃতি, সম্পাদনা বরুণ কুমার চক্রবর্তী ও দিব্য জ্যোতি মজুমদার,অপর্ণা ডিস্ট্রিবিউটরস, কলকাতা, ২০০৪, পৃষ্ঠা- ৫১.
৫. শীলা বসাক,বাংলার নকশি কাঁথা, আনন্দ পাবলিশার্স,কলকাতা, জানুয়ারি, ২০০২, পৃষ্ঠা ১৮৪.
৬. প্রফুল্ল কুমার দাস, চিত্রশিল্পে পল্লী রমণী, আলপনা প্রবাসী ২৫ শ ভাগ দ্বিতীয় খন্ড, চৈত্র ১৩৩২ পৃষ্ঠা-৭৬১.

গ্রন্থ ঋণ :

১. রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, শিল্প ও সংস্কৃতি বাঁকুড়া, দেব সাহিত্য কুটির প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা (২০০৩)
২. প্রদ্যোত ঘোষ, বাংলার লোকশিল্প, পুস্তক বিপণি কলকাতা -২৩,(২০০৪)

স্বাধিকার প্রতিষ্ঠা ও নিরাপত্তা প্রদান: 'শ্রম আইন' পরিপ্রেক্ষিতে ডঃ. বি. আর. আম্বেদকর

তুষার কান্তি সাহা
গবেষক, ইতিহাস বিভাগ, বিশ্বভারতী বিশ্বাবিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ: শ্রম আইন শ্রমিকদের কর্মক্ষেত্রে উপযুক্ত পারিশ্রমিক ও নিরাপদ কর্ম পরিবেশের অধিকারের নীতি নির্ধারণ করে থাকে। নীতি নির্ধারণের মাধ্যমে কর্মক্ষেত্রে শ্রমিকদের ঐক্যবদ্ধ করে রাখা তথা মালিকপক্ষ, শ্রমিকপক্ষ ও ইউনিয়নের মধ্যে মধ্যস্থতা করে থাকে শ্রম আইন। আম্বেদকর দলিত শ্রেণী ও শ্রমজীবী শ্রেণীর নেতা ছিলেন। শ্রমিক শ্রেণী শিক্ষিত হোক এবং দেশের প্রশাসনের অংশ হয়ে উঠুক এই ছিল তাঁর আশা। তিনি শিল্প সংস্থাকে একটি সমাজের অঙ্গ বলে মনে করেছিলেন এবং শিল্পে অশান্তিকে, শিল্পে নিযুক্ত ব্যক্তিদের মানসিক অশান্তির কারণ বলে মনে করেছিলেন। শ্রমিক শ্রেণীকে সংগঠিত করে শ্রমিকদের আইনত অধিকারকে তিনি প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন এবং একইসাথে শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি প্রদানের ব্যপারে লিখিতভাবে দাবিও জানিয়েছিলেন। তাঁর চার বছরের শ্রম মন্ত্রীত্বের সময় ছিল ভারতীয় শ্রমিক মুক্তির এক সুবর্ণ সময়।

মূল শব্দ : আইন, নারী, শ্রম, সন্মেলন, সংবিধান

ভূমিকা :

ডঃ ভীমরাও রামজি আম্বেদকর ১৮৯১ সালে ১৪ই এপ্রিল মধ্যপ্রদেশের ইন্দোর জেলার 'মৌ' নামে একটি গ্রামে 'মাহার' পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৪২ সালে আম্বেদকর গভর্নর জেনারেলের কার্যনির্বাহী পরিষদের শ্রম দপ্তরে শ্রম মন্ত্রীর দায়িত্ব নেন। এই পদে তিনি ১৯৪৬ সাল পর্যন্ত বহাল ছিলেন এবং স্বাধীন ভারতের আইন মন্ত্রী হয়েছিলেন। ১৯৩৫ সালে 'ভারত শাসন আইন' অনুসারে যুক্তরাষ্ট্রীয় সংবিধান লাগু হয়েছিল এবং এই সংবিধানে শ্রমকে যুগ্ম তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। আম্বেদকর শ্রমকে যুগ্ম তালিকায় রাখার ব্যপারে সহমত পোষণ করেননি। ১৯৪২ সালে তিনি অখণ্ড শ্রম আইনের পক্ষে চতুর্থ শ্রম সন্মেলনে বক্তৃতা দিয়েছিলেন এবং শ্রমিকদের স্বার্থে পূর্ণ সন্মেলন সমিতি ও স্থায়ী উপদেষ্টা সমিতি গঠনের প্রস্তাব রেখেছিলেন| ইউরোপীয় শ্রমিকদের সাথে এদেশীয় শ্রমিকদের পার্থক্য করে এদেশীয় শ্রমিকদের সামাজিক রূপে শোষণের কথা তুলে ধরেন। তিনি যুদ্ধকালীন সময়ে, আইন এবং ঔপনিবেশিক সরকারের 'শ্রমকল্যাণ' এর ধারণাগুলি কর্মসংস্থানের অবস্থার উন্নতি করে শ্রমের শর্তকে সমান করে তুলেছিলেন। শ্রম আইনের প্রর্বতনের মাধ্যমে তিনি পুঁজিপতি এবং শ্রমের মধ্যে ক্ষমতার ভারসাম্যহীনতা হ্রাস করতে চেয়েছিলেন। তাঁর অনুসারীদের প্রতি

বার্তাদিয়েছিলেন- 'শিক্ষিত হও, আন্দোলন করো, সংগঠন গড়ে তোলো'। এই প্রবন্ধে আম্বেদকরের শ্রমকল্যাণ এবং শ্রমিকদেরর প্রতি সামাজিক সুরক্ষার দিকের প্রচেষ্টাগুলি তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। এছাড়াও দেখানোর চেষ্টা করেছি আম্বেদকরের দ্বারা শ্রমিকদের স্বার্থে আইন প্রণয়নের পেক্ষাপট কী ছিল? মহিলা শ্রমিকদের জন্য তিনি কী কী আইন প্রণয়ন করেছিলেন? এবং এর সাথে সাথে তাঁর দ্বারা প্রবর্তিত শ্রম আইনের বিশ্লেষণ করার প্রয়াস করা হয়েছে এই প্রবন্ধটিতে।

বি. আর. আম্বেদকর ও শ্রম আইন :

আম্বেদকর ভাইসরয়ের নির্বাহী পরিষদের শ্রমিক সদস্য হিসেবে যোগদান করেন যখন ভারত ছাড়ো আন্দোলন শুরু হয়েছিল। তাঁর প্রয়াসে, যুদ্ধকালীন আইন এবং ঔপনিবেশিক সরকারের 'শ্রমিক কল্যাণ' কর্মসংস্থানের অবস্থার উন্নতি করে শ্রমব্যবস্থার পরিবেশ সামঞ্জস্য করণে পদক্ষেপ নেওয়া হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে তিনি শান্তিপূর্ণ যুদ্ধকালীন সুরক্ষা নিশ্চিত করার জন্য শ্রম দক্ষতা বৃদ্ধি এবং শ্রম মনোবল রক্ষার জন্য আইন প্রণয়নের উপর জোর দেন। আম্বেদকর মনে করতেন শ্রমিকরা শিল্প ও রাষ্ট্রের মোকাবিলা বা প্রতিদ্বন্দ্বী না হয়ে সহোযোগী হতে পারে। তাঁর প্রয়াসে ১৯৪৪ সালের মধ্যে শ্রমিক কল্যাণ পৃথক শিল্প বা স্থানীয় এলাকায় শ্রম আইনের ব্যবস্থাপনা এবং সরকারের কাছে সুপারিশ করার জন্য শ্রমিক কল্যাণ কমিটি নামে একটি নতুন ত্রিপক্ষীয় সংস্থা গঠন করা হয়েছিল।

ঐতিহাসিক গেইল ওমভেট বলেছেন যে ১৯৪০ এর দশক ছিল এমন একটি সময় যখন আম্বেদকরের অর্থনৈতিক চাপ একটি বড় পরিবর্তন করেছিল।[১] কার্যনির্বাহী পরিষদে শ্রমিক সদস্য হিসেবে তার অনবদ্য ভূমিকা হিসেবে উল্লেখ করা যায়। তিনি বলেন প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ভালো কিছুর সম্ভাবনায় পূর্ণ। এটি একটি নতুন আদেশ তৈরি করার অঙ্গীকার দেয়।[২] ঐতিহাসিক ইন্ডিভার কামটেকার দেখিয়েছেন যখন ব্রিটিশ শ্রমিকশ্রেণীর অবস্থার উন্নতি হয়েছে, যুদ্ধের সময় ভারতীয় শ্রমিক শ্রেণীর অবস্থার অবনতি ঘটেছে।[৩] যুদ্ধকালীন সময়ে উৎপাদনের উপর জোর দেওয়ার সময়, আম্বেদকর দেশের প্রতিষ্ঠানে আশা প্রকাশ করেছিলেন এবং রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের মাধ্যমে শ্রম সমস্যার আইনি ও প্রশাসনিক সমাধান খুঁজে ছিলেন। ১৯৪২ সালে অনুষ্ঠিত চতুর্থ শ্রম আম্বেদকরের ভূমিকা ছিল অনস্বীকার্যভাবে উল্লেখযোগ্য এবং এই সম্মেলনের আলোচনার বিষয়বস্তু ছিল- সমগ্র ভারতে অভিন্ন শ্রম আইন প্রণয়ন করার ব্যাপারে উদ্যোগী হওয়া; শ্রমিক পক্ষ ও মালিক পক্ষের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোর প্রতি আলোচনা করা; শিল্প কারখানায় বিবাদ মেটানোর জন্য একটি ধারার প্রচলন করা। চতুর্থ শ্রম সম্মেলনে আলোচনার বিষয়বস্তুর প্রতি দৃষ্টিপাত করে বোঝা যায় যে আম্বেদকর ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টিভঙ্গি রেখে ছিলেন।[৪] আম্বেদকরের মতে দুটি বিষয়ের ওপর শিল্পে শান্তি নির্ভর করে। প্রথমত, শিল্পে কর্মরত মানুষদের মনোবল বৃদ্ধি দ্বিতীয়ত, শিল্পে বিবাদ দূরীকরণের উপযুক্ত পরিকাঠামো। তিনি শিল্প সংস্থাকে একটি

সামাজিক অঙ্গ হিসেবে বিবেচিত করে শিল্পকে সমাজ কল্যাণের আলোচনায় বিবেচ্য বিষয়বস্তু বলে গণ্য করেছিলেন।

আম্বেদকর শ্রম সন্মেলনের উদ্দেশ্য দুটি সমিতির গঠনের প্রস্তাব করেছিলেন। স্থায়ী উপদেষ্টা কমিটি এবং পূর্ণ সন্মেলন রূপায়ণ।[৫] প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় সরকার, শ্রমিক প্রতিনিধি ও দেশীয় রাজ্যগুলির মালিকদের নিয়ে পূর্ণ সন্মেলন সমিতি গঠন করার কথা বলেছিলেন। বলা হয় যে এই সমিতিতে প্রতিনিধিত্ব করবেন প্রতিটি প্রদেশ এবং বড় রাজ্য ও শ্রমিক শ্রেণী, মালিক শ্রেণী ও মূল সংগঠনগুলি প্রতিনিধি পাঠাতে পারবেন। স্থায়ী উপদেষ্টা কমিটির খসড়াতে বলা হয় যে ভারত সরকারের প্রতিনিধি ও প্রাদেশিক সরকার নিয়ে এই কমিটি গঠন হবে; শ্রমিক শ্রেণী, মালিক শ্রেণী ও দেশীয় রাজ্যগুলির প্রতিনিধি এই কমিটিতে থাকবেন। আন্তর্জাতিক শ্রম দপ্তরের পরিচালক সমিতির অনুসরণে এই স্থায়ী উপদেষ্টা কমিটির গঠনতন্ত্র রচনা করা হয়েছিল। লীগ অব নেশনস-এর আন্তর্জাতিক শ্রম দপ্তরের অনুসরণ করেই স্থায়ী উপদেষ্টা কমিটিতে ১০ জন এবং বাকি ১০ জন শিল্প সংস্থা থেকে নির্ধারণ করা হয়। সংরক্ষণ নীতির মাধ্যমে ১৬ টি সরকারের প্রতিনিধি আসনের মধ্যে ৬ টি আসন অ-ইউরোপীয় রাজ্যগুলির জন্য নির্ধারিত হয় এবং মালিক পক্ষের জন্য ২ টি আসন অ-ইউরোপীয় রাজ্যের প্রতিনিধিদের জন্য নির্ধারিত হয়। লন্ডনে আয়োজিত গোলটেবিল সন্মেলনে হতাশাগ্রস্ত শ্রেণীর জনপ্রতিনিধি হিসেবে আম্বেদকর বলপূর্বক জীবনযাত্রার মজুরি, কাজের উপযুক্ত পরিবেশ এবং জমিদারের হাত থেকে কৃষকদের মুক্তির আবেদন করেছিলেন। ১৯৩৭ সালে সেপ্টেম্বর মাসে বোম্বে অ্যাসেম্বলির পুনা অধিবেশন চলাকালীন তিনি কোঙ্কনের ভূমি শাসনের *কোঠি* প্রথা বিলুপ্ত করার জন্য একটি বিল পেশ করেন। ১৯৪৫ সালে নভেম্বর মাসের ২৬ তারিখে নয়াদিল্লীতে অনুষ্ঠিত ভারতীয় শ্রমিক সন্মেলনে ভাষণ দিতে গিয়ে আম্বেদকর প্রগতিশীল শ্রমিক কল্যাণ আইন প্রণয়নের প্রয়োজনের ওপর জোর দেন।

১৯৪২ সালে অনুষ্ঠিত ত্রিপাক্ষিক শ্রম সন্মেলনে একটি স্থায়ী কমিটি এবং একটি পূর্ণাঙ্গ সন্মেলনের গঠনের প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। AITUC (নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস)-এর সভাপতি ভি. ভি. গিরি বলেন এই সন্মেলন শুধুমাত্র আলোচনাতেই সীমাবদ্ধ না থেকে শিল্পে শান্তি স্থাপনেও শ্রমিকদের অবস্থার উন্নতি ঘটাবে।[৬] চা শিল্পে শ্রমিক কল্যাণের বিষয়ে তিনি বলেন, 'একটি নির্দিষ্ট মানের শ্রমিক কল্যাণ চা চাষের ক্ষেত্রে থাকা উচিত। অন্যথায় সমস্যা হবে|' ১৯৩৬ সালে আম্বেদকর ইন্ডিপেন্ডেট লেবার পার্টি গঠন করেন। উদ্দেশ্যে ছিল, "দরিদ্র ও অস্পৃশ্য জাতি অপেক্ষা বৃহত্তর কর্মসূচীতে 'শ্রমিক শ্রেণীর মঙ্গলের জন্য' সমবিষ্ট করা|"[৭] ১৯৩৭ সালে ইন্ডিপেন্ডেট লেবার পার্টি বোম্বে লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলি ১৭টির মধ্যে ১৫টি আসনে জয়লাভ করে। শ্রমজীবী মানুষের মর্যাদা ও অধিকার ফিরিয়ে দেবার জন্য তিনি নির্দেশিকা ও আইন কার্যকর

করেন। তাঁর সংস্কারমূলক পদক্ষেপগুলো শ্রমজীবী সাধারণ মানুষের রক্ষাকবচ হিসেবে কাজ করেছিল। ১৯৩৭ সালে আম্বেদকর ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডিসপিউটস বিলে'র বিরোধীতা করেন। কারণ এই বিলে শ্রমিকদের ধর্মঘট করার অধিকার ছিনিয়ে নেওয়ার কথা বলা হয়েছিল।

সরকারে শ্রম নীতির মৌলিক নীতির মৌলিক কাঠামোর ভিত্তি স্থাপন করে শ্রমিক কল্যাণের জন্য তিনি ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। আম্বেদকর, ইন্ডিপেন্ডেন্ট লেবার পার্টি থেকে ভারতে ঔপনিবেশিক সরকারের সদস্য হিসেবে সংবিধান পরিষদে বর্ণনা করেছিলেন কিভাবে শ্রম আইন শুধুমাত্র কাগজে কলমে রয়ে গেছে। ফলস্বরূপ, তিনি শ্রম আইন প্রণয়ন ও প্রয়োগের বৃহত্তর ক্ষমতার সাথে একটি শক্তিশালী ভবিষ্যত রাষ্ট্র তৈরি করতে চেয়েছিলেন। ১৯৪২ সালের জুলাই থেকে ১৯৪৬ সালের জুন মাস পর্যন্ত বা প্রায় চার বছর ধরে ভারতীয় শ্রম সম্মেলন চার বার অনুষ্ঠিত হয়েছিল যথাক্রমে- আগস্ট ১৯৪২, সেপ্টেম্বর ১৯৪৩, অক্টোবর ১৯৪৪ এবং নভেম্বর ১৯৪৫ ও স্থায়ী শ্রম কমিটি আটবার মিলিত হয়েছিল। উপদেষ্টামূলক সুপারিশ গুলির মাধ্যমে তারা শ্রম এবং নিয়োগ কর্তাদের বোঝানো এবং প্রভাবিত করার পাশাপাশি সরকারি সিদ্ধান্ত গুলিকে ব্যপকভাবে প্রভাবিত করেছিল। শ্রমমন্ত্রী থাকাকালীন সময়ে আম্বেদকরের সংস্কারমূলক আইনগুলির মধ্যে ছিল- মেটার্নিটি বেনেফিট অ্যাক্ট; উইমেন অ্যান্ড চিলড্রেন লেবার প্রোটেকশন অ্যাক্ট; ইন্ডিয়ান ফ্যাক্টরি অ্যাক্ট; ইন্ডিয়ান ট্রেড ইউনিয়ন অ্যামেন্ডমেন্ট বিল; লেবার ওয়েলফেয়ার ফান্ড; কোল এন্ড মাইকা মাইন প্রোভিডেন্ট ফান্ড; হেলথ ইন্সুরেন্স স্কিম; লেবার ডিস্পিউট অ্যাক্ট; লিগাল স্ট্রাইক অ্যাক্ট; প্রোভিডেন্ট ফান্ড অ্যাক্ট ও ডিয়ার অ্যালোয়েন্স ইত্যাদি।[৮]

আম্বেদকর বি. পি. আগরকারের অধীনে শ্রমিক কল্যাণ থেকে উদ্ভূত বিষয়গুলির বিষয়ে পরামর্শের জন্য একটি উপদেষ্টা কমিটি গঠন করেছিলেন এবং শ্রম মন্ত্রী হিসাবে সর্বভারতীয় শ্রমিক ইউনিয়ন কংগ্রেসের তৎকালীন সভাপতিকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। পূর্ব এশিয়ার দেশগুলির মধ্যে, কর্মচারী রাজ্য বীমা (ই.এস.আই) আইনের মাধ্যমে কর্মচারীদের সুস্বাস্থ্যের জন্য ভারত প্রথম দেশ ছিল। আম্বেদকর প্রতিটি প্রদেশে ত্রিপাক্ষিক শ্রম সম্মেলন প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন, যার মধ্যে ছিল সরকারি প্রতিনিধি, মালিক এবং কেন্দ্রীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত সংগঠনের অনুরূপ কর্মচারী।[৯]

১৯৪৩ সালে দিল্লীতে ইন্ডিয়ান ফেডারেশন অব লেবার- এর উদ্যোগে অনুষ্ঠিত অল ইন্ডিয়া ট্রেড ইউনিয়ন ওয়ার্কাস স্টাডি ক্যাম্পের অধিবেশনে আম্বেদকর বক্তৃতায় বলেছিলেন যে, 'ইতিহাসের অর্থনৈতিক ব্যাখা পুরোপুরি ঠিক বলে প্রতিপন্ন না হয় তবে তার জন্য শ্রমিক শ্রেণীর ব্যর্থতাই দায়ি, সমগ্রভাবে এই শ্রেণির অর্থনৈতিক বিষয়ে সহযোগী জীবনের ধারা নির্ধারণের মূখ্য শক্তি করে তুলতে ব্যর্থ হয়েছে|' রুশোর 'সোস্যাল কন্ট্রাক্ট', জন স্টুয়ার্ট মিলের 'অন লিবার্টি', মার্কসের 'কম্যুনিষ্ট ইস্তাহার', পোপ

লিও-র 'এনসাইক্লিকাল অন দ্য কনডিশনস্ অব লেবার' এই চারটি বই ছিল আম্বেদকরের কাছে আধুনিক যুগের সামাজিক সংগঠন বিষয়ে মৌলিক কর্ম সূচিগত দলিল স্বরূপ।[১০] শ্রমিকদের দুর্বলতার কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন শ্রমিকরা নিজেদের স্বার্থরক্ষার জন্য সরকার নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে তার প্রত্যয়ী নয় এবং শ্রমিকরা সহজেই জাতীয়তাবাদী ডাকে বিপথে চালিত হয়। ভারতের শ্রমিকদের লক্ষ্য অর্জনের জন্য শুধুমাত্র ট্রেড ইউনিয়নের গঠনের ধারণা ত্যাগ করতে বলেন। যদিও তিনি ট্রেড ইউনিয়নের বিরুদ্ধে ছিলেন না। তিনি মনে করেছিলেন যে ট্রেড ইউনিয়ন সরকার নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে কাজ না করলে ট্রেড ইউনিয়নের দ্বারা শ্রমিকদের সামান্য উপকার হবে।

১৯৪৪ সালে কেন্দ্রীয় বিধান সভায় শ্রমিকের প্রতি সরকারের নীতি প্রসঙ্গে বক্তৃতা দিতে গিয়ে তিনি যুদ্ধকালীন আইন পর্যালোচনা করে স্বীকার করে নিয়েছিলেন যে যুদ্ধকালীন আইন শ্রমিকদের স্বাধীনতা খর্ব করেছে। কিন্তু এর সাথে দুটি নতুন নীতির উদ্ভবের কথা তিনি বলেছিলেন। প্রথমত, সরকার এই প্রথমবার শ্রমিক নিযুক্তির শর্ত কী হবে তা নির্ধারণ করার দায়িত্ব নিয়েছিল এবং আগের শ্রমিক আইনে এই নীতি ছিল না। দ্বিতীয়ত, বাধ্যতামূলক সালিসি নীতির কথা উল্লেখ করেন। আম্বেদকর বলেন, 'ভারত রক্ষা বিধির ৮১ তম বিধি প্রদত্ত সরকারকে বাধ্যতামূলক সালিসির ক্ষমতা আমার মতে শ্রমিকের পক্ষে সবচেয়ে বড়ো সুবিধা|'[১১] এই নীতি স্মরণ করিয়ে তিনি বোঝাতে চেয়েছিলেন যে মালিকদের কাছে কিছু সুযোগ সুবিধা আদায় করার জন্য শ্রমিকশ্রেণী ধর্মঘটের মধ্য দিয়ে সুবিধা আদায় করতে পারবে। প্রধান শ্রম কমিশনার, প্রাদেশিক শ্রম কমিশনার ও শ্রম পরিদর্শক ইত্যাদি প্রথম তাঁর আমলে নিযুক্ত হয়েছিলেন। শ্রমিকদের স্বার্থে সহায়ককারী শ্রম বিরোধ, মজুরি হার, আয়, মুদ্রাস্ফীতি, ঋণ, কর্মসংস্থান, আমানত এবং অন্যান্য তহবিলের বিষয়ে শ্রম পরিসংখ্যান মূল্যায়নের জন্য তাঁর 'শিল্প পরিসংখ্যান আইন, ১৯৪২' প্রণীত হয়েছিল।

১৯৪৪ সালে এপ্রিল মাসে আম্বেদকর একাধিক বৎসর যাবৎ কারখানায় নিযুক্ত শিল্প শ্রমিকদের বেতন সহ ছুটির প্রস্তাব করে একটি সংশোধনী বিল উত্থাপন করেন।[১২] ১৯৪৫ সালে জুলাই মাসের শেষ সপ্তাহে টাটা ইনস্টিটিউট অফ সোশ্যাল সায়েন্স-এর ছাত্র ইউনিয়নের উদ্দেশ্যে ভাষণে ঘোষণা করেছিলেন যে বাধ্যতামূলক সমঝোতা বা সালিসি শ্রমিকদের জন্য একটি বড়ো সুবিধা এবং এই নীতিটিকে শ্রম বিধির একটি স্থায়ী বৈশিষ্ট্য হিসেবে গড়ে তোলার আশা তিনি করেছিলেন।[১৩] আম্বেদকর ১৯৪৫ সালের ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে বোম্বে সচিবালয়ে আঞ্চলিক শ্রম কমিশনারের সম্মেলনের উদ্বোধন করেন। উদ্বোধনী ভাষণে তিনি বলেছিলেন যে শিল্প ব্যাধি প্রশমিত বা প্রতিরোধের জন্য তিনটি জিনিস প্রয়োজন যথা, প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি; দ্বিতীয়ত, বাণিজ্য বিরোধ আইনের সংশোধন; এবং তৃতীয়ত, নূন্যতম মজুরি আইন। তিনি

বলেছিলেন যে প্রথমটি চালু ছিল, এবং তিনি আশা করেছিলেন যে বাকি দুটির জন্য প্রস্তাব দেওয়া হবে।[১৪]

নিরাপত্তা ও শ্রমকল্যান সমিতি :

বাবাসাহেব আম্বেদকর ভারতে নারী শ্রমিকদের জন্য দৃষ্টিভঙ্গি রেখেছিলেন এবং নারীশ্রমিকদের সুরক্ষার জন্য বিবিধ আইন চালু করেছিলেন। এর মধ্যে রয়েছে মাইনস মেটার্নিটি বেনেফিট অ্যাক্ট, উইমেন লেবার ওয়েলফেয়ার ফাণ্ড, উইমেন অ্যান্ড চাইল্ড লেবার প্রোটেকশন অ্যাক্ট, উইমেন লেবারের জন্য মাতৃত্বকালীন ছুটির সুবিধা, পাশাপাশি কয়লা খনিতে ভূগর্ভস্থ কাজে মহিলাদের কর্মসংস্থান নিষিদ্ধকরণ এবং লিঙ্গ নির্বিশেষে সম কাজে সম বেতন। কয়লাখনিতে মাতৃত্ব আইন পেশ করার আগে আম্বেদকর একজন শ্রমিক সদস্য হিসেবে, ধানবাদে কয়লা ক্ষেত্রগুলিতে গিয়ে কাজের অবস্থা অধ্যয়ন করেছিলেন। ভারতে নারী শ্রমিকদের জন্য সেরা প্রযুক্তিগত প্রশিক্ষণ স্থাপনে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। বর্তমানে যেসব মহিলারা মাতৃত্বকালীন ছুটির সুবিধা পেয়ে থাকেন সেটি যে আম্বেদকরের অবদান সেটা মহিলারা জানেন কি?

১৯৪৩ সালে নভেম্বর মাসের ৮ তারিখে আম্বেদকর কর্তৃক প্রবর্তিত ইন্ডিয়ান ট্রেড ইউনিয়ন অ্যামেন্ডমেন্ট বিল মালিকপক্ষকে বাধ্য করেছিল ট্রেড ইউনিয়নকে স্বীকার করতে। ব্যক্তিগত সম্পত্তির অবলুপ্তি দারিদ্র্য ও দুর্ভোগের অবসান ঘটাবে এই মার্কসবাদী অবস্থান আম্বেদকর গ্রহণ করেননি এবং তিনি ‘বুদ্ধ ও কার্ল মার্কস’ গ্রন্থে কমিউনিস্টদের নীতি নির্ধারণের সমালোচনাও করেছিলেন।[১৫] ১৯৪৪ সালে ২৭ অক্টোবর দিল্লীতে অনুষ্ঠিত ত্রিপাক্ষিক শ্রম সম্মেলনে ষষ্ঠ অধিবেশনে আম্বেদকর সভাপতিত্ব করেন। এই সভায় সম্মেলনের গঠনতন্ত্র বদলানোর জন্য সুপারিশ করে সম্মেলনের এক্তিয়ার ভুক্ত বিষয়গুলিকে তিনি দুই ভাগে ভাগ করার কথা বলেছিলেন। এক নম্বর তালিকায় শ্রম আইন ও সামাজিক সুরক্ষার সংক্রান্ত বিষয় এবং দুই নম্বর তালিকায় শ্রমিক কল্যাণ সংক্রান্ত ও শ্রম আইন প্রশাসন সংক্রান্ত বিষয় রেখে শ্রমিক কল্যাণ কমিটি নামে সংস্থা সৃষ্টি করে শ্রম আইন বিষয়টি এই সংস্থায় রাখার প্রস্তাব আম্বেদকর দিয়েছিলেন। শ্রমিক কল্যাণ কমিটি যাদেরকে নিয়ে গঠন করার প্রস্তাব রেখেছিলেন তারা হলেন- সরকারের মনোনীত বেসরকারি ব্যক্তি; স্ট্যান্ডিং লেবার কমিটি কর্তৃক নির্বাচিত সদস্য বৃন্দ; পুরসভা অন্যান্য শ্রম নিয়োগকারী সংস্থা ও সংগঠিত শিল্প সংস্থা থেকে একজন করে মালিক প্রতিনিধি ও শ্রমিক প্রতিনিধি; প্রাদেশিক সরকারের প্রতিনিধিবৃন্দ ও রাজ্যসমূহের প্রতিনিধিবৃন্দ।

শ্রমিকদের শারীরিক সুস্থতা ও দক্ষতা বজায় রাখার জন্য আইন মোতাবেক তাদের প্রাপ্য ছুটি দিতে হবে এবং যতগুলো বাধ্যতামূলক ছুটিতে শ্রমিকদের দিয়ে কাজ করানো হবে সমসংখ্যক অন্য দিনগুলোতে ছুটি দিয়ে তা পূরণ করতে হবে এই ছিল আম্বেদকরের মতামত। কোনো কর্মীর পদমর্যাদা ক্ষুণ্ন না করে তার বেতন যদি কেটে নেওয়া হয় এই কারণ দেখিয়ে যে কাজের জন্য তাকে নিয়োগ করা হয়েছিল সেই

কাজের জন্য সে উপযুক্ত নয়, তবে এর জন্য তাকে আগে থেকে নোটিশ দিয়ে জানাতে হবে।[১৬] আম্বেদকর স্প্রেডওভার নীতি বা কাজের সময় নির্ধারণ সংক্রান্ত নীতির সপক্ষে ছিলেন। তিনি ১৯৪৬ সালে কারখানা সংশোধনী বিধেয়ক বিতর্ক সভায় কারখানা সংশোধনী বিলে শ্রমিকদের কাজের সময় ৯ ঘন্টা নির্ধারিত করেন। এর ফলে শ্রমিকরা ৩ ঘন্টা কম সময় কারখানায় অতিবাহিত করার সুবিধা লাভ করে।

যুদ্ধে ক্ষতিপূরণ বিমা বিষয়ে আইন মোতাবেক করার সাওয়াল আমেম্বেদকর করেছিলেন। এই আইন মোতাবেক যে সমস্ত শ্রমিক যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত হবে তাদের মালিক পক্ষ ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য থাকবে। মালিকপক্ষ যাতে বিমার সুবিধা পায় সেই বিষয়টির প্রতিও নজর দেওয়া হবে বলা হয়। এই বিধেয়কটি পর্যালচনা করার জন্য একটি সিলেক্ট কমিটি গঠন ও এই কমিটিতে যমুনাদাস এম. মেহেতা, ডি. এস. যোশি, এন. এম. যোশি সহ আরও ১৪ জন সদস্য রাখার ব্যপারে প্রস্তাব করা হয়। এই সমিতিতে আবশ্যিক ৫ জন রাখার ব্যাপারে বলা হয় এবং সভাটি সিমলায় করার ছাড়পত্র দেওয়া হবে বলে জানানো হয়।[১৭] শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণ প্রদানের জন্য আম্বেদকর তিনটি প্রধান ব্যবস্থার সুপারিশ করেছিলেন যেমন প্রথমত যুদ্ধে হতাহত শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণ দেওয়া, দ্বিতীয়ত এই ক্ষতিপূরণ দিতে মালিক শ্রেণী দায়বদ্ধ থাকবে এবং তৃতীয়ত শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার জন্য মালিক পক্ষকে বাধ্য করতে হবে। ১৯৩৬ সালের ‘ইংল্যান্ডে যুদ্ধে ক্ষতিসংক্রান্ত বিবিধ' আইনের মতো এখানে প্রথম সুপারিশটি কার্যকরের জন্য নির্ধারণ করা হয়েছিল।[১৮]

আম্বেদকরের উদ্যোগে গঠিত বিভিন্ন কমিটি, ইউনিয়ন ও বিলগুলি ছিল জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে শ্রমিকশ্রেণী মানুষের কল্যাণের জন্য। তাঁর উদ্যোগে ১৯৪৩ সালে গঠিত জয়েন্ট লেবার ম্যানেজমেন্ট কমিটি কারখানা পরিচালনায় শ্রমিকদের প্রতিনিধি রাখার ব্যবস্থাপনা করা হয় এবং এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ গঠন করার মাধ্যমে শ্রমিক কর্মচারী নিয়োগের ব্যবস্থা করা হয়। শিল্প, কারখানা, অফিসে শ্রমিকদের আইনগতভাবে স্বীকৃতি দেবার জন্য তাঁর উদ্যোগেই ‘ভারতীয় শ্রমিক সমিতি বিল’ পাশ হয়, ফলে ভারতীয় শ্রমিকরা ট্রেড ইউনিয়ন করার অধিকার লাভ করে।[১৯]

শ্রমিক শ্রেণীর খাদ্য, বাসস্থান, বস্ত্র, শিক্ষা, চিকিৎসা প্রভৃতি বিষয়গুলির প্রতি বিবেচনা করে তার সুষ্ঠ ব্যবস্থাপনা করার জন্য আম্বেদকর লেবার ইনভেস্টিগেশন কমিটি গঠন করেন এবং আইন প্রণয়নের মাধ্যমে শ্রমিকদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেন। শ্রমিকদের কাজের সময়সীমা তিনি ৮ ঘণ্টা বেঁধে দেন এবং অতিরিক্ত কাজের জন্য অতিরিক্ত বেতন দেবার আইন পাশ করেন।[২০] ফ্যাক্টরিস অ্যামেন্ডমেন্ট বিল প্রণয়নের মাধ্যমে আম্বেদকর কারখানার শ্রমিকদের ১০ দিন সমবেতনের ছুটির ব্যবস্থা করেন। কয়লা খনিতে কর্মরত শ্রমিকদের আর্থিক উন্নতির জন্য কোল মাইন লেবার ওয়েলফেয়ার ফান্ড অরডিনান্স পাশ করেন। সম কাজের সম বেতনের আইন পাশ করে

নারী ও পুরুষের শ্রমিকদের কর্মক্ষেত্রে বৈষম্য দূর করার পদক্ষেপ নিয়েছিলেন। আম্বেদকর তাঁর মন্ত্রীত্বের শেষের দিকে প্রোটেকশন অব মিনিমাম ওয়েজ বিমার কথা ঘোষণা করেছিলেন। যদিও এই বিলটি স্বাধীনোত্তর ভারতবর্ষের শ্রমমন্ত্রী জগজীবন রামের সময়ে পাশ হয়েছিল। এই বিলে বলা হয়েছিল যে শ্রমিকদের বেতন নির্ধারণের জন্য অ্যাডভাইসরি কমিটি ও অ্যাডভাইসরি বোর্ড গঠিত হবে।[২১]

শ্রমিকের কাজ করার বাধ্যবাধকতা, নিয়োগ কর্তার অর্থ প্রদানের বাধ্যবাধকতা বা যুক্তিসঙ্গত মজুরি এবং শ্রমের কল্যাণ এবং রাষ্ট্রের বাধ্যবাধকতা প্রদান করে শিল্প সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণের জন্য আম্বেদকরের নীতি গুলি যুদ্ধ পরবর্তী দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে নির্দিষ্ট ভাবে প্রকাশ করা হয়েছিল।[২২] তিনি বোঝাতে চেয়েছিলেন ব্রিটিশ রাজধানী হিসেবে পরিচালিত শুধুমাত্র মতামতের সাথে ভারতীয় স্বার্থ ভিন্নতা অব্যহত ছিল কিন্তু তাদের ক্রমবর্ধমান প্রভাবশালী অংশ দ্বারা ভারতীয় সমকক্ষ ছিল।[২৩] বেশিরভাগ ঐতিহাসিক লিখেছেন যে, ভারতে ১৯৪৫ সালের পরবর্তীতে শ্রম আইনের বিবর্তনের পথ নেওয়া হয়েছিল মূলত পূর্বতন ঔপনিবেশিক সরকারের নিষেধাজ্ঞা নীতিতে প্রতিষ্ঠিত প্রতিমাণ অনুসরণে এবং বিশেষ করে যুদ্ধের বছরের আইনের।[২৪] ১৯৪৭ এবং ১৯৪৮ সালের শ্রম আইনের প্রধান অংশগুলি আম্বেদকরের তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত করা হয়েছিল।

উপসংহার :

শ্রমিক বা শ্রমজীবী মানুষরা সমাজ ও দেশের উত্থান ও অগ্রগতির মূলে থাকে। আম্বেদকরের কথা আমাদের মনের মধ্যে আসলে প্রাথমিক ভাবে আমরা তাকে দলিত শ্রেণীর নেতা হিসেবে কল্পনা করে থাকি। শ্রমিকদের সুরক্ষা ও আর্থিক অবস্থা উন্নতির জন্য তার গৃহীত পদক্ষেপগুলো আমরা প্রাথমিক কল্পনা জগতে আনয়ন করি না। ব্রিটিশ সরকারের অধীনে শ্রমমন্ত্রী থাকাকালীন সময়ে আম্বেদকর শ্রমিক শ্রেণীর জন্য গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিয়েছিলেন যেগুলো আজকের দিনে তাৎপর্য বহণ করে। আম্বেদকর নারী শ্রমিক শ্রেণীর নিরাপত্তা ও আর্থিক উন্নতির জন্য সর্বদা প্রয়াস চালিয়েছিলেন এবং শ্রমিকদের ধর্মঘটে যাবার অধিকার দিয়েছিলেন। তাঁর দ্বারা প্রবর্তিত আইনগুলো শুধুমাত্র দলিত শ্রেণীর জন্য প্রযোজ্য হয়নি। শ্রমিক ইউনিয়ন ও শ্রম আইন মান্যতা দিতে গিয়ে জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে শ্রমিকদের উন্নতির কথা ভাবা হয়েছিল। শ্রমজীবী মানুষের তিনি প্রতিনিধি ছিলেন এবং মানুষের সামাজিক মর্যাদাকে গুরুত্ব দিয়ে মানুষকে তিনি একাত্ম করতে চেয়েছিলেন ও বেগার প্রথাকে আইনত অপরাধ হিসেবে ঘোষণা করেছিলেন। ভারতীয় সংবিধান তৈরির সময় বাবা সাহেব আম্বেদকর শ্রমিক সংস্কার মূলক কাজগুলি সংবিধানে সমন্বিত করেছিলেন।

তথ্য সূত্র :

১. Omvedt, Gail, *Ambedkar: Towards an Enlightened India,* Penguin Books, New Delhi, 2004, p.106

২. Moon, Vasant (eds.), *Dr. Babasaheb Ambedkar Writings and Speeches Vol. 10,* Dr. Ambedkar Foundation (Ministry of Social Justice & Empowerment, Gov. of India), New Delhi, 2014, p.42

৩. Kamtekar, Indivar, 'A different War Dance: State and Class in India 1939-1945', *Past & Present,* 176, 2002, pp.187-221

৪. *বাবা সাহেব ডঃ আম্বেদকর রচনা- সম্ভার,* অষ্টাদশ খন্ড, ডঃ আম্বেদকর ফাউন্ডেশন, সামাজিক ন্যায় ও ক্ষমতায়ন মন্ত্রক (ভারত সরকার), নতুন দিল্লি, ২০০৪, পৃষ্ঠা. ২৯

৫. তদেব, পৃ.৩২

৬. তদেব, পৃ.৬৫

৭. Bandyopadhyay, Sekhar, *Form Plassey to Partition and After A History of Modern India,* Oriental Blackswan Private Limited, New Delhi, 2014, p.356

৮. উদ্দীপন, শরদিন্দু. *আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস ও বাবা সাহেব ডঃ বি.আর. আম্বেদকরের ভাবনা,* টিডিএন বাংলা, https://m.dailyhunt.in/news/india/bangla/tdn+bangla-epaper-tdnban/aantarjatik+shramik+dibas+o+baba+saheb+d+bi+aar+aambedakarer+bhabana-newsid-115158505

৯. Jaiswal, Shivangi, 'Labour Minister, State and The Prism of Law 1942-52', *Sudasien Chronik South Asia Chronicle,* 8, 2018, pp.233-256

১০. *বাবা সাহেব ডঃ আম্বেদকর রচনা- সম্ভার,* অষ্টাদশ খন্ড, ডঃ আম্বেদকর ফাউন্ডেশন, সামাজিক ন্যায় ও ক্ষমতায়ন মন্ত্রক (ভারত সরকার), নতুন দিল্লি, ২০০৪, পৃ.১২৫

১১. তদেব, পৃ.১২৮

১২. Keer, Dhananjay, *Dr. Ambedkar Life and Mission,* Popular Publication, Bombay, 1954, p.373

১৩. তদেব

১৪. তদেব, পৃ.৩৭৪

১৫. Narake, Hari (eds.), *Dr. Babasaheb Ambedkar Writings and Speeches Vol. 3,* Dr. Ambedkar Foundation (Ministry of Social Justice & Empowerment, Gov. of India), New Delhi, 2014, p.415,

also see in Ambedkar, Dr. B. R. *Buddha Or Karl Marx,* Samyak Prakashan, New Delhi, 2017, p.16

১৬. *বাবা সাহেব ডঃ আম্বেদকর রচনা-সম্ভার,* তদেব, পৃ.৮৭

১৭. তদেব, পৃ.৮৮

১৮. তদেব, পৃ.৯৩

১৯. হালদার, সুধীর রঞ্জন, *শ্রমমন্ত্রী ও আইন মন্ত্রী বাবাসাহেব ডঃ বি. আর. আম্বেদকর,* http://dalitliteratures.blogspot.com/2016/07/labour-law-minister-dr-brambedkar.html?m=1

২০. তদেব.

২১. তদেব.

২২. Ahuja, Ravi, 'Produce or Perish: The crisis of the late 1940s and the place of labour in Post-Colonial India', *Modern Asian Studies,* Vol. 54(4), 2020, pp.1041-1112

২৩. তদেব.

২৪. Mitchell, Richard & Others, 'The Evolution of Labour Law in India: An Overview and Commentary on Regulatory Objectives and Development', *Asia Journal of Law and Society,* Vol. 1(2), 2014, pp.413-453

বাংলার বিপ্লবী আন্দোলনে অরবিন্দ ঘোষের ভূমিকা

সম্বুদ্ধ চক্রবর্তী
এম.এ, দ্বিতীয় বর্ষ, ইতিহাস বিভাগ
বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়

জাতীয় কংগ্রেসের নরমপন্থী নেতৃবৃন্দের 'রাজনৈতিক ভিক্ষাবৃত্তি'র বিকল্পরূপে সংগ্রামশীল জাতীয়তাবাদ ভারতবর্ষের রাজনীতিতে উনবিংশ শতকের শেষ দশক থেকে আত্মপ্রকাশ করে । নরমপন্থী নেতৃবৃন্দ তাদের এই বিরোধী গোষ্ঠীকে 'চরম্পন্থী' বলে উল্লেখ করেন । বাংলায় এই সংগ্রামশীল জাতীয়তাবাদ সর্বাপেক্ষা বলিষ্ঠ রূপ গ্রহণ করেছিল । এবং এক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন অরবিন্দ ঘোষ ।

অরবিন্দ অবশ্য তিলক এবং তার অনুগামীদের 'চরম্পন্থী' বলার পক্ষপাতী ছিলেন না । তিনি 'ন্যাশনালিস্ট' বা 'জাতীয়তাবাদী' বলে উল্লেখ করতেন বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত স্বাধীনতা সংগ্রামীদের[১] । তাদের জাতীয়তাবাদী গোষ্ঠীর মধ্যে আর একটি গোপন বিপ্লবী সংস্থা ছিল । এই গুপ্ত সংস্থার সাথে যুক্ত বিপ্লবীরা সশস্ত্র সংগ্রামে বিশ্বাসী ছিলেন । ব্রিটিশ গুপ্তচর বিভাগের অফিসাররা এই বিপ্লবীদের কার্যকলাপের কড়া সমালোচনা করে জনসাধারণের নিকট তাদের হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য তাদেরকে 'টেররিস্ট', 'অ্যানারকিস্ট' বলে অভিহিত করেন । সি. আর. মিডল্যান্ড, যিনি ছিলেন ক্রিমিন্যাল ইন্টেলিজেন্সে এর ডিরেক্টর, এই বিপ্লবীদের 'রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রকারী' বলে নিন্দা করেছেন[২] । রমেশচন্দ্র মজুমদার তার 'History of the Freedom Movement in India', vol. II গ্রন্থে এই বিপ্লবীদের 'মিলিট্যান্ট ন্যাশনালিস্ট' বলে উল্লেখ করেছেন । যদিও অমলেন্দু দে এদের 'জাতীয়তাবাদী বিপ্লবী', বা 'ন্যাশনলিস্ট রেভলিউশনারি' বলার পক্ষপাতী। তবে একথা মনে রাখতে হবে যে, সংগ্রামশীল বৈপ্লবিক কর্মধারা জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার পূর্বেই মহারাষ্ট্রে আত্মপ্রকাশ করেছিল । দেশকে হিন্দুধর্মের শত্রুদের কবল থেকে মুক্ত করার জন্য বাসুদেব বলবন্ত ফাড়কে ১৮৭০-র দশকে একটি সশস্ত্র বিদ্রহে নেতৃত্ব দেন। মহারাষ্ট্রের জাতীয়তাবাদী কর্মকাণ্ডের অন্যতম পথিকৃৎ ছিলেন বাল গঙ্গাধর তিলক। তিলকের 'গণপতি' ও 'শিবাজী' উৎসব জনমনে উদ্দীপনার সঞ্চার করেছিল। তিলককে জাতীয়তাবাদী বৈপ্লবিক কর্মপন্থার প্রথম ও প্রধানতম প্রবক্তা বলা যায়[৩]।

তিলকের কার্যকলাপ অরবিন্দকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল । পিটার হীজ-এর মতে, ভারতীয় রাজনীতির সহজাত নিষ্ক্রিয়তার বিরুদ্ধে প্রথম যারা আওয়াজ তুলেছিলেন তাদের মধ্যে অরবিন্দ ঘোষ ছিলেন অন্যতম[৪] । ১৮৯৩ সালে ইংল্যান্ড থেকে ফিরে অরবিন্দ নরমপন্থী রাজনীতির বিরুদ্ধে সুসংবদ্ধ আক্রমণ চালায় । 'New Lamps For Old' ন্নামে কতগুলি ধারাবাহিক প্রবন্ধে এই সময় তিনি লেখেন যে, "কংগ্রেসের

চরিত্র মোটেই 'জাতীয়' নয়; তা বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব করে না । বরং একটিমাত্র সীমিত শ্রেণীর প্রতিনিধিত্ব করে[৫] । "অরবিন্দের মতে, সমসাময়িক কালের সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা হল নগরবাসী মধ্যবিত্তদের সঙ্গে 'সর্বহারা' শ্রেণীর একটি সংযোগ গড়ে তোলা, কারণ সর্বহারাই প্রকৃতপক্ষে পরিস্থিতির নিয়ন্ত্রক । তবে, অরবিন্দ সর্বহারা বলতে গ্রাম ও শহরের সাধারণ মানুষদের বুঝিয়েছেন এবং তাদের হিন্দু পুনরুজ্জীবনবাদী মতাদর্শে উবুদ্ধ করতে চেয়েছিলেন । অমলেশ ত্রিপাঠী উল্লেখ করেছেন, অরবিন্দ ও বাংলার অন্যান্য বিপ্লবীদের উপর দয়ানন্দ সরস্বতী, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শের অপরিসীম প্রভাব ছিল[৬] ।

কলকাতার এক অভিজাত পরিবারে সন্তান অরবিন্দ ইংল্যান্ডে তার ছাত্র জীবন অতিবাহিত করেন । ইংল্যান্ডে পাঠরত অবস্থায় তিনি 'Lotus and Dagger' নামক গুপ্ত বিপ্লবী সংস্থার সংস্পর্শে আসেন[৭] । আমেরিকান বিপ্লব, ফরাসী বিপ্লব এবং আইরিশ আন্দোলনের ন্যায় রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড সম্পর্কে ব্রিটেনে অধ্যায়নরত অবস্থায় তিনি জ্ঞানলাভ করেন । ক্রমে তার মধ্যে এই বিশ্বাস সুদৃঢ় হয় যে, ভারতেও এরকম সশস্ত্র বৈপ্লবিক আন্দোলন প্রয়োজন[৮] । স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের পর তিনি বরোদা কলেজে অধ্যাপনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন । এই সময় তিনি উদয় পুরের অভিজাত ঠাকুর সাহেব-এর সংস্পর্শে এসে বিপ্লবী কর্মকাণ্ডের সাথে সক্রিয় ভাবে যুক্ত হন । ঠাকুর সাহেব পুণা-কে একটি গুপ্ত বিপ্লবী সংস্থা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন । অরবিন্দ ১৮৯৬ সালে এই সংস্থার সভাপতি হন । পরবর্তীকালে তিনি গুজরাটের বৈপ্লবিক সংস্থার সভাপতি হিসাবেও মনোনীত হন[৯] ।

১৮৯৮ সালে অরবিন্দ যতীন্দ্রনাথ ব্যানার্জি নামক এক বাঙ্গালী তরুণকে বরোদার মহারাজার সেনাবাহিনীতে প্রশিক্ষণ লাভে সাহায্য করেন । ১৯০২ সালে অরবিন্দ যতীন্দ্রনাথকে কলকাতায় প্রেরণ করেন এবং বাংলার বিপ্লববাদ প্রচারের দায়িত্ব অর্পণ করেন । অরবিন্দ একই সাথে প্রমথনাথ মিত্র ও অন্যান্য বিপ্লবীদের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করেন । বাংলার সমসাময়িক গুপ্ত বিপ্লবী সংস্থাগুলি জাপানী ঐতিহাসিক ওকাকুরা কাকুজো-র চিন্তাধারার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিল । কাকুজো এশিয়ার উপর ইউরোপিয়ানদের কর্তৃত্বের অবসান ঘটানোর জন্য এশিয়াবাসীদের আন্দোলনের জন্য উবুদ্ধ করেছিলেন ।

যতীন্দ্রনাথ কলকাতায় এসে তরুন্দের শরীরচর্চার জন্য আপার সার্কুলার রোডে আখড়া স্থাপন করেন । এখানে মুষ্টি যুদ্ধ, মল্লযুদ্ধ, লাঠিখেলা, সাঁতার, ব্যায়াম প্রভৃতির অনুশীলন হত । যতীন্দ্রনাথকে সহায়তার জন্য ১৯০৩ সালে অরবিন্দ নিজের ভ্রাতা বারীন্দ্রকুমার ঘোষকে কলকাতায় পাঠান । বারীন্দ্রকুমার বাংলায় বিপ্লববাদী মতাদর্শের প্রচারে এই সময় উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছিলেন । ফলস্বরূপ, বাঁকুড়া, দিনাজপুর, রাঁচি, ময়মনসিংহ, ঢাকা, কৃষ্ণনগর, বসিরহাট প্রভৃতি অঞ্চলে বহু সংখ্যক সমিতি ও আখরা গড়ে ওঠে । এই সময় গগনেদ্রনাথ ঠাকুর, অবিনাশচন্দ্র চক্রবর্তী, সূর্যকান্ত

আচার্য চৌধুরী, যোগেন্দ্র চন্দ্র বিদ্যাভূষণ, সুবোধচন্দ্র মল্লিক, সখারাম গণেশ দেউকর-এর ন্যায় ব্যাক্তিবর্গ যতীন্দ্রনাথের আখড়াকে পৃষ্ঠপোষকতা করেন[১০]।

যদিও কিছুদিনের মধ্যে যতীন্দ্রনাথ ও বারীন্দ্রকুমারের মধ্যে মতান্তরের ফলে আখড়ার কার্যকলাপ স্তিমিত হয়ে যায় । বারীন্দ্র অরবিন্দের কাছে ফিরে যান । ১৯০৪ সালে অরবিন্দ ও বারীন্দ্র কলকাতায় আসেন এবং কলকাতায় গুপ্ত সমিতির কার্যকলাপ পরিচালনার জন্য প্রমথনাথ মিত্র, ভগিনী নিবেদিতা প্রমুখের সাথে একটি কমিটি গঠন করেন[১১]।

ইতিমধ্যে অরবিন্দ তার সংগ্রামী মতাদর্শ প্রচারের জন্য 'No Compromise' নামক একটি পুস্তিকা প্রকাশ করেন । এই পুস্তিকায় তিনি নরমপন্থী রাজনীতির কঠোর সমালোচনা করে সশস্ত্র সংগ্রামের করা প্রচার করেন । ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ-কে অরবিন্দ 'আশীর্বাদস্বরূপ' ব্যাখ্যা করে কলকাতার গুপ্ত সমিতিগুলিকে বার্তা দেন যে, এই ব্রিটিশবিরোধী মনোভাবকে হাতিয়ার করে সশস্ত্র বিপ্লবকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার সুযোগের সদ্ব্যবহার করা দরকার ।

১৯০৫ সালে অরবিন্দ 'ভবানী মন্দির' নামক প্রবন্ধ প্রকাশ করে সংগ্রামশীল জাতীয়তাবাদী ভাবধারায় প্রসার ঘটাতে সচেষ্ট হন । এই প্রবন্ধে তিনি দেশমাত্রিকাকে শক্তির সঙ্গে তুলনা করেন । জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে সাফল্যমণ্ডিত করতে ব্রিটিশবিরোধী চেতনার প্রসার ঘটানোর প্রয়োজনীয়তা অরবিন্দ অনুভব করেন। বিদেশী শক্তির বিরুদ্ধে সমগ্র দেশকে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য তিনি দেশমাতৃকার আরাধনার ব্রতে ভারতিয়দের দীক্ষিত করতে উদ্যত হন । ভবানী বা শক্তি মাতার আরাধনার মাধ্যমে স্বদেশের তরুণরা মৃত্যুভয়কে জয়করে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে সফল করবে এই ছিল অরবিন্দের বিশ্বাস[১২]। অরবিন্দের নেতৃতে স্বদেশী আন্দোলনের সময় বাংলার গুপ্ত বিপ্লবী সমিতিগুলি সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছিল ।

অরবিন্দ উপলব্ধি করেছিলেন শক্তিহীন ভারতীয়রা সপ্নাচ্ছন্ন । তাই এই উদ্যমহীন স্বপ্নরাজ্যের বাসিন্দাদের মনে আত্মপ্রত্যয় জাগ্রত করার জন্য প্রয়োজন 'শক্তি অর্জন' করা । অরবিন্দের নিজের ভাষায়; "...in the absence of strength we are like men in a dream who have hands but can not seize or strike, who have feet but cannot run[১৩]। " তাই ভারতের নবজন্মলাভ শুধুমাত্র অন্তরের প্রকৃত শক্তির উৎসকে অনুসন্ধান করার মাধ্যমেই হওয়া সম্ভব ।

অরবিন্দ ভারতবাসিকে তিনটি প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত করেন – (i) দরিদ্র (ii) মধ্যবিত্ত এবং (iii) সম্পন্ন শ্রেণি[১৪]। অরবিন্দ চেয়েছেন যে, বিপ্লবীরা ভারতমাতার প্রতি কর্তব্যপালন করতে এই শ্রেনীগুলির মধ্যে সমস্ত অনৈক্য দুর করবেন ও সব শ্রেণীর মধ্যে দেশপ্রেমের মহৎ আদর্শের সঞ্চার করবেন । তিনি ভারতের আধ্যাত্মিক পুনর্জাগরনের প্রতিগুরুত্ব আরোপের দ্বারা বলেন যে, ধর্মের উৎস থেকে শক্তি সঞ্চারের

দ্বারা ভারতীয়রা সমগ্র জাতির উন্নতিকল্পে পশ্চিমী বিজ্ঞানের সঠিক প্রয়োগ সক্ষম হবে। তিনি আধ্যাত্মিক উৎকর্ষের সাথে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির মেলবন্ধন ঘটানোর দ্বারা এক নতুন ভারতবর্ষ গড়ে তুলতে চেয়েছেন, যাতে একাধারে ভারতবর্ষের অতীত আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যও রক্ষিত হয় এবং অপরদিকে আর্থিক সমৃদ্ধলাভের মাধ্যমে দেশবাসীর কল্যাণসাধনও সম্ভব হয় । তাই তিনি 'Habits of Purity and self – Abnegation'- এর উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন[১৫] । ১৯০৬ সালে অরবিন্দ বরোদা থেকে কলকাতায় এসে এবং স্বদেশী যুগে প্রতিষ্ঠিত ন্যাশন্যাল কলেজের অধ্যক্ষ হন । অরবিন্দের সহায়তায় বারীন ও অন্যান্যরা 'যুগান্তর' নামে একটি সংবাদ পত্র প্রকাশকরে বৈপ্লবিক চিন্তাধারার প্রসারে উদ্যোগী হন । যুগান্তরে প্রকাশিত অরবিন্দের নানা প্রবন্ধ জনমনে উদ্দীপনার সঞ্চার করেছিল । দেশকে স্বাধীন করার জন্য এই পত্রিকা জনগণকে সশস্ত্র সংগ্রামের পথে অগ্রসর হতে উদ্বুদ্ধ করে ।

১৯০৬ সালে অরবিন্দ বরিশাল সম্মেলনে যোগদান করেন এবং বিপিনচন্দ্র পালের সঙ্গে 'স্বরাজ' ও পূর্ণ স্বাধীনতাকে তাদের লক্ষ্য হিসাবে ঘোষণা করেন । নরমপন্থীদের ঔপনিবেশিক স্বায়ত্বশাসন লাভের দাবিতে বিরোধিতা করে জাতীয়তাবাদী বিপ্লবীরা স্বনির্ভরতার নীতি গ্রহণ করেন । সরকারের সাথে পূর্ণ অসহযোগিতার নীতি গৃহীত হয় । জাতীয়তাবাদী সংস্থার মধ্যেই অরবিন্দ সশস্ত্র সংগ্রামে বিশ্বাসী আন্দোলনকারীদের জন্যে একটি গুপ্ত বিপ্লবী সংগঠন গড়েতোলেন । বিপ্লবী জাতীয়তাবাদী কর্মকাণ্ডের সাথে আয়ারল্যান্ডের সিনফিন আন্দোলনের সাদৃশ্য লক্ষ্য করে অনেকেই জাতীয়তাবাদী এই সশস্ত্র আন্দোলনকে ভারতের 'সিনফিন' আন্দোলন বলে উল্লেখ করেন । কিন্তু অরবিন্দের মতে, সিনফিনের সাথে মিল থাকলেও সিনফিনের পূর্বেই ভারতীয় জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সূত্রপাত[১৬] । বারবারা সাউথার্ডের ন্যায় ঐতিহাসিকগণ বাংলার বিপ্লবী আন্দোলনের একটি সিমাবদ্ধতার কথা উল্লেখ করেছেন । তার মধ্যে অত্যাধিক হারে হিন্দু প্রতীকের ব্যবহার এবং হিন্দু পুনররুজ্জীবনবাদী মতাদর্শের প্রসার মুসলিম সম্প্রদায়কে বিপ্লবী আন্দোলন থেকে দূরে সরিয়ে দিয়েছেন । একথা সত্য যে, প্রথম দিকে মুসলিম সম্প্রদায়ের যুবকদের গুপ্ত সমিতিতে নেওয়া হলেও মুসলিম বিপ্লবীদের সংখ্যা ছিল খুবিই নগন্য । এমনকি, অমলেন্দু দে দেখিয়েছেন যে, পরবর্তীকালে কিছুদিনের জন্য মুসলিম সদস্য নেওয়া বন্ধও হয়ে গিয়েছিল[১৭] । অপরদিকে মুসলিম সমাজ ও সশস্ত্র সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত ছিল না । কিন্তু একই সাথে মনে রাখতে হবে যে, হিন্দু- মুসলিম ঐক্যের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে অরবিন্দ যথেষ্ট সচেতন ছিলেন । অরবিন্দ তার বিপ্লবী সঙ্গিদের সাথে আব্দুল, রসুল, লিয়াকৎ হোসেন, আব্দুল হক প্রমুখ মুসলিম নেতার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল । এমনকি ১৯০৫- ০৮ সালের মধ্যে মৌলানা আবুল কালাম আজাদ যুগান্তর দলের সংস্পর্শে এসে বৈপ্লবিক চিন্তা ধারায় উদ্বুদ্ধ হন ।

মুসলিম জাতীয়তাবাদী নেতৃবৃন্দের সাথে ঐক্যবদ্ধ ভাবে স্বাধীনতা আন্দোলনকে সাফল্যমণ্ডিত করার প্রচেষ্টা যেমন একদিকে ছিল, তেমনি অন্যদিকে অরবিন্দের ন্যায় বিপ্লবীরা ঢাকার নবাব সল্লিমুল্লা-র ন্যায় মুসলিম সাম্প্রদায়িক নেতৃবৃন্দের আন্দোলন ব্যার্থ করার প্রচেষ্টার তীব্র সমালোচনা করেছিলেন। এই সময় সল্লিমুল্লা বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন ব্যার্থ করার জন্য সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় ইন্ধন দেন। প্রতিক্রিয়া স্বরূপ, সাম্প্রদায়িক ব্যাক্তির আক্রমণের হাত থেকে আন্দোলনকে রক্ষা করতে অরবিন্দ জনসাধারণকে 'লাঠি' ও 'বোমা' ব্যবহার করতে বলেন । ১৯০৬ সালের আগস্ট মাসে বিপিনচন্দ্র পাল 'বন্দেমাতরম' নামক সংবাদপত্র প্রকাশ করেন এবং অরবিন্দকে সম্পাদক হওয়ার অনুরোধ করেন । 'বন্দেমাতরম'–এ রাজদ্রোহমূলক লেখালেখির জন্য অরবিন্দকে ১৯০৭ সালে গ্রেফতার করা হয়। যদিও বিপিনচন্দ্র পাল কোর্টে সংবাদপত্রের সম্পাদকের নাম প্রকাশ করতে অস্বীকার করেন ফলে অরবিন্দ মুক্তি লাভ করেন । ১৯০৭ সালে ডিসেম্বর মাসে সুরাট কংগ্রেসে অরবিন্দ অংশগ্রহণ করেন । নরমপন্থীরা রাসবিহারী ঘোষকে সভাপতি হিসাবে চেয়েছিল, অপরদিকে চরমপন্থীদের দাবি ছিল লাজপত রায়-কে সভাপতি পদ দেওয়া । কিন্তু গোখেল- এর অনুরোধে লাজপত রায় তার দাবি থেকে স্বরে দাঁড়ান । অরবিন্দ এই ঘটনার বিরোধিতা করেছিলেন । অবশেষে সুরাটে নরমপন্থী ও চরম্পন্থী নেতৃবৃন্দের মধ্যে বিরোধিতার ফলে কংগ্রেসে ভাঙ্গন ধরে । সুরাটের ভাঙ্গনকে অরবিন্দ মনেকরেছিলেন 'ঈশ্বরের ইচ্ছা'। শিশিরকুমার মিত্র অরবিন্দর ব্যক্তিগত চিঠিপত্র থেকে দেখিয়েছেন যে, কংগ্রেসের ভাঙ্গনের পেছনে অরবিন্দের সক্রিয় ভূমিকা ছিল । অরবিন্দ তার চিঠিতে লিখেছিলেন, 'very few people know that it was I who gave the order that led to the breaking up of the congress'.[১৮] । ১৯০৮ সালে অরবিন্দ ' আলিপুর বোমার মামলায়' গ্রেফতার হন । চিত্তরঞ্জন দাশ আদালতে তার হয়ে সওয়াল করেন । অবশেষে তিনি বিনাশর্তে মুক্তিপান । এরপর অরবিন্দ গভীরভাবে সনাতন ধর্মের দ্বারা আকৃষ্ট হন । ১৯০৯ সালে ডিসেম্বরে মহারাষ্ট্রের সন্যাসী বিষ্ণু ভাস্কর লেলের সাক্ষাৎ অরবিন্দকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল । ১৯১০ সালে রাজনৈতিক জীবন থেকে অবসর নিয়ে তিনি পণ্ডিচেরিতে আধ্যাত্মিক জীবনের পথ গ্রহণ করেন ।

বাংলার বিপ্লবী রাজনীতিতে সক্রিয়ভাবে অরবিন্দ ১৯০৫ থেকে ১৯১০ এই পাঁচ বছর গভীর প্রভাব বিস্তার করেন । চিত্তরঞ্জন দাশ তাঁকে জাতীয়তাবাদের দার্শনিক ও সদেশিকতার কবি বলে উল্লেখ করেছেন । বাংলার বিপ্লবী গুপ্ত সমিতির উত্থানের পিছনে অরবিন্দ সর্বাপেক্ষা অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন বলে উমা মুখার্জি মনে করেন[১৯] । রাজনৈতিক মুক্তিলাভ ও আধ্যাত্মিক উন্নতির মধ্যে যে সমন্বয়সাধনের আদর্শ অরবিন্দ প্রচার করেছিলেন তা বিংশ শতকের প্রথম দশকে বাংলার যুব সমাজে ব্রিটিশ বিরোধী সশস্ত্র সংগ্রামে উজ্জীবিত করেছিল । যদিয়ও ১৯১০-র পরে রাজনৈতিক জীবন

থেকে অবসরলাভের পর প্রায় চার দশক ধরে তিনি পণ্ডিচেরিতে আধ্যাত্মিক ক্রিয়াকলাপে যুক্ত থাকেন । এইভাবে বিশ্বের কাছে তিনি ঋষি অরবিন্দ নামে খ্যাত হন।

তথ্যসূত্র :

১. অমলেন্দু দে, শ্রী অরবিন্দ ও ভারতের জাতীয়তাবাদী বিপ্লবী আন্দোলন (১৮৭৬-১৯৮৭) কলকাতাঃ রক্তকরবী, ১৯৯৩, পৃঃ ৭-৮
২. তদেব, পৃঃ ৮
৩. প্রণবকুমার চট্টোপাধ্যায়, আধুনিক ভারত (প্রথম খণ্ড), কলকাতাঃ পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যপুস্তক পর্ষদ, ২০১৪, পৃঃ ৮০
৪. পিটার হীজ, বৈপ্লবিক সন্ত্রাসবাদ, সিরাজুল ইসলাম (সম্পাঃ), বাংলাদেশের ইতিহাস, ১৭০৪-১৯৭১, প্রথম খণ্ড, কলকাতাঃ মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, ১৯৯৩, পৃঃ ২০১
৫. উমা মুখার্জি, টুগ্রেট ইন্ডিয়ান বেডলিউশনারিসঃ রাসবিহারী বোস অ্যান্ড যতীন্দ্রনাথ মুখার্জি, কলকাতা ফার্মা কে এল মুখোপাধ্যায়, পৃঃ ৯-১০
৬. অমলেশ ত্রিপাঠী, স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস (১৮৮৫-১৯৪৭), কলকাতাঃ আনন্দ পাবলিশার্স, ১৪১৭ বঙ্গাব্দ, পৃঃ ৫২-৫৩
৭. শঙ্কর ঘোষ, লিডারস অব মডার্ন ইন্ডিয়া, নিউদিল্লিঃ আল্যাইড পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৮০, পৃঃ ১১৬
৮. পিটার হীজ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২০১
৯. শঙ্কর ঘোষ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১১৮
১০. উমা মুখার্জি, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৩
১১. শঙ্কর ঘোষ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১১৯
১২. উমা মুখার্জি, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৪
১৩. অমলেন্দু দে, রাজা সুবোধচন্দ্র মল্লিক অ্যান্ড হিস টাইমস, বেঙ্গল পাস্ট অ্যান্ড প্রেসেন্ট, জুলাই-ডিসেম্বর, ১৯৭৯, পৃঃ ৬১
১৪. অমলেন্দু দে, শ্রী অরবিন্দ ও ভারতের জাতীয়তাবাদী বিপ্লবী আন্দোলন, পৃঃ ২৩
১৫. তদেব, পৃঃ ২৪
১৬. তদেব, পৃঃ ২২
১৭. তদেব, পৃঃ ১২১
১৮. শঙ্কর ঘোষ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১২১
১৯. উমা মুখার্জি, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৪

প্রোফেসর শঙ্কু

রানু বিশ্বাস
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ,
দ্বিজেন্দ্রলাল কলেজ, কৃষ্ণনগর, নদীয়া

সারসংক্ষেপ (Abstract) : বাংলার ছোটগল্পে প্রোফেসর শঙ্কুর সংযোজন বাংলা কথাসাহিত্যে নবতর দিগন্ত উন্মোচন করেছিল। সত্যজিতের পূর্বে কিশোর সাহিত্যে সেইভাবে কল্পবিজ্ঞানকে কেউ এত গুরুত্ব দেননি। প্রোফেসর শঙ্কু একজন বিজ্ঞানী। বিভিন্ন বিষয়ে তিনি জ্ঞানী এবং বিচিত্র বস্তু আবিষ্কার করেন। তাঁর আবিষ্কৃত ফর্মুলা পাঠককে চমৎকৃত করে, অন্যদিকে কিশোরকুল তাঁর গল্প পড়ে ভিতরে ভিতরে উত্তেজনা বোধ করেন। সত্যজিৎ রায়ের এই সৃষ্ট চরিত্র নিয়ে আমরা যেমন আমোদিত হই, তেমনি তাঁর অসাধারণ পাণ্ডিত্য নিয়ে আমরা গর্বিত হই। এখানেই সত্যজিৎ রায় অনবদ্য।

মূল শব্দ/ সূচক (Key word) : ডায়েরি, আবিষ্কার, ফর্মুলা, বিজ্ঞান, মানবতা, শঙ্কু, প্রোফেসর, সত্যজিৎ রায়।

মূল আলোচনা (Discussion) : সত্যজিৎ রায় বিখ্যাত 'রায়' পরিবারের সন্তান। আমরা জানি, উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী ও বিধুমুখীর ছয় সন্তানের মধ্যে দ্বিতীয়তম সন্তান ছিলেন সুকুমার রায় (ডাকনাম তাতা)। অন্যদিকে সুকুমার রায় ও সুপ্রভার একমাত্র সন্তান ছিলেন সত্যজিৎ রায় (ডাকনাম মানিক)।পারিবারিক সূত্রে সত্যজিৎ রায় কল্পনাবিলাসী মন পেয়েছিলেন। উপেন্দ্র কিশোর রায়চৌধুরীর 'গল্পমালা' গ্রন্থে ঘ্যাঁঘাসুরকে আমরা সকলেই চিনি। অন্যদিকে সুকুমার রায়ের মৌলিক রচনা ছিল 'হেশোরাম হুঁশিয়ারের ডায়েরি'। আথার কন্যান ডয়েলের 'লস্ট ওয়াল্ড' থেকে সুকুমার রায় অনুপ্রাণিত হয়ে রচনা করেন হেশোরাম হুঁশিয়ারের ডায়েরি। আবার এই বই থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে সত্যজিৎ রায় সৃষ্টি করলেন প্রোফেসর শঙ্কু চরিত্রকে।

এই প্রসঙ্গে সত্যজিৎ রায় নিজেই লিখেছেন –"শঙ্কু যখন প্রথম evolve করে, তখন শঙ্কু was slightly comic character, it was taken off on science fiction. সেটার উৎস ছিল আমার বাবার 'হেশোরাম হুঁশিরামের ডায়েরি' অর্থাৎ শঙ্কুর ব্যপারটা ছিল more or less on the lines of 'হেশোরাম হুঁশিয়ার।'"[১] পাঠকমনে প্রশ্ন ওঠে, এত নাম থাকতে 'ত্রিশঙ্কু' কেন? পরে আমরা জানতে পারি যে, সত্যজিৎ রায় অভিধান অনুযায়ী নাম রাখেন চরিত্রের। 'শঙ্কু' অর্থ অস্ত্র, শলাকা, কীলক, বা রত্ন। বিজ্ঞানে 'শঙ্কু' হল এক বিশেষ ধরনের ঘনবস্তুর আকার।'শঙ্কু' কাহিনীতে প্রফেসর শঙ্কু নানারকম অস্ত্র ব্যবহার করেছেন, অন্যদিকে তিনি একজন বিজ্ঞানী –তাই সত্যজিৎ রায়ের অভিনব চরিত্র হল প্রোফেসর শঙ্কু।

সত্যজিতের পূর্বে প্রেমেন্দ্র মিত্র, হেমেন্দ্রকুমার রায়ের কিছু গল্পে আমরা কল্পবিজ্ঞানের আভাস পাই। প্রেমেন্দ্র মিত্রের ‘পিঁপড়ে পুরাণ’, ‘কুহকের দেশে’ এবং হেমেন্দ্রকুমারের ‘অমানুষিক মানুষ’, ‘মায়াবতীর মায়াকানন’গল্পগুলি পাঠ করে আমরা বিস্মিত হই একথা সত্য। তবে গল্পগুলি আমাদের মনে নতুন কোন রেখার সঞ্চার করে না। সেদিক থেকে প্রোফেসর শঙ্কু আমাদের বিজ্ঞান নিয়ে ভাবায়, আমরা নতুন উদ্ভাবনায় মত্ত থাকি। সত্যজিৎ রায় প্রথম ব্যক্তি, যিনি কল্পবিজ্ঞানকে পত্র – পত্রিকায় প্রকাশ করেন। ১৯৬১ সালে সেপ্টেম্বরে ‘সন্দেশ’ পত্রিকায় ‘ব্যোমযাত্রীর ডায়েরী’ গল্পের মধ্য দিয়ে প্রফেসর শঙ্কু পাঠক মহলে প্রবেশ করে। ডায়েরী আকারে প্রকাশিত এই গল্পের কথক স্বয়ং প্রফেসর ত্রিলোকেশ্বর শঙ্কু।

প্রোফেসর শঙ্কুর দ্বিতীয় গল্প ‘প্রোফেসর শঙ্কু ও হাড়’ গল্পের ভূমিকা থেকে আমরা শঙ্কুর বিষয়ে অনেক ব্যক্তিগত তথ্য জানতে পাই। ত্রিলোকেশ্বর শঙ্কুর পিতা হলেন ঈশ্বর ত্রিপুরেশ্বর শঙ্কু, তিনি ছিলেন আয়ুর্বেদিক চিকিৎসক। পিতামহ ছিলেন ঈশ্বর বটুকেশ্বর শঙ্কু, তিনি ছিলেন গিরিডির একজন নামকরা তান্ত্রিক।প্রোফেসর শঙ্কু ১২ বছরে ম্যাট্রিক পাশ করেন, ১৪ বছরে কলকাতার আই এসসি পাশ করেন। তারপর ১৬ বছর বয়সে ফিজিক্স – কেমিস্ট্রি নিয়ে ডবল অনার্স নিয়ে বি এস সি পাশ করে স্কটিশ চার্চ কলেজে অধ্যাপনা করেন। পাঁচ ফুট সাত ইঞ্চি লম্বা এই আত্মভোলা মানুষটি জীবনে বিয়ে করেননি। তাঁর একমাত্র সঙ্গী ছিল চাকর প্রহ্লাদ ও বিড়াল নিউটন। নির্লোভ, সৎ মানুষ ছিলেন প্রোফেসর শঙ্কু। তিনি সারাজীবন গরীবদের সাহায্য করেছেন, কোনদিন জাত – ধর্ম – বর্ণ মানতেন না। উশ্রী নদীর ধারে গিরিডির বাড়িতে তিনি নিজের গবেষণা নিয়েই সদা ব্যস্ত থাকতেন।

প্রোফেসর শঙ্কুর জ্ঞানের পরিধি ছিল অগাধ, সীমাতীত। প্রত্নতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব, প্রাণীতত্ত্ব, ভূতত্ত্ব, মনস্তত্ত্ব, জীববিদ্যা, চিকিৎসাবিদ্যা, ইলেকট্রনিক্স, গণিতের বিচিত্র ফর্মুলায় তাঁর ছিল অবাধ বিচরণ।পিতার সূত্রেই তিনি ভারতীয় আয়ুর্বেদিক শাস্ত্রে খুঁটিনাটি জ্ঞান ধারণ করেছিলেন। এত জ্ঞানের জন্য তিনি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বড়ো বড়ো সন্মান পেয়েছিলেন।সুইজাল্যান্ড থেকে তাঁকে সুইডিশ অ্যাকাডেমি অব সায়েন্স কর্তৃক বিশ্ব বিখ্যাত বাঙালি বৈজ্ঞানিকের সন্মান পান, ব্রাজিলের রাটানটান ইনস্টিটিউট থেকে তাঁকে ডক্টরেট উপাধি দেওয়া হয়। পৃথিবীর বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞান আরোহণের জন্য তাঁকে বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ করেন। আমেরিকা, স্পেন, ইংল্যান্ড, জাপান, মিশর, নরওয়ে, সুইডেন ইত্যাদি স্থান ছাড়াও মঙ্গল গ্রহে, আফ্রিকার ঘন অঞ্চলে, সাহারা মরুভূমিতে তিনি ঘুড়ে বেড়ান। তিনি তাঁর অভিযানের জন্য মাঝে মাঝে তদন্ত করেছেন। তবে 'প্রোফেসর শঙ্কু ও হাড়’ গল্পে তিনি মৃতদেহ বিষয়ক অতিপ্রাকৃত রহস্য উন্মোচনে ব্যর্থ হন। শঙ্কুর প্রধানদুই শত্রু হলেন সুইজাল্যান্ড বিজ্ঞানী কর্নেলিয়াস হামবোল্ট আর ইতালীর বিজ্ঞানী কাউন্ট লুইজি রন্ডি।

প্রোফেসর শঙ্কুর জীবনে ৪০ টি ডায়েরির খোঁজ পাওয়া যায়। তার মধ্যে ৩৮ টি সম্পূর্ণ আর বাকি দুটি অসম্পূর্ণ ডায়েরি। সত্যজিৎ রায় শঙ্কুর শেষ ডায়েরি 'ড্রেক্সেল আইল্যান্ডের ঘটনা' প্রকাশ করেন ১৯৯২ সালে পূজাবার্ষিকী আনন্দমেলায়, তবে ডায়েরিটি অসম্পূর্ণ ছিল। তাঁর ডায়েরি পাঠ আমরা তাঁর আবিষ্কারের সম্পর্কে জ্ঞাত হই। প্রথম ডায়েরি পাঠ করলে আমরা দেখি, তিনি মঙ্গল গ্রহ থেকে টাফা গ্রহে রওনা দিয়েছেন, সেখানে পিঁপড়ের মত অতিকায় প্রাণীদের সাথে কয়েকদিন আরামে কাটিয়ে আসেন। পরের গল্পে তিনি ম্যাকাও পাখিকে খুঁজে পান দক্ষিণ আফ্রিকায়,''ঈজিপ্টিয় আতঙ্ক' গল্পে মমির রহস্য উদ্ঘাটন করেন। নরওয়ে থেকে তিনি আবিষ্কার করেন আশ্চর্য মানুষরূপী পুতুল, আবিষ্কার করেন নারভাইটা বড়ি (যা শরীরের ও মনের মূহ্যমান অবস্থা কাটায়), উশ্রী নদীর ধারে খুঁজে পান পৃথিবীর ক্ষুদ্রতম উপগ্রহ টেরাটোমকে, আবিষ্কার করেন ভূত দেখার যন্ত্র 'নিও – স্পেকট্রোস্কোপ যন্ত্র, মাত্র তিনশো তেত্রিশ টাকা দিয়ে তিনি তৈরি করেন প্রথম যন্ত্রমানব 'রোবু', নির্মাণ করেন'আনাইহিলিন পিস্তল' যা দিয়ে যেকোন শত্রুকে ঘায়েল করা যায়, আরেকটি আবিষ্কার বটিকা ইন্ডিকা পিল যার দ্বারা ২৪ ঘণ্টার খিদে দূর করা যায়। এছাড়াও তাঁর নিত্য আবিষ্কৃত দ্রব্য হল এয়ারকন্ডিশন পিল, টি পিল, কফি পিল, তৃষ্ণানাশক পিল, ঘুমতাড়ানি ট্যাবলেট এসেন্স, বাইনোকুলার, রিমমব্রেন যা পরলে হারানো স্মৃতি মানুষ ফিরে পায়, মানুষের প্রবৃত্তিগুলো প্রকট করে দেখার যন্ত্র এক্স। প্রোফেসর শঙ্কুর দুটি প্রধান আবিষ্কার হল সেরিব্রিলান্ট, যার দ্বারা মাথা পরিষ্কার হয় আর কম্পিউডিয়াম যন্ত্র, যার দ্বারা পরলোকগত আত্মার সাথে যোগাযোগ লক্ষ্য করা যায়। এছাড়া তাঁর সাথে সাক্ষাৎ হয় মাছ আর সরিসৃপের মধ্যবর্তী প্রাণী আম্ফিবিয়ান ও উদ্ভিদজীবি সরিসৃপ ব্রন্টেসরাস -এর।

পাঠক মনে কৌতূহল হতে পারে, সত্যজিৎ রায় হঠাৎ বিজ্ঞানের সাধক হলেন কেন? কেন তিনি বিজ্ঞানী প্রোফেসর শঙ্কু চরিত্র নির্মাণ করলেন ?এর উত্তর আছে ভারতের ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে, স্বাধীনতার বয়স ১০ বছর পর তিনি শঙ্কু কাহিনী লেখেন, সেই সময় ভারতের প্রধানমন্ত্রী জহরলাল নেহেরু দেশের স্বার্থে বিজ্ঞানের উন্নতির কথাভাবছিলেন।নেহেরু জাপান আর সোভিয়েত রাশিয়ার মডেলকে সামনে রেখে জীবনের সবক্ষেত্রে scientific temper –এর প্রয়োগ করতে চেয়েছিলেন, তাঁকে এই কাজে সাহায্য করেছিলেন সুকুমার রায়ের বন্ধু প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ। তাঁর পরিকিল্পনাকে সফল করতে এগিয়ে এলেন হোমি জাহাঙ্গীর ভাবা- সকলের সম্মতিতে মুম্বাইতে প্রতিষ্ঠিত হল 'টাটা ইনস্টিটউট অফ ফান্ডামেন্টাল রিসার্চ'(১৯৬২); শুরু হল কম্পিউটার চর্চা, গড়ে উঠল 'অ্যাটমিক এনার্জি কমিশন'। ১৯৬৪ সালে ভারত সরকার বাজেট করলেন নিউক্লিয়ার প্রোজেক্ট –এ একশো মিলিয়ন টাকা। নেহেরুর মন্তব্য ছিল – 'as rapidly possible'. বৃহৎ শিল্পে স্বাবলম্বী করে তুলতে হবে ভারতকে। এইসব

কিছুই জানত সত্যজিৎ রায়।তাই তিনি সৃষ্টি করলেন 'প্রোফেসর শঙ্কু'- যাতে ভারতীয় মন আগের থেকেই বিজ্ঞানমনস্ক হয়।

কিশোরসাহিত্য মনের মণিকোঠায় চিরকাল শঙ্কুকে 'হিরো' করেছেন। শঙ্কুর এইসকল কাহিনীর জনপ্রিয়তার কারণে শ্রী অনীশ দেব কয়েকটি বিষয়কে চিহ্নিত করেছেন-

১) অতি সহজে গল্পগুলি বলা।

২) সাধারণ ঘটনাকে অসাধারণত্বে পৌঁছে দেওয়া।

৩) দৃশ্যগুলিকে সিনেমার মত ফুটিয়ে তোলা।

৪) ভূগোল নির্বাচনে পাঠককে ভ্রমণের স্বাদ দেওয়া।

৫) বিষয় বৈচিত্র্যে ও প্লটে বিপুল তথ্যের প্রাধান্য লক্ষ্যণীয়।

শঙ্কুর জীবনাদর্শের মধ্যে সত্যজিৎ রায় এক মানবতার বীজও উপ্ত করেছিলেন। এক ডায়েরিতে শঙ্কুর বাবা তাঁকে একবার বলেছেন –

"ক্ষমতা আছে বলেই যে অঢেল উপার্জন করতে হবে তার কোনমানে নেই।সচ্ছল জীবনযাপনের জন্য অর্থের প্রয়োজন ঠিকই, আর তাতেই মানসিক শান্তির পথ সহজ হয়ে যায়; কিন্তু যাদের সে সংস্থান নেই, সুখে থাকা কাকে বলে যারা জানে না, সারা জীবন যারা দু'বেলা দু'মুঠো ভাতের জন্য মাথার ঘাম পায়ে ফেলে,বা যারা দৈবদুর্বিপাকে উপার্জনে অক্ষম—তাদের দুঃখ যদি কিছুটা লাঘব করতে পারিস, তার চেয়ে বড় সার্থকতা, তার চেয়ে বড় আনন্দ, আর কিছুতে নেই।"[২] প্রোফেসর শঙ্কু তাঁর বাবার কথায় প্রভাবিত ছিলেন। অর্থাৎ শঙ্কু শুধু বিজ্ঞানী চরিত্র নয়, বিশ্বনাগরিক শুধু নন, তিনি মানবতাবাদী এবং চেতনাবাদিও বটে। এককথায় শঙ্কুর কাহিনী হয়ে ওঠে যেন সত্যজিতের কাহিনী। তাই আমরা সহজেই বলতে পারি যে, সত্যজিৎ রায়ের মানবতাবাদীর নবজাগরণমুখী দৃষ্টিভঙ্গির বহিঃপ্রকাশ হল প্রোফেসর শঙ্কু।

তথ্যসূত্র (References) :

১. রায় দীপক, 'সত্যজিৎ ও দুই পূর্বপুরুষ', পত্রলেখা, কলকাতা, জানুয়ারি, ২০১৩, পৃষ্ঠা– ১৬৬

২. রায় সত্যজিৎ, 'স্বর্ণপর্ণী', শঙ্কু সমগ্র, পূর্বোক্তা, ১৯৯২ পৃষ্ঠা– ৬০৭

সহায়ক গ্রন্থাপঞ্জী :

ক. ভট্টাচার্য শঙ্করলাল ও দাস উজ্জ্বলকুমার (সম্পাদনা), 'সত্যজিৎ পরিক্রমা', বুলবুল প্রকাশন, কলকাতা,জানুয়ারি, ২০১২

খ. বিশ্বাস সুখেন, 'সত্যজিতের ভাবনায় প্রোফেসর শঙ্কু', ইন্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস, কলকাতা, মে, ২০০০

পরিবেশবাদী সাহিত্যতত্ত্ব ও লীলা মজুমদারের নির্বাচিত উপন্যাস

ব্রতবাণী ঠাকুর
গবেষক, বাংলা বিভাগ, প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ: উত্তর-আধুনিক সাহিত্য সমালোচনা পদ্ধতির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্বপ্রস্থান ইকোক্রিটিসিজম বা পরিবেশবাদী সাহিত্যতত্ত্ব। মানুষ ও পরিবেশের সম্পর্ক যে আধিপত্যবাদী ক্ষমতাকাঠামো দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় পরিবেশবাদী সাহিত্যতত্ত্ব সেই কাঠামোর নিরিখে সাহিত্যকে বিশ্লেষণ করে। বিদ্যায়তনিক ক্ষেত্রে সাহিত্যসমালোচনা পদ্ধতি রূপে পরিবেশবাদ জনপ্রিয় হয়ে ওঠার আগেই কথাসাহিত্যিক লীলা মজুমদারের বিভিন্ন উপন্যাস ও ছোটোগল্পে উঠে এসেছে সচেতন পরিবেশভাবনার বিভিন্ন প্রসঙ্গ। বর্তমান প্রবন্ধে তাঁর *হলদে পাখির পালক*, *বাতাস বাড়ি* ও *হাওয়ার দাঁড়ি* উপন্যাস তিনটিকে পরিবেশবাদী সাহিত্যতত্ত্বের আলোয় বিশ্লেষণ করা হয়েছে। মানুষের সঙ্গে প্রকৃতি-পরিবেশ ও জীবজগৎ-এর সম্পর্কের বহুমাত্রিকতা *হলদে পাখির পালক* উপন্যাসের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দিক। অন্যদিকে *বাতাস বাড়ি* এবং *হাওয়ার দাঁড়ি* উপন্যাসদুটিতে আপাত ফ্যান্টাসির মোড়কে উঠে এসেছে বর্তমান যুগের একাধিক পরিবেশকেন্দ্রিক সমস্যা ও তার সমাধানসূত্রের প্রসঙ্গ। দেশ-কাল-অর্থনীতি-শ্রেণি-জাতি প্রভৃতির পার্থক্যে কীভাবে বদলে যায় পরিবেশের সঙ্গে মানুষের চিরায়ত সম্পর্কের বিন্যাস তা অত্যন্ত সহজ ও মায়াবী ভাষায় ফুটিয়ে তোলেন লীলা মজুমদার। আপাতভাবে শিশুসাহিত্যিক রূপে পরিচিত লীলা মজুমদারের নির্বাচিত তিনটি উপন্যাসকে ইকোক্রিটিসিজম বা পরিবেশবাদী সাহিত্যতত্ত্বের মাপকাঠিতে বিশ্লেষণ করাই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

সূচক শব্দ: পরিবেশবাদী সাহিত্যতত্ত্ব, লীলা মজুমদার, হলদে পাখির পালক, বাতাস বাড়ি, হাওয়ার দাঁড়ি

মূল আলোচনা: বিবর্তমান সমাজ-সংস্কৃতির ধারায় জীবনসত্যের বিন্যাস বারবার বাঁকবদল করে। সেই পরিবর্তনের সূত্র মেনেই সাহিত্য সমালোচনার ইতিহাসে জন্ম নেয় নতুন তত্ত্ব, জন্ম নেয় ভিন্নতর পাঠপদ্ধতি। উত্তর আধুনিক ও উত্তর ঔপনিবেশিক সমালোচনার জগৎ-এ অন্যতম নবীন সংযোজন ইকোক্রিটিসিজম বা পরিবেশবাদী সাহিত্যতত্ত্ব। নাগরিক সভ্যতার উন্নতির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে প্রকৃতি ও পরিবেশের চূড়ান্ত অবক্ষয় যে সময় থেকে মানুষের ব্যক্তিগত ও স্বাভাবিক জীবনযাত্রাকে প্রভাবিত করতে শুরু করল সে সময় থেকেই শুরু হল প্রকৃতি ও মানুষের চিরায়ত সম্পর্ককে নতুন করে বিশ্লেষণ করার তাগিদ। সেই তাগিদ থেকেই প্রতীচ্যের বৌদ্ধিক, নান্দনিক ও

বিদ্যায়তনিক ক্ষেত্রে ইকোক্রিটিসিজম বা পরিবেশবাদী সাহিত্যতত্ত্বের উত্থান। এই তত্ত্ব দেশ-কাল-লিঙ্গ-রাজনীতি-অর্থনীতি প্রভৃতির প্যারামিটারে প্রকৃতি ও মানবসংস্কৃতির মধ্যে ক্ষমতাকাঠামো ভিত্তিক সম্পর্কের বহুমাত্রিক বিন্যাস নিয়ে আলোচনা করে।

অধিকাংশ সমালোচকের মতে ১৯৬২ সালে Rachel Carson রচিত *Silent Spring* গ্রন্থের মাধ্যমেই প্রথম সচেতনভাবে পরিবেশবাদী সাহিত্য রচনার ধারা শুরু হয়। বিশ শতকের নয়ের দশক থেকে বিদ্যায়তনিক সাহিত্য সমালোচনার জগতে পরিবেশবাদী দৃষ্টিভঙ্গির প্রাতিষ্ঠানিক চর্চা শুরু হয়। ১৯৯৬ সালে পরিবেশবাদী সাহিত্যতত্ত্বের পুরোধা Cheryll Glotfelty ও Harold Fromm পরিবেশবাদ সম্পর্কিত বেশ কিছু প্রবন্ধ একত্রিত করে প্রকাশ করেন *The Ecocriticism Reader: Landmarks in Literary Ecology* বইটি। ইকোক্রিটিসিজম-এর সংজ্ঞা দিতে গিয়ে সেখানে বলা হয়েছে:

> Ecocriticism is the study of the relationship between literature and physical environment. Just as feminist criticism examines language and literature from a gender conscious perspective, and Marxist criticism brings an awareness of modes of production and economic class to its reading of texts, ecocriticism takes an earth-centered approach to literary studies.[১]

প্রথমদিকে পরিবেশবাদী সাহিত্য সমালোচনার ধারা শুধুমাত্র ইংরেজি Romantic Poetry বা Nature Writing-এর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলেও পরবর্তীতে এর ক্ষেত্র আরো প্রসারিত হয়। মানুষ ও পরিবেশের পারস্পরিক সম্পর্ক অনুসন্ধান করতে গিয়ে পরিবেশবাদী তাত্ত্বিকরা আবিষ্কার করেন অর্থনৈতিক বৈষম্য, ধর্মীয়-জাতিগত-সাংস্কৃতিক পার্থক্য, ঔপনিবেশিকতার প্রভাব, লিঙ্গভেদের মতো বিষয়গুলোকে। তাঁরা বলেন যে প্রাচীন পৃথিবীতে অন্যান্য প্রাণীদের মতো মানুষও ছিল প্রকৃতিরই অংশ। কিন্তু যেদিন থেকে মানুষ তার বৌদ্ধিক চেতনা সম্পর্কে সচেতন হল সেদিন থেকেই সে প্রকৃতির অন্যান্য উপাদানের থেকে নিজেকে শ্রেষ্ঠতর বলে ভাবতে শুরু করল। বিশেষ করে শিল্প-বিপ্লবের পরবর্তী সময় থেকে মানুষ ও না-মানুষের এই বিভাজন আরও বেশি করে ধরা পড়ল। আধুনিক প্রযুক্তি হাতে আসার ফলে তার প্রকৃতির ওপর নির্ভর করার প্রয়োজনীয়তা কমল। শুরু হল প্রকৃতির ওপর নির্বিচার আধিপত্য স্থাপন। মানব সভ্যতার দ্বিতবাদী কাঠামোয় প্রকৃতি ও পরিবেশ চিহ্নিত হল এক অধঃপতিত ‘অপর’ রূপে। সভ্যতা ও সংস্কৃতির উন্নতিকল্পে প্রকৃতি ও পরিবেশের ওপর অত্যাচার পেল নৈতিক বৈধতা।

তত্ত্বরূপে পরিবেশবাদী চিন্তার উদ্ভবের আগেই পরিবেশের অবক্ষয়, পরিবেশ সংরক্ষণ, মানুষ ও পরিবেশের বহুমাত্রিক সম্পর্কের কথা অত্যন্ত সাবলীলভাবে উঠে এসেছে যাঁর কলমে তাঁর নাম লীলা মজুমদার। আশ্চর্য হতে হয় যে আপাতভাবে ছোটোদের জন্য লেখা গল্প-উপন্যাসেও তিনি তুলে এনেছেন পরিবেশচিন্তার এমন কিছু দিক যা উত্তরাধুনিক কালে এসে ভাবিয়ে তুলছে পরিবেশবাদী তাত্ত্বিকদের। মানুষ ও পরিবেশের সম্পর্কের মধ্যে কেমনভাবে জড়িয়ে থাকে অর্থনৈতিক বৈষম্য, লৈঙ্গিক তফাৎ, শ্রেণিগত ও জাতিগত পার্থক্যের মতো বিষয়গুলো তা অত্যন্ত সরল অথচ বলিষ্ঠভাবে দেখিয়ে যেতে ভোলেননি লীলা মজুমদার। ভবিষ্যতের পৃথিবী গড়ার গুরুদায়িত্ব যাদের কাঁধে তাদের জন্য তিনি রেখে গিয়েছেন পরিবেশ ও মানবসভ্যতার বহুমাত্রিক সম্পর্ককে নতুন দৃষ্টিভঙ্গিতে বিচার করার সূত্র।

লীলা মজুমদারের বেশিরভাগ গুরুত্বপূর্ণ গল্প-উপন্যাস যে কালপর্ব জুড়ে রচিত সে সময় পরিবেশবাদী সাহিত্য সমালোচনা পদ্ধতি তেমনভাবে তত্ত্বায়িত না হলেও প্রকৃতি-পরিবেশের অবক্ষয়ের দিকটি গোটা পৃথিবীর কাছেই স্পষ্ট হতে শুরু করেছে। সেই প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে যখন ছোটোদের জন্য কলম ধরছেন সময়সচেতন, মননশীল ও দূরদর্শী কথাসাহিত্যিক লীলা মজুমদার তখন তাঁর লেখায় অনায়াসে উঠে আসছে প্রকৃতি-পরিবেশের সঙ্গে মানবসভ্যতার দ্বান্দ্বিক সম্পর্কের ছবি। আপাত ফ্যান্টাসির আড়ালে তাঁর লেখায় ধরা পড়ছে গ্রিন-হাউস এফেক্ট, গ্লোবাল ওয়ার্মিং, ভূ-গর্ভস্থ শক্তির নিঃশেষতার কথা। তথাকথিত 'উন্নততর' পৃথিবীতে প্রকৃতির ওপর মানব সভ্যতার আধিপত্য স্থাপনের প্রসঙ্গ ফুটিয়ে তোলার পাশাপাশি তাঁর সাহিত্যে বারবার উঠে এসেছে দেশের মূলনিবাসী জনজাতির প্রকৃতিচেতনা ও পরিবেশচেতনার প্রসঙ্গ। এই প্রবন্ধে লীলা মজুমদারের *হলদে পাখির পালক*, *বাতাস বাড়ি* ও *হাওয়ার দাঁড়ি* উপন্যাস তিনটিকে ইকোক্রিটিসিজম বা পরিবেশবাদী সাহিত্যতত্ত্বের নিরিখে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করা হবে।

দুই

হলদে পাখির পালক উপন্যাসটি ১৯৫৬ সালে 'আকাশবাণী'-র 'গল্পদাদুর আসর' অনুষ্ঠানে প্রথম পঠিত হয় এবং ১৯৫৭ সালে 'ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড' থেকে প্রথম গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। একথা ঠিক যে এই উপন্যাসের কেন্দ্রীয় সমস্যা পরিবেশকে ঘিরে আবর্তিত হয়নি তবে সম্পূর্ণ উপন্যাস জুড়ে তিনি যেভাবে প্রকৃতির সঙ্গে তথাকথিত নাগরিক সভ্যতার বাইরে থাকা মানুষের নিবিড় সম্পর্ককে তুলে ধরেছেন তা উপন্যাসটিকে পরিবেশবাদী সাহিত্যতত্ত্বের নিরিখে বিশ্লেষণের দাবি রাখে। উপন্যাসের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সমান্তরাল ভাবে এগিয়ে চলে দুটি কাহিনি যার একদিকে থাকে রুমু-বোগির হঠাৎ হারিয়ে যাওয়া কুকুর ভুলো-কে ঘিরে ঘনিয়ে ওঠা রহস্য আর অন্যদিকে থাকে বুড়ো চাকর ঝগড়ু-র মুখ থেকে শোনা তার ফেলে আসা গ্রাম দুমকার

আশ্চর্য সব গল্প। এক অদ্ভুত মায়াবী ভাষায় রুমু-বোগির কল্পনার পৃথিবীর সঙ্গে ঝগড়ুর দুমকার জগৎ-কে একসূত্রে গেঁথে দেন ঔপন্যাসিক। ঝগড়ুর বলা জাদুকরি মাঞ্জার কথা, ময়ূর মেয়ের কথা, হলদে পাখির পালকের কথা, কাঠপরিদের কথা, জাদু করা ছাগলের কথা সব যেন রূপকথা ও বাস্তবের মিশেলে তৈরি এক কল্পলোকের সন্ধান দেয়। তবে এই স্বপ্ন-কল্পনায় গড়া জগৎ-ই দুমকার সম্পূর্ণ ছবি নয়। ঝগড়ুর কথার ফাঁকে ফাঁকে যে বাস্তব দুমকার খোঁজ পেয়ে যান সচেতন পাঠক তা ভারতবর্ষের যেকোনো দারিদ্র্যপীড়িত, অভাব-অনটনে জর্জরিত, আদিবাসী অধ্যুষিত জঙ্গলময় পাহাড়ি অঞ্চলের সঙ্গে অভিন্ন হয়ে ওঠে। ঝগড়ু বলে- "দুমকার লোকেরা বড়ো গরিব হয়, দিদি। তাদের বড়ো কষ্ট। শীতকালে টোপাকুল পাকলে বিঁচি সুদ্ধু পাথর দিয়ে ছেঁচে খায় লোকে। তাহলে অনেকক্ষণ পেট ভার হয়ে থাকে, ভাত খেতে ইচ্ছা হয় না।"[২] কিন্তু এইরকম আর্থিক সংকটের মধ্যে দাঁড়িয়েও দুমকার লোকেদের পরিবেশ চেতনা শিক্ষিত শহুরে মানুষজনের কৃত্রিম পরিবেশ ভাবনাকে তীব্র আঘাত করে অনায়াসে। উপন্যাসের আখ্যানে বারবার উঠে আসে গাছপালা-পশুপাখি-কীটপতঙ্গের সঙ্গে দুমকার তথাকথিত নিম্নবর্গীয় মানুষের আন্তরিক সংযোগের নিঁখুত ছবি। আর তাই শহুরে বইপড়া বিদ্যাকে ব্যঙ্গ করে নির্দ্বিধায় ঝগড়ু বলে-"গাছ-গাছালির কথা যারা চারটে দেওয়ালের মধ্যে বাস করে তারা জানবে কোত্থেকে?"[৩]

শুধু গাছপালাই নয় পশু-পাখি সহ সমগ্র জীবজগৎ-এর সঙ্গেই ঝগড়ুদের সম্পর্ক অন্যমাত্রার। সেখানে গ্রামের সর্দারের ছেলের পা চিবিয়ে খায় যে ভাল্লুক তাকে দাবানলের সময় সামনে পেয়েও ছেড়ে দেয় সশস্ত্র সর্দার। ঝগড়ুর বাবা পথ হারানো নেকড়ের বাচ্চাকে বুকে করে নিয়ে এসে আশ্রয় দেয় নিজের ঘরে। আর দুমকার বনে শিকার করতে আসা শহুরে বাবুদের থেকে অকারণ পশুশিকার বন্ধ করার প্রতিশ্রুতি আদায় করে নেয় দুমকার লোকেরা। দরিদ্র, অশিক্ষিত, আদিবাসী ঝগড়ু শিক্ষিত মানুষদের লোকদেখানো পশুপ্রেমকে আঘাত করে বলে- "জন্তু জানোয়ারকে ভালোবাসা চারটি খানিক কথা নয় দিদি। একটা কুকুর কী একটা বেড়াল ঘরে বেঁধে রেখে তাকে আদর করলেই কি আর ভালোবাসা হল।"[৪] ভাবতে অবাক লাগে নাগরিক সংস্কৃতিতে পশুপ্রেমের অজুহাতে তাদের বিনোদনের মাধ্যম হিসেবে উপস্থাপিত করার যে প্রবণতার কথা ঝগড়ুর মুখ দিয়ে তুলে ধরেন লীলা মজুমদার তারই তাত্ত্বিক প্রতিধ্বনি শুনতে পাওয়া যায় আজকের পরিবেশবাদী সমালোচক Greg Garrad-এর এই মন্তব্যে:

> For the integrated pre-modern sensibility, the fondness and the slaughter are not contradictory. It is only through industrialization that most animals are removed from everyday life, and the meat production process hidden away. Once marginalized in this way the few animals still

> visible to us can be only 'human puppets' family pets or Disney characters.[৫]

পশুপাখিকে ঘরে আটকে রেখে তাদের মানবপুতুল বানানোর বিরোধিতার কথা যেমন উঠে আসে ঝগড়ুর গলায় তেমনই আবার পশুপ্রেম ও পশুহত্যা যে সবসময় স্ববিরোধী নয় একথাও নিজের মতো করে বলার চেষ্টা করে ঝগড়ু। বোগি ও ঝগড়ুর কথোপকথনের মধ্য দিয়ে যে প্রসঙ্গটি উঠে আসে তা উত্তর-আধুনিক পৃথিবীতে ইকোক্রিটিসিজম ও অ্যানিমাল লিবারেশনের মধ্যে তৈরি হওয়া অন্যতম প্রধান বিতর্কটির কথাই মনে করায়। "তোমরাও তো জানোয়ার মার"[৬]— বোগির এই বক্তব্যের প্রেক্ষিতে ঝগড়ু বলে তাদের কাছে পশুহত্যার উদ্দেশ্য ক্ষমতার প্রয়োগ নয় বরং জীবনরক্ষার তাগিদ– "বোগিদাদা আমরা মারি পেটের জ্বালায় কিংবা প্রাণের তরে।"[৭] বন্য হাতির পায়ে শেকল পরিয়ে তাদের দাসত্ব স্বীকার করতে বাধ্য করানোর কথা বলতে গিয়ে, খররা বুরুশ দিয়ে ঘষে ঘষে হাতির বাচ্চার কাতুকুতু ছাড়িয়ে তার পিঠে হাওদা চাপানোর কথা বলতে গিয়ে ক্ষোভে ফেটে পড়ে ঝগড়ু। অধ্যাপিকা গোপা দত্তভৌমিক *হলদে পাখির পালক* প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে তাই বলেন– "গোটা গল্পটাই মানুষ, পশুপাখি আর গাছপালার পারস্পরিক সম্পর্কের টানাপোড়েনে বোনা। আজকের ভাষায় একেই হয়তো বলে পরিবেশ চেতনা।"[৮] *হলদে পাখির পালক* উপন্যাসটির পাতায় পাতায় জড়িয়ে থাকে তৃতীয় বিশ্বের আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষের পরিবেশভাবনা যাকে পরিবেশবাদী তত্ত্বের উত্থানের প্রথম পর্বে আমলই দিতে চাননি পাশ্চাত্যের পরিবেশবাদীরা। কিন্তু পাশ্চাত্য পরিবেশবাদী তত্ত্বের এই একপেশে মনোভাব যে নির্ভুল নয় সেকথাই যেন বারবার মনে করিয়ে দেয় *হলদে পাখির পালক* উপন্যাসটি। অনেক পরবর্তীকালে সেকথা মনে করিয়ে দেন রামচন্দ্র গুহও:

> In India for instance, the environmental movement has drawn on the struggles of marginal populations— hill peasants, tribal communities, fishermen, people displaced by the construction of dams- neglected by the existing political parties.[৯]

তিন

হলদে পাখির পালক উপন্যাসের এক জায়গায় ঝগড়ু বলেছিল –"পাহাড়ের ধারের ওই দুমকা হয়তো বদলে গেছে। শুনেছি ভালুকরা আর মহুয়া খেতে আসেনা।"[১০] বোঝা যায় সভ্যতার চোরা লোভ নষ্ট করে ফেলছে দুমকার প্রকৃতিকে। বিপন্ন হচ্ছে সেখানকার অমলিন পরিবেশ। পরিবেশের বিপন্নতার এই ছবিটি আরও প্রকট ভাবে উঠে এসেছে লীলা মজুমদারের *বাতাস বাড়ি* (১৯৭৪) উপন্যাসে। *বাতাস বাড়ি* উপন্যাসটি ১৩৮০ সালের বৈশাখ থেকে পৌষ পর্যন্ত 'সন্দেশ' পত্রিকায় ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়

এবং ১৯৭৪-এ 'আনন্দ' থেকে গ্রন্থাকারে মুদ্রিত হয়। *হলদে পাখির পালক*-এ পরিবেশের বিপন্নতার একটা ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছিল মাত্র কিন্তু *বাতাস বাড়ি* উপন্যাসে এসে প্রকৃতির বিপর্যয়ের ছবিটি সরাসরি উঠে এসেছে। এই উপন্যাসের মূল ঘটনাপ্রবাহই আবর্তিত হয়েছে পরিবেশ সমস্যাকে কেন্দ্র করে। তাই আক্ষরিক অর্থেই এই উপন্যাসকে পরিবেশ ভাবিত রচনা বলা যায়। তবে পরিবেশ সমস্যার সমাধানের ক্ষেত্রে এখানে কল্পবিজ্ঞানের আশ্রয় নিয়েছেন লীলা মজুমদার। ফলে উপন্যাসটির ঘটনাপ্রবাহ সবসময় বাস্তবের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হয়নি। তবে ছোটোদের কাছে মনোগ্রাহী করে তুলতে কিছু কিছু ক্ষেত্রে কল্পনার আশ্রয় নিলেও বর্তমান যুগের পরিবেশ সমস্যার যে দিকগুলি ঔপন্যাসিক এখানে তুলে ধরেছেন তা *বাতাস বাড়ি* উপন্যাসটিকে নিঃসন্দেহে পরিবেশ-বিভাবিত সাহিত্যের মর্যাদা প্রদান করে।

বাতাস বাড়ি উপন্যাসের মূল কাহিনি শুরু হয়েছে হিমালয়ের পাদদেশের একটি ছোট্ট গ্রাম 'লখনা'-য় নেমে আসা প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ছবিকে কেন্দ্র করে। লেখিকা বলছেন- "সেবার মোটে বৃষ্টি হল না, পাহাড় চূড়ার ঝরনার জল কমে গেল, গ্রামে লোকদের কষ্টের আর শেষ রইল না।"[১১] পরিবেশের ভারসাম্য বিনষ্ট হওয়ার ফলে লখনার সব নদীর জল শুকিয়ে গেল, কমলালেবু গুটি ধরেই খসে পড়ে গেল। আর স্বাভাবিকভাবেই পরিবেশের এই অবক্ষয়ের প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়ল লখনার সহজ, সরল, দরিদ্র মানুষগুলোর ওপর। ভারতীয় সাংবাদিক অনিল আগরওয়াল ১৯৮৬ সালে বলেছিলেন –"..it is the poor who are affected the most by environmental destruction।"[১২] *বাতাস বাড়ি* উপন্যাসেও দেখা যায় দীর্ঘ অনাবৃষ্টিতে গ্রামে কোনও ফসল না ফলায় গ্রামের বারো-তেরো জন গরিব ছেলে-মেয়ে খিদের জ্বালা সহ্য করতে না পেরে ভিড় জমায় বড়ো লামার বাড়িতে। বড়ো লামা ওদের কাছে "পেট পুরে ছুরপি খাস নিশ্চয়"[১৩] বলে সন্দেহ প্রকাশ করলে ওরা জামা তুলে জিরজিরে পাঁজরার হাড় দেখিয়ে বলে-"ছুরপি খায় বড়োলোকরা, আমরা কোথায় পাব?"[১৪] ছুরপি নয় কাঁচা সুপুরি মুখে দিলেই নরবু চোখের সামনে দেখে- "আলমনির থালাভরা আল আল ভাত, তাতে ঝাল ঝাল টক টক শুঁটকি মাছের চচ্চই।"[১৫]

বাতাস বাড়ি উপন্যাসে প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশের সমস্যা রূপে উঠে এসেছে ভূ-গর্ভস্থ শক্তির নিঃশেষতা, জনবিস্ফোরণ প্রভৃতি প্রসঙ্গ। অতিরিক্ত হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি, মোটরগাড়ি, কলকারখানার সংখ্যা বৃদ্ধি প্রভৃতির ফলে কয়লা, খনিজ তেল প্রভৃতি ভূ-গর্ভস্থ শক্তির ভাণ্ডার যে একদিন ফুরিয়ে যাবে সেই আশঙ্কার কথা উঠে আসে বড়ো লামার কথায়। তবে এই সমস্যার সমাধান হিসেবে বড়ো লামা বলেন সৌরশক্তির কথা। সৌরশক্তির পরিমান অগাধ। এছাড়া সৌরশক্তির ব্যবহারে কোনোরকম দূষণ সৃষ্টি হয় না। তাই সূর্যকল বানিয়ে সৌরশক্তিকে অন্যান্য শক্তিতে রূপান্তরিত করার বিজ্ঞান-ভাবনার প্রকাশ ঘটেছে বড়োলামার চিন্তাধারায় – "সব যখন শেষ হয়ে যাবে সূয্যি তখনও তেজ দেবে। সেই তেজ কল করে ধরা হবে। তাই দিয়ে

যন্ত্র চলবে। সেই যন্ত্র দিয়ে মাটির তলা থেকে জল তুলে আনা হবে। তোদের ধান ক্ষেত, আলু ক্ষেত আবার সবুজ হবে।”[১৬] পরিবেশের বিপর্যয়ের কথা বলতে গিয়ে জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রসঙ্গও উঠে এসেছে *বাতাস বাড়ি* উপন্যাসে। পাদ্রীর মুখে শোনা যায় –“তোদের এখানে পাহাড়ের ন্যাড়া গা, খাবার নেই, জল নেই। কিন্তু পাহাড়ের নীচে আরও খারাপ। খাবার আর জল তো নেই-ই, থাকার জায়গা পর্যন্ত নেই। গিজগিজ করছে লোক। রোজ রোজ আরও আসছে, আরও ভীড় বাড়ছে। জায়গা ধরছে না।”[১৭]

ভূ-গর্ভস্থ শক্তির পরিপূরক রূপে সৌরশক্তির কথা বলার সময় লেখিকা যেমন বিজ্ঞানের সাহায্য নিয়েছেন তেমনই জনবিস্ফোরণ সমস্যা সমাধানে আশ্রয় নিয়েছেন কল্পবিজ্ঞানের। তাঁর উপন্যাসের বড়ো লামা তাই পৃথিবীর ওপর জনসংখ্যার চাপ কমাতে শূন্যে ভাসিয়ে দেয় বাতাস বাড়ি। সেই “বাতাস বাড়ির গা পোড়ে না, রোদে গরম হয় না, এমনি হালকা যে বাতাসে ভেসে থাকে।”[১৮] উপন্যাসের শেষে বড়ো লামা বা দুলে তার নোটবইয়ের পাতায় লিখে রাখে বাতাস বাড়ির নকশা, সূর্য কলের নিয়ম, খিদের বড়ি বানানোর পদ্ধতি। পরিবেশ চেতনা মিশে যায় আশাবাদের সঙ্গে– “পৃথিবীর দুঃখ ঘুচে যাক, সবাই সুখী হোক।”[১৯] এই মঙ্গল কামনার মধ্যেই লীলা মজুমদারের পরিবেশ ভাবনার মূল সুরটি নিহিত।

চার

বাতাস বাড়ি-র মতোই লীলা মজুমদারের আর একটি পরিবেশ-কেন্দ্রিক উপন্যাস হল *হাওয়ার দাঁড়ি* (১৯৮৩)। উপন্যাসটি ১৩৮৮ সালের কার্তিক থেকে চৈত্র মাস পর্যন্ত ধারাবাহিক ভাবে ‘সন্দেশ’-এ মুদ্রিত হয় এবং ১৯৮৩ সালে ‘ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড’ থেকে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। এই উপন্যাসের পটভূমি, চরিত্রনির্মান ও কাহিনির বিন্যাস অনেকটাই *বাতাস বাড়ি*-র অনুরূপ তবে পরিবেশ সচেতনতা এই উপন্যাসে আরও বেশি প্রকট। ‘গ্লোবাল ওয়ার্মিং’, ‘গ্রিনহাউস এফেক্ট’-এর মতো জ্বলন্ত প্রাকৃতিক সমস্যার আভাস ফুটে উঠেছে এই উপন্যাসে। *বাতাস বাড়ি*-র ‘লখনা’ গ্রামটি এখানে পরিণত হয়েছে ‘বনগাঁও’-এ। নরকু, শামু, বলবীর, পদম, পম্পার জায়গা নিয়েছে মংলু, মুংরি, বুধন, বুধো, চম্পা, টেমি। উপন্যাসে দেখা যায় পাহাড় ঘেরা ছোট্ট গ্রাম ‘বনগাঁও’-এর ওপর নেমে এসেছে প্রাকৃতিক সংকট। শিক্ষিত, সভ্য মানুষের উন্নাসিক কাজকর্মের ফলে সমগ্র পৃথিবীর পরিবেশের ওপর নেমে আসা বিপর্যয়ের রেশ ছড়িয়ে পড়েছে ‘বনগাঁও’ পর্যন্ত। বর্ষাকাল চলে গেলেও সেখানে বৃষ্টি নামে না, সারা বছর ধরে শুকনো হওয়া মাটি ঝুরঝুর করে ঝরে যায়। গ্রামের মোড়ল বলেন- “মাটি ধসল, গাছ খসে গেল, হাতিরাও নীল পাহাড় ছেড়ে নীচে নেমে যাচ্ছে। কিন্তু গরম কালে গরম হল না, বর্ষা কালে জল হল না, গত বছর শীত কালেও শীতের হাওয়া দেয়নি।”[২০] গ্রিন-হাউস-এফেক্ট-এর প্রভাব আরও বেশি করে ধরা পড়ে গ্রামের ছোটো ছেলে-মেয়েদের কথায়– “চারাগাছের শেকড় নামছে না, গরমের সময় জল হচ্ছে, বর্ষাকাল খরখরে, শীতের

সময় শীত নামছে না, বুনো হাঁসের ঝাঁক আসছে না।”[২১] পাহাড়ের পাদদেশের গ্রাম ‘বনগাঁও’ থেকে শুরু করে পাহাড়ের ওপরের গ্রাম পর্যন্ত সব জায়গাই আক্রান্ত হয় পরিবেশের বিপরীত আচরণে। দলে দলে মানুষ নেমে আসতে থাকে নিচে। সবার ক্ষেতের শস্য জলের অভাবে মরে যায়। গ্রামের বুড়ো ঠাকুর এই বিপর্যয়ের কারণ সম্পর্কে বলেন– “তোদের জ্বালায় পৃথিবী চুপসে যাচ্ছে, ফোঁপরা হচ্ছে...আমি অঙ্ক কষে স্পষ্ট করে এসব দেখতে পাচ্ছি আর তোরা যে দিনে-রাতে কয়লা তুলছিস, তেল তুলছিস, নলে করে গ্যাস চালান দিচ্ছিস, জ্বালাচ্ছিস, পোড়াচ্ছিস, সব খেয়ে পরে শেষ কচ্ছিস– এ বিষয়ে ভেবেছিস কখনো?”[২২]

পরিবেশ-সমস্যার সমাধান করার ক্ষেত্রে এরপর স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতেই কল্পবিজ্ঞানের আশ্রয় নেন লীলা মজুমদার। ভূ-গর্ভস্থ শক্তির মাত্রাতিরিক্ত ব্যবহার প্রসঙ্গে বিজ্ঞানের সঙ্গে কল্পনার রঙ মিশিয়ে একটি নতুন তত্ত্বের ধারণা দেন তিনি। বুড়ো পণ্ডিতের মুখ দিয়ে লীলা মজুমদার বলেন যে এই পৃথিবীর গর্ভ থেকে প্রতিনিয়ত এত বিপুল হারে কয়লা, খনিজ তেল তোলা হতে থাকলে একটা সময় পর পৃথিবীর ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যেতে পারে। বুড়ো পণ্ডিত বলেন:

> মনে করতে হবে পৃথিবীর মধ্যিখান দিয়ে এপার-ওপার একটা ডাণ্ডা চলে গেছে।...ওই ডাণ্ডা একটু কাত হয়ে থাকে। তাইতেই দিন-রাত ছোট-বড়ো হয় শীত-গ্রীষ্ম হয়, সে এক অদ্ভুত ব্যাপার। তা তোরা পৃথিবীর পেট ফোঁপরা করে দিচ্ছিস, হাওয়ার দাঁড়ি চারদিকে ওজন পাচ্ছে না, কাত হয়ে থাকতে পারছে না। একটু একটু করে খাড়া হয়ে উঠছে। তাই সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছে।[২৩]

উপন্যাসের ছোটো ছোটো ছেলেমেয়েরা অবাক হয়ে দেখে পাদরির তত্ত্বাবধানে পৃথিবীর ফোঁপরা পেট ভরাট করার কাজ চলছে। বিভিন্ন জায়গা থেকে রাশি রাশি বর্জ্য পদার্থ সংগ্রহ করে একটি মৃত আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখের ভেতর ঢেলে দেওয়া হচ্ছে। “পৃথিবীর চাপ খেয়ে আর ভেতরের গরম লেগে ওই রাবিশগুলোই আবার তেল হবে,ধাতু হবে, সব অভাব দূর হবে”।[২৪] ভূ-গর্ভস্থ শক্তির পুনরুৎপাদনের এই অভিনব চিন্তার মধ্যে কল্পনার আশ্রয় থাকলেও সামগ্রিকভাবে পরিবেশ ভাবনাকে অস্বীকার করা যায় না।

আধুনিক যন্ত্রসভ্যতার সম্প্রসারণের ফলে একদিকে যেমন মানুষের জীবনযাত্রার মান অনেক উন্নত হয়েছে তেমনই প্রকৃতি-পরিবেশ ও জীবজগতের ওপর নেমে এসেছে বিপর্যয়। সভ্যতা-সংস্কৃতির অহংকারে যুগের পর যুগ ধরে প্রকৃতির ওপর আধিপত্য স্থাপন করার পরিণাম এখন ভোগ করছে মানুষ। আর তার প্রথম আঁচ গিয়ে লাগছে অর্ধভুক্ত, হতদরিদ্র, প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর ওপর। পরিবেশের ওপর যারা আদৌ ততটা অত্যাচার করেনি পরিবেশ বিপর্যয়ের প্রাথমিক ফল সবার আগে ভোগ করতে হচ্ছে তাদেরই। আলোচিত উপন্যাস তিনটির মধ্য দিয়ে তিনি এই সত্যটিকেই ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন লীলা মজুমদার।

উপন্যাসের মতো লীলা মজুমদারের বিভিন্ন ছোটোগল্পেও বারবার উঠে এসেছে পরিবেশমুখী ভাবনা। ‘বনবাসী’ গল্পে লেখিকা দেখিয়েছেন কীভাবে সভ্যতার উন্নয়নের স্বার্থে প্রকৃতিকে নষ্ট করে মানুষ। তাঁর ছোটোগল্পের শিশু চরিত্ররা অনেকসময়ই আধিপত্যকামী অত্যাচারী বড়োদের হাত থেকে বন্য পশু-পাখিকে রক্ষা করে। ‘হাঁস’ গল্পের নিমাই সকৌশলে বন্ধ করে তার বাবা-কাকুর প্রতিবছর গুলি করে শ’য়ে শ’য়ে বুনো হাঁস মারার পৈশাচিক উৎসব। আবার ‘কুঁকড়ো’ গল্পে কুমুর পোষা মোরগটিকে খেয়ে ফেলেছিল যে বিরল প্রজাতির শেয়াল তাদেরই একটি বাচ্চাকে বড়োদের চোখ এড়িয়ে পশু-সংরক্ষণের লোকেদের হাতে তুলে দেয় কুমু। এভাবেই লীলা মজুমদারের গল্পের ছোটোরা পরিবেশ ভাবনার ক্ষেত্রে লেখিকার সহযাত্রী হয়ে ওঠে।

১৯৮১ সালের ২১ সেপ্টেম্বর ‘আনন্দবাজার পত্রিকা’-য় প্রকাশিত ‘কেন ছোটোদের জন্য লিখি’ শীর্ষক প্রবন্ধে লীলা মজুমদার বলেছিলেন- “কল্পনা যতই উদ্ভট হোক, তার গোড়া খুঁড়লে একটা বাস্তব শিকড় খুঁজে পাওয়া যায়।”[২৫] লীলা মজুমদারের আপাত আজগুবি গল্পগুলোর আড়াল থেকে যেভাবে সচেতন পরিবেশচেতনা ফুটে ওঠে তা এই সত্যকেই প্রমাণ করে। প্রকৃতি-পরিবেশের দ্রুত অবনমনের ফলে মানবজাতির সংকটময় ভবিষ্যৎ-এর আশঙ্কা যেকোনো চিন্তাশীল মানুষের মতো লীলা মজুমদারকেও ভাবিয়েছে। তবে পরিবেশের সংকট থেকে মুক্ত হতে বিজ্ঞানের সাহায্য নেওয়ার কথাই বারবার উঠে এসেছে তাঁর পরিবেশ-সমস্যা বিষয়ক উপন্যাসগুলোতে। আবার পরিবেশের সঙ্গে মানবজীবনের সম্পর্ক বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে উঠে এসেছে সামাজিক ও অর্থনৈতিক কাঠামোর অনেক অজানা সত্য। ছোটোদের জন্য লিখতে বসে কখনোই শুধু অর্থহীন ফ্যান্টাসি-র জগৎ নির্মাণ করেননি লীলা মজুমদার। ভবিষ্যৎ পৃথিবীর নাগরিকদের তিনি সচেতন করে দিতে চেয়েছেন পরিবেশের নানারকম সংকট সম্পর্কে। সেইসঙ্গে ছোটোদের মধ্যে জাগিয়ে তুলতে চেয়েছেন প্রকৃতির প্রতি প্রেম, জীবজগৎ-এর প্রতি সহানুভূতি। বাংলা সাহিত্যে পরিবেশবাদী সাহিত্যিকদের সম্পর্কে আলোচনা করতে গেলে তাই সেখানে লীলা মজুমদারের নাম চলে আসে অনিবার্যভাবেই।

তথ্যসূত্র:

১. Cheryll Glotfelty, Harold Fromm (Ed.), *The Ecocriticism Reader: Landmarks in Literary Ecology*, Georgia, The University of Georgia Press, 1996, p.xviii

২. সোমা মুখোপাধ্যায় (সম্পা.), *লীলা মজুমদার রচনাসমগ্র*, প্রথম খণ্ড, কলকাতা, লালমাটি, ২০০৮, পৃ.১৮৪

৩. প্রাগুক্ত, পৃ.১৮৩

৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৩
৫. Greg Garrad, *Ecocriticism*, Oxfordshire, Routledge, 2004, p.139
৬. সোমা মুখোপাধ্যায় (সম্পা.), *লীলা মজুমদার রচনাসমগ্র*, প্রথম খণ্ড, কলকাতা, লালমাটি, ২০০৮, পৃ.১৮৬
৭. প্রাগুক্ত, পৃ.১৮৬
৮. তাপস ভৌমিক (সম্পা.), *লীলা মজুমদার*, কলকাতা, কোরক, ২০০৭, পৃ.৪৫
৯. Ramachandra Guha, J.Martinez-Alier, *Varities of Environmentalism*, Delhi, Oxford University press, 1998, P.17
১০. সোমা মুখোপাধ্যায় (সম্পা.), *লীলা মজুমদার রচনাসমগ্র*, প্রথম খণ্ড, কলকাতা, লালমাটি, ২০০৮, পৃ. ১৯০
১১. সোমা মুখোপাধ্যায় (সম্পা.), *লীলা মজুমদার রচনাসমগ্র*, দ্বিতীয় খণ্ড, কলকাতা, লালমাটি, ২০০৮, পৃ.২৩৭
১২. Ramachandra Guha, J.Martinez-Alier, *Varities of Environmentalism*, Delhi, Oxford University press, 1998, P.3
১৩. সোমা মুখোপাধ্যায় (সম্পা.), *লীলা মজুমদার রচনাসমগ্র*, দ্বিতীয় খণ্ড, কলকাতা, লালমাটি, ২০০৮, পৃ.২৩৮
১৪. প্রাগুক্ত, পৃ.২৩৮
১৫. প্রাগুক্ত, পৃ.২৪৬
১৬. প্রাগুক্ত, পৃ.২৩৯
১৭. প্রাগুক্ত, পৃ.২৫৩
১৮. প্রাগুক্ত, পৃ.২৫০
১৯. প্রাগুক্ত, পৃ.২৬৬
২০. প্রাগুক্ত, পৃ.৬০৬
২১. প্রাগুক্ত, পৃ.৬০৮
২২. প্রাগুক্ত, পৃ.৬২০
২৩. প্রাগুক্ত, পৃ.৬২৪
২৪. প্রাগুক্ত, পৃ.৬২৯
২৫. প্রসাদ রঞ্জন রায় (সম্পা.), *অনন্য অন্য লীলা মজুমদার*, কলকাতা, অনুষ্টুপ, ২০১১, পৃ.৩২০

দ্বিজ কবিচন্দ্র শঙ্কর চক্রবর্তীর বিভিন্ন রচনা ও বিষ্ণুপুরী রামায়ণ

মিতালী বিশ্বাস
গবেষক, বাংলা বিভাগ, ভাষা ভবন,
বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ : মল্লভূমের কবি কবিচন্দ্র শঙ্কর চক্রবর্তী মধ্যযুগের একজন প্রথিতযশা কাব্যকার ছিলেন। বাংলাদেশের অন্যতম স্বাধীন হিন্দু রাজা অর্থাৎ মল্লরাজাদের রাজত্বকালে তিনি 'শিবমঙ্গল', 'অনাদিমঙ্গল', 'রামায়ণ', 'ভাগবতামৃত শ্রীশ্রীগোবিন্দমঙ্গল', 'মহাভারত', 'কপিলামঙ্গল'-এর মতো একাধিক কাব্য এবং বিভিন্ন ছোটো ছোটো পালা রচনা করেছিলেন। কবিচন্দ্র মল্লরাজ দ্বিতীয় রঘুনাথসিংহের রাজত্বকালে 'রামায়ণ' রচনা করেছিলেন, যা বিষ্ণুপুর অঞ্চলে বহুল প্রচলিত ও জনপ্রিয় ছিল। কবি 'বাল্মীকি রামায়ণ' ও 'অধ্যাত্ম রামায়ণ' এর অনুসরণে 'উত্তর কাণ্ড' ব্যতীত ছয় কাণ্ডের 'রামায়ণ' রচনা করেছিলেন। কবির এই সহজ, সরল, প্রাঞ্জল ও সংক্ষিপ্ত অনুবাদে তাঁর বহুমুখী কবি প্রতিভার প্রতিফলন পরিলক্ষিত হয়।

সূচক শব্দ : দ্বিজ কবিচন্দ্র শঙ্কর চক্রবর্তী, মল্লভূম, মল্লরাজ দ্বিতীয় রঘুনাথসিংহ, 'শিবমঙ্গল', 'অনাদিমঙ্গল', 'রামায়ণ', 'ভাগবতামৃত শ্রীশ্রীগোবিন্দমঙ্গল', 'মহাভারত', 'কপিলামঙ্গল', 'বিষ্ণুপুরী রামায়ণ', 'বাল্মীকি রামায়ণ', 'অধ্যাত্ম রামায়ণ', 'কৃত্তিবাসী রামায়ণ', 'উত্তররামচরিত', 'রামচরিতমানস', 'পূর্ণব্রহ্ম নারায়ণ রামচন্দ্র'।

মধ্যযুগের বেশিরভাগ কবি রাজা, জমিদার বা বিরাট কোনো ভূস্বামীর পৃষ্ঠপোষকতায় তাঁদের রচনা সৃষ্টি করেছিলেন। আর সেই রচনাতে সেই রাজার বংশ পরিচয় বা রাজ্য পরিচয় ফুটে উঠেছে। রচনার প্রেক্ষিতেও এই জিনিসগুলির অবদান যথেষ্ট। দ্বিজ কবিচন্দ্র শঙ্কর চক্রবর্তীর রচনাও এর ব্যতিক্রম নয়। দ্বিজ কবিচন্দ্র মল্লভূমের রাজসভা কবি ছিলেন। কবিচন্দ্র বিখ্যাত মল্লরাজাদের রাজত্বকালেই একে একে লিখেছিলেন 'শিবমঙ্গল', 'ধর্মমঙ্গল'-এর মতো একাধিক মৌলিক মঙ্গলকাব্য এবং 'রামায়ণ', 'মহাভারত' ও 'ভাগবত'-এর মতো বিরাট অনুবাদ কাব্য। এছাড়াও ঈশ্বর প্রদত্ত প্রতিভাসম্পন্ন কবি নিজের সমস্ত জীবনকাল জুড়ে সৃষ্টি করে গেছেন একাধিক কালজয়ী রচনা। অতুলনীয় ও অলৌকিক কবিত্ব শক্তির প্রভাবে আজীবন বিভিন্ন পৌরাণিক গ্রন্থের সুললিত অনুবাদ করার ফলে শঙ্কর চক্রবর্তী 'কবিচন্দ্র' উপাধিতে ভূষিত হয়ে তৎকালীন পণ্ডিত ও ভক্ত সমাজে বিশেষ প্রতিষ্ঠা পেয়েছিলেন। প্রখ্যাত সাহিত্যিক তারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন — "তিনি ছিলেন মল্লভূমির স্বাধীন রাজাগণের সভাকবি এবং সাহিত্য-জগতের একজন দিকপাল। মঙ্গলকাব্যে তাঁহার দান অসীম। তিনি অসাধারণ

প্রতিভা এবং অলৌকিক কবিত্বশক্তির বলে অসংখ্য কাব্যগ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার রচনা এত সুন্দর এবং সংখ্যা এত বেশী যে তাঁহাকে প্রাচীনকালের রবীন্দ্রনাথ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। আজও বাংলার প্রতিটি পুঁথিশালা কবিচন্দ্রের পুঁথিতেই সমৃদ্ধ হইয়া আছে।”[১]

মাখনলাল মুখোপাধ্যায় কবিচন্দ্রের দৌহিত্র বংশীয় একজন সাহিত্যানুরাগী পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। তিনি কবির একাধিক পুথি সংগ্রহ ও পাঠোদ্ধার করে পুস্তকাকারে প্রকাশ করেন, যেমন ‘ভাগবতামৃত শ্রীশ্রীগোবিন্দমঙ্গল’, ‘কাপাসের পালা’ ইত্যাদি। শঙ্কর কবিচন্দ্রের রচনা সম্পর্কে বিখ্যাত সাহিত্যিক চিত্রা দেব জানিয়েছেন — “আমরা তাঁর সমস্ত রচনার সন্ধান এখনো পাইনি, কোনদিন পাওয়া যাবে কিনা তাই বা কে জানে? মধ্যযুগে তাঁর মতো বিপুল সংখ্যক কাব্য এবং পালা আর কোন কবি রচনা করেছেন কিনা আমাদের জানা নেই। তাঁর একার দানেই অষ্টাদশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্য পুষ্টি লাভ করেছে। অবশ্য এই যুগের শ্রেষ্ঠ কবি রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র। কিন্তু শঙ্কর কবিচন্দ্র ছিলেন প্রাচীন ভক্তিধারার সর্বশেষ কবি। একাধিক মঙ্গলকাব্য রচয়িতারূপে সপ্তদশ শতকের কৃষ্ণরামের নাম শোনা যায় বটে কিন্তু তাঁর সকল কাব্যই তেমন বৃহৎ নয়। সেদিক দিয়ে শঙ্কর কবিচন্দ্র তিনখানি প্রধান গ্রন্থের অনুবাদক। কবিচন্দ্র ঠিক কতগুলি পালা রচনা করেছিলেন আমরা জানি না, তবে একখানি ‘হরিশচন্দ্র পালা’র পুঁথিতে দেখা যায় -

“তিন শয় ষাটি পালা আনন্দিত মনে।
কবিচন্দ্র চক্রবর্তী করিল রচনে।।”

(শ্রীঅক্ষয়কুমার কয়াল সংগৃহীত পুঁথি)”[২]

যদিও এই পালা কথাটি নিয়ে অনেক দ্বিধা রয়েছে। কবির ‘ভাগবতামৃত শ্রীশ্রীগোবিন্দমঙ্গল’ অনেকগুলি পালার সমাহারে গঠিত কিন্তু ‘রামায়ণ’ ও ‘মহাভারত’-এর সম্পূর্ণ পুথি পাওয়া যায়। তবে কবির এই তিনটি প্রধান কাব্যের অসংখ্য ছোট ছোট পুথি পাওয়া যায়। ‘সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা’র ১৩৬১ বঙ্গাব্দের প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ সংখ্যায় দ্বিজ কবিচন্দ্রের বিভিন্ন বিষয়ের ৫৮টি পুথির বিবরণ দেওয়া আছে। যেমন – ‘প্রসাদচরিত্র’, ‘গঙ্গারবন্দনা’, ‘দাতাকর্ণের উপাখ্যান’, ‘শিবরামের যুদ্ধ’, ‘উদ্ভবসংবাদ’, ‘শিবায়ন - মৎস্যধরা পালা’, ‘দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ’, ‘কাপাসের পালা’, ‘রাধিকামঙ্গল – কলঙ্কভঞ্জন’, ‘কুম্ভকর্ণের রায়বার’, ‘চিত্রকেতুর উপাখ্যান’, ‘হরিশ্চন্দ্রের পালা’, ‘লক্ষ্মণের শক্তিশেল’, ‘ভরত উপাখ্যান’, ‘শ্রীশ্রীদূর্গা’, ‘অঙ্গুরীসংবাদ’ ইত্যাদি।[৩] আর কবিচন্দ্রের ‘কপিলামঙ্গল’ কাব্যও একটি পালা আকারের রচনা। দ্বিজ কবিচন্দ্রের রচিত গ্রন্থগুলি নিচে ক্রমানুসারে সাজানো গেল —

১। ‘শিবমঙ্গল’ — ‘হরগৌরী’ লীলারসাত্মক সংসার চিত্র কাব্য।

২। ‘অনাদিমঙ্গল’ — ‘অনাদি’ বা ‘ধর্মঠাকুরে’র লীলামাহাত্ম্যমূলক কাব্য।

৩। 'বিষ্ণুপুরী রামায়ণ' —'বাল্মীকি রামায়ণ', 'অধ্যাত্ম রামায়ণ' ও 'অদ্ভুত রামায়ণ'-এর মিশ্রিত সপ্তকাণ্ড সম্বলিত একটি রামলীলা গ্রন্থ।
৪। 'ভাগবতামৃত শ্রীশ্রীগোবিন্দমঙ্গল' —'শ্রীমদ্ভাগবত'-এর সারসংগ্রহ উপাদেয় কৃষ্ণের লীলামাহাত্ম্যমূলক কাব্য।
৫। 'বিষ্ণুপুরী মহাভারত' —বেদব্যাস রচিত অষ্টাদশ পর্ব 'মহাভারত'-এর সরল পদ্যানুবাদমূলক কাব্য।
৬। 'কপিলামঙ্গল কাব্য' —স্বর্গের গাভী 'কপিল'র লীলামাহাত্ম্য বিষয়ক কাব্য।

এগুলি ছাড়াও কবিচন্দ্র কতকগুলি ক্ষুদ্র আখ্যান বা পালা রচনা করেছিলেন, যেমন – 'মশার কবিতা', 'জীবিতবাহন রাজার উপাখ্যান', 'শিবি রাজার উপাখ্যান', 'কাপাসের পালা', 'বারমাসী ছড়া', 'কলিকালের ছড়া', 'মদনমোহন বন্দনা', 'যোগাদ্যা বন্দনা', 'রাজবল্লবীর বন্দনা' ইত্যাদি। তবে শিরোনামের প্রয়োজনে আমরা কেবল কবিচন্দ্রের 'বিষ্ণুপুরী রামায়ণ' নিয়েই বিশদে আলোচনা করব।

বিষ্ণুপুরী রামায়ণ — কবিচন্দ্র শঙ্কর চক্রবর্তীর তৃতীয় রচনা এবং সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় সৃষ্টি হল 'রামায়ণ'। এই বহুল চর্চিত 'রামায়ণ'টি মল্লভূম বা বিষ্ণুপুর অঞ্চলে অধিক প্রচলিত ছিল বলে একে 'বিষ্ণুপুরী রামায়ণ' বলা হয়। সাহিত্যের ঐতিহাসিকদের মতে — "কবিচন্দ্রের গ্রন্থ বিষ্ণুপুর অঞ্চলে গীত ও পঠিত হইত এজন্য ইহা বিষ্ণুপুরী রামায়ণ নামেও প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিল।"[৪] কবিচন্দ্রের এই সর্বাধিক প্রচলিত 'রামায়ণ'টি খ্রিস্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর শেষে ও অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম দশকের মধ্যে মল্লরাজা দ্বিতীয় রঘুনাথসিংহের রাজত্বকালে রচিত হয়েছিল। কবি 'রাম ও ভরতের সাক্ষাৎ' অংশে লিখেছেন —

> "দ্বিজ কবিচন্দ্র গায় পান্বায় বসতি। রঘুনাথ সিংহের জয় কর রঘুপতি।।"[৫]

দ্বিজ কবিচন্দ্র 'বাল্মীকি রামায়ণ', 'অধ্যাত্ম রামায়ণ'এবং 'শ্রীমদ্ভাগবত'-এর নবম স্কন্ধের দশম অধ্যায় অবলম্বনে কিছুটা সংক্ষেপে ছয় কাণ্ডের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্যযুক্ত 'রামায়ণ' রচনা করেছিলেন। কবিচন্দ্রের এই ভিন্নধর্মী 'রামায়ণ' রচনা প্রসঙ্গে আমরা কয়েকটি কথা বলব।

চিত্রা দেব আমাদের আদি মহাকাব্য 'রামায়ণ' সম্পর্কে একটি মূলকথা বলেছেন। তিনি লিখেছেন — "রামায়ণে আমরা তিনটি কাহিনীর চুম্বক লক্ষ্য করি — প্রথমতঃ মানুষের গল্প বা রাম কাহিনী, ঘটনাস্থল অযোধ্যা বা পূর্বভারত। দ্বিতীয়তঃ বানরের গল্প বা বালী-সুগ্রীবের দ্বন্দ্ব, ঘটনাস্থল কিষকিন্ধা বা মধ্য ভারতের বনাঞ্চল। তৃতীয়তঃ রাক্ষসদের গল্প বা রাবণের কাহিনী, ঘটনাস্থল লঙ্কা বা দক্ষিণ ভারত। ... এই তিনটি কাহিনীর প্রধান যোগসুত্র ছিল সীতাহরণ, সীতান্বেষণ ও সীতা উদ্ধার। মহাকবি বাল্মীকির শিল্পকৌশল ও রচনা পরিপাট্যে প্রায় বিচ্ছিন্ন কাহিনীগুলি রাম কাহিনীর সঙ্গে

মিশে রামায়ণ মহাকাব্যে পরিণত হয়েছে।”[৬] আপামর বাঙালি প্রাচীনকাল থেকেই সপ্তকাণ্ড ‘রামায়ণ’-এর ধারণায় বিশ্বাসী ও অভ্যস্ত। কিন্তু কবিচন্দ্র ছয় কাণ্ড ‘রামায়ণ’ রচনা করেছিলেন। যথা – ‘আদি কাণ্ড’, ‘অযোধ্যা কাণ্ড’, ‘অরণ্য কাণ্ড’, ‘কিষ্কিন্ধা কাণ্ড’, ‘সুন্দর কাণ্ড’ ও ‘লঙ্কা কাণ্ড’; তাঁর ‘রামায়ণ’-এ ‘উত্তর কাণ্ড’ নেই। কবিচন্দ্রের অব্যবহিত পূর্বেই বাঙালির প্রাণের কবি মহাকবি কৃত্তিবাস প্রথম বাংলা ‘রামায়ণ’ রচনা করেছেন। যার ফলে ‘রামায়ণ’ বিশ্ব সাহিত্যের সীমাহীন পরিধি থেকে সমস্ত বাঙালির ঘরের আপন জিনিস হয়ে উঠেছে। কৃত্তিবাস ‘উত্তর কাণ্ড’ সমেত সাত কাণ্ড ‘রামায়ণ’ রচনা করেছিলেন। শুধু তাই নয় ‘উত্তর কাণ্ড’-এ কবি প্রতিভার প্রভূত বিচ্ছুরণ দেখা যায়। যাইহোক এই ‘উত্তর কাণ্ড’ বাদ দিয়ে ‘রামায়ণ’ রচনা ধারায় কবিচন্দ্রের আগে আরো দুইজন কবি ছিলেন। তাঁরা হলেন হিন্দি কবি তুলসীদাস ও অসমীয়া কবি মাধবকন্দলী। এঁরা তিনজনেই মধ্যযুগের কবি হলেও সময়ের দিক থেকে তুলসীদাসের ‘রামায়ণ’ সবচেয়ে প্রাচীন, তারপর মাধবকন্দলীর ‘রামায়ণ’ এবং সবশেষে শঙ্কর কবিচন্দ্রের ‘বিষ্ণুপুরী রামায়ণ’। এঁরা কেন ‘রামায়ণ’-এর ‘উত্তর কাণ্ড’ বর্জন করেছিলেন তা সঠিকভাবে জানা যায় না। বিয়োগান্তক বা করুণ রসাত্মক বলেই কি এঁরা ‘উত্তর কাণ্ড’ বর্জন করেছিলেন তা নিয়ে সংশয় আছে। ‘বিষ্ণুপরী রামায়ণ’-এ ‘উত্তর কাণ্ড’ বর্জন করা নিয়ে আমরা কয়েকটি বিষয় অনুমান করতে পারি। যেমন[৭] —

ক) বাল্মীকি রচিত ‘রামায়ণ’ সম্পর্কে আধুনিক গবেষকগণ (যেমন সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, সুকুমার সেন প্রমুখ) মনে করেন ‘উত্তর কাণ্ড’ বাল্মীকির রচনা নয়, এটি খুব সম্ভবত পরবর্তীকালের সংযোজন। ‘লঙ্কাকাণ্ড’-এ যুদ্ধের শেষে রামের মাহাত্ম্য সংযোজনকে তাঁরা প্রমাণ হিসেবে উল্লেখ করেন। শুধু তাই নয় তাঁদের মতে, মহাকবি বাল্মীকি দ্বিতীয় থেকে ষষ্ঠ কাণ্ড পর্যন্ত নরচন্দ্রমা রামচন্দ্রের কথা লিখেছিলেন। যে রামচন্দ্র অশেষ ধর্মশীল একজন মানুষ। কিন্তু ‘আদি’ ও ‘উত্তর’ কাণ্ডে রামচন্দ্র বিষ্ণুর অবতার।

খ) নারদ বর্ণিত রামোপাখ্যানে সীতার বনবাস, সীতার পাতাল প্রবেশ বা ‘উত্তর কাণ্ড’-এর কোনো ঘটনা নেই। আর ‘উত্তর কাণ্ড’-এ রামকাহিনির থেকেও রাক্ষস ও বানরদের বংশ কাহিনির ওপর বেশি জোর দেওয়া হয়েছে। এছাড়া বিভিন্ন প্রাচীন গ্রন্থতেও ‘উত্তর কাণ্ডে’র কোনো উল্লেখ নেই। ‘মহাভারত’-এর রাম উপাখ্যান বা ‘দশরথজাতক’-এ রাম-সীতার সিংহাসনারোহণেই কাহিনি শেষ হয়েছে।

গ) ‘পদ্মপুরাণ’ এর ‘পাতাল খণ্ড’ ও ভবভূতির ‘উত্তররামচরিত’-এও শেষ পর্যন্ত রাম সীতার মিলন হয়েছে। আবার বহির্ভারতীয় রামকাহিনিতেও ‘উত্তর কাণ্ড’ পাওয়া যায় না। তবে ‘উত্তর কাণ্ড’কে প্রক্ষিপ্ত ভাবার কথা সপ্তদশ, অষ্টাদশ শতাব্দীর কবি কবিচন্দ্রের পক্ষে জানা সম্ভব নয়।

ঘ) ব্যাস প্রণীত ‘মহাভারত’-এর ‘বনপর্ব’-এ রামকথা খুব সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণিত হয়েছে তবে তাতে সীতার নির্বাসন ও পাতাল প্রবেশের ঘটনা নেই।

ঙ) 'অধ্যাত্ম রামায়ণ'-এ 'উত্তরা কাণ্ড' সন্নিবেশিত হলেও 'শ্রীমদ্ভাগবত'-এর নবম স্কন্ধের দশম অধ্যায়ে রামের অযোধ্যায় প্রত্যাগমন পর্যন্ত আছে। এবং একাদশ অধ্যায়ে সীতার বনবাসের প্রসঙ্গ খুবই সংক্ষিপ্ত।

তবে হয়তো শঙ্কর চক্রবর্তী 'কৃত্তিবাসী রামায়ণ'-এর চরম কৃতিত্ব থেকে নিজের কাব্যকে স্বতন্ত্র ও বৈচিত্র্যপূর্ণ করার জন্য সম্পূর্ণ ভিন্ন ধারার ও ভিন্ন আদর্শের 'রামায়ণ' রচনা করেছিলেন। সেই আদর্শটি হল 'ভারত রামায়ণ'-এর আদর্শ ও নারদ কথিত 'রামায়ণ'-এর আদর্শ। আরেকটি গ্রন্থের সাহায্য তিনি নিয়েছিলেন সেটি হল তুলসীদাসের 'রামচরিতমানস'। লব কুশের বিবৃত 'রামায়ণ' গানই কবিচন্দ্রের 'রামায়ণ', তাই রাম সীতার সিংহাসনারোহণেই এই কাব্যের পরিসমাপ্তি।[৮]

শঙ্কর কবিচন্দ্র 'রামায়ণ' রচনা করার সময় বহু সংস্কৃত 'রামায়ণ' এবং বিভিন্ন ভাষার 'রামায়ণ' ব্যবহার করার সুযোগ পেয়েছিলেন, কারণ তিনি মধ্যযুগের একেবারে শেষ পর্বের কবি ছিলেন। 'মহাভারত' রচনা করার সময় কবিচন্দ্রকে রাজ আদেশের কথা স্মরণ রেখেই মূলানুগ অনুবাদ করতে হয়েছিল। কিন্তু 'রামায়ণ'-এর ক্ষেত্রে তাঁর অন্তরের অনুপ্রেরণায় ছিল মুখ্য। সুতরাং তিনি অবলীলায় বাল্মীকির মানুষ রামকে অধ্যাত্মের নারায়ণ-রামে পরিণত করে তুলেছেন। কবিচন্দ্র লিখেছেন —

"দ্বিজ কবিচন্দ্র কয় : শ্রীরাম মানুষ নয় : পূর্ণ ব্রহ্ম দেব নারায়ণ।
রাবণ বধের তরে : জন্মিলা রাজার ঘরে : অংশাঅংশে ভাই চারিজন।।"[৯]

সঙ্গে সঙ্গে তাঁর ভাবুক ভক্ত কবি মনটিরও আত্মপ্রকাশ ঘটেছে। আমাদের মনে হয় কবিচন্দ্র স্বেচ্ছায় তাঁর পূর্ববর্তী কবি কৃত্তিবাসকে অনুসরণ না করে একটি স্বতন্ত্র 'রামায়ণ' রচনার অনুপ্রেরণা অনুভব করেছিলেন।এবং এজন্যই তিনি বাল্মীকি, অধ্যাত্ম, প্রভৃতি সংস্কৃত 'রামায়ণ' ছাড়াও 'মহাভারত'-এর কাহিনি, পুরাণের রামকথা, তুলসীদাসের 'রামচরিতমানস' ও 'ভাগবত' থেকে উপাদান গ্রহণ করেছিলেন। এই কারণেই তিনি হয়তো বাল্মীকিকে অনুসরণ করে রামকাহিনি বর্ণনা করতে শুরু করেও রামের সিংহাসনারোহণের পরই 'রামায়ণ' শেষ করেছেন। মূল আদর্শ থেকে বিচ্যুত হওয়ার ফলে 'বিষ্ণুপুরী রামায়ণ' হয়তো খানিকটা ভারসাম্য হারিয়েছে কিন্তু তার রসাভাব ঘটেনি। কবিচন্দ্র তাঁর 'রামায়ণ-এর মূল কাঠামোটি বাল্মীকির 'রামায়ণ' থেকে সংগ্রহ করেছিলেন। তাই আপাত দৃষ্টিতে 'বাল্মীকি রামায়ণ'-এর সঙ্গে 'বিষ্ণুপুরী রামায়ণ'-এর সাদৃশ্য খুব বেশি। 'বিষ্ণুপুরী রামায়ণ'-এর 'আদি কাণ্ড' অংশটি 'বাল্মীকি রামায়ণ'-এর হুবহু সংক্ষিপ্ত অনুবাদ, শুধুমাত্র 'রাম ধীবর সংবাদ' অংশটি কবিচন্দ্র 'অধ্যাত্ম রামায়ণ' অনুসরণে রচনা করেছেন। রামচন্দ্র পাষাণী অহল্যাকে উদ্ধার করার পর যখন নৌকা করে গঙ্গা পার হচ্ছেন তখন কাণ্ডারী বলেছে প্রভুর পদধূলিতে তার জীবনতরী তড়িয়ে যাবে। এরপর 'অধ্যাত্ম রামায়ণ'-এর অনুসরণে কবিচন্দ্র 'অযোধ্যা কাণ্ড'-এ বাল্মীকির পূর্ব জীবনের কথা যোগ করে দিয়েছেন। রামচন্দ্র, সীতা ও লক্ষণকে

নিয়ে বনবাসে এসে বাল্মীকি মুনির আশ্রমে আশ্রয় নিয়েছেন, তখন বাল্মীকি মুনি বলেছেন, তিনি পূর্বজন্মে কিরাতের দেশে কিরাতের সঙ্গে ছিলেন। সেই দস্যু কিরাতদলের সঙ্গে থেকে সবসময় দস্যুবৃত্তি করে অনেক পাপ করেছিলেন। এইভাবে একদিন ধনের লোভে সাতমুনিকে হত্যা করতে গেলে, নারদমুনি তাঁকে নানা সদুপদেশের দ্বারা সেই কাজ থেকে নিরস্ত করেন। এবং তাঁকে প্রায়শ্চিত্তের পথ বাতলে নারদ বলেন —

> “এখান হইতে তুমি কোথাঅ না যাবে। মরা মরা জপিলে পরম পদ পাবে।। উপদেশ দিয়া তারা তীর্থ সেবায় গেল। মরা মরা জপিএ মুখে তোমার নাম আল্য।। বল্মীকের রাশি হল্য আমার উপরি। যোগে জপি রাম [নাম] আপনা পাসরি।। বাল্মীকি বলেন রাম তোমায় সত্য কই। সাত মুনি ফির্য়া আল্য হাজার যুগ বই।। বল্মীকে ঠেলিয়া আমি উঠিলাম সত্বর। বাল্মীকি আমার নাম থুল্যা মুনিবর।।”[১০]

‘অরণ্য কাণ্ড’ অতিসংক্ষিপ্ত ও মূলানুগ। ব্যতিক্রম বা নতুনত্ব দেখা যায় সীতান্বেষণের সময় রাম, লক্ষণের সঙ্গে মাছরাঙা পাখি ও মণ্ডূকের সাক্ষাৎ এবং ইতর প্রাণীর নাম ভক্তিতে। সীতাকে খুঁজতে খুঁজতে ক্লান্ত ও তৃষ্ণার্ত রামচন্দ্রকে জল খাওয়ানোর জন্য লক্ষণ সরোবর থেকে জল আনতে গেলে মাছরাঙ্গা পাখি বারংবার তা ফেলে দেয়। লক্ষণ রেগে গিয়ে মাছরাঙ্গা পাখিকে ধনুকের হলে বেঁধে ফেলে তার সঙ্গে একটি মণ্ডূকও বাঁধা পড়ে। রামচন্দ্র এই দৃশ্য দেখার পর মাছরাঙ্গা পাখিকে মুক্ত করে হাতের স্পর্শে তার চৈতন্য ফিরিয়ে আনে। তখন মাছরাঙ্গা নিজের আচরণের কারণ হিসেবে জানায়, বালী বানর দুন্দুভী দানবকে হত্যা করেছে। তার রক্তেই এই সরোবর তৈরি হয়েছে। বনের কোনো পশু-পাখী এই জল খাই না, তাহলে সব জেনে মাছরাঙা কিভাবে প্রভুকে সেই জল খেতে দেবে। তখন কবি লিখেছেন —

> “ভাগ্য করি মানি আমি আপন জীবন। পক্ষ হইয়া দেখি পূর্ণব্রহ্ম নারায়ণ।। অনাথের নাথ রাম দয়ার সাগর। মনে তুষ্ট হয়্যা মৎসরঙ্গে দিলা বর।। মোর হস্তের চিহ্ন ধরি পৃষ্ঠের উপর। তোমার ছোঁ বৃথা নহে আমি দিলাম বর।।”[১১]

এরপর রামচন্দ্র মণ্ডূকেও মুক্ত করে তার ব্যথা নিরসন করেন। মণ্ডূক বলে অসাধু লোক যখন আমাকে আঘাত করে তখন আমি ত্রিভুবনের নাথ প্রভু রামচন্দ্রকে স্মরণ করি, কিন্তু যখন প্রভু আমাকে আঘাত করেন তখন আমি কাকে স্মরণ করব। তখন রামচন্দ্র মণ্ডূকের কথায় তুষ্ট হয়ে তাকে বর দেন, মণ্ডূকের সর্বাঙ্গ স্বর্ণবর্ণ লেখা হবে এবং সে আট মাস ধ্যানযোগে থাকবে আর বাকি চার মাস মেঘদল বর্ষায় থেকে উচ্চঃস্বরে প্রভুর নাম স্মরণ করবে। এইভাবে রামচন্দ্র বিভিন্ন প্রাণী ও কীটপতঙ্গকে উদ্ধার করলেন। ‘কিষ্কিন্ধা কাণ্ড’ থেকে কবি কল্পনার জগতে বিচরণ করেছেন, তবে ‘বাল্মীকি রামায়ণ’-এর কাহিনি থেকে খুব দূরে সরে যাননি।

'বাল্মীকি রামায়ণ'-এর আখ্যানগুলির দিকে তাকালে দেখা যায় কবিচন্দ্র প্রধানত রাম কাহিনিটিকে 'রামায়ণ' থেকে বেছে নিয়েছেন এবং বর্জন করেছেন অন্যান্য উপাখ্যানগুলিকে, যেমন বিশ্বামিত্রের বংশ বৃত্তান্ত, গঙ্গা উপাখ্যান, সগর রাজার উপাখ্যান ইত্যাদি। সেইজন্য প্রথম থেকেই তাঁর 'রামায়ণ' তীব্র একমুখী ও সংক্ষিপ্ত। তবে 'অরণ্য কাণ্ড'-এর পর থেকে কবি বাল্মীকির নিষ্ঠা ও কাব্যের সংক্ষিপ্তিকরণ বজায় রাখতে পারেননি। 'লঙ্কা কাণ্ড'-এর অধিকাংশই কবির নিজস্ব কল্পনা। কবি বোধহয় বিভিন্ন উপাখ্যান রচনার সময় বাল্মীকিকে অনুসরণ না করে অন্যান্য গ্রন্থ থেকে রামকথা সংগ্রহ করে কাহিনির আকর্ষণ বৃদ্ধি করতে চেয়েছেন। বাল্মীকির প্রতি তাঁর নিষ্ঠা থাকলেও রচনাভঙ্গিতে তিনি মহাকবির গাম্ভীর্য ও সৌন্দর্য বজায় রাখতে পারেননি। 'বাল্মীকি রামায়ণ'-এর অযোধ্যা কাণ্ড-এর ২১/১৯ শ্লোকে লক্ষণ ক্রুদ্ধ হয়ে বলে ওঠেন —

> "হনিষ্যে পিতরং বৃদ্ধং কৈকেয্যাসক্তমানসম্।
> কৃপণঞ্চ স্থিতং বাল্যে বৃদ্ধভাবেন গর্হিতম।।"[১২]

তখন কবিচন্দ্র লিখেছেন —

> "লক্ষণ বলেন প্রভু নিবেদি চরণে। যুবতীর বশ বৃদ্ধ রাজার বচনে।।
> মূর্ছাপন্ন হয়্যা বাপা রয়্যাছে যাবদ। এইকালে অযোধ্যায় করহ রাজত্ব।।"[১৩]

এইভাবে কবি বাল্মীকির কাহিনিটি শুধু অনুসরণ করেছেন।

'অধ্যাত্ম রামায়ণ'-এর প্রধান বৈশিষ্ট্য রামকে পূর্ণব্রহ্ম নারায়ণরূপে প্রতিষ্ঠা করা। এখানে রাম, বিষ্ণুর অবতার এবং রামরূপে জন্ম গ্রহণ করেও তিনি আত্মবিস্মৃত নন। রাম সর্বজ্ঞ এবং সর্ব কর্মের নিয়ামক। রামচন্দ্রকে এভাবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য কাব্যরস কিছুটা ক্ষুণ্ণ হয়েছে, কিন্তু তার পরিবর্তে যুক্তি রয়েছে ভক্তি। শত্রু-মিত্র সকলেই এখানে রামভক্ত এবং মনে মনে রামের স্বরূপ সম্বন্ধে অবগত থাকায় সংঘাতমূলক তীব্রতাগুলি স্বাভাবিকভাবেই হ্রাস পেয়েছে। অধ্যাত্ম মতে, শিব দুর্গার কথোপকথনের মধ্য দিয়ে রামকথা ব্যক্ত হয়েছে কাহিনি মোটামুটি 'বাল্মীকি রামায়ণে'র মতো। কবিচন্দ্র শুধু বাল্মীকির পূর্বজীবনের কথা, অহল্যার পাষাণী রূপ এবং ছায়াসীতার কথা 'অধ্যাত্ম রামায়ণ'-এর অনুসরণে লিখেছেন। 'লঙ্কা কাণ্ড'-এ রাবণের মামা কালনেমির প্রসঙ্গ এবং রাবণের মৃত্যু ঘটনাতেও 'অধ্যাত্ম রামায়ণ'-এর কিছু বৈশিষ্ট্য এনেছেন, তবে তার পরিমাণ সমান্যই। 'অধ্যাত্ম রামায়ণ'-এর প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি প্রায় সবই গ্রহণ করেছেন কবিচন্দ্র। 'বাল্মীকি রামায়ণ'-এর নাটকীয়তা ও গ্রন্থসূচনা কবি বর্জন করতে পারেননি। 'বিষ্ণুপুরী রামায়ণ'-এ রাম পূর্ণব্রহ্ম নারায়ণ এবং শত্রু-মিত্র, পশু-পাখি সকলেই রামভক্ত ঠিকই, কিন্তু রামচন্দ্র নিজে আত্ম সম্বন্ধে সর্বদা সচেতন নন। কবিচন্দ্র 'বাল্মীকি রামায়ণ'-এর মতো 'অধ্যাত্ম রামায়ণ'-এরও ভাবানুবাদ করেছেন। যেমন গৌতম অহল্যাকে বলেছেন —

"দুষ্টে ত্বং তিষ্ঠ দুর্বৃত্তে শিলায়ামাশ্রমে মম।
নিরাহারা দিবারাত্রং তপ পরমমাস্থিতা।
আতপানিলবর্ষাদি-সহিষ্ণুঃ পরমেশ্বরম্।
ধ্যায়ন্তী রাম রামেতি মনসা হৃদি সংস্থিতম্।" (আদি ৫। ২৬-২৮)[১৪]

আর কবিচন্দ্র লিখেছেন —

"ইন্দ্র সঙ্গে ভূঞ্জ রতি ভয় নাই লো যমে। পাষাণ হইয়া থাক আমার আশ্রমে।।
… … …
দুষ্টা নহে বটে সতী : তার রীত জানে পতি : কৃপা কইর‍্যা কহে গুণধাম।
হাজার বছর রহ : শীত তাত বৃষ্টি সহ : তোমারে তারিবেন আস্যা রাম।"[১৫]

'যোগাবশিষ্ঠ রামায়ণ' ও 'অদ্ভুত রামায়ণ'-এর সঙ্গে 'বিষ্ণুপুরী রামায়ণ'-এর কোনো যোগ নেই। বলাবাহুল্য এই 'রামায়ণ'গুলি 'বাল্মীকি রামায়ণ'-এর পরবর্তীকালে রচিত হয়েছে।

আমরা আগেই বলেছি, কবিচন্দ্র 'মহাভারত' ও 'ভাগবত' পুরাণের 'নবমস্কন্ধ' থেকে রামকাহিনি সংগ্রহ করেছেন। এবং কবিচন্দ্রের 'রামায়ণ'-এর সঙ্গে 'মহাভারত'-এর রামকাহিনির সাদৃশ্য যেন বেশি। রাম সীতার সিংহাসনারোহণেই কাহিনি শেষ হওয়া ছাড়াও 'মহাভারত'-এ রয়েছে অঙ্গদের দৌত্য, কবিচন্দ্রের 'রামায়ণ'-এ এটি খুব উল্লেখযোগ্য ঘটনা। 'ভাগবত'-এর 'নবম স্কন্ধে'র একাদশ অধ্যায়ে 'উত্তর কাণ্ড'-এর ঘটনা রয়েছে। লক্ষণীয় যে, কবিচন্দ্র তাঁর 'রামায়ণ'-এ খুব সচেতনভাবেই নবম স্কন্ধের দশম অধ্যায়ের ঘটনাকেই গ্রহণ করেছেন। 'সুন্দর কাণ্ড'-এ 'রাবণের জাঙ্গালদর্শন', 'জাঙ্গাল ভাঙ্গা' এবং 'জাঙ্গালে শিবলিঙ্গ স্থাপন' ইত্যাদি অংশে আমরা দেখি নল ও নীল সীতা উদ্ধারের জন্য সমুদ্রের উপর সেতুবন্ধন শুরু করেন। কিন্তু রাবণ সমুদ্রে সেতুবন্ধন দেখতে এসে সেই সেতু ভেঙে দেয়। এই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটতে পারে, এইজন্য বিভীষণ রামচন্দ্রকে বুদ্ধি দেন —

"আজনম শিব সেবা করে দশানন। প্রাণ গেলে শিবলিঙ্গ না করে চালন।।
চিন্তা ছাড় শুন প্রভু আমার বচন। জাঙ্গালপর শিবলিঙ্গ করহ স্থাপন।।
তিন যোজন করি নিত্য বাঁধিবে সাগর। তবে শিবলিঙ্গ স্থাপ তাহার উপর।।"[১৬]

ফলতঃ রাবণ রাজা পুনরায় জাঙ্গাল ভাঙতে এসে শিবলিঙ্গ দেখে তা থেকে বিরত থাকে। এই কাহিনিটি কবিচন্দ্র 'শিবপুরাণ' থেকে নিয়েছেন। রামের দেবী পূজার কথা 'কালিকাপুরাণ' ও 'দেবীভাগবত'-এ আছে। কবিচন্দ্রও রামকে দিয়ে দেবীর পূজা করিয়েছেন।[১৭]

নিজের কাব্যে নতুনত্ব সৃষ্টির জন্য কবিচন্দ্র ভাষা ‘রামায়ণ’গুলিও ব্যবহার করেছেন তুলসীদাসের ‘রামচরিতমানস’-এর ভক্তিরস তাঁর কাব্যে ঘনীভূত হয়ে উঠেছে। এছাড়া ‘অঙ্গদ রায়বার’-এর অম্লমধুর উপাখ্যানটি তিনি তুলসীদাসের ‘রামায়ণ’ থেকেই গ্রহণ করেছেন। বাল্মীকি অঙ্গদের দৌত্যের কথা বলেননি কিন্তু বাংলা ‘রামায়ণ’-এ ‘অঙ্গদ রায়বার’ একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ১৮০৩ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত ‘কৃত্তিবাসী রামায়ণ’-এ অতি সংক্ষেপে ‘অঙ্গদ রায়বার’ বর্ণিত হলেও পরবর্তীকালে ‘কৃত্তিবাসী রামায়ণ’-এ তার ব্যাপকতা দেখা যায়। কিন্তু ‘কৃত্তিবাসী রামায়ণ’-এর পুথিতে ‘অঙ্গদ রায়বার’-এর ব্যাপকতা অনুপস্থিত। এটি কবিচন্দ্রেরই রচনা। ‘অঙ্গদ রায়বার’-এর অনুকরণে ‘কুম্ভকর্ণের রায়বার’, ‘বিভীষণের রায়বার’, ‘সূর্পনখার রায়বার’, ‘কালনেমির রায়বার’ ইত্যাদির সৃষ্টি হয়েছে। কবিচন্দ্র স্বয়ং ‘অঙ্গদ রায়বার’ এবং ‘কুম্ভকর্ণের রায়বার’ রচনা করেছেন। তুলসীদাসের সঙ্গে কবির ‘অঙ্গদ রায়বার’-এর বেশ মিল দেখা যায়। তুলসীদাস লিখেছেন —

“বালি বিমল জস ভাজনু।
হতউ ন তোহি অধম অভিমানী।।
কহু রাবন রাবন জগ কেতে।
মৈঁ নিজ শ্রবণ শুনে সুনু জেতে।।
বলিহি জিতন একু গয়উ পতালা।
রাখা বাঁধি সিসুন্হ হয়সালা।।”[১৮]

আর কবিচন্দ্র লিখেছেন —

> “কোন বাপ তোর জিন্যাছিল তিন লোকে। কোন বাপ কোথা গেল বল দেখি মোকে।। কোন বাপ উচ্ছিষ্ট সে খাইল পাতালে। কোন বাপ বন্দী ছিল অর্জুন-অশ্বশালে।। কোন বাপ যম জিনিতে গেল রে দক্ষিণ। মান্ধাতার বণে কেবা দাঁতে কৈল তৃণ।। কোন বাপ জব্দ হৈল জমদগ্নি-তেজে। কোন বাপকে মোর বাপ বান্ধ্যাছিল লেজে।।”[১৯]

ফকিররাম, খোসাল শর্মা প্রমুখ কবিরা হিন্দিতে বা হিন্দি বাংলা মেশানো এক জগাখিচুড়ি ভাষায় রায়বার লিখেছেন। তবে খোসাল শর্মাকে গোপীচন্দ্রের পূর্ববর্তী কবি বলে মেনে নেওয়া কঠিন।[২০]

‘বিষ্ণুপুরী রামায়ণ’-এর দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য আখ্যান হলো ‘শিবরামের যুদ্ধ’। বিজু লক্ষণ ভণিতায় ‘শিবরামের যুদ্ধ’ পাওয়া যায়। ইনি যদি কবিচন্দ্রের পূর্ববর্তী না হন, তা হলে ধরে নিতে হবে কবিচন্দ্রই এই কাহিনির স্রষ্টা। এছাড়া আমরা জানি শঙ্করের একটি পুত্রের নাম লক্ষণ। সাহিত্যিক চিত্রা দেব লিখেছেন — “কবিচন্দ্রের রামায়ণের শিবরামের দ্বন্দ্ব আমাদের মনে দক্ষিণ ভারতীয় রামায়ণের হরিহর দ্বন্দ্বের কাহিনি স্মরণ করায়। তাঁর কাব্যে আরো দেখা যায়, শিবের কণ্ঠস্থিত ছয়রাগ রামানুচর। শত্রুরূপে

ভজনা করে তারা রামের হাতে মৃত্যুবরণ করেছে ও শিবসঙ্গে মিলিত হয়েছে।”[২১]‘লঙ্কা কাণ্ড’-এ কবিচন্দ্র সবচেয়ে বেশি স্বাধীনতা গ্রহণ করেছেন। ‘অঙ্গদ রায়বার’ ছাড়াও এতে আছে বিভীষণ পুত্র তরণী ও অরনীর যুদ্ধ, মহীরাবণ ও অহীরাবণ বধ, সীতা ও সরমা সাক্ষাৎকার এবং রাম-সীতার পুষ্পবাসর ইত্যাদি কাহিনি। তরণী ও মহীরাবণের কথা ‘কৃত্তিবাসী রামায়ণ’-এও আছে। তবে কবিচন্দ্রের ‘রামায়ণ’-এ এইসব অপ্রধান আখ্যান বিশেষ প্রাধান্য লাভ করেছে।

‘কৃত্তিবাসী রামায়ণ’-এর সঙ্গে ‘বিষ্ণুপুরী রামায়ণ’-এর যথাযথ কোনো সাদৃশ্য আছে কিনা তা সঠিক বলা যায় না। তবে ‘বিষ্ণুপুরী রামায়ণ’-এর অনেক কাহিনি ‘কৃত্তিবাসী রামায়ণ’-এর মধ্যেও আমরা দেখতে পায়। বাংলাদেশী যে ক’টি ‘রামায়ণ’ খুব জনপ্রিয় হয়েছিল তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো ‘কৃত্তিবাসী রামায়ণ’ ও ‘বিষ্ণুপুরী রামায়ণ’। কৃত্তিবাস আপামর বাঙালির প্রাণের কবি হলেও বাঁকুড়া, বিষ্ণুপুর অঞ্চলে একসময় ‘বিষ্ণুপুরী রামায়ণ’ অপরিসীম জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। এখনো ওই অঞ্চলের ছৌ নাচে ও বিভিন্ন লোকগীতিতে ‘বিষ্ণুপুরী রামায়ণ’ অনুসৃত হয়। চিত্রা দেব জানিয়েছেন —

> কৃত্তিবাসী রামায়ণ বাঙালী সংসারের চিত্ররূপ। সুখে-দুঃখে, মায়া-মমতায়, কর্তব্যে ও কর্মে বাঙালী জীবনেরই এক নিখুঁত প্রতিচ্ছবি। তাঁর রামায়ণে রাম-লক্ষণ কর্তব্যপরায়ণ বাঙালী। সীতা পতিব্রতা বাঙালি বধূ। রাবণের স্বর্ণলঙ্কা যেন বাংলাদেশেরই একটি সমৃদ্ধ নগরী।
>
> শঙ্কর কবি চন্দ্রের বিষ্ণুপুরি রামায়ণ জনপ্রিয় হয়েছিল এবং মজার কথা এই যে কৃত্তিবাসী রামায়ণের যেসব অংশ অধিক জনপ্রিয় তার অনেকগুলি শঙ্কর কবিচন্দ্র রচনা বিষ্ণুপুরী রামায়ণের অনেক কাহিনী ঈষৎ পরিমার্জিত করে সম্পাদকরা কৃত্তিবাসী রামায়ণের অঙ্গীভূত করেছেন এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য- অঙ্গদ রায়বার, তরণীর যুদ্ধ, ভরত কর্তৃক হনুমান বাঁটুল নিক্ষেপ ইত্যাদি। ... প্রচলিত কৃত্তিবাসী রামায়ণ কিছুটা সাজানো-গোছানো, গ্রাম্যতাবর্জিত ও পরিমার্জিত। কুশলী শিল্পীর সুনির্বাচিত ভাষাসূত্রে কাব্যমালিকা গ্রথিত। আর কবিচন্দ্রের কাব্যকুসুম সদ্য আহরিত, তার ভাষায় মধ্যযুগীয় অপেলবতা, কিন্তু ছন্দে সহজ কলতান। এই বৈশিষ্ট্যের কথা মনে রেখেই বিষ্ণুপুরী রামায়ণের স্বাদ গ্রহণ করতে হবে।[২২]

অতিরিক্ত সংক্ষেপণের জন্য কবিচন্দ্র কাব্যের চরিত্রগুলির প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দিতে পারেননি। ভক্তবৎসল রাম, অবনতমুখী সীতা, অনুগত ভক্তবৃন্দ ও ভক্ত হনুমান প্রথানুগ কিন্তু রাক্ষস চরিত্র অঙ্গনে কবি নতুনত্ব এনেছেন। অন্তরে যারা রামভক্ত বাইরে তারা শত্রুভাবে রামের সঙ্গে যুদ্ধ করছে এবং রামের হাতে মৃত্যুবরণ করছে। এই পরিকল্পনায় সংগ্রামের তীব্রতা হ্রাস পেলেও রাক্ষস চরিত্রগুলি উন্নত হয়েছে। কোনো

বিস্তৃতির দিকে কবি যাননি তবে সেই অভাব কিছুটা পূরণ করেছেন বাস্তব জীবন থেকে নেওয়া উপমা প্রয়োগ করে। 'অঙ্গদ রায়বার' ও অন্যত্র কবি লিখেছেন —

> "কি কাজ আঁকড়ি যদি হাতে ফুল পাই। সেবকে হইলে কার্য আপনি না যাই।।"[২৩] বা "রাজার পাপে রাজ্য নষ্ট প্রজা কষ্ট পায়। গৃহিণী পাপে গৃহ নষ্ট লক্ষ্মী উড়্যা যায়।। পাপে গুরু মজে নারীর পাপে পতি। তোর বাপে মজে বেটা লঙ্কার বসতি।।"[২৪]

কোনো কোনো বর্ণনায় কাহিনি নিটোল রস-রূপ লাভ করেছে। সরমা সীতাকে সেতুবন্ধনের সংবাদ দিলে সীতা মনের আনন্দে অশোক ফুলের মালা গাঁথতে বসেন রামকে পড়াবেন বলে। আকাশে মেঘ দেখে তাঁর রামের কথা মনে পড়ে। কবিচন্দ্র লিখেছেন —

> "যখন বসিয়া থাকিয়া অশোকের বনে। আকাশেতে মেঘ দেখি রাম পড়ে মনে।। নীল মেঘে বিজুরি সঘনে গরজন। আমি বলি আইলো মোর কমললোচন।।"[২৫]

এই ধরনের বহু দৃষ্টান্ত আমরা কাব্য জুড়ে দেখতে পায়। কবিচন্দ্রের সৃষ্টির এই বিশিষ্টতার জন্য শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁকে মধ্যযুগের একজন শ্রেষ্ঠ কবি বলেই চিহ্নিত করেছেন।[২৬] কবিচন্দ্রের এই প্রাঞ্জল সহজ, সরল ভাষায় কাব্য রচনা সম্পর্কে সাহিত্যের ইতিহাসকার লিখেছেন — "কবিচন্দ্র শঙ্কর রামায়ণ রচনায় বিশেষ কোনো উৎকৃষ্ট ঐতিহ্য সৃষ্টি করে না পারলেও রামায়ণের কোন কোন কাহিনী সরল ভাষায় রচনা করিয়া অষ্টাদশ শতাব্দীতে বিষ্ণুপুর অঞ্চলে বেশ জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছিলেন।"[২৭]

শঙ্কর কবিচন্দ্র, তাঁর রামকথায় রামচন্দ্রের দেবত্বভাবের প্রকাশ ঘটালেও কোথাও আবেগের আতিশয্যে পর্যবসিত হয়নি। তাই রামচন্দ্র কখনো নিজেকে ঈশ্বর বলে প্রকাশ করেনি তাঁর কাব্যে। তবে তিনি সর্বত্র নররূপী নারায়ণ, প্রভু এবং দূর্বাদলশ্যামরূপে বর্ণিত হয়েছেন। 'শ্রীমদ্ভাগবত'-এর তটস্থভাবের মতো কবিচন্দ্রও রামচন্দ্রের ঈশ্বরত্ব বর্ণনায় সর্বদা সংযম রক্ষা করেছেন। তাঁর কাব্যের পালাগুলির সংক্ষিপ্ততা এবং বাহুল্যবর্জিততা তাঁর রচনায় অন্যতম বিশিষ্টতার সাক্ষ্য বহন করে করছে। আর কাব্যসুষমা ও ছন্দলালিত্যে কবিচন্দ্রের 'রামায়ণ' অন্য সকল রচনার মধ্যে প্রকৃতার্থেই শ্রেষ্ঠ।

তথ্যসূত্র :

১. পানুয়ার ইতিকথা; তারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়; প্রকাশক – পানুয়া রামকৃষ্ণ সাধারণ পাঠাগার, পানুয়া, বাঁকুড়া; প্রথম প্রকাশ ১৯৬০ খ্রিস্টাব্দ; পৃষ্ঠা – ৭।

২. বিষ্ণুপুরী রামায়ণ; কবিচন্দ্র শঙ্কর চক্রবর্তী; সম্পাদনা – চিত্রা দেব; প্রকাশিকা – তনুশ্রী দেবী; সাকচী, জামসেদপুর; প্রথম প্রকাশ – অক্ষয় তৃতীয়া, ১৩৬৭ বঙ্গাব্দ; পৃষ্ঠা - ভূমিকা XiV। [অতঃপর বইটি বিষ্ণুপুরী রামায়ণ; কবিচন্দ্র শঙ্কর চক্রবর্তী; সম্পাদনা – চিত্রা দেব; নামে উল্লিখিত হবে।]

৩. সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ সংখ্যা, ১৩৬১ বঙ্গাব্দ; পত্রিকাধ্যক্ষ – শ্রীত্রিদিবনাথ রায়; প্রবন্ধ – "বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ"; প্রাবন্ধিক – শ্রীতারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য; বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, কলকাতা ৬;পৃষ্ঠা - ৪৫-৫২, ১০৪-১০৫, ১৫৩-১৬০, ২২৯-২৩৬।

৪. বাঙ্গালা সাহিত্য, দ্বিতীয় খণ্ড; মণীন্দ্রমোহন বসু; কমলা বুক ডিপো, ১৫ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট, কলকাতা; প্রথম প্রকাশ : ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দ; পৃষ্ঠা - ১৪৭।

৫. বিষ্ণুপুরী রামায়ণ; কবিচন্দ্র শঙ্কর চক্রবর্তী; সম্পাদনা – চিত্রা দেব; পৃষ্ঠা – ৩৯।

৬. প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠা - ভূমিকা XVii-XViii।

৭. প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠা - ভূমিকা XXi – XXii।

৮. প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠা - ভূমিকা XXiV।

৯. প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠা – ২১।

১০. প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠা – ২৭।

১১. প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠা – ৪৮।

১২. প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠা – ভূমিকা XXV।

১৩. প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠা – ২০।

১৪. প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠা - ভূমিকা XXVi।

১৫. প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠা – ১০-১১।

১৬. প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠা – ৮৭।

১৭. প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠা - ভূমিকা XXVi।

১৮. প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠা - ভূমিকা XXVii।

১৯. প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠা – ৯৮।

২০. প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠা - ভূমিকা XXVii।

২১. প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠা - ভূমিকা XXViii।

২২. প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠা - ভূমিকা XXViii-XXiX।

২৩. প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠা – ৯৫।

২৪. প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠা – ১০১।

২৫. প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠা – ৯৪।

২৬. সাহিত্য ও সংস্কৃতি তীর্থ সঙ্গমে, সাহিত্য, ধর্ম ও সংস্কৃতি বিষয়ক প্রবন্ধ সংগ্রহ; শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়; মডার্ন বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ১২; প্রথম প্রকাশ বৈশাখ ১৩৬৭ বঙ্গাব্দ; পৃষ্ঠা – ১০৩।
২৭. বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, তৃতীয় খণ্ড, দ্বিতীয় পর্ব; অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়; মডার্ন বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ৭৩; পুনর্মুদ্রণ ২০১১-২০১২; পৃষ্ঠা -২২৬।

ঔপনিবেশিক আমলে বাংলায় জাতিকাঠামোয় ভূমিজ উপজাতির উৎস সংক্রান্ত পর্যালোচনা

পিন্টু চৌধুরী
গবেষক, সেন্টার ফর আদিবাসী স্টাডিজ এণ্ড মিউজিয়াম,
বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপঃ বহু ভাষা ও সংস্কৃতির দেশ ভারতবর্ষে সুপ্রাচীনকাল থেকেই জাতিব্যবস্থা ভারতীয় সমাজের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে আছে। জাতিব্যবস্থা নিয়ে অনেক লেখালেখি হলেও ভূমিজদের নিয়ে আলোচনা অপ্রতুল। জাতিব্যবস্থার (Caste) ক্ষেত্রে ট্রাইব, ইণ্ডিজেনাস পিপল্স, অ্যাবরিজিন্স, আদিবাসী, উপজাতি শব্দগুলি জড়িত। ভূমিজরা উপজাতির মধ্যেই পড়ে, 'উপজাতি' মূলত নিম্নবর্ণের মানুষদের বোঝানো হয়েছে। যাঁরা সমাজের মূল স্রোত থেকে কম বেশি বিচ্ছিন্নভাবে বসবাস করে। ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে উপজাতির সংজ্ঞায় ভাষার এক বিশেষ ভূমিকা রয়েছে এবং সাধারণভাবে সমভাষী গোষ্ঠীকেই উপজাতি আখ্যায় চিহ্নিত করা হয়েছে। উপজাতি ঔপনিবেশিক নির্মাণ; তা বুঝতে গেলে আদিবাসী আন্দোলন গুলির আঞ্চলিক বিস্তৃতি স্পষ্ট হয়। উপজাতি নির্মিতি ব্রিটিশদের কাজ নয়, বহু আগে থেকেই সামাজিক কাঠামোয় তার অস্তিত্ব গড়ে উঠেছিল। ভারতের অন্যান্য প্রদেশের মত বাংলাতেও বিভিন্ন জাতির মানুষ সুপ্রাচীনকাল থেকে বসবাস করে আসছে। বাংলার ভৌগোলিক অঞ্চল বিশেষ করে সুবর্ণরেখা নদীর দুই তীরবর্তী, ছোটনাগপুর মালভূমির পশ্চিমপ্রান্ত, অযোধ্যা পাহাড়ের পূর্বদিক সংলগ্ন এলাকা, দক্ষিণ সিংভূম, মানভূমের উত্তর, হাজারিবাগ সন্নিহিত অঞ্চলে ভূমিজ উপজাতির বসবাস। ভূমিজদের 'Autochthon' বলা হয়, তাঁদের কাঠামোগত অবস্থান, উৎসের উপর আলোকপাত করেছি।

সূচক শব্দঃ উপজাতি, ভূমিজ, Proto-Austroloid, কোলারিয়ান, Autochthon, মুণ্ডা, ভূমিজানী।

জাতিভেদ প্রথা বা বর্ণাশ্রম প্রথা বংশানুক্রমিক ভাবে ভারতীয় সমাজে জটিল রুপ ধারণ করেছিল, এই প্রথা ভারতীয় সমাজের গতিপ্রকৃতিকে বিভিন্নভাবে নিয়ন্ত্রিত করেছে। এই জাত ব্যবস্থার মধ্যেই ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলের ইতিহাসের গতি প্রতিফলিত হয়েছে। ভারতীয় সমাজের পাশাপাশি বাংলার সমাজের ওপর দৃষ্টিনিক্ষেপ করলে বোঝা যায় জাত ব্যবস্থার জটিল রুপ। বৃহদ্ধর্মপুরাণ ও ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে বাংলার সমাজের জাতিভেদ প্রথার সুষ্পট ধারণা পাওয়া যায়। বৃহদ্ধর্মপুরাণে মিশ্রবর্ণের উদ্ভবের কথা উল্লিখিত হলেও ভূমিজের উল্লেখ নেই।

জাতিকাঠামোয় ভূমিজ উপজাতি

১৮৭১-৭২ সালে বেভারলি প্রথম আদমসুমারিতে বাংলার বর্ধমান, বীরভূম, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, হুগলি, হাওড়া, ২৪-পরগণা, নদীয়া, যশোহর, মুর্শিদাবাদ, দিনাজপুর, মালদহ, রাজশাহী, রংপুর, বগুড়া, পাবনা, দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, ঢাকা, ফরিদপুর, বাখরগঞ্জ, সিলেট, কাছাড়, চট্টগ্রাম, নোয়াখালি, ত্রিপুরা, পার্বত্য অঞ্চল সহ সাতাশটি জেলার বর্গীকরণ অন্যান্য জনগোষ্ঠীর মত ভূমিজদের জীবনযাত্রার ধরণকে জানার কাজ সহজ করে দিয়েছেন।[১] পশ্চিমবঙ্গ ছাড়াও ধলভূম, বরাভূম, মানভূম, বাগমুণ্ডী ও তার সন্নিহিত আঞ্চলের অধিবাসী হল ভূমিজ।[২] বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের চারটি বৃহৎ উপজাতি গোষ্ঠী; সাঁওতাল (৪৭.৪৩%), ওঁরাও (১২.১৫%), ভূমিজ (৭.১০%) এবং মুণ্ডা (৬.৯২%)। ভূমিজরা পশ্চিমবঙ্গের তৃতীয় বৃহত্তম তপশিলী উপজাতি। ভূমিজদের মূলত পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়া ও বাঁকুড়ায় বেশি দেখা যায়। পশ্চিমবঙ্গের সর্বত্রই ভূমিজরা তপশিলী উপজাতি (Scheduled Tribe)। ব্যতিক্রম পূর্ণিয়া জেলা, এখানে ভূমিজদের পরিচয় তপশিলী জাতি (Scheduled Caste)। ১৯৬১ -র সরকারী নথিতে পশ্চিমবঙ্গের ভূমিজদের Proto-Austroloid শ্রেণীর অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে।[৩] ভুমিজরা মুণ্ডারিদেরই গোষ্ঠীভূক্ত। নৃবিজ্ঞানীরা মুণ্ডাদের Australoid বলেছেন এবং চারিত্রিক বৈশিষ্ঠ্যের দিক থেকে অস্ট্রেলিয়ান আদিম অধিবাসীর সমগোত্রীয় মনে করেন। ২০১১ র আদমসশুমারি অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গে ভূমিজদের সংখ্যা ৩,৭৬,২৯৬ জন।[৪]

১৯৩৫ এর ভারতশাসন আইন (Govt. of India Act) অনুযায়ী ১৯৩৬- র The Govt. of India (Scheduled Castes) Act -এ Depressed Class বা Depressed Caste এর পরিবর্তে বাংলাতে ৭৬ টি নিম্নবর্ণ জাতিকে Scheduled Caste এর অন্তর্ভূক্ত করা হয়।[৫] এই ৭৬ টি নিম্নবর্ণ জাতির ১৩ টি জাতি (Caste) পরবর্তী সময়ে Scheduled Tribe হিসেবে পরিগণিত; সাঁওতাল, ওঁরাও, মুণ্ডা, ভূমিজ, বেদিয়া, গারো, টোটো, কোড়া, লোধা, মাহালি, মেচ, রাভা, নাগেশিয়া। ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দের The Constitution (Scheduled Tribes) Order মোতাবেক Scheduled Tribe দের প্রথম পৃথক তালিকা প্রকাশ পায়, এই তালিকায় পশ্চিমবঙ্গে ৪০ টি উপজাতি (Scheduled Tribe) অন্তর্ভূক্ত হয়। The Scheduled Castes and Scheduled Tribes Orders (Amendment) Act ১৯৭৬ এর আদেশনামা অনুযায়ী ৩৮ টি নিম্নবর্ণীয় জাতিকে পশ্চিমবঙ্গে Scheduled Tribes এর অন্তর্ভক্ত করা হয়, যার মধ্যে ভূমিজরাও Scheduled Tribe হিসেবে পরিচিত।[৬]

উৎস ও আদি বাসভূমি সংক্রান্ত পর্যালোচনা

ভূমিজ উপজাতির উৎসকে কেন্দ্র করে নানান ধরণের বক্তব্য পাওয়া যায়। মানভূম, সিংভূম ও বাংলার পশ্চিমপ্রান্তের ভূমিজ জাতিকে ডালটন সহ অনেকেই ভষাগত দিক থেকে কোলারীয় বলে অভিহিত করেছেন এবং ভূমিজরা মুণ্ডা শ্রেনীভূক্ত ছিল, এ বিষয়ে

কোন সন্দেহ নেই। ছোটনাগপুরের মুণ্ডাদের সাথেই ভূমিজরা ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিল। ঐতিহাসিক ভাবে অন্যান্য 'কোলারিয়ান' ভাষা গোষ্ঠীর মধ্যে ভূমিজরাও ছিল সবচেয়ে প্রভাবশালী, এর দরুণ তাঁরা মেদিনীপুরের পশ্চিমাংশ, যা বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা এবং ঝাড়খণ্ডের পূর্ব সিংভূম ও সরাইখেলা জেলায় আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেছিল। তাঁদের এই আধিপত্য শুধুমাত্র সংখ্যাধিক্যের জন্য নয় বরং এর দাবিদারও তারা ছিল। কেবলমাত্র রাজা বা জমিদার হওয়ার ইতিহাস নয়, প্রাথমিকভাবে ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে অংশগ্রহণও করেছিল। এই অঞ্চলে কেবল ভূমিজ উপজাতি নয় পাশাপাশি কুর্মি-মাহাতো, লোধা উপজাতিরাও বসবাস করত। ভূমিজরা ইতিহাসের পাতায় স্মরণীয়, কারণ তারা 'চুয়াড়' নামেও পরিচিত এবং এই চুয়াড় শব্দটি ব্রিটিশ বিরোধী প্রতিরোধ সংগ্রামের সঙ্গে সম্পর্কিত। কিন্তু সময়ের সাথে সাথে তাদের সংখ্যা হ্রাস পেয়েছে এবং এই অঞ্চলে রাজা বা জমিদার হিসেবে অথবা ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হিসেবে তাদের বারবার প্রতিদ্বন্দ্বীতার মুখে পড়তে হয়েছে। কাঁসাই বা কংসাবতী ও সুবর্ণরেখা নদীর উভয় তীরের পার্বত্য অরণ্যভূমি, ছোটনাগপুর মালভূমি থেকে অযোধ্যা পাহাড় পর্যন্ত বিস্তীর্ণ অঞ্চলেই ভূমিজদের বাসস্থান। ভূমিজরা বিহারের সিংভূম, হাজারিবাগ, রাঁচি, ধানবাদ, পুরুলিয়া এবং পশ্চিমবঙ্গের মেদিনীপুর ও বাঁকুড়াতে বাস করত। পশ্চিমবঙ্গের ভূমিজদের আদি বাসভূমি হল; ধলভূম, বরাভূম, পাটকূম, বাগমুণ্ডী। দৈহিক বৈশিষ্ট্যে ভূমিজরা সিংভূমের হো অপেক্ষা হীন হলেও ছোটনাগপুরের মুণ্ডাদের অপেক্ষা শ্রেয়। দৈহিক বর্ণের পার্থক্য থাকলেও সাধারণত তাদের গাঢ় হালকা পিঙ্গল বর্ণের চেহারা দেখা যায়।[৭]

গেইট ছোটনাগোপুরের ভূমিজদের নয়টি খণ্ডজাতির কথা বলেছেন; কোল, মুণ্ডা, ঠাকুর, মানকি, দেশি, বড়ভূমিয়া, শিখরিয়া, পাতকুমিরা, তামারিয়া। এদের মধ্যে প্রথম চারটি খণ্ডজাতি মানভূমে দেখা যায় এবং তাদের সমাজে স্থান ক্রমানুসারে, বাকি খণ্ডজাতি গুলো সিংভূমে দেখা যায়। কিন্ত ভূমিজদের কোন খণ্ডজাতি একে অপরের অন্তর্ভূক্ত হতে পারে না। প্রসঙ্গত বলা যায়, মানভূমে সকল ভূমিজদের পঞ্চায়েত আছে কিন্তু সিংভূমে প্রতিটি খণ্ডজাতিরই পৃথক পঞ্চায়েত ব্যবস্থা।[৮] সুতরাং মানভূম ও সিংভূমে ভূমিজরা জাতিগত দিক থেকে এক হলেও শাসন ব্যবস্থা পৃথক। অযোধ্যা পাহাড় সংলগ্ন ভূমিজরা বাংলা ভাষায় যেমন কথা বলে, তেমনি তারা নিজেদের ভূমিজ বা সর্দার বলে পরিচয় দেয়। Risley ভূমিজ উপজাতির উৎস সম্পর্কে বলেছেন, 'Bhumij are nothing more than a branch of the Mundas, who have spread to the eastword, mingled with the Hindus, and thus for the most part severed their connexion with the parent tribe, the Bhumj of western Manbhum are beyond doubt pure Mundas'.[৯]

এছাড়াও S. C. Roy বলেছেন, "It is only with the Bhumijs of Pargana Patkum which adjoins the Tamar Pargana of the Ranchi

district, that the Mundas of Tamar side still inter-marry. In fact the Bhumij-Mundas of Tamar and adjoining Parganas of the Manbhum district would appear to belong to the same tribe as the Mundas".[১০] সুবর্ণরেখা নদীর দুই তীরবর্তী অঞ্চল, ছোটনাগপুর মালভূমির পশ্চিমপ্রান্ত, অযোধ্যা পাহাড়ের পূর্বদিক সংলগ্ন এলাকা, দক্ষিণে সিংভূম এবং উত্তরে মানভূম, হাজারিবাগ ও লোহাডোগরার সন্নিহিত অঞ্চলে ভূমিজরা বসবাস করেন, আবার এই অঞ্চলেই বৃহৎ সংখ্যক মুণ্ডাদের কবরস্থান বা কবরখানা পাওয়া গেছে, তাই স্বাভাবিকভাবে ধরেই নেওয়া হয় এই অঞ্চলে মুণ্ডাদের আদি বসবাস ছিল এবং ভূমিজরা মুণ্ডাদেরই সমগোত্রীয় বা স্বজাতীয়। W. W. Hunter ভূমিজদের সম্পর্কে বলেছেন, 'The Bhumij are, no doubt, the original inhabitants of Dhalbhum, Barabhum, Patkum and Baghmundi and they still from the bulk of the population in these and the adjoining estates. They may be roughly described as being chiefly located in the country between the Kasai and Subarnarekha rivers, but they were disloged by Aryans, who as Hindus of the Kurmi Caste, now occupy their old village sites'.[১১] এছাড়াও প্রাচীন রাঢ়ভূমির অন্তর্গত বজ্রভূমি বা বজ্জভূমির যে সমস্ত বর্বর ও রুঢ় মানুষের কথা জৈন আচরঙ্গ সূত্রে আলোচিত হয়েছে তারাই এই ভূমিজ গোষ্ঠীর পূর্বপুরুষ। ভূমিজরা ভৌগোলিকগত দিক থেকে জঙ্গলমহলের পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে বা চতুস্পার্শের জেলাগুলোতে বসবাস করত, ১৭৬৯-১৮০৫ এর মধ্যে জঙ্গলমহল গড়ে উঠেছিল বর্তমান পশ্চিমমেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া ও বীরভূম নিয়ে। এইসময় তাঁরা অত্যন্ত নিষ্ঠুরতার সাথে দস্যুবৃত্তির কাজে নিযুক্ত ছিল, তাই তাঁরা 'চুয়াড়' (Chuar) বলে পরিচিত এবং তাঁদের কাজকর্ম ও ঔদ্ধত্যকে 'চুয়াড়ী' (Chuaris) বলা হয়।[১২] 'চুয়াড়' শব্দটি বাংলায় নিম্নবর্ণের জাতিকে চিহ্নিত করে। মধ্যযুগের সাহিত্যে এই শব্দের প্রয়োগ পাওয়া যায়। ষোড়শ শতাব্দীর কবিকঙ্কন মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর চণ্ডিমঙ্গল কাব্যে কালকেতুর উক্তিতে অলা হয়েছেঃ

অতি নীচ কুলে জন্ম
জাতিতে চোয়াড়
কেহ নাহি পরশ করে
লোকে বোলে রাঢ়।

রাঢ় অঞ্চল বা জঙ্গলমহলের তথাকথিত উচ্চবর্ণের ব্যক্তি ও ব্রিটিশ কর্মচারীরা তৎকালীন মেদিনীপুর, বাঁকুড়া ও মানভূমের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে বসবাসকারী ভূমিজ সম্প্রদায়কে চোয়াড় বা চুয়াড় বলে অভিহিত করতেন।[১৩] ব্রিটিশ শাসনের প্রারম্ভে ভূমিজরা ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে তীব্র বিরোধিতার পাশাপাশি সংঘর্ষেও লিপ্ত হয়েছিল, প্রসঙ্গত ১৭৯৮

খ্রীষ্টাব্দে রাজস্বের জন্য পাঁচেতরাজের (Panchet State) সম্পত্তি বিক্রি হলে ভূমিজরা বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। ভবিষ্যতে যাতে সম্পত্তি বিক্রি না হয় এই দাবি আদায়ের জন্য ভূমিজরা ইংরেজদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ জারি রেখেছিল। যতবারই ব্রিটিশ সরকার জঙ্গলমহল শাসন করার চেষ্টা করেছে ঠিক ততবারই ভূমিজদের সাথে সংঘর্ষ হয়েছে।

মানভূম, ধলভূম ও বরাভূম অঞ্চলে ভূমিজদের নিজস্ব পরিচিতি ছিল, সাধারণভাবে মুণ্ডাদের থেকেই এদের উৎপত্তি এবং নৃতাত্বিকভাবেও এরা মুণ্ডা গোষ্ঠীভূক্ত, বর্তমানে এদের একটি শাখা মুণ্ডা ভাষায় কথা বলে, এদের মুরা (Muras) বলা হয়। কোলারিয়ান ট্রাইবদের মতো পুজো অর্চনার জন্য কোন মন্দির এরা তৈরি করে না, কিন্ত বড় কোন পাথরকে তারা দেবতা হিসেবে পূজা করে, এই পাথরের দেবতা কে 'Buru' বলা হয়। এই পাথরের বেশকিছুটা অংশে সিন্দুর লাগানো থাকে, এটিকে জাহের থান বলা হয়। জাহের থানটি গ্রামের একপ্রান্তে থাকে। এই ব্যবস্থাটি অযোধ্যার পশ্চিমপ্রান্তে ভূমিজদের মধ্যেই দেখা যায়। কিন্ত অযোধ্যার পূর্বপ্রান্তে যারা মুরা হিসেবে পরিচিত তারা সর্দারে স্থানান্তরিত হয় এবং ভূমিজদের মতোই বাংলায় কথা বলে। তারা হিন্দুধর্ম গ্রহণ করে এবং তাদের উপজাতীয় দেবদেবীদের ন্যস্ত করে মহিলা জ্ঞাতিগোষ্ঠীর কাছে এবং কোন বিশেষ উৎসব অনুষ্ঠানে উপজাতিয় ঐতিহ্যের সাথে নির্দিষ্টভাবে সম্পর্কিত কিছু আচার অনুষ্ঠান পালন করে। তারা রাজপুত-ক্ষত্রিয়দের মত মর্যাদাও দাবি করেছিল।

আদি বাসস্থান যে কোন উপজাতির উৎস অনুসন্ধানে অনেকাংশে সাহায্য করে। ভূমিজ এর অর্থ হল 'Autochthon', ভূমিজরা মানভূম, ধলভূম, বরাভূম অঞ্চলের আদিম অধিবাসী (Autochthones)। তাঁদের এই বাসস্থান নিয়ে নৃবিজ্ঞানী এবং ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। C. J. O'Donnell ভূমিজকে 'semi-Hinduized' বলেছেন। ১৮৯১ এর জনগণনায় ভূমিজকে দ্রাবিড় গোষ্ঠী ও 'Aboriginal' বলা হয়েছে। ১৯০১ এর জনগণনায়ও ভূমিজকে 'Aborigines' বলা হয়েছে।[১৪] নৃবিজ্ঞানী ডালটন ও অন্যান্যরা ভূমিজদের বাসস্থান সর্ম্পকে বলেছেন, 'a non-Aryan tribe of Manbhum, Singhbhum and Western Bengal, mainly on linguistic grounds, as Kolarian. There can be no doubt that the Bhumij are closely allied to, if not identical with, the Mundas; but there is little to show that they ever a distinct language of their own'.[১৫] প্রচলিত ভাষায় ভূমিজ এর অর্থ হল; Son of the Soil, ভূমিজ শব্দের উৎপত্তি সর্ম্পকে বলা যায়, ব্রিটিশদের আগমনের পূর্বে ভূমি রাজস্ব বা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আগে পাহাড়ী ও জঙ্গল এলাকায় ভূমির ওপর ভূমিজানী নামে ভূমির মেয়াদ চালু ছিল, ভূমি বা জমির মেয়াদ এমন লোকেদের দেওয়া হত যারা পাহাড়ী বা জঙ্গল এলাকা থেকে সমতল ভূমি রক্ষা করেছিল। প্রধানত মুণ্ডারী জনগোষ্ঠীরা যাঁরা পূর্বদিকে প্রাধান্য লাভ করেছিল তারাই ভূমিজানী জমির সুবিধা লাভ

করেছিল। Risley বলেছেন, “the term ‘Bhumijani’ mahal seems to me give a clue to the real origin of the tenures now called Ghatwali. They were originally ‘Bhumijani’, the holdings of the first settlers and clearers who owed services, feudal and personal, to the chief, who was himself of the Bhumij tribe. I doubt myself whether the Bhumij can properly be classed as a distinct tribe. They are I believe meerly Hinduised as degraded Mundas”.[১৬]

উপসংহার

জাতিকাঠামোয় ভূমিজদের অবস্থান ও উৎস সংক্রান্ত বিষয় পর্যালোচনা থেকে সুস্পষ্ট হয় যে, ভূমিজ উপজাতিরা কোলারিয়ান ভাষা গোষ্ঠীর। তৎকালীন সুবর্ণরেখা ও কাঁসাই নদী সংলগ্ন অঞ্চল, ধলভূম, বরাভূম, পাটকুম, বাগমুণ্ডী ছিল তাঁদের আদি বাসভূমি। এছাড়াও মেদিনীপুর সন্নিহিত বসবাসের সংখ্যা ছিল বেশি। সাধারণত মুণ্ডাদের থেকেই এদের উৎপত্তি, কেননা নৃতাত্ত্বিকভাবে ভূমিজরা মুণ্ডা গোষ্ঠীভুক্ত। ধলভূমের ভূমিজরা আবার মুণ্ডাদের সঙ্গে কোন সম্পর্ককেই স্বীকার করেন না। অযোধ্যার পূর্বে বসবাসকারী ভূমিজরা নিজেদের মানভূমের আদিম অধিবাসী হিসেবে মনে করেন। বিভিন্ন কারণে তাঁরা ছোটনাগপুর থেকে বিতাড়িত হয়ে তাঁদের নিজস্বতা হারিয়ে ফেলে।

তথ্যসূত্র ও গ্রন্থপঞ্জী :

১. Beverley, H. (1872), Report on the Census of Bengal, Calcutta, Bengal Scretariat Press.

২. Dalton, E. T. (1872), *Descriptive Ethnology of Bengal,* Calcutta, Government Printing, p. 173.

৩. Das, A. K. Roy Choudhury, B. K and Raha, M. K. (1966), *Bulletin of the Cultural Research Institute, Tribal Welfare Department, Hand Book on Scheduled Castes and Scheduled Tribes of West Bengal, Special Series No. 8,* Calcutta, Government of West Bengal, pp. vii-ix.

৪. Census of India 2011.

৫. *The Government of India (scheduled castes) Order,* 1936.

৬. *The Scheduled Castes and Scheduled Tribes Orders (Amendment) Act,* 1976.

৭. Dalton, E. T. p. 173.

৮. Gait, E. A. *Census of India, 1901, Vol. VI*, *Bengal.*

৯. Risley, H. H. (1998), *The Tribes and Castes of Bengal, Vol. I,* Calcutta, Firma KLM Private Ltd. (Reprint), p.117.

১০. Roy, S. C. (1912), *The Mundas and their Country,* Calcutta, Kuntaline Press, p. 118.

১১. Hunter, W. W. (1877), *A Statistical Account of Bengal, Vol. 17* (Singbhum District, Tributary states of Chutia Nagpur and Manbhum), London, Trubner & Co. p. 278.

১২. Dalton, E. T. p. 179.

১৩. Sen, S. (2020), *Bharater Adibasi: Samaj, Paribesh O Sangram,* Kolkata, Bookpost
Publication, p. 102.

১৪. Bhattacharya, U. (2008). Report on the Project *"Communities and Local History: A Study in the Processes of Community Formation in South-Western Bengal (Mid19th century to 1947),* Maulana Abul Kalam Azad Institute for Asian Studies, Kolkata. P. 71.

১৫. Risley, H. H. p. 117.

১৬. Bengal District Gazetter: Manbhum, 1911, Calcutta, Bengal Secretariat Book Depo.

পুরুলিয়া জেলার আঞ্চলিক ভাষার কবিতার উত্থান, ক্রমবিকাশ ও 'ছত্রাক' পত্রিকার ভূমিকা

কার্তিক নাগ
গবেষক, রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দির, বেলুড় মঠ

একটি ভূখণ্ডের মানুষ যখন সেই ভূখণ্ডের কোলে নিজেদের শিকড়কে অবলম্বন করে যাপন করে জীবন, নিজস্ব ঐতিহ্য-সংস্কৃতিকে উপলব্ধি করে লালন করে চলে যুগের পর যুগ তখন সেই ভূখণ্ডটি নিজস্ব রূপ-রঙ-ছন্দে স্বতন্ত্র অঞ্চল হয়ে দাঁড়ায়। কেন্দ্র থেকে যত দূরে আমরা এগোতে থাকি এই আঞ্চলিকতার রূপটি স্পষ্ট হতে থাকে।

আঞ্চলিকতার প্রসঙ্গ এলেই ভাষার কথা উঠে আসে। বাংলা ভাষার পাঁচটি উপভাষার কথা আমরা জানি। ঝাড়খণ্ডি, কামরূপী, বঙ্গালী, বরেন্দ্রী ও রাঢ়ী। এক একটি ভূখণ্ডের মানুষ এক একটি উপভাষায় কথা বলে। এই রূপভেদের ভেতর যে রূপকে বাংলাভাষার মান্য চলিত লেখ্যরূপ হিসেবে মান্যতা দেওয়া হল তা ছিল রাজধানী শহরের ভাষা রাঢ়ী বাংলারই প্রমিতরূপ। কলকাতা, হাওড়া, হুগলি, নদিয়া প্রভৃতি জেলাগুলিও এক একটি আঞ্চলিক ভূখণ্ডই। কিন্তু কলকাতা রাজধানী কেন্দ্র হওয়াই, মান্য লেখ্যভাষার সাথে তাদের কথ্যভাষা প্রায় মিলে যাওয়াই, এই অঞ্চলের নিজস্ব সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, মুখের ভাষা বলে তেমনভাবে স্বতন্ত্র বা বৈচিত্র্যপূর্ণ কিছু আর রইল না। তাই ভাষার ক্ষেত্রেও যতই প্রান্তের দিকে এগোতে থাকি আমরা, আঞ্চলিকতার লক্ষণগুলো উপলব্ধি করতে থাকি। অর্থাৎ 'অঞ্চল' শব্দটির সাথে 'প্রান্ত'-এর যোগ রয়েছে। ব্যুৎপত্তিগত বিচারেও এর অর্থ তাই।

কেন্দ্র থেকে, মান্যতা থেকে, রাজধানী থেকে, শহর থেকে, দূরবর্তী, প্রান্তিক একটা ভূখণ্ড নিজস্ব ভাষা-সংস্কৃতি-ঐতিহ্যের লালনে যখন যাপন করে জীবন এবং জীবনের গতিতে সহজ-স্বাভাবিকভাবে জন্ম নেয় শিল্প-সাহিত্য, তখন সেই ভূখণ্ডটিকে আমরা জানি স্বতন্ত্র অঞ্চল বলে। পুরুলিয়া এমনই একটি আঞ্চলিক ক্ষেত্র। নিজস্ব ভূ-প্রকৃতি, সমাজ ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য থেকে জন্ম নিয়েছে এখানকার আঞ্চলিক কবিতা। অর্থাৎ এই আঞ্চলিক কবিতার মূলে রয়েছে এখানকার প্রকৃতি, মানুষ, তাদের জীবন এবং অবশ্যই তাদের পরম্পরায় লালিত সংস্কৃতি।

২

পুরুলিয়ার আঞ্চলিক কবিতার ইতিহাস সন্ধান করতে গেলে আমাদের প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় পুরুলিয়ায় ছো, ঝুমুর, টুসুগান, ভাদুগান, জাওয়াগান, করম প্রভৃতির কথা। আসলে মানভূমের (পুরুলিয়ার বঙ্গভুক্তির আগে) মাটিতে দীর্ঘদিন ধরে লালিত হয়ে এসেছে লোকগান, লোকসাহিত্য, লোকসংস্কৃতির এই চিরায়ত প্রথা। মানভূমের মানুষ

সেই কবে থেকে মুখে মুখে বেঁধেছে ঝুমুর, টুসু, ভাদু গান। সেই কবে থেকে লালন করে এসেছে নিজস্ব সংস্কৃতিকে। পুরুলিয়ার আঞ্চলিক কবিতার কবিরা তাঁদের এই চিরায়ত ঐতিহ্যকেই স্মরণ করেছিলেন। তাঁদের এই চিরায়ত ঐতিহ্য থেকেই নতুন ধারা-সৃষ্টির রসদ খুঁজে নিলেন। আজ পুরুলিয়ার আঞ্চলিক কবিতা যদি প্রজ্বলিত প্রদীপ হয়, তাহলে তার সলতে ও তা পাকানোর বিস্তীর্ণ ইতিহাস লুকিয়ে আছে দীর্ঘ লালিত মানুভূমের লোকসংস্কৃতি-চর্চার মধ্যে। এবং আছে মানভূমের ভূপ্রকৃতি, মানুষ, তাদের জীবনের মধ্যে। এ প্রসঙ্গে সমালোচক দিলীপ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন :

> এই সূত্রেই পুরুলিয়ার আঞ্চলিক ভাষার কবিতার উৎসমূলে রয়ে গেছে এ অঞ্চলের এতগুলি জনগোষ্ঠীর সুষমাময় সহাবস্থান, স্মরণাতীত কাল থেকে আসা জনজীবনের নানা স্পন্দন, ভাদু-টুসু-জাওয়া-করম-জিতা-ছাতা-বিপত্তারিনি-বাঁদনা পরব, ছৌ-নাটুয়া ডাইড় নাচ-নাচনি নাচ, বিচিত্র স্বাদের ঝুমুর, মানভূমের ভাষা আন্দোলন, মানভূম ভাগ, পুরুলিয়ার বঙ্গভুক্তি।[১]

প্রসঙ্গত উল্লেখ, মানভূমের এই লোকগান মান্য বাংলায় যেমন রচিত হত তেমনই রচিত হত নিজস্ব মানভূমি ভাষাতেও। গদাধর চৌধুরী, দীনা তাঁতি, পরেশ কামার, দ্বিজ টিমা, উদয় কামার প্রমুখেরা মানভূমি ভাষাতেই গানের ছন্দে তাঁদের মনের ভাব প্রকাশ করে গেছেন।

গদাধর চৌধুরী যখন লেখেন—

খালভরা হামাকে সাঁথাছে
লোদী ভরায় হামকে সাঁথাছে[২]

একটি সংসারে স্বামীর অত্যাচার, কুকীর্তিতে নাজেহাল স্ত্রীর যন্ত্রণাময় ভাষ্যই জীবন্ত হয়ে ওঠে।

কোনো যুবতী নারীকে মিথ্যে প্রতিশ্রুতি দিয়ে আসাম পাচার করার করুণ কাহিণী দীনা তাঁতি ঝুমুরের সুরে লেখেন—

চাটি চুটি দিঞে মোরে   সামকরাল্য ডিপু ঘরে
লেখাইল সাত পুরুষের নাম
হায়রে লম্পট্যা শ্যাম ফাঁকি দিয়ে চালালি আসাম।[৩]

স্বাধীনতা উত্তর কালে ভাষা আন্দোলনের সময়পর্বে মানভূমে টুসুগানের ব্যাপক প্রচার হয়। মান্যবাংলার সাথে সাথে মানভূমি বাংলাতেও অনেকে টুসুগান লেখেন ও প্রচার করেন। যেমন মানভূমের ভাষা আন্দোলনের সময়কালে উদাত্ত কণ্ঠে ভজহরি মাহাত গেয়ে ওঠেন—

শুন বিহারী ভাই
তোরা রাখতে নারবি ডাঙ্গ দেখাই।
তোরা আপন তরে ভেদ বাড়ালি
বাংলা ভাষায় দিলি ছাই।[৪]

এগুলি পড়লে আঞ্চলিক কবিতার সাথে তেমন কোনো প্রভেদ আপাতভাবে আমাদের চোখে পড়ে না। মিলে মিশে যেন একাকার হয়ে যায়। পুরুলিয়ার আঞ্চলিক কবিতার আদিসূত্র, উৎস এগুলিই। কিন্তু এগুলি কখনোই 'আঞ্চলিক কবিতা' নয়। এগুলি লোকগান। কোনোটি ঝুমুর, কোনোটি টুসু। এর কথাগুলি কবিতার মতো মনে হলেও তার অতিরিক্ত একটি সত্তা থেকে যায় এর বাঁধনে। যা ছাড়া একে পৃথকভাবে দেখা অনুচিত হবে। এর ভণিতা অংশগুলিও বলে দেয় কবিতা থেকে এগুলি পৃথক। আর তাছাড়া মানভূমে কবিতাচর্চার অনেক আগে থেকেই লোকগান চর্চা ছিল। লোকগান বহু পুরাতন একটি ঐতিহ্য। এর রচয়িতারা কেউই তেমনভাবে শিক্ষিত নন, লোকায়ত মাটিতে লালিত হয়েছে তাদের জীবন সহজ-স্বাভাবিকভাবে, লোকগানগুলি উঠে এসেছে সহজ জীবন থেকে, সম্পূর্ন হৃদয় থেকে, প্রচারিত হয়েছে মুখে মুখে। পরবর্তীতে লেখার রীতি আরম্ভ হয়। কিন্তু কবিতার রচয়িতারা কিছু সংখ্যককে বাদ দিলে মোটামুটিভাবে সকলেই উচ্চ-শিক্ষিত। ফলে আঞ্চলিক কবিতা ও লোকগানের কথার মধ্যে একটা প্রভেদ থাকা স্বাভাবিক। একটির থেকে আরেকটিকে উচ্চতর প্রমাণ করার উদ্দেশ্যে থেকে নয়, তুলনামূলক প্রসঙ্গের খাতিরে একথা স্বীকার করতেই হয়, লোকগান যতখানি লোকজ ও আঞ্চলিক, আঞ্চলিক কবিতা ততখানি নয়। এর মধ্যে থেকে যায় অনেকখানি বুদ্ধিমত্তা, শিক্ষার কারিগরি ক্ষমতাও। তবে দুটোই ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রে উচ্চতর জায়গায় অবস্থান করে।

৩

পুরুলিয়ায় সাহিত্যের পৃথক শাখা হিসেবে 'আঞ্চলিক কবিতা'র জন্ম হয় ভাষা আন্দোলন ও পুরুলিয়ার বঙ্গভুক্তির (১৯৫৬, ১ নভেম্বর) পর, নির্দিষ্টভাবে বললে মোটামুটি ছ'য়ের দশক থেকে।

অরুণ চট্টোপাধ্যায়ের তাঁর 'সাঁঝবিহান' কাব্যের ভূমিকায় বলেন—

> সাঁঝবিহান-এর প্রথম কবিতা "উরর্‌ রাঙ চাঙ্‌" এর রচনাকাল ১৯৬৪ মে এবং শেষ কবিতা "ভারত উৎসবের গল্প"—জুন ১৯৮৫[৫]

অর্থাৎ বঙ্গভুক্তির পর, বিশেষত ছয়ের দশক থেকেই আঞ্চলিক কবিতা স্বতন্ত্র ধারা রূপে নিজেকে উন্মুক্ত করল।

কিন্তু বঙ্গভুক্তির পরই কেন? এর যথেষ্ট কারণ রয়েছে। আসলে বঙ্গভুক্তির সাথে জড়িয়ে ছিল পুরুলিয়াবাসীর আবেগ, স্বপ্ন, ভালোবাসা। মাতৃভাষা ও মাতৃভূমির জন্য দীর্ঘ রক্তাক্ত সংগ্রামের ভয়াবহ অধ্যায় পার হয়ে যখন তারা নিজস্ব মাতৃভাষার ভূখণ্ড পেল, তখন স্বাভাবিকভাবেই তারা বুকভর্তি আবেগ-ভালোবাসা দিয়ে আষ্টেপৃষ্টে জড়িয়ে ধরতে চাইল, নিজেদের মাতৃভাষা ও মাতৃভূমিকে। আরো কাছাকছি, নিবিড় আঁচলের তলায় আশ্রয় নিতে চাইল তারা। নিজস্ব সংস্কৃতিকে চিনতে শিখল নতুন করে। নিজস্ব সংস্কৃতি-ভাষার প্রতি নিবিষ্ট হল। এবং তারই ছাপ পড়তে লাগল, শিল্প-সাহিত্যে।

পুরুলিয়ার লোকসংস্কৃতি ও ভাষা নিয়ে প্রবন্ধ রচিত হতে লাগল। গল্পে, কবিতায় পুরুলিয়ার ভাষা, সংস্কৃতি, অনুসঙ্গ জীবন্তরূপে ভেসে উঠতে লাগল। কাব্য সাহিত্যেও নেমে এল প্রভাব। তবে কেবল অনুসঙ্গ নয়, ধীরে ধীরে পুরুলিয়ার নিজস্ব ভাষা-সংস্কৃতি ও প্রকৃতিকে নিয়ে একটি স্বতন্ত্র ধারার ভূবন নির্মাণ করল এখানকার কবি-সাহিত্যিকেরা। 'ছত্রাক' পত্রিকা এই সময়-পর্বের একটি উল্লেখযোগ্য অধ্যায়। ১৯৬৯ এ ক্ষুদ্রাকারে পত্রিকাটির প্রথম প্রকাশ। প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক ছিলেন অপূর্ব সান্যাল। কিন্তু পত্রিকাটিকে বৃহৎ আকার দান করলেন সুবোধ বসু রায়, ১৯৭২-এর অক্টোবর মাসে। ১৯৭২ এর অক্টোবর থেকে সুবোধ বসু রায়ের সম্পাদনায় পত্রিকাটি বার হতে লাগল। দ্বিতীয় বর্ষের প্রথম সংখ্যা থেকে পত্রিকার শিরোনমের নীচে লেখা হতে লাগল 'মানভূম সংস্কৃতির মুখপত্র'। এবং এ শুধু কথায় নয়, কাজেও প্রমাণ করল। পুরুলিয়ার সমাজ-সংস্কৃতির এক আখড়াভূমি হয়ে উঠল এই পত্রিকা। তবে কেবল সমাজ-ইতিহাস-লোকসংস্কৃতির গবেষণার বেড়াজালে আবদ্ধ থাকল না, জেলার লোকসাহিত্য, আঞ্চলিক সাহিত্যওকেও আশ্রয় দিতে লাগল। একদিকে বিভিন্ন লোকসংস্কৃতিমূলক প্রবন্ধ রচনা ও গবেষণা যেমন চলতে থাকল, অন্যদিকে আঞ্চলিক সাহিত্য মাথা তুলে উঠতে লাগল এই পত্রিকাকে ঘিরে। আমরা এই আলোচনায় এই পত্রিকাকে ঘিরে পুরুলিয়ার আঞ্চলিক কবিতা চর্চার ক্ষেত্রটিকে কেবল লক্ষ করব। মোহিনীমোহন গঙ্গোপাধ্যায় এ-প্রসঙ্গে বলেন—

> মানভূম সংস্কৃতির মুখপত্র "ছত্রাক"কে কেন্দ্র করে মানভূমের শিল্প সংস্কৃতি, জনজাতি, কৃষ্টি পুরাতন ভাস্কর্য ইত্যাদি যেমন তুলে ধরা হয়েছে তেমনি মানভূমি কবিতাকেও তাঁরা সর্বত্র পৌঁছে দেবার চেষ্টা করেছেন। অধ্যাপক সুবোধ বসু রায় কঠিন পরিশ্রম করে প্রকাশ করেছেন 'মানভূমি শব্দকোষ'। মানভূমি কবিতা লেখার জন্য ও মানভূমি কবিতা বোঝার জন্য এই অভিধান অনেকের কাজে লাগবে।[৬]

অর্থাৎ পুরুলিয়া জেলার আঞ্চলিক কবিতার উত্থানে 'ছত্রাক' পত্রিকার যে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে, তা বোঝা যায়।

৪

এখন আমরা 'ছত্রাক' পত্রিকাকে ঘিরে পুরুলিয়া জেলার আঞ্চলিক কবিতার ক্রমবিকাশের স্রোতটিকে লক্ষ করব।

১৩৮৫ বঙ্গাব্দে মোহিনীমোহন গঙ্গোপাধ্যায়ের 'অমন ভাতার নাই বা র্যল' কবিতাটি প্রকাশিত হয়। শারদীয়া ১৩৮৬ তে প্রকাশিত বিভূতিভূষণ কুইরীর 'ভাচাকুটা মায়ারা' কবিতাটিতে ফুটে উঠেছে, পাকা রাস্তার ওপর ধান শুকোতে দেওয়া গ্রাম্য মহিলাদের জীবন।

১১শ বর্ষ, ২য় সংখ্যায় (১৩৮৭) গৌরশঙ্কর দাসের 'পুরুল্যার বারমাস্যা' কবিতায় পুরুলিয়ার মানুষের জীবন-যাপন, সংস্কৃতি, পার্বণের বিস্তীর্ণ কক্ষপথে প্রদক্ষিণ করেছেন কবি।

এই সংখ্যাতেই, অরুণ কুমার চট্টোপাধ্যায়ের 'পাঁচিলটোই ভাইঙে দেন' কবিতাটি প্রকাশিত হয়। মিথ্যে মামলায় ফাঁসিয়ে দিয়ে এক অসহায় পিতার একমাত্র সন্তানকে গ্রামের 'বাবু'রা জেলে পুরে। নিজের ছেলেকে বৃদ্ধ পিতা 'তিনকুড়ি দশসনের দুপহরের পর' আর চোখে দেখেনি। সন্তানকে চোখে দেখার জন্য বৃদ্ধ পিতার অস্থির আকুতি—

হ আইজ্ঞ্যা কবে তক্ক বেটা আমার আইসবেক[৭]

আর বৃদ্ধ মা, সন্তানের জন্য অপেক্ষায় বসে থাকে দরজার কোণে—

বহুত রাতে কুপি জ্বইলতে জ্বইলতে বুতে যায় আইজ্ঞ্যা
খুলা কপাটের ধারটোতে উহার মায়ে মিছাই বইসে থাকে...[৮]

এই সংখ্যায় প্রকাশিত অরুণ কুমার চট্টোপাধ্যায়ের 'পিরীতের সুতায় গিরা' কবিতাটি ঢাকের বোলের তালে তালে এগোতে এগোতে অপূর্ব মাদকতা সৃষ্টি হয়।

১১শ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যায় (১৩৮৭) প্রকাশিত তারাশঙ্কর দরিপার 'আজকের ছড়া' কবিতায় যুগের সাথে সাথে সমাজ-ব্যবস্থা, জীবন-যাপনের পরিবর্তন যেমন রূপ পেয়েছে, পুরুলিয়াবাসীর যন্ত্রণাময় জীবনও ফুটে উঠেছে। তবে এসব কিছুর পরে প্রতিবাদের আগুনে উচ্চারিত কয়েকটি শব্দ সমস্ত আঞ্চলিকতা অতিক্রম করে যায়—

যাহার ভখ, অন্ন তার,
সুয়াঙ যার, তার অধিকার।[৯]

এই সংখ্যায় প্রকাশিত হয় দিলীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'হারান্যা' কবিতাটি। চাষনালার কয়লাখনির খাদানে জল ঢুকে ধস পড়ে বহু মজুর মারা যায়। মারা যায় এক পিতার বড় ছেলেও। সে আর ফিরে আসেনি। তার চাকরিটা পেয়েছে তার কাকা। সবাই ভুলে গেছে তাকে, শুধু মনে রেখেছে তার বৃদ্ধ পিতা। বহুদিন পর মরা নদীতে ক্যানেল আসার খবর এলে তার স্মৃতি, হাহাকার আরও চূড়ান্ত হয়—

লদীর সঙ্গে সঙ্গে হামার বড় ছেল্যট কি
নাই আইসব্যাক বাবু?[১০]

দোল সংখ্যায় (১৩৮৮) প্রকাশিত সত্য গুপ্তের 'ভিখ মাঙ্গা' কবিতাটি সমাজের বৈষম্যমূলক চেতনায় সজোর চাবুক মারে। অন্নপূর্ণ এই পৃথিবীতে অন্নের জন্য কাঙাল ভিক্ষুকের কথাগুলি আঞ্চলিকতার সীমা অতিক্রম করে যায়--

ত' হে আইজ্ঞা ইট কি রকম পরব বটে?
পেটটই ন পহিলে!
পেট দিয়েঁইত দেখা, পেট দিয়েই শুনা
পেটটই যদি ভখে রহিল্য

ভিখারী যদি ভিখ্ মাঙ্গাই রহে গেল
ত শুখা ঝাণ্ডিট উঠাই কি শুধু ফট তুল্যে হবেক![১১]

এই সংখ্যায় হরিদাস মুখোপাধ্যায়ের 'পাঘা আর খাঁচার গল্প' কবিতায় নেতাদের হাতে সাধারণ মানুষ যে কাঠের পুতুলমাত্র তারই প্রকাশ ঘটে—

(হা ভাল) তরা হলি সব সার্কেসের
খাঁচায় ভরা আঁতরগা বাঘ।
যত্না পাবি, অত্না খাবি
উয়ার বেশী খুঁজতে গেলে 'সপাং' করে চাভুক পাবি।[১২]

এই সংখ্যায় প্রকাশিত অরুণ প্রকাশ সিংহের 'একটা দেশপ্রেমবিমূখী কবিতা' কবিতাটি। গান্ধীজির স্বরাজের আদর্শ ভঙ্গ করে চলা শাসক শ্রেণি পালিত ডাকাত, লুঠেরাদের অত্যাচারে জর্জরিত মানুষের কণ্ঠস্বর ফুটে উঠেছে নিদারুণভাবে—

হেঁ গান্ধী মহারাজ? কেনে সাহেব খেইদ্‌লে বাপ?
ই কিসিমের স্বরাজ তুমি কখনও ত খুঁজ নাই?[১৩]

উচ্চারিত হয়েছে অমোঘ, স্পষ্ট, একটি চিরসত্য কথা—

লড়াইয়ে জান দিয়েঁ জিত নাই কন্‌হরে বাপ,
জী না থাক, বাঁইচে থাকাই দুনিয়াতে মস্ত জিত
অভিরামে খুদিরামে কন জিতট' জিতল বল?
জিতট' ত পাইল যারা লড়াইয়ে নাম্‌হেই নাই। [১৪]

এই সংখ্যাতেই, সুবোধ বসু রায়ের 'ই সময়টয়' কবিতাটিতে বসন্ত কালের মানভূমের জীবন-সংস্কৃতি-পার্বন ফুটে উঠেছে। ফুটে ওঠে পুরুলিয়াবাসীর জীবনের সারসত্য—

ইঠিনে
ভখে মইল্লেও লাচগান ছাইড়তে লারবেক লকে।[১৫]

ষোড়শ বর্ষ, ২য় ও ৩য় সংখ্যায় (১৩৯৩) প্রকাশিত দিলীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'টুসু গীত' কবিতাটিতে টুসুকে নামিয়ে আনা হয়েছে দেবীর আসন থেকে মাটিতে। যে টুসু গান ভালোবাসে, গানের জন্য কান্না করে সেই টুসুই আবার ভোটে দাঁড়ায়।

অষ্টাদশ বর্ষ, নববর্ষ, ৩য় সংখ্যায় (১৩৯৫) সুবোধ বসু রায়ের 'লদী য্যামন' কবিতাটি প্রকাশিত হয়।

অষ্টাদশ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যায় (১৯৯৪) প্রকাশিত হয় গৌরী শঙ্কর দাসের 'ভুখা শহিদ' কবিতাটি। অন্নের আশায় পার্টির মিছিলে একমাত্র সন্তানকে নিয়ে কলকাতায় গিয়েছিল এক পিতা। পেয়েছিল 'এক কুড়ি নোট, দুসের গম, দুসের চাল'। কিন্তু সন্তানটি মারা যায় রবীন্দ্র-সেতুতে। রবীন্দ্র-জয়ন্তীতে রবীন্দ্রনাথের প্রতি পিতার আর্তি—

হে রবীন্দ্রনাথ মস্ত কবি, ভুখাকেই তুমি লিহে লিলে

ভালই হল টুকু শিক্ষা দিভে যেমন ভখের জ্বালায় না
মরে।[১৬]

ঊনবিংশ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, শারদীয়া সংখ্যায় (১৩৯৫) কুচিল মুখোপাধ্যায়ের 'শাগে বাইগণে' কবিতাটিতে শাগ ও বেগুনের মাধ্যমে সমাজের, সংসারের ছবি যেন ফুটে উঠেছে। সহাবস্থানে কলহ-ঝগড়াঝাঁটি হতে হতে একে অপরের সাথে মিলে যাওয়ার ছবি ফুটে উঠেছে—

শাগে বাইগণে দেখ সংগেই শিঝিছে
বোধ হয় ভাব হঁয়েছে।[১৭]

এই সংখ্যাতেই, মোহিনীবাবুর 'পাথর চাটান বুক' কবিতাটি আসলে প্রকৃতির ভেতর দিয়ে প্রেমের সন্ধানে, মনের মানুষের সন্ধানে, একটি প্রিয় মুখের সন্ধানে চেতনালোকে ভ্রমণ—

গাছকে জড়াই লতা
বইলছে মনের কথা
মন দিয়ে মন কুথায় পাবি ইমন সরলতা?'[১৮]

ঊনবিংশ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, সাহিত্য সংখ্যায় (১৩৯৬) প্রকাশিত অরুণ কুমার চট্টোপাধ্যায়ের 'ই দেশটতে আর রইব নাই' কবিতায় দেশের অরাজকতা, সামাজিক বৈষম্য, ক্ষুধার্ত মানুষের অভিমান, ব্যঙ্গ ও প্রতিবাদ ভাষা পেয়েছে যখন শুনি—

শুইনলম চাঁদে মানুষ জমি লিছে
নিজের মাস মানুষ খাইছে
পাতালে রেল চইলছে
তবু পেটের ভুখ্ ত মিটছে নাই
বাবা হে ই দেশটাতে আর রইব নাই।[১৯]

বিংশতি বর্ষ, ১ম সংখ্যায় (১৩৯৬) মোহিনীবাবুর 'কানাভাঙা হাঁড়ি' কবিতায় বন্যার হাহাকার, অন্নকষ্টের দৃশ্য ফুটে উঠেছে। তবে তার পরেও মনে সঞ্চারিত হয়েছে স্বপ্ন—

জল সইরবেক
ঝিক মিকাবেক সবুজ সবুজ ফসল
ফুল ফুইটলেই আবার সেই ভাঙা ঘরে
উঁকি মারব্যেক জ্যোছনা ভিজা ফুটফুটা এক চাঁদ।[২০]

একবিংশতি বর্ষ, ১ম সংখ্যায় (১৩৯৭) মহম্মদ শফির 'শহীদের মা' কবিতাটিতে স্বাধীনতা দিবসের আয়োজন দেখে এক মায়ের মনে পড়ে তার পুত্রের কথা, সামনের আশ্বিনে যার বয়স হত তিন কুড়ি দশ। রাজনৈতিক বেড়াজালে নিজের জীবন খুঁইয়েছে যে। মার মনে পড়ে পুত্রকে বলেছিলেন তিনি—

'বাবা যাস নাই বাবা'
কালাপাণি পার হয়ে আসা
উ' লালমুখাগুলানকে বিশ্বাস নাই
ত' হামার কথা শুনবেক তবে ন।[২১]

দ্বাবিংশতি বর্ষ, ১ম সংখ্যা, শারদীয়ায় (১৩৯৮) প্রকাশিত মধুসূদন কালিন্দীর 'ভাঙাট' কবিতাটিতে অসাধারণ চিত্রকল্পে মনের ইচ্ছা, স্বপ্নের ভাঙন ফুটে উঠেছে। পুনরায় জুড়ে দিতে সচেষ্ট হলেও সেই ভাঙ্গনকে, স্বপ্নকে যে আর জোড়া লাগান সম্ভব নয়, তারই মনোকষ্ট ফুটে উঠেছে—

রঙচঙা সপুন গিলা
কত চাঁড়ে ছড়্যে গেল
লাহিলাগা মাল্হান ফুলের পারা।[২২]

দ্বাবিংশতি বর্ষ, ২য় সংখ্যায় (১৩৯৮) প্রকাশিত মধুসূদন কালিন্দীর 'ছভি' কবিতাটিতে একটি নদীতে নামার দৃশ্যের অপরূপ চিত্রকল্প ফুটে উঠেছে। প্রকৃতির অসামান্য রূপের মাঝেই জীবনানন্দের রূপসী বাংলার মতো কবি মধুসূদনও হারিয়ে যান তাঁর খুঁজে পাওয়া সাম্রাজ্যে—

আমি হারাঁই গেলি—
বালি, পাথর, লদীর বুকে।
ছভি হঁয়্যে মিশে গেলি।[২৩]

ত্রয়োবিংশ বর্ষ, ১ম সংখ্যায় (১৩৯৯) প্রকাশিত অরুণ কুমার চট্টোপাধ্যায়ের তিনটি 'লৌকিক ছড়া' প্রকাশিত হয়।, যার প্রথমটিতে রাধা-কৃষ্ণ হয়ে উঠেছেন মজুর-কামিন—

বিন্দাবনের কিষ্ট এখন
বনজেমারীর মালকাঠা
বেগার কামিন রাধা যেমন
হাজ্‌রি খাতায় নামকাটা।[২৪]

চতুর্বিংশতি বর্ষ, ২য় সংখ্যায় (১৪০০) সুবোধ বসু রায়ের 'সাক্ষরতার টুসু' কবিতাটিতে শিক্ষার প্রয়োজনের কথা ব্যক্ত হয়েছে—

দুকুড়ি পাঁচ বছর গেল
আজ সে স্বাধীনতা
টিপসহিতে ভরা কেনে
ভটের বাকসাটা।[২৫]

ত্রয়োবিংশ বর্ষ, ২য় সংখ্যায় (১৩৯৯) অসীম বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'টুসুর দেশে' কবিতাটিতে টুসুর রূপকে পুরুলিয়ার নারী সমাজ ফুটে উঠেছে। পুরুলিয়ার খেটে খাওয়া কর্মঠ রমণী, শ্বশুরবাড়ির শোষণ মুখ বুজে সহ্য করা রমণী, নতুন বিবাহ-জীবনে

লজ্জায় রাঙা রমণী, স্কুলে যাওয়া শিশু-কিশোরী—সবাই যেন এক একটি টুসু। এছাড়াও—

একটি টুসু মুড়ি ভাজে
মুড়ির বেদন নিয়ে ফুটে
তাতা থালায় টাঁইড়ে টিকরে।।[২৬]

রজত-জয়ন্তী বর্ষ, উদ্বোধনী সংখ্যা শারদীয়ায় (১৪০১) অসীম বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘মালকাটা’ কবিতাটি প্রকাশিত হয়।

সাহিত্য সংখ্যায় (১৪০২) প্রকাশিত রমানাথ দাসের ‘হামদের কথা’ কবিতায় পুরুলিয়াবাসীর জীবনযাপন, সংস্কৃতি, পার্বন ও কষ্টের মধ্যেও আনন্দে থাকার রসদগুলিকে যেমন তুলে ধরেছেন তেমনি আহ্বান জানিয়েছেন মানভূমের মনের কথা, আনন্দে থাকার রসদ শোনার জন্য—

শাল মহুল আর কু’ল পলাসের দেশে
খেড়্রহ-খেসর ট্যাঁড়-টিকরে জিঁরাই লে আয় ব’সে।[২৭]

রজত-জয়ন্তী বর্ষ, উদ্বোধনী সংখ্যায় (১৪০১) প্রকাশিত সুকুমার চৌধুরীর ‘ফেলি’ কবিতাটি। একদিকে শ্বশুরবাড়ি থেকে ‘মেথরার বিটি’ ফেলি-র বাবার বাড়িতে চলে আসা, সংসার চালানোর জন্য বাসন মাজা বৃত্তি গ্রহণ অন্যদিকে তার উঠতি যৌবন এবং তার পেছনে লোলুপ দৃষ্টিদের আনা গোনা—সব মিলিয়ে ফেলির জীবন সংগ্রাম ফুটে উঠেছে। কবিতা হয়েও জীবন্ত সংলাপে এ যেন একটি ছোটগল্প। কল্প ঠাকুরের কুপ্রস্তাবে ফেলি গর্জে উঠে—

পাঁইয়াঘর থেকে ফেলি বাঁহরাইলেই পিছন যায়, বলে :
‘রেল লাইনের ধারে যাভি। হাই দেখ পাঁচ টাকা—কঁরকরা।’
রাগ্যে গনগনাই ফেলি লেতড়ায়। ঢেলকা ছুঁড়হে। বলে :
‘তোর মুঞে আগুন। মা মাওগা...লদীভরা...’[২৮]

ষড় বিংশতি বর্ষ, শারদীয়া সংখ্যায় (১৪০২) প্রকাশিত প্রণবকুমার সেনগুপ্তের ‘আমাদের ঠাকুর ও একটি ভাসান’ কবিতার ২ নং কবিতায় খরার ভূমিতে সরস্বতী পুজায় ঘরপিছু ধান আদায়, পূজোর বাহারি আয়োজন, এবং শেষে উল্লাসপূর্ণ ভাসান দেখে কথক ব্যথাতুর হন।

মাইকে জর্ হিন্দী গান—'তু চীজ বড়া মস্ত্ মস্ত্’
আলি গা মা, তা বল্যে কি এমনই হেফাজৎ?!
ভাইস্যে গেল টুসুর পরে কষ্টে পাওয়া ধান।–
লক্ষীর সাথে ঝগড়া বল্যে—এমনও জয়গান![২৯]

শারদীয়া সংখ্যায় (১৪০৪) প্রকাশিত সুকুমার চৌধুরীর 'ভগীরথ' কবিতাটিতে ভগীরথ মনে করে তার জীবন বৃথা, তাই সে ট্রেনের নিচে আত্মহত্যা করতে চায়, কিন্তু সে পেরে ওঠে না। তাই সবাই তাকে ঠাট্টা করে। সে বলে 'আজ'ই সে আত্মহত্যা করবে, কিন্তু সেই 'আজ' আর আসে না। আসলে জীবন বৃথা হয়ে গেছে মনে হলেও ভগীরথ যে জীবনকে বড্ড বেশি ভালোবাসে, তা বোঝা যায়। সে গান গায়, সবাই তাকে বাহবা দিলে, সে আবার নিজস্ব ছন্দে বলে ওঠে—

কন লাভ লাই দাদ, জীবনডা বেরথা হঞে গেলই
থাজই ন্যাষ শুনে লাও। চরটার টেরেনেই আজ।[৩০]

৩০ বর্ষ, ৩য় ও চতুর্থ সংখ্যায় (শ্রাবণ, ১৪০৭) তারাশঙ্কর দরিপার 'নাড়ীতে লঢ়াই দপ্দপাছে' কবিতায় মানুষের নাড়ির ভেতরে যে চিরন্তন সংগ্রাম, তাকেই স্মরণ করা হয়েছে—

সেই কবে লেই ফুলকলির ফল বন্য উঠার,
পিঁজরা ভাঙার অক্‌বকি অভিলাষেই ত
নিয়মের দাস-লে নিয়মের মালিক হওয়া[৩১]

এই সংখ্যাতেই, কে. এল. খানের 'গরমীবালা' কবিতায় প্রখর গ্রীষ্ম কবির কল্পনায় হয়ে উঠেছে নারীরূপী 'গরমীবালা'। প্রখর গ্রীষ্মে পুরুলিয়ার মানুষ ও প্রকৃতির কষ্ট পরিস্ফুটিত হয়েছে, এবং সে কষ্ট দেখে কবি কখনও কাতর অনুরোধ, কখনও দোষারোপ করেছেন। কখনও হয়ে উঠেছেন ক্রোধান্বিত —

চাইট্যে ফুরাঁই মাড়-ভাতের বাটি
তখে গড়্হার্যেঁ দিয়ে পাথর ভাঙ্গি মাটি কাটি
তবু যে তোর্ লাজ লাগ্যে নাই, লাজখাউকি
কিসের এত দেমাক্ ল; তোর্, লাচ্‌দেমাকি?[৩২]

কখনও অভিমানীও হয়ে উঠেছেন। প্রায় মৃতপ্রায় অবস্থার পর বৃষ্টি নামলে কবির অভিমান ছায়া ফেলে—

আংরাপুড়া দিনের যত ঘামঘামাচি
ধুঁয়ো দিতে ঝম্‌ঝমাঝম্ বিষ্টি দিলি
তাইলে এত পুড়্হালি কেনে বল?[৩৩]

৩১ বর্ষ, ১ম সংখ্যায় (১৪০৭) মৃদুল মুখোপাধ্যায়ের 'মন যাতে চায় চান্দের দেশে' কবিতাটিতে ক্ষুধার সাথে রোমান্টিকতা একাকার হয়ে গেছে—

ভাবছি ইবার তুকে লিয়্যে
বন্যেই চলে যাব
গাছের তলায় ভূঁয়্যে শুয়্যে
চান্দের পিঠা খাব।[৩৪]

এই সংখ্যায় নিসার সুরফুদ্দিনের 'ই কথা কাকে বলি?' কবিতাটিতে কর্মহারা মানুষের অন্তর্কন্দন ছাপ ফেলেছে।

৩১ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, টুসু সংখ্যা (১৪০৭) এ মোহিনীমোহন গঙ্গোপাধ্যায়ের 'কখন হবেক মা' কবিতায় পুরুলিয়ার খরা ও প্রকৃতির আর্তনাদ প্রকাশ পেয়েছে—

আয় মেঘ আয় তর্ ডাকেতে মাঠ দিয়েছে রা।[৩৫]

এই সংখ্যাতেই, ছত্রমোহন মাহাতর 'কিসের ডরাবি' কবিতাটি প্রকাশিত হয়। এই সংখ্যায় ঝগড়ু মাহাতর 'আঁধার্‍্যা আকাশ' কবিতাটি সাম্যবাদের মিথ্যা প্রতিশ্রুতির উপর কড়া চাবুক মারে। সমাজের বৈষম্য ফুটে উঠে জীবন্তরূপে। সাম্যবাদের অলীক স্বপ্ন যে ভিত্তিহীন, কথকের মনে সেই বোধের সঞ্চার হয়—

সোবকে সমান নাকি কইরবেক পেঁদারা
ফ'চ্ছ্যাল আকাশটা, আমি দেখি আঁধার্‍্যা।।[৩৬]

৫

'ছত্রাক' পত্রিকাকে ঘিরে পুরুলিয়ার কবিরা এভাবে আঞ্চলিক ভাষার কবিতাচর্চা চালিয়ে গেছেন। তবে পরবর্তীতে 'অনৃজু', 'অড়ের' মতো পত্রিকাও এই পথে এগিয়ে এসেছে। পুরুলিয়ার আঞ্চলিক ভাষার কবিতাচর্চায় জোয়ার আসে ৮-৯ এর দশকে। কেননা, পত্র-পত্রিকা ছাড়িয়ে কবিরা আঞ্চলিক ভাষার কাব্য প্রকাশে এগিয়ে এলেন। মান্য বাংলার কবিতা-স্রোতের উলটো দিকে দাঁড়িয়ে এ যে কতখানি সাহসী ও প্রতিবাদী পদক্ষেপ, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। পুরুলিয়া জেলার আঞ্চলিক ভাষার কবিতার বই প্রথম প্রকাশ পেল ১৯৮৫ তে। বইটির নাম 'গাঁয়ের নাম পরব', কবি দিলীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা। পুরুলিয়া জেলার আঞ্চলিক ভাষার কবিতাচর্চা ও তার ক্রমবিকাশের ইতিহাসে এই বই একটি মাইলফলক। ক্রমে, ১৯৮৬ -তে অরুণ কুমার চট্টোপাধ্যায়ের 'সাঁঝবিহান', ১৯৮৭ -তে মোহিনীমোহন গঙ্গোপাধ্যায়ের 'মাড়ভাতের লড়াই', ১৯৯৩ -এ দিলীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'এত বড় লদী', ১৯৯৫ -এ মোহিনীমোহন গঙ্গোপাধ্যায়ের 'চাঁদে এককাঠা জমি', ১৯৯৬ -এ বেণু দেবীর 'পুরুলিয়ার বারহমাসি', ১৯৯৮ -এ সুকুমার চৌধুরীর 'লাল নীল হইলদা তিনদিকে ঝাইলদা', শঙ্কর চৌধুরীর 'ঝরাপাতা', পার্থসারথি মহাপাত্রের 'বড় বড়মকরুর ছা', ১৯৯৯ -এ মোহিনীমোহন গঙ্গোপাধ্যায়ের 'মাঠখসড়া', জলধর কর্মকারের 'হামরা মানভূঞা বঠি', তারাশঙ্কর দরিপার 'কপাট খুল', ২০০০ -এ রমানাথ দাসে 'ঢেউ', মুজিবর আনসারির 'টাঁড় টিকর', ২০০১ -এ বসন মণ্ডলের 'মল্লভূমির কবিতা', ২০০২ -এ অসিত কুমার মাজীর 'পরব টাঁড়ের পাঁচালী', ২০০৫ -এ সাধন মাহাতর 'মহড়ার পালক', ২০০৭ -এ শ্রীজয়ন্তর 'হ্যা লো হামি মহুল বইনা বইলছি', ২০১০ -এ শশধর মাহাতর 'তাও পুরুল্যাকে নেদাড়িয়েই বলে', ২০১২ -তে রমানাথ দাসের 'আই পুরুল্যা যাই পুরুল্যা' প্রভৃতি অসংখ্য গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে এবং হয়ে চলেছে, যাদের তালিকা দেওয়া এই

সংক্ষিপ্ত আলোচনায় সম্ভব নয়। তবে ক্রমবিকাশের দীর্ঘ-রূপরেখাটিকে আরেকটু স্পষ্ট করার খাতিরে আমাদের ২০২১ এ প্রকাশিত অজয় গাঙ্গুলীর 'শাল-পিয়ালের মাঝে' গ্রন্থটির নাম উল্লেখ করতেই হয়।

সুতরাং বোঝাই যাচ্ছে, বঙ্গভুক্তি পরবর্তী পুরুলিয়ায় আঞ্চলিক ভাষার কবিতার উত্থানপর্ব ছিল যতখানি স্বতঃস্ফূর্ত ও প্রতিস্পর্ধী, তার ক্রমবিকাশের পথটিও ততখানিই উজ্জ্বল হতে উজ্জ্বলতর হয়েছে। এবং তাই মান্যবাংলার বিপরীতে দাঁড়িয়ে পুরুলিয়ার আঞ্চলিক কবিতা নিজেকে আজ স্বতন্ত্র ক্ষেত্র-রূপে গড়ে তুলতে পেরেছে।

৬

জসীমউদ্দিন, মণিশ ঘটক সহ অনেকেই সাহিত্যে তথা কবিতায় আঞ্চলিক শব্দ ব্যবহার করেছেন। কিন্তু আপাদমস্তক আঞ্চলিক ভাষায় কবিতা রচনা সম্ভব কি না, বা তা হলে আপামর কবিতা-পাঠকের কাছে তা কতটা গ্রহণযোগ্য হবে এ নিয়ে তর্কবিতর্ক চলেছে নানা সময়। ফলত পুরুলিয়ার আঞ্চলিক কবিতাকে তার সূচনা থেকে এখনও পর্যন্ত এই প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়। ভাষার অজুহাতে দেখিয়ে একটি ধারার সাহিত্যকে ব্রাত্য করে রাখা অনুচিত। কবির মনের একটি বিমূর্ত ধারণাকে কবি প্রকাশ করতে চান কবিতার মধ্যে। তাতে থাকে, তার অনুভূতি-আবেগ-কল্পনা। একটি ব্যঞ্জনার উপলব্ধি ঘটায়। আঞ্চলিক ভাষা এই অনভূতির প্রকাশমাধ্যম হতে পারে না, এমন সন্দেহ প্রকাশ করা অযৌক্তিক। বরং মাতৃভাষায় প্রকাশ করা আরো সহজ হয়ে ওঠে, এই সারসত্য আমাদের মানতে হবে। ভাষা নয়, কবির কবিত্বই আসল কথা। এই সমস্ত ভাবনা থেকেই 'ছত্রাক' পত্রিকা বার বার আঞ্চলিক কবিতার স্বরূপ সন্ধান ও সম্ভাবনা বিষয়ক আলোচনা সভার আয়োজন করেছে। এবং সেগুলি প্রকাশিত হয়েছে, পত্রিকার পরবর্তী সংখ্যায়। আমরা এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করতে পারি, রজত-জয়ন্তী বর্ষ, উদ্বোধনী সংখ্যা, শারদীয়া, ১৪০১ বঙ্গাব্দে "ছত্রাকের আসরে আলোচনা (মানভূমি কবিতা)" শীর্ষক প্রতিবেদনটির কথা। এছাড়া মানভূমী কবিতা বিষয়ক প্রবন্ধ-নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে নিয়মিত। ৩০ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, শারদ সাহিত্য বিশেষ সংখ্যা, ১৪০৬ এ প্রকাশিত মোহিনী মোহন গঙ্গোপাধ্যাইয়ের "মানভূমি কবিতার আঙ্গিক ও গতি প্রকৃতি প্রসঙ্গে কিছু কথা", এ বিষয়ক একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ। এছাড়া প্রবন্ধ লিখেছেন সুবোধ বসু রায়, অমিয় কুমার সেনগুপ্ত, শান্তি সিংহ প্রমুখরা। চিঠিপত্র বিভাগেও আঞ্চলিক কবিতা প্রসঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা-অনুসন্ধানমূলক লেখা ও ভাবনা উঠে আসতে লেগেছিল। যেমন প্রাবন্ধিক শান্তি সিংহ আঞ্চলিক কবিতা প্রসঙ্গে একটি চিঠিতে লিখছেন—

> রসনিষ্পত্তিই কবিতার বড় কথা। তা আঞ্চলিক ভাষার আংশিক প্রয়োগেই হোক কিংবা সম্পূর্ণ আঞ্চলিক ভাষা দিয়ে কবিতার নির্মাণেই হোক। আর যদি সেখানে আপাত দুরূহতার কথা ওঠে তবে আগ্রহী পাঠকপাঠিকাকে কিঞ্চিৎ পরিশ্রমী হয়ে অধিকারী বা যোগ্য হতে হবে, যেভাবে তাঁরা তথাকথিত গদ্য কবিতা প্রসঙ্গে গ্রহিষ্ণুচিও হয়েছেন।[৩৭]

আঞ্চলিক কবিতার গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন উঠলে, আমরাও প্রাবন্ধিক সিংহের সঙ্গে এবিষয়ে একমত পোষণ করব। মাধ্যম নয়, কবিতাই আসল কথা।

বাংলা কাব্যের ক্ষেত্রে পুরুলিয়ার আঞ্চলিক ভাষার কবিতা আজ একটি স্বতন্ত্র জগৎ নির্মাণ করেছে। সেই স্বাতন্ত্র্য তাদের দীর্ঘ লালিত ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, পরম্পরা থেকেই উঠে আসা। নতুন সৃষ্টির রশদ পেয়েছে তারা নিজেদের শেকড় থেকেই। তবে এই নতুন সৃষ্টি যথাযথ মর্যাদা ও আশ্রয় পেয়েছিল ছত্রাক পত্রিকার কাছে। মান্য বাংলার কবিতাচর্চার জোয়ার যখন তুমুল, পুরুলিয়ার লোকসংস্কৃতি-প্রেমী সুবোধ বসু রায় তাঁর সম্পাদিত 'ছত্রাকে' আশ্রয় দিলেন আঞ্চলিক কবিতাকে। স্রোতের উল্টোদিকে দাঁড়িয়ে পাঠকের কাছে পৌঁছে দেওয়ার লড়াইয়ে নেমেছিলেন তিনি। এবং এই লড়াই চালিয়ে গেছেন বহুদিন। আজও সেই আদর্শ নিয়ে হাঁটছেন বর্তমান সম্পাদক শ্রমিক সেন। এ কথা অনস্বীকার্য, পুরুলিয়ার আঞ্চলিক ভাষার কবিতা-চর্চা, তার অগ্রগতি-ক্রমবিকাশপর্বের একটি বৃহৎ অংশজুড়ে রয়েছে 'ছত্রাক'-এর ভূমিকা। এবং তাই পুরুলিয়ার আঞ্চলিক ভাষার কবিতার কথা উঠলেই বৃহত্তর অধ্যায় হিসেবে 'ছত্রাক' পত্রিকার নাম উঠে আসে স্বাভাবিকভাবেই।

উত্থান, ক্রমবিকাশের পথ বেয়ে পুরুলিয়ার আঞ্চলিক কবিতা আজ বাংলা কাব্য-কবিতার জগতে স্বতন্ত্র অধ্যায় হয়ে দাঁড়িয়ে। যার নিভৃত কোটরে জেগে থাকে পুরুলিয়ার ঘ্রাণ। একটি ভূখণ্ডের মাটি, মানুষ, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি জলছবির মতো জেগে থাকে। তবে আঞ্চলিকতাই সমাপ্তি নয়, তা অতিক্রম করে একটি দেশ-কাল-সময়কেও ধারণ করে এই কবিতার ধারা। অঞ্চল ছাড়িয়ে মানুষের শাশ্বত মন, চিরন্তন অনুভূতিরও কথা বলে। জাতীয় জীবনের আশা-আকাঙ্খা, রূপ-রঙ ভেসে ওঠে ক্যানভাসে। কবি মনের চিরন্তন ঘাত-প্রতিঘাত, আশ্রয় অনুসন্ধানী উদ্ভ্রান্ততাও জেগে থাকে। পুরুলিয়ার আঞ্চলিক কবিতা আবৃত্তিশিল্পীদের জন্য অনেকখানি এখন জনপ্রিয়। অনেক মানুষ শুনতে ভালোবাসেন, শোনেনও। কিন্তু কেবল আবৃত্তির জন্য, প্রচারিত হওয়ার উদ্দেশ্যে হালকা চালের ছড়াজাতীয় বেশ কিছু লেখা জোরপূর্বক লেখা হচ্ছে। এগুলি আর যাই হোক কবিতা নয়। কেবল আঞ্চলিক ভাষায় প্রয়োগেই কোনো লেখা কবিতা হয়ে ওঠে না। থাকতে হয় স্বভাবজাত কবি মন, সিরিয়াস অধ্যাবসায়, এবং ঐতিহ্যের প্রতি সম্যক জ্ঞান ও উপলব্ধি। পুরুলিয়ার আঞ্চলিক কবিতার জগতে এমন সিরিয়াস কবি আছেন অনেকেই, আমরা আলোচনা করেছি। তবে অ-কবির সংখ্যাও কম নয়।

তথ্যসূত্র :

১. দিলীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'ভূমিকা', *সুনির্বাচিত মানভূমি কবিতা*, সুভাষ রায় সম্পাদিত, অনৃজু, পুরলিয়া, দ্বিতীয় প্রকাশ, পুরুলিয়া বইমেলা, ২০১৭, তৃতীয় নম্বর পৃষ্ঠা

২. গদাধর চৌধুরী, 'খালভরা হামাকে সাঁথাছে', পূর্বোক্ত, পৃ. ২৫
৩. দীনা তাঁতি, 'ফাঁকি দিয়ে চালালি আসাম', পূর্বোক্ত, পৃ. ২৫
৪. ভজহরি মাহাত, 'শুন বিহারী ভাই', ২ নং গান, *টুসুর গানে মানভূম*, অরুণচন্দ্র ঘোষ কর্তৃক প্রকাশিত, লোকসাহিত্য ভবন, পুরুলিয়া (মানভূম)
৫. অরুণ কুমার চট্টোপাধ্যায়, 'ভূমিকা', *সাঁঝ বিহান*, মহাদিগন্ত প্রকাশ সংস্থা, প্রথম প্রকাশ, বইমেলা, জানুয়ারি, ১৯৮৬
৬. মোহিনী মোহন গঙ্গোপাধ্যায়, 'মানভূমি কবিতার আঙ্গিক ও গতিপ্রকৃতি প্রসঙ্গে কিছু কথা', *ছত্রাক*, সুবোধ বসু রায় সম্পাদিত, পুরুলিয়া, শারদ সাহিত্য বিশেষ সংখ্যা, ৩০ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ১৪০৬, পৃ. ১৭
৭. অরুণ কুমার চট্টোপাধ্যায়ের 'পাঁচিলটোই ভাইঙে দেন', *ছত্রাক*, পূর্বোক্ত, একাদশ বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা, ১৩৮৭, পৃ. ১৪০
৮. তদেব
৯. তারাশঙ্কর দরিপা, 'আজকের ছড়া', *ছত্রাক*, পূর্বোক্ত, একাদশ বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা, পৃ. ২২৩
১০. দিলীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'হারান্যা', তদেব, পৃ. ২২৬
১১. সত্য গুপ্ত, 'ভিখ মাঙ্গা', *ছত্রাক*, পূর্বোক্ত, দোল সংখ্যা, ১৩৮৮, পৃ. ১৯৮
১২. হরিদাস মুখোপাধ্যায়, 'পাঘা আর খাঁচার গল্প', তদেব, পৃ. ১৯৬
১৩. অরুণ প্রকাশ সিংহ, 'একটা দেশপ্রেমবিমূখী কবিতা', তদেব, পৃ. ১৯৯
১৪. তদেব
১৫. সুবোধ বসু রায়, 'ই সময়টয়', *ছত্রাক*, পূর্বোক্ত, দোল সংখ্যা, ১৩৮৮, পৃ. ১৭
১৬. গৌরী শঙ্কর দাস, 'ভুখা শহিদ', *ছত্রাক*, পূর্বোক্ত, অষ্টাদশ বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা, ১৩৯৪, পৃ. ৯
১৭. কুচিল মুখোপাধ্যায়, 'শাগে বাইগণে', *ছত্রাক*, পূর্বোক্ত, ঊনবিংশ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, শারদীয়া সংখ্যা, ১৩৯৫
১৮. মোহিনীমোহন গঙ্গোপাধ্যায়, 'পাথর চাটান বুক', তদেব
১৯. অরুণ কুমার চট্টোপাধ্যায়, 'ই দেশটতে আর রইব নাই', *ছত্রাক*, পূর্বোক্ত, ঊনবিংশ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, সাহিত্য সংখ্যা, ১৩৯৬
২০. মোহিনীমোহন গঙ্গোপাধ্যায়, 'কানাভাঙা হাঁড়ি', *ছত্রাক*, পূর্বোক্ত, বিংশতি বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ১৩৯৬
২১. মহম্মদ শফি, 'শহীদের মা', *ছত্রাক*, পূর্বোক্ত, একবিংশতি বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ১৩৯৭
২২. মধুসূদন কালিন্দী, 'ভাঙাট', *ছত্রাক*, পূর্বোক্ত, দ্বাবিংশতি বর্ষ, ১ম সংখ্যা, শারদীয়া, ১৩৯৮, পৃ. ১৩
২৩. মধুসূদন কালিন্দী, 'ছভি', *ছত্রাক*, পূর্বোক্ত, দ্বাবিংশতি বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ১৩৯৮, পৃ. ১৪১

২৪. অরুণ কুমার চট্টোপাধ্যায়, 'লৌকিক ছড়া', *ছত্রাক*, পূর্বোক্ত, শারদ সংখ্যা, ত্রয়োবিংশ বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, ১৩৯৯, পৃ. ১১
২৫. সুবোধ বসু রায়, 'সাক্ষরতার টুসু', *ছত্রাক*, পূর্বোক্ত, চতুর্বিংশতি বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ১৪০০
২৬. অসীম বন্দ্যোপাধ্যায়, 'টুসুর দেশে', তদেব, পৃ. ৯১
২৭. রমানাথ দাস, 'হামদের কথা', *ছত্রাক*, পূর্বোক্ত, সাহিত্য সংখ্যা, ১৪০২
২৮. সুকুমার চৌধুরী, 'ফেলি', তদেব
২৯. প্রকাশিত প্রণবকুমার সেনগুপ্ত, 'আমাদের ঠাকুর ও একটি ভাসান', ২ নং কবিতা, *ছত্রাক*, পূর্বোক্ত, ষড় বিংশতি বর্ষ, শারদীয়া, ১৪০২
৩০. সুকুমার চৌধুরী, 'ভগীরথ', *ছত্রাক*, পূর্বোক্ত, শারদীয়া, ১৪০৪, পৃ. ১০
৩১. তারাশঙ্কর দরিপা, 'নাড়ীতে লড়াই দপ্‌দপাছে', *ছত্রাক*, পূর্বোক্ত, ৩০ বর্ষ, ৩য় ও চতুর্থ সংখ্যা, শ্রাবণ, ১৪০৭
৩২. কে. এল. খান, 'গরমীবালা', *ছত্রাক*, পূর্বোক্ত, ৩০ বর্ষ, ৩য় ও চতুর্থ সংখ্যা, শ্রাবণ, ১৪০৭, পৃ. ৩৮
৩৩. তদেব
৩৪. মৃদুল মুখোপাধ্যায়, 'মন যাতে চায় চান্দের দেশে', *ছত্রাক*, পূর্বোক্ত, বাঁদনা সংখ্যা, ৩১ বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, ১৪০৭, পৃ. ৫৫
৩৫. মোহিনীমোহন গঙ্গোপাধ্যায়, 'কখন হবেক মা', *ছত্রাক*, পূর্বোক্ত, ৩১ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, টুসু সংখ্যা, ১৪০৭, পৃ. ২৬
৩৬. ঝগড়ু মাহাত, 'আঁধার্‍যা আকাশ', তদেব, পৃ. ২৭
৩৭. শান্তি সিংহ, 'প্রসঙ্গ আঞ্চলিক কবিতা' (সম্পাদককে লেখা চিঠি), *ছত্রাক*, পূর্বোক্ত, ১২শ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, ১৩৮৯, পৃ. ২২৮

চারের দশকের প্রগতি-চেতনার নিরিখে বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কবিতার প্রাসঙ্গিকতা

সীমা পুরকাইত
গবেষক, বাংলা বিভাগ,
প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা

সারসংক্ষেপ: চারের দশকের অন্যতম সমাজমনস্ক কবি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় একদিকে রাজনৈতিক, প্রতিবাদী, সমাজচেতনামূলক কবিতা যেমন লিখেছেন, অন্যদিকে তাঁর ব্যক্তিপ্রেমের কবিতাও অসংখ্য। তাঁর প্রথম কবিতা সংকলন 'গ্রহচ্যুত' ১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত। তাঁর এই কবিতা-গ্রন্থে আত্মগত কবিতার প্রাধান্য বেশি। তবে 'মাঝে মাঝে মালটানা গাড়ির শব্দ' একটু ব্যতিক্রম। তৎকালীন যুদ্ধবিধ্বস্ত পৃথিবীর সমাজ ও জীবনের পঙ্কিল রূপের আভাস পাওয়া যায় এই কবিতায়। পুঁজিবাদী শক্তির প্রভূত উত্থানে সাধারন জনজীবন যেভাবে দূর্বিষহ হয়ে ওঠে, তারই এক ভারাক্রান্ত রূপ এই কবিতায় ফুটে উঠেছে -

"মাঝে মাঝে মালটানা গাড়ির শব্দ
কুকুরের কান্না?
তোমার গভীর ঘুমের পাশে আমার রাত্রি জাগরণ।
অদ্ভুত, এই পৃথিবীতে জীবনধারণ।"

("মাঝে মাঝে মালটানা গাড়ির শব্দ", 'গ্রহচ্যুত')

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কোনো একটি নির্দিষ্ট ধারার কবিতা রচনায় আবদ্ধ থাকেন নি। নানান স্বাদের কবিতা রচনাতেই তিনি উৎসাহী ছিলেন। প্রগতিশীলতার সঙ্গে প্রেমচেতনার, সৌন্দর্যচেতনার কোনো বিরোধ নেই তাঁর কাছে। বলেছেন, "মার্ক্সবাদে আমার অঙ্গীকার কোনোদিনই সুভাষ বা সুকান্তের সঙ্গে সমান্তরাল রেখা ধরে চলেনি।...আমার রাস্তা প্রথম থেকেই ছিল ভিন্ন। আজও তাই। 'মুখোশ', 'প্রভাস' অথবা আমার ব্যক্তিগত প্রেমের কবিতাগুলি থেকে আমি কোনওদিনই মুখ ফিরিয়ে নেবো না।" তারপর বলছেন, "আমাদের দেশ অথবা পৃথিবী এখনও কোনো স্বর্গরাজ্যে বা তার কাছাকাছি কোথাও পৌঁছাতে পারেনি। আমাদের (দেশের) রাজনৈতিক কর্মীদের তাই তো সারা জীবনের লড়াই থেকে যায় এই পৃথিবীটাকে বদলে দেবার। আমার কাজ মাটিতে কান রেখে কোথায় কি হচ্ছে, তার সংবাদ পৌঁছে দেওয়ার।"

তাঁর কবিতা সবসময়েই মানবিক আবেদনে উজ্জীবিত। তিনি যেহেতু মানুষের কবি, তাই তাদের অসহায়তার কথা, ক্ষুধা - অনাহারের কথা বারে বারে উঠে এসেছে তাঁর বিভিন্ন কবিতার মাধ্যমে। 'আশ্চর্য ভাতের গন্ধ', 'কালো বস্তির পাঁচালী', 'দোল ও পূর্ণিমা', 'রুটি দাও', 'অন্ন দেবতা', 'মহাদেবের দুয়ার' ইত্যাদি কবিতায় ক্ষুধার্ত মানুষের

অসহায়তাকে কাতর কণ্ঠে প্রকাশ করেছেন তিনি। তবে কবির প্রত্যয়, সমাজতন্ত্র একদিন প্রতিষ্ঠিত হবেই। বলেছেন, "আপনাদের এবং আমাদেরও সবসময় মনে রাখতে হবে, কোনো দেশেই সমাজবিপ্লব রাতারাতি আসে না; সেজন্য অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়। তার আগে আমাদের (এবং আপনাদের) মাঝেমধ্যেই নরক-দর্শন করতে হবে।" ফ্যাসিস্টরা কখনও জয়ী হতে পারে না। একটা সময়ে রাস্তা ছাড়তেই হয় তাদের।

"বরং তাকেই একদিন রাস্তা ছাড়তে হয়, যার স্পর্ধা আকাশ ছুঁয়ে যায়।"

("রাস্তা কারো একার নয়")

তাঁর কবিতায় ঈশ্বর, পুরাণ অনুষঙ্গও এসেছে। এছাড়া বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মার্ক্স, লেনিনকে নিয়ে যেমন কবিতা লিখেছেন, ঠিক তেমনই বিপরীত রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী মহাত্মা গান্ধীর প্রতিও শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। তাঁকে নিয়েও অনেক কবিতা লিখেছেন তিনি। সাম্য ও সমাজতন্ত্রের প্রতি আস্থা থাকলেও কমিউনিস্ট পার্টির বিধিনিষেধগুলোকে কখনো গুরুত্ব দেননি তিনি। সব ধরনের কবিতা রচনাতেই সমান উৎসাহী ছিলেন তিনি। মার্ক্সবাদী পত্রিকাই হোক বা রাজনৈতিক পত্রিকা - সব ধরনের পত্রিকাতেই তিনি লিখতেন। তিনি স্বাধীন সাহিত্য রচনায় বিশ্বাসী ছিলেন এবং ব্যক্তি-স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ অপছন্দ করতেন। বামপন্থী দলের মতামতকে তিনি সর্বদা মানতে পারেননি।

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় চারের দশকের প্রধান কবিতার ধারার অন্যতম একজন কবি হলেও, মতাদর্শে অনেকখানি স্বতন্ত্র পথে হেঁটেছিলেন তিনি। তাঁর সব কবিতা শিল্পগত দিক থেকে সার্থক না হলেও, চারের দশকের প্রগতিশীল কবিতার ধারায় অবশ্যই এক স্বতন্ত্র স্থান দখল করে আছে তাঁর কবিতা।

সূচক শব্দ : পুঁজিবাদ, সুকুমার রায়, 'আবোল তাবোল', ক্ষুধা-হাহাকার, 'মুখোশ', ব্যক্তিপ্রেমের কবিতা, দেশভাগ, নকশাল, বন্দীমুক্তি আন্দোলন, সমাজ-বিপ্লব, লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি, গ্যালিলিও, তীর্থের পাণ্ডা, ফ্যাসিস্ট, ভারতবর্ষ, চাঁদের দেশ, শোষণমুক্ত নির্মল মানবিক ঠাঁই, ঈশ্বর-পুরাণ অনুসঙ্গ, শিব, বেহুলা, লখিন্দর, মার্ক্স, লেনিন, মহাত্মা গান্ধী, জীবনানন্দ দাশ, নজরুল, রবীন্দ্রনাথ, মঙ্গলকাব্য, সমাজচেতনা, অরুণ মিত্র, বিমলচন্দ্র ঘোষ, 'অরণি', 'বসুমতী', 'পরিচয়', 'পূর্ব্বাশা', 'কবিতা', বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রগতিশীল সাহিত্যিক।

মূল আলোচনা:

চারের দশকের অন্যতম সমাজমনস্ক কবি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় একদিকে রাজনৈতিক, প্রতিবাদী, সমাজচেতনামূলক কবিতা যেমন লিখেছেন, অন্যদিকে তাঁর ব্যক্তিপ্রেমের কবিতাও অসংখ্য। তাঁর প্রথম কবিতা সংকলন 'গ্রহচ্যুত' ১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত। তাঁর এই কবিতা-গ্রন্থে আত্মগত কবিতার প্রাধান্য বেশি। তবে 'মাঝে মাঝে মালটানা

গাড়ির শব্দ' একটু ব্যতিক্রম। তৎকালীন যুদ্ধবিধ্বস্ত পৃথিবীর সমাজ ও জীবনের পঙ্কিল রূপের আভাস পাওয়া যায় এই কবিতায়। পুঁজিবাদী শক্তির প্রভূত উত্থানে সাধারন জনজীবন যেভাবে দূর্বিষহ হয়ে ওঠে, তারই এক ভারাক্রান্ত রূপ এই কবিতায় ফুটে উঠেছে -

"মাঝে মাঝে মালটানা গাড়ির শব্দ
কুকুরের কান্না?
তোমার গভীর ঘুমের পাশে আমার রাত্রি জাগরণ।
অদ্ভুত, এই পৃথিবীতে জীবনধারণ।"

("মাঝে মাঝে মালটানা গাড়ির শব্দ", 'গ্রহচ্যুত')

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কোনো একটি নির্দিষ্ট ধারার কবিতা রচনায় আবদ্ধ থাকেন নি। নানান স্বাদের কবিতা রচনাতেই তিনি উৎসাহী ছিলেন। একটি সাক্ষাৎকারে বলেছেন, "কবিতার সঙ্গে রাজনীতির সম্পর্ক থাকলে আমি খুশি হই। আমি এই ধরনের কবিতাই বেশি লিখতে চাই। তবে কোনো কবির সব কবিতার সঙ্গে, বা, সব কবির কবিতার সঙ্গেই রাজনীতির সম্পর্ক থাকতে হবে, এমন কোনো নির্দেশনামা আমি ভিতর থেকে পাই না, অথবা বাইরে থেকে কেউ বলে দিলেও আমি পছন্দ করি না। ধরুন কেউ যদি সুকুমার রায় সম্পর্কে এমন অভিযোগ আনেন যে, তাঁর কবিতার সঙ্গে রাজনীতির কোনো গভীর সম্পর্ক নেই সুতরাং কবি হিসেবে তিনি আমাদের আপন নন, তাতে আমার মন সায় দেয় না। 'আবোল তাবোল' - এর কবিতা আমরা ছোটোবেলায় পড়েছি এবং এখনও পড়ি। ভবিষ্যতেও পড়বো।"[১]

প্রগতিশীলতার সঙ্গে প্রেমচেতনার, সৌন্দর্যচেতনার কোনো বিরোধ নেই তাঁর কাছে। বলেছেন, "মার্ক্সবাদে আমার অঙ্গীকার কোনোদিনই সুভাষ বা সুকান্তের সঙ্গে সমান্তরাল রেখা ধরে চলেনি।...আমার রাস্তা প্রথম থেকেই ছিল ভিন্ন। আজও তাই। 'মুখোশ', 'প্রভাস' অথবা আমার ব্যক্তিগত প্রেমের কবিতাগুলি থেকে আমি কোনওদিনই মুখ ফিরিয়ে নেবো না।"[২] তারপর বলছেন, "আমাদের দেশ অথবা পৃথিবী এখনও কোনো স্বর্গরাজ্যে বা তার কাছাকাছি কোথাও পৌঁছাতে পারেনি। আমাদের (দেশের) রাজনৈতিক কর্মীদের তাই তো সারা জীবনের লড়াই থেকে যায় এই পৃথিবীটাকে বদলে দেবার। আমার কাজ মাটিতে কান রেখে কোথায় কি হচ্ছে, তার সংবাদ পৌঁছে দেওয়ার। আর তখনই আমাকে ঘুরে ফিরে একটি ক'রে নতুন 'মুখোশ' লিখতে হয়। লেখা উচিত।"[৩]

তাঁর কবিতা সবসময়েই মানবিক আবেদনে উজ্জীবিত। তিনি যেহেতু মানুষের কবি, তাই তাদের অসহায়তার কথা, ক্ষুধা - অনাহারের কথা বারে বারে উঠে এসেছে তাঁর বিভিন্ন কবিতার মাধ্যমে। 'আশ্চর্য ভাতের গন্ধ' কবিতায় লিখেছেন -

"আশ্চর্য ভাতের গন্ধ রাত্রির আকাশে
কারা যেন আজো ভাত রাঁধে

ভাত বাড়ে, ভাত খায়।
আর আমরা সারারাত জেগে থাকি
আশ্চর্য ভাতের গন্ধে,
প্রার্থনায় সারারাত।”

(“আশ্চর্য ভাতের গন্ধ”, ‘মুখে যদি রক্ত ওঠে’)

এছাড়া ‘কালো বস্তির পাঁচালী’, ‘দোল ও পূর্ণিমা’, ‘রুটি দাও’, ‘অন্ন দেবতা’, ‘মহাদেবের দুয়ার’ ইত্যাদি কবিতায় ক্ষুধার্ত মানুষের অসহায়তাকে কাতর কণ্ঠে প্রকাশ করেছেন তিনি। ক্ষুধার জ্বালায় মানুষের পেট জ্বলছে। মরছে মানুষ। দুধের শিশুটাও দুধ পাচ্ছে না।

“ক্ষুধার আগুন দাউ দাউ দাউ
কান্না-ভেজা ঘরে;
মায়ের কোলে দুধের শিশু
দুধ ছাড়া আজ মরে।”

(“কালো বস্তির পাঁচালি”, ‘মুখে যদি রক্ত ওঠে’)

খিদের দেবতাকে ডেকেও ক্ষুধা-যন্ত্রণার নিষ্পত্তি ঘটে না।

“মাগো এত ডাকি খিদের দেবতাটাকে
বেশি নয় যেন দু’বেলা দু’মুঠো নুনমাখা ভাত রাখে –
তুই আর আমি দুঃখ ভুলবো, ভুলবো পেটের জ্বালা;
খিদের দেবতা সে কী, একেবারে কালা!”

(“কালো বস্তির পাঁচালি”, ‘মুখে যদি রক্ত ওঠে’)

আসলে শোষিত, বঞ্চিত, অসহায়, দরিদ্র মানুষের যন্ত্রণার নিষ্পত্তি ঘটানোর কেউ নেই। দেবতাও নয়।

“বাছা রে, আমরা অচ্ছুৎ, তাই যেভাবে যতই ডাকো
কোনো দেবতাই বস্তিতে আসে নাকো।”

(“কালো বস্তির পাঁচালি”, ‘মুখে যদি রক্ত ওঠে’)

ক্ষুধার্ত মানুষের হাহাকার কবির হৃদয়ে এসে যেন আঘাত হানে। তাই তাঁর কাতর আবেদন -

“হোক পোড়া বাসি ভেজাল মেশানো রুটি
তবু তো জঠরে বহ্নি নেবানো খাঁটি
এ এক মন্ত্র! রুটি দাও, রুটি দাও,
বদলে বন্ধু যা ইচ্ছে নিয়ে যাও :”

(“রুটি দাও”, ‘উলুখড়ের কবিতা’)

না খেতে পেয়ে মানুষ কাঁদছে। মরছে মানুষ। যারা সাধারণ মানুষের মুখের ভাত কেড়ে নেয়, তাদের ধ্বংস কামনা করেছেন তিনি -

"সে অন্নে যে বিষ দেয়, কিংবা তাকে কাড়ে
ধ্বংস করো, ধ্বংস করো, ধ্বংস করো তারে।"

("অন্নদেবতা", 'মুখে যদি রক্ত ওঠে')

একজন সমাজমনস্ক কবি হিসাবে তাঁর কবিতায় স্বদেশের কথা উঠে আসবে, সেটাই স্বাভাবিক। 'বিশুদ্ধ কবিতায় আমি নিশ্চয় বিশ্বাস করি। এরকম যে আমি নিজেও লিখিনি এমন নয়। পারলে এখনও লিখবো। তা বলে সময় ও দেশকেই বা আমি অস্বীকার করবো কেন?'[৪] দেশকে স্বাধীন করতে হবে - এই উদ্দেশ্য থেকেই তিনি অনুশীলন দলের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন ক্লাস সেভেনে পড়াকালীন।[৫] দেশভাগের ঘটনাটি সবচেয়ে বেশি আলোড়িত করেছিল তাঁকে।[৬] এছাড়া নকশাল আন্দোলন এবং আন্দোলনকারীদের ওপর পুলিশী অত্যাচারের ঘটনাও তাঁর লেখায় উঠে এসেছে – "...নকশাল আন্দোলন প্রসঙ্গে বলতে গেলে (বলতে হয়) ওই আন্দোলনের সঙ্গে আমি যুক্ত ছিলাম না। হাজার হাজার ছেলের ওপর পুলিশের অত্যাচার হচ্ছিল। আমি কেবলমাত্র তার প্রতিবাদ করেছি। তবে ছোটোবেলায় অগ্নিযুগের বিপ্লবীদের যেমন দেখেছি যুবকরা আদর্শের জন্য প্রাণ দিতে জানে, সত্তরের দশকে সে-ধরনের একটা প্রত্যয় বাইরে থেকে অনুভব করেছিলাম।"[৭] তবে নকশালপন্থীদের সঙ্গে তাঁর সকল মতামতের যে মিল ছিল, তা নয় – "নকশালপন্থীদের সঙ্গে কোনো যোগই ছিল না। প্রথম-প্রথম কাগজে পড়তাম। কোনো উৎসাহ বোধ করিনি। মতামতের সমর্থকও ছিলাম না। কোনো কোনো কাজের প্রবল বিরোধী ছিলাম। এখনও আছি। স্কুল আক্রমণ করার, ছাত্রজীবন নষ্ট করার কোনো যুক্তি নেই। স্কুল হলো নতুন কর্মী বেছে নেবার, তৈরি করবার জায়গা। স্কুল-ব্যবস্থা ভেঙে দিয়ে কোনো বিপ্লব হয় না।"[৮] কিন্তু তারা যেহেতু কোনো ক্রিমিনাল নয়, তাই শুধু মিছিল করছে ব'লে, সভা করছে ব'লে যদি একটা গণতান্ত্রিক দেশের গণতান্ত্রিক সরকার তাদের ওপর অকথ্য অত্যাচার চালায়, জেলে নিয়ে গিয়ে বিনাবিচারে মেরে ফেলে, কবির প্রতিবাদ শুধু প্রশাসনের সেই অবিচারের বিরুদ্ধে। একটি সাক্ষাৎকারে বলেছেন, "কিন্তু তারপর ক্রমেই সরকারের অত্যাচার দেখতে - দেখতে অস্থির হয়ে উঠলাম। এই পাড়ার অল্প বয়সের ছেলেরা - শুধু মিছিল করছে, সভা করছে ব'লে - যেভাবে অত্যাচার হয়েছে তাদের ওপর, জেলে নিয়ে গিয়ে বিনাবিচারে মেরে ফেলা হয়েছে – তারা তো ক্রিমিনাল নয়। দেশের জন্য ভিন্ন এক শাসনব্যবস্থার কথা ভাবছে - এই অপরাধে গণতান্ত্রিক সরকার যদি এই নির্বিচার হত্যাকাণ্ড চালায় তাহলে তার প্রতিবাদ করা উচিত মনে করেছি। সেজন্যই তাদের মনে ক'রে, তাদের উদ্দেশ্যে, অত্যাচারের প্রতিবাদে আমার কবিতা।"[৯] তাঁর সেইরূপ ভাবনারই একটি কবিতা 'মুণ্ডহীন ধরগুলি আহ্লাদে চিৎকার করে'। কবির একটি সাক্ষাৎকার থেকে জানা যায়।[১০]

"মুণ্ডহীন ধরগুলি আহ্লাদে চিৎকার করে, 'রঙ্গিলা! রঙ্গিলা!
কী খেলা খেলিস তুই!
যন্ত্রণায় বসুমতী ধনুকের মতো বেঁকে যায় –
বাজারে মহান নেতা ফেরি করে কার্ল মার্কস
লেনিন স্ট্যালিন গান্ধী এক এক
পয়সায়..."

("মুণ্ডহীন ধরগুলি আহ্লাদে চিৎকার করে", 'মুণ্ডহীন ধরগুলি আহ্লাদে চিৎকার করে')

তৎকালীন প্রশাসনের নৃশংস রূপকে ফুটিয়ে তুলেছেন কবি এইভাবে –

গুলি চলছে, গুলি চলছে, গুলি চলবে
এই না হলে শাসন?
ভাত চাইতে গুলি, মিছিল করলে গুলি,
বাংলা বনধ গুলির মুখে
উড়িয়ে দেওয়া চাই!
দেশের মানুষ না খেয়ে দেয় ট্যাক্স, গুলি কিনতে,
পুলিশ ভাড়া
করতে, গুণ্ডা পুষতে ফুরিয়ে যায় তাই।
একেই বলে গণতন্ত্র; এরই জন্য কবিতার সর্দার সাহিত্যের মোড়লেরা
কেঁদে ভাসান; যখন
গুলিবিদ্ধ রক্তে ভাসে আমার ঘরের বোন, আমার ভাই!"

("গুলি চলছে", 'মুণ্ডহীন ধরগুলি আহ্লাদে চিৎকার করে')

তবে তাঁর সব কবিতা যে শিল্পগুণ বজায় রাখতে পেরেছে, তা নয়। বলেছেন, "বন্দীমুক্তি আন্দোলনের সময় একটার পর একটা কবিতা এই পত্রিকায়, ওই পত্রিকায় নিজে থেকে পাঠিয়েছি। কোনটা কবিতা হলো আর কোনটা হলো না - এটা ভেবে দেখার সময় তখন ছিল না।বিষয়টাই ছিল প্রধান। ফলে বহু 'কাব্যগুণহীন জার্নালিজম' হয়েছে। নকশাল তরুণ-তরুণীদের নিয়ে যখন পুলিশী তাণ্ডব চলছিল, সত্তর দশকের সেই কয়েকটা বছর শুধু প্রতিবাদ জানানোর জন্যই আমাকে শতাধিক কবিতা লিখতে হয়েছে। 'মুণ্ডহীন ধরগুলো আহ্লাদে চিৎকার করে', 'আমার রাজা হওয়ার স্পর্ধা', 'রাস্তায় যে হেঁটে যায়', 'মানুষখেকো বাঘেরা বড় লাফায়' - এইসব পুস্তিকাগুলি প্রধানত তারই ফলশ্রুতি।"[১১]

প্রশাসন যখন আন্দোলনকারীদের ওপর অকথ্য অত্যাচারের দ্বারা তাদের আন্দোলনকে দমন করার চেষ্টা করছে, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কবিতা তখন আন্দোলনকারীদের উৎসাহ, সাহস ও প্রেরণারূপে কাজ করেছে।

"এখনো রাত শেষ হয় নি;

অন্ধকার এখনো তোমার বুকের ওপর
কঠিন পাথরের মতো, তুমি নিঃশ্বাস নিতে পারছো না।
মাথার ওপর একটা ভয়ংকর কালো আকাশ
এখনো বাঘের মতো থাবা উঁচিয়ে বসে আছে।
তুমি যেভাবে পারো এই পাথরটাকে সরিয়ে দাও
আর আকাশের ভয়ঙ্করকে শান্ত গলায় এই কথাটা জানিয়ে দাও
তুমি ভয় পাও নি।"

("জন্মভূমি আজ", 'মুণ্ডহীন ধরগুলি আহ্লাদে চিৎকার করে')

চারদিকে রক্ত দেখতে দেখতে দুই চোখ অন্ধ হয়ে যাচ্ছে। শোষক শ্রেণির অকথ্য অত্যাচার সত্ত্বেও হার মানতে নারাজ। দীপ্ত কণ্ঠে জানিয়েছেন –

"এই তোমার রাজত্ব, খুনি! তার ওপর কী বাহবা চাও?
আমরাও দেখব, তুমি কতদিন এইভাবে রাক্ষস নাচাও!"

(উত্তরপাড়া : কলেজ হাসপাতাল", 'ওরা যতই চক্ষু রাঙায়')

তিনি মৃত্যুকেও ফিরিয়ে দিতে চান –

"যেতে হবে।
যেতেই হবে?
কিন্তু তাঁকে বলে দিও,
যাব ঠিকই যেদিন আমার সময় হবে।"

("যাবো ঠিকই", 'অফুরন্ত জীবনের মিছিল')

কারণ কবির এখন এই পৃথিবীতে ঢের কাজ বাকি আছে। সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ তিনি।

"ধর্ম যখন বিজ্ঞানকে বলে রাস্তা ছাড়ো! বিজ্ঞান কি রাস্তা ছেড়ে দেয়?
পোপের ভয়ে দেশান্তরী হয়েছিলেন লিওনার্দো দা ভিঞ্চি। সারাদিন
একটা অন্ধকার ঘরের মধ্যে পায়চারি করতেন গ্যালিলিও গ্যালিলেই;
তাঁকে পাহারা দেবার জন্য বসে থাকতো একজন ধর্মের পেয়াদা, যার
চোখের পাতা বাতাসেও নড়তো না।
বিজ্ঞান কি তখন থেমে ছিল? তীর্থের পাণ্ডাদের হই হই, তাদের লাল।
চোখ কি পেরেছিল পৃথিবীকে বেঞ্চের উপর দাঁড় করিয়ে, সূর্যকে
তার চারদিকে ওঠবোস করাতে?" ("রাস্তা কারও একার নয়")

কবির প্রত্যয়, সমাজতন্ত্রও একদিন প্রতিষ্ঠিত হবে এভাবে। বলেছেন, "আপনাদের এবং আমাদেরও সবসময় মনে রাখতে হবে, কোনো দেশেই সমাজবিপ্লব রাতারাতি আসে না; সেজন্য অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়। তার আগে আমাদের (এবং আপনাদের) মাঝেমধ্যেই নরক-দর্শন করতে হবে। হতাশা আসবে। বিচ্ছিন্নতার বিষাদ বারবার আমাদের কবিতার অর্ধেক ফসল তুলে নিয়ে যাবে। একটি প্রত্যয়ের কবিতা লিখবার

আগে সাতবার আমাদের কলমের নিব ভেঙে যাবে। এখানেই তো একজন কবির জীবন। একজন মানুষের জীবন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আশা থেকে যাবে। ততদিন আমাদের স্বদেশে, বিদেশে, সমস্ত পৃথিবী জুড়ে মানুষের জন্য মানুষের লড়াই চলতে থাকবে।"[১২] ফ্যাসিস্টরা কখনও জয়ী হতে পারে না। একটা সময়ে তাদেরকে রাস্তা ছাড়তেই হয়।

"বরং তাকেই একদিন রাস্তা ছাড়তে হয়, যার স্পর্ধা আকাশ ছুঁয়ে যায়।"
("রাস্তা কারো একার নয়")

এই ভারতবর্ষ হল সেই পঞ্চাশ কোটি নগ্ন মানুষের,

"যারা সারাদিন রৌদ্রে খাটে, সারারাত ঘুমোতে পারে না
ক্ষুধার জ্বালায় শীতে।" ("আমার ভারতবর্ষ", 'মহাদেবের দুয়ার')

যারা দিন রাত পাহাড়ে, জঙ্গলে, চা-বাগানে, কয়লা খনিতে কাজ করে সোনা ফলায়, তারাই আজ নিজভূমে পরবাসী। আধপেটা হয়ে দিন কাটে তাদের, বিনা চিকিৎসায় মরে তারা।

"ঘর কোথায়? পাহাড়ে জঙ্গলে, চা-বাগানে, কয়লা-খনিতে,
তারা হাঁটে, কুঁজো হয়ে কাজ করে, আধপেটা খায়, বিনা চিকিৎসায় মরে।
কিংবা কপালের জোরে বেঁচে থাকে..."
("অথচ ভারতবর্ষ তাদের", 'অথচ ভারতবর্ষ তাদের')

বেঁচে থাকাটাই যাদের অনিশ্চিত, দেশ গড়ার কারিগর আসলে তারাই।

"অথচ ভারতবর্ষ তাদের রক্ত ও হাড় তারাই গড়েছে
এই মহাদেশ
শত শতাব্দীর শ্রমে, পরিচ্ছন্ন সততায়, মানবিক
শুভেচ্ছায়-বোধে।"
("অথচ ভারতবর্ষ তাদের", 'অথচ ভারতবর্ষ তাদের')

পৃথিবীতে সাধারণ মানুষের মাথাগোঁজার ঠাঁইটুকুও কেড়ে নিচ্ছে পুঁজিবাদীর দল। তাই কবি পৃথিবীর সকল শোষিত অত্যাচারিত সর্বহারা মানুষকে নিয়ে চাঁদের দেশে চলে যেতে চেয়েছেন। কারণ,

"পৃথিবীতে কোথাও আর নদী পাহাড় আকাশ
কোথাও আর ঘুমিয়ে থাকার ছ'ফুট জমি নেই।"
("যুদ্ধের বিরুদ্ধে", 'সভা ভেঙে গেলে')

তাই কবি বলেছেন -

"চলো আমরা চাঁদের দেশে যাই
চলো আমরা সময় থাকতে যে যার দেশের জাতীয় পতাকা
চাঁদের দেশের সবার চাইতে উঁচু পাহাড়টার

চূড়ায় দিই উড়িয়ে, তার মাটিকে করি সোনার চেয়ে দামী।"

("যুদ্ধের বিরুদ্ধে", 'সভা ভেঙে গেলে')

'পৃথিবীতে মানুষই মানুষের আর থাকবার জায়গা যখন দিচ্ছে না, তখন অগত্যা চাঁদের দেশে গিয়ে চাঁদের মাটিতে একটা দুর্নীতিমুক্ত শোষণমুক্ত নির্মল মানবিক ঠাঁই যদি গড়ে তোলা যায় এমন স্বপ্ন ও কল্পনার মিলিত চেতনার প্রকাশ ঘটালেন তিনি। একদিকে যুদ্ধ উন্মাদনায় ভোগদখলের প্রতিযোগিতায় আচ্ছন্ন পৃথিবী, অন্যদিকে সব-হারানো মানুষের দল। এই সব হারানোদের পাশে দাঁড়িয়ে এবং তাদের সঙ্গে নিয়ে বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মানুষের চেতনাস্বচ্ছ একটি নতুন দেশরচনার কারিগর হতে চাইলেন।'[১৩]

তাঁর কবিতায় ঈশ্বর, পুরাণ অনুষঙ্গও এসেছে। তাঁর একাধিক কবিতায় শিবের অনুষঙ্গ এসেছে। 'রাত্রি শিবরাত্রি', 'মালদহের গম্ভীরা' ইত্যাদি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সমাজতত্ত্বের নিরিখে বেহুলা চরিত্রটিকে ভিন্নরূপে প্রতিষ্ঠা করেছেন বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর একাধিক কবিতায়। যদিও বেহুলা কোনো ঈশ্বর বা পৌরাণিক চরিত্র নয়। সর্পাঘাতে মৃত লখিন্দরের প্রাণ ফিরিয়ে আনার দৃঢ় সংকল্পে বেহুলার যে জলযাত্রা, সেই কাহিনীর মধ্য দিয়ে কবি এই কবিতায় পুঁজিবাদের প্রভাবে বিপর্যস্ত তৎকালীন সমাজ-সভ্যতাকে পুনরুজ্জীবিত করে তোলার দৃঢ় সংকল্পকে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন।

"সে জাগবে। জাগবেই। আমি তাকে কোলে নিয়ে
বসে আছি পুঁজে মাখামাখি রাত্রি
ভেলায় ভাসিয়ে।
সে জাগবে, জাগবেই, লখিন্দর সে আমার।"

("বেহুলা", 'লখিন্দর')

লখিন্দর যেন বিপন্ন সমাজ-সভ্যতার প্রতীক। আর বেহুলা যেন সেইসব লড়াকু শ্রেণির প্রতিনিধি, যারা সময়ের অন্ধকার ঘুঁচিয়ে পুঁজিবাদের বিনাশ ঘটিয়ে সমাজটাকে সকল শ্রেণির মানুষের বসবাস-যোগ্য করে তুলতে চায় এবং সমান অধিকার সুনিশ্চিত করতে চায়।

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মার্ক্স, লেনিনকে নিয়ে যেমন কবিতা লিখেছেন, ঠিক তেমনই বিপরীত রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী মহাত্মা গান্ধীর প্রতিও শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। তাঁকে নিয়েও অনেক কবিতা লিখেছেন তিনি। বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মানুষের কবি। তাই অসহায় মানুষের প্রতি গান্ধীজির যে করুণা, একজন সমাজমনস্ক ও মানবতাবাদী কবি হিসাবে তা তিনি নিজের কবিতায় তুলে ধরতে দ্বিধাবোধ করেননি।

"দুচোখে ঝরে করুণাধারা
সে কি তোমার শান্তি
ভুবন ধুয়ে অঝোরে ঝরঝরানি।"

("গান্ধীজির পৃথিবী", 'মানুষের মুখ')

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় চারের দশকের কবি। আর চারের দশক হল বামপন্থী উজ্জীবনের দশক। কিন্তু প্রথাগত মার্ক্সবাদী ধ্যান-ধারণাগুলোর সঙ্গে তিনি তাঁর প্রগতি-ভাবনাকে মেলাতে পারেন নি সবসময়। বলেছেন, "আমার কবিতা কোনোদিনই চল্লিশের প্রগতিশীল কবিতা বা কবিদের কাছ থেকে অন্ন বা জল আহরণ করেনি। বরং আমি নিজের কবিতাকে যতটা বুঝি, আমার কবিতার শিকড় অন্যখানে। সেখানে আজও যারা জলসিঞ্চন করছেন তাঁরা সবাই দলছুট একক কবি – যেমন জীবনানন্দ, তারপর নজরুল এবং রবীন্দ্রনাথ।"[১৪]

মঙ্গলকাব্য থেকে শুরু করে রবীন্দ্রনাথেও সমাজচেতনা অনুভব করেছেন তিনি। তাঁর মতে, "বাংলা কবিতায় শ্রেণীসচেতনতা অথবা সাম্যবাদের ভাবনাটা চল্লিশের কবিরাই প্রথম আনেননি।... চল্লিশের যুগে ব্যাপারটা ঘটেছে একটি সংহত ঐকতানের মধ্য দিয়ে, ঢাক-ঢোল বাজিয়ে, মিছিল করে।"[১৫] তিনি বলেছেন, "বাংলা কবিতার সমাজচেতনা মঙ্গলকাব্যের সময় থেকেই আমরা অনুভব ক'রে আসছি। আধুনিক বাংলা কবিতার যাঁরা ভগীরথ - ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, মাইকেল, হেমচন্দ্র, নবীন - তাঁদের প্রত্যেকের কবিতায় তাঁদের নিজস্ব সমাজভাবনাগুলি বারবার উঁকি দিয়েছে। কিছুটা পিছুটানের ব্যাপার ঘটেছিল রবীন্দ্রনাথের কৈশোরকালে, তাঁর আত্মকথনে এবং প্রেমের কবিতায়। কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীর আধখানা রেনেসাঁর জোয়ার তাঁকেও স্থির থাকতে দেয়নি। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, গোবিন্দচন্দ্র দাস, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত এবং মাঝে মধ্যেই রবীন্দ্রনাথ কবিতার মাধ্যমে তাঁদের নিজস্ব সমাজভাবনাগুলিকে আমাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন। এদের পরেও এলেন নজরুল, বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র। শেষোক্ত কবিরা তাঁদের কবিকর্মের কৈশোর কালেই সাম্যবাদের প্রেমে পড়েছিলেন। সত্যেন্দ্রনাথ এবং বিজয়লাল পৌঢ় বয়সে সাম্যের সঙ্গে গান্ধীবাদকেও মেলাতে চেষ্টা করেছেন।"[১৬]

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় নিঃসন্দেহে একজন সাম্যবাদী কবি। তবে সাম্য ও সমাজতন্ত্রের প্রতি আস্থা থাকলেও কমিউনিস্ট পার্টির বিধিনিষেধগুলোকে কখনো গুরুত্ব দেননি তিনি। সব ধরনের কবিতা রচনাতেই সমান উৎসাহী ছিলেন তিনি। বলেছেন, "নিজের যখন যা মনে হয় সহজভাবে তাই বলার চেষ্টা করি। কোনো তত্ত্বই আমি কোনোদিনই তেমন বুঝিনি।"[১৭] মার্ক্সবাদী পত্রিকাই হোক বা রাজনৈতিক পত্রিকা - সব ধরনের পত্রিকাতেই তিনি লিখতেন। "কলেজে থাকতে খাতায় কবিতা লিখতাম। বিশেষ ছাপা হতো না। পার্টির সূত্রেই আমি ১৯৪২ সালের কাছাকাছি সময় থেকে 'অরণি' পত্রিকায় নিয়মিত কবিতা লিখতে শুরু করি। এর মধ্যে 'বসুমতী'তেও অনেক লেখা বেরিয়েছে। একটু - একটু করে পরিচয়ের সীমানা বাড়ে। কবি বিমলচন্দ্র ঘোষের সঙ্গে ১৯৪৪ – এ খুব ঘনিষ্ঠতা হয়। অরুণ মিত্রের বাড়িতেও ১৯৪২ থেকে ১৯৪৫ যেতাম। ১৯৪৪ থেকে 'কবিতা', 'পরিচয়' ও 'পূর্ব্বাশা' পত্রিকায় কিছু কিছু লিখেছি। কলেজে

আমার অধ্যাপক ছিলেন বুদ্ধদেব বসু ও বিষ্ণু দে। কিছু পরিচয় ছিল। 'সাহিত্যপত্র' যখন বেরোলো প্রথম তিন সংখ্যাতেই কবিতা লিখেছিলাম। ১৯৪৬-৪৭ – এ প্রচুর লিখেছি, প্রচুর ছাপাও হয়েছে।"[১৮] অতএব কবিতা লেখার বিষয়ে কোনোরকম ছুঁৎমার্গ স্পর্শ করেনি তাঁকে। তিনি স্বাধীন সাহিত্য রচনায় বিশ্বাসী ছিলেন এবং ব্যক্তি-স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ অপছন্দ করতেন। তাই বামপন্থী পার্টির সঙ্গে যোগাযোগ থাকলেও গভীর ঘনিষ্ঠতা সেভাবে কখনো তৈরি হয়নি -- "পার্টির সঙ্গে আমার খুব গভীর যোগাযোগ কখনও ছিল না। সভাসমিতি বা মিছিলে যেতাম কিন্তু কারণটি বিবেচনা ক'রে যাবার চেষ্টা করতাম। আমার ব্যক্তিগত সমর্থন থাকলে তবেই যেতাম। আর, ব্যক্তি স্বাধীনতায় হাত দেওয়া ভালো লাগতো না। আমি চিরকালই সব ধরনের পত্রিকায় কিছু কিছু লিখেছি।"[১৯]

প্রগতিশীল কবিতা সম্পর্কে কবির মন্তব্য, "প্রগতিশীল কবিতা বলতে আপনারা যা বোঝেন (অর্থাৎ আপনাদের প্রশ্নগুলির ব্যাখ্যা আমার কাছে যেরকম মনে হয়েছে) তার সঙ্গে আমার অনেক কবিতারই লড়াই বেঁধে যায়। আমি কোনো রাজনৈতিক কর্মী বা যোদ্ধা নই; পৃথিবীটাকে শিকড়শুদ্ধ নেড়ে দেবার ব্যাপারে বস্তুত আমার কোনো ভূমিকাই নেই। বরং Cultural Revelution-এর ব্যাপারে যদি কোথাও আমার সামান্য পরিশ্রমও থেকে থাকে- যার মাধ্যম আমার কবিতা, তার জন্যই আমার সমস্ত যুদ্ধ।"[২০] বামপন্থী দলের মতামতকে তিনি সর্বদা মানতে পারেননি। "...'কালচারাল রেভেলিউশন' আর 'বিপ্লব' যে ঠিক এক জিনিস নয় – বিপ্লবী না হয়েও বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় অথবা জীবনানন্দ দাশ প্রগতিশীল সাহিত্যিকের ভূমিকা কিছুটা পালন করতে পেরেছেন- এই পরিচ্ছন্ন কথাটি এখন পর্যন্ত আমাদের অধিকাংশ বামপন্থী বুদ্ধিজীবী ও পণ্ডিতদের কাছে গ্রাহ্য নয়।"[২১]

অতএব বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় চারের দশকের প্রধান কবিতার ধারার অন্যতম একজন কবি হলেও, মতাদর্শে অনেকখানি স্বতন্ত্র পথে হেঁটেছিলেন তিনি। তাঁর সব কবিতা শিল্পগত দিক থেকে সার্থক না হলেও, চারের দশকের প্রগতিশীল কবিতার ধারায় অবশ্যই এক স্বতন্ত্র স্থান দখল করে আছে তাঁর কবিতা।

তথ্যসূত্র :

১। বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, "সাক্ষাৎকার : ৩", 'সাক্ষাৎকার সংগ্রহ বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়', বিদুর, কলকাতা, ফেব্রুয়ারি ২০২১, প্রথম প্রকাশ, সম্পাদক : গৌতম বসু, পৃঃ ৪৮

২। বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, "সাক্ষাৎকার : ২", 'সাক্ষাৎকার সংগ্রহ বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়', বিদুর, কলকাতা, ফেব্রুয়ারি ২০২১, প্রথম প্রকাশ, সম্পাদক : গৌতম বসু, পৃঃ ২৯

৩। তদেব, পৃঃ ৩০

৪। বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, “সাক্ষাৎকার : ৩”, ‘সাক্ষাৎকার সংগ্রহ বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়’, বিদুর, কলকাতা, ফেব্রুয়ারি ২০২১, প্রথম প্রকাশ, সম্পাদক : গৌতম বসু, পৃঃ ৫১
৫। বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, “সাক্ষাৎকার : ৬”, ‘সাক্ষাৎকার সংগ্রহ বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়’, বিদুর, কলকাতা, ফেব্রুয়ারি ২০২১, প্রথম প্রকাশ, সম্পাদক : গৌতম বসু, পৃঃ ৬৮
৬। বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, “সাক্ষাৎকার : ৪”, ‘সাক্ষাৎকার সংগ্রহ বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়’, বিদুর, কলকাতা, ফেব্রুয়ারি ২০২১, প্রথম প্রকাশ, সম্পাদক : গৌতম বসু, পৃঃ ৫৪
৭। তদেব, পৃঃ ৫৪
৮। বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, “সাক্ষাৎকার : ৬”, ‘সাক্ষাৎকার সংগ্রহ বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়’, বিদুর, কলকাতা, ফেব্রুয়ারি ২০২১, প্রথম প্রকাশ, সম্পাদক : গৌতম বসু, পৃঃ ৭৪
৯। তদেব, পৃঃ ৭৪
১০। বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, “সাক্ষাৎকার : ১”, ‘সাক্ষাৎকার সংগ্রহ বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়’, বিদুর, কলকাতা, ফেব্রুয়ারি ২০২১, প্রথম প্রকাশ, সম্পাদক : গৌতম বসু, পৃঃ ১৩
১১। বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, “সাক্ষাৎকার : ২”, ‘সাক্ষাৎকার সংগ্রহ বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়’, বিদুর, কলকাতা, ফেব্রুয়ারি ২০২১, প্রথম প্রকাশ, সম্পাদক : গৌতম বসু, পৃঃ৩৪
১২। তদেব, পৃঃ ৪১
১৩। জহর সেনমজুমদার, “বাংলা কবিতা : মেজাজ ও মনোবীজ”, পুস্তক বিপনি, কলকাতা, ১৯৯৮ জানুয়ারি, প্রথম প্রকাশ, পৃঃ ৩৬০
১৪। বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, “সাক্ষাৎকার : ২”, ‘সাক্ষাৎকার সংগ্রহ বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়’, বিদুর, কলকাতা, ফেব্রুয়ারি ২০২১, প্রথম প্রকাশ, সম্পাদক : গৌতম বসু, পৃঃ ২৬
১৫। বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, “সাক্ষাৎকার : ২”, ‘সাক্ষাৎকার সংগ্রহ বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়’, বিদুর, কলকাতা, ফেব্রুয়ারি ২০২১, প্রথম প্রকাশ, সম্পাদক : গৌতম বসু, পৃঃ ২৪
১৬। তদেব, পৃঃ ২৪
১৭। বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, “সাক্ষাৎকার : ৬”, ‘সাক্ষাৎকার সংগ্রহ বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়’, বিদুর, কলকাতা, ফেব্রুয়ারি ২০২১, প্রথম প্রকাশ, সম্পাদক : গৌতম বসু, পৃঃ৭৪
১৮। তদেব, পৃঃ ৭০
১৯। তদেব, পৃঃ ৭১

২০। বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, "সাক্ষাৎকার : ২", 'সাক্ষাৎকার সংগ্রহ বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়', বিদুর, কলকাতা, ফেব্রুয়ারি ২০২১, প্রথম প্রকাশ, সম্পাদক : গৌতম বসু, পৃঃ ২৮

২১। বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, "সাক্ষাৎকার : ৫", 'সাক্ষাৎকার সংগ্রহ বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়', বিদুর, কলকাতা, ফেব্রুয়ারি ২০২১, প্রথম প্রকাশ, সম্পাদক : গৌতম বসু, পৃঃ ৬২

গ্রন্থপঞ্জি :

১। বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। "বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ কবিতা"। দে'জ পাবলিশিং । কলকাতা। ২০১৯, মে। সপ্তম সংস্করণ।

২। বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। 'সাক্ষাৎকার সংগ্রহ বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়'। বিদুর ।কলকাতা । ফেব্রুয়ারি, ২০২১। প্রথম প্রকাশ। সম্পাদক : গৌতম বসু।

৩। জহর সেনমজুমদার। "বাংলা কবিতা : মেজাজ ও মনোবীজ"। পুস্তক বিপনি। কলকাতা। ১৯৯৮, জানুয়ারি । প্রথম প্রকাশ।

৪। সুমিতা চক্রবর্তী। "আধুনিক বাংলা কবিতার প্রথম পর্যায়"। প্রজ্ঞাবিকাশ ।কলকাতা । ২০১৬ বইমেলা । চতুর্থ পরিবর্ধিত সংস্করণ।

৫। অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত ও দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়। 'আধুনিক কবিতার ইতিহাস'। দে'জ পাবলিশিং । কলকাতা । ২০১১ । প্রথম সংস্করণ ।

৬। সুমিতা চক্রবর্তী, "পুরাণ-ভাষায় কবিমানস : বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়"। 'জিজ্ঞাসা' (নব পর্যায়)। সপ্তত্রিংশ বর্ষ। প্রথম চতুর্থ সংখ্যা।

জীবনানন্দের ‘ক্যাম্পে’ ও রবিশংকরের ‘ক্যাম্পে’: একটি প্রতিতুলনা

লাল্টু মাইতি
গবেষক ও প্রাবন্ধিক

সারসংক্ষেপ :
জীবনানন্দ দাশের ‘ক্যাম্পে’ কবিতা ও রবিশংকর বলের ‘ক্যাম্পে’ গল্প এই দুটির একটি তুলনামূলক আলোচনা করা হয়েছে আলোচ্য প্রবন্ধে। বিশ শতকের তিনের দশকে অবস্থান করে জীবনানন্দ ক্যাম্পে কবিতায় যে ভাবনা প্রকাশ করেছিলেন, শতকের শেষ সময়কালে রবিশংকর বল সেই ভাবনার প্রতিসরণ করলেন সময়-কালের পরিবর্তিত প্রেক্ষাপটে অবস্থান করে। আমাদের আলোচনা এ দুটির পারস্পরিক তুলনামূলক বিশ্লেষণে।

সূচক শব্দ : জীবনানন্দ দাশ। রবিশংকর বল। ক্যাম্পে। জীবনের একাকীত্ব, নিঃসঙ্গতা।

মূল আলোচনা : জীবনানন্দ দাশ সম্বন্ধে বলতে গিয়ে দীপ্তি ত্রিপাঠী বলেছিলেন, ‘এক বিমূঢ় যুগের বিভ্রান্ত কবি জীবনানন্দ দাশ। ...আধুনিক কবিদের মধ্যে একমাত্র তাঁর কাব্যেই এ-যুগের সংশয়ী মানবাত্মার ক্ষতবিক্ষত পরিচয়টি ফুটে উঠেছে....জীবনানন্দের অন্তর্লোকে যে-সমুদ্রমন্থন চলেছে তার উগরানো বিষ তাঁকেই পান করে নীলকণ্ঠ হতে হয়েছে।’[১] জীবনানন্দের আরো ষাট বছর পর রবিশংকর বল বাংলা সাহিত্যে এসেছিলেন। সময়ের স্বাভাবিকতায়, মানুষের, ব্যক্তি মানুষের জীবন আরো জটিল ও নির্জন হয়েছে। নির্জনতা শহর থেকে উধাও হয়েছে, কলরবময় শহরের ভিড়ে দাঁড়িয়ে তাই মানুষ নিঃসঙ্গ। প্রেম-ভালোবাসা এক প্রত্ন বিষয়ে পরিণত হচ্ছে, এ পৃথিবী ভোগময় হয়ে উঠছে। উচ্ছ্বাসের উদ্দামতা হারিয়ে মানুষ, ব্যক্তি মানুষ জ্যন্ত জড়ত্বে ক্রমশ পরিণত হচ্ছে। এ সময়েরই কথাকার রবিশংকর বল। এ সমস্ত কিছুর কথাকার রবিশংকর বল।

‘ক্যাম্পে’ কবিতা জীবনানন্দের প্রতিনিধিস্থানীয় কবিতা। তাঁর প্রথম জীবনের কবিতা। এ কবিতাতে তিনি মানুষের, শুধু মানুষের না তাবৎ প্রাণীকূলের বেঁচে থাকার নিঃসহায়তার করুণ সুরের রাগিণী বাজিয়েছেন।

বনের কাছে ক্যাম্পে বসে কবির অনুভূতির শৈল্পিক প্রকাশ এই কবিতা। বসন্তের জ্যোৎস্নায় বসে কবি শোনেন এক ডাক, বুঝতে পারেন, প্রেমের ডাক— মৃগের প্রতি মৃগীর—

> আজ এই বিস্ময়ের রাতে
> তাহাদের প্রেমের সময় আসিয়াছে;[২]

আলোকিত রাতে তাদের আজ প্রেমের জোয়ার এসেছে। অথচ পৃথিবীর বুকে তো আরো বহু মানুষের পদচারণা, তাই দেখি তাদের এই প্রেমের সময় কারোর কাছে উত্তম শিকারের সময়ে পরিবর্তিত হয়। শিকারীর নির্ভুল লক্ষ্যে বিদ্ধ হয়ে যায় প্রেমার্ত হৃদয়— হরিণ। ভালোবাসার স্পর্শ লাভে কাতর হয়ে ছুটে যাওয়া হৃদয় গুলিতে বিদ্ধ হয়, সময়ের অনির্দেশ্য নিয়মে। কবির মনে হয়, এ শুধু হরিণ-আর হরিণীর ব্যর্থ প্রেমের গল্প নয়! আদতে তাবৎ পৃথিবীর এটাই নিয়তি।

সময়ের আবর্তনে পৃথিবীতে দিন-রাত্রি সংঘটিত হয় এক চক্রাকারে। অথচ সেই দিন-রাত্রির মধ্যে যারা বেঁচে থাকে, সেইসব মানুষ, পাখি, কীট-পতঙ্গ তাদের কারোর নির্দিষ্ট চক্রাবল নেই! এক অনির্দেশ্য পথেই তাদের যাত্রা। সেখানে তাদের নিজস্ব কোনো গতিপথ নেই, নেই কোনো অক্ষরেখা! আছে শুধু বিস্ময় ভরা মন আর মন। এই অনির্দেশ্য পথে যাপনের নামই জীবন। মানুষের প্রতি মুহূর্তে মৃত্যুকম্পিত সময়ের সঙ্গে বেঁচে থাকার নামই জীবন। আর সেজন্যই তো জীবনানন্দ দাশ বলেন,

কেন এই মৃগদের কথা ভেবে ব্যথা পেতে হবে
তাদের মতন নই কি আমিও?
* * *   * * *
আমার বুকের প্রেম ঐ মৃত মৃগদের মতো
যখন ধূলায় রক্তে মিশে গেছে
এই হরিণীর মতো তুমি বেঁচেছিলে নাকি
জীবনের বিস্ময়ের রাতে
কোনো এক বসন্তের রাতে?[৩]

এই প্রেম, ব্যথা, যন্ত্রণা, বেদনা, অতৃপ্তি নিয়েই যে আমাদের বেঁচে থাকতে হয়। আমরা বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে যায়, যখন একটু দাঁড়িয়ে ভাবি এই জীবন ক্ষণিকের। এক পলকেই, যখন খুশি নিভে যাবে এই জীবনের প্রদীপ! মানুষের মধ্যে এই যে চেতনা, তা যে তাকে দিগন্ত বিস্তারী সমুদ্রের মতোই মূক করে রাখে। রূপকথার গল্পের মতো কখন যে কে আমাদের প্রাণ ভোমরাটা টিপে দেবে কেউই যে তা জানে না, সে যে জ্ঞানের অতীত! নিয়তির এই খেলা আমাদের বিমূঢ় করে দেয়। কবি তাই বলেন--

এই ব্যথা,--এই প্রেম সব দিকে রয়ে গেছে,--
কোথাও ফড়িঙে-কীটে,- মানুষের বুকের ভিতরে,
আমাদের সবের জীবনে।
বসন্তের জ্যোৎস্নায় অই মৃত মৃগদের মতো
আমরা সবাই।[৪]

আমরা সবাই তাই বেদনার সন্তান! বেদনার সুর রিনরিন করে বেজে চলে, আকাশ-বাতাস ব্যাপ্ত করে। কবির ভাষায় বলতে হয়,

> যদি কোনও স্থির নিষ্কম্প সুর এ কবিতাটিতে থেকে থাকে তবে তা জীবনের—মানুষের কীট-ফড়িঙ'এর সবার জীবনেরই – নিঃসহায়তার সুর। সৃষ্টির হাতে আমরা ঢের নিঃসহায় – ক্যাম্পে কবিতাটির ইঙ্গিত এই; এই-মাত্র। কবিতাটির এই সুর শিকারি, শিকার, হিংসা এবং প্রলোভনে ভুলিয়ে যে-হিংসা সফল— পৃথিবীর এই সব ব্যবহারে বিরক্ত তত নয়,- বিষণ্ণ যতখানি; বিষণ্ণ-নিরাশ্রয়। 'ক্যাম্পে' কবিতায় কবির মনে হয়েছে, তবু যেন তেমন এক শিকারি, আমাদের সকলের জীবন নিয়েই যেন তার সফল শিকার চলেছে; প্রেম-প্রাণ-স্বপ্নের একটা ওলট-পালট ধ্বংস নিরবচ্ছিন্ন আয়োজন যেন সব দিকে...[৫]

রবিশংকর বল 'ক্যাম্পে' এই শিরোনাম ব্যবহার করে একটি গল্প রচনা করেন গত শতকের শেষের দিকে। গল্পটিতে রবিশংকর বল নিজস্ব আঙ্গিকে ব্যক্তি মানুষ কীভাবে সমস্ত দৈন্যতা, নিঃসঙ্গতা, যন্ত্রণা, বেদনা, ব্যর্থতা, অপ্রেমে বেঁচে থাকে বা থাকতে বাধ্য হয়, তার এক ভাষ্য গড়ে তুলেছেন।

'ক্যাম্পে' গল্পটি ফ্ল্যাশব্যাক রীতিতে, আত্মকথনের ভঙ্গিতে রচিত হয়েছে। আমরা সবটাই একটি চরিত্রের দৃষ্টিতে পড়ি। সে হল শুভ। সে তার বাবার জীবনের গল্প বলে যায়। যে জীবন ব্যর্থতার, নিঃসঙ্গতার, যন্ত্রণার, বেদনার, অপ্রেমের। বাবার জীবনের কথা বলতে গিয়ে আসে মা ও দিদির কথা, নিজের কথা। গল্পটি শুরু হচ্ছে একটি ঘটনা দিয়ে--

> সূর্যাস্তের মুখোমুখি বসে হঠাৎই বাবা অন্ধ হয়ে গেল। অন্ধ হওয়ার মুহূর্তে একটাও কথা বলেনি বাবা। অনেকক্ষণ একইভাবে বসে থেকে, ইজিচেয়ার ছেড়ে ওঠার সময় আমাকে বলেছিল, 'দেখ তো একটা লাঠি পাও কিনা। আমি আর কিছু দেখতে পাচ্ছি না, আমি অন্ধ হয়ে গিয়েছি'।[৬]

-এই ঘটনার ব্যখ্যা এরপরেই গল্পকার দিয়ে দেন, 'বাবা গত বছর ষাট পেরিয়েছে, অতএব কোষ্ঠী অনুযায়ী যে-কোনও সময়েই তার অন্ধ হওয়ার কথা ছিল।'[৭] অতএব অন্ধ হওয়া ভবিতব্য ছিল। জীবনানন্দ দাশ ক্যাম্পে কবিতায় যেখানে অনির্দেশ্যে শক্তির কাছে মানুষের নিঃসহায়তার সুর ফুটিয়ে তুলেছিলেন, রবিশংকর বল প্রথমেই কোষ্ঠী তথা ভারতীয় জন্মান্তরবাদের প্রসঙ্গ এনে সেটা খারিজ করলেন। সব কিছুই পূর্ব নির্দিষ্ট হয়ে রয়েছে, তার বাইরে কোনো পথ নেই।

কিন্তু আমাদের মনে প্রশ্ন জাগে এভাবে কি সত্যিই অন্ধ হয়ে যাওয়া যায়? বিজ্ঞান বলছে,

> When you stare directly at the sun -or other types of bright light such as a welding torch—ultraviolet light floods your retina, literally burning the exposed tissue.
> Short-term damage can include sunburn of the cornea- known as solar keratitis. This results in light sensitivity and pain, with symptoms generally showing up with 24 hours of exposure.
> More serious damage known as solar retinopathy. This occurs when UV light literally burns a hole in the retinal tissues. It destroys the rods and cones of the retina and can create a small blind spot in the central vision, known as a scotoma.[৮]

গল্পের মূল চরিত্র বাবা, শুভর বাবা। শুভর বাবাকে কেন্দ্র করে গল্পটি আবর্তিত হয়। কোনো ব্যক্তি নাম উল্লেখ করেন নি গল্পকার। আমরা পাঠকরা গল্পটি পড়তে পড়তে এই চরিত্রের সঙ্গে, মাল্যবানের মিল খুঁজে পায়, মাল্যবানের স্রষ্টাও কোথাও এক হয়ে যায়। পৌঢ়ত্বের সীমায় তিনি পৌঁছেছেন। স্ত্রী, কন্যা পরিত্যক্ত হয়ে একমাত্র পুত্র সন্তানকে নিয়ে এখন তার দিন কাটে। অন্ধ হয়ে যাওয়ার পর থেকে বাবার মুখে একটাই কথা উচ্চারিত হয়েছে ক্রমাগত—

> পৃথিবীকে যদি উপভোগ করতে চাও তাহলে সৃষ্টির স্রোতের ভিতরকার অক্লান্ত সুবিধাবাদ ও অশ্রাব্য আত্মপরতাকে মনপ্রাণ দিয়ে গ্রহণ করতে শেখো, ভগবানও আশীর্বাদ করবেন, নারীও হাতের পুতুল হবে।[৯]

'নারীও হাতের পুতুল হবে'-এই কথাটির মধ্য দিয়ে শুভর বাবার ব্যর্থতা, অতৃপ্তি কবিতার ধ্রুবপদের মতন গল্পে ফিরে ফিরে এসেছে। এই সূচক শব্দ দিয়ে গল্পকার আমাদের শুভর বাবার চেতনার গভীরে নিয়ে যান।

শুভর বাবা সংসারের প্রতি উদাসীন, নিজত্বে মগ্ন স্বভাবের মানুষ। আজীবন নিজের রচিত এক বলয়ে থাকতে চেয়েছেন সর্বদা। স্বাভাবিক মানুষ ছিলেন না আর পাঁচটা লোকের মতো। দলছুট স্বভাবের মানুষ। যৌবনে কিছুকাল আর পাঁচজনের মতো একটা চাকরি করত, নিজের পচ্ছন্দ মতো মেয়েকে বিয়ে করেছিল। মধ্যবিত্তের জীবনে দুটো সন্তানও হয়েছিল। তারপর কখন কবে কীভাবে যে পাল্টাতে শুরু করল জীবন—

'ভাবানা, চিন্তাগুলো মাথার ভিতরে যেন ক্ষতের মতো। আমার ব্রেনটা আসলে এক ক্ষত। যদি মেশিন হতে পারতাম। কোনো ভাবনা নেই, বেদনা নেই।'[১০]--

সকল লোকের মাঝে বসে
আমার নিজের মুদ্রাদোষে
আমি একা হতেছি আলাদা?[১১]

শুভর মা করুণাকণা গুপ্ত ছিল পিতৃমাতৃহীন কন্যা। জ্যাঠামশাইয়ের কাছে মানুষ হয়েছে। পড়াশোনা বেশি করতে পারে নি। অপরদিকে শুভর বাবা ছিল একেবারেই আর্থিক স্বচ্ছলতায় ভরপুর এক পরিবারের সন্তান। অর্থ উপার্জন নিয়ে চিন্তা করতে হয় নি বিশেষ। সাহিত্য ছিল প্রিয়, লেখক হওয়ার বাসনা ছিল তীব্র। দুজনে ছিল দুই ভিন্ন গ্রহের নক্ষত্র। দুটি মনের মধ্যে দূরত্ব ছিল শত আলোকবর্ষের। তাই তো একে ওপরকে তারা বুঝতে পারে নি। বাইশ-তেইশ বছর সময় তাদের কাছে স্বল্প হয়ে গিয়েছিল নিজেদের এক ওপরকে বুঝে নিতে। অতএব এক শূন্য গহ্বর তাদের মধ্যে। যে শূন্যতার রন্ধ্র পথে দুজনে খুঁজে নিচ্ছিল এক আশ্রয়।

'বাইশ-তেইশ বছরের সংসার ভেঙে মা একদিন চলে গেল সিনেমার নায়িকা হবে বলে। মার বয়স তখন চল্লিশ ছুঁই ছুঁই, কিন্তু দিনে দিনে তার সৌন্দর্য যেন প্রাগৈতিহাসিক কোনও পাখির ডানার মতো ছড়িয়ে পড়ছিল...'[১২]

-নতুন জীবনের স্বপ্ন বুকে নিয়ে করুণাকণার এই যাত্রার পশ্চাতে আছে স্বামীর দীর্ঘ উপেক্ষা, দুই মনের আলোকবর্ষব্যাপী দূরত্ব। 'মাল্যবান' উপন্যাসে জীবনানন্দ দাশ উৎপলাকে দিয়ে স্বামীর সামনে পরপুরুষের সঙ্গে হাসিঠাট্টা পর্যন্ত দেখাতে পেরেছিলেন, রবিশংকর বল আর একটু এগিয়ে গেলেন সময়ের স্বাভাবিক নিয়মে। বাইশ তেইশ বছরের সংসার জীবনে তাদের দুটি সন্তান হয়েছে ঠিকই, তবুও কোথাও ভালোবাসার শূন্যতা ছিল। যে শূন্যতা আর পূরণের নয়--

আমরা দুজনেই রক্তাক্ত হতে চেয়েছিলাম, শুভ। এমন এক জীবনে আমি বাঁচতে চেয়েছিলাম যেখানে সবসময় বিপদের সম্ভাবনা আমাদের জাগিয়ে রাখে। নাহলে বেঁচে থেকে স্বাদ নেই। তোমার মা আমাকে দিনে দিনে তার শরীরের ওম থেকে দূরে সরিয়ে দিয়েছিল। তোমার মা জানত না মন আমাদের শরীরের প্রতিটি স্পর্শে বেঁচে থাকে। মরে যাওয়া মনও দুই শরীরের স্রোতের ভিতরে পুনর্জন্ম লাভ করে। আর তাই হস্তমৈথুন করে আমার মন আবার বেঁচে উঠত। সে সময় অদৃশ্য এক নারীর শরীরই তো আমাকে ঘিরে রাখত।[১৩]

-শুভর বাবার একটা নিজস্ব জগৎ ছিল, যে জগতে করুণাকণার প্রবেশের অনুমতি ছিল না। বলা ভালো করুণাকণার মেজাজের ছিল না। সে জগৎ হল তার লেখালেখির জগৎ। বাড়ির একটা ঘর ছিল তার লেখালেখির জন্য। যার দেওয়ালে ভ্যান গখের আঁকা হাতলহীন চেয়ারের ছবি টাঙানো ছিল। চার দেওয়ালের এই ঘরের মধ্যে বসে গল্প উপন্যাস লিখে গিয়েছে। ডায়েরি লিখে গিয়েছে। নিজের শিল্পিত মনের শাব্দিক রূপ দিতে চেয়েছে--

> জীবন আর শিল্পকে আমি কখনও আলাদা করে দেখতে পারিনি। আমার মনে হয়েছিল, আমাদের এই বেঁচে থাকাটাকে পরতে পরতে উন্মোচন করাই শিল্পের বিষয়- এই অদ্ভুত বেঁচে থাকা, যার সত্যিই কোনও মানে নেই।[১৪]

-অথচ সেই চেষ্টাও একদিন ব্যর্থ হয়। আজ লেখালেখি থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়েছে। পৌঢ়ত্বের সীমায় পৌছে মনে হয়েছে, 'শব্দের হৃদয়ের কাছে পৌঁছতে গেলে কাপালিক হতে হয়..'।[১৫] আজ তাই এই ব্যর্থ জীবনে মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করা ছাড়া আর কিছু অবশিষ্ট থাকে না। তবুও তিনি মৃত্যুবরণ করেন না, বরং তার এই সংক্রমণ ছড়িয়ে দেয় পুত্রের মধ্যে। 'আট বছর আগের একদিন' কবিতার অনামী লোকটা স্ত্রী সন্তান অর্থ বৈভব সব থেকেও আত্মহত্যা করেছিল, কিন্তু সেই যন্ত্রণাদগ্ধ মন ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে দিয়ে যায় নি। এখানেই রবিশংকর বলের নিজস্বতা, সময়ের স্বাক্ষর।

পুত্র শুভ ত্রিশ বছরের যুবক। দশ বছর বয়সে মা ও দিদির স্নেহ থেকে পরিত্যাক্ত হয়েছে বাবার জন্য। তবুও সে বাবার ছায়া থেকে বেরিয়ে আসতে পারেনি, এক মোহচ্ছন্নতার মতো বাবার কাছে থেকে গিয়েছে। আদতে সে ভীরু স্বভাবের—

> কিন্তু বাবাকে ছেড়ে আমি যেতে পারিনি। আমারও বড় ভয় করে এই বাড়ি ছেড়ে যেতে, কোথায় যাব, কী করব, চারপাশের জগৎটা এতো বড়, আমার বড় ভয় করে।[১৬]

আর তাই বাবার জন্মদাস হওয়া ছাড়া শুভর আর কোনো গত্যান্তর থাকে না--

> বাবা, তোমার মতো আত্যাচারীর পাশে আমি যে সারা জীবন রয়ে গেলাম, তুমি জানো না, আমার সব চুল পেকে গেছে চল্লিশে পা রাখার আগেই, তুমি আমাকে পড়াশোনা করালে না, আমার অসুখের চিকিৎসা করালে না, তবু তোমার সঙ্গে আমি রয়ে গেলাম। শুধু ঐ জীবনটাকে ছুঁয়ে থাকার জন্য। যাকে কোনও শিল্পে রূপ দেওয়া যায় না।[১৭]

সে অদ্ভুত এক রোগে আক্রান্ত। মাঝেমাঝে চোখে বুজে সূর্যের দিকে তাকিয়ে থাকার পর তার ভাবশূন্যতা হয়, সে অদ্ভুত একটা স্বপ্ন দেখে—

> হঠাৎ কে যেন আমাকে তাড়া করল আর আমি দৌড়তে দৌড়তে বুঝতে পারলাম, প্যান্টের পিছন ভিজে যাচ্ছে

> মলের তীব্র স্রোতে, দুর্গন্ধে ভরে উঠেছে সারা শরীর, আমার দুই চোখ ঠিকরে বেরিয়ে আসছে, কিন্তু নোংরা সেই স্রোতের শেষ নেই...।[১৮]

হিন্দু শাস্ত্রে সূর্যদেবকে দেখা হয়েছে, 'বিচিত্র তেজঃ পুঞ্জরূপ, মিত্র, বরুণ ও অগ্নির চক্ষু স্বরূপ (সূর্য) উদয় হইয়াছেন, দ্যাবা, পৃথিবী ও অন্তরীক্ষ স্বীয় কিরণে পরিপূর্ণ করিয়াছেন, সূর্য জঙ্গম ও স্থাবর সকলের আত্মস্বরূপ। ...সূর্য জল-স্থল ও অন্তরীক্ষের দ্রষ্টা, সূর্য প্রাণীবর্গের একমাত্র চক্ষুস্বরূপ, তিনি দ্যুলোক ও মর্তলোকে অবস্থানকারী।'[১৯] সূর্যকে শুধু ঋগ্বেদ নয় পুরাণ, মহাভারত, রামায়ণ সমস্ত শাস্ত্রেই স্তুতি করা হয়েছে প্রাণের আধার রূপে। সূর্যের কিরণেই এই বিশ্বে প্রাণের সঞ্চার ঘটে, সূর্য ব্রহ্মস্বরূপ। রবিশংকর বলও সূর্যের এই মেটাফরকে গল্পে ব্যবহার করেন। শুভর অদ্ভুত স্বপ্নের কারণ জিজ্ঞাসা করলে শুভর বাবা বলে, 'সূর্যদেব এবার তোমার ভিতরের সব ক্লেদ বার করে দেবেন।'[২০] কিংবা শুভর বাবা যখন বলে, 'এতদিনে সূর্যদেব আমার চোখের ভিতরে প্রবেশ করলেন।'[২১] ক্লেদ গ্লানিময় পৃথিবী থেকে উদ্ধারের ত্রাতা রূপে যেন সূর্যকে এখানে ব্যবহার করা হয়েছে।

শুভর যন্ত্রণা আরো বেশি বেদনাবিধুর। কেননা, এখন বাবা তাকে ছেড়ে চলে গেছে, একাকীত্বের তার দোসর নেই, কথা বলার কেউ নেই, তার নিজের শিকার সে নিজেই- 'বাবা, তুমি কখনও ফিরে এলে দেখবে, আমিও এখন এক শিকারি হয়ে গেছি। তবে এই শূন্য বাড়িতে আমার শিকার আমিই।'[২২] রবিশংকরের গল্প-উপন্যাসে একটা রূপক বার বার ফিরে এসেছে, তা হল, সাপটা লেজ থেকে নিজেকেই খাচ্ছে। এই যে নিজেকে ভক্ষণের অনন্ত কালচক্রের কথা, এই গল্পের শেষেও রবিশংকর বল যেন সেই কথাই বললেন!

এবার আসা যাক দুটি রচনার মিল-অমিলে। 'ক্যাম্পে' কবিতাতে জীবনানন্দের মৃত্যুচেতনা প্রকাশ পেয়েছে। রবিশংকরের 'ক্যাম্পে'-তেও মৃত্যুচেতনা প্রকাশিত হয়েছে। রবিশংকর বল 'ক্যাম্পে' এই শিরোনাম ব্যবহার করলেও, তিনি জীবনানন্দের রচনার নির্যাস ব্যবহার করেছেন আপন মাধুরী মিশিয়ে। 'ক্যাম্পে' কবিতার শিরোনাম ব্যবহৃত হয়েছে, অথচ কাহিনির মধ্যে দেখি মাল্যবান উপন্যাসের ছোঁয়া, মাল্যবানের মতোই এখানেও স্বামী স্ত্রী-পরিত্যক্ত, স্ত্রী পরপুরুষ স্পর্শিত, যদিও রবিশংকর বলের গল্পটিতে স্বামী পুত্রকে নিয়ে থাকে, পুত্র সাবালক, কন্যা ও স্ত্রী তাদের ছেড়ে চলে গেছে। মাল্যবান যেখানে সর্বজ্ঞকথন রীতিতে রচিত, ক্যাম্পে সেখানে আত্মকথন রীতিতে রচিত, পুত্র শুভই কথক। এখানে বলার, 'ক্যাম্পে' যেহেতু গীতিকবিতা তাই কবির আত্মানুভূতিই প্রধান, কবিই কথক; অপরদিকে গল্পটিতে শুভর অনুভূতির কথা তার চেতন-অবচেতন মনের কথা প্রকাশিত হয়েছে। রবিশংকর বল গল্পটির ফর্মে 'ক্যাম্পে' কবিতাকে ব্যবহার করেছেন, কনটেন্টে 'মাল্যবান' উপন্যাস।

আর তাই 'ক্যাম্পে' গল্পটি শুধু জীবনানন্দের 'ক্যাম্পে' কবিতার প্রতিসরণ নয়। জীবনানন্দের জীবনের শৈল্পিক আখ্যান ছাড়িয়ে উত্তীর্ণ হয়, বেদনার সন্তানদের গল্পে, ভিড়ের মধ্যে হারিয়ে থাকা ব্যক্তি মানুষের গল্পে। রবিশংকর বল এখানে এক আশ্চর্য দক্ষতায় গল্পটির কায়া নির্মাণ করেছেন 'মাল্যবান' উপন্যাস থেকে শুরু করে 'বোধ' হয়ে 'ক্যাম্পে' কবিতার সংমিশ্রণে। এটাই রবিশংকর বলের শিল্পের এক অন্যতম বৈশিষ্ট্য। তিনি অরিজিন্যালিটিকে ধ্বংস করেন, ব্যক্তির ব্যর্থতা, নিঃসঙ্গতা যন্ত্রণার চিত্রণে তিনি অন্য কোনো উপন্যাসেরও আস্ত অনুচ্ছেদ তুলে আনেন, শুধু দু একটি শব্দ নয়। এখানে মাল্যবান উপন্যাস থেকে একটি অনুচ্ছেদ তুলে এনেছেন। অথচ সব কিছুর সংমিশ্রণে এক নতুন শিল্পরূপ জন্ম নিয়েছে, এখানেই রবিশংকর বল তার নিজস্বতা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন।

উৎস নির্দেশ:

১. দীপ্তি ত্রিপাঠী, আধুনিক বাংলা কাব্যপরিচয়, দেজ পাবলিশিং, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ, জুন ২০১৩ পৃ. ১১৭।

২. জীবনানন্দ দাশ, ক্যাম্পে, ক্ষেত্রগুপ্ত সম্পাদিত, জীবনানন্দ দাশের কাব্যসমগ্র। ভারবি। কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ, ২০১৫, পৃ. ১০৭।

৩. ঐ, পৃ. ১০৮-১০৯।

৪. ঐ, পৃ. ১০৯।

৫. জীবনানন্দ দাশ, ক্যাম্পে কবিতা প্রসঙ্গে, ভূমেন্দ্র গুহ সম্পাদিত, জীবনানন্দ দাশ প্রবন্ধ সমগ্র, প্রতিক্ষণ, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ, ২০১৮, পৃ. ৩৭০।

৬. রবিশংকর বল, সেরা পঞ্চাশটি গল্প, দেজ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ২০১৪ পৃ. ২৪৪।

৭. ঐ, পৃ. ২৪৪

৮. www.https://www.science.org.au/curious/people-medicine/will-looking-sun-really-make-you-blind. 16.10.2021, 09.51 am.

৯. রবিশংকর বল, সেরা পঞ্চাশটি গল্প, দেজ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ২০১৪ পৃ. ২৪৪।

১০. ঐ, পৃ. ২৫১-২৫২।

১১. জীবনানন্দ দাশ, ক্যাম্পে, ক্ষেত্রগুপ্ত সম্পাদিত, জীবনানন্দ দাশের কাব্যসমগ্র। ভারবি। কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ, ২০১৫, পৃ. ৯৯।

১২. রবিশংকর বল, সেরা পঞ্চাশটি গল্প, দেজ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ২০১৪ পৃ. ২৪৫।

১৩. ঐ, পৃ. ২৪৯।

১৪. ঐ, পৃ. ২৫০।

১৫. ঐ, পৃ. ২৪৭।
১৬. ঐ, পৃ. ২৪৪-২৪৫।
১৭. ঐ, পৃ. ২৫১।
১৮. ঐ, পৃ. ২৪৮।
১৯. হংসনারায়ণ ভট্টচার্য, হিন্দুদেবদেবীর উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ প্রথম পর্ব, ফার্মা কে এল এম প্রা লি, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ১৯৭৭, পৃ. ৯৭-৯৮।
২০. রবিশংকর বল, সেরা পঞ্চাশটি গল্প, দেজ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ২০14 পৃ. ২৪৮।
২১. ঐ, পৃ. ২৪৪।
২২. ঐ, পৃ. ২৫২।

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর ‘নদী ও নারী’ : পুরানো কাসুন্দি এবং কিছু বিশ্লেষণ

সারমিন রহমান
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ,
ডায়মণ্ড হারবার মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ- বাংলা সাহিত্যে একজন ব্যতিক্রমী গল্পকার জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী। কী অর্থে ব্যতিক্রম এ প্রশ্নের উত্তর লেখক স্বয়ং এবং তাঁর লেখনী। ‘গিরগিটি’, ‘সমুদ্র’ কিংবা ‘বনের রাজা’র মতো গল্পগুলি যে কলম থেকে নিঃসৃত তার ব্যতিক্রমতা নিয়ে সুদীর্ঘ বিশ্লেষণের পুনরাবৃত্তি না করে, তাঁরই লেখা প্রথম যে গল্পটি ‘নদী ও নারী’, তাকে কেন্দ্র করে কিছু পুরানো কাসুন্দি ঘাঁটতে চাইবো। কিছু প্রশ্ন উত্থাপন করবো এবং তার ভিত্তিতে বিশ্লেষণের একটা জায়গা তৈরির প্রয়াস করবো বর্তমান নিবন্ধে। ১৯৩৬ সালে ‘পরিচয়’ পত্রিকায় প্রকাশিত লেখকের প্রথম সাড়াজাগানো গল্প এই ‘নদী ও নারী’। আলোচকের মতে- ‘গল্পটি পাঠক মহলে তুমুল চাঞ্চল্য সৃষ্টি করল’। এ মন্তব্য প্রসঙ্গেই আলোচনা এগোনো যেতে পারে। প্রথমত, পাঠকমহলে এ গল্পটি চাঞ্চল্য তৈরি করা বা সাড়া ফেলে দেবার কারণ কী? কী নতুনত্ব ছিলো এ গল্পটিতে? উত্তর খুঁজে পেতেই গল্পটির বিশ্লেষণ এবং আনুষঙ্গিক আলোচনা করা হল।

সূচক শব্দ: জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, ‘নদী ও নারী, পুরানো কাসুন্দি।

এক.

‘নদী ও নারী’। লক্ষ করার বিষয়, গল্পের নামকরণটি উপস্থাপিত দ্বন্দ্ব সমাসভুক্ত করে। গল্পে বর্ণিত নদীটি পদ্মা। তবে পদ্মার প্রেক্ষিতটি সুন্দর হলেও কথকের দৃষ্টিতে পদ্মার ধ্বংসাত্মক রূপটি ধরা পড়েছে— “জায়গাটা সুন্দর। রাক্ষসী পদ্মার এমন ছায়ানিবিড় শ্যামল সমতল তটরেখা সহজে চোখে পড়ে না।” অথবা লক্ষণ মাঝির কথায়, “রাক্ষুসী এও একদিন গিলে সাবাড় করে দেবে-” তবে পদ্মার এহেন রূপ তো বাংলা সাহিত্য পাঠকদের কাছে অপরিচিত নয়। রবীন্দ্রনাথের ছিন্নপত্রেও পদ্মার এই আগ্রাসী রূপের দেখা মেলে— “পদ্মার নীরব খরস্রোতে ঝুপঝুপ করে পাড় খসে খসে পড়ছে—” বর্ষায় পদ্মার ধার’ দেখে তাঁর মনে হয়েছে— “তীব্র স্রোত যেন চকচকে খড়্গের মতো, পাতলা ইস্পাতের মতো একেবারে কেটে চলে যায়— প্রাচীন ব্রিটেনদের যুদ্ধরথের চাকায় যেমন কুঠার বাঁধা— দুই ধারের তীর। একেবারে অবহেলে ছারখার করে দিয়ে চলেছে।” সর্বোপরি রবীন্দ্রনাথের ছোটোগল্পেও পদ্মার এই রাক্ষসী রূপ প্রত্যক্ষই ধরা পড়ে। গল্পটির নাম ‘খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন’। সেখানে দেখা যায়, “বর্ষাকাল আসিল। ক্ষুধিত পদ্মা উদ্যান গ্রাম শস্যক্ষেত্র এক-এক গ্রাসে মুখে পুরিতে লাগিল। বালুকাচরের কাশবন এবং বনঝাউ জলে ডুবিয়া গেল। পাড় ভাঙার অবিশ্রাম ঝুপঝাপ শব্দ এবং জলের

গর্জনে দশদিক মুখরিত হইয়া উঠিল, এবং দ্রুতবেগে ধাবমান ফেনরাশি নদীর তীব্র গতিকে প্রত্যক্ষগোচর করিয়া তুলিল।” তবে পদ্মার এই ধ্বংসাত্মক রূপের পাশাপাশি পদ্মার তীরবর্তী পল্লীসমূহের (শিলাইদহ, সাজাদপুর, পতিসর প্রভৃতি) মনোমুগ্ধকর প্রাকৃতিক পরিবেশই রবীন্দ্রনাথের লেখনীতে সজীবতা আর প্রাণের সঞ্চার করল। এ সময়টাতে একাধিক বিখ্যাত সব ছোটোগল্প এবং ‘সোনার তরী’, ‘মানসী, বা ‘চিত্রা’র মতো সব কাব্যগ্রন্থ স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ এবং পাঠকের কাছে প্রকৃতিরই ভেট। প্রকৃতি ও মানবজীবনের এই অবিচ্ছেদ্যতাকে তুলে ধরায় রবীন্দ্রনাথের জুড়ি মেলা ভার— “এই পৃথিবীটি আমার অনেক দিনকার এবং অনেক জন্মকার ভালোবাসার লোকের মতো আমার কাছে চিরকাল নতুন; আমাদের দুজনকার মধ্যে একটা খুব গভীর এবং সুদূরব্যাপী চেনাশোনা আছে । বহু যুগ পূর্বে যখন তরুণী পৃথিবী সমুদ্রস্নান থেকে সবে মাথা তুলে উঠে তখনকার নবীন সূর্যকে বন্দনা করছেন, তখন আমি এই পৃথিবীর নূতন মাটিতে কোথা থেকে এক প্রথম জীবনোচ্ছ্বাসে গাছ হয়ে পল্লবিত হয়ে উঠেছিলুম।”

তিন.

জ্যোতিরিন্দ্রর গল্প প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের প্রসঙ্গ আপাত অর্থে অকারণ। কিন্তু উদ্দেশ্য এটাই যে নদী বাংলা সাহিত্যে তথা ছোটোগল্পে অনুষঙ্গ হয়ে এসেছে প্রায়শই। নদীর সঙ্গে নারীর সহজাত তুলনাও এসেছে হামেশাই। কী ছোটোগল্পে, কী উপন্যাসে, কী কবিতায়। উত্তর খুঁজছি উক্ত গল্পটি চাঞ্চল্য সৃষ্টি করবার কী কারণ?

এ গল্প শুধু একটি নদীর গল্প বা শুধু একটি নারীর গল্প নয়। নদী এবং নারীর পারস্পরিক সহাবস্থান এ গল্পের উপজীব্য। এ গল্পটিতে প্রকৃতির প্রতিনিধিত্ব করছে পদ্মা। তবে পদ্মা এখানে বিশেষিত। সে হিংস্র। গল্পের বর্ণনায়— “জায়গাটা সুন্দর। রাক্ষসী পদ্মার এমন ছায়ানিবিড় শ্যামল সমতল তটরেখা সহজে চোখে পড়ে না” তবু যেটুকু আছে সেটুকুও হয়তো “রাক্ষুসী... একদিন গিলে সাবাড় করে দেবে।” অর্থাৎ হিংস্র তথা অসুন্দর পদ্মার পাশেই সুন্দর ‘ছায়ানিবিড় শ্যামল তটরেখা’-র অবস্থান। অসুন্দরের বিপরীতে সুন্দরের একটা অবস্থান এখানে রয়েছে। পদ্মা এখানে ধ্বংসাত্মকতার প্রতীক বা দ্যোতক। এককথায় পদ্মা যেন মৃত্যু আর তীরখানি জীবন। এভাবেই নদী এবং নদীতীর অর্থাৎ মৃত্যু এবং জীবনের মিলিত প্রেক্ষাপটেই ‘লেফাফাদুরস্ত উগ্র’ আধুনিকতার (নীলিমা) জীবনবাহী ইঙ্গিতকে অসাধারণ নিপুণতায় তুলে ধরলেন লেখক।

গল্পটার আরম্ভ শুরু থেকেই। সূচনা পর্বেই পদ্মাতীরে ভ্রমণরত দম্পতি নির্মলা-সুরপতি এবং তাদের নৌকার মাঝি লক্ষণের সঙ্গে পরিচয় ঘটে পাঠকের। উদ্দেশ্য পদ্মার চরে ভ্রমণ। গল্পের সূচনা নির্মলা সুরপতিকে দিয়ে হলেও, গল্পের ক্রম অগ্রগতিতে নীলিমার সঙ্গে পরিচয়। নীলিমা গল্পে আধুনিকতার ‘লেফাফাদুরস্ত উগ্র সংস্করণ’। আর এসব গুণের লক্ষণগুলি হল যে, নীলিমা মেয়েমানুষ হয়েও বড়শি গেঁথে

মাছ ধরে। শাড়ি পরলেও আঁচল মাথায় থাকে না। নীলিমার ‘পরনে ফিকে নীল রঙের শাড়ি — ঘাড়ের উপর দিয়ে মাথার পিছনে খোলা আঁচলটা বাতাসে নিশানের মতো পতপত করে উড়ছিল।’ নীলিমার শাড়ির আঁচলখানি এই নিশানের মতো ওড়ার বর্ণনা হয়তো গতানুগতিক বাঁধা নারীজীবনের মুক্তির ইঙ্গিতবাহী। এ ইঙ্গিত যে শুধু মুক্তির ইঙ্গিত তা নয়, এ ইঙ্গিত প্রচলিত প্রথারও বিদ্রোহাত্মক প্রকাশ যেন। কেননা সধবা বাঙালি বউ মানেই তো আটপৌরে শাড়ির বাঁধনে, কপালে সিঁদুরচর্চিত টিপ আর মাথার সিঁথিতে সিঁদুরের রেখা, হাতে শাখা-পলা, সর্বোপরি মাথায় লজ্জার আবরণ। তাই তো নির্মলার বক্তব্য, বিয়ে যদি হত, ‘তা’লে মাথায় কাপড় থাকত।’ কিন্তু নীলিমার বেশভূষা বাঙালি বধূর যে কনসেপ্‌শন তার ধারে কাছেও ঘেঁষে যায় না। তার পরনে শাড়ি থাকলেও মাথায় আঁচল তুলে দেওয়ার বহর নেই। নারীরা তো মূলত অন্তঃপুরচারী। তবে এ মেয়ে তো তা নয়। নির্জন নিঃশব্দ নদীতীর এবং নদীর বুকে সাদা রঙের বোটটিতে একাকী তার অবাধ স্বচ্ছন্দ বিচরণ তাই বিস্মিত করে বই-কি ! শুধু কি তাই? এতো বিস্ময়ের পরে আরও বিস্ময়— এ মেয়ে আঁচলের ঘটা তো নেইই, উপরন্তু ববড্‌ কাটা চুল। খোঁপা বা বিনুনীর কোনো বালাই নেই। এমন মেয়েমানুষের বেহায়াপনায় সুরপতিরও চোখ টাটায় বই-কি ! এমনই নারী যখন ‘অজানা’ ‘অপরিচিত জায়গায়’ ‘ব্রহ্মসঙ্গীত’, ‘শ্যামাসঙ্গীত’ ছেড়ে একেবারে সস্তা থিয়েটারী গলায় কালোয়াতি করে, তখন তো সুরপতি ইঙ্গিতটা সহজেই অনুমান করতে পারে , ‘এ কোন জাতের মেয়েমানুষ।’ এরপর হঠাৎই ‘নির্জন-নিঃশব্দ বালুচরে নির্মলা সুরপতি এ মেয়েকে আবিষ্কার করে রাইফেল হাতে। সে সময় ‘দীর্ঘছন্দ নিটোল নিভাঁজ গড়ন কোমরে আঁট করে জড়ানো আঁচলটা, হলদে ছোপ দেওয়া শাড়িতে মেয়েটাকে দেখায় একটা চিতাবাঘের মতন’।

চার.

এরপর গল্পের পরবর্তী অংশে বা বলা যেতে পারে গল্পের শেষাংশে দেখা যায়, সে আধুনিকার আমন্ত্রণে নির্মলা সুরপতি আসে নদীর উপর ভেসে থাকা সাদা রঙের বোটটিতে। তবে তাদের আগমন নিছক ভদ্রতা রক্ষাই নয়, তার সঙ্গে রয়েছে অনেক বেশি কৌতুহল। সেই আধুনিকতার জীবনযাপনকে জানার কৌতূহল। আর এখানেই জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর একটুখানি হলেও সাধুবাদ প্রাপ্য যে, কী অনায়াসেই, প্রখর অভিজ্ঞতা থেকে সহজ ভাষায় বলে ফেললেন, কৌতূহল মানুষের রক্তগত। আর পাঁচটা প্রবৃত্তির মতো এই কৌতূহলতাও একটা প্রবৃত্তি বৈ তো নয় ! যাহোক, এই কৌতূহলই নির্মলা সুরপতিকে টেনে নিয়ে আসে সাদা বোটখানিতে। এরপর গল্প ক্রমশ এগিয়ে যায় পরিণতির দিকে। তবে জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর ‘গল্প উপন্যাস যত পরিণতির দিকে এগোতে থাকে, ততই শিল্পী যেন একটার পর একটা পর্দা সরিয়ে পাঠককে একটা গভীর রহস্যের অন্তরালে নিয়ে যান।’ বাস্তবিকই আলোচ্য এ গল্পের ক্ষেত্রেও এ বক্তব্যটি

সমর্থনযোগ্য। কেননা এরপরেই একটার পর একটা পর্দা সরে গিয়ে নিলীমার প্রকৃত জীবন রহস্য উন্মোচিত হয়। জানা যায় তার ব্যক্তিগত জীবনপঞ্জী। জানা যায় তার জীবনযুদ্ধের গল্প। কোনো উচ্চকিত তথাকথিত নাটকীয় মুহূর্ত তৈরি না করেই সহজাত ভঙ্গিতে কথক নির্মলা-সুরপতির সঙ্গে সঙ্গে পাঠকেরও কুতূহলতার নিরসন ঘটিয়ে জানান— কীভাবে টানা তিন বছর নীলিমা পদ্মায় রয়েছে দুর্ঘটনায় একটা হাত ও বাঁ পাটা কেটে গিয়ে এবং নার্ভে চোট লেগে অন্ধ হয়ে যাওয়া স্বামীকে নিয়ে। কেননা ডাক্তারের পরামর্শ 'নদীতে গিয়ে থাকুন'। তাই স্বামীর জীবন বাঁচাতে 'নারী' (নীলিমা) নদীকে করেছে আশ্রয়।

পাঁচ.

এই হল 'নদী ও নারী' গল্পের বিষয়বস্তু। তবে সবকিছুকেই ছাপিয়ে এ গল্প শেষ পর্যন্ত নীলিমার একক লড়াইয়ের গল্প। তবু খুব নতুন কিছু কি? ছোটোগল্পের ধারায় এর আগেও একাধিক সাহসী নারী চরিত্র দুষ্প্রাপ্য নয়। আর লক্ষ করবার বিষয়, এ গল্প রচনা কিম্বা প্রকাশের কাল চারের দশক। বিশ শতকের প্রেক্ষাপটে 'নীলিমা' খুব আনকোরা কি? খুব অস্বাভাবিক কি নীলিমার জীবনাচরণ? এখানেই পুরনো কাসুন্দি ঘাঁটার পালা। কেননা ঊনবিংশ শতক তো এসব দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছে। যেমন— সতীদাহ নিবারণ, স্ত্রীশিক্ষা আন্দোলন, বিধবাবিবাহ আন্দোলন, বহুবিবাহ আন্দোলন, বাল্যবিবাহ আন্দোলন। এসবের পাশাপাশি পৈতৃক সম্পত্তিতে নারীর অধিকার দাবির আন্দোলন, পণপ্রথার বিলোপ আন্দোলন, পর্দাপ্রথার বিলোপ আন্দোলন। উনিশ শতকের নারী সামাজিক ক্ষেত্রেই গড়ের মাঠে ঘোড়সওয়ার করে। কাজেই উনিশ শতকের যে পটপরিবর্তন তার যাবতীয় ফলশ্রুতি সমাজ এবং সাহিত্যে ততদিনে প্রকাশ পেয়েছে। তবুও বিশ শতকের একটা গল্পে এক দম্পতির দৃষ্টিতে সমালোচিত এবং বিশ্লেষিত হতে দেখা যায়, নীলিমার মতো একটা নারীকে। এ গল্পে দুটো দাম্পত্য জীবন পাশাপাশি এসেছে। আর এসেছে দুটি নারী চরিত্রের বৈপরীত্য। নির্মলা এবং নীলিমা। নীলিমার ঠিক বিপরীত বিন্দুতে নির্মলার অবস্থান। বলা বাহুল্য, নারীর দৃষ্টিতে নারী সমালোচিত হয়েছে বেশি। অর্থাৎ উনিশ শতকীয় আন্দোলন আমাদের চেতনাকে সার্বিকভাবে আলোড়িত করতে পেরেছিল কি— এই প্রশ্নটা এড়িয়ে যাওয়া চলে না। কেননা বিশ শতকের একজন ব্যতিক্রমী গল্পকারকে তাঁর গল্পের নায়িকাকে নির্মাণ করতে হয় তৎকালীন বাঙালির আবেগের মাত্রাকে বুঝে, ভাবনাকে বুঝে। অথচ এর আগে 'কল্লোল' এর একাধিক গল্পে ছক ভাঙার সাহস নিয়ে ফেলেছেন অনেকে (অন্তত বিষয়বস্তুর দিক থেকে)। তবুও 'ছোটগল্পঃনূতন রীতি'র অন্যতম লেখক জ্যোতিরিন্দ্র তাঁর প্রথম মৌলিক গল্পে বাঙালির ইমোশনকে মাথায় রাখছেন। হতেই পারে নীলিমার ছোট করে ছাঁটা চুল, শাখা-সিঁদুরের বহর নেই, কালোয়াতি গানে যার রুচি সে আদতে সধবার চিহ্নরহিত একজন সধবা। যে নারী চরিত্রটি তার জীবনের সর্বাধিক মূল্যবান

মানুষটির জীবনরক্ষার দায়িত্ব নিয়েছে। এ দায়িত্ব রক্ষায় রয়েছে তার অপরিসীম মানসিক দুঃখ-কষ্ট-যন্ত্রণা। তবে এ সব কিছুকে এড়িয়ে গিয়ে ভীষণ দাপটের সঙ্গে বলা চলে মৃত্যুভয়কে পদদলিত করে" অফুরন্ত প্রাণশক্তি দিয়ে আগলে রেখেছে আরও একটা প্রাণকে। শেষাবধি নির্মলা-সুরপতির মতো পাঠকও একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে প্রশান্তি লাভ করেছে এবং একজন আধুনিকা পতিব্রতার প্রতি বহুগুণ মুগ্ধতায় তৃপ্ত হয়েছেন।

ছয়.

পুরানো কাসুন্দির কথায় বলতে চেয়েছি তাহলে নতুন কী হলো? এতো ব্যাপক সাড়া পেল কেন এ গল্প? আসলে এই গতানুগতিক চিরাচরিত দাম্পত্য একটা সম্পর্ককে মর্যাদা দিয়ে লেখক যেমন তৎকালীন পাঠকভাবনাকে তুলে ধরতে সক্ষম হলেন, ঠিক তেমনই পাশাপাশি চিরাচরিত ছক ভাঙার প্রবণতাও বজায় রাখলেন। এটা তো বাস্তবিক অর্থেই স্পষ্ট যে, এই অজস্র আন্দোলন পরিবর্তনের সূচনা করলেও তার সার্বিক ব্যাপকতায় প্রশ্ন ছিলো। যে কারণেই হয়তো রবীন্দ্রনাথের 'স্ত্রীর পত্র'র পালটা বিপিনচন্দ্র পাল লেখেন 'মৃণালের কথা'। বাঙালির চিরাচরিত প্রথা এবং ভাবনার সঙ্গে সেদিন নতুন ভাবনার বিরোধ তো ছিলোই। তারই প্রকৃষ্ট প্রমাণ নির্মলা-সুরপতি। এই দম্পতি আসলে সেই সময়ের সংরক্ষণশীল বাঙালি মানসিকতার প্রতিভূ। কাজেই নীলিমা বিবাহিতা এবং সে তার স্বামীর সঙ্গেই এসেছে তাতে একটা প্রচ্ছন্ন স্বস্তিবোধের জায়গা লক্ষ করা যায়। তবে লেখক জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী সধবা নারীর গতানুগতিক সামাজ নির্ধারিত পরিচিতিকে মুছে ফেলে তার স্বেচ্ছা প্রসাধনের ভাবনাকে এ গল্পে প্রাধান্য দিয়েছেন। তাঁকে পুরুষ ব্যতীত শারীরিক এবং মানসিক স্বাবলম্বিতার জায়গায় উপস্থাপন করেছেন। পুরুষ নারীকে রক্ষা করে এসেছেন এতকাল। আর এ গল্পে নারী প্রতিভাত হয়েছে নির্ভরতা হসেবে, রক্ষক হিসেবে। আদতে এও এক ছক ভাঙারই গল্প।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি :

১. নিতাই বসু (সম্পা) জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর নির্বাচিত গল্প
২. রবীন্দ্র-রচনাবলী একাদশ খণ্ড (পশ্চিমবঙ্গ সরকার)
৩. অসীম সামন্ত (সম্পা) অনুষ্টুপ ক্রোড়পত্র জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী।
৪. অসীম সামন্ত (সম্পা) অনুষ্টুপ জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী বিশেষ সংখ্যা
৫. বিকাশ শীল (সম্পা) জনপদপ্রয়াস জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী সংখ্যা ।
৬. বারিদবরণ ঘোষ (সম্পা) - শিবনাথ শাস্ত্রী রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ রণজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়- উনিশ শতকে নারীমুক্তি আন্দোলন ও বাংলা সাহিত্য

দয়ারসাগর ঈশ্বরচন্দ্র : প্রেক্ষাপট শ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত

রুবেল পাল
সহকারী অধ্যাপক, শ্রী রামকৃষ্ণ সারদা বিদ্যামহাপীঠ,
কামারপুকুর, হুগলি

সারসংক্ষেপ : আমরা শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতে মাস্টারমশাইয়ের দেওয়া বর্ণনা থেকে জানতে পারি, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর শুধুমাত্র একজন শুষ্ক পন্ডিত ছিলেন না, বরং তিনি ছিলেন একজন দয়াবান ব্যক্তি । বিদ্যাসাগরের কাছে সাহায্য চেয়ে অনেক দুঃখী,আর্ত ও অসহায় মানুষ বিভিন্ন সময়ে তাঁকে চিঠি লিখেছে। মহেন্দ্রনাথ গুপ্তের লেখনী থেকে জানতে পারি, একজন বন্ধু বিদ্যাসাগরকে বিদেশ থেকে আর্থিক সাহায্য চেয়ে চিঠি লিখত। " হয়তো কেহ বিলাত হইতে লিখিয়াছেন, আমি এখানে বিপদগ্রস্থ, আপনি দীনের বন্ধু, কিছু টাকা পাঠাইয়া আসন্ন বিপদ হইতে আমাকে রক্ষা করুন । "১আসলে বিদ্যাসাগরের এই বন্ধুটি আর কেহ নয়, স্বয়ং মাইকেল মধুসূদন দত্ত। আমরা জানি মাইকেল-মধুসূদন-দত্ত পাশ্চাত্য সংস্কৃতির মোহে নিজের মাতৃভূমিকে অবহেলা করে বিলাতে গিয়েছিলেন প্রতিষ্ঠা লাভের জন্য । কিন্তু পরিণামে তিনি পেয়েছেন অনেক লাঞ্ছনা ও অপযশ । সেখানে গিয়ে তিনি অনেক আর্থিক সংকটের সম্মুখীন হন । সেই সময়ে দয়ারসাগর বিদ্যাসাগরই মধুসূদন দত্তকে অর্থ পাঠিয়ে নানাভাবে সাহায্য করেছিল। আর সে কথাই মধুসূদন দত্ত স্বীকার করেন তাঁর 'ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর' কবিতায়। মধুসূদন দত্ত লেখেন -

" বিদ্যাসাগর তুমিবিখ্যাত ভারতে।
করুণার সিন্ধু তুমি, সেই জানে মনে,
দীন যে, দীনের বন্ধু!—উজ্জ্বল জগতে
হিমাদ্রির হেম- ক্লান্তি অম্লান কিরণে।
কিন্তু ভাগ্য- বলে পেয়ে সে মহাপর্বতে,
যে জন আশ্রয় লয় সুবর্ণ -চরণে,
সেই জানে কত গুণ ধরে কত মতে
গিরীশ। কী সেবা তার সে সুখ- সদনে!—
দানে বারি নদীরূপ বিমলা কিংকরি ;
জোগায় অমৃত ফল পরম আদরে
দীর্ঘ-শিরঃ তরু-দল, দাসরূপ ধরি ;
পরিমলে ফুল- কুল দশ-দিশ ভরে ;
দিবসে শীতলশ্বাসী ছায়া, বনেশ্বরী,
নিশায় সুশান্ত নিদ্রা, ক্লান্তি দূর করে। "২

মধুসূদন দত্তের কবিতা থেকেইআমরা বুঝতে পারি বিদ্যাসাগরের কোমল হৃদয় দুঃখী মানুষের জন্য কতটা ব্যথিত ও স্পন্দিত হত । আমরা এই প্রবন্ধে বিদ্যাসাগরের জীবনের বিভিন্ন দয়ার ঘটনা উল্লেখ করব, এবং পরবর্তীকালে তিনি কীভাবে সর্বজনের দয়ারসাগর হয়ে উঠলেন, সে বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করব।

সূচক শব্দ : শ্রীরামকৃষ্ণ, বিদ্যাসাগর, দয়ার সাগর, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত, সংস্কৃত কলেজ, মেট্রোপলিটন স্কুল।

মাস্টারমশাই শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতে বিদ্যাসাগরের অনেকগুলি গুণের কথা উল্লেখ করেছেন । সেখানে তিনি বিদ্যাসাগরের দ্বিতীয় গুণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন তাঁর দয়ার কথা। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বাল্যকাল থেকে দক্ষিণেশ্বরে থাকাকালীন, সর্বদা বিদ্যাসাগরের অনেক দয়ার কথা শুনেছেন, এ কথারও উল্লেখ করেছেন মাস্টারমশাই তাঁর গ্রন্থে। মাস্টারমশাই লিখছেন - "দ্বিতীয় - দয়া সর্বজীবে, বিদ্যাসাগর দয়ার সাগর । বাছুরেরা মায়ের দুধ পায় না দেখিয়া নিজে কয়েক বৎসর ধরিয়া দুধ খাওয়া বন্ধ করিয়াছিলেন, শেষেই শরীর অতিশয় অসুস্থ হওয়াতে অনেকদিন পরে আবার ধরিয়াছিলেন । গাড়িতে চরিতেন না - ঘোড়া নিজের কষ্ট বলতে পারে না । একদিন দেখিলেন, একটি মুটে কলেরা রোগে আক্রান্ত হইয়া রাস্তায় পড়িয়া আছে, কাছে ঝাঁকাটা পড়িয়া আছে। দেখিয়া নিজে কোলে করিয়া তাহাকে বাড়িতে আনিলেন ও সেবা করিতে লাগিলেন ।"[২৬] আমরা জানি মানুষের প্রথম চরিত্র গঠন হয় তার পরিবারের সদস্যদের কাছ থেকে, বিশেষত তাঁর পিতা-মাতার কাছ থেকে। বিদ্যাসাগরের চরিত্রে দয়া-ভাবের উদ্রেক ঘটে, তাঁর মা বাংলাদেশের ভগবতী দেবীর চারিত্রিক গুনাবলী থেকে মায়েদের মধ্যে বহুল প্রচলিত ছিল। ভগবতী দেবী সব সময় পরিবারের সকলকে খাইয়ে শেষে নিজের আহার গ্রহণ করতেন । তাঁর খাওয়ার সময় যদি কোনো গরীব দুঃখী মানুষ অতিথিরূপে তাঁর বাড়িতে আসত, তখন তিনি নিজে কাজ না খেয়ে সেই দীন-দরিদ্র অতিথিকে আগে খাওএয়াতেন। এমনও দিন যেত, এই রকম পরিস্থিতিতে তার নিজের খাওয়া হতো না। কখনো কখনো আবার পরিবারের সকলের খাওয়া হয়ে গেলেও নিজে বসে থাকতেন কোন দীন-দুঃখী মানুষের অপেক্ষায়। তাই মাইকেল মধুসূদন দত্ত তাই বিদ্যাসাগরকে একবার চিঠি দিয়ে লেখেন -"বাংলাদেশের মায়েদের মতো আপনার কোমল হৃদয়, প্রাচীনকালের মুনি-ঋষিদের মত আপনার জ্ঞান ও সত্যদৃষ্টি একালের ইংরেজদের মত আপনার অফুরন্ত কর্মশক্তি।"[২৭] বস্তুতপক্ষে শুধু বিদ্যাসাগরের মা ভগবতীদেবীই নন, বাংলাদেশের তৎকালীন মায়েদের চরিত্র ছিল অত্যন্ত কোমল ও দয়ায় পরিপূর্ণ। আর এরকমই এক যুগসন্ধিক্ষণে ঈশ্বরচন্দ্র শুধুমাত্র বিদ্যাসাগররূপেই নন, দয়ারসাগর রূপেও পরিচিত হবেন এটাই খুব স্বাভাবিক। বিনয় ঘোষ তাঁর গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, - "বিদ্যাসাগরকে সকলে দয়ার সাগর বলেন । তাঁর দয়া, বদান্যতা, মহানুভবতা ও মানবতা সম্বন্ধে এত গল্প শোনা যায়, যা বলে শেষ করা যায় না।"[২৮]

১৮৬৭ সালে অনাবৃষ্টির জন্য বাংলাদেশে যে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ হয়েছিল, সে সময় বহু মানুষ না খেতে পেয়ে ঘরবাড়ি ছেড়ে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে শুধু ছুটে বেড়াচ্ছিল দুমুঠো অন্নের জন্য। সেই সময় বিদ্যাসাগর নিজের চেষ্টায় সরকারি ও বেসরকারিভাবে এই সমস্ত অনাহারে ক্ষুধার্ত মানুষের জন্য অন্নসত্র খোলার ব্যবস্থা করেন। গ্রামে গ্রামে ঘুরে তথা নিজের গ্রামে বীরসিংহে অন্নসত্র খোলেন। তাঁর নিজব্যয়ে নির্মিত অন্নসত্রে প্রতিদিন প্রায় ১২ জন রাঁধুনী রান্না করতো এবং হাজার ২০ জন অক্লান্তভাবে পরিবেশন করতে। উচ্চ-নীচ, বর্ণ-জাত নির্বিশেষে প্রতিদিন প্রায় ২০০ বেশি মানুষ এই অন্নসত্রে অন্ন গ্রহণ করত। কারুর যাতে কোন অসুবিধা না হয়, সেজন্য বিদ্যাসাগর নিজে হাড়ী, ডোম, বাগদী প্রভৃতি সমাজের উপেক্ষিত মানুষদেরও নিজে দাঁড়িয়ে থেকে যত্ন নিতেন। সমাজের বঞ্চিত অবহেলিত উপেক্ষিত মানুষের যাতে কোনোভাবেই অযত্ন না হয়, বিদ্যাসাগর সেইদিকে বিশেষভাবে খেয়াল রাখতেন। এইসকল নিম্নবর্গের ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা গায়ে মাথায় তেল মাখতে না পেরে অত্যন্ত রুগ্ন দেখাতো। বিদ্যাসাগর নিজের হাতে এই সকল ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের গায়ে ও মাথায় তেল মাখিয়ে দিতেন। কিভাবে বিদ্যাসাগর দুর্ভিক্ষের সময় বহু মানুষের জীবন দান করেছিলেন যা আজও সমগ্র বাংলাদেশ তথা বিশ্ববাসীর স্মরণে ও মননে চির ভাস্বর হয়ে আছে ।

বিদ্যাসাগর শুধুমাত্র অন্নবস্ত্র বা অর্থদানের মধ্য দিয়েই সমাজের দরিদ্র বা পিছিয়ে পড়া মানুষের সেবা করতেন না, প্রয়োজনে তাদের সমাজে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্য যা যা প্রয়োজন সেই ব্যবস্থাও করতেন। একবার বিদ্যাসাগর মহাশয় বর্ধমান থেকে তার নিজের গ্রাম বীরসিংহে পালকি করে ফিরছিলেন । পথের মাঝে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে বেহারারা বিশ্রাম নিচ্ছিল । এমন সময় একটি ছেলে এসে বিদ্যাসাগরকে বলে - বাবু একটা পয়সা দেবে, কিছু কিনে খাব। বিদ্যাসাগর মহাশয় তখন বলেন - যদি দুই পয়সা দি তাহলে কি করবি? ছেলেটি তখন বলে, - তাহলে কাল আরেক পয়সা দিয়ে খাব । বিদ্যাসাগর বলেন, - যদি চার পয়সা দি, তাহলে কি করবি? ছেলেটি উত্তর দিল, ব্যবসা করব। কি ব্যবসা জানতে চাইলে ছেলেটি বলে, - বাজারে দুপয়সার আম কিনে নিয়ে গিয়ে চার পয়সায় বিক্রি করব। এইভাবে পয়সা বাড়িয়ে ব্যবসা করব এবং নিজেও খাব। বিদ্যাসাগর মহাশয় তখন খুব খুশি হন এবং বলেন এই নে তোকে ৮ পয়সা দিলাম। আমি 15 দিন পরে এসে খোঁজ নেব, যদি লাভ করতে পারিস তোকে একটা দোকান বানিয়ে দেব । ঠিক পনেরো দিন পরে বিদ্যাসাগর এসে জানতে পারলেন ছেলেটি ওই ৮ পয়সা থেকে ১ টাকা করে ফেলেছে। বিদ্যাসাগর তখন খুব খুশি হলেন এবং তাকে একটি দোকান বানানোর জন্য ১০ টাকা দিলেন। বিদ্যাসাগর ছেলেটিকে আশীর্বাদ করলেন , টাকা যখন চিনেছিস, তাহলে তুই অনেক বড় হবি । বাস্তবিকপক্ষে দেখা যায় সেই ছেলেটি আর পাঁচটা গ্রামের মধ্যে

একজন বড় প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী হলো এবং বিয়ে করে সংসার করতে শুরু করেছিল । শোনা যায় বিদ্যাসাগর পরে দেখা করতে এসে ছেলেটিকে বিয়ে করার জন্যও কিছু টাকা হাতে দিয়েছিল। এইরকমই মহানুভব ও দয়াবান ব্যক্তি ছিলেন পন্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ।

বিদ্যাসাগর কখনো কোন মানুষের কষ্ট সহ্য করতে পারতেন না । একবার চন্দননগরে পথে যেতে যেতে দেখলেন একটি পাগল যুবক ছেলে প্রচন্ড হাসছে। আর সেই পাগল মানুষটিকে ঘিরে অনেকেই খুব মজা নিচ্ছে। রাস্তায় দাঁড়িয়ে তারা নিজেরাও হাসছে এবং পাগলটিকে প্রচন্ড উত্তপ্ত করছে। এই সকল দৃশ্য দেখে বিদ্যাসাগর মহাশয় অত্যন্ত ব্যথিত হলেন এবং নিজে সকলের সামনে কেঁদে ফেললেন । তারপর পাগলটিকে সঙ্গে করে কলকাতায় নিজের বাড়িতে নিয়ে গেলেন। বিদ্যাসাগরের আবেগমথিত হৃদয় তখন ভাবেনি যে, তিনি কোন পাগলকে নিয়ে যাচ্ছেন। তিনি ভাবলেন প্রত্যেকেই মানুষ এবং মানুষমাত্রই সুন্দর ও সুস্থভাবে বাঁচার অধিকার আছে। আরতআর কি, তাই মানবতার সেই চরম নিদর্শন দেখাতে গিয়ে তিনি নিজে পাগল ছেলেটির চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন। নিজেও নিরলসভাবে সেবা-যত্ন করতে থাকেন। এইভাবে কিছুদিনের মধ্যেই সেই পাগল ছেলেটি যখন সুস্থ হয়ে ওঠে, তখন তাকে তার বাবা-মার কাছে ফিরিয়ে দেন । এইভাবে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে বিদ্যাসাগর তাঁর দয়ালু হৃদয়ে মানবতার পরিচয় দেন । আর এই দয়া-মায়া দেখাতে গিয়ে তিনি কখনোই উচ্চ-নীচ বা জাত-বর্ণের বিভাজন করেননি।

বিদ্যাসাগর বিধবা বিবাহের প্রবর্তন করেন। আমরা জানি সেইকালে বাল্যবিবাহ বহুল প্রচলিত ছিল। ফলস্বরূপ মেয়েরা অতি কম বয়সেই বিধবা হয়ে যেত। এরকম এক পরিস্থিতিতে সেই সকল মেয়েদের সমাজে বাস করা ছিল অত্যন্ত কষ্টসাধ্য। বিদ্যাসাগর বিধবাদের বিবাহের জন্য সমগ্র জীবনব্যাপী অনেক সংগ্রাম করেন, যা ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে খোদিত হয়ে আছে। যখনই কোন বালিকাকে বিধবা দেখতেন, তখনই নিজে তার পড়াশোনার ব্যবস্থা করতেন এবং তার যাতে পুনর্বিবাহ হয় সেই ব্যবস্থাও করতেন । এমনই একটি ঘটনা ঘটে পন্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর বাড়িতে । বিদ্যাসাগর শাস্ত্রী মশায়ের বাড়িতে ঢুকে দেখলেন শাস্ত্রীমশাই একটি ৬/৭ বছরের বালিকাকে কোলে নিয়ে আদর করছেন। তারপর বিদ্যাসাগর জানতে পারেন এই বালিকাটি বিধবা । বিদ্যাসাগর অত্যন্ত ব্যথিত হন এবং শিবনাথ শাস্ত্রীকে বলেন, কাল যেন তাঁর বাড়িতে এই মেয়েটিকে এবং তার মাকে শিবনাথ শাস্ত্রী পাঠিয়ে দেন। পরদিন শিবনাথ শাস্ত্রী তাই করলেন এবং বিদ্যাসাগরও সেই মেয়েটিকে তার নিজের স্কুলে ভর্তি করে দেন । বিদ্যাসাগর চেয়েছিলেন'মেয়েটিকে উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত করে নিজের খরচে মেয়েটির পুনরায় বিবাহ দেবেন। যদিও বিশেষ কারণবশত মেয়েটির অন্য জায়গায় চলে যাওয়ায় বিদ্যাসাগরের সেই স্বপ্ন পূরণ হয়নি, কিন্তু বিদ্যাসাগর যে এই বিষয়ে আজীবন অত্যন্ত আগ্রহী ছিলেন এই নিয়ে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই ।

বিদ্যাসাগর কতটা মানবদরদী ছিলেন তা শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতে মাস্টারমশাইয়ের বর্ণনা থেকেই আমরা বুঝতে পারি । সেখানে বিদ্যাসাগরের টেবিলের উপরে পড়ে থাকা অনেকগুলি চিঠির বর্ণনা আছে । বিদ্যাসাগর প্রয়োজনে মানুষের যেকোন ধরনের উপকার করতে কখনোই পিছুপা হতেন না। কারোর মেয়ের বিয়ে না হলে তিনি অর্থ দিয়ে সাহায্য করতেন । কেউ যদি অর্থের অভাবে না খেতে পেত, বিদ্যাসাগর তাকে অর্থ পাঠিয়ে সাহায্য করতেন। কোন বিধবা যদি বিবাহ করতে ইচ্ছুক হত, বিদ্যাসাগরের নিজে দাঁড়িয়ে থেকে তার বিবাহ দিতেন। কথামৃতকার মাস্টারমশাই তাই বর্ণনা দিচ্ছেন - "টেবিলের উপর যে পত্রগুলি চাপা রহিয়াছে- তাহাতে কি লেখা রহিয়াছে ? কোন বিধবা হয়তো লিখিয়াছে, আমার অপোগণ্ড শিশু অনাথ, দেখিবার কেহ নাই, আপনাকে দেখিতে হইবে। কেহ লিখিয়াছে, আপনি করমাতার চলিয়া গিয়াছিলেন, তাই আমরা মাসোহারা ঠিক সময়ে পাই নাই, বড় কষ্ট হয়েছে । কোন গরীব লিখিয়াছে আপনার স্কুলে ফ্রি ভর্তি হইয়াছি,কিন্তু আমার বই কিনিবার ক্ষমতা নাই । কেহ লিখিয়াছে আমার পরিবারবর্গ খেতে পাচ্ছে না - আমাকে একটি চাকরি করিয়া দিতে হইবে। তাঁর স্কুলের কোন শিক্ষক লিখিয়াছেন, আমার ভগিনী বিধবা হইয়াছে ,তাহার সমস্ত ভার আমাকে লইতে হইয়াছে, এই বেতনে আমার চলবে না । হয়তো কেহ বিলাত হইতে লিখিয়াছে - আমি এখানে বিপদগ্রস্থ, আপনি দীনের বন্ধু, কিছু টাকা পাঠাইয়া আসন্ন বিপদ হইতে আমাকে রক্ষা করুন। কেহ বা লিখিয়াছেন অমুক তারিখে সালিশের দিন নির্ধারিত - আপনি সেদিন আশিয়া আমাদের বিবাদ মিটাইয়া দিবেন।"[২৯]

উপরে উল্লিখিত চিঠিগুলির বিষয়বস্তু দেখেই আমরা বুঝতে পারি, বিদ্যাসাগর মহাশয় কতটা দয়ালু ছিলেন। একবার তাঁর গ্রাম থেকে তাঁর এক বন্ধু ভাইজীকে চিকিৎসার জন্য কলকাতায় নিয়ে আসেন। সেই বন্ধুর ভাইঝীটি ছিল অত্যন্ত সুশ্রী এবং তরুণী । কিন্তু কোন কারনে মস্তিষ্কের বিকৃতি দেখা দেওয়ায় সেই বন্ধুটি এখন চিকিৎসার জন্য ভাইজীকে নিয়ে কলকাতায় এসেছেন। বিদ্যাসাগর তাদের থাকার ব্যবস্থা করে দেন । কিন্তু সেই বন্ধুর ভাইঝীটি এতটাই বদ্ধ উন্মত্ত ছিল যে, হঠাৎ করে জেদ ধরে বসে যে, সে এখন বিদ্যাসাগরের হাতে ছাড়া কোন খাবার খাবে না, এমনকি জলস্পর্শ করবে না। এইরকম কঠিন পরিস্থিতিতেও বিদ্যাসাগর কিন্তু বিরক্ত হতেন না। আর তাই অনেক ব্যস্ততার মধ্য দিয়েও বিদ্যাসাগর প্রতিদিন নিয়মিত দুপুরে এবং রাতে নিজে হাতে সেই মেয়েটিকে খাবার খাওয়াতে যেতেন । বিদ্যাসাগর শুধুমাত্র দয়ার জন্যই দয়া করতেন না, তাঁর ছিল সেবাব্রত। আর এইভাবে দীর্ঘদিন সেবা-শুশ্রূষার মধ্য দিয়ে বিদ্যাসাগরের বন্ধুর ভাইঝীটি ধীরে ধীরে সুস্থ ও প্রকৃতস্থ হয়ে ওঠে।

সাঁওতাল পরগনায় বিদ্যাসাগরের একটি বাংলো ছিল। বিদ্যাসাগর প্রায়ই সেখানে সময় কাটাতেন এবং সাঁওতালদের দুঃখ কষ্ট দূর করার জন্য জীবন অতিবাহিত করতেন । পন্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী ও পন্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রীকে বিদ্যাসাগর নিজের

পুত্রের মত ভালোবাসতেন । একবার হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সাঁওতাল পরগনায় বিদ্যাসাগরের বাংলোতে গিয়েছিলেন । সেখানে গিয়ে দেখেন বিদ্যাসাগর কিভাবে সাঁওতালদের মধ্যে নিজেকে একাত্ম করে তুলেছেন এবং তাদের দৈনন্দিন উন্নতি বিধানের জন্য নিজের জীবনকে সমর্পিত করেছেন । শাস্ত্রী মশাই একদিন সকালবেলা দেখেন একজন সাঁওতাল এসে বিদ্যাসাগর কে বলল - সে কিছু ভুট্টার বিনিময়ে বিদ্যাসাগরের কাছে 5 আনা চায়। বিদ্যাসাগর তৎক্ষণাৎ সেই ভুট্টাগুলো নিয়ে তাকে পাঁচ আনা দিয়ে দেয় । কিছুক্ষণ পর আরেকজন সাঁওতাল এক ঝুড়ি ভুট্টা নিয়ে আসে এবং বিদ্যাসাগরের কাছে আটানা চায়। বিদ্যাসাগর তৎক্ষণাৎ তাকে আট আনা দিয়ে দেয় । এইভাবে অনেকক্ষন ধরেই ভুট্টা কেনা চলতে থাকে। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ভুট্টা কেনার রহস্য কিছুই বুঝতে না পেরে বিদ্যাসাগরকে জিজ্ঞাসা করেন যে বিদ্যাসাগর মহাশয় এই ভুট্টাগুলো দিয়ে কি করবেন । বিদ্যাসাগর একটু হেসে বলেন - ঠিক সময়ে বুঝতে পারবে। এইভাবে ভুট্টা কেনা কিছুক্ষণ চলতে থাকে। সমস্ত ঘরে ভুট্টা স্তুপাকার নেয়। এরপর শাস্ত্রী মশাই দেখেন, বিদ্যাসাগরের বাংলোর উঠোনে হঠাৎ অনেক সাঁওতাল শুঁকনো পাতা নিয়ে উপস্থিত হয়। বিদ্যাসাগর এবার তাদেরকে ভুট্টাগুলি দিতে থাকেন। সেই ক্ষুদার্থ সাঁওতালরা তখন কাঠ ও পাতা জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে খেতে থাকে। অনেকে আবার একটি বা দুটি করে ভুট্টা চেয়ে নিতে থাকে। তারপর সকলে তৃপ্ত হয়ে বিদ্যাসাগরকে বিদায় জানায় । এই দৃশ্য দেখে পন্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী অত্যন্ত আশ্চর্য হন এবং বলেন - "আমি তার মুখের দিকে আশ্চর্য হয়ে চেয়ে রইলাম, মনে মনে বললাম - এরকম দৃশ্য আর বোধ হয় জীবনে কখনো দেখতে পাব না।"[৩০]

বিদ্যাসাগর অত্যন্ত কোমল হৃদয়ের মানুষ ছিলেন । যদিও তিনি বিশেষ কিছু না ভেবেই দীন-দুঃখীদের অকাতরে দান করতেন ,কিন্তু তিনি কখনও প্রতারণা পছন্দ করতেন না । কেউ যদি তাকে ঠকিয়ে সাহায্য নিত, তাহলে তিনি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হতেন এবং তাকে উপযুক্ত শাস্তিও দিতেন। বিদ্যাসাগরের মেট্রোপলিটন স্কুল ও কলেজে বহু ছাত্র বিনা পয়সায় পড়াশুনা করত। প্রত্যেকেরই যে অত্যন্ত দরিদ্র ছিল এমনটা নয়, অনেকেরই বেতন দেওয়ার ক্ষমতা ছিল । কিন্তু তারা জানত বিদ্যাসাগর কি কি বিষয়ে অত্যন্ত দুর্বল এবং নরম প্রকৃতির। তাই এই সকল ধূর্ত ছাত্ররা 'কারোর বাবা নেই', 'কারোর মা নেই', অথবা 'কারোর মা বিধবা'ইত্যাদি স্পর্শকাতর বিষয় বিদ্যাসাগরকে বলে তাঁর বিদ্যালয়ে বিনা বেতনে পড়াশোনা করত। শুধু বিনা বেতনে পড়াশুনাই নয়, কোনো কোনো ছাত্র আবার বই কেনার ক্ষমতা নেই বলে টাকাও নিত। বিদ্যাসাগর এইসকলই করতেন তাঁর হৃদয়ের আর্দ্রতা ও দয়ালু মনোভাব থেকে। কিন্তু তিনি যদি জানতে পারতেন, কোন ছাত্র তাকে ঠকিয়ে টাকা নিয়েছে বা প্রতারণা করে তাঁর বিদ্যালয়ে বিনা বেতনে পড়াশোনা করছে, তবে তিনি সেইসব ছাত্রকে শাস্তিস্বরূপ বিদ্যালয় থেকে তাড়িয়েও দিতেন।

কলকাতার বাইরে বিভিন্ন গ্রামাঞ্চলের স্কুলের ছাত্ররা বিদ্যাসাগরকে প্রায়শই চিঠি লিখতো, 'কারোর বিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার ক্ষমতা নেই', 'কারো বা বই কেনার ক্ষমতা নেই', 'কারো আবার বার্ষিক বেতন দেওয়ার ক্ষমতা নেই'ইত্যাদি নানান প্রকার অসুবিধার কথা জানিয়ে। এইরকমই একবার গ্রামাঞ্চলের একটি ছেলে বিদ্যাসাগর কে চিঠি লিখত - 'তার মা নেই ও বাবা নেই'। কিন্তু সে ভালো করে পরীক্ষায় পাশ করে পরবর্তী শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হয়েছে। এখন তার কাছে বই কেনার টাকা নেই, তাই বিদ্যাসাগরকে বই কেনার টাকা পাঠাতে হবে। বিদ্যাসাগরও ছেলেটির চিঠি পেয়ে যথারীতি তাঁর হৃদয়ের করুন উদ্বেলতা থেকে ছেলেটিকে টাকা পাঠিয়ে দিত। এইভাবে পরপর তিন বছর ছেলেটি 'ভালো করে পরীক্ষায় পাশ করেছি 'এই বলে চিঠি লিখত এবং টাকা চেয়ে পাঠাতো । বিদ্যাসাগর প্রতি বছর নিয়মিত তাকে টাকা পাঠিয়ে দিতেন। একবার কলকাতায় কোন এক কাজে বিদ্যাসাগরের কাছে সেই গ্রামাঞ্চলের স্কুলের কোন এক শিক্ষক বিদ্যাসাগরের কাছে এলে, বিদ্যাসাগর সেই শিক্ষকের কাছে ছেলেটির কথা জানতে চান । তখন সেই শিক্ষক জানান তার স্কুলে এই নামে কোন ছাত্র নেই। বিদ্যাসাগর তখন স্পষ্ট বুঝতে পারেন, তাঁর হৃদয়ের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে কোন এক ভদ্রলোক তাকে ছাত্র সেজে ঠকিয়েছে

বিদ্যাসাগর তাঁর মহান হৃদয়ের পরিচয় দেন নারীশিক্ষা তথা স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের মধ্য দিয়ে। তাই বিদ্যাসাগর ছেলেদের মডেল স্কুলের মত বিভিন্ন জেলায় জেলায় বালিকা বিদ্যালয় স্থাপনের কাজে ব্রতী হন । তিনি প্রথমেই বর্ধমান জেলার জৌ গ্রামে একটি বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। তারপর ১৮৫৭ সালের নভেম্বর থেকে ১৮৫৮ সালের মে মাসের মধ্যে হুগলি, বর্ধমান, মেদিনীপুর ও নদীয়া জেলায় মোট ৩৫ টি বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। এই সকল বিদ্যালয়ে মোট ছাত্রীর সংখ্যা ছিল প্রায় ১৩০০ । প্রথমদিকে গ্রামবাসীরাই বিদ্যালয় চালানোর জন্য বিভিন্ন সরঞ্জাম দিয়ে বিদ্যাসাগরকে সাহায্য করতে থাকেন। বিদ্যাসাগর নিজের খরচে এই সকল বিদ্যালয়ে বিভিন্ন বিভাগে শিক্ষক নিয়োগ করেন । বাংলার সরকার বিদ্যাসাগরের এই প্রচেষ্টায় স্ত্রীশিক্ষার জন্য অর্থ-ব্যয়ে যদিও সম্মত হয়েছিলেন, কিন্তু ভারত সরকার 1857 সালের সিপাহী বিদ্রোহে প্রচুর অর্থ ব্যয়ের জন্য এই বিষয়ে খরচ করতে একেবারেই সম্মত ছিল না। ভারত সরকারের এহেন মনোভাবে বিদ্যাসাগর অত্যন্ত ব্যথিত ও মর্মাহত হয়েছিলেন । বিদ্যাসাগর ভেবেছিলেন ভারত সরকার তাঁকে অর্থ দিয়ে সাহায্য করবেন। আর সেই কারণেই বিদ্যাসাগর গ্রামে গ্রামে ঘুরে ঘুরে অত্যন্ত উৎসাহের সঙ্গে বালিকা বিদ্যালয়গুলি স্থাপনের জন্য প্রয়াসী হয়েছিলেন। ১৮৫৮ সালের জুন মাস পর্যন্ত শিক্ষকদের বকেয়া বেতন প্রায় ৩৪৪০ টাকা, এটাই ছিল বিদ্যাসাগরের প্রধান দুশ্চিন্তা ও মাথা ব্যথার কারণ । তাই তখন তিনি শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টরের কাছে চিঠি লেখেন যে, অত্যন্ত উৎসাহ ও আশা নিয়ে তিনি জেলায় জেলায় এই সকল বালিকা

বিদ্যালয়গুলি স্থাপন করেছেন। তাঁর মর্মস্পর্শী ও আন্তরিক চিঠির আহবানে ভারত সরকারের হৃদয়ে সাড়া জেগেছিল।

ভারত সরকার প্রত্যুত্তরে চিঠি দিয়ে লেখেন যে, পন্ডিতমশাই খুবই আন্তরিক উৎসাহ ও হৃদয়বত্তার সাথে বালিকাদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের জন্য স্কুলগুলি প্রতিষ্ঠা করেছেন এবং এবিষয়ে বাংলা সরকারের শিক্ষাবিভাগেরও অনুমোদন আছে। তাই সেই দিক বিবেচনা করে শিক্ষকদের বকেয়া স্বরূপ 3440 টাকা ভারত সরকার অবিলম্বে মিটিয়ে দেবে । ভারত সরকারের এই চিঠি আসে ডিসেম্বর মাসে, কিন্তু বিদ্যাসাগর নভেম্বর মাসে মাসিক ৫০০ টাকা বেতনের চাকরি থেকে ইতিমধ্যেই অবসর নেন। চাকরি ছাড়ার ফলে তাঁর পক্ষে বিদ্যালয়গুলি চালানোর জন্য আর্থিক সাহায্য করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। বিদ্যাসাগর তখন অত্যন্ত মর্মবেদনা অনুভব করেন, কিন্তু তিনি কখনই নিরুৎসাহ হননি । কারণ বিদ্যাসাগর কোন কাজ শুরু করলে তা সহজে ছাড়ার পাত্র ছিলেন না । এমতাবস্থায় বিদ্যাসাগর দেশের বিভিন্ন সম্ভ্রান্ত মানুষের কাছে আর্থিক সাহায্যের জন্য আবেদন করেন এবং অনেকের কাছ থেকে ইতিবাচক সাড়াও পান । এইভাবে বিদ্যাসাগর তার মহান হৃদয়ের পরিচয় দিয়ে স্ত্রীশিক্ষা কাজের ক্ষেত্রে এগিয়ে যেতে থাকেন এবং ধীরে ধীরে বেথুন কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন । এই সমস্ত ঘটনা থেকেই আমরা স্পষ্ট বুঝতে পারি নারী জাতির প্রতি বিদ্যাসাগরের হৃদয় কতটা দয়াদ্র ও সংবেদনশীল ছিল।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃতকার মাস্টারমশাই তাই তাঁর গ্রন্থে ঠাকুরের মুখ দিয়ে উল্লেখ করছেন, বিদ্যাসাগরের অনেক দয়া। বিদ্যাসাগরের এই সকল সামাজিক কর্ম প্রকৃত অর্থেই সাত্ত্বিক কর্ম। বিদ্যাসাগর একজন সিদ্ধপুরুষ । তিনি হলেন জ্ঞান-সিদ্ধ, তিনি বিদ্যায় সিদ্ধ, তিনি দয়ায় সিদ্ধ। আর সিদ্ধপুরুষ হওয়ায় তাঁর হৃদয় অত্যন্ত নরম। মাস্টারমশাই সুন্দর বর্ণনা দিচ্ছেন, -"তোমার কর্ম সাত্ত্বিক কর্ম। সত্ত্বের রজঃ। সত্ত্বগুণ থেকে দয়া হয়। দয়ার জন্য যে কর্ম করা যায়, সে রাজসিক বটে -- কিন্তু এ রজোগুণ, সত্ত্বের রজোগুণ, এতে দোষ নাই । শুকদেবাদি লোকশিক্ষার জন্য দয়া রেখেছিলেন -- ঈশ্বর-শিক্ষা দিবার জন্য। তুমি বিদ্যাদান অন্নদান করছ , এও ভালো। নিষ্কাম করতে পারলেই, এতে ভগবান-লাভ হয়। কেউ করে নামের জন্য, পুণ্যের জন্য, তাদের কর্ম নিষ্কাম নয়। আর সিদ্ধ তো তুমি আছই।

বিদ্যাসাগর - মহাশয়, কেমন করে ?

শ্রীরামকৃষ্ণ- (সহাস্যে) আলু-পটল সিদ্ধ হলে তো নরম হয়, তা তুমি তো খুব নরম। তোমার অত দয়া ! (হাস্য)

বিদ্যাসাগর - (সহাস্যে) কলাই বাটা সিদ্ধ তো শক্তই হয় ! (সকলের হাস্য)

শ্রীরামকৃষ্ণ - তুমি তা নও গো , শুধু পন্ডিতগুলো দরকচা পড়া, না এদিক - না ওদিক। শকুনি খুব উপরে ওঠে, তার নজর ভাগাড়ে। যারা শুধু পন্ডিত, শুনতেই পন্ডিত,

কিন্তু তাদের কামিনী-কাঞ্চনে আসক্তি - শকুনির মত পচা মরা খুঁজছে। আসক্তি অবিদ্যার সংসারে। দয়া, ভক্তি, বৈরাগ্য বিদ্যার ঐশ্বর্য।"[৩১]

১৮৪১ সালের ২৯ শে ডিসেম্বর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের শেরেস্তাদার অর্থাৎ প্রধান পন্ডিতের পদে নিযুক্ত হন। সেই সময়ে বিদ্যাসাগরের মাইনে ছিল মাত্র ৫0 টাকা। বিদ্যাসাগরের পিতা ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বিদ্যাসাগরকে পন্ডিত করে তোলার জন্য অনেক কাল থেকেই নানান ভাবে পরিশ্রম করছিলেন । এমনকি সেই সময়ও তাঁর পিতা ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় কলকাতায় মাসিক ১০ টাকার বেতনে কাজ করছিলেন । পন্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের হৃদয়ে পিতার এই পরিশ্রমের বিষয়টি অত্যন্ত সাড়া জাগিয়েছিল। বিদ্যাসাগরের স্বীয় পরিবারের প্রতি দয়াভাব ও কর্তব্য পরায়ণবোধ তখনই প্রকাশ পেয়েছিল তাঁর আচরণের মধ্য দিয়ে। বিদ্যাসাগর তাঁর পিতাকে বললেন যে, এখন পিতার আর পরিশ্রম করার কোন প্রয়োজন নেই, কারণ তিনি এখন ৫০ টাকা মাসিক বেতন পান। পিতাকে তিনি গ্রামে ফিরে যেতে বললেন এবং তিনি ২০ টাকা করে গ্রামে পিতাকে পাঠিয়ে দেবেন , সেই প্রতিশ্রুতিও দিলেন। এরপর থেকে বিদ্যাসাগর প্রতিমাসে কুড়ি টাকা করে পিতাকে পাঠাতে শুরু করলেন এবং বাকি ৩০ টাকায় তিনি কলকাতায় তাঁর যাবতীয় ব্যয়ভার চালাতে লাগলেন। এরপর বিদ্যাসাগরকে বড়বাজার ছেড়ে বউবাজারে ঘর ভাড়া নিতে হয়েছিল । সেখানে বিদ্যাসাগরের সঙ্গে থাকত তাঁর দুই ভাই শম্ভুচন্দ্র ও দীনবন্ধু। এছাড়াও সেখানে থাকত দুজন খুড়তুতো ভাই , দুজন পিসতুতো ভাই, একজন মাসতুতো ভাই ও শ্রীরাম নামে একজন চাকর । এই ৩০ টাকার মধ্যেই ঘর ভাড়া তথা বিদ্যাসাগরকে বাদ দিয়ে বাকি আটজনের সমস্ত আহারাদির খরচা তাঁকেই বহন করতে হত। সেখানে শুধু রান্নাবান্না তারা পালাক্রমে করত। মাঝেমধ্যে বিদ্যাসাগরকে নিজেকেও রান্না করতে হত । এমনদিনও আসত যে বিদ্যাসাগরকে নিজে রান্না করে খেয়ে-দেয়ে কলেজ যেতে হত। বউবাজার থেকে লালদীঘি (ডালহৌসি স্কোয়ার) হেঁটেই তিনি যাতায়াত করতেন। বিদ্যাসাগরের জীবনের এই সমস্ত ঘটনা থেকে আমরা স্পষ্ট বুঝতে পারি যে, তিনি একজন কলেজের প্রধান অধ্যাপক হওয়া সত্ত্বেও কখনই তিনি বিলাসবহুল জীবনযাত্রার প্রতি আগ্রহী হননি । বরং তাঁর স্বহৃদয় কর্তব্যপরায়ণ বোধ থেকে আমৃত্যু তিনি সর্বদা দয়া-দাক্ষিণ্যময় সুমহান জীবন যাপন করে গেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে যে যে কথাগুলো বলেছেন, আমরা যদি সেগুলো ভালো করে বিশ্লেষণ করি তাহলে বুঝতে   পারব বিদ্যাসাগরের মধ্যে প্রকৃত বিদ্যার যে ঐশ্বর্য, দয়া, ভক্তি ও বৈরাগ্য - তার প্রকাশ কিন্তু সমগ্র জীবনব্যাপী তাঁর আচার-ব্যবহার ও কর্মে খুবই স্পষ্ট ভাবে প্রকাশ পেয়েছে। আমরা বর্তমান প্রবন্ধে যা কিছু আলোচনা করেছি, সেখানে স্পষ্টভাবেই বুঝতে পেরেছি, বিদ্যাসাগর শুধু পন্ডিতই ছিলেন না, তিনি ছিলেন শাশ্বত বিদ্যার সনাতন আধার।আর সেই ভাবই খুব স্পষ্টভাবে

প্রকাশ পেয়েছে উপরিউক্ত শ্রীরামকৃষ্ণের অকপট স্বীকারোক্তির মধ্য দিয়ে। আর পাণ্ডিত্যের এই পূর্ণতার প্রকাশের মধ্য দিয়েই বিদ্যাসাগর হয়ে উঠেছেন আপামর সকলের বিদ্যারসাগর তথা দয়ারসাগর।

তথ্যসূত্র :

১. শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, পৃষ্ঠা - ৪৫
২. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রচনা - মাইকেল মধুসূদন দত্ত
৩. শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, পৃষ্ঠা- ৪৪
৪. শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, পৃষ্ঠা- ৪৪
৫. শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, পৃষ্ঠা- ৪৪
৬. শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, পৃষ্ঠা- ৪৪
৭. শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, পৃষ্ঠা- ৪৬
৮. শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, পৃষ্ঠা - ৪৫
৯. শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, পৃষ্ঠা - ৪৫
১০. যুগপুরুষ'বিদ্যাসাগর
১১. শতরূপে সারদা
১২. শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত
১৩. যুগপুরুষ'বিদ্যাসাগর, পৃষ্ঠা - ২০
১৪. যুগপুরুষ'বিদ্যাসাগর, পৃষ্ঠা - ২৯-৩১
১৫. যুগপুরুষ বিদ্যাসাগর, পৃষ্ঠা - ২৪
১৬. যুগপুরুষ'বিদ্যাসাগর, পৃষ্ঠা - ২৪
১৭. বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ, প্রথম খন্ড, পৃষ্ঠা - ১০৮
১৮. বিদ্যাসাগর ও বাঙালি সমাজ, প্রথম খন্ড, পৃষ্ঠা- ১০৮ - ১০৯
১৯. শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, পৃষ্ঠা - ৪৬
২০. যুগপুরুষ'বিদ্যাসাগর, পৃষ্ঠা - ৩৩
২১. যুগপুরুষ'বিদ্যাসাগর, পৃষ্ঠা - ৩৪
২২. যুগপুরুষ'বিদ্যাসাগর, পৃষ্ঠা - ২২
২৩. শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, পৃষ্ঠা - ৪৮
২৪. যুগপুরুষ'বিদ্যাসাগর, পৃষ্ঠা - ৪০
২৫. শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, পৃষ্ঠা - ৪৭

২৬. শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, পৃষ্ঠা - ৪৬
২৭. যুগপুরুষ'বিদ্যাসাগর, পৃষ্ঠা - ১১৩
২৮. যুগপুরুষ'বিদ্যাসাগর, পৃষ্ঠা - ১২৩
২৯. শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, পৃষ্ঠা - ৪৫
৩০. যুগপুরুষ'বিদ্যাসাগর ,পৃষ্ঠা - ১৩৬
৩১. শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, পৃষ্ঠা - ৪৬ – ৪৭

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী :

১. শ্রীম-কথিত, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা-০৩, প্রথম সংস্করণ-১৯৮৬-৮৭, মুদ্রিত।
২. পান্ডে, গোপালদত্ত, বৈয়াকরণ সিদ্ধান্ত- কৌমুদী (প্রথমো ভাগ), চৌখাম্বা সুরভারতী প্রকাশন, বারানসী, পুনর্মুদ্রণ-২০১২।
৩. পান্ডে, গোপালদত্ত, বৈয়াকরণ সিদ্ধান্ত- কৌমুদী (তৃতীয়ো ভাগ), চৌখাম্বা সুরভারতী প্রকাশন, বারানসী, পুনর্মুদ্রণ-২০১২।
৪. মুখোপাধ্যায়, সচ্চিদানন্দ, সিদ্ধান্তকৌমুদী (সমাস প্রকরণ),সাহিত্য নিকেতন, কলকাতা- ৭,পুনর্মুদ্রণ- ২০০৯-১০ ।
৫. M.M.JHA, অষ্টাধ্যায়ী সূত্রানুক্রমণিকা, Google plystore Applicatuon.
৬. দে, পূর্ণচন্দ্র, ব্যাকরণ-কৌমুদী (প্রথম ভাগ), The sansket press Dipository, calcutta-30.
৭. হালদার, গুরুপদ, ব্যাকরণ দর্শনের ইতিহাস, সংস্কৃত বুক ডিপো, কলকাতা -০৬।
৮. সামন্ত ,অমিও কুমার, বিদ্যাসাগর, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, ২০১৪ ।
৯. ইসলাম, নুরুল, ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাসের রূপরেখা, শ্রীধর প্রকাশনী, ২০১৮ ।
১০. বন্দোপাধ্যায়, চণ্ডীচরণ, রায়, বণিক, বিদ্যাসাগর, স্ট্যান্ডার্ড পাবলিকেশন, ১৯৯০ ।
১১. চট্টোপাধ্যায়, শরৎ, বিদ্যাসাগর: সংগঠন ও শিক্ষা প্রসঙ্গ, নিউ সেন্ট্রাল বুক এজেন্সি, ২০০৭।
১২. মজুমদার, রমেশচন্দ্র, বিদ্যাসাগরের বাংলা গদ্যের সূচনা ও নারী প্রগতি, জেনারেল প্রিন্টার্স এন্ড পাবলিকেশন লিমিটেড, ১৩৭৬ বঙ্গাব্দ।
১৩. শ্রীমদ্ভগবদগীতা (শ্লোকসর্থসহ) গীতা প্রেস, গোরক্ষপুর, পুনর্মুদ্রণ - 2016 ।
১৪. ব্যাকরণ মহাভাষ্য (পষ্পসাহ্নিক) দন্ডিস্বামী দামোদর আশ্রম, সম্পাদিত, কলকাতা ।
১৫. উপনিষদ্, গীতা প্রেস, গোরক্ষপুর, 2003 ।

১৬. শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত (অখন্ড), মাইতি বুক হাউস, কলকাতা।

১৭. ঘোষ, বিনয় : যুগপুরুষ'বিদ্যাসাগর, পাঠভবন, ১২/১ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা -১২, প্রথম সংস্করণ - জানুয়ারী, ১৯৬০।

১৮. ঘোষ, বিনয় : বিদ্যাসাগর ও বাঙালি সমাজ (প্রথম ও তৃতীয় খন্ড) , বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৪ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা - ১২।

১৯. চাণক্য শ্লোক সংগ্রহ।

২০. লোকেশ্বরানন্দ, স্বামী: শতরূপে সারদা, রামকৃষ্ণ মিশন গোলপার্ক, কলকাতা – ২৯।

নৈতিকতার মানদন্ড রূপে সর্বমুক্তিবাদ

নৃপেন বিশ্বাস
সহকারী অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ
গোবরডাঙ্গা হিন্দু কলেজ

সারসংক্ষেপ : মনুষ্য প্রজাতির সঙ্গে অপারাপর প্রজাতির পার্থক্য এখানেই যে, মানুষের জীবনে একটা মূল লক্ষ্য রয়েছে যদিও ওই মূল লক্ষ্যটি ঠিক কি এবং সেটিকে ঠিক কিভাবে লাভ করা যাবে তা নিয়ে এখনও কোনো স্থির সিদ্ধান্তে আসা যায়নি। তবে এ নিয়ে সব থেকে বেশি আলোচনা হয়েছে নৈতিক দর্শনে।

এখন কাজের ভাল মন্দ বিচার করাটাই নৈতিক দর্শনের অন্যতম একটি মূল কাজ হলেও ঠিক কোন মানদন্ড ব্যবহার করে সঠিক নৈতিক বিচার করা যাবে সেটা নির্নয় করা এবং ঐ নৈতিক মানদন্ডগুলির ভিত্তি নির্ধারন অর্থাৎ সাধারন বোধবুদ্ধি দিয়েই এদের স্বরূপ সত্যই নির্ধারন করা যায় কিনা এ নিয়ে নৈতিক দার্শনিকরা নিজেরা যেমন একমত হতে পারেনি, তেমনি আজ পর্যন্ত কোনো স্থিরসিদ্ধান্তে আসতে পারেনি, যার ফল স্বরূপ কাজের ভাল- মন্দ বিচারে যে সকল মানন্দন্ডগুলি গড়ে উঠেছে তার মধ্যে অন্যতম হল আত্মস্বার্থবাদ,পরার্থবাদ, সর্বস্বার্থবাদ, উপযোগবাদ ইত্যাদি।

আর এ বিষয়ে রাধাকৃষ্ণণ মত পোষন করে বলেন, মানুষের মূল লক্ষ্য হল, সর্বমুক্তি অর্থাৎ সকল মানুষেরই মুক্তি। কিন্তু সর্বমুক্তি কি সত্যই মানুষের জীবনের মূল লক্ষ্য হতে পারে? একজন ব্যক্তি মানুষ কীভাবে নিজের মুক্তির পর সর্বমুক্তির সহকারী হতে পারে? এসব প্রশ্নের উত্তর খোঁজা খুবই গুরুত্বপুর্ণ। মোট তিনটি পর্বে এটি আলোচিত হবে। প্রথম পর্বে থাকবে কয়েকটি নৈতিক মানদন্ড সম্পর্কিত মতবাদ, দ্বিতীয় পর্বে থাকবে রাধাকৃষ্ণণের সর্বমুক্তির আলোচনা আর তৃতীয় পর্বে থাকবে মূল্যায়ন।

মুলশব্দ : নৈতিকতা, মুক্তি,সর্বমুক্তি।

মূল আলোচনা :

(১)

আত্মস্বার্থবাদ : আত্মস্বার্থবাদ এমন একটি মতবাদ, যে মতবাদ অনুসারে মানুষের উচিৎ কারো ক্ষতি ও অপকার হলেও আত্মস্বার্থ রক্ষার জন্য আপ্রান চেষ্টা করা। এটি করাই তার একমাত্র দায়িত্ব। মনস্তাত্ত্বিক আত্মস্বার্থবাদ অনুসারে মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি ও ধর্ম এমন যে সে নিজের স্বার্থের বাইরে অন্য কিছু চাইতে পারে না বা চাওয়ার যোগ্য বলে মনে করে না, এমন কি সে যখন অন্য কোন ব্যক্তির স্বার্থ রক্ষার চেষ্টা করে বা সমাজের স্বার্থ বা কল্যানের জন্য কাজ করে, তখন তার এই সকল কাজের পিছনেও নিজের স্বার্থ রক্ষার চিন্তাই প্রধান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হয়ে থাকে।[১]আত্মস্বার্থবাদের সাধারন

রূপটি হচ্ছে আত্মসুখবাদ। আত্মসুখবাদ অনুসারে ব্যক্তির নিজের সুখ কামনা করাই জীবনের একমাত্র পরম লক্ষ্য ও কাম্য। অপরদিকে, নৈতিক আত্মস্বার্থবাদ অনুসারে প্রত্যেক ব্যক্তির দায়িত্ব ও কর্তব্য হওয়া উচিৎ নিজের স্বার্থ ও মঙ্গল কামনা করা। কেবল নিজের স্বার্থের খাতিরেই অপরের সুখ ও শান্তি কামনা করা যেতে পারে।

একজন আত্মস্বার্থবাদির নিকট কোনো প্রকার নৈতিক বিবেচনার আশা করা যায় না। কারন সে নিজ স্বার্থের বাইরে কোন কিছু চিন্তা করতে পারে না । অথচ নৈতিক দৃষ্টিকোণের জন্য প্রয়োজন নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি ও পক্ষপাতহীন আচরন। কিন্তু একজন আত্মস্বার্থবাদী পক্ষপাতহীন থাকতে পারে না।

সৎ পরামর্শের সঙ্গে আত্মস্বার্থবাদ সঙ্গতিপূর্ন নয়। কোন আত্মস্বার্থবাদী যখন কোন ব্যক্তিকে কোন সৎ পরামর্শ দেন বা নৈতিক পরামর্শ দেন, তার পিছনে নিজের স্বার্থ রক্ষার চিন্তা মুখ্য হয়।

পরার্থবাদঃ

পরার্থবাদ অনুসারে প্রত্যেক মানুষের নিজের স্বার্থের পরিবর্তে কেবলমাত্র সমাজের অন্যান্য মানুষের স্বার্থ ও কল্যান কামনা করাই একমাত্র পরম লক্ষ্য ও চরম উদ্দেশ্য হওয়া উচিৎ। সমাজের সেবা ও কল্যানমূলক কাজের পিছনে নিজের স্বার্থের পরিবর্তে সমাজের অন্য সকল মানুষের স্বার্থের কথা চিন্তা করা চরম ও পরম কাম্য এবং নৈতিক দায়িত্ব ও কর্তব্য হওয়া উচিত। পরার্থবাদের লক্ষ্য হল পরের স্বার্থের জন্য নিজের সকল স্বার্থ জলাঞ্জলী দেওয়া।[২]

পরার্থবাদ আত্মস্বার্থবাদের মতই সাধারন স্বার্থ রক্ষা করতে ব্যর্থ হয়। ব্যক্তি যদি সব সময় নিজের স্বার্থ জলাঞ্জলী দিয়ে কেবল অন্যান্য মানুষের স্বার্থ সেবা করতে থাকে তাহলে এমন একদিন আসবে যখন নিজেদের স্বাস্থ্যসেবা ও পরিচর্যার জন্য অন্য কারো শরনাপন্ন হওয়ার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেবে এবং তখন তার পক্ষে পরের স্বার্থরক্ষা করার চিন্তা করা মোটেও সম্ভব হবে না। এরুপ পরার্থবাদী দৃষ্টিভঙ্গী অধিকাংশ ক্ষেত্রে ধর্মানুসারি ও মহিলাদের মধ্যে পরিলক্ষিত হয়। তারা অন্যান্য মানুষের সুখশান্তি ও স্বাস্থ্যের প্রতি এতবেশি যত্নবান হন যে, নিজেদের সুখ শান্তি ও স্বাস্থ্যের কথা বেমালুম ভুলে যান।এর ফলে যখন নিজেরা অসুস্থ হয়ে পড়েন তখন নিজেদের স্বাস্থ্য দেখাশোনা ও পরিচর্যার জন্য অন্যদের সাহায্যের শরনাপন্ন হতে বাধ্য হন।

সর্বস্বার্থবাদ বা সর্বাত্মকবাদঃ

নৈতিক সর্বস্বার্থবাদ অনুসারে প্রত্যেক ব্যক্তির কর্তব্য হচ্ছে সামগ্রিকভাবে নিজ সম্প্রদায়ভুক্ত সকল নাগরিকের স্বার্থ ও কল্যান কামনা করা।[৩] এটি একটি সমন্বয়ধর্মী নৈতিক মতবাদ। এ মতবাদ নৈতিক আত্মস্বার্থবাদ ও পরার্থবাদের মধ্যে সমন্বয় সাধন করার জন্য উভয় মতবাদের উপাদান সমূহের মধ্যে সমন্বয় করার চেষ্টা করে। এই মতবাদ বিশ্বাস করে যে, কেবল ব্যক্তি স্বার্থ চরিতার্থ করা বা ব্যক্তিস্বার্থ বাদ দিয়ে শুধু অন্যান্যদের স্বার্থ কামনা করা কোন ব্যক্তিরই কাম্য হওয়া উচিত নয় বরং ব্যক্তির

নিজের স্বার্থ ও কল্যান সহ সমাজের সকল স্বার্থ ও মঙ্গল কামনা করা একমাত্র লক্ষ্য হওয়া উচিত। সর্বস্বার্থবাদের পরিসর অনেক ব্যাপক ও বিস্তৃত। এ মতবাদের লক্ষ্য ও কর্তব্য হল নিজের স্বার্থ থেকে শুরু করে পরিবারের সকল সদস্যদের স্বার্থ, নিজ সম্প্রদায়ের সকল মানুষের স্বার্থ, দেশের নাগরিকদের স্বার্থ, এমনকি সকল চেতনা সম্পন্ন জীবের স্বার্থ ও কল্যানের দৃষ্টি রাখা।[৪]

সর্বস্বার্থবাদ যেভাবে সমষ্টিগত স্বার্থের ওপর জোর দিয়েছে তাতে ব্যক্তির মূর্ত ও সুনির্দিষ্ট স্বার্থের পরিবর্তে সমাজের বিমূর্ত স্বার্থ অনেক বেশি গুরুত্ব পেয়েছে যা মোটেই প্রত্যাশিত ও কাম্য নয়। আবার সমাজ ও সম্প্রদায়ের অধিক পরিমানে স্বার্থ ওকল্যান লাভের বিষয়টি অনিশ্চিত হয়ে পড়তে পারে। সমষ্টিগত ও সামগ্রিক স্বার্থ ও কল্যান চাইতে গিয়ে ব্যক্তি স্বার্থ প্রাধান্য পাওয়ার আশঙ্কা উড়িয়ে দেওয়া যায় না।[৫]

উপযোগবাদঃ

উপযোগবাদ অনুসারে, ন্যায় অন্যায় এবং বাধ্যতাবোধের একমাত্র মানদন্ড হচ্ছে উপযোগের সূত্র। এই মতবাদের সারকথা হল সর্বাধিক লোকের সর্বাধিক সুখ সাধন। কাজের পরিনতি ও ফলাফল যত অধিক পরিমানে উপযোগিতা বৃদ্ধি করতে পারবে কাজটি তত বেশি ভাল বলে পরিগনিত হবে। এর বিপরীত ফলাফল উৎপাদিত হলে কাজটি ভাল ও সঠিক বলে গন্য হবে না। কাজের পরিনতি ও ফলাফল যত বেশি কার্যকর ও ফলপ্রসূ হবে ততই কাজটির যথার্থতা ও গ্রহনযোগ্যতা বৃদ্ধি পাবে। বেন্থামের মতে এ সুখ পরিমানের দিক থেকে বেশি হলেই হবে। জন স্টুয়ার্ট মিলের মতে, শুধু পরিমানগত সুখ লাভই জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হতে পারে না, বরং সুখের পরিমানগত ও গুনগত উভয় প্রকারে সুখশান্তি ও কল্যান বৃদ্ধিই নীতিবিদ্যার মূল লক্ষ্য হওয়া উচিৎ। হেনরি সিজউইক- এর মতে,একমাত্র গড় সুখই প্রতিটি মানুষের জীবনের পরম কাম্য হওয়া উচিৎ।

বেন্থাম ও মিলের উপযোগবাদের ভিত্তি হল মনস্তাত্ত্বিক সুখবাদ। কাজেই মনস্তাত্ত্বিক সুখবাদের বিরুদ্ধে সব আপত্তিগুলিকে, বিশেষত দুটি আপত্তিকে এক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যায়ঃ ক)মানুষ যা প্রত্যক্ষ ভাবে কামনা করে তা সুখদায়ক বস্তু নয়, সুখদায়ক বস্তু প্রাপ্তিতে সুখ আপনি এসে হাজির হয়।[৬] খ) সুখকে পেতে হলে সুখকে ভুলতে হয়, সুখকে চিন্তা না করে সুখদায়ক বস্তুর চিন্তা করতে হয়।[৭] আবার বেন্থাম বিভিন্ন সুখের মধ্যে গুনগত পার্থক্য অস্বীকার করে মানুষের সুখকে পশুর সুখে পরিনত করেছেন। আর মিল সুখের গুনগত পার্থক্যকে স্বীকার করে সুখবাদের মূল ভিত্তিতে আঘাত করেছেন। গুনগত পার্থক্য সুখবাদ বহির্ভূত মানদন্ড।

ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণনের মতে মুক্তিই জীবনের একমাত্র লক্ষ্য এবং আধ্যাত্মিক জীবনের পূর্ণতা অর্জন এবং সমন্বয় সাধনের চেষ্টাই হল মুক্তির লাভের সাধন ক্রম।[৮] কিন্তু তিনি বিশেষ সতর্ক করে দিয়ে বলেছেন যে, এই সাধনা ব্যক্তি স্তরে সীমাবদ্ধ রাখা চলবে না। সে সাধনাকে সমাজ জীবনের সকল স্তরে প্রসারিত করতে হবে এবং আত্মমুক্তিকে সর্বমুক্তিতে পরিনত করতে হবে।

রাধাকৃষ্ণন মুক্তি লাভের উপায় সম্পর্কে তার "An Idealist view of Life" গ্রন্থে বলেছেন যে, মানুষ তখনই মুক্তিলাভ করবে যখন তার ব্যক্তিগত আত্মা সর্বজনীন আত্মায় পরিনত হয়। তবে এই কাজ খুব একটা সহজ নয়। লক্ষ লক্ষ মানুষের মধ্যে হয়তো একজনের ক্ষেত্রে এ উপলব্ধি থাকে। সাধনার ফলে মানুষ যদি শেষ পর্যন্ত এই মোক্ষলাভে সমর্থ হয়, তাহলে তাকে দীর্ঘদিন নিজস্ব স্বতন্ত্র বজায় রাখতে হবে। রাধাকৃষ্ণন বলেছেন "কেবলমাত্র অভ্যন্তরীন সমন্বয় সাধনকেই পূর্ণ মুক্তি বলা চলে না এক্ষেত্রে জাগতিক পরিবেশের সঙ্গে সমন্বয় সাধন প্রয়োজন। যারা পরাচৈতন্যের স্তরে এসে পোঁছেছেন, অন্যদের লক্ষ্যে পৌঁছাবার পথ প্রদর্শনের জন্য তারা একান্তে কাজ করে যান। আসল কথা পূর্নাঙ্গ সমাজ এবং আদর্শ মানুষের উদ্ভব একই সঙ্গে ঘটে থাকে।"[৯]

তাঁর মতে মানুষ যখন সিদ্ধিলাভ করে তখনবিশ্বের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। অনাবিষ্কৃত সূত্র শাশ্বত সত্য বিশ্ব জগৎ কে ভষ্মীভূত করে ফেলে। বিশ্বের গতি শেষ অধ্যায়ের সাথে প্রথম অধ্যায়ের সংযুক্তি সাধন ঘটে যায়। আদি ও অন্তের মিলন মুহূর্তে বিশ্বসত্তা অদ্বৈত সত্তায় পরিনত হয়। মানবাত্মার ক্রম বিকাশের উদ্দেশ্য হল সত্য- শিব- সুন্দরকে উপলব্ধি করা। পরমাত্মিক সত্তার সাথে সাযুজ্য লাভ করা। যখন আমরা সকলে মুক্তি লাভ করতে পারব,তখন আমরা বোধহয় পরিবর্তনশীল কালকে অতিক্রম করতে পারব। কিন্তু সর্বজনীন মুক্তি লাভের ব্যাপারটি খুব একটা সহজ নয়। রাধাকৃষ্ণন বারবার এই মুক্তি লাভের কথা বলেছেন। তিনি মনে করেন প্রত্যেক মানুষ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে মুক্তি আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত। হয়তো তার মননে এই আন্দোলন কোন ছাপ ফেলছে না, কিন্তু সে পরম মুক্তির দিকে ছুটে চলছে, প্রত্যেক মানুষের মনের ভেতরে এক ধরণের সংঘর্ষ চলছে। একদিকে জাগতিক বস্তুর প্রতি আকর্ষন অন্যদিকে পারমাত্মিক উপলব্ধির প্রতি আকাঙ্খা- এই দুই পরস্পর বিরোধী সত্তা মানুষকে দ্বিধাগ্রস্ত করে তোলে। মানুষের জীবনের শেষ পরিণতি সম্পর্কে রাধাকৃষ্ণনের বক্তব্য হল "প্রত্যেকেই যখন আভ্যন্তরীন স্ববিরোধীতা এবং পারিপার্শ্বিক জগতের দাসত্ব থেকে নিষ্কৃতি লাভ করবে, যখন সকল প্রকার বাহ্যিক অনুষ্ঠান পরিত্যক্ত হবে, তখন সকলের মধ্যে পরাচৈতন্যের জাগরন ঘটবে। এই ভাবে যেমন স্বর্গে আছে তেমনই পৃথিবীতে আত্মার রাজত্ব স্থাপিত হবে, পৃথিবী পরিনত হবে এক ব্রহ্মালোকে। তখন পূর্বগামী বা আদিকালের ঈশ্বর অনুগামী বা অনন্তকালের ঈশ্বরে পরিনত হবেন অর্থাৎ আদি অন্ত একাকার হয়ে যাবে।[১০]

(৩)

পাশ্চাত্য দর্শনে উল্লেখিত প্রত্যেকটি নৈতিক মতবাদে একজন ব্যক্তি মানুষ বা কয়েকজন মানুষ কীভাবে তার জীবন থেকে মুক্তি পেতে পারে বা তাদের জীবনের মূল বা পরম লক্ষ্য কী তা নিয়ে আলোচিত হয়েছে। যেমন, আত্মস্বার্থবাদ অনুযায়ী মানুষের জীবনের লক্ষ্য হল কেবল নিজের স্বার্থরক্ষার চেষ্টা করা। পরার্থবাদ অনুযায়ী নিজের স্বার্থের পরিবর্তে কেবল মাত্র সমাজের অন্য সকল মানুষদের স্বার্থরক্ষা করা। আর উপযোগবাদ অনুযায়ী মানুষের জীবনের লক্ষ্য হল, সর্বাধিক মানুষের সর্বাধিক সুখ অন্বেষন করা। মতবাদ গুলির কোনটিতেও সকল মানুষের মূল লক্ষ্য বা পরম লক্ষ্য কি হওয়া উচিৎ তা আলোচিত হয়নি। এদিক থেকে ডঃ সর্বপল্লি রাধাকৃষ্ণনের সর্বমুক্তিবাদ একটি আদর্শ মানদন্ড রূপে গন্য হতে পারে। কারন মতবাদটির মূল লক্ষ্য হল প্রত্যেকটি মানুষের মুক্তি। তার মতে একক ব্যক্তি হিসাবে মোক্ষ লাভ কখনোই মানব জীবনের লক্ষ্য নয়, যখন একক ব্যক্তি মোক্ষলাভে সক্ষম হয়, তখনও তার কাজ সম্পূর্ন হয় না। তখন তাকে অন্যের মোক্ষ লাভে সহায়তা করতে হয়।

গ্রন্থপঞ্জী

১. প্রায়োগিক নীতিবিদ্যা – এ.এস.এম আব্দুল খালেক, পৃষ্ঠা – ৬৬
২. তদেব, পৃষ্ঠা – ৭০
৩. তদেব, পৃষ্ঠা – ৭১
৪. তদেব, পৃষ্ঠা – ৭২
৫. তদেব, পৃষ্ঠা – ৭২
৬. তত্ত্বগত নীতিবিদ্যা ও ব্যবহারিক নীতিবিদ্যা, ডঃ সমরেন্দ্র ভট্টাচার্য, পৃষ্ঠা ৯১
৭. তদেব, পৃষ্ঠা – ৯১
৮. জ্ঞানযোগী সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন, সুশান্ত কুমার সাহিত্যরত্ন পৃষ্ঠা ২৫
৯. শিক্ষাগুরু ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন, অলোক কুমার সেন, পৃষ্ঠা – ৭৮
১০. তদেব, পৃষ্ঠা – ৭৮
১১. An Idealist view of Life,Sarabapalli Radhakrishnan.

‘নতুন ইহুদী’ : উদ্বাস্তু সমস্যার বাস্তব প্রতিরূপ

শিল্পী অধিকারী
গবেষক, বাংলা বিভাগ,
বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপঃ ১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দ দেশের ইতিহাসে একই সঙ্গে সুখের এবং বিষাদের। বহু প্রত্যাশিত স্বাধীনতা এল, কিন্তু স্বদেশকে বিভাজিত করে। নিজের দেশেই সংখ্যালঘুরা হয়ে ওঠে ভিনদেশি। ‘উদ্বাস্তু’ উপাধি মাথায় নিয়ে কেউ প্রাণ হাতে, কেউবা জমি-বাড়ি বিক্রি করে, আবার কেউবা জমি-বাড়ি বিনিময়ের মধ্যে দিয়ে দেশ ছাড়তে বাধ্য হয়েছিল। ভিনদেশে অন্ন ও মাথা গোজানোর ঘরটুকু পর্যন্ত তাদের কাছে ছিল না। সংসার চালাতে একদিকে যেমন পুত্র সন্তানদের মজুর, কুলিগিরি, হকারি ইত্যাদি কাজ করতে হয়েছিল, তেমনি কন্যা সন্তানরা অন্যের বাড়ির দাসীবৃত্তির কাজ করতে বাধ্য হয়। অনেক ঘরের মেয়েকে সংসারের মুখ চেয়ে নিজের আত্মসম্মান বিসর্জন দিতে বাধ্য হতে হয়। পূর্ব বাংলা থেকে আগত এক সাজানো পরিবার কীভাবে অভাবের তাড়নায় ধীরে ধীরে পতিত হয়েছে তারই চিত্র সলিল সেনের ‘নতুন ইহুদী’ নাটকে উঠে এসেছে। সংস্কৃত পণ্ডিত মনোমোহন ভট্টাচার্যের পরিবার এবং প্রতিবেশী নমঃশূদ্র কেষ্টর পরিবার কীভাবে নিজেদের ঘর-বাড়ি ছেড়ে ভিনদেশে ‘উদ্বাস্তু’ জীবন অতিবাহিত করেছে তারই সার্থক পরিচয় আলোচ্য নাটক।

সূচক শব্দ : ১) বঙ্গভঙ্গ ২) দেশভাগ ৩) উদ্বাস্তু সমস্যা ৪) নমঃশূদ্র ৫) ইহুদী ৬) গ্র্যাচুইটি।

মূল আলোচনা : বিশ শতকের প্রথমার্ধে বাংলার উপর নেমে আসে দু-বার বিচ্ছেদের ছায়া। ১৯০৫ খ্রিষ্টাব্দে বঙ্গভঙ্গ এবং ১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দে দেশভাগ। কিন্তু আন্দোলনের চাপে ১৯১১-তে ব্রিটিশ সরকার বঙ্গভঙ্গ রদ করতে বাধ্য হয়। তবে ১৯৪৭-এ বাংলা দ্বি-খণ্ডিত হয়— ভারতের অধীনে পশ্চিমবঙ্গ এবং পাকিস্তানের অধীনে পূর্ববঙ্গ (বর্তমান বাংলাদেশ)। ব্রিটিশরা দেশ ছেড়ে যাওয়ার আগে যেন হৃদয়কে দু-খণ্ডে ভাগ করে দিয়ে গেল। পূর্ব পাকিস্তান (বাংলাদেশ) মুসলিম প্রধান রাষ্ট্র হিসেবে ঘোষিত হল। ফলে নিজ জন্মভূমিতেই হিন্দুরা অ্যাখ্যা পেল বিদেশি হিসেবে। বর্বর পাকিস্তান সেনাদের অত্যাচারে তারা অনুভব করতে লাগল নিরাপত্তাহীনতা। একদিকে যেমন স্বাধীনতার আনন্দে দেশের মানুষ মেতে উঠল, অপরদিকে সাধারণ সংখ্যালঘু হিন্দু ও মুসলিম অনেকের জীবনে নেমে এল চরম সঙ্কট, এই সঙ্কট পরাধীনতার। আর এই পরাধীনতা নিজের জন্মভূমি থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার সমার্থক। যার জন্য কাতারে কাতারে মুসলিম মানুষ যেমন ভারত থেকে পূর্ব বাংলায় চলে গিয়েছিল, তেমনি বিপুল সংখ্যক বর্ণ হিন্দুরা আশ্রয় নিতে লাগল ভারতের মাটিতে। ভারতে বিভিন্ন জায়গায় তাদের জন্য তৈরি হল

উদ্বাস্তু শিবির। অনেকে আবার রেল লাইনের ধারে, রেল স্টেশনে নিজেদের সুবিধা মত আশ্রয় নেয়। আগত শরণার্থীরা নিজেদের ভিটেমাটি বিক্রি করে, কেউবা ভিটেমাটির মায়া ত্যাগ করে, আবার কেউ আদান-প্রদানের মাধ্যমে নিজেদের বেঁচে থাকার লড়াই শুরু করে। উদ্বাস্তুর শিরোপা নিয়ে শুরু হল তাদের কঠিন জীবনসংগ্রাম। ক্ষুধা, তৃষ্ণা, নিদ্রাহীনতা, রোগ-ব্যাধি, অপমান, হতাশা হয়ে উঠল তাদের চিরসঙ্গী। দেশের এই স্বাধীনতা সকলের কাছে মিষ্টতার স্বাদ নিয়ে আসেনি, অনেকের কাছেই তা তিক্ততায় পরিণত হয়েছে। স্বাধীনতার নামে তাদের ভাগ্যে জুটেছে কঠিন সংগ্রাম। এ সংগ্রাম বেঁচে থাকার, পেটের জ্বালার, সম্মান রক্ষার। অন্নদাশঙ্কর রায় 'খুকু ও খোকা' নামক ছড়ায় তৎকালীন রাজনৈতিক নেতাদের দেশভাগের কথা ব্যঙ্গ করে বলেছেন—

"তেলের শিশি ভাঙল বলে
খুকুর পরে রাগ করো
তোমরা যে সব বুড়ো খোকা
ভারত ভেঙে ভাগ করো!
তারবেলা?"[১]

খণ্ডিত ভারতবর্ষের এই মর্মান্তিক ট্র্যাজিক ইতিহাসের ছায়াপাত ঘটেছে সাহিত্যের নানা ধারায়। বাংলা সাহিত্যের এমন কোনও দিক নেই যেখানে দেশভাগের করুণ বাস্তব ছবি চিত্রিত হয়নি। দেশভাগের ফলে সাধারণ সংখ্যালঘু মানুষের করুণ পরিণতি, উদ্বাস্তু সমস্যার এক জীবন্ত দলিল সলিল সেনের 'নতুন ইহুদী' (১৯৫৩) নাটক। প্রসঙ্গত সমালোচকের মত—

"রাজনীতির উপরতলার দেনাপাওনার দরকষাকষি চলে, কালির আঁচড়ে চুক্তির সাক্ষ্য থাকিয়া যায়। কিন্তু সেই কালির আঁচড়ে যে নীচেকার লোকগুলির হৃদয় রক্তের রেখা হইতে উঠে তাহা প্রতিমুহূর্তেই তাহারা বিক্ষত জীবনের মধ্যে অনুভব করিয়া থাকে। স্বাধীনতার রথ আসিল বটে; কিন্তু তাহা দেশের মাটিকে দুই ভাগ করিয়া আমাদের মিলিত জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষা গুঁড়াইয়া দিয়া এক অনিশ্চিত অন্ধকারাচ্ছন্ন ভবিষ্যতের দিকে আমাদের সুস্থিত সংসারগুলিকে নিক্ষেপ করিল। ছিন্নমূল নর-নারীরা মাটির মায়া ত্যাগ করিল কিন্তু পুনরায় স্বাধীন মাটির সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করিতে পারিল না। তাহাদের সংসার ছিন্ন হইল, মনুষ্যত্ব লুপ্ত হইল, জীবনের সর্বপ্রকার আশা-ভরসা নিশ্চিহ্ন হইয়া গেল। এই ভাগ্যহীন উদ্বাস্তু জীবনের এক নিদারুণ বাস্তব চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে আলোচ্য নাটকটিতে।"[২]

উদ্বাস্তু সমস্যাকে এক মধ্যবিত্ত পরিবারের মধ্য দিয়ে তুলে ধরেছেন নাট্যকার সলিল সেন। পূর্ব পাকিস্তানে বসবাসকারী মনোমোহন ভট্টাচার্য দেশভাগের কারণে নিজের ভিটেমাটি বিক্রি করে সামান্য কিছু অর্থ নিয়ে এক অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে পা বাড়ায়। তাদের শিয়ালদা স্টেশনে এসে উদ্বাস্তুরূপে বসবাস, টিকে থাকার লড়াই ও

নিজের আত্মসম্মান বিসর্জন ইত্যাদি এই নাটকের মূল বিষয়। পাশাপাশি নাট্যকার দেখিয়েছেন কিছু অর্থলোভী মানুষ কীভাবে এইসব অসহায়দের যথাসর্বস্ব ছিনিয়ে নিয়ে লাভবান হতে থাকে। ভাগ্যের পরিহাসে এবং সমাজের কঠোরতার চাপে কীভাবে এই অসহায় মানুষেরা নিঃস্ব থেকে নিঃস্বতর হয়। অভাবের তাড়নায় কাউকে বেছে নিতে হয় চুরির পথ, আবার কেউবা শিক্ষিত হয়েও বেছে নেয় সামান্য হকারি। শিক্ষক ও চাষি সমভাবে নেমে আসে পথে। ঘরের মেয়েকে হতে হয় বেআব্রু। নিজের আত্মসম্মান জলাঞ্জলি দিয়ে দেহ ব্যবসাকেই বেছে নিতে হয় পরিবার রক্ষার্থে। চাষি পরিণত হয় শ্রমিকে এবং ঘরের বধূকে করতে হয় অন্যের বাড়ির দাসীবৃত্তি। নানান সংকটময় পরিস্থিতির দোলাচলতায় নাট্যকার পাঠক ও দর্শকের মনকে ভারাক্রান্ত করে তুললেও পরিণতিতে এক আশার আলো দেখান। সেই আলো দেখতে পাই মোহনের মধ্য দিয়ে। ভাগ্যের নিদারুণ পরিণতির গোলামি অস্বীকার করে সুস্থ-স্বাভাবিকভাবে বেঁচে থাকার প্রতীক মোহন। যদিও মোহনকে এক সময় ভাগ্যের নিদারুণ চাপে ভেঙে যেতে দেখা যায়। কিন্তু নাট্যকার আশাবাদী তাই শেষ পর্যন্ত মোহনের অন্তরের প্রজ্জ্বলিত আগুন উজ্জীবিত করে তুলেছেন। কেবলমাত্র অসহায় পরিণতি দেখিয়ে চুপ থাকেননি। স্বার্থলোভী, অর্থলোভী, যে সকল মানুষ এই অসহায় নিঃস্ব সাধারণ মানুষদের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলেছে তাদের শাস্তি দাবি করেছেন। শোষক ও ভাগ্যকে পরাজয় করার বার্তা দিয়েছেন নাটকের সমাপ্তিতে। সমকালীন কঠিন বাস্তব সত্যের নাটক ‘নতুন ইহুদী’। দেশ বিভাগের ফলে যে উদ্বাস্তু সমস্যা তৈরি হয় নাট্যকার তাদেরই ‘নতুন ইহুদী’ বলে সম্বোধন করেছেন। হিটলারের অত্যাচারে যেমন জার্মান থেকে ইহুদীদের উদ্বাস্তু হতে হয়েছিল। নাট্যকার সেই ভয়াবহ পরিস্থিতির সঙ্গে পূর্ব পাকিস্তানে অত্যাচারিত সংখ্যালঘু মানুষদের তুলনা করে নাটকটির নাম রেখেছেন ‘নতুন ইহুদী’।

কাহিনির শুরুতেই দেখি পূর্ব পাকিস্তানের অন্তর্গত মধ্যবিত্ত হিন্দু ব্রাহ্মণ পরিবারকে। যারা দেশভাগের ফলে নিজের ভিটেমাটি বিক্রি করে পশ্চিম বাংলায় চলে আসে। মনোমোহন ভট্টাচার্য পেশায় সংস্কৃতের শিক্ষক। কিন্তু দেশভাগের ফলে বিদ্যালয়ে সংস্কৃত ভাষা উঠে যাওয়ায় তাকে বরখাস্ত করা হয়। তাই হাতে সামান্য কিছু সম্বল এবং বাড়িঘর বিক্রির টাকা নিয়ে তিন সন্তান ও স্ত্রীর হাত ধরে দেশ ত্যাগ করে। পূর্ব বাংলায় অনেকেই এই পরিস্থিতিতে জন্মভূমি ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিল। নাটকের চরিত্র কেষ্ট-গিন্নির কথাতেই তা স্পষ্ট, “ভদ্দর লোক বেক্‌টিতো পাকিস্থান হইছে— কইয়া, পিট্‌টান। পাকিস্থানে কি ডর্‌রে মশয়? তোমাগো, তিন ঘরের মইধ্যে মুখুইজ্যা বাড়ীর তো চুপ্‌চাপ্‌ পিট্‌টান্‌ দেওনের মতলব। পালেগো পোলারা দুইজন ছাড়া বেক্‌টিরে পাঠাইয়া দিছে। বাকী তোমরা গো!”[৩]

মনোমোহনের পরিবারের সঙ্গ নেয় গ্রামেরই নমঃশূদ্র চাষি কেষ্ট ও তার স্ত্রী। কিন্তু অনেকেই এই হঠাৎ বিচ্ছেদ পরিস্থিতিকে মেনে নিতে পারেনি। এতদিন একসঙ্গে যাদের সঙ্গে সুখে বাস ছিল, বন্ধু আত্মীয়-স্বজনকে ছেড়ে যেতে তাদের মন সায় দেয়নি।

অপরদিকে বাঙালি মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষ জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে পাশাপাশি অবস্থিত হিন্দু মানুষকেও শেষ বিদায় জানিয়েছে অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে। এই নাটকে মির্জা সেইসব মানুষের প্রতীক। মির্জা মনোমোহনের প্রকৃত বন্ধু, একই স্কুলে কর্মরত। মীর্জা এই দেশ বিভাগ মেনে নিতে পারেনি। তাই মোহনকে সে দেশ সম্পর্কে এক সম্প্রীতির বার্তা দিয়ে বলেছে—

> "দেশ কথাটা মোহ নারে, দেশ মাইন্‌ষের মনে, জমির উপুর দেওয়াল তুলছে—মনে য্যান তুলতে না পারে। মাইন্‌ষেরে অবিশ্বাস করিস্‌না, ভালবাইসা যেন মাইন্‌ষেরে জয় করতে পারস্ এই আশীর্ব্বাদই করি। আমার মনে তগ লেইগ্যা জায়গা রইল—কসম খা বেটা, আমার বুক ছুঁইয়া কসম্ খা—কইয়া যা, তরা আবার ফিরা আবি। আমার পোলায় আর তুই লড়াই কইরা বাইচা বইরতা থাকবি—আমারে জবান দিয়া যা, কসম্ খাইয়া যা বেটা—"[৪]

একদিকে দেখা যায় সম্প্রীতির বাণী অন্যদিকে তেমনি হিন্দু-মুসলিম বিদ্বেষ। দেশভাগের দিন স্কুল কমিটির প্রেসিডেন্ট বক্তৃতায় বলেন দেশভাগ না হলে নাকি মুসলিমরা হিন্দুদের হাতে পরাধীন থাকত। দেশ বিভাগের ফলে সংখ্যালঘু হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে এক ভীতি কাজ করছিল। আধিপত্য বিস্তার, একের উপর অন্যের অত্যাচার, সম্পত্তির মালিকানা প্রভৃতি ক্ষেত্রে নিজের অধিকারের টানাপোড়েনের মধ্যে দলে-পিশে এক অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে পা বাড়ানোই একমাত্র উপায় মনে করেছিল। আর এই কঠিন বাস্তব সম্পর্কে অবগত হওয়ার প্রেক্ষিতেই তাদের এই সিদ্ধান্ত। কেষ্ট নিজের বাড়ি বিক্রি করে বসির মিঞা ও মান্নান আলির কাছে। কিন্তু তারা শুধুমাত্র বায়না দিয়েই কেষ্টর বাড়ি দখল করতে আসে। ভবিষ্যত অরাজকতার হাত থেকে নিজেদের রক্ষার্থে ব্রাহ্মণ পরিবার ও নমঃশূদ্র পরিবার কলকাতার শিয়ালদহ স্টেশনে আশ্রয় নেয়। এখানে এসে তারা 'উদ্বাস্তু' রূপে পরিগণিত হয়। নানা সংকটের মধ্যে তাদের দিন কাটাতে হয়। মনোমোহন কাজের সন্ধানে বারংবার ব্যর্থ হয়। পদে পদে অপমানিত হতে হয় তাকে। কিন্তু নিজের সম্মান সম্পর্কে সচেতন মনোমোহন শহীদ পরিবারের হয়ে সরকারি সাহায্য প্রার্থনা করেনি, প্রতীক্ষা করেছে ন্যায্য পাওনা গ্র্যাচুইটির টাকার। কিন্তু তাকে নিজের আত্মসম্মান জলাঞ্জলি দিতে হয়েছে পেটের দায়ে। সামান্য হালুইকরের কাজ করতে হয়েছে উপার্জনের তাগিদে। সেখানেও অপমানিত হয়েছে কিছু খাবারের জন্য। পূর্ববঙ্গে বাসকালে বহু লোককে সে আনন্দে খাইয়েছে। সেইসব দিনের কথা মনে করে সে হতাশায়, দুঃখে, ক্ষোভে নিজের পরিস্থিতির কথা ভেবে বলেছে— "কত দিন কত লোকেরে আনন্দে খাওয়াইছি— খাইতে না পারলে বাইন্ধা দিছি। সেই সব দিন বেশী পুরান হয় নাই— বেশী পুরান হয় নাই। কিন্তু সেই ছান্দা—সেই অন্ন যে এত চোখের জলে কিনতে লাগবো, ভাবতেও

পারি নাই। সেই ভাত যে এত নোনা— সেই ভাতে যে এত জ্বালা—”[৫] দেশভাগের অভিঘাতে নিষ্ঠুর পরিস্থিতির চাপে একটি সুন্দর সাজানো পরিবার ধ্বংসের মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে। যেখানে না আছে স্বপ্ন, না আছে আনন্দ। আছে কেবল হতাশা, নিরাশা, খাদ্য যন্ত্রণা, টিকে থাকার কঠিন লড়াই। পরিবারের মানুষগুলোকে বাঁচিয়ে রাখতে সেইসমস্ত নিঃস্ব পিতার প্রতীক মনোমোহনের জীবনসংগ্রাম।

দেশভাগের ফলে তৎকালীন নারীদের অবস্থান কেমন ছিল, তার সার্থক নিদর্শন পরী। সে সেইসব মেয়ের প্রতীক, যারা দ্বি-খণ্ডিত বাংলার কড়াল কষাঘাতে নিজেদের আত্মসম্মান বলি দিতে বাধ্য হয়েছে। চোখের সামনে ভেঙে যাওয়া সুন্দর পরিবারের মানুষগুলির নিত্যদিনের অসহায়তার চিত্র তার মনকে ভারাক্রান্ত করে। চারিদিকের অজস্র হিংস্র নারীলোলুপ দৃষ্টির সামনে বারবার তাকে বেআব্রু হতে হয়েছে। অভাবের তীব্র যন্ত্রণায় লজ্জা নিবারণের শাড়ির অভাবে অপমানিত হতে হয়েছে রাস্তার পুরুষের কাছে। বারবার নোংরা প্রস্তাব শুনতে হয়েছে অসৎ দালাল যতীনের মুখে, “তুমি রাজী হ’লে বড়বাবু তোমায় মাথায় করে রেখে দেবেন। মোটর, রেডিও, কলের-গান, ফার্ণিচার স—ব হবে। আপাদমস্তক জড়োয়ায় মুড়ে দেবেন। চাকর-চাকরাণীর মাথায় পা দিয়ে বেড়াবে। শুধু তুমি যদি রাজী হও।—কি হবে ভিখিরী-বস্তীতে পড়ে’ থেকে—”[৬] আপনজনের কাছে শুনতে হয়েছে পরিবারে তার উপস্থিতির অপ্রয়োজনীতা। তাই সে আক্ষেপ করে বলেছে, “মায়ের মনে ধারণা, আমি একটা গলার কাঁটা ছাড়া আর কিছু না। বাবায় মরতে বইসাও আমার চিন্তায় শান্তি পাইতাছে না। মেজদায় বোকার মত আমার ভাল করণের লেইগা মরতে বইছে। পেটে ভাত নাই। পরণের কাপড় ছিড়া— ভিক্ষা আর মিথ্যা ধার আইনা আমি পাড়ার লোকের কৃপার জীব।”[৭] এই অসহায় শিক্ষক পিতার মেয়ে নিজের সম্মান সম্পর্কে সচেতন তাই তো নারী ব্যবসার দালাল যতীনের কুপ্রস্তাবে পরী বলেছে, “ছিঃ ছিঃ!—আপনে এত নীচ! মাথার উপুর ভগবান আছেন, আপনের কি পাপের ভয়ও নাই? আপনেরে আমি দাদার মত বিশ্বাস করতাম, ভাবছিলাম, আপনে ভদ্রলোকের ছেলে! আপনে যান—যান—গেলেন?”[৮] কিন্তু অসহায় এই নারী পরিবারকে বাঁচাতে শেষ পর্যন্ত যতীনের দেখানো অন্ধকার রাস্তায় চলে গেছে সমস্ত কিছুকে পিছনে ফেলে। পরী কোনও কল্পনার পরী নয়—এই পরী বাস্তবের। যাকে পরিবারের রক্ষার্থে নিজেদের আত্মবলিদান দিতে বাধ্য হতে হয়েছে ভাগ্যের নিদারুণ কষাঘাতে।

অসহায় পরিবারের আর এক সদস্য দুইখ্যা, তার মৃত্যু ঘটে ট্রামে চাপা পড়ে। ভাগ্যের নিদারুণ পরিহাস তাকে নিয়ে গেছে অসৎ পথে। সে পরিবারের অভাব দূর করতে চুরির পথ বেছে নিয়েছিল। দুইখ্যার কথাতেই স্পষ্ট, সেইসময় বহু মানুষ খাবারের জন্য চুরির পথ অবলম্বন করেছিল এবং তাতে তাদের কোনো অনুশোচনা নেই— “হঃ ফিরৎ দিয়া আয়! আমি যেন একলা চুরি করছি,—আর এক দোকানেই চুরি হইছে কিনা? ফিরৎ দিমু কারে...? বেবাকে যার যার মনে বাসায় লইয়া গেল—অখন

আমি যাই ফিরৎ দিতে—”[৯] খাদ্যাভাব মানুষকে এমন পর্যায়ে নামিয়ে আনে যেখানে নীতিজ্ঞান হয়ে যায় তুচ্ছ। পেটের জ্বালা তাদের চুরির পথ দেখায়। উদ্বাস্তু, যাদের নাট্যকার নাম দিয়েছেন ‘ইহুদী’ তারা অনেকেই এই সহজ পন্থা বেছে নিয়েছিল। আবার অনেকেই সৎ পথে টিকে থাকার কঠিন লড়াই করে গেছে। নাটকে মোহন তার প্রতীক। সে নিজের পরিবারকে বাঁচাতে সামান্য মুটেগিরির কাজ করেছে। কিন্তু একটা সময় অভাবের তীব্র কষাঘাত তাকে নীতি শূন্য করে ধর্মঘট হওয়া কারখানার কাজ নিতে বাধ্য করেছে। প্রচলিত সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে সে প্রতিবাদ করে বলেছে—

> “আইজ অর্থলোভীগো কাছ থেইকা বেশী টাকার ঘর ভাড়া নিয়া আমরা তার ভাড়া দিতে পারিনা, প্রমাণ হয় আমরা চোর—আমরা নীতিহীন। কথায় কথায় আমরা আমাগো ছাইড়া-আসা ঐশ্বর্যের তুলনা দেই; অথচ এইখানকার দোকানদার পাওনাদার গো টাকা না দিতে পাইরা পলাইয়া বেড়াই—আমরা নীতিবিবর্জ্জিত। আমাগো ছোট ছোট ছেলেরা পকেট কাটে, পড়াশুনা করে না—ট্রামে-বাসে বিনা পয়সায় চুরি কইরা চড়ে—আমাগো বউ-ঝিরা বেআব্রু হইয়া রাস্তায়, দোকানে, হাটে, বাজারে উদরান্নের সংস্থানের লেইগা সৎ অসৎ নানা রকম গোপন বৃত্তি গ্রহণ করে, প্রমাণ হয় আমরা ইতর—আমরা নীতিহীন। আমরা সক্ষম পুরুষেরা এইরকম বিশ্বাসঘাতকতা কইরা চাকরীর চেষ্টা করি—তাই আমরা নীতিহীন। কিন্তু কেন?”[১০]

শেষ পর্যন্ত শ্রমিক ধর্মঘট হওয়া কারখানার কাজে মোহন যোগ দিতে পারেনি। সে সামান্য হকারি করেছে। অভাবের তাড়নায় মোহনের নীতিজ্ঞান দিক্‌ভ্রান্ত হয়ে গেলেও সৎ রাজনৈতিক কর্মী মহেন্দ্র সেই ভুল পথ থেকে তাকে ফিরিয়ে এনেছে। ছিন্নমূল যুবককে আশার আলো দেখিয়েছে মহেন্দ্র। ধ্বংসপ্রাপ্ত ছিন্নমূল অসহায় পরিবারগুলোকে একত্রিত করে প্রতিবাদী হওয়ার কথাও বলেছে মহেন্দ্র— “যেমন করে বাস্তুহারারা নিজেদের ক্ষমতায় পতিত জমি করেছে দখল। পতিত জায়গায় পত্তন করেছে নিজের ঘরের। সেই ঘোর ভাঙ্গতে কায়েমী স্বার্থের জুলুমবাজরা গেছে, লাঠিয়াল গেছে, কিন্তু জোর করে যারা নিজেদের দাবীকে প্রতিষ্ঠিত করেছে, তাদের কাছে মাথা নীচু করে হটে এসেছে অত্যাচারীর দল। পথের ইঙ্গিত সেই দিকে। সঙ্ঘবদ্ধ হোন, নিজেদের দাবী সম্বন্ধে সচেতন হোন। নিজেদের দাবীকে সুপ্রতিষ্ঠিত করুন।”[১১]

দেশভাগের হঠাৎ পরিস্থিতির চাপে মানুষগুলোকে এক ভয়ংকর পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হল। একদিকে যেমন নতুন দেশ নতুন জায়গায় নিজেকে টিকিয়ে রাখার প্রবল চেষ্টার মুখোমুখী হতে হল, অন্যদিকে তেমনি কিছু ঠকবাজ মানুষের হাতে পড়ে আরও সংকটময় হয়ে উঠল তাদের জীবন। কেষ্টর শেষ সম্বলটুকু কম দামের জমির লোভ দেখিয়ে লুঠ করে নেয় কিছু ঠকবাজ। মনোমোহনকে বাড়ির ভাড়া ছাড়াও দিতে

হয় উপরি অনেক টাকা। স্বার্থবাদীরা এইসব অসহায় নিঃস্ব মানুষদের ঠকিয়ে নিজের পুঁজির ওজন বাড়াতে থাকে। নিষ্ঠুর সমাজে দলিত-নিপীড়িত হতে হয় অসহায় গরিব মানুষদের। নাটকে এই চিরন্তন সত্যের কথাই উঠে এসেছে ভিখুয়ার গানে—

"হাম গরিবোঁকা কেয়া দুনিয়া
দুনিয়া পয়সেবালে কো।।
...হাম মজলুমোঁকো কেয়া দুনিয়া
দুনিয়া পয়সেবালে কো...।"[১২]

নাটকে দুঃখভোগী মানুষগুলোর চরম বেদনা থাকলেও এই নিষ্ঠুর পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের কথা নাট্যকার বলেছেন। নিজের অসহায় পরিস্থিতির জন্য ভাগ্যকে দোষারোপ না করে বা হার না মেনে সংঘবদ্ধ হয়ে প্রতিবাদের কথা নিজের জায়গা ছিনিয়ে নেওয়ার বার্তা দিয়েছেন। ভিখুয়ার মুখে শোনা যায় সেই একত্রিত হওয়ার কথা, "ইসি লিয়ে হম কইতে হ্যয়—ছোটঠাকুর ডরো মৎ। দুঃখকে সাথ লড়ো—নসীবকে সাথ লড়ো—আগে কদম রাখখো, লড়াইমে হঠো মৎ। মরণে হো তো শেরকা তরাহ্ মরো—বলিদান কা বিশ্বাসী—বারোঁ মরো, আউর অমর বন যাও!"[১৩]

দেশভাগের করুণ কাহিনিকে সলিল সেন 'নতুন ইহুদী'তে সুন্দরভাবে বর্ণনা করেছেন। নাট্যকারের জীবন প্রসঙ্গে সমালোচকের মত উল্লেখ করে প্রসঙ্গ শেষ করব—

> "বাংলা নাট্য সাহিত্যে সলিল সেনের একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। তাঁর আবির্ভাব দেশ বিভাগের বিপর্যস্ত সমাজের মধ্যে। সে কারণে সমাজমূলে প্রোথিত সংঘাতমুখর জীবনের জয়-পরাজয় তাঁর নাটকে আশা-ভঙ্গের আর্তনাদে অন্তর্ভেদী। সংসার সংগ্রামের দুঃসহ যন্ত্রণা সামাজিক বিপর্যয় ও বীভৎসতা সংক্রান্ত। অবক্ষয়িত সমাজ, শহর ও সভ্যতার প্রতি নাট্যকারের দৃষ্টিনিবদ্ধ। অস্থির অনিশ্চিত পরিবেশে জীবন ও জীবিকার প্রচণ্ড সংগ্রাম, পারিপার্শ্বিক নিরর্থকতা ও ব্যর্থতার সঙ্গে পাপ এবং দুঃখ যোগ করে তিনি জীবনের যোগফল সম্পন্ন করেছেন। উত্তেজিত আবেগ থেকে নাটকগুলি সৃষ্টি হওয়ার ফলে আধুনিকতা অপেক্ষা সমকালীনতাই বেশি প্রত্যক্ষ হয়। সলিল সেন আধুনিক নন—সমকালীন। সমকালীন জীবনের নাট্যকার তিনি।"[১৪]

তথ্যসূত্রঃ

১. রায়, অন্নদাশঙ্কর, ছড়া সমগ্র, বাণীশিল্প, চতুর্থ পরিবর্ধিত সংস্করণ, জানুয়ারী ২০০৩; পৃ ৪৯।
২. ঘোষ, ড. অজিতকুমার, বাংলা নাটকের ইতিহাস, দে'জ পাবলিশিং, পঞ্চম সংস্করণ, আশ্বিন ১৪২৩, পৃ ৩৯৫।

৩. সেন, সলিল, নতুন ইহুদী, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা—৭৩, দ্বিতীয় দে'জ সংস্করণ ২০১১, পৃ ২১।
৪. তদেব, পৃ. ৩১।
৫. তদেব, পৃ. ৫৩।
৬. তদেব, পৃ. ৭৭।
৭. তদেব, পৃ. ৮৪।
৮. তদেব, পৃ. ৭৭।
৯. তদেব, পৃ. ৪৩।
১০. তদেব, পৃ. ৬৪।
১১. তদেব, পৃ. ৬৫—৬৬।
১২. তদেব, পৃ. ৬১।
১৩. তদেব, পৃ. ৮৯।
১৪. চন্দ্র, ড. দীপক, বাংলা নাটকে আধুনিকতা ও গণচেতনা, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা—৭৩, পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত প্রথম দে'জ সংস্করণ ১৯৯৪, পুনর্মুদ্রণ ২০১৬, পৃ. ২৩৬—২৩৭।

মতি নন্দীর ‘ননীদা নট আউট’ : ময়দানি সমাজের ক্রাইসিস

মহঃ রেজ্জাক আনসারি
গবেষক, বাংলা বিভাগ, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়

সারমর্ম: সাহিত্য তার বহুধাবিস্তৃত ডালপালার প্রসার ঘটিয়েছে নানা ভাবে। এই সাহিত্যরূপ বিশাল বৃক্ষের একটি অংশ হল খেলা বিষয়ক সাহিত্য বা ক্রীড়াসাহিত্য। বাংলা ভাষায় এই বিশেষ ধারাটি শুরু করেছিলেন বিনয় মুখোপাধ্যায়, বেরী সর্বাধিকারী, শঙ্করীপ্রসাদ বসু, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, রণজিৎ সেন প্রমুখ। তবে এই ক্ষেত্রটিতে যথেষ্ট জনপ্রিয়তা লাভ করেছিলেন মতি নন্দী। তিনি তাঁর দীর্ঘ সাহিত্যজীবনে খেলা বিষয়ক বহু উপন্যাস, ছোটগল্প, প্রবন্ধ রচনা করেছেন। এরমধ্যে একটি অন্যতম জনপ্রিয় উপন্যাস হল ‘ননীদা নট আউট’(১৯৭১)। ৮টি পরিচ্ছেদে বিভক্ত এই উপন্যাসটিতে খেলার অন্দরমহলের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি সুন্দরভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। তৎকালীন ক্রিকেট ক্লাবগুলির করুণ অবস্থার কথা, ক্লাবের খেলোয়াড়দের অভাব-অনটন, দারিদ্র-দুর্দশার কথা মতি নন্দী এই উপন্যাসে সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরেছেন। ক্লাবগুলির অবলুপ্তি আটকাতে দুঃস্থ প্রতিভাবান খেলোয়াড়দের নানা রকম প্রলোভন দেখিয়ে ক্লাবে ধরে রাখার মত ঘটনাও এখানে বর্ণিত হয়েছে। অপরদিকে ক্লাবের প্রতি ননীদার মত মানুষদের নিঃস্বার্থ আত্মত্যাগ পাঠকদের মন স্পর্শ করে। ক্লাব বা ক্রীড়া সামগ্রী ছাড়াও ক্রিকেট খেলার জন্য প্রয়োজনীয় মাঠের অভাবের দিকটিও এই উপন্যাসে লক্ষণীয়। অতএব বলা যায় ময়দানি সমাজের নানা ক্রাইসিস এই উপন্যাসের প্রধান উপজীব্য বিষয়।

সূচক শব্দ: ক্রীড়াসাহিত্য, ননীদা নট আউট, ক্রিকেট ক্লাব, খেলোয়াড়, ক্রীড়া সামগ্রী।

মূল বক্তব্য: মানুষের জীবন ওতপ্রোত ভাবে সমাজের সঙ্গে সম্পৃক্ত যা সুচারু রূপে প্রতিধ্বনিত হয় সাহিত্যে। বিস্তৃত সমাজের একটি অংশ হল ক্রীড়াজগৎ। ফলস্বরূপ সাহিত্যের আঙিনায় সমাজের নানা দিকের প্রতিফলনের সঙ্গে সঙ্গে ক্রীড়ার প্রবেশ খুবই অবসম্ভাবী ঘটনা এবং তাই বাংলা সাহিত্যের একেবারে গোড়া থেকেই ক্রীড়ার উল্লেখ পাওয়া যায়। চর্যাপদে জুয়া খেলা, দাবা খেলা, শিকার করা, মাছ ধরা, নৌকা বাওয়া প্রভৃতির প্রসঙ্গ রয়েছে। মঙ্গলকাব্যগুলিতেও দাবা, পাশা, তাস ইত্যাদি খেলার কথা উঠে এসেছে। আবার কৃত্তিবাস ওঝার ‘রাম পাঁচালী’তে রামের ডাংগুলি খেলার কথা বর্ণিত হয়েছে। পরের দিকে হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর ‘বেনের মেয়ে’, কালীপ্রসন্ন সিংহের ‘হুতোম প্যাঁচার নক্সা’ ইত্যাদি গ্রন্থে ‘বাচ’ খেলা বা ‘বাইচ’ খেলার উল্লেখ রয়েছে। ঔপনিবেশিক বাংলায় অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে ফুটবল, ক্রিকেটের মত খেলা ধীরে ধীরে জনপ্রিয় হচ্ছে, ফলে এইসব খেলা সংক্রান্ত বিভিন্ন লেখা উঠে আসছে মূলত প্রবন্ধ আকারে।

১৮৯৯ সালে শিবনাথ শাস্ত্রীর 'নয়নতারা' উপন্যাসে প্রথম ক্রিকেট ও ক্রিকেটের প্রসঙ্গ গুরুত্বসহকারে উপস্থাপিত হচ্ছে। ১৯১০ সালে প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'গোরা' উপন্যাসেও ক্রিকেট খেলার প্রসঙ্গ আমরা পেয়ে থাকি। যোগেন্দ্রনাথ গুপ্তের ক্রিকেট বিষয়ক উপন্যাস 'খেলার মাঠে' প্রকাশিত হয় ১৯৪৩ সালে, যাকে বাংলা সাহিত্যের প্রথম ক্রীড়া উপন্যাস হিসেবে ধরা হয়। অপরদিকে ১৯১১ র মোহনবাগানের শিল্ড জয়ের ফলে বাংলায় ফুটবলকেন্দ্রিক লেখালেখি শুরু হচ্ছে। অতঃপর পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়ের হাত ধরে আমরা পেয়ে যায় বাংলা সাহিত্যের প্রথম ফুটবল বিষয়ক উপন্যাস— 'খেলোয়াড়'(১৯৪৮)। এরপর থেকেই একে একে শঙ্করীপ্রসাদ বসু, বেরী সর্বাধিকারী, বিনয় মুখোপাধ্যায়, রণজিৎ সেন প্রমুখেরা কলম ধরেছেন ক্রীড়া নিয়ে। সৃষ্টি হচ্ছে বাংলা সাহিত্যের এক নতুন ধারা যা ক্রীড়াকেন্দ্রিক সাহিত্য বা ক্রীড়াসাহিত্য নামে পরিচিতি পায়। এই নতুন ধারার প্রণেতারা ক্রীড়ার বাস্তবতাকে সাহিত্যে স্থান দিয়ে এক বিশেষ দ্বার উন্মোচন করলেও এই ধারায় সবচেয়ে জনপ্রিয়তা লাভ করেছিলেন মতি নন্দী।

মতি নন্দী ছোটোবেলা থেকেই খেলাধূলায় উৎসাহী ছিলেন। খেলোয়াড় ও ক্রীড়া সাংবাদিক হওয়ার সুবাদে তিনি ক্রীড়া সম্পর্কে ছিলেন সুবিজ্ঞেয়। এর দরুণ তিনি ক্রীড়ার খুঁটিনাটির সঙ্গে নিজের সাহিত্যিক সত্তাকে মিশিয়ে সৃষ্টি করলেন ক্রীড়াকেন্দ্রিক বহু ছোটগল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ। ১৩৬৮ বঙ্গাব্দের পৌষ সংখ্যায় 'অমৃত' পত্রিকায় প্রকাশিত হল তাঁর প্রথম ক্রীড়াকেন্দ্রিক গল্প 'অস্থায়ী পলায়ন'। এরপর ১৯৬৮ সালে 'ক্রিকেটের আইন কানুন' নামক প্রবন্ধ গ্রন্থ রচনা করেন। তার পরের বছরই প্রকাশিত হয় তাঁর প্রথম ক্রীড়া বিষয়ক উপন্যাস 'দ্বাদশব্যক্তি'। এই উপন্যাসটি তেমনভাবে জনপ্রিয়তা লাভ না করলেও ১৯৭১ সালে প্রকাশিত ক্রিকেট বিষয়ক উপন্যাস 'ননীদা নট আউট' পাঠকদের কাছে অধিক পরিমাণে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। ৮টি পরিচ্ছেদে বিভক্ত এই উপন্যাসটিতে ক্রিকেট জগৎ নিয়ে পরিহাস থাকলেও খেলার অন্দরমহলের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি এখানে সুন্দরভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। মতি নন্দী একদিকে যেমন তৎকালীন ক্রিকেট ক্লাবগুলির করুণ অবস্থার কথা তুলে ধরেছেন এই উপন্যাসে, অন্যদিকে তেমনই ক্লাবের খেলোয়াড়দের অভাব-অনটন, দারিদ্র-দুর্দশার কথাও সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করেছেন। ক্লাবগুলির অবলুপ্তি আটকাতে দুঃস্থ প্রতিভাবান খেলোয়াড়দের নানা রকম প্রলোভন দেখিয়ে ক্লাবে ধরে রাখার মত ঘটনা এখানে বর্ণিত হয়েছে যা আদতে অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক। অপরদিকে ক্লাবের প্রতি ননীদার মত মানুষদের নিঃস্বার্থ আত্মত্যাগ পাঠকদের মন স্পর্শ করে। ক্লাব বা ক্রীড়া সামগ্রী ছাড়াও ক্রিকেট খেলার জন্য প্রয়োজনীয় মাঠের অভাবের দিকটিও এই উপন্যাসে বর্ণিত। অতএব বলা যায় ময়দানি সমাজের নানা ক্রাইসিস এই উপন্যাসের প্রধান উপজীব্য বিষয় যা মতি নন্দীর পূর্বসূরী ক্রীড়া সাহিত্যিকদের রচনায় লক্ষ্য করা যায়নি।

বিষয়বস্তুর এই অভিনবত্ব ক্রীড়াসাহিত্য জগতে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল যার ফলে বাংলা ক্রীড়াসাহিত্য ধারার গভীরতা ও ব্যাপ্তি ঘটেছে যথেষ্ট।

'ননীদা নট আউট' উপন্যাসটির শুরুতেই আমরা ক্রিকেট ক্লাব অফ হাটখোলা (সি.সি.এইচ) নামক একটি সেকেন্ড ডিভিসন ক্লাবের কথা পাচ্ছি। আর্থিক দিক থেকে ক্লাবটির এতটাই শোচনীয় অবস্থা যে ক্লাবটির অস্তিত্ব সংকট হয়ে উঠেছে। কোনো রকমে টিকে থাকা এই ক্লাবটির খেলার সামগ্রীর অভাব থাকায় ম্যাচ খেলার দিন ননীদা তিনটি ব্যাট বার করেন যেগুলি দিয়ে আশিটা ম্যাচ খেলা হয়ে গেছে এবং খেলা শেষে সেগুলি কাঠের বাক্সে ভরে তালা এঁটে দেন। এছাড়াও ননীদা ক্লাবের খরচ কমানোর জন্য একটি বলে দু-তিনটি ম্যাচ খেলান। তাই বোলারদের অভিযোগ নতুন বল না পাওয়াই তারা ভালো বল করতে পারে না। ম্যাচে খেলা বলগুলি ননীদা সেই কাঠের বাক্সে যত্ন করে রেখে দেন। যে গোটা চারেক বল নেট প্র্যাকটিসের জন্য বরাদ্দ থাকে সেগুলি নরম হয়ে তুবড়ে ফুলে বা সেলাই ছিঁড়ে গেলে তবেই বাক্স থেকে বল বার করেন। ক্লাবটির করুণ অবস্থার কথা বর্ণনা করতে গিয়ে মতি নন্দী হালকা মেজাজে বলেছেন – 'ক্লাবের প্যাড চার জোড়া। ব্যাটিং গ্লাভস তিন জোড়া। ব্যবহার করতে করতে ঢলঢলে হয়ে গেছে সেগুলো, আঙুল থেকে খুলে পড়ে। ঘামে এবং ময়লায় এখন এমন দুর্গন্ধ ছড়ায় যে উইকেটকিপাররা পর্যন্ত পিছিয়ে বসে। ... প্র্যাকটিসের জন্য একটা ব্যাট ঠিক করা আছে। কেউ বলে সেটা কাঁটাল কাঠের কেউ বলে শালের। কেউ সঠিক বলতে পারে না, যেহেতু প্রায় পুরো ব্লেডটাই কালো সুতোর ব্যান্ডেজ ঢাকা। যেটুকু দেখা যায়, সেটার রং দুশো বছরের পুরনো কাগজের মতো। ওজন ছ-সাত পাউন্ড, হ্যান্ডেলটা মচমচ করে।'[১] খেলার সরঞ্জামের মত অত্যন্ত আবশ্যক জিনিসের অভাবের কথা মতি নন্দী যেমন সুদক্ষতার সঙ্গে এই উপন্যাসে তুলে ধরেছেন, তেমনই এই রকম একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে উপস্থাপিত করার জন্য করুণরসের পরিবর্তে বেছে নিয়েছেন হাস্যরসকে, যা শুধু ক্রীড়াসাহিত্য নয়, বাংলা সাহিত্যেও এমন দৃষ্টান্ত খুব কম দেখা যায়।

যে কোনো ক্লাবকে বাঁচিয়ে রাখতে এক বা একাধিক মানুষের অক্লান্ত পরিশ্রম, ত্যাগের প্রয়োজন হয়। মতি নন্দীর 'ননীদা নট আউট' উপন্যাসেও আমরা দেখতে পাচ্ছি কোনো রকমে টিকে থাকা সি.সি.এইচ ক্লাবটির অবলুপ্তি আটকাতে ননীদা ক্লাবের সমস্ত ভার বহন করেছেন। তাই তিনি একাধারে ক্লাবের প্রেসিডেন্ট, সেক্রেটারি, ট্রেজারার, সিলেকটার, স্কোরার, সাবস্টিটিউট ফিল্ডার, কোচ প্রভৃতি। ক্লাবটির বছরের বাজেট প্রায় দুহাজার টাকা। এই টাকা জোগাড় করার জন্য ননীদা নানা রকম ট্যাকটিক্স প্রয়োগ করেন, যা 'ননীটিক্স' নামে পরিচিত। তিনি এমন একজন অর্থবান, যশোলোভী, ঈষৎ বোকা ধরণের, তোষামোদপ্রিয় লোক খুঁজে বার করেন যাকে ক্লাবের প্রেসিডেন্ট বানিয়ে মোটা টাকা আদায় করা যায়। এই টাকার উপরই ক্লাবের জীবন মরণের অর্ধেক নির্ভর করে। আগের বছরের প্রেসিডেন্ট কাউন্সিলার দুলাল খাঁ

ইলেকসন হেরে গিয়ে ক্লাবের ডোনেশন ছাঁটাই করে ১/৬ এ নামিয়ে এনেছে। তাই এবছর ননীদা প্রেসিডেন্ট নির্বাচন করেছেন গুড়, ঘি ও চালের আড়তদার, গোটা পাঁচেক রেশন দোকানের মালিক চাঁদমোহন শ্রীমানীকে। তাঁর কাছ থেকে দেড় হাজার টাকা পাওয়ার আশায় ননীদা পাঁচখানা টেস্ট ম্যাচের টিকিট ও সি.এ.বি-র কোনো একটা কমিটিতে ঢুকিয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন। অপর দিকে দুটি টেস্ট টিকিটের বিনিময়ে ভাইস প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছেন অ্যাটর্নি মাখন দত্ত, যিনি বছরে ত্রিশ কিলো আলু, দশ কিলো মাংস, পঞ্চাশ পাউন্ড পাউরুটি ও পাঁচ কিলো সরষের তেল দেবেন। ননীদা মরিয়া হয়ে ক্লাবটিকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য শ্রীমানী, মাখন দত্তের মত ধনী ব্যক্তিদের তোষামোদ করে থাকেন। তোষামোদ কোন পর্যায়ে চলে তার প্রতিচ্ছবি উপন্যাসের তৃতীয় পরিচ্ছেদে বর্ণিত একটি ম্যাচে দেখতে পাওয়া যায়। প্রতি বছর মরশুম শুরুর আগে ক্লাব সদস্যদের মধ্যে একটি ম্যাচ খেলার আয়োজন করেন ননীদা, যেটিকে প্রীতি সম্মেলন হিসাবে পঞ্চাশভাগ, পৃষ্ঠপোষকদের তোয়াজ করার জন্য পঁচিশ ভাগ, বাকি পঁচিশ ভাগ নবাগতদের ট্রায়াল হিসাবে দেখেন। এই ম্যাচের একদিকে থাকে সভাপতি একাদশ দল, আর একদিকে ননীদা একাদশ। যদিও দুটি দলের নামে 'একাদশ' শব্দটি আছে, আসলে সেটা অষ্টাদশ কি ত্রয়োবিংশ হতে পারে। নির্ভর করে মাঠে খেলার আগে ক'জন হাজির হচ্ছে তার উপর। এমনকি সদস্যরা গেষ্টও আনতে পারেন – সেজন্য মাথাপিছু পাঁচ টাকা বরাদ্দ। আয়োজিত এই ম্যাচটিকে প্রহসন ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না। কারণ এই ম্যাচে এমন কিছু অনিয়ম বাকি থাকে না যা ঘটে না। যেমন, কেউ আউট হলে আম্পায়ার সঙ্গে সঙ্গে নো বল ঘোষণা করে দেন, নিশ্চিত রান আউটকে 'বেনিফিট অফ ডাউট' এর নিয়মে নট আউট করে দেন। আসলে এই সব হয় ননীদারই নির্দেশে। এইসব করার জন্য ম্যাচের আগে তিনি দায়িত্ব ভাগ করে দেন। শূন্য রানে কেউ যাতে আউট না হন তার দায়িত্ব থাকে আম্পায়ারের উপর। স্কোরারের কাজ দশ রানকে পনেরো, পনেরো রানকে কুড়ি করা এবং বাই রানের সাহায্যে টোটালকে ত্রিশ চল্লিশ রান বাড়ানো। এই দায়িত্বভার যথাযথ পালন করে উক্ত ম্যাচে আম্পায়ার দু'জন এগারোটা এল.বি.ডব্লু, সাতটা রান আউট, ছটা স্টাম্পিং এবং তিনটে ক্যাচ আউটের আবেদন নাকচ করে দেন। এসব ছাড়াও সদস্যদের খুশি করার জন্য ইচ্ছাকৃত খারাপ বল করে রান করার সুযোগ করে দেওয়া হয়। ননীদার মতো একজন ক্রিকেটপ্রেমীর এরূপ আচরণ শুধুমাত্র অর্থ উপার্জনের মাধ্যমে ক্লাবকে বাঁচিয়ে রাখার উদ্দেশ্যে। অপরদিকে ক্লাবের সম্মান রক্ষার্থে তন্ময়কে ক্লাবে ফেরানোর জন্য ননীদা তাঁর মৃত স্ত্রীর গয়না বিক্রি করে সেই টাকা তন্ময়কে দেন। ননীদার এই স্বার্থত্যাগ 'কোনি' উপন্যাসের ক্ষিদ্দাকে মনে করায়। 'বইয়ের দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত এক সাক্ষাৎকারে মতি নন্দী বলেছিলেন— 'আমি সবসময় খেলার জগতের লোয়ার লেভেলের স্ট্রাগলটা দেখাতে চেয়েছি। ননীদার মত মানুষকে কাছ থেকে দেখেছি আমি। খেলার প্রতি,

ক্লাবের জন্য তাদের কী অপরিসীম নিঃস্বার্থ ভালবাসা তা আমি দেখেছি।'[২] এইজন্য তিনি তাঁর ক্রীড়াকেন্দ্রিক রচনায় এই সব চরিত্রগুলিকে এড়িয়ে যেতে পারেননি। ননীদার মতো ক্লাবের ক্যাপ্টেন মতিও ক্লাবের শোচনীয় অবস্থা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল। তাই সে ননীদাকে সব সময় সমর্থন করে, এমনকি ননীদার শ্রীমানী, মাখন দত্তের মত ধনী ব্যাক্তিদের তোষামোদ করাকেও। অপরদিকে ননীদার এহেন আচরণ তন্ময়ের পছন্দ হচ্ছে না। তন্ময়ের আচরণে তাই মতি রীতিমত উৎকণ্ঠা প্রকাশ করছে। যদিও সে তন্ময়কে নিয়ে আশাবাদী— 'সি সি এইচ এর মত ছোট ছোট ক্লাবগুলো কাদের দয়ায় চলে সে কথা যেদিন জানবে, সেদিন ও নিশ্চয় ক্লাবকে ভালো না বেসে পারবে না।'[৩] পরের দিকে শ্রীমানী ক্লাবকে হাজার টাকা কম দিলে ননীদার মত মতিও মুষড়ে পড়ে। ক্লাবের খরচ কমানোর জন্য মতি সমান ভাবে সচেষ্ট। তাই সে ক্লাবের আর্থিক অবস্থার কথা বিবেচনা করে চার পাঁচটি ম্যাচ খেলে এই সিজনের মতো খেলা বন্ধ করে দেওয়ার পরামর্শ দেয় ননীদাকে। আবার তন্ময় যাতে সেঞ্চুরি করে ব্যাটের দাবি না করে তার জন্য ইচ্ছাকৃত তন্ময়কে রান আউট করার মতো জঘন্য কাজ করতেও সে দ্বিধা করেনি। এছাড়াও টাকার বিনিময়ে ভবানীকে কয়েকটা ম্যাচের জন্য ক্যাপ্টেন্সি করতে দেওয়ার ঘটনা ক্লাবের অভাবের দিকটিকেই স্পষ্ট করে।

মতি নন্দীর ক্রীড়াকেন্দ্রিক 'ননীদা আউট' উপন্যাসে ক্লাবগুলির পাশাপাশি খেলোয়াড়দের অসহায় দূরবস্থার কথাও লক্ষ্য করা যায়। নিকোষ কালো রঙের তন্ময় বোসের অভাব-অনটন, পারিবারিক দারিদ্র-দুর্দশা মতি নন্দী এখানে সুস্পষ্ট ভাবে তুলে ধরেছেন। তন্ময়ের পরিহিত ময়লা জামা কাপড় ও তালি মারা পুরনো বুটের মধ্য দিয়ে তৎকালীন খেলোয়াড়দের করুণ অবস্থার দিকটিই চিত্রিত হয়েছে। এই প্রসঙ্গে সাম্প্রতিক Twitter এ ভাইরাল হওয়া জিম্বাবয় আন্তর্জাতিক ক্রিকেট দলের খেলোয়াড় Ryan Brue এর ছেঁড়া বুটের ছবি মনে পড়ে যায়, যা স্পষ্ট করে যে আজকের দিনেও এই চিত্র বিরল নয়। তন্ময় প্রতিভাবান খেলোয়াড়, কিন্তু বাড়ির আর্থিক অস্বচ্ছলতার কারণে সে মরিয়া হয়ে অর্থ উপার্জনের চেষ্টা করে। তাই সে ক্রিকেট ছেড়ে ফুটবলের ভাড়া খেলতে গ্রামাঞ্চলে চলে যায়। এমনকি সেঞ্চুরি করার উপহার স্বরূপ ক্লাব থেকে যে ব্যাট পাবে তা সে বিক্রি করে সেই টাকা বাড়িতে দিতে চায়। এতটাই তার টাকার প্রয়োজন যে সে মরিয়া হয়ে চাকরির খোঁজ করে— 'আমিও গরিব। কুড়িয়ে বাড়িয়েই চলে আমাদের সাত জনের সংসার। বাবার যা রোজগার তাতে টেনেটুনে পনেরো দিনের বেশি চলে না। আমি বড় ছেলে, প্রি-ইউ পাশ, মাঝে মাঝে ফুটবল খেলার কয়েকটা টাকা বাড়িতে দেওয়া ছাড়া আর কিছুই সাহায্য করতে পারি না। ব্যাট দুটো পেলে বিক্রি করে কিছু টাকা মাকে দিতে পারব। ক্লাব যদি ব্যাটের বদলে তার দামটা দেয় তা হলে আমি যাব। আমার এখন একটা চাকরি ভীষণ দরকার।'[৪] তন্ময়ের এই অভাব-অনটনের চিত্র পরবর্তীকালে মতি নন্দী কোনি, নারান, শিবা চরিত্রের মধ্যেও তুলে ধরেছেন। আসলে মতি নন্দী খেলার প্রতি দেশের সরকারের যে উদাসীন

মনোভাব তার নগ্ন চিত্র স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেছিলেন এবং তা তিনি বারংবার সাহিত্যে প্রতিফলন করে গেছেন। তাই শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় যথার্থ বলেছেন— 'মতির লেখার বিশেষত্ব হল, আমাদের দেশের যা অবস্থা, যা ইনফ্রাস্ট্রাকচার তার মধ্যে আন্তর্জাতিক স্তরের একজন খেলোয়াড়ের উঠে আসা যে কী অসম্ভব কঠিন কাজ তা নিপুন হাতে ফুটিয়ে তোলা।'[৫] খেলাভিত্তিক ছোটগল্প ও উপন্যাসের পাশাপাশি তাঁর প্রবন্ধের দিকে আলোকপাত করলেও এই বিষয়টি দেখা যায়। প্রবন্ধগুলিতে তিনি বাংলা তথা ভারতে বিশ্বমানের খেলোয়াড় উঠে না আসার জন্য সরকারকেই দায়ী করেছেন। কলকাতার তিনশো বছর পূর্তি উপলক্ষে **১৯৯১** সালে লেখা 'খেলায় ভারত : স্বাধীনতার আগে ও পরে' প্রবন্ধে মতি নন্দী বলেছেন— 'অভুক্ত, নিরক্ষর, কর্মহীন, কুসংস্কারাচ্ছন্নদের দেশে এখন খেলাধুলোয় বিশ্বপর্যায়ে পৌঁছনো খুব কঠিন কাজ, বিশেষত যে দেশে খেলোয়াড়দের পেশাদারি মানসিকতা একদমই নেই। খেলে টাকা রোজগার করার সুযোগ থাকলে তবেই পেশাদারদের আবির্ভাব ঘটে। ভারতে কয়েকজন মাত্র ফুটবলার ও ক্রিকেটার খেলা থেকে টাকা পায় বটে কিন্তু কোনো পেশাদারি মানসিকতা তাদের নেই। দেশের বাকি খেলোয়াড়রা এখনও চাকুরি-নির্ভর, নিরাপত্তাবোধহীন, অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ নিয়ে খেলোয়াড়-জীবন কাটিয়ে চলেছে। স্বাধীনতার আগে খেলার প্রতি যে শৌখিন মনোভাব ছিল এখনও তাই রয়ে গেছে।'[৬] তাই মতি নন্দী চাইতেন প্রতিভাবান গরীব খেলোয়াড়রা নানা প্রতিকূলতাকে জয় করে যেন স্বপ্নপূরণ করতে পারে এবং তাই তাঁর সৃষ্ট প্রধান চরিত্ররা দুর্জয় জেদ, অনুশীলনের কঠোর নিষ্ঠা, চারিত্রিক সততার মাধ্যমে অবশেষে জয়ী হয়েছে। মারাদোনা, ইরফান পাঠান, বীরেন্দ্র সওবাগ প্রমুখ খেলোয়াড়দের বিশ্ববিখ্যাত হওয়ার পশ্চাতে যে সংগ্রাম তা দূরদর্শী মতি নন্দী কোথাও যেন তাঁর উপন্যাস ও ছোটগল্পে আগেভাগেই রচনা করে গেছেন।

ষাট-সত্তরের দশকে ভারত তথা বাংলায় ফুটবলের মত ক্রিকেটের প্রতি তেমন উত্তেজনা ছিল না এবং ক্রিকেট জগতে পেশাদারী প্রথা তখনও চালু হয়নি। ফলে ক্রিকেট ক্লাবগুলি বিশেষ করে নিম্নস্তরের ক্লাবগুলি আর্থিক দিক থেকে এতটাই অসচ্ছল ছিল যে খেলোয়াড়দের কোনো রকম বেতন বা পারিশ্রমিক প্রদান করতে পারত না। মতি নন্দীর 'ননীদা নট আউট' উপন্যাসেও আমরা দেখতে পাচ্ছি ক্লাব থেকে টাকা পাওয়া যাবে কিনা তন্ময়ের এই প্রশ্নে মতি অত্যন্ত অবাক হয়ে ওঠে— 'তুমি কি ফুটবল পেয়েছ? কলকাতায় ক্রিকেট প্লেয়ার ক'জন টাকা পায়, তাও সেকেন্ড ডিভিশন ক্লাবে।'[৭] ক্লাবগুলিতে তাই নিয়মিত খেলোয়াড় পাওয়াও যেত না। এমনকি গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে খেলোয়াড়দের অনুপস্থিতির মত ঘটনাও ছিল খুব স্বাভাবিক। 'ননীদা নট আউট' উপন্যাসেও এই কথা উল্লেখিত— 'চারজন খেলোয়াড় আর এলই না। লিগের শেষ দিকে এইরকমই অবস্থা হয়...।'[৮] এর আগে মতি নন্দীর 'অস্থায়ী পলায়ন' গল্পেও দেখা যায় বরযাত্রী যাওয়ায় ক্রিকেট মাঠে তিনজন খেলোয়াড়ের অনুপস্থিতি। ক্লাবগুলিতে

খেলোয়াড় ধরে রাখতে তাই নানা রকম প্রলোভন দেওয়া হত। মতি নন্দীর 'ননীদা নট আউট' উপন্যাসে এই দিকটিও বর্ণিত। তন্ময়ের মত প্রতিভাবান গরীব খেলোয়াড়দের ধরে রাখতে ব্যাট উপহার দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন ননীদা। এইসব ছাড়াও তৎকালীন শহর কলকাতায় মাঠের অভাবের কথাও এই উপন্যাসে লক্ষ করা গেছে। গড়ের মাঠের অল্প জায়গার মধ্যে চারটি ক্লাবের নেট প্র্যাকটিস করার কথা এখানে আছে, যার জন্য একেকটি ক্লাবকে ৪০০ টাকা করে দিতে হত। দুর্গাপূজা শেষ হলে ক্লাবগুলি নিজেরাই চার কোণে বাঁশ পুঁতে দড়ি দিয়ে ঘিরে রাখে, যাতে কেউ প্রবেশ না করে। এবড়ো খেবড়ো মাঠ, সেই মাঠে ইট টুকরো, গবর, শালপাতা পড়ে থাকার ঘটনা মতি নন্দীর আরও বহু গল্প-উপন্যাসের মত এই উপন্যাসেও পরিলক্ষিত— 'নেটের পিচ খুবই খারাপ। কয়েকটা বল বিশ্রী ভাবে লাফিয়ে উঠল, শুট করল।'[৯] অথবা 'পিচে বোধহয় ইটের কুচি আছে, তৃতীয় বলটি হটাৎ ফণা তোলার মতো সোজা খাড়া হয়ে ছেলেটির কানের পাশ দিয়ে নেট ডিঙিয়ে গেল।'[১০] এইভাবেই মতি নন্দী 'ননীদা নট আউট' উপন্যাসে গড়ের মাঠ ও তার ক্লাবগুলির জীবন্ত চিত্র অঙ্কন করেছেন। এই প্রসঙ্গে রবীন পালের মন্তব্য— 'গড়ের মাঠের পরিস্থিতি জানতে হলে সংবাদপত্রের পরিবর্তে মতি নন্দীর এসব বই পড়া অনেক বেশি নির্ভরযোগ্য।'[১১]

তথ্যসূত্র:

১. মতি নন্দী, *ননীদা নট আউট*, দ্র. *কিশোর সাহিত্য সমগ্র* -২, দীপ প্রকাশন, কলকাতা, ২০১৮, পৃ. ৪৪৪।
২. *বইয়ের দেশ*, জানুয়ারি – মার্চ, ২০০৮, পৃ. ১৩৯।
৩. মতি নন্দী, *ননীদা নট আউট*, দ্র. *কিশোর সাহিত্য সমগ্র* -২ দীপ প্রকাশন, কলকাতা, ২০১৮, পৃ. ৪৫১।
৪. তদেব, পৃ. ৪৬২।
৫. সাধন চট্টোপাধ্যায় (সম্পা), *প্রসঙ্গ : মতি নন্দী*, প্রমা প্রকাশনী, কলকাতা, ২০১৫, পৃ. ৩১।
৬. মতি নন্দী, *খেলা সংগ্রহ*, দীপ প্রকাশন, কলকাতা, ২০২০, পৃ. ৪।
৭. মতি নন্দী, *ননীদা নট আউট*, দ্র. *কিশোর সাহিত্য সমগ্র* -২ দীপপ্রকাশন, কলকাতা, ২০১৮, পৃ. ৪৪৭।
৮. তদেব, পৃ. ৪৬৭।
৯. তদেব, পৃ. ৪৪২।
১০. তদেব, পৃ. ৪৪৬।
১১. রবিন পাল, *পাঠ সরণিতে মতি নন্দী*, এবং মুশায়েরা, কলকাতা, ১৯৯৮, পৃ. ৪৩।

গণনাট্য আন্দোলন ও সমসাময়িক সমাজ-পরিস্থিতি : প্রসঙ্গ ‘নবান্ন’

সুকুমার বর্মন
গবেষক, বাংলা বিভাগ, কলা অনুষদ
বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপঃ বিশ শতকের প্রথমার্ধের শেষ দিকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, স্বাধীনতা আন্দোলন ও মন্বন্তর ভারতীয় রাজনীতি, অর্থনীতি ও সমাজকে ব্যাপক ভাবে প্রভাবিত করেছিল। নিজে প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণকারী না হয়েও ভারত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। এক সময় বার্মা থেকে পূর্ব ভারতে প্রচুর পরিমাণ চাল আমদানি করা হত। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে বার্মা অক্ষশক্তির ক্ষমতায় চলে গেলে সেখান থেকে চাল আসা বন্ধ হয়ে যায়। পাশপাশি পূর্ব ভারতের সমুদ্র উপকূলবর্তী এলাকায় অক্ষশক্তির সেনারা পৌঁছলে যাতে খাদ্যাভাবে পড়ে, সেই লক্ষ্যে সেসব অঞ্চলে ‘পোড়ামাটি নীতি’ গ্রহণ করা হয়। অল্পপরেই বাংলায় দুর্ভিক্ষের কারণে সাধারণ মানুষেরপক্ষে অন্ন জোগানো কষ্টকর হয়ে ওঠে। কমিউনিস্ট দলের সাংস্কৃতিক ফ্রন্ট সাধারণ মানুষদের সাহাযার্থে ‘গণনাট্য সংঘ’ গড়ে তোলে। দুর্ভিক্ষ পীড়িত মানুষদের সাহাযার্থে ‘গণনাট্য সংঘ’ নানান জায়গায় নাটক অভিনয় করে অর্থ সংগ্রহ করত। বিশ্বযুদ্ধ, স্বাধীনতা সংগ্রাম ও মন্বন্তরের দিনগুলিতে সাধারণের কাছে যেমন অন্ন জোগানো কঠিন হয়ে ওঠে, তেমনি কালোবাজারি ও মুনফালোভী ব্যবসায়ী সমাজ এই আকালকে কাজে লাগিয়ে আরও বেশি ধনবান হয়ে ওঠে। অন্নের অভাবে অনেক সাধারণ মানুষের মৃত্যু ঘটে। অনেকে আবার নিজের কন্যা সন্তানকে বিক্রি করতে বাধ্য হয়। কঠিন সেই পরিস্থিতির চিত্র বিজন ভট্টাচার্য ‘নবান্ন’ নাটকে তুলে ধরেছেন। তবে সমাজ-সমস্যার কথাই তিনি বলেননি, তার থেকে মুক্তির চিত্র কাহিনিতে অঙ্কন করেছেন। প্রধান সমাদ্দার ও তার ভাতৃপুত্র, পুত্রবধূর জীবনকাহিনির মধ্য দিয়ে কাহিনি পরিবেশিত হয়েছে।

সূচক শব্দঃ ১) প্রগতি সাহিত্য সংঘ ২) দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ৩) ফ্যাসিবাদ ৪) নবান্ন উৎসব ৫) পোড়ামাটি নীতি ৬) পিপলস রিলিফ কমিটি। ৭) বেঙ্গল রিলিফ কমিটি ৮) বঙ্গীয় প্রাদেশিক হিন্দু মহাসভা রিলিফ কমিটি।

মূল আলোচনাঃ বিশ শতকের প্রথমার্ধে বাংলা নাট্যক্ষেত্রে আন্দোলনের জোয়ার সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিল ‘গণনাট্য সংঘ’। সাধারণ মানুষের উদ্দেশ্যে এই সংঘের প্রতিষ্ঠা। দীনদরিদ্র মানুষের জীবনকাহিনি এর প্রধান অবলম্বন। ঠিক কোন পরিস্থিতিতে ‘গণনাট্য সংঘ’ গড়ে ওঠে তা লক্ষ্য করা অনিবার্য। মানুষের অস্তিত্বরক্ষা ও মানবতাবোধ জাগরণের উদ্দেশ্যে দেশ-বিদেশের লেখক-শিল্পীরা এক হয়ে স্বাধীনতা ও মুক্তির বার্তা

দিগ্‌দিগন্তে ছড়িয়ে দেওয়ার পরিকল্পনা করে। ১৯৩৫ খ্রিষ্টাব্দে লন্ডনের ডেনমার্ক স্ট্রিটের নানকিং চাইনিজ রেস্তোরাঁয় প্রথম ভারতীয় এবং ব্রিটেনের লেখক শিল্পী ও বুদ্ধিজীবীরা মিলিত হন। তাঁদের আলোচনার মধ্যে একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা করা হয়। যার ফলস্বরূপ ১৯৩৬ খ্রিষ্টাব্দে লখনউ-এ গঠিত হয় 'প্রগতি সাহিত্য সংঘ'। এর প্রথম সভাপতি নির্বাচিন হন মুন্সি প্রেমচন্দ্র। কিন্তু কিছুদিন পরেই সে নাম পরিবর্তন করে রাখা হয় 'প্রগতি লেখক সংঘ'। দ্বিতীয় অধিবেশন কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর বেশ কিছুদিন সংগঠনটির আর কোনো খবর পাওয়া যায়নি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৪২ খ্রিষ্টাব্দে ৮ মার্চ ঢাকা শহরে ফ্যাসিস্ট বিরোধী এক মিছিলে বিরোধী পক্ষের আক্রমণে সোমেন চন্দের মৃত্যু হয়। এরই প্রতিবাদে ফ্যাসিবাদের বর্বরতার বিরুদ্ধে প্রগতি লেখক সংঘ কলকাতায় এক সম্মেলনের আয়োজন করে। তাৎক্ষণিকভাবে সেখানেই সংগঠনের নাম পরিবর্তন করে রাখা হয় 'ফ্যাসিস্ট বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ'। সংগঠনের প্রতিনিধিরা সিদ্ধান্ত নেন, কেবল প্রগতি মূলক ভাবনা দিয়ে কাজ চলবে না, নিষ্ঠুর, বর্বর ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে কলম, তুলি ধারণ করা আবশ্যক। এই ফ্যাসিবিরোধী সংগঠন হিসেবে 'গণনাট্য আন্দোলন'-এর প্রতিষ্ঠা হয়। বোম্বাই (বর্তমান মুম্বাই) শহরে গণনাট্য সংঘ প্রথম 'জননাট্য' নামে শুরু হয়। বাংলায় গণনাট্যের প্রতিষ্ঠা হয় ১৯৪৩ খ্রিষ্টাব্দে। তবে শুরু থেকে গণনাট্য ফ্যাসিস্ট বিরোধী লেখক ও শিল্পী সঙ্ঘের অধীনে কাজ করতে থাকে। বাংলায় গণনাট্য কেবল ফ্যাসিবাদ বিরোধী হিসেবেই নয়, ১৯৪৩-এর ভয়ঙ্কর মন্বন্তরের সময় সাধারণ মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছিল। সাধারণ মানুষের অন্ন জোগাতে দেশের নানান জায়গায় ঘুরে ঘুরে অভিনয় করে অর্থ যোগাড় করেছিল। গণনাট্য সংঘ গড়ে ওঠার প্রসঙ্গে দর্শন চৌধুরীর মত—
"অনাচার ও অত্যাচারের দানবশক্তির নখদন্ত বিকাশের বিরুদ্ধে মানবসমাজ—কল্যাণকামী মানুষের, বিশেষ করে লেখক-শিল্পী-বুদ্ধিজীবীদের এই সংগঠিত প্রয়াসই আন্তর্জাতিক ভাবনার সঙ্গে মিলেমিশে এদেশে গণনাট্য আন্দোলন গড়ে উঠতে কার্যকরী ভূমিকা নিয়েছে।"[১]

গণনাট্য আন্দোলন বাংলা নাট্যসাহিত্যকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করেতে সক্ষম হয়েছিল। সমসাময়িক লেখকদের লেখনিতে এর প্রতিফল স্বরূপ প্রাধান্য পেল সমসাময়িক সমাজ-পরিস্থিতি। ঠিক কোন উদ্দেশ্য নিয়ে সংঘটি গড়ে উঠেছিল সে প্রসঙ্গে দর্শন চৌধুরী তাঁর 'গণনাট্য আন্দোলন' গ্রন্থে জানিয়েছেন—
"শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ, অত্যাচারীর মুখোশ খুলে ধরা, মুনাফাখোর মজুতদারের বদমায়েশি প্রকাশ করা, অর্থনৈতিক শোষণ এবং সামাজিক অবক্ষয়ের পরিণাম; এবং এর সঙ্গে মুক্তিকামী মানুষের জীবনসংগ্রাম, প্রতিরোধ ও বাঁচার লড়াইকে সামনে এনে মানুষের মুক্তি ও শ্রেণিহীন সমাজ গঠনের উপস্থিত সম্ভাবনাকে উজ্জ্বল করে তোলা—এই ছিল ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘের সকল সাংস্কৃতিককাজের অনুপ্রেরণা।"[২]

গণনাট্য আন্দোলন গড়ে ওঠার পিছনে ও মূলে রয়েছে সাধারণ মানুষ। কতকগুলি বৈশিষ্ট্য গণনাট্য আন্দোলনে লক্ষ্য করা যায়— ১) 'গণনাট্য' নাম থেকেই বোঝা যাচ্ছে তা সাধারণ জনগণের উদ্দেশ্যেই সৃষ্টি। সাধারণ মানুষই নাটকের নায়ক-নায়িকা। এর মধ্যে একক নায়কের কোনো স্থান নেই। একের পরিবর্তে সমষ্টিই এর প্রধান অবলম্বন। ২) নাটকের বিষয়ের ক্ষেত্রে সমসাময়িক সমস্যাই প্রধান। ৩) বিষয়গত দিক থেকে নাটকগুলির কাহিনিও সংলাপ সরল সাদাসিধে হয়ে থাকে। ৪) নাট্যদলের সভ্যরা বিভিন্ন পরিবেশ-পরিস্থিতি থেকে উঠে এলেও তাদের উদ্দেশ্য সবসময় এক হওয়া প্রয়োজন। ৫) গণনাট্যের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হিসেবে দেখা যায়, শুধু সমস্যাই নয়, তার পাশাপাশি সমাধানের উপায়ও নাট্যকারকে বর্ণনা করতে হয়। ৬) নাট্যমঞ্চের একটি নতুন দিক এই ধারায় লক্ষিত হয়। এর আগে পর্যন্ত মূল নাটকে মঞ্চসজ্জার কোনো বর্ণনা থাকত না। কিন্তু গণনাট্য সংঘের নাটকগুলিতে মঞ্চসজ্জার পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা লক্ষিত হয়।

গণনাট্য ধারায় একটি বিশেষ নাম বিজন ভট্টাচার্য। তাঁর 'নবান্ন' নাটক এ প্রসঙ্গে আলোচ্য। কাহিনিতে দেখা যায়, মন্বন্তরের কারণে আমিনপুর গ্রামে কৃষকদের জীবন দুর্দশাগ্রস্ত। সেইসঙ্গে নাট্যকার দেখিয়েছেন সমসাময়িক সময়ের মুনফাদার মানুষেরা কীভাবে সাধারণ মানুষের দুর্দশার সুযোগ নিয়ে জমি-বাড়ি গ্রাসাচ্ছাদন করে আরও বেশি ধনবান হয়ে উঠতে থাকে। তবে শুধু কৃষক সমস্যার কথাই নাট্যকার কাহিনিতে তুলে ধরেননি। পাশাপাশি তা থেকে মুক্তিদানের চিত্রও অঙ্কিত হয়েছে নাটকে। পুনরায় সেখানে চাষাবাদের ফলে গ্রামের মানুষ অন্ন জোগাতে সমর্থ হয়েছে। কাহিনির শেষে দেখা যায়, সবাই মিলে 'নবান্ন' উৎসবে মেতেছে। 'নবান্ন' কৃষক সমাজে নতুন ধান ওঠার আনন্দে পালিত উৎসব। আমিনপুরের সাধারণ মানুষ ও আনন্দে উৎসব পালন করেছে। সাধারণ কৃষকদের কথা কাহিনিতে প্রাধান্য পেলেও তার প্রধান ধারক হয়ে উঠেছে সমসাময়িক সমাজ-পরিস্থিতি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন সারা ভারত জুড়ে স্বাধীনতা সংগ্রাম অর্থাৎ আগস্ট আন্দোলন শুরু হয়ে যায়। ব্রিটিশ রাজের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে সারা দেশের মানুষ স্বাধীনতা সংগ্রামে মেতে ওঠে। গান্ধীজি মনে করেন, ভারতের স্বার্থে ব্রিটিশ সরকারের উচিত এদেশ ছেড়ে চলে যাওয়া। কিন্তু তার পরিবর্তে কংগ্রেসের বিভিন্ন নেতা-নেত্রীকে গ্রেপ্তার করে ব্রিটিশ শক্তি আন্দোলন দমনে তৎপর হয়। এতে সাধারণ জনতা দমে যাওয়ার পরিবর্তে বেশি পরিমানে ক্ষীপ্ত হয়। পরিস্থিতি সামাল দিতে অসমর্থ হলে সাধারণ মানুষের উপর গুলিবর্ষণ করতেও দ্বিধাবোধ করে না ব্রিটিশ সরকার। 'নবান্ন' নাটকের কাহিনির শুরুতে বাঁশের গাঁট ফাটার আওয়াজ শোনা যায়। আসলে ইংরেজ শাসনে কোম্পানির অত্যাচারের কথা কোনও নাট্যকারেই সরাসরি লিখতে সাহস করতেন না (যদিও 'নীলদর্পণ'-এর মতো নাটকে দীনবন্ধু মিত্র সরাসরি প্রতিবাদ চিত্রিত করেছেন, কিন্তু তা সরকার কর্তৃক নিষিদ্ধ

ঘোষিত হয়)। সেই ভয়ঙ্কর পরিস্থিতিতে পুরুষ মানুষের পক্ষে ঘরে থাকা অসম্ভব ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। নিজেদের বাঁচানোর তাগিদে তারা সর্বদা লুকিয়ে বেড়াত। নাটকে দৃশ্যত, বাঁশের গাঁট ফাটার আওয়াজ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কুঞ্জর জ্যেঠা প্রধান সমাদ্দারকে বনের ভিতরে পালানোর কথা বলে। কিন্তু প্রতিবাদী চরিত্রের প্রতিনিধি প্রধান বন্দুকের গুলিতে ভয় না পেয়ে বরং এগিয়ে নিজের প্রাণ দেওয়ার কথা জানায়।

১৯৪৩ খ্রিষ্টাব্দ ভারতীয় ইতিহাসে স্মরণীয়। এসময়েই সারা বাংলা জুড়ে ঘটে যায় ভয়ঙ্কর মন্বন্তর। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে অক্ষশক্তির সেনারা বার্মা আক্রমণ করলে সেখান থেকে চাল আমদানি পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যায়। এতদিন পর্যন্ত বার্মা থেকে প্রচুর পরিমানে চাল ভারতের পূর্বাংশে আমদানি হত। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কারণে তা বন্ধ হওয়ার পাশাপাশি জাপান সেনারা যদি কোনও কারণ বশত ভারতের পূর্বাংশে প্রবেশ করে তাহলেও যাতে তারা পেটের অন্ন জোগাতে অসমর্থ হয়, সেই উদ্দেশ্যে সেসব জায়গায় ‘পোড়ামাটি নীতি’ অনুসরণ করা হয়। এই নীতির মূল কাজ হল সংশ্লিষ্ট স্থানের শস্যকে পুড়িয়ে ফেলা। সাধারণ মানুষের কাছে অন্ন জোগানোই একটা বড় ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। সরকারের তরফ থেকেও তেমন কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। ফলে অন্নের অভাবে অনেক সাধারণ কৃষক নিজেদের স্ত্রী-কন্যাকে বিক্রি করে দিতে বাধ্য হয়। আলোচ্য নাটকেও দেখা যায়, অন্নের অভাবে কুঞ্জর ছেলে মাখনের মৃত্যু ঘটে। কুঞ্জর কাছে মাখনের অসুস্থতার সময় কাঁকড়া খাওয়া অপত্যের কারণ। কিন্তু প্রধানের মুখে মাখনের অসুস্থতার প্রকৃত কারণটি প্রকটিত। তার মতে এ অসুখ খাওয়ার জন্য নয়, বরং না খাওয়ার জন্যই হয়েছে। কুঞ্জকে সে জানায়— “বুঝলাম, সব বুঝলাম। কিন্তু অসুখটা কি খাওয়ার জন্যে, না, না-খাওয়ার জন্যে, সেই কথাটা জিজ্ঞেস করি?”[৩] দেশের সাধারণ মানুষ অন্নের অভাবে মারা গেলেও মুনফাদার ব্যবসায়ী মানুষ কিন্তু মন্বন্তরের সুযোগে আরও বেশি ধনবান হয়ে ওঠে। তারা কম দামে চাল কিনে দুর্ভিক্ষের সময় সেই চালই অত্যন্ত চড়া দামে বিক্রি করতে শুরু করে। নাটকের কাহিনিতে দেখা যায়, কালীধনের গোলায় চালের আধিক্য কিন্তু সে তা চড়া দামে বিক্রি করতে চায়। এক ভদ্রলোক চালের জন্য তার কাছে আসলে সে পঞ্চাশ টাকা দরের কথা জানায়। আমিনপুরবাসী অনেকেই পেটের অন্ন জোগাতে অসমর্থ হয়ে শহরমুখী হয় এই আশায়— সেখানে তারা অন্তত ভিক্ষা করে নিজেদের জীবন বাঁচাতে পারবে। কিন্তু শহরে গিয়েও অন্নের অভাবে ডাস্টবিনের নোংরা তুলে খেতে হয়েছে তাদের। স্বয়ং নাট্যকার নাটকের ভূমিকা অংশে সমসাময়িক সমাজ-পরিস্থিতিকে উল্লেখ করতে গিয়ে জানিয়েছেন—

> “পবিত্র এই স্বাধীনতা সংগ্রামে আত্মবলিদান দিতে ভারতের লক্ষকোটি প্রাণ যেমন কাতার দিয়ে দাঁড়িয়েছে, তেমনি অন্যদিকে দেখতে পাই সাম্রাজ্যবাদীর পক্ষপুটচ্ছায়ায় পুষ্ট স্বার্থান্বেষী পাইকার মহাজন আর কালোবাজারি মজুতদারের দল প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির সঙ্গে হাত মিলিয়ে

দেশের লোকের রক্ত শুষে খাচ্ছে। শরৎচন্দ্রের ভাষায় যে গোরু গোমাংসের গাড়ি টানে এরা তাদেরই স্বধর্মী। শহীদবেদীর ওপর দিয়ে সমাজদ্রোহী এই সব নর-পিশাচের শ্মশান-উল্লাস বাংলার বুকে সর্বনাশ ডেকে আনে এবং মাঠের রাজা কৃষককে ভূমিহীন নিরন্ন ভিক্ষুকে পরিণত করে। কুৎসিত শাসন আর নিরঙ্কুশ শোষণের অনিবার্য ফলে বাংলা দেশের গ্রামীণ জীবন চূড়ান্তভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ল। নেমে এল সারাদেশব্যাপী মহামন্বন্তরের করাল কালো ছায়া! কুলোর বাতাস দিয়ে আগে আগে চললেন ধূমাবতী আর তার পশ্চাতে নিরন্ন মানুষের বিরামহীন ভুখামিছিল শ্মশানের হাহাকার তুলে শহরের অলিগলি রাজপথ প্রদক্ষিণ করে ফিরতে লাগল। প্রাণের অপচয়ের সেই নিষ্করুণ ইতিবৃত্তান্ত সমগ্র জাতির জীবনে এক দুরপনেয় কলঙ্কের অধ্যায়।”[৪]

সমসাময়িক কালের সনামধন্য কবি প্রেমেন্দ্র মিত্র ‘ফ্যান’ কবিতায় সাধারণ মানুষের দুর্দশার যে চিত্র তুলে ধরেছেন তা কঠিন বাস্তবতার পরিচায়ক—

“নগরের পথে পথে দেখেছ অদ্ভুত এক জীব
ঠিক মানুষের মতো
কিংবা ঠিক নয়,
যেন তার ব্যঙ্গ-চিত্র বিদ্রূপ-বিকৃত!
তবু তারা নড়ে চড়ে, কথা বলে, আর
জঞ্জালের মতো জমে রাস্তায় রাস্তায়,
উচ্ছিষ্টের আস্তাকুঁড়ে বসে বসে ধোঁকে,
—আর ফ্যান চায়।
রক্ত নয়, মাংস নয়,
নয় কোনো পাথরের মতো ঠান্ডা সবুজ কলিজা,
মানুষের সৎভাই চায় শুধু ফ্যান।
তবু যেন সভ্যতার ভাঙে নাকো ধ্যান...।”[৫]

মন্বন্তরের কারণে মুনফাদার মানুষের জীবন কতটা স্বচ্ছল হয়েছিল তার সার্থক উদাহরণ বড়োকর্তা চরিত্রটি। সমসাময়িক সমাজ-পরিস্থিতিকে আরও প্রকটভাবে তুলে ধরবার জন্য বিজন ভট্টাচার্য নাটকে ধনবান বাড়ির বিয়ের অনুষ্ঠানের পাশাপাশি কুঞ্জর ও রাধিকার ডাস্টবিন থেকে কলাপাতা স্তূপ ঘেটে খাবার সন্ধানের চিত্র দেখিয়েছেন। অভাব-অনটনের সময়েও ধনী ব্যবসায়ীর বাড়িতে একহাজার লোক নিমন্ত্রিত। নাটকের কিছু সংলাপ উপস্থাপন করলেই বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে উঠবে—

“নির্মলবাবু : তা হলে তো রাজসিক ব্যাপার করে ফেলেছ হে দেখছি রায় মশাই, য়্যাঁ! হাজার খানেক লোক খাচ্ছে, এই বাজারে, চাড্ডিখানি কথা নয়।

২য় ভদ্রলোক : তবে!
নির্মলবাবু : তা জিনিসপত্তর ঠিক মতো জোগাড় করতে পাল্লে তো? কোনো অসুবিধে হয়নি!
বড়োকর্তা : অসুবিধে মানে, চোরাবাজার। চোরাবাজার যদ্দিন আছে ততদিন—
২য় ভদ্রলোক : তার আর কী করবে ভাই। সত্যি কথা বলতে গেলে এই চোরাবাজারটি ছিল বলে তাই এখনও কিছুতে আটকাচ্ছে না, নইলে—করবে কী লোকে বল? ব্ল্যাকমার্কেটের সুবিধে না নিয়ে উপায় কী? বেশি কী কথা, এই ধর না সামান্য চিনির ব্যাপারটাই! সংসারে গিন্নি বলেন, মাসে অতি কম দেড় মণ চিনি তাঁর চাই-ই, নইলে মানে ওদিকে সে একেবারে বুঝতেই পারছ, ডেড্‌লক, কম্‌প্লিট্‌ ডেড্‌লক। তা এখন কোথায় পাবে তুমি এই চিনি? ওপ্‌ন্‌ মার্কেটে যাও, নেই নেই নেই নেই, হাত উলটেই বসে আছে সব দোকানিরা। কোথাও পাবে না তুমি এই চিনি। কী করবে? তা ও বেঁচে থাক বাবা ব্ল্যাক মার্কেট, বেঁচে থাক আমার মজুতদার, না হয় চতুর্গুণই পয়সা নেবে, জিনিসটি তো ঠিক ঠিক পাওয়া যাবে। করব কী বল? পয়সা তো আর সঙ্গে যাবে না।”[৬]

মন্বন্তরের সময় সাধারণ মানুষের দিন চালানোও এতটাই ভার হয়েছিল যে অনেকে নিজেদের মেয়েকে বিক্রি করে দিতে বাধ্য হয়েছে। চন্দর নিজের মেয়েকে বিক্রি করে বিনিময়ে হারুদত্তের কাছে পয়সা নিতে বাধ্য হয়েছিল। এইসব মেয়েদের চালান করা হত কালীধনের মতো পয়সাওয়ালা মজুতদার মানুষদের কাছে। তারা অর্থের প্রাচুর্যে নিজেদের ভোগাকঙ্খার জন্য মেয়েদের কিনে রাখত। মন্বন্তরের পাশাপাশি মেদিনীপুর সংলগ্ন এলাকায় ঘটে যায় ভয়াবহ বন্যা। মৃত্যু হয় অনেকেরই। বন্যার জলে স্ত্রী ও সন্তানকে হারিয়ে দয়াল উন্মাদের মতো আচরণ করে। প্রধানের ঘর ভেঙে গেলে তারা গৃহছাড়া হয়ে শহরে চলে যায়। কিন্তু বন্যার কবলেই শেষ নয়, অল্প কিছুদিনের মধ্যেই শুরু হয় ভয়ঙ্কর মহামারি। হাসপাতালগুলিতে রোগীর সংখ্যা দিন দিন বাড়তে থাকে। কিন্তু সরকারের তরফ থেকে তেমন পরিমানে ওষুধের ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। নাটকে ডাক্তার চরিত্রের মুখে শোনা যায়—“বলি যে ওষুধ-পত্তরই যদি সাপ্লাই করতে না পার তো দরকার কী এই ‘শ্যাম শো’-র, বন্ধ করে দাও হাসপাতাল। হ্যাঁ, না—কোনো জবাব নেই তার। এখন বলুন, এ অবস্থায় আমরাই বা কতটুকুখানি কী করতে পারি? ভালো করে দেখে শুনে বিধি-ব্যবস্থা করতে দু ঘন্টার জায়গায় নয় দশ ঘন্টাই আমরা খাটলাম, দশখানার জায়গায় নয় দু’শখানা প্রেস্‌ক্রিপশন লিখলাম, কিন্তু ওষুধ যদি না পাওয়া যায় তো কী হবে তাতে করে বলুন!”[৭]

দুর্ভিক্ষের এই দিনগুলিতে পীড়িত মানুষের পেটের অন্ন জোগানোর চেষ্টা চালিয়ে ছিল পিপলসরিলিফ কমিটি (পি.আর.সি), বেঙ্গল রিলিফ কমিটি (বি.আর.সি), বঙ্গীয় প্রাদেশিক হিন্দু মহাসভা রিলিফ কমিটি, ভারতীয় গণনাট্য সংঘ ইত্যাদি নানা সংস্থা। মানুষের অস্তিত্বরক্ষার সেই সংকটময় মুহূর্তে মানুষের পাশে থেকে তাদের সাহায্য

করাই সংস্থাগুলিরর মূল লক্ষ্য। জানা যায়, সেই সঙ্কটময় মুহূর্তে পি.আর.সি-র পরিচালনায় ১৬৭টি লঙ্গরখানায় দুর্ভিক্ষ পীড়িত সাধারণ মানুষকে অন্নদানের ব্যবস্থা করেছিল। 'নবান্ন' নাটকেও বাজারখোলায় খিচুড়ি দেওয়ার কথা জানা যায়। তৃতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্যটি চিত্রিত হয়েছে নিখরচার লঙ্গরখানায়। সেখানে দীনদরিদ্র মানুষদের বিনা খরচায় খাবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। খাবার সময় হলে ঘন্টাধ্বনির মধ্য দিয়ে জানান দেওয়া হত। বেঙ্গল রিলিফ কমিটি ও বঙ্গীয় প্রাদেশিক হিন্দু মহাসভা রিলিফ কমিটি মিলে ৩৫ লক্ষের অধিক টাকা সংগ্রহ করেছিল দুর্ভিক্ষ পীড়িতদের সাহায্য করতে। গণনাট্য সংঘ সারা দেশে নাটক অভিনয় করে অর্থ সংগ্রহ করত এবং তা দুর্ভিক্ষ পীড়িতের সাহায্যে প্রেরণ করত।

চতুর্থ অঙ্কে আমরা দেখি নিরঞ্জন ও তার স্ত্রী বিনোদিনী বাড়ি ফিরে এসে চাষাবাদ করছে। একদিন রাতে প্রধান সমাদ্দারের বাড়ির খোঁজ করতে করতে কুঞ্জর ও তার স্ত্রী রাধিকাও গ্রামে ফিরে আসে। সবাই মিলে মনের সুখে ধান ঝাড়ার কাজ করে। কিছুধান তারা ধর্মগোলায় তুলেও রাখে। গ্রামের মানুষ আনন্দে 'নবান্ন উৎসব' পালন করে। সেখানে গ্রামীণ সংস্কৃতির পরিচায়ক হিসেবে আমরা লাঠিখেলা, মোরগ লড়াই, গরুদৌড় খেলার চিত্র দেখতে পাই। গ্রামের এই সুখময় মুহূর্তে প্রধানও গ্রামে ফিরে আসে। এমত একটি মিলনান্তক পরিস্থিতিতে কাহিনির পরিসমাপ্তি ঘোষিত হয়। মিলনান্তক সমাপ্তি প্রসঙ্গে সমালোচকের মত—

> "আনন্দমুখর উৎসবের পরিবেশে নাটকের কেন শেষ হইল তাহার একটা ব্যাখ্যা দেওয়া যাইতে পারে। কমিউনিস্ট মতবাদে বিশ্বাসী কোন নাট্যকারই তাঁহার নাটকের পরিণাম দেখাইতে পারেন না পরাজয়ে, বিষাদে, মৃত্যুতে। নাটকের পরিণাম তাঁহাকে দেখাইতে হয় সঙ্ঘবদ্ধ গণশক্তির অভ্যুত্থানে, জয়ে, আনন্দে। শিল্পের দাবী, রসের দাবী বড় নহে, বড় এখানে মতবাদ নিয়ন্ত্রিত তত্ত্বের দাবী। মন্বন্তর এখানে শেষ কথা নহে, শেষ কথা হইল মন্বন্তর হইতে উত্তরণ—নবান্ন উৎসব। যাহা কাম্য তাহাই দেখান হইয়াছে, যাহা শিল্পরীতির দিক দিয়া অনিবার্য তাহা দেখান হয় নাই।"[৮]

'নবান্ন' নাটকটি ভারতীয় গণনাট্য সংঘ কর্তৃক প্রযোজিত হয়। গণনাট্যের রীতি অনুসারে এখানে সমস্যার পাশাপাশি তার থেকে মুক্তির উপায়ও বিজন ভট্টাচার্য দেখিয়েছেন। কাহিনির সমাপ্তি দেখাতে গিয়ে সকল চরিত্রকে অপ্রাসঙ্গিকভাবে একস্থানে জড়ো করেছেন। কেবল এ অংশটিকে পরিহার করলে সমকালের অস্থিরতার যে চিত্র নাট্যকার তুলে ধরতে চেয়েছেন তা সার্থকভাবে কাহিনিতে উঠে এসেছে।

তথ্যসূত্র :-

১. চৌধুরী, দর্শন, গণনাট্য আন্দোলন, অনুষ্টুপ, কলকাতা—০৯, প্রথম প্রকাশ ১৯৯৪, পরিমার্জিত ও পরবর্ধিত তৃতীয় সংস্করণ, ডিসেম্বর ২০০৯; পৃ ৭৫।

২. তদেব; পৃ ১১৭।

৩. ভট্টাচার্য, বিজন, রচনা সমগ্র—১, নবারুণ ভট্টাচার্য ও শমীক বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পাদক), দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা—৭৩, প্রথম প্রকাশ ২০০৮, পুনর্মুদ্রণ ২০১৬, পৃ ৫৮।

৪. তদেব, ভূমিকা অংশ।

৫. মিত্র, প্রেমেন্দ্র, প্রেমেন্দ্র মিত্রের সমগ্র কবিতা, গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড, প্রথম সংস্করণ ২৫ বৈশাখ, ১৩৯৬, পৃ ৯৮।

৬. ভট্টাচার্য, বিজন, রচনা সমগ্র—১, নবারুণ ভট্টাচার্য ও শমীক বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পাদক), দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা—৭৩, প্রথম প্রকাশ ২০০৮, পুনর্মুদ্রণ ২০১৬, পৃ ৭৮।

৭. তদেব, পৃ ৯৩—৯৪।

৮. ঘোষ, ড. অজিতকুমার, বাংলা নাটকের ইতিহাস, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পঞ্চম সংস্করণ, আশ্বিন ১৪২৩, পৃ ৩৭৮।

বাংলা চলচ্চিত্র ও নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

অন্তরা দাস
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ,
বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়

Abstract: বাংলা সাহিত্য এবং বাংলা চলচ্চিত্রের পারস্পরিক সম্পর্কটি বহু প্রাচীন। বাংলা চলচ্চিত্র তার শৈশব থেকেই সাহিত্যের হাত ধরে বেড়ে উঠেছে। অন্যদিকে চলচ্চিত্রের দৃশ্য-শ্রাব্যের অভিনব মাধ্যম, জনসংযোগের অভাবনীয় ক্ষমতা, বিপুল জনপ্রিয়তা এবং অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্য আকৃষ্ট করেছে বাংলার সাহিত্যিকদের। বিশ শতকের কথাসাহিত্যিকদের অনেকেই চলচ্চিত্রের সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িয়ে পড়েছেন। তাঁদের মধ্যে অনেকেরই সাহিত্যকে প্রভাবিত করেছে বাংলা চলচ্চিত্র। আবার এর ঠিক বিপরীতে এমন অনেকেই ছিলেন, যাঁরা চলচ্চিত্র-শিল্পের সঙ্গে সংযুক্ত থেকেও নিজেদের সাহিত্যিক সত্তাটিকে প্রভাবিত হতে দেননি। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় তাঁদের মধ্যে অন্যতম। তিনি বাংলা চলচ্চিত্রের অঙ্গনে সাবলীল হাঁটাচলা করেছেন, কিন্তু ছায়াছবির মায়াডোর তাঁকে বেঁধে রাখতে পারেনি। বিনোদনের বাইরেও চলচ্চিত্র সম্পর্কে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ব্যক্তিগত একটি দর্শন ছিল। তিনি চলচ্চিত্রের কাহিনি, চিত্রনাট্য, সংলাপ এবং গান রচনা করেছেন। বলাবাহুল্য বাংলা চলচ্চিত্র না থাকলে গীতিকার নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের পরিচয়টি আমাদের কাছে অজ্ঞাতই থেকে যেত।
Keywords: নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, সাহিত্য, চলচ্চিত্র, সিনেমা, সাহিত্য ও চলচ্চিত্র, গীতিকার নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রথম গল্প 'নিশীথের মায়া' ১৩৪২ বঙ্গাব্দে 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এই সূত্র ধরে ১৩৪২ বঙ্গাব্দ থেকে যদি তাঁর সাহিত্যিক জীবনের কাল গণনা করি, তাহলে দেখতে পাই ততদিনে সজনীকান্ত দাস, নজরুল ইসলাম, প্রেমাঙ্কুর আতর্থী, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র, তুলসী লাহিড়ী, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য প্রমুখ সাহিত্যিক চলচ্চিত্র-জগতের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত হয়ে পড়েছেন। তাছাড়া বাংলা চলচ্চিত্রে ততদিনে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, অমৃতলাল বসু, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ সাহিত্যিকদের একাধিক সাহিত্যকর্ম চলচ্চিত্রে রূপায়িত হয়ে গেছে। অর্থাৎ ১৩৪২ বঙ্গাব্দের মধ্যেই বাংলা চলচ্চিত্রের সঙ্গে বাংলা সাহিত্যের সম্পর্কটি নিবিড় হয়ে উঠেছিল। সাহিত্য-চলচ্চিত্রের মধ্যে ঘনীভূত পারস্পরিক সম্পর্কের পরিমণ্ডলে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় যখন সাহিত্য জগতে উদিত হলেন, তখন চলচ্চিত্রের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কটি কেমন হল, চলচ্চিত্রের সঙ্গে তাঁর আদান-প্রদানের জায়গাটি কেমন হয়ে উঠেছিল এবং চলচ্চিত্র সম্পর্কে তাঁর ব্যক্তিগত দর্শনটি কেমন ছিল, এই বিষয়গুলির উপর আমরা আলোক সম্পাতের চেষ্টা করব।

১৯১৭ খ্রিস্টাব্দে বাংলার মাটিতে নির্মিত হয় প্রথম চলচ্চিত্র 'সত্যবাদী রাজা হরিশচন্দ্র'। আর ১৯২১ সালে গিরিশচন্দ্রের নাটক অবলম্বনে বাংলার মাটিতে নির্মিত হয় প্রথম সাহিত্যাবলম্বী চলচ্চিত্র 'নল দময়ন্তী'। 'নলদময়ন্তী'কে কেন্দ্র করেই বাংলা সাহিত্য আর বাংলা চলচ্চিত্রের আনুষ্ঠানিক মেলবন্ধন রচিত হয়। চলমান চিত্রমালার আলোছায়ার রহস্য একদিকে যেমন বাংলার আপামর জনগণকে আকর্ষিত করেছিল, তেমনি বাংলার শিল্প-সাহিত্যের মহান স্রষ্টাগণও এই অভূতপূর্ব শক্তিশালী মাধ্যমের আকর্ষণকে এড়িয়ে যেতে পারেননি। ১৯৩১ সালে যখন নির্বাক চলচ্চিত্র সবাক হয়ে উঠল তখন যে তার ক্ষমতা শুধু অসীম হয়ে উঠল এমনটাই নয়, সেই সঙ্গে সাহিত্যজগতের প্রতি তার নির্ভরতা আরো বেশি করে বৃদ্ধি পেতে থাকল। কেননা নির্বাক যুগের চলচ্চিত্রে চিত্রনাট্য থাকলেও, তা ছিল দৃশ্যপ্রধান। চলচ্চিত্রের সবাক যুগে চিত্রনাট্যে প্রধান হয়ে উঠল 'সংলাপ'। সংলাপ– যা কিনা নাটকেরও প্রধান উপকরণ, আর কথাসাহিত্যেরও অন্যতম অবলম্বন। সংলাপ ছাড়াও সবাক চলচ্চিত্রের আরেকটি আকর্ষণের জায়গা ছিল চলচ্চিত্রায়িত সংগীত বা গান। বাংলা প্রচলিত গানের পাশাপাশি চলচ্চিত্রের জন্যই রচিত হল গান। কিন্তু চলচ্চিত্রের সবাক যুগের আরো একটি বিশেষ চাহিদা সাহিত্যজগৎকে চলচ্চিত্রের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ করে তুলেছিল– সেটি হল, চলচ্চিত্রের 'কাহিনি'। ভারতীয় চলচ্চিত্র-সহ বাংলা চলচ্চিত্রেরও মুখ্য প্রবণতা কাহিনি-বর্ণন। এই প্রবণতার জন্যই চলচ্চিত্রকে প্রথম থেকেই সাহিত্যের মুখাপেক্ষী থাকতে হয়েছে। আমরা জানি এই নির্ভরতার প্রাবল্য দেখেই রবীন্দ্রনাথ চলচ্চিত্রের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আশঙ্কা করে বলেছিলেন–

> ... আমার বিশ্বাস ছায়াচিত্রকে অবলম্বন করে যে নূতন কলারূপের আবির্ভাব প্রত্যাশা করা যায় এখনো তা দেখা দেয়নি। ...আপন সৃষ্টিজগতে ছায়াচিত্র এখনো পর্যন্ত সাহিত্যের চাটুবৃত্তি করে চলেছে— তার কারণ কোনো রূপকার আপন প্রতিভার বলে তাকে দাসত্ব থেকে উদ্ধার করতে পারেনি।[১]

'সাহিত্যের চাটুবৃত্তি' করার প্রবণতা আজও অব্যাহত রয়েছে, তবে উনিশ শতকের পাঁচের দশক থেকে বাংলা চলচ্চিত্র সাহিত্যকে নতুন ভাষ্য দিতে সক্ষম হয়েছে। চলচ্চিত্রাকাশে উদিত হয়েছেন নবীন 'রূপকার', যাঁদের 'প্রতিভার বলে' 'পথের পাঁচালী' বা 'অযান্ত্রিক'-এর মতো চলচ্চিত্রে সাহিত্যের দাসত্ব-শৃঙ্খলছিন্ন হয়েছে।তবে সংখ্যালঘিষ্ঠ এই প্রতিভাদের অতিক্রম করে সাহিত্য-অনুকৃতির ধারাটি ক্রমাগত পুষ্ট হতে থেকছে বাংলা চলচ্চিত্রে।

'চলচ্চিত্র আন্দোলন' বা 'সিনে ক্লাব'-এর তরঙ্গ মুষ্টিমেয় দর্শককে চলচ্চিত্রের শিল্পধর্ম অনুধাবনে আগ্রহী করলেও অধিকাংশ দর্শকের কাছে আজও চলচ্চিত্র মানে একটি পুষ্ট কাহিনির চিত্ররূপ। এই অর্থে বাংলা গল্প-উপন্যাসের সাধারণ পাঠক আর বাংলা চলচ্চিত্রের সাধারণ দর্শকের মধ্যে কোনো ফারাক নেই–উভয়েই আস্বাদ করতে চায় একটি কাহিনি। হয়তো এই কারণেই চলচ্চিত্র বা সিনেমা বাংলার দর্শকের

অজ্ঞাতেই 'বই' হয়ে উঠেছে।ভারতীয় চলচ্চিত্র কাহিনির গুরুত্বকে সর্বদাই স্বীকার করে নিয়েছে। 'নিউ থিয়েটার' বা 'বম্বে টকীজ'-এর মতো চলচ্চিত্র নির্মাতা-সংস্থাগুলিতে চলচ্চিত্রের কাহিনি রচনা করার জন্য রীতিমতো সাহিত্যকদের মাইনে করে রাখা হত। 'নিউ থিয়েটার্স'-এর কাহিনিকারদের মধ্যে সাহিত্যিক শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় এবং 'বম্বে টকিজ'-এর কাহিনিকার হিসাবে শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম আমাদের বিদিত। এখন প্রশ্ন হল সাহিত্যিকেরা কি চলচ্চিত্রের এই আশ্রয়ে খুশি ছিলেন? সেলুলয়েডকে কি তাঁরা কালি-কলমের মতো সমান আদরে গ্রহণ করতে পেরেছিলেন? এর উত্তর– না, পারেননি। অধিকাংশ সাহিত্যিকই পারেননি। সাধারণভাবে এর কারণ হিসাবে বলা যায় চলচ্চিত্রের দাসত্ব। রবীন্দ্রনাথের উক্তির বিপ্রতীপে বলা যায়– চলচ্চিত্রের প্রলোভন সাহিত্যিকদের চলচ্চিত্রের চাটুবৃত্তি করতে বাধ্য করে তুলেছিল। কেন? এর অন্যতম কারণ– অর্থ। বনফুল তাঁর দিনিলিপিতে এ কথা স্পষ্ট করে বলেছেন–

> সিনেমার ক্ষেত্রে নায়ক-নায়িকা এবং বক্স-অফিসই প্রধান। সাহিত্য, সাহিত্যিক বা শিল্প সেখানে গৌণ। ব্যবসাটাই আসল। কিন্তু সাহিত্যিকদের তবু ওরা ছাড়েনা। কিছু টাকা দিয়ে তাদের গল্পটা কিনে সেটা দুমড়ে-মুচড়ে এমন কাণ্ড করেন যে অনেক সময় শিউরে উঠতে হয়। সাহিত্যিকেরা গরীব, তাই তারা সব জেনেও কিছু টাকার লোভে গল্প বিক্রি করেন।[২]

একই কথা বলেছেন শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়–

> সাহিত্যকে বাঁচাবার জন্যই আমি গিয়েছিলাম সিনেমায়। একমাত্র সাহিত্যকে উপজীবিকা করে তখনকার দিনে বেঁচে থাকা সম্ভব ছিল না।[৩]

ইনকাম ট্যাক্স অফিসারকে লেখা একটি চিঠিতে তারাশঙ্কর বন্দোপাধ্যায়ও তাঁর উপার্জনের সংস্থান হিসাবে চলচ্চিত্রের উপর নির্ভরশীলতার কথা জানিয়েছেন–

> আমি পেশায় একজন গ্রন্থকার। সুতরাং সমস্ত উপার্জন নির্ভর করে আমার পরিশ্রমের উপর। ... আমাদের উপার্জনের একটি বিশেষ অংশ ছায়াছবি হইতে আসিয়া থাকে। বর্তমান বৎসরে স্বাস্থ্যের জন্য ছায়াছবির কোন কর্ম গ্রহণ করিতে পারি নাই। এই হিসাবে বর্তমান বৎসরে আমার আয় যৎসামান্যই হইবে।[৪]

সাহিত্য অন্য মাধ্যমে নতুন ভাষ্যে বৃহত্তর জনগণের কাছে পৌঁছে যাক, এই আগ্রহের থেকে সাহিত্যের স্বত্ব বিক্রি হলে আয়ের সংস্থান হবে, এই আবশ্যিকতা যখন প্রধান হয়ে ওঠে তখন সাহিত্যিকের পক্ষে আপোশের সঙ্গে লড়াইটা দুরূহ হয়ে পড়ে। অনেকের ক্ষেত্রে হয়েওছিল তাই। এই কারণে তাঁরা চলচ্চিত্রের সংসর্গকে শ্লাঘায় গ্রহণ করতে পারেননি। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ক্ষেত্রে প্রাথমিকভাবে এই দায় ছিল না। কেননা সাহিত্যকেই কখনো তাঁর উপার্জনের একমাত্র আশ্রয় হিসাবে গ্রহণ করতে হয়নি। ১৯৪০ সালে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের বিবাহ-পরবর্তী সংসার জীবনের পথচলা

শুরু হয়, আর ১৯৪২ সালে তিনি জলপাইগুড়ির জ্ঞানেন্দ্র চন্দ্র কলেজে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক হিসাবে চাকরিতে যোগদান করেন। চাকরিতে যোগদানের আগে তিনি 'রাঙাবউ' চলচ্চিত্রের জন্য গান রচনা করেছিলেন ঠিকই, কিন্তু এই একটি মাত্র চলচ্চিত্র। এর পর চলচ্চিত্রের জন্য তিনি যা-কিছু রচনা করেছেন, তার সবই ১৯৪২ পরবর্তী। এই তথ্যের বিচারে আমরা ধরে নিতে পারি অর্থ উপার্জনের জন্য নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়কে চলচ্চিত্রের মুখাপেক্ষী হতে হয়নি।

চলচ্চিত্র-জগতের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ার জন্য শৈলজানন্দ তাঁর রচনায় একাধিকবার কৈফিয়ত দিয়েছেন।

> সাহিত্যকে বাঁচাবার জন্যই আমি গিয়েছিলাম সিনেমায়।... তাছাড়া চেয়েছিলাম সিনেমার গল্পও সত্যিকারের গল্প হয়ে উঠুক! সাহিত্যের স্পর্শ না পেলে সিনেমাশিল্পের দুর্দিন ঘনিয়ে আসতে দেরি হবে না! এমন সব নানা চিন্তা আমাকে সিনেমার দিকে টেনেছিল।[৫]

অনুমান করতে পারি এই কৈফিয়তের পিছনে রয়েছে সাহিত্যিক-সত্তার গ্লানিবোধ। তারাশঙ্কর এর বিপরীত ভঙ্গিতে নিজের আত্মকথামূলক রচনাগুলিতে নীরব থেকেছেন। ('আমার সাহিত্য-জীবন', দুই খণ্ড, এই গ্রন্থে তারাশঙ্করের স্মৃতিকথার বিস্তৃতি ১৯১৬ থেকে ১৯৪৯ সাল পর্যন্ত। 'আমার কথা' গ্রন্থে আত্মকথার পরিধি ১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৬৭-৬৮ সাল পর্যন্ত।) নিজের কথা বলতে গিয়ে তিনি একথা-সেকথার পুনরুক্তি করেছেন, অথচ চলচ্চিত্র প্রসঙ্গে এতটাই চুপ থেকেছেন, যেন চলচ্চিত্র-জগতের সঙ্গে তাঁর কোনো যোগাযোগই ছিল না। অথচ আমরা জানি তিনি চলচ্চিত্রের জন্য গান লিখেছেন, সংলাপ লিখেছেন, চিত্রনাট্য লেখার চেষ্টা করেছেন এবং তাঁর জীবৎকালে তাঁরই সাহিত্য নিয়ে মুক্তি পেয়েছে ২৭টি চলচ্চিত্র। অন্য দিকে বনফুলকে চলচ্চিত্রের সঙ্গে সাহিত্যিকের ঘনিষ্ঠতা প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি কিছুটা বিরক্ত হয়ে কৈফিয়ত দিয়েছিলেন–

> সাহিত্যিকদের সঙ্গে সিনেমার কি সম্পর্ক হওয়া উচিত, আপনি জানতে চেয়েছেন। সম্পর্কটা একটা বিশেষ ধরনের হবে, একথা আপনি ভাবছেন কেন? দর্শক, প্রযোজক, অভিনেতা, অভিনেত্রী, ক্যামেরাম্যান প্রভৃতি বহু লোকের সিনেমার সঙ্গে যে সম্পর্ক, সাহিত্যিকের সঙ্গেও সিনেমার সেই সম্পর্ক হওয়া সম্ভব– অর্থাৎ টাকার সম্পর্ক। কারণ একথাটা তো সুবিদিত যে সাহিত্যকেরাও মানুষ, তাঁদেরও বাঁচতে হবে। প্রাচীনযুগে সাহিত্যকেরা রাজানুগ্রহে সাহিত্য-চর্চা করতেন। মাঝে মাঝে অবশ্য রাজার মহিমাকীর্তন করতে হত তাঁদের।... এখন জনগণই রাজা। সুতরাং জনপ্রিয় শ্লোগান কীর্তন করে এখনও অধিকাংশ সাহিত্যিকদের বাঁচতে হবে। সিনেমা যদি সেই ধুয়ার বাহন হয়, অর্থ এবং স্বাচ্ছন্দ্যের বিনিময়ে কবি নিশ্চয়ই সুর দেবেন তাতে। এতে যে তাঁদের সাহিত্য-ধর্মচ্যুতি ঘটবেই এমনও কোন কথা নেই।...[৬]

বলা বাহুল্য নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের এই ধরনের কৈফিয়ত দেওয়ার কোনও দায় উপস্থিত হয়নি। তিনি স্বেচ্ছায় চলচ্চিত্র-জগতে যুক্ত হয়েছিলেন এবং তার জন্য কখনো গ্লানিবোধ প্রকাশ করেননি। চলচ্চিত্রের প্রতি আগ্রহের কারণেই তিনি চলচ্চিত্রের জন্য চিত্রনাট্য, সংলাপ, গান রচনা করেছেন। চলচ্চিত্র থেকে উপার্জনকে তিনি বিশেষ প্রাধান্য দেননি। প্রাধান্য দেননি বলেই তপন সিংহ যখন তাঁর কাছে 'সৈনিক' গল্পের চলচ্চিত্র-স্বত্ব কিনতে যান, তখন তপন সিংহের আগ্রহ এবং সৃজন-ভাবনায় আনন্দিত হয়ে গল্পটিকে তিনি নিঃশর্তে দিতে চেয়েছিলেন:

> সাহিত্যিক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় তখন থাকতেন হ্যারিসন রোডের কাছাকাছি পটলডাঙা স্ট্রিটে। একদিন গেলাম তাঁর কাছে। তাঁর ছোটগল্প 'সৈনিক' অবলম্বনে আমার প্রথম ছবি করবার কথা ভেবেছিলাম। নারায়ণবাবু একজন অমায়িক, উদার এবং সত্যিকারের বিদগ্ধ মানুষ ছিলেন।... 'সৈনিক' সম্পর্কে আমার ইচ্ছার কথা শুনে প্রথমটায় অবাক হয়ে গেলেন। তারপর খুশি হয়ে বললেন, 'এই তো চাই! আপনাদের মতো তরুণেরাই এই সব গল্প ভাববেন।' আমার বেশ মনে আছে দক্ষিণার কথা তুলতেই তিনি বলেছিলেন, 'কিছু চাই না। আপনার সাহসই আমার দক্ষিণা'[৭]

বাংলা চলচ্চিত্র এবং চলচ্চিত্র-জগৎ সম্পর্কে তিনি অবগত ছিলেন। অবগত ছিলেন চলচ্চিত্রের ভাষ্য সম্পর্কেও। চলচ্চিত্র সম্পর্কে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ভাবনা-চিন্তা কেমন ছিল, তাঁর রচিত প্রবন্ধ সূত্রেই এখন আমরা সে-বিষয়ে কিছুটা ধারণা লাভের চেষ্টা করব।

চলচ্চিত্রের সঙ্গে বাণিজ্য শব্দটি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। চলচ্চিত্র-সমালোচকেরা 'বাণিজ্যিক-ছবি' নামের একটি শ্রেণিবিভাগের অবতারণা করে চলচ্চিত্রের আলোচনা করে থাকেন। বলা বাহুল্য 'বাণিজ্যিক' বিশেষণটি চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে আজও নিন্দা-সূচক অর্থেই ব্যবহৃত হয়। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় চলচ্চিত্রের বাণিজ্যিক দিকটিকে অস্বীকার করেননি এবং নিন্দার দৃষ্টিতেও দেখতে চাননি। তিনি মনে করেছেন–

> ...সাধারণভাবে একটি ভালো ছবি হবে এবং অর্থকারী দিকটাও থাকবে, অধিকাংশ প্রযোজক-পরিচালকের এইটিই যুক্তিসঙ্গত বাসনা। মোটামুটি কাকতালীয় বর্জিত, সাজ ভাব আর আবেগ-নির্ভর আতিশয্যহীন নিশ্চিত নাটকীয়তার একটি পরিচ্ছন্ন বিন্যাস– এই সব গুণগুলো থাকলেই একালের দূরন্ত পরীক্ষামূলক কিংবা দুঃসাহসী ছবির যুগেও একেবারে নিন্দিত হওয়ার ভয় নেই, তাছাড়া ব্যবসার জন্যেই যখন ছবি করা– তখন আর্থিক দিকটাও ভাবতে হবে নিশ্চয়ই।[৮]

সাহিত্যাবলম্বী চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে 'পরিচালকের স্বাধীনতা' একটি পরিচিত বিষয়। পরিচালক চিত্রনাট্যের প্রয়োজনে সাহিত্যের কাহিনির অংশবিশেষ গ্রহণ,বর্জন এবং

পরিবর্তন করে থাকেন। আর একে কেন্দ্র করেই সাহিত্য-চলচ্চিত্রের মধ্যে শুরু হয় চিরন্তন দ্বন্দ্ব। আমরা জানি 'অরণ্যের দিনরাত্রি', অভিযান, 'মঞ্জরী-অপেরা', হাঁসুলী বাঁকের উপকথা', 'অন্তরমহল' ইত্যাদি অসংখ্য চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে সমালোচকেরা সাহিত্য বিচ্যুতির অভিযোগে মুখর হয়ে উঠেছেন। চলচ্চিত্র সাহিত্যের পদাঙ্ক অনুসরণ করেই ঘটনার পর ঘটনা বিবৃত করুক, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় এমনটা মনে করতেন না।তিনি মনে করতেন, চলচ্চিত্র সাহিত্যের ব্যঞ্জনা পরিবর্তন করেও যদি তার অভিপ্রায়কে নিজের ভাষ্যে প্রকাশ করতে পারে তাহলে সেটি সার্থক সৃষ্টি হয়ে উঠবে। তাঁর এই ভাবনার নিরিখে তিনি হেনরি কিং পরিচালিত আর্নেষ্ট হেমিংওয়ের 'দ্য স্নোজ অভ কিলিমন্‌জারো' গল্প অবলম্বনে নির্মিত সমনামের চলচ্চিত্রটির দৃষ্টান্ত উপস্থিত করেছেন। উক্ত চলচ্চিত্রের পরিণতি, গল্পের পরিণতি থেকে ভিন্ন হয়ে গল্পের ব্যঞ্জনাকে পরিবর্তিত করেছে। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় বলেছেন–

> তাহলে গল্পকেও আমরা ব্যঞ্জনার দিক থেকে বদলাতে পারি। কিন্তু 'দ্য স্নোজ অভ কিলিমন্‌জারো'তে যেমন মূল গল্পটির সব 'ইন্টেনসিটি' (শব্দটার ভালো বাংলা পাচ্ছি না) পাওয়া যাচ্ছে, অথচ মনে হচ্ছে হেমিংওয়ের যেটুকু লেখা উচিত ছিল অথচ লেখেননি– সেটুকুও আমাদের এনে দেওয়া হয়েছে, তখন অন্তত আমার মতো পাঠক ও দর্শকের অভিযোগ করবার বেশি কারণ থাকে না।[৮]

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় অন্যের কাহিনি থেকে অন্তত পাঁচটি চিত্রনাট্য রচনা করেছিলেন। চিত্রনাট্য রচনার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে তিনিগল্প এবং উপন্যাস অবলম্বনে নির্মিত চলচ্চিত্র প্রসঙ্গে সুচিন্তিত মতামতলিপিবদ্ধ করে গেছেন। উপন্যাস অবলম্বনে নির্মিত চলচ্চিত্র সম্পর্কে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গিটি ব্যক্ত করতে গিয়ে তিনি জানিয়েছেন–

> ইরিডিয়াম পয়েন্ট কলম আর প্রক্ষেপিত-আলোর কলম দুরকমভাবে গল্প বলে। কাজেই লেখার গল্পকে ছবির গল্পে রূপান্তরিত করার জন্যে রীতির পার্থক্য অবলম্বন করতেই হবে। উপন্যাস আর চিত্রনাট্যে তফাৎ থাকবে– থাকতে বাধ্য। কিন্তু রূপান্তর হলেই যে গোত্রান্তর হবে এ যুক্তি গ্রাহ্য নয়। উপন্যাসকে সিনেমা করতে হবে এর চাইতেও বড় কথা হল– সিনেমাকে উপন্যাস করে তোলা দরকার।[৯]

কিন্তু উপন্যাসের মধ্যে লেখক একেশ্বর– সমগ্র জীবন, সমস্ত দেশ তাঁর সম্মুখে বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্যের মতো পরিব্যপ্ত হয়ে থাকে। ঔপন্যাসিক আখ্যান পরম্পরায় চরিত্রের মধ্য দিয়ে বয়ন করে চলেন তাঁর আত্মদর্শন। কখনো সময়ের অভিঘাত কখনো মানুষের চিরন্তন চাওয়া-পাওয়াগুলিই কারুকাজের মতো ফুটে ওঠে আখ্যানের শরীরে। উপন্যাস রচনার সময় লেখক মুক্ত। রচনার পরিমাপ এবং পরিসর সম্পর্কে তিনি পূর্ণ স্বাধীনতা উপভোগ করেন। কিন্তু চলচ্চিত্র পরিচালক কাহিনির পরিসর আর পরিমাপের কাছে

পরাধীন।প্রযোজকের অর্থ এবং চলচ্চিত্রের দৈর্ঘ্যের গণ্ডিকে তিনি চাইলেও অতিক্রম করতে পারেন না। সে-কারণে উপন্যাসের বিস্তৃত কাহিনির ইন্টেনসিটি বজায় রেখে 'ব্লক-স্টোরি'র নির্মাণের গুরুত্বপূর্ণ দায়ভার তাঁকে গ্রহণ করতে হয়। উপন্যাস গুণ রক্ষা করে চলচ্চিত্র নির্মাণের প্রক্রিয়া সম্পর্কে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যেয় বলেছেন–

> প্রযোজক-পরিচালক যদি সন্ধানী দৃষ্টি মেলে রাখেন, তাহলে উপন্যাসের সমস্ত বিস্তৃতির অন্তরাল থেকে এই ভালোলাগাটুকু ছেঁকে নেওয়া তাঁর পক্ষে কঠিন নয়। তারপরে আসবে চিত্রনাট্যকারের পালা। যা ইঙ্গিতে আছে, তাকে তিনি সঞ্চারিত করবেন সংলাপে, যা বিবৃতিতে আছে, তাকে তিনি বিন্যস্ত করবেন ঘটনায়, যা বিলম্বিত-লয়ে বাঁধা আছে, তাকে তিনি চলচ্চিত্রের উপযোগী দ্রুতলয়ে গতিবান করে তুলবেন। এই কাজ যদি রসবোদ্ধা চিত্রনাট্যকার দায়িত্বের সঙ্গে করে উঠতে পারেন তাহলে দেখা যাবে, চমৎকার ছবি হয়েছে এবং উপন্যাসও পরোধর্মের মধ্যে গিয়ে বিনষ্টি লাভ করেনি। লাভের মধ্যে এই হবে– ঔপন্যাসিকের স্বচ্ছন্দ অবাধ মন যে নতুন সত্যকে আবিষ্কার করেছে, ছায়াচিত্রের দর্শক পর্দায় সেই নতুনের সন্ধান পাবে।[১০]

ছোটগল্পকে চলচ্চিত্রে চিত্রায়িত করার ক্ষেত্রে পরিচালক অনেক বেশি স্বাধীনতা লাভ করেন। গল্পের সংক্ষিপ্ত পরিসরে না-বলা কথাগুলিকে পরিচালক নিজ-পাঠে চলচ্চিত্রে উপস্থাপনের সুযোগ পান। তবে সে-ক্ষেত্রেও পরিচালককে একটি বিষয়ে সচেতন থাকতে হয়, লেখকের দর্শন এবং অভিপ্রায় মুদ্রিত গল্পে যেভাবে পরিস্ফুট হয়ে ওঠে, চলচ্চিত্রের কাহিনি যেন তার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন না হয়ে পড়ে। তা না হলে যে-গল্পটিকে অবলম্বন করে পরিচালক চলচ্চিত্র নির্মাণ করছেন সেই গল্পটিকে গ্রহণ করার কোনও অর্থ থাকে না। নারয়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ছোটগল্পের চিত্রনাট্য নির্মাণ প্রসঙ্গে বলেছেন–

> চিত্রনাট্যকারের আসল শক্তির পরিচয় হল ছোট গল্পকে বাড়িয়ে অন্তত হাজার দশেক ফুট একটি ছবিতে দাঁড় করিয়ে দেওয়ায়। ...কিন্তু ছোট গল্পকে বড়ো ছবি করতে হলে সেখানে অনেক বেশি দরকার হয় সাহিত্য-বুদ্ধির, লেখকের যৎসামান্য ইঙ্গিত-সংকেতের দিকে লক্ষ্য করতে হয়— কোথায় কতটুকু বাড়িয়ে নিলে মূল গল্পকে অতিক্রম করা হয় না, তার বক্তব্যের আরো উদ্ভাস আনা যায়— এগুলি সম্পর্কে প্রায় নিষ্ঠাবান ভক্তের মতো সজাগ থাকতে হয়। যে-সব ক্ষেত্রে পরিচালক গল্পকে ছাড়িয়ে তাকে অন্যতর রসে উত্তীর্ণ করে দিতে চান— সেখানে স্বতন্ত্র কথা; তাতে ছবি গল্পকে সার্থকতর করতে পারে আবার হত্যা করেও বসতে পারে। কিন্তু গল্পের মূল আবেদনটুকু বাঁচিয়ে রেখে তাকে বিবর্ধিত করার দায় অনেক, সেখানে লেখকের সঙ্গে চিত্রনাট্যকারের সহমর্মিতা দরকার, অন্তত ছবিটি দেখে লেখক ভাবতে পারেন: গল্পটা এভাবে

আমিও বাড়াতে পারতাম, কিম্বা ঠিক এই পরিবর্ধনটিকে আমি স্বচ্ছন্দে অনুমোদন জানাতে পারি।[১১]

আমরা অনুধাবন করতে পারি, চিত্রনাট্য রচনা এবং চলচ্চিত্রের কলাকৌশল সম্পর্কেও নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের দৃষ্টিভঙ্গিটি স্বচ্ছ এবং শিল্পনিষ্ঠ ছিল। নবতরঙ্গ চলচ্চিত্র আন্দোলনে উদ্বুদ্ধ হয়ে যে-সমস্ত পরিচালকগণ চলচ্চিত্রে রূপক এবং প্রতীক ব্যবহারে আতিশয্য দেখাতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় তাঁদেরকে তীব্র শ্লেষে অস্বীকার করেছেন। 'সুনন্দর জার্নাল'-এ 'চলচ্চিত্র চিন্তা' প্রবন্ধে তিনি বলেছেন–

সর্বান্তঃকরণে মার্জনা চেয়ে বলছি, বাংলা ছবি সম্পর্কে আমি আতকঙ্কিত। ইদানীং কালে তাতে প্রতীকের যে সূক্ষ্ম কারুকার্য আরম্ভ হয়েছে, তা ক্রমশই আমার কাছে দুরূহ দুষ্প্রবেশ্য হয়ে উঠেছে। একটি গরু দড়ি ছিঁড়ে বারবার ছুটে বেড়াচ্ছে, তাই দেখে নায়িকার সুগভীর অন্তর্দ্বন্দ্ব অনুমান করে নিতে হবে– এতখানি কল্পনাশক্তি আমার নেই। অতএব বাংলা ছবি সম্পর্কে কোন মন্তব্য আমি করব না।[১২]

বাংলা চলচ্চিত্র না থাকলে, গীতিকারনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের পরিচয়টি আমাদের অজ্ঞাত থেকে যেত। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর সাহিত্যিক জীবনের শুরুর দিকে কবিতা লিখেছেন। পরবর্তী সময়েও 'অমৃত', 'বিচিত্রা', 'শনিবারের চিঠি' ইত্যাদি সাহিত্য-পত্রিকার সৌজন্যে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের কবিসত্তাটি অক্ষুণ্ণ থেকেছে। কিন্তু গীতিকার নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় একান্তভাবে চলচ্চিত্রের দান।নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ৬টি চলচ্চিত্রের জন্য অন্তত ১৩টি গান রচনা করেন। গানগুলির বৈচিত্র্য সহজেই প্রতিভাত হয়। কোনও গান রচিত হয়েছে ব্রজবুলি ভাষার পদাবলীর ভঙ্গিতে, কোনও গানে আছে জাগরণের আহ্বান। কোনও গানে বন্দিত হয়েছে জন্মভূমি বঙ্গমাতা, কোনও গানস্মরণ করিয়েছে বাংলার চিরায়ত লোকগানের ধারাটি, কোনও গানে আবার ধ্বনিত হয়েছে অনুপ্রাসের ঝঙ্কার। উদাহরণ হিসাবে কয়েকটি গানের [১৩] অংশ-বিশেষ উদ্ধৃত করা হল–

ভক্ত বিল্বমঙ্গল

দরশন দে মুঝে নওল কিশোর
জনম জনম হম সোভারিনু তুয়াপদ
ন হেঁরলু রূপ উজোর।।
মান, যশ, বৈভব তুঝে সঁপিলু সব প্রেম
পিয়ারমুখ মধুরাতি উৎসব
চীর বাকল পরি তীরথ তীরথ ঢুড়ি
ন মিলল মম চিতচোর।।

সাহারা

ঝড়ের আকাশে রাঙা বিদ্যুতে
জলে কার তরবারি

মেঘে মেঘে ওই মন্দিরা বাজে
জাগো লাঞ্ছিতা নারী
অলস-মদির দুটি কালো চোখে
শিখা জ্বেলে দাও প্রলয় আলোকে
যত বন্ধন যত ক্রন্দন আজ হয়ে যাক সারা।।

পদ্মা প্রমত্তা নদী

কইলকাত্তাতে না যাইও ভাই,
যাইও না রে কেউ
(ও মাঝি ভাই) দিয়া সাত দরিয়া পাড়ি
ময়নামতীর মুলুক সে যে,
ভেল্‌কি ভুলার দ্যাশ
(যেথা) ভানুমতীর বাড়ি
...

গড়ের মাঠ

কে তুমি আপন ভোলা দিলে দোলা
অশোক পলাশ রঙ্গণে
(তাই) চৈতালী বায় বৈতালী গায়
শ্যামল বনের অঙ্গণে...
তুমি যে পত্র লেখার ললাট আঁক
পূর্ণ চাঁদের চন্দনে
পরাও প্রিয় মিলন রাখি কুসুম ফুলের কঙ্কণে
...

ঢুলী

ও আমার বাংলা মাগো

দেখি তোমায় নয়ন ভরে
তোমার ছলো ছলো নদীর জলে
প্রাণ জুড়ানো সুধা ঝরে–
ওমা তোমার বটের ছায়ায়
শ্যামল বনের কোমল মায়ায়,

মধুর স্নেহের আঁচলখানি বিছিয়ে দিলে
সবার তরে–
...

সব মিলিয়ে বলা যায় চলচ্চিত্রের জন্য রচিত ১৩টি গানে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের গীতিকার সত্তাটির পরিচয় পেতে আমাদের অসুবিধা হয় না।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের সাহিত্য অবলম্বনে নির্মিত চলচ্চিত্রগুলিতে তাঁর সাহিত্যের 'ইনটেন্‌সিটি' রক্ষিত হয়েছিল কি না,– এই বিষয়টি স্বতন্ত্র আলোচনার দাবি রাখে। একইভাবে স্বতন্ত্র আলোচনার দাবি রাখে, তাঁর সাহিত্যের উপর চলচ্চিত্রের প্রভাব সম্পর্কেও। আপাতত এটুকু বলা যায় যে, তারাশঙ্করকে যেমন 'সিনেমাশঙ্কর' বলে নিন্দা করা হয়েছে এক সময়, কিংবা শৈলজানন্দকে বলা হয়েছে সিনেমার সাহিত্যিক– নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় সম্পর্কে তেমন কোনো বিদ্রুপ শোনা যায়নি কখনো। তিনি চলচ্চিত্র-পত্রিকায় নির্দ্বিধায় গল্প-প্রবন্ধ লিখেছেন। আবার 'একটি চলচ্চিত্রের ভূমিকা' বা 'ভজহরি ফিল্ম কর্পোরেশন' নামে গল্পও লিখেছেন। তবে তাঁর জীবনে সাহিত্যের জগৎ আর চলচ্চিত্রের জগৎ গুলিয়ে যায়নি । সে-কারণেই সাহিত্যের জগৎ আর চলচ্চিত্রের জগতে অবাধ এবং অনায়াসে স্বেচ্ছা-বিচরণ করেছেন নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়।

*পরিশিষ্টে যে-সকল চলচ্চিত্রে গীতিকার, চিত্রনাট্যকার, কাহিনিকার এবং সংলাপ রচয়িতা হিসাবে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের নাম পাওয়া যায়, পৃথক চারটি তালিকায় তা উপস্থিত করা হল। যে-সকল চলচ্চিত্রের চিত্রনাট্য নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রচনা করেছেন, সেই-সকল চলচ্চিত্রের সংলাপ তিনিই লিখেছেন। শুধুমাত্র সংলাপ রচয়িতা হিসাবে তাঁর নাম পাওয়া যায় যে-দুটি চলচ্চিত্রে, সেই চলচ্চিত্রদুটিই চতুর্থ তালিকায়উল্লেখ করা হল।

গীতিকার নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

ক্রম	চলচ্চিত্রের নাম	মুক্তির তারিখ	পরিচালক	কাহিনিকার	চিত্রনাট্যকার	সহ-গীতিকার
১	রাঙা বউ	২২-০৫-১৯৩৭	জ্যোতিষ বন্দ্যোপাধ্যায়	প্রভাবতী দেবী সরস্বতী	জ্যোতিষ বন্দ্যোপাধ্যায়	বিমলচন্দ্র ঘোষ, প্রণব রায়
২	পদ্মা প্রমত্তা নদী	০৩-১২-১৯৪৮	অর্ধেন্দু মুখোপাধ্যায়	সুবোধ বসু	অর্ধেন্দু মুখোপাধ্যায়	তড়িৎ কুমার ঘোষ, গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার
৩	সাহারা	৩০-০৪-১৯৪৮	সুনীল মজুমদার	বিনয় ঘোষ	সুনীল মজুমদার	অজিত দে, অরুণাচল বসু, সন্তোষ সেন

৪	সম্পদ	২৭-১০-১৯৫১	অর্ধেন্দু মুখোপাধ্যায়	নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়	অর্ধেন্দু মুখোপাধ্যায়	আশা দেবী
৫	ভক্ত বিল্বমঙ্গল	১৫-০১-১৯৫৪	পিনাকী মুখোপাধ্যায়	শ্রী লালদাস বাবাজী	অর্ধেন্দু মুখোপাধ্যায়	বিদ্যাপতি, বিমলচন্দ্র ঘোষ, প্রণব রায়, আশা দেবী
৬	ঢুলী	০৩-৬-১৯৫৪	পিনাকী মুখোপাধ্যায়	বিধায়ক ভট্টাচার্য	অর্ধেন্দু মুখোপাধ্যায়	বিমলচন্দ্র ঘোষ, প্রণব রায়, পণ্ডিত ভূষণ
৭	গড়ের মাঠ	০১-১১-১৯৫৭	আজ প্রোডাকশন ইউনিট	নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়	অর্ধেন্দু মুখোপাধ্যায়	–

কাহিনিকার নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

ক্রম	চলচ্চিত্রের নাম	মুক্তির তারিখ	পরিচালক	চিত্রনাট্যকার	গীতিকার
১	স্বর্ণসীতা	১১-০৬-৪৮	অসিত ঘোষ	অসিত ঘোষ	প্রণব রায়, মোহিনী চৌধুরী
২	রূপান্তর	১০-০৩-১৯৫১	অর্ধেন্দু মুখোপাধ্যায়	অর্ধেন্দু মুখোপাধ্যায়	আশা দেবী
৩	সম্পদ	২৭-১০-১৯৫১	অর্ধেন্দু মুখোপাধ্যায়	অর্ধেন্দু মুখোপাধ্যায়	আশা দেবী, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়
৪	সঙ্কেত	০৪-০৫-১৯৫১	অর্ধেন্দু মুখোপাধ্যায়	অর্ধেন্দু মুখোপাধ্যায়	আশা দেবী, নব্যেন্দু ঘোষ
৫	অঙ্কুশ	১৯-০৩-১৯৫৪	তপন সিংহ	তপন সিংহ, বলীন সোম	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার
৬	গড়ের মাঠ	০১-১১-১৯৫৭	আজ প্রোডাকশন ইউনিট	অর্ধেন্দু মুখোপাধ্যায়	নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়
৭	মেঘ মল্লার	২১-০৩-১৯৫৮	পিনাকী মুখোপাধ্যায়	পিনাকী মুখোপাধ্যায়	বিমলচন্দ্র ঘোষ,
৮	সপ্তারিণী	২৩-০২-১৯৬২	সুশীল মজুমদার	বিধায়ক ভটাচার্য	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার
৯	বনজ্যোৎস্না	১৫-০৮-১৯৫৯	দীনেন গুপ্ত	অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়	নীহার রায়

১০	নন্দিতা	১২-১১-১৯৭৬	স্বদেশ সরকার	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়
১১	চারমূর্তি	০৫-০৫-১৯৭৮	উমানাথ ভট্টাচার্য	উমানাথ ভট্টাচার্য	শিবদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
১২	মুক্তপ্রাণ	২১-০৩-১৯৮৬	সমীর ঘোষ	শ্রী দূতবনী	অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়, জটিলেশ্বর মুখোপাধ্যায়, রবীন্দ্র ঘোষ, সুবিনয় দত্ত
১৩	দামু	১৩-০৩-১৯৯৭	রাজা সেন	মোহিত চট্টোপাধ্যায়	মোহিত চট্টোপাধ্যায়, জটিলেশ্বর মুখোপাধ্যায়
১৪	নিশিযাপন	১৫-০৪-২০০৫	সন্দীপ রায়	সন্দীপ রায়	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
১৫	টোপ	০৫-০৫-২০১৭	বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত	বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত	নজরুল ইসলাম, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, আনন্দ বক্সি

চিত্রনাট্যকার নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

ক্রম	চলচ্চিত্রের নাম	মুক্তির তারিখ	পরিচালক	কাহিনিকার	গীতিকার
১	ইন্দিরা	১০-৩০-১৯৫০	অর্ধেন্দু মুখোপাধ্যায়	বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, আশা দেবী, গোবিন্দ চক্রবর্তী
২	সীমান্তিক	১৬-০৬-১৯৫০	অর্ধেন্দু মুখোপাধ্যায়	হেমেন্দ্রনাথ দাস	রমেন চৌধুরী
৩	কপালকুণ্ডলা	২৪-১০-১৯৫২	অর্ধেন্দু মুখোপাধ্যায়	বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	গোবিন্দ চক্রবর্তী, বিমলচন্দ্র ঘোষ
৪	গরীবের মেয়ে	২১-০৭-১৯৬০	অর্ধেন্দু মুখোপাধ্যায়	অনুরূপা দেবী	বিমলচন্দ্র ঘোষ

৫	দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন	০৫-১১-১৯৭০	অর্ধেন্দু মুখোপাধ্যায়	-	দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কাজী নজরুল ইসলাম, চিত্তরঞ্জন দাশ

সংলাপ রচয়িতা নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়						
ক্রম	**চলচ্চিত্রের নাম**	**মুক্তির তারিখ**	**পরিচালক**	**কাহিনিকার**	**চিত্রনাট্য কার**	**গীতিকার**
১	ভাঙা গড়া	১৭-১২-১৯৫৪	সুশীল মজুমদার	প্রভাবতী দেবী সরস্বতী	সুশীল মজুমদার	চারু মুখার্জী
২	কমললতা	০২-১০-১৯৬৯	হরিসাধন দাশগুপ্ত	শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	হরিসাধন দাশগুপ্ত	প্রণব রায়

উল্লেখপঞ্জি :

১. রবীন্দ্রনাথ ও চলচ্চিত্র, অরুণকুমার রায়, চিত্রলেখা প্রকাশনী, ৪৪বি, আঞ্জুমান আরা বেগম রো, কলকাতা-৩৩, দ্বিতীয় সংস্করণ ৩১ ডিসেম্বর ২০০৫, পৃষ্ঠা: ২৬।

২. মর্জিমহল, বনফুল, রচনাবলী, ২৪ খণ্ড, গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড, ১১এ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ, ১৩৬৭, পৃষ্ঠা:২৫৬।

৩. যে কথা বলা হয়নি, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, প্রসঙ্গ: চলচ্চিত্র, বাঁধন সেনগুপ্ত সম্পাদিত, পুনশ্চ, ৯এ নবীন কুণ্ডু লেন, কলকাতা-০৯, প্রথম সংস্করণ, বইমেলা ২০০৭, পৃষ্ঠা: ৯৯।

৪. আমার পিতা তারাশঙ্কর, সরিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর ভবন, ২৭ তারাশঙ্কর সরণী, কলকাতা-৩৭, প্রথম প্রকাশ, ২৫ বৈশাখ, ১৩৬৭, পৃষ্ঠা: ৩৭।

৫. যে কথা বলা হয়নি, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, প্রসঙ্গ: চলচ্চিত্র, বাঁধন সেনগুপ্ত সম্পাদিত, পুনশ্চ, ৯এ নবীন কুণ্ডু লেন, কলকাতা-০৯, প্রথম সংস্করণ, বইমেলা ২০০৭, পৃষ্ঠা: ৯৯।

৬. উত্তর, বনফুল, দেশ, বঙ্কিমচন্দ্র সেন সম্পাদিত, ১ নং বর্মন ষ্ট্রীট, কলিকাতা, ষোড়শ বর্ষ, ২৭ সংখ্যা, ২৪ বৈশাখ ১৩৫৬, পৃষ্ঠা: ৪৮।

৭. মনে পড়ে, তপন সিংহ, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-০৯, দ্বিতীয় মুদ্রণ, মে ২০০২, পৃষ্ঠা: ৫২।

৮. ছোটগল্পের চিত্রনাট্য, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, দেশ, অশোককুমার সরকার সম্পাদিত, ৬ সুতারকিন স্ট্রীট, কলিকাতা-০১, ৩৬ বর্ষ, ৯ সংখ্যা, ২৮ ডিসেম্বর ১৯৬৮, পৃষ্ঠা: ৯৭৫।

৯. ছবির গল্প আর গল্পের ছবি, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, শারদীয়া চিত্রবাণী, গৌর চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত, ১৮ হাজরা লেন, কলিকাতা-২৯, আশ্বিন ১৩৬০, পৃষ্ঠা: ১২৬-১২৭।

১০. তদেব। পৃষ্ঠা: ১২৮।

১১. ছোটগল্পের চিত্রনাট্য, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, দেশ, অশোককুমার সরকার সম্পাদিত, ৬ সুতারকিন স্ট্রীট, কলিকাতা-০১, ৩৬ বর্ষ, ৯ সংখ্যা, ২৮ ডিসেম্বর ১৯৬৮, পৃষ্ঠা: ৯৭৪।

১২. সুনন্দর জার্নাল, অখণ্ড সংস্করণ, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, মিত্র ও ঘোষ পাব্‌লিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩, চতুর্থ মুদ্রণ, মাঘ ১৪১০, পৃষ্ঠা: ৬৩।

১৩. গানগুলি উল্লিখিত চলচ্চিত্রের প্রচার-পুস্তিকা থেকে সংগৃহীত।

বিশেষ কৃতজ্ঞতা: ড.সুপ্রিয় কাঞ্জিলাল

বাংলা ভাষায় 'স্ল্যাং' ও তার সাহিত্যিক প্রয়োগ

রেজমান মল্লিক
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
ভট্টর কলেজ, দাঁতন, পশ্চিম মেদিনীপুর

সারসংক্ষেপ : আমাদের সমাজে 'স্ল্যাং' (অপভাষা) নিয়ে অনেক গোপনীয়তা থাকলেও সব মানুষই কম বেশি 'স্ল্যাং' (অপভাষা) ব্যবহার করে। স্ল্যাং' আসলে আমাদের আবেগের বহিঃপ্রকাশ। রাগ, ক্ষোভ, হিংসা বা আদর যে কোন আবেগ প্রকাশের জন্যই স্ল্যাং' (অপভাষা) ব্যবহার করা হয়। বাংলা ভাষায় অনেক শ্রেণির 'স্ল্যাং' বর্তমান। তবে যৌনাঙ্গ বিষয়ক, যৌনপেশা বিষয়ক 'স্ল্যাং' (অপভাষা) কে সবচেয়ে খারাপ ভাবা হয়। বাংলা সাহিত্যে চর্যাপদের যুগ থেকেই 'স্ল্যাং' (অপভাষা) ব্যবহার চলে আসছে। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন', মঙ্গলকাব্যসহ মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যেও কম-বেশী 'স্ল্যাং' (অপভাষা) ব্যবহার হতে দেখা যায়। আধুনিক বাংলা সাহিত্যে 'স্ল্যাং' (অপভাষা) ব্যবহারের মাত্রা ও তীব্রতা ক্রমশ বৃদ্ধি হতে থাকে। প্রহসন ও নাটকে ভাষাকে জীবন্ত, সরস ও বাস্তবমুখী করতে 'স্ল্যাং' (অপভাষা) ব্যবহার সাধারণ হয়ে পড়ে। একবিংশ শতকের বাংলা সাহিত্য বিশেষত গল্প- উপন্যাসে 'স্ল্যাং' (অপভাষা)-এর আগল মুক্ত করে দেওয়া হয়। প্রচলিত সব ধরনের 'স্ল্যাং' (অপভাষা) তা যতই কটু বা লজ্জার হোক তার ব্যবহার বাঙলা সাহিত্যে শুরু হয়। ফলে 'স্ল্যাং' (অপভাষা) বলার শুধু নয় লেখার ভাষাও হয়ে ওঠে।

মূল আলোচনা : মানুষ কথা বলতে পারে তাই কথার মধ্য দিয়ে আবেগকে প্রকাশ করে। মানুষের কথায় ব্যবহৃত প্রত্যেকটি শব্দ কমবেশি আবেগকে যেমন প্রকাশ করে তেমনি অন্যের আবেগকেও তৈরী করে। আবেগ তৈরীর পেছনে আছে ব্যবহৃত শব্দের অর্থ প্রয়োগ। শব্দের প্রায়োগিক অর্থ বৈচিত্র্যপূর্ণ। বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করে এর নানা শ্রেণি বিচার করা হয়। কিন্তু সমাজ সভ্যতার দৃষ্টিকোণ থেকে দু ধরনের শব্দ হয়- ১. 'শ্লীল' শব্দ বা 'ভদ্র' শব্দ ২. 'অশ্লীল' শব্দ বা 'ইতর' শব্দ। শব্দের এই প্রকারভেদ ঠিক করে সমাজ। ছোট থেকেই পরিবার আমদের ভালো শব্দের ও খারাপ শব্দের ধারণা তৈরী করে দেয়। সমাজের চোখে খারাপ শব্দগুলি চুড়ান্ত পর্যায়ে এসে 'খিস্তি'র মর্যাদা পায়। আধুনিক পরিচয়ে শিক্ষিত বাঙালি সমাজ 'স্ল্যাং' (অপভাষা) নামে এই শব্দগুলিকে নতুন পরিচয় দিয়েছে। শব্দ ও ভাষা বিশেষজ্ঞ চিন্তাশীল মানুষজন 'স্ল্যাং' (অপভাষা) বা ইতর শব্দ বা 'খিস্তি-গালাগালি'র সংজ্ঞায় বলছেন- 'ইতর বা অভদ্র জনের মধ্যে এমন কিছু শব্দ ও শব্দগুচ্ছ প্রচলিত থাকে যার ব্যবহার সমাজের শিক্ষিত ভদ্রজনের মধ্যে নিন্দনীয় বলে বিবেচিত হয়। একে ইতর শব্দ (Slang) বলে।'[১] এ ছাড়া 'স্ল্যাং' (অপভাষা) ব্যবহার বিষয়ে প্রচলিত ধারণা হল 'যাকে অপভাষা বা slang বলা হয় তা সাধারণত শিক্ষা ও রুচির দিক থেকে একটু মাটির কাছাকাছি

থাকা মানুষের মুখেই বেশি শুনতে পাওয়া যায়'[২]। ভাষাতাত্ত্বিক সংজ্ঞায় বলা হয় 'স্লাং' 'ইতর' বা 'অভদ্র' বা নিরক্ষর সমাজের ভাষা। তাই ভদ্র সমাজের কাছে তা নিন্দার যোগ্য। কিন্তু 'স্লাং' কেবল ইতর-নিরক্ষর সমাজ ব্যবহার করে এমন নয় রুচিশীল ভদ্র-শিক্ষিত সমাজও ব্যবহার করে। তথাকথিত 'ইতর' মানুষজন হয়ত 'স্লাং'এর ব্যবহার মাত্রাধিক করেন এবং অহরহ করেন কিংবা স্থান পাত্র নির্বিশেষে অতি-প্রকাশ্যে করে থাকেন। আর শিক্ষিত-ভদ্রজন নিজস্ব পরিসরে মৃদু-প্রকাশ্যে করে থাকেন। কিন্তু 'স্ল্যাং' (অপভাষা) এর 'উপভোক্তা' সকলেই। শিক্ষিত (স্বাক্ষর), অশিক্ষিত (নিরক্ষর) সকলেই আবেগ প্রকাশ করে, আর আবেগের সাথে কোন না কোন ভাবে কখনও না কখনও স্ল্যাং' (অপভাষা) ব্যবহার করে ফেলে।

Language that 'Slang is very informal is usually spoken rather than written, used especially by particular groups of people: (Cambridge English Dictionary) অর্থাৎ 'খিস্তি' বা 'স্লাং' লেখার চেয়ে বলায় বেশি ব্যবহার হয়। কারণ স্ল্যাং খারাপ অর্থাৎ গোপন ; প্রকাশ্য নয় তাই লেখ্য নিদর্শন সৃষ্টির তাগিদ প্রায় নেই। 'স্ল্যাং' বা 'খিস্তি'র খারাপত্ব বা গাঢ়তা অর্থ নির্ভর নয় উদ্দেশ্য নির্ভর এবং অবশ্যই প্রচলিত ধারণা নির্ভর। যে কোন শব্দকেই 'স্ল্যাং' (অপভাষা) বা 'খিস্তি'র উদ্দেশ্যে ব্যবহার করলেই তা 'স্ল্যাং' (অপভাষা) রূপে প্রকাশিত হয়।শব্দের সম-অর্থ যুক্ত নানা রূপ থাকে তাই কখনও একটি রূপ 'স্ল্যাং' অন্য রূপ 'মার্জিত শব্দ' হতে পারে। যেমন 'স্বামী' ও 'ভাতার' এই শব্দ দুটির অর্থ এক কিন্তু প্রায়গিক ধারণায় ভালো ও মন্দ। প্রথম শব্দ 'স্বামী' ভদ্র ও মার্জিত শব্দ। দ্বিতীয়টি ভাতার (<ভর্তা) 'স্ল্যাং' হিসাবেই ব্যবহার হয়। আবার কোন 'খিস্তি' কে যখন আমরা ভদ্র ভাবে উপস্থাপন করতে যাই বিশেষত লেখার ক্ষেত্রে তখন সেই শব্দটির একটি মার্জিত রূপ তৈরী করে ব্যবহার করি। যাতে মানুষ শব্দটিকে 'স্ল্যাং' (অপভাষা) বুঝলেও 'স্ল্যাং'-এর অনুভূতি না নেয়। যেমন 'বেশ্যা' শব্দটি আমাদের কাছে 'স্ল্যাং' বা 'খিস্তি' তাই আমরা 'পতিতা' শব্দটি বিকল্প মার্জিত শব্দ হিসাবে ব্যবহার করি। কখনও কখনও একই অর্থ যুক্ত শব্দকে 'খিস্তি' হিসাবে ব্যবহার করার জন্য নতুন শব্দ তৈরী করি। যেমন 'বিধবা' মার্জিত শব্দ। কিন্তু বিধবাকে 'খিস্তি'র রূপ দিতে 'রাঁঢ়' শব্দটি ব্যবহার করা হয়।

প্রশ্ন হল মানুষ 'স্ল্যাং' (অপভাষা) ব্যবহার করে কেন ? 'স্লাং' ব্যবহারের অনেকগুলি কারণ বা উদ্দেশ্য আছে তবে বেশিরভাগ উদ্দেশ্যই আসলে আমাদের আবেগের বহিঃপ্রকাশ মাত্র। i) সাধারণত ক্ষোভ বা রাগ প্রকাশের জন্যই 'স্ল্যাং' (অপভাষা) ব্যবহার করা হয়। যেমন ঝগড়ার ক্ষেত্রে বেশি ও সব চেয়ে তীব্র 'স্লাং' ব্যবহার করা হয়। ঝগড়া, বিতর্কে 'স্লাং' এর মূল উদ্দেশ্য-উদ্দিষ্টকে অপমান করে নিজের রাগ বা ক্ষোভকে প্রশমিত করে আত্মতৃপ্তি লাভ করা। ii) মজা করার জন্যও অনেক 'স্লাং' ব্যবহার করা হয়। বিশেষত বন্ধুত্ব প্রকাশে 'শালা' প্রভৃতি 'স্লাং' ব্যবহার করা হয়। iii) আবার সোহাগ বা আদর দেখানোর জন্য 'স্লাং' ব্যবহার হয়। যেমন দাদু-

নাতনীর কথা বার্তায় ব্যবহৃত 'শালী', 'মাগী' প্রভৃতি 'স্লাং' সোহাগ বা আদরের বহিঃপ্রকাশ। iv) মুদ্রাদোষ হিসাবে অনেকে কথায় কথায় 'স্লাং' ব্যবহার করে থাকে মূল বাক্যের সঙ্গে যার কোন অর্থগত যোগ নেই। V) 'স্লাং' অনেক সময় পেশাগত উৎকর্ষতার বহিঃপ্রকাশ হিসাবে ব্যবহার করা হয়। যেমন অপরাধ জগতের মানুষজন তাদের বাক্য ব্যবহারে বেশি 'স্লাং' ব্যবহার করেন। এতে তাদের পেশাদারীর ওজন বাড়ে এবং নঞর্থকভাবে হলেও মানুষ প্রভাবিত হয়। 'নিজেদের মধ্যে বাক্যালাপে স্ল্যাং শব্দের ঝুড়ি ঝুড়ি ব্যবহার হয়। অপরাধের পেশার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বুলি অহরহ পরিত্যক্ত হয়ে থাকে।'[৩] vi) স্বাভাবিক ও স্বতফূর্তভাবে অনেক সময় 'স্ল্যাং' (অপভাষা) ব্যবহার করা হয়। যেমন- যাঃ শালা! অন্ধকার হয়ে গেল। এখানে 'শালা' শব্দটির বাক্যটিতে কোন অর্থ নেই কিন্তু স্বতফূর্তভাবে শব্দটি প্রকাশিত হয়েছে যা বিরক্তির (আবেগ) কে প্রকাশ করছে। বাঙলা ভাষায় যে সমস্ত 'স্ল্যাং' (অপভাষা) ব্যবহার করা হয় সেগুলিকে বিষয় ভিত্তিক শ্রেণি বিভাগ করলে যা দাঁড়ায়-

১. ফল বা সব্জী বিষয়ক স্ল্যাং- এই ধরনের 'স্ল্যাং'গুলি নির্বিষ। দেহজ আকৃতি ও মূল্যহীনতার তুলনা করে এই গুলি ব্যবহার করা হয়। এই 'স্ল্যাং' (অপভাষা) গুলি ব্যবহারের উদ্দেশ্য অপমান ও মজা করা। যেমন- ঢ্যাঁড়শ কোথাকার! কুমড়ো, কাঁচকলা, আলু ইত্যাদি। চরিত্র ও উদ্দিষ্টের শারীরিক আকারের সাদৃশ্যে এই 'স্ল্যাং' (অপভাষা)গুলি ব্যবহার করা হয়।

২. পশু-পাখি বিষয়ক স্ল্যাং- অপেক্ষাকৃত একটু তীব্র এই ধরনের গালাগালি গুলি। মূলত চেহারা ও স্বভাবের অনুসঙ্গে এই 'স্ল্যাং'গুলি ব্যবহার করা হয়। আমাদের সমাজে গালাগাল দেওয়ার সবচেয়ে সহজ পন্থা হল উদ্দিষ্টকে পশু সাবক বলে সম্বোধন করা। যেমন- শূয়োরের বাচ্চা। তেমনি কুকুর/কুত্তা, ছাগল, পাঁঠা, ভ্যাড়া এবং তাদের 'বাচ্চা' প্রচলিত বাংলা 'স্ল্যাং' এর সহজ উদাহরণ। অবশ্য সকল পশু বা তাদের শাবক 'স্ল্যাং' হয় না। যে পশুগুলি রাজকীয় বা কুলীন বলে পরিচিত বরং সেগুলি অপমানজনক না হয়ে সম্মানজনক হয়। যেমন বাঘের বাচ্চা, সিংহের বাচ্চা ইত্যাদি।

৩. হীন খাদ্য বিষয়ক স্ল্যাং- এই ধরনের গালাগালি গুলি ঘৃণা বোধ থেকে তৈরী হয়।প্রত্যেকে গোষ্ঠীর খাদ্য তালিকায় কিছু নিষিদ্ধ খাদ্য থাকে যেগুলি অনেক সময় 'স্ল্যাং' হিসাবে ব্যবহার করা হয়। যেমন হিন্দুরা ব্যবহার করে-'গোরু খেকো। মুসলমান সমাজে ব্যবহার করা হয়- হারাম খেকো/ শুয়ার খেকো। আবার কোনো কোনো নোংরা পদার্থ বা বস্তুকে খাদক আখ্যা দিয়ে গালাগাল দেওয়া হয়। যেমন- গু খেকো।

৪. রূপক বা মেটাফোর জাতীয় স্ল্যাং- বাংলা স্ল্যাং' এর বড় অংশ জুড়ে রয়েছে মেটাফোর ধরনের গালাগালি। এই ধরনের গালাগালগুলি রূপকের থেকেও যেন একটু বেশি। তাই বুদ্ধিদীপ্ত ও মেজাজে আদুরে এবং কাব্যিক। যেমন- হতভাগা, মুখপোড়া, লক্ষীছাড়া প্রভৃতি।

৫. **বৃত্তি বিষয়ক স্ল্যাং**- অনেক সময় সমাজের কিছু পেশাকে ‘ছোট’ বা ‘নিচু’ মনে করে সেই পেশাকে ‘স্ল্যাং’ হিসাবে ব্যবহার করা হয়। যেমন- মেথর, কসাই, চামার কিংবা এই পেশাগুলিকে পিতার পেশা বলে সম্বোধন করেও ‘স্ল্যাং’-এ রুপান্তরিত করা হয়। যেমন- মেথরের বাচ্চা, কসাই এর বাচ্চা ইত্যাদি।

৬. **গোপন অঙ্গ বিষয়ক স্ল্যাং**- পৃথিবীর প্রায় সব ভাষাতেই নারী ও পুরুষের গোপন অঙ্গকে ‘স্ল্যাং হিসাবে ব্যবহার করা হয়। কারণ গোপন অঙ্গটিকে প্রকাশ করলে লজ্জার বিষয় হয়ে ওঠে তাই তা সহজেই বিষাক্ত ‘স্ল্যাং এর অনুভূতি প্রকাশ পায়। বাংলা ভাষায় যৌন অঙ্গগুলি তীব্র ‘স্ল্যাং হিসাবে ব্যবহৃত হয় এবং এই ‘স্ল্যাংগুলিই সবচেয়ে তীব্র ও বিষাক্ত।

৭. **যৌনবৃত্তি বিষয়ক স্ল্যাং**- যৌনবৃত্তিকে আমাদের সমাজ সবচেয়ে হীন চোখে দেখে। সমাজের কাছে এই বৃত্তি সবচেয়ে ঘৃণ্য,অপরাধ মূলক। কাজেই এই কাজ যে করে (মহিলা) এবং এই কাজের সহায়ক (পুরুষ) কে ‘স্ল্যাং’ এর সমার্থক হিসাবে অবিহিত করা হয়। যেমন- ছেনাল, বেশ্যা (মহিলা); বেশ্যার দালাল (পুরুষ)। এই গালাগাল গুলি অবশ্যই অনেক তীব্র ও অপমানকর।

৮. **বৈধ সম্পর্ক বিষয়ক স্ল্যাং**- গালাগাল আসলে নির্ভর করে প্রয়োগের উপর ও ব্যক্তি বা সমাজ কি ভাবে নিচ্ছে তার উপর। আমাদের সমাজের অনেক বৈধ সম্পর্ক ‘স্ল্যাং’ হিসাবে ব্যবহার হয়। যেগুলি অর্থে কোন ইতরতা নেই অথচ সে গুলি গালাগাল। যেমন- শালা, শালার ব্যাটা, সতীনের পো।

৯. **অবৈধ সম্পর্ক বিষয়ক স্ল্যাং**- অবৈধ সম্পর্কিত ‘স্ল্যাং’ গুলি বাংলা ভাষায় সবচেয়ে বেশি উদ্দিষ্টকে অস্বস্তি দেয়। কারণ এই ‘স্ল্যাং’ গুলির মধ্যে থাকে অপমান, কুৎসিত ঈঙ্গিত, যৌনতা, নীচ মনোবৃত্তির অভিধা। আসলে এই ‘স্ল্যাং’গুলিতে থাকে একের মধ্যে সব। যেমন- বাপ ভাতারী, ভাই ভাতারী, মা মেগো, প্রভৃতি।

১০. **অবাস্তব অর্থযুক্ত স্ল্যাং**- অবাস্তব অর্থযুক্ত অনেক শব্দ যার বাস্তব ভিত্তি নাই সেগুলিকেও ‘স্ল্যাং’ (অপভাষা) হিসাবে ব্যবহার করা হয়। যেমন- আঁটকুড়ির ব্যাটা। আঁটকুড়ি হল সেই মহিলা যার সন্তান নেই (বন্ধ্যা) কাজেই তার ব্যাটা হওয়া অবাস্তব কিন্তু শব্দটি ব্যবহার করা হয় ‘স্ল্যাং’ (অপভাষা) হিসাবে। বাংলা ভাষায় ‘স্ল্যাং শব্দ নির্মাণ পদ্ধতি কোন সূত্রের উপর নির্ভর করে না। সাধারণত ‘স্ল্যাং বাচক কতকগুলি মৌলিক শব্দকে ব্যবহার করা হয়। তাছাড়াও দুটি আলাদা শব্দকে একত্রিত করে তাকে ‘স্ল্যাং’ এ রূপান্তরিত করা হয়। যেমন- কুত্তা(র)+ বাচ্চা= কুত্তার বাচ্চা । কুত্তা একটি শব্দ ও বাচ্চা অন্য একটি শব্দ। দুটির একত্রিকরণ ‘স্ল্যাং’এ পরিণত করেছে।বাংলা ভাষায় কতকগুলি বিশেষ ‘পরসর্গ’ আছে যে গুলি গালাগাল বাচক।‘চোদা’, ‘খোর’ এই ‘পরসর্গ’ গুলি যে কোন শব্দের পরে জুড়ে দিলেই তা ‘স্ল্যাং’ হয়ে যায়। যেমন ‘বোকাচোদা’ ‘পাগলচোদা’ ‘লাতখোর’, প্রভৃতি।

সাহিত্য যদি সমাজের দর্পণ হয় আর ‘স্ল্যাং’ যদি মানুষের মুখের ভাষার স্বাভাবিক ও গুরুত্বপূর্ণ অংশ হয় তবে সাহিত্যে ‘স্ল্যাং’ এর ব্যবহার অবসম্ভাবী কিছুটা ‘সেন্সর’ করে হলেও। ‘চর্যাপদ’ থেকে একেবারে সাম্প্রতিক সাহিত্য পর্যন্ত্য লক্ষ্য করলে দেখা যাবে ‘স্ল্যাং’ এর ব্যবহার ছিল আজও আছে এবং উত্তরোত্তর বেড়েছে। ক্রমশ ‘সেন্সারসিপ’ কমেছে। ‘চর্যাপদে’ কয়েকটি পদে আমরা ‘খিস্তি’র উল্লেখ পাই। ১৮ নং চর্যাপদে কাহ্নপা’র রচনায় আমরা ‘স্ল্যাং’ এর প্রয়োগ পাই- ‘ডোম্বী ত আগলি নাহি চ্ছিণালী’[৪] ‘চ্ছিণালী’>ছেনাল শব্দটি র উৎপত্তি যা ‘স্ল্যাং’ হিসাবে ব্যবহৃত হয়। এছাড়াও ৩৭ নং পদে-

‘বাগু কুরুগু সন্তারে জাণী
বাকপথাতীত কাঁহি বখাণী’[৫]

উপরে উল্লেখিত ‘বাগু কুরুগু’ শব্দটি ‘স্ল্যাং’ বলে মত দিয়েছেন বাংলা ভাষার বিশিষ্ট ‘স্ল্যাং’ গবেষক ড. অভ্র বসু। তিনি বলেন- ‘বাগু কুরগু । পুরুষাঙ্গ ও অন্ডকোষ অর্থে শব্দদ্বয়ের ব্যবহার।’[৬] কাজেই প্রাচীনকাল থেকেই যৌনাঙ্গকে ‘খিস্তি’ বা ‘অপভাষা’ হিসাবে প্রয়োগ করার রীতি প্রচলিত। ‘শ্রীকৃষ্ণকীর্তন’ কাব্যে’র দানখন্ডে ‘খিস্তি’র ব্যবহার রয়েছে। যেখানে কৃষ্ণ রাধাকে ‘শালী’ বলে গালাগাল দিয়েছে। ‘শালী’ শব্দটি আত্মীয়বাচক হলেও বক্তার উদ্দেশ্যের জন্য শব্দটি খিস্তি হয়ে দাঁড়িয়েছে। বক্তা শালী শব্দটি ‘খারাপ মেয়ে’ (অবৈধ প্রণয়ী) অর্থে ব্যবহার করেছেন।

বাংলা মঙ্গলকাব্য গুলি যেহেতু অনেক বেশি লোকায়েত জীবনের ছবি বহন করে তাই এই সাহিত্যগুলিতে স্বতঃফূর্তভাবেই ‘স্ল্যাং’ এর ব্যবহার অনেক বেশি। মুকুন্দরামের চন্ডীমঙ্গলকাব্যের একাধিক অংশে ‘স্ল্যাং’এর ব্যবহার পাই। ‘শালা’, ‘ভাতার’ প্রভৃতি গালাগালের ব্যবহার বর্তমান- ‘খাট ভাতার ঢেঙা মাগু দেখ্যা লোক হাসে’[৭] । ভারতচন্দ্রের ‘অন্নদামঙ্গল’ কাব্যে যথেষ্ট পরিমাণ গ্রাম্য ‘স্ল্যাং’এর ব্যবহার দেখা যায়। এমনকি ব্যসদেবকেও ‘স্ল্যাং’ ব্যবহার করতে দেখা যায়-

‘দৈবদোষে ব্যসদেবে উপজিল ক্রোধ।
বিরক্ত করে মাগী নাহি কিছু বোধ।।’[৮]

আধুনিক বাংলা সাহিত্যের প্রকৃত উত্থান কবিগানের হাত ধরে। কবিগান ছিল বাংলা সাহিত্যে ‘স্ল্যাং’ প্রয়োগের স্বর্ণযুগ। মানুষের মুখের জীবন্ত ভাষাকে কোন ‘সেন্সর’ না করেই কবিয়ালরা তাদের গানে অনেক সময় ব্যবহার করত। তাই কবিগান একটা সময় রূপান্তরিত হয়ে ‘খেউড়’ (খিস্তির সমার্থক শব্দ) নামে পরিচিত হয়ে ওঠে। কবিগানে অধিক পরিমাণে ‘অপভাষা’ প্রয়োগ করলেই তা ‘খেউড়’ নামে অবিহিত হয়। কবিগানে ‘শালা’ ‘বাঁঝা মেয়ের বেটা’ ইত্যাদি গালাগাল ‘আটপৌরে’ ব্যবহৃত হত। দাশরথি রায়ের ‘পাঁচালি’তে ‘স্ল্যাং’ ব্যবহার অতি সহজলভ্য ছিল-

‘যত পেঁদির বেটা রামসন্না শ্যামা মায়ের সন্না

শাক্ত বামুনের ভাত খান্না বলি দিয়াছেন বলে।’[৯]

‘পেঁদির ব্যাটা’ এখানে ‘খিস্তি’। সাধারণত শব্দটি ভিতু অর্থে ব্যবহার করা হয়। বাংলা প্রহসনের যুগে এসে চেষ্টা করা হল চরিত্রের বাস্তবতাকে জীবন্ত রাখা হবে।তাই প্রত্যেক চরিত্রের ভাষাকে ‘uncut’ (অপরিবর্তীত) করতে গিয়ে তীব্র ‘খিস্তি’গুলিকেও ভাষার মধ্যে রেখে দেওয়া হল। দীনবন্ধু নিত্রের ‘নবীন তপস্বিনী’ থেকে উদাহরণ দিলেই বোঝা যাবে- ‘সেবার গুণী গয়লানকে খামকা একটা কথা বলে কি ঢলানটাই ঢলালে।’[১০] গ্রাম্য মেয়েদের বহুল প্রচলিত ‘স্ল্যাং’ হিসাবে ‘ঢলানো’ শব্দটি নাটকে ব্যবহার করা হয়েছে। ‘ঢলানো’ শব্দটির বহুমাত্রিক ব্যবহার হয়। তবে মূলত নারীর অবৈধভাবে প্রেম করারকেই বোঝায়। মাইকেল মধুসূদন দত্তের প্রহসন গুলিতে ‘স্ল্যাং’ এর ব্যবহার অনেক বেশি স্পষ্ট ও সার্বিক। ‘একিই কি বলে সভ্যতা’ প্রহসনে শিক্ষিত শহুরে বাবু ‘কালচারে’ অভ্যস্থ মানুষগুলির ব্যবহৃত ‘স্ল্যাং’ তিনি প্রকাশ করেছেন। তারা অবশ্য ইংরেজি ‘স্ল্যাং’ ব্যবহারে অভ্যস্থ যা তাদের গর্ব ও আভিজাত্যের প্রতীকও বটে। অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র কালীনাথের মুখে পাই-‘ননসেনস। তার চেয়ে শালাকে গোটা কতক কিক দিয়ে একেবারে বৈকুণ্ঠে পাঠাও না কেন। ড্যাম দি ব্রুট। ও শালাকে এ পৃথিবীতে কে চায়?ওর কি আর কোন মিনস আছে?’[১১] বাবু কালচারে অভ্যস্ত শিক্ষিত মানুষের কাছে বাংলা ‘স্ল্যাং’ অপেক্ষা ইংরেজি ‘স্ল্যাং’ অনেক বেশি স্পর্শকাতর তাই বাংলা গালাগাল হজম করলেও ইংরেজি ‘স্ল্যাং’ ‘নৈব নৈব চ’। এই প্রহসনের প্রধান চরিত্র নবকুমার তাই বলে-‘ট্রাইফ্লীং! ও আমাকে লাইয়র বললে –আবার ট্রাইফ্লীং? ও আমাকে বাঙ্গালা করে বল্লে না কেন?ও আমাকে মিথ্যাবাদী বললে না কেন?তাতে কোন শালা রাগতো?কিন্তু লাইয়ার- এ কি বরদাস্ত হয়।’[১২] আসলে আধুনিক জীবনদর্শনে আবেগকে প্রকাশ করাকেই বড় স্বাধীনতা মনে করা হয়। তাই ভাষায় আবেগের বহিঃপ্রকাশে ‘স্ল্যাং’ ব্যবহার স্বাভাবিক হয়ে পড়ে। মধুসূদন এই প্রবণতাকে ভালোভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। ‘বুড় শালিকের ঘাড়ে রোঁ’ প্রহসনে পুঁটির বক্তব্যে ঘৃণার প্রকাশ ঘটেছে ‘স্ল্যাং’ ব্যবহারে- ‘আমরা হল্যেম হিঁদু, তুই হলি নেড়েদের মেয়ে, তোদের তো আর কুলমান নাই, তোরা রাঁড় হল্যে আবার বিয়ে করিস।’[১৩] ‘নেড়ে’ শব্দটি মুসলমানের প্রতিশব্দ হিসাবে বাংলার হিন্দু সমাজে ব্যবহার করা হয়। শব্দটি ‘স্ল্যাং’ বা ‘অপভাষা’র উদ্দেশ্যেই প্রয়োগ হয়। শব্দটির অর্থ নীচ জাতি যদিও আক্ষরিক অর্থ ‘নেড়া’ (মাথা কামানো) আবার ‘রাঁড়’ শব্দটির আক্ষরিক অর্থ ‘বিধবা’ কিন্তু শব্দটি অপভাষার উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয় যার অর্থ দাঁড়ায় খারাপ চরিত্রের বিধবা। গ্রাম্য মহিলাদের মুখে ব্যবহৃত প্রচলিত ‘স্ল্যাং’গুলি বাছাই করে মধুসূদন দত্ত পুঁটির সংলাপে ব্যবহার করেছেন। ঠিক এই ভাবেই তিনি গ্রাম্য পুরুষের সংলাপে গালাগাল যোগ করে বাস্তবতাকে ফুটিয়ে তুলেছেন। ভক্তপ্রসাদের সংলাপে আমরা পাই-‘কি জানি যদি মাগীর গায়ে প্যাঁজের গন্ধ টন্ধ থাকে, না হয় একটু আতর মাখিয়ে তা দূর করবো।[১৪] মধুসূদন গ্রাম্য ভাষার বাস্তবতা নির্মাণে ‘রাঁঢ়’ ‘মাগী’ প্রভৃতি শব্দ ব্যবহারের বেশী ওঠেন

নি। সময় যত গড়িয়েছে 'স্ল্যাং' ব্যবহারের তীব্রতা তত গাঢ় হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তার উপন্যাসে চরিত্রের সংলাপে অনেক স্থানেই 'স্ল্যাং' ব্যবহার করেছেন। মূলত বঙ্কিমচন্দ্র নারীদের সংলাপে 'গালাগাল' ব্যবহার করেছেন এবং তা বিশেষত ঝগড়ার পটভূমিতে। 'কৃষ্ণকান্তের উইল' উপন্যাস থেকে দৃষ্টান্ত দিলে বোঝা যাবে-

ভ্রমর বলিল, "তারপর? কোন মাগীর নাক কাটিয়া চাহিতেছিলি?

নং ১- রোহিণী ঠাকরুণের –আর কার?

নং ২- সেই আবাগীই ত সর্বনাশের গোড়া।

নং ৩- সেই নাকি ডাকাতের দল সঙ্গে করিয়া নিয়ে এসেছিল।"[১৫]

বঙ্কিমচন্দ্র 'মাগী', 'আবাগী' বা তার সমগোত্রীয় স্ল্যাং এর উপরে ওঠেন নি। কারণ এগুলিই তৎকালীন মহিলাদের বচনের সঙ্গে মিলে যায়। উৎপল দত্ত বিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে এসে তাঁর অনেক নাটকের সংলাপে 'স্ল্যাং' ব্যবহার করলেন। কিন্তু এর বিশেষত্ব হল এগুলি চরিত্র অনুযায়ী এবং প্রেক্ষিতের দাবীর সাথে খুবই সঙ্গতিপূর্ণ।সংলাপ থেকে 'স্ল্যাং'গুলি বাদ দিলে চরিত্রটিকে যেমন পাওয়া যায় না তেমনি সংলাপটিও কৃত্রিম হয়ে পড়ে। অর্থাৎ 'স্ল্যাং' যে আবেগের বহিঃপ্রকাশ তা তাঁর ব্যবহৃত 'স্ল্যাং'গূলিতে নজর দিলেই অনুধাবন করা যায়। 'টিনের তলোয়ার' নাটক থেকে উদাহরণ দিলেই বোধা যাবে-

> "মুদী। কই, সে বেটি গেল কোথায়?(বসুন্ধরাকে দেখে) এই যে মাগী, বাজারের বেশ্যা, তুমি কি চাও থানাদার ডাকি?"[১৬]

মুদীর মুখে ব্যবহৃত 'স্ল্যাং' নারীদের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত অতি সাধারণ গালাগাল কিন্তু বলার ভঙ্গী ও উদ্দেশ্যের জন্য এর তীব্রতা অনেক বেশি। আসলে 'স্লাং' এর তীব্রতা শব্দের অর্থের উপর শুধু নির্ভর করে না তার সাথে নির্ভর করে বক্তার উদ্দেশ্য, পরিস্থিতি ও বলার ভঙ্গির উপর। তাই অনেক সময় দেখা যায় বক্তা যে গালাগালটি ব্যবহার করল তার মানে বোঝাই গেল না অথচ সেটা 'স্ল্যাং' হয়ে উঠল শুধু বলার ভঙ্গির জন্য। এই নাটকেই আমরা পাই-

> "বসুন্ধরা। আস্তে, আস্তে। সবাই শুনে ফেলবে। মর ছোঁড়া উনপাঁজুরে বরাখুরে।"[১৭]

'ছোঁড়া' শব্দটি যুবকের প্রতিশব্দ কিন্তু ব্যবহারের গুণে ভদ্র সমাজে এটি 'স্ল্যাং' হিসাবেই গন্য হয়ে ওঠে। 'উনপাঁজুরে বরাখুরে' শাব্দিক অর্থ তেমন কিছুই নয় তবুও ব্যবহারের উদ্দেশ্যের কারণে এটি সাহিত্যিক 'স্ল্যাং'।নারী ও পুরুষের আলাদা আলাদা 'স্ল্যাং' সমাজে প্রচলিত। নারীকে পুরুষের 'স্ল্যাং' ব্যবহারের অধিকার সমাজ দেয় না। তাই সাহিত্যেও নারীর মুখে নারীর প্রচলিত 'স্ল্যাং' ব্যবহার করা হয়। এ ক্ষেত্রে দুটি উদ্দেশ্য সাধিত হয় ।প্রথমত, বাস্তবতা রক্ষিত হয় বা কৃত্রিমতা মুক্ত সংলাপ অটুট থাকে। দ্বিতীয়ত, নারীর অধিকারের গন্ডি লঙ্ঘন করতে দেওয়া হয় না। 'রূপদর্শী' বা গৌর

কিশোর ঘোষের লেখা 'প্রতিবেশী' উপন্যাসের একটি দৃষ্টান্ত দিতে পারি- "দিদির মুখে মা যেদিন বানচোত কথাটা শোনেন, সেদিন কী হুলু স্থুলু কান্ড ঘটেছিল তাদের ডালিম তলার বাড়িতে।"[১৮] 'বানচোত' শব্দটি হিন্দি শব্দ থেকে এসেছে এবং বাংলায় হিন্দির সমান অর্থে প্রয়োগ করা হয়। শব্দটি বোনের সাথে যৌন সম্পর্ক স্থাপনকারীকে বোঝানো হয়।

একবিংশ শতকের গোড়া থেকে বাংলা সাহিত্যে ভাষা প্রয়োগে আমূল পরিবর্তন ঘটে।সাহিত্যকে বাস্তব ও জীবন্ত করে তুলতে মুখের ভাষাকে সরাসরি সাহিত্যে ব্যবহার করা শুরু হয়।লক্ষ্য রাখা হয় অশ্লীলতার অজুহাতে কোন শব্দকে ব্রাত্য করে না রাখা হয়। তাই যৌনাঙ্গ, যৌনকর্ম ও যৌনপেশা বীষয়ক 'স্ল্যাং'গুলির সরাসরি প্রয়োগ শুরু হয়। সোহরাব হোসেন তার ছোটগল্পে এই ধারণাতেই বড় কটু 'স্ল্যাং' গুলিকেও অবলীলায় ব্যবহার করেছেন।

'....পোঙায় ভয় থাকে তুই যা।আমি এই ক্ষাতেই বসলুম।'[১৯]

'মেট্রো চ্যালেনে রূপালি পোঁদের যোনি ও স্তনের বোঁটা দেখানো হয়।'[২০]

সোহারাব হোসেন গ্রাম্য 'স্ল্যাং'গুলিকে সরাসরি সাহিত্যে ব্যবহার করেছেন কিন্তু তিনিও ও একটা জায়গায় থেমে গেছেন। তাই 'পোঙা' ও 'পোঁদ' শব্দদুটি ব্যবহার করলেও বাকি দুটি যৌনাঙ্গ বিষয়ক শব্দকে মার্জিতভাবে ব্যবহার করেছেন যাতে তা কুৎসিৎ 'স্ল্যাং' প্রতিপন্ন না হয়। সোহারাব হোসেন 'স্ল্যাং'কে ব্যবহার করেছেন বক্তব্যকে উন্মুক্ত করতে এবং পাঠকের মানসিকতাকে ক্রমশঃ উদার করতে।তা সত্ত্বেও দেখা যায় উক্ত লেখকের মধ্যে তবুও কিছুটা রক্ষণশীলতা কাজ করেছে। কিন্তু নবারুণ ভট্টাচার্য রক্ষণশীলতার সব আগলকে ভেঙে দিয়েছেন। তিনি আড্ডায় ব্যবহৃত বলা যায় 'রকের আড্ডায়' ব্যবহৃত 'স্ল্যাং'কে তার উপন্যাসে ব্যবহার করেছেন।তাঁর 'হারবার্ট' উপন্যাস থেকে বলা যায়-

> "গৃহে আশ্রিত পাচকের মেয়ের পেট হয়েছিল বলে।
> মুণ্ডহীন কেউ হা হা রবে রোদন করতে করতে এসে সরবে পর্দন ও বিষ্ঠাত্যাগ করে।
> -উনি কে?
> উনি নয়। ঐ বানচোৎ কে বল্।
> ....
> ....
> এ হল বারাণসীলাল। ব্যবসায় মেতেছিল ফিরিঙ্গিদের সঙ্গে। কামুক সাহেসদের নেটিভ মাগী সাপ্লাই দিত।
> -তারপর?
> -তারপর?তারপর সব বোকাচোদা। তবে হ্যাঁ আমাদের গিন্নিগুলো ভালো ছিল।[২১]

উপরের বাক্যগুলি পড়লেই বোঝা যাচ্ছে নবারুণ ভট্টাচার্য 'স্ল্যাং' গুলি ব্যবহার করেছেন মূলত সাহিত্যে 'স্ল্যাং' নিয়ে বাঙালীর যে রক্ষণশীলতা তাতে আঘাত করতে। আর সাধারণ মানুষজন যে ভাবে নিজেদের মধ্যে কথা বলে এবং 'স্ল্যাং' ব্যবহার করে তার হয়ত লিখিত প্রমাণ তৈরী করতে। 'কাঙাল মালসাট' থেকে একটু উদাহরণ তুলে ধরা যায়-

> "পুরন্দরের কবিতায় একটা বি.জে.পি লাইন চলে আসছে, তাই বললাম। এতক্ষণ পুরন্দর কিছু বলেনি। সে 'যাঃ বাঁড়া', বলে স্বগতোক্তি করে একটা বিড়ি ধরাল।"[২২]

বাংলা সাহিত্য ক্রমশ নিজেকে প্রকাশ করে চলেছে। গোপনীয়তা আর থাকছে না। ভাষায় আর কোন গোপনীয়তা থাকছে না। কাজেই 'Slang is very informal is usually spoken rather than written,' এই আপ্ত বাক্য আর বজায় থাকছে না। 'স্ল্যাং' যেমন বলার বিষয় ঠিক তেমনি লেখাতেও ব্যবহার হয়। অতএব 'স্ল্যাং' শুধু বলার নয় লেখার ভাষাও হয়ে ওঠেছে। এমন সময় আসতে চলেছে যখন বাংলা সাহিত্যে 'স্ল্যাং' সহজ স্ততঃস্ফূর্তভাবে ব্যবহার হবে এবং সেটাই স্বাভাবিক বলে মনে হবে।

তথ্যসূত্র :

১. রামেশ্বর শ।সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা।পুস্তকবিপনি।কলকাতা।১৩৯০। পৃঃ-৬৪৯
২. পবিত্র সরকার।লোকভাষা লোকসংস্কৃতি।চিরায়ত প্রকাশন।কলকাতা।১৩৯৮। পৃঃ-১১৩
৩. ভক্তিপ্রসাদ মল্লিক।অপরাধ-জগতের ভাষা ও শব্দকোষ। দে'জ পাবলিশিং। কলকাতা। নভেম্বর ২০১১।পৃঃ-৫৯
৪. সুকুমার সেন।চর্যাগীতিপদাবলী(সম্পাদিত)।আনন্দ।কলকাতা।১৯৯৫।পৃঃ-৬২
৫. ঐ। পৃঃ-৬২
৬. অভ্র বসু।বাংলা স্ল্যাং সমীক্ষা ও অভিধান।প্যাপিরাস।কলকাতা।২০০৫।পৃঃ-১২৭
৭. মুকুন্দরাম চক্রবর্তী। চণ্ডীমঙ্গল (সুকুমার সেন সম্পাদিত)। সাহিত্য অকাদেমি। কলকাতা। ১৯৯৩। পৃঃ-১১৮
৮. ভারতচন্দ্র। অন্নদামঙ্গল (আশিসকুমার দে সম্পাদিত)। সাহিত্য সঙ্গী। কলকাতা। ২০০৯। পৃঃ-৬০
৯. অজিতকুমার ঘোষ। বঙ্গ সাহিত্যে হাস্যরসের ধারা। ভারতী লাইব্রেরী। কলকাতা। ১৩৬৭। পৃঃ-২৫৮

১০. ক্ষেত্রগুপ্ত (সম্পাদিত)। দীনবন্ধু রচনাবলী। সাহিত্যসংসদ। কলকাতা। ১৯৮৯। পৃঃ-৬৪
১১. মাইকেল মধুসূদন দত্ত।একিই কি বলে সভ্যতা বুড় শালিকের ঘাড়ে রোঁ(নিশীথ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত)।প্রজ্ঞাবিকাশ।কলকাতা।২০০৪।পৃ-১১
১২. ঐ পৃঃ-১৪
১৩. ঐ পৃঃ-২৮
১৪. ঐ পৃঃ-৩৪
১৫. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।কৃষ্ণকান্তের উইল (ধ্রুব কুমার মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত)। সাহিত্য সঙ্গী। কলকাতা। ২০০৩।পৃঃ-২২
১৬. মোহন পাল। টিনের তলোয়ার নয় প্রতিবাদের তলোয়ার। প্রজ্ঞাবিকাশ। কলকাতা। - । পৃঃ-১০২
১৭. ঐ ।পৃঃ-১০১
১৮. গৌর কিশোর ঘোষ।প্রতিবেশী।আনন্দ।কলিকাতা।১৯৯৮।পৃঃ-২০
১৯. সোহারাব হোসেন। শ্রেষ্ঠ গল্প (মাঠমিছিলের দুঃখ সুখ)। করুণা। কলকাতা।২০১০।পৃঃ-৪৮
২০. ঐ। (মহানিষ্ক্রমণ)।পৃঃ- ১৯
২১. নবারুণ ভট্টাচার্য। উপন্যাস সমগ্র।দে'জ।কলকাতা।১৩৭২। পৃঃ-৫০
২২. ঐ । পৃঃ-২৩৯

বাংলা মঙ্গলকাব্যে মাতৃত্বের পরিসর : একটি অন্বেষণ

সৌমিত্র বাগ
গবেষক, বাংলা বিভাগ
বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়,বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ

Abstract : At one time society was matriarchal while the position of women was significant enough. This condition of women changes in the evolution of time. Polygamy of men deprived women of their due dignity. The woman became confined to the inner city. But even though it was confined to the inner city, the inner city palace remained under its control. And the main focus of this mastery is her child. These mother have behaved strangely while raising their children. Yashoda of Vaishnava terms is very familiar to us and this mother has been selfish in the affection of the child. On the other hand, the mothers of Mangalkavya are very diverse. Mothers from different walks of life have flocked to Mangalkavya.

Keyword : Mother image; loving; proud; defendant; diverse

১

মাতৃপ্রধান আমাদের এই বাংলাদেশ। একসময় সমাজে মায়েরা ছিল মুক্তচিন্তার অধিকারিণী। সমাজে তাঁর আসন ছিল যথেষ্ট সম্মানের। মায়ের নির্দেশেই একসময় পরিবারে তথা সমাজে সবকিছু গড়ে উঠত। যদিও এই চিত্রটা মূলত প্রাচীনকালের বাংলাদেশেই দেখি। কিন্তু সময়ের সাথে সাথে সমাজে মায়ের এই আলোকিত অধ্যায় ক্রমশ অন্তর্হিত হতে থাকে, শেষ হয়ে যায় নারীর অধিকারবোধের কথা। পুরুষের প্রতাপে, পুরুষের স্বেচ্ছাচারে মায়েরা হয়ে পড়ে অসহায়তার স্বরূপ। মানুষের বংশগতিতে, ঐতিহ্যে, ইতিহাসে পুরুষেরা প্রধান হয়ে যায়। নারী শুধু প্রজননক্রিয়াটি ঘটায়, সন্তান ধারণের আধার হয়ে বলে সে জননী মাত্র- তার চেয়ে বেশি কিছুই নয়। তবে পরিবারতন্ত্র নারীকে যতই বাঁধুক, অন্দরমহল তার নিজস্ব এক্তিয়ারে। আধিপত্যের অন্তর্ভুক্ত হয়েও তা স্বতন্ত্র একটি বলয়। নারীর এই অন্দরমহলের পরিসরটি যে তার নিজস্বক্ষেত্র হয়ে উঠেছে তার কারণ তার জননীসত্তা। সন্তানকে বড় করে তোলার জন্য সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকারের দায়িত্ব যেন অনেকটাই মায়ের একার। সন্তানের পরিচর্যায় মা-ই প্রধান অবলম্বন। মায়েরা অন্তঃপুরে বন্দি হয়েও সন্তানের জন্য তাদের স্নেহ, ভালোবাসা, আশা,ভরসা, উদ্বেগ সবকিছু ছড়িয়ে দিয়েছে সন্তানের মধ্যে। সন্তানের জন্য জননীর এই মহীরুহ সত্তায় আগলে রাখার কথা আমাদের সাহিত্যের পাতায় পাতায় আঁকা হয়েছে।

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যেও জননীর এই সত্তার প্রকাশ বিচিত্রভাবে দেখতে পাই। মা ও সন্তানের সম্পর্কের এই বিচিত্র বিন্যাস আমাদের দীর্ঘদিন ধরে রক্তের সাথে মিশে থাকা ধারণাকে উন্মীলিত করে দেয়।

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে মাদার ইমেজ বলতেই যাঁর কথা প্রথমেই আমাদের মনে আসে তিনি যশোদা। পালিতপুত্রের জন্য যশোদার স্বার্থপর ভালোবাসা তাঁকে স্নেহান্ধ করে তুলেছে। যশোদা যেন কারুণ্যের বিগ্রহ। তাঁর স্নেহ-বিহ্বলতা অনেক সময়ই পাড় ভেঙ্গে দিগন্ত প্লাবিত করেছে। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে এই মায়ের বিপরীতে আরো অনেক মায়ের চিত্র আমরা পাই। যেমন- শচীমাতা, মঙ্গলকাব্যের সনকা, নিদয়া, রম্ভাবতী, খুল্লনা, গোপীচন্দ্রের ময়নামতী, গীতিকার চাঁদবিনোদের মা প্রমুখ। আমাদের আলোচ্য মঙ্গলকাব্যের মধ্যেও মা ও সন্তানের সম্পর্ক আমাদের মুগ্ধ করে। মঙ্গলকাব্যের মা অন্য মায়ের থেকে অনেক গুণে আলাদা। আঘাতে, সংঘাতে, ঘটনার বৈচিত্র্যে এই মা বিচিত্ররূপ ধারণ করেছে। মঙ্গলকাব্য যেহেতু নিম্নশ্রেণির সমাজের দেবদেবীকে উচ্চশ্রেণির সমাজে উন্নীত করার সাহিত্য তাই এখানে সমাজের বিভিন্ন স্তরের মা এসে ভিড় করেছে। এই মায়েরা কখনও সন্তান গর্বে গর্বিনী, কখনও সন্তানের দুঃখে কাতর, আবার কখনও সন্তানকে স্নেহের বাঁধনে বাঁধতে উদগ্রীব, কখনও সন্তানকে অভিযানে পাঠাতে তৎপর। আমরা জানি মঙ্গলকাব্যের পরিধি খুবই বিস্তৃত। পঞ্চদশ শতাব্দী থেকে শুরু করে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত এই ধারায় অসংখ্য কবি কাব্য লিখেছেন। আবার এই মঙ্গলকাব্যের নানা শাখা-প্রশাখা বিদ্যমান। তাই এই সংক্ষিপ্ত পরিসরে সমস্ত শাখার কবিদের কাব্য নিয়ে আলোচনার পরিসর নেই। সুতরাং মঙ্গলকাব্যের প্রধান তিনটি শাখার (মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল ও ধর্মমঙ্গল) কয়েকজন নির্বাচিত কবির কাব্যে মাতৃত্বের স্বরূপ কতটা পরিসর জুড়ে আছে তা দেখার চেষ্টা করবো। তার আগে মাতৃত্বের স্বরূপটিকে বুঝে নেবো।

২

নারীত্বের পূর্ণতা মাতৃত্বে কথাটা আমাদের সমাজে ব্যাপকভাবে প্রচলিত। মায়ের সঙ্গে তার সন্তানের সম্পর্কটা খুবই নিবিড়। সন্তানের সঙ্গে মায়ের একটা অন্যরকম টান থাকে। সন্তানেরা তার মায়ের জীবনের আধার হয়ে থাকে। মায়েদের বেঁচে থাকার একটাই উৎস হল তাদের সেই সন্তানেরা। স্নেহ-বিহ্বল মায়ের এই ছবি সব দেশেই এক হলেও বাংলার মায়ের একটা আলাদা গুন আছে।

বাংলার মা যেন বাংলার প্রকৃতির সাথে সমার্থক হয়ে উঠেছে।"বাংলার ছায়ানিবিড় প্রকৃতি গভীর শান্তির নীড়। নিদাঘতপ্ত দিনে এই ছায়া আশ্রয় করে ক্লান্ত মানুষ, বেলা অবসানে এই নীড়ে পাখা গুটায় শ্রান্ত পাখী। তেমনই সকল জ্বালাজুড়ানো মায়ের কোল। মায়ের বোলেও কত না শান্তি। গ্রাম-বাংলার কবিরা বলেন, মায়ের রাও পবনের বাও।"[১] অর্থাৎ বাংলার মায়ের সাথে প্রকৃতির এই সম্পর্কের মেলবন্ধনের মধ্যে দিয়ে এক অপূর্ব আদিমতা, সৌকুমার্য অনুভব করা যায়।

জননী ও সন্তানের সম্পর্কের মধ্যে যে মাধুর্য বিরাজ করে তাকে বাৎসল্য রস বলা হয়ে থাকে। এই রস তীব্র নয়, গাঢ় নয়, তা অত্যন্ত স্নিগ্ধ সরস এবং যুক্তি সংগতিহীন। সন্তানের আকুলকরা 'মা মা' ডাকে আবেগের তীব্রতায়, অভিমান ও অনুযোগের প্রাচুর্যে বাৎসল্য রস উথলে ওঠে। সন্তান ও মায়ের মধ্যে সর্বদাই স্নেহ-মমতা, মান-অভিমানের সম্পর্ক নিহিত থাকে। যদিও গভীর স্নেহের প্রধান লক্ষণই হল অভিমান। আবার এই অভিমানই স্নেহকে গাঢ় করে, মধুর করে তোলে। অভিমান থাকলেও জননীর প্রতি সন্তানের থাকে গভীর আকুলতা।

সন্তানের মুখের মধ্যে কী এমন আছে যাকে দেখার জন্য, উপলব্ধি করবার জন্য মায়ের কাছে সংসারের সমস্ত কাজকর্ম পণ্ড মনে হয়। জননী তার সন্তানের মধ্যে এমন দুর্লভ বস্তুর সন্ধান পায় যে জননীর সর্বদাই আশংকা হয় তার সন্তানকে কেউ আড়ালে থেকে বিপদে ফেলার চেষ্টা করছে। সে যে কে তা তার জানা না থাকলেও তাকে অভিসম্পাত দিতে ছাড়ে না। সন্তান কৃষ্ণবর্ণই হোক আর গৌরবর্ণই হোক, তাকে সবসময়ে অন্যসব সন্তানের থেকে রূপে-গুণে শ্রেষ্ঠ বিবেচনা করে। মায়ের চোখের সামনে দিয়ে সন্তানের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কত অস্পষ্ট স্বপ্ন ভেসে যায়।

বাঙালি ঘরে অভাব নিত্যদিন বিরাজ করে। এই অভাবের তাড়নায় সন্তানের জন্য মায়েদের বিনিদ্র রজনী কাটে। দুঃখিনী মায়ের এই ভাবনা যেকোনো বাঙালি মায়েরই ভাবনা। মায়েদের এই ব্যথা, এই উদ্বেগ যেন বাঙালি গৃহের প্রতিটি মায়ের ব্যথা ও উদ্বেগ। স্নেহের কারণেই বাঙালি মাকে দুঃখ-যন্ত্রণার শরিক হতে হয়েছে। আবার কখনও কখনও বাংলার এই মা বিপদ থেকে উদ্ধারের আশায় সন্তানকে অভিযানে পাঠায়। বাংলা মায়ের এই বিচিত্রমূর্তি মঙ্গলকাব্যের কবিরা কীভাবে অঙ্কিত করেছেন, তা কাব্যবিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে দেখবো।

৩

বাংলা মঙ্গলকাব্যগুলির মধ্যে মনসামঙ্গল সবথেকে বেশি প্রচার লাভ করেছিল। এই কাব্যের চরিত্রগুলির মধ্যে এমন করুণ রসের ভাব আছে যা বাঙালির মনকে হরণ করে। ফলে এই কাব্যের জননী চরিত্রগুলিও বাঙালির সামাজিক জীবনের উপরে নানা দিক দিয়ে অধিকার স্থাপন করেছে।

মনসামঙ্গল কাব্যের জননী চরিত্রগুলির মধ্যে প্রথমেই আমরা পাই ধনা মনার মা কাজলা। বিপ্রদাসের মনসামঙ্গল কাব্যে দেখি চম্পকের অধিপতি চাঁদ সদাগর দেবী মনসার সাথে বিবাদে লিপ্ত হয়ে নিজের জীবনে বিপর্যয় ডেকে এনেছে। মনসা বিষদৃষ্টি দিয়ে চাঁদের অন্তঃপুরের চন্দন গাছ ভস্ম করে দেয়। চাঁদ ঘোষণা করে যে এই গাছ বাঁচিয়ে তুলতে পারবে তাকে পুরস্কার দেবে। ধনা মনা এই ঘোষণা শুনে হাজির হয়েছে এবং চাঁদের গাছ বাঁচিয়ে তুলেছে। পুত্রদের এই কীর্তির কথা শুনে মা কাজলার স্নেহ-বিহবলতা দুঃখে উত্তাল হয়ে উঠেছে। কারণ সে জানে মনসার সাথে বিবাদে দেবতাও

বাঁচতে পারে না, আর তার সন্তানেরা কীভাবে নিজেদের রক্ষা করবে। তাই সে অপত্য স্নেহে বলেছে-

"কে দিল কুমতি হেন তোমা দুহাকারে।
জানিয়া শুনিয়া পুত্র ইচ্ছ মরিবারে।।
তোমা দুহা বিনে মোর আর কেহ নাই।
পুষ্প বেচি খাব পুত্র না কর বড়াই।।"[২]

কিন্তু ধনা মনা মায়ের নিষেধ অমান্য করে। ফলে মনসার সাপের কামড়ে তাদের মৃত্যু হয়। মায়ের কাছে এই সংবাদ পৌঁছাতেই তার হৃদয় হাহাকার করে উঠেছে। শোকে কাজলার অবস্থা-

"ইহা শুনি কাজলা হৃদয়ে হাতে হাত।
আশ্চন্বিতে মুন্ডে জেন পড়ে বজ্রাঘাত।।
পুত্র পুত্র বলিয়া আর্তনাদ ডাক ছাড়ে।"[৩]

মনসা কাজলার কাছে সখী সেজে এসে প্রতিশ্রুতি দেয় যে তার ছেলেদেরকে সে বাঁচিয়ে তুলবে, কিন্তু মনসা তাদেরকে নিয়ে চলে যাবে। শোকাকূলা মা তাতেই রাজি হয়ে যায়। কাজলা যেকোনো মূল্যে তার সন্তানদের ফিরে পেতে চায়-

"শোকেতে পাগল রামা সত্য কৈল তায়।
জিয়াইয়া লহ পুত্র মোর নাহি দায়।।"[৪]

মনসা মন্ত্র পড়ে দুইভাইকে বাঁচিয়ে তুলে তাদের নিয়ে যেতে চাইলো। কিন্তু কাজলা মাতৃত্বের টানে সত্যভ্রষ্ট হয়ে সন্তানদের ছাড়তে চাইল না-

"না দেখি পুত্রের মুখ ভাবিয়া পরম দুঃখ
মরিব পুত্রের দুঃখ শোকে।"[৫]

মনসা কোনো কিছুতেই তার পুত্রদের রেখে যেতে রাজি না হলে শেষ পর্যন্ত কাজলা বলে-

"তুমি মোর হইলা ধাতা হও মোরে কৃপাদাতা
ছোট পুত্র মোরে দেহ দানে।"[৬]

আসলে মা ও সন্তানের জীবন এক সুতোয় বাঁধা। দুজনে এক আত্মা। সন্তান ছাড়া মায়ের কাছে সবকিছুই শূন্য মনে হয়। তাই দুঃখনিশার অবসানে এই মায়ের চিত্র আমাদের মনে উজ্জ্বল হয়ে থাকে।

এই কাব্যের আরেকটি জননী চরিত্র হল সনকা। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে সবথেকে দুঃখিনী জননী হল চাঁদঘরনী এই সনকা। চাঁদবেনে মনসার বিরোধিতা করতে গিয়ে মনসার রোষের কবলে পড়ে। ফলে তাঁর নাখরা বাগান বিনষ্ট হয়, মহাজ্ঞান হারায়। মনসার কোপে তার ছয় পুত্র বিষভাত খেয়ে প্রাণ হারালো। ছয় পুত্রের মৃত্যুতে সনকা আকুল হয়ে পড়েছে, শোকে ভেঙ্গে পড়েছে-

"কান্দে কান্দে সনকা হইয়া ব্যাকুলী।
কে হরিয়া নৈল পুত্র সোনার পুথলি।।"[৭]

সনকার এই মৃত্যুশোক যেন অপঘাত মৃত্যুশোক। কেঁদে কেঁদে গোটা চাঁদের পুরীকে শোকসাগরে নিমজ্জিত করেছে। সন্তানহীনা হয়ে সেও বিষ খেয়ে মৃত্যুবরণ করতে চেয়েছে। তাকে সান্ত্বনা দেবার কেউ নেই। সনকা যখন জানতে পেরেছে মনসার সাথে চাঁদের বিবাদের ফলেই তার ছয় পুত্রের মৃত্যু হয়েছে তখন সনকার সমস্ত ক্ষোভ গিয়ে পড়েছে তার স্বামীর উপর-

"সর্বনাশ হৈল রাজা তোর দম্ভদোষে।
... ...
যদি রাজা পুজ তুমি মনসাকুমারী।
কেন পুত্র মরিবেক রূপের মুরারি।।"[৮]

চাঁদ-সনকা বেঁচে থাকলে আবার তাদের সন্তান হবে- চাঁদ এই বলে সনকাকে আশ্বস্ত করতে চাইলেও সনকার ক্ষোভ কমেনি। ক্রমে চাঁদের বাণিজ্যযাত্রাকালে সনকা আবার গর্ভবতী হয়েছে। গর্ভের সন্তানের প্রতি স্নেহে সনকা আনন্দে সাধভক্ষণ করেছে। ক্রমে পুত্র লখিন্দর ভূমিষ্ঠ হল। "পুত্র-মুখ দেখি রানি সানন্দিত মন।"[৯] ছয় পুত্রের শোক কাটিয়ে সনকা অধিক যত্নে লখিন্দরকে লালন পালন করতে থাকে। "শুভক্ষণে অন্নদিল পুত্রের বদনে/মিষ্টান্ন ভোজন করাইল বিপ্রগণে।"১০ এছাড়া "পরম হরিষ মনে দিলেক পুত্রের কানে/গড়াইয়া রতন কুণ্ডলে।"[১১] এদিকে চাঁদ বাণিজ্য থেকে ফিরে পুত্রের বিবাহের আয়োজন করতে থাকে। কিন্তু বিয়ের রাত্রে পুত্রের মৃত্যু হবে শুনে সনকা শঙ্কিতা হয়ে বলে-

"বিবা-রাত্রে পুত্রের নাগের আছে ডর।
না দিব পুত্রের বিবা থাকুক ঐমনে।"[১২]

চাঁদ সদাগর তার কথা না শুনে লোহারবাসর তৈরি করে লখিন্দরের বিবাহ দেয়। কিন্তু দৈবের লিখনে লখিন্দরকে সর্পদংশন করলো। পুত্রের সর্পদংশনে সনকার হৃদয় আর্তনাদ করে উঠেছে-

"হাহাকার সনকা লখাই করি কোলে।
বদনে বদন দিয়া সঘন নেহালে।।"[১৩]

কেঁদে কেঁদে সনকা মূর্ছিত হয়েছে। পুত্রের মৃত্যুতে সনকা কখনও বেহুলাকে, কখনও চাঁদকে দায়ী করেছে। সনকার শোক এখানেই শেষ হয়নি। আমরা দেখি বেহুলা তার মৃত পতিকে নিয়ে কলার ভেলা ভাসিয়ে স্বর্গ থেকে তার মৃতপতি, ছয় ভাসুর ও চাঁদের মধুকর ডিঙা নিয়ে ফিরেছে। তবে শর্ত একটাই চাঁদকে মনসার পূজা দিতে হবে। বাৎসল্যময়ী জননী সনকার কাতর আবেদনে চাঁদ মনসার পূজো দিয়েছে। সনকার মত দুঃখিনী জননী সত্যিই দুর্লভ। সন্তানের প্রতি মায়ের ভালোবাসার নিদর্শন যে

অনেকসময় পিতার পক্ষেও দেখানো সম্ভব হয় না, তা সনকার মধ্যে দিয়ে দেখতে পাই।

বেহুলার মা সুমিত্রা এই কাব্যের আর এক জননী। সেও দুঃখিনী জননী। সনকার মত যদিও পুত্রের মৃত্যুশোক তাকে সহ্য করতে হয়নি, কিন্তু কন্যার প্রতি বাৎসল্যে সে ভিতরে ভিতরে দহনজ্বালা সহ্য করেছে। কন্যা বেহুলার সাথে লখিন্দরের বিবাহ ঠিক হয়েছে। কিন্তু বিয়ের রাত্রে লখিন্দরের সর্পাঘাতে মৃত্যু হবে- এই কথা শুনে সে তার স্বামীকে বলেছে-

"সুমিত্রা বলেন বিবা নাদিব তখাই।
বিবা-রাত্রে সর্পাঘাতে মরিবে লখাই।।"[১৪]

কিন্তু মেয়ের কাছে দৈবনির্ভর যুক্তিতে সুমিত্রা হার মানলেন। ফলে বেহুলা-লখিন্দরের বিবাহ হল। সুমিত্রা বিবাহের সামাজিক রীতিনীতিও বাঙালি মায়ের মতই পালন করলেন। "নানা দ্রব্য লইয়া তবে সুমিত্রা সুন্দরী/জামাতা ভোজন হেতু রান্ধে ত্বরাত্বরি।"[১৫] এরপর মেয়েকে বিদায় দিতে গিয়ে "সুমিত্রা মনের দুঃখে করেন ক্রন্দন।"[১৬] এরপর সর্পাঘাতে লখিন্দরের মৃত্যুসংবাদ শুনে সুমিত্রা শোকসাগরে নিমজ্জিত হল। বেহুলা লখিন্দরের জীবন বাঁচাতে অনন্তের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে। কন্যাকে হারানোর এই বিরহ, শোক সুমিত্রা তিল তিল করে কাটিয়েছে। তাই বেহুলা যখন মনসার সাথে স্বর্গে ফিরে যাওয়ার পথে ছদ্মবেশে তার মায়ের কাছে দেখা করতে আসে তখন সেই ছদ্মবেশী বেহুলার মধ্যে নিজের মেয়ের ছবি দেখতে পেয়েছে-

"ঝি জামাই ছিলো মোর সর্পাঘাতে মৈল।
তোমা দুহা দেখি সেই শোক উপজিল।।"[১৭]

বাৎসল্যময়ী মায়ের এই দুঃখ সান্ত্বনার অতীত।

৪

চণ্ডীমঙ্গল কাব্যেও সন্তান ও জননীর সম্পর্কের মধ্যে যে বাৎসল্যবোধ, তার প্রকাশ দেখি। সন্তানের জন্য মাতৃহৃদয়ের উদ্বেগ, আনন্দ এই কাব্যের জননীর মধ্যে দেখি।

কালকেতু জননী নিদয়ার কথা এক্ষেত্রে আমরা স্মরণ করতে পারি। নিদয়া ব্যাধপত্নী। যদিও মাতৃস্নেহের ক্ষেত্রে ব্যাধপত্নী বা অভিজাত সমাজের পত্নীর মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। মাতৃস্নেহের প্রকৃতি সব মায়ের কাছেই একইরকম। বাংলার নারী সন্তান কাঙাল। কোলে একটি সন্তানের জন্য বাঙালি জননী সব কিছু করতে রাজি। সন্তানের আশাতেই নিদয়া ব্রাহ্মণীবেশী চণ্ডী ভিক্ষা চাইতে এলে যত্ন করে পীড়াপানি দিয়েছে-

"আইলা ভিক্ষার আশে ধর্মকেতুর বাসে
নিদয়া দিলেন পিড়া পানি।"[১৮]

সন্তান লাভের আশায় নিদয়া দেবীর কথামত স্নান করে দেবীর কাছে উপস্থিত হয়ে ঔষধ চেয়েছে। মাতৃত্ব লাভের আবেগে নিদয়া সবশ্রেণির জননীর প্রতিরূপ হয়ে

উঠেছে। দেবীর বরে নিদয়া কালকেতুকে সন্তানরূপে লাভ করে। কালকেতুর বিবাহপর্বে নিদয়া সকল মায়ের মতই মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে কাজকর্ম করেছে। পুত্রকে পুত্রবধূর সাথে দেখে নিদয়া সন্তানধারণের গর্বের সার্থকতা অনুভব করেছে-

"খাওয়ায় ফুল্লরা বধূ খির খন্ড দধি মধু
নিদয়ার সফল জীবন।"[১৯]

শেষ পর্যন্ত পুত্র ও পুত্রবধূর হাতে সংসার অর্পণ করে নিদয়া কাশিবাস করেছে।

এই কাব্যের আর এক অসহায় জননী হল খুল্লনার মা রম্ভাবতী। চণ্ডীমঙ্গলের বণিকখন্ডে দেখি খুল্লনার পিতা তার বিয়ে দেবে দোজবর ধনপতির সঙ্গে এবং ধনপতির প্রথমা স্ত্রী লহনার স্বভাব কেমন, তা খুল্লনার মা রম্ভাবতী খুব ভাল করেই জানে। খুল্লনার জীবনে সতীনকাঁটার যন্ত্রণার কথা ভেবে বিচলিত হয় মা রম্ভাবতী। সপত্নীর সঙ্গে অধিকার বন্টনের ক্ষেত্রে লহনা কখনও খুল্লনাকে ছোট বোন বলে রেয়াত করবে না। তাই খুল্লনার পিতা যখন সম্বন্ধ ঠিক করে ফেলেছে তখন তার মা বলেছে-

"খুল্লনা বান্ধিআ গলে ঝাঁপ দিব গঙ্গাজলে
নাঞি দিব দারুন সতিনে।"[২০]

সমাজের নিষ্ঠুর নিয়মে সন্তানের জন্য মায়ের নিরুপায়তা ও অসহায়তার যে তীব্র বেদনা তার চিত্র আমরা এই মায়ের মধ্যে দিয়ে দেখি। রম্ভাবতীর অনুনয় অবশ্য সফল হয়নি। দ্বিতীয়পক্ষে কন্যাদান না করলে খুল্লনার বৈধব্য অনিবার্য- এই অলীক ভাগ্যলিপি ঘোষণা করে সংস্কারপ্রবণ মায়ের মনকে দুর্বল করল লক্ষপতি। সন্তানের জন্য মায়ের যে আকূলতা শাক্তপদাবলীতেও যেমন আছে, তেমনি মঙ্গলকাব্যের মধ্যেও আছে। সেইসঙ্গে সন্তানের জন্য মায়ের প্রতিবাদও এর মধ্যে দেখি। নিষ্ঠুর বাস্তব মা ও সন্তানের মাঝখানে এসে দাঁড়িয়েছে। সন্তানের জন্য মায়ের কিছু করার নেই।

খুল্লনাও এই কাব্যের একটি জননী চরিত্র। খুল্লনা ধনপতির দ্বিতীয়া পত্নী। দেবীর কৃপায় খুল্লনা শ্রীমন্তকে পুত্ররূপে লাভ করে। শিশু শ্রীমন্ত খুল্লনার চোখের মণি। একটু চোখের আড়াল হলেই খুল্লনা পাগল হয়ে ওঠে। দেবী কৌতুকে শ্রীমন্তকে লুকিয়ে রাখলে খুল্লনা কেঁদে আকুল হয়। আবার শিশুকে ঘুম পাড়ানো যেমন মায়ের এক সমস্যা, তেমনি সময়ে অসময়ে শিশুর কান্না নিবারণও আর এক সমস্যা। মায়েরা এই সমস্যার সমাধানের ক্ষেত্রে ছড়ার সাহায্য নেয়। এই কাব্যে দেখি শিশু শ্রীমন্ত যখন কাঁদছে তখন মা খুল্লনা তাকে ছড়া বলে ভোলাতে চেয়েছে-

"আরে বাছা আয় আয় আয়
কি নাগি কান্দে মোর শ্রীমন্ত রায়।
আনিব তুলিআ গগন-ফুল
একেক ফুলের লক্ষেক মূল।"[২১]

স্বামী যেহেতু বিদেশে তাই শ্রীমন্তর লালন-পালনের দায়িত্ব সব খুল্লনার উপরে পড়ে। শ্রীমন্তের দুরন্তপনা থেকে রেহাই পাবার জন্য খুল্লনা তাকে পাঠশালায় ভর্তি করে দেয়, কিন্তু পাঠশালায় গিয়ে শ্রীমন্ত গুরু মশাইয়ের সাথে বাকবিতণ্ডায় লিপ্ত হয়েছে। গুরু তাকে জারজ সন্তান বলে অপমান করেছে। অভিমানে শ্রীমন্ত সবার অলক্ষ্যে বাড়িতে দরজা বন্ধ করে কাঁদতে লাগলো। এদিকে মা খুল্লনা তাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। সন্তানকে খুঁজে না পেয়ে তার কাছে সবকিছু অন্ধকার মনে হয়েছে-

"জননী লোচনতারা আমার শ্রীমন্তহারা
দিবস দুপুরে অন্ধকার।"[২২]

সতীনের কাছে খুল্লনা সন্তানের খোঁজ পায়। সন্তানকে পেয়ে খুলনার স্নেহ উতল হয়ে উঠেছে। কিন্তু শ্রীমন্ত তার মায়ের কাছে ক্ষোভ উগরে দিয়েছে। তার এই ক্ষোভ আন্তরিক নয়, তীব্র অভিমানপ্রসূত। তাই খুল্লনা তাকে শান্তভাবে তার পিতার কথা বোঝাতে চেয়েছে, কিন্তু শ্রীমন্ত পিতার খোঁজে সিংহলে যেতে চাইলে খুল্লনার অপত্যস্নেহ উদ্বেলিত হয়ে প্রকাশ পেয়েছে। পথের বিপদের কথা শুনিয়েছে। খুল্লনা পুত্র-স্নেহের পরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেছে। শেষপর্যন্ত পুত্রকে সিংহলে যাওয়ার অনুমতি দিয়েছে। যাত্রার আগে পুত্রের মঙ্গলের জন্য দেবী চণ্ডীর কাছে পূজা দিয়েছে।

৫

মঙ্গলকাব্যগুলির মধ্যে ধর্মমঙ্গলকাব্য অনেকটাই মহাকাব্যিক, যুদ্ধবিগ্রহে পরিপূর্ণ। মাতৃত্বের অনুভূতি আস্বাদনের জন্য মায়েরা কতখানি ত্যাগ স্বীকার করতে প্রস্তুত, এমনকি নিজের জীবন উৎসর্গ করতেও রাজি, তার দৃষ্টান্ত এই কাব্যের নাম। সেইসঙ্গে বাঙালি মায়েরা যে সন্তান লালন-পালন করে শুধুমাত্র গৃহকোণে আবদ্ধ থাকেনি, যুদ্ধক্ষেত্রে পর্যন্ত অবতীর্ণ হয়েছে তারও দৃষ্টান্ত আমরা পাই।

এই কাব্যের একটি মাতৃচরিত্র হল রানী রঞ্জাবতী। রঞ্জাবতী গৌড়েশ্বরের পাটরানী, তার ভাই মহামদ। মহামদের অনুপস্থিতির সুযোগে বৃদ্ধ কর্ণসেনের সাথে তার বিবাহ হয়। এই বিবাহকে কেন্দ্র করেই ভাই বোনের মধ্যে শত্রুতা তৈরি হয়। মহামদ বৃদ্ধ কর্ণসেনকে আঁটকুড়, রঞ্জাবতীকে আঁটকুড়ি বলে অপবাদ দেয়। এই বন্ধ্যা অপবাদ ঘোচাবার জন্য রঞ্জাবতী উদগ্রীব হয়ে ওঠে। সে সব কিছুর মূল্যে সন্তান পেতে চায়। শেষ পর্যন্ত ধর্মঠাকুরের কাছে শালে ভর দিয়ে সন্তানলাভের বর পায়-

"তুষ্ট হয়ে তবে কন ত্রিলোক ঈশ্বর।
তথাস্তু তোমাকে বাছা দিব পুত্রবর।।"[২৩]

যথা সময়ে রঞ্জাবতীর একটি পুত্রসন্তান ভূমিষ্ঠ হল। নাম রাখা হল লাউসেন। পুত্র পেয়ে রঞ্জাবতীর আনন্দ আর ধরে না। সন্তানকে এক মূহুর্ত চোখের আড়াল হতে দেয় না। অন্যদিকে মহামদ রঞ্জাবতীর পুত্র হওয়ার সংবাদ পেয়ে ক্ষোভে ফেটে পড়ে। কীভাবে ভাগিনেয়ের অনিষ্ট করা যায় সেই চিন্তা করতে থাকে। মহামদের চক্রান্তে শিশু

লাউসেনকে নিদ্রিত রঞ্জাবতীর কাছ থেকে চুরি করা হয়। রঞ্জাবতী নিদ্রা থেকে উঠে কোলের কাছে শিশু পুত্রকে দেখতে না পেয়ে কান্নায় ভেঙে পড়ে-

“কান্দে রঞ্জা তনয় লাগিয়া
অভাগিনী মায়ের কোলেশয়ন করিয়াছিলে
কথা গেলে না গেলে বলিয়া।।”[২৪]

ধর্মঠাকুর সদয় হয়ে হনুমানের সাহায্যে লাউসেনের মত অন্য এক সন্তানকে (কর্পূর) ফিরিয়ে দিতে চাইলে রঞ্জাবতী সেই সন্তান গ্রহণ করতে অস্বীকার করে। কারণ সন্তান তার সমস্ত সত্তার সঙ্গে জড়িয়ে আছে। সন্তানের প্রতিটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গের স্পর্শ তার শরীরে সিক্ত হয়ে আছে। তাই সে বলে-

“পরের তনয়ে লাগি পড়াইব মন।।
এ তনয় মোর নয় চিনি আমি তারে।
শ্রীধর্ম পাদুকা তার চিহ্ন ছিল শিরে।।।”[২৫]

শেষ পর্যন্ত সন্তানকে ফিরে পেয়ে আনন্দে বিহ্বল হয়েছে।

লাউসেন বড় হয়ে অস্ত্রবিদ্যায় পারদর্শী হয়ে গৌড়ে যেতে চাইলো। তা শুনে রঞ্জার মাথায় যেন বাজ ভেঙে পড়লো। কারণ যে মহামদ তাকে পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন করার জন্য প্রতিনিয়ত চেষ্টা করছে সেখানে সে যাবে বিদ্যা জাহির করতে। মা রঞ্জা অনেক চেষ্টা করেও পুত্রকে যাওয়া থেকে নিরত করতে না পেরে সিদ্ধান্ত নেয়-

“গৌড় হইতে আন মল্ল সারেঙ ধরে।।
হাত পা ভাঙ্গিয়ে রাখ বলে কয়ে তাকে।
ঠুটা খোড়া হয়ে যেন ঘরে বসে থাকে।।
...   .
অবিরত বেটার দেখিব চাঁদমুখ।”[২৬]

বাঙালি মায়ের এরকম সন্তানস্নেহের দৃষ্টান্ত আর কোনো কাব্যে চোখে পড়ে না। যদিও লাউসেন শেষ পর্যন্ত গৌড়ে যায়। তাতে রঞ্জার অবস্থা-

“কর্ণসেন রঞ্জাবতী শোকে অচেতন।
রাম বিনা রাজরানী কৌশল্যা নন্দন।।”[২৭]

তবে রঞ্জার স্নেহ-বিরহ চরম হলেও লাউসেনের বীরত্বে খুশিও হয়েছে, পুত্রের গর্বে গর্ববোধ করেছে। আবার কখনও লাউসেনকে হাকন্দে পশ্চিমে সূর্যোদয় করতে পাঠিয়ে নিজে কারাগারে বন্দি থেকেছে। পুত্র সফল হয়ে ফিরে এসেছে, তাতে মা আনন্দে আত্মহারা হয়েছে।

ধর্মমঙ্গল কাব্যের বীর জননী হল কালু ডোমের পত্নী লখ্যা ডোমনী। নারীশক্তি ও তার বাৎসল্যবোধের জয়গান ঘোষিত হয়েছে লখ্যার মধ্যে দিয়ে। মহামদের চক্রান্তে পশ্চিমে সূর্যোদয়ের আরাধনায় লাউসেনকে হাকন্দে যেতে হয়েছে। রাজ্যরক্ষার দায়িত্ব দিয়ে গেছে কালুডোম ও তাঁর পত্নী লখ্যার উপর। লখ্যা এই আদেশ অঙ্গীকার করে দৃঢ়তার সাথে। এদিকে লাউসেনের অনুপস্থিতিতে মহামদ ময়নাগড় রাজ্য আক্রমণ করল। কিন্তু লখ্যার স্বামী কালু মদের ঘোরে অচেতন হয়ে পড়ে আছে। কিন্তু লখ্যার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা-

"শুধিব সেনের নুন সাধিব সাধনা।
মরণ অবধি আমি রাখিব ময়না।।"[২৮]

স্বামীকে জাগাতে না পেরে লখ্যা বিপদকালীন পরিস্থিতিতে পুত্রস্নেহকে দূরে রেখে পুত্র সাখাকে রণে যাওয়ার জন্য আদেশ দেয়। কিন্তু সাখা যুদ্ধে যেতে ইতস্তত করলে তার ক্ষোভ ফেটে পড়ে। শেষে পুত্র সাখা যুদ্ধে যায়। যুদ্ধে সাখা নিহত হলে লখ্যা বাৎসল্যের ক্রন্দনে চারিদিক হাহাকার করে তোলে-

"কাটা মুন্ড কোলে করা লখ্যার ক্রন্দন।
কোথা গেল্যা বাপধন মায়ের জীবন।।"[২৯]

মধ্যযুগের সংস্কারাচ্ছন্ন পরিবেশে লখ্যার মত বীরমাতার চিত্র আমাদের বিস্মিত করে। কালের সীমা অতিক্রম করে এই মা আমাদের মনে স্থায়ী আসন লাভ করেছে।

আমাদের সামাজিক কাঠামোতে নারীসত্তা এখনও সার্থকতা খুঁজে পায় জননী হিসেবেই। মঙ্গলকাব্যের নারীরাও জননী হিসেবেই নিজেদের সার্থক মনে করেছে। মঙ্গলকাব্যের মধ্যে আমরা বিচিত্র মায়ের সন্তান পেলাম। মঙ্গলকাব্যের এই মায়েরা কখনও স্নেহময়ী, কখনও বা কঠিন আঘাতে ক্রন্দনরত, কখনও সন্তানের দুঃখে-কাতর, কখনও আবার প্রতিবাদিনী। পিতৃতান্ত্রিক সমাজে মায়েরা অনেকসময় পুরুষের মুখাপেক্ষী হয়ে পড়তে বাধ্য হয়েছে। তবুও এই মায়েরা সন্তানের জন্য পুরুষের কাছে তাদের মনোভাব অব্যক্ত রাখেনি। সনকা তার ছয়পুত্রের মৃত্যুর জন্য চাঁদ সদাগরকে দায়ী করেছে। খুল্লনার মা রম্ভাবতী দোজবরের সাথে কন্যার বিবাহ দেওয়ায় স্বামীর কাছে প্রতিবাদ করেছে। বেহুলার মা সুমিত্রাও যখন জেনেছে বাসররাতে লখিন্দরের সর্পাঘাতে মৃত্যু হবে তখন সেও স্বামীকে বলেছে বিবাহ না দিতে। আবার এই কাব্যের মায়েরা প্রয়োজনে ঘরের বাইরেও পা বাড়িয়েছে। ব্যাধ জননী নিদয়া মাংসের পসরা নিয়ে হাটে গেছে। লখ্যা ডোমনী তো যুদ্ধক্ষেত্রে পর্যন্ত অবতীর্ণ হয়েছে। সেইসঙ্গে জননীর স্নেহ যেমন সন্তানকে বুকের মধ্যে আগলে রাখতে চায় তেমনি প্রয়োজনে দূরেও ঠেলে দেয়, যার দৃষ্টান্ত লখ্যা। সে তার সন্তানকে যুদ্ধের মতো বিপদসাগরে পতিত করেছে। বৈষ্ণবকবিরা যেমন মা যশোদা ও শচীমাতাকে কেন্দ্র করে বাৎসল্যরসের মধ্যে দিয়ে বাঙালি মাতৃহৃদয়ের প্রকাশ ঘটিয়েছেন তেমনি মঙ্গলকাব্যের

কবিরাও সন্তান ও জননীর স্নেহময়তার পরিচয় দিয়েছেন। ধর্মীয় চেতনা মাতৃত্বকে দুর্বল করেনি, দিয়েছে দুঃখসহন ক্ষমতা।

তথ্যসূত্র :

১. জাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী, বাংলা সাহিত্যে মা, ২০১৬, সূত্রধর, কলকাতা, পৃষ্ঠা ২২
২. অচিন্ত্য বিশ্বাস (সম্পা.), বিপ্রদাস পিপিলাইয়ের মনসামঙ্গল, ২০০২, রত্নাবলী, কলকাতা, পৃষ্ঠা ১১২
৩. ঐ, পৃষ্ঠা ১১৫
৪. ঐ, পৃষ্ঠা ১১৫
৫. ঐ, পৃষ্ঠা ১১৭
৬. ঐ, পৃষ্ঠা ১১৭
৭. ঐ, পৃষ্ঠা ১২৪
৮. ঐ, পৃষ্ঠা ১২৪
৯. ঐ, পৃষ্ঠা ১৪২
১০. ঐ, পৃষ্ঠা ১৪২-১৪৩
১১. ঐ, পৃষ্ঠা ১৪৩
১২. ঐ, পৃষ্ঠা ১৬৪
১৩. ঐ, পৃষ্ঠা ১৯০
১৪. ঐ, পৃষ্ঠা ১৬২
১৫. ঐ, পৃষ্ঠা ১৮২
১৬. ঐ, পৃষ্ঠা ১৮৪
১৭. ঐ, পৃষ্ঠা ২১৬
১৮. সুকুমার সেন (সম্পা.), কবিকঙ্কণ মুকুন্দ বিরচিত চণ্ডীমঙ্গল, ১৯৯৩, সাহিত্য আকাদেমি, নতুন দিল্লি, পৃষ্ঠা ৩৮
১৯. ঐ, পৃষ্ঠা ৪৪
২০. ঐ, পৃষ্ঠা ১১৭
২১. ঐ, পৃষ্ঠা ২১৮
২২. ঐ, পৃষ্ঠা ২২৭
২৩. বিজিতকুমার দত্ত ও সুনন্দা দত্ত (সম্পা.), মানিকরাম গাঙ্গুলী বিরচিত ধর্মমঙ্গল, ১৯৬০, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা, পৃষ্ঠা ৮৯
২৪. ঐ, পৃষ্ঠা ১০৭
২৫. ঐ, পৃষ্ঠা ১১১
২৬. ঐ, পৃষ্ঠা ১৫৭
২৭. ঐ, পৃষ্ঠা ১৬৯

২৮. ঐ, পৃষ্ঠা ৫০৭
২৯. ঐ, পৃষ্ঠা ৫৩২

গ্রন্থপঞ্জি

আকর গ্রন্থসমূহ :

১. অচিন্ত্য বিশ্বাস (সম্পা.), বিপ্রদাস পিপিলাইয়ের মনসামঙ্গল, ২০০2, রত্নাবলী, কলকাতা
২. বিজিতকুমার দত্ত ও সুনন্দা দত্ত (সম্পা.), মানিকরাম গাঙ্গুলী বিরচিত ধর্মমঙ্গল, ১৯৬০, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা
৩. সুকুমার সেন (সম্পা.), কবিকঙ্কণ মুকুন্দ বিরচিত চণ্ডীমঙ্গল, ১৯৯৩, সাহিত্য আকাদেমি, নতুন দিল্লি

সহায়ক গ্রন্থসমূহ :

১. আশুতোষ ভট্টাচার্য্য, বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, ১৩৪৬, কলকাতা বুক হাউস, কলকাতা
২. জাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী, বাংলা সাহিত্যে মা, ২০১৬, সূত্রধর, কলকাতা
৩. তারাপদ বসু, ধর্মমঙ্গল কাব্যে নারী, ১৪১৮, শিক্ষা সংস্কৃতি গবেষণা কেন্দ্র, বর্ধমান
৪. বিশ্বনাথ রায় (সম্পা.), কবিকঙ্কণ মুকুন্দের চণ্ডীমঙ্গল বীক্ষা ও সমীক্ষা, ১৪২১, এবং মুশায়েরা, কলকাতা
৫. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, লোকসাহিত্য, ১৩৯৯, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা

মানবদরদী স্বাধীনতা সংগ্রামী নজরুল

শিল্পী পাঁজা
সহকারী অধ্যাপক, ইসলামিক ইতিহাস বিভাগ,
খিদিরপুর কলেজ

আমাদের দেশে যখন বিভিন্ন স্থানে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের শোষণ, অত্যাচার ও কু-শাসনের বিরুদ্ধে বহু আন্দোলন চলছিল এবং টগবগ করে ফুটছিল ঠিক সেই সময় কাজী নজরুল ইসলাম তাঁর কাব্য সাধনা শুরু করেছিলেন। শুধু তাই নয়, সেই সময় তাঁর স্বকীয়তায় ও অভিনবত্বে দেশ চমকিত হয়েছিল। বাংলা কাব্য জগতে অন্যতম বিস্ময়কর ঘটনা হল কাজী নজরুল ইসলামের অভ্যুত্থান। ১৯২০ সালে বিভিন্ন মাসিক পত্রিকাতে তাঁর গদ্য, কবিতা ছাপা থেকেই তাঁর কবি প্রসিদ্ধির পরিচয় আমরা পাওয়া যায়। কবিরূপে এইসময় কবি নজরুলের খ্যাতি খুব দ্রুত ছড়িয়ে পড়েছিল।

নজরুল ইসলাম ছিলেন একজন স্বাধীনতা সংগ্রামী, যিনি স্বদেশের স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখতেন – তা আমরা তাঁর লেখাতে পাই। দেশের জনগণকে পরিবেষ্টন করেই বিকশিত হয় তাঁর দেশপ্রাণতা।—

‘প্রাথনা করো – যারা কেড়ে খায়
তেত্রিশ কোটি মুখের গ্রাস
যেন লেখা হয় আমার রক্ত লেখায়
তাদের সর্বনাশ ।’[১]

তিনি রবীন্দ্রনাথের গান, কবিতা খুব ভালোবাসতেন। তাসত্ত্বেও তাঁর কবিতা, লেখা একেবারে পুরোপুরি রবীন্দ্র প্রভাবমুক্ত ছিল। “রবীন্দ্রনাথের জীবদ্দশায় নজরুল কবি খ্যাতি লাভ করেছেন। তিনি রবীন্দ্রনাথের পরম ভক্তও ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের শত শত গান ও কবিতা তাঁর মুখস্ত ছিল। তিনি যখন বিশিষ্ট সঙ্গীত রচয়িতা হয়ে ওঠেননি তখন তিনি বেশি রবীন্দ্র-সংগীতই গাইতেন। এসব সত্ত্বেও নজরুল তাঁর কাব্য সাধনায় রবীন্দ্র-প্রভাব মুক্ত। রবীন্দ্রযুগের একজন কবির পক্ষে এটা কম কৃতিত্বের পরিচায়ক নয়।”[২] নজরুল যখন পল্টন থেকে ফিরেছিলেন তখন তাঁর মধ্যে আন্তর্জাতিকতাবোধ যে ভরপুর ছিল তার প্রথম পরিচয় পাওয়া যায় যখন ১৯১৮ সালে লিখেছিলেন ‘ব্যথার দান’ গল্পটি। এটি তাঁর প্রথম গল্প ছিল। “প্রথম মহাযুদ্ধের সময় নজরুল ৪৯ নম্বর বাঙালি পল্টনের কোয়ার্টারে মাস্টার হাবিলদার ছিলেন। করাচীতে এই পল্টনের সেনানিবাসে থাকার সময়ে ১৯১৮ সালের শেষাশেষিতে তিনি ‘ব্যাথার দান’ নাম দিয়ে একটি ছোটগল্প লেখেন।”[৩] ‘ব্যাথার দান’ গল্পটি ‘বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা’য় ছাপানোর জন্য মুজফফর আহমেদ ব্যবস্থা করেছিলেন এবং ঐ পত্রিকায় এই গল্পটি ছাপা হয়েছিল।

নজরুলের মধ্যে যে সাম্যবাদের ঝোঁক এসেছিল তা হল রুশদেশের মহান অক্টোবর বিপ্লবের থেকে। 'ব্যথার দান' গল্পের একজন নায়ক সয়ফুল মুলক বলেছেন – "ঘুরতে ঘুরতে শেষে এই মুক্তিসেবক সৈন্যদের দলে যোগ দিলুম। এ পরদেশীকে তাদের দলে আসতে দেখে এই সৈন্যদল খুব উৎফুল্ল হয়েছে। এরা মনে করছে, এদের এই মহান নিঃস্বার্থ ইচ্ছা বিশ্বের অন্তরে অন্তরে শক্তি সঞ্চয় করছে। আমায় আদর করে এদের দলে নিয়ে এরা বুঝিয়ে দিলো যে কত মহাপ্রাণতা আর পবিত্র নিঃস্বার্থপরতা প্রণোদিত হয়ে তারা উৎপীড়িত বিশ্ববাসীর পক্ষ নিয়ে অত্যাচারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে এবং আমিও সেই মহান ব্যক্তি সংঘের একজন। আমার কালো বুকে অনেকটা তৃপ্তির আলোক পেলুম।" এই গল্পের আর একজন নায়ক আলাদাভাবে গিয়ে এই সৈন্যদলে যোগ দিচ্ছেন এবং বলছেন – "এর চেয়ে ভাল কাজ আর দুনিয়ায় খুঁজে পেলুম না, তাই এই দলে এসেছি।"[৪] ১৯১৭ সালে রাশিয়ায় মহান অক্টোবর বিপ্লব হওয়ায় এই দেশে যে সোভিয়েত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয় তার নেতৃত্বে ছিল শ্রমজীবী জনতা। তার ফলে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির সাহায্যে প্রতিবিপ্লবী গৃহযুদ্ধ শুরু হয়েছিল। তখন এই দেশে কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে লালফৌজ গঠিত হয়েছিল। এই লালফৌজ শেষে ঐ প্রতিবিপ্লবকে প্রতিহত করেছিল। নজরুলের গল্পের নায়কেরা যে লালফৌজে যোগ দিয়েছিলেন – এটি তাঁর কল্পনা ছিলনা। সত্য সত্যই ভারতীয় সৈন্য ১৯১৮ সালে লালফৌজে যোগ দিয়েছিলেন। ১৯২০ সালের প্রথমের দিকে ৩১ নম্বর কলেজ স্ট্রীটের দোতলায় 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতি'র অফিসে যাঁরা যাতায়াত করতেন তাঁরা সবাই জানেন কাজী নজরুল ইসলাম কীভাবে সশব্দে বাড়িতে প্রবেশ করতেন।

নজরুলের ছাত্রজীবনের অন্যতম বন্ধু ছিলেন শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়। করাচিতে একটি অস্থায়ী সৈন্যদলের নাম ছিল 'উনপঞ্চাশ নম্বর বেঙ্গলী ব্যাটালিয়ান' – এতে নজরুল ইসলাম কোয়ার্টারস মাস্টার হাবিলদারের পদে উঠেছিলেন। ১৯২০ সালের মার্চ মাসে 'উনপঞ্চাশ নম্বর বেঙ্গলী ব্যাটালিয়ন' দলটি পুরোপুরি ভেঙে গিয়েছিল। আর তারপরেই নজরুল ইসলাম কলকাতায় এসেছিলেন। নজরুল ইসলাম ছিলেন সদা প্রাণচঞ্চল একজন যুবক। তাঁর বন্ধুর দলের অভাব ছিল না। তিনি যার বাড়িতে যেতেন পাশের বাড়ির লোকেরা টের পেয়ে যেতেন – বন্ধুদের সঙ্গে উচ্চরোলে হেসে, চেঁচিয়ে বাড়ি ঘর মাতিয়ে তুলতেন – এমনই প্রাণচঞ্চল ছিলেন তিনি। এরপর তিনি কবিতা লেখা শুরু করেছিলেন। বিভিন্ন পত্রিকাতে তাঁর কবিতা ছাপা হত। রাতারাতি তিনি কবি-প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন। তরুণ কবি হিসেবে তাঁর জয়-জয়কার হতে লাগল। তাঁর খ্যাতি কেবল বুদ্ধিজীবী মহলে আটকে ছিলনা, তিনি যাতায়াত করতেন সাধারণ মানুষ, মজুর ও কৃষকদের মধ্যে। অবশেষে ১৯৪২ সালের ৯ই জুলাই তাঁর ব্যাধি প্রকট হয়ে দেখা দিয়েছিল – অল ইন্ডিয়া রেডিও'র কলকাতা স্টেশনে। এরপরে আমরা ধীরে ধীরে তাঁকে হারালাম। তিনি সাতাশ বছর যাবৎ অসুস্থ ছিলেন। তিনি বাইশ বছর

অত্যন্ত কর্মব্যস্ত জীবন কাটিয়েছেন। এই বাইশ বছরে তিনি দেশকে দিয়েছেন অনেক কিছু।

এছাড়া দেশকে স্বাধীনতা ও দেশপ্রেমের প্রেরণাও জুগিয়েছেন। সাহিত্যিক ও স্বাধীনতাসংগ্রামী হিসেবে তাঁর জনপ্রিয়তা প্রতি বছরই বেড়ে চলেছে। বড় কবি হিসেবে নজরুল ইসলাম রাষ্ট্র থেকে সাহিত্যিক বৃত্তি পেতেন।

১৯২২ সালের ১২ই আগস্ট তারিখে নজরুল ইসলামের সপ্তাহের দু'বার প্রকাশিত ধূমকেতু'র প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছিল। প্রথমে ৩২, কলেজ স্ট্রীটের দোতলায় ধূমকেতু'র অফিস ছিল। পরে সেই অফিস ৭, প্রতাপ চাটুজ্যে লেনের দোতলায় উঠে যায়। ধুমকেতু'র এই অফিসে সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবী নেতারা যাতায়াত করতেন। যেন সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবী আন্দোলন আবার মাথা তুলেছিল – তা নজরুলের লেখার মধ্যে ফুটে উঠেছিল। 'ধূমকেতু'র এই অফিসের সূত্রে নজরুলের সঙ্গে বিপিনবিহারী, ভূপেন্দ্রকুমার দত্ত, জীবনলাল চট্টোপাধ্যায়, চারুচন্দ্র ঘোষ, মুজফফর আহমেদ প্রমুখের সঙ্গে যোগাযোগ হয়।

নজরুল বিভিন্ন কাগজে লিখতেন, যেমন – সওগাত। এছাড়া উপাসনা নামে মাসিক পত্রিকাতেও কবিতা তিনি লিখতেন। এভাবে তাঁর জনপ্রিয়তা ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়ল। এই জনপ্রিয়তার অন্যতম কারণ ছিল তাঁর গান। তিনি গায়ক হিসাবে খুব ভালো না হলেও প্রাণের সব দরদ দিয়ে গান গাইতেন বলে তিনি সবার কাছে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিলেন। এছাড়া কারোর অনুরোধ ফেলতেন না এবং রবীন্দ্রনাথের অনেক গান তিনি গাইতেন। "সমস্ত কুরআন যারা মুখস্থ করেন তাঁদের হাফিজ বলা হয়। নজরুল তেমনই ছিলেন রবীন্দ্র সঙ্গীতের হাফিজ।"[৬] তাঁর কাব্যচর্চা কেবল শিক্ষিত সমাজে সীমাবদ্ধ ছিল না, তাঁর পরিধি সুবিস্তৃত ছিল। চটকলের বাঙালি মজুরেরাও তাঁর গান, আবৃত্তি শোনার জন্য ডাকতেন। তিনি কৃষকদের মধ্যে ঘুরে বেড়াতেন, এমনকি বিভিন্ন জনগণের মধ্যেও। সেজন্য বাংলাদেশের কবিদের মধ্যে তিনি জনপ্রিয় কবি হতে পেরেছিলেন। তাই আজও কৃষক, মজুর, সাধারণ মানুষ তাঁর জন্মদিবস পালন করেন। 'বেঙ্গলি ডবল কোম্পানি'তে যোগদান ছিল নজরুলের কাছে দেশপ্রেমের আহ্বান।

নজরুল অন্যান্য তরুণ সৈনিকদের মতো ছিলেন না। তিনি একদিকে যেমন কবি ছিলেন তেমনি অন্যদিকে দেশপ্রেমী, স্বাধীনতা সংগ্রামী ছিলেন। সেজন্য তিনি ফৌজে যোগদান করে ছিলেন। এই ফৌজে যোগদান করার উদ্দেশ্য ছিল রাজনীতিতে যোগ দেওয়া। ঐ সময় পাঞ্জাবে যে নিষ্ঠুর অত্যাচার হয়েছিল তাতে বিক্ষুব্ধ মানুষ টগবগ করে ফুটছিল। ১৯১৯ সালের শাসন সংস্কার আইন যখন দেশের লোকেরা মেনে নিতে চাইছে না তখন বড় বড় নেতারা এই শাসন সংস্কারকে কাজে লাগাতে চাইছেন। এ সময় রুশ-দেশের মজুরশ্রেণির বিপ্লবের ঢেউ এদেশে খানিকটা পৌঁছেছিল। এই ঢেউ মজুরশ্রেণির উপর প্রভাব ফেলেছিল। ফলে মজুরশ্রেণি চঞ্চল হয়ে উঠেছিল এবং নানা

জায়গায় ধর্মঘট চালিয়ে ছিল। 'তিন-চারজনকে সঙ্গে নিয়ে নজরুল আর মুজফফর আহমেদ একখানা সান্ধ্য দৈনিক পত্রিকা বার করেছিলেন। কাগজের নাম ছিল নবযুগ। লম্বায় ২৬ ইঞ্চি ও চওড়ায় ২০ ইঞ্চি মাপের এক শিট কাগজ ছিল 'নবযুগ'।'[৭] ১৯২০ সালের ১২ই জুলাই তারিখে কাগজখানা প্রথম বার হয়েছিল। *নবযুগ* পত্রিকার স্থায়ী-কর্মী ছিলেন ফজলুল হক সেনবর্সী, মহুম্মদ ওয়ানজিদ আলি, নজরুল ইসলাম ও মুজফফর আহমেদ। এই কাগজের জনপ্রিয়তা লাভ হয়েছিল নজরুলের জোরালো লেখা এই কাগজে ছাপার জন্য। এই কাগজের দাম ঠিক করা হয়েছিল ১ পয়সা। কাগজে নজরুলের ও মুজফফর আহমেদের নাম ছাপিয়ে প্রধান পরিচালক হিসাবে এ.কে. ফজলুল হকের নাম ছাপা হত। নজরুল কখনো কোনো দৈনিক কাগজের অফিসে ঢুকতেন না। তা সত্ত্বেও তিনি বড় বড় সংবাদগুলি পড়ে সহজে তা এমনভাবে সংক্ষিপ্ত করতেন, যা ছিল খুবই আশ্চর্যের বিষয়। এ'কাজ অন্যান্যরা সহজে করতেই পারতেন না। ১৯২২ সালকে আমরা জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের এক যুগসন্ধিক্ষণ বলে জানি। এ সময় যখন দেশবাসী অজ্ঞানতা ও কুসংস্কারে আচ্ছন্ন ছিল এবং শোষিত ও অত্যাচারে জর্জরিত হচ্ছিল সাম্রাজ্যবাদী বৈদেশিক সরকারের দ্বারা, ঠিক তখনই কবি নজরুল ইসলাম এই অন্যায়, অবিচার, অত্যাচার, ভীরুতা ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে লেখা শুরু করেছিলেন।

নবযুগ-এর সম্পাদকীয় স্তম্ভে অনেক জ্বালাময়ী ও আবেগপূর্ণ প্রবন্ধ তিনি লিখতেন। দৈনিক নবযুগ-এ মজুরদের কথা, কৃষকদের কথা লেখা হত ।[৮] দৈনিক নবযুগ-এ নজরুল তাঁর বহু বিখ্যাত কবিতা লিখেছিলেন। তাঁর সাহিত্যিক ও গানের আড্ডা এমনই ছিল যা সবার মনকে তাজা করত। ১৯১১ সালে 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতি'র প্রাণপ্রতিষ্ঠা হয়েছিল।[৯] নজরুল ফৌজ থেকে ফিরে সাহিত্য সমিতিতেই আশ্রয় নিয়েছিলেন। তিনি নিজেই বলেছিলেন সাহিত্য সমিতি তাকে আশ্রয় দিয়েছিল বলে তাঁর পক্ষে কবি হওয়া সম্ভব হয়েছে। সাহিত্য সমিতিতে এসে তিনি কবি বন্ধুরূপে যাদের পেয়েছিলেন তাদের মধ্যে মিস্টার আবুল কালাম শামসুদ্দিনের নাম উল্লেখ করেছেন। 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতি'র রজত জয়ন্তী হয়েছিল ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দের ৫ই এবং ৬ই এপ্রিল তারিখে কলকাতার মুসলিম ইনস্টিটিউট হলে। তাতে সভাপতি ছিলেন কাজী নজরুল ইসলাম।[১০] সাহিত্য সামিতিতে নজরুল ইসলামের প্রবেশের পর অনেক বেশি সংখ্যায় কবি ও সাহিত্যিকদের যাতায়াত অধিক বেড়ে গিয়েছিল। যারা আগে আসতেন না, তাঁরাও আসতে শুরু করলেন। যেমন কয়েকজনের নাম উল্লেখযোগ্য – শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়, শ্রীপ্রেমাঙ্কুর আতর্থী, কবি শ্রীকান্তি ঘোষ, শ্রীধীরেণ গঙ্গোপাধ্যায়, নজরুলের ঘনিষ্ঠতম বন্ধু শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, শ্রীমতিলাল মুখোপাধ্যায় প্রমুখ। মুজফ্ফর আহমেদ যখন 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতি'র সহকারী সম্পাদক ও সবসময়ের কর্মী ছিলেন তখন আলি আকবর খানের সঙ্গে দেখা হয়েছিল। পরিচয় হওয়ার পর আলি আকবর খান 'বঙ্গীয় মুসলমান

সাহিত্য সমিতি'র অফিসে যাতায়াত শুরু করলেন। কিছুদিন পরে আলি আকবর খান অসুস্থ হয়ে সাহিত্য সমিতির একখানা ছোট ঘরে থাকতেন। এই সময় নজরুল তাঁর খাবার কিনে ও বিভিন্নভাবে সাহায্য করতেন। এইভাবেই আলি আকবর খানের সঙ্গে নজরুল ইসলামের পারিচয়ের সূত্রপাত হয়েছিল।

১৯২১ সালে 'বাঙ্গালার কথা' নামে সাপ্তাহিক পত্রিকা বের হয়েছিল তার সম্পাদকের নাম শ্রীচিত্তরঞ্জন দাশ। এই পত্রিকার সহ-সম্পাদদের নাম শ্রীহেমন্ত কুমার সরকার। কিন্তু এই বছরে ১০ই ডিসেম্বর তারিখে চিত্তরঞ্জন গ্রেফতার হলে ঐ পদের ভার নেন তাঁর স্ত্রী বাসন্তী। বাসন্তী 'বাঙ্গালার কথা' পত্রিকাতে কবিতা ছাপানোর জন্য দেবর সম্পর্কিত শ্রীকুমাররঞ্জন দাশকে নজরুলের কাছে পাঠালেন। নজরুল তা শুনে কবিতা লেখা শুরু করলেন। কিছুক্ষণ পরে ঐ কবিতাটি শেষ করে নজরুল সবাইকে সেটি পড়ে শোনালেন। এই কবিতাটির নাম ছিল 'ভাঙার গান'। এরপর ১৯২২ সালে ২০ জানুয়ারি তারিখে এই কবিতাটি 'বাঙ্গালার কথা'য় ছাপা হয়েছিল। এছাড়া নজরুলের 'নবযুগ' শীর্ষক একটি গদ্য লেখাও 'বাঙ্গালার কথা-তে ছাপানো হয়েছে। এই সময়টি ছিল নিরুপদ্রব অসহযোগ আন্দোলনের যুগ, এর মানে এই যুগে শুধু শারীরিক বলপ্রয়োগ হতে বিরত থাকতে হবে তাই নয়, চিন্তার ক্ষেত্রে, লেখার ক্ষেত্রেও বলপ্রয়োগ বা প্রেরণা জোগানো যাবে না। ঠিক এই পরিস্থিতিতে অসহযোগ আন্দোলনের নেতা চিত্তরঞ্জনের কাগজে নজরুল ইসলামের 'ভাঙার গান' ছাপানো হয়ে গিয়েছিল। ১৯২২ সালে 'পউষ' কবিতাটি লিখেছিলেন। ঐ বছর ডিসেম্বর মাসে এই কবিতাটি রচনা করেছিলেন। এই সময় নজরুল প্রেসিডেন্সি জেলে বিচারাধীন বন্দি ছিলেন। এই সময় কবির সঙ্গে দেখা করার ইচ্ছে হল অবনী চৌধুরী ও মুজফ্ফর আহমেদের এবং তাঁরা দেখা করেও ছিলেন। সে সময় নজরুল অবনী চৌধুরীর হাতে একটি ছোট কাগজ দেন। তাতে 'পউষ' কাবিতাটি লেখা আছে। এ থেকে তাঁরা বুঝতে পেরেছেন কবির বড় শীত লেগেছে। শ্রীপবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় মারফতে 'পউষ' 'প্রবাসী'তে ছাপা হয়েছিল। কবি মোহিতলাল মজুমদারের সঙ্গে আগেই নজরুলের ছাড়াছাড়ি হয়ে গিয়েছিল। কাজেই নজরুলের তখন ''কার তোয়াক্কা রাখি আর'' ভাব। মোহিতলাল তাকে 'প্রবাসি'তে লেখা ছাপতে দিতেন না। কবিতাটির শুরু ছিল এইরকম –

এলো গো
পউষ এলো অশ্রু পাথর হিম পাবাবার পারা যে
ঐ যে এলো গো –
কুজ্ঝটিকায় ঘোমটা পরা দিগন্তরে দাঁড়ায়ে।'[১১]

নজরুল ইসলাম কৃষ্ণনগরে থাকার সময় 'ওয়ার্কস অ্যান্ড পেজান্টস পার্টি'র অফিসে – কলকাতার ৩৭, হ্যারিসন রোডে (বর্তমানে এখন নাম মহাত্মা গান্ধি রোড) মুজফ্ফর আহমেদ-সহ কয়েকজন থাকতেন। এই অফিস থেকে কল্লোল-এর অফিস কাছাকাছি

ছিল। কৃষ্ণনগর থেকে কলকাতার অফিসে নজরুল মাঝে মাঝে আসতেন। নজরুলের ‘দারিদ্র’ কবিতাটি বহুল প্রশংসিত হয়েছিল আমরা জানি। কবিতাটি কল্লোল পত্রিকাতে ছাপা হয়েছিল। কবিতাটির প্রথম কয়েক ছত্র নীচে দেওয়া হল –

‘হে দারিদ্র, তুমি মোরে করেছ মহান !
তুমি মোরে দানিয়াছ খ্রীষ্টের সম্মান
কণ্টক-মুকুট শোভা । -দিয়াছ, তাপস,
অসংকোচ প্রকাশের দুরন্ত সাহস,
উদ্ধত উলঙ্গ দৃষ্টি? বাণী ক্ষুরধার,
বীণা মোর শাপে তীব্র হল তরবার ।’[১২]

১৯১১ সালে ‘বঙ্গীয় সাহিত্য সমিতি’র প্রাণপ্রতিষ্ঠা হয়েছিল।[১৩] এই সমিতি কোনো সাম্প্রদায়িক সংগঠন ছিল না। এবং এটি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের প্রতিদ্বন্দ্বী প্রতিষ্ঠান ছিল না। এই সমিতির উদ্দেশ্য ছিল যে, বাঙালিদের সামনে মুসলিম সভ্যতার নানা দিক বাংলা ভাষায় তুলে ধরা হবে। কারণ বাংলার মুসলমান পরিবারগুলির কেমন রাজনীতি ছিল, কেমন চালচলন ছিল এ সম্বন্ধে বাংলা হিন্দুদের জ্ঞান অত্যন্ত সীমিত ছিল। বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা তিন মাস অন্তর বার হতো। **১৩২৬** বঙ্গাব্দের শ্রাবণ মাস থেকে নজরুল ইসলামের লেখা ছাপানো আরম্ভ হয়। তারপর থেকে এই কাগজের প্রতি সংখ্যাতেই তার কিছু না কিছু লেখা ছাপা হয়েছে। নজরুল ইসলামের মনে রুশ-বিপ্লবের প্রভাব যথেষ্ট পড়েছিল। লালফৌজের প্রতি নজরুলের টান ছিল।

১৯২৬ সালের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময়ে নজরুল অনেক কবিতা রচনা করেছিলেন এবং অনেক প্রবন্ধও লিখেছিলেন। এসবের সঙ্গে মুজফ্ফর আহমেদের অনেক স্মৃতি জড়িয়ে আছে। **১৩২৬** সালে শ্রাবণ মাসে যখন বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা-য় নজরুল ইসলামের লেখা ছাপানো শুরু হয় – এই সময় ‘ব্যথার দান’ ও ‘হেনা’ নামক দু’টি গল্প ঐ পত্রিকাতে ছাপানো হয়েছিল। এই গল্প দু’টি ফৌজে থাকা অবস্থায় নজরুল লিখেছিলেন। ‘ব্যথার দান’ গল্পে বেলুচিস্তানের বাসিন্দাদের নিয়ে লিখেছিলেন। নজরুল নিজেই বলেছিলেন, পলাতক সৈনিককে ধরার জন্যে তাঁকে একবার বেলুচিস্তানের গুলিস্তান, বুস্তান, চমক প্রভৃতি এলাকায় যেতে হয়েছিল। তাঁর গল্পে যে পেশোয়ারের নাম আছে, সেই পেশোয়ারের কাছেই নৌশহরা নামক স্থানে নজরুলরা প্রথম সৈনিক শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। ‘হেনা’ ও ‘ব্যথার দান’ এই দু’টি গল্পেই দেশপ্রেম ও আন্তর্জাতিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। তবে আন্তর্জাতিকতার পরিচয় বেশি আছে ‘ব্যথার দান’-এ। নজরুল ইসলাম যে ‘বিদ্রোহী’ কবিতাটি তা তিনি প্রথম শুনিয়েছিলেন মুজাফফর আহমেদকে। এই কবিতাটি প্রথম ছাপা হওয়েছিল বিজলী নামক সাপ্তাহিক কাগজে। ‘**১৯২১** সালের ডিসেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহ ‘বিদ্রোহী’ কবিতাটি রচনার প্রকৃত সময়।’[১৪] নজরুল ছিলেন দেশপ্রেমের কবি। এই দেশপ্রাণতার কবিকেই সেই সময় থেকে আজও হাজার হাজার যুবক, যুবতী, মধ্য বয়স্ক, বৃদ্ধ প্রমুখ

শ্রদ্ধা করেন। নজরুল ইসলামের জনপ্রিয়তা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের মধ্যে তাঁর সম্পর্কে চেতনাও বাড়ছে। '১৯২২ সালের ৬ই জানুয়ারী (মুতাবিক ২২শে পৌষ, ১৩২৮ বঙ্গাব্দ) তারিখে, শুক্রবার 'বিদ্রোহী' বিজলীতেই প্রথম ছাপা হয়েছিল।'[১৫] আনন্দবাজার পত্রিকা-য় পুজা সংখ্যার জন্য একটি কবিতা লিখেছিলেন। কবিতাটির নাম 'আনন্দময়ীর আগমনে'। কিন্তু এই কবিতা আনন্দবাজার পত্রিকা-য় ছাপা না-হয়ে ধুমকেতু-তে ছাপা হয়াছিল-

'আর কতকাল থাকবি বেটী মাটির ঢেলার মূর্তি আড়াল ?
স্বর্গ যে আজ জয় করেছে অত্যাচারী শক্তি চাঁড়াল ।'

১৯২২ সালের পর নজরুল রাজনীতিতে প্রবেশ করেন এবং বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে রাজনৈতিক সভা সমিতিতে বক্তৃতা দিতে শুরু করেন। তাঁর জনপ্রিয়তা কেবল সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক সভা সমিতিতে সীমাবদ্ধ ছিল না, তিনি ১৯২৬ সালে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটিরও সভ্য ছিলেন। গান্ধিজির আগমনে নজরুল চরকা নিয়ে একটি কবিতা লিখেছিলেন, কিন্তু নজরুল নিশ্চিত ছিলেন যে, দেশে চরকা ও খদ্দরের মারফতে স্বাধীনতা আসবে না। সেজন্য তিনি ক্রমশ জনগণের দিকে ঝুঁকে পড়েন। এ বিষয় নিয়ে তিনি তাঁরা কয়েকজন বন্ধুদের সঙ্গে আলোচনা করেছিলেন। বন্ধুদের মধ্যে ছিলেন কুতুবুদ্দীন আহমদ, হেমন্ত কুমার সরকার ও শামসুদ্দীন হুসেন। স্থির হয়েছিল, ঐ চারজন একটি দল গঠন করবেন এবং ১৯২৫ সালে কলকাতায় দলটি গঠিত হয়, যার নাম 'লেবর-স্বরাজ-পার্টি'। এই দলটি 'ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসে'র অন্তর্ভুক্ত ছিল। 'লেবর-স্বরাজ-পার্টি'র প্রথম গঠন প্রণালী, প্রোগাম ও পলিসি ১৯২৫ সালের পয়লা নভেম্বর তারিখেই ৩৭, হ্যারিসন রোড থেকে কাজি নজরুল ইসলামের স্বাক্ষরে প্রকাশিত হয়েছিল লাঙল-এর দ্বিতীয় সংখ্যায়।[১৬] '১৯২৫ সালের ২৫শে ডিসেম্বর তারিখে লেবর-স্বরাজ-পার্টির (শ্রমিক প্রজা-স্বরাজ দলের) মুখপত্ররূপে একখানি বাংলা সাপ্তাহিক প্রকাশিত হয়। তার নাম ছিল 'লাঙ্গল'। এই পত্রিকার কভারের পৃষ্ঠায় 'লাঙ্গল' নামের পরে লেখা থাকত; প্রধান পরিচালক – নজরুল ইসলাম, সম্পাদক – মণিভূষণ মুখোপাধ্যায়।' [১৭] এই সম্পাদক হিসাবে মণিভূষণ মুখোপাধ্যায় কিছু কাজ করতেন না। তিনি বাঙ্গালি পল্টনের সৈনিক ছিলেন নজরুলের সঙ্গে। নজরুলের সঙ্গে ঘুরতেন, নাম করতেন। এই মণিভূষণ মুখোপাধ্যায় পরে গেরুয়া পরে স্বামী বিরুপাক্ষনন্দ হয়েছিলেন। '১৯২৬ সালের ১২ই আগস্ট হতে 'লাঙ্গল'-এর নাম পরিবর্তন করে 'গণবাণী' করা হয়।'[১৮] অনেকের ধারণা ছিল লাঙল কেবল কৃষকদের কাগজ, কিন্তু এই কাগজ ছিল শ্রমজীবী জনগণের কাগজ। লাঙল-এর প্রথম সাংখ্যায় নজরুলের বিখ্যাত অন্যতম কবিতা 'সাম্যবাদী' ছাপানো হয়েছিল । লাঙল-এর দ্বিতীয় সংখ্যা বার হয়েছিল ১৯২৬ সালের পয়লা জানুয়ারি তারিখে – তাতে তাঁর বিখ্যাত গান 'কৃষকের গান' প্রকাশিত হয়। ঐ সালে ঐ কাগজের তৃতীয় সংখ্যা প্রকাশিত হয় ৭ই

জানুয়ারি। এই সংখ্যাতেই নজরুলের বিখ্যাত কবিতা 'সব্যসাচী' প্রকাশিত হয়। নজরুল তাঁর বহু বিখ্যাত কবিতা, গান রচনা করেছিলেন হুগলিতেই। লাঙল-এর প্রথম তিন সংখ্যায় প্রকাশিত তিনটি কবিতা – 'সাম্যবাদী' 'কৃষকের গান' ও 'সব্যসাচী' এসবই নজরুল হুগলীতেই রচনা করেছিলেন। এছাড়া 'ঝড়' , 'রেখা' কবিতাগুলিও হুগলীতেই রচনা করেছিল। তিনি দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের মৃত্যুর বিষয়ে বহু কবিতা ও গান রচনা করেছিলেন। কৃষ্ণনগরে বহু সম্মেলন হয়েছিল – তার মধ্যে প্রথম সম্মেলন হল 'নিখিল বঙ্গীয় প্রজা সম্মেলন'। শামসুদ্দীন আহমেদ সাহেব এর অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ছিলেন, এছাড়া কৃষ্ণনগরের উকিল ও মন্ত্রী ছিলেন। নরেশ চন্দ্র সেনগুপ্ত সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেছিলেন। কলিকাতা হাইকোর্টের অ্যাডভোকেট শ্রী অতুলচন্দ্র গুপ্ত ও সম্মেলনে যোগ দিয়েছিলেন। এঁদের সঙ্গে সম্মেলনে মুজফফর আহমেদের দেখা ও পরিচয় হয়। এই সম্মেলনের উদ্বোধন সঙ্গীত হিসেবে 'শ্রমিকের গান' নজরুল রচনা করেছিলেন এবং তিনি নিজেই এই গানটি গেয়েছিলেন। গানটি হল –

'ওরে ধ্বংস পথের যাত্রী দল।
ধর হাতুড়ি, তোল কাঁধে শাবল ।
আমরা হাতের সুখে গড়েছি ভাই
পায়ের সুখে ভাঙব চল ।
ধর হাতুড়ি, তোল কাঁধে শাবল ।।'[১৯]

কৃষ্ণনগরে 'নিখিল বঙ্গীয় প্রজা সম্মেলনে'র যে অধিবেশন হয়েছিল তাতে যে কর্মকর্তারা ছিলেন তাদের মধ্যে নজরুল ইসলাম একজন ছিলেন।

১৯২৬ সালে এপ্রিল মাসে কলকাতায় হিন্দু মুসলমানের দাঙ্গা শুরু হয়েছিল। কলকাতার সঙ্গে নজরুলের ছিল নিত্য যোগাযোগ। এই দাঙ্গায় নজরুল অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু এই বিপ্লব গ্রামে বা অন্য কোনো শহরে ছড়িয়ে পড়েনি। সাম্প্রদায়িক এই দাঙ্গার বিশ্রী আবহাওয়ায় তখন কৃষ্ণনগরের তিনটি সম্মেলনের প্রস্তুতি চলছিল – 'বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলন' অর্থাৎ প্রাদেশিক কংগ্রেসের বার্ষিক সম্মেলন, 'ছাত্র সম্মেলন' এবং 'যুব সম্মেলন'।

ঐ তিনটি সম্মেলনের সভাপতি ছিলেন যথাক্রমে কলকাতা হাইকোর্টের ব্যারিস্টার শ্রী বীরেন্দ্রনাথ শাসমল, শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু, মানিকতলা বোমা মামলার শ্রী উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। ঐ সম্মেলনগুলির প্রস্তুতির জন্য নজরুল ইসলামকে এত বেশি কাজ করতে হয়েছিল যে তাঁর কোনো অবকাশ ছিল না। ঐ সম্মেলনগুলির উদ্বোধনী সংগীতগুলি রচনা করেছিলেন এবং গেয়েও ছিলেন। 'বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনে'র জন্য তিনি 'কান্ডারী হুঁশিয়ার' লিখেছিলেন। গানটি ছিল অপূর্ব কোরাস সংগীত –

'দুর্গম গিরি কান্তার মরু দুস্তর পারাপার
লঙ্ঘিতে হবে রাত্রি নিশীথে, যাত্রীরা হুশিয়ার ।'[২০]

ছাত্র সম্মেলনের উদ্বোধন সংগীতরূপে নজরুল ‘ছাত্রদলের গান’টি রচনা করেছিলেন –
‘আমরা শক্তি আমরা বল

আমরা ছাত্রদল।
মোদের পায়ের তলায় মূর্ছে তুফান,
ঊর্ধ্বে বিমান ঝড়-বাদল।
আমরা ছাত্রদল ।।’[২১]

কৃষ্ণনগর যুব সম্মেলনের উদ্বোধন সংগীত হিসাবে গাওয়া হয়েছিল নজরুলের লেখা –

‘চল চল চল
ঊর্দ্ধে গগনে বাজে মাদল
নিম্নে উতলা ধরণী তল,
অরুণ প্রাতের তরুণ দল
চলরে চলরে চল।।’[২২]

উনিশ-বিশের দশকেই আমাদের দেশে শ্রেণিসংগ্রাম তীব্র আকার ধারণ করেছিল এবং তা ধীরে ধীরে সংগ্রামশীল রূপ গ্রহণ করেছিল। বিভিন্ন স্থানে কৃষক অভ্যুত্থানও হয়েছিল। নজরুল ইসলাম একদিকে যেমন গায়ক, সংগীত রচয়িতা ও সুরসংযোজনকারী তেমনি অন্যদিকে তিনি ছিলেন এক মানবদরদী দেশপ্রেমিক ও স্বাধীনতা সংগ্রামী। বলা বাহুল্য, নজরুল ইসলাম বাংলার মানুষের কাছে অতি প্রিয় কবি হয়ে আছেন। বাংলা কাব্য জগতে এবং স্বদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে তাঁর অবদান যে একটি বিস্ময়কর ব্যাপার, তা অনস্বীকার্য ।

সূত্রনির্দেশ :

১. মুজফফর আহমেদ , নির্বাচিত প্রবন্ধ, ন্যাশানাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, ২০১১, পৃ. ২০৪
২. তদেব
৩. তদেব
৪. তদেব, পৃ. ২০৫
৫. মুজফফর আহমেদ, আমার জীবন ও ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি, ন্যাশানাল বুক এজেন্সি, ১৯৬৯, পৃ. ১৭৩
৬. মুজফফর আহমেদ, কাজী নজরুল ইসলামঃ স্মৃতিকথা, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি, ১৯৬৫, পৃ. ২৮
৭. মুজফফর আহমেদ, আমার জীবন ও ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৪
৮. মুজফফর আহমেদ, কাজী নজরুল ইসলাম : স্মৃতিকথা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪

৯. মুজফ্‌ফর আহমেদ, আমার জীবন ও ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬
১০. মুজফ্‌ফর আহমেদ, কাজী নজরুল ইসলাম : স্মৃতিকথা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯
১১. তদেব, পৃ. ৯৬
১২. তদেব, পৃ. ৯৭
১৩. মুজফ্‌ফর আহমেদ, আমার জীবন ও ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬
১৪. রঘুবীর চক্রবর্তী (স.), রবীন্দ্রনাথ, নজরুল ও বাংলাদেশ, দি ওয়ার্ল্ড প্রেস, ১৯৭২
১৫. মুজফ্‌ফর আহমেদ, কাজী নজরুল ইসলাম : স্মৃতিকথা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৪
১৬. মুজফ্‌ফর আহমেদ, আমার জীবন ও ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫৮
১৭. তদেব
১৮. তদেব, পৃ. ৩৫৯
১৯. মুজফ্‌ফর আহমেদ, কাজী নজরুল ইসলাম : স্মৃতিকথা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৫
২০. তদেব, পৃ. ১৯৮
২১. তদেব, পৃ. ১৯৯
২২. তদেব

সংস্কৃতি বিবর্তিত এক জাতি : ক্যানিং মহকুমার আদিবাসী

মুরারী মোহন মিস্ত্রী
গবেষক, ইতিহাস বিভাগ
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ: সুন্দরবনের অনুন্নত মহকুমা ক্যানিং-এর আদিবাসী মানুষগুলির সমাজ-সংস্কৃতির পরিবর্তিত রূপ এক মিশ্র সংস্কৃতি। এই ঐতিহাসিক প্রবন্ধটিতে দেখানোর চেষ্টা থাকবে কিভাবে ক্যানিং মহকুমার আদিবাসীদের আগমন ঘটেছিল? নিজস্ব বাসভূমি ত্যাগী মানুষগুলি কিভাবে ক্যানিং মহকুমার স্থানীয় অধিবাসীদের সাথে মিশে নিজস্ব সংস্কৃতিকে ভুলে জন্ম দিয়েছে এক মিশ্র সংস্কৃতির? এই সংস্কৃতিক বিবর্তনের লক্ষণ গুলি কি কি? উদাহরণ সহযোগে বর্ণনা। জল-জঙ্গল ঘেরা সুন্দরবনের দ্বীপগুলির কখনো উত্থান, কখনোবা পতন হয়েছে। আবার উত্থান-পতনের সাক্ষী এই দ্বীপগুলি কখনো মানুষের সমাগমে কোলাহলপূর্ণ আবার কখনো তা বনানীর বন্ধনে জনশূন্য হয়েছে। এইরূপ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ দ্বীপগুলির মধ্যে বর্তমানের ক্যানিং মহকুমা-এর অন্তর্গত অঞ্চলগুলিতে ব্রিটিশদের আগমনের পূর্বেও মানুষের বসবাস ছিল। তবে ১৭৫৭ সালের ২০ই ডিসেম্বর ব্রিটিশ কর্তৃক চব্বিশ পরগনার জমিদারি স্বত্ব গ্রহণ করার পর সুন্দরবন দ্বিতীয়বারের জন্য মনুষ্য বসবাসের উপযোগী হয়েছিল। আর এই সময়-পর্বে জঙ্গল পরিষ্কার, রেললাইন নির্মাণ ও বন্দর তৈরির কাজে মজুর হিসেবে আগমন ঘটেছিল আদিবাসীদের। ছোটনাগপুর, পশ্চিম ভারতের পাহাড়ি জেলা ঝাড়খন্ড, বাঁকুড়া, সাঁওতাল পরগনা, বীরভূম, পুরুলিয়া ও মানভূম অঞ্চল থেকে আগত এই মানুষগুলোই বর্তমানে সুন্দরবনের আদিবাসী পরিচয়ে পরিচিত। নিজস্ব বাসভূমি পরিত্যাজ্য এই মানুষগুলি এখানে এসে স্থানীয় মানুষগুলির সঙ্গে কোথাও সংঘবদ্ধভাবে কোথাও বা বিচ্ছিন্নভাবে বসবাস করতে থাকে। ফলস্বরূপ তাদের নিজস্ব বাসভূমির দেব-দেবী, সামাজিক রীতিনীতির সঙ্গে সংযোগ হারিয়েছে। আর বিশ্বাস করতে শুরু করেছে স্থানীয় দেব-দেবীকে, গ্রহণ করেছে স্থানীয় রীতিনীতিকে। এভাবে তিন-চার পিড়ি পূর্বে বর্তমানের ক্যানিং মহকুমাতে বসতি স্থাপনকারী আদিবাসী মানুষগুলো উন্নত সংস্কৃতির সংস্পর্শে এসে নিজেদের সম্পূর্ণভাবে পরিবর্তিত না করলেও উন্নত সংস্কৃতির রীতিনীতি কে গ্রহণ করে জন্ম দিয়েছে এক মিশ্র সংস্কৃতির। এখানকার ভূমিজ সম্প্রদায়ভুক্ত আদিবাসীরা আজ নিজেদের হিন্দু সম্প্রদায়ভুক্ত বলে মনে করেন। তাদের সন্তানরা নিজেদের ভাষায় কথা বলতে পারে না। এভাবে চললে অদূর ভবিষ্যতে এদের নিজস্ব অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখা অসম্ভব হয়ে দাঁড়াবে।

সূচক শব্দ: জঙ্গল হাসিল, সুন্দরবনের আদিবাসী, আদিবাসীদের আগমন, সাংস্কৃতিক বিবর্তন, আদিবাসী রূপান্তর, হিন্দুত্বকরন।

"বঙ্গদেশের দক্ষিণ সীমায় অবস্থিত সমুদ্র-কূলবর্তী জঙ্গলাকীর্ণ ভূ-ভাগকে সুন্দরবন বলে। নিম্নবঙ্গে যেখানে গঙ্গা বহুশাখা বিস্তার করিয়া সাগরে আত্মবিসর্জন করিয়াছে। প্রাচীন সমতটের দক্ষিণাংশে অবস্থিত সেই লবণাক্ত পল্বলময় অসংখ্য বৃক্ষ-গুল্ম সমাচ্ছাদিত শ্বাপদ-সংকুল চরভাগ সুন্দরবন বলিয়া পরিকীর্ত্তিত হয়"।[১]

সুন্দরী গাছের বিশাল জঙ্গল, বিশাল বিশাল ঢেউ সমৃদ্ধ নদীর বুকে বিরাজ করছে নোনাজল, আর নোনাজলকে আশ্রয় করে কুমির-হাঙ্গরের বাস, পৃথিবীর বিখ্যাত রয়েল বেঙ্গল টাইগারের বিচরণভূমি সুন্দরবন। বাঘ-কুমিরের বসত এলাকা এহেন সুন্দরবনের প্রবেশদ্বার হিসেবে পরিচিত ক্যানিং বর্তমানে চব্বিশ পরগনা জেলার একটি অনুন্নত মহকুমা। সুন্দরবনের অন্যান্য অঞ্চলের ন্যায় এখানেও মানুষের বসতি স্থাপনের সূচনা ইংরেজ কর্তৃক জঙ্গল হাসিলের সময় থেকে। তবে ব্রিটিশদের আগমনের আগে এখানে মানুষের বসবাস ছিলোনা একথা বলা যায়না। প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শন, তাদের ব্যবহার্য দ্রব্যাদি ও ঐতিহাসিক কীর্তি ইত্যাদি দেখে এটা অনুমান করা যায় অঞ্চলটির সর্বত্র সর্বদা জঙ্গলাবৃত ছিল না।[২] সম্ভবত নদীর গতিপথ পরিবর্তন, সাইক্লোন ও বন্যার মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগের হাত থেকে বাঁচতে এবং পর্তুগিজবাসী ফিরিঙ্গি ও আরাকানবাসী মগদের আক্রমণে অঞ্চলটি জনশূন্য হয়ে পড়েছিল বা পরিত্যক্ত হয়েছিল। এভাবে অরণ্য বসতি অঞ্চলকে গ্রাস করেছিল।[৩] তাই ব্রিটিশদের আগমনের সময় চব্বিশ পরগনা তথা সমগ্র সুন্দরবনের তারা যে দৃশ্য দেখেছিলেন তা ছিল অরণ্যাবৃত শ্বাপদসংকুল ও দস্যু নিয়িন্ত্রিত একটি জঙ্গল।[৪]

এভাবে বারবার কখনো জনপূর্ণ কখনো জনশূন্য হয়ে পড়া এই অঞ্চল কিছু গল্প, উৎসব ও রীতিনীতিকে সঙ্গে নিয়ে বয়ে চলেছে আবহমানকাল ধরে। যেটি স্থানীয় জনগোষ্ঠীর বিশেষ করে এখানে বসবাসকারী তথাকথিত আদিবাসী ও নিম্নবর্গের মানুষগুলির সংস্কৃতি ও ধর্ম। আমার আলোচিত ক্যানিং মহাকুমার আদিবাসী সম্প্রদায়গুলি এখানকার আদি বাসিন্দা ছিলেন না। জঙ্গল পরিষ্কার, বন্দর ও রেললাইন নির্মাণের হাত ধরে সমগ্র ভারতবর্ষের বিশেষ করে বীরভূম, পুরুলিয়া মানভূম প্রভৃতি আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চলগুলির আদিবাসী সম্প্রদায়ের আগমন এই অঞ্চলকে আদিবাসী সংস্কৃতির সাথে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল। পরবর্তীতে এই আদিবাসীরাই স্থানীয় সংস্কৃতির সাথে মিশে গিয়ে ভুলতে বসেছে তাদের আসল বা নিজস্ব সংস্কৃতিকে এবং জন্ম দিয়েছে এক মিশ্র সংস্কৃতির। এইরূপ মিশ্র সংস্কৃতির ধারক ক্যানিং মহকুমার আদিবাসী সম্প্রদায়গুলির সাংস্কৃতিক বিবর্তনের লক্ষণগুলি বর্ণনার পূর্বে তাদের আগমন বৃত্তান্ত পর্যালোচনা করা আবশ্যিক।

সর্বোপরি বলে নেওয়া প্রয়োজন বর্তমানে সুন্দরবন তথা ক্যানিং মহকুমায় বসবাসকারী কোন আদিবাসীই এখানকার আদিম বাসিন্দা বা ভূমিপুত্র নয়।[৫] এরা সকলেই ভাল কিছুর আশায় আগত অভিবাসী। ছোটনাগপুর এবং পশ্চিম ভারতের পাহাড়ি জেলা ঝাড়খণ্ড, বাঁকুড়া, সাঁওতাল পরগনা, বীরভূম, পুরুলিয়া ও মানভূম অঞ্চল

থেকে আগত “বুনো” উপজাতি।[৬] সাধারণত জন্ম থেকে জঙ্গলের সাথে নিবিড় সম্পর্ক থাকায় এবং অরণ্যময় দেশ থেকে আসার জন্য এরা স্থানীয়ভাবে বুনো নামে পরিচিত। প্রধানত সাঁওতাল, মুন্ডা, ওরাওঁ, ভূমিজ ও হো এই পাঁচটি সম্প্রদায়ভুক্ত উপজাতিগুলি কালের বিবর্তনে সামগ্রিকভাবে সুন্দরবনের আদিবাসী নামে বিশেষ পরিচিত। দীর্ঘকাল ধরে এই অঞ্চলের প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে বসবাস করে এই এলাকার সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষাকে তারা নিজেদের করে নিয়েছে। ১৭৫৭ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি কর্তৃক পলাশীর যুদ্ধে নবাব সিরাজউদ্দৌলার পরাজয় বাংলা তথা ভারতের ভাগ্যাকাশে নিয়ে এসেছিল স্বাধীনতার সূর্যাস্ত। পলাশীর যুদ্ধের অবসানের পর ২০শে ডিসেম্বর তৎকালীন নবাব মীর জাফর কর্তৃক কোম্পানি কলকাতা তথা চব্বিশ পরগনার জমিদারি সত্ত্ব গ্রহণ করেছিলেন।[৭] এরপর ১৭৬৫ সালে বাংলার শাসনভার হাতে পেয়ে কোম্পানি সুন্দরবনের অনাবাদী জমিকে আবাদি জমিতে পরিণত করার উপর গুরুত্ব দিতে থাকেন। উদ্দেশ্য ছিল দুটি অনাবাদী জলাভূমিকে চাষের আওতায় এনে রাজস্ব বৃদ্ধি এবং সুন্দরবনের প্রাকৃতিক সম্পদের আবাধ লুন্ঠন।[৮] তবে জঙ্গল পরিষ্কার করে কৃষি জমি পুনরুদ্ধার এবং বসতি স্থাপনের কাজটা খুব সহজ ছিল না। কেননা বিপদসংকুল ঘন এই অরণ্যে ডাঙ্গায় বাঘ, জলে কুমির কোথাও কোথাও জঙ্গল এত নিবিড় ছিল যে সূর্যের আলো প্রবেশ করতে পারে না। সকল বাধা-বিপত্তি কে পিছনে ফেলে জঙ্গল পরিষ্কার করে বসতি স্থাপনের প্রথম পদক্ষেপটি আসে ১৭৭০ সালে চব্বিশ পরগনার কালেক্টর ক্লড রাসেলের থেকে।[৯] ১৭৮৩ সালে দ্বিতীয় পদক্ষেপটি গ্রহণ করেন যশোর জেলার ম্যাজিস্টেট টিলম্যন হেঙ্কেল। তিনি তৎকালীন গভর্নর জেনারেল ওয়ারেন হোস্টিংসের অনুমোদন নিয়ে সমগ্র অঞ্চলটিকে কতকগুলি তালুকে বিভক্ত করেছিলেন।[১০] এভাবে ১৭৮৭ সালের মধ্যে প্রায় ৭০০০ একর জমি চাষের আওতায় আসে।[১১] লিজ গ্রহণকারী যেসকল জমিদার এবং তাদের জমিদারী পরিচালনায় নিযুক্ত লাটদার, চাকদার, নায়েব ও গোমস্তা সুন্দরবনের জমি পুনরুদ্ধারের কাজে যোগ দিয়েছিলেন তাদের মূল চালিকাশক্তি ছিল শ্রমিক কুল। তবে সাধারণ কোন কুলি মজুর এই অমানবিক পরিশ্রমের কাজে আসতে রাজি ছিল না। শুধুমাত্র কাঠুরিয়া সম্প্রদায়ের মানুষ কিছুটা সফল হয়েছিল। পরবর্তীতে তারাও যখন পেরে উঠছিলেন না। তখন জঙ্গলের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত মানুষদের নিযুক্তির মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করা হয়েছিল। এমতাবস্থায় তদানীন্তন বাংলার আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চলগুলি থেকে আদিবাসীদের আনয়নের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। জন্ম, কর্ম্ম, চিন্তা-ধারা সবই অরণ্য-কেন্দ্রিক এই সকল আদিবাসীদের আনতে লাটদারেরা আড় কাটিয়াদের নিযুক্ত করেছিলেন। যাদের মূল কাজ ছিল যে কোনও উপায়ে আদিবাসীদের বুঝিয়ে সুন্দরবনের জমি পুনরুদ্ধার প্রকল্পে অংশগ্রহণ করানো। আড় কাটিয়ারা সহজ-সরল জীবনে বিশ্বাসী আদিবাসীদের গিরমিট অর্থাৎ উদ্ধারকৃত জমির এক অংশ সাফাই-

কারীদের দেওয়া হবে এই লোভ দেখিয়ে এই অঞ্চলে আনতে সমর্থ হয়েছিল। এছাড়াও অরণ্যচারী আদিবাসীদের পক্ষে অন্য এক অরণ্যের আহ্বান গ্রহণ করা কোনও অস্বাভাবিক ব্যাপার ছিল না। সেটিও আবার এমন অরণ্য যেখানে রয়েছে সম্ভাবনার নানান আকর্ষণ। যেগুলি আড় কাটিয়ারা সুন্দর ভাবে তাদের কাছে উপস্থাপন করেছিলেন। ফলে দলে দলে আদিবাসীদের আগমন ঘটে সুন্দরবনে। তাদের দা-কুঠারের আঘাতে ঘন অরণ্য ধীরে ধীরে বৃক্ষহীন হতে শুরু করে। খুলে যায় কৃষিকাজের সবরকম সম্ভাবনা। জঙ্গল সাফাইয়ের কাজে প্রথম যে সকল আদিবাসী এখানে এসেছিলেন তাদের বেশিরভাগই ছিল সাঁওতাল এবং মুন্ডা। শর্ত ছিল একটাই খুব শীঘ্রই জঙ্গল পরিষ্কার করে চাষের জমি উদ্ধার।[১২] ১৮১১-১৯০০ মধ্যবর্তী সময় পর্বে সুন্দরবনাঞ্চলে আগত আদিবাসী সম্প্রদায়ের সংখ্যা সর্বোচ্চ সীমায় পৌঁছেছিল।[১৩]

সম্ভবত নতুন ভূমি ও জঙ্গলের ডাক বিশেষ করে বসতি স্থাপনের সহজ-শর্তে আকর্ষিত হয়ে তিন থেকে চার পুরুষ পূর্বে অর্থাৎ প্রায় ৭৫ থেকে ১০০ বছর পূর্বে এখানে ওরাওঁ সম্প্রদায়ভুক্ত আদিবাসীদের আগমন ঘটেছিল।[১৪] এভাবে সুন্দরবনের জল জঙ্গলাকীর্ণ ভূ-ভাগ পরিষ্কার করে বহু আদিবাসীর আগমন ঘটেছিল সমগ্র সুন্দরবনের ন্যায় ক্যানিং, বাসন্তী ও গোসাবার মতো অঞ্চলগুলিতেও। বর্তমান সুন্দরবনের আদিবাসী অধ্যুষিত ক্যানিং, বাসন্তী ও গোসাবা অঞ্চলগুলিতে আদিবাসীদের আগমনের আরও কয়েকটি কারণ বিশেষ উল্লেখ্যের দাবি রাখে। এর মধ্যে অন্যতম হলো ১৮৫৩ সালের জমি বন্দোবস্তের নতুন নিয়ম অনুসারে সুন্দরবনের সর্বাপেক্ষা প্রতাপশালী জমিদার পোর্ট ক্যানিং কোম্পানি মাতলা সহ অনেকগুলো অনাবাদি লাট ইজারা নিয়ে জঙ্গল পরিষ্কারের কাজ শুরু করেছিলেন। উদ্দেশ্য ছিল পোর্ট ক্যানিং বন্দর ও শহর নির্মাণ। এই সময় কোম্পানির আড় কাটিয়ারা জমির টোপ দেখিয়ে শ্রমিক হিসেবে মেদিনীপুরের ভূমিজ, ছোটনাগপুর অঞ্চলের মালপাহাড়িয়া, সাঁওতাল, মুন্ডা, ওরাওঁ ও অন্যান্য আদিবাসী কৌম সম্প্রদায়গুলিকে এখানে এনেছিলেন।[১৫] এরপর ১৮৭৯ সালে লার্জ ক্যাপিটালিস্ট লিজ অ্যাক্ট অনুসারে সমগ্র সুন্দরবনকে প্রায় ১৮৮টি লাটে বিভক্ত করে ইজারা প্রদান করা হয়েছিল।[১৬] ফলে সমগ্র সুন্দরবনে লাটদারি কেনার হিড়িক পড়ে যায়। এমন সময় ১৯০৩ সালে স্যার ড্যানিয়েল ম্যাকিনন হ্যামিল্টন নামক এক স্কটিশ ব্যবসায়ী গোসাবা ও রাঙাবেলিয়া এবং ১৯০৯ সালে সাতজেলিয়া দ্বীপগুলিকে ইজারা নিয়ে তার স্বপ্নের সমবায় এস্টেট গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। এই সকল জঙ্গলময় দ্বীপগুলিকে পরিষ্কার, নদী বাঁধ নির্মাণ, বৃষ্টির জল ধরে রাখার জন্য খাল-পুকুর কাটা প্রভৃতি এককথায় বসতি স্থাপনের উপযুক্ত করে তুলতে রাঁচি, হাজারীবাগ, মানভূম, ময়ুরভঞ্জ, সিংভূম, কেত্তনঝড়, সুন্দরগড়, বিলাসপুর, ছত্তিশগড় ও নাগপুর থেকে আদিবাসী সাঁওতাল, মুন্ডা ও ওরাওঁ শ্রমিকদের নিয়ে আসেন।[১৭] পরবর্তীতে সেই সকল শ্রমিকরাই হয়েছিল হ্যামিল্টন আবাদ বা উক্ত দ্বীপগুলির স্থায়ী বাসিন্দা। তবে আড় কাটিয়ারা জমিদানের যে লোভ দেখিয়ে তাদের এনেছিলেন, জঙ্গলমুক্ত কৃষিক্ষেত্র তৈরির

পর তারা সেই অধিকার পায়নি। কারণ স্বরূপ বলা যেতে পারে তারা বেশিরভাগই ছিল ঠিকা চুক্তির বেকার শ্রমিক। এই চুক্তি অনুসারে তারা চাষের জমি পায়নি। অর্থাৎ ভূমিহীন শ্রমিক হিসেবেই থেকে গিয়েছিল। ভূমিহীন হলেও বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আগত বা অভিবাসিত আদিবাসীরাই জঙ্গল পরিষ্কারের পর জনহীন অরণ্যের মূল অধিবাসী। বর্তমানে তারা সবাই সুন্দরবনের আদিবাসী হিসেবে সমধিক পরিচিত। মূলত পাঁচটি মুখ্য আদিবাসী সম্প্রদায়ের আগমন ঘটেছিল ক্যানিং মহকুমার বিভিন্ন অঞ্চলে। মুন্ডাদের প্রধানত দেখা যায় গোসাবা, বাসন্তী, ক্যানিং এবং ঝড়খালির বিভিন্ন অংশে। ওরাওঁরা রয়েছে ক্যানিং ও গোসাবা অঞ্চলে। সাঁওতাল ও হো আদিবাসীদের মূলত দেখা যায় ক্যানিং বাসন্তী অঞ্চলে। আবার ভূমিজদের আগমন ঘটেছিল ক্যানিং, বাসন্তী ও গোসাবাতে। এভাবে সংখ্যাধিক্যের ভিত্তিতে এদের অঞ্চল বিভাজন করলেও মূলত সমগ্র মহকুমার বিভিন্ন অংশে এদের বাসভূমি ছিল। এখানে তারা সম্প্রদায়গত ভাবে বসবাস করতে পারেনি। বিভিন্ন সম্প্রদায় একত্রে বসতি স্থাপন করেছিল। তাই সাঁওতালদের এলাকাতে ভূমিজদেরও দেখা মেলে। আর এজন্যই ক্যানিং মহাকুমার সাধারণ মানুষ এখানে বসবাসকারী আদিবাসীদের প্রকৃত গোষ্ঠী যেমন মুন্ডা, সাঁওতাল, ভূমিজ ইত্যাদি নামে চেনে না সামগ্রিকভাবে আদিবাসী হিসেবে চেনে। এইভাবে ছোটনাগপুর, সাঁওতাল পরগনা, ঝাড়খণ্ড, বীরভূম, মানভূম, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া প্রভৃতি অঞ্চল থেকে আগত অরণ্যনির্ভর এই আদিমতম জনজাতি পাহাড়-টিলা-মালভূমি অধ্যুষিত জঙ্গল থেকে অনেক দূরে কোথাও দলবদ্ধভাবে, কোথাও বা ছড়িয়ে-ছিটিয়ে স্থানীয় জনজাতির সঙ্গে মিলেমিশে বসবাস করতে শুরু করেছিল। ফলে তাদের সমাজ ও সংস্কৃতিতে কিছু পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। যা তাদের আদি বাসভূমির নিজস্ব সংস্কৃতি থেকে কিছুটা আলাদা।

এবার ক্যানিং মহকুমায় আগত এইসকল আদিবাসভূমি পরিবর্তিত আদিবাসীদের সাংস্কৃতিক বিবর্তন এবং তার লক্ষণগুলির উপর আলোকপাত করা যেতে পারে। জঙ্গল পরিষ্কারের সুবাদে আগত আদিবাসী গোষ্ঠীগুলি জঙ্গল পরিষ্কার করে গ্রামের পত্তন করেছিল। গ্রাম প্রতিষ্ঠাকালে এমন একটি গ্রাম প্রতিষ্ঠা করার স্বপ্ন তারা দেখেছিল যেখানে থাকবে নিজস্ব ভূমির ওপর নিজস্ব বাড়ি, নিজেদেরই পঞ্চায়েত যেখানে শুধুমাত্র তাদেরই অধিকার থাকবে কিন্তু সেই স্বপ্ন বাস্তবের কঠিন চাপে বিলীন হয়ে গিয়েছিল। জমি হাসিলের সুবাদে তারা যে জমি অর্জন করেছিল জমিদার, লাটদার ও অন্যান্য দালালদের চাতুরীতে তা আয়ত্তে রাখতে পারেনি। এভাবেই তারা সুন্দরবন অঞ্চলের সবচেয়ে দরিদ্র জনগোষ্ঠীতে পরিণত হয়েছিল। এরই পাশাপাশি অর্থনৈতিক অক্ষমতা ও সুযোগ-সুবিধা বঞ্চিত হওয়ার কারণে অথবা দূরত্বের কারণে সুন্দরবন অঞ্চলের অধিবাসীদের সঙ্গে তাদের মূল ভূখণ্ডের সম্পর্ক ছিন্ন হয়েছিল, তৈরি হয়েছিল দূরত্ব। মূলত এই দূরত্ব এবং সম্প্রদায় হীনতার কারণে তারা তাদের চিরাচরিত ঐতিহ্যকে

রক্ষা করতে পারিনি। এখানে এসে ঘর নির্মাণের ক্ষেত্রে তারা নিজস্ব রীতিকে নয় স্থানীয় রীতিকে অনুসরণ করেছিল এবং এর উপাদানও ছিল ভিন্ন। যেমন ঘর নির্মাণের ক্ষেত্রে তারা আর শাল কাঠের ব্যবহার করতে পারেননি, ব্যবহার করতে হয়েছিল সুন্দরবনের সুন্দরী, গরান, বাইন নামক বৃক্ষ। সাঁওতালদের ঘরের দেওয়ালে চিত্রাঙ্কন দেখা গেলেও তা তাদের নিজস্ব চিরাচরিত ধারাকে অনুসরণ করেনা। এসব ছাড়াও বিবর্তনের আরও কয়েকটি ধারা, আরো কয়েকটি লক্ষণ এই অঞ্চলে আসা আদিবাসী মানুষগুলির আদিম সংস্কৃতিক রূপের পরিবর্তনের চিহ্ন হিসেবে তুলে ধরা যেতে পারে।

এর মধ্যে সর্বপ্রথম আসে আদিবাসী রূপান্তর। আদিবাসীরা সুন্দরবনের এই নতুন পরিবেশে এসে প্রথমদিকে নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মাধ্যমে নিজেদের দৃঢ় করতে সক্ষম হয়েছে। আবার অভিযোজনের মাধ্যমে মহকুমার অন্যান্য জাতির দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে। ফলে তারা তাদের আদিম ধারাকে সম্পূর্ণ ভাবে অনুসরণ করতে পারেনি বা রক্ষা করতে পারেনি। ওরাওঁ গ্রামে গেলে ধুমকুড়িয়া বা আখড়ার ব্যবহার দেখা যায়না। মুন্ডাদের গ্রামে সাসান দিরির সঙ্গে আদিবাসীদের সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল। সাঁওতাল পরগনার আদিবাসীদের জীবনে শালগাছ এক বিশেষ গুরুত্ব পালন করত কিন্তু সুন্দরবনে এসে তা আর সম্ভব হলো না। তাই বর্তমানের আদিবাসী যুবক আস্তে আস্তে শালগাছের গুরুত্বই ভুলে যেতে বসেছে। এখানে এসে তারা যে গ্রাম গড়ে তুলেছিল সেখানে দুই-তিন ধরনের আদিবাসী সম্প্রদায় একত্রে বসবাস করত। ফলে তাদের মধ্যে সম্প্রদায় ভিত্তিকতা গড়ে ওঠেনি। এছাড়া তাদের আদি বাসভূমিতে পাহান ও মাহাতো যে প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন করত এখানে তা অক্ষত রইলোনা। সাঁওতাল গ্রামে মাঝিথানের সেই গুরুত্ব ও পবিত্রতা নেই। জাহের থান থাকলেও সামগ্রিক জীবনে তার মূল্যবোধ কমেছে। আদিবাসীদের আদি বাসভূমিতে বোঙ্গা নামক যে নৈবেত্তিক শক্তি, যিনি হিতকারী এবং অহিতকারীর ভূমিকা পালন করত। ক্যানিং মহকুমার লবণাক্ত পরিবেশে সেই চিন্তা ধারা হারিয়ে গেছে, তবে তা একেবারে নিঃশেষ হয়ে যায়নি। আজও তারা ভৌতিক শক্তিতে বিশ্বাসী।

আদিবাসী সংস্কৃতির বিবর্তনের ধারায় যে উপাদানটি সবচেয়ে বেশি প্রভাব ফেলেছে তাহলো হিন্দুত্বকরন। ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে যে সমস্ত আদিবাসী গোষ্ঠী বিশেষ করে যারা বহুদিন ধরে হিন্দু জনগোষ্ঠীর সংস্পর্শে এসেছে, তাদের মধ্যে ধীরে ধীরে হিন্দু ভাবধারার অনুপ্রবেশ ঘটেছে। ফলস্বরূপ তাদের জীবন চর্চায় উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। হিন্দু প্রভাব বিশিষ্ট সামাজিক-অর্থনৈতিক পরিমণ্ডলের নিকট সান্নিধ্যে যে সকল আদিবাসী জনগোষ্ঠী এসেছে তাদের মধ্যে কিছু সাংস্কৃতিক ভাবধারার মূলগত বিষয়সমূহ অবাধে প্রবেশ করেছে। ফলে এই অঞ্চলের আদিবাসীগুলির মধ্যে তাদের নিজস্ব ভাবধারার সঙ্গে হিন্দু ভাবধারার সুষ্ঠু মেলবন্ধন লক্ষ্য করা যায়। আজ ক্যানিং মহকুমার আদিবাসী সমাজ তাদের নিজ নিজ দেব-দেবীর পাশাপাশি হিন্দুদের দেব-দেবীর পূজা করছে। হিন্দুদের উৎসবকে নিজেদের উৎসব ভেবে অপরিসীম

আনন্দে মেতে ওঠে। যেমন তারা তাদের নিজস্ব দেব-দেবী সিংবোঙ্গা, মারাংবুরুকে পূজা করেন তেমনি সুন্দরবনের স্থানীয় দেব-দেবী মনসা, দক্ষিণরায়, বনবিবি, কালী ঠাকুরকেও পূজা করেন। নিজস্ব উৎসব করম পরব, সহরাই, টুসু, সহরুল এর পাশাপাশি গাজন উৎসব, মনসার ঝাপান ইত্যাদিকে তারা আপন করে নিয়েছে। জঙ্গলে কাঠ কাটতে, মাছ ধরতে বা মধু আহরণে বেরোনোর ঠিক আগে আজকাল অনেক আদিবাসী গঙ্গা পূজা, বনবিবি, আটেশ্বর বা গাজির পূজা দিয়ে থাকেন।[১৮] এছাড়া ক্যানিং মহকুমার আদিবাসী সম্প্রদায় ভাদ্র মাসে যে মনসা পূজার আয়োজন করেন এবং তাকে উৎসর্গ করে বলি প্রদান করেন তা কখনোই আদিবাসীদের পূজা নয়। সাঁওতাল, ওরাওঁ, মুন্ডা, শবর প্রভৃতি প্রোটো অস্ট্রালয়েড বা আদি অস্ট্রাল বলে পরিচিত ভারতীয় আদিম জাতিগুলির মধ্যে সর্প পূজার বিশেষ লক্ষণ দেখতে পাওয়া যায়না। সর্প এদের অধিকাংশেরই ভক্ষ।[১৯] কিন্তু বর্তমানে বহু আদিবাসী হিন্দুদের অনুকরণে শ্রাবণ মাসের সংক্রান্তিতে একবার এবং ভাদ্র মাসের সংক্রান্তিতে আরো আরেকবার সর্প দেবী মনসার পূজা করেন। এছাড়া আরও একটি বিষয় বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করে তা হল আদিবাসীদের পূর্ববর্তী বাসস্থানে যেকোনো পূজাকর্ম সম্পাদন করতেন তাদেরই সম্প্রদায়ের ওঝা বা পুরোহিত।[২০] কিন্তু বর্তমানে ক্যানিং মহকুমার আদিবাসীরা তাদের পূজা-অর্চনা সম্পাদন করান হিন্দু সম্প্রদায়ের ব্রাহ্মণ পুরোহিত দিয়ে। অন্যদিকে সাঁওতাল সম্প্রদায় তাদের পূর্ববর্তী বাসভূমিতে সাদানি নামক যে লৌকিক গীত সম্পাদন করতেন তা লিখিত হত নিজস্ব ভাষায় কিন্তু এখানে এসে সেটি বাংলা ভাষায় লিখতে শুরু করেন। আবার তাদের প্রধান বাদ্যযন্ত্র ছিল "বুঙ্গা" (শুকনো এবং ফাঁপা কুমড়ার উপর তার যুক্ত যন্ত্র) যে বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার এখানে দেখা যায় না।[২১] জঙ্গল পরিষ্কারের সময় আগত আদিবাসীরা স্থানীয় লৌকিক দেবী বনবিবির প্রতি আস্থাশীল হয়ে ওঠে। তাই এখানে এসে তারা বনবিবির গান ও বনবিবির পূজাও করে। এটা তারা সুন্দরবনে এসে গ্রহণ করেছিল কারণ তাদের নিজস্ব বাসভূমির পাহাড়ি জঙ্গলে এটি সম্ভব ছিলনা বা করতো না।

ক্যানিং মহাকুমার বিভিন্ন প্রান্তে আগত আদিবাসী সম্প্রদায়গুলির সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থানেরও পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। মূলত জমির মালিক হওয়ার বাসনা নিয়ে আসা মানুষগুলি কালচক্রের দুর্বিপাকে কৃষি মজুরে পরিণত হয়েছে। শাল-মহুয়ার জঙ্গলে জীবজন্তু শিকার, মধু সংগ্রহ, কাঠ সংগ্রহ এবং পার্শ্ববর্তী খেতে কৃষিকাজ ছিল যাদের ক্ষুন্নিবৃত্তির মাধ্যম বা অর্থনৈতিক উপাদান তারাই এখানে অবলীলাক্রমে বেছে নিয়েছে মৎস্যকেন্দ্রিক বিভিন্ন পেশা। নদী-সমুদ্রে মাছ ধরার কলাকৌশল আয়ত্ত করে নিজেদের জেলে সম্প্রদায়ভুক্ত করে ফেলেছে। তারা পেশা হিসেবে মৎস্যশিকারকে এমন ভাবে গ্রহণ করেছে যে স্থানীয় অন্যান্য সম্প্রদায়ভুক্ত অধিবাসীরা ভাবতেই পারেনা তারা কৃষি কাজটাও জানে। বাঘ-কুমিরের বাদাবনে মধু সংগ্রহের মতো বিপদসংকুল

পেশাকেও তারা সানন্দে গ্রহণ করেছে যার কোনটিরই সঙ্গে তাদের পূর্ব পরিচয় ছিলনা।

সময় চক্রের নির্মম পরিহাসে আজ থেকে তিন-চার পিড়ি পূর্বে বর্তমানের ক্যানিং মহকুমাতে বসতি গড়েছিল যে সকল আদিবাসী তারা আদি বাসভূমির আদিবাসীদের সঙ্গে নিজেদের পৃথক বলে অনুভব করতে শুরু করেছে। গোষ্ঠীবদ্ধভাবে বসবাসকারী মানুষগুলো হারিয়ে ফেলেছে গোষ্ঠীবদ্ধভাবে বসবাসের ধারা। সুন্দরবন অঞ্চলের অন্যান্য জাতির সাথে মিশে সৃষ্টি করেছে এক মিশ্র সংস্কৃতির ধারা। এই মিশ্র সংস্কৃতির মধ্যে থেকে উন্নত সংস্কৃতি আজ গ্রাস করতে চলেছে সমগ্র আদিবাসী সমাজকে। কেননা সংস্কৃতায়নের সূত্রানুযায়ী তথাকথিত ভাবে অনুন্নত সভ্যতাগুলি উন্নত সভ্যতাগুলি থেকে উন্নত ধ্যান-ধারণা গ্রহণ করে নিজেদের সব সময় উন্নত করতে চায়। তাই ক্যানিং অঞ্চলে আগত আদিবাসীগুলি উন্নত হিন্দুত্বকরনের ধারায় নিজেদের পুরোপুরিভাবে হিন্দু হিসেবে প্রতিভাত না করলেও হিন্দু রীতিনীতিকে মনেপ্রাণে গ্রহণ করেছে। তাই এই অঞ্চলের ভূমিজ সম্প্রদায়ভুক্ত আদিবাসী নিজেদেরকে আদিবাসী বললে নয়, হিন্দু বললে সবচেয়ে বেশি খুশি হয় এবং তারাও নিজেদের হিন্দু বলে জাহির করতে পছন্দ করে। আজ সুন্দরবন অঞ্চলের খুব কম আদিবাসী সন্তান নিজের ভাষায় কথা বলতে পারে, নিজের দেব-দেবীকে মান্য করে। অর্থাৎ সুন্দরবনের আদিবাসী মনুষগুলি আজ সাংস্কৃতিক বিবর্তনে হিন্দুত্বকরন এবং খ্রিস্টানীকরনের যে উভয় মুখী চাপে পড়েছে তার থেকে মুক্তি পাওয়া প্রায় অসম্ভব। কেননা পার্শ্ববর্তী বসবাসকারী হিন্দু এবং খ্রিস্টানদের মত তথাকথিত উন্নত সংস্কৃতির প্রভাবে তারা নিজেদের সামাজিক সাংস্কৃতিক কিছু নিয়ম রীতির বিরুদ্ধে প্রশ্ন তুলতে শুরু করেছে। এছাড়াও আদিবাসীদের সাংস্কৃতিক বিবর্তনে আরও একটি বিষয় খুবই গুরুত্বপূর্ণ সেটি হল আদিবাসী সমাজ-সংস্কৃতি, রীতি-নীতির কোনো লিখিত দলিল বা গ্রন্থ নেই। ঐতিহ্যবাহী পরম্পরা অনুযায়ী এটি চালিত হয়। এক ‘পিড়ি’র পর আরেক পিড়ি দেখে দেখে শিখে সেটাকে বজায় রাখে। আর এক্ষেত্রে ক্যানিং মহকুমার আদিবাসীরা বহুকাল পূর্বে তাঁদের মূল বাসভূমি, মূল সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছে তাই তারা তাদের সাংস্কৃতিক রীতিনীতির অনেকটাই ভুলে গেছে, কিছুটা মনে রেখেছে। তাই অদূর ভবিষ্যতে এদের নিজস্ব অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখা প্রায় অসম্ভব হয় দাঁড়াবে।

তথ্যসূত্র

১. সতীশ চন্দ্র মিত্র, *যশোর খুলনার ইতিহাস*, প্রথম খন্ড (কলিকাতা: চক্রবর্তী চাটার্জী এন্ড কোঃ প্রথম প্রকাশ ১৯১৪), পৃ. ৪৫।

২. নীহাররঞ্জন রায়, *বাঙালির ইতিহাস আদিপর্ব* (কলিকাতা: দে’জ পাবলিশিং, প্রথম বাংলা প্রকাশ ১৩৫৬, অষ্টম প্রকাশ ১৪২০), পৃ. ৪৫ ; দীনেশচন্দ্র সেন, *বৃহৎ বঙ্গ*

(সুপ্রাচীন কাল হইতে পলাশীর যুদ্ধ পর্যন্ত) দ্বিতীয় খন্ড (কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, প্রথম প্রকাশ ১৯৩৫ পুনর্মুদ্রণ ১৯৯৩), পৃ. পৃ. ১১২৩-১১৩০।

৩. মিত্র, *যশোর খুলনার ইতিহাস*, প্রথম খন্ড, পৃ. পৃ. ৫৯-৬১ ; J. West Land, A report on the District of Jessore, Its Antiquities, Its History and Its Commerce, Calcutta, 1871, pp. 20-21 ; James Rennell: Map of the Sundarban and Baliagot PassJames Rennell: A Map of the Sunderbund and Baliagot passages, with their principal communication Harrison, William; (1780) Website https://bildsuche. digitale-sammlungen.de.

8. F.D. Ascoli, *A Revenue History of the Sundarbans from 1870 to 1920* (Calcutta: The Bengal Secretariat Book Depot., 1921), p. 3.

৫. এ. এফ. এম. আবদুল জলিল, *সুন্দরবনের ইতিহাস* (কলকাতা: নয়া উদ্যোগ, ভারতীয় সংস্করণ ২০০০), পৃ. ২০৩।

৬. W. W. Hunter, *A Statistical Acount of Bengal, vol-1, District of the 24 parganas and sundarban* (London: Trubner & co., 1875), p. 35;

৭. Hunter, *A Statistical Acount of Bengal, vol-1, District of the 24 parganas and sundarban*, 18; L. S. S. O'Malley, *Bengal Disrtict Gazetteers, 24-Parganans* (Calcutta: The Bengal Secretariat Book Depot.,1914), p. 44.

৮. Annual Progress Report of Forest Administration (Indian office Library, London, hereafter cited as PRF) for 1867-68,Calcutta 1869; Taken from Ranjit Chakrabarti, " Local People and The Global Tiger, An Environmental History of the Sundarban" Global Environment 3 (2009), pp. 72-95, http;// W.W.W.enviromentandsociety.org /node / 4614.

৯. F. E. Pargitter, *A Revenue History of the Sundarbans From 1765 to 1870,* Bengal, 1934, p. 1.

১০. O'Malley, *Bengal Disrtict Gazetteers, 24-Parganan*, pp. 46-47; কমল চৌধুরী, *চব্বিশ পরগণা উত্তর দক্ষিণ সুন্দরবন* (কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, প্রথম প্রকাশ ডিসেম্বর ১৯৯৯), পৃ. ৫৬-৫৭।

১১. Hunter, *A Statistical Acount of Bengal, vol-1, District of the 24 parganas and sundarban*, p. 328.

১২. Aparna Mandal, *The Sundarban An Ecological History* (1770-1870), (Kolkata: Readers Service, 17 July, 2004), p. 84.
১৩. Barun De, *West Bengal District Gazetteers: 24 Parganas*, (Calcutta: March 1994), 143; Amal Kumar Das and Manish Kumar Raha, "The Oraons of Sundarban" Bulletin of Cultural Research Institute, Tribal Welfare Department of W.B Calcutta Special Series No. 3, 1963, pp. 16-17.
১৪. Snakarananda Mukherjee, *The Sundarban Shylock and the Tribal*, Bulletin of Cultural Research Institute, Vol-3, 1964, p.73.
১৫. পুর্নেন্দু ঘোষ, *ইতিহাসার আলোকে সুন্দরবন ও পোর্ট ক্যানিং* (কলকাতা: লোকসখা প্রকাশন, প্রথম প্রকাশ-২০১৭), পৃ. ১০৭।
১৬. Ascoli, A Revenue History of the Sundarbans from 1870 to 1920, pp. 15-18.
১৭. সুভাষ মিস্ত্রি, *লোকায়ত সুন্দরবন*, প্রথম খন্ড (কলকাতা: লোক, ফেব্রুয়ারি ২০১৩), পৃ. পৃ. ২৩৬-২৩৮।
১৮. তদেব, পৃ. ৬৯।
১৯. আশুতোষ ভট্টাচার্য, *বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস* (কলিকাতা: এ মুখার্জী এন্ড কোম্পানি প্রাইভেট লিমিটেড, অষ্টম সংস্করণ বইমেলা ১৯৯৮ পুনর্মুদ্রণ ২০০০), পৃ. ২৫৩।
২০. Mandal, *The Sundarban An Ecological History (1770-1870)*, pp. 183-184.
২১. তদেব, পৃ. ১৮৬।

রবীন্দ্রনাথ ও বৌদ্ধ দর্শন এবং সাহিত্য

সুপর্ণা কুণ্ডু চ্যাটার্জী
সহকারী অধ্যাপক
বাংলা বিভাগ, রানাঘাট কলেজ

উনিশ শতক বাঙালির নবজাগরণের সূচনায় ধর্মচিন্তা থেকে উৎপন্ন দার্শনিক উপলব্ধির সংযোগ ঘটে যা বৌদ্ধসাহিত্যের অনুবাদ ও সমালোচনার পথ সৃষ্টি করে। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, রামদাস সেন, রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, কেশবচন্দ্র সেন, অঘোরনাথ গুপ্ত, নবীনচন্দ্র সেন, শরচ্চন্দ্র দেব, সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ প্রমুখ ব্যক্তি বুদ্ধদেবের জীবন ও দর্শন নিয়ে গ্রন্থ রচনা করতে উৎসাহী হন।

রবীন্দ্রমানস গঠনে এদের চিন্তাধারা নিশ্চিত প্রভাব ফেলেছিল; বুদ্ধ সম্পর্কে পাশ্চাত্য দৃষ্টিভঙ্গিও তাঁর অজানা ছিল না। হীনযান-মহাযান সম্পর্কেও তাঁর ধারণা স্বচ্ছ ছিল। বুদ্ধদেবকে নিয়ে তাঁর বিভিন্ন ধরনের ভাবনা সঞ্জাত গ্রন্থও রয়েছে এমনকি রবীন্দ্রনাথের পরিবারেও ছিল বৌদ্ধ দর্শনের চর্চা। তাঁর ভাই দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত 'আর্যধর্ম এবং বৌদ্ধধর্মের পরস্পর ঘাতপ্রতিঘাত ও সজ্ঘাত' (১৮৯৯) এবং সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত 'বৌদ্ধধর্ম' (১৯০১) নামক দুটি গ্রন্থ রচনা করেন । তবে সবথেকে বড় প্রভাব হলো রাজেন্দ্রলাল মিত্রের 'দি সংস্কৃত বুদ্ধিস্ট লিটারেচার অফ নেপাল' গ্রন্থটি যা তাঁকে অনেক বৌদ্ধআখ্যানের সন্ধান দিয়েছিলো। এই গ্রন্থ থেকে রবীন্দ্রনাথ যে সকল আখ্যান তাঁর গ্রন্থে ব্যবহার করেছেন, তা হলো, শ্রেষ্ঠভিক্ষা, পূজারিণী, উপগুপ্ত, মালিনী, পরিশোধ, চণ্ডালী, মূল্যপ্রাপ্তি, নগরলক্ষী ও মস্তকবিক্রয়।

'কথা ও কাহিনী' কবিতাগ্রন্থের সকল আখ্যানই তিনি গ্রহণ করেছেন বৌদ্ধ কাহিনী থেকে। এই গ্রন্থের আখ্যা-অংশে 'বিজ্ঞাপন' শিরোনামে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য থেকে মেলে- 'এই গ্রন্থে যে-সকল বৌদ্ধ-কথা বর্ণিত হইয়াছে তাহা রাজেন্দ্রনাল মিত্র-সংকলিত নেপালী বৌদ্ধসাহিত্য সম্বন্ধীয় ইংরাজি গ্রন্থ হইতে গৃহিত। রাজপুত-কাহিনীগুলি টডের রাজস্থান ও শিখ-বিবরণগুলি দুই-একটি ইংরাজি শিখ-ইতিহাস হইতে উদ্ধার করা হইয়াছে। ভক্তমাল হইতে বৈষ্ণব গল্পগুলি প্রাপ্ত হইয়াছি। মূলের সহিত এই কবিতা গুলির কিছু কিছু প্রভেদ লক্ষিত হইবে-আশা করি, সেই পরিবর্তনের জন্য সাহিত্য-বিধান-মতে দন্ডনীয় গণ্য হইবে না।'(১)

'কথা ও কাহিনী' গ্রন্থের প্রেক্ষাপট সম্পর্কে কবি বলেছেন - 'এক সময়ে আমি যখন বৌদ্ধ কাহিনী এবং ঐতিহাসিক কাহিনীগুলি জানলুম তখন তারা স্পষ্ট ছবি গ্রহণ করে আমার মধ্যে সৃষ্টির প্রেরণা নিয়ে এসেছিল। অকস্মাৎ 'কথা ও কাহিনী'র গল্পধারা উৎসের মতো নানা শাখায় উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল। সেই সময়কার শিক্ষায় এই-সকল

ইতিবৃত্ত জানবার অবকাশ ছিল, সুতরাং বলতে পারা যায় 'কথা ও কাহিনী' সেই কালেরই বিশেষ রচনা।' [সাহিত্যে ঐতিহাসিকতা, সাহিত্যের স্বরূপ] (২)।

'কথা' কাব্যে যে সব কবিতা আছে তা হলো: কথা কও, শ্রেষ্ঠভিক্ষা, প্রতিনিধি, ব্রাহ্মণ, মস্তকবিক্রয়, পূজারিণী, অভিসার, পরিশোধ, সামান্য ক্ষতি, মূল্যপ্রাপ্তি, নগরলক্ষী, অপমান-বর, স্বামীলাভ, স্পর্শমণি, বন্দী বীর, মানী, প্রার্থনাতীত দান, রাজবিচার, গুরু গোবিন্দ, শেষ শিক্ষা, নকল গড়, হোরিখেলা, বিবাহ, বিচারক, পণরক্ষা।

'কাহিনী' কাব্যে রয়েছে ৮টি কবিতা। তা হলো: কত কী যে আসে, গানভঙ্গ, পুরাতন ভৃত্য, দুই বিঘা জমি, দেবতার গ্রাস, নিষ্ফল উপহার, দীনদান, বিসর্জন। অর্থাৎ 'কথা' ও 'কাহিনী'র এই ৩৩টি কবিতাই বৌদ্ধকাহিনী থেকে প্রভাবিত। এর বাইরেও অজস্র কবিতা রয়েছে যাতে বৌদ্ধসংস্কৃতির প্রভাব রয়েছে। 'পুনশ্চ' কাব্যের 'শাপমোচন', 'পরিশেষ' কাব্যের 'বুদ্ধজন্মোৎসব', 'বোরোবুদুর', 'সিয়াম, 'বুদ্ধদেবের প্রতি, 'প্রার্থনা, 'বৈশাখী পূর্ণিমা; 'পত্রপুট' কাব্যের ১৭-সংখ্যক কবিতা, 'নবজাতক' কাব্যের 'বুদ্ধভক্তি' এবং 'জন্মদিনে' কাব্যের ৩ ও ৬ সংখ্যক কবিতায় রয়েছে ভগবান বুদ্ধের উপস্থিতি।

'কথা ও কাহিনী' কাব্যের প্রায় পুরোটাই বুদ্ধ কাহিনী। 'শ্রেষ্ঠভিক্ষা, 'মস্তক বিক্রয়, 'পূজারিণী', 'অভিসার', 'পরিশোধ', 'সামান্য ক্ষতি', 'মূল্যপ্রাপ্তি', 'নগরলক্ষী', 'শাপমোচন' প্রভৃতি কবিতায় বৌদ্ধআখ্যান সরাসরি গৃহীত রয়েছে। এছাড়া 'পুনশ্চ' কাব্যের 'শাপমোচন' কবিতায় আছে বৌদ্ধধর্মীয় আখ্যান।

'পরিশেষ' কাব্যের 'বুদ্ধজন্মোৎস' (৩) এ আমরা রবীন্দ্রনাথের বুদ্ধপ্রশস্তি উপলব্ধি করতে পারি। 'বোরোবুদুর' দেখার প্রতিক্রিয়ায় রবীন্দ্রনাথ বোরাবুদুরের বর্ণনার পাশাপাশি বুদ্ধের আদর্শের কথা প্রকাশ করেছেন। সারনাথে মূলগন্ধকুটিবিহার প্রতিষ্ঠা-উপলক্ষে 'বুদ্ধদেবের প্রতি' নামের এক কবিতায় তিনি বুদ্ধদেবের নামের মহিমা তুলে ধরেছেন।

'প্রার্থনা' শিরোনামের কবিতায় ভগবান বুদ্ধের উপস্থাপনা লক্ষ্য করা যায়। 'পত্রপুট' কাব্যের ১৭ সংখ্যক কবিতাও বুদ্ধের প্রসঙ্গে রচিত। 'নবজাতক' কাব্যের 'বুদ্ধভক্তি' এবং 'জন্মদিনে' কাব্যের ৩ ও ৬ সংখ্যক কবিতা বুদ্ধবিষয়ক। 'খাপছাড়া' কাব্যের ৬৬-সংখ্যক কবিতায় বুদ্ধকে এক ভিন্ন আঙ্গিকে তুলে ধরা হয়েছে।

প্রবন্ধসাহিত্য গুলির মধ্যে 'সমালোচনা ১৮৮৮' গ্রন্থের 'অনাবশ্যক' নামের প্রবন্ধে রয়েছে বুদ্ধের উপস্থিতি। 'আত্মশক্তি' গ্রন্থে 'স্বদেশী সমাজ' ও 'দেশীয় রাজ' নামের প্রবন্ধদুটি ছাড়াও 'ভারতবর্ষ' গ্রন্থের 'সমাজভেদ', 'নববর্ষ', 'ব্রাহ্মণ', 'চীনেম্যানের চিঠি' ও 'অত্যুক্তি' প্রবন্ধে বুদ্ধের উল্লেখ করা হয়েছে।

প্রবন্ধগ্রন্থ 'সমালোচনা', 'ভারতবর্ষ', 'বিচিত্র প্রবন্ধ', 'প্রাচীন সাহিত্য', 'সাহিত্য', 'সমাজ', 'শিক্ষা', 'রাজাপ্রজা', 'ধর্ম', 'সঞ্চয়', 'পরিচয়', 'জাপানযাত্রী', 'লিপিকা', 'জাভাযাত্রীর পত্র', 'মানুষের ধর্ম', 'ভারতপথিক রামমোহন', শান্তিনিকেতন', 'কালান্তর',

'পথের সঞ্চয়', 'আত্মপরিচয়', 'সাহিত্যের স্বরূপ' 'বিশ্বভারতী', 'ইতিহাস', 'বুদ্ধদেব', 'খৃস্ট' প্রভৃতি গ্রন্থে একাধিকবার বৌদ্ধধর্ম, সংস্কৃতি ও আখ্যানের উলে¬খ রয়েছে।

রবীন্দ্রসাহিত্যে নাটক, কবিতায় ও প্রবন্ধে বুদ্ধ প্রসঙ্গের অবতারণা ব্যাপক হলেও উপন্যাস এবং ছোটগল্পে সরাসরি বুদ্ধপ্রসঙ্গ নেই বললেই চলে। ১০টি নাটকে বৌদ্ধআখ্যান রয়েছে। এগুলি হলো মালিনী (১৮৯৬), রাজা (১৯১০), অচলায়তন (১৯১২), গুরু (১৯১৮), অরূপরতন (১৯২০), নটীর পূজা (১৯২৬), চন্ডালিকা (১৯৩৮), নৃত্যনাট্য চণ্ডালিকা (১৯৩৮), শ্যামমোচন (১৯৩১) । এই ১০টি নাটক ছাড়াও 'শোধবোধ' নাটকে বৌদ্ধপ্রসঙ্গ রয়েছে।

বৌদ্ধআখ্যান নিয়ে রবীন্দ্রনাথ কোনো উপন্যাস রচনা করেননি যদিও 'ঘরে বাইরে" (১৯১৬) উপন্যাসে নিখিলেশের আত্মকথায় এবং 'শেষের কবিতা' (১৯২৯) উপন্যাসে ১৩শ পরিচ্ছদের প্রাসঙ্গিক উক্তিতে বুদ্ধপ্রসঙ্গ রয়েছে। 'শোধবোধ' (১৯২৬) নাটকে বুদ্ধদর্শনের প্রভাব নেই, কিন্তু বুদ্ধপ্রসঙ্গ রয়েছে।

বুদ্ধের প্রতি প্রবল শ্রদ্ধাবোধই এখানে তাঁর প্রসঙ্গ উত্থাপিত হওয়ার কারণ। 'ঘরে বাইরে' (১৯১৬) উপন্যাসেও আছে বুদ্ধের নাম। নিখিলেশের আত্মকথা-য় এসেছে রাজপুত্র সিদ্ধার্থের প্রসঙ্গ। 'শেষের কবিতা' (১৯২৯) উপন্যাসেও আছে বুদ্ধপ্রসঙ্গের অবতারণা। লাবণ্য ও অমিতের সংলাপে পাওয়া যায় বৌদ্ধধর্ম প্রচারের পথ সম্পর্কে। আর গানের কথা যদি বলা হয়, তাহলে অজস্র গানে রয়েছে বুদ্ধের বাণী ও দর্শন প্রভাব বিস্তার করেছে।

প্রকৃতপক্ষে ১৮৫৯ খ্রিষ্টাব্দের ২৭ শে সেপ্টেম্বর মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর বৌদ্ধধর্ম বিষয়ে জ্ঞান অন্বেষণে শ্রীলঙ্কায় যান, সঙ্গী হন পণ্ডিত কেশব সেন, কালী কমল গাঙ্গুলি এবং পুত্র সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর। দীর্ঘ সময় শ্রীলঙ্কায় অবস্থান করে তাঁরা বৌদ্ধধর্ম ও দর্শনের সাথে পরিচিত হন। এই ভাবধারায় বৌদ্ধধর্মের সাথে ব্রাহ্মধর্মের তুলনামূলক গবেষণা করে মহর্ষি ব্রাহ্মধর্মের বিকাশ ঘটান। তারই ফল হলো মহর্ষির কনিষ্ঠ পুত্র রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর সৃজনশীল সাহিত্যসাধনার এক বিশাল অংশজুড়ে বুদ্ধ এবং বুদ্ধের অহিংসা-মৈত্রীর বাণীকে ধারণ করে তাঁর কালজয়ী সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় বিস্তৃতি ঘটিয়েছেন। তাঁর সাহিত্য গভীর ভাবে অধ্যয়ন করলে অতি সহজেই এ কথা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে বুদ্ধের জীবন এবং দর্শন কবিকে প্রবলভাবে আকৃষ্ট করেছিল। এর ফলে গান, নাটক এবং গীতিনাট্যের মূল উপাদান বুদ্ধের অতীত জন্মের 'জাতক' কথা এবং বুদ্ধের আলোকিত জীবন ও আদর্শের বিভিন্ন দিক কবিগুরুর অলোকসামান্য প্রতিভার গুণে তাঁর সাহিত্যকে প্রভাবিত করেছে। 'জাতক' গ্রন্থ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের একটি উক্তি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য : 'জাতকের বাংলা অনুবাদ পরলোকগত ঈশানচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের একটি আশ্চর্য কীর্তি। ...এই অসামান্য উদ্যোগে লেখক বাংলা

পাঠকদের নিকট চিরস্মরণীয় হইয়া রহিলেন। এই গ্রন্থখানি অনুশীলন করিয়া অনেক উপকার পাইতেছি; সেইজন্যেও অনুবাদকের নিকট আমি ব্যক্তিগতভাবে কৃতজ্ঞ।' (৪)

গৌতম বুদ্ধের অতীত জন্মসমূহের বৃত্তান্ত যা ফৌসবোল সম্পাদিত 'জাতকার্থবর্ণনা' নামক মূল পালিগ্রন্থ থেকে ঈশানচন্দ্রকৃত বাংলা অনুবাদের এই মূল্যায়ন এবং তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে এই উক্তি করেছেন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথ তাঁর ধর্মভাবনায় একই রকমভাবে বৌদ্ধমতের প্রতি আকৃষ্ট হন। তিনি লিখেছেন :-

'ভগবান বুদ্ধ তুমি ,
নির্দয় এ লোকালয়, এ ক্ষেত্রই তবে জন্মভূমি।
ভরসা হারালো যারা, যাহাদের ভেঙেছে বিশ্বাস
তোমারি করুনাবিত্তে ভরুক তাদের সর্বনাশ।'(৫)

বুদ্ধ বলেছেন জীবের সব দুঃখের কারণ হলো তৃষ্ণা। এর জন্যই পুনর্জন্ম। তৃষ্ণাই হলো দ্বিতীয় আর্যসত্য। এই তৃষ্ণাকে রবীন্দ্রনাথ এক রোমান্টিক রসতৃষ্ণায় পরিবর্তিত করেন চন্ডালিকায় :-

'চক্ষে আমার তৃষ্ণা, ওগো
তৃষ্ণা আমার বক্ষ জুড়ে।
আমি বৃষ্টিবিহীন বৈশাখী দিন;
সন্তাপে প্রাণ যায় যে পুড়ে।
ঝড় উঠেছে তপ্ত হাওয়ায়,
মনকে সুদূর শূন্যে ধাওয়ায়,
অবগুণ্ঠন যায় যে উড়ে।'(৬)

কবি যখন বলেন 'সহায় মোর না যদি জুটে- / নিজের বল না যেন টুটে'(৭) তখন যেন সেখানে শোনা যায় 'ধম্মপদের' বাণী - 'অত্তা হি অত্তনো নাথো/ কো হি নাথো পরো সিয়া।'

যদি আমরা সরাসরি বৌদ্ধ সাহিত্য থেকে নেওয়া রবীন্দ্রসাহিত্যে প্রবেশ করি তাহলে দেখবো যে কিভাবে তিনি আশৈশব রাজেন্দ্রলাল মিত্রের অনুবাদকে পাঠ করে প্রভাবিত হন। 'শ্রেষ্ঠভিক্ষা' নামক কবিতা প্রকৃত পক্ষে 'অবদানশতক'-এর 'বস্ত্রম' থেকে। মূল কাহিনী যদিও রাজেন্দ্রলালের থেকে অনেকটাই আলাদা। রাজেন্দ্রলাল মূলানুগ সারাংশ করলেও সবটা হুবহু হয়নি। রবীন্দ্রনাথও পাঠকের অশেষ কৌতূহল জাগিয়ে রেখে একে মূলানুগ করেননি।

'মস্তকবিক্রয়' কবিতাটি আবার 'মহাবস্তুবদান'- এর 'আজ্ঞাতকৌন্ডিন্য জাতক'- এর প্রভাবে রচিত। রাজেন্দ্রলাল এই আখ্যানটি 'The sanskrit buddhist literature of nepal' গ্রন্থে সংকলিত করেন (৮)। যথারীতি রবীন্দ্রনাথ মূলের থেকে সামান্য পৃথক ঘটনা দেখিয়েছেন।

রাজেন্দ্রলাল এর ওই একই গ্রন্থের অন্য আখ্যান (৯) থেকে 'অভিসার' কবিতাটি নেওয়া যা কিনা সম্পূর্ণভাবে 'বোধিসত্বাবদানকল্পলতা'-র ২৭ তম পল্লবে 'উপগুপ্তাবদান'-থেকে গৃহিত। রবীন্দ্রনাথ একেও স্বতন্ত্র সৃষ্টিতে রূপান্তরিত করেছেন।

খ্রিস্টীয় দ্বিতীয় থেকে তৃতীয় শতাব্দীর মধ্যভাগে রচিত হয় 'দিব্যাবদান'। এরই কাহিনী হলো 'মাকন্দিকাবদানম'। এই কাহিনী রাজেন্দ্রলাল মিত্রের গ্রন্থে 'The stories of syamavati' নামে প্রকাশিত(১০)। এই কাহিনীই ব্যবহার করা হয়েছে 'সামান্য ক্ষতি' কবিতায়। একথা বলাই যায় যে কবিতাটি শুধুমাত্র লিরিক নয়। বরং লিরিক্যাল ড্রামা।

এছাড়াও 'অবদানশতক'-এর 'পদ্ম' আখ্যান 'কথা ও কাহিনী'-র 'কথা'- অংশে হয়েছে 'মূল্যপ্রাপ্তি'। আবার 'অবদানশতক' এবং অপরাপর বৌদ্ধ গ্রন্থ থেকে উপাদান নিয়ে তৈরি হয় 'কল্পদ্রুমাবদান'। এই গ্রন্থ সম্পূর্ণ পৌরাণিক রীতিতে রচিত। সেখান থেকেই সুপ্রিয়ার আখ্যান থেকে নেওয়া কাহিনী হয়েছে 'নগরলক্ষ্মী'।

'অবদানশতকের'ই শ্রীমতী উপাখ্যান থেকে রবীন্দ্রনাথ সৃষ্টি করেন 'পূজারিনি' কবিতা এবং 'নটীর পূজা' নাটক। সম্ভবতঃ এই আখ্যানটি রবীন্দ্রনাথের খুবই প্রিয় ছিলো।

এরপরেই বলতে হবে 'মহাবস্তুবদান'-এর 'শ্যামা'-জাতকের কথা। কাহিনীতে ব্যাপক বীভৎসতা থাকলেও রবীন্দ্রনাথ তা পরিহার করেন। প্রথমে 'পরিশোধ' নাটক ও পরে ১৯৩৯ সালে (ভাদ্র ১৩৪৬) 'শ্যামা' নাটক রচনা করেন। বলাই বাহুল্য যে রাজেন্দ্রলাল মিত্রের গ্রন্থে এই কাহিনীও ছিল (১১)।

১৩০৩ বঙ্গাব্দে অর্থাৎ ১৮৯৬ সালে 'মালিনী' নাটিকা প্রকাশিত হয় 'কাব্যগ্রন্থাবলী'-তে। পরে ১৩১৯ অর্থাৎ ১৯১২ সালে আলাদা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। এটিও 'মহাবস্তুবদান'- থেকে গৃহীত। অবশ্যই রাজেন্দ্রলাল এর গ্রন্থেও আছে ।

জাতিভেদের বিরুদ্ধে ঝোঁক থাকার কারণে রবীন্দ্রনাথ 'দিব্যবদান'-এর 'শার্দূলকর্ণাবদান' এর কাহিনীর প্রতি আলাদা পক্ষপাত দেখাতেন। এই কাহিনী ২৬৫ খ্রিস্টপূর্ব নাগাদ তে হু জে হু নামে এক চীনা লেখক 'শি তাউ কিন কিং' নামে অনুবাদ করেন। এতে জ্যোতিষ বিচারের কিছু উদাহরণ আছে। এর থেকেই রবীন্দ্রনাথ সৃষ্টি করেন অমর বাংলা সাহিত্য 'চন্ডালিকা'।

ঘটনা হলো যে নাটকের ক্ষেত্রেও বৌদ্ধ সাহিত্যের প্রভাবের বাত্যয় ঘটেনি। 'মহাবস্তুবদান' এর আখ্যান থেকেই 'রাজা' নাটক লিখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। এটি 'কুশজাতক' থেকে গৃহীত। পরে একই আখ্যান থেকে 'অরূপরতন' ও 'শাপমোচন' গীতিনাট্য রচনা করেন কবি।

'দিব্যবদান'-এর 'চূড়াপক্ষাবদান' থেকে রবীন্দ্রনাথ প্রথমে 'অচলায়তন' ও পরে 'গুরু' নাটক রচনা করেন। তবে শুধু 'মহাপন্থক' ও 'পন্থক' নামের ছায়ায় 'মহা পঞ্চক' ও 'পঞ্চক' ছাড়া আর কারোর তেমন একটা মিল নেই। দাদাঠাকুর,গুরু বা গোঁসাই আসলে স্বয়ং বুদ্ধের ছায়ায় তৈরি।

শুধু ধর্ম নয় রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্র ও সমাজচেতনার মধ্যেও বুদ্ধের আদর্শের প্রভাব ছিল। ভগবান বুদ্ধকে উদ্ধৃত করে কবি লিখেছেন, বাহুবলের সাহায্যে ক্রোধ-প্রতিহিংসাকে জয়ী করে শান্তি পাওয়া যাবে না। শান্তির পথ হচ্ছে ক্ষমা। রাষ্ট্র ও সমাজনীতিতে এই বিষয় মানুষ যতদিন না স্বীকার করবে ততদিন অপরাধ বেড়ে চলবে। রাষ্ট্রগত বিরোধের আগুন ততদিন নিভবে না। পৃথিবীর মর্মান্তিক পীড়া উত্তরোত্তর অসহ্য হতে থাকবে। কোথাও এর শেষ পাওয়া যাবে না।

যুদ্ধক্লান্ত তৎকালীন ইউরোপ রবীন্দ্রনাথকে মানবপ্রেমিক করেছিল। কিন্তু সে ছিল রাজনীতির দিক থেকে। ইউরোপের মানুষ জানত না যে সাহিত্যক্ষেত্রেও তিনি সর্বাগ্রে মানবপ্রেমিক, অতঃপর অন্যকিছু। আরও বিশদে বলা যায় যে তাঁর সমস্ত প্রেম ছিল জীবন ও মাটির পৃথিবীর জন্য। স্বর্গের থেকে মর্ত্যকে, পরলোকের থেকে ইহলোককে এবং দেবতার চাইতে মানুষকেই বেশি মূল্য দিয়েছেন তিনি। এখান থেকেই বুঝতে হবে , সবাই যাঁকে 'ভগবান' বুদ্ধ বলেছেন, কবি কেন তাঁকে প্রণাম নিবেদন করতে গিয়ে অন্তরের সমস্ত শ্রদ্ধা ঢেলে 'শ্রেষ্ঠ মানব' বলে উল্লেখ করেছেন।

রবীন্দ্রনাথের জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত বৌদ্ধধর্মের দর্শনের প্রতি প্রবল আকর্ষণ ছিল। রবীন্দ্রদর্শনে বৌদ্ধধর্মের নানা দিক প্রতিফলিত হয় আর রবীন্দ্রনাথ হয়ে ওঠেন আমাদের আত্মশুদ্ধির এক মহামানব। বৌদ্ধকাহিনী নিয়ে রবীন্দ্রনাথের লেখা কবিতাগুলোর একটি আলাদা তাৎপর্য আছে। তার অন্তর্গূঢ় স্বভাবে, প্রসারিত চেতনার ধ্রুবশিখায়, উপলব্ধির গহীনতম প্রদেশে কিংবা মানবকল্যাণবোধের সীমাহীন আকাক্সার মাধ্যমেই এর বিস্তার ঘটেছে।

মানুষের অভাব, খাওয়া-পরার সমস্যা, চিকিৎসা, বাসস্থান ও অন্যান্য মৌলিক চাহিদাগুলো তাকে প্রতিনিয়ত তাড়িত করছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও তার চেতনাগত উপাদানগুলোর ক্রিয়াশীলতাও সত্য। বাস্তবতা যত ক্রুরই হোক, মানুষ তো স্বপ্ন দেখতে ভুলে যায় না। আত্মিক সম্প্রসারণের ভেতর দিয়েই ঘটতে পারে মুক্তি। আর এই মুক্তিই কাম্য ছিল রবীন্দ্রনাথের।

আধ্যাত্মবাদের পাশাপাশি বৌদ্ধধর্মের মানবতাবাদের বাণী একইভাবে কাজ করেছে রবীন্দ্রনাথের মনে। বৌদ্ধকাহিনীগুলোর মধ্যে মানবিকতার যে উদ্বোধন ঘটেছে, ত্যাগের যে মহিমা প্রকাশিত হয়েছে, জীবনের সত্যরূপের যে পরিচয় ফুটে উঠেছে তা রবীন্দ্রজীবনদর্শনের সঙ্গেই সঙ্গতিপূর্ণ।

বৌদ্ধ দর্শনের অমিত গ্রন্থ ধম্মপদ রবীন্দ্র চেতনায় প্রজ্ঞার ধারা বইয়ে দিয়েছিলো। ধম্মপদের বাণীময় প্রকাশ রবীন্দ্রনাথকে গভীরভাবে প্রাণিত করেছিলো। ধম্মপদ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের অভিমত “ধম্মপদ সমগ্র ত্রিপিটক গ্রন্থমালার একটি অতি ক্ষুদ্র অংশ মাত্র। কিন্তু এই ক্ষুদ্র গ্রন্থটি ভাব, ভাষা ও অনুপম সাহিত্য মাধুর্যে বৌদ্ধ সাহিত্যে এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে।" এ গ্রন্থ শুধু বৌদ্ধদের কাছেই নয়, বিশ্বের সকল সম্মার্গান্বেষী মানুষের কাছেই আদরণীয়। ধম্মপদ সম্পর্কে রবীন্দ্র বলেছেন: "জগতে যে কয়েকটি শ্রেষ্ঠ ধর্মগ্রন্থ আছে ধম্মপদ তাহার একটি। ভগবদ্‌গীতায় ভারত বর্ষ যেমন আপনাকে প্রকাশ করিয়াছে, গীতার উপদেশ ভারতের চিন্তাকে যেমন একস্থানে একটি সংহত মূর্তি দান করিয়াছেন, ধম্মপদও ভারতবর্ষের চিত্তের একটি পরিচয় তেমনি ব্যক্ত হইয়াছে"।

বুদ্ধের সূত্র পিটকের মঙ্গল সূত্রের বাণীময় প্রকাশ রবীন্দ্র সংস্কৃতির বহুমাত্রিক রূপারোপ করেছে।

অনুরূপ বহুমাত্রিক শাস্ত্র অধ্যয়ন, নন্দনতত্ত্ব এবং উর্বর মানব কল্যাণধর্মী সংস্কৃতির বিকাশ সাধন, চিত্রকল্প, কারুশিল্প এবং অতুল গৌরবে সঙ্গীতচর্চার নিবিড় তপোবন হিসেবে রবীন্দ্রনাথ শান্তি নিকেতন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের বাঙ্ময় উপলদ্ধির বিন্যাসে ধরা দিয়েছে, প্রকৃতি কিংবা নিসর্গের হাতছানি, শিক্ষা আর জীবনধারা একই অনুষঙ্গে লালিত হলে মানবিক মূল্যবোধ বিকশিত হয় সহস্র ধারায়।

জাতিস্মর কিংবা জন্মান্তরবাদ বৌদ্ধ দর্শনের অনন্য উপাদান। এই জন্মান্তরবাদ কিংবা পুন:জন্মের দুর্নিবার আকাঙ্খা রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীত ভাবনায় মূর্ত হয়ে ওঠেছে দারুণভাবে –

"তখন কে বলে গো সেই প্রভাতে নেই আমি/ সকল খেলায় করবে খেলা এই আমি/ নতুন নামে ডাকবে মোরে বাঁধবে নতুন বাহু ডোরে/ আসব যাব চিরদিনের এই আমি।"

বৌদ্ধ ধর্ম অবশ্যই ইতিবাচক মোটেই নিবৃত্তিমূলক নয় এই প্রদীপ্ত সত্য রবীন্দ্রনাথ আবিষ্কার করেছেন। উপমা হিসেবে তিনি চিত্রিত করেছেন, তেলের প্রদীপের বর্ণনা বিবৃত করে তিনি দেখিয়ে দিয়েছেন, তেল নিজেকে পোড়ায় নিজেকে নিঃস্ব করার জন্যে নয়, চারপাশকে আলোকিত করতে। তিনি বোঝাতে সক্ষম হয়েছেন বুদ্ধই প্রথম মানুষ যিনি বলেছিলেন প্রতিটি মানুষের মধ্যেই এক অনন্ত বিশাল মহাজাগতিক শক্তি আছে। তারই নাম বুদ্ধ।

তথ্যসূত্র :

১. কথা ও কাহিনী. রবীন্দ্র রচনাবলী, ৭ম খন্ড।
২. রবীন্দ্র রচনাবলী।

৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পরিশেষ,পৃষ্ঠা-২০৬। বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ২ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রিট, কলিকাতা।

৪. ২১ শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৩।

৫. বুদ্ধদেব, বিশ্বভারতী।

৬. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, চন্ডালিকা, রবীন্দ্র রচনাবলী, ২৩ খণ্ড, পৃষ্ঠা-১৩৮।বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ২ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রিট, কলিকাতা।

৭. গীতাঞ্জলি -8।

৮. Rajendralal Mitra, 'The sanskrit buddhist literature of nepal'-p-158।

৯. Ibid -67

১০. Ibid-313

১১. Ibid-135

শব্দতত্ত্বে ব্যুৎপত্তিবিদ হিসাবে নিরুক্তকার আচার্য যাস্কের মূল্যায়ন

রফিকুল আলম
সহকারী অধ্যাপক,
সংস্কৃত বিভাগ,
উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ : ছয়টি বেদাঙ্গের মধ্যে নিরুক্ত হল ঐতিহ্যগত আনুষঙ্গিক বৈদিক অধ্যয়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা যা সাধারণভাবে একটি বৈদিক শব্দের সঠিক অর্থ স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করে। নিরুক্ত শাস্ত্রের রচয়িতা হিসাবে অনেক নাম পাওয়া যায়, যার মধ্যে বর্তমান নিরুক্তকারের নাম আচার্য যাস্ক।আচার্য যাস্ক পাণিনির পূর্ববর্তী ছিলেন। পারম্পরিকভাবে আচার্য যাস্ককে নিরুক্তের রচয়িতা হিসাবে ধরা হয়।এই নিরুক্ত গ্রন্থে যাস্ক নিঘণ্টু থেকে নির্বাচিত কিছু বৈদিক শব্দ, মন্ত্র এবং সামান্যত: নিজ নির্বাচিত কিছু বৈদিক শব্দের নির্বচন করেছেন।এই শব্দগুলো ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি আবার স্বাভাবিকভাবেই তাদের ব্যুৎপত্তিগত অনুমানে প্রবেশ করার চেষ্টা করেছেন। অর্থ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে এবং পদনির্বচন বিষয়ে নিরুক্ত ব্যাকরণের থেকে একটু আলাদা। সাধারণত বেদের কঠিন ও দুরূহ শব্দগুলির অর্থবোধের জন্য নিরুক্তে প্রদত্ত বৈদিক শব্দগুলির নির্বচন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে ভারতীয় পরম্পরায়। এই নির্বচনশৈলীই আধুনিক ভাষাতত্ত্বে ব্যুৎপত্তি বিদ্যা রূপে বিবেচিত হয়। আচার্য যাস্ক সামান্যত কোনো শব্দের নির্বচন নির্ণয়াবসরে অবশ্য সেই শব্দটির অর্থকে বিবেচনায় রেখেছেন। আবার আধুনিক তুলনামূলক ভাষাচর্চার যুগে কোনো শব্দের ব্যাখ্যাবসরে শব্দের অর্থকে বিবেচনায় রাখাকে তেমন প্রণিধানযোগ্য হিসাবে দেখা হয় না। আধুনিক ভাষাবিদ্যায় তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব ও ধ্বনিবিজ্ঞানের মাধ্যমে শব্দকে ব্যাখ্যা করার প্রয়াস লক্ষিত হয়। আচার্য যাস্ক শব্দকে তিন ভাগে ভাগ করে প্রত্যেকটি বিভাগের শব্দের নির্বচনের জন্য যথাযোগ্য পন্থা অবলম্বন করেছেন। এখানে লক্ষণীয় যে আধুনিক ভাষাতত্ত্বের যে বীজ স্বরূপ সূত্র ‘Deconstruction Theory’ তা আচার্য যাস্কের মস্তিস্কপ্রসূত তথা প্রসঙ্গ ছাড়া শব্দের অর্থ নির্ণয় করা অনুচিত ইতি। এই গবেষণা পত্রে আচার্য যাস্কের বিভিন্ন নির্বচন পদ্ধতি আধুনিক ভাষাবিদ্যার নিরীখে কতটা প্রাসঙ্গিক ও মূল্যবান তা দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে মাত্র।

সূচকশব্দ : অগ্নি, যাস্ক, নির্বচন, ব্যুৎপত্তিবিদ্যা, নিঘণ্টু, নিরুক্ত, জাতবেদস্, অনুষ্টুভ্।

মূল আলোচনা : ছয়টি বেদাঙ্গের মধ্যে নিরুক্ত হল ঐতিহ্যগত আনুষঙ্গিক বৈদিক অধ্যয়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা যা সাধারণভাবে একটি বৈদিক শব্দের সঠিক অর্থ স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করে। নিরুক্ত শাস্ত্রের রচয়িতা হিসাবে অনেক নাম পাওয়া যায়, যার মধ্যে বর্তমান নিরুক্তকারের নাম আচার্য যাস্ক। এই বেদাঙ্গ শাখার তথা নিরুক্তগ্রন্থগুলির মধ্যে এখন শুধুমাত্র প্রাচীন ঐতিহ্যগত পবিত্রচেতা যাস্কের নিরুক্ত বেঁচে আছে। তাই বলা যায় ঘটনাচক্রে যাস্ক প্রণীত নিরুক্তই এখন এই শাস্ত্রের একমাত্র অক্ষত প্রতিভূ। নিরুক্ত হল নিঘণ্টুস্থিত বৈদিক শব্দের ঐতিহ্যবাহী তালিকার একটি ভাষ্য। তালিকাভুক্ত শব্দগুলির উপর মন্তব্য এবং ব্যাখ্যা করার প্রক্রিয়ায় যাস্ক প্রায়শই প্রকৃত বৈদিক মন্ত্রগুলি উদ্ধৃত করেন এবং তারপর কেবল তালিকাভুক্ত শব্দগুলিই নয়, উদ্ধৃত মন্ত্রগুলিতে উপস্থিত অন্যান্য শব্দগুলোর ও ব্যাখ্যা করেন। এই শব্দগুলো ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি আবার স্বাভাবিকভাবেই তাদের ব্যুৎপত্তিগত অনুমানে প্রবেশ করার চেষ্টা করেছেন। তাই আচার্য যাস্কের কাজটি ভারতীয় ঐতিহ্যের প্রথম এবং প্রাচীনতম প্রচেষ্টা হয়ে উঠেছে বৈদিক শব্দগুলিকে ব্যাখ্যা করার জন্য যা সাধারণত তাদের ব্যুৎপত্তিগত শিকড়গুলি বোঝাতে চেষ্টা করে। ভারতীয় ঐতিহ্য এইভাবে যাস্ককে প্রধান ভারতীয় ব্যুৎপত্তিবিদ হিসাবে ধারণ করে। আবার আচার্য যাস্ককে ব্যাপকভাবে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য এই উভয় ব্যুৎপত্তিবিদ্যা-শৃঙ্খলার পূর্ববর্তী প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে বিবেচনা করা হয়।

Dr. Varmaতাঁর প্রসিদ্ধ “Etymologies of Yāska”[i]গ্রন্থের মুখবন্ধে লিখেছেন যে “Yāska was a remarkable etymologist far in advance of his times. But for the primitive age in which he lived, he would have been a brilliant etymologist.”[ii]তাই সহজেই অনুধাবন করতে পারি যে আধুনিক তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের দৃষ্টিকোণ থেকেও একজন ব্যুৎপত্তিবিদ হিসাবে যাস্কের সীমাবদ্ধতা বেশিরভাগই তাঁর সময়ের সীমাবদ্ধতা ছিল। আচার্য যাস্কের সময়ে শব্দের উৎপত্তি খোঁজার একটা ঝোঁক ছিল। Prof. Fatah Sing এর “The Vedic Etymology”[iii]গ্রন্থটি আমাদের একটি ভালো ধারণা দেয় যে শব্দগুলিকে কীভাবে এবং কতগুলি ভিন্ন উপায়ে ব্যাখ্যা করা হয়েছিল- বেদ থেকে শুরু করে, ব্রাহ্মণ ও উপনিষদের মাধ্যমে এমনকি বেদাঙ্গ পর্যন্ত অর্থের ক্রমান্বয় বিকাশকে বিবেচনা না করেই। নিরুক্তশাস্ত্রানুসারে শব্দ তিন প্রকারের হয় যেমন প্রত্যক্ষক্রিয়, পরোক্ষক্রিয় এবং অতি পরোক্ষক্রিয়।যে সকল পদের প্রকৃতি প্রত্যয় স্পষ্ট অর্থাত ধাতু ও প্রত্যয় শব্দের অর্থানুসারী, স্পষ্টভাবে প্রত্যক্ষ হয় সেগুলি প্রত্যক্ষক্রিয় বা প্রত্যক্ষবৃত্তিক শব্দ।যেমন পাচক শব্দের অর্থ পাককারী বা রন্ধনকারী। এখানে ধাত্বর্থ পচ্= রান্না করা এবং ণ্বুল প্রত্যয়ের কর্তৃবাচ্যে অর্থ শব্দার্থের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে দৃশ্যমান।পরোক্ষবৃত্তি এবং অতি পরোক্ষবৃত্তির ক্ষেত্রে এই সরাসরি দৃশ্যমানতা না থাকায় অর্থানুযায়ী এক বা একাধিক ক্রিয়া অনুমান করা এবং তদনুসারী বিভক্তি প্রয়োগ করতে হয়।যেমন ডিত্থ,

ডবিত্থ ইত্যাদি।যাস্কের বক্তব্য দুরূহ বৈদিক শব্দের ক্ষেত্রে ব্যাকরণানুসারী ধাতু প্রত্যয় যোগে শব্দ নির্বচন অসম্ভব, কেননা শব্দের বৃত্তি অধিকাংশ ক্ষেত্রে সংশয়াকীর্ণ বা অস্পষ্ট।আচার্য যাস্ক বলেছেন-"বিশয়বত্যো হি বৃত্তয়ো ভবন্তি"[iv] নি. 2/1।ফলত: নিরুক্তকারেরা বলেন সেগুলির অর্থ খুঁজতে হবে এবং অর্থানুসারে ধাতু ও বিভক্তি নির্ণয় করতে হবে।এই হল নির্বচনের অন্যতম নীতি।রাঢ়িশব্দের অর্থ জানতে নিরুক্তনীতি একমাত্র ভরসা।এই প্রসঙ্গে আচার্য যাস্ক বলেন-"ন ত্বেবং ন নিব্রুয়ান্ন সংস্কারমাদ্রিয়েত"[v]। অর্থাৎ শব্দের নির্বচন করতে কখনো অস্বীকার করা উচিত নয়। প্রসঙ্গক্রমে শব্দের নির্বচন বা ব্যাখ্যা দিতেই হবে, কখনই 'না' বলা উচিত নয়। ব্যাখ্যা প্রদানের এই অতি-উৎসাহ, আচার্য যাস্ক দ্বারা অগ্নির এই পাঁচটি ব্যাখ্যায় পরিলক্ষিত হয় অগ্নি (7/14), বা জাতবেদস্(7/9) এর ছয়টি ব্যাখ্যায় অথবা লক্ষ্মী (4/10) এর জন্য প্রদত্ত সাতটি ব্যাখ্যায়।এমনকি তিনি তাঁর ব্যাখ্যাকে সমর্থন করার জন্য বিভিন্ন স্থানে ব্রাহ্মণ-কর্ম থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন যেমন গায়ত্রী 7/2, অনুষ্টুভ্ 7/12 ইত্যাদি। তাই তার অনেক ব্যাখ্যাই বস্তুত ব্রাহ্মণ রচনার থেকে উদ্ধৃতি অথবা এমনকি তাঁর জাতবেদস্, পৃথিবী 1/3এর মতো জনপ্রিয় শব্দের শব্দের ব্যাখ্যাতেও তাদের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়।এখানে এটি উপলব্ধি করা দরকার যে ব্রাহ্মণ শাস্ত্রের প্রধান লক্ষ্য ছিল যজ্ঞ বা বলিদানের আচার-অনুষ্ঠানগুলিকে ব্যাখ্যা করা।শব্দগুলি ব্যাখ্যা করা কখনই তাদের দায়িত্বের মধ্যে ছিল না, এটি তাদের জন্য কেবলমাত্র অধস্তন বা গৌণ বিষয় ছিল, এই ব্যাখ্যাগুলির সমর্থন পাওয়া শুধুমাত্র ঘটনাগত মিল ছাড়া আর কিছু নয়। তাদের দেওয়া শব্দের ব্যাখ্যাগুলি নৈমিত্তিক হতে পারে, ভিত্তিহীনও হতে পারে বা এমনকি শব্দের আসল অর্থকে উপেক্ষা করে রচিত হতে পারে।আবার শুধুমাত্র বলিদানের প্রসঙ্গ এবং প্রাসঙ্গিকতার সাথে সম্পর্কিত এবং প্রায়শই শুধুমাত্র বিশেষভাবে (এবং বিশুদ্ধভাবে) উপযোগী গল্প দ্বারা সমর্থিত হতে পারে এই প্রয়োজনীয় প্রাসঙ্গিক অর্থ। অন্যদিকে আচার্য যাস্কের স্ব-নির্বাচিত কাজটি ছিল প্রাথমিকভাবে বৈদিক শব্দগুলিকে ব্যাখ্যা করা; এটা স্বীকৃত যে তিনি একটি বেদাঙ্গ লিখেছিলেন, যা বৈদিক শব্দাবলী এবং বৈদিক যজ্ঞানুষ্ঠান বা আচারের প্রেক্ষাপটে একটি বিজ্ঞান অনুষঙ্গী ব্যাখ্যামূলক বই, তবুও তাঁর বইয়ের প্রয়োজনে ব্রাহ্মণিক প্রভাবের পরিসর থেকে বেরিয়ে আসা সত্যিই গুরুত্বপূর্ণ হত।তিনি এখনও সেই 'শ্রুতি-গ্রন্থ' বা ঐতিহ্যগত ব্যাখ্যামূলক কর্মকাণ্ডের প্রভাব থেকে নিজেকে পরিষ্কার রাখতে পারেননি তা তাঁর প্রধান সীমাবদ্ধতার একটি। সেসব রচনার মতো তিনিও কিছু শব্দ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে মাঝে মাঝে বিশ্বামিত্র-নদী(2/24-27) অথবা দেবাপি-শন্তনু (2/10-12) এর মতো কিছু আখ্যানে পড়ে যান। এই প্রসঙ্গে ড: লক্ষণসরূপের কাজ আমাদের স্পষ্ট ধারণা দেয় যে আচার্য যাস্ক তাঁর কাজে ব্রাহ্মণ্য প্রভাবকে কতটা শুষে নিয়েছে। তাই দেখা যায় যে এই

শক্তিশালী ব্রাহ্মণ্য প্রভাব যাস্ক মুনির ব্যাখ্যামূলক প্রচেষ্টাকে যথেষ্টভাবে প্রভাবিত করেছে।

আবার "নামানি আখ্যাতজানি' তথা সমস্ত শব্দ ধাতু থেকে উদ্ভূত এই ধারণাটি তখনকার দিনে ব্যাপকভাবে প্রায় সর্বজনস্বীকৃত নীতিতে পরিণত হয়েছিল। "অর্থনিত্য: পরীক্ষেত"[vi] এই নিয়মের দ্বারা আমরা বুঝতে পারি যে কোনো শব্দের নির্বচন নির্ণয়াবসরে অবশ্যই সেই শব্দটির অর্থকে বিবেচনায় রাখতে হবে।সেজন্য প্রায়শই মূল অর্থ, রূপান্তরিত অর্থ এবং রূপক অর্থের মধ্যে পার্থক্যগুলি যথাযথভাবে বিবেচনায় নেওয়া হয়নি এবং ব্যাখ্যাযোগ্য শব্দগুলির ব্যাখ্যাগুলি প্রায়শই মূলের সাথে সামঞ্জস্য রেখে করা হয়েছিল যা তাদের প্রচলিত অর্থের কাছাকাছি বলে মনে হয়েছিল।এই কারণে, আচার্য যাস্ক দ্বারা প্রদত্ত ব্যাখ্যাগুলি কখনও কখনও স্বরবর্ণকে অবহেলা করে বলে মনে হয় (উষ্ণীষ 7/12)। কখনো ব্যঞ্জনবর্ণকে অবহেলা করে বলে মনে হয় (কম্বল 2/2)।কখনও কখনও তারা একটি নির্দিষ্ট ধাতু থেকে জোর করে শব্দটি আহরণ করার জন্য অর্থকে মোচড় দেয় (কচ্ছ 4/18, কক্ষ 2/2 ইত্যাদি)। কখনও কখনও একটি ধাতু কল্পনা করা হয় যেখানে ওটি নেই (দীর্ঘ 1/1)। এখানে এটা প্রমাণ করে যে "নামানি আখ্যাতজানি" এই নিয়মের উপর অধিক গুরুত্ব ও যাস্কের ব্যুৎপত্তিবিদ্যার সীমাবদ্ধতার একটি কারণ।

একজন ব্যুৎপত্তিবিদ হিসাবে আচার্য যাস্কের অন্যতম সীমাবদ্ধতা ছিল অবশ্যই তাঁর আবির্ভাব কাল। বৈদিক ভাষার তুলনামূলক অধ্যয়নের যে সুযোগ-সুবিধা আজ আমাদের আছে, তা যাস্কের সময়ে উপলব্ধ ছিল না। আমরা কেবল বৈদিক অভিধানে তাকাতে পারি এবং জানতে পারি কোন শব্দটি কোথায় এবং তা কতবার ব্যবহৃত হয়েছে। নির্দিষ্ট শব্দের অর্থ, তাদের সাথে সম্পর্কিত আরও অসংখ্য শব্দ, তাদের অর্থ এবং এমনকি তাদের সম্পর্কে বিভিন্ন পণ্ডিতদের দৃষ্টিভঙ্গি খুঁজে বের করার জন্য আমাদের কেবল বৈদিক সূচকটি দেখতে হবে।আমরা আবার আজকে গ্রীক, ল্যাটিন, আবেস্তা ও গাথিকের মতো অন্যান্য ভাষার তুলনামূলক ধ্বনিগত-অর্থবোধক কাঠামো সহ শব্দগুলি দেখতে পারি এবং সেগুলি থেকে মৌখিক বা শব্দার্থিক পরিবর্তনের নিয়ম ও নীতি দেখতে পারি। কিন্তু যাস্কের সময় তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের সমগ্র শাখার অস্তিত্ব ছিল না। বৈদিক সংস্কৃত যে কিছু ইন্দো-ইউরোপীয় উৎস থেকে বেড়ে উঠেছে তা জানা ছিল না তখন।যাস্ক মুনির সময় বৈদিক সংস্কৃত বা প্রাকৃত ছাড়া অন্য কোনো ভাষা অধ্যয়নের সুযোগ ছিল না। সেজন্যই আচার্য যাস্কের একাধিক নির্বচন অত্যন্ত প্রাথমিক স্তরে থেকে গেছে, যেমন অধ্বর্যু 1/8, পাণি 2/26, সেনা 2/11 ইত্যাদি।এরকম আরো অনেক উদাহরণ পাওয়া যায় যে নির্বচনগুলি ধ্বনিগতভাবে সঠিক কিন্তু শব্দার্থগতভাবে গ্রহণযোগ্য হয় না, যেমন-(ঋতু 2/25, বয়া **¼**, শরীর 2/16) ইত্যাদি।

একজন ব্যুৎপত্তিবিদ হিসেবে আচার্য যাস্কের কৃতিত্ব অবশ্য তার সীমাবদ্ধতার চেয়ে অনেক বেশি। এটা দেখা যায় যে তিনি কিছু আধুনিক বৈজ্ঞানিক গবেষকের মত তার বিষয়ের প্রতি একটি বস্তুনিষ্ঠ এবং সৎ মনোভাব গ্রহণ করেছেন। তিনি তার ব্যাখ্যায় অনমনীয় নন, তিনি অনেকগুলি বিকল্প দিয়েছেন। যে শব্দের নির্বচনে তিনি নিশ্চিত নন সেখানে তিনি ‘স্যাত্’ ব্যবহার করতে পারতেন। কিন্তু যেখানে তিনি মনে করেছেন যে তিনি শব্দটি ব্যাখ্যা করতে পারবেন না যেমন শিতামন্ 4/3,সেইসব ক্ষেত্রে তিনি কেবল একটি সমার্থক শব্দ বেছে নিয়েছেন এবং অন্যান্য পণ্ডিতদের মতামত ব্যাখ্যা করেছেন।'নামানি আখ্যাতজানি' এই নীতির প্রয়োগেও তিনি একেবারেই অনমনীয় নন। তিনি প্রায়শই তার উত্তরসূরি ব্যুৎপত্তিবিদদের চেয়ে আরও বেশি বৈজ্ঞানিক নমনীয়তা প্রকাশ করেন। Dr. Verma যেমন লক্ষ্য করেছেন"Yāska is a little more life-like etymologist than his successors in India, who have made etymology much more to depend upon the roots which are only a fiction of the grammarian.”[vii] আচার্য যাস্কের সময়কালে পদ-পাঠের ঐতিহ্য সম্ভবত সর্বজনীনভাবে সম্মানিত ও গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠেছিল। তবুও তিনি মেহনা 4/4, এর মত শব্দের ব্যাখ্যায় ঐতিহ্য থেকে বেরিয়ে কিছুটা সতেজতা ও স্বাধীনতা দেখান। "অর্থনিত্যঃ পরীক্ষেত" নীতির প্রায় সম্পূর্ণ আনুগত্য তার বেশিরভাগ ব্যাখ্যাকে যান্ত্রিকভাবে কঠোর হওয়া থেকে বাঁচায়।

আবার নিরুক্তে 2/1-এ, তিনি তাদের উদাহরণের মাধ্যমে বিভিন্ন ধরণের শব্দ পরিবর্তনের ইঙ্গিত দিয়েছেন, তিনি বস্তুত: তাদের নামও দেন নি এবং তাদের জন্য ব্যাকরণগত পারিভাষিক পদেরও ব্যবহার করেন নি; তবুও সেখানে দেখা যায় যে যে তিনি এসবের মৌখিক রূপান্তরের প্রক্রিয়া সম্পর্কে সচেতন যা পরে পাণিনি গুণ বা বৃদ্ধি বা সম্প্রসারণ অথবা স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণের সমন্বয় ইত্যাদি নামে অভিহিত করেছেন। আচার্য যাস্ক কেবল সচেতন ই নন, তিনি তাঁর দ্বারা প্রদত্ত ব্যাখ্যার ধ্বনিগত প্রক্রিয়াগুলির সেই নিয়মগুলি পর্যবেক্ষণ এবং প্রয়োগ এবং নিশ্চিত করেছেন বলে মনে হয়। যেমন পয়স্>√প্যৈ(>√প্যা), মৃগ>√মৃজ্- (1/20), অঙ্ক>√অঞ্চ্- (2/28) এবং উষস>√উচ্ছ্-(2/28)।এই প্রসংগে Dr. Varmaবলেছেন যে- “The phonetic foundations of Yāska’s explanation are sound- sound enough to allow them to be examined as etymologies! The fact that Yāska could offer etymology based on the correct rules of phonetic processes at a time when no kind of any systematic idea about philology was in vogue is itself strong enough to prove Yāska as a philologist of high rank.”[viii]

এবং শুধু এইগুলি নয়। অনেক ধ্বনিগতভাবে শব্দ ব্যুৎপত্তি প্রদান করা ছাড়াও আচার্য যাস্ক ভাষাতত্ত্বের অনেক ক্ষেত্র এবং প্রক্রিয়াগুলিতে ঝলক দিয়েছেন যেগুলিকে আমরা খুব আধুনিক বলতে পারি। যখন তিনি'শবতির্গতিকর্মা কম্বোজেষ্বেব ভাষ্যতে'[ix]বলেন। যদিও তিনি এটিকে একটি নীতি হিসাবে তুলে ধরেননি, তবে আমরা যাকে ভৌগোলিক ভাষাতত্ত্ব বলি সে সম্পর্কে তার ধারণা রয়েছে।

এখানে লক্ষণীয় যে Shri V.K. Rajwade তাঁর সম্পাদিত নিরুক্তে যাস্ক মুনির কর্মপদ্ধতি বিষয়ে নিন্দাত্মক মন্তব্য ই করেছেন "Nirukta does not deserve these high compliments, it is not a science, but a travesty of science.....the derivation given by Yaska have nothing to do with sound laws." মহাশয়ের এই বক্তব্যের সাথে কোনো মতেই এক মত হওয়া যায় না।বিপরীতে আমাদের অবশ্য ই ড: লক্ষণসরূপের সাথে যুক্তিগত ঐতিহ্য বজায় রাখতে হয়। লক্ষণসরূপ একটি সর্বাঙ্গসুন্দর নিঘণ্টু ও নিরুক্ত গ্রন্থেরে সম্পাদনা করেছেন, যা পরবর্তীকালের নিরুক্ত আলোচকদের কাছে একটি প্রাসঙ্গিক ও মূল্যবান সম্পদে পরিণত হয়েছে।তিনি বিশ্লেষণের মাধ্যমে দেখাতে পেরেছিলেন যে সেই অতি প্রাচীনকালে ব্যুৎপত্তিবিদ্যাগত নির্বচনশৈলী ও অর্থ নির্ণয়ের যে পথ ও পদ্ধতি যাস্ক দেখিয়েছেন তাতে তিনি প্রাচীন গ্রীক দার্শনিকদের চেয়ে অনেকটাই এগিয়ে ছিলেন।তাঁর প্রশংসনীয় মন্তব্য- "As far as etymology and semantics are concerned, he is far advance of the greatest ancient Greek writers like Plato and Aristotle."[x] লক্ষণস্বরূপ আচার্য যাস্কের সম্পর্কে এই প্রশংসা তাঁর ভাবাবেগবশত করেননি।তিনি এই বিষয়ে ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠীগুলির তুলনামূলক ধ্বনিতত্ত্বগুলিকে বহু বিচার ও বিশ্লেষণ করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন।যাস্কের একটি তত্ত্ব যা আধুনিক ভাষাতত্ত্বে বিশেষভাবে আলোচিত হয় সে অংশটুকুও তাঁর নজর এড়ায় নি।প্রসঙ্গ ছাড়া শব্দের অর্থ নির্ণয় অনুচিত এই যাস্কনীতিটি তিনি তুলে ধরেছেন- "He (Yāska) argues that single words isolated from their contexts is often difficult to the precise meaning of a word." তিনি আরো আচার্য যাস্কের সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন-"But Yāska'sgreatness; even if every one of his etymological explanations is proved to be wrong-as many are manifested by so-lies in the fact that he is the first to claim a scientific foundation and also the first to formulate general principles for etymology." Dr. Verma তাঁর গ্রন্থে যাস্ক মুনির নির্বচনশৈলীর সদর্থক ও নঞর্থক উভয় দিকই উন্মোচন করেছেন| তাঁর মতে যাস্কের নির্বচনশৈলী যথেষ্ট সুশৃঙ্খল ও নীতিনির্ভর। তিনি বলেছেন- "To Yāska's credit, it must be stated that he is the first systematic treatise on the etymology of an ancient language."

তথ্যসূত্র :

---

[i] **Verma, Siddheshwar, The Etymologies of Yāska, 1953, Hoshiarpur, Vishveshvaran and Vedic Research Institute.**

[ii] **Ibid, p. XI.**

[iii] Singh, Fatah**, The Vedic Etymology: A Critical Evaluation of the Science of Etymology as found in Vedic Literature** 1962, Kata, The Sanskrit- Sadan.

[iv] NIRUKTA 2/1/5

[v] Ibid 2/1/4

[vi] Ibid 2/1/3

[vii] **Verma, Siddheshwar, The Etymologies of Yāska, 1953, Hoshiarpur, Vishveshvaran and Vedic Research Institute, p.7**

[viii] Ibid, p.10-16

[ix] NIRUKTA 2/2/8

[x] **Rajwade VaijanathKashinath,**Yāska**'s Nirukta(Vol.1), 1940, Poona, Bhandarkar Oriental Research Institute, Introduction p. XLI-XLII.**

সাপ্তাহিক 'অমৃত' ও 'দেশ': বিশ্বভারতী এবং রবীন্দ্রনাথ

সন্ধ্যা মন্ডল
গবেষক, বাংলা বিভাগ,
প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়

তরুশূন্য, জনহীন এক প্রান্তর। ভুবন ডাঙা। সেখানে একসময় ডাকাতের বাস ছিল। বোলপুর স্টেশন থেকে আড়াই মাইলের পথ। ১৮৬২ সালে রায়পুরের এই বিস্তীর্ণ মাঠটি অতিক্রম করার সময়ে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এই জায়গাটার প্রতি নিবিড়ভাবে আকৃষ্ট হন। তিনি অনুভব করেছিলেন, একান্তে ঈশ্বর সাধনার উপযুক্ত স্থান এটি। তাই নির্জনে আরাধনার স্থান প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে তিনি রায়পুরের জমিদারের কাছ থেকে ছাতিমতরুদ্বয়কে কেন্দ্র করে বিশ বিঘা জমিটি কিনে নেন। এই ছাতিমতলাতেই তিনি ধ্যানের আসন পাতেন। এরই পূর্বদিকে তৈরি করেন একটি দোতলা বাড়ি। নাম দেন শান্তিনিকেতন।

মহর্ষি চেয়েছিলেন একেশ্বরবাদীরা যাতে এখানে শান্তিপূর্ণভাবে নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনা করার সুযোগ পায়, তার ব্যবস্থা করতে। ১৮৯১ সালে শান্তিনিকেতন মন্দির স্থাপিত হয়। ১৯০১ সালে পিতার অনুমতি নিয়ে রবীন্দ্রনাথ 'ব্রহ্মবিদ্যালয়' প্রতিষ্ঠা করেন। শান্তিনিকেতনের উন্মুক্ত পরিবেশে শিশুদের শিক্ষাদান করাই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। পরবর্তীকালে আশ্রমটি রবীন্দ্রনাথের স্পর্শে আরও বহুধা কার্যে বিস্তৃত হয়ে ওঠে। তাই রবীন্দ্রজীবনচর্যায় ওতপ্রোতভাবে যুক্ত হয়ে যায় শান্তিনিকেতন ও বিশ্বভারতী। রবীন্দ্রসাহিত্যেও যার প্রভাব বিপুল। সাময়িকপত্রের পৃষ্ঠাতেও এই বিষয়টির আলোচনা অতি গুরুত্ব সহকারে প্রতিষ্ঠা পায়।

সাপ্তাহিক সাহিত্য পত্রিকা 'অমৃত'-এর প্রকাশ রবীন্দ্রজন্মশতবর্ষপূর্তিতে। ১৮৬১ সালের ১২ মে। বাংলা কাব্য এবং সাহিত্যের প্রাণপুরুষ রবীন্দ্রনাথের চিন্তা এবং কর্মকে সামনে রেখে এই সাহিত্য পত্রিকাটি বিরাট রূপ নেয়। অন্যদিকে 'দেশ' পত্রিকা ১৯৩৩ সালে প্রকাশিত হয়। যা আজও সমভাবে প্রবাহিত। প্রথম প্রকাশ থেকেই রবীন্দ্রপ্রসঙ্গ পত্রিকাটিকে অন্যমাত্রায় নিয়ে যায়। রবীন্দ্রনাথের জীবনের বৃহৎ অংশে জড়িয়ে থাকা বিশ্বভারতী পর্বটি রবীন্দ্রচর্চায় বিশেষ আলোচ্য বিষয়। তাই স্বাভাবিকভাবেই ধারাবাহিক পত্রিকা 'অমৃত'-তে এই প্রসঙ্গটি উল্লেখ্য হয়ে উঠেছে। পাশাপাশি সাপ্তাহিক 'দেশ'-এও এর ব্যতিক্রম ঘটেনি।

'অমৃত' পত্রিকার ব্যাপ্তিকাল ১৯৬১ সাল থেকে ১৯৮০ সাল। এই দীর্ঘ সময়কালটিতে 'অমৃত' ও 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত বিশ্বভারতী ও রবীন্দ্রবিষয়ক প্রবন্ধগুলিকে কয়েকটি বিভাগে বিন্যস্ত করে আলোচনা করা হল।

উৎসবমুখর শান্তিনিকেতন:

সাপ্তাহিক 'অমৃত':

শান্তিনিকেতনের উৎসব নিয়ে **১৯৬১** সালের **১৩** অক্টোবর সংখ্যায় প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় লিখলেন *'বনমহোৎসব ও রবীন্দ্রনাথ'* **প্রবন্ধটি। ১৯২৫** সালে কবির জন্মদিনে শান্তিনিকেতনে প্রথম বৃক্ষরোপণ হয়। এই প্রসঙ্গে প্রাবন্ধিক লিখেছেন— "কবির জন্মদিনের উৎসব মহাসমারোহে শান্তিনিকেতনে উদযাপিত হলো।... উত্তরায়ণের উত্তর দিকে পথের ধারে 'পঞ্চবটী' প্রতিষ্ঠা হলো। এই শান্তিনিকেতনে প্রথম বৃক্ষরোপণ। রবীন্দ্রনাথ এই দিনের জন্য গান লিখলেন—মরুবিজয়ের কেতন উড়াও শূন্যে/ হে প্রবল প্রাণ।"[১]

শান্তিনিকেতনে বৃক্ষরোপণ অনুষ্ঠানের সাথে আরও দুটি উৎসব পালিত হতে দেখা যায়। প্রবন্ধটিতে শান্তিনিকেতনকে কেন্দ্র করে রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে বহু তথ্য জানা যায়। এই স্থানটি নিয়ে কবির গভীর আবেগ ছিল। এমনকি তাঁর মনের অনেক পরিকল্পনাও শান্তিনিকেতনের পরিবেশেই বাস্তবায়িত করেন। সমগ্র রচনাটিতে শান্তিনিকেতনের বিভিন্ন উৎসবগুলিতে কবির যে গভীর যোগসূত্র ছিল, তার বিস্তৃত বর্ণনা দেওয়া হয়েছে।

১৯৬৭ সালের ৬ জানুয়ারি সংখ্যায় অচিন রায়ের *'শান্তিনিকেতনে পৌষ উৎসব'* প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়। ১৮৪৩ সালের ২১ ডিসেম্বর (১২৫০ বঙ্গাব্দের ৭ পৌষ)। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের কাছে ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষাগ্রহণ করেন। ব্রাহ্মদের মধ্যে পারস্পরিক সৌহার্দ্য বৃদ্ধির জন্য মহর্ষি **১৭৬৭** শকের ৭ পৌষ-এ গোরিটির বাগানবাড়িতে প্রথম পৌষমেলার সূচনা করলেন। শান্তিনিকেতনে 'ব্রহ্মমন্দির'-এর উদ্বোধন হয় **১৮৯১** সালের ৭ পৌষে। এই বিশেষ সময়টিকে গুরুত্ব দিয়ে **১৯০১** সালের ৭ পৌষ শান্তিনিকেতনে 'ব্রহ্মবিদ্যালয়' প্রতিষ্ঠা করেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। এই দিনকে কেন্দ্র করেই উৎসব করার ভাবনা ছিল মহর্ষিরই। এই প্রেরণা থেকেই পৌষ উৎসবের সূচনা। সেই ঐতিহ্য আজও বহমান। প্রাবন্ধিক এই লেখাতে মহর্ষির লক্ষ্য প্রতিষ্ঠার প্রারম্ভকালের সাথে সাথে রবীন্দ্রনাথের ভাবনায় এই দিনটির গুরুত্ব কতখানি ছিল, তা নিয়ে আলোচনায় ব্যাপ্ত থেকেছেন। যা রবীন্দ্রচর্চায় বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

১৯৬৮ সালের ৯ ফেব্রুয়ারি সংখ্যায় বিশ্বজিৎ রায়ের *'শান্তিনিকেতনের উৎসব'* প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়। শান্তিনিকেতন একটি উৎসব মুখরিত কেন্দ্র। প্রাবন্ধিক বলেছেন— "বছরের শুরু হয় নববর্ষ দিয়ে।... এইদিন গুরুদেবের জন্মোৎসবও পালিত হয়। কেননা ২৫ বৈশাখের আগেই শান্তিনিকেতনের গ্রীষ্মাবকাশ শুরু হয় প্রাকৃতিক কারণে।"[২]

তারপর সমস্ত বছর ধরে একে একে বৃক্ষরোপণ, বর্ষামঙ্গল, হলকর্ষণ, শারদোৎসব, শান্তিনিকেতনের বার্ষিক উৎসব (৭ পৌষ), মাঘোৎসব, বসন্তোৎসব এবং চৈত্রের সন্ধ্যায় বর্ষ বিদায়ের অনুষ্ঠান সংগঠিত হয়। রচনাটির বিশ্লেষণে শান্তিনিকেতনে সমস্ত বছর ধরে অনুষ্ঠিত হওয়া উৎসবগুলির সামগ্রিক একটি পরিচয় পাওয়া যায়।

সাপ্তাহিক 'দেশ':

১৯৬১ সালের ৫ আগস্ট সংখ্যায় পূর্ণানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের *'বাইশে শ্রাবণ ও বৃক্ষরোপণ উৎসব'* প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়। শান্তিনিকেতনে বৃক্ষরোপণ ও বর্ষামঙ্গল অনুষ্ঠান খুব প্রচলিত একটি অনুষ্ঠান। রবীন্দ্রনাথের পরিকল্পনায় বৃক্ষরোপণ একটি বার্ষিক উৎসবে পরিণত হয়। লেখক এই প্রসঙ্গে লেখেন— "গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ বৃক্ষকে দেখেছেন প্রাণের আদিম প্রকাশ, 'আদিপ্রাণ রূপে।... তাই সমস্ত প্রাণীর পূর্বপুরুষ বলে গুরুদেব তাঁর বৃক্ষবন্দনায় বৃক্ষ বা উদ্ভিদকে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেছেন।"[৩]

প্রাবন্ধিক দেখিয়েছেন রবীন্দ্রনাথের পঁয়ষট্টিতম জন্মদিবস উপলক্ষে **১৩৩২** সালের ২৫ বৈশাখে শান্তিনিকেতনে প্রথম বৃক্ষরোপণ হয়। এর দুই বছর পর থেকে প্রতিবছর এই অনুষ্ঠানটি হয়। একইসাথে বর্ষামঙ্গলের অনুষ্ঠানটিও সংগঠিত হত। রবীন্দ্রনাথের প্রয়াণের পরের বছর থেকে তাঁর মৃত্যুদিন বাইশে শ্রাবণ দিনটিতে বৃক্ষরোপণের অনুষ্ঠানটি পালন করা হয়, যা ইঙ্গিতবাহী। মৃত্যুর মধ্যে নবজন্মের সূচনাকে আহ্বান করা হয়েছে। এই লেখাটির মধ্যে দিয়ে শান্তিনিকেতনের একটি অতি পরিচিত অনুষ্ঠানের কথা জানা যায়। সর্বোপরি শান্তিনিকেতনে কবির সৃষ্টি সংস্কৃতিময় পরিবেশ সম্বন্ধে জ্ঞাত হওয়া যায়।

১৯৭৬ সালের বিনোদন সংখ্যায় পূর্ণানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের *'পৌষমেলার একাল সেকাল'* প্রবন্ধটি প্রকাশ পায়। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর **১৮৪৫** সালের ২০ ডিসেম্বর-এ কয়েকজন ব্রাহ্মকে নিয়ে কলকাতার কাছে গোরিটিতে পৌষ উৎসব সূচনা করেন। এই উৎসবই পরবর্তীকালে শান্তিনিকেতনে পৌষমেলায় পরিণত হয়। প্রবন্ধটিতে প্রথম থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত এই উৎসবের ক্রমপরাম্পরার বিবরণ বিবৃত হয়েছে।

১৯৭৭ সালের ৩০ জুলাই সংখ্যায় হীরেন্দ্রনাথ দত্ত-এর *'রবীন্দ্রনাথের বর্ষাকাব্য ও শান্তিনিকেতনের বর্ষামঙ্গল'* প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়েছে। শান্তিনিকেতনে ঋতু-উৎসবের মধ্যে একটি হল বর্ষামঙ্গল। রবীন্দ্রনাথের বর্ষাকাব্য এবং শান্তিনিকেতনের ঋতু-উৎসবগুলির মধ্যে কবির এক গভীর উপলব্ধির প্রকাশ ঘটেছে। তিনি অনুভব করেছিলেন প্রকৃতিতে যেমন নানা ঋতুর পর্যায়ক্রমে সময় অতিবাহিত হয়, সেভাবেই মানুষের জীবনের ক্ষেত্রেও সত্য। প্রকৃতির ঋতুগুলির সাথে মানবজীবনের নানা অবস্থার তুলনা করেছেন। এক্ষেত্রে প্রাবন্ধিক বলেছেন—

"প্রকৃতির মধ্যে যে লীলাখেলা চলছে জীবনেও তাই। প্রকৃতির ঋতুরঙ্গে রুদ্র এবং শান্ত, ভীষণ এবং মধুর পাশাপাশি অবস্থান করছে।... গ্রীষ্মের তাপ বর্ষার ধারায় শীতল হয়ে

যাচ্ছে, শীতের দৈন্য বসন্ত এসে পূরণ করে দিচ্ছে। প্রচন্ড ঝড়ের পরে কী গভীর শান্তি। জীবনের খেলাও এই।”[৪]

প্রবন্ধটিতে ঋতু-উৎসবগুলির মধ্যে কবির গভীর জীবনবোধের যে পরিচয় পাওয়া যায়, সে কথাই ব্যক্ত হয়েছে। ফলে রচনাটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

১৯৮০ সালের বিনোদন সংখ্যায় দেবীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়ের *‘বিশ্বভারতীর উৎসব-অনুষ্ঠান’* প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিশ্বভারতীর শিক্ষার সাথে নানা উৎসবকে যোগ করেছিলেন। ব্যক্তির সার্বিক উন্নয়নের জন্য তিনি এই ভাবনায় অগ্রসর হয়েছিলেন। বিশ্বভারতীর উৎসবগুলি সাধারণত ধর্মকেন্দ্রিক, কর্মকেন্দ্রিক ও প্রকৃতিকেন্দ্রিক। মাঘোৎসব, পৌষ-উৎসব ধর্মমূলক। হলকর্ষণ, শিল্পোৎসব হল কর্মোৎসব। প্রকৃতি পর্যায়ের উৎসব হল সমস্ত ঋতু-উৎসবগুলি। বছরের সূচনা থেকে শেষ অবধি শান্তিনিকেতনের প্রধান অনুষ্ঠানগুলির কথা এখানে বিবৃত হয়েছে।

স্মৃতিচারণায় রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন:

সাপ্তাহিক ‘অমৃত’:

১৯৬১ সালের ১৬ জুন সংখ্যায় অবনীনাথ রায়ের *‘আমাদের সময়কার শান্তিনিকেতন’* প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়। স্মৃতিমূলক রচনাটিতে প্রাবন্ধিক ছাত্রজীবনে শান্তিনিকেতন ও রবীন্দ্রনাথকে কেমন ভাবে উপলব্ধি করেছিলেন, সেই একান্ত অনুভূতির কথা ব্যক্ত করেছেন। তিনি ছিলেন আদ্য বিভাগের ছাত্র। এই প্রসঙ্গে তিনি স্মৃতিচারণ করে লিখেছেন— “আদ্য বিভাগ থেকে দু’খানি কাগজ বেরুতো—বাংলায় ‘শান্তি’ এবং ইংরাজীতে ‘The Gardener’।... কাগজ বেরুলে রবীন্দ্রনাথের কাছে পাঠানো হত এবং তিনি সেগুলি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতেন।”[৫]

এছাড়াও লেখক অজিতকুমার চক্রবর্তী, নেপালচন্দ্র রায়, হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিধুশেখর শাস্ত্রী, জগদানন্দ রায় প্রমুখের সাহচর্যে বড়ো হয়েছেন। সর্বোপরি তিনি রবীন্দ্রনাথের কাছে থেকে পড়াশুনার সুযোগ পেয়েছেন। সমগ্র প্রবন্ধটিতে লেখক স্মৃতি রোমন্থন করে বাল্যাবস্থার সুখময় দিনের কথা লেখেন। শান্তিনিকেতনের পঠনপাঠনের কথা যেমন উঠে এসেছে। সেখানকার নিয়মশৃঙ্খলা, মাস্টারমশাইদের কথাও বাদ যায় নি। ফলে এই রচনাটির মধ্যে দিয়ে রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন বিষয়ে অনেক অজানা তথ্য জানা যেতে পারে।

১৯৬২ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারি সংখ্যায় বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের *‘কবিতীর্থ শান্তিনিকেতন’* প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়। শান্তিনিকেতনের বিচিত্রা প্রাঙ্গণে রবীন্দ্রশতবর্ষ উপলক্ষ্যে তিন দিন ধরে এক সাহিত্যসম্মেলন হয়। এই সম্মেলনে দুই বাংলার প্রায় শতাধিক কবি, সাহিত্যিক ও অধ্যাপক যোগদান করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে প্রাবন্ধিকও

আমন্ত্রিত ছিলেন। লেখক প্রসঙ্গক্রমে লেখেন— “কবিতীর্থে গিয়েছিলাম এক গভীর প্রত্যাশা নিয়ে। সে প্রত্যাশা আমার পূর্ণ হয়েছে।”[৬]

প্রাবন্ধিক এই রচনাটিতে চারটি অংশে বিভক্ত করে শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রশতবর্ষকে কেন্দ্র করে পালিত অনুষ্ঠানে গিয়ে তিনি যে উপলব্ধি করেছিলেন, তা ব্যক্ত করেছেন। পূর্বের স্মৃতি থাকলেও এবারের অনুষ্ঠান লেখকের কাছে অনেক বেশি স্মরণীয় হয়ে আছে। কারণ এই তিনটি দিনই তাঁর কাছে ছিল পরম আনন্দের।

শান্তিনিকেতনের প্রাকৃতিক পরিবেশের একটি অভূতপূর্ব বর্ণনা রয়েছে ১৯৬২ সালের ২০ এপ্রিল সংখ্যায় প্রকাশিত অসীম রায়-এর *‘শান্তিনিকেতন ১৯৬১’* কবিতাতে। রবীন্দ্রনাথের জন্মশতবর্ষতেও শান্তিনিকেতনের প্রকৃতি যেন সম্পূর্ণ রূপ নিয়ে ফুটে উঠেছে। সেখানে জল, জলে ছায়া, গাছ, গরু, দিনান্তের পাখী, ঘরে ফিরে চলা সাঁওতাল, মাঠ এই সবকিছুর মধ্যে দিয়ে বাংলাদেশের প্রকৃত রূপটি যেন শান্তিনিকেতনের মধ্যে প্রতিভাত হয়েছে। এমনকি কবিতার শেষেও কবির কণ্ঠে সেই আকুতি ফুটে উঠেছে—“ফের যদি বাংলাদেশ বাংলাদেশ হয়।”[৭]

১৯৭৬ সালের ৩ ডিসেম্বর সংখ্যায় অজিত বাইরীর *‘শান্তিনিকেতন ভোরের পাঠশালা’* কবিতাটি একটি স্মৃতিচারণা। তিনি লিখেছেন বীরভূমের লাল টিলা, খোয়াই মাঠের ধারে শান্তিনিকেতন অবস্থিত। এমনই প্রকৃতির মধ্যে কবি রবীন্দ্রনাথ কোনো গাছের নীচে অবসর নিতেন। তেমনি আশ্রমের ঘাসে শিষ্যদের সাথে অবনীন্দ্রনাথ শিশুর মতো নিসর্গের চিত্র রঙ ও রেখায় ফুটিয়ে তুলতেন। দীনেন্দ্রনাথ সুরে সর্বত্র ভাসিয়ে দিতেন। তাই কবি লিখেছেন—

“মাথার ওপর আশ্রমিক আকাশ; / পায়ের নীচে সবুজ ঘাস, শিশির। / শান্তিনিকেতন ভোরের পাঠশালা।”[৮]

১৯৭৭ সালের নববর্ষ সংখ্যায় শৈলজারঞ্জন মজুমদারের *‘পূর্বস্মৃতিতে শান্তিনিকেতন ও দিনেন্দ্রনাথ’* প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়। প্রবন্ধটি একটি স্মৃতিকথামূলক। ১৯৩২ সালের মার্চ মাসে প্রথম শান্তিনিকেতনে আসেন। সেখানে যাওয়ার প্রধান আকর্ষণ ছিল রবীন্দ্রনাথের গান। ১৯২৬ সালে কলেজে পড়ার সময় জোড়াসাঁকোয় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছে তিনটি গান শিখিয়েছিলেন। ১৯৩২ সালে শান্তিনিকেতনে এসে গানে যোগ দিলেন। সেই সূত্রেই বলেন— “সেখানকার প্রধান আকর্ষণ আমার কাছে ছিল গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের গান এবং সেই গানের ভিতরেই আমার জীবনের উপজীব্য খুঁজে পেয়েছি।”[৯]

গুরুরূপে পেলেন দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে। অধ্যক্ষ রবীন্দ্রনাথের সাথে সেইসময়ই প্রথম পরিচয় ঘটে। প্রবন্ধটির মধ্যে দিয়ে রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে যে সাংস্কৃতিক পরিমন্ডল তৈরি করেছিলেন, তার বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়। একইসাথে দিনেন্দ্রনাথকে কেন্দ্র করে শান্তিনিকেতনের সঙ্গীতচর্চার রূপটিও ফুটে উঠেছে।

সাপ্তাহিক ‘দেশ’:

‘দেশ’ পত্রিকার **১৯৭৮** সালের সাহিত্য সংখ্যায় অমিয় চক্রবর্তী-র *‘আত্মস্মৃতি: শান্তিনিকেতন পর্ব’* প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়েছে। এই প্রবন্ধটির ভূমিকা ও টীকা অংশটি নরেশ গুহের রচিত। তিরিশের দশকে আধুনিক কবিতার ইতিহাসে অমিয় চক্রবর্তীর নাম বিশিষ্ট হয়ে আছে। **১৯২৬** থেকে **১৯৩৩** সাল পর্যন্ত তিনি শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য সচিবের দায়িত্ব পালন করেছেন। সেই সূত্রেই বিশ্বভারতী এবং রবীন্দ্রনাথের সাথে নিবিড় সম্পর্ক গড়ে ওঠে। এই প্রবন্ধটিতে প্রাবন্ধিক বহুবিধ ঘটনার উল্লেখ করে রবীন্দ্রনাথকে এবং শান্তিনিকেতনের স্মৃতিচারণা করেছেন। সেইসাথে তাঁর জীবনে রবীন্দ্রনাথের ভূমিকা কতখানি ছিল, সে সম্পর্কে এক হৃদয়গ্রাহী বর্ণনা পাওয়া যায়।

রবীন্দ্রনাথ ও বিশ্বভারতী প্রসঙ্গ:

সাপ্তাহিক ‘অমৃত’:

১৯৬৬ সালের ৭ জানুয়ারি সংখ্যায় আশিষ সান্যালের *‘বঙ্গতীর্থ শান্তিনিকেতন’* প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়। প্রবন্ধটিতে মহর্ষির শান্তিনিকেতন প্রতিষ্ঠার সূচনাপর্ব থেকে রবীন্দ্রনাথের ব্রহ্মবিদ্যালয় স্থাপনের বর্ণনা আছে। **১৯০১** সালে পিতার অনুমতি নিয়ে রবীন্দ্রনাথ ‘ব্রহ্মবিদ্যালয়’ প্রতিষ্ঠা করেন। লেখকের বক্তব্য, “এই সময়ে রবীন্দ্র-মানস দেশের বাস্তব সমস্যায় বিশেষ বিচলিত হয়ে উঠেছিল। তাঁর মনে হয়েছিল—‘বিদ্যালয়গুলি প্রকৃত মনুষ্যত্বের সর্বাঙ্গীন বিকাশে নিয়ত না হলে দেশের কল্যাণ নাই। বহু চিন্তার পর ভারতের পুরাতন আশ্রমিক পদ্ধতিতে শিক্ষার ব্যবস্থা করার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠলেন’।”[১০]

শান্তিনিকেতনের উন্মুক্ত পরিবেশে শিশুদের শিক্ষাদান করাই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। প্রাবন্ধিক ব্রহ্মবিদ্যালয়ের পঠন-পাঠনের বর্ণনা দিয়েছেন। প্রবন্ধটির বিশ্লেষণে দেখা যায় শান্তিনিকেতনকেন্দ্রিক ভাবনায় এই রচনাটি যথেষ্ট উল্লেখযোগ্য হয়ে উঠবে। কারণ এই স্থানটির প্রতিষ্ঠা পর্বের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণী দেওয়া হয়েছে। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ যেভাবে এই ক্ষেত্রটি বিস্তৃত করেছিলেন, তার কথাও জানা যায়। একইসাথে রবীন্দ্রনাথের স্পর্শে বিশ্বভারতীর বিস্তৃতির কথাও আলোচনা করা আছে।

১৯৬৬ সালের ৭ জানুয়ারি সংখ্যাতে পূর্ণানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের *‘শান্তিনিকেতন বিদ্যালয় ও ৭ই পৌষ’* প্রবন্ধটি প্রকাশ পায়। রবীন্দ্রনাথের জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়। এই প্রতিষ্ঠানের যাত্রা শুরু হয়েছিল ১৩০৮ সালের ৭ই পৌষ। সেইসময় এর নাম ছিল বোলপুর ব্রহ্মচর্যাশ্রম। সেই ব্রহ্মচর্যাশ্রমই পরবর্তীকালের শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়, যা বর্তমানে বিশ্বভারতীতে রূপান্তরিত হয়েছে। এই বিদ্যালয়ের সঙ্গে রবীন্দ্রজীবনের যোগ যে কত গভীর, কত নিবিড় তা রবীন্দ্রনাথ নিজেই স্বীকার করে গেছেন। এ প্রসঙ্গে প্রাবন্ধিক লেখেন— “শান্তিনিকেতনে বিদ্যালয় স্থাপনের ফলে

নিজেকে প্রকাশের এবং তপোবনের আদর্শকে রূপায়িত করার সুযোগ পেলেন রবীন্দ্রনাথ।”[১১]

শান্তিনিকেতন বিদ্যালয় শুধু যে ক্রমশ বড় হয়ে উঠেছে তা নয়, কবিকে নিয়ে গেছে যুগ থেকে যুগান্তরে। বিদ্যালয়ে বিকাশের সাথে সাথে কবিরও ঘটেছে জন্মান্তর। প্রবন্ধটির আলোচনায় দেখা গেল ভাববস্তুটিতে অভিনবত্ব আছে। রবীন্দ্রনাথের কাছে শান্তিনিকেতন বিদ্যালয় স্থাপনের দিনটি যে কতটা মূল্যবান তা আলোচিত হয়েছে। এবং এই প্রতিষ্ঠানের পূর্বের যে বিরাট প্রেক্ষাপট, তার বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়। ফলে এই লেখাটি রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন বিষয়ক আলোচনার ধারার পথকে ঋদ্ধ করবে।

‘অমৃত’ পত্রিকায় ১৯৭২ সালের ২১ জানুয়ারি সংখ্যায় সুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের *‘রবীন্দ্রনাথ ও বিশ্বভারতী’* প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়েছে। প্রবন্ধটিতে রবীন্দ্রপ্রতিভার এক বিরাট সৃষ্টি বিশ্বভারতীর সৌন্দর্য নিয়ে গভীর দৃষ্টিভঙ্গিতে আলোচিত হয়। সামাজিক মহলে শান্তিনিকেতন-বিশ্বভারতীর ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা, তার আদর্শ, নিয়ম-শৃঙ্খলা রক্ষা ইত্যাদি নিয়ে নানা মতভেদ তৈরি করে। কিন্তু লেখক এসমস্ত দ্বিধা-দ্বন্দ্বকে উপেক্ষা করে এক সাধারণ রবীন্দ্রানুরাগীর মতো এই প্রতিষ্ঠানটি যাতে ভারত-সংস্কৃতিচর্চায় আরও প্রসার লাভ করে, সেই প্রার্থনাটাই জানিয়েছেন।

সাপ্তাহিক ‘দেশ’:

১৯৬৫ সালের ৭ আগস্ট সংখ্যায় শঙ্করীপ্রসাদ বসুর *‘শান্তিনিকেতন ও রবীন্দ্রনাথ’* প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়। ‘প্রবাসী’ পত্রিকাতে ১৩৪৮ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাসে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে লিখিত রবীন্দ্রনাথের একটি চিঠি আংশিকভাবে প্রকাশিত হয়। সেটিই ‘দেশ’ পত্রিকাতে ১৯৬৫ সালের ৩ জুলাই সংখ্যায় মুদ্রিত হয়। এবং সেই সংখ্যাটিতেই চিঠিটিতে কিছু তথ্য সংযোজন করা হয়েছে। এই চিঠিটির আলেখ্যেই এই প্রবন্ধটি রচিত হয়েছে।

প্রাবন্ধিক বলেছেন ‘প্রবাসী’ পত্রিকাতে প্রকাশিত কবির চিঠিটি বর্জিত আকারে প্রকাশের বিশেষ একটি কারণ ছিল। মহর্ষির গড়ে তোলা শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সার্থক স্থান হিসাবে মনে করেছিলেন। এবং তারই কারণে পিতৃদেবের অনুমতি নিয়ে ১৯০১ সালের ডিসেম্বরে ‘ব্রহ্মচর্যাশ্রম’ নাম দিয়ে একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। পরে এর নাম হয় ‘ব্রহ্মবিদ্যালয়’।

শান্তিনিকেতনের উন্মুক্ত আকাশ, আলো-হাওয়ায় শিক্ষার্থীদের শিক্ষাদান করাই কবির একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু লোক-কোলাহলের বাইরে এতদূরে এই আশ্রম প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে তৎকালীন ইংরেজ সরকারের মনে নানারকম সন্দেহ দেখা দিয়েছিল। তাঁরা এই বিদ্যালয়কে বিশেষ সুনজরে দেখলেন না। এর ফলে কোনো সরকারী কর্মচারী বা যিনি সরকারের কাছে কিছু আশা করেন, তাঁরা তাঁদের ছেলেমেয়েদের এখানে পাঠাতে চাইতেন না বা চাইলেও ভয়ে পাঠাতেন না। সরকারের ধারণা হয়েছিল

শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যবিদ্যালয় গঠনের মধ্যে ছদ্মবেশী কোনও বৈপ্লবিক প্রেরণা আছে। এরফলে রবীন্দ্রনাথ ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে কঠোর ভাষায় সমালোচনা করেছিলেন। কবির সেই সম্পূর্ণ কথা প্রকাশিত হয়নি। কিন্তু লেখক উল্লেখ করেছেন বর্তমানে সেই প্রকাশিত চিঠিটির সাথে আরও কিছু লেখা প্রকাশ পেয়েছে।

প্রবন্ধটি সম্পূর্ণ নতুন একটি ভাবনায় প্রকাশ পেয়েছে। প্রবন্ধটিতে শান্তিনিকেতনকেন্দ্রিক কবির একটি চিঠির প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ও শান্তিনিকেতনের কথা যেভাবে উঠে এসেছে, তার সবিশেষ মূল্য আছে। কারণ শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠার প্রাথমিক পর্বে যেভাবে কবিকে নানা বিরুদ্ধ অবস্থায় পড়তে হয়েছিল, সে সব তথ্য উঠে এসেছে। ফলে এই প্রবন্ধটির বিষয়বস্তু রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন বিষয়ক আলোচনায় যথেষ্ট গুরুত্ব পাবে।

১৯৬৭ সালের ৩০ ডিসেম্বর সংখ্যায় পূর্ণানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের *‘রবীন্দ্রনাথ ও হায়দারবাদ’* প্রবন্ধটি প্রকাশ পায়। শান্তিনিকেতন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর থেকে রবীন্দ্রনাথকে নানা সময়ে অর্থ সংকটে পড়তে হয়েছে। সম্পূর্ণ রিক্ত হয়ে যাওয়ার মুহূর্তে তিনি অন্যের সহানুভূতির উপর নির্ভর করেছেন। তখন অধিকাংশ মানুষই এই প্রতিষ্ঠানকে কবির বিচিত্র খেয়াল বলে মনে করতেন। তবুও কবি আশা ছাড়েননি। স্বদেশের পাশাপাশি বিদেশেও রবীন্দ্রনাথ সাহায্যের জন্য প্রার্থনা করেছেন। রবীন্দ্রনাথের বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠাপর্বে যেসব রাজপরিবার অর্থ দিয়ে সাহায্য করেছিল, তাদের মধ্যে হায়দরাবাদের নিজাম অন্যতম। এই সরকার বিশ্বভারতীর খাতে নানা সময়ে প্রচুর দান করেছে।

প্রাবন্ধিক আলোচনা করেছেন বিশ্বভারতীর জন্য হায়দরাবাদের নিজামের কাছ থেকে অর্থ সাহায্য লাভ করার জন্য যাঁর উদ্যোগ ও প্রচেষ্টা কার্যকরী হয়েছিল, তিনি হলেন কালীমোহন ঘোষ। ১৯২৭ সালের মাঝামাঝি সময়ে বিশ্বভারতীর সাথে হায়দরাবাদের যোগসূত্র গড়ে ওঠে। কালীমোহন ঘোষ নিজাম সরকারের আমন্ত্রণে হায়দরাবাদে যান। সেই সময়ে তাঁর সাথে হায়দরাবাদের প্রথম শ্রেণীর রাজপুরুষদের বিশেষ ঘনিষ্টতা হয়। তাঁদের কছে বিশ্বভারতীর আর্থিক সমস্যার দিকটি তিনি তুলে ধরেন। এমনকি তিনি শান্তিনিকেতন ও শ্রীনিকেতন সম্বন্ধে সেখানে দুটি বক্তৃতাও দেন। এরই কারণে নিজাম সরকার বিশ্বভারতী সম্পর্কে জানতে ঔৎসুক্য হয়ে ওঠে। সেই সময়ই কালীমোহন ঘোষ তাঁদের কাছে রবীন্দ্রনাথের অর্থসংকট মোচনের জন্য আবেদন করেন। এবং এরই ফলশ্রুতিতে বিশ্বভারতীর জন্য নিজাম সরকার এক লক্ষ টাকা মঞ্জুর করেন। রবীন্দ্রনাথ কৃতজ্ঞ চিত্তে সেই দান গ্রহণ করেছিলেন। ব্যক্তিগতভাবে কৃতজ্ঞতার জন্যেই কবি হায়দরাবাদেও যান। লেখক বলেছেন—

“১৬ ডিসেম্বর কিং কোর্ট প্যালেসে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে মহামান্য নিজাম বাহাদুরের বহু-প্রতীক্ষিত সাক্ষাৎ ঘটল—বিশ্বভারতীর জন্যে নিজামের এক লক্ষ টাকা দানের কথা

স্মরণ করে কবি তাঁকে ব্যক্তিগতভাবে আন্তরিক ধন্যবাদ জানালেন এবং বিশ্বভারতীর উন্নতিকল্পে নিজাম বাহাদুরের আর্থিক সাহায্য রবীন্দ্রনাথ সেদিন একান্তভাবে কামনা করেছিলেন।”[১২]

এরপরে বলা হয়েছে রবীন্দ্রনাথ বেশ কয়েকদিন সেখানে অতিবাহিত করেন ও নানা অনুষ্ঠানের মধ্যে তিনি ব্যাপৃত ছিলেন। একইসাথে হায়দরাবাদের দ্রষ্টব্য স্থানগুলি পরিভ্রমণের পাশে বিশ্বভারতীর জন্য অর্থ সংগ্রহের কাজ করে যাচ্ছিলেন। প্রবন্ধটির বিষয়বস্তু খুবই মূল্যবান। শান্তিনিকেতন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রাথমিক পর্বে রবীন্দ্রনাথকে যে বহু সমস্যায় পড়েছিলেন, তার মধ্যে বিশেষ একটি হল অর্থ সংকট। সেই অবস্থায় কবির পাশে এগিয়ে আসা ব্যক্তি বা সংস্থার কথা নানাভাবে জানা যায়। তারই একটি বিষয় নিয়ে এই প্রবন্ধটি রচিত হয়েছে। ফলে রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন বিষয়ক আলোচনায় এই প্রবন্ধটির গুরুত্ব থাকবে।

১৯৬৯ সালের ২৬ এপ্রিল থেকে ৩১ মে পর্যন্ত একটি ধারাবাহিক সংখ্যায় নেপাল মজুমদারের *‘বিশ্বভারতীর বন্ধু গান্ধীজী’* প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শান্তিনিকেতন বিদ্যালয় (বিশ্বভারতী) পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠা পেতে নানা উত্থান-পতনের মধ্যে দিয়ে অগ্রসর হতে হয়েছে। বিশ্বভারতীর আর্থিক সংকট চরম পর্যায়ে উপনীত হলে ১৯৩৫ সালে কবি গান্ধীজীর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করেন। ১৯৩৬ সালে গান্ধীজী ৬০ হাজার টাকার চেক পাঠান, এমনকি ১৯৩৭ সালে তের হাজার টাকার চেক দেন। ১৯৪০ সালে রবীন্দ্রনাথের আহ্বানে গান্ধীজী শান্তিনিকেতনে দুদিনের জন্য আসেন। সেইসময় বিশ্বভারতীর ভবিষ্যৎ নিয়ে উভয়ের মধ্যে নানা আলোচনা চলে। গান্ধীজী যথাসাধ্য সাহায্য করবেন বলে প্রতিশ্রুতি দেন। রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর তিনি সুষ্ঠভাবে পরিচালনার জন্য পরিচালক মন্ডলীকে আবেদন করেন। গান্ধীজীর তিরোধানের পর ১৯৫১ সালে বিশ্বভারতী কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হয় ।

এই দীর্ঘ প্রবন্ধটির মধ্যে দিয়ে রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের প্রাথমিক পর্বে কবি যেসব সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিলেন তার মধ্যে অর্থ সংকট প্রধানতম, সেই নিয়েই আলোচিত হয়েছে। সেই পরিস্থিতিতে কবি নানা ব্যক্তির মধ্যে গান্ধীজী-র কাছেও অর্থের জন্য প্রার্থনা করেছিলেন। এবং কবির সেই আবেদন ব্যর্থ হয়নি। গান্ধীজীর সাথে কবির একইসাথে বিশ্বভারতীর সম্পর্ক কতটা গভীরে তা দেখানো হয়েছে। ফলে এই প্রবন্ধটির বিষয়বস্তু রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন বিষয়ক আলোচনার ধারায় খুবই মূল্য পাবে।

১৯৬৯ সালের ২০ সেপ্টেম্বর সংখ্যায় ‘দেশ’ পত্রিকায় অশোক রুদ্র-র *‘শান্তিনিকেতনের হাওয়া এবং বিশ্বভারতীর ভবিষ্যৎ’* প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের এক স্বপ্নলব্ধ স্থান শান্তিনিকেতন। বহু বছরের পরিশ্রমে বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। প্রাবন্ধিক সংশয় প্রকাশ করে বলেছেন— “যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটির জন্য

জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত সেই ভগ্নস্বাস্থ্য বৃদ্ধটি উদ্বেগে জর্জর রইলেন তার জন্য এতটুকু চিন্তা এতটুকু প্রয়াস কি বাঙালীর মাঝে দেখা দিয়েছে?”[১৩]

লেখকের মনে হয়েছে এই শান্তিনিকেতন ও বিশ্বভারতী সম্পর্কে বর্তমানে বাঙালির কাছে এক অন্য অর্থ বহন করে। শান্তিনিকেতন এখন পর্যটন কেন্দ্র হিসাবে গড়ে উঠেছে। বিশ্বভারতী পরিচিত হয়ে আছে বিশ্ববিদ্যালয় বলে। অথচ এইখানে ভবিষ্যতে উচ্চতর গবেষণা কেন্দ্র হিসাবে গড়ে তোলা যেতে পারে। শান্তিনিকেতন বিদ্যালয় সম্পর্কে এক ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গিতে প্রবন্ধটি আলোচনা হয়েছে।

১৯৭৪ সালের ২৭ জুলাই সংখ্যায় নেপাল মজুমদার-এর *‘বিশ্বভারতী বন্ধু লিওনার্ড এলমহারস্ট’* প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়। ১৯২১ সালের মার্চ মাসে মিসেস মুডির গৃহে রবীন্দ্রনাথের সাথে এলমহারস্টের প্রথম সাক্ষাৎ হয়। সেখানেই কবি তাকে আহ্বান জানান শান্তিনিকেতনে পল্লি-পুনর্গঠনের জন্য। এলমহারস্টের তত্ত্বাবধানেই সুরুলের কুঠিবাড়িকে কেন্দ্র করে বিশ্বভারতীর পল্লি সংগঠন কেন্দ্র গড়ে ওঠে। রবীন্দ্রনাথের ভাবধারাকে গ্রহণ করে তিনি বিলাতে ডার্টিংটন হল নির্মাণ করেন। এই ডার্টিংটন হল বিদেশের শ্রীনিকেতন। প্রাবন্ধিক কবি বন্ধু এলমহার্স্টের কথা বলা হয়েছে। এবং সেই সাথে শান্তিনিকেতনে পল্লি-পুনর্গঠনে তাঁর অবদানের কথা জানা যায়। কেবল মাত্র শান্তিনিকেতনেই না বিদেশে এই প্রতিষ্ঠানের আদর্শে আর একটি কেন্দ্র গড়ে তুলে কবির ক্ষেত্রটি বাড়িয়ে তুলেছিলেন। এইসব নানা তথ্য সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়া যায়।

১৯৭৭ সালের ৬ আগস্ট সংখ্যায় শান্তিদেব ঘোষের *‘বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠাপর্বে রবীন্দ্রবিরোধিতা’* প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ বহুভাবে জানিয়েছেন দেশের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির কথা চিন্তা করে যে কটি গঠনমূলক কাজের প্রস্তাব দেশনেতাদের কাছে করেছিলেন, তার পূর্ণ সমর্থন তাঁদের কাছ থেকে পাননি। বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠাকালেও তিনি ভারতের যুগোপযোগী নতুন এক শিক্ষাধারা প্রবর্তনের ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। সঙ্গীত, চিত্রকলা সহ নানা বিদ্যায় ভারতের শিশুদের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির কর্মপ্রচেষ্টা এবং পাশ্চাত্য জ্ঞানের সঙ্গে ভারতীয় জ্ঞানের যোগরক্ষাকারী উপযোগী কেন্দ্র হিসাবে তিনি একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তখন দেশের শিক্ষিতদের একদল রবীন্দ্রনাথের এই শিক্ষাচিন্তাকে স্বীকৃতি দিতে চাইলেন না। বরং বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তুললেন। কবি দেশবাসীর এই মনোভাবের জন্য দুঃখ পেলেন। তাই বলে তিনি বিশ্বভারতীর কাজ বন্ধ রাখেন নি। এই প্রসঙ্গে প্রাবন্ধিক বলেছেন:

“এ যুগের রবীন্দ্রানুরাগী জনসাধারণের ধারণা গুরুদেবের মত মনীষীর প্রতি দেশবাসীর প্রবল অনুরাগের কখনো অভাব ঘটেনি। একথা যে সর্বাংশে যথার্থ নয়, তাঁকেও যে মাঝে মাঝে প্রবল প্রতিকূলতার সম্মুখীন হতে হয়েছিল, সে কথাও সকলের জানা

দরকার। তাই বিশ্বভারতীর বিরুদ্ধে কি কারণে এবং কিভাবে শিক্ষিত দেশবাসীর এক দল আন্দোলন তুলেছিলেন এবং গুরুদেবের মন সেই কারণে কতখানি ব্যথিত হয়েছিল, তারই একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেবার চেষ্টা করেছি এই প্রবন্ধটিতে।"[১৪]

এই প্রবন্ধটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি রচনা। কারণ বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাকালে কবিকে কিরূপ সমস্যায় পড়তে হয়েছিল, তারই একটি রূপরেখা এই লেখার মধ্যে দিয়ে পাওয়া যায়। একইসাথে কবির জীবৎকালে দেশের একশ্রেণীর শিক্ষিত মানুষের কবির প্রতি মনোভাবের স্বরূপটি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

১৯৭৮ সালের ১২ আগস্ট সংখ্যায় চিত্তরঞ্জন দেবের *'বিশ্বভারতীর কর্মধারা প্রবর্তনে রবীন্দ্রনাথের স্বলিখিত নির্দেশ'* প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিশ্বভারতীর কর্মধারা সম্পর্কে বহু তথ্য বিভিন্ন ব্যক্তিকে প্রেরিত চিঠিপত্র ও পান্ডুলিপি থেকে পাওয়া যায়। সেখানে বিদ্যাভবন, কলাভবনের পাঠ্যক্রমের আলোচনার পাশাপাশি আচার্য, ছাত্র এবং অধ্যাপকদের কর্তব্যের নির্দেশ করা হয়েছে। সবিস্তারে বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যাবলি বিষয়ে একটি বিশদ ধারণা পাওয়া যায়।

অনান্য রচনা:

সাপ্তাহিক 'অমৃত':

১৯৬৮ সালের ৯ ফেব্রুয়ারি সংখ্যায় দিলীপ মালাকারের *'শান্তিনিকেতনের সঙ্গীত ও কলাভবনে কয়েকদিন'* প্রবন্ধটি প্রকাশ পায়। প্রাবন্ধিক দেখিয়েছেন শান্তিনিকেতনে অনুষ্ঠিত সমস্ত উৎসবগুলিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্ত বিভাগ নানাভাবে জড়িত থাকে। সঙ্গীত, নৃত্য, কলাভবন সব একইসাথে কাজ করে। প্রাবন্ধিক দিলীপ মালাকার উৎসবের কয়েকদিন শান্তিনিকেতনের সঙ্গীত ও কলাভবনে কাটিয়েছেন। তাদের উৎসবকে কেন্দ্র করে যে বিরাট আয়োজন, তা দেখে তিনি বিস্মিত হয়ে লিখেছেন— "উৎসবের আগে ও পরে এদের শিল্পচর্চা চলে সমানভাবে। উৎসবকে সার্থক করে তোলার জন্যে সঙ্গীত ও কলা ভবনের সবাই প্রাণ-মন ঢেলে দিয়ে কাজে লাগে।"[১৫]

প্রবন্ধটিতে এখানে রবীন্দ্রনাথের প্রসঙ্গ সেভাবে প্রত্যক্ষভাবে আলোচনা হয়নি। তবে কবি যেভাবে তাঁর প্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয়ে নানা পরিকল্পনা করেছিলেন, তারই বাস্তব চিত্র যেন এখানে ফুটে উঠেছে। ফলে এটি একটি ভিন্ন ধরণের রচনা। যা রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন আলোচনার ধারায় নতুনত্ব আনবে।

১৯৭৬ সালের ২৪ ডিসেম্বর সংখ্যায় অমিতাভ গুপ্ত-এর *'জাপানী শান্তিনিকেতন'* এবং ১৯৭৮ সালের বিনোদন সংখ্যায় অরুণা সেনগুপ্ত-এর 'অস্তাচলের আগে শান্তিনিকেতন', 'অমৃত' পত্রিকায় বিশেষ উল্লেখযোগ্য দুটি প্রবন্ধ। একটিতে রয়েছে রবীন্দ্রনাথ এবং শান্তিনিকেতন জাপানিদের কাছে কতখানি হৃদয়ের, তার বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়। অন্যটিতে রবীন্দ্রসৃষ্টির এক বিরাট রূপ শান্তিনিকেতনের ভবিষ্যৎ কর্মপন্থার দিকটি নিয়ে আলোচিত হয়েছে।

সাপ্তাহিক 'দেশ':
১৯৬১ সালের ৬ মে সংখ্যায় শান্তিদেব ঘোষের *'শান্তিনিকেতনের নৃত্য-আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথের দান'* প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়েছে। সাধারণ শিক্ষার সাথে সঙ্গীত ও নৃত্যকলার যোগসূত্র ঘটানোর পরিকল্পনা বিংশ শতাব্দীর শিক্ষাবিদদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরই সর্বপ্রথম করেন। প্রাবন্ধিক লেখেন— "সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে ললিতকলা, সঙ্গীত ও নৃত্যের যে বিশেষ স্থান থাকা দরকার একথা তিনি কেবল একটা বড় আদর্শ হিসাবেই প্রচার করলেন না, শান্তিনিকেতনের সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে তার স্থান করে দিয়ে মানুষের সমাজে তার প্রয়োজনীয়তার প্রমাণ দিলেন।"[১৬]

প্রাবন্ধিক দেখিয়েছেন আমৃত্যু তিনি গানের সঙ্গে সামঞ্জস্য করে সঠিক নৃত্যভঙ্গি বা নৃত্যাভিনয় নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছিলেন। মণিপুরি, কথাকলি, বাউল, সিংহলের ক্যান্ডি নাচ, ভারতনাট্যম, কত্থক– সমস্ত নৃত্যকলা গ্রহণের মধ্যে দিয়ে তিনি সমন্বয় সাধন করতে চেয়েছিলেন। বহু নৃত্যধারার সমাবেশে শান্তিনিকেতনের নৃত্য-আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে সমগ্র দেশবাসীর কাছে তাঁর সমন্বয়ী আদর্শকে তুলে ধরতে চেয়েছিলেন। রচনাটির মধ্যে দিয়ে কবির বিশ্ববোধের এক পরিচয় পাওয়া যায়। একটি কেন্দ্রে সমগ্র দেশের সংস্কৃতির মেলবন্ধন ঘটাতে চেয়েছিলেন। এই উদার মানসিকতার রূপটি প্রাবন্ধিক সুনিপুণভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন।

১৯৬৬ সালের **২৯** ফেব্রুয়ারিতে অশোকা সিংহার *'শান্তিনিকেতনে সতীর্থ ইন্দিরা'* প্রবন্ধটি প্রকাশ পায়। প্রবন্ধটিতে শান্তিনিকেতনের পরিবেশে ইন্দিরা নেহেরুর শিক্ষাকালীন সময়ের কথা আলোচিত হয়েছে। তিনি শান্তিনিকেতনে **১৯৩৪** সালে পড়াশুনার সূত্রে আসেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত বিনম্র, মাধুর্য্যতায় পূর্ণ, আত্মনির্ভরশীল। ইন্দিরার চরিত্র, মানসিকতা শান্তিনিকেতনবাসীদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ সহ অনান্যদের মুগ্ধ করে দিয়েছিল।

১৯৬৬ সালের **১৪** মে সংখ্যায় পূর্ণানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের *'শান্তিনিকেতনের নন্দলাল'* প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়েছে। নন্দলালের সাথে রবীন্দ্রনাথের প্রথম সাক্ষাৎ হয় **১৯০৯** সালে। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কারণে উভয়ের সাথে সাক্ষাৎ হয়। রবীন্দ্রনাথের জীবনে, সাহিত্যে, কর্মে নন্দলাল বসু ভীষণভাবে জড়িয়ে ছিলেন। শিলাইদহ বাসকালে একসময় তিনি কবির সাথে সেখানে কিছুদিন অতিবাহিত করেছিলন। **১৯১৯** সালে নন্দলাল শান্তিনিকেতনের সাথে যুক্ত হয়।

প্রাবন্ধিক আলোচনা করেছেন রবীন্দ্রনাথের আহ্বানেই নন্দলাল শান্তিনিকেতন বিদ্যলয়ের যোগ দেন। এবং সুরেন্দ্রনাথ, অসিতকুমার ও তার উদ্যোগে তৈরি হয় শান্তিনিকেতন কলাভবন। ক্রমে এই ভবনটির প্রভূত উন্নতি ঘটে নন্দলালের স্পর্শে। এমনকি শান্তিনিকেতনে প্রবর্তিত রবীন্দ্রনাথের নানা অনুষ্ঠানের সাথে তিনি প্রত্যক্ষ যুক্ত

থাকতেন। প্রবন্ধটিতে শান্তিনিকেতনের পরিবেশে নন্দলালের আসার পূর্ব থেকে ও পরবর্তীকালে সেখানে নানাকর্মের সাথে নিজেকে জড়িয়ে যে কর্মোদ্যগী হয়ে পড়েছিলেন, সেসব কথাই ব্যক্ত হয়েছে।

১৯৭২ সালের ১ এপ্রিল সংখ্যায় পূর্ণানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের *‘শান্তিনিকেতনে জাপানি রবীন্দ্রনুরাগীদের সান্নিধ্যে কিছুক্ষণ’* প্রবন্ধটি প্রকাশ পায়। জাপানের টোকিয় থেকে আসা কুড়িজন রবীন্দ্রানুরাগী শান্তিনিকেতনে এক বসন্তোৎসবে আসেন। প্রাবন্ধিক তাঁদের সান্নিধ্যে কাটান। তাঁরা টোকিয়োর ভারত-জাপান রবীন্দ্রসমিতির সদস্য-সদস্যা। এই বিদেশীদের মধ্যে দশজন ছাত্র-ছাত্রী এবং বাকিদের মধ্যে ছিলেন কেউ অধ্যাপক, কেউ সাময়িক পত্রিকার সম্পাদক কিংবা রবীন্দ্র-রচনাবলীর প্রকাশক। তাঁরা ভারত পর্যটন করতে এসে সর্বপ্রথমেই শান্তিনিকেতনে আসেন। তাঁদের মধ্যে দলনেতা হয়ে ছিলেন বিশ্বভারতীর প্রাক্তন জাপানী অধ্যাপক শ্রীকাজুও আজুমা। তাঁদের ইচ্ছা শান্তিনিকেতনে চীন ভবনের ধাঁচে একটা ‘নিপ্পনভবন’ স্থাপন করার। এই বিষয়ে তাঁরা প্রধানমন্ত্রী ও বিশ্বভারতীর আচার্য শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীকে পত্র লিখেছেন। এই প্রসঙ্গে লেখক বলেছেন:

“ভারত সরকার ও বিশ্বভারতীর অনুমোদন পেলে ভারত-জাপান রবীন্দ্র সমিতি এবং শান্তিনিকেতন বান্ধব সমিতি একযোগে নিপ্পন ভবনের জন্যে প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহের কাজ আরম্ভ করবেন।”[১৭]

তবে প্রাবন্ধিকের সাথে তাঁদের আলোচনায় উঠে এসেছে এই অর্থ তাঁরা জাপান থেকেই তুলে দিতে পারবে। জাপানের রবীন্দ্রানুরাগীরাই এই সাহায্যে এগিয়ে আসবে। এরপরে প্রবন্ধটিতে বহু জাপানি রবীন্দ্রভক্তের কথা আলোচিত হয়েছে। একইসাথে সেখান থেকে কবির রচনাবলী প্রকাশের কথাও জানা যায়। জাপানের মানুষদের হৃদয়ে কবি কতখানি অধিকার করে আছে তার দৃষ্টান্ত স্বরূপ এই প্রবন্ধটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। একইসাথে বিশ্বভারতীতে জাপানিদের দ্বারা নির্মিত ভবনের ইতিহাস সম্বন্ধেও আলোকপাত করা হয়েছে। ফলে এই রচনাটির বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

১৯৭২ সালের ১৩ মে সংখ্যায় নেপাল মজুমদারের *‘শিলাইদহে দ্বিতীয় শান্তিনিকেতন’* প্রবন্ধটি প্রকাশ পেয়েছে। রবীন্দ্রনাথের স্মৃতি বিজড়িত স্থান হল শিলাইদহ। রবীন্দ্রজীবনে, সাহিত্যে যার স্থান বিশেষভাবে প্রতিষ্ঠিত। ১৯৪০ সালে নিখিল বঙ্গ পল্লীসাহিত্য সম্মেলনে এই কুঠিবাড়িকে জাতীয় সম্পদ হিসাবে সংরক্ষণের প্রস্তাব করা হয়েছিল। সেই কারণে বর্তমানের বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শিলাইদহকে দ্বিতীয় শান্তিনিকেতন গড়ে তোলার কথা ঘোষণা করেছেন। বাংলাদেশের মানুষদের কবির প্রতি গভীর ভালোবাসার কারণে তিনি এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বলে জানা যায়। প্রবন্ধটিতে রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতনের কথা প্রত্যক্ষভাবে আলোচিত হয়নি। তবে শান্তিনিকেতনের দ্বারা প্রভাবিত হয়েই কবির স্মৃতি বিজড়িত স্থান শিলাইদহকে

নতুনভাবে সাজিয়ে তোলার কথা জানা গেছে। তাই এই রচনাটি শান্তিনিকেতন বিষয়ে অন্য একটি ধারণা দেয়, যা অতীব গুরুত্বপূর্ণ।

১৯৭২ সালের ২০ মে সংখ্যায় হীরেন্দ্রনাথ দত্তের *'শান্তিনিকেতনের ইন্দিরা'* প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্রনাথের বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে তোলার পিছনে এক মহৎ আদর্শ ছিল। যত্র বিশ্বং ভবেত্যকনীড়ম—সেই নীড় যার পরিচয় বিশ্বভারতী রূপে। বিশ্বের সকল জাতির মধ্যে মৈত্রীবন্ধনই হল বিশ্বভারতীর মূল নীতি।

প্রাবন্ধিক দেখিয়েছেন শান্তিনিকেতনে ইন্দিরা গান্ধী ১৯৩৪-এর জুলাই থেকে ১৯৩৫-এর এপ্রিল পর্যন্ত মাত্র এক বছর পড়াশুনা করেছিলেন। সেই অল্পদিনেই শান্তিনিকেতনের সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক গড়ে তুলেছিলেন। এবং শান্তিনিকেতনের শিক্ষার প্রকৃত মর্মটুকু উপলব্ধি করেন। কবির আদর্শ ও বিশ্বভারতীর মূল নীতির দ্বারা তিনি প্রভাবিত হন। তাই প্রাবন্ধিক বলেছেন ইন্দিরা গান্ধী প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর তাঁর পররাষ্ট্রনীতি ওই আদর্শের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। প্রবন্ধটির মধ্যে দিয়ে রবীন্দ্রনাথের আদর্শ ও শান্তিনিকেতনের পরিবেশ এক বিখ্যাত মানুষের জীবনকে কিভাবে প্রভাবিত করেছিল, সে বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। তাই রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন বিষয়ক আলোচনার ধারাতে এই প্রবন্ধটি সবিশেষ গুরুত্ব রাখবে।

১৯৭৪ সালের ২২ জুন সংখ্যায় ইন্দ্রানী গুপ্ত-র *'শান্তিনিকেতনের গোঁসাইজী'* প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের মধ্যে প্রাচীন আশ্রমিক শিক্ষাকে বাস্তবায়িত করেছিলেন। প্রাবন্ধিকের মতে কবির পরবর্তীযুগে গোসাঁইজী সেই শিক্ষার আর্দশকে একমাত্র ধরে রেখেছিলেন। প্রাবন্ধিক হলেন এনার ছাত্রী। পরবর্তী অধ্যায়ে তিনি গোঁসাইজির ক্লাসে রবীন্দ্রসাহিত্য পাঠদানের স্মৃতিকথা লিপিবদ্ধ করেছেন। প্রবন্ধটির মধ্যে দিয়ে শান্তিনিকেতনের শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ে আলোচনা হয়েছে।

১৯৭৮ সালের ৫ আগস্ট সংখ্যায় দেবীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়ের *'শান্তিনিকেতন: উত্তরায়ণের উদ্যান'* প্রবন্ধটি প্রকাশ পায়। শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথ থাকার জন্য কয়েকটা বাসস্থান নির্মান করেন। উত্তরায়নের বাড়িটা সবথেকে আদি বাড়ি। প্রবন্ধের প্রথমেই উত্তরায়ণের ঘরবাড়ি এবং সেখানকার গাছপালার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। একইসাথে আলোচিত হয় বাড়িগুলি কোন দেশের কোন শৈলীর আদর্শে নির্মাণ করা হয়েছে এবং এখানকার গাছগুলি কোথা থেকে সংগ্রহ করা হয়েছিল, তার বিবরণও পাওয়া যায়।

১৯৭৮ সালের ৫ আগস্ট সংখ্যায় অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য-এর '*শ্যামলী: কবির 'শেষ বেলাকার ঘরখানি'* প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়েছে। শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শ্যামলী নামে মাটির বাড়িটি জীবনের শেষ বেলায় নির্মাণ করেন। বাড়িটি নির্মিত হওয়ার পরের বছরে 'শ্যামলী' কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়। নির্মাণকার্যের সমস্ত খরচের

সংবাদ রবীন্দ্রভবন সংগ্রহালয়ে রক্ষিত হয়েছে। বাড়িটির সাথে কবির মনের যোগ রয়েছে গভীরে। তথ্যমূলক রচনা হিসাবে এই লেখাটির গুরুত্ব আছে।

১৯৭৮ সালের সাহিত্য সংখ্যায় অনুকণা খাস্তগীরের *‘শিশুবিভাগ-শান্তিনিকেতন’* প্রবন্ধটি প্রকাশ পায়। রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনের ব্রহ্মচর্য-আশ্রম শিশুশিক্ষার জন্য স্থাপন করেন। কিন্তু প্রথমদিকে ছাত্রসংখ্যা খুবই কম ছিল। ক্রমে দীর্ঘ প্রচেষ্টার পর সেই বিদ্যালয় পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠা পায়। প্রবন্ধটিত্র এই শিশুবিভাগের প্রারম্ভকাল থেকে নানা কার্যকলাপের বর্ণনা পাওয়া যায়।

১৯৭৯ সালের ২৮ জুলাই সংখ্যায় দেবীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়ের *‘উত্তরায়ণে কবির বাসগৃহ’* প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়। কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জীবনের শেষদিকে উত্তরায়ন পরিমন্ডলীতে বেশ কয়েকটা বাড়ি নিমার্ণ করেছিলেন। কোণার্ক, উদয়ন, চিত্রভানু, শ্যামলী, পুনশ্চ, উদীচী নামে। এই বাড়িগুলির পরিকল্পনাতে কবির কাছের ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের প্রভাব আছে। এবং একইসাথে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যের বিভিন্ন শৈলীর দ্বারাও প্রভাবান্বিত হতে দেখা যায়। প্রবন্ধটিতে কবি নির্মিত এই বাড়িগুলির কথাই আলোচিত হয়েছে।

উপসংহার:

১৯৬১ সাল থেকে **১৯৮০** সাল পর্যন্ত ‘অমৃত’ পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এই দীর্ঘ সময়ে রবীন্দ্রচর্চাকে কেন্দ্র করে পত্রিকাটির পৃষ্ঠায় নানা প্রবন্ধ রচিত হয়েছে। ব্যতিক্রম ঘটেনি সাপ্তাহিক সাহিত্য পত্রিকা ‘দেশ’-এর ক্ষেত্রেও। সাহিত্যের বিভিন্ন মহলে রবীন্দ্রনাথ এবং বিশ্বভারতী প্রসঙ্গ বিশেষ একটি আলোচ্য বিষয়। তাই এই দুটি পত্রিকায় প্রকাশিত রবীন্দ্রজীবনের এক বিশেষ অধ্যায়কে তুলনামূলক বিচার করা হয়েছে।

বিস্তৃত আলোচনায় রবীন্দ্রপ্রসঙ্গে বহু অজানা তথ্য উঠে এসেছে। যা সাহিত্যমূল্যেও বিচার্য হয়ে ওঠে। ‘অমৃত’ ও ‘দেশ’-এর রচনাগুলিতে বিষয় ভাবনায় যেমন বৈচিত্রতা লক্ষ্য করা যায়, সমতাও কম নয়। তবে দৃষ্টিভঙ্গি ও উপস্থাপনাতে রয়েছে স্বাতন্ত্র্য। দুই পত্রিকার শান্তিনিকেতনের উৎসবগুলির বিবরণের মধ্যে দিয়ে বছরের প্রারম্ভ সময় থেকে বর্ষশেষ পর্যন্ত প্রতিটি অনুষ্ঠানের একটি সামগ্রিক ধারণা পাওয়া যায়। স্মৃতিচারণায় রবীন্দ্রনাথ এবং বিশ্বভারতীর কথা প্রাবন্ধিকরা যেভাবে তুলে ধরেছেন, তা অত্যন্ত মনোগ্রাহী। এছাড়াও বিশ্বভারতী সম্পর্কীয় বিবিধ রচনাগুলিও গবেষণামূলক।

সামগ্রিকভাবে পর্যালোচনার নিরিখে বলা যায়, রবীন্দ্রনাথ ও বিশ্বভারতী বিষয়ক ভাবনায় দুটি পত্রিকার রচনাগুলিই সমানভাবে গুরুত্ব পেয়েছে। প্রবন্ধের সংখ্যার বিচারে ‘দেশ’-এর তুলনায় ‘অমৃত’ পত্রিকায় কিছুটা কম। তথাপি এ কথা অনস্বীকার্য যে রবীন্দ্রসাহিত্য আলোচনায় বা বিশ্বভারতী সংক্রান্ত গবেষণায় ‘দেশ’ পত্রিকা যেমন আলোচ্য হয়ে উঠবে, তেমনভাবেই একই মূল্যে ‘অমৃত’-এ প্রকাশিত প্রবন্ধরাশি রবীন্দ্রসাহিত্যধারায় নতুন তথ্য প্রদানে বিশেষ ভূমিকা রাখবে।

তথ্যপঞ্জী:

১. অমৃত, ১৩ অক্টোবর, ১৯৬১, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, 'বনমহোৎসব ও রবীন্দ্রনাথ', পৃ. ৮৩০
২. অমৃত, ৯ ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৮, বিশ্বজিৎ রায়, 'শান্তিনিকেতনের উৎসব', পৃ. ৮৬
৩. দেশ, ৫ আগস্ট, ১৯৬১, পূর্ণানন্দ চট্টোপাধ্যায়, 'বাইশে শ্রাবণ ও বৃক্ষরোপণ উৎসব', পৃ. ৫৩
৪. দেশ, ৩০ জুলাই, ১৯৭৭, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, 'রবীন্দ্রনাথের বর্ষাকাব্য ও শান্তিনিকেতনের বর্ষামঙ্গল', পৃ. ২২
৫. অমৃত, ১৬ জুন, ১৯৬১, অবনীনাথ রায়, 'আমাদের সময়কার শান্তিনিকেতন', পৃ. ৪৯৫
৬. অমৃত, ১৬ ফেব্রুয়ারি, ১৯৬২, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, 'কবিতীর্থ শান্তিনিকেতন', পৃ. ১৯২
৭. অমৃত, ২০ এপ্রিল, ১৯৬২ সাল, অসীম রায়, 'শান্তিনিকেতন ১৯৬১'
৮. অমৃত, ৩ ডিসেম্বর, ১৯৭৬ সাল, 'শান্তিনিকেতন ভোরের পাঠশালা', পৃ. ৮
৯. অমৃত, নববর্ষ সংখ্যা, ১৯৭৭ সাল, শৈলজারঞ্জন মজুমদার 'পূর্বস্মৃতিতে শান্তিনিকেতন ও দিনেন্দ্রনাথ', পৃ. ৫৬
১০. অমৃত, ৭ জানুয়ারি, ১৯৬৬, আশিষ সান্যাল, 'বঙ্গতীর্থ শান্তিনিকেতন', পৃ. ৭৪৯
১১. অমৃত, ৭ জানুয়ারি, ১৯৬৬, পূর্ণানন্দ চট্টোপাধ্যায়, 'শান্তিনিকেতন বিদ্যালয় ও ৭ই পৌষ', পৃ. ৭৫২
১২. দেশ, ৩০ ডিসেম্বর, ১৯৬৭, পূর্ণানন্দ চট্টোপাধ্যায়, 'রবীন্দ্রনাথ ও হায়দারবাদ', পৃ. ৯১৪
১৩. দেশ, ২০ সেপ্টেম্বর, ১৯৬৯, অশোক রুদ্র, 'শান্তিনিকেতনের হাওয়া এবং বিশ্বভারতীর ভবিষ্যৎ', পৃ. ৭৫১
১৪. দেশ, ৬ আগস্ট, ১৯৭৭, শান্তিদেব ঘোষ, 'বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠাপর্বে রবীন্দ্রবিরোধিতা', পৃ. ১৭
১৫. অমৃত, ৯ ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৮, দিলীপ মালাকার, 'শান্তিনিকেতনের সঙ্গীত ও কলাভবনে কয়েকদিন', পৃ. ৮৯
১৬. দেশ, ৬ মে, ১৯৬১, শান্তিদেব ঘোষ, 'শান্তিনিকেতনের নৃত্য-আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথের দান', পৃ. ১০১
১৭. দেশ, ১ এপ্রিল, ১৯৭২, পূর্ণানন্দ চট্টোপাধ্যায়, 'শান্তিনিকেতনে জাপানি রবীন্দ্রনুরাগীদের সান্নিধ্যে কিছুক্ষণ', পৃ. ৮৭১

সাম্প্রতিক বাংলা উপন্যাসে শ্রীচৈতন্যদেব

রবীন্দ্রনাথ মণ্ডল
গবেষক, কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলা বিভাগ,
বেনারস, উত্তর প্রদেশ

সারসংক্ষেপ : বাংলা তথা ভারতীয় সমাজ, সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে এক প্রবাদপ্রতিম ব্যক্তি হলেন শ্রীচৈতন্যদেব (১৪৮৬-১৫৩৩)। গৌড়ীয় বৈষ্ণব ভক্তদের কাছে তিনি অবতার রূপে পূজিত ছিলেন। মধ্যযুগে চরিত সাহিত্যে শ্রীচৈতন্যদেবকে দেখতে পাই তাত্ত্বিক রূপে,ভক্তের দৃষ্টিতে ভগবান রূপে পূজিত হন। তাঁর দিব্য জীবন অলৌকিকতায় মোড়া। মহামানব শ্রীচৈতন্যদেবের মূল্যায়ন সঠিক ভাবে হয়নি বলেই তাঁকে নিয়ে আজও লেখা লেখি। পাঁচশো বছর পর জীবনী সাহিত্য নয়, প্রবন্ধ, কাব্য, নাটক নয় উপন্যাসের আঙ্গিনায় একালের ঔপন্যাসিকরা চৈতন্যদেবকে হাজির করেছেন একালের দৃষ্টিতে। এই চৈতন্য কেন্দ্রিক উপন্যাসগুলিতে চৈতন্যদেবের জন্ম রহস্য, ব্যক্তি ও পারিবারিক জীবন, সন্ন্যাস প্রসঙ্গ, লৌকিক ও অলৌকিক কাহিনি, শেষ জীবনে পরিণতি কি হয়েছিল? ইত্যাদি নানা প্রসঙ্গ আলোকপাত করা হবে। আজকের প্রেক্ষাপটে ঔপন্যাসিকরা তাঁকে কেমন ভাবে দেখেছেন, কি প্রসঙ্গ নিয়ে লিখেছেন এবং উপন্যাসগুলির গুরুত্ব কতখানি তা বিচার ও বিশ্লেষণ করে দেখা হবে মূল প্রবন্ধে।

সুচক শব্দ : সাম্প্রতিক, চৈতন্যদেব,অবতার,মানবায়ন, অন্তর্ধান।

মূল প্রবন্ধ :

> "সেদিনকার সমগ্র বাংলাদেশের বিরাট এক অংশকে নতুন আবেগে আনন্দে নবোন্মাদনায় মাতিয়ে তুলেছিলেন। যে মানুষের মধ্যে বড়ো জীবনের প্রকাশ ঘটে, সেই মানুষের উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব ও চরিত্র সমগ্র জাতির চেতনাকে প্রবলভাবে নাড়া দিয়ে জাগিয়ে দেয়। সেই বড়ো-জীবনের মানুষ তখন পূজার যোগ্য হয়ে ওঠেন, বন্দিত হন দেবকল্পে মহিমায়।"[১]

তিনি আর কেউ নন বাঙালি জাতির মানবতার মূর্ত প্রতীক শ্রীচৈতন্যদেব(১৪৮৬-১৫৩৩)। শ্রীচৈতন্যদেব একজন পণ্ডিত ও অধ্যাপক হয়েও কোন গ্রন্থ রচনা করেন নি। অথচ তাঁকে নিয়ে বাংলা সাহিত্যে রচিত হয়েছে বৈষ্ণব পদাবলী এবং চরিত সাহিত্য। মঙ্গলকাব্য ও অনুবাদ সাহিত্যে তাঁর প্রভাব দেখা যায়। শুধু বাংলা নয়, অন্যান্য ভাষায় তাঁকে নিয়ে লেখা হয়েছে। একজন মানুষকে নিয়ে সাহিত্যের নানা দিক ফুলে ফেঁপে উঠেছে। আধুনিক কালেও তাঁকে নিয়ে কাব্য, নাটক, গল্প ও উপন্যাস রচিত হয়েছে। এমনকি তাঁর প্রয়াণের প্রায় পাঁচশো বছর পরও তাঁকে নিয়ে চর্চা হচ্ছে। চৈতন্যদেবকে নিয়ে সাম্প্রতিক কালে ২০২০ সালে দেবশ্রী চক্রবর্তী 'সেথায় চরণ পড়ে তোমার' উপন্যাস লিখেছেন। বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসে শ্রীচৈতন্যদেবের ভূমিকা

অত্যন্ত বড় এবং সুদূরপ্রসারী। সাম্প্রতিক কালে বাংলা উপন্যাসে শ্রীচৈতন্যদেবের নানা প্রভাব বিস্তার করে আছে তা এই প্রবন্ধে আমরা আলোকপাত করব।

নব্বইয়ের দশকে অর্থনীতির আমূল পরিবর্তনে যেমন চিন্তা চেতনার বিকাশ ঘটেছে তেমনি সারা পৃথিবী জুড়ে ইতিহাসের মহাপুরুষদের পূর্ণমূল্যায়ন করার প্রয়াস দেখা যায়। বিশ্বায়ন, নতুন অর্থনীতি, প্রাইভেটাইজেশন, বিজ্ঞান প্রযুক্তি, Digital Platforms, Technology ব্যবহারের ফলে সঠিক মূল্যায়ন করার প্রবণতা দেখা যায়। সাম্প্রতিক কালে চৈতন্যদেবকে নিয়ে উপন্যাস লেখা এটাও একটা অভিনব প্রয়াস। চৈতন্যদেব বলতেই আমাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে মুণ্ডিত মস্তক সন্ন্যাসী, কৃষ্ণের অবতার ও রাধা কৃষ্ণের যুগল মূর্তি। কিন্তু বর্তমান কালের উপন্যাসে দেবতা থেকে মানবায়ন করার প্রয়াস দেখা যায়। একালের সমাজ ও চরিত্রকে নির্মাণ করতে ঔপন্যাসিকরা চৈতন্যদেবকে উপন্যাসের আঙিনায় হাজির করেছেন। এই উপন্যাসগুলি সাহিত্য জগতে যথেষ্ট সাড়া জাগিয়ে তুলেছিল।

সাম্প্রতিক কালে তাঁকে নিয়ে লেখা উপন্যাসগুলি উদ্দেশ্য তাঁর মহিমা প্রচার নয়, আসলে চৈতন্যদেব মানুষটি কেমন ছিল, তাঁর উদ্দেশ্য কি ছিল? তাঁর ব্যক্তি ও পারিবারিক জীবন, কেন তিনি সন্ন্যাস নিলেন? কেন তিনি নীলাচলে আশ্রয় নিলেন? ভ্রমণ ও শেষ জীবনে তাঁর পরিণতি কি হয়েছিল? তাঁর যাত্রা পথ কেমন ছিল? এই বিষয়গুলিকে একালের প্রেক্ষাপটে ঔপন্যাসিকেরা তারই বাস্তবায়ন করেছেন। তিনি একজন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব ছিলেন। চৈতন্য চরিত্রের যে দিক গুলি অসম্পূর্ণ থেকে গেছে তা দূর করে একটা বাস্তবোচিত রূপ দিয়েছেন। প্রায় প্রত্যেকটি উপন্যাসই গবেষণা ধর্মী। জীবনী গ্রন্থগুলিতে তাঁর জীবনের ফাঁক-ফোকর গুলিকে ঘিরে জীবনের নতুন তথ্য সামনে আনার চেষ্টা করেছেন একালের কথাসাহিত্যিকরা। তাই আধুনিক যুগে চৈতন্যদেবের পুনর্নির্মাণ হওয়াটাই খুব স্বাভাবিক।

চৈতন্যদেবকে নিয়ে আধুনিক জীবন বোধের সার্বিক প্রচেষ্টা শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ে(১৮৯৯-১৯৭০) 'চুয়াচন্দন'(১৯৩৪) গল্পে পাওয়া যায়। এই গল্পে চুয়া ও চন্দনের প্রেম এবং তাদের বিবাহে প্রবল বাধা আসে। সেই বাধাকে অতিক্রম করে যুবক নিমাই পণ্ডিত বুদ্ধি ও কৌশলের দ্বারা তাদের বিবাহ দিয়েছিলেন। গল্পকার শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় নিমাইকে এক অসামান্য বুদ্ধিমান, সুদক্ষ এবং পরোপকারী উদ্যমী সামাজিক বাস্তব মানুষ রূপে দেখানোর চেষ্টা করেছেন। সাম্প্রতিক কালে শ্রীচৈতন্যদেব জীবন প্রসঙ্গ নিয়ে যে সকল উপন্যাস লেখা হয়েছে তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল, 'সচল জগন্নাথ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য'(২০০১) - দীপক চন্দ্র, 'রাজপাট ধর্মপাঠ' (২০০৮) - অভিজিৎ সেন, 'চেনা পথ অচেনা পথিক'(২০০৯)- নন্দিনী চট্টোপাধ্যায়, 'গোরা'(২০১২) - শৈবাল মিত্র, 'ক্ষমা কর হে প্রভু' (২০১৩) রূপক সাহা, পানিহাটা'(২০১৪) সাধন চট্টোপাধ্যায়, 'শ্রীচৈতন্যকথা'(২০১৯)- কিন্নর রায়, 'সেথায় চরণ

পড়ে তোমার'(২০২০) - দেবশ্রী চক্রবর্তী ইত্যাদি। উল্লেখিত উপন্যাসগুলির বিস্তারিত আলোচনা করার এখানে অবসর নেই। সুতরাং আমাদের নির্বাচিত উপন্যাসের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকতে হবে।

'সচল জগন্নাথ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য' উপন্যাসে দীপক চন্দ্র চৈতন্যদেবের সন্ন্যাস গ্রহণের পশ্চাতে যে রাজনৈতিক ও সামাজিক পটভূমি কি ছিল তার কারণ উন্মোচন ও চৈতন্যচরিত গ্রন্থগুলি নানা অসম্পূর্ণতার বা ত্রুটির বাস্তব জীবনালেখ্য রচনা করেছেন। দীপক চন্দ্র গ্রন্থের ভূমিকায় লিখেছেন – 'প্রচলিত চৈতন্যচরিত গ্রন্থগুলি নানা দিক থেকেই অসম্পূর্ণ। তাই নানা উৎস থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে এই অসম্পূর্ণতা যথাসাধ্য দূর করে একটি গ্রহণযোগ্য বাস্তব জীবনালেখ্য রচনা করেছি।' (সচল জগন্নাথ শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য, দৃষ্টিকোণ) তিনি চৈতন্যের অন্তর্ধান রহস্যকে রহস্যাআবৃত করে রাখেন নি, অমীমাংসিত তিরোধান রহস্যের ক্ষেত্রে ড. দীনেশ চন্দ্র সেন এবং ওড়িয়া কবি ঈশ্বর দাসের সিদ্ধান্তকে মেনে নিয়েই গুপ্ত হত্যার কথা লিখেছেন। নিমাই ও লক্ষ্মীর প্রেম, মায়ের বিরুদ্ধে গিয়ে নিমাইয়ের লক্ষ্মীকে বিবাহ, স্ত্রী মারা যাওয়ার পর দেশ ও দশের কাজে তিনি নিজেকে সঁপে দিয়েছেন। সেই কারণেই নিমাই তার মাকে বলেছেন –

> 'মা, নেতাকে সর্বত্যাগী হতে হয়। মানুষের সমাজ সংস্কারের বাইরে এসে তাকে দেশ ও জাতির কথা চিন্তা করতে হয়। নইলে সন্দেহ ঘোচে না। অবিশ্বাস যায় না। আমাকে ঘিরে একজন লোভী, স্বার্থন্বেষী মানুষের মনে সন্দেহ জেগেছে। দেশের রাজা পর্যন্ত ভীত হয়ে পড়েছে। তিনিও বিশ্বাস করেন আমি আরো বেশি করে মানুষকে আহ্বান করতে পারব। তাদের বিশ্বাসভাজন হব।'[২]

তৎকালীন মুসলিম সমাজের বিরুদ্ধে হিন্দুদের একত্রিত করতে নিমাই এক রাজনৈতিক পরিকল্পনা নিয়েছিলেন। আর সেই পরিকল্পনার বাস্তবায়ন করতে সন্ন্যাস গ্রহণ ছিল তাঁর নিছক ছদ্মবেশ। লেখক বলেছেন –'সন্ন্যাস হল তার "মহাজাল"। 'রঙ্গই' নয় চাতুরী অপার'ও বটে।'[৩] সকল সন্দেহর উর্দ্ধে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করতে সন্ন্যাসই ছিল তাঁর একমাত্র অবলম্বন। তিনি চেয়েছিলেন মানুষের অচলাতায়নের সংস্কার থেকে সমাজকে মুক্ত করতে। 'সবার উপর মানুষ সত্য' এই কথাটি সত্য রূপে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। চৈতন্যদেব অবতার নন, একজন রক্ত-মাংসের মানুষ, ধর্ম বিপ্লবী, রাজনৈতিক ও সমাজিক নেতা। লেখক বিষয় ও চরিত্রকে পরিবর্তন করে একালের ভাবনায় বাস্তব জীবনালেখ্য নির্মাণ করেছেন। কেননা আজ সেই পরিবেশ নেই। দীপক চন্দ্র নিমাই চরিত্রকে আধুনিক রূপে, মানবিক রূপে অঙ্কন করেছেন। নিমাইকে এযুগের একজন সমাজ নায়ক রূপে প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছেন।

আশির দশকের কথাসাহিত্যিক অভিজিৎ সেন শ্রীচৈতন্যদেবের জীবনের একটি বিশেষ পর্ব উত্তর ভারত ভ্রমণকে নিয়ে 'রাজপাট ধর্মপাঠ'(২০০৮) উপন্যাসটি রচনা করেছেন। এই উপন্যাসটির মূল বিষয় হল শ্রীচৈতন্যদেব, গৌড়ের রাজনৈতিক ও

ধর্মীয় পেক্ষাপট। এটি একটি ইতিহাস আশ্রিত উপন্যাস। ঔপন্যাসিক শ্রীচৈতন্যের নীলাচল থেকে নবদ্বীপ, শান্তিপুর হয়ে গৌড়বঙ্গ বা রামকেলিতে আগমন এবং পুনরায় নীলাচলে ফিরে গিয়ে ঝাড়খণ্ডের পথ দিয়ে বৃন্দাবন যাত্রা এই সময়কালকে বেছে নিয়েছেন। চৈতন্যদেবকে কেন্দ্র করে রাজা হোসেন শাহর হিন্দু অমাত্যদের মধ্যে কোন উচ্চাশা অঙ্কুরিত হয়েছিল কিনা? চৈতন্যদেব উড়িষ্যা থেকে ফিরে সোজা শান্তিপুরে গিয়ে অদ্বৈতের সঙ্গে কী আলোচনা করেছিলেন? সেখান থেকে কুলিয়া গ্রামে বিদ্যাবাচস্পতির বাড়িতে কেনই অজ্ঞাতবাস? কেন রূপ-সনাতন ছদ্মবেশ ধারণ করে মাঝরাত্রিতে তাঁর সঙ্গে দেখা করলেন? এ ধরনের বহু প্রশ্নের উত্তর খোঁজার চেষ্টা করেছেন আখ্যানের মধ্যে। লেখক গৌড়ে ব্রাহ্মণ রাজা হবে ও হিন্দুদের উচ্চাআকাঙ্ক্ষাপূর্ণ হবে তা দেখানোর চেষ্টা করেছেন। সুলতান হোসেন শাহের দুইজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী রূপ ও সনাতনের তত্ত্বাবধানে শ্রীচৈতন্য এসেছেন রামকেলিতে রূপ ও সনাতনকে নিজের দলে টেনে আনার জন্য। তা সবার সামনে নয়, করেছেন গোপনে। যদি সুলতানের হাত থেকে দুই কর্মচারীকে সরিয়ে দেওয়া যায়, তাহলে স্বয়ং সুলতান অচিরেই দুর্বল হয়ে পড়বে। বাচস্পতি বলেন –'গৌড় থেকে তাঁরা যদি সরে যান হোসেন শাহের পক্ষে রাজ্য শাসন অসম্ভব হয়ে পড়বে।'[৪] তিনি সরাসরি তাদের সঙ্গে দেখা করেন নি, হরিদাস ও নিত্যানন্দের অনুমতি নিয়ে রাত্রির অন্ধকারে ছদ্মবেশে দেখা করেছেন। এখান থেকে আমরা বুঝতে পারি তাঁর রাজনৈতিক অভিসন্ধি। যেমন করে বর্তমান কালের নির্বাচনের সময় ক্ষমতা দখলের লড়াইয়ে ভোট প্রচার করার জন্য বড় বড় নেতাদের আনা হয় ঠিক সেই ভাবেই চৈতন্য এসেছেন গৌড়বঙ্গে। লেখক এখানে প্রতীকী রূপ অবলম্বন করেছেন। একই সঙ্গে সাতের দশকের রাজনৈতিক যুদ্ধময় পরিবেশকে (নকশাল বাড়ি আন্দোলন,১৯৬৭) উপন্যাসে তুলে ধরেছেন। যেমন ভাবে শাসক বর্গ সিংহাসনকে সুরক্ষিত করার জন্য সমস্ত রকম আন্দোলনকে দমন করে থাকে ঠিক সেই ভাবেই এই আন্দোলনও ব্যর্থ হয়েছিল। ঔপন্যাসিক চরিত সাহিত্য ও ইতিহাস গ্রন্থ থেকে বিষয়টিকে তুলে এনে এক স্বতন্ত্র ও অভিনব কাহিনি নির্মাণ করেছেন। তাই নিমাই পণ্ডিত রূপকে বলেছেন –

> 'পাতিত্যদোষ ব্রাহ্মণ্য সমাজের নিগ্রহ। ব্রাহ্মণ্য সমাজের নিজ স্বার্থের কারণেই সে সব তৈরি। শাস্ত্রে তার প্রশ্রয় নেই। নবদ্বীপের ভট্টাচার্যরা একারণে আমাকে কম নিগৃহীত কম করেন নি। আমি যা সত্য বলে জেনেছি তার সম্যক প্রচার ও প্রতিষ্ঠার জন্য আমাকে সন্ন্যাসও নিতে হয়েছে। আপনারা উভয়েই শাস্ত্রবিদ পণ্ডিত ব্যক্তি। ভয় পাবেন না। ব্রাহ্মণ্য তন্ত্রের কদাচার থেকে সমাজকে রক্ষা করতেই হবে। আপনারা আমার সহায় হলে আমরা সমগ্র দেশ জুড়ে একটা প্রবল আন্দোলন তৈরি করতে পারব, যা অবশেষে ধর্ম এবং সমাজ উভয়েই বাঁচবে।'[৫]

উপন্যাসের এই পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, চৈতন্যদেব একজন দূরদৃষ্টি সম্পন্ন রাজনৈতিক নেতার ভূমিকা পালন করেছিলেন। সেই কারণে উপন্যাসে চৈতন্যদেবকে বলতে শোনা যায়–'এ কাজ আমার নয়। আমি যুদ্ধে বিশ্বাস করি না। যুদ্ধ, তা যে কোনো যুদ্ধই হোক, তা শুধু ধ্বংসই করে এবং অগণিত মানুষের অশেষ দুঃখকষ্টের কারণ হয়। আমার কাজ পৃথক। আর আপনাদের সবার একথা মনে রাখা উচিত এ দেশেটা আর শুধু হিন্দুর দেশ নয় এবং এদেশের বেশিরভাগ মুসলমান জন্ম সূত্রে এদেশেরই মানুষ।'[৬]লেখকের নিজের ব্যক্তি-জীবনের ছাপও এই উপন্যাসে স্পষ্ট রূপে দেখা যায়। প্রথমদিকে অভিজিৎ সেন রাজনীতির সঙ্গে প্রত্যক্ষ ভাবে যুক্তছিলেন, পরবর্তীকালে দল বহু বিভক্ত হওয়ার কারণে রাজনীতি থেকে সরে এসেছিলেন। অভিজিৎ সেন ইতিহাসকে আশ্রয় করে চৈতন্যদেবকে মানব রূপে অঙ্কন করেছেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণব দৃষ্টি বা ধর্মপ্রচারক থেকে সরে চৈতন্যদেবকে একজন রাজনৈতিক দূরদর্শি ব্যক্তি হিসাবে দেখিয়েছেন।

শৈবাল মিত্রের 'গোরা' (২০১২) উপন্যাসটির কাহিনি নির্মিত হয়েছে টেলিভিশনের মেগা সিরিয়াল থেকে, যার নাম গোরা। বিষয়বস্তু অবশ্যই চৈতন্য-জীবন। শৈবাল মিত্র প্রচলিত জীবন বৃত্তান্ত থেকে আখ্যানের ভিতর থেকে এক নতুন কাহিনি নির্মাণ করেছেন। চৈতন্য ভ্রাতা বিশ্বরূপ যে পুঁথি রচনা করেছেন তাতে রয়েছে চৈতন্যদেবের প্রকৃত জন্ম রহস্য। রয়েছে শ্রীহট্টের পীর বুরহানুদ্দিনের দরগায় এক অলৌকিক গর্ভাধারণের কাহিনি। শৈবাল মিত্র এই আখ্যানকে মেগাসিরিয়ালের পর্বে দেখিয়েছেন। যা ইতিহাস নয়, চিত্রনাট্য। আর এই চিত্রনাট্যই আধুনিক গণসংস্কৃতির পণ্যবাহী বিনোদনের অন্যতম মাধ্যম। তিনি এই আখ্যানের মধ্যে দিয়ে দেখিয়েছেন বাঙালি জাতীয় পরিচয় নির্মাণে চৈতন্যদেবের ভূমিকা কতখানি। ইতিহাসের কাহিনির সঙ্গে উপন্যাসের কাহিনি মেলে না। প্রবল ঝড় বৃষ্টির রাত্রে শচীদেবীর মাতৃহৃদয়ের বিহ্বলতা, বিশ্বরূপের মঙ্গল কামনায় শচীদেবীর সন্তান ধারণের অলৌকিক কাহিনি উপন্যাসের বিষয়বস্তুকে আকর্ষণীয় করে তুলেছে। একুশ শতকের গোরা যে মঙ্গল গ্রহের বিমান চালকের স্বপ্ন দেখেছিলেন সেই গোরা হঠাৎ ভক্তিবাদী মেগা সিরিয়ালের নায়কের ভূমিকায় অভিনয় করেছেন। গোরা চরিত্রের সঙ্গে সে একাত্ম হয়ে গিয়েছে। একুশ শতকের গোরা, রবীন্দ্রনাথের গোরা ও মেগাসিরিয়ালের গোরা মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে।

শৈবাল মিত্র এই আখ্যানের মধ্যে একালের রাজনৈতিক প্রসঙ্গকেও তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন –

> 'চৈতন্যের নবদ্বীপ-শান্তিপুরে যা ঘটেছিল, বিংশ শতকে ষাটের দশকে বাংলায় কি প্রায় সেই ঘটনায় ঘটেনি? অদ্বৈত-নিত্যানন্দ-বাসুদেব সার্বভৌম-যবন হরিদাসদের মধ্যে কি সুশীতল রায়চৌধুরী-কানু সান্যাল-সরোজ দত্ত-জঙ্গল সাঁওতালদের পূর্বজরাই ছিলেন না? চৈতন্য বা চারু মজুমদাররা তীব্র

> ভাবাবেগে অল্প সময়ের জন্য একটা সংযুক্ত শিবির তৈরি করলেও নেতার অকালমৃত্যুতে শিবির বহুধাবিভক্ত হয়ে যায় ভিন্ন ভিন্ন মতের বহুধাগামী স্মৃতিতে –এই কি বাংলার ইতিহাসের পুনরাবৃত্ত প্রকরণ?' (গোরা, গৌরচন্দ্রিকা, পৃঃ ১০)

ঔপন্যাসিক ছয়ের দশকে নকশাল বাড়ি আন্দোলনের সঙ্গে চৈতন্যদেবের সমকালকে মেলাতে চেয়েছেন।

পেশায় ক্রীড়া সাংবাদিক রূপক সাহা শ্রীচৈতন্যদেবের মৃত্যু রহস্য ও পুনর্জন্ম নিয়ে 'ক্ষমা কর, হে প্রভু'(২০১৩) উপন্যাস লিখেছেন। দুই গবেষকের মধ্যে একজন উপাসনা জন্মান্তরে বিশ্বাসী তাই মর্ত্যে কোথায় চৈতন্যের জন্ম হয়েছে তা অনুসন্ধান করে চলেছেন। অন্যদিকে গবেষক জয়দেব চৈতন্যের অন্তর্ধান রহস্যের সন্ধান করে চলেছেন। আর এক চরিত্র গোরা কলকাতা বিশ্ববিদ্যায়ের কৃতি ছাত্র। দলিত পরিবারে বড় হয়ে উঠেছে। সে দলিত আন্দোলনের সঙ্গেও যুক্ত। তার জীবনে যে ঘটনা গুলি ঘটে চলেছে তা চৈতন্য-জীবনের পুনারাবৃত্তি। সে অনুভব করে তার মধ্যে চৈতন্যদেব বাসা বেঁধেছে। রূপক সাহা একই সঙ্গে অতীত ও বর্তমান কালের মেলাবন্ধন ঘটিয়েছেন। চৈতন্যদেবের সমকালে বঙ্গের মুসলমানেরা হিন্দুদের অস্তিত্ব বিপন্ন করে তুলেছিল, তেমনি বর্তমানকালেও উচ্চবর্ণের মানুষদের হাতে দলিতেরা অত্যাচারিত হয়ে চলেছে - এই বিষয়টিও স্পষ্ট রূপে ফুটে উঠেছে। পদ্মনাভ মহারাজ মানুষকে বুঝিয়েছেন চৈতন্যদেব উৎকল সমাজের শত্রু। দলিতেরা তত্ত্ব বোঝে না, কিন্তু ধর্ম মানে। মহাপ্রভুকে হত্যা না করলে পাণ্ডাদের রুটিরুজি বন্ধ হয়ে যাবে, সে কারণেই গোরাকে হত্যা না করে উপায় ছিল না। রূপক সাহা লিখেছেন –'আমার দৃঢ় বিশ্বাস হয়েছিল, মহাপ্রভুর অন্তর্ধানের পিছনে গভীর রহস্য ছিল। নানা কারণে তাঁর প্রচুর শত্রু একটা সময় হাত মিলিয়েছিলেন। তাঁকে গুমখুন করা হয়েছিল।'(ভূমিকা অংশ, ক্ষমা কর, হে প্রভু) লেখক একালের চরিত্র, সমাজ ও ঘটনাকে অতীতের সঙ্গে এক করে দেখেছেন।

দেবশ্রী চক্রবর্তীর 'সেথায় চরণ পড়ে তোমার'(২০২০) উপন্যাসের মূল বিষয় শ্রীচৈতন্যদেবের অন্তর্ধান রহস্যের উদঘটান। পাঁচশো বছর আগের ঘটনা নিয়ে লেখিকা যুক্তি, বুদ্ধি ও ইতিহাসের তথ্য সংগ্রহ করে এক সমাধান সুত্র খোঁজার চেষ্টা করেছেন। এই উপন্যাসের মূল কেন্দ্রবিন্দু শ্রীচৈতন্যদেব। তাঁর অন্তর্ধান বা মৃত্যু রহস্য নিয়ে থ্রিলার মূলক উপন্যাস রচনা করেছেন।শ্রীচৈতন্যদেবের আসল উদ্দেশ্য কি ছিল? তিনি কি হিন্দু রাজাদের ঐক্যবদ্ধ করতে সন্ন্যাস নিয়েছিলেন? পুরীর জগন্নাথ মন্দিরে তিনি কি জগন্নাথ দেহে বিলীন হয়েছিলেন? না সেটি ছিল গুপ্ত হত্যা? এই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর পেতেই লেখিকা এই উপন্যাসের নির্মাণ করেছেন। একইসঙ্গে জগন্নাথ মন্দিরের ইতিহাস ও বঙ্গের সামাজিক এবং রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট সমগ্র আখ্যান জুড়ে অবস্থান

করেছে। অবশ্যই এটি একটি গবেষণাধর্মী উপন্যাস। শ্রীচৈতন্যদেবের কর্মময় জীবনকে তুলে ধরার পাশাপাশি অন্তর্ধান রহস্যেরও সন্ধান করেছেন। এই উপন্যাসটি একত্রিশ পরিচ্ছেদে নবদ্বীপ ও উড়িষ্যার পটভূমিতে রচিত হয়েছে। বর্তমান কালে ঔপন্যাসিকরা গবেষণাধর্মী লেখালেখি করলেও লেখিকা সোজাসুজি গবেষণার মধ্যে দিয়ে উপন্যাসের রূপ দান করেছেন।

লেখিকা রাতুল ও ওমকারির গবেষণার মধ্যে যে চৈতন্যদেবের সম্ভাব্য মৃত্যুর কারণগুলি উঠে এসেছে সেই গুলিকেই প্রামান্য হিসাবে গ্রহণ করেছেন। যেমন খাবারে হালকা বিষ প্রয়োগ করে চৈতন্যদেবকে গুপ্ত হত্যার ষড়যন্ত্রের কথা জানিয়েছেন লেখিকা। এই প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন –'পুরীর মন্দিরের সংস্কারের সময় যে কঙ্কালটি পাওয়া গেছিল, সেটিও কিন্তু মহাপ্রভুর মতন দীর্ঘাঙ্গী ছিল। অধ্যাপক বাসুদেব মুখোপাধ্যায় হয়তো জেনে গেছিলেন যে মহাপ্রভুকে পুরীর মন্দিরের গর্ভগৃহের ভেতরে হত্যা করে সেখানেই পুঁতে দেওয়া হয়েছিল। তাই হয়তো তাঁকে খুন হয়ে যেতে হয়।'[৭]একই সঙ্গে নেতাজির অন্তর্ধান রহস্যের প্রসঙ্গ সামনে এনেছেন। চৈতন্য গবেষক জয়দেব মুখোপাধ্যায় চৈতন্যের অন্তর্ধান রহস্যের উদ্ধার করতে গিয়ে তিনিও অস্বাভাবিক ভাবে খুন হন। শ্রীচৈতন্যদেবের অন্তর্ধান রহস্যের সন্ধান নিয়ে দুই গবেষণার মধ্যে দিয়ে উপন্যাসের মূল কাহিনী গড়ে উঠেছে। লেখিকা একই সঙ্গে অতীত এবং বর্তমান সময়কালের এক যোগ সাযুজ্য স্থাপন করেছেন।দেবশ্রী চক্রবর্তী এই উপন্যাসে শ্রীচৈতন্যদেবের মৃত্যু রহস্যের উদঘাটন করেছেন। লেখিকা ইতিহাসের সঙ্গে আশেপাশের সময় ও চরিত্রকে মেলাতে চেয়েছেন।

ঔপন্যাসিকরা এই উপন্যাসগুলিতে শ্রীচৈতন্যকে কখনও মনুষ্য রূপে, প্রেমিক রূপে, সামাজিক ও রাজনৈতিক নেতা হিসাবে পাঠকের সামনে এনেছেন। প্রত্যেক কথাকার চৈতন্যকে অবতার থেকে মানবিক রূপে উপস্থাপন করেছেন। সুনীলকুমার দত্ত বলেছেন –

> 'সেই মহামানবের চৈতন্যদেবের আজি নতুন করে মূল্যায়ন দরকার। যুগ, সমাজ, শাসনব্যবস্থা সব কিছু নিয়ে এক বিরাট পরিপ্রেক্ষিতে চৈতন্যদেবের প্রতিটি কৃতি ও কর্মের নব মূল্যায়ন হওয়া দরকার। চৈতন্য মানেই শালগ্রাম শীলা নয়, ভজ গৌর নিতাই নয়, কিন্তু চৈতন্য মানেই একটা বিশ্বাস, একটা প্রতীতি এবং একটা রক্ত-পাতহীন বিপ্লব। একটা বাঁচার আশা, আলো, আকাঙ্ক্ষা।'[৮]

যতদিন বাংলা ভাষা, জাতি ও সমাজ থাকবে ততদিন শ্রীচৈতন্যদেব থাকবেন। মধ্যযুগের ধারাকে অতিক্রম করে তাঁকে নিয়ে সাহিত্য রচনা হয়েছে এবং ভবিষ্যতেও হবে। আজকের পৃথিবীতে এই মহান মানুষটির বার্তা বড় প্রয়োজন। অতীত তো ভবিষ্যতকে পথ দেখায়। একবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে দাঁড়িয়ে আমরা আজও জাতপাত সংকীর্ণতা থেকে মুক্ত হতে পারে নি। আজও দেশের নানা প্রান্তে দলিত

সমাজের উপর অত্যাচার ও শোষণ, নির্যাতীত হতে দেখা যায়। এই কারণে চৈতন্যদেবের প্রাসঙ্গিতা ও সমাজের চলার পথে অনুসরণ করা আমাদের পাথেয়। এই পরিবেশে ও এই সময় তাঁর চর্চা ও জীবন দর্শন আমাদের একান্ত প্রয়োজন বলে মনে হয়।

তথ্যসূত্র :

১. ভট্টাচার্য, দেবীপদ। *বাংলা চরিত সাহিত্য*। দে'জ পাবলিশিং, ১৯৮২, কলকাতা, পৃঃ ৩২।

২. চন্দ্র, দীপক। *সচল জগন্নাথ শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য*। দে'জ পাবলিশিং, ২০০১, কলকাতা, পৃঃ ১৬২।

৩. তদেব, পৃঃ ১৬৫।

৪. সেন, অভিজিৎ।*রাজপাট ধর্মপাঠ*। দে'জ পাবলিশিং, ২০০৮, কলকাতা, পৃঃ ৬৬।

৫. তদেব, পৃঃ ২১।

৬. তদেব, পৃঃ ১০৭।

৭. চক্রবর্তী, দেবশ্রী।*সেথায় চরণ পড়ে তোমার*। হাওয়াকল, ২০২০কলকাতা/নিউ দিল্লি, পৃঃ ৩০৪।

৮. গুপ্ত, সমীরকুমার। সম্পাদক। *মিলেমিশে*। গান ও সাহিত্য বিষয়ক পত্রিকা, ষষ্ঠ বর্ষ, ঊনসত্তরতম সংখ্যা, ডিসেম্বর ২০১০, কলকাতা, পৃঃ ১০৯।

সেলিম আল দীনের ‘হাত হদাই’ : প্রসঙ্গ লোকজ উপাদান

কমল রায়
গবেষক, বাংলা বিভাগ
কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়

সংক্ষিপ্তসার : দেশজ নাট্যাঙ্গিকে নাটক রচনা করে মঞ্চে দেশজ ঐতিহ্যকে তুলে ধরতেই নাট্যকার সেলিম আল দীন বেশি আগ্রহী ছিলেন। ‘হাত হদাই’ নাটকে তিনি যেমন লোকনাট্যরীতির আধুনিকায়িত প্রয়োগ ঘটিয়েছেন, তেমনি নাটকের বিষয়বৈচিত্র্য ও চরিত্র নির্মাণেও দেশজ ঐতিহ্যকেই নাটক রচনার মধ্যেদিয়ে তাকে মঞ্চে নিয়ে আসেন। জাতীয় নাট্য আঙ্গিক প্রতিষ্ঠার তাগিদ ও দেশজ সংস্কৃতিকে সংরক্ষণের প্রয়াসের ফলেই তিনি ‘হাত হদাই’র মতো নাটক রচনায় মনোনিবেশ করেছিলেন। ‘হাত হদাই’ সেলিম আল দীনের সেইরকমই একটি নাটক যেখানে তিনি বাংলাদেশের ফেনী-নোয়াখালী সমুদ্র উপকূলীয় অঞ্চলের মানুষের জীবনচর্চাকে শিল্পসম্মত ভাবে তুলে ধরেছেন। তাঁর রচিত ‘হাত হদাই’ নাটক হয়ে ওঠেছে বাংলাদেশের সহস্রবর্ষের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যে ভরপুর। আর এই দিকটিকেই আলোচ্য প্রবন্ধে তুলে ধরা হল।

সূচক শব্দ : বর্ণনাত্মক নাট্যরীতি, লোকজ উপাদান, লোকজীবন, লোকসংগীত, ছড়া, প্রবাদ, লোকভাষা, লোকসংস্কার, লোকবিশ্বাস,লোক খেলাধুলা।

মূল আলোচনা :

বিশ শতকের সত্তরের দশকে বাংলা নাটকের ধারায় নাট্যকার সেলিম আল দীন (১৯৪৯ – ২০০৮) ছিলেন একজন অন্যতম নাট্যকার। তিনি শুধু একজন নাট্যকারই ছিলেন না। নাট্যকারের পাশাপাশি তিনি ছিলেন নাট্যগবেষক, নাট্যনির্দেশক ও একজন প্রথাবিরোধী নাট্যকার। বাংলা নাটকের ইতিহাসে তাঁর পরিচয় কেবল দেশজ আঙ্গিকে নাটক রচনার জন্য নয়; বরং জাতির আত্মপরিচয়ের পথও দেখান তিনি। ঊনবিংশ শতকে বাংলা নাটক রচনার সূচনার পর বাংলা নাটকের ইতিহাসের ধারায় যেসকল বিশিষ্ট নাট্যকার এযাবৎ নাটক রচনা করেছেন তাঁদের মধ্যে সেলিম আল দীনের নাট্যপ্রতিভা ছিল স্বতন্ত্র। বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন ও মধ্যযুগ থেকে বাংলাদেশে নাটকের অস্তিত্ব থাকলেও বাঙালির নাট্যরচনার সূত্রপাত ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকেই শুরু হয়েছিল। এই পর্বে সংস্কৃত ও ইংরেজি নাটক অনুবাদের মধ্যে দিয়ে নাট্যকারগণ বাংলা নাটককে এগিয়ে নিয়ে গেছেন। এরপর বিশিষ্ট নাট্যকার মাইকেল মধুসূদন দত্ত, দীনবন্ধু মিত্রের হাতে বাংলা নাটক ইংরেজি নাট্যরীতিতে রচিত হতে শুরু করে এবং তাঁদের হাতেই বাংলা নাটকের যথাযথ প্রতিষ্ঠা হয়েছে। ক্রমে বাংলা নাটকের ধারায় আবির্ভূত হয়েছেন দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রমুখ নাট্যজন। এরপর চিরাচরিত নাট্যরচনার প্রবণতা থেকে বেরিয়ে এসে বাংলা নাট্যজগতে ব্যতিক্রমী ভাবধারার পরিচয়

দিয়েছেন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তিনি তাঁর পূর্ববর্তী নাট্যধারায় অবগাহন না করে বাংলা নাট্যজগতে মৌলিক প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন। রবীন্দ্রনাথের পর বাংলা নাট্যধারায় যাঁদের নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয় তাঁরা হলেন – নাট্যকার বিজন ভট্টাচার্য, বাদল সরকার, উৎপল দত্ত প্রমুখ নাট্যকার। এঁরা প্রত্যেকেই তাঁদের আপন স্বকীয়তা দিয়ে বাংলা নাট্যজগতকে অনেক সমৃদ্ধ করেছেন।

বর্তমান বাংলাদেশের ফেনী জেলার সেনেরখিল গ্রামে নাট্যকার সেলিম আল দীন (১৯৪৯ – ২০০৮) জন্মগ্রহণ করেন। বাংলা নাট্যজগতে তাঁর আবির্ভাব ঘটে বিশ শতকের সত্তরের দশকে। নাট্যরচনার প্রাথমিক পর্বে তিনি তাঁর পূর্ববর্তী নাট্যকার নুরুল মোমেন, শিকানদার আবু জাফর, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ, মুনীর চৌধুরী, সাঈদ আহমেদ প্রমুখ নাট্যকারকেই অনুসরণ করেছেন। নাটক রচনার প্রস্তুতি পর্বে তাঁদের অনুসরণে তিনি মূলত অ্যাবসার্ডধর্মী নাটকই লিখেছেন। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই তাঁর নাটকের বিষয়বস্তু ও আঙ্গিকে ব্যাপক পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। তিনি তৎকালীন বাংলাদেশের নাগরিক জীবনের সমস্যা-সংকটের চিত্র নাটকে তুলে ধরার পরিবর্তে বাংলাদেশের গ্রামীণ জনপদের অন্তহীন সমস্যা ও স্বপ্নভঙ্গের কথা নাটকে তুলে ধরতে শুরু করেন। এবং এই গ্রামীণ জনপদের কথা তুলে ধরতে গিয়ে তিনি নাটকের আঙ্গিকের ক্ষেত্রেও লোকজ ফর্মকে অবলম্বন করলেন।এরপর ধীরে ধীরে বাংলা নাটকের প্রচলিত আঙ্গিককে পাশ কাটিয়ে তিনি এক স্বতন্ত্র ধারায় নাটক রচনা করতে শুরু করলেন। তিনি যে ধারার নাম দিয়েছেন ‘বর্ণনাত্মক নাট্যরীতি’। বর্ণনার মাধ্যমে তিনি নাটকের চরিত্র, ঘটনা ও কাহিনিকে দর্শকের সামনে উপস্থাপন করলেন। এই ধারায় রচিত হয় তাঁর ‘কিত্তনখোলা’ (১৯৮১), ‘কেরামতমঙ্গল’ (১৯৮৫) ও ‘হাত হদাই’ (১৯৮৯) নাটক। বর্ণনাত্মক রীতিতে রচিত ‘হাত হদাই’ (১৯৮৯) হল সেলিম আল দীনের তৃতীয় নাটক। বাংলাদেশের সমুদ্র উপকূলীয় অঞ্চলের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনের এক বাস্তব দলিল এই ‘হাত হদাই’ নাটক। বাংলাদেশের সমুদ্র তীরবর্তী অঞ্চল নোয়াখালীর আঞ্চলিক ভাষায় রচিত এই নাটকে নাট্যকার সমুদ্রতীরের বিচিত্র রকম মানুষের সামাজিক জীবন ও জীবন সংগ্রামের সামগ্রিক চিত্র শিল্পসম্মতভাবে তুলে ধরেছেন। পাশাপাশি সেইসব মানুষদের কর্মজীবন, সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল, বিশ্বাসবোধ, শিল্পবোধ, রীতি-নীতি, আচার-আচরণ প্রভৃতি বিষয়গুলিকেও নাট্যকার চমৎকারভাবে শিল্পরূপ দিয়েছেন।

বাংলাদেশের লোকজ জীবননির্ভর কাহিনি অবলম্বন করে নাটক রচনাতেই নাট্যকার সেলিম আল দীন-এর আগ্রহ ছিল বেশি। ‘হাত হদাই’ হল তাঁর সেই পর্যায়ের নাটক। ষোলোটি পর্বে বিশাল পরিধিতে এই নাটকের কাহিনিতে কোনো একটি মানব চরিত্রের জীবন কাহিনির পরিবর্তে এখানে বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলের অজস্র মানুষের জীবন কাহিনির বর্ণনা রয়েছে। নাটকের মূল কেন্দ্রে চৌষট্টি বছরের বৃদ্ধ

জীবনরসিক আনার ভাণ্ডারির কাহিনি থাকলেও এই বিশাল পরিধির নাটকে রয়েছে লেদন, মোক্কা, হাইশ্‌শা, মোদু, চুক্কুনী, লুত্তা, নাড়ু, ইন্দ্রিজ, ছোলতান, জামাল, ছিদ্দা, ডিঙ্গা, আঙ্কুরী, আফাজ গায়েন প্রমুখ অজস্র চরিত্রের জীবনের নানা রঙের গল্প। সেইসঙ্গে উঠে এসেছে বাংলাদেশের সমুদ্র উপকূলীয় অঞ্চলের নানান পেশাজীবী মানুষের সমুদ্র অভিজ্ঞতার গল্প, তাদের জীবনচর্যা ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য। লোকায়ত জীবনের নানা অনুষঙ্গ নাট্যকার সেলিম আল দীনের নাটকের প্রধান উপাদান হিসেবে গৃহীত হয়। আলোচ্য নাটকেও তিনি প্রচুর পরিমাণে লোকজ উপাদানের ব্যবহার করেছেন। লোকসংস্কৃতির বিভিন্ন বিভাজন অনুযায়ী নিম্নে তা আলোচনা করা হল —

লোকসংগীতের ব্যবহার :

লোকসাহিত্যের একটি প্রধান শাখা হল লোকসংগীত। আলোচ্য নাটকে নাট্যকার ফেনী-নোয়াখালী অঞ্চলের লোকসংগীতের ব্যবহার করেছেন। 'হাত হদাই' নাটকের পাত্র-পাত্রী, ভাষা, জনগোষ্ঠী, ভূ-প্রকৃতির বর্ণনা সেলিম আল দীনের জন্মভুমি সংলগ্ন ফেনী-নোয়াখালীর বিস্তীর্ণ সমুদ্র উপকূলীয় অঞ্চলের জনপদ থেকে গৃহীত হয়েছে। সেই কারণে উপকূলীয় জীবন অভিজ্ঞতার সঙ্গে তাঁর ছিল অচ্ছেদ্য সম্পর্ক। 'হাত হদাই' নামক বিশাল নাটকটিকে নাট্যকার ষোলোটি পর্বে বিভাজিত করেছেন। নাটকের প্রথম পর্ব শুরু হয়েছে বাংলাদেশের সমুদ্র তীরবর্তী ফেনী অঞ্চলের চর চান্দিয়ার মাছুয়াদের মাছ শিকারের বর্ণনা দিয়ে। চর চান্দিয়ার মাছুয়ারা মাছ শিকার করছে এবং মাঝে মাঝে গাঙের পাড়ে চালাঘরের নিচে তারা কিছুক্ষণের জন্য জিরিয়ে নেয়। এই জিরানোর ফাঁকে ফাঁকে চলে তাদের সমেবেত নৃত্য ও সংগীত —

মন তুমি বুঝ নারে।
মন-পবনের ঘোড়া রে ভাই
পবনে ধরে জীন রে – পবনে ধরে জীন
দিল পবনের ঘোড়া আমার – চইলছে রাইত দিন
মন তুমি বুঝ নারে।।
আরে – ঘরে নাই খোরাকির জোগাল
চিউর ভাজা খায়
কচুর ডোগা কান্ধে করি
বাঘ শিকারে যায়।। ...

('হাত হদাই', নাটক সমগ্র — ২, পৃ - ১৬।)

আলোচ্য নাটকের অন্যতম চরিত্র হাইশ্‌শার কণ্ঠে উপরিউক্ত লোকসংগীতটি শোনা যায়। লোকায়ত জীবনের উল্লাসমুখর জীবন-যাপনে লোকসংগীত একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আলোচ্য সংগীতটির মাধ্যমে সমুদ্র এলাকার চরবাসীদের জীবনের অভাব-অনটনের চিত্র উঠে এসেছে। নাট্যকার সেলিম আল দীন তাঁর নাটকে এইভাবেই সংগীতের ব্যবহার করে নাট্য কাহিনিকে গতিপ্রদান করেছেন। সেইসঙ্গে সংগীতটির

মাধ্যমে দর্শক জেলেজীবনের সঙ্গেও পরিচিত হন। লোকায়ত সমাজের মানুষেরা তাদের জীবনে ঘটে যাওয়া বিভিন্ন কাহিনিকে সবসময় কথার মাধ্যমে তুলে না ধরে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তারা সংগীতের আশ্রয় নিয়ে থাকেন। নাটকের প্রথম পর্বে হাইশ্‌শার কণ্ঠে এরকমই একটি লোক কিস্‌সার অন্তর্গত সংগীত রয়েছে —

কোরাল মাছে উঠি বলে – ওগো রাজার পুত।
আমারে না মারিও
আমারে না ধরিও
আমি তোমার বিয়াত যামু
ফাল দি দি নাচনা করমু।
কন কন মাছ। এলকি হানির ভেলকি মাছ
কাটা সুয়া রক্তমাছ – গোলাপি সোন্দর মাছ
সোন্দর জব্বর মাছ – আরে –

('হাত হদাই', নাটক সমগ্র — ২, পৃ – ১৮।)

নাটকে উল্লিখিত উপরিউক্ত লোকসংগীতটি বাংলাদেশের সমুদ্র উপকূলীয় অঞ্চল নোয়াখালীর প্রচলিত সংগীত। লোকজীবনে সহস্র বছর ধরে লালিত এইসব সংগীতকে নাট্যকার তাঁর নাটকে অনায়াসে তুলে আনতে পেরেছিলেন।

পাশ্চাত্যের সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন নীতির ফলে দেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য যখন বিপর্যয়ের মুখে দাঁড়িয়ে, তখন নাট্যকার সেলিম আল দীন দেশজ নাট্য-আঙ্গিকে নাটক রচনার মধ্যেদিয়ে দেশীয় ঐতিহ্যকে রক্ষা করেছেন। বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী নাট্যধারা যাকে আমরা লোক নাটক বলে চিহ্নিত করে থাকি সেই ঐতিহ্যবাহী নাট্যাঙ্গিক ছিল প্রধানত গীত প্রধান ও বর্ণনাত্মক। এই ঐতিহ্যবাহী নাট্যাঙ্গিকের আদলেই তিনি 'হাত হদাই' নাটকটি রচনা করেছেন। তাই তাঁর নাটকের একটি প্রধান উপাদান হল সংগীত। আলোচ্য নাটকের প্রথম পর্বের সূচনা যেমন সংগীতের মাধ্যমে হয়েছে তেমনি পরিসমাপ্তিও হয়েছে সংগীত দিয়েই —

চল চলরে চল
মুখে আল্লা নবীর নাম – বলরে বল।
প্রথমে আসিল সর নাম ঝিকিমিকি।
দেখিয়ানা হেই সর বুক ধিকিধিকি।
চল চলরে চল।।
দ্বিতীয়ে আসিল সর নামে বেচাকেনা।
হেইনা সরে ভাঁসি আইল হাতদরিয়ার হেনা।
চল চলরে চল।। ...

('হাত হদাই', নাটক সমগ্র — ২, পৃ – ২৭।)

এরপর নাটকের দ্বিতীয় পর্বও শুরু হয়েছে গানের মধ্যেদিয়ে। সমুদ্রে মাছ ধরতে গিয়ে সুনীলের নৌকা তুফানে ডুবে যায়। এদিকে তার স্ত্রী সীতা সুনীলের অপেক্ষায় দিনের পর দিন গুনতে থাকে। সুনীলের যে মৃত্যু হয়েছে – তা সীতা কোনমতেই বিশ্বাস করতে পারে না। সুনীলের মৃত্যু সংবাদ পেয়ে বৃদ্ধ আনার ভাণ্ডারি সীতার সঙ্গে দেখা করতে যায়। যাওয়ার পথে নৌকায় আনার ভাণ্ডারির সঙ্গে আছে মোক্কা, হোসেন ও নৌকা চালক হাইশ্‌শা। হাইশ্‌শা গান গাইতে গাইতে নৌকা বাইতে থাকে —

কোথায় তুই পাইলি চম্পা ফুল
ওগো সন্ধ্যা বেলা
ও গুরা বউ।।
ঘাটার আগে শাগের বাগান
গুরা বউ শাগ তুলে
শাগের মধ্যে বাঘের বাসা
লাফদি ধইরবো চাইও
ও গুরা বউ।। ...

('হাত হদাই', নাটক সমগ্র — ২, পৃ - ৩৩।)

লোকজীবনের সঙ্গে জড়িত প্রেম-ভালোবাসা, হাসি-ঠাট্টা, বিরহ-মিলন, খেলাধুলা বিভিন্ন অনুষঙ্গের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে সংগীত। 'হাত হদাই' নাটকের তৃতীয় পর্ব শুরু হয়েছে বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী ঘুড়ি ওড়ানোর খেলা দিয়ে। এই ঘুড়ি ওড়ানোর খেলাতেও মোদু মিঞাকে নোয়াখালীর আঞ্চলিক ভাষায় একটি গান গাইতে শোনা যায় —

ভাল একখান নাটাই ধইরা
সাধের ঘুণ্ডি দে উড়াইয়া।।
ভাল একখানা নাটাই ধইরা
সূতায় ভাল মাঞ্জা দিয়া
সাধের ঘুণ্ডি দে উড়াইয়া।।

('হাত হদাই', নাটক সমগ্র — ২, পৃ - ৪৩।)

এরপর নাটকের চতুর্থ পর্বে মালু আর আনার ভাণ্ডারির মধ্যে কথোপকথন-এর সময় চৌষট্টি বছরের বৃদ্ধ আনার ভাণ্ডারি হঠাৎ গান ধরে —

মাঝ দরিয়ায় খাইয়া মরা
পড়িয়া নদীর ছগ্‌গরে
না জানি ডুব দিওনা তুঁই মায়ার সাগরে।।

('হাত হদাই', নাটক সমগ্র — ২, পৃ - ৫২।)

উক্ত সংগীতটি নাট্যকার ফেনী অঞ্চলের জেলেদের কাছ থেকে সংগ্রহ করেছেন। উপরিউক্ত এই সংগীতগুলি ছাড়াও আলোচ্য নাটকে আরও যেসব লোকসংগীতের উল্লেখ রয়েছে সেগুলি নিম্নরূপ —

১। কেন্দুয়া মাছুয়া মাঘ চিত্রা ডুরিয়া।
হরিণ ধরিয়া ফাঁড়ে শূন্যে ছুঁড়িয়া।।
ললিয়া কালিয়া বাঘ নাচে হুঁকারিয়া।
কলিজার বোঁটা সে যে ছিঁড়ে দন্ত দিয়া।।(কলেরা রোগ তাড়ানোর গান)
('হাত হদাই', নাটক সমগ্র — ২, পৃ - ৫৫।)

২। হাত বেরি বেরি ধরি গো হউর -
ধরি দুটি চরণ
ভাইয়াগো আইছে নাইয়র নিতো
দেশের ঢোলক লইয়া।। ...(বিয়ের গীত)
('হাত হদাই', নাটক সমগ্র — ২, পৃ - ৯৩।)

৩। কি খেলা খেলাইলেন জগতে -
আল্লা পাকে।
কি খেলা খেলাইলে জগতে।।
বানাইয়া ওলি নবী
এ দুনিয়া করলেন খুবি
এক একজনকে পাঠাইলেন এক এক ভাবে -
আল্লা পাকে -
কি খেলা খেলাইলেন জগতে।।(জারি গান)
('হাত হদাই', নাটক সমগ্র — ২, পৃ - ৯৮-৯৯।)

৪। কি প্রেম শিখাইলি ও জাইল্যারে।
ও জাইল্যারে জাইল্যা -
কি প্রেম তুই শিখাইলি - কাইল বিকালে জলে গেলি
জোয়ার ভাটা করে গাঙ্গে - ফিরা না আইলি।। ... (মাঝি-মাল্লাদের গান)
('হাত হদাই', নাটক সমগ্র — ২, পৃ - ১২৬।)

নাট্যকার সেলিম আল দীন-এর 'হাতহদাই' নাটকে বিভিন্ন ধরনের লোক সংগীতের ব্যবহার শুধু লোকজীবনের বিভিন্ন অনুষঙ্গ হিসেবেই উপস্থাপিত হয় নি। বরং তা নাট্যকারের শৈল্পিক চেতনা থেকে উদ্ভুত হয়েছে। দেশজ নাট্যরীতি বর্ণনাত্মক অভিনয়রীতির শিল্পকৌশলকে অবলম্বন করে সেলিম আল দীন 'হাতহদাই' নাটক রচনা করেছেন। 'বর্ণনাত্মক নাট্যরীতি'র মূল বৈশিষ্ট্য নৃত্য-গীত ও বর্ণনার মাধ্যমে অভিনয়ের সমন্বয়ে রচিত হয়েছে এই নাটক। সমুদ্র উপকূলবর্তী লোকজীবনের বিভিন্ন

লোকসংগীতগুলি লোকজীবনের বহুমাত্রিক নাট্যমুহূর্তকেই প্রতিফলিত করেছে। লোকনাট্যরীতির আধুনিকায়িত প্রয়োগ ঘটাতে গিয়ে লোকজীবনের নানা অনুষঙ্গ সেলিম আল দীনের 'হাতহদাই' নাটকে উঠে এসেছে। তাছাড়া —"বাঙলা নাট্যাঙ্গিকের মূল উৎস ও নিয়ন্ত্রক হচ্ছে সঙ্গীত। সঙ্গীতের প্রভাবেই বাঙলা নাট্যাঙ্গিক সম্পূর্ণত বর্ণনাত্মক ভঙ্গিটি অর্জন করেছে। ... সঙ্গীতের ভূমিকা বাঙলা নাটকে অমোচ্য। একে পরিত্যাগ করলে বাঙলা নাটকের ঝলমলে রূপটি মঞ্চ থেকে বিদায় নেবে।"[১] বাঙালির সৃষ্ট এই সংগীত নির্ভর নাট্য আঙ্গিককে অনুসরণ করার নিমিত্তে নাট্যকার তাঁর 'হাতহদাই' নাটকে লোকজীবনের বিভিন্ন সংগীতকে তুলে এনেছেন।

ছড়ার ব্যবহার :

লোকসংগীতের ন্যায় ছড়াও লোকজীবনের একটি অন্যতম সম্পদ। গাছ-পালা, নদী-নালা, পশু-পাখি, মানুষজন, পাহাড়-পর্বত প্রভৃতি মানবজীবন সম্পর্কিত যেকোনো বিষয় অবলম্বন করে ছোট আকারের পদ্য যা মূলত আবৃতি করা হয় তাকেই ছড়া বলা যেতে পারে। লোকসংগীতের ন্যায় ছড়াও লোকজীবনে এক ব্যক্তি থেকে আরেক ব্যক্তিতে বংশ পরম্পরায় ঐতিহ্যগতভাবে মুখে মুখেই প্রবাহিত হয়ে থাকে। 'হাত হদাই' নাটকে ফেনী-নোয়াখালী অঞ্চলের লোকজীবনকে নাট্যকার বাস্তবসম্মত ভাবে তুলে ধরেছেন। তাই স্বাভাবিকভাবেই আলোচ্য নাটকে সমুদ্র উপকূলবর্তী ফেনী-নোয়াখালীর লোকজীবনে প্রচলিত নানা ধরনের ছড়াগুলি জায়গা পেয়েছে। নাটকের বিভিন্ন ঘটনা পরম্পরায় বিভিন্ন সময়ে যে সকল ছড়ার ব্যবহার লক্ষ করা যায় সেগুলি নিম্নরূপ -

নাটকের দ্বিতীয় পর্বে ক্ষিতীশ ও আনার ভাণ্ডারির কথোপকথন চলাকালে সেখানে চরের সাহসী মেয়ে চুক্কুনীর পিতা মোমেন মাঝির আগমন ঘটে। দুঃসাহসী চুক্কুনী দ্বিতীয় বিবাহ ভেঙে স্বামীগৃহ ছেড়ে পালিয়ে যায়। চুক্কুনীর এই বিষয়টিকে নিয়ে আলোচনার জন্য তার পিতা মোমেন মাঝি আনার ভাণ্ডারির শরণাপন্ন হয়েছে। সেখানে আলাপ চলাকালে নাটকের অন্যতম চরিত্র ইন্তু চুক্কুনীর এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে আচমকাই মুখে মুখে একটা ছড়া বানিয়ে ফেলে —

তাইরে নাইরে বন্ধুরে
কোম্বা খাইল উন্দুরে।
চুক্কুনীরে বিয়া দিলাম
হেনীর ঘাঁড়ের উতুরে।।
গাঙের পাড়।

('হাত হদাই', নাটক সমগ্র — ২, পৃ - ৩০।)

নাটকের পঞ্চম পর্বে রয়েছে কেন্দ্রীয় চরিত্র আনার ভাণ্ডারিকে নিয়ে বানানো একটি চরিত্রমূলক লোকছড়া। নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র চৌষট্টি বছরের বৃদ্ধ সারেং আনার ভণ্ডারিকে ঘিরে চর চান্দিয়ার লোকেদের মধ্যে চলে নানা ধরনের হাসি-ঠাট্টা, আনন্দ-

মজা। এই পরিপ্রেক্ষিতেই আনার ভাণ্ডারিকে নিয়ে বানানো মোদু মিঞার একটি ছড়া ইন্দ্রিছ-এর মুখে শুনতে পাওয়া যায় —

আনার কাগার পাকনা কেশ
আনার কাগা অইয়া গেল
দরবেশ দরবেশ।
চরের আনন্দমজা সকল হইল শেষ।।
(‘হাত হদাই’, নাটক সমগ্র — ২, পৃ - ৬০।)

উপরিউক্ত ছড়াগুলি ছাড়াও আলোচ্য নাটকে আরও দুটি ছড়া পাওয়া যায় —

১। তাইরে নাইরে নারে -
ছোলতানের দোকানের চা খাইতে ভুলবেন না রে -।
(‘হাত হদাই’, নাটক সমগ্র — ২, পৃ - ১৪০।)

২। কেশত পাকিল - দন্ত পড়িল
যৌবনে লাগিল ভাটি।
দিনে দিনে খসিয়া হড়িবে
রঙ্গিলা দেলানের মাডি গো।।
(‘হাত হদাই’, নাটক সমগ্র — ২, পৃ - ১৪৫-১৪৬।)

একথা নির্দ্বিধায় বলা যেতে পারে যে, ছড়া হল লোকসমাজের দৈনন্দিন জীবনের সামগ্রী। উঠতে-বসতে লোকসমাজে ছড়ার প্রয়োগ লক্ষ করা যায়। হাসি-ঠাট্টার খোরাক যোগাতেই হোক, কিংবা জনগণকে কোনো নির্দিষ্ট বিষয়ে সচেতন করার উদ্দেশ্যেই হোক, কিংবা জীবনের গভীর রহস্যকে উন্মোচন করতে লোকজীবনে ছড়ার ভূমিকা যথেষ্ঠ। নাটকে উল্লিখিত উপরিউক্ত ছড়াগুলি থেকে তারই আভাস মেলে।

প্রবাদের ব্যবহার :

প্রবাদ হল মনুষ্য সমাজের জীবন অভিজ্ঞতার ফসল। মানুষ জীবনে যা কিছু অভিজ্ঞতা অর্জন করে, সেই অভিজ্ঞতাগুলি যখন একটি সংক্ষিপ্ত বাক্যে সুন্দরভাবে সাজিয়ে প্রকাশ করা হয় তখন তাকে প্রবাদ বলা যেতে পারে। লোকসংগীত ও ছড়ার মতো প্রবাদও লোকসমাজের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। যা লোকসাহিত্যের অন্তর্গত। সেলিম আল দীনের ‘হাত হদাই’ নাটকে তিনটি মাত্র প্রবাদ শ্রেণির উপাদানের উল্লেখ মেলে। সেগুলি নিম্নলিখিত —

১। মোদু মিয়ার ইংরেজি
একই খাচায় সাপ বেজি।
(‘হাত হদাই’, নাটক সমগ্র — ২, পৃ - ১৭।)

২। মিচা গপের পিডা ভাজিছ না
(‘হাত হদাই’, নাটক সমগ্র — ২, পৃ - ২০।)

৩। হিতে বিপরীত অইব।

('হাত হদাই', নাটক সমগ্র — ২, পৃ - ৩০।)

উপরিউক্ত ১ নং প্রবাদটি আলোচ্য নাটকের প্রথম পর্বে মোক্কার কণ্ঠে শোনা যায়। মোদু মিঞা ভালো ইংরেজি বলতে পারে না। তাই তার ইংরেজি বলা নিয়ে উক্ত প্রবাদটির সৃষ্টি হয়েছে। দ্বিতীয় প্রবাদটি নাটকের প্রথম পর্বে ইন্দ্রিছ-এর কাছে শোনা যায়। তৃতীয় প্রবচন শ্রেনীর বাক্যটি উক্ত নাটকের মূল চরিত্র আনার ভাণ্ডারির মুখে শোনা যায়। লোকসমাজের মানুষ জীবন অভিজ্ঞতা ব্যাপারে সঞ্চিত বিষয়গুলি সাধারণত বিভিন্ন প্রবাদের মাধ্যমেই প্রকাশিত করে থাকেন। উপরিউক্ত প্রবাদগুলির মাধ্যমে তারই পরিচয় মেলে।

লোকবিশ্বাস ও লোকসংস্কারের ব্যবহার :

প্রত্যেক লোকজীবনেই রয়েছে কতকগুলি বিশ্বাস ও সংস্কার। এই বিশ্বাস ও সংস্কারের বশবর্তী হয়েই লোকসমাজে জীবন নির্বাহিত হয়। সেখানে আধুনিক বিজ্ঞানমনস্ক যুক্তি-তর্কের কথা প্রায় নিরর্থক। লোকজীবনের এই বিশ্বাসের উৎপত্তি কোথায় ও কীভাবে হয়েছে? তার কারণ অনুসন্ধান করলে নির্দিষ্ট কোনো স্রষ্টা বা ব্যক্তির খোঁজ পাওয়া প্রায় দুষ্কর। এই লোকবিশ্বাসগুলি লোকজীবনে বংশপরম্পরায় এক জীবন থেকে আরেক জীবনে প্রবহমান। তবে সকল লোকবিশ্বাসই যে ঐতিহ্যসূত্রে প্রাপ্ত হয়ে থাকে তা কিন্তু নয়। কখনো কখনো এই লোকবিশ্বাসগুলি একেবারে সাম্প্রতিককালেরও হয়ে থাকে। যাইহোক, আলোচ্য 'হাত হদাই' নাটকে বিভিন্ন সময়ে কুশীলবদের মধ্যে নানান ধরনের লোকবিশ্বাসের উল্লেখ মেলে সেগুলি নিম্নলিখিত —

১। ক্ষিতীশ। আমনের ওঁচে ভূতের ভর আছে ভাণ্ডারি সাব – শিব শিব – রাম রাম।

('হাত হদাই', নাটক সমগ্র — ২, পৃ - ২৯।)

২। ছোলতান। মাইনষে কয় হুনি – অনঅ বলে সোলাইমান নবী আর খিজির সাবের লগে দেও দৈত্যের যুদ্ধ অয়।

('হাত হদাই', নাটক সমগ্র — ২, পৃ - ৩২।)

৩। ক্ষিতীশ। ঋতুকালে নারীর আঁচলের বাতাস লাইগলে – ঋতু-নারী দুধ টোবা ছুঁইলে -সহবাসের পর স্নান ন করি দই বসাইলে – মুখ খারাপ – গালিগালাজ কইরলে – দেইখবেন – সকালে দই এর শরীর ফাডি ফাডি রইছে।

('হাত হদাই', নাটক সমগ্র — ২, পৃ - ৬২।)

৪। মছলন। হেঁতালের ফুল আর বাঘের লোম – রাতে বেদনায় বড় উপুকারী – মাত্র পঁচ সিয়া –

('হাত হদাই', নাটক সমগ্র — ২, পৃ - ৯১।)

৫। বৃদ্ধ। এত ডরাওরে কা ক্ষিতীশ – আফাজ গায়েনে খিজির নবীর গান কইব – তুফানের মাথা ঠান্ডা অই যাইব

('হাত হদাই', নাটক সমগ্র — ২, পৃ - ৯৫।)

৬। আনার। না-না-রে বাউ – মাপ চাই এক্কারে।– ছেরাজ মিয়া – অই – অই মিয়া দূরো – কন জীন ভূতের পাল্লায় হইড়লামরে খোদা।– দেখি মছলন শা'র মন্ত্র।

('হাত হদাই', নাটক সমগ্র — ২, পৃ – ১০৮।)

৭। হাইশ্‌শা। শীতলা দেবীর কোপ। গাঙ্গের কূলের মণ্ডপ ঘর – নিশি রাইত্রে শীতলার গাধা হাঁচি দিল – পষ্ট হুইনছিগো দাদা।

('হাত হদাই', নাটক সমগ্র — ২, পৃ – ১২৭।)

৮। সব। এমন শিকারি নাই যে ডেঙ্গুইরা ধাবায় না। ডেঙ্গুইরা ধরনের মন্ত্র আছে – মন্ত্রদি পাখির উজানের গতি আবেশ করি লইতে অয়।

('হাত হদাই', নাটক সমগ্র — ২, পৃ – ১৩৩।)

নাটকের বিভিন্ন সময়ে প্রমুখ চরিত্রের মুখে কথিত প্রত্যেকটি সংলাপের মধ্যেই রয়েছে লোকবিশ্বাস ও লোকসংস্কারের নিদর্শন। লোকজীবনের বহু সংস্কার ধর্মীয় নির্দেশ অথবা আচার-আচরণ থেকে সৃষ্টি হয়ে থাকে। আমাদের আলোচিত উপরিউক্ত প্রথম লোকসংস্কারটিতে তারই প্রমাণ মেলে। শিব অথবা রামকে হিন্দু ধর্মে ভগবান বলে মানা হয়। তাই অশুভ শক্তির বিনাশের ক্ষেত্রে ভগবানের নাম উচ্চারণের সংস্কার রক্ষা করা হয়েছে উক্ত সংস্কারটিতে। লোকসমাজের বেশিরভাগ সংস্কার ও বিশ্বাসের উৎপত্তির মূলে রয়েছে ধর্মীয় ও পৌরাণিক কাহিনি। দ্বিতীয় লোকবিশ্বাসটি ধর্মীয় ও পৌরাণিক কাহিনির পরিপ্রেক্ষিতেই সৃষ্টি হয়েছে। লোকসমাজের বিভিন্ন সংস্কারকে আপাতভাবে অর্থহীন বলে মনে হলেও কিছু কিছু সংস্কার আছে যেগুলির পেছনে একটি উপযুক্ত যুক্তি বা কারণ অবশ্যই বর্তমান থাকে। তবে সেক্ষেত্রে অনেক সময় প্রকৃত কারণকে খুঁজে পাওয়া কঠিন হয়ে ওঠে। যেমন, উপরে উল্লিখিত তৃতীয় লোকসংস্কারটিতে তার কিছুটা আভাস পাওয়া যায়। এখানে সহবাসের পর স্নান না করে দই বসালে দইয়ের শরীর ফেটে যাওয়ার পেছনে প্রকৃত কারণটি অনুল্লিখিতই রয়েছে। দই ফেটে যাওয়ার পেছনে নারীর আঁচলের কিংবা সহবাসের কোনো সম্পর্ক নেই। তবে দই ফেটে যাওয়ার পেছনে বিভিন্ন ব্যাক্টেরিয়ার একটা সম্পর্ক হয়তো থাকতে পারে। কিন্তু সেই প্রকৃত কারণের কথা সেখানে উল্লেখ করা হয় নি। এটি যুক্তিগ্রাহ্য লোকসংস্কারগুলির একটি বড় বৈশিষ্ট্যও বটে। এইরকমভাবে লোকজীবনে ব্যবহৃত প্রত্যেকটি লোকসংস্কারের পেছনে রয়েছে যুক্তিগ্রাহ্য ভাবনা।

লোকখেলাধুলা :

লোক খেলাধুলাও লোকজীবনের একটি অন্যতম উপাদান। আলোচ্য নাটকে বাংলাদেশের ফেনী-নোয়াখালী অঞ্চলে প্রচলিত বিভিন্ন লোক খেলাধুলার উল্লেখ লক্ষণীয়। এই নাটকে বিভিন্ন সময়ে যেসব লোক খেলাধুলা বর্ণিত হয়েছে সেগুলি হল – ঘুড়ি ওড়ানোর খেলা, গোল্লাছুট খেলা, হাড্ডুডু খেলা, লাঠি খেলা, মোরগ লড়াই, পাঞ্জা খেলা।

লোকভাষা :

আলোচ্য নাটকে বাংলাদেশের সমুদ্র উপকূলীয় ফেনী-নোয়াখালী অঞ্চলের লোকসমাজে প্রচলিত ভাষার ব্যবহার লক্ষণীয়। এই ভাষার প্রয়োগে নাটকের পাত্রপাত্রীগণের মনোভঙ্গি, তাদের আচার-আচরণ, বিশ্বাস, অভ্যাস প্রভৃতি অতি বাস্তব সম্মতভাবে ফুটে উঠেছে। নাট্যকার সেলিম আল দীনের পিতৃভুমি ছিল ফেনী জেলার সেনেরখিল গ্রাম। সেকারণেই এই সমুদ্র উপকূলীয় অঞ্চলের ভাষার সঙ্গে বাল্যকাল থেকেই তাঁর পরিচয় ছিল। এই ভাষার বিশেষ ধরনের উচ্চারণ ও কথা বলার টানের সঙ্গে সেলিম আল দীনের ছিল প্রত্যক্ষ পরিচয়। তাই এই নাটকের ভাষা প্রয়োগে নাট্যকার যথেষ্ট নিপুণতার পরিচয় দিয়েছেন।'হাত হদাই' নাটকের ভাষা প্রয়োগে নাট্যকার এই নাট্যগ্রন্থের ভূমিকায় জানিয়েছেন – '... হাত হদাই সেই ভাষাতেই লেখা হয়েছে — যা বাংলাদেশের ফেনী-নোয়াখালীর বিস্তীর্ণ উপকূলীয় অঞ্চলে প্রচলিত। ... হাত হদাই নাটকে কোন একটি গ্রাম বা বিশেষ অঞ্চলের ভাষারীতিকে আদর্শ মান্য করা হয় নি। এতে ফেনী-নোয়াখালীর সমগ্র উপকূলীয় ভাষার সামগ্রিক বৈশিষ্ট্যের একটি সাধারণীকৃত ভাষাভূমি রচিত হয়েছে।'[২]

'হাত হদাই' নাটকে আঞ্চলিকভাবে পরিবর্তিত শব্দরাশি : পর্দা > হর্দা, পাহাড়ে > ফাআড়ে, আমাদের > অংগো, স্রোত > হোঁত, নেশা > রিশা, ছুটে > ছুডে, আমার > আঁর, দেওয়া > দেঅন, ঠাকুর > ঠাউর, মামা > মামু > মাউ, বৃক্ষ > বিরিক্ষ, শিকড় > হিকড় > হিঁয়, বুড়া > বুইয়া, অতীতকালে > হৈতকালে, পুরুষ মানুষ > মরদেপোলা > মরদোলা, নিদ্রা > নিন্দ > নিন, লেখা নয় > লেয়া ন, আটবার > আইষ্টেবার, ওখানে > হেট্টে, কামড়ে > কাম্বাই, সর্ষের তেল দিয়ে > খৈরর তেল দি, চিহ্ন দিয়ে > চিন মারি, শরীরের অভ্যন্তরে > শইল্লের মধ্যে, বড়টা > বড্ডা, পর্যন্ত > হইরযন্ত, কতটা বড় > কত্তড্ডা, স্থির হও > থিঅ থিঅ, চালকুমড়া > চালকোম্বা ইত্যাদি।

শব্দভাণ্ডার :

দেশি শব্দ : ঢল, ডিঙা, ঘুড়ি, কেউটিয়া, হাডুডু,

ইংরেজি শব্দের পরিবর্তিত রূপ : হিস্টরি > পিস্টরি, ব্রেকফাস্ট > বেরেকফাস্ট, ফাইট > পাইট, ডিফারেন্স > ডিপারিং, অ্যারেঞ্জ ম্যারেজ > চেকেন ম্যারিজ, সেটেল > চেটেল,

ধ্বন্যাত্মক শব্দ : বনবন, লিকলিক, দানাদানা, ফিসফিস, প্যাটপ্যাট, ঠাসঠাস, ঢিসুমঢিসুম, খকখক,

অপিনিহিতি : থাকলে > থাইকলে, নাচতে > নাইচতে, কবি > কইবি, আজ > আইজ, রাজ্যে > রাইজ্যে, কাল > কাইল, ভাগ্যে > ভাইগ্যে,

ক্রিয়া :যানগই (চলে যান), ডলি (ঘষে), লই যাই (নিয়ে যাই), হলানের (পালানোর), মুছাইদি (মুছে দেই), থিঅ থিঅ (স্থির হও), বাঝি গেছে (বেধে গিয়েছে),

ছন্দ :

তাইরে নাইরে/ বন্ধুরে = (৪+৩)

কোম্বা/ খাইল/ উন্দুরে। = (৪+৩)
চুক্কুনীরে/ বিয়া/ দিলাম = (৪+৩)
হেনীর/ ঘাঁড়ের/ উতুরে।। = (৪+৩) (স্বরবৃত্ত ছন্দ)
('হাত হদাই', নাটক সমগ্র — ২, পৃ - ৩০।)

অলঙ্কার :

এককানা টান মারি যান না রে বাউ **দাদা**।
লগো আছে পান সুপারি চুন আর **শাদা**।। (অন্ত্যানুপ্রাস)
('হাত হদাই', নাটক সমগ্র — ২, পৃ - ১৭।)

নাট্যকার সেলিম আল দীনের মধ্যে সর্বদাই দেশজ ঐতিহ্যের প্রতি ছিল অগাধ মমত্ববোধ ও গভীর ভালোবাসা। দেশীয় শিল্পরীতি ও সংস্কৃতির প্রতি এই ভালোবাসা থেকেই জন্ম নিয়েছে তাঁর সৃজন ও ভাবনার স্বাতন্ত্র্য। জাতির ঐতিহ্যের প্রতি এই ভালোবাসার টানেই তিনি ধাবিত হয়েছিলেন বাংলা নাটকের শিকড় সন্ধানে। শিকড় সান্ধানী এই নাট্যকার মধ্যযুগে প্রচলিত বাঙালির নানান ধরনের উপস্থাপন রীতিকে (পাঁচালি, যাত্রা) আধুনিকতার ছাঁচে ফেলে তাকে নতুনভাবে নির্মাণ করেছেন। এই নতুন শিল্পরীতিকে তিনি নাম দিয়েছেন 'কথানাট্য'। তাঁর এই শিল্পরীতি পাশ্চাত্য শিল্পরীতির থেকে একেবারেই আলাদা। চরিত্রের সংলাপ নির্ভরতার পরিবর্তে এখানে গায়েন-এর কথা ও বর্ণনাই প্রধান ভূমিকা পালন করে। তিনি বাংলা নাটকের নতুন আঙ্গিক নির্মাণের মধ্যেদিয়ে বাঙালির হাজার বছরের শিল্পরীতিকে সংরক্ষণ করার প্রয়াস করেছেন। পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রচলনের ফলে বাঙালির শিল্পরুচিতে ঘটে ব্যাপক পরিবর্তন। ফলে এদেশের যা কিছু দেশীয় ঐতিহ্য তা ধীরে ধীরে লোক উপাদানে পরিণত হয়। নাট্যকার সেলিম আল দীন এই লুপ্ত-প্রায় গ্রামীণ লৌকিক উপাদানকে পুনরাবিষ্কার করে তাকে নাটকে ব্যবহার করেছেন। দেশীয় নাট্য-আঙ্গিক ও সংস্কৃতিকে সংরক্ষণের জন্য তিনি একান্তভাবে ব্রতী ছিলেন। এই কারণেই তিনি প্রাচ্য নাট্য-আঙ্গিকে লোকায়ত জীবনকে তাঁর নাটকে তুলে ধরেছেন। আর এই উদ্দেশ্য নিয়েই তিনি তাঁর নাটকে লোকজ উপাদানগুলি বেশি বেশি করে ব্যবহার করেছেন। তিনি লোকনাট্যের আঙ্গিকে নাটক রচনা করেছেন, ফলে তাঁর নাটকে ব্যবহৃত লোকজ উপাদানের ব্যবহার যুক্তিসম্মত হয়েছে। আঙ্গিকের কথা বাদ দিলেও তিনি নাটক রচনার ক্ষেত্রে লোকায়ত জীবননির্ভর কাহিনি ও চরিত্র নির্বাচন করেছেন। ফলত একথা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে যে নাটকে লোকজ উপাদান ব্যবহারে নাট্যকার সেলিম আল দীন অনেকাংশেই সার্থক হয়েছেন। এবং এই লোকজ উপাদানগুলির ব্যবহার তাঁর নাটকে উপযোগী হয়েছে বলেই মনে হয়।

তথ্যসূত্র :

১. হারুন, রশীদ। "সেলিম আল দীনের নাট্যনির্দেশনা নন্দনভাষ্য ও শিল্পরীতি।" ঢাকা, ইছামতি প্রকাশনী, ২০১১, পৃ - ৫৫।

২. দীন, সেলিম আল। "হাত হদাই।" নাটক সমগ্র — ২, ঢাকা, মাওলা ব্রাদার্স, প্রথম প্রকাশ এপ্রিল ২০১৩, পৃ - ৫৮২।

সাধন চট্টোপাধ্যায় নদীকেন্দ্রিক উপন্যাস “গহিন গাঙ”: সুন্দরবনের মালো সম্প্রদায়ের জীবন ইতিহাস

রণজিৎকুমার বাউলিয়া
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ,
নবগ্রাম হীরালাল পাল কলেজ

। **এক** ।

উপন্যাস সাহিত্যের একটি জনপ্রিয় শাখা সেই সূত্রে বলা যায়-“উপন্যাস যে গদ্যে বর্ণিত কল্পিত আখ্যানের মাধ্যমে জীবন ব্যাখ্যা-জনশ্রুতির দৌলতে এ কথা আমাদের মুখস্থ।“সরোজ বন্দোপাধ্যায়-‘বাংলা উপন্যাসের কালান্তর'-পৃষ্ঠা,৪

জীবন যে হেতু ঘটনার পরম্পরা, তাই উপন্যাস গড়ে ওঠে মানব জীবনকে কেন্দ্র করে।বিশ্ব সাহিত্য দর্পণে’আমরা জীবনের নানা রুপ দেখতে পাই। ঔপন্যাসিকের দর্শন সেই পথেয় ধাবিত হয়।ফলে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে অনেক ঔপন্যাসিক সৃষ্টির আলোতে আলোকিত। তাদের আখ্যান মূলত সামাজিক সাংস্কৃতিক রীতি-নীতি জড়িত জীবন দর্শনে প্রতিফলিত-“দেশে দেশান্তরে কালে কালান্তরে মানুষের জীবন ও উপলব্ধি যত রুপায়িত হয়েছে, আখ্যানের নিজস্ব বাস্তবতা আর সেই বাস্তব উপস্থাপনার ধরণ বদলে গেছে।“তপোধীর ভট্টাচার্য-‘আখ্যানের স্বরান্তর'-দিবারাত্রির কাব্য-পৃ (৯)

সামাজিক জীবনে মধ্যে বসবাস করা মানুষের জীবন যন্ত্রণার কথা সাহিত্যে প্রতিবিম্বিত হয়ে ওঠে রাজনৈতিক অর্থনৈতিক সামাজিক সাংস্কৃতিক ধর্মীয় পরিকাঠামোয়।এই পরিকাঠামোয় লেখক জীবন সংগ্রামের অঙ্কুরিত বীজ গুলি চরিত্রের ভাষা সংলাপে ফুটিয়ে তোলে।নগর থেকে উঠে আসা সেই সংস্কৃতি জীবন যন্ত্রণার কথা সাহিত্যে দানা বেঁধেছে। সাহিত্যের গতিমুখ গ্রাম গঞ্জ ছেড়ে নগরায়ন মুখি হয়ে উঠেছে। জীবনের চালচিত্র বদলে যাচ্ছে শ্রেণি সংঘর্ষ ও শোষণে।গ্রামীণ বৈচিত্র্যে পরিবর্তন ঘটে গেছে।জীবনের বক্রতা স্থূলতা রুচিবোধ উদ্ধমুখি হয়ে উঠেছে অর্থনৈতিক উন্নয়নকে সামনে রেখে।

বাংলা উপন্যাস সাহিত্যের জনক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।পরবর্তীতে রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র ও তিন বন্দোপাধ্যায় প্রত্যেকের উপন্যাসে আখ্যান মূলত সামাজিক জীবন সংগ্রামের।এরই পাশাপাশি সুখ- দুঃখ, হিংসা- বিদ্বেষ, প্রেম-ভালোবাসা ও রীতি- নীতি স্বমহিমায় উদ্ভাসিত। পল্লীজীবন কেন্দ্রিকতার পাশাপাশি নদী কেন্দ্রিক উপন্যাসে জীবন সংগ্রাম ও জীবন যন্ত্রণার আখ্যান নিয়ে রচিত হয়েছে সাধণ চট্টোপাধ্যায়ের-‘গহিন গাঙ' ।এছাড়া নদী কেন্দ্রিক বহু উপন্যাসে জীবন ইতিহাস বিধৃত হয়েছে বহু আঙ্গিকে।

। **দুই** ।

জীবনের বহু বিচিত্র অভিজ্ঞতার শিল্পীত রূপ হল উপন্যাস।বাস্তবের প্রতিভাসিত (জীবন আলেখ্য)/রূপই হল উপন্যাস।সমাজ-রাষ্ট্র-রাজনীতির মাঝখানে থেকে এক বা একাধিক মানুষের নিরন্তর সংগ্রাম,বোঝাপড়া, হৃদয়কথা যখন যথাযথ রূপ পায় তখন সে শিল্পকে উপন্যাস বলে।

মধ্যযুগের অলীক স্বপ্নের বিছানা ছেড়ে উপন্যাস চোখ খুলেছিলো বাস্তবের আরশিতে।স্বপ্ন,জাদু, মায়া,মোহ,মধ্যযুগীয় বীর্যগাথা সরে গিয়েছিল সময়ের সঙ্গে। শিল্প বিপ্লবের পর সমস্ত দুনিয়াব্যাপী অলৌকিক কুয়াশার ঘোর কাটতে শুরু করেছিল।যুক্তি,তর্ক মুক্তবুদ্ধি, বিজ্ঞান যন্ত্রযুগ যতই এগিয়েছিল মানুষ ততই সত্যনিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল।উপন্যাসের কাহিনীর বীজ উড়ে এসে পড়েছিল বাস্তব চিন্তা চেতনার কঠিনভূমিতে।

উপন্যাস হলো আধুনিক জীবন সংকটের বাস্তবসম্মত গদ্যভাষ্য। প্রকৃত সংকটের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে উপন্যাস রচিত হয়।আজকের উপন্যাসের বিষয় বাস্তব জীবন সত্য। সমাজ বাস্তবতার মধ্যে দুই ভাবে সৃষ্ট-(ক) প্রত্যক্ষ,(খ) অপ্রত্যক্ষ।
প্রত্যক্ষ হল-সামাজিক (সমাজ বাস্তব জীবন কেন্দ্রিক)।
অপ্রত্যক্ষ হল-মনস্তাত্ত্বিকও চেতনাপ্রবাহ রীতি মূলক উপন্যাস।
উপন্যাসে কল্পনার বিস্তার আসতে পারে কিন্তু তা কখনোই বাস্তবতাকে লঙ্ঘন করে না।(ঘটনা,চরিত্র,দ্বন্দ্ব তো আছেই)

শিল্প সাহিত্যে 'বাস্তব' শব্দটি এসেছে বিশেষ দর্শন থেকে।শিলার এবং শ্লেগেল, এই দুই দার্শনিক শিল্প-সাহিত্যে External Reality অর্থে'Realism'শব্দটি গ্রহণ করেন।'External Reality'যদি সাহিত্যের বাস্তব হয় তাহলে বিষয়টি হলো বাস্তববাদী সাহিত্যের সর্বস্ব।এ প্রসঙ্গে স্মরনীয় যে,আমাদের চোখের সামনে যা আছে সে বিষয়টাকে হুবহু উপস্থাপন করার অর্থ বাস্তবতা নয়। কেননা,উপন্যাস ইতিহাস বা বিঞ্জানের মতো প্রমাণ করতে চায় না।**১** আবার ফটোগ্রাফের মতো প্রত্যক্ষ বিষয়কে সরাসরি তুলে ধরার দায়ও ঔপন্যাসিকের নেই।জীবনের নিজস্ব অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধি জাত প্রত্যক্ষ সত্তার আঁধার হল উপন্যাস।

বিশ শতকে মূলত নিম্নবর্গের জীবন কে কেন্দ্র করে বাস্তববাদের প্রবর্তন ঘটেছে। ইংরেজি Novel কথাটির উৎসমূল ল্যাটিন শব্দ 'Novella',নভেলা শব্দটির প্রকৃত অর্থ হলো নতুন জিনিস বা 'অভিনব বস্তু'।যে গ্রন্থ থেকে ঐ শব্দের প্রকৃত উদ্ভব ও বিস্তার ইতালীয় লেখক বোকাচ্চিত্ত-র লেখা সেই 'দেকামেরন' (Decameron) (১৩৪৮-১৩৫৩) গ্রন্থটি সত্যিই সে যুগে ছিল-'Novella Story'বা নতুন গল্প।ইংরেজি সাহিত্যের আদর্শেই রচিত হয়েছে বাংলা উপন্যাস। ইংল্যান্ডের চসার রচিত-ক্যান্টারবারি টেলস্ তুলে ধরেছেন বাস্তব ভুবনের ছবি।

'Novel'-নোভেল এর পারিভাষিক শব্দ রূপে উপন্যাসের ব্যবহার।গল্পও উপন্যাস শব্দের প্রাচীন অর্থ 'লাগানো','নিন্দা করা','বানিয়ে বলা' এক কথায়'যা নয় তাই বলা।' উপন্যাস শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো 'অত্যাশ্চর্য কাল্পনিক কাহিনী'বঙ্কিমচন্দ্র উপন্যাস অর্থে-'রচা'কথা বুঝিয়েছেন (দেবী চৌধুরানী)।

রবীন্দ্রনাথের ভাষায়-"মানুষ গল্প পোষ্য জীব গল্পের প্রয়োজনে উপন্যাসের সৃষ্টি।"E.M. Forester ও 'The Aspects of Novel' গ্রন্থে বলেছেন- The fundamental aspect of the Novel is its story telling aspect.'

আধুনিক কথাসাহিত্যে উপন্যাসের উদ্ভবের কারণ রূপে উল্লেখ করা যায়।

(ক) শিল্প সভ্যতার ক্রমপ্রসার।

(খ) বৈজ্ঞানিক চিন্তার বিকাশ।

(গ) যুক্তিবাদের প্রতিষ্ঠা।

(ঘ) বাস্তব ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য ব্যাপারে মানুষের আগ্রহ ও মানব চরিত্রের রহস্যময় কার্যকলাপ সম্পর্কে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি।যে দেশের সমাজে উপরিউক্ত মানবিক ও মানসিক বিবর্তন ঘটেছে সেই দেশে উপন্যাসের আবির্ভাব ঘটেছে।

। **তিন** ।

এই সূত্রে বলা যায়-একাদশ শতকের জাপানি লেখিকা মুরাসিকির'গেনজীর কাহিনী'-কে বিশ্ব সাহিত্যের প্রথম উপন্যাস বলা যায়।চতুর্দশ শতকে ইতালির নবজাগরণ এর ফলে ইউরোপের বিভিন্ন মানুষের মনে প্রাচীন সামন্তযুগীয় বিশ্বাসের অবসান ঘটেছিল।মানুষের স্বাধীনসত্ত্বা,ও আত্মমর্যাদার জাগরন ঘটে,কুসংস্কারের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়,মানবিকতার প্রসার ঘটে।

মুদ্রা যন্ত্রের আবিষ্কারের ফলে সেই প্রসারতা ব্যাপ্তি ঘটল।সাহিত্য অঙ্গনে আবির্ভূত হল রাবেলের মত কথাকার, সারভেনটিসের মত উপন্যাসিক।

অষ্টাদশ শতকে ইংল্যান্ডে অগষ্টান যুগে সাধারণ মানুষের জীবনধারণ কেই চরম আদর্শ বলে ঘোষণা করা হল।নানাবৃত্তির মানুষেরা পৃথক শ্রেণি গড়ে তুলেছিলেন। ফলে অষ্টাদশ শতকে জন্ম হয়েছিল ইংরেজি সাহিত্যের প্রথম উপন্যাস রিচার্ডসনের প্যামেলা- Pamela,(or Virtue Rewarded-(১৭৪৮)

কারো মতে সতের শতকের স্পেনীয় লেখক সের ভান্তেস এর ডন কুইজোট উপন্যাসের সমাজ বাস্তবতার অনুসন্ধান চোখে পড়ে।ড্যানিয়েল ডিফো'রবিনসন ক্রুশো' প্রভৃতি প্রথম উপন্যাসের গ্রন্থ মর্যাদার দাবিদার।

এই সময়ের মধ্যে জন ব্যানিয়ান রচিত।ড্যানিয়েল ডিফো(Daniel Defoe-(১৬৬০-১৭৭১)-এর 'রবিনসন ক্রুশো' (Life and Strange Surprising Adventures of Robinson Crusoe-(১৭১৯) রিচার্ডসনের পামেলা (১৭৪০) হেনরি

ফিল্ডিং এর জোসেফ অ্যান্ডুজ(The History of The Adventure of Joseph Andrews, (১৭৪২)ইংরেজি কথা সাহিত্যের ধার উন্মোচনকারী সৃষ্টি।২

উনিশ শতকে রুশ সাহিত্যের সূচনা।রাশিয়ার নিকলাই গোগেল,ইভান তুর্গেনিভ,লিও টলস্টয়,ফিওদর দস্তয়েভস্কি, আন্তন চেকভ উপন্যাস শিল্পকে বিশ শতক সময় ব্যপ্তি দিয়েছেন।

(১)গোগলের-Dead Souls(১৮৪২) এ প্রসঙ্গে উল্লেখের দাবি রাখে।

(২)অ্যামেরিকার নাথেনিয়াল হর্থন এর-‘The Scarlet Letter’-(১৮৫০)এবং

(৩)হারমান মেলভিলের-‘Moby Dick'

-নিঃসন্দেহে উপন্যাস সৃজনের মাইলস্টোন।

উনিশ শতকে: ইংল্যান্ডের স্কট, ডিকেন্স,জর্জ মেরিডিথ,টমাস হার্ডি উপরূপ নির্মাণের জন্য এনেছিলেন স্বকীয়তা।ইংরেজি উপন্যাস অনুসরণে উনিশ শতকে বাংলা উপন্যাস হল- 'ফুলমনি করুনার বিবরণ'(১৮৫২) সুকুমার সেনের মতে।

বাংলা ভাষায় গদ্য আখ্যান প্রকাশিত হয় উনিশ শতকের প্রথম দশক থেকে।কারো কারো মতে দ্বিতীয় দশক থেকে উপন্যাস রচনার সূচনা। ১৮২১খ্রীঃ২৪ফ্রেবুয়ারি ‘সমাচার দর্পণ-এ প্রকাশিত হয় ‘বাবু উপাখ্যান’।

ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এর ‘নববাবু বিলাস’নব-বিধি বিলাস,কলিকাতা কমলালয়।হ্যানা ক্যাথারিণ ম্যলেন্সের-‘ফুলমণি ও করুণার বিবরণ(১৮৫২), টেকচাঁদ ঠাকুরের-‘আলালের ঘরের দুলাল(১৮৫৮)-May be said to be first Nobel in Bengali Language.

কালীপ্রসন্ন সিংহের-‘হুতুম প্যাঁচার নকশা'।ভূদেব মুখোপাধ্যায় ঐতিহাসিক উপন্যাস (‘অঙ্গুরীয় বিনিময়) সচেষ্ট প্রয়াস।গোপীমোহন ঘোষের ‘বিজয় বল্লভ (১৮৬৩)উপন্যাসের পদবাচ্য।

কিন্তু উপন্যাসের সবগুলি লক্ষণের সার্থক প্রকাশ প্রথম দেখা যায় বঙ্কিমচন্দ্রের ‘দুর্গেশনন্দিনী'(১৮৬৫)।

বাংলা সাহিত্যে সার্থক উপন্যাস রূপে সম্মানিত।বঙ্কিমের হাতে বাংলা উপন্যাসের দেহে প্রাণের সঞ্চার।

বিশ শতকের উপন্যাস এর অন্যতম প্রধান লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায় জীবন ব্যাখ্যার সূত্রে অন্তর্মুখীনতা,-ফ্রয়েড,ইয়ং।এছাড়া ফ্লোবেয়ারের শিক্ষা, জয়েস,লরেন্স প্রমুখ শিল্পীর সাধনায় নতুন ধারার উপন্যাস সূচিত হয়।উপন্যাসিক জীবনের সমস্যা অনুসন্ধানে থিম খুঁজছেন।কারণ থিম বা বিষয়বস্তু উপন্যাসের একটা প্রধান কথাএর মধ্যে ফুটে ওঠে দ্বন্দ্ব-সংঘাত।নাটকীয় দ্বন্দ্ব থেকে তার চেহারা পৃথক-এই সময়ে ‘জন স্টেনবেক,লুইস,আর্নেস্ট হেমিংওয়ে প্রমূখের শিল্প দৃষ্টিতে কেবল বাস্তবতার চিত্র নয় জীবনের নানা রূপ ও রঙ সুন্দর ভাবে ধরা পড়েছে।

।চার।

বাংলা সাহিত্যে বিশ শতকের নিম্নবর্গের জীবনকে কেন্দ্র করে বাস্তবতাবাদের প্রবর্তন ঘটেছে- সাধন চট্টোপাধ্যায়-‘গহিন গাঙ’উপন্যাসে- মালো জীবনের সংগ্রামের কাহিনী বর্ণিত। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়-‘পদ্মানদীর মাঝি'-উপন্যাসে জেলে জীবনের অনবদ্য ভাবনার প্রকাশ।তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়-‘হাঁসুলী বাঁকের উপকথাতে-নদীর সঙ্গে কাহারপাড়ার জনজীবনে কথা।‘কালিন্দী’-উপন্যাসে নদীর চরে গড়ে ওঠা সাঁওতাল উপজাতি গোষ্ঠির কথা। মহেশ্বেতা দেবীর –‘অরণ্যের অধিকার'উপন্যাসে-সাঁওতাল, মুন্ডা জীবন সংগ্রামের ইতিহাস।এসব উপন্যাস গুলিতে জীবন সংগ্রামের উদ্বর্তনের প্রসঙ্গ এসেছে, বিভিন্ন ভাবে।

সুন্দরবনের ইতিহাস কেউ কেউ লিখেছেন।আমার তা বিশেষ পড়া হয়ে উঠেনি। তবে গবেষণার সুবাদে ও সুন্দরবনের ভুমিপুত্র হিসাবে সেই ইতিহাসের জানা কিছুটা সম্ভব হয়েছে। হয়তো সে ইতিহাসে প্রাচীন থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত ব্যাপ্ত। সেই ইতিহাসের পাতায় উঠে এসেছে উপন্যাসের কাহিনি যা অতীত বর্তমানের চেহারার একই আছে।‘হয়তো সে ইতিহাসে আছে আঠারো কিম্বা উনিশ শতকের এই দক্ষিণ সীমান্তবঙ্গের ইতিবৃত্ত-যা আসলে ছিল মানুষের বসবাসের অযোগ্য, দূর্গম, বিপদসঙ্কুল,বৈদেশিক শত্রুদের এদেশে ঢোকার অবারিত দ্বার।ধর্মের নামে অধর্মের বিস্তার ঘটেছিল এবং দেশজ মানুষের কাছে অত্যাচারী হয়ে উঠেছিল।সব কিছুর মূলে যে ছিল অর্থ ও বাণিজ্যের সুদর্শন চক্রটি।‘‘**৩**সুন্দরবনের কাহিনী নিয়ে লিখিত হয়েছে অসংখ্য গল্প, উপন্যাস, কবিতা, তৈরি হয়েছে সাহিত্য চলচ্চিত্র ।সুন্দরবনের মানবজীবনের কথা বলতে গেলে অনেক কথাই মনে পড়বে। ‘আসলে,এখানকার মানুষ তাদের জীবনযাপনের মধ্য দিয়ে,রুজি-রুটির মধ্যে দিয়ে,অস্তিত্বের সংকট স্বীকার করে তাদের বেঁচে থাকার মধ্য দিয়ে অলিখিভাবে যা রেখে যাচ্ছে,তা হল প্রকৃত জয়গাথা।আর জয়ের যথার্থ ইতিহাস কখনো যথাযথ লিখিত হয় না।এখানে প্রত্যেকে নিজের মতো করে তার যুদ্ধ-জয়ে সামিল।'**৪**সেই কথা উপন্যাসে উঠে এসেছে।প্রাচীন সাহিত্য থেকে সাম্প্রতিক, নানা লেখায় লেখকরা সুন্দরবনকে মানুষের কাছে নিয়ে আসার প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছেন এবং এখনো তা চলছে।এখানকার মানুষের জীবনওজীবিকা যেহেতু আর পাঁচটি অঞ্চলের মতো নয়,তাই এখানকার বিষয়টি যথেষ্ট বৈচিত্র্যপূর্ণ।আরণ্যক প্রকৃতি, জলময় ভৌগোলিক বৈচিত্র্যময়, এই লীলাময় ‘শ্রীখন্ড'কে নিয়ে আবেগ বিহ্বল হওয়াই স্বাভাবিক।মনোজ বসুর- ‘জলজঙ্গল'অমিতাভ ঘোষের- ‘হাংরিটাইড' ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়-‘ডমরু-চরিত'(১৯২৩),নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়- ‘উপনিবেশ',বরেন গঙ্গোপাধ্যায়ের-‘বাগদা',’বন কেটে বসত', শচীন দাশের-‘অরণ্য পর্ব',তপন বন্দোপাধ্যায়ের-‘নদী মাটি মানুষ',সাধন চট্টোপাধ্যায়ের-‘গহীন গাঙ', মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়-‘পদ্মানদীর মাঝি', তারাশঙ্করের-‘গণদেবতা’অরণ্যবহ্নি, ‘কালিন্দী',

মহাশ্বেতা দেবীর-'অরণ্যের অধিকার' প্রভৃতি উপন্যাসে অরণ্য,নদী,ও নিম্নবর্গের কথা উঠে এসেছে ।এখানকার জীবন ও সংস্কৃতি-এখানকার মানুষের প্রাত্যহিক ঘটনাপ্রবাহ, তাদের জীবিকা, ব্যবসা-বাণিজ্য,আহার-বিহার-ভাষা, সামাজিক রীতিনীতি, লোকবিশ্বাস ও কুসংস্কার অর্থাৎ তাদের জন্মলগ্ন থেকে মৃত্যু-এই অখন্ড জয়কাব্য লিখিত হয়েছে সাহিত্যে প্রাচীন থেকে অধুনা অব্দি।এখানকার মানুষ প্রতিনিয়ত জয় করতে চায় পারিপার্শ্বিকতাকে।প্রতিকুলতাকে। শত্রু এখানে প্রকাশ্য নয়, আত্মগোপনকারী, অদৃশ্য শত্রু ওৎ পেতে থাকে।চরে,গাঙে, জঙ্গলে। আবার অতি সাধারণ দরিদ্র শ্রমিকদের ঘিরে থাকা দৃশ্য শত্রুর অভাব নেই।তারা কেউ ফড়ে দালাল,পাইকার কেউ বা দাদনদাতা মহাজন।এখানকার মানুষের জীবন ও জীবিকা যেহেতু আর পাঁচটা অঞ্চলের মতো নয়,তাই এখানকার সাহিত্যের বিষয় ও যথেষ্ট বৈচিত্র্যপূর্ণ।

। **পাঁচ** ।

'গহিন গাঙ' উপন্যাসটি প্রান্তিক শারদীয় সংখ্যায় **১৯৭৯** সালে প্রকাশিত হয়, এবং তার পরের বছর ১৯৮০ সালে 'প্রান্তিক'প্রকাশনা থেকে গ্রন্থকারে প্রকাশিত হয়।সুন্দরবন অঞ্চলের বসবাসকারী মাটিঘেষা মানুষের জীবন সংগ্রামের চিত্রকে অত্যন্ত সহমর্মিতার সঙ্গে চিত্রিত করেছেন আলোচ্য উপন্যাসে।স্বল্পায়তন এই উপন্যাসের মধ্যে অরণ্য, নদী,ও মানুষের জীবিকার সংগ্রামকে যে পরিভাষায় ব্যক্ত করেছেন তা নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। উপন্যাসের দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকায় লেখক জানিয়েছেন-"বিশেষ প্রয়োজনে সুন্দরবন অঞ্চলে কাটাতে হয়েছিল বেশ কিছু দিন।প্রত্যক্ষ করেছিলাম অরণ্য, নদী ও মানুষের জীবিকার সংগ্রাম। প্রতিদিনের বেঁচে থাকার লড়াইয়ের পাশাপাশি ধর্ম, লোকাচার,স্বপ্ন ও বিশ্বাসের দোলাচলে যে মানুষ বাঘ, কুমীর-কামোট ও 'মনুষ্য-দাপট' বুকে নিয়ে নোনা গাঙ-'গোন''বেগোন'-এর মতো, ইতিহাস তৈরি করছে- আধুনিকতা যাকে বলে ও সাব-অলটার্ন-এ উপন্যাস তাদের জীবনের কয়েকটা দিন।গহিন গাঙ-এর উদ্দেশ্য ও তাই।**৫**

আধুনিক কালে যাকে আমরা 'সাবলটার্ন'বলে চিহ্নিত করি তাদের জীবনসমস্যাকে উপন্যাসের আধেয় করে পাঠকের সামনে উপস্থাপিত করেছেন।তার লেখনীতে ফুটে ওঠে জীবন-বীক্ষার পরিচয়।তাই হাল আমলের অনেক সমালোচকের দৃষ্টি আকর্ষন করতে সক্ষম হন।আমার আলোচনার বিষয় হলো'গহীন গাঙ' উপন্যাসের মাটিঘেষা মানুষের জীবন যন্ত্রণার আখ্যান ও তার চিত্রবিদায়ক বর্ণনা।সাধারণভাবে তিনি সুন্দরবন অঞ্চলের দীনহীন অধিবাসীদের জীবন সমস্যার দিকটিকে আলোকপাত করেছেন। মূলত মালো জীবনের কথাকে তিনি প্রধান্য দিয়েছেন।স্বল্প পরিসরে এই উপন্যাসের বেতনা তীরবর্তী মালোজীবন সংস্কৃতিকে পুরোপুরি তুলে ধরতে প্রয়াসী হননি। প্রসঙ্গক্রমে নদীকেন্দ্রিক কয়েকটি উপন্যাসের মালো সংস্কৃতির সঙ্গেএই উপন্যাসের কিছু কিছু ক্ষেত্রে পার্থক্য তুলে ধরেছেন। অদ্বৈত মল্লবর্মণের-' তিতাস একটি নদীর নাম' উপন্যাসের তিতাসের মালোপাড়া ও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়-'পদ্মানদীর

মাঝি' 'উপন্যাসের কেতুপুরের মালোপাড়া সঙ্গে 'গহিন গাঙ' উপন্যাসের বেতনার মালো সংস্কৃতির।'তবে খুব কম সময়ে সম্পূর্ণ হওয়া এই উপন্যাসে অল্প কয়েকটি চরিত্রের মধ্যেও জীবনরস সঞ্চার করে মূল বক্তব্যকে হৃদয়গ্রাহী করে তুলেছেন।চিত্র কর যেভাবে তুলি দিয়ে তার চিত্র সম্পূর্ণ করে সাধন চট্টোপাধ্যায়ও সেভাবে মানস তুলির আঁচড়ে তার কাহিনি রচনা করেন।**৬**

সমালোচকের মতে-"......তাঁর মানুষ ও ইতিহাসে আস্থা, মানুষের সংগ্রামে শ্রদ্ধা থেকে যায়। কিন্তু অন্ধকার-অবসন্নতা-জটিল' ন যযৌ না তস্থৌ' গতিহীনতার চেতনাও স্পষ্ট হয়ে উঠতে থাকে।আর এ ক্ষেত্রে সাধন এক ঐতিহাসিক ও শ্রেণী ভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গিতে এগোন। তিনি জানেন,শত মার খেলেও, অ-মধ্যবিত্ত নিম্নবর্গীয় শ্রেণী কখনোই তার বহিরাশ্রয়ী জীবন চেতনা, সংযোগ হারায় না।"**৭**

উপন্যাসের শুরুতেই লেখক নিগৃহীত মাছ মারার ব্যর্থ জীবনকাহিনীকে তুলে ধরেছেন।তাদের মধ্যে খুব কম মানুষই বার্ধক্যের সিঁড়িতে পৌঁছানোর সুযোগ পায়-তার আগেই অপঘাত মৃত্যু এসে মালোদের গ্রাস করে।জীবন সংগ্রাম শুরু হওয়ার আগেই জ্বলন্ত প্রদীপকে অপঘাত মৃত্যু যেন ফুৎকারে নিভিয়ে দেয়। উপন্যাসের নায়ক শ্রীপদই প্রথম অপঘাতের মৃত্যু সংবাদ নিয়ে মালো পাড়ায় উপস্থিত হয়।তাদের জীবন ও যে অর্নিবচনীয় যাত্রা।মালোজীবনে বসে খাওয়ার রীতি নীতি নেই, অনিশ্চয়তা সত্ত্বেও মাছ মেরে জীবন নির্বাহ করতে হয়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় জীবিকার জন্য সংগ্রাম করতে গিয়ে ললিত বর্মণ অপমৃত্যুর ডাককে এড়াতে পারে নি। একদিকে অরণ্যের ডাক অন্যদিকে খটিদার মহাজনদের দাদনের লোভ তার মধ্যে সুন্দরবনের বাঘের উপদ্রব-এ ভাবেই চলতে থাকে মালোদের জীবন চক্র।পারিবারিক সামাজিক সাংস্কৃতিক সূত্রে ললিতের অকাল মৃত্যু ননীবালার জীবনে বিপর্যয় ডেকে আনে। মালো জীবনে মৃত্যুর পালা এভাবে চলতে থাকে মালো সমাজ তা মেনে নিতে বাধ্য। কারণ তাদের মতে-'ভাগ্যে যা লেখা থাকে'তা কখনোই খন্ডানো মানুষের পক্ষে অসাধ্য। মৃত্যু সর্বদাই তাদের যেন হাতছানিতে দিয়ে ডাকে।তাই ঔপন্যাসিক জানিয়েছেন-"মালো সমাজের অন্য নাম বিধবা পল্লী।মালোদের মধ্যে এমন কোনো পরিবার নেই, যাদের কোনো বউয়ের দেহে কালো পাড়ের থান ওঠেনি, শোকের শেল তোলেনি হাহাকার।এমন কোনো কুটির নেই যার বড় ছেলে অশৌচ পোষাকে খটিদার, মহাজনদের পায়ের তলায় ঘন্টার পর ঘন্টার বদলে দ'দশ টাকার সাহায্য পেয়ে সুদের গভীর বন্ধনে জড়িয়ে পড়েনি।"**৮**

মালোপাড়ার মানুষ অনিচ্ছা সত্ত্বেও এধরনের দুঃসংবাদের আশঙ্কায় দিন গুনতে থাকে।মালোরা কেবল এই দুঃসংবাদের জন্য জেগে থাকে,পরদিন থেকে আবার আগের মত জীবন সংগ্রামে লিপ্ত হয়।মালোরা বেতনার জল থেকে মাছ ধরে তা গঞ্জের খটিদারের কাছে বিক্রি করে,আর খটিদারেরা সে মাছ সংগ্রহ করে ভোরের শেষ লঞ্চে

ক্যানিং-এর মোকামে বা আড়তে চালান দেয়।শহরের সঙ্গে যোগাযোগের একমাত্র মাধ্যম লঞ্চ সার্ভিস বন্ধ হয়ে গেলে মাছ কেনা বন্ধ করে দেয়।আর সেভাবে খটিদারেরা শাসক গোষ্ঠীর সহায়তায় জেলেদের লঞ্চের ভয় দেখিয়ে শোষণ করতে থাকে।কেবলমাত্র লঞ্চের ভয় দেখানো নয় খটিদার ও মহাজনদের কুচক্রান্তে মালোরা স্বাধীন ভাবে জীবন যাপন করতে পারে না।তারা সুদের গভীর জালে মালোদের আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রাখে। ঈশ্বর মেদিনীপুর জেলা থেকে কপর্দকহীন অবস্থায় বাদা অঞ্চলে এসে সুদের কারবারের মাধ্যমে প্রচুর অর্থ উপার্জন করে।তার কাছে ইহজীবনে একমাত্র আরাধ্য বস্তু হল টাকা।খটিদার আবদুলের সঙ্গে চোরা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় লিপ্ত হয় ঈশ্বর।মালোদের পক্ষে খটিদারদের চটানোর ভয়াবহ পরিণাম ভোগ করতে হয়।খটিদারদের সঙ্গে কো-অপারেটিভের বিরোধ হলে বিভিন্ন কৌশলে তারা লঞ্চ বন্ধ করে দেয়। শ্রীপদর পিতা একবার খটিদারদের সঙ্গে বিদ্রোহ করে কো-অপারেটিভ গিয়েছিল তার জন্য তাকে অনেক শাস্ত্রি ভোগ করতে হয়েছে।মহাজন ও খটিদারের কুচক্ষান্তে মালোরা স্বাধীন ভাবে কোনো দিন মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারেনি।

তবে ললিতের মৃত্যুর পর সংসারের কর্তৃত্ব শ্রীপদকেই গ্রহণ করতে হয়েছে। আবার অন্যদিকে মালো পরিবারের অনেকেই শ্রীপদের উপর রুষ্ট ছিলেন।ভদ্র সমাজনামধারী বাবুরা শ্রীপদর উপর অসন্তুষ্ট।মালোরা জানে দাদন, সুদ, রিলিফ ছাড়া জীবন নির্বাহ করা তাদের পক্ষে অসম্ভব। উচ্চবর্গের চাপানো আর্থিক কাঠামোর জটিল নাগপাশ থেকে বেরোনো যায় না। হাড় ভাঙা পরিশ্রম করে নিজের প্রচেষ্টায় ললিত কিছু জমি কিনেছিল।সে জানে গহীন গাঙের মাছের উপর সর্বদাই ভরসা করা যায় না।কিন্তু সেই জমির ওপর নজর পড়ে আবদুলের মত খটিদারদের।আবদুল অনেক চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয় সে জমিটুকু দখল করতে।অন্যদিকে চিরাচরিত রীতি নীতিকে অগ্রাহ্য করে চলে শ্রীপদ-"সংস্কার মানতে চায় না,অলৌকিকত্ব তার বিশ্বাসে ঠাঁই পায় না,তাছাড়া বিগত বছরগুলোতে শ্রীপদকে নিয়ে মালোপাড়া কম ঝক্কি পোয়ায়নি।গঞ্চের অনেক বাবু আজ মালোপাড়ার উপর অসন্তুষ্ট।দয়াল জানে দাদন, সুদ, সাহায্য,রিলিফ এ-গুলো ছাড়া মালোপাড়া বাঁচেনি,বাঁচবেও না।শ্রীপদ সেই বাঁধন গুলোতে আঘাত হেনে, সমাজটাকে সর্বনাশের পথে বসাতে চেয়েছিল।"**৯**

ললিতের মৃত্যুর পর শ্রীপদ সিদ্ধান্ত নেন যে আর কখনো জঙ্গলে যাবে না। যেখানে মৃত্যু সবসময়ই ফাঁদ পেতে বসে আছে।জীবন যুদ্ধে তারা সেই অপমৃত্যুর ডাক এড়ানোর অব্যর্থ প্রয়াস করতে থাকে।মালোসমাজ বসে খাওয়ার রীতি নেই,তাই বাঁচার তাগিদে মাছ মারতেই হয়।শ্রীপদর জীবনচক্র একই ধারায় ঘুরতে থাকে।নৌকা ও জালের মালিক আবদুল তাই তার কবল থেকে বেরিয়ে আসা শ্রীপদর পক্ষে দুঃসাধ্য।তবু তার চেষ্টার ত্রুটি নেই শ্রীপদর ইচ্ছে ছিল জালে যা মাছ আসে তা কো-অপারেটিভে বিক্রি করবে।কিন্তু ইচ্ছা থাকলেও উপায় নেই-কারণ আবদুলকে অমান্য করলে জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠবে তা হাঁড়ে হাঁড়ে টের পেয়েছে শ্রীপদ।

মালোপাড়ার প্রবীণ ব্যক্তি হল দয়াল। একসময়কার নামকরা'সাঁইদার'ছিল। এখন সে অতিশয় বৃদ্ধ গলায় তুলসীর মালা মাথার চুল সাদা গায়ের চামড়া কুঁচকানো।তার উপর সে একটু রাতকানা।মালোপাড়ার নির্ঝঞ্ঝাট জীবন যাপন তার একান্ত কাম্য।চোখের সামনে এই পাড়াটা দিন দিন ক্ষয়ে ক্ষয়ে যাচ্ছে দেখে তা সহ্য করতে পারে না।ললিতের কুশপুত্তুর পোড়ানোর প্রস্তাবে সে বলেছিল'ভেবে কাজ কইরো কইরে ভেবো না।বুড়ো মানুষটার কথা ফেলে দিও না।"**১০**যদিও সে কিংবদন্তি নায়ক কিন্তু বর্তমানে খেয়ে পরে বেঁচে থাকাটাই সবচেয়ে বড় সংগ্রাম।এই বৃদ্ধ বয়সেও বিনজাল নিয়ে বেতনার বুকে মাছ ধরতে যেতে হয়।তবে বছর দুয়েক হল বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষা নিয়ে ঘরে বসে নামকীর্তন করে। জীবনের শেষ মুহূর্তে একটু শান্তি চায় এই নামকীর্তনের মধ্যে।

শ্রীপদর দুর্দিনের একমাত্র আশ্রয়স্থল ডাক্তারবাবু।মালোরা জানে খটিদারের কাছে মাছ বিক্রি করলে তারা উপযুক্ত মূল্য পায় না।খটিদারেরা নৌকাও জালের মালিক হিসেবে মালোদের ঠকানো অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। মালোরা কো-অপারেটিভের সুযোগ সুবিধা গ্রহন করতে অনেক আসে, কিন্তু এখানে আসার পরিনাম ও ভয়ানক হয়।আর অন্যদিকে তারা চড়া দাদনেই খটিদার কাছে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে থাকে। রাজনৈতিক বিরোধ থাকা স্বত্ত্বেও ডাক্তারবাবু শ্রীপদকে সাবধান করে বলেছিলেন-"শ্রীপদ,তোমার কিন্তু ঘোড়াটা জোরেই ছোটাচ্ছেন,গাড়ি উল্টে যাবার ভয় আছে। তোমার বেতনার চেয়েও এ গাঙ কিন্তু গহিন।'আঙ্গুল উঁচিয়ে গঞ্জের এই সমাজকে নির্দেশ করেছিলেন সেদিন।শ্রীপদ সেদিন তর্ক করেনি, হেসে জবাব দিয়েছিল, 'আপনার ও আলুনি পান্তা আর পেটে রোচে না আমার....কো-অপারেটিভে কি দেশ পাল্টে যাবে?"**১১**

মালোপাড়ায় সংস্কার রীতি-নীতি আছে যা ওদের ক্ষমতার উপর নির্ভরশীল হয়ে পালন করতে হয়। জঙ্গলে আপনজনের অপঘাতে মৃত্যুর পর অসহায় মানুষের অশৌচ পালন করতে অপেক্ষা করতে হয়।যখন হাতে পয়সা আসে তখন খড় বা কলাগাছ নিয়ে মৃত মানুষের কুশপুত্তুর বানিয়ে নদীর চড়ায় পুড়িয়ে একমাস অশৌচ পালন করে। কমপক্ষে অনুষ্ঠানে হাজার খানেক টাকা তো লাগেই,সেই সূত্রে তারা সুদের গভীর বন্ধনে জড়িয়ে পড়ে।সুদ,সুদের সুদ মনে করিয়ে দেয় লোকটা মরার পর গোটা পরিবার টাকে মেরে দিয়ে যায়।তাই সুদের মায়াজাল থেকে রক্ষা পেতে শ্রীপদ চিরাচরিত সংস্কার রীতি-নীতির অভ্যাসের বিপরীতে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। মায়াজালে পদ্মার ইলিশ ধরার মরশুমে কুবেরবা যে ভাবে মাছকে বন্দি করতো।ঠিক তেমনি ভাবে মালো সমাজ কে মহাজন খটিদার আবদুলেরা বন্দি করতে চায়।কিন্তু শ্রীপদ তার বাইরে বেরিয়ে আসতে চায়।

আমাদের সমাজের প্রচলিত প্রবাদের কথা কে না জানে "দুখের পরে সুখ আসে"। কিন্তু এই সমাজ জীবন সংস্কৃতি চেতনায় তা অলীক স্বপ্নের। জীবনের এমন

দুর্দিনে শ্রীপদ ঘরে যখন পুত্র সন্তান এলো,সেই আনন্দে মাতোয়ারা হয়ে পড়ল শ্রীপদ প্রত্যেক পিতার মত।ছেলের ভবিষ্যত চিন্তা করে সে এখনকো-অপারেটিভে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়।মাছ বিক্রি করে বেশি মুনাফার আশায়।কিন্তু সেখানে যাওয়ার পরিণাম ও জানে পিতা ললিতের ঘটনায়।

উপন্যাসের মধ্যেই অসহায় মানুষের হাহাকার শুধু নয় মানবিক মুখগুলি যেন বাস্তব জগতের মনে হচ্ছে কাহিনির পরতে পরতে।আসলে উপন্যাসের খটিদার মহাজন সবই একই সমগোত্রীয়।আসল চেহারায় সব এক বাহ্যিক আবরণ যাই দেখিনা কেন আমরা।ললিত বিপদে পড়ে টাকা ধার এনেছিল এবং কয়েকটি কিস্তিতে পরিশোধ করে দেয়।কিন্তু মৃত্যুর পর হঠাৎ জানা যায়,বছর তিনেক আগে পঞ্চাশ টাকা এখন সুদে আসলে মিলে দুশত পঁয়তাল্লিশ হয়েছে।অতীত-বর্তমানের চেহারার সমাজ শোষক সর্বই এক।

সমাজের মানুষের ভেতরের খোলস বোঝা যায় বিপদের দিনে।ফলে পরম বৈষ্ণব বক্ষ কিশোরী পাল ঝড়ের তাণ্ডবে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের কাছে খড় বিক্রি করে দ্বিগুণ দামে।ললিতের ব্যর্থ জীবনের লড়াই টা সার্থক করতে চায় নায়ক শ্রীপদ। দেবাশীষ ভট্টাচার্য্যের মতে-“ললিতের অসমাপ্ত লড়াই আবার শুরু করতে চায় ‘নতুন যোবক' শ্রীপদ,যে উত্তর প্রজন্মের প্রতিভূ।দয়ালের সঙ্গে তার মতবিরোধকে লেখক কেবল দুই প্রজন্মের দূরত্ব হিসেবেই দেখেন না,দেখেন জীবন প্রত্যয়ের,অর্থাৎ জীবনকে দেখার দৃষ্টিভঙ্গির তারতম্যের নিরিখে।কিন্তু উপন্যাসের দ্রুত লয়ের ঘটনা প্রবাহে দেখি, অচিরেই শ্রীপদ আক্রান্ত হয়েছে,এবং তার প্রতিষ্টাসন্ধানী অভীস্পা বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে,ললিতের পুত্র,তারই ছোটভাই লগাই দাঁড়িয়েছে তার বিরুদ্ধে;খটিদার আবদুলের খুটি হয়ে উঠেছে সে।“**১২**

উপন্যাসে শ্রীপদ বিশ্বাস সংস্কারে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে।ললিতের কুশপুত্তুর পোড়ায় নি কিন্তু নবজাতকের ছয় ষষ্টীর জন্য তাকে ভাবতে হয়েছে।তাঁর জন্য টাকা চাই।অনেক ভেবে বেতনায় বিনজাল ফেলে মাছ ধরে,কিন্তু সে মাছ আবদুল করায়ত্ব করে নেয়।অবশেষে বউয়ের নাকের নোলক ত্রৈলক্য স্যাকরার দোকানে বন্ধক দিয়ে দ'শ ত্রিশ টাকা নিয়ে শ্রীপদ গঞ্জ থেকে বাজার করে বাড়ি এসব অনুষ্ঠানের মধ্যে তারা যেন জীবনের স্বাদ খুঁজে পায়।নবজাতকের শুভ কামনায় তা পালনীয় তা করে।কিন্তু এই শুভ অনুষ্ঠানের বিঘ্ন ঘটাতেই ঈঈশ্বকে সঙ্গে নিয়ে আবদুল হাজির হয়।আবদুল তার অভিপ্রায় ও জানিয়ে দেয়।লেখক শ্রীপদ অবস্থার বর্ণনা দিতে গিয়ে জানিয়েছেন-“এ শিশুর এই ভাগ্যেই দিনটির সমাপ্তি ঘটে।কীর্তন হয় না,যে যার ফিরে গেল বাড়ি।ননীবালা তখন পাথরের মতো বসা।শ্রীপদ হাঁটুতে মাথা গুঁজে। যেন ঝড়ে ভেঙ্গে পড়েছে।খাড়ির মুখে পাটা জাল ঘিরে যেমন মাছমারারা মাছ তোলে,সেও যেন অদৃশ্য জালের মধ্যে জড়িয়ে পড়েছে ক্রমশ।শিশুটি কেঁদে উঠল।শ্রীপদর বুক ফালা ফালা।নিঃশ্বাস বেরুল।সে কী ভাবছে? শিশু ঈশ্বরের পুত্র,কোনো মন্দ ভাগ্য নিয়ে

আসতে পারে না।সব কিছু বুক পেতে নিতে হবে পদকেই।ও যে পিতা।পুত্রকে ফেলে সে জঙ্গলে যাবে না।পৃথিবীর পতঙ্গেরও স্বাধীনতা আছে,ওদের থাকবে না কেন।"**১৩**

শ্রীপদ এর দুঃসময়ে কাল হয়ে দাঁড়ায় তার সহোদর লগাই।লগাই আবদুলের কুচক্রান্তে সঙ্গী হয়ে শ্রীপদকে আঘাত করার জন্য পিতার মৃত্যু নিয়ে থানার এফ আই আর করে বসে।আর অন্যদিকে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের ঘটনায় শ্রীপদকে জড়ানো হয়।এত ঘাত প্রতিঘাত সহ্য করার ক্ষমতা শ্রীপদর ছিল না।সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের ঘটনা মুখরোচক সংবাদ হয়ে গ্রামে শহরে ছড়িয়ে পড়তে বেশি সময় লাগেনি। এবং সঙ্গে সঙ্গে অ্যাকশন।থানার বড়বাবু শ্রীপদকে থানার তলব করলেন।এই বিপদে যিনি রক্ষা করতে পারেন তিনি হলেন ডাক্তারবাবু। দীর্ঘদিনের পোড়া-খাওয়া,বাদায় চুল পাকানো ডাক্তারবাবু কিন্তু কোনো আশ্বাস দিতে পারলেন না।এখানে মানুষ স্বাধীন ভাবে থাকতে পারে না,মন যা চায় তা করারও কোনো উপায় নেই, কারণ শাসক,খটিদার, আইন-আদালত, রাজনৈতিক দলের নেতা সবই যেন শোষকের ভূমিকা নেয়।আর শোষিত, অসহায়,নিরিহ,নিপীড়িত মানুষ জীবন সংগ্রামে যুদ্ধ করা দূরে থাক সারাজীবন বশ্যতা স্বীকার করে চলে।নাম পরিচয় হীন মানুষ এভাবেই মৃত্যুর সীমারেখায় দাঁড়িয়ে শরবিদ্ধ পাখির মতো মৃত্যুর কামনা করে।শ্রীপদ মনে আশঙ্কা ছিল ললিতের মত তারও যদি অপঘাত মৃত্যু হয় তা হলে হয়তো কড়ির স্থান হবে নদীর তীরের দরমায় ব্যারাকে আর ননীবালাকে ভিক্ষে করে জীবন অতিবাহিত করতে হবে।**১৪**

পারিবারিক শত্রুতায় শ্রীপদ ক্লান্ত।ঘর শত্রু বিভীষণ।এক্ষেত্রেও লগাই এর বা কি দোষ সমাজের অভাবই সব নৈতিকতাকে বিবর্জিত করে।ফলে উপন্যাসে আবদুলের চোরা শিকারের জালে লগাই জড়িয়ে পড়ে। পাশাপাশি শহরের লোভনীয় চটক দেখিয়ে করায়ত্ব করে।লগাই এর মনে আশা ক্যানিংয়ের সেচ অফিসে চাকরি করতে পারবে।তাই খটিদারের মোহজালে আবদ্ধ হয়ে বড় ভাইয়ের বিরুদ্ধে নালিশ করে।এছাড়া আবদুলের অভিসন্ধি লগাই বিন্দু মাত্র বুঝতে পারিনি।শহরের লোভনীয় চটক, টাকার লোভ, অন্যদিকে চাকরির আশা সব মিলে লগাই মোহান্ধ হয়ে আবদুলের জটিল ফাঁদে আটকে পড়ে।লগাইকে হাতে রাখতে আবদুলও টাকা দিতেও ভুল করে না। সামাজিক পরিস্থিতিতে মানুষ এভাবেই জড়িয়ে পড়তে বাধ্য হয়। সামাজে চোরা শিকারিরা এভাবেই ফাঁদ পেতে বসে আছে।

শ্রীপদর এখন তীরবেঁধা পাখির মতো অবস্থা।ললিতের বাঘের পেটে অপঘাত মৃত্যুর ঘটনাকে কেন্দ্র করে শ্রীপদকে জেলের ভয় দেখানো হয়।আর তা আবদুলের অঙ্গুলি হেলনে।আবদুলের মূল উদ্দেশ্য ছিল শ্রীপদর চাষের জমি টুকু হাতানো,তাই এই ষড়যন্ত্র।–'থানার বড়বাবুও মধু আর হারানের কথায় বিশ্বাস করেননি,তার সাক্ষী হিসেবে গুণীন শেখের সন্ধান নেই, ডাক্তারবাবু কোনো আশ্বাস দিতে পারেননি,শেষ পর্যন্ত অনন্যোপায় হয়ে স্ত্রীর কাছে জঙ্গলে যাবার প্রস্তাব করে শ্রীপদ।কড়ি প্রস্তাব শোনা মাত্রই

চমকে উঠে,সেখানে মৃত্যু সব সময় ওঁৎ পেতে বসে থাকে।সে খোকার দিব্যি দিয়ে স্বামীকে ধরে রাখার ব্যর্থ প্রয়াস করে।'**১৫**

আসলে মালোদের ঘরে বসে থাকার কোনো রীতি নেই সমাজে, জঙ্গলে না গিয়ে থাকতে পারে না।শ্রীপদর চোখের সামনে সবই অন্ধকার তবুও যেতে হবে। এখানে মনে রবীন্দ্রনাথের কবিতার কথা-'যেতে আমি দেব না তোমায়'। কিন্তু যেতেই হবে।লেখক এমন পরিস্থিতিতে শ্রীপদর অবস্থার বর্ণনা দিয়েছেন এভাবে-"বড় নদীর জল ফুলছে,ফুঁশে উঠছে; ধীরে ধীরে আকাশচুম্বী জলস্তম্ভ ভেঙ্গে ভেঙ্গে একটা মূর্তি বেরিয়ে আসছে,যার লাল চোখজোড়া চোয়াল পর্যন্ত ঝুলে পড়েছে,কষার দুপাশ দিয়ে বেরিয়ে এসেছে দাঁত।পদ যেন ভয়ে ভয়ে চেঁচাচ্ছে,'হেই,তুই আমার বাপ নস।জানো!'মূর্তিটা লোমশ হাত নাড়ছে,'বাপ-রে!আসিসনি সর্বনাশীর কাছে'।জলস্তম্ভ ভেঙ্গে ভেঙ্গে পড়ে,ঢেউ কমে আসে,পদর চোখের সামনে বেতনা জল ঠেলে নিয়ে যায় সাগরে।"**১৬**

এই সেই দক্ষিণ যেখান থেকে ফিরে আসা যায় না।যে শ্রীপদ 'নতুন যোবক'যে 'সংস্কার মানতে চায় না''অলৌকিকত্বে'যার বিশ্বাস নেই,যে ললিতের'কুশপুত্তর' দাহ করেনি সে-ই শেষপর্যন্ত নিজের 'কুশপুত্তুর'নিজেই দাহ করে।কারণ কোনোদিন যদি দক্ষিণ থেকে ফিরে না আসে তখন পুত্রকে 'কুশপুত্তুর'পোড়ানোর ভয় দেখিয়ে এই সমাজের শোষণকারীরা যেন ঋণের জালে গাঁথতে না পারে।

উপন্যাসের মধ্যেই লক্ষ্য করা গেছে নায়কের অবস্থার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে প্রকৃতি তার নিজস্বতা নিয়ে উপস্থিত।তাঁরই সঙ্গে বাতাস, বৃষ্টি,ও মেঘের একত্র মিলনে বেতনা যৌবনের নৃত্য তরঙ্গে ফুলে ফেঁপে উঠেছে। তবুও শ্রীপদকে দক্ষিণে যেতেই হবে। অন্যদিকে আধুনিক কিংবদন্তির নায়ক দয়াল তাকে কোনো ভরসা দিতে পারে না।কেবলমাত্র অদৃষ্টের দোহাই দিয়ে ভাগ্যকে দোষারোপ করেছে।যা স্বাভাবিক জীবনে সকলেই করেন। আসলে নিম্নবর্গের মানুষেরা কোনো দিন উচ্চবর্গের চাপানো আধিপত্য থেকে মুক্তি পায় না।জীবন সংগ্রামে এভাবেই শেষপর্যন্ত যুদ্ধ শেষ করতে হয় বশ্যতা স্বীকার করে।

শেষপর্যন্ত শ্রীপদ জীবন সংগ্রামের ইতিহাসে ব্যর্থ নায়ক।তার সমস্ত ভাবনা চিন্তা ফেলে রেখে শ্রীপদর নৌকা দক্ষিণে এগিয়ে চলেছে।বেতনার বুক বেয়ে এগিয়ে যায় গভীর অরণ্যের দিকে।ঝড় জল বৃষ্টি মাথায় নিয়ে,বুকের মধ্যে একরাশ হতাশা যন্ত্রণা নিয়ে বনবিবির রাজ্যে শিকার করতে গেলে মালোদের মন সর্বদাই পড়ে থাকে নিজের ঘরের টানে।এই ভাবেই শুরু হয় এভাবেই মধ্যস্বত্ত্বভোগী দাপটের মধ্যে শেষ হয় মালো জীবন সংগ্রাম। মানুষের আধিপত্য বাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে বাঁচার ইতিহাস রচিত হয়েছে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় নদী কেন্দ্রিক 'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসে।সেই ধারাকে অব্যাহত রেখে সাধন চট্টোপাধ্যায় লেখেন'গহিন গাঙ'(১৯৮০)উপন্যাস।(এছাড়া অন্যান্য নদী কেন্দ্রিক উপন্যাসের কথা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে তার ব্যাখ্যা করা হয় নি।) সেই

উপন্যাসে উঠে এসেছে সুন্দরবন অঞ্চলের নদী কেন্দ্রিক সমাজের বাস্তব জীবনের ছবি।এই সব বদ্বীপগুলি ঘিরে মানুষ থেকে যাবে। থেকে যাবে তাদের শাশ্বত কোলাহলও।কারণ জীবন অবধ্য।অনিঃ**শেষ।১৭**কখনোই তাকে চিরতরে স্তব্ধ করা যায় না।অখন্ড মানব জীবন কখনও স্তব্ধতা মানে না।সে প্রবাহিত হতে চায়।প্রবাহ বিনা মানবজন অর্থহীন।হায়!মানবী প্রিয়ার যৌবন ফুরায়ে যায়! কিন্তু ফুরায় না এই জঙ্গল,গহিন গাঙ আর মাথায় ওপরে ব্যাপ্ত আকাশ।ফুরায় না মানুষের আকন্ঠ তৃষ্ণা।পাখির কুজন, সাগরের ঢেউ।ফুরায় না জেলেদের জাল ফেলা আর নদী-সাগরের বুকে সারিবদ্ধ নৌকার অভিযান।ফুরায় না বাঁচার আশা।আধিপত্যবাদী সমাজ ব্যবস্থায় দারিদ্র্য লাঞ্ছিত, নিপীড়িত মালোদের ও সুন্দরবন অঞ্চলের অধিবাসীদের জীবন সংগ্রাম ও সমকালীন সমাজ বাস্তবতার যে ছবি চিত্রিত হয়েছে তা এক কথায় **অনবদ্য।**

তথ্যসূত্র :

১. সাহিত্যের সংরুপ-দীপঙ্গর মল্লিক ও দেবারতি মল্লিক (সম্পাদিত), দিয়া পাবলিকেশন, প্রথম প্রকাশ-২০১৬, পৃষ্ঠা-,১৮
২. পূর্বোক্ত-পৃ-১১
৩. শ্রীখন্ড সুন্দরবন-দেবপ্রসাদ জানা(সম্পাদনা),দীপ প্রকাশন, কলকাতা-৭০০০০৬, প্রথম প্রকাশ:২০০৪, দ্বিতীয় সংশোধিত প্রকাশ-২০০৫, পৃষ্ঠা-৫৩০
৪. পূর্বোক্ত-পৃ-৫৩০
৫. সাধন চট্টোপাধ্যায়-গহিন গাঙ, বইমেলা ১৯৯৬, কলকাতা-৭৩, পৃষ্ঠা-৭
৬. -নীতিশ দাস-,সাধন চট্টোপাধ্যায়ের-'গহিন গাঙ' উপন্যাসে মাটি-ঘেসা মানুষের জীবন সংগ্রাম, জানুয়ারি ২০১৫
৭. পার্থপ্রতীম বন্দোপাধ্যায়-'সাধন চট্টোপাধ্যায়ের গল্পঃএকজন পাঠক' পৃষ্ঠা-১৭
৮. সাধন চট্টোপাধ্যায়-'গহিন গাঙ' বইমেলা-১৯৯৬.কলকাতা ৭৩, পৃষ্ঠা-১৯
৯. সাধন চট্টোপাধ্যায়ের-'গহিন গাঙ' বইমেলা-১৯৯৬, কলকাতা-৭৩, পৃষ্ঠা-২৭
১০.নীতিশ বিশ্বাস, পূর্বোক্ত-২০১৫
১১. সাধন চট্টোপাধ্যায়ের-'গহিন গাঙ', বইমেলা-১৯৯৬, কলকাতা-৭৩, পৃষ্ঠা-৩৭
১২.দেবাশিস ভভট্টাচার্য-'বিশ শতকের বাংলা কথাসাহিত্যে নিম্নবর্গীয় চেতনা' প্রকাশ-বইমেলা-২০১০,অক্ষর পাবলিকেশনস্, ত্রিপুরা, পৃষ্ঠা-৩২১
১৩.সাধন চট্টোপাধ্যায়ের-'গহিন গাঙ' বইমেলা-১৯৯৬, কলকাতা-৭৩, পৃষ্ঠা-৫৪
১৪.নীতিশ দাস, পূর্বোক্ত,২০১৫
১৫.পূর্বোক্ত
১৬.সাধন চট্টোপাধ্যায়ের-'গহিন গাঙ' বইমেলা-১৯৯৬, কলকাতা-৭৩, পৃষ্ঠা-৬১
১৭. শ্রী খন্ড সুন্দরবন-দেবপ্রসাদ জানা(সম্পাদনা),দীপ প্রকাশন, কলকাতা-০৬, প্রথম প্রকাশ-নভেম্বর-২০০৪, দ্বিতীয় সংশোধিত প্রকাশ- জানুয়ারি-২০০৫, পৃষ্ঠা-৫৫০

সুন্দরবনাঞ্চলে হ্যামিলটনের আবাদভূমি; বর্তমানে হয়ে উঠেছে গোসাবা—একটি ঐতিহাসিক পর্যালোচনা

দীপক মণ্ডল
সহকারী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, বজবজ কলেজ,
পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

সারসংক্ষেপঃ সুন্দরবন অঞ্চলের গভীর বনাঞ্চল ও প্রাকৃতিক পরিবেশের জন্য বহু পর্যটক প্রাচীনকাল থেকে এখানে এসেছে। এখানকার অগভীর নদীগুলি বিভিন্ন দ্বীপগুলিকে শহরাঞ্চল থেকে আলাদা করে রেখেছে। এই দ্বীপ গুলিতে হ্যামিলটন সাহেব জঙ্গল হাসিল করে গড়ে তোলেন নদীবাঁধ, কৃষি পরিবেশ, সমবায়, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যোন্নয়নের পরিকল্পনা। ফলে হ্যামিলটনের আবাদ ভূমি আজ কিছুটা হলেও নগরায়িত।

সূচক শব্দঃ আবাদ, সমবায়, মহাজন, গোপালন, ধর্মগোলা, জনকল্যাণ, পদস্খলন।

সুন্দরবনাঞ্চলের দুই ২৪ পরগনার দক্ষিণ প্রান্তে বঙ্গোপসাগর ঘেঁষা বিস্তীর্ণ অরণ্যময় ভূখণ্ডে জঙ্গল হাসিলের ঘটনা এই সেদিনের কথা।[১] ইংরেজ আমলে নতুন করে এখানে শুরু হয় জঙ্গল আসিল। ড্যানিয়েল ম্যাকিনন হ্যামিলটন স্কটল্যাণ্ড থেকে ভারতে আসেন ইংরেজ উচ্চপদস্থ কর্মচারী হিসাবে। চাকরী থেকে অবসর নেওয়ার পর বাদাঞ্চলের গোসাবা, সাতজেলিয়া ও রাঙাবেলিয়া দ্বীপ তিনটি সরকারের কাছ থেকে বন্দোবস্ত নেন অষ্টাদশ শতকে।[২] ১৯০০ শতকের শুরু থেকে সুন্দরবনে রায়তদারী ব্যবস্থার সুপারিশ হয়। এই সময়ে হ্যামিলটন সাহেব ভারত সরকারকে কিছু খাজনা দেওয়ার শর্তে এই তিনটি দ্বীপে শুরু করেন জঙ্গল হাসিলের কাজকর্ম। চলল ৩০ এর দশক পর্যন্ত। অঞ্চলটির নাম হলো হ্যামিলটন আবাদ। উড়িষ্যা, মেদিনীপুর, ছোটনাগপুর, হাজারিবাগ, রাঁচি থেকে কিছু মানুষ জনকে নিয়ে জঙ্গল হাসিল করে হ্যামিলটন সাহেব গড়ে তোলেন পাকাপোক্ত নদীবাঁধ।[৩] গড়ে ওঠে ঘর বাড়ি রাস্তা ঘাট। হ্যামিলটন আবাদে স্পন্দিত হয়ে উঠল জনজীবন, শুরু হলো রীতিমতো ঘর গৃহস্থলী। তাঁর উদ্দেশ্য হল আদর্শ একটি কৃষি উপনিবেশ গড়ে তোলা এবং তা হবে সমবায়ের আদর্শে কৃষি উপনিবেশ।[৪] শোষণ, দারিদ্র ও অশিক্ষার হাত থেকে কিছু লোক কে রক্ষা করা। ভারতবর্ষে এসে তিনি দেখেছিলেন ভারতবাসী কত গরীব, শিক্ষার আলো থেকে কত দূরে, কত তারা শোষিত। ইতিপূর্বে ইউরোপের কিছু কিছু জায়গায় তিনি দেখেছিলেন সমবায় আন্দোলনের প্রভাব। এই দেখা গুলোকে কাজে লাগিয়ে দ্বীপ গুলিকে কিভাবে একটি আদর্শ পল্লীতে পরিণত করা যায়, হ্যামিলটন সেই পরিকল্পনাই করে ফেলেন।[৫] তিনি গোসাবাতে একটি বলিষ্ঠ সমবায় আন্দোলন গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। গ্রামীণ অর্থনীতিতে সমবায় একমাত্র হাতিয়ার সে সম্পর্কে তাঁর ধারণা ছিল স্বচ্ছ। তিনি বিশ্বাস

করতেন সমবায় যদি ব্যর্থ হয়, ভারতবর্ষ ব্যর্থ হবে। গ্রামীণ সায়ত্বশাসন প্রবর্তনের দিকেও তাঁর ছিল সর্বশেষ নজর। একটি ভাষণে তিনি এই মনোভাব ব্যক্ত করেন— "The village people will relearn the art of self government and resuscitate the old village republic as they are doing in Gosaba." আর একটা জিনিস তিনি চেয়েছিলেন—তা হল দেশের যুব শক্তি চাকরীর বদলে সমবায় ভিত্তিক কৃষি উৎপাদনে ঝাঁপিয়ে পড়ুক। যুবকদের তিনি স্বাবলম্বী করার কথাও বলতেন। তারা স্বাবলম্বী না হলে অর্থনৈতিক মুক্তি আসতে পারে না। এই ছিল তাঁর বিশ্বাস। তিনি গ্রামে মহাজনী প্রথার উচ্ছেদ ঘটাতে চেয়েছিলেন। দেখেছিলেন গ্রামের মানুষ মহাজনী ঋণে আষ্টেপিষ্টে বাঁধা। চাষী যা কিছু আয় করে তার মোটা অংশ চলে যায় মহাজনের ঘরে।

তিনি এখানে গড়ে তোলেন এক বিশাল কৃষি ক্ষেত্র, সমবায় ভাণ্ডার, সমবায় চালকল, সমবায় পুকুর, রাস্তা-ঘাট, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতিতে জেটিঘাট, গোপালন ব্যবস্থা, তাঁত শিল্প ইত্যাদি।[৬] তিনি গোসাবাতে ১ টাকার নোট প্রচলন করেছিলেন। যার দ্বারা এখানে জিনিস কেনা বেচা চলত।

শিক্ষার অভাব দূরীকরণে তিনি প্রাথমিক, উচ্চ ও নৈশ বিদ্যালয় স্থাপন করেন। তিনি মেহনতী মানুষের জন্য শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও অর্থনৈতিক উন্নতিতে জোর দিয়েছিলেন। ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগার তিনি নির্মান করেন। গোসাবাতে বাংলা বর্ণমালার পরিবর্তে রোমান বর্ণমালার প্রচলন করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু ড. সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়ের পরামর্শ ক্রমে রোমান বর্ণমালার প্রচলন থেকে দূরে সরে আসেন। হ্যামিলটনের বড় পদক্ষেপ হল কৃষি, সমবায়, ব্যবসা ও শিল্পক্ষেত্রে।[৭] ধানচাষ, মাছ চাষ, গোপালন, Cross Breading এর মাধ্যমে দেশী বিদেশী গোপালনের ব্যবস্থা করেন। গ্রামে লবন, গুড়, ধুতী, শাড়ি, গামছা তৈরীর তাঁতকল ইত্যাদির ব্যবস্থা, চর্মশিল্প, মৌমাছি পালনের ব্যবস্থা, মোমশিল্প ইত্যাদি সাধারণ মানুষের অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রয়াস এই সব কর্মসূচী গ্রহণের মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। তিনি সুন্দরবনের নোনা মাটিকে কৃষির উপযোগী করে গড়ে তুলতে, এক ফসলী জমিকে দোফসলী করতে, কৃষিতে সবুজ সারের ব্যবস্থা করতে এবং দেশী বিদেশী শাকসব্জীর চাষ করতে, কৃষিক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন। এখাকার মানুষ শুধু ধান, মাছ, শাকসব্জী নিয়ে থাকে না। তারা পা বাড়ায় গভীর জঙ্গলের দিকেও। মধু, মোম, কাঠের জন্য তাদের সুন্দরবন অভিযান যাতে নিরাপদ করা যায় তারও ব্যবস্থা ছিল।

১৯০৯ সালে গোসাবাতে গড়ে উঠেছিল 'Bengal Young men's Zamindary Co-Operative Society.' চাষীদের অর্থনৈতিক জীবনে অনেকখানি ভূমিকা নিয়েছিল এই সোসাইটি। গরীব মানুষেরা মহাজনের কাছে না গিয়ে যেত সমবায় ব্যাংকে। এখান থেকে তারা পেত লোন। গোসাবায় সমবায় আন্দোলনের পথিকৃৎ হিসাবে নিঃসন্দেহে

হ্যামিলটন-কে চিহ্নিত করা যায়। গোসাবায় মহাজনী প্রথার অবসানের জন্য এখানে আপদকালীন ধর্মগোলা গড়ে তোলা হয়েছিল।

রবীন্দ্রনাথ গোসাবায় এসেছিলেন এবং দেখে গিয়েছিলেন হ্যামিলটন সাহেবের সমবায় আন্দোলনের কর্মকাণ্ড। তিনি বিশ্বাস করতেন সমবায় আন্দোলনের একমাত্র সুসভ্যনীতি। ১৯২২ সালে তিনি গড়ে তোলেন শান্তিনিকেতনে তাঁর গ্রাম পুনঃগঠন তথা গ্রাম সেবার ক্ষেত্রে এক অভাবনীয় সৃষ্টি।[৮] এখানে কৃষি খামার, গোপালন কেন্দ্র, তাঁত শিল্প, স্বাস্থ্য সমবায়, সমবায় ভাণ্ডার ইত্যাদি। এই আন্দোলনের আগেই হ্যামিলটনের কাজকর্ম সম্পর্কে তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল। তাই রবীন্দ্রনাথ ১৯২৯ সালে শান্তিনিকেতনে বাৎসরিক উৎসবের শেষে বর্ধমান বিভাগীয় সমবায় সম্মেলনের সভাপতি হিসাবে হ্যামিলটনকে আমন্ত্রণ জানান। এই সময়ে হ্যামিলটন সাহেবও রবীন্দ্রনাথ-কে তাঁর গোসাবায় আসার জন্য আমন্ত্রণ জানান। এই আমন্ত্রণ উপেক্ষা না করে রবীন্দ্রনাথ ১৯৩২ সালের ২৯ সে ডিসেম্বর হ্যামিলটন আবাসে আসেন এবং দেখে যান সাহেবের মানস কন্যাকে।

মৃত্যুর পূর্বে হ্যামিলটন তাঁর সম্পত্তির একটি মোটা অংশ উইল করে গেছেন গোসাবার কল্যাণে। গোসাবায় তাঁর আমলে পাকা রাস্তা হয়নি ঠিকই, কিন্তু দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজন মেটানোর জন্য এই মানুষটির প্রয়াস প্রচেষ্টা ছিল উল্লেখ্য। তিনি জঙ্গল হাসিল করেছিলেন ঠিকই, গাছে তিনি কোপ লাগিয়েছিলেন ঠিকই। কিন্তু সেটা জনগণের স্বার্থে। প্রকৃতির বিভিন্ন প্রতিকুলতা সত্ত্বেও হ্যামিলটন আপ্রাণ উন্নতির চেষ্টা করেন। গোসাবার ঝাউবন ও নারকেল বীথিই তার প্রমাণ। সরকারী উপনিবেশবাদে অরণ্য সম্পর্কে শোষণ করে ইংল্যাণ্ডের স্বার্থে তা কাজে লাগানোর যে নীতি হ্যামিলটনের নীতির সঙ্গে তাঁর সুস্পষ্ট দ্বন্দ্ব ছিল।

ভারতবর্ষের একটি প্রত্যন্ত দ্বীপের অর্থনৈতিক মানোন্নয়ণের কাজে যে মানুষটি স্কটল্যাণ্ড থেকে ছুটে আসেন তাঁর জন্ম হয় ১৯৬০ সালের ৬ই ডিসেম্বর।[৯] জনসাধারণের কাজে নামলে এককভাবে ত্রুটিহীন কাজ করা যায় না। কিছু না কিছু ভ্রান্তি, পদস্খলন এসে যায়। হ্যামিলটনের ক্ষেত্রে তার ব্যতিক্রম ঘটে নি। তবু বলা যায় এমন প্রত্যন্ত বাঘ ও কুমিরের দেশে এসে কিছু দুঃখী দরিদ্র মানুষের জন্য একটুখানি হলেও তিনি না হয় সেই একটুখানিই করে গেছেন। নানা উত্থান পতনের মধ্য দিয়ে গোসাবা আজ হেঁটে চলেছে। গোসাবা আজ অনেকটা নগরায়িত। সেখানে গেলে আজ দেখা যাবে কিছুটা ঢালাই রাস্তা, কিছুটা ইট বিছানো পথ, কিছুটা পীচ গড়া রাস্তা, স্কুল, বাজার, হাসপাতাল, এখনও গোসাবার জনজীবন থেকে মুছে যাননি এই সাহেবটি। ১৯৩৯ সালের ৬ই ডিসেম্বর পরলোক গমন করেন এই মানুষটি। কিন্তু গোসাবা দ্বীপটি এগিয়ে চলেছে।

সূত্র নির্দেশ :

১. বরুণ দে (সম্পাদনা)—গেজেটিয়ার অফ পশ্চিমবঙ্গ, ২৪ পরগণা, কলকাতা, ১৯৯৪, পৃষ্ঠাঃ ৩৬১।

২. সুকুমার সিং—"২৪ পরগণা জেলার ইতিহাস (উত্তর ও দক্ষিণ)", মাস এন্টারটেনমেন্ট প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ২০১০, পৃ: ১৭।

৩. কমল চৌধুরী, "দক্ষিণ ২৪ পরগণার ইতিবৃত্ত"—কলকাতা, ১৯৮৭, পৃষ্ঠাঃ ১৭৩—১৯৯।

৪. তুষার কাঞ্জিলাল—"'পথে প্রান্তরে'—প্রজন্ম, কলকাতা, ১৯৯৯, পৃঃ ৩৪।

৫. সৌমেন দত্ত—'স্যার ড্যানিয়েল ও গোসাবার আখ্যাণ'—মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, কলকাতা, পৃষ্ঠাঃ ৭৮।

৬. সৌমেন দত্ত—তদেব—পৃষ্ঠা:-৫৮।

৭. তদেব—পৃ: ৬৮।

৮. তদেব—পৃষ্ঠা: ৭৮।

৯. তদেব পৃষ্ঠা: ১৫৪।

‘বেহুলা গীতাভিনয়’ : প্রচলিত কাহিনিতে মৌলিকতা

অভিজিৎকুমার ঘোষ
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
সুরেন্দ্রনাথ কলেজ, কলকাতা

সারসংক্ষেপ : মীর মশাররফ হোসেন বাংলা সাহিত্যের একজন অন্যতম সব্যসাচী লেখক। সাহিত্যের প্রায় সব প্রকরণে তিনি বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। প্রকরণ অভিন্ন হলেও অনেক সময় শৈলীগত বিভিন্নতা লক্ষ্য করা যায় তাঁর লেখায়। একথা কাব্য-কবিতা, উপন্যাস, প্রবন্ধের ন্যায় নাটকের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। ‘বেহুলা গীতাভিনয়’ নাটকে শৈলী নির্মাণে বিশেষ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন মীর মশাররফ হোসেন। নাটকটি বহুল প্রচলিত বেহুলা লখিন্দরের কাহিনি অবলম্বনে রচিত হলেও দেশীয় যাত্রাপালার আদল এখানে গ্রহণ করা হয়েছে। এই নাটকে অঙ্ক রয়েছে ছয়টি। প্রত্যেকটি অঙ্ক আবার কয়েকটি করে গর্ভাঙ্কে বিভক্ত। এই গর্ভাঙ্কগুলি কোন কোনটি আকারে অত্যন্ত ছোট। মাত্র আড়াই লাইনের গর্ভাঙ্কও রয়েছে। গর্ভাঙ্কের শেষে ‘পটক্ষেপণ’ শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। এই নাটকের কাহিনিতে পঞ্চসন্ধি সুস্পষ্ট রূপে বর্তমান থাকলেও, ত্রয়ী ঐক্য রক্ষিত হয়নি। বিশেষ করে কাল ঐক্য এবং স্থান ঐক্য ভীষণভাবে বিঘ্নিত। চরিত্রগুলি গতানুগতিক হলেও মনসা, চাঁদ, বেহুলা চরিত্রাঙ্কনে মৌলিকতা দেখিয়েছেন নাটককার। সহজ, সরল, নিবাভরণ ভাষায় রচিত এই নাটকের সংলাপগুলি গদ্য ও পদ্য উভয় মাধ্যমকে অবলম্বন করেছে। তাছাড়া পয়ার, ত্রিপদী, ছড়ার ছন্দ সংলাপগুলিতে বিরাজমান। প্রয়োগ করা হয়েছে বেশ কিছু বিদেশী শব্দ। বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগীয় রীতির দ্বারা কিছুটা প্রভাবিত এই নাটকটি গীতিময়। মোট পনেরটি গান রয়েছে নাটকটিতে। বাউল সুরের ভাবানুষঙ্গ, ছড়ার ঢং গানগুলিতে থাকলেও, মঙ্গলকাব্যের গান আর ‘বেহুলা গীতাভিনয়’-এর গানের মধ্যে বেশ কিছু ক্ষেত্রে স্বতন্ত্রতা রয়েছে। মঙ্গলকাব্যের কবিরা তাঁদের লেখনীতে সমসাময়িক জীবনযাত্রা ও লড়াই-সংগ্রামের কথা তুলে ধরেছেন। অন্যদিকে এই নাটকে উনিশ শতকীয় জীবনযাত্রার স্বরূপ উদ্ঘাটিত। মীর মশাররফ হোসেন চাঁদ, মনসার বিরোধকে খুব তীব্র করেননি। দৃশ্যপট নির্মাণেও নিজস্বতার পরিচয় দিয়েছেন। আসলে এই নাটকে নাটককার বৃত্তগঠনে, চরিত্র চিত্রণে, সংলাপ রচনায়, সঙ্গীত সংযোজনে, দৃশ্যপট নির্বাচনে নিজ চিন্তাভাবনাকে দিয়েছেন অধিক গুরুত্ব। ফলে শৈলীগত একটা বৈচিত্র্যময়তা সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে এ রচনায়।

মূলশব্দ : শৈলী, মনসা, চাঁদ সদাগর, যাত্রাপালা, গর্ভাঙ্ক, পটক্ষেপণ, পঞ্চসন্ধি, ত্রয়ী-ঐক্য, সাহসিকতা, মঙ্গলকাব্য, হিংস্রতা, গদ্য, পদ্য, বাউল, ছড়া, গতানুগতিক, নিজস্বতা, বৈচিত্র্যময়তা।

মূল আলোচনা : মীর মশাররফ হোসেন (১৮৪৭-১৯১১) বাংলা সাহিক্যের একজন অন্যতম সব্যসাচী লেখক। বিশিষ্ট চিন্তাবিদ্ মশাররফের সৃষ্ট সাহিত্যে বিষয় বৈচিত্র্যের পাশাপাশি নানা প্রকরণের সমাবেশ লক্ষ্য করা যায়। কাব্য, উপন্যাস, প্রবন্ধ, আত্মজীবনী, নাটক প্রভৃতি সাহিত্য প্রকরণে তিনি যেমন কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন তেমনি পত্রিকা সম্পাদনার কাজেও তাঁর দক্ষতা উল্লেখ করার মতো। নব নব আঙ্গিকের সন্ধানী শিল্পী মশাররফ একই সাহিত্য প্রকরণে শৈলীগত নানারূপ অভিনবত্ব আনয়ন করেছেন। আসলে বিভিন্ন বিষয় অনেক সময় দাবী করে ভিন্ন ভিন্ন শৈলী। তাই তাঁর রচনায় একই প্রকরণে লক্ষ্য করা যায় শৈলীগত বিভিন্নতা। একথা কাব্য-কবিতা, উপন্যাস, প্রবন্ধের ন্যায় নাটকের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। মশাররফের সমাজজীবন নির্ভর নাটকের সংখ্যাই বেশি। তবে অন্যান্য নানাবিধ বিষয়ও স্থান পেয়েছে তাঁর রচিত নাটকে। সেগুলিতে নাট্যরীতি নিয়ে বিভিন্ন ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়েছে। তাঁর রচিত প্রায় সব নাটকেই আঙ্গিক নিয়ে চিন্তা-ভাবনার ছাপ সুস্পষ্ট। তবে বাংলায় বহুল প্রচলিত লোকপুরাণ বেহুলা-লখিন্দরের কাহিনি অবলম্বনে লেখা 'বেহুলা গীতাভিনয়' নাটকে শৈলী নির্মাণে বিশেষ দক্ষতার পরিচয় রেখেছেন মীর মশাররফ হোসেন।

আমরা আগেই বলেছি, বিষয় অনেক ক্ষেত্রেই দাবী করে নতুন শৈলী বা আঙ্গিকের। ফলে 'বেহুলা গীতাভিনয়' নাটকের বৃত্তগঠনে, চরিত্র চিত্রণে, সংলাপে, সঙ্গীতে, দ্বন্দ্বে, দৃশ্য সজ্জায় শৈলীগত ব্যাপারটা আলোচনা করতে গেলে এর বিষয় সম্পর্কে জানা প্রয়োজন সর্বাগ্রে।

বাংলার লোকসংস্কৃতি সম্পর্কে অভিজ্ঞ[১] মশাররফ হোসেন ১৮৮৯ খ্রিস্টাব্দে বেহুলা লখিন্দরের কাহিনি অবলম্বনে 'বেহুলা গীতাভিনয়' নাটকটি রচনা করেন। মর্তে নিজ পূজা প্রচারের জন্য বণিক চাঁদ সদাগরের পূজা দরকার ছিল মনসার। কিন্তু তাঁর পূজা করতে অসম্মত হন শৈব চাঁদ। এমনকি স্ত্রী সনকা পূজা করলে মনসার ঘটে পদাঘাত করেছেন তিনি। অন্যদিকে মনসাও ডুবিয়ে দিয়েছে চাঁদের সপ্ত ডিঙা। হত্যা করেছে লখিন্দর সহ সাত পুত্রকে। শেষে বেহুলার আবেদনে সব কিছু ফিরিয়ে দিয়েছে মনসা। এতে চাঁদ সদাগরের গৃহে ফিরে এসেছে শান্তি। 'বেহুলা গীতাভিনয়'-এ দেশীয় যাত্রাপালার আদল অনেকখানি গ্রহণ করেছেন মশাররফ। 'অগ্রে পাঠ্য' নামক ভূমিকায় এই রচনাটি সৃষ্টির কারণ সম্পর্কে নাটককার যে মন্তব্য করেছেন তা উদ্ধার করা যাক-

> বেহুলা লখিন্দরের কথা নূতন নহে। বঙ্গের স্ত্রীমহলে বেহুলার কাহিনী বড়ই আদরের। কথাটা যে একেবারেই উপকথা – এরূপ বোধ হয় না। ভাগলপুর অঞ্চলে চাম্পাই নগর, সাতালী পর্বতের চিহ্ন – এবং ত্রিবেণীর নিকট নেত ধোপানীর পাট (এইক্ষণে পাথরে পরিণত) আজ পর্যন্ত বর্ত্তমান রহিয়াছে। এই ঘটনা লইয়াই যশোহর অঞ্চলে প্রথম ভাসানযাত্রার সৃষ্টি হয়। ভাসানের ভাষা দোষে, রচইতার অযথা বর্ণনায়,

> এবং পরিশুদ্ধ সঙ্গীতের অভাব হেতুতেই শিক্ষিত সমাজে ভাসানযাত্রার আদর নাই। কিন্তু শুক্তিতেই মুক্তা, স্বর্ণকারের নিক্ষিপ্ত অঙ্গার ভস্মেই সুবর্ণকণা, সামান্য প্রস্তরেই কহিনুর এবং দারইয়াই নূরের জন্ম। এই পরিসিদ্ধ বাক্যের অনুকরণে – দৃষ্টান্ত স্থলে বলিতে পারি মনসার ভাসানই "বেহুলা গীতাভিনয়"। এই গীতাভিনয়ে শিক্ষিত সমাজের কথঞ্চিৎ পরিমাণ চিত্তাকর্ষণ করিতে পারিলেই, আমার শ্রম সার্থক বিবেচনা করিব।

'বেহুলা গীতাভিনয়' নাটকের বৃত্তটি পদ্য, গদ্য এবং গানের সমন্বয়ে গঠিত। এই নাটকের কাহিনি ছয়টি অঙ্কে বিন্যস্ত। প্রথম অঙ্কে তিনটি, দ্বিতীয় অঙ্কে তিনটি, তৃতীয় অঙ্কে তিনটি, চতুর্থ অঙ্কে তিনটি, পঞ্চম অঙ্কে চারটি এবং ষষ্ঠ অঙ্কে চারটি নিয়ে মোট কুড়িটি দৃশ্য রয়েছে এই নাটকে। অবশ্য এখানে দৃশ্যগুলিকে চিহ্নিত করা হয়েছে 'গর্ভাঙ্ক' নামে। এই গর্ভাঙ্কগুলির দু-একটা শুধু গদ্যে লেখা হলেও বেশিরভাগই পদ্য গদ্যের মিশ্রণে রচিত। কোন কোন গর্ভাঙ্ক আকারে অত্যন্ত ছোট। যেমন পঞ্চম অঙ্কের তৃতীয় গর্ভাঙ্কটি সমাপ্ত মাত্র আড়াই লাইনে। লখিন্দরের বিয়ে উপলক্ষে চাঁদ সদাগরের বাড়ির অবস্থা চিত্রিত হয়েছে এই অতি ক্ষুদ্র গর্ভাঙ্কে। এটি নাট্যশৈলীর এক অভিনব নিদর্শন। এছাড়া দৃশ্য সমাপ্তিতে 'পটক্ষেপণ' শব্দটি ব্যবহার করার রীতি লক্ষণীয়। অবশ্য মশারফের অন্য কয়েকটি নাটকেও ব্যবহৃত হয়েছে এই রীতি। নাট্যবৃত্তে মোট গান রয়েছে পনেরটি। ছয় অঙ্ক বিশিষ্ট নাটকটিতে নাটকীয় পঞ্চসন্ধি পরিলক্ষিত। বাড়িতে সনকার মনসা পূজা এবং তাতে চাঁদ সদাগরের বিরোধিতার মধ্য দিয়ে কাহিনির মুখসন্ধি (Introduction) রচিত। মনসার চাঁদের কাছে পূজা প্রত্যাশা এবং চাঁদের প্রত্যাখানের দ্বারা কাহিনি অগ্রসর হয়েছে। মনসা, চাঁদের সাতটি বাণিজ্য তরী ডুবিয়ে দিয়ে এবং ছয় পুত্রের জীবনহানিতে কাহিনি প্রতিমুখসন্ধিতে (Rising action) পৌঁছেছে। সদ্য বিবাহিত লখিন্দরের মৃত্যুতে নাট্যকাহিনি গর্ভসন্ধিতে (Climax) উপনীত। পুত্রের মৃত্যুতে বিমর্ষ হয়ে পড়ে চাঁদ। বেহুলা মৃত স্বামীকে বাঁচাবার উদ্দেশ্যে ভেলায় ভাসে। হাজির হয় দেবগণের সভায়। এ ঘটনাগুলি বিমর্ষসন্ধির (Falling action) পরিচায়ক। শেষে চাঁদ সপ্ত ডিঙা, সাত পুত্র ফিরে পান বেহুলার চেষ্টায়। সকলের মিলনে কাহিনির উপসংহার (Catastrophe) ঘটে। এ নাটকের বৃত্তে কাহিনিগত ঐক্য (Unity of action) থাকলেও ঘটনাগুল সংঘটিত হওয়ার ব্যবধান বেশি হওয়ায় কাল ঐক্য (Unity of time) বিঘ্নিত। আর স্থান ঐক্য (Unity of Place) একেবারেই রক্ষিত হয়নি। ফলে নাট্যবৃত্তটি হয়ে পড়েছে কিছুটা অগোছালো। 'মনসার ভাসান' গানের প্রচলিত নাট্যরীতিকে এ ভাবেই বৃত্তবন্ধ করেছেন মীর।

'বেহুলা গীতাভিনয়' নাটকের কাহিনি যেমন বহুল প্রচলিত তেমনি চরিত্রগুলিও গতানুগতিক। তবে দু-একটা ক্ষেত্রে মশাররফ নিজস্ব চিন্তা-ভাবনার পরিচয় রেখেছেন। এই নাটকে চাঁদ সদাগর, বেহুলা প্রধান চরিত্র।[২] এছাড়া মনসা, সনকা, লখিন্দর,

চন্দ্রকেতু, গোঁসাই দাস ঠাকুর, সায়া বণিক, চূড়ামণি ঘটক, নেত ধোপানীর ন্যায় অপ্রধান চরিত্র রয়েছে। সেই সঙ্গে ভুলে গেলে চলবে না দেবতা, মাঝি, মাল্লা, চাকরদের কথা।

চাঁদ সদাগর চরিত্রটিকে সাহসী, তেজস্বী, বলিষ্ঠ, জেদি, দৃঢ় করে অঙ্কন করেছেন নাটককার। তিনি শিবের পূজারি। কিছুতেই মনসার পূজা করবেন না। মনসা তাঁর ক্ষতি করতে পারে জেনেও অসীম সাহসিকতার সঙ্গে বলেছেন –

আজ ছাড়িব ডিঙ্গে বাজায়ে সিঙ্গে
দেখি মনসা কিবা করে।

সাতখানা বাণিজ্য তরী ডুবে যাবার পরেও দৃঢ়তার পরিচয় দিয়েছেন চাঁদ সদাগর। তিনি স্থির চিত্তে বলেছেন-

> ভয় কি? গেছে সাত ডিঙ্গে চিন্তা কি? প্রাণ থাকতে ভাবনা কি? দৈব বিপদে আর দুঃখ কি? স্থির হও, স্থির হও সকলই পাওয়া যাবে, এখন স্থির হও।

তবে প্রচলিত মনসামঙ্গল কাব্যে চাঁদ সদাগর শেষ পর্যন্ত মনসার পূজা করতে বাধ্য হয়েছেন। এ নাটকে চাঁদ সরাসরি মনসার পূজা করেছেন এমন দৃশ্য অনুপস্থিত। ফলে মীর চাঁদ চরিত্র চিত্রণে কিছুটা হলেও নতুন পথের যাত্রী একথা বলা যেতেই পারে।

বেহুলা চরিত্রের মধ্যে পতিভক্তি, ত্যাগ, ধৈর্য, প্রতিজ্ঞা, বিনয় প্রভৃতি মানবিক গুণগুলি বর্তমান। তবে সাধারণ মঙ্গলকাব্যের তুলনায় এ নাটকে বেহুলার আবেদন নিবেদন একটু বেশি। যা আমাদের হৃদয়কে স্পর্শ করে যায়। অন্যদিকে মনসা চরিত্রে গতানুগতিক মঙ্গলকাব্যগুলির মতো হিংস্রতা, নিষ্ঠুরতা, কুটিলতা, প্রতিহিংসা পরায়ণতা পরিলক্ষিত। তবে কোমলতার যে পরিচয়[৩] মনসা চরিত্রে পাওয়া যায় তা অনেকখানি নাট্যকারের নিজস্ব চিন্তা-ভাবনার ফসল। মনসা দয়া প্রবণ হয়ে বেহুলাকে বলেছে –

> তোমার মত সতী-সাধ্বী, পতিব্রতা রমণীর পতিকে অসময় হরণ করে কার সাধ্য। তুমি পতিধনে বঞ্চিত হবে না। অবশ্য পাবে – পা ছাড়। আশীর্ব্বাদ করি তুমি আজীবন পতি সুখে সুখী থাক।

অন্যান্য চরিত্রগুলিও প্রচলিত হয়েও মাঝে মাঝে সময়োপযোগী আচরণ করেছে। ফলে নাট্যশৈলীতে চোখে পড়ে বিবর্তন।

'বেহুলা গীতাভিনয়' নাটকের ভাষা সহজ, সরল, নিরাভরণ।[৪] সংলাপে ব্যবহৃত হয়েছে গদ্য পদ্য দুই রীতিই। এমনকি একই চরিত্রের সংলাপ কিছুটা গদ্যে, কিছুটা পদ্যে। প্রথম অঙ্কের প্রথম গর্ভাঙ্কে চাঁদ সদাগরের সংলাপে এই বৈশিষ্ট্য বর্তমান। আবার দুই বা ততোধিক চরিত্রের কথোপকথন কালে কোন চরিত্র গদ্যে, কোন চরিত্র পদ্যে কথা বলেছে। প্রথম অঙ্কের দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে মনসা ও ত্রিগুণার সংলাপে এই রীতি

লক্ষ্য করা যায়। মশাররফ পয়ার, ত্রিপদী ছড়ার ছন্দ প্রয়োগ করেছেন এই নাটকে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ প্রথম অঙ্কের প্রথম গর্ভাঙ্কে ব্যবহৃত একটি ত্রিপদীর উল্লেখ করা যাক-

তোর মুখে কালি ছার কপালী
কেবলি কাঁদতে পারিস;
সাজা পেতেছিস্ পরাণে মরিতে ছিস্
তবু তাঁরই পূজা করিস।

মনসার মঙ্গলঘট ভেঙে বাণিজ্যে যাবার সময়, মনসা ভক্ত স্ত্রী সনকার উদ্দেশ্যে এ কথাগুলি বলেছেন চাঁদ সদাগর। নাট্য মধ্যে আরবি, ফারসি শব্দের প্রচুর প্রয়োগ রয়েছে। তবে হালকা চালের আটপৌরে ভাষাই বেশি ব্যবহৃত। যেমন প্রথম অঙ্কের তৃতীয় গর্ভাঙ্কে কালীদহে নৌকাডুবির পর চাঁদ সদাগর কেমন আছে? এ প্রশ্নের উত্তরে দাঁড়ি বলেছে-

> রাখ বাবা সদাগর। আপন জান নিয়ে টানাটানী। সদাগরের খবর করে কে? ডুবে হাবুডুবু খাচ্ছিল। যে তুফান, কার সাধ্য তার মাঝে যায়। সেই বালাই বেটা নাথি মেরে মেরে সদাগরকে ডুবাচ্ছে, আর পানি খাওয়াচ্ছে। তার কাছে যায় কেরে বাবা! আপনি বাঁচলে ত কথা।

সাধারণ ভাষায় এই প্রতিক্রিয়াটি অত্যন্ত প্রাণবন্ত। এইভাবে চরিত্রোচিত সংলাপ প্রয়োগ, বিশেষত নিম্নশ্রেণির মানুষের মুখের সংলাপে মশাররফের কৃতিত্ব আসামান্য। নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কের প্রথম গর্ভাঙ্কে চন্দ্রকেতু সদাগরের বাড়িতে ঢুকতে চাঁদকে বাঁধা দিয়েছে দ্বাররক্ষী। পরে সেই দ্বাররক্ষীর উভয়ের ঘনিষ্ঠতা দেখে প্রতিক্রিয়া –

> বাবা! কাকে কি বলেছি। সর্ব্বনাশ হয়েছে। আর রক্ষা নাই। এত কথা এত আলাপ, এত ভালবাসা, এই পরিচয়, এত কান্দাকাটি। হায়! হায়! এতে কি আমার আর রক্ষা আছে? চাকুরির দফা ত আজই শেষ। ওকি আর ছাড়বে। যেমন করে তুই তকার করেছি, কত বকার, সকার, কত আকার ইকারে খাতির করেছি, সে কথা ওর হাড়ে হাড়ে লেগে আছে।

এ কথায় যে আকর্ষিকতা ও চমকের সৃষ্টি হয়েছে, তা সৃজন করেছে এক বিশেষ নাট্যপরিস্থিতি। একইভাবে অন্যান্য ক্ষেত্রেও সংলাপের যথাযথ প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়।

মীর মশাররফ হোসেনের এই নাটকটি মঙ্গলকাব্যের রীতি মেনে যেমন অনেকখানি পদ্যময় তেমনি বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগীয় রীতির দ্বারা প্রভাবিত হয়ে গীতিময় রূপ লাভ করেছে। মোট পনেরটি গান এ নাটকে সংযুক্ত। এমন কি নাট্য মধ্যে বিশেষ পরিস্থিতি সৃজনের জন্য বাউল সুরের সংযোজন লক্ষণীয়। কিন্তু মঙ্গলগান এবং 'বেহুলা লোকাভিনয়'-এর গানের ভাব, ভাষা, প্রয়োগ কৌশল এবং উদ্দেশ্য একেবারেই ভিন্ন ধরনের। এই নাটকের গানগুলি কাব্যময় না হয়ে নাট্যশৈলীকেই আধার হিসেবে গ্রহণ করেছে। নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কের তৃতীয় গর্ভাঙ্কের শুরুতে গান সংযুক্ত হয়েছে চাঁদ সদাগরের কণ্ঠে-

কি হল রে আমার আমি কিছু ভাবিয়ে না পাই
এ ঘোর অরণ্য যাবো একা কোথা যাই।

বনের মধ্যে কাঠের উপরে বসে গাওয়া গানটি জন্ম দিয়েছে বিশেষ নাট্যপরিস্থিতির। মশাররফের কলমে অঙ্কিত এই চাঁদ সদাগর অনেকখানি প্রচলিত মঙ্গলকাব্যের থেকে স্বতন্ত্রতায় মণ্ডিত। আবার সব থেকে বেশি আটটি গান ব্যবহার হয়েছে পঞ্চম অঙ্কে। এই অঙ্কের প্রথম গর্ভাঙ্কে নেতর মুখে ব্যবহৃত – ‘‘যে যে কথা শুনেছি কনে’’ গানটিতে ছড়ার একটা ঢং অনুসরণ করা হয়েছে। এটি অভিনবত্বের পরিচয়বাহী। নাটকে ব্যবহৃত অনেকগুলি গানে নাটককার রাগিনী এবং তাল উল্লেখ করেছেন। মশাররফের সমকালের নাটককারদের গানে তাল, রাগিনীর উল্লেখ দৃষ্টান্ত সচরাচর পাওয়া যায় না। এ দিক থেকে বিচার করলে গতানুগতিক ধারার কিছুটা পরিবর্তন এনেছেন মশাররফ। আর দ্বিতীয় অঙ্কের দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে বাউলের সুর ব্যবহার প্রচলিত রীতির মধ্যে পড়ে না। নাটককার হয়তো এই সুরের দ্বারা বোঝাতে চেয়েছেন সবার চিরদিন একইভাবে না যাওয়ার বিষয়টা। এ সুরে চাঁদ সদাগরের দুঃখ মোচনের ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। এইভাবে গান ব্যবহারে গতানুগতিক ধারার মধ্যে কিছুটা নতুনত্ব এনে নাট্যরীতির কিছুটা পরিবর্তন করেছেন মশাররফ।

মনসা, চাঁদ সদাগরের লড়াইয়ের মাধ্যমে অগ্রসর হয়েছে ‘বেহুলা গীতাভিনয়’ নাটক। তবে পঞ্চদশ থেকে অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত মনসামঙ্গল কবিদের কলমে ব্যক্ত মনসা চাঁদ দ্বন্দ্ব নাটকে দেখা যায় না। এখানে উভয়ের দ্বন্দ্ব অনেকটাই মৃদু। আসলে মনসামঙ্গলের কবিরা তাঁদের সময়ের সামাজিক তীব্র লড়াইয়ের কথা কাব্যে ফুটিয়ে তুলেছেন। আর এ নাটকের নাট্যকার উপস্থাপন করেছেন উনিশ শতকের সমাজের লড়াই সংগ্রামের কথা। তাই নাট্যদ্বন্দ্ব মশাররফের কলমে অন্যমাত্রায় অভিব্যক্ত। ফলে মনসামঙ্গলের বিষয় অবলম্বনে এ নাটক লেখা হলেও আমাদের চোখে পড়ে সাহিত্য শৈলীগত একটা বিবর্তন। এখানে মনসা এবং চাঁদ সদাগরের সংলাপে আক্রমণাত্মক শব্দবন্ধ বা বাক্যের প্রয়োগ অনেকখানি অপসৃত। পঞ্চম অঙ্কের চতুর্থ গর্ভাঙ্কে বাসর ঘরে বেহুলা লখিন্দরকে দেখে মনসার উক্তি-

> (বাসর ঘরের চতুঃদিকে দৃষ্টি – নখিন্দর এবং বেহুলার মুখপানে স্থির নয়নে দৃষ্টি করিতে ২ – স্বাগত) কি চমৎকার রূপ। আহা! কি চমৎকার ভাব, সাধের প্রতিমা। আহা! সোনার প্রতিমা! (একটু নিকটে গিয়া) অর্দ্ধ মুকুলিত কমলগুচ্ছ এ কোমল শয্যায় এমনভাবে কে সাজাইয়া রাখিল? নখিন্দরের মুখের দিকে চাইতে গেলে বেহুলার মুখের কথা মনে পড়ে, বেহুলার মুখের দিকে চক্ষু পড়িলে, নখিন্দরের দিকে টানিয়া নয়ন মোহনিদ্রায় নিদ্রিত।

এই কথাগুলিতে সহানুভূতিশীল, অন্তর্দ্বন্দ্বময়, অনেকখানি হিংস্রতামুক্ত মনসা যেন হাজির। চাঁদ সদাগরের সংলাপেও মনসা বিরোধিতা খুব তীব্র নয়। নৌকাডুবির পর দাঁড়িগণের উদ্দেশ্যে তিনি বলেছেন-

> .... বাবা সকল তোমাদের দুঃখ আমি বাড়ী গিয়ে দূর করবো, আমার সঙ্গে এসে তোমরাও তার কোপে পড়েছ। যার কল্যাণে এই ঘটনা ঘটেছে বোধ হয় আরও ঘট্‌তে পারে। ঘটুক সে যত পারে করুক, তাতে চাঁদ হেলবার নয়, চাঁদের মন টলবার নয়, সেই কথা – মনের কষ্ট মনেই সয়ে রয়েছি।

নাটকটির মোট কুড়িটি গর্ভাঙ্ক বা দৃশ্যকে যথাযথ রূপে সজ্জিত করা হয়েছে। চম্পক নগরে – চাঁদ সদাগরের বাড়ী, সায়া বণিকের বাড়ী, চম্পক নগরের রাজপথ, নেত ধোপানীর বাড়ী, সুরপুর – দেবগণের সভা প্রভৃতি দৃশ্যপটগুলি যথাযথ রূপে উপস্থিত। এই দৃশ্য সজ্জা নির্মাণেও যে কিছু কিছু আপন চিন্তা-ভাবনায় প্রকাশ নাটককার ঘটিয়েছেন তা অনুধাবন করা যায়।

'বেহুলা গীতাভিনয়' প্রচলিত মনসামঙ্গল অবলম্বনে গড়ে ওঠায় কাহিনিগত দিক থেকে নাটককার কোনরূপ মৌলিকতা দেখাতে পারেননি। তবে উপস্থাপন রীতিতে বেশ কিছু নতুনত্ব এনেছেন। মূলত কাব্যময় মনসা কাহিনিকে নাট্যরীতিতে আবদ্ধ করেছেন মশাররফ। সেই নাট্য রীতিতেও শৈলীগত নানা রকমের পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন তিনি। লোকপুরাণের গণ্ডির মধ্যে থেকে বৃত্তগঠনে, চরিত্র চিত্রণে, সংলাপ রচনায়, সঙ্গীত সংযোজনে, দৃশ্যপট নির্বাচনে নাটককার মশাররফ শৈলীগত দিক থেকে কিছু হলেও যে বৈচিত্রময়তার পরিচয় দিয়েছেন সে কথা স্বীকার করতেই হবে। এখানেই নাটককার মীর মশাররফ হোসেনের সার্থকতা।

টীকা ও উৎস নির্দেশ :

১. আবুল আহসান চৌধুরী (সম্পাদিত), (২০১২) মীর মশাররফ হোসেনের নাট্য সমগ্র, নান্দনিক, ঢাকা, পৃ. ২৩।
২. আবুল আহসান চৌধুরী (সম্পাদিত), (২০১২) মীর মশাররফ হোসেনর নাট্য সমগ্র, নান্দনিক, ঢাকা, পৃ. ২৩।
৩. সাইফুল্লা, সুকান্ত মুখোপাধ্যায় (সম্পাদিত), (২০১৬) 'এবং সংস্কৃতি' পত্রিকার মীর মশাররফ হোসেন সংখ্যা, সুবীরকুমার চট্টোপাধ্যায়ের প্রবন্ধ, পৃ. ১৫৫।
৪. সাইফুল্লা, সুকান্ত মুখোপাধ্যায় (সম্পাদিত), (২০১৬) 'এবং সংস্কৃতি' পত্রিকার মীর মশাররফ হোসেন সংখ্যা, সুবীরকুমার চট্টোপাধ্যায়ের প্রবন্ধ, পৃ. ১৫৬।

সহায়ক গ্রন্থ :

১. ঘোষ অজিতকুমার – বাংলা নাটকের ইতিহাস (১৯৯৯), জেনারেল, কলকাতা।

২. চৌধুরী আবুল আহসান – মীর মশাররফ হোসেন – নাট্য সমগ্র (২০১২), নান্দনিক, ঢাকা।

৩. বন্দ্যোপাধ্যায় ব্রজেন্দ্রনাথ – স্বর্ণকুমারী দেবী, মীর মশাররফ হোসেন (১৪১৯), বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলকাতা।

৪. ভট্টাচার্য আশুতোষ – বাংলা নাট্য সাহিত্যের ইতিহাস (২০০৩), এ. মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা।

৫. মুখোপাধ্যায় দুর্গাশঙ্কর – নাট্য তত্ত্ববিচার (১৪০১), মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা।

৬. সাইফুল্লা, সুকান্ত মুখোপাধ্যায় ‘এবং সংস্কৃতি’ (মীর মশাররফ হোসেন সংখ্যা), (২০১৬) এবং সংস্কৃতি, কলকাতা।

সুবোধ ঘোষের নির্বাচিত ছোটগল্পে চারিত্রিক মনস্তত্ত্বের দ্বান্দ্বিক ঝঞ্ঝা ও চেতনার অন্তর্প্রবাহ

অপূর্ব পাহাড়
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
দমদম মতিঝিল রবীন্দ্র মহাবিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ : আধুনিক সমাজ বাস্তবতা আজকের মানব জগৎকে যেমন উন্নয়নের কয়েক ধাপ উপরে এনে ফেলেছে তেমনি এই মানুষগুলির ঝুলিতে ভরে দিয়েছে মনস্তাত্ত্বিক নানান জটিলতা। চেতন-অবচেতন বা অচেতন মনের গভীরে বয়ে চলেছে জটিল ফল্গুধারা। মানসিক উত্থান-পতন, মনের গতিবিধির পরিবর্তনকে অস্ত্র করে বিশ শতকের ছোটগল্পকার সুবোধ ঘোষ সাহিত্য জগতে সূক্ষ্ম কলমের আঁচড় তৈরি করেছেন। এক রহস্যময় গোলকধাঁধার মতো এ জগতে এমন অনেক নারীও থাকেন, যারা ভিখারি; তবে অর্থের নয়— প্রেমের। প্রেমপ্রার্থী হয়ে তাদের অনেক বসন্ত পার হয়ে যায় কিন্তু প্রেম এসে হাতছানি দেয় না। পুরুষের দিকে চাইতে চাইতে একটা সময় পর সে'সব মেয়ের মন ও মেজাজ জুড়ে বাসা বাঁধে একটাই অনুভূতি, তার নাম প্রেম নয়— ভালোবাসা নয় বরং ঈর্ষাপরায়ণতা। আমাদের সমাজ কত সহজে একজন নারীকে বারবণিতার তকমা দেয়— সেই বারবণিতাটির এই সমাজে অনেক ভালো অবদান থাকতেও পারে। কিন্তু সমস্ত কিছুর বিনিময়ে তাদের কপালে কী জোটে? শারীরিক ভোগান্তি; যেন তারা মানুষ নয়— নিছকই একটা শরীর— একটা লোভাতুর আকর্ষণ মাত্র। আবার এমন অনেক পুরুষ মানুষকেও আমরা এই সমাজে লক্ষ করি যারা বাহ্যিক সমাজে দেবতুল্য বলে পরিচিতি পেতে চান। কিন্তু মনস্তত্ত্বের গভীরে সুবোধ ঘোষ অবগাহন করে এই সত্যেরই উদ্‌ঘাটন করেছেন যে, যোগী কখনো কখনো ভোগীও হয়। এমন অনেক সুবিধাবাদী মানুষকে আমরা এই সমাজে প্রতিনিয়ত দেখছি, যারা নিজেদের সুবিধা প্রাপ্তির জন্য গিরগিটির মতো রঙ বদলায়— গোত্র বদলায়। আর এই বদলের মধ্য দিয়ে কখনও কখনও একজন মানুষ তার মানবিকতা বিসর্জন দিয়ে অসামাজিক হয়ে ওঠে; এগুলির-ই বাস্তব রূপায়ণ এই আধুনিক কথাকারের লেখনীতে খুঁজে পাই। একজন বারবধূ সমাজে রক্ষিতা হিসেবে চিহ্নিত হয়, কিন্তু বারবধূ গৃহবধূ হয়ে উঠতে পারবেনা কেন? একজন বারবধূর স্বপ্ন-সাধ-ভালোবাসা-ভালোবাসার প্রবণতাকে সমাজ কেন সীমায়িত করবে? এমন অনেক প্রশ্ন নিয়ে মানব চেতনার গভীরে ঘটে চলা এই ঊর্ধ্বমুখী ও নিম্নমুখী গ্রাফটিকে কথাকার সুবোধ ঘোষ বিশ্লেষণী দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে তাঁর গল্পের মধ্য দিয়ে— তাঁর সৃষ্ট গল্পের চরিত্রের মধ্য দিয়ে পাঠকের সামনে উপস্থাপন করেছেন।

সূচক শব্দ : ঈর্ষাপরায়ণ, লীলাকুরঙ্গী, বাসনা-বিড়ম্বিত, অফুরন্ত ব্যঞ্জনা, অসহায়ত্ব, সৌন্দর্য-বিলাসী, জ্ঞানপ্রদীপ, বিশ্বাসঘাতক, দ্বিধাদীর্ণ মানসিকতা, মানস বিশ্লেষণ, অন্তরঙ্গ সৌন্দর্য।

।। এক ।।

বাংলা সাহিত্যের পরিধি ছাড়িয়ে ভারতীয় সাহিত্যের ছোটগল্পবিশ্বে সুবোধ ঘোষ (১৯০৯ খ্রি.- ১৯৮০ খ্রি.) একটি জ্যোতিষ্কের মতো জ্বলজ্বল করছে। বিচিত্র অভিজ্ঞতা সম্বলিত জীবনীশক্তি— নিপুণ পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা—বিশ্লেষণী দক্ষতা—মনস্তাত্ত্বিক নিরীক্ষণ—জীবন বিশ্লেষণের প্রগতিবাদী ধারা— কাহিনি বয়নের যৌক্তিক শৃঙ্খল ও গঠন কাঠামোর সুচিন্তিত বিন্যাসক্রম সুবোধ ঘোষকে ছোটগল্পকার হিসেবে বিশেষ পরিচিতি দিয়েছে। ছোটগল্প রচনায় গঠন ও নির্মাণশৈলীর আলোয় তিনি স্বীয় গল্পবিশ্বের একটি পরিমণ্ডল সৃষ্টি করেছেন। ছোটগল্পকার সুবোধ ঘোষ সম্পর্কে সমালোচক অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়ের মন্তব্য ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। তিনি বলেছেন—

> *"রিয়ালিজমের নতুন রূপ নিয়ে সুবোধ ঘোষ এলেন গল্পক্ষেত্রে। গভীর আর্থনীতিক ও রাজনীতিক চেতনা, প্রখর বাস্তবজ্ঞান ও অভ্রান্ত জীবনবোধ নিয়ে এলেন।"*[১]

বাস্তবতা ও সমাজ চেতনার যথার্থ ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ ধরা পড়ে সুবোধ ঘোষের একাধিক গল্পে। জীবন-জিজ্ঞাসার বহুমাত্রিক ও বহুস্তরীয় চিত্র ফুটে ওঠে তাঁর বিভিন্ন গল্পে। বহুকৌণিক দিক থেকে চরিত্রগুলি যার আলোকে হয়ে ওঠে যেন সম্পূর্ণ বাস্তবধর্মী। কেবলমাত্র বাস্তবতা বা সমাজচেতনায় লিপিবদ্ধ করলে তাঁর গল্প নির্মাণের যে ব্যাপ্তি, তাকে বোধহয় সংকীর্ণ করে তোলা হয়। এ প্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে সমালোচক সাবিত্রি নন্দ চক্রবর্তীর বক্তব্য। সমালোচকের কথায়—

> *"ব্যক্তিমানুষ তাঁর গল্পে প্রাধান্য পেয়েছে— কাহিনির কক্ষ থেকে ব্যক্তির সম্পূর্ণ ছবি শুধু বহিরঙ্গে নয়— তবে বহিরঙ্গকেই বাদ দিই কেন, বিচিত্র জটিল পেশা, নানা বৃত্তি নানা সামাজিক অবস্থানে যেখানেই থাকুক তাঁর চরিত্ররা তাদের মানবতাই তাঁর অন্বিষ্ট। মানবতার জটিল গহন সূক্ষ্ম নানা আনুষঙ্গিক রূপায়ণ তিনি সন্ধান করেছেন তাঁর গল্পে।"*[২]

সদর্থে সুবোধ ঘোষের ছোটগল্পে সমাজ-বাস্তবতার পাশাপাশি ধরা পড়ে সমাজ-মনস্তত্ত্ব। তাঁর সৃষ্ট চরিত্রগুলিতে মনের অন্তর্গত স্রোতকে ধরতে চায় সবসময়। বাস্তবতা, সমাজতাত্ত্বিক বীক্ষণ, চেতনার ফল্গুধারা ও জীবনবোধের বিবিধ সমন্বয়ে তাঁর ছোটগল্প হয়ে উঠেছে বৈচিত্র্যে পরিপূর্ণ। লেখকের গল্পের মোচড় নয় কেবল, তাঁর সৃষ্ট বিভিন্ন চরিত্র যেন একে অন্যকে অতিক্রম করে গেছে হয় বাস্তবতায় নয় তো মনস্তাত্ত্বিক গুরুত্বে। লেখকের গল্প জগতে প্রবেশ করলে আমরা সম্পূর্ণ ভিন্ন এক জগতের সম্মুখীন হই। সমাজ-প্রেক্ষিতের পাশাপাশি মানুষের মনের জটিলতা, চরিত্রের মনস্তত্ত্ব, চরিত্রের

ঘাত-প্রতিঘাত কিংবা মনস্তাত্ত্বিক যে দ্বন্দ্ব; সেগুলি চরিত্রটিকে নতুনভাবে আবিষ্কার করে— গল্পের ব্যাখ্যা হয় ভিন্নধর্মী, যা পাঠককে যা ভাবতে বাধ্য করে। চরিত্রের অন্তর্মুখী নানান ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া তাকে নিয়ে যায় চেতনার এক স্তর থেকে ভিন্ন আরেক স্তরে। চারিত্রিক মনস্তত্ত্ব ও চরিত্রের অন্তঃস্থ যে প্লাবন তা পাঠককে ভাবায়; সুবোধ ঘোষের সৃষ্ট কয়েকটি ছোটগল্প বিশ্লেষণের পরিসরে তাঁর গল্প নির্মাণের এই বিশেষ বৈশিষ্ট্যের-ই অন্বেষণ রয়েছে নিবন্ধটিতে।

।। দুই।।

গরল অমিয় ভেল : অবদমিত কামনা বাসনা ও সমলিঙ্গে ঈর্ষাপরায়ণতা

সুবোধ ঘোষের এই গল্পটির কেন্দ্রীয় চরিত্র মালা বিশ্বাস। শ্রেণিবিচার বা গোত্র নির্ণয়ে বোঝা যায়, 'গরল অমিয় ভেল' গল্পটি জটিল মনস্তত্ত্বের একটি সার্থক গল্প। এই গল্প পাঠে সহজেই মনে হয়, মধ্যবিত্তের মনোগহনের সর্পিল পথে গল্পকারের যাওয়া-আসা অতিশয় স্বচ্ছ। এখানে যুবতী মালার প্রেম প্রাধান্য পায়নি, প্রাধান্য পেয়েছে পুরুষের জন্য তার প্রেমের ব্যাকুল আর্তি এবং তার থেকে উন্মোচিত হয়েছে বিকৃত আত্মরতি, যা ধ্বংসাত্মক। পুরুষের প্রেম পাওয়ার জন্য বা পুরুষের চোখে নিজ প্রাধান্য তৈরির ক্ষেত্রে মালা চরিত্রটির মধ্যে ধরা পড়েছে সমলিঙ্গে ঈর্ষাপরায়ণবৃত্তি। নারী ও পুরুষ একে অন্যের প্রতি আকৃষ্ট হবে— এ তো খুবই স্বাভাবিক প্রবণতা; কিন্তু এই গল্পটির প্রধান চরিত্রটি অবদমিত কামনা-বাসনার প্রতি ভীষণভাবে মোহাচ্ছন্ন। গল্পটিতে লেখক আধুনিক মনোবিজ্ঞানের যথার্থ প্রয়োগে উদ্যোগী হয়েছেন। গল্পটির সমগ্র অংশ জুড়ে আছে কেন্দ্রীয় চরিত্রটির বিবর্তনের নানাবিধ ধারা— যার ভরকেন্দ্র ভয়ংকর জটিল এক মনস্তত্ত্ব এবং যার ক্রিয়াকর্মে প্রাধান্য পাচ্ছে অবদমিত মন।

'গরল অমিয় ভেল' গল্পটির আদ্যন্ত পাঠে লক্ষণীয়ভাবে ধরা পড়ে, অন্য মেয়েদের থেকে দেখতে কুৎসিত হওয়ার জন্য মালা চরিত্রটিতে আছে হীনমন্যতাবোধ। গল্পটির পরিণতি বা বিবর্তনে দেখা যায় পূর্ণিমা বসু, সুমিতা নন্দী, সুধা দত্ত, প্রীতি মুখার্জী ও মুক্তি রায়— এই পাঁচ সুন্দরী রমণীর নামে নিন্দা বা ভয়ংকর রকমের অশ্লীল লেখা প্রকাশিত হয় কালো পাথরের গায়ে এবং তা বিভিন্ন কালপর্বে বা সময়ের ব্যবধানে। এই ধরনের নিন্দামূলক কথাবার্তায় মনে মনে আনন্দিত হয় মালা। কিন্তু কেন? আসলে নিজের কদর্যরূপকে সবথেকে বেশি সে-ই চেনে; সেই কদর্যরূপের জন্য সে হীনমন্যতায় ভোগে— আত্মগ্লানিতে ভোগে। নিজের কুশ্রী রূপকে আড়াল করতে নানারকম প্রসাধনী ও অদ্ভুত সাজসজ্জা করতেও সে বিরত হয় না। তার এই ক্রিয়াকর্ম একসময় তাকে উদ্‌ভ্রান্ত করে তোলে, তাই নিজের নামে খারাপ কথাবার্তা লিখতেও সে পিছপা হয় না। যে সকল মেয়ের নামে নিন্দা রটেছে, মালা তাদের নিন্দা দেখে ভেবেছে; বেশ হয়েছে— এবার তারা আত্মগোপন করবে। কিন্তু না, তারা মালার আশানুরূপ আচরণ করেনি বরং তারা যেমন ছিল তেমন স্বাভাবিকই থেকেছে। তাদের ঘনিষ্ঠতা, বাক্যালাপ দেখে অবাক হয়েছে মালা, তাই তার কণ্ঠে স্বগতোক্তি—

> "হ্যাঁ ঠিক ওরাই চারজন। কিন্তু কবে ওরা এত ঘনিষ্ঠ হলো? আগে তো ওরা কেউ কাউকে ভাল করে চিনতোও না। আশ্চর্য, আজ ওরা এক হয়ে গেছে।"[৩]

মালার ঈর্ষাপ্রবণ মন বারংবার চেয়েছে, ওরা সমাজের কাছে নিন্দিত হোক। তাই ওদের নিন্দাবাক্যে সে মনে মনে পুলকিত হয়েছে। কিন্তু বাস্তবের প্রকৃত চিত্র ভয়ংকর হয়ে দাঁড়ায় মালার কাছে। সিনেমা হলে গিয়ে সিনেমা না দেখে মালা 'ওদের' দেখছিল। গল্পকারের বর্ণনায় ধরা পড়ে—

> "সিনেমার ছবি চোখের সামনে বৃথা ঝলসে পুড়ছিল, মালা ডুবেছিল তার মনের অন্ধকারে, কালো পাথরের সেই ভয়ংকর কুৎসা, মনে পড়লেই আতঙ্ক হয়। মালা জানতো, এই গরবিণীরাই তো মান হারিয়েছে। কিন্তু এ আবার কোন্ ছবি। এ যে নতুন করে মান পাওয়া। ওদের চোখে মুখে সেই তৃপ্তির উদ্ভাস।"[৪]

মালা ভেবে নিয়েছিল ওরা মান হারিয়েছে, তার কেন জানি না একটা ধারণা জন্মেছিল, ওরা মান খোয়ালে তার মতো মেয়ের মান বাড়বে কিন্তু পরক্ষণেই সে বুঝতে সক্ষম হয়, তার ধারণা ভ্রান্ত। পরবর্তী সময়ে দেখা যায়, মালা একটা সাধারণ মিলের শাড়ি— আঁচলটা আধ হাত ছেঁড়া কিংবা দেশি ছিটের একটা আধ ময়লা ব্লাউজ পরে গেছে মেলায়। তার এই অদ্ভুত আচরণে মনস্তত্ত্বের অজানা প্রবাহকে ইঙ্গিত করে। শুধু তাই নয়, মালা স্পষ্টতই বুঝতে সক্ষম হয়, সে একা, কেবলই একা। লেখকের বর্ণনায় উঠে আসে—

> "মালা যেন আভাষে দেখতে পাচ্ছে— এই মেলার ভীড় ভাগ করে দেওয়া হয়েছে তিন ভাগে। এখানে একদল আছে, যারা পূর্ণিমাদের মত অসাধারণ। একদল রয়েছে, রাণু অনুপমা ও এই পাঁচশত নবীনা প্রবীণার মত সাধারণ। আর আছে মাত্র একজন— মালা বিশ্বাস— সাধারণের নীচে।"[৫]

"গরল অমিয় ভেল' গল্পটির পরিণতিতে দেখা যায়, মালা ক্রমশ নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছে। আজকাল ঘরের ভিতরে নিজেকে বন্দি রাখতেই ভালোবাসে সে। সে ভাবে পুরুষকে নিজের মনের মতো করে দেখা কিংবা পুরুষকে দেখাবার পালা তার সাঙ্গ হয়ে গেছে। সে মনে মনে এও ভাবে, বাইরের পৃথিবীতে তাকে মানায় না। সেখানে কেবলমাত্র পূর্ণিমাদের মতন রূপসীদের-ই মানায়। তার মনে হয় ওরা দয়িতা— কামনার লীলাকুরঙ্গী। সকল প্রলোভন ব্যতিরেকে, সকল সীমানা অতিক্রম করে এক বেদনাহীন মরুস্থলীতে দাঁড়াতে চায় মালা। সে নিজে নিজে ভাবে সে একা— তার মতো নিঃস্ব বোধহয় আর কেউ নেই। কিন্তু অন্তঃস্থ জ্বালা, যন্ত্রণা, ক্ষোভ, কষ্ট, বেদনাকে কোনো মানুষ কী এক লহমায় ভুলতে পারে? বোধহয় না। তাই গল্পটির Climax-এ

দেখা যায়, গল্পকারের কেন্দ্রীয় চরিত্রটি নিজের নামে নিজেই অপবাদ লেখে— আর এই লিখন নায়িকার ঈর্ষা ও অবচেতন মনের কামনা বাসনাকে এক জটিল মনস্তত্ত্বে রূপান্তরিত করে— যা কেবলই বিস্ময়কর! আসলে মালা বিশ্বাস কোনো বিচ্ছিন্ন একক নারী বা একক সত্তা নয়; সেও আসলে প্রতিনিধিত্ব করছে অবদমিত বাসনা-বিড়ম্বিত অসংখ্য অসংখ্য মালা বিশ্বাসের প্রতিনিধি স্বরূপ। সমালোচক আশিস চক্রবর্তী **Henry V** নাটকের প্রসঙ্গ তুলে মালার এই অবস্থানকে সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি বলেছেন—

> *"গল্পের মালা বিশ্বাসও যেন সেই বিধ্বস্ত মানুষগুলিরই একজন— ঢেউ-এর তাণ্ডবে ভেসে যাবে জেনেও নশ্বর বালুকা বেলায় দাঁড়িয়ে থাকাই যার অনিবার্য ভবিতব্য।"*[৮]

পরশুরামের কুঠার : মা ও সন্তান

সুবোধ ঘোষের 'পরশুরামের কুঠার' গল্পের শিরোনাম বা আলোচনায় পুরাণের কথা উঠে আসে এবং বোধ হয় তা স্বাভাবিক-ই। কারণ 'পরশুরাম' চরিত্রটি পুরাণাশ্রিত। পুরাণকে নির্ভর করে লেখা এই গল্পটি সুবোধ ঘোষের একটি বিশিষ্ট গল্প তো বটেই এমনকি গল্পটি তাঁকে স্বতন্ত্র মর্যাদাও দিয়েছে, একথা বলাই যায়। পুরাণে উল্লেখ আছে পরশুরাম বিষ্ণুর ষষ্ঠ অবতার। জমদগ্নি ও রেণুকার পঞ্চম পুত্র হিসেবে পরশুরামের আবির্ভাব। গল্পের শীর্ষনামটি ছাড়া কোনো পৌরাণিক চরিত্র গল্পটিতে স্থান পায়নি কিন্তু প্রতীক ও ব্যঞ্জনায় গল্পটিতে পুরাণের প্রভাব পড়েছে, তা স্বীকার্য। 'পরশুরামের কুঠার' গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্রটি হল ধনিয়া। সমগ্র গল্পের নিবিড় পাঠে ধনিয়া চরিত্রের দ্বিবিধরূপ ফুটে ওঠে। দ্বিবিধরূপটি এমন তরো—

ক. প্রকৃত মা হয়েও সন্তান বিসর্জন।
খ. আপন সন্তান না হওয়া সত্ত্বেও সন্তান প্রতিপালন।

ধনিয়া চরিত্রটি এই দ্বিবিধরূপের সমন্বয়ে সুবোধ ঘোষের অনবদ্য সৃষ্টি হিসেবে গৃহীত হয়েছে পাঠকের মনন ও ভাবনায়।

গল্পটির প্রথম পর্বে দেখা যায় তিলকের মা ধনিয়া হলেও তার বাবার ঠিক নেই— সে অর্থে ধনিয়ার জীবন অসামাজিক। নিয়মিত অবৈধ সন্তানের জন্ম দিলেও নিজের কাছে সে কাউকেও রাখে না। অসামাজিক হলেও তার জ্ঞানবুদ্ধি প্রখর। তার জ্ঞানবুদ্ধি বা বাস্তববুদ্ধির পরিচয় মেলে এরূপ কয়েকটি উক্তিতে—

অ. —ডাক্তারনীজী, আমি খাওয়াতে পারবো না। ছেলে কষ্ট পাবে আর বড় হয়ে আমার দুসমন হবে। ছেলেকে মানুষ করার মত পয়সা আমার নেই।

(সুবোধ ঘোষের শ্রেষ্ঠগল্প, পৃ ৬৫)

আ. —ওরা ছেলেকে মানুষ করে না বহিন, ওরা ছেলেকে ভিখিরি করে, আমি তা পারবো না। (ঐ, পৃ ৬৫)

ই. —অনেকের সঙ্গেই থাকি, তার মধ্যে অনেকের নামও জানি না। কসুর মাপ করবেন ডাক্তারনীজী, যে কোন একটা নাম লিখে নিন। (ঐ, পৃ ৬৬)

নিয়মিত সন্তানের জননী হয়েও নিজ সন্তানকে সে কাছে রাখতে পারে না। সমাজ সংসারে তার আপনার বলতে কেউ নেই। বাঁচার জন্য সে বেছে নিয়েছে এই অসামাজিক জীবন। লেডি ডাক্তার যখন তাকে বলে সন্তানকে ভিখারিও কাছে রাখে, তখন ধনিয়ার প্রত্যুত্তর পাঠককে অবাক করে। আবার যখন লেডি ডাক্তার তার স্বামীর নাম জানতে চায়, সে অকপটে উত্তর দেয়, সে অনেকের সঙ্গেই থাকে— অনেকের নামও সে জানে না। এইরূপ উত্তর দেওয়ার মধ্যে তার কোনপ্রকার লজ্জা নেই; বাঁচার জন্য সে এই জীবনকে বেছে নিয়েছে। কিন্তু যার সঙ্গে শোয়, তার নাম পর্যন্ত তার মনে রাখার প্রয়োজন পড়ে না।

নিয়মিত সন্তান প্রসব করায় ধনিয়ার বুকে দুধ আছে— দুঃখের বিষয়, নিজের সন্তান তা পায় না। কিন্তু উচ্চবিত্ত বা মধ্যবিত্ত সমাজ নিজেদের প্রয়োজনে সেই অসামাজিক মেয়েটাকেও ব্যবহার করে। ধনিয়া স্তন্য দানে বাঁচিয়ে তোলে উচ্চবিত্ত ঘরের ধুকপুকে আয়ুর সেইসব নবজাত শিশুদের— যাদের মা কেউ বা সূতিকাতে জর্জরিত, কেউ বা রক্তহীনতায় সিটিয়ে যায়, আবার কারও বা বুকে দুধ অকালেই স্তব্ধ হয়ে গেছে। কিন্তু যখন তাদের প্রয়োজন ফুরাল, তারাই ধনিয়াকে ছুঁড়ে ফেলে দিল আস্তাকুঁড়ে। যখন ধনিয়ার উপার্জন নেই; কোনরূপ উপায় না পেয়ে সে গেছে সেইসব গৃহস্থের ঘরে, যাদের একদিন লোকলজ্জা ও বংশরক্ষার হাত থেকে ধনিয়া রক্ষা করেছে। আজ তাদের-ই মনে সংশয়, 'পাড়া ভরা সব আইবুড়ো ছেলে— মাগী যে কখন কার সর্বনাশ করে বসে কে জানে।' (শ্রেষ্ঠগল্প, পৃ ৬৭)। তাই সমাজের উচ্চবিত্তরা তাকে বারবণিতার দলে নাম লেখাতে বাধ্য করেছে। গল্পকার তাঁর এই গল্পে পুরুষশাসিত সমাজে নারীকে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে দিয়েছেন। অন্ত্যজ পল্লীর ধনিয়া বেশ্যা হলেও 'ভদ্র' পরিবারে প্রবেশের ছাড়পত্র পায় তার বুকের দুধের বিনিময়ে। কিন্তু তাকে ঘৃণা করে ভদ্র মধ্যবিত্ত সমাজ। তাই শেষপর্যন্ত পুরুষশাসিত ভদ্রসমাজের পরশুরামের কুঠার নেমে আসে। সমালোচক অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় বিষয়টিকে এইরূপে বর্ণনা করেছেন—

> "স্বাস্থ্যহীন জননীর সদ্যোজাত শিশুদের দুধ খাইয়ে পুষ্ট করে তোলার দায়িত্ব থাকে তার। বিনিময়ে পায় টাকা। কিন্তু একদিন পুরুষশাসিত ভদ্রসমাজের পরশুরামের কুঠার নেমে আসে তার ওপর। শহরের প্রান্তে বেশ্যাপল্লীতে উঠে যেতে হয় তাকে।"[৭]

ধনিয়ার এই অসামাজিক জীবনে নিজ জীবন বাঁচানো ছাড়া আর একজনের জীবন বাঁচানোর দায়িত্ব নিয়েছিল সে। সমাজ যখন আইনের শাসনে তাকে বারবণিতার

দলে নাম লেখাতে একপ্রকার বাধ্য করেছে, তখন অভিমানে, ক্ষোভে সে বৃদ্ধ প্রসাদী ডোমকে জিজ্ঞাসা করেছে—

—হ্যাঁ চাচা, আমার জাত নেই, আমি নাকি রাণ্ডী।

—ছি ছি, এ কি বলছিস?

—হ্যাঁ চাচা, আমাকে নাম লেখাতে হয়েছে। কাল থেকে বাজারে থাকতে হবে।

—আরে না, তুই তো লছমী।

—না চাচা, আমার স্বামী নেই।

—গাইগরুরও স্বামী নেই। তারা কি লছমী নয়?

—তা বললে চলে না, আমি তো গাই নই। আমি মানুষ।

'গাই' আর 'মানুষ' এই শব্দদ্বয়ের মধ্য দিয়ে অফুরন্ত ব্যঞ্জনা ঝরে পড়েছে। গল্পকার ও সমালোচক সোহারাব হোসেনের মন্তব্য এ-প্রসঙ্গে উল্লেখের দাবি রাখে। সমালোচক হোসেন বলেছেন—

> *"সমাজ মানুষের হাতে, উচ্চবিত্ত মানুষের হাতে, মানুষের এই পশুর চেয়েও অসম্মান যতটা শোচনীয় ততটা অমানুষিক। আর এই— 'আমি তো গাই নই, আমি মানুষ'— যেন বিদ্রুপ করে ওঠে। একদিন যে ছিল উচ্চবিত্ত সমাজে জীবনদাত্রী, সে এখন গাইয়ের থেকেও অধম।"*[৮]

পুরাণ কথিত পরশুরাম তাঁর মাকে হত্যা করেছিলেন। এই গল্পে ধনিয়া হত্যা হয়নি ঠিকই কিন্তু হত হয়েছে মাতৃত্ব, পাশাপাশি মাতৃহত্যা ধরা দিয়েছে ব্যঞ্জনায়। অন্যদিকে পরশুরাম তার কুঠারের দ্বারা ক্ষত্রিয় নিধন যজ্ঞে মেতে উঠেছিলেন, এই প্রতীকটি তখনই সার্থক হয় ধনিয়া চরিত্রের Climax-এ গিয়ে। বাধ্য হয়ে ধনিয়া যখন রূপজীবিনীদের লাইনে দাঁড়ায়— এখানেই যেন পরশুরামের উদ্যত কুঠারের ইঙ্গিত নিয়ে আসেন কথাকার। ধনিয়া চরিত্রকে স্বচ্ছ আয়না করে গল্পকার সুবোধ ঘোষ যেন তৎকালীন সময়ের ভদ্র, স্বার্থান্ধ সমাজের উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্ত মানুষের নীতিহীনতা ও অবক্ষয়কে ব্যঙ্গ করলেন। তিনি যেন আরও বলতে চাইলেন পরশুরাম মাতৃহন্তারক— একথা সত্য, তবে এখানকার পরশুরামরা ভিন্ন রূপে, ভিন্ন ভাবে প্রতিনিয়ত তাদের মাকে হত্যা করে চলেছে।

বারবধূ : রক্ষিতার নীড়ের স্বপ্ন ও কঠিন বাস্তব

সুবোধ ঘোষের 'বারবধূ' মূলত মনস্তাত্ত্বিক গল্প। কাহিনিতে অনেক চরিত্র সমাবেশ ঘটলে ও নায়ক-নায়িকার মনস্তত্ত্ব ধরেই গল্পের অগ্রগতি হয়েছে এবং পরিণতিতে তা দেখা গেছে ব্যঞ্জনাময়। গল্পটি উল্লেখযোগ্য হয়ে উঠেছে প্রসাদ রায় ও লতার জটিল মনস্তাত্ত্বিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায়। গল্পটিতে গল্পকার নারীর মূলত দুটি রূপ তুলে ধরেছেন—

ক. স্বার্থসর্বস্ব পুরুষের অসংযমিত কামনার জালে জড়িত নারীরূপ

খ. বারবধূর জীবন থেকে গৃহবধূর জীবনে রূপান্তরে নারীর মানস পরিবর্তন।

প্রসাদ রায় ও লতা— দুটি চরিত্রের বৈপরীত্য ও দ্বান্দ্বিক সহাবস্থান গল্পটির পরিণতিকে করে তুলেছে চমকপ্রদ। গল্পটিতে দেখা যায়, লতা প্রসাদ রায়ের রক্ষিতা। রক্ষিতা হিসেবে প্রসাদের সঙ্গে মধুর নীড় রচনা করতে এসে লতা পেল নতুন জীবনের স্বাদ এবং সেই নতুন জীবন তাকে স্বপ্ন দেখতে বাধ্য করল।

গল্পের প্রারম্ভেই দেখা যায়, প্রসাদ রায় তার রক্ষিতা তারকেশ্বরের পঞ্চীবিবিকে নিয়ে বরাকর কলোনিতে এক মাসের চুক্তিতে এসেছে। বাইরের অতিথিদের কাছে প্রসাদের সম্মান বাঁচাতে পঞ্চীবিবিকে লতা সেজে অভিনয় করতে হবে বা হয়েছে, যা লতার কাছে কেবল আপত্তির নয়, বিরক্তিরও বটে। তাই তাকে প্রসাদের উদ্দেশ্যে বলতে শোনা যায় এইরূপ :

অ. নাঃ আর পারি না। কি দায় পড়েছে আমার? এই নিয়ে তিনবার বাইরের লোকের কাছে আমায় ঢঙ করতে হলো । (সুবোধ ঘোষের শ্রেষ্ঠগল্প, পৃ ১৪৩)

আ. ডুডু খাবে খোকা? বুকের পাটা নেই, মেয়ে মানুষ রাখতে সখ কেন? শ্যাম রাখি কুল রাখি দুইই একসঙ্গে হয় না। (ঐ, পৃ ১৪৩)

কাহিনির অগ্রগতিতে দেখা যায়, পঞ্চীবিবি প্রসাদের কথায় 'লতা' সেজে তার স্ত্রী-এর ভূমিকায় অভিনয় করতে শুরু করে অতিথিদের সামনে। অভিনয় করতে করতে একসময় তার মনে গৃহবধূর সংস্কার বদ্ধমূল হতে দেখা যায়। সিগারেট খাওয়ার নেশা তাকে আর আকর্ষণ করে না— ব্যভিচারিণী হয়েও সে ব্যভিচারকে আর তেমন আমল দেয় না— স্বপ্ন দেখে সংসার গড়ার কিন্তু বিধি বাম। প্রসাদ গৃহস্থ ঘরের বিধবা যুবতীর প্রেমে পড়ে আর লতাকে অগ্রাহ্য করতে শুরু করে। লতার সংস্পর্শ তার আর ভালো লাগে না— লতাকে তাড়াতে উদ্যত হয় প্রসাদ। কিন্তু ততদিনে লতা প্রসাদের প্রতি অতিমাত্রায় দুর্বল হয়ে পড়েছে। তার সেই দুর্বল মন প্রসাদকে প্রশ্ন করে বসে—

১. কই, তুমি তো আজকাল কাছে ডাক না।

(সুবোধ ঘোষের শ্রেষ্ঠগল্প, পৃ ১৫১)

২. সত্যি বলছো, আমায় যেতে হবে? (ঐ, পৃ ১৫২)

অপরদিকে প্রসাদ বদলে গেছে। তাই লতাকে সে বলেই ফেলে, 'তুমি আভার চাকরাণী হবারও যোগ্য নও।' ঘর বাঁধার যে স্বপ্ন লতা দেখতে বসেছিল, কঠিন বাস্তবে তা ভেঙে পুরোপুরি নস্যাৎ হয়ে যায়। গল্পের শেষলগ্নে দেখা যায়, প্রসাদ ভাবল কটা টাকা বেশি দিলেই হয়তো লতা খুশি হবে। কিন্তু লতা ততক্ষণে প্রসাদের মতো ভদ্রসমাজের মুখে থুতু ছিটিয়ে দেবে বলে সংকল্প নিলেও শেষপর্যন্ত সে তা পারেনি। গল্পের একেবারে শেষলগ্নে প্রসাদ নানারকম চিন্তা করে লতার হাতে টাকার বাণ্ডিল তুলে দিয়ে বলে—

"—এই নাও। আমার ওপর মনে মনে রাগ পুষে রাখলে না তো লতা? আমি তো তোমাকে কখনো ঠকাইনি— ক্ষতি করিনি।"[৯]

লতা এই কথার পরিপ্রেক্ষিতে প্রসাদকে উত্তর দেয়—

> *"— না, তুমি ক্ষতি করবে কেন, আভা ঠাকুরঝি আমার সর্বনাশটা করলে।"[১০]*

লতার এই মনস্তাত্ত্বিক পরিবর্তন আসলে সুবোধ ঘোষের কলমের মোচড়, যা পাঠককে চমকে দেয়। স্ত্রীর ভূমিকায় অভিনয় করতে করতে আসলে লতা নিজেকে প্রসাদের স্ত্রী হিসেবেই ভেবে নিয়েছিল নিজের মনে মনে।

সদর্থে লতা চরিত্রের আলোয় গল্পকার প্রকৃতার্থে লতার মতো বারবণিতারা নিজের শ্রেণি থেকে বেরিয়ে আসতে চায়— সংসার গড়তে চায়, সেটি প্রকাশ করতে চাইলেন। কিন্তু কঠিন বাস্তব দুমড়ে মুচড়ে সেই স্বপ্ন রাস্তায় ছুঁড়ে ফেলে দেয়। তাদের নিয়ে পুরুষ-তান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার কোন পুরুষ-ই ঘর বাঁধতে পারে না কিন্তু অনেক স্বার্থান্ধ পুরুষের কামনা চরিতার্থ করতে এই বারবণিতারা নিজেদের সঁপে দেয়। লতা চরিত্রের মধ্য দিয়ে গল্পকার সেই বারবণিতাদের মনস্তাত্ত্বিক জটিল অসহায়ত্বকে তুলে ধরলেন তাঁর 'বারবধূ' গল্পটিতে।

সুন্দরম : মানুষ ও সৌন্দর্য

'সুন্দরম' গল্পটিতে আপাত সাধারণ সমস্যাকে কেন্দ্রীয় ভাবনায় রেখে গল্পকার কাহিনিকে ত্বরান্বিত করেছেন। সে সমস্যাটি হল সুকুমারের বিয়ে। যদিও 'সমস্যা' বলতে এই— তবু গল্পপাঠে সমস্যাটি বড়ো হয়ে দেখা দেয় না— সমস্যাটিকে কেন্দ্র করে সুন্দরের নতুন ভাবনাটি বড়ো হয়ে ওঠে। সুন্দরকে সকলে চায়— নিজের চোখে দেখতে— নিজের করে পেতে। সুকুমারও এই পথের পথিক। সে আর পাঁচজনের মতো স্বভাবজাত 'সৌন্দর্য বিলাসী' অন্যদিকে সুকুমারের বাবা কৈলাস ডাক্তার প্রতিষ্ঠিত ও প্রচলিত সৌন্দর্যবাদকে খণ্ডন করে অনুসন্ধান করেছেন দেহের 'অন্তরঙ্গ সৌন্দর্যের'।

এই গল্পটির কেন্দ্রীয় চরিত্র কে, তা নিয়ে দ্বিমত আছে। কাহিনি বর্ণন বা কাহিনির অগ্রগতিকে প্রাধান্য দিলে গল্পটির কেন্দ্রীয় চরিত্র সুকুমার। কিন্তু গল্পকার গল্পটিতে যে গভীর অর্থ নির্দেশ করতে চেয়েছেন, সেই দৃষ্টিকোণ থেকে সুকুমারকে অনেকে কেন্দ্রীয় চরিত্র মনে করতে নারাজ, তাদের মতে সুকুমারের বাবা কৈলাস ডাক্তার-ই এই গল্পটির প্রকৃত নায়ক। আপাতভাবে যে চরিত্রটিতে আমাদের দৃষ্টিনিক্ষেপ করতে হবে, সেটি হল সুকুমার। গল্পটিতে যেভাবে সুকুমার চরিত্রটি উপস্থাপিত হয়েছে, তাতে স্পষ্টত তার চরিত্রের ত্রিবিধ স্তর প্রত্যক্ষ হয়।

প্রথম স্তর : *সুকুমার দেখায় দেহ-মনে সে এক বিবাগী পুরুষ। জপ-ধ্যানে আবিষ্ট এক পুরুষ। স্বাভাবিক জীবনে সে বিয়ে করতে চায় না। কোনরকম মেয়েকে তার বিবাহের উপযোগী মনে হয় না। সংসারে তার মতি আনার জন্য উপন্যাস পাঠের মধ্য দিয়ে রিপুসেবার বর্ণনা পড়তে বাধ্য করেন কানাইবাবু।*

দ্বিতীয় স্তর : এই স্তরে দেখা যায়, চরিত্রটিতে অনেক বিবর্তন ঘটে গেছে। সে কানাইবাবুকে বলে, 'মানুষের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই'। তারপর একে একে বনলতা, দেবপ্রিয়া, অনুপমা বা মমতা অনেক বিয়ের পাত্রীকে দেখতে থাকে, কিন্তু কোন পাত্রী মনে ধরে না। সব শেষে বড় বাধা 'সুন্দরী' মেয়ে তার চাই-ই চাই।

তৃতীয় স্তর : সুন্দরী না হলে চলবেই না। কিন্তু কামনাসক্ত মন ভিখারী তুলসীর শরীরকে ভোগ করতেও ছাড়ে না। ধরা পড়ে যায় সুকুমারের দ্বিচারিতা ও নীতিভ্রষ্টতা।

সুকুমার চরিত্রটি গল্পকার যেভাবে আঁকলেন, কৈলাস ডাক্তারের চরিত্রটি আঁকলেন ভিন্ন মতাদর্শে। ডাক্তারবাবু এক নতুন সৌন্দর্য চেতনার প্রতিষ্ঠা করতে চান। প্রশ্ন ওঠে, কী এই সৌন্দর্যচেতনা? সুকুমার যখন বিয়ের জন্য একের পর এক পাত্রী দেখছেন, আর নাকচ করছেন— বিরক্ত হলেন বাবা। তিনি কানাইবাবুকে জিজ্ঞাসা করলেন—

"... তোমাদের সুন্দরের তো মাথামুণ্ডু কিছুই নেই।

—কি রকম?

—কি রকম আবার? চুল কালো হলে সুন্দর আর চামড়া কালো হলে কুৎসিত।..."

(সুবোধ ঘোষের শ্রেষ্ঠগল্প, পৃ ৪৪)

কৈলাস ডাক্তারের মধ্য দিয়ে আসলে গল্পকার স্বয়ং এক শ্রেণির মানুষের কাছে এই প্রশ্ন রাখলেন। এই গল্পের নায়ক যদি কেউ হন, তিনি অবশ্যই কৈলাস ডাক্তার। তাঁরই জ্ঞানপ্রদীপের আলোয় উদ্ভাসিত হয়েছে কি সুন্দর বা যথার্থ অর্থে কোনটা সুন্দর। কৈলাস বাবুর চরিত্রকে যথার্থ অর্থে বুঝতে গেলে তার দুটি উদ্ধৃতি উল্লেখের প্রয়োজন। তিনি বলছেন—

ক. আজ পঁচিশ বছর ধরে যে ঝানু সার্জন ময়না ঘরে মানুষের বুক চিরে দেখে এসেছে, তাকে আর বোঝাতে হবে না— কা'কে সোনার দেহ বলে। মানুষের অন্তরঙ্গ রূপ— এর পরিচয় কৈলাস ডাক্তারের মত আর কে জানে। কিন্তু তাঁর এই ভিন্ জগতের সুন্দরম্; তাকে কদর দেবার মত দ্বিতীয় মানুষ কই? দুঃখ এইটুকু।[১১]

খ. দুটো লাসের ছাল ছাড়িয়ে দিচ্ছি। চিনে বলুক দেখি, কে ওদের আলপাইন, নেগ্রিটো আর প্রোটো-অস্ট্রেলয়েড। দেখি ওদের বংশবিদ্যের মুরোদ।[১২]

'সুন্দরম' গল্পে বাবা ও ছেলের দুই বিপরীত মানসিকতা বা দৃষ্টিভঙ্গির মধ্য দিয়ে গল্পকার আসলে মধ্যবিত্ত মানসিকতার গালে একটি প্রবল চপেটাঘাত করেছেন। মধ্যবিত্তের ইতরতা-লোভ-লোলুপতার কদর্য রূপ প্রকাশ পেয়েছে সুকুমারের

সৌন্দর্যচর্চার বিলাসিতা ও ভিখারি যুবতী তুলসীকে গর্ভবতী করে হত্যা করার মধ্য দিয়ে। কিন্তু সুকুমারের বাবার সৌন্দর্যবোধ ভিন্ন; ভিন্ন তার মানসিকতা। আপাত সৌন্দর্য বিলাসী সুকুমার কিন্তু প্রকৃতার্থে সুন্দরের পূজারি নয়; বরং তার মনে আছে কদর্যতা, পাঁক। এ প্রসঙ্গে সমালোচক ড. তরুণ মুখোপাধ্যায়ের মন্তব্য ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে, তিনি বলেছেন—

> "সুকুমার আদৌ সুন্দরের দ্রষ্টা বা উপাসক নয়। তার জীবনচর্যার মধ্যে আছে ভ্রান্ত নিয়মের শৃঙ্খল। সেই নাগপাশ যত কঠিন হয়েছে, তার ভিতরের অসুন্দর তত ব্যাকুল হয়েছে। সুন্দরের ধ্যানের মুখচ্ছদে আসলে সে অসুন্দর-প্রবৃত্তিকেই লালন করেছিল। তার ব্রহ্মচর্য পালন, নাটক-নভেল না পড়া, উত্তেজক ছবি না দেখা, না শোনা ইত্যাদি মনে হতে পারে আধুনিক ব্রহ্মচারীর এক পরিচ্ছন্ন জীবনযাত্রা। আদতে তা সত্য নয়।"[১৩]

গোত্রান্তর : গোত্র, গোত্রহীন ও ভিন্নগোত্রীয়

'গোত্রান্তর' ছোটোগল্পটির কাহিনি মূল চরিত্র সঞ্জয়কে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়েছে। চরিত্রটির মধ্যে চড়াই-উতরাই দু'টিই ধরা পড়ে। গল্পের শুরুতেই দেখা যায় তার মধ্যে আছে বেকারত্বের যন্ত্রণা— আছে প্রেম ভঙ্গের যন্ত্রণা— আছে মায়ের তিরস্কার। চারবছর ধরে একের পর এক সে চাকরির দরখাস্ত করে গেছে কিন্তু কোন চাকরি তার জোটেনি। বড়দা কেবলমাত্র হতাশ হয়ে পড়েছে এমন নয়; সময় মতো মুখের উপর বলে দিয়েছে 'যে যার পথ দেখ'। সময়ে অসময়ে মায়ের গঞ্জনাবাক্যও শুনতে হচ্ছে সঞ্জয়কে। যদিও সুমিত্রাকে ভালোবেসেছে কিন্তু সে প্রণয় পরিণয়ে সম্পন্ন হয়ে ওঠেনি। অন্যদিকে সুমিত্রার বিয়ে ঠিক হয়ে গেলে সঞ্জয়ের বৌদিও তাকে তিরস্কার করতে ছাড়েনি। সঞ্জয় এ হেন পরিস্থিতিতে বুঝেছে তার গোত্রান্তর প্রয়োজন, সে বুঝেছে জীবনের সাফল্য যেখানে নেই, নিকটাত্মীয়রাও তার আপন নয়। সঞ্জয় স্বগতোক্তির সুরে বলে ওঠে—

> "ওপর থেকে দেখতে কী সুন্দর। মা বাপ ভাই বোন, আপনজন, আত্মীয়তার নীড়। কত গালভরা প্রবচন। একটু আঁচড় দিলেই চামড়া ভেদ করে দেখা দেয় নির্লজ্জ মহাজনের মাংস।"[১৪]

একা বড়দার গোনাগুনতি মাসোহারায় না থেকে সঞ্জয় রতনলাল সুগার মিলে ত্রিশ টাকা মাইনের চাকরিতে যোগদান করার সিদ্ধান্ত নিয়েই নেয়।

গল্পটিতে দেখা যায়, রতনগঞ্জে গিয়ে সঞ্জয় রায়বাহাদুরের বিশ্বাস অর্জন করে। নেমিয়ারের সঙ্গে পরিচয় ঘটে সঞ্জয়ের। নেমিয়ার নিজের বোন রুক্মিনীকে লেলিয়ে দেয় সঞ্জয়ের দিকে। প্রেম ভঙ্গের যন্ত্রণাকে দূরে সরিয়ে রাখতে গিয়ে নেমিয়ারের ফাঁদে পা দিয়ে বসে সঞ্জয়। গল্পকারের বর্ণনায় ধরা পড়ে—

> "পাখি শুধু তার ডাকার আবেগে যেমন করে সঙ্গিনী লাভ করে, রুক্মিনী তেমনিভাবে এসেছে তার কাছে। তার লাঞ্ছিত পৌরুষকে এই পথের মেয়েটাই সসম্মানে লুফে নিয়েছে। জ'লো দাম্পত্যের চেয়ে এ ঢের ভাল।"[১৫]

দুর্বলতা বলি দুর্বলতা, ভুল বলি ভুল; নেমিয়ার সঞ্জয়ের এই দুর্বলতা বা ভুলকেই নিজের অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করল। নেমিয়ারের ছদ্মবেশ বুঝতে পেরেও সঞ্জয় নিজেকে সামলে নিতে পারল না। আর এই অবস্থাটাকেই কাজে লাগালো নেমিয়ার। সে সঞ্জয়ের মুখোমুখি হল এবার। লেখকের বর্ণনায় উঠে আসে—

'তুমি রুক্মিনীকে ভালবাস?'

প্রশ্নের আঘাতে সঞ্জয় চমকে উঠতেই নেমিয়ার বললো—

'সে তো সুখের কথা। লজ্জা পাবার কি আছে? আচ্ছা, আমি চলি এবার। দাও।'

সঞ্জয় বলে ওঠে, কি? প্রত্যুত্তরে আবার নেমিয়ার বলে ওঠে—

'—সেই যে পাঁচ টাকা চেয়েছিলাম।'

নিজের দুর্বলতার জন্য কেবলমাত্র নেমিয়ারের কাছেই মূল্য চোকাতে হয়েছে, এমনটি নয়। মন ভরা উল্লাসে অপর একদিন রুক্মিনীর ঘরে ঢুকল সঞ্জয়। তার আদরের বাড়াবাড়ি দেখে রুক্মিনী প্রশ্ন করে বসল—

> "বড় সস্তায় সওদা পেয়েছ না? তবুও একদিন তো ছেড়েই দেবে।"[১৬]

না, এ প্রশ্ন সঞ্জয়ের ভালো লাগেনি। তবুও নিজ ব্যক্তিত্বকে বাঁচিয়েই সে জবাব দিয়েছে, 'সস্তা? আমার কি দেবার বাকি আছে? আর ছেড়েই বা দেব কেন?' এত কথার পরেও শেষপর্যন্ত যখন সে জানতে পারে রুক্মিনীর গর্ভে তার সন্তান তখন সঞ্জয় গম্ভীর হয়ে যায়।

সঞ্জয় ও রুক্মিনীর পারস্পরিক কাছে আসা থেকে তার মধ্যে অপরাধ বোধের জন্ম দেয়। আবার সময়ের সঙ্গে সঙ্গে একদিকে যেমন সেটি নির্লিপ্ত হয়ে যায়, পাশাপাশি তার মধ্যে জন্ম নেয় এক প্রতিবাদী ঘৃণা। সঞ্জয়ের চরিত্রে দ্বিচারিতা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। একদিকে সে কৃষকদের চরম দুর্দশায় ফসল না দেওয়ার কথা বলে, আবার অন্যদিকে রায় বাহাদুরকে জানায়, 'যদি বলেন তো কিষাণদের আমি শান্ত করি।' শেষপর্যন্ত দেখা যায়, সঞ্জয় বিশ্বাসঘাতকতার দিকে এগিয়ে যায়। প্রতারক সঞ্জয় পারে না সংগ্রামী নেতা হতে— পারে না নিজের সন্তানের দায়িত্ব নিতে। প্রশ্ন ওঠে, তাহলে সে কী পারে? সে পারে ক্ষমতার কাছে নিজেকে সমর্পণ করতে। সে পারে মিথ্যা কথা বলে অন্যকে ফাঁসাতে। সে পারে রায়বাহাদুরের কাছে বখশিসের আশ্বাস পেয়ে বিশ্বাসঘাতক হয়ে বাঁচতে— সে পারে পালিয়ে যেতে।

'গোত্রান্তর' গল্পটির আদ্যন্ত পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায়, এই গল্পটির কেন্দ্রীয় চরিত্র সঞ্জয়ের বারংবার গোত্রান্তর ঘটেছে। তার গোত্রান্তরের পর্যায়কে যদি ধরা হয়, তাহলে দাঁড়ায় এইরূপ—

ক.	পারিবারিক বন্ধন থেকে নিষ্কৃতি—	প্রথম গোত্রান্তর।
খ.	নিজ চরিত্রের নৈতিক স্খলন—	দ্বিতীয় গোত্রান্তর।
গ.	মধ্যবিত্ত মানসিকতা, বিদ্রোহী মানসিকতা থেকে বিশ্বাসঘাতকতা ও পলায়নী মনোবৃত্তি—	তৃতীয় গোত্রান্তর।

গল্পটিতে সঞ্জয় ও নেমিয়ার এই বিপরীতমুখী দুটি চরিত্র নির্মাণের মধ্য দিয়ে ছোটোগল্পকার সুবোধ ঘোষ গল্পটির কেন্দ্রীয় ভাবনার নির্মাণ করেছেন। নেমিয়ার চরিত্রের জন্য সঞ্জয়ের গোত্রান্তর সহজেই চোখে পড়ে। কিন্তু গল্পটির গভীর বিশ্লেষণে দেখা যায় নেমিয়ার চরিত্রেরও গোত্রান্তর পরিলক্ষিত হয়। যে নেমিয়ার অর্থের জন্য নিজের বোনকে পরপুরুষের দিকে এগিয়ে দেয়— দারিদ্র্য তার স্ত্রী-সন্তানকে আত্মহননের পথে ঠেলে দিয়েছে; সেই নেমিয়ার শেষপর্যন্ত তার সত্তাকে পালটে দিয়ে কৃষকদের লড়াইয়ে এক অসামান্য সদর্থক ভূমিকা নেয়। আর সে অর্থে এটিকে 'নেমিয়ারের গোত্রান্তর' বলা যেতেই পারে।

।। তিন।।

সুবোধ ঘোষের বিভিন্ন ছোটোগল্পে যেভাবে চরিত্রগুলি উপস্থাপিত, সে প্রকাশভঙ্গি অভিনব। 'গরল অমিয় ভেল' বা 'বারবধূ' গল্প দুটি বিশুদ্ধ মনস্তাত্ত্বিক গল্প— এ বিষয়ে দ্বিমত নেই। নারীর একটি স্বভাবধর্ম, যৌবনাগমে পুরুষের প্রার্থিতা হয়ে সে ধন্য হতে চায়। 'গরল অমিয় ভেল' গল্পটির কেন্দ্রীয় চরিত্র মালা বিশ্বাসও পুরুষ পূজারির দৃষ্টি আকর্ষণের কত চেষ্টাই না করেছে, তা সমগ্র গল্প জুড়ে চোখে পড়ে। গল্পে দেখা যায়, মালা বিশ্বাসের যৌবন কিন্তু বৃথা গেল এবং কোন পুরুষের মন জয় করা তার দ্বারা সম্ভব হয়নি। ভালোবাসা পাওয়ার এই দুর্নিবার চেষ্টা এবং তদসঞ্জাত যে মানসিকতা তা খুব details-এ তুলে ধরেছেন গল্পকার তাঁর এই গল্পটিতে। অন্যদিকে 'বারবধূ' গল্পেও মনস্তত্ত্বের টানাপোড়েন দেখে বিস্মিত হতে হয়। বারবধূর জীবনে গৃহবধূর অভিনয় কীভাবে একটি সত্য আকাঙ্ক্ষার জন্ম দেয় ও তাকে আপাদমস্তক আলোড়িত করতে পারে, তার পরিচয় পাই এই গল্পটিতে।

গল্পকার সুবোধ ঘোষ আত্মপ্রতারক মধ্যবিত্তের দ্বিধাদীর্ণ মানসিকতার তীক্ষ্ণ সমালোচনা করেছেন তাঁর বহু গল্পে। সে অর্থে বলাই যায়, মধ্যবিত্ত মানস-বিশ্লেষণে অনেকটা কৃতিত্ব তাঁরও। মধ্যবিত্তের ভীরুতা ও পলায়নী মনোবৃত্তিকে গল্পের বিষয় করে তিনি রচনা করেছেন 'গোত্রান্তর' ছোটোগল্পটি। গল্পটিতে কেন্দ্রীয় চরিত্র সঞ্জয়ের মানসিক টানাপোড়েন-ই বোঝা যায়, গল্পকার কীভাবে মধ্যবিত্তের দ্বিধাদীর্ণ মানসিকতাকে তুলে ধরতে চেয়েছেন পাঠকবর্গের সম্মুখে।

কথাকার তাঁর 'পরশুরামের কুঠার' ও 'সুন্দরম' গল্পদুটিতে উচ্চবিত্ত বিলাসিতা ও ভাবভঙ্গির প্রতি তীব্র ব্যঙ্গ ফুটিয়ে তুলেছেন। গল্পদুটিতে সভ্যতা ও সংস্কৃতির গর্বে গর্বিত উচ্চবিত্ত সমাজ ও মানুষের বিভিন্ন বিলাসিতার প্রতি তীব্র কটাক্ষ করেছেন। 'পরশুরামের কুঠার' গল্পটিতে সমাজের অনুশাসন কুঠারে হত্যা করে ধনিয়াকে সভ্য সমাজে স্থানচ্যুত করে মার্কামারা বারবণিতার দলে ঠেলে দেওয়া হয়েছে। এই নিয়েই চরিত্রটির মধ্যে যে মনস্তাত্ত্বিক টানাপোড়েন, তারই বিশদ বিবরণ উঠে এসেছে এই গল্পটিতে। আর 'সুন্দরম' গল্পে সুকুমারের বিয়ের পাত্রী নির্বাচনকে কেন্দ্র করে উচ্চবিত্ত মানসিকতার সৌন্দর্যবিলাসের দ্বিবিধ রূপ পরিলক্ষিত হয়। গল্পটির শেষ হয়, 'শালা বুড়ো নাতির মুখ দেখছে'— এই বাক্যটি দিয়ে আর তখনই পাঠক বুঝতে সক্ষম হয় তীব্র ব্যঙ্গে উচ্চবিত্ত মানসিকতা তার সমস্ত চালচিত্র নিয়ে ভেঙে পড়েছে।

সদর্থে সুবোধ ঘোষের গল্পগুলির মধ্যে নানা বৈচিত্র্য আছে— চরিত্রগুলিতে কাহিনি অবলম্বনে নানা Shade আছে— আছে চারিত্রিক মনস্তত্ত্বের নানাবিধ পর্যায়। চরিত্রগুলি সকলেই অন্তর বাহিরে সংবৃত্ত। গভীর পর্যবেক্ষণে চেতনার অন্তঃপ্রবাহকেও ধরতে পারে পাঠকবর্গ। কেবলমাত্র বিষয়বস্তু নয়, এই চরিত্রগুলির বহুমাত্রিক বা বহুকৌণিক দৃষ্টিভঙ্গি সুবোধ ঘোষের গল্পের ভুবনকে করেছে যথাযথ। মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ কেবলমাত্র তাঁর সাহিত্যকে নয়, সমৃদ্ধ করেছে বাংলা ছোটোগল্প বিশ্বকেও। এই কথারই সমর্থন মেলে সমালোচক সুদীপকুমার চক্রবর্তীর বর্ণনায়। তিনি বলেন—

> *"...মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ সুবোধ ঘোষের ছোটোগল্পগুলিতে যেভাবে শিল্পরূপান্বিত হয়েছে তা অবিস্মরণীয়।"*[৭]

তথ্যসূত্র :

১. *অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় :* 'কালের পুত্তলিকা বাংলা ছোটগল্পের একশ'বিশ বছর/১৮৯১-২০১০', *পুনর্মুদ্রণ : অক্টোবর ২০১৬, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পৃ ৩৫৮*
২. *ড. সাবিত্রি নন্দ চক্রবর্তী,* সুবোধ ঘোষের গল্পের ভুবন', *'ছোটোগল্পের চিহ্নিত মানচিত্র সুবোধ ঘোষ', ড. আদিত্যকুমার লালা (সম্পা), প্রথম প্রকাশ, ২০১১, একুশ শতক, কলকাতা, পৃ ৯*
৩. *অধ্যাপক জগদীশ ভট্টাচার্য (সম্পা),* 'সুবোধ ঘোষের শ্রেষ্ঠগল্প', *প্রথম প্রকাশ ভবন সংস্করণ, একাদশ মুদ্রণ, ভাদ্র ১৪২১, কলকাতা, পৃ ৯২*
৪. *তদেব।*
৫. *তদেব, পৃ ৯৪*
৬. *আশিস চক্রবর্তী, 'গরল অমিয় ভেল : প্রসঙ্গ',* 'গল্পচর্চা', *উজ্জ্বলকুমার মজুমদার (সম্পা), তৃতীয় সংস্করণ, ২০১৮, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, পৃ ৭৩৩*

৭. *'কালের পুত্তলিকা বাংলা ছোটগল্পের একশ' বিশ বছর/১৮৯১-২০১০', প্রাগুক্ত গ্রন্থ, পৃ ৩৭১*
৮. *সোহারাব হোসেন,* 'বাংলা ছোটগল্প তত্ত্ব ও গতিপ্রকৃতি' (১ম খণ্ড), *দ্বিতীয় সংস্করণ : সেপ্টেম্বর ২০১২, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, পৃ ১৯৬*
৯. *'সুবোধ ঘোষের শ্রেষ্ঠগল্প', প্রাগুক্ত গ্রন্থ, পৃ ১৫৪*
১০. *তদেব।*
১১. *তদেব, পৃ ৪১*
১২. *তদেব, পৃ ৪৪*
১৩. *তরুণ মুখোপাধ্যায়, 'সুন্দরম্ : সুন্দরের বিনির্মাণ', 'গল্পচর্চা', প্রাগুক্ত গ্রন্থ, পৃ ৭২৬*
১৪. *'সুবোধ ঘোষের শ্রেষ্ঠগল্প', প্রাগুক্ত গ্রন্থ, পৃ ৫১*
১৫. *তদেব, পৃ ৫৪*
১৬. *তদেব, পৃ ৫৭*
১৭. *ড. সুদীপকুমার চক্রবর্তী, 'ছোটগল্পের সুবোধ ঘোষ', প্রকাশ ভবন, কলকাতা, পৃ ৮১*

শ্রমিক কবির দর্শনে শ্রম ও সময়ের দলিল : কেষ্ট চট্টোপাধ্যায়

স্বপন প্রামাণিক
গবেষক, বিনোদ বিহারী মাহাতো কয়লাঞ্চল বিশ্ববিদ্যালয়,
ধানবাদ

সারসংক্ষেপ(Abstract) : বাংলা কাব্যসাহিত্যে একমাত্র শ্রমিক কবি কেষ্ট চট্টোপাধ্যায়। শুধু তাই নয় তিনি শ্রমিক সংগঠকও। দীর্ঘদিন দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানায় কাজ করার সূত্রে প্রত্যক্ষ করেছেন শ্রমিক শ্রেণীর আদ্যপ্রান্ত জীবন সংগ্রাম। বন্ধুকের সামনে দাঁড়িয়ে ঠিকা শ্রমিকদের স্থায়ী করণের দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজটি সমাপ্ত করেছেন। সত্তরের দশকে দুর্গাপুরে ঐতিহাসিক অগাস্ট আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছেন। চোখের সামনে নিহত হতে দেখেছেন জব্বরকে। জীবনে পঁচিশবার রক্ত দিয়েছেন। ১৯৬৪-৬৭ সাল পর্যন্ত তিনি পার্টির কালচারাল বিভাগের কনভেনার পদে আসীন ছিলেন। পরে ট্রেড ইউনিয়নের কাউন্সিল মেম্বার হন। দ্বায়িত্ব পালন করেছে 'গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী সংঘ'-এর। শ্রম ও শ্রমিকের মিশ্রিত সহাবস্থান তাঁর মধ্যে। বিস্ময় চরিত্র। দৈনিক আট ঘন্টার কায়িক পরিশ্রমের পরেও তাঁর মন ছটপট করতো সীমাবদ্ধ জগৎ ও জীবনকে অনুভূতির রঙে রাঙিয়ে তুলতে। মিতভাষী এই মানুষটির অন্তর কাঁদত শ্রমিক শ্রেণীর জন্য। সারস্বত সাধনা প্রছন্ন থাকে না। সুযোগ পেলেই তাঁর একান্ত ব্যক্তিক অনুভূতি ভোরের সূর্যমুখী হয়ে প্রকাশ পেতো যন্ত্রাংশের নাম লেখা চিরকুটের অপর পৃষ্ঠায়। সমস্ত বাধা অতিক্রম করে ১৯৭২ সালে ছাপার অক্ষরে প্রকাশিত হয় তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'শরিক না হলে'। একে একে প্রকাশ পেলো ২৪ টি কাব্যগ্রন্থ। তথাকথিত ভুরি ভুরি ডিগ্রি তাঁর নেই, স্কুলের গন্ডি পার করেননি। স্টিল কারখানার একজন সাধারণ কর্মীর হাতে বিপুল কাব্যসাধনা সত্যিই বিস্ময়ের নয় কি! রক্তে-মাংসে গড়া শ্রমিকের লেখনীতে শ্রমগাঁথা ও জীবনের দিনলিপি স্বর্ণাক্ষরে মুদ্রিত হয়েছে। পাশাপাশি বিংশ শতকের দ্বিতীয় দশকের রাজনৈতিক-সামাজিক চালচিত্রও বেশ পরিষ্কার। আলোচ্য প্রবন্ধে কবির দর্শনে শ্রমিকের জীবন ও সময়কে তুলে ধরতে চেয়েছি।

সূচক/ মূল শব্দ (Key Word) : শ্রম, শ্রমিক, আন্দোলন, সময়, ব্যক্তিক অনুভূতি, সংগঠক, সারস্বত সাধনা, দিনলিপি, শ্রেণী, অর্থনীতি, সমাজব্যবস্থা, মার্কসবাদী দর্শন, অধ্যবসায়, উদ্বাস্তু আন্দোলন, সৃষ্টিসত্বা, প্রতিকূলতা, অস্থায়ী কর্মী, মানবতার জয়োধ্বনি, শরিক, সুবিধাবাদ, আশার জগৎ,পদোন্নতি, পদযাত্রা, স্বেচ্ছাবসর, বিশ্বমনন, পদাতিক, স্থিতধী, সাবধান বাণী।

মূল আলোচনা(Discussion) : কর্ম ও ঘর্মের মধ্যেই অন্তর্নিহিত শ্রম ও শ্রমিকের ভাবনা। সমাজ ও সভ্যতার বিকাশের ঊষালগ্নে শ্রম ভাবনার পরিবর্তন সাধিত হয়। একদল কেবল উৎপাদন সামগ্রীর কাঁচামাল করায়ত্ত করে আরাম কেদারায় বসে সেগুলি

উৎপাদনে কাজে লাগাতে চায়। আর একদল কায়িক পরিশ্রমের মাধ্যমে উৎপাদন সামগ্রী প্রস্তুত করে বাজারে বিক্রয়ের স্বার্থে। সমাজে শ্রেণীর সৃষ্টি হয়। এই উৎপাদন ব্যবস্থায় যারা শ্রমদান করেন এবং শ্রমের সুফল ভোগ থেকে বঞ্চিত, এককথায় তাদের বলে 'শ্রমিক'। এব্যাপারে কার্ল মার্কসের কথা না বললেই নয়। তাঁর অর্থনীতি শ্রমিকের অর্থনীতি। মার্কসের মতে আধুনিক সমাজব্যবস্থায় শ্রমিকের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তিনি শ্রমিককে ভবিষ্যতের ভরসা দিয়েছেন। অন্যদিকে এই শ্রমজীবী শ্রেণী থেকে উঠে আসা বা শ্রমের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত ব্যক্তি যখন সারস্বত সাধনায় নিজেকে নিমগ্ন করে দেন, তাঁর সৃজনী পল্লবে লিখিত হয় শ্রমিক শ্রেণীর দিনলিপি, তখন তাকে 'শ্রমিক কবি' বলতে কোনো দ্বিধা থাকে না।

এই দুর্লভ প্রতিভা বাংলা শুধু কেন গোটা বিশ্বসাহিত্যে মেলা ভার। বুলগেরিয়ার কমউইনিস্ট ও কবি নিকোলা ভ্যাপ্সারভ (Nikola Vaptsarov)এর সঙ্গে কেষ্ট চট্টপাধ্যায়ের মিল খুঁজে পাওয়া যায়। ভ্যাপ্সারভও ছিলেন শ্রমিক। প্রথমে একটি কাগজকলে, পরে একটি ময়দাকলে, অবশেষে রেলের দপ্তরে ফায়ার ম্যানের কাজ করতেন। তাঁর পেশা ছিল শ্রমিক, আর মতাদর্শে তিনি কমিউনিস্ট। মাত্র ৩৩বছর বয়েসে তাঁকে ফ্যাসিস্ট দস্যুদেরহাতে অকাল মৃত্যুবরণ করতে হয়। বর্তমানে বাংলাদেশের পাটগ্রামের পানবাড়ির অজ পাড়াগাঁয়ের ছেলে মো. মুকুল হোসেনকে এই শ্রেণীর কবি বলা যায়। জন্ম ১৯৮৯। যিনি অভিবাসী নির্মাণ শ্রমিক। সিঙ্গাপুরে কর্মরত। তার আরো একটা পরিচয় তিনি কবি। তাঁর কয়েকটি কাব্যগ্রন্থ ও একটি উপন্যাস রয়েছে। বাংলা কাব্যসাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, নজরুল ইসলাম, সুকান্ত ভট্টাচার্য, প্রেমেন্দ্র মিত্র, মুখোপাধ্যায় প্রমুখ কবিরা শ্রমজীবী শ্রেণীর মানুষদের নিয়ে লিখেছেন ঠিকই। তবে মনে রাখতে হবে এই মহান সাহিত্যিকরা কেউই পেশায় শ্রমিক ছিলেন না। শ্রমিক শ্রেণীর প্রতি তাঁদের ছিল সহমর্মিতা। লেখায় ছিল ভাববিলাসিতা। অথচ ষাটের দশকে বাংলা সাহিত্যে এমন একজন কবিকে পেলাম, যিনি কিনা পুরোদস্তুর শ্রমিক। তিনি হলেন কবি কেষ্ট চট্টোপাধ্যায়। দুর্গাপুর স্টিল ফ্যাক্টরির একজন কর্মী। মার্কসবাদী দর্শনে তাঁর অবিচল আস্থা। ৮৭ বছর বয়সে পৌঁছেও যিনি একচুলও আদর্শ থেকে বিচ্যুত হননি। লিখেছেন ২৪ টি কাব্যগ্রন্থ। সদ্য প্রয়াত একালের একজন সবচেয়ে বলিষ্ঠ শক্তিমান কবি শঙ্খ ঘোষ তাঁর সম্পর্কে লিখলেন, "নিরাপদ বা দায়হীন কোনো দূরত্বে থেকে নয়; শ্রমজীবীতার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে কবিতা লিখেছেন কেষ্ট চট্টোপাধ্যায়, দশকের পর দশক জুড়ে। সামাজিক বা রাজনৈতিক সমস্ত রকম দলমত নির্বিশেষে তাঁর সেই প্রতিবাদ তাই হয়ে ওঠে খাঁটি মানুষের প্রতিবাদ।"[১]

কবির সর্পিল জীবন পরিক্রমার সঙ্গে জড়িয়ে আছে তাঁর কাব্যভাবনা। ১৯৩৪ সালের ২২ মে বিহারের সাসারামে তাঁর জন্ম। পিতা স্টেশান মাস্টার হওয়ার কারণে পরিবারের কোথাও স্থায়ী বসবাস হয়নি। বাল্যে বিলাসিতা কিংবা শিশুদের প্রতি আদর-যত্ন ছিলোনা বলেই কবি হয়ত একান্তে ভাববার অবসর পেতেন অগাধ। ছোটবেলা

থেকেই খেলার প্রতি ছিল ভীষণ ঝোঁক। বিশেষত ফুটবল খেলা তাঁর প্রথম জীবনের একমাত্র লক্ষ্য ছিল বলাই শ্রেয় হবে। পরবর্তীকালে বারাসাতের সুভাষ ক্লাবে যোগ দিয়ে দলকে ট্রফি এনে দেন। ছোটবেলার এই মনোযোগ ও অধ্যবসায় কবির শরীর ও মনকে শক্ত ভিতের উপর প্রতিষ্ঠিত করে। খেলার প্রতি এই গভীর নিষ্ঠা তাঁর কর্মজীবনেও প্রত্যক্ষ।

তিনি আজীবন মানুষকে ভালোবেসেছেন। মানুষের অসহায়তায় তাঁর অন্তরে বেদনার করুন আর্তির সুর হয়ে বেজে উঠত। খেলাধুলার পাশাপাশি বারাসতে থাকাকালীন বেশ কিছুদিন শিশুদের পাততাড়িতেও কাজ করেন। প্রথমটিতে বুদ্ধি-শ্রম-কৌশলের অসম্ভব মিশ্রন, দ্বিতীয়টিতে শ্রম-বুদ্ধির সহজ বন্ধনে রচনা করতেন ভাবনার দু-চার কথা। যদিও সেগুলির কোনোটাই সংরক্ষিত নেই।মাঝে মধ্যেই চলে যেতেন খিদিরপুর ডকে। সেখানে ছিলেন বড় ভগ্নিপতি কমরেড ড. নরেশ ব্যানার্জি। যিনি খিদিরপুরে কমিউনিস্ট পার্টির উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব। উদ্বাস্তু আন্দোলনে নেতৃত্বও দিয়েছিলেন। কবির দাদা জ্যোতিবিকাশ ছিলেন নরেশের শিষ্য। নরেশের প্রভাবেই যিনি ছাত্রনেতা থেকে পার্টির সর্বক্ষণের কর্মী হন। এই দুই ব্যক্তির হাত ধরেই কবির রাজনীতি জীবনের হাতেখড়ি। ১৯৪৭-১৯৫০ সালের সময়কালে তিনি যখন খিদিরপুরে যেতেন, তখন তাঁর কাজ ছিল পি.আর.সি.-এর তরফ থেকে দুধ গুলে গরিব মানুষদের মধ্যে বিতরণ করা। দেওয়া হতো মাল্টি ভিটামিন ট্যাবলেট। গোপনে চিঠি দেওয়া-নেওয়ার কাজ করেছেন বেশ কয়েকবার। সেই সময় শিক্ষাক্ষেত্রে স্বর্ণপদক প্রাপক ক্ষেত্র গুপ্তের প্রবল উৎসাহ ও অনুপ্রেরণায় প্রথমবার তিনি বারাসাত যুব উৎসবে ১৯৫২সালে স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন। ভাবনার শ্রম সৃষ্টিসত্বায় মোড় নিলো।

সরস্বতীকে কণ্ঠে ধরে রূপায়ণের বাধাহীন মুক্তধারা তিনি চালিয়ে যেতে পারেননি। এই প্রতিকূলতার পিছনে ছিল পারিবারিক অর্থনৈতিক অস্বচ্ছলতা। দেওয়ালে পিঠ ঠেকে গেলে যা হয়। পিতা উপেন্দ্রনাথ বাড়ি বিক্রি করে ভাড়া বাড়িতে থাকতে শুরু করেন। সংসারের করুন দশা কবির মর্মে আঘাত হেনেছিল। অর্থ উপার্জনের পথ খুঁজতে শুরু করেন। ভাগ্যের দেবদূতের মতো এই সময় একদিন খিদিরপুরে কবির সঙ্গে দেখা হয়ে যায় সিঙ্গুরের বাল্য বন্ধু রঞ্জিতের সঙ্গে। দুজনে কাজের সূত্রে পাড়ি দিলেন দুর্গাপুরে। ১৯৫৮ সালে তিনি দুর্গাপুর স্টিল ফ্যাক্টরিতে অস্থায়ী কর্মীরূপে যোগ দেন।শ্রম সম্পূর্ণ নিয়োজিত হলো কর্মে। ল্যান্ড ডেভলাপমেন্ট বিভাগে কাজে ঢুকলেন। দৈনিক ৮ ঘন্টার পরিশ্রমে সৃজনী প্রতিভা যেন অঙ্কুরেই বিনষ্ট হতে লাগলো। বাল্যে-কৈশোরের প্রিয় খেলাধুলা ও সংগীতের জগতে জমতে লাগলো ধুলো। সেই ধুলো ঝেড়ে বীণার তারে টান দেবার মতো অবসরটুকু পাননি। লিখতে না পারার বেদনা তাঁকে অবচেতনে অশ্রু ঝরিয়েছে।

১৯৬০ সালে তিনি স্থায়ীকর্মীর পদ পান। স্থান হয় মেশিন শপে। অন্তরের আবেগ ধরে রাখবে কে। প্রতিভার স্ফুরণ কোন পথে কখন কিভাবে নির্গত হয় সে বোঝ ভার। লোহা-লক্কর চালানো কালিপড়া হাতেও যে সৃষ্টি সম্ভব তাঁর দুর্লভ দৃষ্টান্ত কবি কেষ্ট। কঠিন কর্মের অবিশ্রান্ত শ্রমের মধ্যেও যন্ত্রাংশের নামলেখা চিরকুটের অপর পৃষ্ঠায় লিখে ফেলতেন দু-চার পংক্তি। এ যেন বিন্দুতে বিন্দুতে সিন্ধু দর্শন। একদিকে বিশ্বকর্মার চোখ রাঙানি অন্যদিকে সরস্বতীর সাধনা। কর্মজীবনে তাঁর একটা বড় প্রাপ্তি ১৯৬২ সালে হিন্দুস্থান ষ্টীল ইউনিয়নের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত যুব উৎসব। কবিতা প্রতিযগিতায় এখানে দ্বিতীয় স্থান লাভ করেন। নিপাট এই শ্রমিকের মধ্যে কবিস্বত্ত্বায় প্রচ্ছন্নভাবে রেখায়িত হতে থাকলো জীবন যুদ্ধের মরমী বাণী। শ্রমিক শ্রেণীর জীবনের কথা পল্লবিত হয়ে উঠতে থাকলো গোপনে। অতীতের ছায়াপথ বেয়ে মানবিকতার রূপ, ভালোবাসা, সুখ-দুঃখ, বিষাদময়তা সবই চিত্রিত হলো শব্দের খেলায়। কিছুটা পরে হলেও কবিপ্রতিভা ছাপার অক্ষরে প্রথম স্থায়ী রূপ পেল ১৯৭২ সালে 'শরিক না হলে' কাব্যগ্রন্থ প্রকাশের মধ্যে দিয়ে। গ্রন্থটি উৎসর্গ করলেন ড. নরেশ ব্যানার্জি ও প্রয়াতা দিদি রমা ব্যানার্জিকে। শ্রমিকের লেখনী থেকে বেরিয়ে এলো মানবতার জয়োধ্বনি।'মানবত্বে বারংবার' কবিতায় কবি লিখলেন-

"
. . . .
প্রতিদিন নিয়ে যায় সৃষ্টিছাড়া এ-সৃষ্টিকে
অনির্দিষ্ট গতি থেকে সুনির্দিষ্ট পথে
তোমার সে অদৃশ্য অঙ্গুলি
মানবের মানবত্বে বারংবার"[২]

এযেন শীতের পাতা ঝরে পড়া ডালে সবুজের নবায়ন। কবির সৃজনে প্রতিভাত হতে লাগলো জীবনের গান, শ্রমিকের ঘাম। বিষাদ ত শেষ কথা নয়, বরং তাকে পাশে রেখেই জীবনসঙ্গীত গাওয়াটাই প্রকৃত বেঁচে থাকার অনুপ্রেরনা। 'অন্য হাতে' কবিতায় নবীন সূর্যের সেই আলো-

"এক হাতে বিষাদ নিভাই
বিলোলিত স্মৃতির প্রদীপ
অন্য হাতে জ্বালাই আলোক
গড়ি শুধু জীবনসংগীত।"[৩]

কবির সাধনা সুখী গৃহকোনে নয়, প্রচন্ড যন্ত্রদানবের মাঝে একাকী সত্যের লড়াই। শ্রমিকস্বত্বা ক্রমপ্রকাশ্যমান কাব্যের আধারে। নিত্যদিনের চাক্ষুষ বাস্তবতা, ঘর্ম ও কর্মের কঠিন যুদ্ধ তাঁর লেখনীকে মজবুত করতো। তিনি যেমন শ্রমিক শ্রেণীর শরিক, তেমনি প্রতিবাদী। অধ্যাপক তরুণ মুখোপাধ্যায় তাঁকে 'প্রতিবাদী কবি' বলে আখ্যায়িত করেছেন। কবি বারবার গর্জে উঠেছেন অন্যায়ের বিরুদ্ধে। কখনও বুর্জোয়া শ্রেনীর প্রতি

ক্ষোভ অন্যদিকে আমলাতন্ত্রের শোষণনীতি ভালো চোখে দেখেননি।‘কবিতার পটভূমি সংবাদ’ কাব্যের ‘সব পথ ঘুরে’ কবিতায় সে বাস্তব ঘুনধরা চিত্র-

“ . . . . চোখের সামনে আমলারা সর্বত্র গুছিয়ে নিচ্ছে
আর মন্ত্রীরা-তো রাঁধুনে তোফায় দারুণ-
অন্যধারে ভূমিহারা চাষিদের দেহ শূন্য
অমৃতস্য পুত্রের সতত চলে নিষ্পেষণ
অর্ধাহার, অনাহার,
চতুর্দিকে এ-বড়ো কুটিল ঘুণ-”[৪]

শ্রমিক শ্রেণীর দুঃখে ও গর্বে কবির মধ্যে মিশ্রিত স্বস্থান। অধিকার রক্ষায় তিনি স্পর্ধিত শিখর। ভাগ্যের দোহাই দিয়ে নিভৃত-শোষিত যাপন নয়। রক্তের অধিকার রক্ষায় সমবেত সংগীতই এই বিপন্ন আঁধার দূর করতে পারে বলে তাঁর বিশ্বাস। শৃঙ্খল ভাঙতে ইহবে-

“ . . . .
শ্রমিকের স্পর্ধা বড়ো, মাথা তুলে মর্যাদা সন্ধান . . .
বরং বিধি যা আছে মান তুমি ,শৃঙ্খলে সংযত
শ্রমে-ঘামে দিয়ে যায় সব কিছু-বিনীত সম্মান
নচেৎ এক হও, রক্ষা করো রাখতে অধিকার
মুক্ত কারো এ-লাঞ্ছনা, কেটে যাক বিপন্ন আঁধার।”[৫]

তাঁর কবিস্বত্বা জুড়ে বিরাজ করেছে খেটে খাওয়া মানুষের চিত্র। প্রতিমুহূর্তে তিনি স্বপ্ন দেখেছেন পাষান শিকল ভাঙার। শ্রমিকের হারাবার কিছু নেই। তারা নিঃস্ব সারাজীবন। তারাই পারে স্বর্বস্ব দিয়ে লড়তে। তাদের তাদের মিলনেই ভেঙে পড়বে স্থবিরতার প্রাচীর। তাই থামলে হবে না, ভয়ে পিছিয়ে গেলে হবে না। শূন্য পাত্র পূর্ণ করতে বিদ্রোহ চাই। তাঁর অঙ্গীকার-

“....লড়তে গিয়েও
ভাঙে যদি দেখ-এই দেহ নশ্বর
তবু চল আজ
হারাবার শুধু শূন্য পাত্র
হাতুড়ির সাথে কাস্তেটা ধরো বাঁকা।”[৬]

সত্তরের উত্তাল সময়কে প্রত্যক্ষ করেছেন চোখের সামনে। আসামে বঙ্গাল খেদা হুঙ্কার, কলকারখানায়-আপিসে উচ্ছেদ, ভোটের পূর্বে রাজনৈতিক দলগুলির অজস্র উজ্জ্বল প্রতিশ্রুতি, শাসকের জঘন্য রূপ, চাকরির হাহাকার তাঁর মধ্যে এনেছে বিষাদময়তা। কর্মের নিগড়ে আবদ্ধ থেকে ও তিনি লিখে চলেছেন জীবনের কথা, ঘুরে দাঁড়ানোর দৃঢ়

বাণী। এই সময়কার ভাবনাগুলো মূলত প্রকাশ পেয়েছে তাঁর ‘স্বাধীনের এই স্বাদ’ও ‘সময়ের পদচিহ্ন’ কাব্যে।

‘স্বাধীনের এই স্বাদ’ নাম কবিতায় তিনি দেশের তৎকালীন পরিস্থিতি নিয়ে সংশয় প্রকাশ করেছেন। তিনি শুনতে পেয়েছেন মানুষের বুকের আর্তনাদ-হাহাকার। জন্মভূমি যেন বিভীষিকাময়, কঠিন বন্ধনে আবদ্ধ। যেখানে স্বাধীন শ্বাসটুকু গ্রহণে নেমে আসে অন্ধকার। তিনি হতবাক-‘একি দেশ জন্মভূমি/ চার পাশে শ্বাসরুদ্ধ দিন’[৭]। তাঁর বিদ্রোহী স্বত্বা মুখরিত হয়েছে পরক্ষনেই–‘বুঝলে কিছু হিসাব-নিকাশ এ বিচারের ভাই/ শয়তানিটা ভাঙতে গেলে আরো আগুন চাই।’[৮] অন্তরের এই আগুন জ্বালাময়ী। তিনি প্রতিবাদের নির্ভীক বলিষ্ঠ স্বত্বা। হিমাদ্রির শিখরের মতো মাথা উঁচু করে কঠিন বাণ হেনেছেন প্রতি মুহূর্তে। সুবিধাবাদ ও শয়তানকে মেনে নিতে পারেননি। মুখ বুজে অপমান সহ্য করা তাই কবির দর্শন হতে পারে না। ‘যায় না হে’ কবিতায় তাই উদ্ধত তাঁর স্বর-

“ তুমি
আমার গায়ে কাদা ছুড়লে
আমি তা দাঁড়িয়ে দেখব
সে বান্দা আমি নই”[৯]

কবি জানেন এক মাঘে শীত যায় না। সত্যের পক্ষে দাঁড়িয়ে লিখে গেছেন অবিরত। তাঁর লেখায় নৈব্যক্তিকতার থেকে প্রোজ্জ্বল মানবতার লিপি। বুকের মধ্যে একটা বড় আশার জগৎ দেখেন। কোনো রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধি নয়, শ্রমিকের জন্য পথে নেমেছেন বারবার। অন্ধকার দেওয়ালের ওপারে উদিত সূর্যের রক্তিম আভায় স্নাত করতে চেয়েছেন সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষকে। কারণটা লুকিয়ে আছে তাঁর সত্যম-শিবম-সুন্দরম ভাবমূর্তির মধ্যে। শ্রমিকদের মরা গাঙে বান আনতে ছুটে চলেছেন অবিশ্রান্ত-‘আমাদের মাথার ঘাম পায়ে পড়ছে মরা গাঙে বান আনবার জন্য দিনরাত’[১০]।

পার্টি, ট্রেড ইউনিয়ন, সাংস্কৃতিক কর্মী হিসেবে কবির দীর্ঘদিনের একটা পরিচিতি। ১৯৬৪ সালে তিনি কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য হন। ১৯৬৪-৬৭ সাল পর্যন্ত এই পার্টির কালচারাল বিভাগের কনভেনার পদে আসীন ছিলেন। পরে ট্রেড ইউনিয়নের কাউন্সিল মেম্বার হন। পার্টির মূলমন্ত্র ছিল মানুষ ও শ্রমিকের স্বার্থে কাজ করা। কখনো গোপনে কখনওবা সরাসরি তিনি এই মন্ত্র পালন করেছেন। ১৯৬৬ সালের অগাস্ট আন্দোলনের অন্যতম মুখ ছিলেন তিনি। ১৯৭২ সালে মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়ে ঠিকা শ্রমিকদের স্থায়ীকরণের দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজটি সেরেছেন। এই বছরই দুর্গাপুরে গড়ে তুললেন ‘গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী সংঘ’। সমস্ত দায়িত্ব পালন করেছেন কর্মের বন্ধনে আবদ্ধ থেকেও। অভাবেও কারো কাছে কোনোদিন হাত পাতেননি। কারন না শব্দের প্রতিধ্বনি তাঁকে বড়ই আঘাত দিত। বন্যার্তদের পাশে দাঁড়াতে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর হাতে তুলে দিয়েছেন অর্থ। জীবনে ২৫ বার রক্ত

দিয়েছেন। কখনো পদোন্নতি চাননি। এজন্য বন্ধুমহলে অনেক কথাই শুনতে হয়েছে। ১৯৮২ সালে কলকারখানার জন্য কমরেড বিমান বসুর নেতৃত্বে পুরুলিয়ার প্রান্তভূমি হুড়া থেকে কলকাতা ৯দিনের পদযাত্রায় অংশগ্রহণ করেন।

১৯৯০ সালে কবি কর্মজীবন থেকে স্বেচ্ছাবসর নিলেন। কর্মজীবন সম্পূর্ণ রূপ নিলো সৃষ্টিজীবনে। কবি একবার নিজেই বলেছেন-কবিতা লেখা, বই প্রকাশের মধ্যে দিয়ে বাকি জীবনটা কাটাতে চান। এরপর তাঁর কলম থেকে ঝরতে থাকলো বিশ্বমনন, আন্তর্জাতিক ভাবনা, শ্রমজীবী শ্রেণীর চড়াই-উৎরাই। পদাতিক মানুষের করুন সুর যেন তাঁকে ডাকছে। তাদেরকে সঙ্গী করেই তিনি পাড়ি দিলেন কাব্যজগতে।'দিন ঐ ডাকছে' কবিতায় বললেন-

"দুর্যোগ যত আসে আসুক না
মুখোশের যত থাকে ভঙ্গি
ঝটিকায় ওড়াক না ঘর সব
পদাতিক মানুষ তো সঙ্গী"[১১]

নয়ের দশকে প্রকাশিত হয় 'কবি কারো দাস নয়', 'চতুর্দশপদী কবিতা, 'কমরেডস লাইনটা সোজা করুন, তিনটি বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ। এই তিনটি কাব্যই কবি পরিচিতির দর্শন। স্থিতধী, আত্মশক্তিতে বলীয়ান এই মানুষটির মুখ থেকে বেরিয়ে আসা স্বাভাবিক কবি কারো দাস নয়। কারণ তিনি কখনো মাথানত করেননি। অথচ শাসকের যাকে আস্ফালনে বিকিয়ে যেতে দেখেছেন বহু তথাকথিত লেখকদের। চাটুকাবৃত্তি থেকে ঘৃণ্য বস্তু যেন আর কিছু নেই। তিনি সর্বদা ছুটে গেছেন সৃষ্টির মূলে। সাধারণ মানুষ নিরন্ন, আর একদল রাজ্য পেয়ে সৌখিনতাকে আশ্রয় করেছেন।একই ধ্বনি শোনা গেলো 'ঝড় আসছে' কবিতায়- "এ দেশটাকে কিছু পরিবার লুটেপুটে খাচ্ছে। এরা ভিতরের লোক/ সাথে বিদেশী বণিকের মত্ত আগ্রাসন। শুষে নিচে জীবনের অমূল্য নির্যাস।"[১২] কবি দেখেছেন জীবন ক্রমশ কঠিন থেকে কঠিনতর হচ্ছে। অনুমান করতে পেরেছিলেন ভয়াবহ দিন আসছে। তাই চতুর্দশপদীর পথ বেয়ে তিনি সাবধান বাণী শুনিয়েছিলেন পার্টিকে। সেদিন কেউ বোঝেনি, অনেকেই বলেছিলেন কেষ্টবাবু হয়তো পাগল হয়েছেন, অথবা তিনি আদর্শ থেকে বিচ্যুত হয়েছেন। যে শ্রমিক শ্রেণীকে কেন্দ্র করেই পার্টির উত্থান-মূল শক্তি, তাদের থেকে দূরে সরে গিয়েছিলো তারা। রোদে-জলে-মাঠে কাজ করা, কারখানায় ঘাম ফেলা শ্রমিকদের দিকে তাকানোর সময় পায়নি তারা।'একটু ব্যর্থতাকে দেখো' কবিতায় কবির সতর্ক বার্তা-

"....একটু ব্যর্থতাকে দেখো,যাও, মাটির কাছে যাও
মানুষের জন্য ভাব, তারা বড় কষ্টে আছে"[১৩]

তিনি চেয়েছেন কমরেডের উন্নতি। ভেবেছেন শ্রেণীস্বার্থের কথা। বলেছেন- "আমরা সুবিধাবাদী মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীদের নেতৃত্বে আছি/ তবু, কাউকে খুশি কারবার জন্য লিখি

না/প্রথম যখন লিখি তখন কিছু পাবার জন্যও লিখিনি /চরম দুর্দিনেও না/ বরং যা লিখেছি তা মানুষের জন্যই লিখেছি/ এখনো সেই পথেই আমাদের ক্লান্তিহীন যাত্র . . . . . .।"[১৪] তিনি জানেন একটি কমিউনিস্ট কালচার গড়ে ওঠে অনেক শ্রম, ত্যাগ ও রক্তের মধ্যে দিয়ে। সে চলে সত্যকে কেন্দ্র করে সততার পথে। সেই মূল্যবোধ ক্রমশ হারিয়ে যাচ্ছে বলে তিনি দুঃখ প্রকাশ করেন। ১৫টি কাব্যগ্রন্থকে কেন্দ্র করে ২০০৮ সালে প্রকাশ পায় কবির 'নির্বাচিত কবিতা সংগ্রহ'। বিখ্যাত রবীন্দ্র গবেষক নেপাল মজুমদার এই গ্রন্থের আলোচনার শুরুতেই যথার্থ মূল্যায়ন করেছেন কবির। তিনি লিখেছেন –"কবি কেষ্ট চট্টোপাধ্যায় দুর্গাপুর কারখানার একজন শ্রমিক কবি।"[১৫] তিনি জীবনে বহু সম্মাননা অর্জন করেছেন। তবুও তাঁর মূল্যায়ন যেন কুড়িতেই রয়ে গেছে। 'ভূমিকার বদলে' দীর্ঘ প্রবন্ধে অধ্যাপক ড. অজয়কুমার ঘোষ প্রশ্ন তুলেছে, "কিন্তু শ্রমিক-কবি এবং শ্রমিক শ্রেণীর কবি বলেই কি মধ্যবিত্ত বিদগ্ধ সমাজের একটি অংশে আজ তাঁর যথাযোগ্য সমাদর হয়নি?"[১৬] হয়তো তাই, আবারনাও হতে পারে। একজন শ্রমিকের কবিতে উত্তরণ সাহিত্যের আঙিনায় কতটা ছাপ ফেলে গেলো তা আগামী ভবিষ্যৎই বলবে।

তথ্যসূত্র (References):

১. শ্রমিক কবির প্রতিবাদী কবিতা, কেষ্ট চট্টোপাধ্যায়, শ্রমশ্রী প্রকাশন, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ, নভেম্বর ২০১৬, প্রচ্ছদপট

২. শ্রেষ্ঠ কবিতা সংগ্রহ, কেষ্ট চট্টোপাধ্যায়, নবজাতক প্রকাশন, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা বইমেলা ২০১২, পৃ.১৭

৩. তদেব, পৃ.১৯

৪. তদেব, পৃ.৩০-৩১

৫. চতুর্দশপদী কবিতা, কেষ্ট চট্টোপাধ্যায়, প্রান্তর, কলকাতা,সপ্তম সংস্করণ ২০১৬, পৃ. ১৩

৬. শ্রেষ্ঠ কবিতা সংগ্রহ, কেষ্ট চট্টোপাধ্যায়, নবজাতক প্রকাশন, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা বইমেলা ২০১২, পৃ. ৩৮

৭. তদেব, পৃ.৪৯

৮. তদেব, পৃ. ৫০

৯. তদেব, পৃ. ৫৮

১০. তদেব, পৃ. ৬৮

১১. তদেব, পৃ. ৭৯

১২. তদেব, পৃ. ৮৮

১৩. কমরেডস লাইনটা সোজা করুন, কেষ্ট চট্টোপাধ্যায়, অন্নপূর্ণা প্রকাশনী, কলকাতা, তৃতীয় সংস্করণ, কলকাতা বইমেলা ২০১০, পৃ.৬০

১৪. কিছু তো দাঁড়িয়ে নেই, কেষ্ট চট্টোপাধ্যায়, নবজাতক প্রকাশন, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০০৭, পৃ.৭
১৫. নির্বাচিত কবিতা সংগ্রহ, কেষ্ট চট্টোপাধ্যায়, নবজাতক প্রকাশন, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১ লা মে ২০০৮, পৃ. ৩৫৩
১৬. কবিতা সংগ্রহ ও বিদগ্ধজনের মতামত, কেষ্ট চট্টোপাধ্যায় (সম্পা:), শ্রমশ্রী প্রকাশন, কলকাতা, প্রকাশ ২২মে ২০১৩, পৃ. ৩২

নদীয়ায় বামপন্থী ছাত্র আন্দোলন (1947-1960) : একটি ঐতিহাসিক অনুসন্ধান

ভবানন্দ রায়
সহকারী অধ্যাপক
ইতিহাস বিভাগ, রানাঘাট কলেজ, রানাঘাট, নদীয়া

সারসংক্ষেপ : নদীয়া জেলা তথা পশ্চিমবঙ্গের কমিউনিজম আদর্শ প্রসারে বামপন্থী ছাত্রদের গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা রয়েছে। আমরা দেখতে পাই রাজ্যস্তরে যত বড়-বড় বামপন্থী আন্দোলন সংগঠিত হয়েছে তার প্রত্যেকটি আন্দোলনে ছাত্র সমাজের উজ্জ্বল উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। ছাত্রদের যোগদানের জন্যই আন্দোলন শক্তিশালী ও ফলপ্রসু হয়।

1953 সালে কলকাতায় ট্রাম ভাড়া বৃদ্ধির প্রতিবাদে পশ্চিমবঙ্গের ছাত্রসমাজের সঙ্গে নদীয়া জেলার ছাত্রসমাজেরও একটা সংযোগ গড়ে ওঠে কমরেড দিলীপ বাগচীর হাত ধরে। যদিও তিনি তখন হাওড়া নরসিংহ দত্ত কলেজে পড়ছিলেন। কিন্তু তিনি ছিলেন নদীয়ার মানুষ। তিনি তাঁর কলেজের (হাওড়া নরসিংহ দত্ত কলেজ) ছাত্রদেরকে নিয়ে কলকাতায় ট্রাম ভাড়া বৃদ্ধির প্রতিবাদ আন্দোলন মিছিলে অংশ নেন এবং পুলিশের গুলিও খান। গুলি এসে লাগে তাঁর (দিলীপ বাগচী) ডান পায়ের জানুতে। এইভাবে কমরেড দিলীপ বাগচীর হাওড়া জেলার ছাত্র আন্দোলনের সঙ্গে জড়িয়ে পড়া এবং ট্রামভাড়া প্রতিবাদ আন্দোলনে শামিল হওয়া। সেই তাঁর বামপন্থী ছাত্র আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হওয়া প্রথম। এর পর তিনি নিজের বাড়ী কৃষ্ণনগরে চলে আসেন ও নদীয়ার বামপন্থী ছাত্র আন্দোলনের সঙ্গে গভীরভাবে জড়িয়ে পড়েন। 1959 সালে পশ্চিমবঙ্গে ভয়াবহ খাদ্য সংকট দেখা দেয়। এই খাদ্য সংকট এর বিরুদ্ধে তৎকালীন শাসকদল কংগ্রেস এর বিরুদ্ধে বামপন্থীরা তীব্র খাদ্য আন্দোলন গড়ে তোলেন। সেই আন্দোলনে নদীয়ার ছাত্র সমাজও অংশ নেয়। এছাড়া 1966 সালে নদীয়ার কৃষ্ণনগরে ঐতিহাসিক খাদ্য আন্দোলন দেখা দেয়, সেই আন্দোলনে ছাত্র সমাজই ছিলেন সবার অগ্রভাগে।

শব্দ সূচক: ছাত্র ফ্রন্ট, ট্রামভাড়া আন্দোলন, ছাত্র সংস্থা, ছাত্র কল্যাণ ফ্রন্ট, সাংস্কৃতিক ফ্রন্ট, খাদ্য আন্দোলন।

মূল প্রবন্ধ নদীয়া জেলা তথা পশ্চিমবঙ্গের কমিউনিজম আদর্শ প্রসারে বামপন্থী ছাত্রদের গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা রয়েছে। আমরা দেখতে পাই রাজ্যস্তরে যত বড়-বড় বামপন্থী আন্দোলন সংগঠিত হয়েছে তার প্রত্যেকটি আন্দোলনে ছাত্র সমাজের উজ্জ্বল উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। ছাত্রদের যোগদানের জন্যই আন্দোলন শক্তিশালী ও ফলপ্রসু হয়।

1953 সালে কলকাতায় ট্রাম ভাড়া বৃদ্ধির প্রতিবাদে পশ্চিমবঙ্গের ছাত্রসমাজের সঙ্গে নদীয়া জেলার ছাত্রসমাজেরও একটা সংযোগ গড়ে ওঠে কমরেড দিলীপ বাগচীর হাত ধরে। যদিও তিনি তখন হাওড়া নরসিংহ দত্ত কলেজে পড়ছিলেন। কিন্তু তিনি

ছিলেন নদীয়ার মানুষ। তিনি তাঁর কলেজের (হাওড়া নরসিংহ দত্ত কলেজ) ছাত্রদেরকে নিয়ে কলকাতায় ট্রাম ভাড়া বৃদ্ধির প্রতিবাদ আন্দোলন মিছিলে অংশ নেন এবং পুলিশের গুলিও খান। গুলি এসে লাগে তাঁর (দিলীপ বাগচী) ডান পায়ের জানুতে। এইভাবে কমরেড দিলীপ বাগচীর হাওড়া জেলার ছাত্র আন্দোলনের সঙ্গে জড়িয়ে পড়া এবং ট্রামভাড়া প্রতিবাদ আন্দোলনে শামিল হওয়া। সেই তাঁর বামপন্থী ছাত্র আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হওয়া প্রথম। এর পর তিনি নিজের বাড়ী কৃষ্ণনগরে চলে আসেন ও নদীয়ার বামপন্থী ছাত্র আন্দোলনের সঙ্গে গভীরভাবে জড়িয়ে পড়েন।

নদীয়ায় উদ্বাস্তু আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েন স্কুল-কলেজের ছাত্রছাত্রীরাও। স্বাধীনতার পর নদীয়ায় উদ্বাস্তুদের নানা স্থানে ক্যাম্প গড়ে উঠেছিল। যেমন- ধুবুলিয়া, রানাঘাটের কুপার্স, রূপশ্রী পল্লী, মহিলা ক্যাম্প, শান্তিপুরের চামটা মহিলা ক্যাম্প ইত্যাদি। এইসব ক্যাম্পের দুর্দশা চিত্র ছিল সর্বত্র। এর বিরুদ্ধে কমিউনিস্টদের গঠিত সংস্থা UCRC (United Central Refugee Council) এর নেতৃত্বে বিভিন্ন সরকারী অফিসের সামনে উদ্বাস্তুরা 'সত্যাগ্রহ' আন্দোলন শুরু করেন 1959 সালের জানুয়ারী মাস থেকে। 20 জানুয়ারী 1959 সাল কৃষ্ণনগরে 43 জন ছাত্রছাত্রী আইন অমান্য করেন। এদের মধ্যে তিন জনের 1মাস কারাদণ্ড হয়। ছাত্রছাত্রীদের উদ্বাস্তু আন্দোলনে যুক্ত হওয়ার ফলে নদীয়ার কমিউনিস্ট আন্দোলন এক বিশেষ মাত্রা পায়।

1959 সালের 25শে জানুয়ারীর মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্বাচন সুসম্পন্ন হয়। সেই ভোটের ফলে দেখা যায় যে, নির্বাচনে কংগ্রেস, প্রজাসমাজতন্ত্রী, ফরওয়ার্ড ব্লক, প্রভৃতি বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলি কর্তৃক পরিচালিত বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনকে বিপুলভাবে পরাজিত করে 'ছাত্র ফেডারেশন' রাজ্যের সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী ছাত্র সংগঠনে পরিণত হয়েছে। এতে বোঝা যায় যে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে ক্রমেই বামপন্থা দানা বাঁধতে শুরু করেছে রাজ্যে। 1959 সালের 31শে জুলাই কেরালা রাজ্যে বামফ্রন্ট পরিচালিত সরকারকে ভেঙে দিয়ে রাষ্ট্রপতি শাসন প্রয়োগ করলে তার বিরুদ্ধে পশ্চিমবঙ্গের বামপন্থী সমগ্র সংগঠন তীব্র ক্ষোভে ফেটে পড়েন। ছাত্র সমাজও গর্জে ওঠে। নদীয়ার ছাত্রসমাজ সমগ্র নদীয়া জুড়ে বিক্ষোভ আন্দোলন করতে থাকেন। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির রানাঘাট আঞ্চলিক কমিটির উদ্যোগে 4 আগষ্ট 1959, 7 হাজার ছাত্র, কৃষক, শ্রমিকের এক বিশাল মিছিল রানাঘাট শহর পরিক্রমা করে। এবং কেরালায় রাষ্ট্রপতি শাসন বাতিলের জন্য এক প্রস্তাবপত্র মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট কাছে জমা দেন। নবদ্বীপের কলেজ ও বিভিন্ন স্কুল, বগুলা শ্রীকৃষ্ণ কলেজ ও স্থানীয় হাইস্কুলের পাঁচ শতাধীক ছাত্রছাত্রী ধর্মঘট করেন। বড় জাগুলী অঞ্চলের ছাত্রছাত্রীরা ধর্মঘট করেন। এই আন্দোলনের হাত ধরে নদীয়ার মাটিতে বামপন্থীদের রাজনৈতিক শক্তি আরো বেশখানিকটা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

কৃষ্ণনগরে ছাত্র আন্দোলন

হাওড়ার কলেজে ছাত্র আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার অপরাধে দিলীপ বাগচীর বাবা তাঁকে নিজের শহর কৃষ্ণনগরে পাঠিয়ে দেন এবং কৃষ্ণনগর গভমেন্ট কলেজে পুনরায় প্রথম বর্ষের ছাত্র হিসাবে ভর্তি করেন। কৃষ্ণনগরে বা নদীয়া জেলায় তখন বামপন্থী ছাত্র সংগঠন ‘ছাত্র ফ্রন্ট’ (S.F.) কোথাও কাজ শুরু করেনি। বেআইনি পার্টি ও দেশ বিভাজনের ধাক্কা সামলাতেই সবাই ব্যস্ত। কৃষ্ণনগরে তিনি যখন আসেন তখন বামপন্থী ছাত্ররা 'ছাত্র সংস্থা'র ভেতরে থেকে এবং কংগ্রেস সমর্থক ছাত্ররা 'ছাত্র কল্যাণ সমিতি'র নামে সংগঠন করছেন। 'ছাত্র সংস্থা'র নেতৃত্বে ছিলেন তখন সমাজবাদী ছাত্রনেতারা, যাদের ওপর একদিকে যেমন কাশিকান্ত মৈত্র, অন্যদিকে তেমনি শিবরাম গুপ্ত-র প্রভাব ছিল। কমরেড দিলীপ বাগচী তখন বামপন্থী সাংকৃতিক সংস্থা ‘গণনাট্য সংঘে’র কৃষ্ণনগর শাখা 'সংস্কৃতি সংসদ' এর সাথে সক্রিয়ভাবে যুক্ত হয়ে পড়েন। তাঁর সহযোগী ছিলেন নীরদ হাজরা। এই সময় নদীয়া জেলায় 'ছাত্র ফেডারেশন' (S.F.)-কে পুনরুজ্জীবিত করার জন্য জেলা পার্টির পক্ষ থেকে উদ্যোগ নেওয়া হয়। সেই সময় (1953) কমরেড সুরেশ রায় ছিলেন নদীয়া জেলার সি পি আই পার্টির সম্পাদক। তিনিও তখন সক্রিয় পার্টির সদস্য হয়ে গিয়েছেন। কমরেড সুরেশ রায় নদীয়া জেলার ছাত্র আন্দোলনকে সংগঠিত এবং বিকশিত করার জন্য এক মিটিং ডেকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যে, স্বরুপগঞ্জে একটা আধা কনভেনশন করে জেলা কমিটি তৈরি করা হবে। সেইমতো কাজও করলেন কমরেড সুরেশ রায়। এইভাবে নদীয়ার মাটিতে বামপন্থী ছাত্র আন্দোলনের সূচানা হয়।

কমরেড সুরেশ রায়-এর নেতৃত্বে নদীয়ায় 'ছাত্র ফেডারেশন' (S.F.) আত্মপ্রকাশ করে। তার সভাপতি হন শংকরী ব্যানার্জি, অবিনাশ দেবনাথ হন সাধারণ সম্পাদক, দিলীপ বাগচী ও সন্তোষ সিংহ হন যুগ্ম-সম্পাদক এবং বাকি অনেকে হন কমিটির সদস্য যেমন- কমরেড হরিনারায়ন অধিকারী, সুশান্ত হালদার, সুভাষ বসু, নিতাইপদ সরকার, বীরেন দাস, রবি ভট্টাচার্য, মদন সাহা প্রমুখ।

নদীয়া জেলা 'ছাত্র ফেডারেশন' (S.F.) তৈরি হওয়ার দেড় বছর পরে রানাঘাট রূপশ্রী ক্যাম্পে হয় প্রথম জেলা সম্মেলন। প্রবল উৎসাহ উদ্দীপনায় এই সম্মেলন সবদিক থেকেই একটা ঐতিহাসিক সম্মেলনে পরিণত হয়। হরিনারায়ন অধিকারী, সুভাষ বসু প্রমূখকে সামনে রেখে গোটা ‘রানাঘাট লোকাল কমিটি’ এই সম্মেলনকে সর্বাংশে সাফল্যমন্ডিত করে তোলেন।

নদীয়া জেলার তৎকালীন চারটি পুরনো কলেজ যথা কৃষ্ণনগর গভর্নমেন্ট কলেজ, নবদ্বীপ বিদ্যাসাগর কলেজ, শান্তিপুর কলেজ ও রানাঘাট কলেজের সাথে সাথে সদ্য প্রতিষ্ঠিত বগুলা শ্রীকৃষ্ণ কলেজ ও কৃষ্ণনগর বিপ্রদাস পাল চৌধুরী ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজিতে এই সম্মেলনের গভীর প্রভাব পড়ে। ইতিমধ্যে কৃষ্ণনগর গভারমেন্ট কলেজ থেকে 'ছাত্র সংস্থা'র প্রতিষ্ঠিত সমাজবাদী ছাত্রনেতারা ছাত্রজীবন

শেষ করে বেরিয়ে গেলে 'ছাত্র ফেডারেশন' (S.F.) তাতে সংখ্যাগরিষ্ঠতার জায়গায় চলে আসতে থাকে। এই অবস্থাতেই সন্তোষ সিংহ 'ছাত্র ইউনিয়ন'র সাধারণ সম্পাদক হন 'ছাত্র সংস্থা' মনোনীত এস এফ (S.F)-এর (এখন AISF) প্রার্থী হিসেবে। এরপরই 'ছাত্র সংস্থা' অথবা S.F.- এই প্রশ্নে দিলীপ বাগচীরা S.F.-এর পতাকা নিয়ে ইউনিয়ন নির্বাচনে লড়বার সিদ্ধান্ত নেন। নদীয়া জেলার বাকি আর একটা গোষ্ঠী অল্পকিছু ছাত্র নিয়ে মৃণাল চ্যাটার্জির নেতৃত্বে 'ছাত্র সংস্থা'র অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখে। S.F.- এর নামে কৃষ্ণনগর কলেজে প্রথম সাধারণ সম্পাদক হন রামনিবাস চেৎলাঙ্গিয়া, তারপরের বছর চন্দন কান্তি সান্যাল (শুভ্র ও অমল সান্যাল-এর দাদা)। কৃষ্ণনগর গভমেন্ট কলেজে S.F.-এর একটানা জয়যাত্রা আরম্ভ হয়। শান্তিপুর কলেজে সাধারণ সম্পাদক হন মদন সাহা। রানাঘাট কলেজে সাধারণ সম্পাদক হন হরিনারায়ন অধিকারী। বগুলা কলেজে সাধারণ সম্পাদক হন নিতাইপদ সরকার। ‘ছাত্র ফেডারেশন’(S.F.)-এর প্রথম জেলা সম্মেলনে প্রদেশ নেতৃত্ব থেকে উপস্থিত ছিলেন নন্দ ভট্টাচার্য, গুরুদাস দাশগুপ্ত ও দীনেশ মজুমদার। নদীয়া জেলাতে ছাত্র সংগঠন গড়ার পেছন থেকে সক্রিয় সহযোগিতা করতেন মনু চ্যাটার্জী, অজিত সান্যাল, দেবু চ্যাটার্জী (শান্তিপুর), দেবী বসু (নবদ্বীপ)। এসময় সদস্য সংখ্যা ক্রমেই বেড়ে চলে। কৃষ্ণনগরে আঞ্চলিক কমিটি গঠনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। কৃষ্ণনগর পৌরসভা ভবনে প্রথম শাখা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতি হয়েছিলেন অজিত সান্যাল, সহ-সভাপতি হন দিলীপ বাগচী, সম্পাদক হন চন্দন সান্যাল। এই পর্যায়ে কালীকিংকর ব্যানার্জি (বোতল) অসামান্য ভূমিকা নিয়ে অক্লান্ত পরিশ্রম করে নদীয়া জেলার সদস্য সংখ্যা বাড়াতে সচেষ্ট হন ও সংগঠনকে শক্তিশালী করেন।

ষাট-এর দশকে নদীয়ার ‘ছাত্র ফ্রন্ট’-এর নেতারা একই সঙ্গে 'পার্টি ফ্রন্ট' ও 'সাংস্কৃতিক ফ্রন্ট' এর কাজে লিপ্ত থাকতেন। দিলীপ বাগচী জানিয়েছেন, কৃষ্ণনগর শহরে মধ্যবিত্ত সমাজের উপর পার্টি'র প্রভাব বিস্তারের কাজে ‘সাংস্কৃতিক ফ্রন্ট’-এর অবদান ছিল সবচেয়ে বেশি। ‘ছাত্র ফ্রন্ট’-এর শতকরা 90 ভাগ কর্মী ‘সাংস্কৃতিক ফ্রন্ট’-এর কাজ করতেন কলেজ করার পর। শান্তিপুর, নবদ্বীপেও একই চিত্র ছিল। ব্যতিক্রম ছিল পলাশীপাড়া এলাকা। সেখানে কোন কলেজ না থাকলেও সেখানকার বিদ্যালয়ের ছাত্ররাই ছাত্র আন্দোলন সংগঠিত করেছিলেন। পলাশীপাড়ায় কমিউনিস্ট আন্দোলন জনমুখী করে তুলেছিলেন মনু চ্যাটার্জী ও বিল্বমঙ্গল চ্যাটার্জী অক্লান্ত পরিশ্রম করে। তাঁদের অক্লান্ত প্রচেষ্টায় পলাশীপাড়া অঞ্চলের ছাত্ররা বাংলা-বিহার সংযুক্তির বিরুদ্ধে নিয়মিত আন্দোলন প্রচার করতেন। এছাড়া এই অঞ্চলের ছাত্ররা ও তাঁদের নেতৃত্ব মিলে কৃষক আন্দোলন ও সাংস্কৃতিক আন্দোলন গড়ে তোলেন। পলাশীপাড়া অঞ্চলের ছাত্ররা খুব কমই কৃষ্ণনগর গভমেন্ট কলেজের পড়তে আসতেন। তবু যারা এসেছেন তাঁরা কৃষ্ণনগরের ছাত্র আন্দোলনকে সমৃদ্ধ করেছেন। এঁদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য

মৃত্যুঞ্জয় গুঁই, রবি চ্যাটার্জী ও গুরু প্রসাদ মন্ডল। পলাশীপাড়া অঞ্চলের বেশিরভাগ ছাত্র মুর্শিদাবাদ জেলার বিভিন্ন কলেজে বিশেষ করে বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজ ও জিয়াগঞ্জ শ্রীপত সিং কলেজে পড়তেন। সেইসব কলেজেও তাঁরা 'ছাত্র ফ্রন্ট' এ কাজ করতেন। এঁদের মধ্যে সুভাষ বিশ্বাস, জয়দেব বিশ্বাস, ভক্তি বৈরাগ্য, কালি ও শরদিন্দু বিশ্বাস ভাতৃদ্বয় প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। এঁরা পলাশীপাড়ার গ্রামে এসে পার্টির বিভিন্ন ফ্রন্টের কাজে অংশ নিতেন। মনু চ্যাটার্জির বাড়িটাই ছিল পলাশীপাড়া অঞ্চলের যাবতীয় পার্টি কার্যকলাপের কেন্দ্রবিন্দু। তাঁদের সমগ্র পরিবারটা ছিল পার্টির পরিবার। এই পরিবার পলাশীপাড়া অঞ্চলের কমিউনিস্ট আন্দোলন প্রসারে ব্যাপক নির্যাতন ও কষ্ট সহ্য করেও কাজ করে গিয়েছেন। এই পলাশীপাড়াতেই কলেজ না থাকলেও পরবর্তীকালে ‘ছাত্র ফ্রন্ট’-এর জেলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

নদীয়ার নেতৃত্ব ছাত্রসমাজের মধ্যে বামপন্থী মতবাদ প্রসারের জন্য স্কুল-কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে বিভিন্ন পত্রিকা বিক্রি ও প্রচার করেছেন, যারা ছাত্র নয় তাঁদের মধ্যেও প্রচার ও বিক্রয় করেছেন যেমন- 'স্বাধীনতা', 'পরিচয়', 'নন্দন', 'দেশেহিতৈষী', 'দেশব্রতী', 'অনীক', 'ফ্রন্টিয়ার', 'কালপুরুষ', 'দক্ষিণ দেশ' প্রভৃতি পত্রিকা। তবে কমরেড দিলীপ বাগচীর মতে, নদীয়া জেলায় বামপন্থা প্রসারে বেশি কার্যকরী ছিল সরাসরি রাজনৈতিক তাত্ত্বিক পত্রিকাগুলি। এছাড়া বিভিন্ন গোষ্ঠীর প্রচারিত গোপন রাজনৈতিক দলিলগুলি বামপন্থী মতবাদ প্রচারে খুবই কার্যকর হয়েছিল।

স্বাধীনতার পর থেকেই রাজ্যে খাদ্যের সংকট ক্রমেই তীব্রতর হতে থাকে। 1959 সালের আগষ্ট মাসে রাজ্যের বামপন্থীরা খাদ্যের দাবীতে প্রত্যক্ষ আন্দোলন শুরু করেন। এই আন্দোলনে নদীয়ার ছাত্র সমাজ এগিয়ে আসেন। মিছিল, ডেপুটেশন, সভা চলতে থাকে নদীয়ার বিভিন্ন অংশে। নদীয়ার খাদ্য আন্দোলন পরিচালিত হচ্ছিল ‘নদীয়া জেলা মূল্যবৃদ্ধি ও দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ কমিটি’ এর নেতৃত্বে। খাদ্যের দাবীতে 20শে, 25শে এবং 28শে আগষ্ট নদীয়া জেলার সদর কৃষ্ণনগর এবং রানাঘাট কোর্টে বিক্ষোভ প্রদর্শন এবং কলকাতায় 31শে আগষ্ট মহাবিক্ষোভ কর্মসূচীতে অংশ নেওয়ার কর্মসূচী গৃহীত হয়। সেই বিক্ষোভে ছাত্রছাত্রীদের অংশগ্রহণ ছিল বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ। বামপন্থীদের জনপ্রিয়তা এইভাবে অনেইটাই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়।

বগুলা কলেজের ছাত্র আন্দোলন

নদীয়ার ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাসে বগুলা কলেজের বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। বগুলা কলেজের ছাত্র আন্দোলনের প্রথম পুরুষ ছিলেন নিতাইপদ সরকার। তিনি জানিয়েছেন যে, তিনি বগুলা শ্রীকৃষ্ণ কলেজে 1957 সালে ভর্তি হন। কলেজের ‘স্টুডেন্ট ফেডারেশন’-র কোন অস্তিত্ব তখন ছিল না। আড়ংঘাটা এলাকায় পূর্ববঙ্গ থেকে আসা নমঃশূদ্র সম্প্রদায়-এর (এসসি) প্রাধান্য ছিল। নতুন তৈরি হওয়া এই কলেজে তাই তপশিলি সমাজের ইউনিয়ন ছিল শক্তিশালী। তৎকালীন নদীয়া জেলার কমিউনিস্ট পার্টির প্রথম সারির নেতা সুশীল চট্টোপাধ্যায় প্রায়সই হাঁসখালি আসতেন। বগুলার

কমরেড মুকুন্দ ঘোষ, কমরেড কান্তি বসু, কমরেড অশ্বিনী মণ্ডল প্রমুখদের কাছ থেকে জানতে পারেন যে, বগুলা কলেজে বামপন্থী ছাত্র সংগঠন দুর্বল আছে। বগুলা কলেজে বামপন্থী ছাত্র আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য কমরেড সুশীল চট্টোপাধ্যায় নিতাইপদ সরকারকে বগুলা কলেজে ভর্তি হওয়ার পরামর্শ দেন। শ্রীকৃষ্ণ কলেজের 'স্টুডেন্ট ফেডারেশন' বনাম 'ছাত্র পরিষদ'-এর লড়াইয়ের প্রচলন নিতাইপদ সরকারই প্রথম করেন S.F. প্রার্থী হিসেবে। 1957 সালে নিতাইপদ সরকার হন ছাত্র ইউনিয়নের সহকারি সম্পাদক এবং তৃতীয় বর্ষের ছাত্র শ্রী সুজিত বিশ্বাস হন সাধারণ সম্পাদক। এর থেকেই বগুলা এলাকায় পার্টি'র সূচনা হয় এবং শুরু হয় নদীয়া জেলায় 'ছাত্র ফেডারেশন'-এর জয়যাত্রা।

পার্টি ভাগের পরে নদীয়া জেলায় ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় 'ছাত্রফ্রন্ট'। কিন্তু তৎসত্ত্বেও বগুলা কলেজে এবং বিপ্রদাস পাল চৌধুরী ইনস্টিটিউটের ছাত্র সংগঠন সি পি আই-এর দখলেই থাকে। বগুলা কলেজের ছাত্র রাজনীতিতে জাতপাতের বন্ধন থেকে মুক্ত করে মুক্ত গণতান্ত্রিক পরিবেশ তৈরী করেন নিতাইপদ সরকার। সেই ধারা বজায় রেখেছিলেন গোলোক ঠাকুর, কিরীটেন্দু সরকার প্রমুখরা। বিপ্রদাস পাল চৌধুরী ছাত্র ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন মদন সাহা, যিনি সুশীল চট্টোপাধ্যায়-এর মামাবাড়িতে থেকে পড়াশোনা করতেন। তবে ছাত্র ফেডারেশনের কর্মীরা পার্টি ভাগের পর সি পি আই (এম)-এর দিকে গেলেও খুব বেশিদিন সেখানে থাকেন নি। 1967 সালে নকশালবাড়ির ঘটনা ঘটে যাওয়ার পর তাঁরা প্রায় প্রত্যেকেই নকশালপন্থীদের সঙ্গে কাজ করতে শুরু করেন। কৃষ্ণনগর শহরে ছাত্রনেতা চন্দন সান্যাল-এর বাড়ির ছাদে এক মিটিং বসে, সেখান থেকে একজন বাদে সকলেই নকশালবাড়ির পক্ষে দাঁড়ান এবং সি পি আই (এম)-এর সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করেন। এইভাবে 1967-তে পার্টি ভাগের পর নদীয়ার মাটিতে বামপন্থী রাজনৈতিক আন্দোলনের নতুন সমীকরণ শুরু হয়।

নদীয়ার রানাঘাট ও হাঁসখালী অঞ্চলের ছাত্র আন্দোলনের গুরুত্বপূর্ণ নেতা হয়ে উঠেছিলেন কমরেড নিতাইপদ সরকার সহ উক্ত অঞ্চলের বেশ কয়েকজন ব্যাক্তি, তারমধ্যে অন্যতম ছিলেন বগুলার গোলক ঠাকুর ও আরো অনেকে। তাঁরা বগুলা শ্রীকৃষ্ণ কলেজে ছাত্র আন্দোলন শুরু করে নদীয়ার ছাত্র আন্দোলনের পাশাপাশি এলাকার বিশিষ্ঠ কমিউনিস্ট আন্দোলনের প্রধান মুখ হয়ে ওঠেন। নিতাইপদ সরকার বগুলা কলেজের ছাত্র ফেডারেশন-এর প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ছিলেন। কলেজের নির্বাচনে কলেজের ইউনিয়নের সহকারি সাধারণ সম্পাদক হিসেবে নির্বাচিত হয়েছিলেন। পরপর চার বছর বগুলা কলেজের অন্যতম প্রধান হিসেবে 'কলেজ ইউনিয়নের' ছাত্র-ছাত্রীদের কল্যাণ কাজে নিজেকে নিয়োজিত রাখেন। পরে জেলার ছাত্রনেতা হয়ে যান, তারপর নদীয়ার যুবনেতা এবং শেষে নদীয়ার কৃষক নেতা হন।

ছাত্র ফেডারেশনের নদীয়া জেলার সাধারণ সম্পাদক ছিলেন হরিনারায়ন অধিকারী 1959 থেকে 1964 পার্টি'র ভাঙ্গা পর্যন্ত। আর ছাত্র ফেডারেশন এর সভাপতি ছিলেন নিতাইপদ সরকার 1959 থেকে 1964 পার্টি'র ভাঙ্গা পর্যন্ত। নিতাইপদ সরকার নদীয়া জেলার যুব সংঘের সভাপতি হিসাবে কাজ করেছেন 1963 সালে। তাঁদের সামগ্রিক প্রচেষ্টায় নদীয়া জেলায় ছাত্র আন্দোলন যেমন সংগঠিত রূপ ধারণ করে, তেমনি ছাত্র আন্দোলনের হাত ধরে বামপন্থী রাজনৈতিক শক্তিরও শ্রীবৃদ্ধি ঘটতে থাকে।

1959 সালে নদীয়ার রানাঘাটে কুপার্স ক্যাম্প, মহিলা ক্যাম্প ও রূপশ্রী পল্লীর উদ্বাস্তুদের নানা প্রকার দাবীদাওয়া আদায়ের জন্য সেখানকার ছাত্রছাত্রীরা রানাঘাট কোর্টের সামনে সত্যাগ্রহ আন্দোলন করেন।

1966 সালে নদীয়ার ঐতিহাসিক ছাত্র আন্দোলন

1966 সালে সারা পশ্চিমবঙ্গ জুড়েই নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধির দাবিতে ছাত্র সমাজ তীব্র আন্দোলনে ফেটে পড়ে। এই একই ইস্যুতে নদীয়ার কৃষ্ণনগরে ভয়াবহ ছাত্র আন্দোলন দেখা দেয়। মূলত 1965 সালে ইন্ডিয়া-পাকিস্তান যুদ্ধের ফলে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের দাম আকাশছোঁয়া হয়ে গিয়েছিল। পশ্চিমবঙ্গের শাসক দলের প্রতি মানুষ চরম ক্ষুব্ধ ছিলেন। কেরোসিনের দাবিতে বসিরহাটের ছাত্র আন্দোলন হলে পুলিশের গুলিতে নিহত হন নুরুল নামে এক ছাত্র। কেরোসিনের লাইন থেকে তিনি শহীদ হয়ে যান। প্রতিবাদে ফেটে পড়ল 24 পরগনার মানুষ। তার প্রতিবাদে নদীয়ার 'গণনাট্য সংস্থা' গান বাঁধলেন- 'ও নুরুলের মা' যা মানুষের ভাবাবেগকে সে সময় প্রবল ভাবে আলোড়িত করে। এটাই ছিল পশ্চিমবঙ্গের খাদ্য আন্দোলনের পটভূমি।এই পটভূমিতেই কৃষ্ণনগরের ঐতিহাসিক খাদ্য আন্দোলন সংগঠিত হয়। অংশগ্রহণ করেছিলেন কয়েক হাজার ছাত্র-যুব। সাংগঠনিক নেতৃত্ব দিয়েছিল পার্টির দ্বিতীয় ও তৃতীয় সারির নেতা কর্মীরা, আর রাজনৈতিক নেতৃত্ব দিয়েছিল মার্কসবাদ-লেলিনবাদ-মাও চিন্তা ধারা।

এরপর নদীয়ার বিশিষ্ট ছাত্র নেতা দিলীপ বাগচী উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর পড়াশোনা করতে যান ও উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন ইসু নিয়ে ছাত্র আন্দোলন শুরু করেন। কিন্তু তিনি নদীয়ার ছাত্র আন্দোলনকে সেখান থেকেই পরামর্শ দিতেন। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে দিলীপ বাগচী যখন পড়াশোনা করছেন তখন ঘটে নকশালবাড়ির বিখ্যাত কৃষক আন্দোলন। দিলীপ বাগচীও সেই কৃষক আন্দোলনে যোগ দেন উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের বেশ বড় একটা সংখ্যক ছাত্রদেরকে সঙ্গে নিয়ে। এছাড়া তাঁর ছাত্র আন্দোলনের আকর্ষণে নদীয়ার বেশ কিছু ছাত্রসহ পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে বহু ছাত্র বাড়িঘর ছেড়ে, লেখাপড়া বন্ধ করে নকশালবাড়ি কৃষক আন্দোলনের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন। ফলে অচিরেই নকশালবাড়ীর কৃষক আন্দোলন শুধু পশ্চিমবঙ্গ নয়, নদীয়াসহ সমগ্র ভারতে এক বামপন্থী সফল আন্দোলনের উদাহরণ হয়ে দাঁড়ায়। দিলীপ বাগচী নিজে উত্তরবঙ্গ থেকে দক্ষিণবঙ্গের কলেজগুলোতে ঘুরে ঘুরে

নকশালবাড়ির কৃষক আন্দোলনের খবর নিয়ে কলেজের গেটে মিটিং করতেন। প্রচার করতেন। কলেজের গেটে ভাষণ দিতেন। এইভাবে নদীয়াসহ সারা রাজ্যে বামপন্থী ছাত্র আন্দোলনের হাত ধরে বামপন্থার প্রসার হতে থাকে।

তথ্যসূত্র

১. দিলীপ বাগচী, *‘স্মৃতির জানলা থেকে মফ:স্বলের ছাত্র আন্দোলন ও আমি’*, শংকর সান্যাল ও তাপস চক্রবর্তী সংকলিত ও সম্পাদিত, “এক অসাধারণ সাধারণ মানুষ, দিলীপ বাগচীর জীবন ও স্মৃতি”, গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতি, কৃষ্ণনগর, দিলীপ বাগচী স্মারক গ্রন্থ, 2013, পৃষ্ঠা 139।

২. দিলীপ বাগচী, *‘স্মৃতির জানলা থেকে মফ:স্বলের ছাত্র আন্দোলন ও আমি’*, শংকর সান্যাল ও তাপস চক্রবর্তী সংকলিত ও সম্পাদিত, “এক অসাধারণ সাধারণ মানুষ, দিলীপ বাগচীর জীবন ও স্মৃতি”, গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতি, কৃষ্ণনগর, দিলীপ বাগচী স্মারক গ্রন্থ, 2013, পৃষ্ঠা 139।

৩. স্বাধীনতা, *চামটা মহিলা ক্যাম্পের পুলিশের লাঠি চালনার ও পলাশী ক্যাম্পে শিশুদের ডোল হ্রাসের প্রতিবাদে বিক্ষোভ প্রদর্শন*, কলকাতা, 25 জানুয়ারী, 1959, পৃ. 7।

৪. স্বাধীনতা, *পশ্চিমবাংলার বিভিন্ন কলেজ ইউনিয়ন নির্বাচনে ছাত্র ফেডারেশনের বিপুল জয়*, কলকাতা, 27 জানুয়ারী, 1959, পৃ. 7।

৫. স্বাধীনতা, *পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন স্থানে বিক্ষোভ, কলকাতা*, 4 আগষ্ট, 1959, পৃ. 4।

৬. স্বাধীনতা, *নদীয়া, কলকাতা*, ৪আগষ্ট, 1959, পৃ. 3।

৭. দিলীপবাগচী, *‘স্মৃতির জানলা থেকে মফ:স্বলের ছাত্র আন্দোলন ও আমি’*, শংকর সান্যাল ও তাপস চক্রবর্তী সংকলিত ও সম্পাদিত, “এক অসাধারণ সাধারণ মানুষ, দিলীপ বাগচীর জীবন ও স্মৃতি”, গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতি, কৃষ্ণনগর, দিলীপ বাগচী স্মারক গ্রন্থ, 2013, পৃষ্ঠা 140।

৮. দিলীপ বাগচী, *‘স্মৃতির জানলা থেকে মফ:স্বলের ছাত্র আন্দোলন ও আমি’*, শংকর সান্যাল ও তাপস চক্রবর্তী সংকলিত ও সম্পাদিত, “এক অসাধারণ সাধারণ মানুষ, দিলীপ বাগচীর জীবন ও স্মৃতি”, গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতি, কৃষ্ণনগর, দিলীপ বাগচী স্মারক গ্রন্থ, 2013, পৃষ্ঠা 141।

৯. দিলীপ বাগচী, *‘স্মৃতির জানলা থেকে মফ:স্বলের ছাত্র আন্দোলন ও আমি’*, শংকর সান্যাল ও তাপস চক্রবর্তী সংকলিত ও সম্পাদিত, “এক অসাধারণ সাধারণ মানুষ, দিলীপ বাগচীর জীবন ও স্মৃতি”, গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতি, কৃষ্ণনগর, দিলীপ বাগচী স্মারক গ্রন্থ, 2013, পৃষ্ঠা 145।

১০. দিলীপ বাগচী, *'স্মৃতির জানলা থেকে মফ:স্বলের ছাত্র আন্দোলন ও আমি'*, শংকর সান্যাল ও তাপস চক্রবর্তী সংকলিত ও সম্পাদিত, "এক অসাধারণ সাধারণ মানুষ, দিলীপ বাগচীর জীবন ও স্মৃতি", গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতি, কৃষ্ণনগর, দিলীপ বাগচী স্মারক গ্রন্থ, 2013, পৃষ্ঠা 146।

১১. দিলীপ বাগচী, *'স্মৃতির জানলা থেকে মফ:স্বলের ছাত্র আন্দোলন ও আমি'*, শংকর সান্যাল ও তাপস চক্রবর্তী সংকলিত ও সম্পাদিত, "এক অসাধারণ সাধারণ মানুষ, দিলীপ বাগচীর জীবন ও স্মৃতি", গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতি, কৃষ্ণনগর, দিলীপ বাগচী স্মারক গ্রন্থ, 2013, পৃষ্ঠা 148।

১২. স্বাধীনতা, *নদীয়াজেলায়,* কলকাতা, 19 আগষ্ট 1959, পৃ. 3।

১৩. নিতাইপদসরকার, *শ্রদ্ধেয় কমরেড সুশীল চ্যাটার্জি স্মরণে,* (সম্পাদনা: বাসু আচার্য, সুশীল চট্টোপাধ্যায় এক অনন্য কমিউনিস্ট বিপ্লবী), নবজাতক প্রকাশন, কলকাতা, জানুয়ারি 2021, পৃষ্ঠা 184।

১৪. ড: শুভজিৎ বিশ্বাস, *প্রসঙ্গ সুশীল চট্টোপাধ্যায়,* (সম্পাদনা: বাসু আচার্য, সুশীল চট্টোপাধ্যায় এক অনন্য কমিউনিস্ট বিপ্লবী), নবজাতক প্রকাশন, কলকাতা, জানুয়ারি 2021, পৃষ্ঠা 87।

১৫. নিতাইপদ সরকার, *হতদরিদ্র এক কৃষক সন্তানের আত্ম মর্যাদা প্রতিষ্ঠার লড়াই,* শঙ্খচিল, কোলকাতা, 20শে পৌষ, 1425 বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা 44।

১৬. নিতাইপদ সরকার, *হতদরিদ্র এক কৃষক সন্তানের আত্ম মর্যাদা প্রতিষ্ঠার লড়াই,* শঙ্খচিল, কোলকাতা, 20শে পৌষ, 1425 বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা 199।

১৭. স্বাধীনতা, *সোমবার কলিকাতা ও বিভিন্ন জিলায় 135 জন সত্যাগ্রহীর কারাবরণ,* কলকাতা, 13 জানুয়ারী, 1959, পৃ. 1 ও 4।

১৮. দিলীপ বাগচী, *'স্মৃতির জানলা থেকে মফ:স্বলের ছাত্র আন্দোলন ও আমি'*, শংকর সান্যাল ও তাপস চক্রবর্তী সংকলিত ও সম্পাদিত, "এক অসাধারণ সাধারণ মানুষ, দিলীপ বাগচীর জীবন ও স্মৃতি", গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতি, কৃষ্ণনগর, দিলীপ বাগচী স্মারক গ্রন্থ, 2013, পৃষ্ঠা 154।

১৯. তাপস চক্রবর্তী, *এক অসাধারণ সাধারণ মানুষ,* "এক অসাধারণ সাধারন মানুষ, দিলীপ বাগচীর জীবন ও সৃষ্টি", শংকর সান্যাল ও তাপস চক্রবর্তী সংকলিত ও সম্পাদিত, গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতি, কৃষ্ণনগর, দিলীপ বাগচী স্মারকগ্রন্থ, 2013, পৃষ্ঠা 11।

২০. তাপস চক্রবর্তী, *এক অসাধারণ সাধারণ মানুষ,* "এক অসাধারণ সাধারন মানুষ, দিলীপ বাগচীর জীবন ও সৃষ্টি", শংকর সান্যাল ও তাপস চক্রবর্তী সংকলিত ও সম্পাদিত, কৃষ্ণনগর, গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতি, দিলীপ বাগচী স্মারকগ্রন্থ, 2013, পৃষ্ঠা 11।

গিরিশচন্দ্র ঘোষের 'চন্দ্রা': সিপাহি বিদ্রোহ কেন্দ্রিক উপন্যাস

বাসব দাস
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ময়নাগুড়ি কলেজ

সারসংক্ষেপ : সিপাহি বিদ্রোহকে কেন্দ্র করে উনিশ শতকে যে কয়টি উপন্যাস রচিত হয়, গিরিশচন্দ্র ঘোষের 'চন্দ্রা' উপন্যাস তার মধ্যে অন্যতম। তরুণ সন্ন্যাসী সোমনাথের সঙ্গে চন্দ্রার সম্পর্ক, চন্দ্রা ও রমানাথের সম্পর্ক, রামচাঁদের পারিবারিক বিপর্যয় এই উপন্যাসের মূল বিষয়। তবে উপন্যাসের কেন্দ্রভূমিতে রয়েছে ১৮৫৭-র মহাবিদ্রোহ বা সিপাহি বিদ্রোহ। ঔপন্যাসিক উপন্যাসটিকে 'ঐতিহাসিক উপন্যাস' বলে উল্লেখ করলেও উপন্যাসটিকে আমরা 'ঐতিহাসিক উপন্যাস' বলতে পারিনা। বরং এটি একটি ইতিহাসাশ্রয়ী উপন্যাস। উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্রের শৈলী এবং 'আনন্দমঠ' উপন্যাসের বিশেষ প্রভাব লক্ষ করা যায়। সিপাহি বিদ্রোহকে নিয়ে রচিত বাংলা সাহিত্য দ্বিধা বিভক্ত। সমকালে বহু সাহিত্যিক এই বিদ্রোহকে সমর্থন জানাননি। বর্তমান প্রবন্ধে সিপাহি বিদ্রোহ সম্পর্কে গিরিশচন্দ্র ঘোষের মনোভাব এবং ঔপন্যাসিক হিসাবে গিরিশচন্দ্রের ভূমিকা 'চন্দ্রা' উপন্যাসের কাহিনি বিশ্লেষণের মাধ্যমে উপস্থাপন করবো।
মূল শব্দ : চন্দ্রা, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, সিপাহি বিদ্রোহ, মহাবিদ্রোহ, সাহিত্যে নানাসাহেব
মূল আলোচনা : ১২৯১ বঙ্গাব্দ অর্থাৎ ইংরেজির ১৮৮৪ খ্রিঃ 'কুসুমমালা' পত্রিকায় গিরিশচন্দ্র ঘোষের 'চন্দ্রা' উপন্যাসটি প্রকাশিত হয়। নট ও নাট্যকার হিসাবে সুপরিচিত গিরিশচন্দ্র ঘোষ উপন্যাস রচনার ক্ষেত্রে এক অভিনব দিক তুলে ধরেছেন। উপন্যাসের মাঝে একদিকে যেমন নিয়ে এসেছেন নাটকীয়তা, অন্যদিকে তেমনি নিয়ে এসেছেন সঙ্গীতময়তা। সঙ্গীতের ব্যবহার, আবহবর্ণনা কোথাও যেন উপন্যাসকে দৃশ্যকাব্যর পর্যায়ে পৌঁছে দিয়েছে। 'চন্দ্রা' উপন্যাসটি 'আনন্দমঠ' (১৮৮২) উপন্যাসের দুই বছর পরে রচিত। তাই এই উপন্যাসে কোথাও যেন সন্ন্যাসী বিদ্রোহের প্রভাব লক্ষ করা যায়। সিপাহি বিদ্রোহের নায়কদের মধ্যে আমরা সন্ন্যাসী কোনো ব্যক্তিকে বিশেষ খুঁজে পাইনা। কিন্তু গিরিশচন্দ্রের উপন্যাসে নানাসাহেবের চেয়েও বুদ্ধিমান, সাহসী, সর্বোপরি নেতা হিসাবে উঠে এসেছে সন্ন্যাসী চরিত্র সোমনাথ ও তার গুরু।

বঙ্কিম সমকালের ঔপন্যাসিকরা অধিকাংশই বঙ্কিমের রচনার মোহজালে বন্দী ছিলেন। ঔপন্যাসিক গিরিশচন্দ্রও তার ব্যতিক্রম নন। অধ্যায়ের সূচনায় ইংরেজি ও বাংলা উদ্ধৃতির ব্যবহার তার অন্যতম প্রমাণ। সেই সঙ্গে জ্যোতিষীর প্রসঙ্গ বা অলৌকিক ঘটনার সমাবেশ বঙ্কিম ও শেক্সপীয়ারের প্রভাব বলে ধরা যেতে পারে। তবে উপন্যাসের বিষয় নির্বাচনের ক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্র থেকে গিরিশচন্দ্র পৃথক। ১৮৫৭-র সিপাহি বিদ্রোহে ভারতীয় সিপাহি এবং ইংরেজদের সমর্থন বিষয়ে বাঙালি লেখকরা দ্বিধা বিভক্ত ছিলেন। হয়তো রাজরোষ বা বিদ্রোহের পদ্ধতি এর একটি বড় কারণ।

বঙ্কিম তার উপন্যাসে মহাবিদ্রোহকে বিষয় হিসাবে তুলে ধরেননি। গিরিশ ঘোষ সিপাহি বিদ্রোহকে নির্বাচন করলেও কাহিনিতে গুরুত্ব লাভ করেছে রামচাঁদের পরিবার ও তার অনুষঙ্গ ঘটনা। তবে ঐতিহাসিক ঘটনার সাহিত্যে প্রতিচ্ছবি আলোচনার ক্ষেত্রে 'চন্দ্রা' উপন্যাস যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ।

দশটি বিভাগে বিন্যস্ত গিরিশচন্দ্র ঘোষের 'চন্দ্রা' উপন্যাসের মূল পটভূমি হলো ১৮৫৭-র সিপাহি বিদ্রোহ। একারণে ঔপন্যাসিক স্বয়ং এই উপন্যাসকে 'ঐতিহাসিক উপন্যাস' বলে উল্লেখ করেছেন। উপন্যাসের কাহিনি শুরু হয়েছে সিপাহি বিদ্রোহের মোটামুটি সতেরো থেকে কুড়ি বছর আগে। এসময় ডাকাত বা ঠগি দস্যুদের একটা উন্মুক্ত রাজত্ব ছিলো। অন্যদিকে ইংরেজ কতৃক কৃষকদের শোষণের ফলে কৃষকদের দুরবস্থা দেখা গিয়েছিল। ফলে কৃষকদের মনে চাপা ক্ষোভ জমা হচ্ছিলো। এরসঙ্গে যুক্ত হয়েছে ইংল্যান্ডের শিল্প বিপ্লবের ফলে সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত ভারতীয় কুটির শিল্পী ও বিদ্রোহী ভারতীয় সিপাহিরা। তাই উপন্যাসের সূচনায় 'খুড়োর বিশেষ রোজগার ছিল না' কথাটি কোথাও যেন তৎকালীন সময়ের অর্থনৈতিক অবস্থাকে ইঙ্গিত করে। আবার ব্যঙ্গ করে ঔপন্যাসিক বলেছেন, 'চেহারার চটক' দেখিয়ে চাইলে সে রোজগার করতে পারতো। কিন্তু বাস্তবে কখনোই তা সম্ভব নয়। একারণে অভাবেই তার সংসার কাটতো।

খুড়ো অর্থাৎ রামচাঁদের সন্তানাদি ছিলোনা। ভাগ্যক্রমে শ্মশান ঘাটে নদীর তীরে এক পুত্র সন্তানকে লাভ করে রামচাঁদ। একজন রমণী পুত্র সন্তানকে গঙ্গায় বিসর্জন দিতে এসেছিল। এই সন্তানকে বাড়িতে নিয়ে এলে খুড়োর স্ত্রী শান্তা মাতৃস্নেহে তাকে কোলে তুলে নেয়। এই সন্তান প্রাপ্তিই উপন্যাসের জটিল আবর্তের সৃষ্টি করে। সমাজের চাপের কাছে নত হয়নি শান্তা ও রামচাঁদ। সন্তানকে তারা ত্যাগ করেনি। এমতাবস্থায় কলুটোলায় এক নবাবের বাড়ির চুরির কিনারা করতে গিয়ে ইচ্ছাকৃতভাবে পুলিশ রামচাঁদ খুড়োকে গ্রেপ্তার করে। এসময় শান্ত নীলরতন বাবুর সাহায্য চাইলে তিনিও সাহায্য করেননি। এদিকে পুলিশের প্রচণ্ড প্রহারের কাছে হার মেনে রামচাঁদ স্বীকার করে চুরির কথা। এরপর সুযোগ পেয়ে পুলিশের কয়েদ থেকে পালায় রামচাঁদ। এসময় ক্লান্ত রামচাঁদ একটি বাগানের পুকুর ধারে বসে রাতে ঘুমিয়ে যায়। এসময় বাগানের পাহারাওয়ালা রামচাঁদকে 'লাউ চোর' বলে ঘোষণা করে। চুরি এবং পুলিশ হেফাজত থেকে পালানোর অপরাধে ১৪ বছরের জেল হয় রামচাঁদের।

রামচাঁদের অবর্তমানে শান্ত ও তার কুড়িয়ে পাওয়া সন্তান হারাণ আশ্রয় নিয়েছিল নীলরতনের বাড়িতে। নীলরতনের স্ত্রী রেবতী হারাণকে হিংসা করতে শুরু করে। কারণ তার সন্তান রমানাথ প্রায়শই অসুস্থ হলেও হারাণ কখনো অসুস্থ হয়না। অবমাননা ও অপরের উচ্ছিষ্টকে অবলম্বন করে বড় হতে থাকে হারাণ। অন্যদিকে বাগানের ফুল তোলার অপরাধে প্রহার কিংবা রূপার গ্লাস চুরির জন্য সন্দেহ— এসব ঘটনা হারাণকে বিচলিত করে তোলে। হারাণ বুঝতে পারে যে স্বামীহারা, পরান্নভোজী মায়ের পক্ষে সম্ভব নয় তাকে রক্ষা করা। তাই নিজেকে রক্ষা করার তাগিদে পলায়ন

করে হারাণ এবং আশ্রয় নেয় সন্ন্যাসীর কাছে। এই সন্ন্যাসীই নীলরতনের সন্তান জন্মানোর জন্য কৃপা করেছিল।

রামরতনের খানসামা স্বরূপ সর্বদাই চেষ্টা চালাতো শান্ত ও তার পরিবারকে সমাজের সামনে অপদস্থ করতে। সেই লক্ষ্যে একসময় বাগানের আম চুরির দায় শান্তর ওপর চাপিয়ে, পরপুরুষের সঙ্গে সম্পর্ক রাখার মিথ্যা অভিযোগ এনে কলঙ্ক রটানোর চেষ্টা করে। সম্মান রক্ষার্থে সেই রাতেই বাড়ি ত্যাগ করে শান্ত। সকালে নদী তীরে সাক্ষাৎ হয় রমেশচন্দ্র ঘোষাল ও তার সন্তানহীন স্ত্রীর সঙ্গে। এরপর তাদের আশ্রয়ে ঠাঁই হয় শান্তর।

অন্যদিকে রামচাঁদ রাতে বাগানে ফিরে এসে শান্তকে খুঁজে পায়নি। সৎ পথে থেকেও এত হয়রানি ও বিপদ দেখে রামচাঁদ বিশ্বাস হারিয়ে ফেলে সমাজের ওপর। তাই শেষপর্যন্ত ডাকাতের দলে যোগ দেয় সে। ডাকাতি করতে গিয়ে ডাকাত সর্দার গুরুতর আহত হয়ে মারা গেলে সেই সম্পত্তির অধিকারী হয় রামচাঁদ। সেইসঙ্গে দলের সর্দার হিসাবে নিজেকে ঘোষণা করে।

এর পাঁচ বছর পর একদিন জলে ডুবে যাওয়া এক তরুণীকে উদ্ধার করে যুবক সন্ন্যাসী সোমনাথ। কিন্তু সোমনাথের সন্ন্যাসী গুরু তরুণী চন্দ্রার প্রতি অসন্তুষ্ট। একথা অনুধাবন করে চন্দ্রাকে সুস্থ করে তাকে তার বাড়িতে পৌঁছে দেয়। চন্দ্রা একসময় জানতে পারে সিপাহিদের উত্তেজিত করার অপরাধে এক সন্ন্যাসীর সন্ধান করছে ইংরেজরা। ইংরেজদের হাত থেকে সেসময় সোমনাথকে উদ্ধার করে চন্দ্রা এবং তাকে পালাতে সাহায্য করে।

উপন্যাসে সিপাহি বিদ্রোহের প্রসঙ্গ এসেছে অনেক পরে। আমরা বুঝতেও পারিনি যে, এটি একটি 'ঐতিহাসিক উপন্যাস'। তৃতীয় বিভাগে প্রথম সিপাহিদের প্রসঙ্গ এবং পঞ্চম বিভাগে নানাসাহেবের সশরীর উপস্থিতি ইতিহাসের সুর আনতে সাহায্য করেছে। যে সন্ন্যাসী নীলরতনের পুত্র লাভে সহায়তা করেছিল, সেই সন্ন্যাসী অর্থাৎ পরমানন্দ গোঁসাই নানাসাহেবকে ও অন্যান্য সিপাহিদের উৎসাহ যোগায় বিদ্রোহে। অন্যদিকে রমেশচন্দ্র ঘোষালের স্ত্রী পাগল হয়ে ঘুরে বেড়ায়। আর তাকে আশ্রয় দেয় এক ভিখারিনী।

রামচাঁদের কুড়ানো ছেলে হারাণই পরবর্তীকালে সোমনাথের নামে পরিচিত হয়েছিল। চন্দ্রাকে কেন্দ্র করে নীলরতনের পুত্র রমানাথ এবং সোমনাথের মধ্যে দ্বন্দ্ব চলে। চন্দ্রার বাড়িতে ডাকাতদের আক্রমণ হলে সোমনাথ ডাকাতদের সঙ্গে লড়াই করে ও আহত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়। রমানাথ চন্দ্রার বাড়িতে লুকিয়ে থাকায় তাকে চোর বলে গ্রেপ্তার করা হয়। রমানাথ চন্দ্রাকে ভালোবাসলেও চন্দ্রা সোমনাথকে পছন্দ করে। কিন্তু সোমনাথ সন্ন্যাসী হওয়ায় সে চন্দ্রার প্রেম প্রত্যাখ্যান করে।

কুড়নো সন্তানের খোঁজ দেবার প্রলোভন দেখিয়ে পরমানন্দ গোঁসাই সিপাহি বিদ্রোহে সহায়তার জন্য রামচাঁদকে পাশে চায়। কিন্তু রামচাঁদ গোপনে ইংরেজকেই সমর্থন করে। বেথুন সাহেবের স্কুলে গিয়ে সিপাহি বিদ্রোহের গোপন সংবাদ জানায়— **“জাঁদরেল সাহেব, যে বদমাস সন্ন্যাসী জেল হইতে পলাইয়াছিল, সে টালায় লুকাইয়া আছে। তাহাকে ধরুন, নহে সমস্ত সিপাহী খারাপ করিবে।**[১] কিন্তু রামচাঁদের কথা বিশ্বাস করেনি ইংরেজরা। এদিকে চন্দ্রা রামচাঁদের কথা শুনে দ্রুত ছুটে যায় সোমনাথকে রক্ষা করতে। শেষপর্যন্ত সোমনাথ পালিয়ে যায়। সোমনাথের খোঁজে চন্দ্রা প্রথমে এলাহাবাদ ও পরে বেনারস যায়। এসময় রামচাঁদের কাছে আটক হয় চন্দ্রা। রমানাথ সেখান থেকে চন্দ্রাকে উদ্ধার করে ও প্রেম নিবেদন করে। কিন্তু রমানাথের প্রেম গ্রহণ করেনি চন্দ্রা।

এসময় চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে বিদ্রোহের আগুন। ইংরেজরা বিদ্রোহী সিপাহিদের পরাস্ত করতে থাকে। বিদ্রোহে নেতৃত্ব দিতে গিয়ে মারা যায় পরমানন্দ গোঁসাই এবং রমানাথ। গোঁসাইয়ের স্ত্রী ‘ভিখারিনী’ সোমনাথকে জানায় চন্দ্রা তাকে ভালোবাসে। কিন্তু সোমনাথ সন্ন্যাসী হওয়ায় সে-কথায় বিচলিত হয়নি। চন্দ্রা বুঝেছিল রামচাঁদ ইংরেজের সমর্থক। তাই নানাসাহেবকে পালিয়ে যেতে বলে চন্দ্রা। রামচাঁদ সোমনাথকে হত্যা করতে উদ্যত হলে রামচাঁদের স্ত্রী ‘শান্ত’ এসে জানায় সোমনাথই হলো তাদের সন্তান হারাণ। এসময় নানাসাহেব গুলি করে হত্যা করে রামচাঁদকে। পরবর্তীতে ইংরেজরা সোমনাথকে গুলি করলে চন্দ্রা সোমনাথের সামনে দাঁড়িয়ে সেই গুলিতে আহত হয়। সোমনাথ গ্রেপ্তার হয়। পরবর্তী সময়ে ইংরেজ প্রশাসন জানতে পারে বিবিঘর হত্যায় সোমনাথ মেমসাহেবদের বাঁচানোর চেষ্টা করেছিল। তাই চন্দ্রার অনুরোধে এবং লর্ড ক্যানিং-র দয়ায় সোমনাথ কারামুক্ত হয়। উপন্যাসের সমাপ্তিতে সোমনাথ ও চন্দ্রার পরস্পরের মিলন না হলেও তারা তাদের প্রকৃত পিতা-মাতার সন্ধান লাভ করে।

উপন্যাসের কাহিনিতে এই সুদীর্ঘ আলোচনায় আমাদের কখনো মনে হয়না যে এটি একটি ঐতিহাসিক উপন্যাস। যদিও গিরিশচন্দ্র ঘোষ স্বয়ং এই উপন্যাসটিকে ‘ঐতিহাসিক উপন্যাস’ বলে উল্লেখ করেছেন। শুদ্ধসত্ত্ব বসু ঐতিহাসিক উপন্যাস সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে লিখেছেন— **“ঐতিহাসিক উপন্যাসে ইতিহাসের নির্ভুল তথ্য উপস্থাপনাই লেখকের শুধু কাজ নয়, লেখক অতীতের জীবনসত্য ও যুগলক্ষ্মণটিকেও ব্যক্ত করতে প্রয়াসী হন; ছোটোখাটো অনেক জায়গাতেই তাঁকে কল্পনাশ্রয়ী হতে হয়, তবে সেই কল্পনার সম্ভাব্যতা থাকা চাই।”**[২] ‘চন্দ্রা’ উপন্যাসের প্রেক্ষাপটে সিপাহি বিদ্রোহ থাকলেও এখানে প্রাধান্য পেয়েছে রামচাঁদের পারিবারিক সমস্যা এবং চন্দ্রা- সোমনাথ-রমানাথের ত্রিকোণ প্রেম। ঐতিহাসিক চরিত্র হিসাবে নানাসাহেব, তাঁতিয়া টোপি, লর্ড ক্যানিং-কে আনা হয়েছে ঠিকই কিন্তু চরিত্রগুলি জীবন্ত হয়ে ওঠেনি। উপন্যাসে তারা গৌণ চরিত্র। রবীন্দ্রনাথ যে ‘ঐতিহাসিক রস’-র কথা বলেছিলেন, সেটিও এই উপন্যাসে

পাওয়া যায়না। তাই গিরিশচন্দ্র ঘোষের 'চন্দ্রা' উপন্যাসকে আমরা ঐতিহাসিক রোমান্স বলতে পারি। ইতিহাস এখানে প্রেম ও কল্পনার কাছে ছোটো হয়ে গেছে।

উপন্যাসে প্রত্যক্ষ ইতিহাস উঠে এসেছে চর্বিমিশ্রিত কার্তুজের ঘটনার মাধ্যমে— **"যখন ম্লেচ্ছ ভয়ে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় দন্তে 'কারতুজ' কাটিবে – কাঁদিতে কে সাহস করিবে?"**[৩] বলাবাহুল্য সিপাহি বিদ্রোহের জন্য অধিকাংশ মানুষ এই কার্তুজের ঘটনাকেই দায়ী করে থাকে। কিন্তু কেবলমাত্র কার্তুজ নয়; সেনাবাহিনিতে পদোন্নতি বিষয়ে বৈষম্যতার কারণে সিপাহিদের মধ্যে ক্ষোভ জন্মেছিল। অধিকাংশ সিপাহিরা কৃষিজীবী পরিবারের সন্তান ছিল। তাই কৃষকের ওপর অতিরিক্ত শুল্ক ধার্য করায় কৃষকরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। তার প্রভাব পড়েছিল সিপাহিদের মনে। এসময় স্বত্ত্ববিলোপ নীতি প্রয়োগ করে ইংরেজ সরকার বহু রাজ্য দখল করেছিল। ফলে এই রাজ্যগুলির শাসকরা সিপাহিদের সমর্থন জানিয়েছিল। উপন্যাসে ইংরেজ কতৃক বিভিন্ন অঙ্গরাজ্য অধিকারের ইতিহাস বৃত্তান্তকে ছুঁয়ে গেছেন গিরিশচন্দ্র—

ক) **"সেতারা রাজ্য বলপূর্ব্বক অধিকার করিল"**

খ) **"সর্ব্বগ্রাসী শ্বেত রাক্ষস যখন নাগপুর গ্রাস করিল, হিন্দুর চির প্রচলিত প্রথা ধ্বংস হইল"**

গ) **"ঝাঁসী যখন পদতলে দলিল, প্রজার হাহাকারে গগন বিদীর্ণ হইল"**

ঘ) **"কুবের পুরী অযোধ্যা ভিক্ষুকাগার হইল"**[৪]

সিপাহি বিদ্রোহ সিপাহিদের স্বতঃস্ফুর্ত বিদ্রোহ হলেও সিপাহিদের মধ্যে কেউ নেতা হয়ে উঠতে পারেনি। নেতা হয়ে উঠেছিল অঙ্গরাজ্যের শাসকরা। 'চন্দ্রা' উপন্যাসে বিঠুরের নানাসাহেবকে উপস্থাপন করা হয়েছে। তবে গিরিশচন্দ্র নানাসাহেবকে যেভাবে উপস্থাপন করেছেন, তাতে বোঝা যায় যে ঔপন্যাসিক সিপাহি বিদ্রোহকে সমর্থন করেননি। পঞ্চম বিভাগের প্রথম পরিচ্ছেদে নানাসাহেবকে প্রত্যক্ষভাবে দেখা যায়। কিন্তু এই নানাসাহেব ব্যাভিচারী। ইংরেজদের সঙ্গে তাকে মদ্যপানের অনুষ্ঠানে অংশ নিতে দেখা যায়। পরমানন্দ গোঁসাই বুঝেছিল, লর্ড সাহেবকে হত্যা করার লক্ষে নানাসাহেব এসকল কাজ করেছে। পরমানন্দ গোঁসাই নানাসাহেবকে উৎসাহিত করেছিল প্রাদেশিক রাজ্য একজোট হয়ে ইংরেজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে। শেষপর্যন্ত আজিমউল্লার পরামর্শক্রমে নানাসাহেব গোঁসাইকে সাহায্য করতে সম্মত হয়। নানাসাহেবের জীবনের সবচেয়ে কলঙ্কিত অধ্যায় হলো বিবিঘর হত্যা। সোমনাথ মেমসাহেবদের পালাতে সাহায্য করলেও শেষরক্ষা হয়নি। অসংখ্য ইউরোপীয় নারী ও শিশুকে হত্যা করা হয়— **"বিবিঘরের বন্দিদের হত্যা করে একটা কূপের মধ্যে ফেলে দেওয়া হয়েছিল।"**[৫] তবে প্রমোদ সেনগুপ্ত প্রমাণ করেছেন যে ঐ হত্যাকাণ্ডের সময় নানাসাহেব উপস্থিত ছিলোনা। গিরিশচন্দ্র যে ইতিহাসকে তুলে ধরেছেন তা ইংরেজের লেখা বিকৃত ইতিহাস। তবে ইংরেজরা সংবাদপত্র এবং ইতিহাস গ্রন্থে যা দেখিয়েছিলেন

তা-ই বিশ্বাস করেছিল ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষ। ফলে বাঙালি বুদ্ধিজীবীরা সেসময় সিপাহি বিদ্রোহকে সমর্থন করা নিয়ে দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়ে। গিরিশচন্দ্র ঘোষ এক্ষেত্রে কিছুটা মধ্যপন্থা, আবার কোথাও ইংরেজদের পক্ষ অবলম্বন করেছিলেন। এজন্য নানাসাহেবকে খল চরিত্র বানিয়ে উপন্যাসের শেষে গুলি চালিয়েছেন। যাতে রামচাঁদ মারা যায়।

উপন্যাসে সোমনাথ বা হারাণ একটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র। সোমনাথ হলো পরমানন্দ গোঁসাইয়ের শিষ্য তথা সন্ন্যাসী। সোমনাথ সিপাহি বিদ্রোহকে সমর্থন করে এবং ইংরেজের বিরুদ্ধে যুদ্ধে সে নেতৃত্ব দিয়েছে। পাণ্ডু নদীর তীরে সিপাহিদের নেতৃত্ব দিয়েছিল সোমনাথ। সোমনাথের এই সংগ্রামের উদ্দেশ্য ছিলো দেশপ্রেম। যদিও নানাসাহেবের মতো সে অসহায় ইউরোপীয় মহিলাদের বন্দী ও হত্যা করার কথা ভাবেনি। বরং তাদের পালাতে সাহায্য করেছিল সে। এজন্য লর্ড ক্যানিং তাকে ক্ষমা করেছিল। অন্যদিকে চন্দ্রা ইংরেজদের কাছের লোক হয়েও সোমনাথকে সাহায্য করেছিল। এক্ষেত্রে সোমনাথের প্রতি চন্দ্রার ভালোবাসা প্রধান কারণ ছিলো। সোমনাথকে রক্ষা করতে বা পালাতে সাহায্য করেছিল চন্দ্রা। কিন্তু ইংরেজদের হত্যার ঘটনার সঙ্গে চন্দ্রার সরাসরি কোনো সম্পর্ক ছিলোনা। উপন্যাসের শেষে চন্দ্রা ও সোমনাথের মিলন হয়নি। মিলন নয়, বিচ্ছেদেই যেন চন্দ্রার প্রেম সার্থক হয়েছে। চন্দ্রা কোনো ঐতিহাসিক চরিত্র নয়। তবে উপন্যাসের নায়িকা বা নামকরণের ক্ষেত্রে গিরিশ ঘোষ তাকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। তাই চন্দ্রার মুখেই যেন ঔপন্যাসিকের মনের কথা উঠে এসেছে। সোমনাথকে চন্দ্রা বলেছে— **"তুমি কি ভাব, স্বাধীনতার সময় আসিয়াছে? ইংরাজের ক্ষমতা অবগত নও। এখনও সে দিন উপস্থিত হয় নাই, এ কথা কি বুঝ না?"**[৬] সিপাহিদের বিদ্রোহ যে সময়োপযোগী এবং সুচিন্তিত ছিলোনা, চন্দ্রার এই মন্তব্য তার প্রমাণ।

'আনন্দমঠ' (১৮৮২) উপন্যাসের প্রভাব 'চন্দ্রা' (১৮৮৪) উপন্যাসে পড়েছে বলে গবেষকরা মনে করেন। ড. শঙ্করপ্রসাদ চক্রবর্তী এ প্রসঙ্গে লিখেছেন— **"বিদ্রোহী সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের দেশপ্রেম, মাতৃভক্তি এবং ব্যর্থতা বাঙালি মনে গভীর রেখাপাত করে। গিরিশচন্দ্রও তার ব্যতিক্রম নয়।"**[৭] 'আনন্দমঠ' উপন্যাসে সন্ন্যাসীদের নেতৃত্বে বিদ্রোহের কথা রয়েছে। আর 'চন্দ্রা' উপন্যাসেও সিপাহি বিদ্রোহকে নেতৃত্ব দিয়েছে পরমানন্দ গোঁসাই, সোমনাথ প্রমুখ। সন্ন্যাসী হয়েও প্রত্যক্ষ বিদ্রোহে অংশ নিয়েছে তারা। যুবক সন্ন্যাসীর গানে উঠে এসেছে দেশপ্রেমের কথা—

"উঠ, উঠ, উঠ – কি কর কি কর,
ধর ধর ধর, ধর আসি ধর,
মাতৃভূমি জর জর জর,
ধিক ধিক ধিক প্রাণে।"[৮]

'আনন্দমঠ' উপন্যাসের শেষে ইংরেজদের গুণগান করা হয়েছে। সেই সঙ্গে ভারতীয়দের অবক্ষয়ের কথা বলা হয়েছে— **"সনাতন ধর্ম্মের পুনরুদ্ধার করিতে গেলে, আগে বহির্বিষয়ক জ্ঞানের প্রচার করা আবশ্যক। এখন এদেশে বহির্বিষয়ক জ্ঞান নাই— শিখায় এমন লোক নাই; আমরা লোকশিক্ষায় পটু নহি। অতএব ভিন্ন দেশ হইতে বহির্বিষয়ক জ্ঞান আনিতে হইবে। ইংরেজ বহির্বিষয়ক জ্ঞানে অতি সুপণ্ডিত, লোকশিক্ষায় বড় সুপটু।"**[৯] অন্যদিকে 'চন্দ্রা' উপন্যাসেও ক্যানিং-র মহত্ত্ব দেখানো হয়েছে— **"কাউন্সিলের মেম্বরেরা বিরুদ্ধে তক্তা তক্তা কাগজ লিখিতেছে। কিন্তু দয়াবান ক্যানিং অটল! তিনি শরণাগতকে ক্ষমা করিবেন।"**[১০]

গিরিশচন্দ্র ঘোষ উনিশ শতকের প্রখ্যাত নাট্যকার। কিন্তু তার উপন্যাসে নাটকীয় দ্বন্দ্ব দেখানো হয়নি, চরিত্রদের মনস্তত্ত্বও ফুটে ওঠেনি। আসলে সেসময়ের উপন্যাসে মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণের ব্যবহার দেখা যায়নি। ঘটনার বর্ণনার মাধ্যমে চরিত্রদের মানসিক অবস্থার কথা তুলে ধরা হতো। গিরিশচন্দ্রও সেই রীতি গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু কোনো চরিত্রই ফুটে ওঠেনি। চরিত্রের চেয়ে বড় হয়ে উঠেছে উপন্যাসের কাহিনি। 'চন্দ্রা' উপন্যাসের কাহিনি জটিল। অতিরিক্ত চরিত্র এবং অসংখ্য উপকাহিনির সমাবেশে মূল কাহিনি জটিল হয়ে পড়েছে। ফলে উপন্যাসের বিষয় যে ইতিহাস, তা অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়েছে। বিবিঘরের ঘটনা, সিপাহিদের যুদ্ধের বর্ণনা পূর্ণতা লাভ করেনি। তা কেবল ছুঁয়ে গেছেন মাত্র। সোমনাথ ছাড়া অন্য কোনো বিদ্রোহী সিপাহি চরিত্রকে তুলে ধরা হয়নি। প্রকৃতপক্ষে মহাবিদ্রোহ বা ১৮৫৭-র সিপাহি বিদ্রোহে ভারতীয়দের যে পরাজয় হয়েছিল, তার প্রধান কারণ ছিলো নেতৃত্বের অভাব। একসময় দিল্লির শেষ মোঘল সম্রাট বৃদ্ধ বাহাদুর শাহকে নেতা মেনে লড়াই করেছিল সিপাহিরা। সে কথা উপন্যাসে উল্লেখ করেছেন ঔপন্যাসিক— **"দিল্লীর বাদশার অনুমতি অনুসারে বকরিদের দিন কলিকাতায় সমস্ত মুসলমান মিলিয়া কেল্লা আক্রমণ করিবে।"**[১১] বাদশাহ, প্রাদেশিক রাজা, জমিদারের প্রতি ক্ষোভ ছিলো সাধারণ মানুষের। কিন্তু বাদশাহ – রাজারা যখন আন্দোলনের নেতা হয়ে ওঠে, তখন সাধারণের সমর্থন হারায় এই বিদ্রোহ।

গিরিশচন্দ্র প্রধানত নাট্যকার। কিন্তু নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ঔপন্যাসিক গিরিশচন্দ্রকে গ্রাস করে ফেলেনি। গিরিশচন্দ্র বঙ্কিম সমকালের লেখক হওয়ায় বঙ্কিমের প্রভাব 'চন্দ্রা' উপন্যাসে লক্ষ করা যায়। বঙ্কিমের উপন্যাসের মতো প্রতিটি পরিচ্ছেদের সূচনায় বিভিন্ন গ্রন্থের উদ্ধৃতি দিয়ে গিরিশচন্দ্র বর্ণনা শুরু করেছেন এবং উদ্ধৃতির সঙ্গে সাযুজ্য রেখেই কাহিনি রচনা করেছেন। 'আনন্দমঠ' উপন্যাসের মতো 'চন্দ্রা'তেও গান রয়েছে। তবে 'চন্দ্রা' উপন্যাসের গান 'আনন্দমঠ' উপন্যাসের 'বন্দেমাতরম'-র মতো আবহ সঙ্গীত হয়ে ওঠেনি। তবে নাট্যকারের মতো গানের রাগ ও তালের উল্লেখ করেছেন। উপন্যাসের ভাষা সাধু গদ্যে হলেও এই ভাষা চলিতের অনেকটা কাছাকাছি।

রূপবর্ণনার ক্ষেত্রে বঙ্কিম যেমন সংস্কৃত সাহিত্য অনুসারী ছিলেন, গিরিশ ঘোষ আলোচ্য উপন্যাসে সে পথে চলেননি।

প্রসন্নময়ী দেবীর 'অশোকা' যেমন সিপাহি বিদ্রোহের প্রেক্ষাপটে লেখা একটি ঐতিহাসিক রোমান্স। 'চন্দ্রা' উপন্যাসও অনুরূপ। তবে 'চন্দ্রা' উপন্যাসে ভারতের বিশাল প্রেক্ষাপটকে তুলে ধরা হয়েছে। গিরিশ ঘোষ উপন্যাস রচনায় অধিক আগ্রহ দেখাননি। তবে 'চন্দ্রা' উপন্যাস সিপাহি বিদ্রোহ কেন্দ্রিক রচনা হিসাবে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। যথার্থ ঐতিহাসিক উপন্যাস না হলেও, উপন্যাসটির ঐতিহাসিক মূল্য যথেষ্ট।

তথ্যপঞ্জি :

১. গিরিশচন্দ্র ঘোষ, চন্দ্রা, গিরিশ রচনাবলী, পঞ্চম খণ্ড, সাহিত্য সংসদ, কলিকাতা-৯, তৃতীয় মুদ্রণ- এপ্রিল- ২০০২, পৃষ্ঠা- ১৫১

২. শুদ্ধসত্ত্ব বসু, বাংলা সাহিত্যের নানা রূপ, মাইতি বুক হাউস, কলকাতা- ৭৩, দশম মুদ্রণ, মে-২০১৮, পৃষ্ঠা- ১৪৭

৩. গিরিশচন্দ্র ঘোষ, চন্দ্রা, পৃষ্ঠা- ১২৭

৪. তদেব, পৃষ্ঠা- ১২৭

৫. প্রমোদ সেনগুপ্ত, নানাসাহেব, ভারতীয় মহাবিদ্রোহ, সুবর্ণরেখা, কলিকাতা- ৯, দ্বিতীয় পরিবর্ধিত সুবর্ণরেখা সংস্করণ- ২০১৪, পৃষ্ঠা- ৩২৬

৬. গিরিশচন্দ্র ঘোষ, চন্দ্রা, পৃষ্ঠা- ১৩৪

৭. ড. শঙ্করপ্রসাদ চক্রবর্তী, বঙ্গসাহিত্যে মহাবিদ্রোহ, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা-৯, প্রথম প্রকাশ- জানুয়ারি- ২০০৮, পৃষ্ঠা- ২৯৯

৮. গিরিশচন্দ্র ঘোষ, চন্দ্রা, পৃষ্ঠা- ১২৭

৯. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, আনন্দমঠ, বঙ্কিম রচনাবলী (উপন্যাস সমগ্র), বসাক বুক স্টোর প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা- ৭৩, তৃতীয় প্রকাশ- ২০০৫, পৃষ্ঠা- ৭৭৪

১০. গিরিশচন্দ্র ঘোষ, চন্দ্রা, পৃষ্ঠা- ১৭১

১১. তদেব, পৃষ্ঠা- ১৪৮

কালের প্রতিমা, নির্মাণ বিনির্মাণ সুবোধ ঘোষের ছোটোগল্প

তপন কুমার মণ্ডল
বাংলা বিভাগীয় প্রধান,
বহড়াগোড়া কলেজ, বহড়াগোড়া, ঝাড়খণ্ড

সংকেত শব্দ/কুঞ্জিভূত শব্দ :দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, গণবিক্ষোভ, দাঙ্গা, দেশভাগ, সুবোধ ঘোষের ছোটোগল্প।

চল্লিশের দশকের রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অস্থিরতার কালে সুবোধ ঘোষের ছোটোগল্প রচিত হয়েছে। যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, দাঙ্গা, দেশভাগ, স্বাধীনতাপ্রাপ্তি, উদ্বাস্তু স্রোতের ধাক্কায় বাংলার সমাজজীবন যে নতুন খাতে প্রবাহিত হয়েছিল; অর্থনৈতিক ভাঙনের ধারায় জীবনের শ্রদ্ধা, বিশ্বাস, মূল্যবোধ, শান্তি ও স্থিতির বিনষ্টি ঘটেছিল, ব্যক্তির অস্তিত্বের চেতনা এবং শূন্যতাবোধ জেগে উঠেছিল— সেই কালের প্রেক্ষাপটে সুবোধ ঘোষের ছোটোগল্পের প্রতিমা নির্মিত হয়েছে; গল্প বিষয়ের ব্যতিক্রমী উপস্থাপনা, বিষয়বস্তুর নির্বাচন-বৈচিত্র্য, আঙ্গিক— এককথায় রূপ ও রীতির রূপান্তরণের মধ্য দিয়ে। গল্পকার সুবোধ ঘোষের বিস্তৃত জীবন অভিজ্ঞতা, অধ্যবসায়, চিন্তা, দৃষ্টিভঙ্গি ও জীবনবোধ ছোটোগল্পগুলিতে ভিন্নমাত্রা দান করেছে। সমরজনিত সমস্যার সঙ্গে সঙ্গে একটা বৃহৎ জীবনজিজ্ঞাসা সুবোধ ঘোষের ছোটোগল্পে কালের প্রতিমা নির্মাণ করতে ততোধিক সফল হয়েছে। যুদ্ধ কিংবা যুদ্ধজনিত সমস্যার প্রতিচিত্র নয় বরং তাঁর ছোটোগল্পগুলিতে যুদ্ধ একটি জীবনদর্শনে পৌঁছাবার সোপান হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। তাই সমসাময়িক গল্পকারদের তুলনায় সুবোধ ঘোষ অনন্য— 'বহুর সান্নিধানে থেকেও একক।'(১) এ-কালের প্রবাদপ্রতীম স্বর্গীয় অধ্যাপক শ্রদ্ধাস্পদ ড. উজ্জ্বলকুমার মজুমদার মহাশয় বলেছেন— "যদিও যুদ্ধ, মন্বন্তর, গণআন্দোলন এবং দাঙ্গা, দেশ-বিভাগ এই সবের মধ্যেই মানুষের মূল্যবোধ ভাঙার ছবি আছে, মূল্যবোধকে আঁকড়ে ধরার ছবিরও প্রমাণ অনেক।(২) বাংলা ছোটোগল্পে কালের প্রতিমা নির্মাণের ইতিহাসে সুবোধ ঘোষের অবস্থান ও পরিচয় যতটা না মূল্যবোধ ভাঙার বাস্তব অভিজ্ঞতায় ততোধিক মূল্যবোধকে আঁকড়ে ধরার দৃষ্টিভঙ্গিমায় সমুজ্জ্বল। প্রথমধারার গল্পলেখকগণ হলেন; অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, পরিমল গোস্বামী, মনোজ বসু, সরোজ রায়চৌধুরী, অচিন্ত্য সেনগুপ্ত, প্রবোধ সান্যাল, শচীন সেনগুপ্ত, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, নবেন্দুভূষণ ঘোষ, সোমনাথ লাহিড়ী, সুশীল জানা প্রমুখ। অন্যান্যদের তুলনায় সুবোধ ঘোষের দৃষ্টিভঙ্গি তাই অনেক বেশি সুদূরপ্রসারী ও প্রাসঙ্গিক।

বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানের সবচেয়ে বড়ো দান যন্ত্রের আবিষ্কার। আজ তাকে জগৎ-কল্যাণের বিপরীতে ধ্বংসের কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে। শুরু হয়েছে বিশ্বসমর। সাম্রাজ্যবাদী দম্ভ বন্দুক তুলেছে। যন্ত্রে আরূঢ় হয়ে সমবেত হয়েছে নাৎসি বাহিনী। অন্যদিকে পঞ্চ প্রহরণে সজ্জিত হয়েছে সোভিয়েত রুশের রক্তচক্ষু। করাল নরমেধের আয়োজনে বিংশ শতাব্দী শিউরে উঠেছে। তখন 'যন্ত্র'কেদানব বলেই হওয়াটা খুবই স্বাভাবিক। সুবোধ ঘোষ যন্ত্র সম্বন্ধে নতুন দর্শনের কথা শোনালেন, প্রতিবাদ করলেন 'যন্ত্রদানব' কথাটার বিরুদ্ধে। ''বাংলাসাহিত্যে 'যন্ত্রদানব' নামে একটা কথার খুবই চলন হয়েছে। কোন মনীষী প্রথম এ-শব্দটি ব্যবহার করেছেন জানি না। যিনিই করে থাকুন, এর জন্য তিনি প্রশংসা পাবেন না, কারণ, এই কথাটার ভেতর সবচেয়ে জঘন্য কুসংস্কার আশ্রয় করেছে। বলতে গেলে এর চেয়ে বড় কুসংস্কার আর বোধহয় নেই। সমস্ত সভ্য মানুষের প্রগতিশীল ফিলোসফিকে কবর দেবার একটা মূঢ় সনাতনী অপচেষ্টার পরিচয় এই যন্ত্রদানব কথাটির মধ্যে নিহিত রয়েছে।''[৩] '*** যন্ত্রের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের মাধুর্য আধুনিক বুর্জোয়া সাহিত্যিকের অনুভবের বাইরে। ঠিক যারা যন্ত্রজীবী বা যন্ত্রশ্রমিক তারা কিন্তু যন্ত্রকে এর মধ্যে ভালোবাসতে শুরু করেছে। পশুপক্ষীর যতই গুণগরিমা থাক তবুও সে পর। তারা মানুষের প্রতিবেশী। মানুষ তাকে সৃষ্টি করেনি। অপরদিকে যন্ত্র মানুষের নিজের জ্ঞানজ সন্তান। বিংশ শতাব্দীর এতবড়ো একটি মহান সৃষ্টির গৌরব একান্তভাবে মানুষের নিজস্ব। এই যন্ত্র-সন্তানের সেবার মূল্য উপলব্ধি করে তাকে উপযুক্ত মর্যাদা দিয়ে বিংশ শতাব্দীর ফিলোসফিতে নতুন একটি মরাল সৃষ্টির সময় এসেছে।''[৪]—গল্পকার সুবোধ ঘোষ 'অযান্ত্রিক' গল্পটি লিখে একথাই প্রমাণ করতে চেয়েছেন। সমালোচকের ভাষায়, 'অযান্ত্রিকে যন্ত্রযুগ যেন কথা কয়ে উঠল'।[৫] অপরজন বলেছেন, 'যন্ত্র মানবতাই গল্পের রস'।[৬] এই গল্পে শ্রেষ্ঠ হয়ে উঠেছে— যন্ত্রের প্রতি মানুষের মানবিক আচরণ। কাজেই অযান্ত্রিক গল্পে যন্ত্র আর যন্ত্র থাকেনি। মানুষের 'জ্ঞানজসন্তান' মানুষেরই রক্ত লালিত আবেগ, বেদনায়, স্নেহে, মমতায়, ক্ষোভে, দুঃখে মানুষের সঙ্গে একাকার হয়ে ফুটে উঠেছে। আমরা ভুলে গেছিলাম মানবসভ্যতা সৃষ্টির আদিম কথাগুলি : "There is no tool without man and no man without tool; they came into being simultaneously and are indissolubly linked to one another."[৭] 'অযান্ত্রিক' গল্পের প্রধান শ্রমিকচরিত্র বিমল ও তার একমাত্র রুজিরোজগারের বাহন ফোর্থগাড়ি জগদ্দল আত্মিক সম্পর্কে বিধৃত। বেঙ্গলি ক্লাবের কটাক্ষের প্রত্যুত্তরে বিমল জবাব দিয়েছে— ''আমিও যন্ত্র। বেঙ্গলী ক্লাব বলেছে ভাল।... কিন্তু জগদ্দলও যে মানুষের মত, এ তত্ত্ব বেঙ্গলী ক্লাব বোঝে না... এই কম্পিটিশনের বাজারে এই বুড়ো জগদ্দলই দিন গেলে নিদেন দুটি টাকা তার হাতে তুলে দিচ্ছে। আর তেল খায় কত কম। গ্যালনে সোজা বাইশটি মাইল দৌড়ে যায়। বিমল গরীব— জগদ্দল যেন এটুকু বোঝে।'' গল্পে বিমলের শুধু জগদ্দলের

প্রতি নির্ভরতা প্রকাশই নয়; আনুগত্য, কৃতজ্ঞতা, সংবেদনশীলতা, সহমর্মিতা, বন্ধুবৎসলতা একান্ত হয়ে ফুটে উঠেছে। তাই গল্পটির প্রতিমা নির্মাণ সার্থক ও দর্শনস্থানীয় হয়ে উঠেছে। সমাজতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী সুবোধ ঘোষ এখানে শ্রম আর শ্রমশক্তি উৎপাদনের সামগ্রী— উভয়কেই মানবিক মূল্যবোধে সমুজ্জ্বল করে গল্পের প্রতিমা নির্মাণ করতে সক্ষম হয়েছেন। তাছাড়া, "গল্পতে যে ড্রাইভারের চরিত্রটা বিমল, ঐ নামে ওঁর (সুবোধ ঘোষ) এক বন্ধুর সত্যিই একটা খুব ভাঙা গাড়ি ছিল।"[৮] বাস্তব অভিজ্ঞতা।

একই সময়ে রচিত এবং প্রকাশিত 'ফসিল' গল্পে (অগ্রণী, ষষ্ঠ সংখ্যা, জুন ১১৪০) সুবোধ ঘোষ শ্রমিকশ্রেণির পরাজয়ের কথা অত্যন্ত সমবেদনার সঙ্গে চিত্রিত করেছেন; যদিও এই গল্পের পটভূমি অঞ্জনগড় তবু তার প্রতিমা নির্মাণে আসামের নেফা অঞ্চলের অভিজ্ঞতা কার্যকরী হয়েছে। লেখকের সাংবাদিকতা সূত্রে 'টাস্কারের নিস্ফল প্রয়াস : নেফায় সড়ক নির্মাণে অযত্ন' শীর্ষক প্রতিবেদনে উল্লেখ আছে : মজুরদের অমানুষিক মৃত্যু, জঙ্গলের মধ্যে সৈনিকের লাশ পড়ে থাকা, গহ্বরের উল্লেখ, সাধারণ মানুষের প্রতি সমবেদনা, পলিটিক্যাল অফিসারের অসহায়তা ইত্যাদি। গল্পটিতে সামন্ততন্ত্র তথা ফিউডাল দেমাক আর ধনতন্ত্র তথা ক্যাপিটালিস্ট বণিকের স্বার্থচরিতার্থতার শিকার হতে হয়েছে শ্রমিকশ্রেণিকে। গল্পে শ্রমিক নেতা দুলাল মাহাত'র নেতৃত্বে নিজেদের অধিকার বুঝে নেওয়ার প্রসঙ্গ মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। দু-পক্ষই ভীত। এদিকে সিন্ডিকেটের ঔদ্ধত্য বেড়েছে। সামন্তরাজার পরমায়ু কমার সম্ভাবনা। এমতাবস্থায় ধস নেমেছে মার্চেন্টদের খনিতে আর ওদিকে মহারাজার ফৌজদার বন্দুকের গুলিতে জঙ্গলে বাইশজন কুর্মি প্রজাকে মেরে ফেলেছে। ফলে যা হবার তা হল। জান বাঁচাতে সামন্তরাজা ধসে যাওয়া খনির গর্ভে শ্রমিকদের লাশগুলিকে চিরকালের জন্যে বিসর্জন দিল। "ক্ষুধার্ত খনির গহ্বরের মুখে লাশগুলি তুলে দিয়ে দারোয়ানেরা ভুজ্যি চড়িয়ে দিল একে একে," শাসক শ্রেণির লোভ, নৃশংসতা; শোষণের সমস্ত চিহ্নকে লোপাট করতে। কিন্তু সত্যিই কি মুছে গেল শোষণের চিহ্ন? এখানেই গল্পটির প্রতিমা নির্মাণ সার্থক হয়ে ফুটে উঠেছে : "লক্ষ বছর পরে এই পৃথিবীর কোনো একটা জাদুঘরে, জ্ঞানবৃদ্ধ প্রত্নতাত্ত্বিকের দল উগ্র কৌতূহলে স্থির দৃষ্টি মেলে দেখছে কতকগুলি ফসিল! অর্ধপশুগঠন, অপরিণত মস্তিষ্ক ও আত্মহত্যাপ্রবণ তাদের সাব-হিউম্যান শ্রেণীর পিতৃপুরুষের শিলীভূত অস্থিকংকাল, আর ছেনি-হাতুড়ি-গাঁইতা; কতগুলি লোহার ক্রুড কিম্ভূত হাতিয়ার। অনুমান করছে তারা, প্রাচীন পৃথিবীর একদল হতভাগ্য মানুষ বোধহয় একদিন আকস্মিক কোনো ভূ-বিপর্যয়ে কোয়ার্টস আর গ্রানিটের গহ্বরে সমাধিস্থ হয়ে গিয়েছিল। তারা দেখছে শুধু কতগুলি সাদা সাদা ফসিল, তাতে আজকের এই এত লাল রঙের কোনো দাগ নেই।"—এই সমাপ্তিতেই গল্পটি প্রতিমার মতো জ্বল জ্বল করে ফুটে উঠেছে। এখানে শোষকের অত্যাচার, শ্রমিক শ্রেণির পরাজয়

ও সমবেদনা সবকিছুই ফুটে উঠেছে, কোনোকিছু গোপন থাকেনি।

তবে, 'ফসিল' গল্পের প্রতিমা নির্মাণে ভারতের রাজনীতির সন্ধিলগ্নের ইতিহাস আছে। বিশ্বযুদ্ধের আগে ভারতের দেশীয় রাজ্যের প্রজাদের ওপর বিভিন্নরকম শোষণ-পীড়নের ইতিহাস লিপিবদ্ধ আছে। তাছাড়া সমাজবিবর্তনের ইতিহাসে সামন্ততন্ত্রের অবসানের পরই ধনতন্ত্রের আগমন। কিন্তু আমাদের দেশের ধনতন্ত্র তো মজবুত ছিল না। কারণ, যেহেতু আন্তর্জাতিকভাবে সংকটগ্রস্ত পুঁজিবাদের গর্ভে তার জন্ম হয়েছিল এবং বিদেশি বণিকের পুঁজির হাত ধরেই সে চলতে শিখেছিল; ফলে জন্মলগ্নেই সে ছিল পঙ্গু। তাই তার গতিশীলতা অন্তর্হিত হয়েছিল। তাই সে নিজে বেঁচে থাকার স্বার্থে, বিপ্লবের ভয় থেকে পরিত্রাণ পেতে তার জাতশত্রুর সঙ্গেও হাত মেলাতে কসুর করেনি।— ইতিহাসের এই ভিতরের কথাটিও যেন 'ফসিল' গল্পের বিষয় হয়ে উঠেছে। সেই কারণে উদারনৈতিক গণতন্ত্রে তথা সমাজতন্ত্রে আস্থাশীল মি. মুখার্জী শ্রমিকশ্রেণির কথা ভেবেও শ্রম ও পুঁজির সঙ্গে আপসের পথ রচনা করেছে এবং শেষপর্যন্ত শ্রমিকশ্রেণির পরাজয়ের পথটিকেই প্রশস্ত করেছে; সোশ্যাল ডেমোক্রেটিস-কে হত্যা করতেও পিছপা হয়নি। এই মধ্যবিত্ত চরিত্রটিই সামন্ততন্ত্রের সঙ্গে ধনতন্ত্রের সহায়তায় একটি আদর্শ কল্যাণরাষ্ট্রের স্বপ্ন দেখেছিল।

ছোটোগল্পকার সুবোধ এই এই মধ্যবিত্তচরিত্রকে খুব নিকট থেকে সেকালে পর্যবেক্ষণ করেছিলেন। দেখেছিলেন অর্থনৈতিক দিক থেকে এরা 'আনস্টেবল' বলেই চিন্তাগতভাবে দোদুল্যমান। বিশ শতকের দ্বিতীয় দশকে অর্থনৈতিক দিক থেকে মধ্যবিত্ত শ্রেণি বিকশিত হল না, চিন্তাগতভাবে প্রগতিশীলতার পরিবর্তে প্রতিক্রিয়ার রূপ ধারণ করেছিল। অন্যদিকে রুশবিপ্লবের সর্বময় প্রেরণা তাকে প্রভাবিতও করেছিল। ঊনবিংশ শতক থেকেই মধ্যবিত্তের দুর্দশা প্রকট হতে থাকল, বিশ শতকে যার ভয়াবহ রূপ দেখা গেল; তারপর প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আঘাত এই শ্রেণিচরিত্রকে ধসিয়ে দিয়েছিল, শিথিল হয়েছিল তার মানবিক গ্রন্থিগুলি। পরে পরে মধ্যবিত্তের মানবিক সুকুমার বৃত্তিগুলি বাণিজ্যিক হয়ে পড়ল। মধ্যবিত্ত চরিত্রের গোত্রান্তর আর হল না। সুবোধ ঘোষের এই শ্রেণিচরিত্রের অসাধারণ একটি ছোটোগল্প 'গোত্রান্তর'। অন্য একটি 'সুন্দরম'।

'গোত্রান্তর' গল্পে অর্থনীতিতে এম. এ পাশ করা সঞ্জয় শ্রমিক শ্রেণির হয়ে নেতৃত্ব দিয়েও শেষপর্যন্ত বিশ্বাসঘাতকতা করল, শ্রমিকনেতা নেমিয়ারকে ধরিয়ে দিল। আর রতনলাল সুগারমিলের তিরিশটাকা মাইনের ক্যাশমুন্সি সঞ্জয়ের প্রমোশন হয়ে গেল, গোরখপুর মিল-এ 'শওরূপেয়া তন্‌খা'র চাকরি জুটে গেল। এই সঞ্জয়-ই অবৈধ সহবাসে লিপ্ত হয়েছিল নেমিয়ারের বোন রুক্মিনীর সঙ্গে। তার ভাবনায়, 'জোলো দাম্পত্যের চেয়ে এ ঢের ভাল।' সঞ্জয় মধ্যবিত্ত মানসিকতার বাতারণ থেকে নিজেকে মুক্ত করতে চেয়েছিল, যে মধ্যবিত্ত সমাজে অর্থনৈতিক মাপদণ্ডে ভালো-মন্দ বিচার করা হয়, স্নেহ-প্রেম-ভালোবাসা সবকিছুর। তাই সে অতিসাধারণ মানুষগুলির সঙ্গে মিশে 'ডি-ক্লাসড্' হবার স্বপ্নও দেখেছিল। সুবোধ ঘোষ এই গল্পে দেখালেন, অর্থনীতিগতভাবে

পঙ্গুত্ব কীভাবে নীতি এবং আদর্শ থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়ে। ভারতবর্ষের আকাশে তখন বিশ্বযুদ্ধের কৃষ্ণপক্ষ। "চুরাশী পরগণা থেকে সহস্র যোজন দূরে, লবণ পারাবারের অপরপ্রান্তে ওলন্দাজের দেশে মুদ্রালক্ষ্মী যেন বিধবা হয়েছে। স্বর্ণমান বাতিল হয়ে বাট্টা আর বিনিময়ের হার পাল্টে গেছে রাতারাতি। গিলডারের দাম এক দফায় নেমে গেছে সস্তা হয়ে।"—এই যুদ্ধের দোহাই দিয়ে রতনলাল সুগারমিলের মালিক শ্রমিক ছাঁটাই করেছিল। চল্লিশ শতাংশ মাইনে কমিয়ে দিয়েছিল আর কিষাণদের নির্দেশ দিয়েছিল সস্তায় সব আখ বেচে দিতে। এই প্রেক্ষাপটে সঞ্জয়ের নেতৃত্বে নেমিয়ার ও মুনিরামরা চুরাশি পরগণার খেতে-খামারে, শ্রমিক বস্তিতে কিষাণ মজুরদের সংগঠিত করেছিল। এম.এ. পাশ সঞ্জয় নিজেকে অপমানিত মনে করেছিল, তাই সে শ্রমিক শ্রেণির লড়াই-এ শামিল হয়েছিল। চুরাশি পরগণার চাষিরা অল্প দামে আখ বেচবে না। শ্রমিক-মালিক লড়াই যখন তুঙ্গে, তখন, মিল বন্ধ হয়ে গেল। মড়ক লাগল চুরাশি পরগণায়। ঠিক এই সময়, লড়াকু কিষাণ-মজুরদের বাঁচিয়ে রাখতে নেমিয়ার সঞ্জয়ের কাছ থেকে ক্যাশবাক্সের চাবি নিয়ে সরে পড়ল। এই ঘটনায় মধ্যবিত্ত সঞ্জয় নেমিয়ারের বোন রুক্মিণীকে ভোগ করার অপরাধে নিজেকে বাঁচাতে আর পালিয়ে যেতে মিলমালিকের কাছে নেমিয়ারকে ধরিয়ে দিল। —একটি গোটা মধ্যবিত্ত চরিত্র নিমেষে হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ল। সঞ্জয়ের এই অপরাধ আর লোভ-লালসাকে চমৎকার একটি চিত্রকল্পে রূপ দিয়েছেন গল্পকার। "সঞ্জয় ঘোড়া থেকে নেমে স্রোতের ধারে বসে আঁজলা ভরে জল খেল। গেরস্তের মুর্গি চুরি করে একটা শেয়াল ভেজা বালির উপর বসে গোঁপের রক্ত চাটছিল। সেও জল খাবার জন্য স্রোতে মুখ নামালো।"— মানুষ আর পশু এখানে এক ধর্মে এসে মিলিত হয়ে গেল। তবে সঞ্জয় চরিত্রের গোত্রান্তরহীনতার কারণ নিরূপণে জনৈক সমালোচক যে কথা বলেছেন, তা প্রণিধানযোগ্য— "ব্যক্তিগত জীবনের অসহায়তা থেকে জন্ম নেওয়া ক্রোধ আর আবেগ মূলধন করে শ্রেণীসংগ্রামে অংশগ্রহণ করলেই চলে না, সেইসঙ্গে মন-মনন-রুচি-নীতি-নৈতিকতায় মধ্যবিত্ত চিন্তাকে সচেতন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে অপসারিত করে শ্রেণী রাজনীতিকে সম্পৃক্ত করতে পারলে তবেই কাঙ্ক্ষিত গোত্রান্তর সম্ভব, নতুবা নয়। সঞ্জয় চরিত্রে এ বিষয়টি প্রতিফলিত।"[৯]

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সার্বিক সংকটের পটভূমিকায় সুবোধ ঘোষের একইপ্রকার ছোটোগল্প 'অনধিকার প্রবেশ'। এ-গল্পে মধ্যবিত্ত এক লেখক চরিত্রের ভীরু-নিষ্ফলতাকে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। এগল্পের প্রধান চরিত্র প্রিয়তোষ শ্রমিক শ্রেণির প্রত্যক্ষ জীবনযাত্রার অভিজ্ঞতা নিয়ে গল্প লিখবে বলে এক বস্তিতে গিয়ে উঠেছিল। বস্তির খেটে-খাওয়া মানুষগুলির সঙ্গে মিশে গিয়েছিল। গোত্রমোহ কাটিয়ে উঠবার জন্যে সে বস্তির লোকদের সঙ্গে তাড়ি পর্যন্ত খায়, এমনকি আনুষঙ্গিক দোষও অর্জন করে। কিন্তু সে বাস্তববাদী লেখক। "গল্প লেখে— তাদের বিষয়ে, যারা আড়াইকোটি টাকার মালিক, যারা প্রভুত্ব করে আড়াই লক্ষ লোকের উপর।" সে গল্প 'জীবনের ভয়ংকর অভিজ্ঞতা...

সে লেখার মধ্যেপ্রেমের চিহ্ন নেই।’ কিন্তু বস্তিরই এক শ্রমিক গৌরবাবুর যুবতী মেয়ে প্রিয়তোষকে ভালোবেসে ফেলেছে সে। আর বস্তির যে মেয়েরা রাতের অন্ধকারে রহস্যময় রোজগার করে, তাদের বাবারাই যখন প্রিয়তোষ আর বেলার সম্পর্ক নিয়ে অসামাজিকতার প্রশ্ন তোলে তখন ভীরু কাপুরুষের মতো ভদ্রঘরের লেখক মধ্যবিত্ত সঞ্জয়ের মতোই সগোত্র প্রিয়তোষ তার প্রতিবাদটুকুও করতে পারে না। তাকে বস্তি ছেড়ে চলে যাওয়ার ফরমান জারি করলে প্রিয়তোষ রাতের অন্ধকারে গা-ঢাকা দিয়ে পালিয়ে যায়। তাই এ-ধরনের জীবনবিমুখ লেখকদের সম্পর্কেও গল্পকার আঘাত হেনে উপসংহার রচনা করে লেখেন— “ভাগ্যিস বেলা জানে না যে প্রিয়তোষ লেখক মাত্র; মানুষ নয়। জীবনের আহ্বনের সম্মুখে যারা তাদের পৌরুষের ওপর ঘোমটা টেনে দিয়ে চুপি চুপি সরে পড়ে। ওরা শুধু লেখে— জীবন ছেড়ে দিয়ে পালিয়ে যায় বলেই ওরা লেখক।”— গল্পটিতে লেখক জীবনসংগ্রামহীন নির্বীর্য শখের লেখকদের ঘোমটাকে একটানে খুলে দিয়ে পরিতৃপ্ত হতে পেরেছিলেন। বুর্জোয়া গোষ্ঠীর লেখকদের বিরুদ্ধে তাঁর এই প্রতিবাদ। স্নেহ-প্রেমের মতো সূক্ষ্ম অনুভূতিগুলিকে অর্থনীতির তুলাদণ্ডে মেপে চলবার প্রবণতা সেদিন মধ্যবিত্ত শ্রেণিচরিত্রের ভিতর পচন ধরিয়েছিল। সুবোধ ঘোষ তাঁর কালে সেই ভয়াবহ সামাজিক অধঃপতনের ছবি সূক্ষ্মভাবে অঙ্কন করে গেছেন। মধ্যবিত্ত শিক্ষাভিমান থেকে অবক্ষয়িত মানসিকতার আরও দৃষ্টান্ত ‘উচলে চড়িনু’, ‘কাঞ্চন সংসর্গাৎ’।

মধ্যবিত্ত মানসিকতার যুবক দীনেশ দত্ত ‘উচলে চড়িনু’ গল্পে মানবীয়তাকে গভীরভাবে নষ্ট করেছিল। গল্পের প্রধান চরিত্র দীনেশ কোম্পানির অভ্রখনির ওভারম্যান। এই খনির মজুরনি বিলাসী নারীত্বের কোমলতাটুকু ছাড়া মুখ ও বুকের ছাঁদে পরিশ্রমী পুরুষদের সবা কাঙ্ক্ষিতা অভিলাষিণী এক নারী। এরই মধ্যে পাঁচবার সাঙ্গা-তালাক করে গভীরভাবে ভালোবেসেছে ওভারম্যান এই দীনেশকে। কিন্তু মধ্যবিত্ত চরিত্র দীনেশ ভাবছে, “আরও মুশকিল হয়েছে ভদ্রলোক হয়ে, লেখাপড়া শিখে। জীবনের দুর্বার আবেগ টেনে নিয়ে যায় পাতালের দিকে। বিলাসীকে নিয়ে যে জনরব গড়ে উঠেছে তার সম্বন্ধে সেটা সত্য হয়ে উঠতে চায়। কিন্তু রুচিতে বাধে। পদে পদে ভদ্রয়ানার নিষেধ ভীরুতা।” ‘আবার মনে হয় সমাজ-সংসার মিছে সব।’“দীনেশের মনে হয়, অবার্চীন বিংশ শতাব্দীর এই সংকুচিত জীবনের জঞ্জাল ঠেলে দিয়ে বিলাসীর পাশে গিয়ে দাঁড়ায়...।” কিন্তু দীনেশের জীবনে জুটেছে আরও একটি নারী— ইরানি বেদের মেয়ে সারা—‘খরস্রোতা নদীর উতরোল, নিষ্কলঙ্ক রুবি অভ্রের মতো চেহারা।’ দীনেশ এই সারাকে পেতেই নির্মম ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। কারণ সারা অর্থশুল্কা। তাই কন্যাপণ সংগ্রহের জন্যে দীনেশ সারাকে চুরি করা অভ্র চালান করার জন্যে বিলাসীকে খনির গহ্বরে ঠেলে দিয়ে হত্যা করে। বিলাসী জীবন দিয়েই তার প্রেমের মূল্য চুকিয়ে দিল, সে দীনেশকে প্রকৃতই ভালোবাসত।

পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থার অধীনস্থ মধ্যবিত্ত সমাজের নপুংসকতা, নিবীর্যতা ফুটে উঠেছে, 'কাঞ্চনসংসর্গাৎ' গল্পে। এ-গল্পের কান্তিকুমার সঞ্জয়-দীনেশেরই গোত্রভুক্ত। সেও কাঞ্চন সংসর্গে নিজের প্রেমিকাকে পর্যন্ত সঁপে দিয়েছে প্রভু অটলনাথের অর্থলিপ্সার কাছে। মানবতার কবর রচনা করা হয়েছে। এই অটলনাথ কুলিমজুর রিক্রুট করে আজ বাণিজ্যবীর— লক্ষপতি আর তার এ-কাজের মসৃণতা এনে দিয়েছে বন্ধুপুত্র কান্তিকুমার। এই কান্তিকুমার লিখবে অটলনাথ বসু চৌধুরীর জীবনী। কান্তিকুমার দরিদ্র প্রতাপবাবুর মেয়ে জয়াকে ভালোবাসে। কিন্তু অর্থের জোরে জয়াকে সংসারে প্রতিষ্ঠা দিতে পারে না। শুধু দয়া আর উপকার নিয়ে জয়া খুব বিরক্ত, সে চায় কান্তিকুমার তাকে বিয়ে করে মর্যাদা দিক। এদিকে অটলনাথ প্রতাপবাবুকে চাকরি দিয়ে দূরে পাঠিয়ে দেয় আর জয়া আশ্রয় পেয়ে যায় অটলনাথের অন্তঃপুরে। কান্তিকুমার আহত জানোয়ারের মতো মাত্র একবার ফুঁসে উঠে শান্ত হয়ে যায়। যে পৌরুষ আর মর্যাদা থাকলে অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে প্রেমকে প্রতিষ্ঠা করা যায়, কান্তিকুমারের তা নেই। লক্ষপতি অটলনাথের মনোভাব এবং কান্তির নিবীর্য চরিত্র ফুটে উঠেছে আলোচ্য গল্পে। গল্পকার বিবৃতি দিয়েছেন অটলনাথের মুখ দিয়ে যে, "একটা তুলে নাও মাস্টার, লজ্জা করো না। আমেরিকার ক্রোড়পতি মালিকও চাকরানীর সঙ্গে নাচতে দ্বিধা করে না; আমি তো তোমাকে বিশুদ্ধ একটা সিগারেট দিচ্ছি। নাও, নিয়ে ফেল।"— এই অবমাননা মধবিত্ত কান্তিকুমারকে মেনে নিতে বাধ্য করে। মনুষ্যত্ব, মানবিকতা, প্রেম-প্রীতি-ভালোবাসা যে ঠুনকো পুঁজির হাতে বিক্রীত হয়— কান্তিকুমারের মেরুদণ্ডহীনতা-ক্লীবত্ব, ক্লিন্নতা, বীর্যহীনতা এসব পুঁজিবাদী সভ্যতারই সৃষ্ট, তাই এ-গল্পের প্রাসঙ্গিকতা আজও শেষ হয়ে যায়নি।

'ঐতিহাসিক বস্তুবাদ' গল্পে গল্পকার ছদ্মগোত্রের ভ্রষ্ট মধ্যবিত্ত শিক্ষিত একটি চরিত্রকে শ্লেষ-স্যাটায়ারে বিদ্ধ করে মনের জ্বালা জুড়াতে চেয়েছেন। এই গল্পের প্রধানচরিত্র বিমল বসু প্রিয়দর্শী অশোকের ভাবশিষ্য। তিনি অশোকিষ্ট। অশোক অনার্য নারী বিবাহ করে ইতিহাসের চাকা সামনের দিকে প্রসারিত করেছিলেন। ভাবশিষ্য বিমল বসুও অনার্য-ভীল নারী স্টেলা হেমব্রমকে বিবাহ করবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। তাই তাঁর ছাত্ররা ভীষণ খুশি হয়েছিল কিন্তু একদিন বিমল বসু সকলকে ফাঁকি দিয়ে কলকাতায় চলে গেলেন এবং কলকাতার কোনো এক মস্ত বড়োলোকের মেয়েকে বিয়ে করে ফেললেন। এখানে ছদ্ম-গাম্ভীর্যের বিমল বসুর আচরণকে বিদ্রুপে ফালা ফালা করেছেন গল্পলেখক।— "ঐতিহাসিক বস্তুবাদ; হিস্টরিক্যাল মেটেরিয়ালিজম। কথাটার অর্থ বুঝতে অনেক চেষ্টা করেছি, কিন্তু বুঝতে পারিনি। আজ হঠাৎ মনে হয়েছে যেন বুঝতে পেরেছি। কারণ, আজ হঠাৎ আমার মনে পড়ে গেল আমাদের সেই কলেজের অধ্যাপক বিমল বসুর কথা।"— কত বিচিত্রভাবে ছোটোগল্পের প্রতিমা নির্মাণ করা যায়, তা আমাদের অবশ্যই ভাবায়। অর্থনীতিগত শ্রেণিবিভাগ যে নীতিবোধ তৈরি

করে এবং তার সঙ্গে অর্থহীন মর্যাদাবোধ মিলে গিয়ে কীভাবে মনুষ্যত্ব অপমানিত হয়, মধ্যবিত্তের অসার জাতিদম্ভ কীভাবে মনুষ্যত্বকে লাঞ্ছিত করে— তারই নিদারুণ পরিচয় উদ্‌ঘাটিত সুবোধ ঘোষের 'তিন-অধ্যায়' গল্পটিতে। পাশাপাশি প্রায়শ্চিত্তও দেখানো হয়েছে। জীবিকা দিয়ে যারা জীবনের মানে খুঁজতে যায় তারাই ঠকে। যেমন 'তিন-অধ্যায়' গল্পে বারীণদের ঠকতে হয়েছে। বণিকী সভ্যতার নিষ্পেষণে, মিথ্যা জাতিগৌরব টিকে থাকে না; মিথ্যা মর্যাদা রক্ষা করা যায় না আবার এই শোষণব্যবস্থায় মধ্যবিত্ত সমাজকে হীন জীবিকা গ্রহণ করে বাঁচতেও হয়। সমাজের এই ভাঙাগড়ার প্রতিমা নির্মিত হয়েছে 'তিন-অধ্যায়' গল্পে। প্রথম অধ্যায়ে বামুনের ছেলে অহিভূষণ ময়লা ফেলা গাড়ির তদারকি করে; এই কাজ তাকে করতে হয় বাঁচবার জন্যে কিন্তু সমস্যা হল সেই পদের নামটি নিয়ে। মিউনিসিপ্যালিটি এই পদটির নাম 'অ্যাসিস্ট্যান্ট কনজারভেন্সী সুপারভাইজর' থেকে 'সর্দার স্কাভেঞ্জার' করে দিয়েছে। এতেই ক্ষেপে উঠেছে স্ব-অভিমানে মধ্যবিত্ত সমাজ। বন্ধুরাও তাচ্ছিল্য করে, এমনকি স্কুল মাস্টারের পাশ করা মেয়ের সঙ্গে অহিভূষণের বিয়ে ভেঙেও দেয়। তাই অহিভূষণ শেষপর্যন্ত তার বাবার এক বন্ধু মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যানের কাছে গিয়ে পদটির নাম বদলানোর আর্জি জানায় আর চরম অপমানিত হয়। দ্বিতীয় অধ্যায়ে, জুতোর ব্যবসায়ী পুলিন বাঁড়ুজ্জে সমাজের চোখে 'পুলিন চামার'। তাই সমাজে তাকেও চরম অপমান সহ্য করতে হয়েছে। এই পুলিন বাবুর মেয়ে বন্দনা যে হাসপাতালে নার্সদের সহকারিণী রূপে কাজ করছে এবং যে কাজের নাম 'জমাদারনী'— তার বিয়ে ঠিক হয়েছিল পাটনার এক প্রফেসরের সঙ্গে। মধ্যবিত্ত সমাজ সেই বিয়েও ভেঙে দিয়েছে। এ-প্রসঙ্গে গল্পকারের সাধারণ মানুষের হয়ে সমাজ বিশ্লেষণ নজর কাড়ার মতো। তাঁর গল্পের ভাষায়, ''জাতপাতগর্বী মধ্যবিত্ত সমাজ ... বিশ্বাস করে সমাজের একটা স্বাভাবিক আত্মরক্ষা করার শক্তি আছে।'' কিন্তু শেষপর্যন্ত গল্পকার প্রগতিশীল সমাজ নির্মাণের লক্ষ্যে তৃতীয় অধ্যায়ে অহিভূষণ আর বন্দনার বিবাহ সম্পন্ন করে মধ্যবিত্ত সমাজ মানসিকতার গালে কষে থাপ্পড় মেরে আধুনিক সমাজব্যবস্থার মূল্যবোধের নবনির্মাণ করলেন। গল্পকারের ভাষায়, 'মধ্যবিত্ত সুগম্ভীর সমাজ এইখানে এসে চরমভাবে ভুয়ো হয়ে গেছে।' অহিভূষণ-বন্দনার মতো মেয়েরা চেয়েছে মর্যাদা, সম্মান আর সামাজিক স্বীকৃতি। আর তখনই গল্পের নবকল্লোল প্রতিমা ভাস্বর হয়ে ফুটে উঠেছে সন্দেহ নেই।

মধ্যবিত্তের স্ব-মহিমায়, স্ব-অভিমানে বসে যারা দুনিয়াকে পায়ের তলায় দেখতে চায়, অন্যকে দাস ছাড়া আর কিছু ভাবতেই পারে না, অন্যের সৃষ্টিশীলতাকে অপদস্থ করে আনন্দ পায়— সেই মধ্যবিত্ত মানসিকতার সঙ্গে লড়াই করা হয়েছে 'স্ব-মহিমাচ্ছায়া' ছোটোগল্পে। দেহাতি মানুষ হয়ে বিলেতি সদাগরি অফিসের ছোটো সাহেব নিখিল মিত্র তার অফিসের সি-গ্রেড কর্মচারী টাইপিস্ট হরেন নিয়োগীকে সহ্য করতে পারে না। কারণ হরেন সি-গ্রেডের হতে পারে কিন্তু তার টেলেন্ট অনেক। সে মোটা মোটা ফিলসফির বই পড়ে, ইংরেজি কবিতার উপর আর্টিক্যাল লিখে খবরের কাগজে

প্রকাশ করে আবার কবীরের ভজনও ভালো গাইতে পারে। তাই এ হেন অধঃস্তন কর্মচারীর প্রতি ঈর্ষান্বিত হয়ে একসময় সাসপেন্ড করার কথাও ভেবেছিল মধ্যবিত্ত আত্মম্ভর মানসিকতার নিখিল মিত্র। কিন্তু ভেস্তে যায় তার স্ত্রী মীরা মিত্রর অনুরোধে। মীরা মিত্র তাদের সন্তান পুঁটুর জন্মদিনে হরেন নিয়োগীকে নেমন্তন্ন করতে বলে, অনেক গান শুনবে বলে ইচ্ছে প্রকাশ করে। গল্পকার জানান, 'ছোটসাহেবের সোনা বাঁধানো কলমটার মেরুদণ্ড ভেঙে গেছে।' এই কলম দিয়েই মিত্রসাহেব একদিন নিয়োগীর চাকরি খাবার কথা ভেবেছিল। একেবারে নিরাবেগ হয়ে মধ্যবিত্তের উচ্চাকাঙ্ক্ষী, মেরুদণ্ডহীন পেটিবুর্জোয়া মানসিকতাকে ধরাশায়ী করেছেন গল্পকার। একইরকমভাবে মধ্যবিত্তের রূপপিপাসা ও লোভকে তীব্র ব্যঙ্গে কশাঘাত করা হয়েছে 'স্বপ্নহাসিনী' গল্পটিতে। রাতের অন্ধকারে মায়াময় আলোয় যে মেয়েটিকে অপূর্ব সুন্দরী বলে মনে হয়েছিল গ্রামের স্বেচ্ছাসেবী রক্ষাবাহিনীর নেতা মিহিরের, তাকেই দিনের আলোয় দেখে মিহিরের ভালো লাগে না, মেয়েটিকে আর বিয়ে করতে ইচ্ছে করে না। আর অন্য আর একদিন মিহির আবিষ্কার করেছে মেয়েটির বিবাহিত রূপ। কিন্তু মেয়েটি মিহিরকে দেখে— 'চোর চোর' বলে চিৎকার করে উঠেছে— মধ্যবিত্ত স্বভাবের চৌর্যপনাকে গল্পকার এভাবেই জব্দ করলেন আলোচ্য গল্পটিতে।

মধ্যবিত্তের চিন্তা, চেতনা এবং জীবনাচরণের মধ্যে আসমান-জমিন ফারাক লক্ষ করেছিলেন গল্পকার সুবোধ ঘোষ। তাই তাদের অন্তঃসারশূন্য ভড়ংসর্বস্ব জীবনযাত্রাকে মেনে নিতে পারেননি, ছোটোগল্পগুলিতে তার প্রতিবাদ ফুটে উঠেছে। তিনি দেখেছিলেন জাতিগঠনের প্রধান অন্তরায় হল মধ্যবিত্ত চরিত্রের এইসব মানসিকতা। গল্পগুলিতে চরিত্র সৃষ্টি, ঘটনার উদ্‌ঘাটন-উন্মোচন, ভাষার সংকেত, আক্রমণ ও উত্তরণ এমন সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে যে, সমসাময়িকদের কারও মধ্যে তেমনটি দেখা যাবে না। ভাবনাচিন্তার প্রসারণ ও দর্শন অন্যতম নিয়ামক চালিকাশক্তি হয়ে উঠেছে সন্দেহ নেই। 'সুন্দরম' গল্পটির প্রধানচরিত্র সুকুমার শহরের বড়ো সিবিলসার্জেন কৈলাস ডাক্তারের ছেলে। সে ঋষি-বালকের মতো ব্রহ্মচারী হতে চেয়েছে, মুসুরির ডাল পর্যন্ত খায় না, কাব্য-উপন্যাস পড়ে না, সিনেমা দেখে না। বিয়ে করতে চায় না। পরে 'জামাইদাদা' কানাইবাবুর উদ্যোগে ধীরে ধীরে সিনেমাও দেখে আর উপন্যাসও পড়া শুরু করে। একসময় বিয়ে করতেও মন চায় তার। কিন্তু একটার পর একটা কনে দেখেও পছন্দ হয় না। ওদিকে কৈলাস ডাক্তারের বাড়ির পাশে আস্তানা গেড়েছে ধিঙ্গি মেয়ে কুরূপ তুলসী তার বাবা-মাকে সঙ্গে নিয়ে। তুলসী ভিক্ষে করে এনে বাবা-মাকে খাওয়ায়। ভদ্রপরিবারের সন্তান এই সুকুমার গোপনে তুলসীর সঙ্গে সহবাস করে এবং একসময় তুলসীর গর্ভে সন্তান এলে তাকে পাউরুটির সঙ্গে বিষ মাখিয়ে খাইয়ে দিয়ে মেরে ফেলে। ভাগ্যের এমনই নির্মম পরিহাস যে এই তুলসীর লাশ তদন্ত করতে করতে পিতা কৈলাস ডাক্তার যদু ডোমের কাছে ধরা পড়ে যান। যদু ডোম তখন বলে ওঠে,

'শালা বুড়ো নাতির মুখ দেখছে'। কিন্তু গল্পে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে বাহ্যিক রং-রূপ-চেহারার বিপরীতে নারীদেহের আন্তর সৌন্দর্যের রূপের কথা, যা বিশশতকের মানুষের মনেরই নতুন এক সৌন্দর্যচেতনা। "সুন্দরম লেখকের একটি প্রিয় গল্প। সৌন্দর্য মানবীয় জীবনের একটি আনন্দের সম্বল এবং অবলম্বন। প্রাচীন জ্ঞানীর মনে প্রশ্ন দেখা দিয়েছিল : যদি আকাশে আনন্দ না থাকত তবে কেউ কি আকাশকে চাইত? সৌন্দর্য মানুষের বোধে ও অনুভবে যে রসাত্মক আবেগ সঞ্চারিত, তাই আবার আনন্দরূপে নিষ্পন্ন হয়। এই সৌন্দর্যের একটি লৌকিক সংস্কার সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ একটি তাত্ত্বিক জিজ্ঞাসা এই গল্পে সৃষ্টি করা হয়েছে। বিশেষ করে শারীরিক সৌন্দর্যের সংস্কার সম্বন্ধে একটি কঠিন জিজ্ঞাসার নির্মাণ।"[(১০)] অবশ্য 'সুন্দরম' গল্পের প্রতিমা নির্মাণ প্রসঙ্গে কাজ করেছে গল্পকারের একটি বাস্তব জীবন অভিজ্ঞতাও। এক স্থানে গল্পলেখক জানিয়েছেন, "লেখক যখন হাজারিবাগ জেলা স্কুলের ছাত্র, তখন মানুষের দেহগত রূপের একটি অনাবরণ পরিচয় লাভ করবার সুযোগ তৈরি হয়েছিল। স্কুলের ড্রিল ময়দানের কাছে একটি সুন্দর পুকুর; সেই পুকুরের পশ্চিমে পুলিশ ফৌজের প্যারেড গ্রাউন্ড, সেই গ্রাউন্ডের উত্তরভাগে বড় বড় বেলগাছের ছায়ায় গা ঘেঁষে লাস কাটবার ময়নাঘর। এই ময়নাঘরের টেবিলের উপর রাখা কাটা লাসের চেহারা অনেকবার দেখেছিলাম। ময়নাঘরের ডোম জমাদার মাঝে মাঝে দেখিয়ে ও বুঝিয়ে দিত কাটা-ছেঁড়া নিদারুণ পরিচয়। পুলিশের গুলিতে নিহত ডাকাতের লাস, কিংবা আত্মঘাতিনী পতিতার লাস ইত্যাদি। দেহের রূপতত্ত্ব সম্বন্ধে কঠিন একটি জিজ্ঞাসা সৃষ্টি করবার আখ্যায়িকা এই 'সুন্দরম'কে একটি দুরূহ সমস্যায় কিছুদিন অসমাপ্ত হয়ে পড়ে থাকতে হয়েছিল। ব্যবচ্ছিন্ন দেহের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের রূপ বর্ণনা করবার ভাষা ও পরিভাষা কোথাই পাই? আনন্দবাজার পত্রিকার লাইব্রেরীতে সহসা একদিন চোখে পড়ল একটি বই, মহামহোপাধ্যায় শ্রী গণনাথ সেনের লিখিত 'প্রত্যক্ষ শরীরম্', সংস্কৃত ভাষায় অ্যানটমির একটি প্রশস্ত পাঠ্যপুস্তক। এরপর ভাষা ও পরিভাষা পেতে অসুবিধা হয়নি।"[(১১)]

> "যদু বললো— এসবে কোন জখম নেই হুজুর। পেটটা দেখুন। ছুরির ফলার আঘাতে দুভাগ করা হলো পাকস্থলী। এইবার কৈলাস ডাক্তার দেখলেন মৃত্যুর কামড়। ক্লোমরসে মাখা একটি অজীর্ণ পিণ্ড। সন্দেশ-পাউরুটি বেলেডোনা।
>
> —মার্ডার!...
>
> হঠাৎ ছটফট করে টেবিলের কাছে আবার এগিয়ে এলেন কৈলাস ডাক্তার। ছোঁ মেরে কাঁচিটা তুলে নিয়ে তুলসীর তলপেটের দুটো বন্ধনী ছেদন করলেন। নিকেলের চিমটের সুচিক্কণ বাহুপুটে চেপে নিয়ে, স্নেহাক্ত আগ্রহে ধীরে ধীরে টেনে তুলে ধরলেন পরিশল্কে ঢাকা সুডোল, সুকোমল একটি পেটিকা। মাতৃত্বের রসে উর্বর মানবজাতির মাংসল ধরিত্রী। সর্পিল নাড়ীর আলিঙ্গনে ক্লিষ্ট, কুঞ্চিত, বিষিয়ে নীল হয়ে আছে শিশু এসিয়া।"

সুকুমারের ঘৃণ্য লালসার পরিণামে কুৎসিত তুলসীর গর্ভে সন্তান এসেছিল আর তার এই কৃতকর্মে মধ্যবিত্তের সৌন্দর্যবিলাসী সংরারটা ধসে যাবে? অপমানিত হবে?— বলা যায় এই পুঁজিবাদী দুনিয়াটার ভিত্তিমূল নড়ে যাবে? আদিম জৈবশক্তি জয়ী হবে?— এ কথা ভেবেই তো সুকুমার নারীহত্যা আর ভ্রূণ হত্যা করেছিল। লাসকাটা ঘরে প্রকারান্তরে গল্পকার মধ্যবিত্তের সৌন্দর্যচেতনাকেই চিরে ফালা ফালা করে দিলেন। বিজ্ঞানসম্মতভাবে সমালোচক যথার্থই বলেছেন, 'শ্লেষ ও বক্রোক্তির তীক্ষ্ণতায়, বুদ্ধিদীপ্ত সমাসোক্তির ব্যঞ্জনায়, কাব্যমণ্ডিত বর্ণনা ও গভীর ভাবদ্যোতক মন্তব্য যোজনায়'[১২] আলোচ্য গল্পটি বাংলা ছোটোগল্পের ইতিহাসে একটি সেরা সম্পদ হয়ে থাকবে। সুবোধ ঘোষের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ছোটোগল্প এটি।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, যুদ্ধজনিত মন্বন্তর, যুদ্ধোত্তর সামাজিক-অর্থনৈতিক-সাংস্কৃতিক সংকট ও অবক্ষয় সুবোধ ঘোষের ছোটোগল্পে কালের প্রতিমার রূপ নির্মাণ করেছে। এসব ঘটনা ভেঙে দিয়েছিল মানুষের সামাজিক শৃঙ্খলা, ধ্বস্ত করে দিয়েছিল মানবীয় মূল্যবোধ আর যাবতীয় বিশ্বাসের ভিত্তিভূমি। মানুষের দৈনন্দিন জীবনে এনে দিয়েছিল চূড়ান্ত দুর্দশা। সুবোধ ঘোষের একটি গল্পে নয়াবাদ পরগণার ধনিয়ার ঘরে বহু পুরুষের আনাগোনা কিন্তু দিনের বেলায় সে 'দুধমা'— শারীরিক অসুস্থতায় ভদ্রলোকের বাড়ির প্রসূতিদের দুধ শুকিয়ে যাওয়ায় শিশুদের দু-বেলা বুকের দুধ খাওয়ানোর কাজ করত সে। এর প্রয়োজনে দু-তিন বছর পর পর হাসপাতালে সন্তানও প্রসব করত ধনিয়া, যাদের ঠাঁই হত কোনো অনাথ আশ্রমে। এ হেন দুধ-মা ধনিয়াকে শহরের, জেলারবাবু, মাস্টারবাবু, হাকিমবাবু প্রমুখ প্রতিষ্ঠিত সমাজ-নেতৃত্বরা দেহরূপোজীবিনীর বৃত্তিকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করাতে বাধ্য করল। কারণ তখন শহরে বেবিফুডের আমদানি হয়ে গেছে, ধনিয়াকে এখন আর তাদের দরকার নেই। নয়াবাদ পরগণার এই গল্পে নয়াকাল এসে এইভাবে হাজির হয়েছে ও গল্পের প্রতিমা নির্মাণ করতে সক্ষম হয়েছে। তাই লাইনের এক কুঠরিতে বিগতযৌবনা ধনিয়া প্রাণপণে প্রসাধন মেখে জানালার ধারে দাঁড়িয়ে থেকেছে, তাকিয়ে দেখেছে একদা তারই দুগ্ধপালিত কাউকে কাউকে। গল্পে সেই ছেলেদের উত্তাল যৌবনের রুচিহীন কামনা পরশুরামের কুঠার হয়ে আঘাত হেনেছে ধনিয়ার মাতৃত্বের উপর। তাই গল্পটির সুচিন্তির নাম 'পরশুরামের কুঠার'। গল্পে সুবোধ ঘোষের দৃষ্টিভঙ্গি পতিতা চরিত্রটির দিকে। শরৎচন্দ্রের মন ও মনন দিয়েই সুবোধ ঘোষ এইসব পতিতা চরিত্রগুলির মানসিকতা ও মর্যাদাবোধ অন্বেষণ করতে চেয়েছেন আন্তরিক আবেগ ও দরদ নিয়ে। দেখানোর চেষ্টা করেছেন একজন পতিতা যদি উপযুক্ত মর্যাদা ও সুস্থসমাজ পরিবেশ পান তাহলে আর পাঁচটি মেয়ের মতোই স্বামীপুত্রসহ ঘর করবার বাসনা ব্যক্ত করে ফেলে। কিন্তু নীচ পুরুষ সে পথে তাকে আর ফিরতে দেয় না। অথচ নারীর পরিচয় তো তার মর্যাদায়, সম্মানবোধে, আর নারীত্বে। এ-রকমই আর একটি সুন্দর গল্প 'বারবধূ'। তারকেশ্বরের এক বেশ্যা

পঞ্চীবিবিকে সঙ্গে নিয়ে বিহার-বাংলা সীমান্তে বরাকর কলোনিতে মধুকুঞ্জ রচনা করেছে জমিদার প্রসাদ রায়। কিন্তু বরাকরের বাঙালি সমাজ জানতে পেরে যাবে ভেবে পঞ্চীবিবি লতা'র অভিনয় করে গেছে। পঞ্চীবিবি লতা-বৌদিতে পরিণত হয়েছে। প্রসাদ বধূ লতার অভিনয় করতে করতে ঘর-সংসার করার বাসনায় নিজেকে সম্পূর্ণ নিয়োজিত করে ফেলেছে সে। এখন সে ঘরের মধ্যে রেশমি পায়জামা পরতে চায় না, চোখে সুর্মা লেপতে চায় না, হুইস্কি ধরতে চায় না, মদ খেতে চায় না— এককথায় প্রসাদ রায়ের লোলুপতার শিকার হতে চায় না সে। পঞ্চীবিবির আবরণ সরে গেছে তার, সম্ভ্রান্ত গৃহবধূ হয়ে উঠেছে মনে মনে। কিন্তু দুশ্চরিত্র লোভী প্রসাদ রায় তাকে গালি দিয়ে স্মরণ করিয়ে দেয়, 'ইউ ভ্রষ্টা মুড়িওয়ালীর বাচ্চী। আমি তোকে জুতিয়ে...'' অথচ ''সব সামর্থ্য খসে পড়ে গেছে, যেন সব দিক দিয়ে অসহায় হয়ে গেছে লতা, শুধু একটু ছদ্মনামের গৌরবের লোভে। ঘোমটা আর সিঁদুর, শাঁখা আর নোয়া দিয়ে সাজানো তার নিজেরই ছদ্মমূর্তিটার ওপর বড় বেশি মায়া পড়ে গেছে। ভাঙতে পারে না এই মূর্তিকে, ভাঙার চেষ্টাও করতে পারে না, বোধহয় চেষ্টা করতেই ইচ্ছা করে না। কোন উপায় নেই।'' কিন্তু মধুপবৃত্তির তাড়নায় প্রসাদ রায়ের কাছে বারনারী লতা নয় কুলনারী আভার আকর্ষণ বেশি। তাই লতা-কে শেষপর্যন্ত তাড়িয়ে দেয় জমিদার প্রসাদ রায়। শেষপর্যন্ত লতার একটি উক্তিতে প্রসাদ চরিত্রের ভণ্ডামি প্রকাশিত হয়— ''তার একটা মেকি আধুলি চুরি করে আভার যদি কিছু লাভ হয়, হোক।'' তার শেষপর্যন্ত ভদ্র রক্তবীজের পাপমুক্ত পৌরুষের উপর একদলা থুতু ছিটিয়ে বিদায় নিয়েছে লতা। তবে প্রসাদের দেওয়া টাকার নোটের তাড়া সঙ্গে নিয়েছে। কিন্তু গল্পে মূর্তিমান প্রতিমা নির্মিত হয়েছে তখন, যখন প্রসাদ জানতে চেয়েছে— 'আমার ওপর মনে কোন রাগ পুষে রাখলে না তো লতা? আমি তো তোমাকে কখনও ঠকায়নি, ক্ষতি করিনি।' তখন বোধহয়, ''আলোর ধাঁধানি থেকে দৃষ্টি আড়াল করার জন্য হঠাৎ চোখ নামিয়ে নিয়ে মাথার ওপর কাপড়টা বড় করে টেনে দিল লতা। কী আশ্চর্য! সত্যিই যেন একটি লাঞ্ছিতা গৃহবধূ; ভীরু অভিমানের একটি করুণ মূর্তি! আস্তে একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে নিয়ে লতা বলে— না তুমি ক্ষতি করনি, আভা ঠাকুরঝি আমার এই সর্বনাশটা করে ছাড়ল।'' 'ঠাকুরঝি' শব্দ উচ্চারণেই তো এই মূর্তিমান প্রতিমার গৃহবধূ রূপে জাগরণ ও উত্থান!

সরাসরি বিশ্বযুদ্ধ ও তৎপ্রসঙ্গ ব্যক্তিজীবনকে বিধ্বস্ত করেছে সুবোধ ঘোষের কয়েকটি ছোটোগল্পে: তবে বিশ্বযুদ্ধ এখানে মানুষের ভাগ্যবিধাতা না হয়ে (যেমনটি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ে আছে) বরং একটা জীবনদর্শনে পৌঁছবার সোপান হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে আর সেখানেই সুবোধ ঘোষের গল্পের প্রতিমা যুগের হতাশা, অন্ধকার আর ক্রোধকে ছাপিয়ে মানসিক আশ্রয় পেতে সক্ষম হয়েছে। সেখানে জীবন আর দর্শন এক হয়ে মিশে যেতে সক্ষম হয়। তাঁর 'কর্ণফুলির ডাক', বৈরনির্যাতন', 'যাযাবর', 'তমসাবৃতা' গল্পগুলির সাপেক্ষে এ কথা বলা যায়।

'কর্ণফুলির ডাক' গল্পে বোমা পড়েছে চট্টগ্রামে। জাপানি বোমার ভয়ে কলকাতা ছেড়ে পালাচ্ছে সকলে, আর্থিক সংগতিবানরা বাদ দিয়ে সকলেই। কিন্তু চল্লিশ টাকা মাইনের ইতিহাসের মাস্টার ধ্রুবেশ স্ত্রী রমা আর ছেলে টুটুকে নিয়ে বিপদে পড়ে। সে আদর্শবান শিক্ষক, যুদ্ধের বাজারে তার চাকরিটা গেছে। ইতিহাসের অগ্রগতির বিজয় রক্তে রক্তে অনুভব করা ও করানোর উদ্দেশ্যে আজ আর কোনো ছাত্রও জোটে না। টালিগঞ্জের গরিব পাড়ার এক ছোট্ট ধোঁয়াটে ঘরে রমার সংসার জীর্ণ হয়ে অশান্তির আস্তানা হয়ে গেছে। ক্লান্তি যখন ধরাশায়ী তখন ইতিহাসের শিক্ষক ধ্রুবেশ জন্মভূমি চট্টগ্রামের কর্ণফুলি নদীর তীরে বিরাজপুর গ্রামের স্বপ্ন দেখল। অনাত্মীয় মানুষের পরম আত্মীয়তায় একদিন যারা ধ্রুবেশকে মমতায় জড়িয়ে ধরে রেখেছিল। "প্রস্তরযুগের পূর্বপুরুষের, অনাবিল গোষ্ঠী-স্নেহের রেশ যেন আজও এই গেঁয়ো প্রীতির গায়ে লেগে আছে ঝরা ফুলের গন্ধের মতো।" জনযুদ্ধওয়ালাদের ডাকে সভায় বক্তৃতা করেও বিশেষ ফল হল না তার। উলটো অজ্ঞ সাধারণ মানুষের কাছে তাকে বিদ্রুপের শিকার হতে হয়। কথা শুনতে হয়। কেউ বলে 'স্পাই', কেউ বলে ইংরেজের পা-চাটা, কারও ভাষায় সে 'পাতিবুর্জোয়া'। বাড়িতে স্ত্রীর সঙ্গে মনোমালিন্য হয়। পার্কে এসে শুয়ে যায়। এমন সময় হকারের চিৎকারে শুনতে পায়— জন্মভূমি চট্টগ্রামে বোমা পড়ার খবর। সচকিত হয়ে উঠে পড়ে ধ্রুবেশ, চোখে ভেসে ওঠে জন্মভূমির ছবি— "বিশ্ব ইতিহাসের সব লেখা ছাপিয়ে সোনালী আখরে ঝিলিক দিয়ে উঠলো একটিমাত্র নাম— বিরাজপুর। কর্ণফুলির জ্বালাভরা জলের ঢেউ অসহায়ের মতো ডাকছে কলস্বরে।"

—জন্মভূমির আহ্বানে সাড়া দিয়ে চলে যায় ধ্রুবেশ।

নিমেষে শহীদের প্রতিমা নির্মিত হয়ে যায় ইতিহাসচেতন গল্পকারের কলমে। আদর্শবাদ গল্পে মাথাচাড়া দেয়। ধ্রুবেশের স্ত্রী রমা সব কষ্টকে ছাপিয়ে উপলব্ধি করে, "সে থাকবে না, সে থাকতে পারে না। সে যে ইতিহাসের মানুষ— এতদিন হয়তো সে হাতের কাছে পেয়েছে তার জীবনের পারানি নৌকার হাল।" তাই রমা প্রণাম জানায়, "মাটির মান বাঁচাতে জীবনপণে দাঁড়ালো আজ যাঁরা" তাঁদের উদ্দেশ্যে। আর গল্পকার দেখালেন ইতিহাসের সেই অমোঘ নির্দেশ লিখন—

"শতাব্দীর সিঁথির মতো বিরাজপুরের ঐ সড়কে হয়তো মুখ থুবড়ে পড়বে বুলেটের আঘাতে শতদীর্ণ এক ইতিহাসের মাস্টারের শোনিতাক্তচুম্বন।" ঘটনা শেষ।

'বৈরনির্যাতন' গল্পে বাঙালি বৈমানিক দিলীপ দত্ত বিশ্বযুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে ইংরেজদের শত্রু পাঠানদের শাস্তি দিতে চলেছে বায়ুসমুদ্রে। তার মনে দোলা দিয়েছে দুটি তরুণী— দুটি জীবনভাবনা। ডোরা দিলীপের এই অভিযানকে স্বাগত জানিয়েছে বীরত্বের কুলগৌরবহিসেবে অন্য দিকে স্বদেশব্রতিনী শোভা এই অভিযানকে 'চাকুরীরক্ষার' ক্লীবতা বলে চিহ্নিত করেছে।তাছাড়া কৈশোরকালের একটি স্মৃতি দিলীপের মনে প্রভাববিস্তার করেছে। মনে পড়েছে রসিদ আর খলিফার কথা। তারই

মামার বাড়ি এই পেশোয়ারে। চোখে পড়েছে পাহাড়ের মাথায় জীর্ণ এক বৌদ্ধ স্তূপ।

সুপ্ত ইতিহাসবোধ জেগে উঠেছে দিলীপের মনে— 'সেই যুগ যুগের কুটুম্বিতার সুখস্মৃতি যেন বিষণ্ণ বেদনায় পাহাড়টার মাথায় ভেঙে পড়ে আছে।'মুহূর্তে বদলে যায় দিলীপের মন, ভারতীয়বোধে আপ্লুত বাঙালি বৈমানিক সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলে। শাস্তি দিতে গিয়েও আর দেওয়া হয় না। এই গল্পের প্রতিমা নির্মিত হয়েছে ভারতীয়ত্ব বোধ থেকে। প্রবন্ধে সুবোধ ঘোষ জানিয়েছেন, "ভারত ইতিহাসের শত ঘটনায় এই সত্য প্রমাণিত হয়েছে যে, মৈত্রীভাবনাই জাতিকে শক্তিদান করে' এবং 'ভারতীয় ফৌজ কোনদিন নিজের থেকে পররাজ্য আক্রমণ করেনি।' (প্রবন্ধ মৈত্রীভাবনা)।

যুদ্ধের কারণে জিনিসপত্রের দাম অত্যন্ত আক্রা বলে নরেনবাবু জার্মানিদের ওপর ভীষণ খাপ্পা হয়েছেন 'যাযাবর' গল্পে। যে নরেনবাবু আটটি সন্তান নিয়ে আর শহরে থাকতে পারলেন না— গ্রামে প্রত্যাবর্তন করতে বাধ্য হলেন। বাহান্ন টাকা মাইনের ওভারসিয়ার নরেনবাবুর কোনো স্থায়ী ঠিকানা হয়নি, তিন বছরে পঁচিশবার বাসা বদল করেছিলেন। এই গল্পে নরেনবাবুকে কেন্দ্র করে ফুটে উঠেছে ইতিহাসচেতনা— "নতুন তৃণভূমির স্বপ্ন দুচোখে, শস্যকণা প্রলুব্ধ যাযাবর মানুষের দল দিকে দিকে ছুটে হেঁটে চলে যাচ্ছে, পেছনের যত পরিচয় দুহাতে মুছে ফেলে, যত বন্ধ্যা মাটির ঢেলা অবহেলায় মাড়িয়ে ওরা একদিন চলে যায়। ওরা বাঁধা পড়ে না কোথাও।" তাই ওরা যাযাবর সম্প্রদায়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এভাবে বাংলা মায়ের শেষ প্রাণরসটুকু নিংড়ে নিয়েছিল, বুকে চাপিয়ে দিয়েছিল মন্বন্তরের দুঃসহ বোঝা। এক ধাক্কায় বাংলাকে বিবস্ত্র করে দিয়েছিল। নারীর লজ্জা নিবারণের বস্ত্র নিয়েও ঘৃণ্য রাজনীতি-অর্থনীতির খেলাও চলছিল। চারিদিকে বস্ত্র সংকট, অর্থ সংকট, খাদ্য সংকট। সুবোধ ঘোষের ছোটোগল্পে তারও ছবি পরিষ্কার ফুটে উঠেছে। বস্ত্র সংকটের ভয়াবহতার কথা 'প্রবাসী' পত্রিকা লিখেছিল : "১৯৪২ সালে ভারতবর্ষে ৩৯০ কোটি গজ কাপড় উৎপন্ন হইয়াছে। তন্মধ্যে সরবরাহ বিভাগ ১১০ কোটি গজ গ্রহণ করিয়াছেন এবং ১০০ কোটি গজ রপ্তানী হইয়াছে। অবশিষ্ট ১৮০ কোটি গজ দেশের মাটির অভাব মিটিতে পারে না।"[১৩] দেশের তাঁতশিল্পের অবস্থা শোচনীয় হয়ে উঠেছিল। ওদিকে, "দেশী ও বিলাতী পুঁজিপতির মধ্যে যে কোন পার্থক্য নাই সুবিধা পাইলে যে একসঙ্গে দেশবাসীর রক্ত শোষণ করিতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠাবোধ করে না।"[১৪] একথাও প্রবাসী লিখেছে। বস্ত্রশিল্পের এই সামগ্রিক নৈরাজ্য ও অরাজকতা ১৯৪২-১৯৪৪-এর কালে বাংলাদেশ বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিল। এই মন্বন্তর ও বস্ত্রসংকট বাংলার পুরোনো মূল্যবোধগুলিকে শুকনো পাতার মতো উড়িয়ে দিয়েছিল। 'ভাঙনের মুখে বাংলা' (১৯৪৪) পুস্তিকায় কমিউনিস্ট নেতা ভবানী সেন মূল্যবোধের ভাঙনকে মন্বন্তরের সৃষ্টি বলে উল্লেখ করেছেন। অন্যান্য লেখকদের মতো সুবোধ ঘোষের ছোটোগল্পেও তার ছায়া পড়েছে। 'তমসাবৃতা' গল্পে ধুলাগড় গ্রামের মেয়ে-বৌ-মায়েরা একটুকরো বস্ত্রের অভাবে সূর্যাস্তের পর কৃষিকাজ করতে যায়,

সূর্যোদয়ের পর মাঠে যায় না। তাঁতিদের ছেলে মোহন বাঁশি তার ভালোবাসার পাত্রী জবার জন্যে নকশাকরা শাড়ি কিনে দিতে এসেও দেখেছে— জবা অন্যান্যদের সঙ্গে রাতের অন্ধকারে কৃষিকাজে বেরিয়ে পড়েছে— "ওরা আসছিল— বিবসনা মৃত্তিকাবধূর দল। টুকরো টুকরো কানি চট কাঁথা— ওদের লজ্জা ঘিরে রেখেছে লক্ষ কালো সূতোর জালে তৈরি এই নিঃসীম অন্ধকারের পরিচ্ছদ।" এই গল্পেই আছে গ্রামের চাষিরা মহাজনদের কাছে চড়া সুদে দাদন নিয়ে খাতকে পরিণত হয়, 'আকাশবৃত্তি' গল্পে দেখা দিয়েছে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ। চারিদিকে হাহাকার। যারা তিনবেলা খেয়ে দিন কাটাত, এখন তারা আধপেটা খায়। এ গল্পে মাধব চক্রবর্তী তাই 'আকাশবৃত্তি' অবলম্বন করেছে। কিন্তু শেষপর্যন্ত মাধব চক্রবর্তীর অনাহারক্লিষ্ট শরীরটা মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছে। দুর্ভিক্ষের সময় অনাহারক্লিষ্টতা ফুটে উঠেছে সুবোধ ঘোষের 'কতটুকু ক্ষতি' গল্পে। এই গল্পে দুই শিল্পী আর্টিস্ট শ্রীমন্ত সেন ও ফটোগ্রাফার বিজয় গুপ্ত দুজনেই যে ছবি উপহার দিয়েছেন, দুটিই দুর্ভিক্ষে পীড়িত নিদারুণ অনাহারক্লিষ্ট ছবি। আর্টিস্ট শ্রীমন্ত সেন এঁকেছেন, "পথের পাশে একটি গাছের ছায়ায় এক ক্ষুধাজীর্ণ ভিখারিণী বসে আছে। তার কোলে একটি মুমূর্ষু শিশু। শিশুটির অন্তিম মুহূর্ত ঘনিয়ে এসেছে। অস্থিসার ভিখারিণী মাতার বুকে শিশুপ্রাণের পানীয় সেই জীবতুষ্টির ধারা শুকিয়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। মুমূর্ষু শিশুর তৃষ্ণার্ত অধর শুধু শেষ বিদায়ের আক্ষেপে থেকে থেকে কেঁপে উঠছে। আর ভিখারি মাতার চোখ থেকে একটি দুটি করে তপ্ত মুক্তোর মতো জলের ফোঁটা ঝরে পড়ছে শিশুটির অধরে।"—এর চেয়ে সকরুণ দৃশ্য আর কী হতে পারে? হতে পারে যখন এর সঙ্গে যুক্ত হয় ক্ষুধার্ত ভিখারিণী মাতা আপন জঠরজ্বালা সহ্য করতে না পেরে লঙ্গরখানা থেকে পাওয়া এক মগ ভর্তি দুধ শিশুটিকে না দিয়ে নিজেই ঢক ঢক করে পান করছে। এই সংযোজন আর্টিস্ট বিজয় গুপ্তের সংগৃহীত বাস্তব ছবি। তাই প্রতিযোগিতায় বিজয় গুপ্তকেই জয়ী করেছেন গল্পকার। শ্রীমন্ত সেনের ছবির প্রতিমায় যা ছিল না, শুধু এতটুকুই ক্ষতি হয়েছিল শিল্পের বিচারে। কালের প্রতিমা এভাবেই নির্মাণ করা হয়েছে।

সুবোধ ঘোষের ছোটোগল্পে ছেচল্লিশের দাঙ্গা, প্রাকৃতিক বিপর্যয়, দেশভাগের কালও অন্বেষণ করা যায়। 'মাটির দীক্ষা' গল্পটিতে ছেচল্লিশের ভয়াবহ দাঙ্গার ফলে নোয়াখালি থেকে কলকাতার নগরজীবনে এক দম্পতি (নরেশ ও অমিতা) তাদের শিশুসন্তানটিকে নিয়ে ঠাঁই নিয়েছিল। যদিও কলকাতার ধুলো-ধোঁয়া-ময়লাভরা দমবন্ধ পরিবেশে তারা সুসংস্কৃত জীবনযাপন করতে পারেনি, রাজীবপুরের এক গ্রামীণ পরিবেশে কৃষকের ভূমিকায় তারা এসে শান্তি পেয়েছিল। গল্পকার জানিয়েছেন, "নরেশ ও অমিতার জীবন একটা বিষণ্ণ দীর্ঘশ্বাসের ইতিহাস পার হয়ে এইখানে এসে মাটির উদার স্পর্শ লাভ করে ধন্য হয়েছে।" এই গল্পেই ইতিহাসের কালের ছবিটি স্পষ্ট করে দিয়েছেন গল্পকার। "দেশ তখনো ভাঙেনি। ভাঙবার লক্ষণ দেখা দিয়েছে, সেই সময়।

'ভয়ানক এক হিংসার ঝড়ে নোয়াখালির পল্লীর শান্তি বিপর্যস্ত হয়ে গেছে। গ্রামে গ্রামে কুটিরের ভগ্নস্তূপ, হিন্দু নরনারীর জীবন অপমানিত। যারা ঘরে আছে, নির্যাতিত বন্দীর মতো তাঁদের মূর্তি। যারা ঘর ছেড়েছে শোকার্তের মতো তাদের চোখের দৃষ্টি। সেইসময়'' 'মাটির দীক্ষা' গল্পটির প্রেক্ষাপট। হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গার ঘটনার প্রেক্ষাপট তাঁর ছোটোগল্পে আর পাওয়া যায় না। অথচ আমরা জানি নোয়াখালির দাঙ্গার সময় এই লেখক গান্ধীজির সঙ্গী হয়ে ছিলেন তাছাড়া সেই দাঙ্গায় তাঁর এক সহকর্মী বন্ধু শচীন্দ্রনাথ মিত্র শহীদ হয়েছিলেন। অথচ ছেচল্লিশের সেই দাঙ্গার প্রেক্ষাপট সুবোধ ঘোষের ছোটোগল্পে কালের প্রতিমা রূপে ফুটে উঠলো না কেন?— এর উত্তর স্বয়ং লেখক 'ফসল' নামক এক পত্রিকায় প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে জানিয়েছেন, ''...সাম্প্রদায়িক হানাহানি দেশের জীবনে অনেক বেদনা ও বিপর্যয় ঘটিয়েছে। ঐ বিষয়ে আমার চোখে দেখা অভিজ্ঞতাও যথেষ্ট আছে। নোয়াখালির ভয়ানক স্মৃতি আমার কাছে আজও একটা দুঃসহ বেদনা। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ঘটনাকে পটভূমি করলে দাঙ্গার নিদারুণ বীভৎস ও নিষ্ঠুরতার বাস্তব চিত্রটিও আঁকতে হয়। কিন্তু সেটা করলে ফল খুব খারাপ হতে পারে। সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ এখনও আমাদের জনজীবনে একটা সমস্যা। সুতরাং সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার নিষ্ঠুর ও বীভৎস বাস্তবতার বর্ণনা বর্তমান অবস্থায় সমাজের পক্ষে ক্ষতিকারক হতে পারে; বিদ্বেষবাদীর মনে প্ররোচনা হয়ে উঠতে পারে। সেই জন্যই লিখিনি।''[১৫]

স্বাধীনতার প্রেক্ষাপটে গণবিক্ষোভের ছোটোগল্প হিসেবে সুবোধ ঘোষের 'কালাগুরু' আর 'শিবালয়' গল্প দুটিকে অবশ্যই উল্লেখ করতে হয়। পরাধীন ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করে পরাধীনতার নাগপাশে আবদ্ধ থেকে সুবোধ ঘোষ দুটি গল্পকেই বিহারের আগস্ট আন্দোলনের পটভূমিকায় রূপ দিয়েছেন। এই আগস্ট আন্দোলন সারা ভারতবর্ষে প্রসারিত ছিল, কিন্তু মূলত জঙ্গীরূপ ধারণ করেছিল বিহার, মহারাষ্ট্র এবং বাংলাদেশে। হ্যানিংহ্যাম এস-এর 'Quit India in Bihar and the Eastern united Provinces' এবং আর. গুহ সম্পাদিত 'Subaltern Studies' গ্রন্থে বিহারে ভারতছাড়ো আন্দোলনের ব্যাপকতার কথা লিপিবদ্ধ হয়ে আছে। এস. হ্যানিংহ্যামের রচনা থেকে জানা যায়, বিহারের আগস্ট আন্দোলনের নেতৃত্ব ছিল মূলত ছাত্রদের হাতে, যা কালাগুরু গল্পটিতে আমরা তার পরিচয় পাই।

'কালাগুরু' গল্পটিতে সেখপুরা মহকুমার হাকিম মি. জেরোম টি. এল. ট্রেনব্রুক আগস্ট আন্দোলন মোকাবিলা করার জন্যে জনজীবনে গভীরভাবে মেলামেশা করেন। গল্পে তিনি ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের প্রতিনিধি। তিনি প্রাচ্যবিদ, ভারতীয় ভাষা জানেন, ঋগ্বেদের ওপর থিসিস আছে— এমনকি ভারতীয় আত্মাকে জানেন বলে দাবি করেন। ফলে আগস্ট আন্দোলনের ঝোড়ো হাওয়া সেখপুরার জনজীবনকে যাতে চঞ্চল না করে তার জন্য তিনি বক্তৃতায়, হ্যান্ডবিলে গণতন্ত্রের জয়গান করেন। পুলিশকেও সতর্ক করেন, বলেন, 'তারা জনসাধারণের ভাগ্যবিধাতা। তারা পাব্লিকের সেবক।' সেখপুরার

যুবছাত্ররা যাতে আন্দোলনে মত্ত হয়ে না ওঠে তার জন্যে বিদ্যাপীঠের ছেলেদের সঙ্গে ফুটবল পর্যন্ত খেলে। কিন্তু বিদ্যাপীঠের ছাত্র করালীবাবুর ছেলে বলাই খেলার সময় বার বার সাহেব টেনব্রুককে ল্যাং মেরে ফেলে দেয়। রেফারী অনাদি মাস্টার ভয় পেয়ে যান।— এখানেই গল্পকার লড়াই-এর ইঙ্গিতটুকু দিয়ে রেখেছেন। এই বলাই-এর নেতৃত্বে ছাত্রসমাজ প্রতিদিন ভোরে প্রভাতফেরী বের করেছে স্বদেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করতে। গান শুনে বুক কেঁপে উঠেছিল সাহেবের— "নয়া জমানার সূর্য উঠেছে। জাগো আমার হিন্দুস্থানী ভাই আর বহিন। জেগে উঠে নতুন রশ্মি পান কর।"— এই আন্দোলন ঠেকাতে টেনব্রুক ছাত্রদের দিয়ে পালটা শোভাযাত্রা করিয়েছিলেন স্বরচিত গানের ফেরী করিয়ে—

"আমি যীশুর ছোট মেষ
প্রতিদিন মোর সুখ অশেষ।"

কিন্তু শেষপর্যন্ত নিশ্চিন্ত না হয়ে গোটা শহরটাকে কর্ডন করে ঘিরে রাখতে পুলিশবাহিনীকে নির্দেশ দেন, কারণ যে গান গাইবে তাকে অ্যারেস্ট করা হবে। ওদিকে লোকাল বোর্ডের একুশজন সদস্য পদত্যাগ করেছে। স্বরাজ আদায়ে তিনদিন হরতাল হল। রায়গঞ্জ কোলিয়ারিতে ধর্মঘট শুরু হয়েছে। শহরে জনসভা হয়েছে। স্বরাজ পতাকা নিয়ে একটা মিছিল বের হয়েছে। কিন্তু মি. টেনব্রুক এতে ভীত নয়, ভীত শুধু ছাত্রদের আন্দোলন ঘিরে। বলাই-এর নেতৃত্বে কালাগুরুর সুগন্ধের সঙ্গে ভেসে আসছে প্রভাতফেরীর গান— সবকিছুকে উপেক্ষা করে। দোর্দণ্ডপ্রতাপ প্রশাসকের কাছে নির্দেশ গেল, ইস্টার্ন রাইফেলের কাছে নির্দেশ গেল, ডি. এস. পি'র কাছে নির্দেশ গেল— গ্রেপ্তার করা হল বলাইকে— মাথায় ব্যান্ডেজ, কোমরে দড়ি, হাতে হাতকড়া— বলাইকে জেলা আদালতে হাজির করা হল। বাইরে শত শত ছাত্রের যুদ্ধং দেহি রণহুঙ্কার। দেশি ডি.এস.পি-ও হুঙ্কার ছাড়লেন— 'চার্জ'।

—দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের একটি বিরাট অধ্যায়কে গল্পের ফ্রেমে বন্দি করে গেলেন জাতীয়তাবাদী গল্পকার সুবোধ ঘোষ। যেন জাতীয় কর্তব্য পালন করে গেলেন গণবিক্ষোভের এই অনবদ্য গল্পটি রচনা করে। এ ধরনের আরেকটি ভিন্ন স্বাদের ছোটোগল্প 'শিবালয়'।

'শিবালয়' গল্পেও শুরু হয়ে গেছে আজাদী লড়াই। এলাকার সববয়সী জনতা তসীল কাছারীর দিকে ছুটে চলেছে। পরশাসনের গ্লানির চিহ্নকে ওরা অগ্নিশুদ্ধ করবে। স্লোগান উঠেছে— 'জান হাজির হ্যায় আগ কর দো ইসারা গান্ধী।' গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র মুদির দোকানী অনন্তরাম গান্ধীভক্ত এবং সমাজসেবী। অবসর সময়ের সাক্ষী রামচরিতমানস। অনন্তরামের স্ত্রী প্রমীলা শিবভক্ত, তাকে পাবার অভিলাষে ট্যাকসি ড্রাইভার কৈলাস শিবসাধনায় মেতেছে— মতলব খারাপ। অনন্তরাম বুঝতে পারে। তুলসীদাসের দোঁহার মধ্যে সে নিজেকে খুঁজে পায়—

"অজহুঁ কছু সংশয় মন মোরে।
করহু কৃপা বিনাঁউ কর জোরে।।"

অনন্তরাম আজ আজাদীর সংগ্রামের মধ্যে রামচরিত মানসের সম্পর্ক আবিষ্কার করে। তার কাছে গান্ধীজির আহ্বান আর রামচরিতমানস মুহূর্তের মধ্যে একাকার হয়ে যায়। সেভাবে, 'গান্ধীজী গান্ধীজী— রামজীর আত্মাটি বুঝি নতুন করে আবির্ভূত হয়েছেন।' কাজেই সব পিছুটান উপেক্ষা করে 'কংগ্রেস জিন্দাবাদ', 'করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে' বলে অনন্তরাম ঝাঁপিয়ে পড়ে মিছিলের প্রথম সারিতে। আর সাম্রাজ্যবাদী বুলেট এসে ঝাঁঝরা করে দেয় অনন্তরামের বুক। একখণ্ড ভূমিকে রঙিন করে দিয়ে অনন্তরাম নিজেও রঙিন হয়ে গেল ভারবর্ষের বুকে। আর ভূমিখণ্ডটুকু স্বাধীনতাবাদী মানুষের তীর্থস্থান হয়ে উঠতে পারে আশঙ্কা করে অনন্তরামের মৃত্যুস্থল ঘিরে রাখল পুলিশ। আর সেই পবিত্রস্থানে এসে লুটিয়ে পড়ল স্ত্রী প্রমীলা— "গৌরী নয়, সীতাও নয়। কৌতূহলী জনতা শুধু বুঝতে পারলো, নতুন সরাইয়ের অনন্তমুদীর বৌ কাঁদছে।"— এইভাবে গল্পের প্রতিমাকে নির্মাণ করেছেন গল্পলেখক।

দাঙ্গা, স্বাধীনতা, দেশভাগ, উদ্বাস্তু স্রোত, যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ— এই সবেরই প্রেক্ষাপটে সুবোধ ঘোষের ছোটোগল্পের প্রতিমা নির্মিত হয়েছে অবাধে। এ কালের পটভূমিতেও ছোটোগল্পকার সুবোধ ঘোষকে বেশি করে উপলব্ধি করা যায়। যদিও তাঁর বিচিত্র গল্পের ভুবন। বিচিত্র তার বিভাজন। আর সবক্ষেত্রেই কোনো না কোনোভাবে এই বিশ্বযুদ্ধের কাল ও তার লক্ষণগত প্রভাব খুঁজে পাওয়া যায়। তা সেই তাঁর দাম্পত্যজীবন নির্ভর গল্পই হোক, অথবা অন্যান্য গল্পই হোক। বিশ্লেষণ করলে মনস্তত্ত্ব, নৃতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব— উদ্‌ঘাটিত হয়, যা তাঁর সমকাল ব্যতিরিক্ত নয়। তবে তাঁর গল্পরচনার তাগিদ আর কারিগরি শিল্পটি ছিল চমৎকার। 'সেদিনের আলোছায়া নামক জীবনস্মৃতিতে গল্পকার এক স্থানে জানিয়েছেন, "যখনই গল্প লিখেছি তখনই বুঝতে পেরেছি যে, বিশেষ একটি জিজ্ঞাসার প্রেরণা ছাড়া গল্প লেখাই সম্ভব নয়, যদিও গল্পের মতো চেহারার এক একটা বাক্-সামগ্রী নির্মাণ করা সম্ভব।"[১৬] এরকম তাঁর বহু বিচিত্র কথা স্থান পেয়েছে 'সুবোধ ঘোষ : প্রবন্ধাবলী' পুস্তকের প্রথম অধ্যায়ে। কিন্তু আবার মজার ব্যাপার হল, এর দু-তিনটি-কে গল্পকার ছোটোগল্পের বাণীরূপ দান করে অনবদ্য ছোটোগল্পে উপহার দিয়েছেন। যেমন তাঁর 'দিব্যানুভূতি' রচনাংশটি রূপ লাভ করেছে 'অশোকের শিলালিপি কাঁদল' নামক অভিনব কিশোর গল্পে। আবার 'লালকি নদীর বাঁধ' রূপ নিয়েছে 'ভাট তিলক রায়'-এর মতো ছোটোগল্পে। গল্পে সরাসরি উল্লেখ রয়েছে, 'লালকি নদীর বাঁধ তখনো তাদের কাছে শত্রু হয়ে আছে। কিন্তু তিলক রায় আসে মাঝে মাঝে।' লালকি নদীর বাঁধ নির্মাণে তিলক রায় একসময় শ্রমিক শ্রেণির হয়ে নেতৃত্ব দিয়েছিল। তেমনি 'রসিদ খলিফার মামাবাড়ি' সরাসরি ছায়া ফেলেছে 'বৈরনির্যাতন' ছোটোগল্পে, 'যন্ত্রদানব নয়' 'অযান্ত্রিক' ছোটোগল্পে। 'অতীত রূপ ও রূপাতীত' ছায়া ফেলেছে নতুন ও পুরাতন কালের দ্বন্দ্বমুখর ছোটোগল্প 'নতস্থৌ'-তে। তেমনি 'পশুপালিত মানুষ' আছে

'বিলিবাঘিনী দুঃখের কারণ কি' নামক কিশোর গল্পে। 'ময়না ঘরের বিস্ময়' ফুটে উঠেছে 'ফসিল' গল্পে। 'শিল্পীর স্বাধীনতা' 'কতটুকু ক্ষতি' গল্পে। 'কেন সে সুন্দর' 'সুন্দরম' ছোটোগল্পে। 'কিংবদন্তির প্রসঙ্গ' আছে কিংবদন্তির গল্পগুলিতে। ইত্যাদি ইত্যাদি ইত্যাদি। আদিবাসী জীবনকেন্দ্রিক সমস্যামূলক প্রবন্ধগুলির এক চিন্তা ছায়া ফেলেছে 'চতুর্থ পানিপথের যুদ্ধ' গল্পে। 'উপজাতীয় সমাজ সংহতি' প্রবন্ধে প্রাবন্ধিক সুবোধ ঘোষ সরাসরি জানিয়েছেন, 'উপজাতীয় সমাজের সংহতিকে যদি সত্যি সত্যি কেউ বিনষ্ট করে থাকে, তবে সেটা করেছে ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট।'[১৭] আদিবাসীদের ধর্মান্তকরণের বিষয়টিকে 'চতুর্থ পানিপথের যুদ্ধ' গল্পে দেখানো হয়েছে— আমরা যদি অর্থাৎ জাতির জীবনের মানুষ (মূলত বাঙালি এবং বিহারি) ইংরেজদের বিরুদ্ধে (মিশনারিদের বিরুদ্ধে) আদিবাসীদের লড়াইতে (স্টিফান হোরোর লড়াইকে) সাথ দিতাম, তাহলে ঐভাবে তাদের পরাজয় হত না। এর জন্যে গল্পকার জাতির মানুষদেরই দায়ী করেছেন পরোক্ষভাবে— গল্পটিতে এভাবেই সেদিনের ধর্মান্তরণের প্রসঙ্গটিতে কালের প্রতিমা নির্মাণ করেছেন গল্পকার সুবোধ ঘোষ।

পরিশেষে এ-কথা বলা চলে, গল্পনির্মাণের কারিগরি প্রসঙ্গে গল্পকার সুবোধ ঘোষ অত্যন্ত কালসচেতন ছোটোগল্পকার। কালই তাঁর ছোটোগল্পের রক্তবীজ।[১৮]

উল্লেখপঞ্জি :

১. ভরা থাক সুবোধ ঘোষ স্মৃতি তর্পণ— সুবোধ ঘোষ স্মৃতি সংসদ; প্রথম প্রকাশ : আশ্বিন ১৩৯৮, প্রবন্ধ : যে বনস্পতির নাম— সন্তোষকুমার ঘোষ, পৃ. ১০০

২. সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটে বাংলা ছোটগল্প— ড. ভাস্বতী চক্রবর্তী (লাহিড়ী), দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা ৭৩, প্রথম দে'জ সংস্করণ, জানুয়ারি ২০০৩, ভূমিকা, উজ্জ্বলকুমার মজুমদার।

৩. আনন্দবাজার পত্রিকা, প্রবন্ধ : যন্ত্রদানব নয়, সুবোধ ঘোষ, কালপুরুষের সাতপাঁচ, পৃ. ৮৮

৪. ঐ, পৃ. ১৬৪

৫. সুবোধ ঘোষের শ্রেষ্ঠ গল্প— সম্পাদনা জগদীশ ভট্টাচার্য, প্রকাশভবন, ১৪০১, ভূমিকা : জগদীশ ভট্টাচার্য, পৃ. ২

৬. ভরা থাক সুবোধ ঘোষ স্মৃতি তর্পণ— সুবোধ ঘোষ স্মৃতি সংসদ, ১৩৯৮, প্রবন্ধ : ছোটগল্প, চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, ড. উজ্জ্বলকুমার মজুমদার।

৭. Ernest Fischer—The Origin of Art, The Necessity of Art, Marxism & Art, Edited by Berel Lang and Forrest Williams, Network, 1972, p. 137

৮. ভরা থাক সুবোধ ঘোষ স্মৃতি তর্পণ— সুবোধ ঘোষ স্মৃতি সংসদ, ১৩৯৮, স্মৃতির

সৌরভ, মুকুলরাণী ঘোষ।

৯. সুবোধ ঘোষের ছোটগল্পে মানবিক মূল্যবোধ, ড. শিবশংকর পাল, সুবর্ণা প্রকাশনী, কলকাতা-৭৩, ১৯৯৯, পৃ. ১৫৫

১০. শ্রেষ্ঠ গল্প, শ্রেষ্ঠ লেখক, সুবোধ ঘোষ (প্রথম লেখক), কৈফিয়ৎ, ১৯৪৯

১১. ঐ।

১২. বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা— শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, মডার্ন বুক এজেন্সি, ১৯৮৪

১৩. প্রবাসী, আষাঢ়, ১৩৫০

১৪. ঐ।

১৫. ফসল, ৮/৩/১৯৬৩

১৬. সুবোধ ঘোষ : প্রবন্ধাবলী, সম্পাদনা নিতাই বসু, সাহিত্যলোক, জানুয়ারি ২০০০, সেদিনের আলোছায়া, সুবোধ ঘোষ, পৃ. ৪৭৯

১৭. ঐ, প্রবন্ধ : উপজাতীয় সমাজ সংহতি, পৃ. ২৮২

১৮. "চল্লিশের দশকে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের বহ্নিজ্বালার যুগে একদিকে তারাশঙ্কর, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় যেমন মানবিকতা ও সমাজের অনাচার অবিচারের বাস্তব রূপকে তুলে ধরলেন, অন্যদিকে সুবোধ ঘোষ, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, সন্তোষকুমার ঘোষ, সমরেশ বসু, সুশীল জানা, ননী ভৌমিক, নবেন্দু ঘোষ প্রমুখ লেখকরাও বিভিন্ন মানসিক জটিলতা ও বিষয়বস্তুর অভিনবত্ব, আঙ্গিকের তীক্ষ্ণতা ও বাস্তবতার মধ্য দিয়ে বাংলা ছোটোগল্পকে এগিয়ে নিয়ে চললেন নতুন আবর্তে। দুর্ভিক্ষ, মন্বন্তর, দাঙ্গা, স্বাধীনতা, উদ্বাস্তু আগমন, মধ্যবিত্ত মানসিকতার বিপর্যয় প্রভৃতি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধপ্রসূত ঘটনাবলী ও তজ্জনিত বীভৎসতা এই লেখদের হাতে বিশেষ সার্থক রূপ লাভ করেছে।"

— সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটে বাংলা ছোটগল্প, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের ‘অঘ্রানে অন্নের ঘ্রাণ’, ‘বুঢ়াপিরের দরগাতলায়’, ‘সোনার পিদিম’ : শ্রেণি সমাজের আড়ালে নিম্নবর্গের অব্যক্ত যন্ত্রণা

প্রতাপ বিশ্বাস
গবেষক, রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দির

সারসংক্ষেপঃ বাংলা সাহিত্য সমালোচনায় ‘নিম্নবর্গ’ আজ একটি প্রধান আলোচ্য বিষয়। ইতিহাস-সমাজবিজ্ঞান চর্চার মহলে ‘সাবলটার্ন স্টাডিজ’ এখন খুবই পরিচিত একটি নাম। অতীতকাল থেকেই সমাজের একটি বৃহদংশের মানুষকে বারেবারেই নানা কৌশলে নিম্নবর্গে পরিণত করা হয়েছে। বর্ণভেদ তথা জাতিভেদের জাতাকলে পড়ে যুগে যুগে পিষ্ট হচ্ছে এক শ্রেণির মানুষের জীবন। এই নিম্নবর্গের সামাজিক অবস্থান তথা শোষণ বঞ্চনার ইতিহাস বারেবারেই উঠে এসেছে বিভিন্ন লেখনীর মাধ্যমে।সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের সাহিত্যের বিভিন্ন অঙ্গনে উঠে এসেছে এইসব সর্বহারা, বঞ্চিত, শোষিত শ্রেণির মানুষের ইতিহাস। তেমনই তিনটি গল্প– ‘অঘ্রানে অন্নের ঘ্রাণ’, ‘বুঢ়াপিরের দরগাতলায়’, ‘সোনার পিদিম’ নিয়ে এই আলোচনা।
সূচক শব্দঃ নিম্নবর্গ,সর্বহারা, প্রভুত্ব, অধীনস্ত, উচ্চবর্গ, শঠতা।

মূল আলোচনাঃ

> “ব্রাহ্মনঃ ক্ষত্রিয়ো বৈ্যস্ত্রয়োবর্ণা দ্বিজায়তঃ।
> চতুর্থ একজাতিস্তু শূদ্রো নাস্তি তু পঞ্চমঃ।।”[১]

মনুসংহিতার এই শ্লোক অনুসারে সমাজবিন্যাসের ধারায় শূদ্র জাতির পরে সমাজে আর কোন বর্ণেরই স্থান নেই। এবং সমাজে প্রথম তিন বর্ণই দ্বিজ – নিম্নবর্গ সব ক্ষেত্রেই অবহেলিত ও পরিত্যক্ত। মানব সভ্যতায় চিরকালই একদল মানুষ থাকে, যারা ঠিক মানুষ নয়। অথবা যাদের মানুষ হয়ে ওঠা হয়নি। তারাই সমাজের বাহন ; চিরকালই সমাজের উচ্ছিষ্টে তারা পালিত। পরিশ্রম, অসম্মান, উপরওয়ালাদের লাথি ঝাঁটাই তাদের প্রাপ্য। পুঁজিবাদের অসম বণ্টনে তাদের জন্ম। সমাজ সভ্যতার দীপ মাথায় নিয়ে যারা দাঁড়িয়ে আছে যুগ যুগ ধরে, নিজে জ্বলে যারা আলোক বিতরণ করে, তারাই নিম্নবর্গ।পুঁজিবাদের অসম বণ্টন যেখানে বর্তমান সেখানে ভেদাভেদ অনিবার্য। প্রাবন্ধিকের মতে আমাদের দেশ ভারত দু’ভাগে বিভক্ত – “একদল ভারতবাসী থাকেন ইন্ডিয়া-য়, আরেকদল ভারতবর্ষ-এ। দ্বিতীয় দলের সংখ্যা ভারী...... সমাজ বিজ্ঞানের পরিভাষা ব্যবহার করলে উচ্চবর্গের ভারত এবং নিম্নবর্গের ভারত।”[২] ইতিহাস সমাজ বিজ্ঞান আলোচনার সূত্রেই নিম্নবর্গ (subaltern) এখন একটি তত্ত্বে পরিণত হয়েছে। ইতিহাস কখনোই নিরপেক্ষ হয়না। কারণ সমাজে বসবাসকারী মানুষের পক্ষে নিরপেক্ষ

ইতিহাস তুলে ধরা সম্ভব নয়। যে সমাজে আমরা বাস করি, সেই সমাজ ব্যবস্থার উপর নির্ভর করে যে আমরা কি চোখে সমাজের ইতিহাসকে দেখব। আসলে ইতিহাসের স্পন্দনকে নিয়ন্ত্রণ করে ধনতন্ত্রবাদ।

সমাজতত্ত্বের আলোচনায় 'নিম্নবর্গ' ধারণাটি এসেছে মূলত মার্কস চর্চার সূত্রে। ইতালির বিখ্যাত কম্যুনিস্ট নেতা আন্তেনিও গ্রামসি তাঁর বিখ্যাত 'কারাগারের নোটবই' (A Prisoner's Note Book, ১৯২৯ থেকে ১৯৩৫ সালে রচিত) গ্রন্থে মার্কস-এর ভাবনাকে মুসলিনির প্রহরা এড়িয়ে 'প্রলেতারিয়েত' শ্রেণি অর্থে 'সাবলটার্ন' শব্দটি সুকৌশলে প্রয়োগ করেছিলেন। ব্যাপকার্থে এই প্রতিশব্দটি ইতালির পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় মেহনতি শ্রমিক শ্রেণিকেই নির্দেশ করে। তবে 'নিম্নবর্গ' ইংরেজি 'সাবলটার্ন' (subaltern) শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ। ইংরেজি ভাষায় সাবলটার্ন (নিম্নবর্গ)শব্দটি সামরিক বাহিনী তথা সামরিক সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত। সাধারণত ক্যাপ্টেনের অধস্তন অফিসারদেরই সাবলটার্ন হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। আভিধানিক অর্থ এই রকম- "Under the control or influence of someone or something that is more powerful"[৩]; অর্থাৎ সাবলটার্ন মানে অধস্তন, নীচে যার অবস্থান। আবার অ্যারিস্টটলের মতানুসারে "সাবলটার্ন হচ্ছে এমন কোন বচন যা সব সময় অন্য বচনের অধীন- যা বিশিষ্ট , মূর্ত, সার্বিক নয়।"[৪] অধীন অর্থাৎ পুঁজিবাদী অসম বণ্টনের কর্তৃত্ব, ক্ষমতা, আধিপত্যের অধীন। এই অধীনতার ফলেই একদল ক্রমশই নীচে নেমে আসে। এই নীচে থাকা মানুষেরাই নিম্নবর্গ। সমাজ বিন্যাসের সর্বস্তরেই এরা পরিত্যক্ত।

সুতরাং ব্যাপকার্থে সামাজিক ক্ষমতা বিন্যাসের ধারায় শ্রেণিবিভক্ত সমাজে যারা প্রভুত্ব বিস্তার করে, তার বিপরীতে অবস্থানকারী শ্রেণিই সাবলটার্ন বা নিম্নবর্গ । এই মানদণ্ডের বিভাজনে শ্রমিক শ্রেণি, গরিব চাষি, মজুর সবাই নিম্নবর্গ। নিম্নবর্গের ইতিহাস বলে, "ইংরেজশাসিত ভারতবর্ষে যারা প্রভুশক্তির অধিকারী ছিল"[৫]– তারাই উচ্চবর্গ। এই বিভাজন মেনে উচ্চবর্গ বহির্ভূতদের বলা হয় নিম্নবর্গ। ঔপনিবেশিক ভারতে 'ক্ষমতা' শব্দের মাপকাঠিতে বিভাজিত হয় উচ্চবর্গ ও নিম্নবর্গ। বিশ শতকের শেষদিকে এদেশে সাবলটার্ন সম্পর্কিত চর্চা শুরু হয়। ১৯৮২ খ্রীস্টাব্দে 'সাবলটার্ন স্টাডিজ' প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষে নিম্নবর্গের ইতিহাস চিন্তাচর্চার একটি নতুন ধারা প্রচলিত হয়। আমাদের প্রথাগত ইতিহাস থেকে বেরিয়ে এসে সমাজের অকথিত ইতিহাস তুলে ধরার একটি নতুন ধারা তৈরি হল নিম্নবর্গের ইতিহাস চিন্তাচর্চার সঙ্গে সঙ্গে। সাধারণ মানুষ প্রাধান্য পেল এই ইতিহাস চর্চার ক্ষেত্রে।নিম্নবর্গের ঐতিহাসিকগণ নিম্নবর্গের মানুষের চোখ দিয়ে ইতিহাসকে দেখার এক সমান্তরাল পাঠ রচনা করলেন নিম্নবর্গের ইতিহাস চর্চার মাধ্যমে।

বাংলা সাহিত্য-আলোচনার পরিসরে বর্তমানে 'নিম্নবর্গ' একটি বহু পরিচিত পরিভাষা। বিশ শতকের শেষ দিকে সাবঅলটার্ন চর্চা শুরু হলেও, সাহিত্যে নিম্নবর্গের চর্চা বহু আগে থেকেই শুরু হয়েছে। বাংলা সাহিত্যের তিন বন্দ্যোপাধ্যায় থেকে শুরু

করে মহেশ্বেতা দেবী প্রমুখের লেখায় গুরুত্ব পেতে থাকে নিম্নবর্গের মানুষ। “আধিপত্যহীন ভারতীয় জনগণ, আদিবাসী, মুণ্ডা, গ্রামের মানুষ, নারী, প্রান্তিক জনগণ, ঔপনিবেশিক শিক্ষার আলোক বহির্ভূত ও ধর্মভীরু মানুষদের কথা স্বাধীনতাপরবর্তী বাংলা উপন্যাসগুলিতে বেশি করে ফুটে উঠেছে।”[৬] ভারতে নিম্নবর্গের ইতিহাস চিন্তাচর্চার একটি স্বতন্ত্র ধারা প্রচলিত হয়েছে বিগত কয়েক দশকে। নিম্নবর্গ ধারণাটির উদ্ভব অতি সাম্প্রতিক হলেও তার বিস্তার ও প্রয়োগ ভারতবর্ষীয় সমাজ-সাহিত্যের সুদূরে। বাংলা সাহিত্যের আদি নিদর্শন চর্যাপদ থেকে শুরু করে প্রাগাধুনিক পর্বের প্রায় সব সাহিত্যেই উঠে এসেছে প্রান্তিক, অন্ত্যজ শ্রেণির মানুষেরা। নিম্নবর্গীয় মানুষের জীবনমুখিতায় অভিষিক্ত হয়েছে কল্লোল বাস্তবতার যুগ। বাংলা সাহিত্যে নিম্নবর্গের জীবনবৈচিত্র্য রূপায়ণে মানিক, বিভূতি, তারাশঙ্করের ভূমিকা অপরিসীম। এছাড়া নিম্নবর্গের আখ্যান নির্মাণে যাঁরা সক্রিয়তা দান করেছেন, তাঁদের মধ্যে সতীনাথ ভাদুড়ী, অদ্বৈত মল্লবর্মন, কমলকুমার মজুমদার, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ, মহাশ্বেতা দেবী, সমরেশ বসু প্রমুখ স্মরণীয়। সাম্প্রতিক এ ধারায় আছেন অনিল ঘড়াই, অভিজিৎ সেন, তপন বন্দ্যোপাধ্যায়, নলিনী বেরা প্রমুখ। উঠে এসেছে শ্রমজীবী মানুষের জীবন সংগ্রামের চিত্র। ‘আরণ্যক’, ‘হাঁসুলি বাঁকের উপকথা’, ‘পদ্মা নদীর মাঝি’, ‘অরণ্যের অধিকার’, ঢোঁড়াই চরিত মানস – প্রভৃতি উপন্যাসে উঠে এসেছে নিম্নবর্গীয় সমাজ ও জীবনের জীবন্ত চিত্র। এ-সব উপন্যাস পাঠের মাধ্যমে আমরা সমাজের এইসব অবহেলিত মানুষদের সম্পর্কে জানতে পারি। জানতে পারি, আর্থ-সামাজিক পরিকাঠামোয় এদের অবস্থান সম্পর্কে।কখনো আর্থিক ক্ষমতা, কখনো সামাজিক ক্ষমতা, কখনো বা প্রভুত্বের নিরিখে পিছিয়ে পড়া, তলানিতে থাকা শ্রেণিই নিম্নবর্গের ধারণায় বর্গীভূত হয়।

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের লেখক সত্তায় জড়িয়ে রয়েছে রাঢ়বঙ্গের প্রাণতা। তিনি ছিলেন প্রকৃতিপ্রেমী। কিন্তু তা সত্ত্বেও পাঠকবর্গকে উপহার দিয়েছেন কর্নেলের মত গোয়েন্দা চরিত্র। নগর তথা নাগরিক জীবনের তুলনায় পল্লী জীবনের বৃত্তান্ত রচনাই তাঁর সাহিত্যের মূল উপজীব্য বিষয়। রাঢ় বাংলার এক বিশেষ অঞ্চলের গ্রাম্য জীবন ও সেখানকার মানুষজন উঠে এসেছে তাঁর গল্পে। যে জীবনে বেঁচে থাকাটাই মূল লক্ষ্য, আর তার জন্য প্রয়োজন খাদ্য। খাওয়ার জন্য বাঁচা, আর বাঁচার জন্যই খাওয়া যাদের প্রধান বিষয়। সভ্যতা যেখানে এসে থমকে দাঁড়ায়। সভ্য সমাজের নিয়ম নীতি এখানে অর্থহীন। এই মানুষদের আদিম ও জৈবিক প্রবৃত্তির জীবনচিত্র তিনি অঙ্কন করেছেন। তাঁর কাহিনিতে যেমন আছে শ্রমজীবী, নিরন্ন ভিক্ষুক, ঠিক তেমনই আছে তাদের শোষণকারী জোতদার, ব্যবসায়ীরা। নির্দিষ্ট কোন নিয়মে এদের জীবন চালিত নয়; এই সত্যকেই তুলে ধরেছেন সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ। উঠে এসেছে এইসব অন্ত্যজ জাতির ব্যক্তিজীবনের সংগ্রাম, লোভ, লালসা, সরলতা, শঠতা, বেঁচে থাকার লড়াই প্রভৃতি।

(১)

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের অন্ত্যজ জীবনাশ্রিত গল্প – 'অঘ্রানে অন্নের ঘ্রাণ'। সমাজের উঁচু শ্রেণির মানুষের শঠতা, হিংস্রতা, জৈবিক ক্ষুধা নিবারণের মাশুল গুনতে হয় অন্ত্যজ মানুষদেরকে। নিজেদের ভোগ বাসনা চরিতার্থ করবার জন্য নিশানা করা হয় সর্বহারা শ্রেণির মানুষদেরকে। এবং এইসব নিম্নবর্গীয় শ্রেণির মানুষেরাও তাদের ক্ষুধা নিবারণের জন্য, আরও একটু ভালো ভাবে বাঁচার জন্য ধরা দেয় উচ্চবর্গের লোভের ফাঁদে।

'অঘ্রানে অন্নের ঘ্রাণ' গল্পের মূল উপজীব্য বিষয় গ্রামের অর্থবান মোড়ল কর্তৃক নিম্নবর্গের এক নারীর উপরে অত্যাচারের কাহিনি। গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র আদুরি বেওয়ারের পিতৃহীন একমাত্র মেয়ে চিরুনি। যাদের জীবনে খাবার জোগাড় করা এক অতি কঠিন বিষয়। যে জীবনে গুগলির ঝোল মেশানো ঠাণ্ডা ভাতের আঘ্রাণ শিহরণ তোলে মনে প্রাণে। মাঠঘাট ঘেঁটে গুগলি, মাঠের ক্ষেতে জন্ম নেওয়া শাক, শামুক, ঝিনুক প্রভৃতি যাদের রোজকার খাদ্য। গরম ভাত যাদের কাছে দুর্লভ, দুষ্প্রাপ্য বস্তু। নেই যাদের শরীরের লজ্জা ঢাকার নূন্যতম বস্ত্রটুকুও। সেই চিরুনি নবান্ন উপলক্ষ্যে তার মাসির বাড়ি যেতে চায়, গরম ভাপ ওঠা ভাত খেতে পাবার আশায়। মায়ের আপত্তি সত্ত্বেও একসময় সে তারই গ্রামের ধনহরি মোড়লের সাথে পাড়ি দেয় মাসির বাড়ি ধামালিতলার উদ্দেশ্যে। আদুরিও মেয়েকে বারণ করতে পারেনা। কারণ বাপ মরা আদরের মেয়ের মুখে হাজার চেষ্টা করেও গরম ভাত দেবার সামর্থ্য তার নেই।

ধনহরি মোড়ল যাচ্ছিল তার শালার বাড়ি, নিজের নিখোঁজ হয়ে যাওয়া গরুর খোঁজে। কারণ তার শালা গুনিন ও কবিরাজ। ফাঁকা মাঠের মধ্যে দিয়ে যেতে যেতে সদ্য যৌবনে পা রাখা চিরুনির প্রতি কামনায় উন্মত্ত হয় ধনহরি। এবং একসময় সামান্য গুড় মুড়ি খেতে দেওয়ার মূল্যে সে চিরুনির সারা শরীরে হাতের খেলা খেলে নেয়। চিরুনিও গুড় মুড়ি খেতে পাবার লোভে অনিচ্ছা সত্ত্বেও মোড়লকে কিছু বলতে পারে না। "চিরুনি একবার ভাবে, সরে বসবে– আবার ভাবে, মোড়লবুড়োর মুড়ি আর গুড়টা ছেড়ে যাওয়া ঠিক হবে না।"[৭] কিন্তু এখানেই শেষ হয়না মোড়লের আদিম লিপ্সা। দু-হাত বাড়িয়ে একসময় সে উদ্যত হয় চিরুনির সতীত্বকে গিলে খেতে। এবার চিরুনি বাধা দেয়। কিন্তু তা না মেনে জোর করতে থাকে ধনহরি। এমনি অসহায় মুহূর্তে চিরুনিকে রক্ষা করে এক মুনিশ। সেই চিরুনিকে ধামালি তলা পর্যন্ত পৌঁছে দেবার ভার নেয়। সব কিছুকে দূরে ঠেলে চিরুনিও ধামালিতলার উদ্দেশ্যে ছোটে বুকে নবান্ন খাওয়ার বাসনা নিয়ে – গল্পকাহিনি এখানেই সমাপ্ত। নিম্নবর্গের ইতিহাস বলে, "পুরুষশাসিত সমাজে সব নারীই এক অর্থে নিম্নবর্গ।"[৮]নিম্নবর্গের নির্মাণ দেখতে হলে সমাজে নারীর অধীনতা যেমন বিশ্লেষণের বিষয়, ঠিক তেমনই নিম্নবর্গীয় নারীর অধীনতার বিষয়টিও লক্ষণীয়। দেখা যাচ্ছে, অর্থবান মানুষ অন্ন ও অর্থের লোভ দেখিয়ে নিম্নবর্গীয় মানুষের সতীত্ব সম্ভ্রমকে ভোগ করতে সক্ষম। নিম্নবর্গের জীবনও সেখানে

অসহায়। দু-মুঠো খেতে পাবার লোভে তারাও নিজেদেরকে সঁপে দেয় উচ্চবর্গের লালসা জর্জরিত থাবার নীচে।

নিম্নবর্গের ঐতিহাসিকগণ নিম্নবর্গের নিজস্ব কণ্ঠস্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। তাঁরা বলেন, ইতিহাস থেকে নিম্নবর্গের যে কণ্ঠস্বর উঠে আসে সেটি তার স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠাকারী স্বর নয়, অন্যের নির্মাণ। "ইতিহাসের দলিলে যে-কণ্ঠস্বরই শুনি না কেন, তা নিম্নবর্গের কথা নয়, অন্যের নির্মাণ।"[৯] কিন্তু সাহিত্য যখন তৈরি হয় দায়বদ্ধতার স্তর থেকে ; তখন অধীনস্ত হয়ে বেঁচে থেকেও নিম্নবর্গের কণ্ঠস্বরে সরব হয়ে উঠতে পারে সাহিত্যের পাতা । প্রভুত্ব ও কর্তৃত্বের থাবার নীচে পিঠ ঠেকে গেলে নিম্নবর্গ কখনো কখনো সরব হয়ে ওঠে, সৃষ্টি হয় কৃষক বিদ্রোহের, সাঁওতাল বিদ্রোহের। গল্পে পরের জমিতে খেটে খাওয়া মুনিসও তেমনই ফুঁসে উঠেছে উচ্চবর্গের লাম্পট্যের বিরুদ্ধে। "সাধারণভাবে ইতিহাসচর্চা-র উপাদানগুলির মধ্যে নিম্নবর্গের চরিত্র প্রতিফলিত হয়েছে নিষ্ক্রিয়, ভীরু, একান্ত অনুগত একটি জীব রূপে। একমাত্র রাজনৈতিক বিরোধের কালেই শাসকশ্রেণি তার মধ্যে 'সক্রিয় প্রতিপক্ষ'-কে চিহ্নিত করেছে।"[১০] নির্জন মাঠে একলা একটা মেয়েকে এভাবে ধর্ষিতা হতে দেখে রুখে দাঁড়িয়েছে মুনিশটি, "অ্যাই বুড়ো শালো!......কেটে বিলের জলে ভাসিয়ে দোব।"[১১] গল্পে মুনিশ চরিত্রটি এভাবেই একটি পার্শ্বচরিত্র রূপে নিম্নবর্গীয় জীবনে মানবিকতা, সহানুভূতি ও প্রতিবাদ প্রতিরোধের প্রতীক রূপে প্রস্ফুটিত হয়েছে।

(২)

নিম্নবর্গীয় জীবনের পরিবারকেন্দ্রিক গল্প 'বুঢ়াপিরের দরগাতলায়'। দারিদ্য লাঞ্ছিত পরিবারের পিতৃ-মাতৃ স্নেহ তথা দারিদ্র্য ক্লিষ্ট জীবনের পটভূমিতে রচিত হয়েছে গল্পটি। নিদারুণ অর্থকষ্টে পড়ে ও অর্থের লোভে, সর্বোপরি সন্তান সুখে থাকবে এই অভিপ্রায়ে এক অন্ধ পিতা তার শিশু পুত্রকে বেঁচে দেয় এক অর্থবান ব্যক্তির হাতে। গল্পে একসময় খেটে খাওয়া কর্মঠ বৃন্দাবন হঠাৎ করেই অন্ধ হয়ে যায়। যে হাত কখনো কারো কাছে হাত পাতেনি, পীরের দরগার সামনে সেই হাত পেতেই বৃন্দাবন বসে থাকে ভিক্ষার জন্য। নিজের অসহায় অবস্থার সাথে কিছুতেই নিজেকে মেলাতে পারে না সে, ভিক্ষে চাইতে তার এখনো বড়ো লজ্জা। তাই সে গ্রামে ভিক্ষে না করে গ্রামের বাইরে এই দরগাতলায় আসে চুপি চুপি হাত পাততে। তার অন্ধ বয়সের অবলম্বন, হাতের নড়ি তার মেজ ছেলে 'নেম্মল'।

একদিন এক নিঃসন্তান হাজি সাহেব ও তার স্ত্রী দরগায় মানত করতে এসে নির্মলকে দেখে ভালোবেসে ফেলে। বৃন্দাবনকে টাকার লোভ দেখিয়ে ও নির্মল তাদের কাছে ভালো থাকবে সেই আশা দেখিয়ে বৃন্দাবনের শিশু সন্তানকে তারা নিয়ে যায়। বৃন্দাবনও কড়কড়ে পঞ্চাশ টাকার লোভে রাজী হয়ে যায়। তাদের না খেতে পাওয়া সংসারে থাকার চাইতে বড়োলোকের বাড়ি গিয়ে নির্মল ভবিষ্যতে সমস্ত সম্পত্তির

মালিক হবে এ-ধারণাও উড়িয়ে দিতে পারেনা বৃন্দাবন। অভাবের সংসারে ছেলেকে ঠিক মতো খেতে দিতে পারে না তারা, ভাত তাদের কপালে জোটে না। বাবাকে দরগা তলায় আনার সময় নির্মল খেয়ে আসে এক বাটি আমানি – পান্তা ভাতের জল। দরগায় কোনও ভক্ত এলে কিছু খাবার জোটে, না হলে তাও নয়।

স্ত্রীকে প্রথমে কিছু না জানালেও একসময় ধরা পড়ে যায় বৃন্দাবন। কিন্তু তার স্ত্রী সুখেশ্বরী কখনোই মেনে নিতে পারেনা এ ঘটনা। সে তার অন্ধ স্বামীকে গাল দেয়। তারপর একসময় হাজি সাহেবের বাড়ি রূপপুর কাঁকসায় ছেলেকে দেখতেও চলে যায়। কিন্তু সেখানে সে হাজি বা নির্মলের কোন সন্ধানই পায়না। সন্তানহারা মায়ের হাহাকার বিষিয়ে তোলে আকাশ বাতাস। হতাশায় ভেঙে পড়ে বৃন্দাবনও, পীরের কাছে মনে মনে বিচার প্রার্থনা করে। অসহায় পিতামাতার চরম হাহাকার উঠে এসেছে এই গল্পে। সেই সাথে উঠে এসেছে উচ্চবর্গের মানুষের খল, শঠতা। মিথ্যে বলে হাজি সাহেব নির্মলকে নিয়ে গেছে নিজের স্বার্থ চরিতার্থ করবার জন্য। তার উদ্দেশ্য তাদের নিঃসন্তান জীবনে ওয়ারিশ লাভ করা। তাতে কোনও মায়ের কোল খালি হলে তাদের কিছু যায় আসে না। আসলে এভাবেই যুগে যুগে নিম্নবর্গ শোষিত হয় উচ্চবর্গের শঠতার জাঁতাকলে পড়ে।

(৩)

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের ধর্মবিশ্বাসও উচ্চবর্গের লোভ-লালসাকেন্দ্রিক ছোটোগল্প ‘সোনার পিদিম’। এ গল্পে নিম্নবর্গের বঞ্চনার আড়ালে উচ্চবর্গের লোভ লালসার মুখোশ খসে পড়েছে। বারিক বাড়ির পুরাতন ভৃত্য জনাই দীর্ঘদিন বিশ্বস্ত ভৃত্যের কাজ করে বৃদ্ধ বয়সে কর্মে উদাসীন হয়ে পড়ে ও একসময় সাধু হয়ে যায়। বাড়ির বুড়ো কর্তা ডাক্তার দেখানো ও অন্যান্য উপায় অবলম্বন করলেও ফল হয় না। ইতিমধ্যে একদিন দেখা যায় জনাইয়ের ভর পড়েছে। তাকে ভূতে ধরেছে ভেবে ডাকা হয় ওঝা গ্যাদা বাউরিকে। কিন্তু কোনও লাভ হয় না। জনাই জানায় সে কালিপাটের সাধুবাবা।

লালদিঘীর জঙ্গলের পারে কালীপাটের মন্দির। সেখানে থাকতেন এক সাধু বাবা। এই কালীপাটের ইতিহাস রহস্যময়। সাধুবাবা একদা জানতে পারেন যে মন্দিরের প্রতিমার নীচে প্রকাণ্ড বড় সোনার পিদিম রয়েছে। সাধুবাবা পিদিমটি অন্যত্র সরিয়ে রাখেন, কিন্তু অর্থলোভী মন্মথ বারিকের দৃষ্টি থেকে বাঁচাতে পারেন না। পিদিমটা পাওয়ার লোভে সাধুবাবাকে বিষ প্রয়োগ করে হত্যা করেন বারিক মশাই। সাধুবাবার কাছে দীক্ষিত জনাইয়ের এই সমস্ত ইতিহাসই জানা। সে জানে তার প্রভুর হত্যাকারী হিংস্র রূপ, যা সে কখনোই মেনে নিতে পারেনি। কিন্তু প্রতিবাদ করতে না পেরে গুমরে মরেছে।

নিজের প্রভুর অপকীর্তি নিজের কাছে ধরা পড়ে যাওয়ায় জনাই উদাসীন হয়ে পড়ে। সাধুবাবার প্রতি হওয়া অন্যায়ের প্রতিবাদ সে করতে পারেনি কারণ বারিক পরিবারের সে বহুকালের ভৃত্য। প্রভুর বিরুদ্ধে সে মুখ খুলতে পারে না, আবার সহ্য করতেও পারে না। এই টানাপোড়েনে তার মনে পরিবর্তন আসতে থাকে এবং

একসময় সে সাধু হয়ে যায়। সাধু হয়ে জনাই প্রথমেই ঘোষণা করে যে পিদিমটা মন্দিরের প্রাঙ্গনেই অশ্বত্থ তলায় পোতা আছে। এবং সে এটি প্রতিষ্ঠা করবে। মন্মথ বারিক আবার লুব্ধ হয় এবং জনাইকে অনুরোধ করে পিদিমটা দেবার জন্য। কিন্তু ব্যর্থ হয় এবং তার ছেলে সুমথ বারিক জনাইকে হত্যা করে। উচ্চবর্গের লোভ লালসার শিকার হয় নিম্নবর্গের মানুষ।

উচ্চবর্গের লোভ লালসা তাকে কোথায় টেনে নামাতে পারে এ-গল্পে তার উদাহরণ রয়েছে। সামান্য সোনার লোভে নিজের এতদিনের বিশ্বস্ত তথা কাছের ভৃত্য জনাইকে হত্যা করাতে কোন দ্বিধা হয়না বুড়ো বারিক কর্তার। নিজের ছেলেকে দিয়ে সে দু-দুবার হত্যা করিয়েছে নিরীহ মানুষকে। উচ্চবর্গের মুখোশ খসে পড়েছে। তাইতো গল্পের শেষে এসে দেখা যায় জনাইয়ের মৃত্যুর খবর শুনে বুড়ো কর্তা কেঁদে উঠলে সুমথ বলে – "থামুন! রাতদুপুরে আদিখ্যেতা করবেন না তো।"[১২] লোভের বশবর্তী হয়ে যে জনাইকে হত্যা করতে হাত কাঁপেনি বারিক মশাইয়ের, তার জন্য অশ্রু ঝরানো সত্যিই হাস্যকর তাইনা?

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের ছোটোগল্পের অন্ত্যজ চরিত্রগুলি উঠে এসেছে এভাবেই সব হারানোর ব্যথা নিয়ে। তাদের এই ট্র্যাজেডিক পরিণতির মূলে রয়েছে অপরিসীম দারিদ্যতা ও তার থেকে সৃষ্ট লোভ। নিজেদের দারিদ্যতার সাথে লড়াই এবং তার থেকে বাঁচার জন্য উচ্চবর্গের শিকার হয় বৃন্দাবন, চিরুনি ও জনাইরা। উচ্চবর্গের পুরুষের কামনা বাসনার বলি হয় নিম্নবর্গের নারী। সব বুঝেও তারা মুখ বুজে সব সহ্য করে উদর পূরণের তাগিদে। সেখানে তাদের দৈহিক পবিত্রতা শিথিল হয়ে পড়ে। তারা ধরা দেয় ধনহরি মোড়লের মতো মানুষদের কাছে। আবার বৃন্দাবনের মতো মানুষেরাও একটু ভালোভাবে বাঁচার জন্য পা দেয় উচ্চবর্গের ফাঁদে। তখন হাজার ছটফট করলেও মুক্তির উপায় থাকে না। জনাইয়ের মতো সরল মানুষেরা তো উচ্চবর্গের লোভ-লালসা, হিংস্রতার শিকার হয়। বাংলা ছোটোগল্পে বহু লেখকের হাতেই নিম্নবর্গীয় জীবন উঠে এসেছে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে। ঠিক তেমনই সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের ছোটোগল্পে নিম্নবর্গীয় মানুষের ব্যক্তিজীবন, পরিবার জীবন, অসহায়তা, লোভ-লালসা, সরলতা প্রভৃতি দিক উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে।

তথ্যপঞ্জি :

১. মজুমদার বঁরদাকান্ত। বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম। কলকাতা, সদেশ, বইমেলা ২০০৫। পৃঃ ১

২. মাঝি বিপ্লব (সম্পা.)। সন্ধান। নিম্নবর্গ সংখ্যা। কলকাতা, দিয়া পাবলিকেশন, ২০১৩।পৃঃ ১২৩

৩. মজুমদার জহর সেন। নিম্নবর্গের বিশ্বায়ন। কলকাতা : পুস্তক বিপণি, জুলাই ২০০৭। পৃঃ ১১

৪. ঐ, পৃঃ ১১
৫. ভদ্র, গৌতম এবং চট্টোপাধ্যায় পার্থ । নিম্নবর্গের ইতিহাস । কলকাতা : আনন্দ, ১৯৯৮। পৃঃ ৩২
৬. মাঝি বিপ্লব (সম্পা.)। সন্ধান। নিম্নবর্গ সংখ্যা। কলকাতা, দিয়া পাবলিকেশন, ২০১৩। পৃঃ ১০৭
৭. সিরাজ সৈয়দ মুস্তাফা। সেরা পঞ্চাশটি গল্প । কলকাতা : দে'জ পাবলিকেশন, ২০১৬। পৃঃ ২৪৮
৮. ভদ্র, গৌতম এবং চট্টোপাধ্যায় পার্থ । নিম্নবর্গের ইতিহাস। কলকাতা : আনন্দ, ১৯৯৮। পৃঃ ২০
৯. ঐ, পৃঃ ১৭
১০. মাঝি বিপ্লব (সম্পা.)। সন্ধান। নিম্নবর্গ সংখ্যা। কলকাতা, দিয়া পাবলিকেশন, ২০১৩। পৃঃ ১২৪
১১. সিরাজ সৈয়দ মুস্তাফা। সেরা পঞ্চাশটি গল্প । কলকাতা : দে'জ পাবলিকেশন, ২০১৬। পৃঃ ২৪৯
১২. ঐ, পৃঃ ২৬৮

গ্রন্থপঞ্জি :

১. ভদ্র, গৌতম এবং চট্টোপাধ্যায় পার্থ । নিম্নবর্গের ইতিহাস । কলকাতা : আনন্দ, ১৯৯৮।
২. মজুমদার জহর সেন । নিম্নবর্গের বিশ্বায়ন। কলকাতা : পুস্তক বিপণি, জুলাই ২০০৭।
৩. মজুমদার বঁরদাকান্ত। বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম। কলকাতা, সদেশ, বইমেলা ২০০৫।
৪. মাঝি বিপ্লব (সম্পা.)। সন্ধান। নিম্নবর্গ সংখ্যা। কলকাতা, দিয়া পাবলিকেশন, ২০১৩।
৫. সিরাজ সৈয়দ মুস্তাফা। সেরা পঞ্চাশটি গল্প । কলকাতা : দে'জ পাবলিকেশন, ২০১৬।

উনিশ শতকের নারীনির্মাণ ও জনমানসে তার প্রতিক্রিয়া: স্ত্রীশিক্ষা, বিবাহ ও দাম্পত্য প্রসঙ্গ

সঙ্গীতা সাহা
গবেষক, বাংলা বিভাগ, বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ: উনিশ শতকের সামাজিক প্রেক্ষাপটে স্ত্রী শিক্ষার প্রসার ঘটায় নারীর সামাজিক ও পারিবারিক অবস্থানগত পরিবর্তনের সূচনা হয়। সতীদাহ প্রথা রদ, বিধবা বিবাহ আইন, বহুবিবাহের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ইত্যাদি নানান ঘটনার সাক্ষী উনিশ শতক। ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত নব্য বাঙালি পুরুষ নতুন দৃষ্টিতে তাকালেন অন্দরমহলের প্রতি। ভারতীয় ঐতিহ্যের সঙ্গে নতুন ইংরেজি শিক্ষার সংমিশ্রণে নারী নির্মাণের যজ্ঞ শুরু হলো পত্রপত্রিকা কাব্য উপন্যাস সাহিত্যের নানান সংরূপে। এই নির্মাণযজ্ঞ মানসিক টানাপোড়েন, ঐতিহ্যের পিছুটান ও রোমান্টিক আদর্শের দ্বন্দ্বে নিষ্কণ্টক ছিল না। নারীর এই পুনর্নির্মাণ প্রক্রিয়ায় আলোকপ্রাপ্ত মেয়েরা বিভিন্ন পত্রিকায় নিজেদের চিন্তার প্রকাশ করেছেন এবং পক্ষে বিপক্ষে অনেক প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন।

সূচক শব্দ: উনিশ শতকে স্ত্রীশিক্ষা, সমাজ সংস্কার আন্দোলন, বিধবা বিবাহ, বাল্য বিবাহ, কৌলীন্য প্রথা, দাম্পত্যের নতুন ধারণা, পত্র-পত্রিকায় মেয়েদের প্রতিক্রিয়া।

মূল আলোচনা:

উনিশ শতক আধুনিকতার দিকে পা বাড়িয়ে থাকা স্ববিরোধী মনের কাল। তার মন উনিশ শতকীয় ঔপনিবেশিক শাসন ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় ইংরেজি শিক্ষার সাহায্যে পূর্বের সংস্কারকে প্রশ্ন করতে শিখেছে অথচ একেবারে নির্দ্বিধায় ঐতিহ্যকে অগ্রাহ্য বা উপেক্ষা করতে পারছে না। সেই আত্মবিশ্বাস ও ঔদ্ধত্য তার তখনও আয়ত্ত হয়নি। ইংরেজি শিক্ষার পূর্বে, ইংরেজদের চোখে ভারত বিবরণ পড়ার পূর্বে প্রথাগত শিক্ষায় শিক্ষিত ভারতবাসী সতীদাহের মর্মন্তুদ কান্না শুনে পতিব্রতার গুণগান করেছে। একটি সদ্য বিধবা অগ্নিদগ্ধ কন্যার প্রতি অন্যায়ের বিরুদ্ধে তার মন জেগে ওঠেনি। কিংবা স্ত্রী পুরুষের সম্পর্ক যে কেবল এতদিন সেবাদাত্রী ও সেবা গ্রহীতার মধ্যে সীমাবদ্ধ থেকে গেছে তাও তার উপলব্ধিতে আসেনি। এ দেশের সমাজ সংসারে তখন রত্নগর্ভা বধুর মর্যাদা অপরিসীম আর এই রত্ন অবশ্যই পুত্র সন্তান। পুত্র ভূমিষ্ঠ হলে শঙ্খধ্বনি দিয়ে প্রতিবেশীকে জানানো হত বংশের কুল প্রদীপের আগমন হয়েছে। আর তার বিপরীত চিত্র দেখা যেত কন্যা সন্তান ভূমিষ্ঠ হলে। নিঃশব্দ বাড়িতে আশাভঙ্গ হওয়ার কান্না শুনেই বোঝা যেত 'মাটির ঢেলা' এসেছে ঘরে। জন্ম গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গেই বৈষম্য ও পৃথকীকরণের রেওয়াজ থেকে ভারত আজও যখন মুক্ত নয় তখন সেকালের কথা তো সহজেই অনুমেয়।

পুত্র কুলের রক্ষক, কুল প্রদীপ আর কন্যা সম্পর্কে আশঙ্কা, তার অধঃপতনে কুলের গ্লানি ও কলঙ্ক। নারী যে পুরুষের তুলনায় চিন্তা চেতনায় সর্বদা অধমর্ণ এ ধারণা এতটাই স্বতঃসিদ্ধ ছিল যে কন্যা জন্মালে পরিবারে কুলের গ্লানি ঘটবে এমন আশঙ্কা জীবনভর করতে হত, অন্তত যতদিন না তার বিয়ে হয়ে সে পিতৃকুল ত্যাগ করছে। পিতৃকুল ত্যাগ করলে মেয়ে তখন শ্বশুরকুলের অন্তর্গত; ফলে এক পক্ষ তখন নিশ্চিন্ত হয় নিজের পরিবারের পবিত্রতা অক্ষুণ্ণ রাখা গিয়েছে ভেবে। কুলনারীর দায়িত্ব চার দেওয়ালের মধ্যে পুরুষের চোখ এড়িয়ে শিক্ষা ও চেতনার আলোক বঞ্চিত হয়ে বেঁচে থাকা। আমরা দেখেছি উনিশ শতকে ঘরে বাইরে অন্তঃপুরিকাদের কাঠামোতে যে পরিবর্তন আনার চিন্তা ভাবনা হতে থাকে সে বিষয়ে বিস্তর লেখালেখি হয়েছে। সেকালের সংবাদপত্রে প্রস্তাব, প্রস্তাবের বিরুদ্ধে প্রস্তাব, ব্যাখ্যা টীকা, শাস্ত্র প্রমাণ উত্তর প্রত্যুত্তরের পালায় সমাজে অনেক ঢেউ উঠেছিল। অবশ্য এত লেখালেখির মূল আলোচ্য মেয়েরা হলেও অধিকাংশের লেখক ছিলেন বলাবাহুল্য পুরুষেরা। পুরুষ প্রদর্শিত পথে সতীদাহ, বিধবাবিবাহ ইত্যাদি প্রথম পর্যায়ের সমাজ সংস্কার আন্দোলনে মেয়েরা স্বতঃস্ফূর্ত মতামত বা প্রতিবাদ জানিয়েছে এমন নিদর্শন দুর্লভ। অবশ্য তারা প্রকাশ্যে আসবেনই বা কি করে। যে দেশে দশ বছর না হতেই কন্যা বিদায় করা হয়, সতীর ধর্ম, মা ও গৃহবধূ হওয়ার আদর্শ শেখানো হয়, ব্যক্তিচেতনা বিকাশের কোন পরিসর থাকেনা সেখানে দশ এগারো বছরের বাল্যবিধবা সতীদাহের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাবে কিভাবে আর কোথায় বা জানাবে। উপরন্তু সে দেখেছে বিধবার কষ্টকর, ক্লেদাক্ত জীবন, পদে পদে বিপদ; পুরুষের ব্যভিচার স্বেচ্ছাচারের ফল ভোগ মেয়েদের ভাগে এসে জোটে। আর্থিক দিক থেকে নিঃসম্বল বিধবার সামনে তখন পরলোকে স্বামী সহবাসের হাতছানি আর মর্ত্যে সতী হওয়ার প্রলোভন কিংবা বলা যায় সমাজের প্রতি ঘৃণাও একাংশে তাকে সতী হওয়ার দিকে ঠেলে দিয়েছে। পরিবারের সদস্যদের উপদ্রব আর সহজলভ্য আফিম প্রয়োজনীয় ইন্ধন যুগিয়েছে।

অষ্টাদশ শতকের শেষ দিক থেকে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পর্যন্ত কলকাতা ও তৎসংলগ্ন অঞ্চলে সতীদাহের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছিল। অবশেষে ১৮২৯ সালে রামমোহন রায় রাধাকান্ত দেব প্রমুখদের প্রচেষ্টায় আইন করে রদ হয় সতীদাহ। তৈরি হয় বাল্য বিধবাদের অন্যতর জীবনযাপনের পথ। বাল্য বিধবাদের কষ্টকর জীবন তাদের অনেককেই বিপদের পথে ঠেলে দেয়, আর কোন কোন ক্ষেত্রে তারা পারিবারিক সহৃদয়তায় অল্প স্বল্প শিক্ষার আলোও পায়। তবে মেয়েদের শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে অনুভূত হচ্ছিল শিক্ষিত বাঙালির মনে। পুরুষেরা আর অল্পবয়স্ক মাটির প্রতিমা বিয়ে করতে চাইতেন না। তারা উপযুক্ত সহধর্মিণী না হোক অন্তত যাকে শিক্ষিত করে নিজের মতো গড়ে নেওয়া যাবে তেমন মেয়ে চাইতেন। পিতৃআজ্ঞার বিরুদ্ধে গিয়ে নির্বাচিত পাত্রীকে বিয়ে না করতে চেয়ে মধুসূদন দত্তের খ্রিস্ট ধর্ম গ্রহণের কাহিনী আমাদের সকলের জানা। ফলে অনেক ক্ষেত্রে বিয়ের প্রয়োজনে পাত্রের

মন পাওয়ার উদ্দেশ্যে পরিবারে মেয়েদের পড়াশোনার স্বল্প আয়োজন শুরু হয়। উনিশ শতকে যারা শিক্ষিত হচ্ছিলেন তাদের অনেকেই শিক্ষার আলো দেখে ছিলেন ব্রাহ্ম প্রভাবিত হিন্দু অথবা স্ত্রী শিক্ষার প্রতি উদারমনস্ক ব্রাহ্ম স্বামীদের আগ্রহে। যেমন কৈলাসবাসিনী দেবী (জন্ম ১৮৩৭), তার বিয়ে হয় বারো বছর বয়সে। বিয়ের আগে তিনি পড়াশোনা জানতেন না কিন্তু পরবর্তীকালে তিনি লেখাপড়া শেখেন ব্রাহ্ম প্রভাবিত স্বামীর উৎসাহে। একই সঙ্গে উল্লেখ করা যায় কুমুদিনী (১৮৫০-৬০), নিস্তারিণী দেবী (১৮৪০-৬০), ব্রহ্মময়ী (১৮৪৫-৭৬), মনোরমা মজুমদার (১৮৪৮-১৯৩৬), জ্ঞানদানন্দিনী দেবী (১৮৫২-১৯৪১), সৌদামিনী দেবী, স্বর্ণলতা ঘোষ, হেমাঙ্গিনী দেবী প্রমুখ নারীদের নাম যারা বাড়িতে লেখাপড়া শিখে ছিলেন। উনিশ শতকে একে একে হিন্দু কলেজ তৈরি হচ্ছে, সংস্কৃত কলেজে ইঙ্গ বঙ্গ ভারতীয় শিক্ষার মেলবন্ধন ঘটছে সবই পুরুষের আয়োজনে পুরুষদের জন্য। নারীকে সেখানে প্রকাশ্যে আনা হচ্ছে না। নারীরও শিক্ষার প্রয়োজন এ দাবি উঠতে শুরু করলেও প্রকাশ্যে বিদ্যালয় শিক্ষা নয় তার জন্য শুরু হল অন্তঃপুর শিক্ষাব্যবস্থা। তার পাঠক্রমে থাকল সাহিত্য, ধর্মগ্রন্থ, সুগৃহিণী হওয়ার নিয়মাবলী, সূচিকর্ম গৃহসজ্জার নিয়ম-নীতি ইত্যাদি। বিজ্ঞান অংক ভূগোল পড়লে মেয়েদের দেহ সৌষ্ঠব নষ্ট হয়, তাদের সন্তান ধারণ ক্ষমতা কমে যায় এ ধারণা উনিশ শতকের শেষ ভাগেও বড় বেশি বিশ্বাসযোগ্য ছিল। ১৮৪৯ সালে বেথুন সাহেব মেয়েদের স্কুল তৈরি করে দিলে মেয়েদের প্রকাশ্য শিক্ষার দরজা খুলে যায়। কিন্তু সে স্কুলের ছাত্রী জোগাড় করতে জলপানি বা অর্থ ব্যয় করতে হত। স্ত্রী শিক্ষার ব্যাপারে উৎসাহী রাধাকান্ত দেব প্রকাশ্য বিদ্যালয়ে ভদ্রবাড়ির মেয়েদের শিক্ষা গ্রহণের বিরোধী ছিলেন। এমন ভাব তখন শিক্ষিত বাঙালি পুরুষদের অনেকেরই মনে। তারা চাইছেন স্ত্রী শিক্ষার প্রসার হোক কিন্তু ঘরে বসে, অন্তঃপুরের চার দেওয়াল অতিক্রম না করেই। আসলে তারা তো প্রয়োজন দেখেননি মেয়েদের মিল্ বেন্থামের দর্শন পড়ানোর। কিংবা অঙ্কশাস্ত্র বিজ্ঞানে মেয়েদের কোনো প্রয়োজন থাকতে পারে এই বোধ সেকালের সংস্কারকদের হয়নি। তারা কেবল আরেকটু ‘সংস্কৃত’ হবে, রুচিতে উন্নত হবে, মার্জিত স্বভাব, রন্ধনে পটু ও সূচীকর্মে নিপুণা হবে; শিক্ষিত স্বামীর পদতলে কোন কোন ক্ষেত্রে ‘পাশে বসে’ স্বামীর মুখনিঃসৃত ইংরেজি গল্পের সারসংক্ষেপ শুনবে। মেয়েদের উপার্জনের জন্য বা আত্মিক বিকাশের উদ্দেশ্যে শিক্ষার প্রয়োজন তারা অনুভব করেননি। বাঙালি মেয়েরা রূপে রসে মাতৃত্বে আদর্শ গৃহবধূ এবং শিক্ষিত স্বামীর মার্জিত পরিচারিকা হয়ে উঠলেই তারা সন্তুষ্ট হতেন। ফলে পুরুষদের চোখে মেয়েদের স্বাধীনতা বা আত্মপ্রতিষ্ঠা তখন অবিশ্বাস্য। পরে যখন প্রাথমিক শিক্ষার পালা শেষ করে উচ্চশিক্ষার পালা এলো তখন প্রগতিশীল পুরুষদের প্রায় সকলেই বিরূপ হলেন। বিদ্যার প্রভাবে মেয়েরা পুরুষ হয়ে উঠছে, সৌন্দর্য হারাচ্ছে, স্বেচ্ছাচারী মদ্যপ ব্যভিচারিণী হচ্ছে একথাও প্রচারিত হয়েছিল পত্র পত্রিকায়। এত কণ্টকাকীর্ণ পথে

মেয়েদের যাত্রা রক্তাক্ত হলেও তাদের সোচ্চার প্রতিবাদ ছিল না বললেই চলে। আমরা আগেই বলেছি মেয়েদের শিক্ষা ছিল অন্তঃপুরের গৃহকর্ম মূলক ধর্মগ্রন্থ আশ্রিত শিক্ষা। দীর্ঘদিনের ধ্যান ধারণা পাল্টে ফেলার মতো বৈপ্লবিক যুক্তিবাদের শিক্ষা মেয়েরা পায়নি।

উনিশ শতকের শেষ ভাগ পর্যন্ত আমরা দেখেছি স্ত্রী শিক্ষার ক্ষেত্রে মানসিক দোটানার মধ্যে লড়াই করতে হয়েছে নারী পুরুষ উভয়কে। বিভিন্ন প্রবন্ধ পুস্তক পত্র-পত্রিকায় পুরুষেরা নানাভাবে পুরাতন ভারতীয় নারীর আদর্শকে নতুন ভাবে প্রচার করেছেন। তারা ইংরেজি শিক্ষিত নব্য যুবকের ঘরণী হিসেবে সুগৃহিণী 'সুশীলা' নারী তৈরির উপায় সন্ধান করতে আগ্রহী হয়েছেন। বলা বাহুল্য উদারপন্থী প্রগতিশীল স্বামীদের প্রচেষ্টায় শিক্ষিত স্ত্রীরাও চেনা গণ্ডির বাইরে খুব বেশি দূর পা ফেলতে পারেননি। ১৮৫৯-১৮৮০র দশকের মধ্যে মধুসূদন মুখোপাধ্যায় রচনা করেছিলেন 'সুশীলার উপাখ্যান'। তিন ভাগে লিখিত এই বইয়ের সুশীলা একজন মধ্যবিত্ত ঘরের আধুনিকমনস্ক শিক্ষিত গৃহবধূ। তিনি সুগৃহিণী হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শহরের সংস্কার গুলি নিয়ে আসছেন গ্রামে। প্রতিবেশিনী সতী নারীকে নারী শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ করা, শালীন পোশাক পরিধান করা, শালীন বাক্য বলা, বিধবা বিবাহ দেওয়া প্রভৃতি সৎকার্য শেখানোর পাশাপাশি লম্পট স্বামীকে বশ করে কিভাবে শান্তি-শৃঙ্খলার পথে আনা যায় তাও শেখাচ্ছেন। খেয়াল করতে হবে সুশীলা লম্পট স্বামীর বিরুদ্ধে আত্মমর্যাদার কথা শেখাচ্ছেন না স্ত্রীকে। তিনি এ কথাও বলছেন না যে এমন স্বামী থাকার চেয়ে না থাকা ভালো। 'সধবার একাদশী' নাটকের কুমুদিনী চরিত্র জানিয়েছিল লম্পট স্বামী থাকার চেয়ে বিধবা হওয়া অনেক ভালো– "এর চেয়ে বিধবা হয়ে থাকা ভালো-আমি ভাই সইতে পারিনে, গলায় দড়ি দে মরবো"[১]। অবশ্য স্বামীকেন্দ্রিক জীবনে স্বামী না থাকার কথা বলতে পারে ধনী কন্যা কুমুদিনী। কিন্তু বাস্তব হল, বর্ধিষ্ণু ঘরের মেয়েও বিধবা হলে তার মর্যাদা তলানিতে এসে ঠেকে। তখন সে হয় পরিবারের গলগ্রহ। কুলীন ঘরের মেয়ে নিস্তারিণী দেবীর বাস্তব জীবন এর প্রমাণ। মৃত্যুর পর 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর আত্মজীবনী 'সেকেলে কথা'র পাতা ওল্টালে দেখা যাবে কুলীন কন্যা হওয়ায় বিয়ের পরেও আজীবন তাকে পিতৃগৃহে থাকতে হয়েছে। স্বামী বেঁচে থাকাকালীন জীবন এক রকম ভাবে চলে কিন্তু বিধবা হওয়া মাত্র তিনি গলগ্রহ। অথচ তার বাপের বাড়িকে বর্ধিষ্ণু পরিবারের মধ্যে গণ্য করা চলে। দাদাদের ঘরে রান্না করে বাড়ির যাবতীয় কাজ বিনে মাইনে ঝির মতো করেও তিনি ভাল ব্যবহার পাননি। শেষ জীবনে বহু অপমান ও কষ্ট সহ্য করে তিনি দেহ রাখেন। তাই নিস্তারিণী দেবীর জীবন কাহিনী শুনে আমাদের মনে হয় কুমুদিনীর 'এমন স্বামী থাকার চেয়ে না থাকা ভালো' এমন বক্তব্যের চেয়ে 'সুশীলার উপাখ্যানে' মানিয়ে নেওয়ার শিক্ষা মেয়েদের পক্ষে অনেক বেশী কার্যকর ছিল। 'বামাবোধিনী', 'অবলাবান্ধব', 'পরিচারিকা' প্রভৃতি মেয়েলি পত্রিকার পাতায় পাতায় তখন প্রকাশিত হত 'স্ত্রীর প্রতি স্বামীর উপদেশ', 'স্ত্রীজাতির বিশেষ কার্য্য', 'গৃহিণীর কর্তব্য স্ত্রীজাতির আদর্শ', 'গার্হস্থ্য দর্পণ', 'এদেশে স্বামীর প্রতি

স্ত্রীর ব্যবহার', 'সতীত্ব ও পাতিব্রত্য ধর্ম', 'মাতার প্রতি কয়েকটি উপদেশ' - এইরকম বিবিধ উপদেশ নির্দেশমূলক প্রবন্ধ। প্রবন্ধ গুলির নামের মধ্যে রয়েছে উচ্চবর্ণের বাঙালি মেয়েদের সুশীলা করে তোলার স্পষ্ট উদ্দেশ্য। প্রগতিশীল শিক্ষিত ব্রাহ্ম পুরুষেরা 'বাবু কালচারের' কুফল থেকে পুরুষদের উদ্ধারের জন্য মেয়েদের মুখের দিকে তাকিয়েছেন। তারা আশা করেছেন স্ত্রীরা ধৈর্যের সঙ্গে সাংসারিক নানা উপায় অবলম্বন করে স্বামীদের বিপথগামী হওয়া আটকাবেন এবং তাদের সৎ পথে আনবেন। অথচ তারা পরিবারে যোগ্য সম্মান না পেলেও স্বামীকে ত্যাগ করার কথা চিন্তা করবেন না কারণ সেটি পতিব্রতা নারীর ধর্ম নয়। মেয়েদের আত্মমর্যাদা ও তাদের আত্মসম্মানের প্রশ্ন অনেকের মনেই জাগেনি। বেশিরভাগ পুরুষেরা সে কথা ভাবেননি অন্তত নীতিবান শিক্ষিত পুরুষ যারা প্রগতিশীল চিন্তাভাবনার প্রশ্রয় দিতেন তারা একটি নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত নারী প্রগতির সমর্থন করেছেন। সেই সীমারেখার বাইরে মেয়েরা পা রাখে না। 'সুশীলার উপাখ্যান' বইটির জনপ্রিয়তা সে কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। 'সুশীলার উপাখ্যান' মেয়ে মহলে বিশেষভাবে বলতে হয় প্রবীণাদের কাছে জনপ্রিয় হয়েছিল। সুশীলা 'শিক্ষিতা' হলেও প্রাচীনারা সুশীলার উপাখ্যান পাঠে মেয়েদের উৎসাহ দিতেন, চাইতেন মেয়েরা যুগের উপযুক্ত শিক্ষা গ্রহণ করলেও ঐতিহ্যের দাসত্ব ত্যাগ করবে না। সেকালে নারী শিক্ষার উদ্দেশ্য ছিল গৃহ নির্মাণ। পরিষ্কৃত রুচির আদর্শ মা তার সন্তানদের পালনে দক্ষ হবেন, পরিবারের সেবা যত্ন করবেন, সকলের সঙ্গে শালীন ব্যবহার করে গ্রাম্য স্থূল রুচি পরিত্যাগ করবেন। এর থেকে বেশি কিছু আশা উনিশ শতক মেয়েদের কাছ থেকে করেনি। পরিবার সংসার বিয়ে এই ছিল সমাজে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তাই নারীকে বারবার পতি পরায়ণা সুগৃহিণী প্রকৃত স্ত্রী হতে বলা হয়েছে বামাবোধিনী থেকে অবলাবান্ধব থেকে অন্তঃপুরিকা শিক্ষার পাঠক্রমে সর্বত্র। সাধারণ গৃহকর্মকে প্রজা পালনের সঙ্গে তুলনা করে বারংবার নারীকে ঘরের গণ্ডিতে রেখে মহিমান্বিত করা হয়েছে। এতে অবশ্য মেয়েদের পারিবারিক ও সামাজিক অবস্থান বিশেষ পরিবর্তন হয়নি। এটিকে আসলে বৃহত্তর কর্মভূমি থেকে বিচ্যুত করে উচ্চ বর্ণের মেয়েদের অন্তঃপুরে আবদ্ধ রাখার এক বিশেষ কৌশল বলা যায়। কারণ স্ত্রী শিক্ষার বিকাশ ঘটায় মেয়েদের আর রুদ্ধ দ্বারে বন্দী করা যাবে না। এমত অবস্থায় পিতৃতন্ত্রের স্বাভাবিক আশঙ্কার জায়গা হল মেয়েরা বাইরে বেরিয়ে এলে তার সংসার চালাবে কে? শিক্ষিত স্ত্রীরা যাতে ঘরের সাধারণ কাজে অবহেলা না করে সেই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে সংসারকর্মকে 'প্রজা শাসন' 'রাষ্ট্র পরিচালনা' এবং স্ত্রী সেই পরিবার তথা রাষ্ট্রের 'মন্ত্রী' এমন ভাবনার ব্যাপক প্রচার দেখা গেল বাংলা সাহিত্যের নানান সংরূপে। বলা নিষ্প্রয়োজন যে এই শিক্ষায় লালিত নারীর জীবন ঘুরবে স্বামী নামক সূর্যটিকে কেন্দ্র করে। আর মেয়েরাও এই শিক্ষার ফাঁকা অংশটির প্রতি দীর্ঘদিন অসচেতন ছিলেন।

বামাবোধিনীর দীর্ঘ প্রকাশকালে 'সুশীলা' হওয়ার বহু প্রস্তাব নিয়ম লিপিবদ্ধ ও প্রচারিত হতে দেখা যায় যার বহুলাংশে লেখক ছিলেন কোনো-না-কোনো 'আলোকপ্রাপ্ত নারী'।

'বামাবোধিনী' ও কুচবিহারের রানী নিরুপমা দেবী সম্পাদিত 'পরিচারিকা' পত্রিকার লেখিকা শরৎকুমারী দেব (১৮৬১-১৯৪১) তার ১৯২১ সালের কোনো এক সময় রচিত 'আমার সংসার' নামক স্মৃতি গ্রন্থে স্বামী পুত্র পরিজন পরিব্যাপ্ত সংসারের যে ছবি এঁকেছেন তা পড়তে পড়তে মনে প্রশ্ন জাগতেই পারে 'আমার সংসার'-এ শরৎকুমারীর 'আমি' কোথায়? পুরো স্মৃতিগ্রন্থ জুড়েই তো তিনি সাংসারিক কর্তব্য পালনে আদর্শ গৃহবধূর মত নিজেকে প্রচ্ছন্ন রেখে সংসারে বিলীন করে দিয়েছেন। তার গ্রন্থটিতে ঘরের বাইরে ঘটে চলা পুরুষদের সমাজ সংক্রান্ত পালাবদল বিরোধ প্রতিরোধের আঁচ মেয়েমহলে অল্প বিস্তর এসে পড়তো তা বোঝা যায়। কেশবচন্দ্র সেনের কন্যা সুনীতি দেবীর বিয়েকে কেন্দ্র করে ব্রাহ্মসমাজের বিবাদে শরৎকুমারীর স্বামী ও পিতার উত্তপ্ত বাক্য বিনিময় তাকে ভীতসন্ত্রস্ত করেছে। তিনি গৃহবিবাদে জর্জরিত হয়েছেন কিন্তু নিজের কোনো মতামত জানিয়েছেন বলে স্মৃতি গ্রন্থে উল্লেখ নেই। সামাজিক স্রোতের বিরুদ্ধে যেতে গেলে লড়াই স্বাভাবিক। পুরুষের সেটা প্রত্যক্ষ লড়াই, নারীর ক্ষেত্রে তা অনেকটাই নিষ্ক্রিয়। বাইরের লড়াইয়ের আঁচ তার গায়ে লাগলেও তারা মুখাপেক্ষী হয়ে থেকেছেন পুরুষের। 'তাঁদের মানসিক শক্তি বৃদ্ধির কথা বলা হয়েছে উপাসনা ও আধ্যাত্মিক জীবনযাপনের মধ্যে দিয়ে, প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ করে নয়'।[২]

অবশ্য মেয়েরা যে একেবারেই পরমুখাপেক্ষী ছিলেন এমনটা বলা বোধহয় সংগত হবে না। স্ত্রী শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রধান বাধা ছিল 'ভদ্রবাড়ির' মেয়েদের প্রতি আরোপিত অবরোধ প্রথা। অবরোধ প্রথা বা পর্দা প্রথা অর্থ কেবল ঘোমটা নিয়ে মেয়েদের বাইরে বেরোনো নয়। অবরোধ প্রথা ঘোমটার আড়ালে মেয়েদের গৃহবন্দি জীবন শুধু নয় বরং তা বলতে বোঝায় সর্বব্যাপী একটা আদর্শ ও ব্যবহার বিধি যার ভিত্তিতে গড়ে তোলা হয় নারীর লজ্জাশীল ভাবমূর্তি এবং বিভিন্ন সামাজিক শর্ত আশা-আকাঙ্ক্ষা যা নারীর জীবনকে পদে-পদে নির্ণয় করে, সে যেখানেই যাক না কেন। মাথার ঘোমটা থেকে মুক্তি মিললেও তার উপর সতর্ক দৃষ্টি থাকে সমাজের এবং পরিবারের। এই অবরোধ প্রথা নিয়ে 'বামাবোধিনী'-র লেখিকা নগেন্দ্রবালা মুস্তাফীর বক্তব্য একবার জেনে নেওয়া যাক। তার সংক্ষিপ্ত চিঠিতে সরাসরি বলেছেন-

> আমাদের দেশে আমাদের সমাজে স্ত্রী জাতির জন্য যে অবরোধ প্রথা প্রচলিত আছে আমরা এ প্রথা ভালো বিবেচনা করি না। এই অবরোধ প্রথা আমাদের সর্ব্বনাশের মূল, এই অবরোধ প্রথাই আমাদের হীনাবস্থার কারণ।[৩]

১৩০২ সালের বৈশাখ মাসে প্রকাশিত এই চিঠিতে তিনি বারংবার সৎশিক্ষাভিলাষী মেয়েদের অবরোধ প্রথার বাধা অতিক্রম করে সৎশিক্ষা লাভ করা হয়ে ওঠে না বলে

আক্ষেপ করেছেন। এবং মেয়েদের জীবন পিঞ্জরাবদ্ধ পশুর অপেক্ষাও হেয় এমন মন্তব্য করেছেন। কিন্তু ‘সৎশিক্ষা’ বলতে তিনি কি আত্মমর্যাদার উন্মেষ, আর্থিক সক্ষমতা অর্জন, মতামত প্রকাশের অধিকার কিংবা ঘরের গণ্ডি অতিক্রম করে বাইরের কাজে অংশগ্রহণকে বুঝিয়েছেন? এ বিষয়ে তার বিস্তারিত মতামত জানা যায় না। তিনি প্রাচীন যুগের আর্য নারীর অবরোধমুক্ত রোমান্টিক জীবন, যার বর্ণনা হয়তো উনিশ শতকের কাব্য কবিতা থেকে জেনেছেন, সেই জীবন আকাঙ্ক্ষা করেছেন। আর্য রমণীদের মধ্যে গার্গী, অপালারা থাকলেও তাদের সংখ্যা মুষ্টিমেয় এবং তাদের জীবনও যে সুখকর ছিল না তা বর্তমানের বহু গবেষণা প্রমাণ করেছে। নগেন্দ্রবালা অবরোধ মোচন করে সৎ শিক্ষা চাইলেও সেই শিক্ষা প্রকৃতপক্ষে কী এবং সেই শিক্ষা নিয়ে মেয়েদের করণীয়ই বা কী তা ব্যাখ্যা করেননি। বোধ করি এ সম্পর্কে তার নিজেরও সম্যক ধারণা ছিল না। এই চিঠির শেষাংশে ‘সৎশিক্ষা’ অভিলাষিণী ‘ভগিনী’দের উদ্দেশ্য করে বলেছেন-

> আইস আমরা এ ভীষণ অবরোধ প্রথা হইতে মুক্তি লাভ করিয়া জীবনকে উন্নতির পথে লইয়া যাইবার জন্য একান্তমনে পরমপিতা পরমেশ্বরকে ডাকি। তাঁহার কৃপায় আমরা নিশ্চয়ই এই হীনতা হইতে মুক্তি লাভ করিব ও আমাদের জীবন প্রাচীন আর্য্য মহিলাদিগের ন্যায় বরণীয় ও আদরণীয় হইবে।[৪]

লক্ষণীয় হীনাবস্থা মোচনের জন্য পরমপিতা পরমেশ্বরের কৃপা প্রার্থনা করতে বলা হয়েছে। বলিষ্ঠ প্রতিবাদের ভাষা এটি নয়, এ হলো অনুনয়ের ভাষা; কৃপা ভিক্ষা পুরুষের কাছে। নগেন্দ্রবালা মুস্তাফীর অন্যান্য লেখাতেও দেখা যাবে তিনি হিন্দু রমণীর জন্য পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রবর্তনের আগে আর্য রমণীর উপযুক্ত যে গার্হস্থ্য ধর্মের আদর্শ প্রচারিত ছিল তারই পুনঃপ্রচার প্রার্থনা করেছেন ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে দাঁড়িয়েও। তার মতে ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত বাঙালিনী কেবল স্বামীর ভালোবাসা চান, বাকি সংসার - গৃহকর্ম -পরিবারের সেবায় তারা বিমুখ, তারা সতীত্বের ধর্ম মানেন না বা শুনতে চান না। প্রগতিশীল শিক্ষার একটা নির্দিষ্ট সীমায় পৌঁছে স্ত্রী শিক্ষাবিরোধী প্রবীণ ও প্রগতিশীল নবীন পুরুষেরা নারী শিক্ষার যে কুফল গুলো বার বার মনে করাতেন তারই প্রতিধ্বনি শোনা গেল নগেন্দ্রবালার কণ্ঠে। অর্থাৎ মেয়েরা নিজেরাও নিজেদের শিক্ষার সুযোগকে সন্দেহের চোখে দেখছেন এবং অবিশ্বাস করছেন। বহুপত্নী জর্জরিত পরিবার কিংবা বেশ্যাসক্ত মদ্যপ স্বামীর সংসারে পশুবৎ জীবনের ‘সতীত্ব’ বর্তমানে নব্যশিক্ষিত একক পরিবারের স্ত্রীদের মধ্যে থেকে লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে বলে লেখিকার আক্ষেপ। অথচ ‘পুরাতনী’ র কথক জ্ঞানদানন্দিনী দেবী যথাযথ সংসার ধর্ম পালন এবং নারীত্বের আদর্শকে শিরোধার্য করেও একক পরিবারের স্বামী-স্ত্রীর দাম্পত্য প্রণয় এবং দুজনের চিত্ত বিকাশের অবকাশ রয়েছে বলে মনে করতেন। এমন সংসারের সন্তানও যথাযথ

মানবিক হবার সম্ভাবনা থাকে বলে তিনি জানিয়েছেন। জ্ঞানদানন্দিনীর এই মতের সঙ্গে মিল পাওয়া যাবে কৈলাসবাসিনী দেবী ও কৃষ্ণ কামিনী দাসীর লেখায়।

উনিশ শতকে কেউ কেউ অবশ্য মেয়েদের দুরবস্থার জন্য সরাসরি পুরুষের অনিচ্ছা ও প্রত্যক্ষ বিরোধকে দায়ী করেছিলেন, যেমন মধুমতি গাঙ্গুলী, সৌদামিনী দেবী প্রমুখেরা। সৌদামিনী দেবী জ্যৈষ্ঠ, ১২৭২এর বামাবোধিনী পত্রিকায় স্পষ্ট ভাষায় প্রশ্ন করেন-

> পুরুষগণ কেন, আমাদিগকে এরূপ নিকৃষ্টাবস্থায় রাখিয়াছেন? আমরা কি পরম পিতার সন্তান নই? পুরুষেরা নানারূপ বিদ্যাভ্যাস করিয়া পরম জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া ইহকালেই পরমাত্মার রসাস্বাদনে অনুপম সুখানুভব করিতে পারেন। আমরা কি উক্ত সুখের কণামাত্রও প্রাপ্ত হইব না?... আর কতদিন আমরা এই শৃঙ্খলরূপ গৃহরুদ্ধা থাকিব?[৫]

পুরুষের ও মহিলাদের অন্তঃপুরে বন্দি রাখেন, বিদ্যালয়ের শিক্ষা শেষ না হতেই বিয়ে দেবার ব্যবস্থা করেন- একই অভিযোগ কৈলাসবাসিনী দেবীর। মেয়েদের অশিক্ষিত করে রাখার কারণ বিশ্লেষণ করে তিনি জানান -

> কি হিন্দু কি মুসলমান কি খ্রিষ্টান সকল জাতীর শাস্ত্রেই কথিত আছে যে পত্নী পতির অর্ধ অঙ্গ স্বরূপ এবং সুখ ও দুঃখের সমভাগী, কিন্তু ভারতবর্ষীয়েরা সেই শাস্ত্রোক্ত বাক্যের অর্ধেক প্রতিপালন ও অপরার্ধেক পরিত্যাগ করিতেন অর্থাৎ দুঃখের অংশটি বিলক্ষণরূপে প্রদান করিতেন কিন্তু সুখের অংশটি দিতে অতিশয় কাতর হইতেন, নচেৎ স্ত্রী শিক্ষা বিষয়ে পুনঃ পুনঃ নিষেধ করিবেন কেন? তাঁহারা বনিতাদিগকে সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত রাখিবার অভিপ্রায়েই তাহাদিগকে বিদ্যারসের সুধাময় মাধুর্য আস্বাদন করাইতে ইচ্ছা করিতেন না পাছে তাহারা বিদ্যাবলে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়া পুরুষগণকে অগ্রাহ্য করে কিংবা গৃহকার্যে উপেক্ষাকরতঃ কেবল শাস্ত্রালাপেই রত থাকে।[৬]

‘হিন্দু মহিলার হীনাবস্থা’ গ্রন্থে কৈলাসবাসিনী দেবী কৌলীন্য, বহুবিবাহ, বাল্যবিবাহ, পরিবারে মহিলাদের মর্যাদা, স্বামী ও শ্বশুরবাড়ির অন্যান্য আত্মীয়দের সঙ্গে মহিলাদের সম্পর্ক বিষয়ে স্পষ্ট বক্তব্য রাখেন। তিনি লক্ষ্য করেন যে বিদ্যাসাগরের কঠোর পরিশ্রম ও প্রভূত ব্যয় সত্ত্বেও বিধবা বিবাহ আন্দোলন নগণ্য সাফল্য লাভ করে। শাস্ত্রসম্মত হওয়া সত্ত্বেও সাধারণ মানুষের কেন বিধবা বিবাহ প্রচলন করে বিধবাদের আমৃত্যু কষ্ট থেকে মুক্তি দেন না, সে বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে দেশবাসীর প্রতি তিনি আবেদন করেন।

বাল্যবিবাহ সমাজের সার্বিক অধঃপতনের একটি অন্যতম কারণ এ উপলব্ধি উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে নারী পুরুষ প্রায় সকলের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল।

'বামাবোধিনী'র চৈত্র ১২৭৭ সংখ্যায় পরিবারে বাল্যবিধবার দুরবস্থার অনুপুঙ্খ বর্ণনা দিয়ে তাদের জীবন যন্ত্রণা থেকে মুক্তির উপায় স্বরূপ পুনর্বিবাহের প্রতি ইঙ্গিত করে ছিলেন জনৈক মহিলা। পণ্ডিতা রমাবাই সরস্বতী ১৮৮৫ সালে একটি বিধবাশ্রম স্থাপন করেন। বিধবাদের আশ্রয় ও শিক্ষা দানের মাধ্যমে তাদের আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী করার জন্যই তিনি এটি প্রতিষ্ঠা করেন। এরপর বেশ কতগুলো বিধবা আশ্রম প্রতিষ্ঠা হয় কিন্তু বিধবার পুনর্বিবাহ নয় পরিবারে বিধবার মর্যাদা পুনরুদ্ধার ও ব্রহ্মচর্যের আদর্শ বৃদ্ধি পেলে মানসিকতার পরিবর্তন ঘটবে এবং পরিবারের মর্যাদা বাড়বে বলে শিক্ষিত সমাজ অভিমত পোষণ করতে থাকে। আসলে বিধবা বিবাহের প্রতি সেকালের হিন্দু সমাজের মনে এক আশঙ্কা সদা জাগ্রত থেকেছে। ১৮৫৫ সালে পীতাম্বর সেন কবিরত্ন মেয়েদের বৈধব্যের পেছনে তার পূর্ব জন্মের পাপকে দায়ী করেছিলেন।[৭] তার লেখায় হিন্দু সমাজে বিধবা সম্পর্কে প্রচলিত ধারণার পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি বলেন যে বিধবা নারীর পুনর্বিবাহ হলে সে আবার বিধবা হবে পূর্ব জন্মের পাপ থেকে তার মুক্তি নেই। এখন প্রশ্ন উঠতে পারে পূর্ব জন্মের কোন পাপ থেকে মেয়েদের পরজন্মে বৈধব্য দশা ঘটে? এ প্রসঙ্গে চার্লস গ্রান্টের ১৭৯২ সালে লেখা রিপোর্ট থেকে জানা যায়, হিন্দুরা বিশ্বাস করে মেয়েরা বিধবা হয় কারণ মেয়েটি নিশ্চয় গত জন্মে কোন সম্ভ্রান্ত বংশীয়া ছিল এবং সে তার স্বামীকে ত্যাগ করে অপর কোনো পুরুষের সঙ্গে বাস করত ও সেই পরপুরুষের মৃত্যুর পর তার সহমৃতা হয়েছিল। গ্রান্ট লিখেছিলেন সেই গত জন্মের পাপের প্রায়শ্চিত্তের উদ্দেশ্যে মেয়েদের দিয়ে বর্তমান জন্মে কঠোর কৃচ্ছ্রসাধন করানো হত।[৮] ফলে জন্মান্তরের ধারণায় বিশ্বাসী যে সমাজে প্রচলিত রয়েছে নারীর বৈধব্যের পিছনে একইসঙ্গে কুলত্যাগ ও ব্যভিচারের মতো পাপকর্ম জড়িত, সেখানে বিয়ের মতো পবিত্র বন্ধনে কোনো 'পূর্বজন্মের ভ্রষ্টা' নারীকে তো স্থান দেওয়া যায় না। উপরন্তু পীতাম্বর সেন কবিরত্নের মতো মানুষেরা প্রচার করেছিলেন পুনর্বিবাহ হলে পতির প্রাণ আশঙ্কা থেকে মুক্তি নেই। তবুও একবেলা আহার, একাদশী ব্রত, পরিবারের গলগ্রহ হয়ে বেঁচে থাকা বাল্য বিধবাদের কষ্টকর জীবন থেকে মুক্তির দাবি শোনা যেতে থাকে মেয়েদের লেখায়। শুধুমাত্র মেয়েদের কষ্টকর জীবন থেকে মুক্তি দান নয় বাল্য বিবাহ অসমর্থনের পেছনে ছিল আর একটি কারণ। ব্রাহ্ম সমাজ দাম্পত্য জীবনের যে আদর্শ জনমানসে প্রচার করেছিল, সেই সঙ্গে ইংরেজি শিক্ষা নাটক উপন্যাসের রোমান্স কাহিনি পড়ে পুরুষদের সামনে নারী পুরুষের একত্র যৌথ জীবন যাপনের স্বপ্ন দানা বেঁধেছিল। কিন্তু গৌরিদানের আসরে বসা অনূর্ধ্ব দশ বছরের অশিক্ষিতা গ্রাম্য মেয়ে সেই স্বপ্নের সঙ্গে পাল্লা দেবে কীভাবে। তাই সেকালে শিক্ষিত মাত্রেই বাল্য বিবাহের নিন্দা করেছেন। মেয়েদের বিয়ের বয়স নিয়ে আলাপ আলোচনার ফলে তাদের বিয়ের বয়স বাড়িয়ে করা হয় চৌদ্দ বছর। তাছাড়া বাল্যবিবাহিত স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কখনোই যথার্থ সমঝোতার সম্পর্ক গড়ে উঠতে পারে না। তাই পরবর্তী জীবনে তাদের অসুখী দাম্পত্য

এবং পুরুষের পদস্খলনের সম্ভাবনা দেখা দিত। কৈলাসবাসিনী দেবী বাল্যবিবাহের কুফল হিসেবে সর্বপ্রথম মেয়েদের শারীরিক কষ্ট সম্পর্কে সচেতন করেন। প্রথম বয়সে সন্তান ধারণের কারণে শিশু মৃত্যুর হার বেশি হয়, স্ত্রীর মৃত্যু ঘটতে পারে এবং বিধবা হওয়ার সম্ভাবনাও প্রবল থাকে এক্ষেত্রে। সেকালে শ্বশুরবাড়ির আত্মীয়দের সঙ্গে স্ত্রীদের সম্পর্ক খারাপ হওয়ার পিছনে তিনি বাল্যবিবাহের কুফল দেখতে পান। ফলে মেয়েদের বাল্যবিবাহ নয় বরং তাদের শিক্ষিত করে আর্থিক সক্ষমতা অর্জনের পথে মুক্তি দিতে অনুরোধ করেছেন বেগম রোকেয়া, বিনোদিনী সেনগুপ্তার মতো অনেকেই। এ প্রসঙ্গে আবারো ফিরে যেতে হয় 'বামাবোধিনী'র পাতায়। বৈশাখ ১৩০৭ সনের প্রবন্ধে বিনোদিনী লিখেছেন -

> এদেশে ভদ্র সমাজে অধিকাংশ স্ত্রীলোক জীবিকা অর্জনের জন্য কিছুই শিক্ষা করেন না। পিতা-মাতা স্বামী ও পুত্রের উপর তাঁহাদের ভরণপোষণ নির্ভর করে, অসময়ে আত্মীয়বিহীনা হইলে দুর্দ্দশার আর সীমা থাকে না। যদি বিদ্যা ও কার্যাদি শিক্ষা এদেশের স্ত্রী সমাজের সর্ব্বত্র প্রচলিত হইত তবে আর এসকল দুঃখপূর্ণ অবস্থা গোচর হইতো না।[৯]

পছন্দ অনুযায়ী তিনি মেয়েদের কাজ বেছে নিতে বলেছেন। অবশ্য সব কাজ নয়। সেবা শুশ্রুষা নার্সিং এর কাজ মেয়েদের স্বভাব বৈশিষ্ট্যের অনুকূল এবং সমাজের চোখেও শ্রদ্ধেয় এমন কাজে মেয়ে এবং গৃহবধূদের এগিয়ে আসতে বলেছেন। এদেশীয় রমণীকুলের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির লক্ষ্যে বিনোদিনী অর্থকরী কোন বিদ্যা ও চরিত্র গঠন বিষয়ে কোন শিক্ষা অর্থাৎ 'ভোকেশনাল কোর্স' এবং 'ক্যারেক্টার বিল্ডিং কোর্স' বলতে আমরা এখন যা বুঝি তিনি সেরকমই কিছু বোঝাতে চেয়েছেন। সন্দেহ নেই বিনোদিনী সেনগুপ্তা মেয়েদের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির সঠিক সিঁড়ি চিনতে পেরেছিলেন।

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের প্রথম পর্যায়ে গৃহশিক্ষিত মেয়েদের মধ্যে নিজেদের আর্থিক সক্ষমতা অর্জনের বিষয়টি স্পষ্ট ছিল না। স্বামী সংসার সন্তান পালনের উপযুক্ত শিক্ষা পেলেই তারা সন্তুষ্ট হতেন। কিন্তু এই অবস্থার পরিবর্তন হয় ধীরে ধীরে। শিক্ষিতাদের মধ্যে অনেকে মেয়েদের দুরবস্থার জন্য তাদের আর্থিকভাবে নিঃসম্বল অবস্থাকে দায়ী করেছিলেন। তাই শতাব্দীর শেষ পর্বে এসে মেয়েদের চিন্তা চেতনার আমূল পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। পুরুষদের কাছ থেকে *উপহৃত স্বাধীনতা* নয় তাদের সোচ্চার হতে দেখা গেল *অর্জিত স্বাধীনতার* পক্ষে। শিক্ষার অধিকার, উপার্জনের চেষ্টা, বিদ্যালয়ে শিক্ষয়িত্রী হিসেবে যোগদান করা, ডাক্তারি কিংবা ধাত্রী হয়ে রোগী দেখা ক্ষেত্র বিশেষে উপার্জিত অর্থে পরিবার প্রতিপালনের দুঃসাহসও মেয়েরা করেছিলেন। কামিনী রায়, কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায়, সরলা বসু প্রমুখ আমাদের অতি পরিচিত নাম। আর এই তালিকা দিনে দিনে আরো দীর্ঘ হচ্ছিল। বলা বাহুল্য বদ্ধ পরিবেশের ফাঁক ফোঁকর দিয়ে যে বাতাস প্রবেশ করেছিল অন্দরমহলে সে বাতাসে আত্ম বিশ্বাসী মেয়েদের পদধ্বনি

ছিল। তাই বলা যায় এ শতক ছিল মেয়েদের বাইরের পথ অনুসন্ধান ও আত্ম আবিষ্কারের কাল। এ কাজে পুরুষের সাহায্য সে নিয়েছে, অনেক দ্বিধাদ্বন্দ্বে নৌকো ভাসিয়ে তবেই সে বিশ শতকের পাড়ে এসে পৌঁছেছে।

তথ্যসূত্র :

১. সধবার একাদশী, দীনবন্ধু রচনাবলী, সম্পাদনা ক্ষেত্র গুপ্ত, সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, তৃতীয় মুদ্রণ ১৯৮৯, পৃষ্ঠা- ১৩০।

২. ঔপনিবেশিক বাংলায় গার্হস্থ্যের গল্প: শরৎকুমারী দেব-এর স্মৃতিকথার আলোকে, নন্দিনী জানা, ইতিহাস অনুসন্ধান ২৮, সম্পাদনা মঞ্জু চট্টোপাধ্যায় পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ কলকাতা প্রথম প্রকাশ ২০১১, পৃষ্ঠা- ৯৩৯।

৩. অবরোধে হীনাবস্থা, নগেন্দ্র বালা মুস্তাফী, বামারচনা, বামাবোধিনী, বৈশাখ ১৩০২, নারী ও পরিবার বামাবোধিনী পত্রিকা (১২৭০-১৩২৯ বঙ্গাব্দ), সংকলক ও সম্পাদনা ভারতী রায়, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৯৯৯, পৃষ্ঠা- ১৮৫।

৪. তদেব।

৫. সংকোচের বিহ্বলতা আধুনিকতার অভিঘাতে বঙ্গরমণীর প্রতিক্রিয়া ১৮৪৯-১৯০৫, গোলাম মুরশিদ, সাহিত্য অকাদেমী, নিউ দিল্লি, ১৯৮৫, পৃষ্ঠা-৪৪।

৬. তদেব, পৃষ্ঠা- ৪৫।

৭. অন্দরে অন্তরে উনিশ শতকে বাঙালি ভদ্রমহিলা, সম্বুদ্ধ চক্রবর্তী, স্ত্রী, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৯৯৫, পৃষ্ঠা-৮।

৮. তদেব- ৮।

৯. রমণীর কার্য্যক্ষেত্র, শ্রী বিনোদিনী সেনগুপ্তা, বামাবোধিনী, বৈশাখ ১৩০৭, নারী ও পরিবার বামাবোধিনী পত্রিকা (১২৭০-১৩২৯ বঙ্গাব্দ), সংকলন ও সম্পাদনা ভারতী রায়, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৯৯৯, পৃষ্ঠা- ২১০।

সহায়ক গ্রন্থ

বাংলা গ্রন্থ

- কৈলাসবাসিনী দেবী, হিন্দু মহিলাগণের হীনাবস্থা, শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ গুপ্ত কর্তৃক প্রকাশিত, কলিকাতা, ১৭৮৫ শক।
- ক্ষেত্র গুপ্ত সম্পাদিত, দীনবন্ধু রচনাবলী, সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, তৃতীয় মুদ্রণ ১৯৮৯।
- গোলাম মুরশিদ, সংকোচের বিহ্বলতা আধুনিকতার অভিঘাতে বঙ্গরমণীর প্রতিক্রিয়া ১৮৪৯-১৯০৫, গোলাম মুরশিদ, সাহিত্য অকাদেমী, নিউ দিল্লি, ১৯৮৫।

- চিত্রা দেব, অন্তঃপুরের আত্মকথা, আনন্দ, কলকাতা, নবম মুদ্রণ অক্টোবর ২০১৭।
- জ্ঞানদানন্দিনী দেবী, পুরাতনী (ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী অনুলিখিত সম্পাদিত), আনন্দ, কলকাতা, দ্বিতীয় মুদ্রণ মে ২০১২।
- ভারতী রায় (সংকলন ও সম্পাদনা), নারী ও পরিবার বামাবোধিনী পত্রিকা (১২৭০-১৩২৯ বঙ্গাব্দ), পুস্তক বিপণি, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৯৯৯।
- মঞ্জু চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত ইতিহাস অনুসন্ধান ২৫, পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ২০১১।
- মঞ্জু চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত ইতিহাস অনুসন্ধান ২৮, পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ২০১৪।
- মধুসূদন মুখোপাধ্যায়, সুশীলার উপাখ্যান প্রথম ভাগ, কলিকাতা, ১৮৫৯।
- শ্রী গোবিন্দচন্দ্র শর্ম্মা, বিধবাবিবাহ নিষেধ বিষয়ক প্রস্তাব, কলিকাতা, ১৭৬৭ শক।
- সুকুমারী ভট্টাচার্য, প্রবন্ধ সংগ্রহ ১, গাঙচিল, কলকাতা, জানুয়ারি ২০১২।
- সম্বুদ্ধ চক্রবর্তী, অন্দরে অন্তরে উনিশ শতকে বাঙালি ভদ্রমহিলা, স্ত্রী, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৯৯৫।

<u>ইংরেজি গ্রন্থ</u>

- Rochona Majumdar, Marriage And Modernity: Family Values in Colonial Bengal, Duke University press, Durham and London, 2009.

ভারতবর্ষের জাতীয়তাবাদী আন্দোলন ও অনগ্রসর সম্প্রদায়ের উন্নয়নের পরিপ্রেক্ষিতে মহাত্মাগান্ধী ও আম্বেদকরের ভাবনা: একটি সংক্ষিপ্ত বিশ্লেষণ

প্রভাস মণ্ডল
সহকারী অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, নেতাজী নগর ডে কলেজ

মহাত্মা গান্ধী ছিলেন ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের প্রাণপুরুষ। তিনি ছিলেন মানবতাবাদের পূজারী। নিজগুন বলে তিনি বিশ্বমানবতাবাদীদের মধ্যে অন্যতম স্থান দখল করে নিয়েছেন। নিজেকে একজন বিশ্বনাগরিক হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। গান্ধীজির এই জীবন, আদর্শ, সংগ্রাম ও ভাবনাকে এককথায় গান্ধীবাদ বলা যেতে পারে। অপর পক্ষে ডঃ বি.আর. আম্বেদকর ছিলেন বিংশশতাব্দীর এক বিশিষ্ট ভারতীয় ব্যক্তিত্ব। অর্থনীতি, রাজনীতি, সমাজতত্ত্ব এবং সমাজবিজ্ঞানের অন্যান্য শাখায় তিনি ছিলেন এক অসামান্য পণ্ডিত। ভারতবর্ষের অস্থির রাজনৈতিক পরিস্থিতি এবং সংকটময়তার সময়ে তিনি যে সাংগঠনিক ভূমিকা পালন করেছিলেন, সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যে মৌলিক সংস্কারমূলক আন্দোলন চালিয়ে গিয়েছিলেন তা তাকে অমরত্বের আসন দান করেছে।

এই বিশ্লেষণধর্মী সংক্ষিপ্ত আলোচনার মধ্যে ভারতবর্ষের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে এবং ভারতীয় জনসমাজ সম্পর্কে মহাত্মা গান্ধী ও আম্বেদকরের ভাবনা চিন্তার মধ্যে তুলনামূলক ব্যাখ্যা দান করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে সামাজিক বৈষম্য, ধর্মীয় প্রভাব, অর্থনৈতিক সংকট প্রভৃতি সাধারণ মানুষজনকে কিভাবে প্রভাবিত করেছিল সে প্রসঙ্গের আলোচনা করা হয়েছে। আর এই উদ্দেশ্যে এই দুই মহান ব্যক্তিত্বের দর্শনের আলোচনার পাশাপাশি যে সকল রাজনৈতিক পদক্ষেপে উভয়ের মধ্যে মতপার্থক্য চূড়ান্ত রূপ লাভ করেছিল তার আলোচনা করা হয়েছে। এই বিশ্লেষণের মধ্যে দিয়ে ভারতবর্ষের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে এবং স্বাধীন ভারতবর্ষের সাংগঠনিক কাঠামোর প্রকৃতি প্রসঙ্গে উভয়ের চিন্তা-আদর্শ সম্পর্কে স্পষ্ট ধারনা পাওয়া যেতে পারে। উল্লেখ্য গান্ধীজীর সময়কাল যেখানে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রায় মাঝামাঝি সময় থেকে বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত, সেখানে আম্বেদকরের আগমন গান্ধীজির থেকে বেশ কিছুকাল পরে। যদিও স্বাধীনতা প্রাপ্তির অল্পদিনের মধ্যেই গান্ধীজি নিহত হন। সেখানে আম্বেদকর স্বাধীন ভারতে কয়েক বছর উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছিলেন। যাই হোক এখানে মূলত মতাদর্শগত বিভাজন, সামাজিক অসাম্য, ধর্মীয় বিশ্বাস প্রভৃতি

বিষয়ের উপর জোর দিয়ে কিছু বিশেষ রাজনৈতিক পদক্ষেপ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

গান্ধীবাদঃ

গান্ধীবাদ অর্থাৎ গান্ধীজির চিন্তা-আদর্শ বিষয়ে আলোচনার জন্য তাঁর জীবন, সংগ্রাম, আন্দোলন, রাজনৈতিক পদক্ষেপ বিষয়ে বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। মোহন দাস করমচাঁদ গান্ধী জন্মগ্রহণ করেন ১৮৬৯ সালের ২রা অক্টোবর এক অভিজাত পরিবারে। তার পিতা কাবা গান্ধী রাজকোট কাথিয়াওয়াড় স্টেটের প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন। তাই জন্ম থেকে গান্ধীজি বিখ্যাত ছিলেন। গান্ধীজির চিন্তা, আদর্শ ও কর্ম তার ধর্মীয় বিশ্বাস ও মানবতাবাদের দ্বারা পরিচালিত হয়েছিল। তার চিন্তা ভাবনার উৎস হিসাবে – বেদ, ভগবদ গীতা, বাইবেল, কোরান প্রভৃতির কথা বলা যায়। তিনি নিজেকে একজন আদর্শবাদী নেতা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন। আর এই কারণে তিনি জাতীয় বা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে যে সকল নীতির কথা বলতেন তা হল – সত্য, অহিংসা, সামাজিক সাম্য, সর্বধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা প্রভৃতি। উপনিবেশিকতাবাদ, সাম্রাজ্যবাদ, পুঁজিবাদ ও যে কোন ধরনের শোষণের বিরোধিতা করা আর এই লক্ষ্যপূরণের জন্য তিনি যে সকল কৌশলের অবলম্বনের কথা বলেছেন – সেগুলি হল – সত্যাগ্রহ, অসহযোগ আন্দোলন, আইন অমান্য আন্দোলন, প্রীতীকী ও আমরণ অনশন, হরতাল প্রভৃতি। তিনি সত্যাগ্রহের আলোচনায় বলেছেন – সত্যাগ্রহীর একমাত্র ভরসা হবেন ভগবান, আর ভগবানের প্রতি এই বিশ্বাস একজন সত্যাগ্রহীকে শক্তিমান করে তোলে। গান্ধীজি বিশ্বাস করতেন ভগবানের ইচ্ছা ব্যতীরেকে – গাছের একটি পাতাও নড়ে না। গান্ধী রাষ্ট্র ব্যবস্থার বিরোধিতা করে ব্যক্তি স্বাতন্ত্রবাদের পথ প্রশস্ত করতে চেয়েছেন। তাই তিনি রাষ্ট্রকে বলপ্রয়োগ ও হিংসার মূর্ত প্রকাশ বলে বর্ণনা করেছেন। গান্ধীজি সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার সমালোচনা করেছেন। সংসদীয় গণতন্ত্রকে সমালোচনা করতে গিয়ে, এই ব্যবস্থাকে তিনি ‘বন্ধ্যা নারী’ হিসাবে বর্ণনা করেছেন। গান্ধীজি একটি আদর্শ ‘রামরাজ্য’ প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। যেখানে কোন অন্যায়, হিংসা, শোষণ থাকবে না। গান্ধীজি ধর্মীয় প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে ‘সর্বদয়’ ধারণার প্রতিষ্ঠা করার কথা বলেছিলেন যেখানে ধনি-দরিদ্র, শক্তিমান-দুর্বল নির্বিশেষে সকল সম্প্রদায়ের উদয়ের কথা বলতে চেয়েছিলেন। কিন্তু বাস্তব সমস্যা বা বাধার কথা না ভেবে তিনি ধর্মীয় আলোকে এই ব্যাখ্যা উপস্থাপন করেছিলেন। আর এর সুস্পষ্ট বহিঃপ্রকাশ ঘটেছিল তার ‘অছিব্যবস্থার’ বর্ণনার মধ্য দিয়ে। যেখানে তিনি ব্যক্তিকে সম্পদের মালিক হিসাবে বিবেচনা না করে কেবল মাত্র অছি হিসাবে ভাবতে বলেছিলেন। গান্ধীজি ধর্ম ও রাজনীতির মধ্যে আন্তঃসম্পর্ক প্রতিষ্ঠার কথা বলেছিলেন। তিনি ধর্মকে রাজীনতি থেকে কোনভাবে বিচ্ছিন্ন করতে চান নি। আর ঐ ধর্মীয় আলোকে তিনি রাজনৈতিক সিদ্ধিলাভের জন্য সচেষ্ট থাকার কথা বলেছেন। এইভাবে মহাত্মাগান্ধী নিজেকে একজন ধর্মনিষ্ঠ আদর্শবাদী রাষ্ট্রদার্শনিক হিসাবে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। আর সেই ভাবনা

নিয়ে তিনি ভারবর্ষের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের নেতৃত্বদান করেছিলেন। তার এই নিজস্ব বিশ্বাস ও দৃষ্টিভঙ্গীর জন্য নিজের দলের অনেক প্রতিনিধির সঙ্গে তার বিরোধ চরম পর্যায়ে পৌঁছায় অবশেষে বিভাজন ঘটে। যাইহোক এখানে মূলত গান্ধীজির ভাবনা-চিন্তা, আদর্শ, দর্শন নিয়ে আলোচনার চেষ্টা করা হয়েছে অর্থাৎ এককথায় গান্ধীবাদ সম্পর্কে বিশ্লেষণী আলোচনা করা হয়েছে। যদিও মহাত্মা গান্ধী নিজে তার অনুগামীদের বলেছিলেন 'গান্ধীবাদ' বলে কিছু নেই। তাঁর কথায় – "আমার জীবনই আমার আদর্শ"।

আম্বেদকরের ভাবনাঃ

গান্ধীবাদ প্রসঙ্গে আম্বেদকরের ভাবনা আলোচনার পূর্বে – তাঁর আবির্ভাব, চিন্তা-ভাবনা, আদর্শ সম্পর্কে আলোচনা করা দরকার। আম্বেদকরের জন্ম হয় **১৮৯১** সালের **১৪ই** এপ্রিল এক সাধারণ পরিবারে। তিনি বাল্যকাল থেকে নানারকম সামাজিক অসাম্যের শিকার হন। যা তার শিক্ষা ও কর্মজীবনকে বিভিন্নভাবে প্রভাবিত করে। তৎকালীন ভারতবর্ষে সামাজিক শ্রেণীবিন্যাস কী ভয়ঙ্কর আকার নিয়েছিল এবং নিম্নবর্গের মানুষদের কত অবিচারের সম্মুখীন হতে হতো তা আম্বেদকরের জীবনী পাঠের মধ্যে দিয়ে মর্মে মর্মে উপলব্ধি করতে পারা যায়। আর এই অবিচার, অপমান, অত্যাচারে জর্জরিত হয়ে তিনি প্রতিজ্ঞা করেছিলেন নিজের জীবনকে সমাজের এই কলুষতা মুক্ত করতে উৎসর্গ করবেন। আর তাই তিনি আজীবন হিন্দু সমাজের ঐ বৈষম্য অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে লড়াই করে গেছেন। আম্বেদকরের সংগ্রাম, লড়াই এবং শেষে সাংবিধানিক ব্যবস্থা গ্রহণের যে প্রচেষ্টা তা মূলত তৎকালীন ভারতবর্ষের সর্বাপেক্ষা প্রভাবশালী জাতীয়তাবাদী নেতা মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে তার বিবাদের মূল কারণ। এখানে আলোচিত হয়েছে কেন তিনি মহাত্মা গান্ধীর ভাবাদর্শকে মেনে নিতে পারেন নি? কেন তার কাছে মনে হয়েছে মহাত্মা গান্ধীর চিন্তাধারা, রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ হিন্দু সমাজের ঐ শোষণমূলক সুবিধাভোগী, অমানবিক নীতির সংস্করণের জন্য নয় বরং তা ঐ সকল ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখার পক্ষে সওয়াল করে? আর এই সকল কারণে তিনি মহাত্মা গান্ধীর আদর্শ, বিশ্বাস, ক্রিয়াকলাপকে বিরোধিতা করেছিলেন। এই প্রসঙ্গটি আলোচনার জন্য 'পুনা চুক্তিকে' কেন্দ্র করে তাদের মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গীগত যে পার্থক্য পরিস্ফুট হয়েছে তার আলোচনা করা হয়েছে। তার পূর্বে আম্বেকরের সামাজিক, রাজনৈতিক ধ্যান ধারনা বিষয়ে একটু আলোচনা দরকার।

আম্বেদকর যে জাতিগত বৈষম্যের শিকার তা তার ছাত্রজীবনকে বিভিন্নভাবে প্রভাবিত করে। তা সত্ত্বেও অত্যধিক মেধাবী এবং কৃতী ছাত্র হওয়ার জন্য তিনি তার শিক্ষা চালিয়ে যেতে পেরেছিলেন। অবশেষে তিনি এত বেশি ডিগ্রি অর্জন করেছিলেন যে তৎকালীন ভারতবর্ষে তার সমজুড়ী মেলা ভার ছিল। তার কর্মজীবন ছিল বিচিত্র অভিজ্ঞতা সম্পন্ন, এখানেও তিনি বিভিন্নভবে জাতিগত বৈষ্যের শিকার হন। আম্বেদকর

সারা জীবন ধরে মূল তিনটি বিরোধী শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যান। যেগুলি হল – সাবেকী হিন্দুসমাজের রক্ষণশীলতা, ধর্মীয় গোঁড়ামী – জাতীয় আন্তর্জাতিক ভ্রান্ত রাজনীতি এবং সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ সরকারের শাসন ও শোষণ। হিন্দু সমাজের রক্ষণশীলতা এবং ধর্মীয় গোঁড়ামি তাকে ভীষণ ভাবে আঘাত করছিল।

আম্বেদকর বিদেশি শিক্ষা লাভ কালে বিভিন্ন বিদেশি মণীষীদের দ্বারা প্রভাবিত হন। যা তার জীবনাদর্শ, কর্মপ্রক্রিয়া ও মানসিক গঠনে ভীষণ ভাবে প্রভাব রেখেছে। যেমন – মার্কিন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বদের মধ্যে ম্যাডিসন, জেফারসন প্রমুখের নাম উল্লেখ করা যায়। আবার আব্রাহাম লিঙ্কনের গণতান্ত্রিক ধ্যান ধারনা তাকে প্রভাবিত করে। ইংরেজ রাষ্ট্রদার্শনিকদের মধ্যে – হ্যারল্ড ল্যাস্কি, আর্নেস্ট বার্কার, এ.ভি. ডাইসি, আইভর জেনিংস প্রমুখের নাম উল্লেখ করা যায়। তবে ভারতবর্ষের ভগবান বুদ্ধের আদর্শ ও সংস্কার আন্দোলনের দ্বারা তিনি ভীষণ ভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। এছাড়াও কবীর, জ্যোতিবা ফুলের জীবন ও বাণী তাকে প্রভাবিত করেছিল।

আম্বেদকরের সামাজিক রাজনৈতিক ভাবনার পরিচয় দিতে যেটি না বললে নয় যে তিনি ছিলেন দলিত মানুষের প্রতিনিধি। তৎকালীন ভারতীয় সমাজে যেখানে দলিতরা ন্যূনতম মানবিক মর্যাদাটাও পেতেন না সেই অবস্থার অবসানকল্পে তিনি আজীবন লড়াই করে গেছেন। হিন্দু সমাজের সংস্কার সাধনের জন্য দলিতবর্গের্ প্রতিনিধি স্বরূপ এগিয়ে এসে ঐ সমস্ত পিছিয়ে পড়া শ্রেণীর রাজনীতিক অর্থনৈতিক অধিকার সমূহের সংরক্ষনের মাধ্যমে তাদের ভবিষ্যৎ সুনিশ্চিত করনের পথ প্রশস্ত করতে সচেষ্ট ছিলেন। তিনি ভারতবর্ষের জাতিভেদ প্রথার বিরোধিতার পাশাপাশি সমাজের পিছিয়ে পড়া শ্রেণীরা বিভিন্নভাবে যে সমান সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছিল অর্থাৎ তাদের সমানাধিকারের যে অস্বীকৃতি ছিল সেই অবস্থার অবসানের জন্য চেষ্টা চালিয়ে যান। হিন্দু সমাজে যে অন্যায় অবিচার, তার প্রতিকারের সাথে সাথে হিন্দু ধর্মের যে সাবেকী বা সনাতনী বিশ্বাস তার ভ্রান্ততার দিকটি তুলে ধরতে চেষ্টা করেন। আম্বেদকরের এই ভাবাদর্শ ও কার্যপ্রবণতা সম্পর্কে আরোও সুস্পষ্ট ধারনা লাভ করতে গান্ধীজির সঙ্গে তার বিতর্কের যে ক্ষেত্র তৈরী হয়েছিল এবং যে বিষয়ে তার গৃহীত পদক্ষেপ নিয়ে পরে আলোচনা করা হয়েছে।

আম্বেদকরের রাজনীতিক ভাবনা চিন্তা ছিল অনেক প্রগতিশীল। তিনি উদারনৈতিক রাষ্ট্রচিন্তায় বিশ্বাসী ছিলেন আর এ ক্ষেত্রে বিদেশী বিভিন্ন তাত্ত্বিকের প্রভাব তার উপর পড়েছিল। তিনি সক্রিয় রাষ্ট্রব্যবস্থার পক্ষপাতি ছিলেন, তবে সেই রাষ্ট্র যেন উদারনৈতিক দর্শনের দ্বারা পরিচালিত হয়। কিন্তু তিনি উদারগণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থার আড়ালে সংখ্যাগরিষ্ঠের কর্তৃত্বমূলক রাজনীতিক ব্যবস্থাকে বিরোধিতা করেছিলেন। তিনি মার্কিন রাষ্ট্রপতি আব্রাহাম লিঙ্কনের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে এদেশে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার পক্ষপাতি ছিলেন। আর সেই কারণে গণতান্ত্রিক সরকারের প্রতি তিনি সব সময় অনুরাগী ছিলেন। আম্বেদকর চেয়েছিলেন সমাজের সংখ্যালঘু জাতিকে সমাজের

মূলস্রোতে ফিরিয়ে আনতে। তিনি সংসদীয় গণতান্ত্রিক অবস্থাকে সমর্থন জানিয়েছিলেন। আর এই ব্যবস্থার সমর্থনে তিনি বিশেষ তিনটি যুক্তির অবতারণা করেছিলেন। প্রথমতঃ সংসদীয় ব্যবস্থায় বংশানুক্রমিক শাসন ক্ষমতা লাভের কোন সুযোগ থাকে না। দ্বিতীয়তঃ এই ব্যবস্থায় জনজীবনকে নিয়ন্ত্রণকারী নিয়োমনীতি জনগণের অনুমতিতে বৈধতা লাভ করে। তৃতীয়তঃ জনগণের আস্থা ব্যতীরেকে শাসকবর্গ ক্ষমতায় টিকে থাকতে পারে না। এই সকল কারণের জন্য আম্বেদকর সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার সাফল্যের জন্য সর্বদা সচেষ্ট থেকেছেন এবং সেই সঙ্গে সৌভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠার পথ প্রশস্ত করতে উদ্যোগী হয়েছিলেন।

এখন যে বিষয়টার উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে আলোচনা করা হবে তা হল গান্ধীবাদের উপর আম্বেদকরের ভাবনা চিন্তা অর্থাৎ মহাত্মা গান্ধীর চিন্তা-ভাবনা ও ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের প্রতি আম্বেদকরের দৃষ্টিভঙ্গী। গান্ধীবাদ সম্পর্কে আম্বেদকর যে ধারনা পোষন করেছিলেন তা খানিকটা এরকম যে, গান্ধীজী ছিলেন আধুনিকতা ও প্রগতিশীলতার বিরোধী। গান্ধীজির মতে রেল, স্টীমার, হাসপাতালের কোন প্রয়োজন নেই কেননা এইগুলি মানুষকে পাপপূর্ণ জীবনের দিকে ঠেলে দেয়। বৈদ্যুতিক আলো, যন্ত্রচালিত জলসরবরাহ ব্যবস্থারও তিনি বিরোধিতা করেছিলেন। তিনি বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারকে মানতে পারেন নি। কারণ তার কাছে এসব ছিল অভিশাপ। তিনি মনে করতেন মানুষ তার প্রয়োজনীয় সমস্ত জিনিস সে নিজেই মিটিয়ে নেবে। তাঁর মতে যন্ত্র মানুষকে যান্ত্রিক জীবনে যাপনে বাধ্য করে। তাই এগুলিকে সমর্থন জানানো যায় না। সামাজিক ও ধর্মীয় ক্ষেত্রে গান্ধীজি ছিলেন সনাতনপন্থী গোঁড়া হিন্দু। তার মতে হিন্দুদের শাস্ত্রের যে নির্দেশ তা অলঙ্ঘনীয়। ফলত ঐগুলি যৌক্তিকতা দিয়ে বিচার করার কোন প্রয়োজন নেই। প্রকৃতপক্ষে গান্ধীজি রাস্কিন, টলস্টয়, থোরো প্রমুখের ধ্যান ধারনাকে পুনরাবৃত্তি করেছেন বলে আম্বেদকর মনে করেছিলেন। আরোও বলেন – গান্ধীজি বণিক সম্প্রদায়ের স্বার্থপুরণের জন্য বিশেষভাবে সচেষ্ট ছিলেন। এমনকি ভারতবর্ষের সংখ্যাগরিষ্ঠ কৃষক সম্প্রদায়ের মধ্যে শিক্ষার সম্প্রসারণে তার বিশেষ কোন আগ্রহ ছিল না। এছাড়াও গান্ধীজির অন্যান্য যে সকল দৃষ্টিভঙ্গী ও পদক্ষেপকে কেন্দ্র করে আম্বেদকরের সঙ্গে বিরোধ চরম অবস্থায় পৌঁছে ছিল তার আলোচনার মধ্যে দিয়ে উভয়ে মতবাদ সম্পর্কে আরোও স্পষ্ট ধারনা পাওয়া যেতে পারে।

এখানে প্রথম যে বিষয়টার উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে আলোচনা হয়েছে তা হল – 'বর্ণাশ্রম' ব্যবস্থাকে কেন্দ্র করে গান্ধীজির সঙ্গে আম্বেদকরের বিরোধের ক্ষেত্রে। গান্ধীজি যেখানে বর্ণ ব্যবস্থাকে সমর্থন জানাচ্ছেন আম্বেদকর সেখানে এই ব্যবস্থার বিলোপ সাধনের কথা চিন্তা করছেন ফলে বিরোধ স্বাভাবিক। গান্ধীজি বর্ণাশ্রম ব্যবস্থার পক্ষে যুক্তি দিতে গিয়ে বলেছিলেন – মানুষের চরিত্র এবং ব্যক্তিগত গুনাবলীর ভিত্তিতে কোন্ মানুষ কোন্ শ্রেণীভুক্ত তা নির্ধারিত হয়েছে আর ঐ নির্ধারিত বর্ণের ভিত্তিতে ঐ

বর্ণের মানুষজন তাদের পেশার প্রতি মনোনিবেশ করবেন এবং প্রশিক্ষিত হবেন। কিন্তু আম্বেদকর গান্ধীজির ঐ যুক্তিকে মেনে নিতে পারেন নি। তিনি বর্ণব্যবস্থার প্রতি ঐ যুক্তিকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে ঐ ব্যবস্থা উৎখাত করত সচেষ্ট হয়েছিলেন। কারণ ব্যক্তিগত যোগ্যতা ও গুনাবলীর যে যুক্তি মহাত্মা গান্ধী খাড়া করতে চেয়েছিলেন তা ভিত্তিহীন। কারণ কোন্ মানুষ কোন্ বর্ণের অন্তর্ভুক্ত তা পূর্ব থেকে নির্ধারিত হয়ে থাকত। এ প্রসঙ্গে প্রাচীন ভারতের জাত ব্যবস্থার যে ব্যাখ্যা তার আলোচনা করা যেতে পারে। হিন্দুদের প্রাচীন ধর্মগ্রন্থের মধ্যে বিশেষত 'উপনিষদে' জাত ব্যবস্থার যে ব্যাখ্যা দেওয়া আছে তার দ্বারা গান্ধীজি ভীষণ ভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। উপনিষদের ব্যাখ্যানুযায়ী ব্রহ্মার শরীর থেকে মানব সমাজের উৎপত্তি হয়েছে। সেক্ষেত্রে ব্রহ্মার কোন অংশ থেকে কোন সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়েছে তার দ্বারা তাদের পদমর্যাদা নির্ধারিত হয়েছিল। যেমন ব্রহ্মার মুখ থেকে সৃষ্টি হয়েছে যে জাতির তারা হল উচ্চ জাতি, ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়। তারা সমাজ পরিচালনার দায়িত্ব পালন করবে। আবার ব্রহ্মার বাহুদ্বয় থেকে সৃষ্টি হয়েছে ক্ষত্রিয় সম্প্রদায়ের, তাই তাদের কাজ হবে দেশকে নিরাপত্তা দান করা। ব্রহ্মার উরুদ্বয় থেকে সৃষ্টি হয়েছে বৈশ্য সম্প্রদায়ের, তাদের কাজ ব্যবসা বাণিজ্য পরিচালনা করা এবং সমাজের সম্পদের বণ্টনের কাজ করা। অপর পক্ষে শূদ্র সম্প্রদায়ের সৃষ্টি ব্রহ্মার পদযুগল থেকে তাই তাদের কাজ হবে ওপরের ঐ তিন সম্প্রদায়কে সেবা করা এবং তাদের নির্দশ মতো পরিচালিত হওয়া। উপনিষদীয় ব্যাখ্যা আম্বেদকর কোনভাবে মেনে নিতে পারেন নি। তিনি মনে করেছিলেন এই সকল ব্যাখ্যা সমাজের উচ্চ সম্প্রদায়ের মানুষদের মনগড়া। এই ব্যাখ্যাদানের মধ্যে দিয়ে তারা সাধারণ মানুষের উপর শোষনের ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছিল। আম্বেদকর এই ব্যবস্থার বিরোধিতা করতে গিয়ে তাই ক্ষোভে, দুঃখে-মনুস্মৃতি পুড়িয়ে ফেলা, ডিনামাইট দিয়ে হিন্দু ধর্মকে উড়িয়ে দেওয়ার ডাক দিয়েছিলেন। অবশেষে তিনি হিন্দু ধর্ম ত্যাগ করে বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন।

আবার পৃথক নির্বাচন মণ্ডলীর প্রসঙ্গে মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে আম্বেদকরের মতবিরোধ একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গ। যেখানে বর্ণ হিন্দুদের নিপীড়িত, অত্যাচারিত, শোষিত হওয়ার পর নিচু সম্প্রদায়ের জন্য আম্বেদকর যখন পৃথক নির্বাচন মণ্ডলীর দাবি জানান গান্ধীজি তার চরম বিরোধিতা করেন। এমনকি আম্বেদকর যখন মুসলমান, খ্রীষ্টান প্রভৃতি অন্যান্য সংখ্যালঘুদের জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের কথা বলছেন গান্ধীজি তার চরম বিরোধিতা করেন। গান্ধীজি এখানে যুক্তি দিয়েছিলেন যে, যদি পৃথক নির্বাচন মণ্ডলীর ব্যবস্থা করা হয় তাহলে হিন্দু সমাজের ভাঙনকে আহ্বান জানানো হবে। আর এক্ষেত্রে হিন্দুদের মধ্যেকার ঐ ব্যবধানের অবসানের পরিবর্তে তা পাকাপাকি ভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত হবে। গান্ধীজির এই যুক্তির কারণে আম্বেদকরের সঙ্গে তাঁর বিরোধ চূড়ান্ত রূপ লাভ করে। যা তাদের ধ্যান ধারনাগত ব্যবধানকে স্পষ্ট করে তোলে।

এই বিশ্লেষণ ধর্মী সংক্ষিপ্ত আলোচনাটি 'সাম্প্রদায়িক বঁটোয়ারা' ও 'পুনাচুক্তির' প্রেক্ষাপট আলোচনার মধ্য দিয়ে সমাপ্ত করা হয়েছে। এক্ষেত্রে বলা যায় – **১৯৩২** সালের ২৩ শে মে পুনায় সর্বভারতীয় অস্পৃশ্যতা লীগের অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। ঐ অধিবেশনে আম্বেদকর অস্পৃশ্যদের জন্য মন্দির, কূপ, জলাধার নির্মাণ বা অসবর্ণ পোঙক্তি ভোজনের ব্যবস্থাকে সমর্থন করতে পারেন নি। তিনি অস্পৃশ্যদের জন্য দাবী করেছিলেন – চাকুরী, শিক্ষা, খাদ্য, পরিধেয় ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা। **১৯৩২** সালে সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার মাধ্যমে তিনি অস্পৃশ্যদের জন্য পৃথক নির্বাচন মণ্ডলীর দাবী আদায়ে সচেষ্ট হন। কিন্তু গান্ধী এই ব্যবস্থার বিরোধিতা করেন এবং এই অবস্থা অবসানের জন্য আমরণ অনশনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এক্ষেত্রে গান্ধীজির অনশনের বিষয়ে আম্বেদকরের বিবৃতি এবং উদ্ভুত পরিস্থিতির বিশ্লেষণে মাধ্যমে পুনা চুক্তির প্রেক্ষাপট বিষয়ে সুস্পষ্ট ধারনা তুলে ধরা যেতে পারে।

আম্বেদকর তার বিবৃতিতে বলেছিলেন – "আমি আশা করব গান্ধীজী তার অনশনের সিদ্ধান্ত থেকে বিরত হবেন। আমরা মনে করি পৃথক নির্বাচনের দাবী করে আমরা হিন্দুসমাজের কোন ক্ষতি করিনি। আমরা পৃথক নির্বাচন চেয়েছি কারণ আমাদের ভাগ্য নির্ধারণের ব্যাপারে অন্যের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে চাই না। আমরা আমাদের হৃত অধিকারের দাবী জানিয়েছি। আমরা আশা করব মহাত্মাজী আমাদের আশা থেকে বঞ্চিত করবেন না। তিনি আমৃত্য অনশনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন আরোও মহত্তর উদ্দেশ্যে। আমি আশা করব তিনি এরূপ সংকল্প নেবেন – হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গা, নির্যাতিত শ্রেণীর উপর বর্ণ হিন্দুদের দাঙ্গা, অথবা কোন জাতীয় কারণে। তাঁর বর্তমান সিদ্ধান্তের দ্বারা নির্যাতিত শ্রেণীর কোন কল্যাণ হতে পারে না। মহাত্মাজী এটা অনুধাবন করতে পেরেছেন কিনা জানি না যে, এর ফলে তার অনুগামীদের দ্বারা নির্যাতিত শ্রেণীর উপর সর্বত্র একটা সন্ত্রাস সৃষ্টি করা হবে মাত্র" – এইভাবে আম্বেদকর গান্ধীজিকে অনশন থেকে বিরত করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন।

গান্ধীজির অনশন এক বিরাট সমস্যার সৃষ্টি করল। সমস্যাটি হল – গান্ধীজির জীবন রক্ষা করা যাবে কি উপায়ে? গান্ধীজির জীবন রক্ষার একমাত্র উপায় হল সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার নীতির পরিবর্তন। আর ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী এ বিষয়ে স্পষ্ট ভাবে জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, কেবলমাত্র বর্ণ হিন্দুরা এবং অস্পৃশ্যরা একমত হয়ে নতুন কোন প্রস্তাব ব্রিটিশ সরকারকে দেয় তবেই বাঁটোয়ারা রায়ের পরিবর্তন সম্ভব। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী অস্পৃশ্য সমাজের রাজনৈতিক অধিকারের রায়কে উপেক্ষা করে গান্ধীজির সম্মতি সাপেক্ষে সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ার রায়কে পরিবর্তন করেন। আর এই সম্মতি 'পুনা অ্যাক্ট' বা 'পুনা চুক্তি' নামে অভিহিত হয়।

এইভাবে ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে মহাত্মাগান্ধীর চিন্তাধারা তথা গান্ধীবাদের সঙ্গে আম্বেদকরের ভাবনা চিন্তার বিরোধের ধারা প্রবাহিত

হয়। অবশেষে ভারতের সমস্ত বঞ্চিত এবং দলিত সমাজকে একটি মঞ্চে সংঘবদ্ধ করার উদ্দেশ্যে ডঃ ভীমরাও আম্বেদকর ১৯৪৬ সালে ভারতীয় রিপাবলিকান পার্টির রূপরেখা অঙ্কন করনে। কিন্তু পার্টি গঠন করার আগেই ঐ সালের ডিসেম্বর মাসের ৬ তারিখে এই কৃতি সন্তানের জীবনাবসান ঘটে। অবশেষে দাদাসাহেব গাইকোয়াড়ের নেতৃত্বে ঐ দল গঠিত হয়ে স্বাধীন ভারতের রাজনৈতিক মঞ্চে খানিকটা স্থান দখল করলেও তাঁর মৃত্যুর পর তা ভেঙে পড়ে। পরবর্তীকালে সংগ্রামী নেতা কাঁসীরামের নেতত্বে আম্বেদকরের ভাবাদর্শে নতুন দল হিসাবে বহুজন সমাজবাদী পার্টি গঠিত হয় ১৯৮৪ সালে।

তথ্যসূত্রঃ

১. Dr. B.R. Ambedkar – "What Congress and Gandhi have done to the untouchables?"
২. Bhiku Parekh – "Gandhi's Political Philosophy"
৩. ডঃ আম্বেদকর প্রকাশনী – পুনা চুক্তি পটভূমি ও ফলশ্রুতি।
৪. ডঃ আম্বেদকর প্রকাশনী – ডঃ বি.আর. আম্বেদকরের সংক্ষিপ্ত জীবনী।
৫. ডঃ আম্বেদকর প্রকাশনী – ডঃ আম্বেদকরের রাজনৈতিক চিন্তাধারা।
৬. সুকুমার সিং – সমাজ ও সংস্কৃতি : বিরোধ ও উত্তরণ।
৭. অনাদি কুমার মহাপাত্র – ভারতীয় রাষ্ট্রদর্শন।

হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় : জীবন ও সাহিত্য

ইমরান আলী মুনশী
সহকারী অধ্যাপক,
গবেষক, পশ্চিমবঙ্গ রাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়

হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ২৫শে চৈত্র, ১২৯৬ বঙ্গাব্দে রবিবার জন্মগ্রহণ করেন। খুব অল্প বয়সে তিনি বাবা-মা কে হারিয়ে মাসির কাছে মানুষ হন। তিনি প্রথাগত শিক্ষায় শিক্ষিত ছিলেন না। কিন্তু নিজের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় তিনি ছিলেন স্বশিক্ষিত। সুকুমার সেন 'দিনের পরে দিন যে গেল' স্মৃতিচারণায় লিখেছেন, 'হরেকৃষ্ণবাবু ইস্কুল কলেজে পড়েননি। নিজের চেষ্টায় শিক্ষিত হয়েছিলেন'। রাঢ় বাংলার অজপাড়া গাঁয়ে দরিদ্র লাঞ্ছিত অসহায় পরিবারে তাঁর জন্ম, কর্ম ও সুশিক্ষিত হয়ে ওঠার সংগ্রাম অনেকটা রোমাঞ্চকর গল্পের মতো। তিনি একে একে লিখেছেন- 'বীরভূম বিবরণ' (তিনটি খণ্ড), 'কবি জয়দেব ও শ্রীশ্রীগীতগোবিন্দম্', 'পদাবলী পরিচয়' সহ একাধিক গ্রন্থ। এছাড়া বেশকিছু গ্রন্থের সম্পাদনাও করেছেন তিনি। মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার থেকে শুরু করে হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় পর্যন্ত একাধিক বাঙালি প্রাচীন সাহিত্য চর্চায় আগ্রহ দেখিয়েছেন। বৈষ্ণবরস সাহিত্যের ব্যাখ্যাতা হিসাবে হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের অবদান অদ্যাবধি বাঙালির মনে প্রাণে জায়মান। তাঁর 'পদাবলী পরিচয়' গ্রন্থে বৈষ্ণব ধর্ম ও তত্ত্ব দর্শনের ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। তিনি ১৩৬৮ বঙ্গাব্দে ৩৮৫৮ টি পদ নিয়ে প্রকাশ করেন 'বৈষ্ণব পদাবলী' সংকলন গ্রন্থ। হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের প্রথম কবিতার বই 'কমণ্ডলু' এবং দ্বিতীয় কবিতা ও গানের গ্রন্থ 'যাবার দিনে' পাঠকের হৃদয় হরণ করে। এহেন প্রথিতযশা ব্যক্তিত্ব ১৯৭৭ সালে আমাদের ছেড়ে পরলোক গমন করেন।

অন্নদাশঙ্কর রায় একটি চিঠিতে 'বীরভূমের তিন মহারথী' বলে নামোল্লেখ করেছিলেন হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস এর। তবে একথা আমাদের মেনে নিতেই হবে বিংশ শতাব্দীর এক বিশেষ কাল-সীমায় বাংলা সাহিত্যের ত্রিবিধ ক্ষেত্রে ফলবান হয়েছিল এই তিনজন মনিষীর হাত ধরেই। প্রথমজন গবেষক প্রাবন্ধিক হিসাবে, দ্বিতীয়জন কথাসাহিত্যিক রূপে এবং তৃতীয়জন সমালোচক ও সাময়িক পত্রের সম্পাদক রূপে। তবে এঁদের গুরুস্থানীয় হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সম্পর্কে চর্চা বাংলা সাহিত্যে খুব কমই দেখা গেছে। আজ আমরা হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের জীবন ও সাহিত্য চর্চার ইতিহাস নিয়ে আলোচনা করব।

হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় জন্ম গ্রহণ করেন ২৫শে চৈত্র, ১২৯৬ বঙ্গাব্দে (৬ই এপ্রিল, ১৮৯০)। হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের পূর্বপুরুষগণ মুর্শিদাবাদ জেলার সোনারুন্দী

গ্রামে বাস করতেন। সোনারুন্দী গ্রামের অপর নাম বনওয়ারীবাদ। হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের পিতামহ ধনকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় 'ফুলে মেল নিকষ কুলীন'[১]ছিলেন। ধনকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের একাধিক বিবাহ ছিল বলে জানা যায়। বিভিন্ন সূত্র থেকে জানা যায় যে তাঁর শেষ বিবাহ ছিল বীরভূম জেলার মঙ্গলডিহি গ্রামে। হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের পিতামহী ছিলেন চট্টরাজ বংশের মেয়ে। কথিত আছে তিনি অপূর্ব সুন্দরী ছিলেন। তিনি বিবাহের পর পিত্রালয় মঙ্গলডিহিতেই থাকতেন। মঙ্গলডিহিতেই হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের পিতা জন্মগ্রহণ করেন। মাতুল বিষ্ণু চট্টরাজ, হরেকৃষ্ণের পিতার নাম রাখেন ত্রৈলোক্যনাথ। তিনি পাঁচবৎসর বয়সে বিদ্যাশিক্ষার জন্য মায়ের সঙ্গে সোনারুন্দী আসলে, এখানকার জমিদার (রাজা) সুলক্ষণযুক্ত বালিকাটির নাম রাখেন বনওয়ারীলাল[২]। হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের পিতা বনওয়ারীলালও তিনটি বিবাহ করেন। অন্য দুই স্ত্রীর কোনো সন্তান ছিল না। হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের মাতা ছিলেন ক্ষুদুমণি দেবী। বনওয়ারীলাল ও ক্ষুদুমণির দুই পুত্র, জ্যেষ্ঠ পঞ্চানন মুখোপাধ্যায়, কনিষ্ঠ হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়।

হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় জন্মগ্রহণ করার কয়েক বছর পর ১২৯৯ সালের ১৮ই ফাল্গুন তাঁর পিতৃদেব বনওয়ারীলাল মুখোপাধ্যায় পরলোক গমন করেন। এর কিছু বছর পর ১৩০৪ সালের ১৭ই মাঘ মাতাঠাকুরাণীও পরলোক গমন করেন। অতঃপর মাসীমাতা সারদাসুন্দরী দেবীই হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ও তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পঞ্চাননকে প্রতিপালন করেন। পঞ্চানন হেতমপুর রাজচতুস্পাঠীতে ব্যাকরণ অধ্যায়ন এবং পৌরহিত্যে শিক্ষালাভ করেন। তাঁর ক্রিয়া কলাপে সন্তুষ্ট হয়ে নবদ্বীপের মহামহোপাধ্যায় আশুতোষ তর্কভূষণ সহ কয়েকজন পণ্ডিত তাঁকে 'কৃতিভূষণ'[৩]উপাধি দান করেছিলেন।

গ্রামের পাঠশালায় উচ্চপ্রাথমিক শ্রেণি পাশ করে হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ছাত্র বৃত্তি পর্যন্ত অর্থাৎ চতুর্থ শ্রেণি পর্যন্ত পড়েছিলেন; কিন্তু শেষ পর্যন্ত পরীক্ষা দেওয়া হয়নি। পরে অবশ্য নিজের চেষ্টাতে তিনি বিভিন্ন লাইব্রেরিতে ঘুরে ঘুরে জ্ঞানার্জনে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন বলে জানা যায়। কারো কারো মতে হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের পড়াশুনা যথেষ্ট নেই। এই প্রসঙ্গে কবি শেখর কালিদাস রায় বলেছেন—

> "সাহিত্য রত্নের বই পড়ে অন্তত তা মনে হয় না।ওঁর লাইনে, অর্থাৎ বৈষ্ণব সাহিত্যে পড়াশুনা যথেষ্ট আছে এবং তা নিজ চেষ্টাকৃত অর্থাৎ মহাবিদ্যালয় বা বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতার বাইরে থেকেই জ্ঞান অর্জনকরেছিলেন। "[৪]

প্রতিষ্ঠানিক শিক্ষায় শিক্ষিত না হয়েও হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় যে স্বশিক্ষিত ছিলেন, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় তাঁকে 'সাহিত্যরত্ন'[৫] উপাধি দিয়েছিলেন। বিভিন্ন তথ্য থেকে জানা যায় শেষ বয়সে তিনি বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'ডি-লিট'[৬] উপাধিও লাভ করেছিলেন।

হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় নয় বছর বয়সে বিবাহ করেন, তখন তাঁর স্ত্রীর বয়স ছিল সাত। তথ্যানুসন্ধানে জানা যায় বিবাহের কিছু দিন পূর্বে তাঁর উপনয়ন হয়, ফলে ন্যাড়া মাথাতেই টোপর পরে বিবাহ করতে গিয়েছিলেন তিনি, এমনই তথ্য পাওয়া যায়। হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ও দুবার বিবাহ করেছিলেন। তাঁর প্রথম পত্নী ছিলেন আচলাদেবী। হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের প্রথমা পত্নী আচলাদেবী বেশিদিন জীবিত ছিলেন না ; উদারী রোগে[৭] তিনি ১৩২১ বঙ্গাব্দের ২০শে আষাঢ় মাসে কলিকাতায় কারমাইকেল কলেজে পরলোক গমন করেন। তাঁর দ্বিতীয় স্ত্রী ছিলেন কনকলতা দেবী। ১৩৬৯ সালের ৩রা ফাল্গুন নবদ্বীপে পরলোক গমন করেন তিনি । এর বেশ কিছু বছর পর ৩রা ডিসেম্বর, ১৯৭৭ সালে হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় পরলোক গমন করেন।

বীরভূম অনুসন্ধান সমিতির প্রতিষ্ঠাতা সাহিত্যরত্ন হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় (১৮৯০ – ১৯৭৭) প্রথাগত শিক্ষায় শিক্ষিত নাহলেও বাংলা সাহিত্যের, বিশেষ করে বৈষ্ণব সমাজ-ধর্ম ও সাহিত্যের একটি উল্লেখযোগ্য নাম। নানান শিলালিপি, বহু মহাজনী পদাবলী ও বহু প্রাচীন পুঁথির আবিষ্কর্তা হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় লিখেছেন বীরভূম বিবরণ (১ম খণ্ড ১৩২৩, ২য় খণ্ড ১৩২৬, ৩য় খণ্ড ১৩৩৪), ‘কবি জয়দেব ও শ্রীশ্রীগীতগোবিন্দম্’(১৩৩৬), ‘পদাবলীপরিচয়’ (১৩৫৯) প্রভৃতি একাধিক গ্রন্থ। ‘শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত’, ‘শ্রীশ্রীচৈতন্যভগবত’, ‘কৃত্তিবাসী রামায়ণ’, ‘বৈষ্ণব পদাবলী’, ‘জ্ঞানদাস পদাবলী’ প্রভৃতি গ্রন্থের সম্পাদনাও করেছেন তিনি। এছাড়া বিভিন্ন সংবাদপত্র ও পত্র পত্রিকায় লিখেছেন একাধিক প্রবন্ধ। ‘দিনের পরে দিন যে গেল’ স্মৃতিচারণায় সুকুমার সেন তাঁকে ‘রবীন্দ্রনাথেরর জোড়া’ বলে অবিহিত করেছেন। তিনি বলেছেন—

> “হরেকৃষ্ণবাবু ইস্কুল কলেজে পড়েননি। নিজের চেষ্টায় শিক্ষিত হয়েছিলেন। তাঁকে ‘সাহিত্যরত্ন’ উপাধি দিয়েছিলেন হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। শেষ বয়সে তিনি বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডি-লিট উপাধি লাভ করেছিলেন। এ বিষয়ে হরেকৃষ্ণবাবু রবীন্দ্রনাথের জোড়া।”[৮]

এমনই একজন প্রথিতযশা ব্যক্তির জীবন ও সাহিত্য অন্বেষণ যে আধুনিক পাঠকের আগ্রহের বিষয় হয়ে উঠবে, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। সাহিত্যরত্ন হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের জীবন ও সাহিত্য নিয়ে অনুসন্ধিৎসুগবেষকদের তেমন কোনো আগ্রহ আমাদের নজরে আসেনি। অথচ তাঁকে বাদ দিয়ে প্রাগাধুনিক বাংলা সাহিত্যের চর্চা খণ্ডিত হয়ে যায়। কারণ তিনি ছিলেন বৈষ্ণব সাহিত্য, সমাজ ও ধর্মের ব্যাখ্যাতা, প্রচারক ও প্রতিষ্ঠাতা এবং বহু বিখ্যাত বৈষ্ণব কবির রচিত পদাবলীর সংগ্রাহক ও গ্রন্থ সম্পাদক। ১৯৭০ সালে প্রগতি সাহিত্য সম্মেলনের সভাপতি দক্ষিণারঞ্জন বসু প্রাজ্ঞ প্রবীণ সাহিত্যরত্ন হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সম্পর্কে বলেছেন—

> “বাংলার বৈষ্ণব সাহিত্য বিশেষজ্ঞদের মধ্যে তিনি অন্যতম শিরোমণি। ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিচার বিশ্লেষণ এবং তত্ত্বের সঙ্গে তথ্যের সমন্বয় বিধান তাঁর সাহিত্য পর্যালোচনা রীতির বৈশিষ্ট্য।”[৯]

ইতিহাসের প্রতি ভালোবাসা হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের আগে থেকেই ছিলো। এ বিষয়ে তাঁকে উৎসাহ যোগাতেন হেতমপুরের মহারাজ কুমার সুহৃদ বন্ধুবর মহিমানিরঞ্জন চক্রবর্তী। তাঁরই উৎসাহ ও প্রচেষ্টায় হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় বীভূমের বিভিন্ন স্থান ঘুরে ঘুরে রচনা করেন চিত্রসহ তিন খণ্ডে ‘বীরভূম বিবরণ’[১০] গ্রন্থ। গ্রন্থ তিনটিতে ইতিহাসের উপাদান খুঁজে পাওয়া যায়। এই গ্রন্থ তিনটি থেকে আমরা বীরভূম জেলার আর্থ - সামাজিক অবস্থান, সাংস্কৃতিক ও সাহিত্যিক পরিচয় উদ্ধার করতে পারি।

‘বীরভূম বিবরণ’ প্রথম খণ্ড গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় ১৩২৩ সালের ভাদ্রমাসে ‘বীরভূম–অনুসন্ধান – সমিতি’র পক্ষ থেকে। গ্রন্থটি মহারাজ কুমার মহিমানিরঞ্জন চক্রবর্তীর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়। বিশ্বকোষ-কুটীর, ৯ বিশ্বকোষ লেন, কলিকাতা থেকে গ্রন্থটি প্রকাশিত। বইটির মূল্যছিল দুই টাকা। গ্রন্থটি উৎসর্গ করা হয় রামরঞ্জন চক্রবর্তী বাহাদুর’কে। উৎসর্গ পত্রে রামরঞ্জন চক্রবর্তীর একটি সাদা কালো আবক্ষ চিত্র দেওয়া আছে। প্রচ্ছেদ পত্র, নাম পত্র, ভূমিকা, উৎসর্গ পত্র, মূলগ্রন্থসহ বইটির মোট পৃষ্ঠাসংখ্যা ২৫৬। গ্রন্থটিতে ভূমিকাসহ মোট দশটি অধ্যায় আছে এবং হেতমপুর, ভদ্রপুর, বক্রেশ্বর প্রভৃতি বিভিন্ন স্থানের চিত্রসহ বর্ণনা আছে।

মহিমানিরঞ্জন চক্রবর্তীর সম্পাদনার ‘বীরভূম বিবরণ’ এর দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হয় ১৩২৬ সালের ১লা ফাল্গুন। এই গ্রন্থের ভূমিকাটিও লেখেন নগেন্দ্রনাথ বসু। প্রথম মুদ্রণের সময় বইটির মূল্য ছিল তিন টাকা। গ্রন্থটি উৎসর্গ করা হয় ‘বর্তমান বঙ্গের সর্বশ্রেষ্ঠ পুরাতত্ত্ববিদ্‌ পূজ্যপাদ মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী’ মহাশয়কে।মোট আঠারোটি অধ্যায়ে ‘বীরভূম বিবরণ’ (দ্বিতীয় খণ্ড) গ্রন্থটি লিখিত। বীরনগর কাহিনি, কনকপুর কাহিনি (বারা), রামপুরহাট কাহিনি প্রভৃতি কাহিনি নিয়ে গ্রন্থটি রচিত। গ্রন্থটির মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ২৬০। গ্রন্থে শুধু বর্ণনা নয় প্রত্যেকটি স্থানের চিত্রসহ পুঙ্ক্ষানুপুঙ্ক্ষ বিবরণ তুলেছেন লেখক। বীরভূমের বিভিন্ন ঐতিহাসিক স্থানের চিত্রও আমরা এই গ্রন্থে পেয়ে থাকি। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করতে পারি বারাগ্রামে প্রাপ্ত একটি মূর্তি ও উক্ত গ্রামেই পাওয়া সূর্য মূর্তির কথা।

‘বীরভূম বিবরণ’ তৃতীয় খণ্ড মহিমানিরঞ্জন চক্রবর্তীর সম্পাদনায় ১লা শ্রাবণ, ১৩৩৪ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থের ভূমিকা লেখেন হরপ্রসাদ শাস্ত্রী । বইটির মূল্য ছিল তিন টাকা। ‘বীরভূম বিবরণ’ প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডের থেকে তৃতীয় খণ্ড কিছুটা ভিন্নধর্মী। এখানে বীরভূমের বেশ কিছু গ্রাম নিয়ে আলোচনা আছে; পাশাপাশি ঐ গ্রামের বা অঞ্চলের সাহিত্যিকদের বর্ণনাও সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। এছাড়াও আছে চণ্ডীদাসের কথা, শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কথা। গ্রন্থটিতে বৈষ্ণবপদ সম্পর্কেও আলোচনা

করা হয়েছে। এছাড়া এই গ্রন্থে কালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়, পীতাম্বর দে, ভৈরবচন্দ্র চট্টরাজ প্রমুখ ব্যক্তিবর্গদের সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায়ে।

বাঙালির প্রাচীন সাহিত্য বিষয়ক আগ্রহ, চর্চা ও সচেতনতা দেখা গিয়েছে অনেক আগে থেকেই। ন্যাথানিয়েল ব্রাসি হ্যালহেড, উইলিয়াম কেরী প্রমুখেরাও এই কাজে আমাদের সহযোগিতার হাত বাড়িয়েছিলেন। বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থের কথা বলা যায়, যেখানে প্রাচীন সাহিত্যের প্রকাশ ও প্রচার করে বাঙালির সাহিত্য-চর্চার ইতিহাসকে তাঁরা এগিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালংকার থেকে শুরু করে হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় পর্যন্ত একাধিক বাঙালি এই কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। বৈষ্ণবরস সাহিত্যের ব্যাখ্যাতা হিসেবে হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের আবদান অদ্যাবধি বাঙালির মনে প্রাণে জায়মান। হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় লিখিত ‘পদাবলী পরিচয়’ (১৩৫৯) গ্রন্থে বৈষ্ণব ধর্ম ও তত্ত্ব দর্শনের ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। ২রা আশ্বিন ১৩৫৯ বঙ্গাব্দে ‘পদাবলী পরিচয়’ গ্রন্থটি হরিদাস চট্টোপাধ্যায়, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স থেকে প্রকাশিত হয়। গ্রন্থটি শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, সাতকড়ি মুখোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, সজনীকান্ত দাস প্রমুখকে উৎসর্গ করা হয়। ভূমিকা লেখেন সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়। গ্রন্থটিতে টাইটেল পেজ, উৎসর্গ পত্র, ভূমিকা, নিবেদন, সূচিপত্রসহ মোট ২১টি পৃষ্ঠা এবং মূলগ্রন্থে ২১৮টি পৃষ্ঠা আছে। গ্রন্থটির মূল্য ছিল তিন টাকা।এছাড়া হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের‘বৈষ্ণব পদাবলী’ ছাত্র ছাত্রী ও গবেষকদের কাছে একমাত্র সহজপ্রাপ্ত বৈষ্ণবপদ সংকলনের আকর গ্রন্থ।

বৈষ্ণবসাহিত্য-সমালোচক হিসাবে হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের আবদান কম নয়। তাঁর লেখা বৈষ্ণব প্রবন্ধ সমকালের বিখ্যাত পত্র-পত্রিকায়, যেমন- দৈনিক আনন্দবাজার, যুগান্তর, উজ্জীবন প্রভৃতিতে নিয়মিত প্রকাশিত হত। পরে সেইসব প্রবন্ধ একত্রিত করে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ‘গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাধনা’, ‘শ্রীকৃষ্ণ প্রসঙ্গ ও বৈষ্ণবতত্ত্ব’ প্রভৃতি গ্রন্থে। গ্রন্থটি প্রথম প্রকাশিত হয় ৭ই ভাদ্র, ১৩৭৭ বঙ্গাব্দে, জিজ্ঞাসা প্রকাশনী থেকে। গ্রন্থটি উৎসর্গ করা হয় সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়-কে। গ্রন্থের ভূমিকা লেখেন স্বয়ং হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়। গ্রন্থটি কুড়ি বছর পর পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ থেকে ১৯৯০ খ্রিস্টাব্দে প্রথম পুনর্মুদ্রিত হয় এবং অনমিত্র দাশের সম্পাদনায় জুন, ২০১১ তে দ্বিতীয় মুদ্রণ হয়। গ্রন্থের ভূমিকা থেকে জানা যায় ১৩৭৫ সালে ‘হরেকৃষ্ণ সম্বর্ধনা সমিতি’ গঠিত হয় এবং একটি স্মারক গ্রন্থ প্রকাশের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। কিন্তু নানা কারণে এই পরিকল্পনা রূপায়িত হয়নি। হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ভূমিকায় লিখেছেন—

“সমিতির মূল সভাপতি ডক্টর চট্টোপাধ্যায়ের পরামর্শে সমিতির সদস্যগণ আমার কয়েকটি পুরানো লেখা লইয়া আমাকে একখানি গ্রন্থ প্রকাশে অনুরোধ করিলেন। তাহারই ফল এই গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাধনা।”[১১]

এই গ্রন্থের প্রথম প্রবন্ধ 'শ্রীচৈতন্য ভাগবত ও শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত'। গ্রন্থের অপর উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধের মধ্যে আছে– শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়, শ্রীলোকনাথ গোস্বামী, শ্রীজীব গোস্বামী প্রভৃতি। এছাড়াও এই গ্রন্থে বৈষ্ণবপদাবলীর বিভিন্ন পর্যায়ের চমৎকার ব্যাখ্যা করেছেন হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়। হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় প্রেমবৈচিত্ত্যের সংজ্ঞা দিয়েছেন এইভাবে—

> "প্রিয়তমের নিকটে থাকিয়াও প্রেমের প্রগাঢ়তায় মনে হয় তিনি কোথায়? ইহা এক রহস্যময় অবস্থা। এই অবস্থার নামই প্রেমবৈচিত্ত্য"।[১২]

ছোটবেলা থেকেই হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় 'জয়দেব কেন্দুলী' নামের সঙ্গে পরিচিত। জয়দেবের কেন্দুবিল্ব এখন 'জয়দেব কেন্দুলী' নামে পরিচিত। অনেকে কেন্দুলীও বলে না, বলে জয়দেব। তবে হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'জয়দেব'[১৩] প্রবন্ধ পাঠ করার পরেই এ বিষয়ে বিশেষ আগ্রহী হন। সেই আগ্রহ ও কৌতূহলের বসে তিনি কেন্দুলীর মেলায় কোনো ভালো লোক দেখতে পেলে, ভক্ত বৈরাগীর সঙ্গে পরিচয় হলে তাঁদের কাছে গিয়ে বসতেন, পুঁথিপত্রের খবর নিতেন এবং তারই ফলস্বরূপ তিনি রচনা করেন। 'কবি জয়দেব ও শ্রীগীতগোবিন্দ' নামক সমালোচনামূলক গ্রন্থ।

দেশে-বিদেশের অধিকাংশ শিক্ষিত ব্যক্তির কাছে শ্রীগীতগোবিন্দ একটি কাব্যমাত্র। তাঁরা কাব্য হিসাবেই এই গ্রন্থটিকে বিচার করে থাকেন। অনেকেই এই কাব্যকে ভালো বলেন আবার অনেকেই নিন্দা করেন। অনেকেই মনে করেন কাব্যটি আশ্লীলতা দোষে দুষ্ট। তবে হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় প্রথম সংস্করণের নিবেদন অংশে জানিয়েছে, ' জয়দেব কামের আবরণে প্রেমের কথাই বলিয়াছেন'[১৪]। শ্রীগীতগোবিন্দের সৌন্দর্য ও চমৎকারিত্ব সম্বন্ধে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। বিশেষ করে শ্রীরাধার প্রেমতন্ময়তায় যে চিত্র কবি ফুটিয়ে তুলেছেন, তার মাধুর্য, মহিমা ও পবিত্রতা বিতর্কের অতীত। 'কবি জয়দেব ও শ্রীগীতগোবিন্দ' গ্রন্থে হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় যেমন মূল কাব্যের বিশ্লেষণ করেছেন, তেমনি শ্রীকৃষ্ণ প্রসঙ্গ, শ্রীরাধা প্রসঙ্গ, শ্রীরাধাতত্ত্ব ইত্যাদি প্রাসঙ্গিক বিষয়ের আলোচনাও করেছেন।

পদাবলী সাহিত্য হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়কে বার বার মুগ্ধ করেছে। খুব অল্প বয়স থেকেই তিনি কীর্তন গানের প্রতি আকৃষ্ট হন। হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের বয়স যখন ছয়-সাত বছর তখন তিনি মঙ্গলডিহির ঠাকুরবাড়িতে রসিক দাসের কীর্তন গান শুনেছিলেন। এত অল্প বয়সে গানের মর্মার্থ কিছু না বুঝলেও পদবলির শব্দঝঙ্কার হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যেয়ের মনে অভূতপূর্ব উন্মাদনা সৃষ্টি করেছিল। এরপর একে একে গণেশ দাশ, শচীনন্দন দাস, বিপিন দাস, অবধূত বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রেমদাস, ফটিক চৌধুরী, বনওয়ারী দাস, অখিল দাস প্রমুখ কীর্তনায়াদের গান শুনেছিলেন। অনেকের সঙ্গে সৌহার্দ্যও হয় তাঁর। কীর্তনের পাঠ, ব্যাখ্যা নিয়ে তাঁদের সঙ্গে আলোচনাও করেছেন বলে জানা যায়। পদাবলী ও বৈষ্ণবপদের পাঠান্তর সংগ্রহের জন্য সংযুক্ত বাংলার ঢাকা, আসাম এবং

উড়িষ্যার নানা স্থান ভ্রমণ করেছেন তিনি। কীর্তন গান প্রসঙ্গে হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় জানিয়েছেন—

> "কীর্তনগানের একটা বৈশিষ্ট্য আছে। কীর্তন গান বাঙ্গালীর এক অভিনব সৃষ্টি, বাঙ্গালীর স্বকীয়তা-মাখানো বাঙ্গালার এক অতুলনীয় সম্পদ। কথা ও সুরের মর্যাদানুরূপ মিলনে কীর্তন বাঙালির এক দিব্যাবদান। কীর্তনের এই বৈশিষ্ট্য স্বকীয়তা আমি লিখিয়া বুঝাইতে পারিব না"।[১৫]

'বাঙ্গালার কীর্তন ও কীর্তনিয়া' গ্রন্থটি প্রথম প্রকাশিত হয় ২৬শে ফাল্গুন ১৩৭৭ বঙ্গাব্দে, শিশু সাহিত্য সংসদ প্রা. লি. থেকে। গ্রন্থের ভূমিকা লেখেন হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়। গ্রন্থটি উৎসর্গ করেন – 'আনন্দবাজার' ও 'দেশ' পত্রিকার 'সম্পাদক অশোককুমার সরকারকে। প্রকাশের কুড়ি বছর পর আগস্ট, ১৯৯০ খ্রি.গ্রন্থটি পুনর্মুদ্রিত হয় 'পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ' থেকে। গ্রন্থটি পাঁচটি খণ্ডে ভাগ করা আছে। প্রথম খণ্ডে শ্রীচৈতন্য পূর্ববর্তী বেশ কিছু পদকর্তাদের নিয়ে লেখক আলোচনা করেছেন। দ্বিতীয় খণ্ডে কীর্তন গানের বিভিন্ন পর্যায় সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। এই গ্রন্থের তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ডে আছে নবদ্বীপ ও পুরীধামের কীর্তনিয়াদের পরিচয় এবং পঞ্চম খণ্ডে বাংলার কীর্তন ও কীর্তনিয়াদের, যেমন- শ্রীনিবাস আচার্য, কৃষ্ণদয়াল নন্দী, রাধারমণ দাস প্রমুখদের নিয়ে আলোচনা করেছেন তিনি।

হরেকৃষ্ণ মুখোপাধায়ের প্রথম কবিতার বই 'কমণ্ডলু' প্রকাশিত হয় ২০ জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৫ বঙ্গাব্দে (১৯১৮ খ্রি.)। এবং দ্বিতীয় গ্রন্থ 'যাবার দিনে' প্রকাশিত হয় ৩০ শে আশ্বিন, ১৩৭৯ বঙ্গাব্দে (১৯৭২ খ্রি.)।'কমণ্ডলু' গ্রন্থটি 'বাণী প্রেস', ১২/১ নং চোরাবাগান লেন, সিমলা, কলিকাতা থেকে প্রকাশিত হয়। গ্রন্থটি উৎসর্গ করা হয় এইভাবে – 'সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত নিত্যগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় সোদর প্রতিমেষু মঙ্গলডিহি, বীরভূম'।গ্রন্থের নিবেদন অংশে তিনি জানিয়েছেন—

> 'কমণ্ডলু'কতকগুলি ক্ষুদ্র কবিতার সমষ্টি। পল্লীর সাধারণ প্রচলিত মহাজনবাক্য ও প্রবচনমালা হইতে কয়েকটি কবিতার উপাদান সংগৃহীত হইয়াছে। কবিতা প্রণয়নে প্রধানতঃ স্বর্গীয়কান্ত-কবি রজনীকান্তের অমৃতের অনুসরণ করিয়াছি। অবশ্য একথা সর্ববথা স্বীকার্য্য যে 'অমৃতের' সে অনুপমের মাধুর্য্য ধারা ধরিয়া রাখিবার স্থান আমার এ ক্ষুদ্র ' কমণ্ডলু'তে নাই"। [১৬]

হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় দ্বিতীয় কবিতা ও গানের গ্রন্থ 'যাবার দিনে'। 'জিজ্ঞাসা' থেকে ১৩৭৯ বঙ্গাব্দে গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। গ্রন্থের ভূমিকা লেখেন হরেকৃষ্ণ মুখোপাধায় স্বয়ং। গ্রন্থটি উৎসর্গ করা হয় নব্যবঙ্গের রামপ্রসাদ পরমানন্দ সরস্বতীকে। এই গ্রন্থের ভূমিকা অংশে লেখক জানিয়েছেন –

"আমি বিবাহের অজস্র প্রীতি-উপহার লিখিয়াছি, ও বিশেষ অনুরোধে পড়িয়া দুই-চারটি গানও লিখিয়াছি। প্রীতি-উপহার, অন্য দুই-একটি কবিতা ও কয়েকটি গান 'যাবার দিনে' ছাপানো হইলো"।[১৭]

এই গ্রন্থে কবিতার পাশাপাশি গানও রচনা করেছেন হরেকৃষ্ণ মুখোপাধায়। যেমন শ্রীকৃষ্ণকে নিয়ে রচনা করেছেন; তেমনি হোলিখেলা, শ্যামাসঙ্গীত নিয়েও গান রচনা করেছেন।

আমরা আগেই স্বীকার করেছি প্রাগাধুনিক বাংলা সাহিত্য-চর্চায়, বিশেষ করে বৈষ্ণবধর্ম, তত্ত্ব-দর্শন ও রস-সাহিত্য চর্চার ক্ষেত্রে হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় একজন উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব। একাধিক গ্রন্থের প্রণেতা, গ্রন্থসম্পাদক, সাহিত্য-সমালোচক,হরেকৃষ্ণ মুখোপাধায়কে 'সাহিত্যরত্ন' উপাধিতে ভূষিত করা হয়।বীরভূমের গৌরব হলেন হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়। তিনি একক নীরব প্রচেষ্টায় যে কাজ করেছেন তা প্রশংসারযোগ্য; একথা অবশ্য স্বীকার্য যে, প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ছাড়াই বিভিন্ন বিষয়ের জ্ঞান অর্জনের এজাতীয় নজির সচরাচর পাওয়া যায়না। এর উদাহরণ খুবই বিরল। হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সেই জাতীয় বিরল ব্যক্তিত্বদের একজন।

তথ্যসূত্র :

১. বিশ্বনাথ রায় সম্পাদিত, 'জলগণ্ডূষ অথবা আমার জীবন কথা, আশাদীপ, জুন ২০১৮, পৃষ্ঠা – ৪৯ ।

২. পূর্বোল্লিখত সূত্র, পৃষ্ঠা – ৪৯ ।

৩. পূর্বোল্লিখত সূত্র, পৃষ্ঠা – ৪৯ ।

৪. 'প্রগতি' পত্রিকা, বৈশাখ ১৩৭৭ (মনসাতলা, খিদিরপুর, কলিকাতা, ১১ ই জানুয়ারি, ১৯৭০), পৃষ্ঠা – ৫৩১ ।

৫. বিশ্বনাথ রায় (সম্পাদিত), 'গৌড়বঙ্গ সংস্কৃতি', হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, পুস্তকবিপণি, দ্বিতীয় মুদ্রণ- ২০১৫, পৃষ্ঠ – ১৩ ।

৬. পূর্বোল্লিখত সূত্র, পৃষ্ঠা – ২১০ ।

৭. 'প্রগতি' পত্রিকা, বৈশাখ ১৩৭৭ (মনসাতলা, খিদিরপুর, কলিকাতা, ১১ ই জানুয়ারী, ১৯৭০), পৃষ্ঠা – ৫৪১ ৮) বিশ্বনাথ রায় সম্পাদিত, 'জলগণ্ডূষ অথবা আমার জীবন কথা, আশাদীপ, জুন ২০১৮, পৃষ্ঠা – ৫ ।

৯. 'প্রগতি' পত্রিকা, বৈশাখ ১৩৭৭ (মনসাতলা, খিদিরপুর, কলিকাতা, ১১ ই জানুয়ারি, ১৯৭০), পৃষ্ঠা – ৫২৭- ৫২৮ ।

১০. ‘বীরভূম বিবরণ’র তিনটি খণ্ড (১ম খণ্ড ১৩২৩ বঙ্গাব্দ, ২য় খণ্ড ১৩২৬ বঙ্গাব্দ, ৩য় খণ্ড ১৩৩৪ বঙ্গাব্দ)।

১১. দ্র:হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, ‘গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাধনা’,পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, দ্বিতীয় মুদ্রণ , জুন ২০১১, পৃষ্ঠা- ix।

১২. পূর্বোল্লিখত সূত্র, পৃষ্ঠা- ২১০।

১৩. দ্র:হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, ‘কবি জয়দেব ও শ্রীগীতগোবিন্দ’ , দে’জ পাবলিশিং, পঞ্চম সংস্করণ, বৈশাখ ১৪১৭, প্রথম সংস্করণের নিবেদন অংশ, পৃষ্ঠা – ৭।

১৪. দ্র:হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, ‘কবি জয়দেব ও শ্রীগীতগোবিন্দ’ , দে’জ পাবলিশিং, পঞ্চম সংস্করণ, বৈশাখ ১৪১৭, প্রথম সংস্করণের নিবেদন অংশ, পৃষ্ঠা ৭।

১৫. হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, ‘বাঙ্গালার কীর্তন ও কীর্তনিয়া’,পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, দ্বিতীয় মুদ্রণ , জুন ২০১১, প্রথম প্রকাশকের নিবেদন অংশ, পৃষ্ঠা – তেরোদ্রষ্টব্য।

১৬. দ্রষ্টব্য: হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, ‘কমণ্ডলু’, বাণীপ্রেস, ১২/১ নং চোরাবাগান লেন, সিমলা, কলিকাতা, ১৩২৫, নিবেদন অংশ, পৃষ্ঠা- ৫ ।

১৭. দ্রষ্টব্য: হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, ‘যাবার দিন’, জিজ্ঞাসা, কলিকাতা, (১৩৭৯) ভূমিকা অংশ, পৃষ্ঠা- ৬।

গ্রন্থপঞ্জী

আকর গ্রন্থ :

১. হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, কবি জয়দেব ও শ্রীগীতগোবিন্দ,দে’জ পাবলিশিং, পঞ্চম সংস্করণ, ১৪১৭।

২. হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, কমণ্ডলু, বাণী প্রেস, ১৩২৫।

৩. হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, (বিশ্বনাথ রায় সম্পাদিত), গৌড়বঙ্গ সংস্কৃতি,পুস্তক বিপণি, দ্বিতীয়, মুদ্রণ, ১৪০৫।

৪. হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়,গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাধনা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, দ্বিতীয় মুদ্রণ,২০১১।

৫. হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ও সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়,চণ্ডীদাস পদাবলী, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ,১৩৪১।

৬. হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পাদিত),জ্ঞানদাস পদাবলী, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ১৩৪১।

৭. হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়,পদাবলী পরিচয়, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ১৩৫৯।

৮. হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, বাঙ্গালার কীর্তন ও কীর্তনীয়া, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, দ্বিতীয়, মুদ্রণ, ২০১১।

৯. হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, বৈষ্ণব পদাবলী, সাহিত্য সংসদ, পঞ্চম মুদ্রণ,১৪২২।

১০. হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়,বীরভূম বিবরণ, প্রথম খণ্ড, ১৩২৩, দ্বিতীয় খণ্ড, ১৩২৬, তৃতীয় খণ্ড, ১৩৩৪।

১১. হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়,যাবার দিনে, জিজ্ঞাসা, ১৩৭৯।

সহায়ক গ্রন্থ :

১. ক্ষুদিরাম দাস, বৈষ্ণব রস প্রকাশ,দে'জ পাবলিশিং, ১৪১৬।

২. সত্যবতী গিরি, বাংলা সাহিত্যে কৃষ্ণকথার ক্রমবিকাশ, দে'জ পাবলিশিং, ১৪১৩।

৩. ত্রিপুরাশঙ্কর সেন শাস্ত্রী, বৈষ্ণব সাহিত্য, এস ব্যানার্জী এণ্ড কোং, ১৩৬৮।

‘সাজাহান’ : দু-একটি কথা

হেনা বিশ্বাস
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
নেতাজী শতবার্ষিকী মহাবিদ্যালয়, অশোকনগর

সারসংক্ষেপ : অভিনয়ের অভিজ্ঞতা ব্যতিরেকেও যাঁরা নাট্যজগতে বিশেষভাবে নাট্যপ্রতিভার স্বাক্ষর রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে দ্বিজেন্দ্রলাল অন্যতম। জাতীয় ভাবাবেগকে লেখনীর মাধ্যমে তুলে ধরতে তিনি অনেক নাটকের ক্ষেত্রেই ইতিহাসের চেনা পথকে অবলম্বন করেছেন। ইতিহাস লিখতে বসেননি তিনি। তাই ইতিহাসের সত্যকে কল্পনার রঙে রাঙিয়ে প্রয়োজন মতো কাহিনি সৃজন করেছেন। জাতীয় ভাবাবেগের আদর্শে অনেক ঐতিহাসিক পটভূমিকার নাটক তিনি লিখেছেন। কালের বিচারে অপ্রতিদ্বন্দ্বী জনপ্রিয় ‘সাজাহান’ নাটকে মুঘল সম্রাট সাজাহানের পরিচিত ইতিহাসকেই অঙ্কন করতে চাননি তিনি। সম্রাট সাজাহানের পিতৃসত্ত্বা বনাম তার সম্রাটসত্ত্বার যে দ্বন্দ্ব তা চমৎকার ভাবে নাটকে ফুটিয়ে তুলতে সক্ষম হয়েছেন নাট্যকার। পুরুষসিংহ সাজাহানের অবরুদ্ধ দশার নিষ্ফল গর্জন আর প্রতিবেশ রাজা লিয়রের ট্রাজেডিকে স্মরণ করায়। স্নেহে অন্ধত্ব, সন্তানের নিমর্ম পাশবিকতায় পিতার অসহায়তা, বিশ্বাস-অবিশ্বাসের দ্বন্দ্ব ইত্যাদি বিষয়গুলি নাটকের ঘটনা সংস্থান এবং পরিণতিকে যেন অনিবার্য করে তুলেছে। ভ্রাতৃদ্বন্দ্ব মোঘল ইতিহাসের এক পরিচিত ঘটনাবৃত্ত। সেই পরিচিত বৃত্তে সম্রাট-পিতার অন্তর্ভুক্তি ঘটিয়ে তার পিতৃসত্ত্বা ও সম্রাটসত্ত্বার টানাপোড়েনকে সার্থকভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন নাট্যকার। নাটকের শেষে দুর্বৃত্ত সন্তানকে ক্ষমা করার মধ্যে দিয়ে চিরন্তন ক্ষমাধর্মকে সবকিছুর ঊর্দ্ধে স্থান দেওয়া হয়েছে। নাটকে বেশ কিছু গান রয়েছে। এই আবেগময় গানের সংযোজনে যে কবিময়তা ধরা পড়েছে তা অবশ্য কোথাও নাট্যদ্বন্দ্ব ও নাট্যঘটনার প্রতিকূলতা বা নাট্যরসের হানি ঘটায়নি। আলোচ্য প্রবন্ধে এই সামগ্রিক বিষয়টিকে সংক্ষিপ্ত পরিসরে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে । এই আলোচনার সূত্রেই পরাধীন ভারতবাসীর মর্মবেদনা এবং জাতীয় আন্দোলনের অনিবার্য প্রভাবকে স্বীকার করা হয়েছে।

শব্দবন্ধন : জাতীয় ভাবাবেগ, দেশাত্মবোধ, পিতৃসত্ত্বা, সম্রাটসত্ত্বা, অসহায়ত্বতা, বিশ্বাস-অবিশ্বাসের দ্বন্দ্ব, ট্রাজিক পরিণতি, ক্ষমাধর্ম, অন্তর্বেদনা, হৃদয়বৃত্তি, পাশবিকতা, স্নেহান্ধ, কপটতা, কূটনীতি, বিবেকদংশন, টানাপোড়েন, কবিময়তা, পরাধীনতা, বিশ্বাসঘাতকতা ইত্যাদি।

প্রতিপাদ্য বিষয় :

বাংলা সাহিত্যের একটি প্রাচীন প্রকরণ হল নাট্যসাহিত্য। আর বিংশ শতকের প্রাক্লগ্ন থেকেই বাংলা নাট্যধারার গতি পরিবর্তন সূচিত হয় পৌরাণিক থেকে ঐতিহাসিক

পরিমন্ডলের দিকে। কারণ, পরাধীন ভারতবাসীর মর্মবেদনা, জাতীয় উন্মাদনা এবং জাতীয় আন্দোলনের অনিবার্য প্রভাব এই ধারাকে পরিপুষ্টতা দান করেছে। ঐতিহাসিক বীর চরিত্রের স্বদেশসাধনা ও আত্মোৎসর্গে বাঙালীহৃদয় পরাধীনতার বন্ধনজ্বালা ঘুচিয়ে মুক্তির মন্ত্রে উৎসাহ-প্রেরণা লাভ করেছে। এই ধারার এক খ্যাতনামা নাট্যকার ডি. এল. রায় (১৮৬৩ – ১৯১৩)। ইংরেজী সাহিত্যের সুপন্ডিত এই বিলেতফেরত নাট্যকার পাশ্চাত্ত্য নাট্যসাহিত্য ও অভিনয় পদ্ধতির সঙ্গে সুপরিচিত ছিলেন বলে তাঁর অধিকাংশ নাটকে পাশ্চাত্ত্য ধারার প্রভাব দুর্মর। কেবল নাট্যকার নন, একাধারে কবি, গায়ক, সুরকার, সংগীতকার তিনি। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের স্মৃতির উদ্দেশে প্রদত্ত 'সাজাহান' নাটকে তাঁর ঐতিহাসিক নাট্যচিন্তনের পাশাপাশি কাব্যবোধের অপূর্ব সমন্বয় ঘটেছে।

নাটকটির প্রথমাঙ্কে সাতটি, দ্বিতীয়াঙ্কে পাঁচটি, তৃতীয়াঙ্কে ছয়টি, চতুর্থাঙ্কে সাতটি ও পঞ্চমাঙ্কে ছয়টি অর্থাৎ পাঁচটি অংকে মোট একত্রিশটি দৃশ্য বর্তমান। নাটকের মূল বিষয় ঔরঙ্গজেব নামক শঠ-প্রবঞ্চক পুত্রের সাম্রাজ্যলিপ্সার নিষ্ঠুরতায় বৃদ্ধ অথর্ব পিতার করুণ পরিণতি। পুরুষসিংহ সাজাহান কারারুদ্ধ থেকেও পুত্রের অন্যায়ের বিরুদ্ধে গর্জন করেছে। তার প্রবল পরাক্রম প্রকৃতির মধ্যে কেবল হাহাকার করে ফিরেছে। উন্মাদগ্রস্ত হয়ে প্রবল আক্রোশে অন্তর্বেদনাকে চারিদিকে প্রবাহিত করে দিয়েছে। বাইরে ধর্মনাম আর ভিতরে ফণীর বিষভান্ড নিয়ে ঔরঙ্গজেব সকলের জীবনকে বিষময় করে তুলেছে। প্রয়োজনে ছলনা, প্রলোভন দিয়ে প্রতিপক্ষকে বশ করে সে কার্যসিদ্ধি করেছে নতুবা প্রতিস্পর্ধী শক্তিকে হত্যা করে নিজের স্বার্থ চরিতার্থ করেছে। তার কারণে বৃদ্ধ পিতা রাজা লিয়রের মতো উন্মাদগ্রস্ত হয়ে ট্র্যাজিক চরিত্রে পরিণত হয়েছে। দারা, সুজা, মোরাদ, সোলেমান, মহম্মদ, জহরৎ সকলের করুণ পরিণতির জন্য দায়ী সে। শেষে বিবেকদংশনে পিতার কাছে ক্ষমা চাইতে এলে দিদি জাহানারা ক্ষমা করতে বারণ করে। তার মনে হয় এটা পিশাচের কোনো নতুন কৌশল, স্নেহান্ধ পিতা তাকে ক্ষমা না করে পারেনি। কারণ সম্রাট বনাম পিতার দ্বন্দ্বে সে জেরবার। এই দ্বন্দ্বই আলোচ্য নাটকের মূল বিষয়। মুমূর্ষু পিতার অনুরোধে জাহানারও তাকে ক্ষমা করতে বাধ্য হয়। পিতৃ-হীনা জহরৎ ঘাতককে অভিশাপ দিয়ে বলে –'তুমি আমার পিতাকে হত্যা করে যে সাম্রাজ্য অধিকার করেছো, আমি অভিশাপ দেই, যেন তুমি দীর্ঘকাল বাঁচো, আর সেই সাম্রাজ্য ভোগ কর; যেন সেই সাম্রাজ্য তোমার কালস্বরূপ হয়; যেন সে পাপ থেকে কেবল গাঢ়তর পাপে তোমায় নিক্ষেপ করে, যাতে মর্ব্বার সময় তোমার ঐ উত্তপ্তললাটে ঈশ্বরের করুণার এককণাও না পাও।' শ্রদ্ধেয় শ্রী অজিতকুমার ঘোষ তাঁর 'বাংলা নাটকের ইতিহাস' গ্রন্থে যথার্থই বলেছেন –'ঔরঙ্গজীবের সূক্ষ্ম শাণিত বুদ্ধি বারবার জয়লাভ করিয়াছে বটে, কিন্তু তাঁহার সর্বশেষ জয় হইয়াছে হৃদয়বৃত্তির করুণ আবেদনে, এই বিষয়টি লক্ষ্য করিবার যোগ্য'। সিংহাসনকেন্দ্রিক ভ্রাতৃদ্বন্দ্বসমন্বিত মোঘল ইতিহাসের কাহিনীটিকে ইতিহাসরস অক্ষুণ্ণ রেখে নাট্যকার এমনভাবে পরিবেশন করেছেন যা পরাধীন ভারতজাতির দেশহিতব্রতকে সুদৃঢ় করে। নাট্যরসের রসায়নে

নাট্যকার সার্থকভাবে তাঁর কবিত্বপ্রতিভার সংমিশ্রণ ঘটিয়েছেন নাটকে।

নাটকের প্রথম থেকেই সাজাহানের মধ্যে সম্রাট বনাম পিতৃসত্ত্বার দ্বন্দ্ব লক্ষ্য করা যায়। সিংহাসনকেন্দ্রিক ভ্রাতৃদ্বন্দ্বে সুজা বঙ্গদেশে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে, মোরাদ গুর্জ্জরে সম্রাট নাম নিয়ে বসেছে আর দাক্ষিণাত্যে থেকে ঔরঙ্গজেব তার সঙ্গী হয়েছে। জ্যোষ্ঠপুত্র দারা সে বিদ্রোহ দমন করতে চায়। কিন্তু সন্তান-স্নেহান্ধ পিতা কিংকর্তব্যবিমূঢ়। বিদ্রোহদমন অপেক্ষা তার অধিক চিন্তা ভ্রাতৃদ্বন্দ্ব নিয়ে। স্নেহদুর্বল চিত্তে তার ঘোষণা –'আমার হৃদয় শুধু এক শাসন জানে। সে শুধু স্নেহের শাসন।' দ্বন্দ্বমথিত সম্রাট দৈবফলের উপর নির্ভর করে ঈশ্বরের কাছে বিচার প্রার্থনা করেন –'ঈশ্বর! পিতাদের এই বুকভরা স্নেহ দিয়েছিলে কেন ? কেন তাদের হৃদয়কে লৌহ দিয়ে গড়নি।' নর্মদাযুদ্ধে ছলনা আর কপটতার আশ্রয়ে মোরাদ-ঔরঙ্গজেব যুগলবন্দি জয়লাভ করে। অন্যদিকে কাশীতে সুজার বিরুদ্ধে পাঠান হয় দারাপুত্র সোলেমান, বিকানীরের মহারাজ জয়সিংহ আর সেনাধ্যক্ষ দিলীর খাঁকে। সুজা বিনাযুদ্ধে বঙ্গদেশে প্রত্যাবর্তন করতে রাজি তবে দারার প্রভুত্বকে সে মেনে নিতে পারবেনা। সোলেমানের অতর্কিত আক্রমণে সুজা দিশেহারা হয়ে পলায়ন করে। বিপক্ষ শিবিরের শায়েস্তা খাঁ-এর সঙ্গে গোপন আঁতাত করে ঔরঙ্গজেব। পুরস্কারের প্রলোভন দিয়ে সে কিনে নেয় জয়সিংহ এবং দিলীর খাঁ-কেও। এদের কাছে নতজানু সোলেমানের সাহায্য প্রার্থনা ব্যর্থ হয়। শায়েস্তা খাঁ-এর বিশ্বাসঘাতকতায় আগ্রার কাছে তুমুল যুদ্ধে পরাস্ত দারা দোয়াবের দিকে পলায়ন করে। ঔরঙ্গজেবের যোগ্য সন্তান মহম্মদের হাতে বন্দী সাজাহান আর্তনাদে ঘোষণা করে –'পিতা সব, আর নিজে না খেয়ে পুত্রদের খাইও না; তাদের হাসিটি দেখার জন্য স্নেহের হাসিটি হেসো না। তারা সব কৃতঘ্নতার অঙ্কুর। তারা সব শিশু-শয়তান'।

নাটকের দ্বিতীয় অংক থেকে ঔরঙ্গজেবের কূটনৈতিক প্রয়োগে অন্য ভাইদের বন্দী করার ষড়যন্ত্র শুরু হল । এই উদ্দেশে নর্তকী ও সুরাসক্ত মোরাদের জন্য বিদেশী সুরা ও সুন্দরী নর্তকী উপঢৌকন দিয়ে শেষে বন্দী করা হয়। এই অংশে অবশ্য তাকে কিছুটা বিবেকদংশিত হতে দেখি 'আমার হাত ধরে কোথায় নিয়ে যাচ্ছ খোদা! আমি এ সিংহাসন চাই নি। তুমি আমার হাত ধরে এ সিংহাসনে বসালে! কেন – তুমিই জান।' ঔরঙ্গজেবের সিংহাসনে বসার আনন্দে আগ্রায় উৎসব শুরু হয়। কন্যার মুখে এখবর শুনে সাজাহান উন্মাদ হয়ে যায়। জাহানারা শোনায় –'বাবা সংসারে দয়ামায়া নেই। সব ভয়ে চলছে। সাজাহানের সম্পৎকালে যারাই "জয় সম্রাট", সাজাহানের জয়" বলে চিৎকারে আকাশ দীর্ণ করে দিত তারাই যদি আজ আপনার এই স্থবির অথর্ব্ব মূর্ত্তি দেখে ত ঐ মুখে ঘৃণায় থুৎকার দেবে – আর যদি কৃপাভরে থুৎকার না দেয়, ত ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নিয়ে চলে যাবে?' কেবল সম্রাট নয় দারাও নরকদর্শন করে। স্ত্রী নাদিরার কাছে নিজের অসহায়তার কথা বলে। দুইবার সে ঔরঙ্গজেবের কাছে পরাজিত ও

তাড়িত। ঔরঙ্গজেবের শেষ লক্ষ্য এখন সুজা। সুজাপত্নী পিয়ারার কাছে শস্য-শ্যামলা, পুষ্পভূষিতা অমরাবতী বঙ্গভূমির কাছে সাম্রাজ্য তুচ্ছ । প্রজামন জয় করতে ঔরঙ্গজেব কপট ছলনার অভিনয়ে বলে –'আপনারা নিজেদের দিকে চেয়ে বলুন যে পীড়ন চান, না শাসন চান ? বলুন। আমি আপনাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে শাসনদন্ড গ্রহণ করতে পার্ব্বনা, আর আপনাদের ইচ্ছাক্রমেও এখানে দাঁড়িয়ে দারার উচ্ছৃঙ্খল অত্যাচার দেখতে পার্ব্ব না'।

নাটকের তৃতীয় অংকে ঔরঙ্গজেবকে সুজার বিরুদ্ধে সৈন্যসজ্জার প্রস্তুতি নিতে দেখা যায়। যশোবন্তের সমর কৌশলে খিজুয়ার যুদ্ধে সে জয়লাভ করে। আমেদাবাদের শিবিরে ঔরঙ্গজেবের শ্বশুর গুজরাটের সুবাদার সাহা নাবাজের সঙ্গে দারা সংঘবদ্ধ হয় কপটাচারীকে শাস্তি দিতে। দারা পুত্র সোলেমান এখন শ্রীনগররাজ পৃথীচন্দ্রের আশ্রিত। কন্যা জহরৎ ও পুত্র সিপারকে ভরণ-পোষণের কোনো সামর্থ আজ দারার নেই। স্ত্রী নাদিরাও মৃত্যুপথযাত্রী। সুতরাং মোঘল আকাশে ঔরঙ্গজেবের জয়তারা আজ উজ্জ্বল। প্রেমের মূল্যে পুত্র মহম্মদ পিতার অবাধ্য হয়ে বিবেক-দংশনে পিতাকে শোনায় – 'আপনি বিবেক বর্জ্জন করে সাম্রাজ্য লাভ করেছেন, সেই সাম্রাজ্য কি পরকালে নিয়ে যেতে পার্ব্বেন'? শেষ যুদ্ধেও দারা পরাস্ত হয়। মৃত্যু হয় সাহা নাবাজের। সুজার মেয়ের জন্য পাপের পক্ষ ছেড়েছে মহম্মদ। ঔরঙ্গজেবের কূটচালে সূজা তাকে শত্রু ভাবে। নাদিরার মৃত্যুর পর পুরাতন বিশ্বস্ত বন্ধু জিহন খাঁর বিশ্বাসঘাতকতায় দারা বন্দী হয় ও মৃত্যুদন্ড প্রাপ্ত হয়। অবশ্য জিহনকেও প্রজাদের কাছ থেকে মৃত্যুদন্ড পেতে হয়েছিল। জহরৎকে অন্তঃপুরে কয়েদ করে শয়তান। অবাধ্য পুত্রকেও গোয়ালিয়র দুর্গে বন্দী করা হয়। ঔরঙ্গজেবের নির্দেশে দিলীর শ্রীনগরে বন্দী করে সোলেমানকে। সুলতান সুজা গোপনে আরাকানরাজের আশ্রয়ে ওঠে ও বিপর্যস্ত হয়ে আত্মহত্যার কথা ভাবে। ঔরঙ্গজেবের বিবেক-দংশন, প্রায়শ্চিত্তের প্রস্তুতি, সাজাহান-জাহানারার ক্ষমা পাঠক-দর্শক চিত্তে বিস্ময়ের জন্ম দেয়। কারণ এমন দুর্বৃত্তের এত সহজে ক্ষমা পাওয়াটা মেনে নিতে কষ্ট হয়। আলোচ্য নাটকটি পড়ে মনে হয় সেটি যেন বিশ্বাসভঙ্গের এক নাটক। ঔরঙ্গজেব, জয়সিংহ, দিলীর খাঁ, শায়েস্তা খাঁ, যশোবন্ত সিংহ, মীরজুমলা শ্রীনগররাজ সকলেই এক একজন বিশ্বাসঘাতক চরিত্র। নাটকটিতে একাধিক চরিত্রের মৃত্যু ঘটেছে :

১) নাদিরা :- রোগে ভুগে
২) দারা :- ঔরঙ্গজেবের বিচারে প্রাণদন্ডে
৩) মোরাদ :- ঔরঙ্গেবের বিচারে প্রাণদন্ডে
৪) জিহন খাঁ :- প্রজাদের হাতে বিশ্বাসঘাতকতার নির্মম বিচারে
৫) সাহা নাবাজ :- দারার পক্ষে ঔরঙ্গজেবের বিপক্ষে যুদ্ধে।

একাদিক্রমে এতগুলি মৃত্যুদৃশ্য দেখতে দেখতে দর্শকচিত্ত বিকল হয়ে পড়ে। তবে ঐতিহাসিক নাটক যেহেতু বীরত্বব্যঞ্জক যুদ্ধকাহিনী, দর্শক তাই তা থেকে মৃত্যুবোধ নয় জীবনাদর্শের শিক্ষাই গ্রহণ করে। 'সাজাহান' নাটকে মোট আটটি গান আছে : ১ম

অংকে ১টি, ২য় অংকে ২টি, ৩য় অংকে ৩টি ও ৪র্থ অংকে ২টি গান সংযোজিত। পিয়ারার কণ্ঠের ৫টি গানের ২টি বৈষ্ণব পদাবলী থেকে গৃহীত। ৪র্থ অংকের বালকদের কণ্ঠের গানটি একটি দেশাত্মাবোধক জনপ্রিয় গান –'ধনধান্য পুষ্পভরা ....' ২য় অংকের নর্তকীর গানে আছে সুধারসের মত্ততা –'আজি এসেছি-আজি এসেছি, এসেছি বধুঁ হে' ৩য় অংকে কাশ্মীরে সোলেমানের উদ্দেশে গীত রমণীদের গানে দেহ তরণীতে ভেসে যাওয়ার ফেনিলতা –'যাত্রী সব নূতন প্রেমিক, নূতন প্রেমে ভোর'। ১ম অংকে গীত পিয়ারার কণ্ঠের গানে ক্ষুদ্র জীবনের ক্ষুদ্র হৃদয়ের প্রেমের অতৃপ্তি ব্যক্ত –'এ জীবনে পূরিল না সাধ ভালোবাসি'। এই বিরহ প্রগাঢ় হয়েছে তার কণ্ঠের ৩য় অংকের গানে –'আমি সারা সকালটি বসে বসে এই সাধের মালাটি গেঁথেছি'। এই অংকে তার অন্য গানটিতে আছে নিগূঢ় মধুর বন্ধনে হৃদয় জড়ানোর কথা। গান বা বর্ণনার ঢঙে কবিসুলভ আবেগ-উচ্ছাস থাকলেও নাট্যদ্বন্দ্ব নাট্যঘটনার হানি কোথাও ঘটতে দেননি নাট্যকার। নাটকটি তাই সচেতন নাট্যকারের কবিত্বশক্তি-নাট্যশক্তির অপূর্ব মেলবন্ধন।

গ্রন্থঋণ :

১. 'বাংলা নাটকের ইতিহাস' – অজিত কুমার ঘোষ, সংশোধিত ও পরিবর্ধিত অষ্টম সংস্করণ, জুন, ১৯৯৯, জেনারেল প্রিন্টার্স য়্যান্ড পাবলিশার্স প্রা. লি. কলিকাতা-১৩

২. 'বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস' – আশুতোষ ভট্টাচার্য (২য় খন্ড), এ মুখার্জী অ্যান্ড কোং প্রা. লি, কলিকাতা-৭৩, চতুর্থ সংস্করণঃ মে ২০০৩

৩. 'সাজাহান'- প্রকাশকঃ মুখোশ, বিরাটী, কলকাতা-৫১, দ্বিতীয় প্রকাশ ঃ পৌষ, ১৪০৪

বাংলাদেশের ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতা প্রতিরোধে গোবিন্দচন্দ্র দেবের অসাম্প্রদায়িক, মানবতাবাদী ও সমন্বয়ী দর্শন: একটি শান্তির বার্তা

আসাদুজ্জামান
প্রভাষক, দর্শন বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম

সারসংক্ষেপ : হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিষ্টান-মুসলিম সকল ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে অসাম্প্রদায়িক চেতনায় অনুপ্রাণিত হয়েই বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছিল। অথচ যে সাম্প্রদায়িকতাকে মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে কবর দেয়া হয়েছিল, সেই সাম্প্রদায়িকতাই যেন বাংলাদেশে নতুন করে মাথাচাড়া দেয়ার চেষ্টা করছে। আজকের পৃথিবীতে উদার দৃষ্টিভঙ্গি ধারণ করে যেখানে সেকুলারিজম বা ধর্মনিরপেক্ষতার চর্চা হচ্ছে পুরো উদ্যমে সেখানে বাংলাদেশ আজও ধর্মান্ধতাকে ধারণ করে সাম্প্রদায়িকতাকে উস্কে দিচ্ছে মাঝে মধ্যেই। ধর্মনির্ভর ইহলৌকিক-পরলৌকিক উন্মত্ততার দ্বন্দ্ব নিরসনে বৈচিত্র্য ও বহুত্বের মধ্যে ঐক্যের সন্ধান করেছেন উপমহাদেশের বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী দার্শনিক গোবিন্দচন্দ্র দেব। বর্তমান সময়ে বাংলাদেশে মাঝে মধ্যেই উঁকি দেয়া ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে গোবিন্দচন্দ্র দেবের সমন্বয়বাদী শান্তির দর্শনই হতে পারে সকল সম্প্রদায়ের মাঝে শান্তি প্রতিষ্ঠায় যথার্থ এক বার্তা। এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য হচ্ছে বাংলাদেশের সমকালীন ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতা প্রতিরোধে গোবিন্দচন্দ্র দেবের সমন্বয়ী দর্শন যে একটি শান্তির বার্তা হতে পারে তা তুলে ধরা।

শব্দ সূচক: সমন্বয়ী দর্শন, মধ্যপথ, ধর্মে প্রয়োগ, সাম্প্রতিক প্রসঙ্গ।

মূল আলোচনা :

সাধারণভাবে মানুষকে মানুষ হিসেবে বিবেচনা না করে ধর্ম, বর্ণ, জাতি, দল, গোত্র ইত্যাদিকে প্রাধান্য দিয়ে পার্থক্য করে দেখাই সাম্প্রদায়িকতা। তবে বর্তমান সময়ে সাম্প্রদায়িকতা শব্দটি উচ্চারিত হলেই আমাদের চোখের সামনে ভাসে উগ্র ধর্মান্ধদের উগ্র কার্যকলাপ। ধর্মের আসল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য থেকে বিচ্যুত হয়ে একটা নির্দিষ্ট সম্প্রদায় যখন কেবল নিজেদের ধর্মকেই শ্রেষ্ঠ মনে করে অন্য ধর্মের প্রতি বিরূপ ধারণা পোষণ করে ও হিংসাত্মক হয়ে উঠে তখনই ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতার আবির্ভাব ঘটে। অথচ পৃথিবীর সকল ধর্মেরই মূল কথা শান্তি, সম্প্রীতি, ভালবাসা, সমতা, মৈত্রী, শৃঙ্খলা। এই শিক্ষা থেকে সরে এসে এক ধর্মীয় সম্প্রদায়ের প্রতি অন্য সম্প্রদায়ের বিদ্বেষ, হিংসা ও আক্রোশের কারণে ধর্মীয় সম্প্রীতি বিনষ্ট হচ্ছে।

বাংলাদেশের সংবিধানে 'ধর্মনিরপেক্ষতা' উল্লেখ থাকলেও ধর্মীয় সংখ্যালগুরা নির্বিঘ্নে ধর্মপালন বা জীবন যাপনে বারবার বাঁধা পাচ্ছে। বাংলাদেশে সাম্প্রতিক সময়ে হিন্দু এবং বৌদ্ধ মন্দিরে হামলার ঘটনা প্রায়ই ঘটেই যাচ্ছে। বিশেষ করে মাঝে মধ্যেই হিন্দু সম্প্রদায়ের ঘর এবং মন্দিরে হামলা, জমি দখল, ধর্ষণ, লুটপাটের মতো অঘটন ঘটছে। সমকালীন সাম্প্রদায়িক এ সংকট প্রতিরোধে জিসি দেবের সমন্বয়বাদী দর্শনই শান্তির একটা বার্তা হতে পারে।

অসাম্প্রদায়িক ও মানবতাবাদী দার্শনিক দেব সব ধর্মকে দেখেছেন উদার ও সর্বজনীন দৃষ্টিকোণ থেকে। তাঁর চিন্তা ধারার মূলে সক্রিয়ভাবে কাজ করেছে এক সমন্বয়ী ভাবধারা এক বিশ্বজনীন মানবপ্রেম, সাম্য ও মৈত্রীভাবনা। তাই তাঁর দর্শন সমন্বয়ী ভাববাদ বা সিনথেটিক আইডিয়ালিজম নামে সমধিক পরিচিত।[১] তিনি মনে করতেন, সকল ধর্মের মধ্যেই নিহিত আছে সার্বজনীন প্রেম ও মৈত্রীর বাণী। সকল ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে তিনি বলেন, সব ধর্মের সারকথা শান্তি। কিন্তু বাস্তবে স্বার্থপর ধর্মান্ধরা নিজের ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করতে গিয়ে মানুষে মানুষে বৈষম্য তৈরি করেছে। এর কারণ হিসেবে জিসি দেব দায়ী করেন, উগ্র অধ্যাত্মবাদী এবং উগ্র বস্তুবাদী মানসিকতাকে। তাই তাঁর দর্শনে এ দু'য়ের সমন্বয়ে তিনি মধ্যপন্থার মাধ্যমে শান্তি স্থাপনের কথা বলেন। মূলত এ প্রবন্ধে ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতা প্রতিরোধে জিসি দেবের সমন্বয়ী দর্শন যে একটি প্রকৃষ্ট শান্তির বার্তা হতে পারে সে বিষয়টি তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। সে লক্ষ্যে আলোচ্য প্রবন্ধে জিসি দেবের সমন্বয়ী দর্শন, ধর্মে এর প্রয়োগ, সকল ধর্মপ্রচারকদের সারকথা, বিশিষ্ট্য মনীষীদের চিন্তাধারা, সাম্প্রতিক প্রসঙ্গ প্রভৃতি বিষয়ের উপর আলোচনা করা হয়েছে।

মানুষের শাশ্বত মঙ্গল ও শান্তিময় জীবনের জন্য প্রয়োজন এমন এক জীবন-দর্শনের যা যথার্থ দর্শনের পরিপূর্ণ অবয়ব। এ প্রসঙ্গে দেব বলেন,

> "সারাজীবন দর্শনের সঙ্গে আন্তরিক যোগ স্থাপনের চেষ্টা করে এই সত্য উপলব্ধি করেছি যে সার্থক দর্শন মাত্রই জীবনদর্শন। দর্শন কথাটি তাই জীবনদর্শন কথারই প্রতিশব্দ।"[২]

তিনি মনে করতেন, দর্শন তাত্ত্বিক দিক দিয়ে সম্পূর্ণ সঠিক হলেও তা যদি ব্যবহারিক দিক দিয়ে শুভ না হয়, তাহলে তা মানবজীবনের জন্য কল্যাণ বয়ে আনতে পারে না। তাই তিনি তাঁর দার্শনিক চিন্তাধারায় তত্ত্ব ও প্রয়োগের সমন্বয় সাধন করেছেন। আমাদের এ উপমহাদেশে সমন্বয়ী দার্শনিক ধারার সার্থক প্রবর্তক তিনি।[৩]

পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস প্লেটো থেকে শুরু করে হেগেল এবং নব্য হেগেলিয় ভাববাদী দর্শনের বিশাল সাহিত্য ভান্ডার তিনি নিরলসভাবে একাগ্রচিত্তে অনুসন্ধিৎসু মন নিয়ে পাঠ করে উপলব্ধি করেছেন একদেশদর্শী ভাববাদ একপেশে। কেননা ভাববাদী দর্শনে মানুষের বাস্তবজীবন প্রায় উপেক্ষিত।[৪]

একইভাবে তিনি পাশ্চাত্যের বস্তুবাদী দর্শনের বিশাল সাহিত্য অধ্যয়ন করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, বিশাল এই জগৎ ভাণ্ডারে বহুর মধ্যে যে একত্ব বিদ্যমান তা এই দর্শনে উপেক্ষিত হয়েছে।[৫]

ড. দেব ভাববাদ ও অধ্যাত্মবাদকে একই পরমসত্তার দুটি দিক উল্লেখ করে তাদের সমন্বয়ের প্রয়োজনের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, জৈবিক চাহিদা যদি মানুষকে চালিত করে বস্তুবাদের দিকে, তা হলে আধ্যাত্মিক চাহিদা তাকে চালিত করে অধ্যাত্মবাদের দিকে। মানুষের সার্বিক সংহত নিরাপদ শান্তিপূর্ণ জীবনের জন্যই প্রয়োজন এ দুই সম্পূরক দৃষ্টিভঙ্গির সংযোগ ও সমন্বয়।

ধর্মান্ধরা কেবল উগ্র অধ্যাত্মবাদকে প্রাধান্য দেন আর ধর্মবিরোধীরা উগ্র বস্তুবাদকে প্রাধান্য দেন। দেব বলেন, "একদিকে আধুনিক উগ্র জড়বাদ আর অন্যদিকে অতিপুরনো অধ্যাত্মবাদ। প্রথমটি এক নিশ্বাসে অসংকোচে উড়িয়ে দেয় পরকাল আর ইহকালের সুখকেই মানুষের উন্নতির মাপকাঠি মনে করে। দ্বিতীয়টি তার ঠিক উল্টো। তার কাছে ইহকালের মূল্য অতি নগন্য আর পরকালই প্রধান। অথচ প্রয়োজনের নিক্তিতে এ দুটির ওজনই সমান। আর তাই যাঁরা ভাবুক, তাঁরা বেছে নেন মধ্যপথ ও এই মধ্যপথেই পান সত্যের সন্ধান। এই মধ্যপথই আমার জীবন-দর্শনের মধ্যমণি।"[৬]
এ মধ্যপথের সন্ধান করেছেন তিনি ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতা নির্মূল করার ক্ষেত্রে। তিনি মনে করেন, এই মধ্যপথেই সকল ধর্মের মানুষের সার্বিক কল্যাণ ও শান্তি নিহিত। ধর্মীয় ক্ষেত্রে এই সমন্বয়ী দার্শনিক মতবাদ গড়ে উঠেছে হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান ও ইসলামি ভাবধারা থেকে।[৭]

দেবের দৃষ্টিতে প্রধান প্রধান ধর্মগ্রন্থের প্রবক্তাদের সারকথা বুঝতে পারলে আমাদের জন্য সহজেই অনুমেয় হবে সকল ধর্মই মানবকল্যাণের জন্য এসেছে। দেব তাঁর 'আমার জীবন-দর্শন'-গ্রন্থে বলেন, মধ্যপথ কথাটা আসলে নতুন কিছু নয়। ইতিহাসের এক আদিমতম মুহূর্তে ভগবান তথাগত বুদ্ধ নির্বাণ লাভের জন্যে বছরের পর বছর কঠোর তপস্যা করে পেয়েছিলেন এই মধ্যপথের সন্ধান। সত্যলাভের জন্যে প্রয়োজন, কৃচ্ছ তপঃ আর সহজ ভোগ এই দু'য়ের মধ্যপথে পদচারণা। সে পথে চলেই তিনি পৌঁছেছিলেন নির্বাণের জ্যোতির্ময় অমৃতলোকে। অষ্টম শতকে বা তারও কিছু আগে দার্শনিক প্রবর আচার্য শংকর তাঁর গীতাভাষ্যের উপক্রমণিকায় বলেছেন, এই মধ্যপথ আবিষ্কারই গীতার মহান শিক্ষা। আচার্য শংকরের মতে একদিকে নিবৃত্তিমার্গীয় সংসার বিরতি স্পৃহা। অন্যদিকে প্রবৃত্তিমার্গীয় সংসার ভোগস্পৃহা প্রথমটি বেদের জ্ঞানকাণ্ড অর্থাৎ উপনিষদ ভাগের প্রতিপাদ্য, দ্বিতীয়টি কর্মকান্ডের বিষয়বস্তু। এ দুয়ের মাঝখানে যে সরু পথ তাই গীতার প্রধান আবিষ্কার। এই মধ্যপথের বাণী ঘোষিত হয়েছে ইসলামের ভিতর। দীন ও দুনিয়া, ধর্ম-আচরণ ও সংসারজীবন, এ দু'য়ের সামঞ্জস্য বিধান কোরআনের বিশেষ নির্দেশ। ইতিহাসের আদি যুগ থেকে মহাপুরুষরা

প্রায় এক বাক্যে যে পথের সন্ধান দিয়েছেন, আরবী ভাষায় যাকে বলা হয় সেরাতুল মুস্তাকীম-সত্যের প্রশস্ত ও উন্মুক্ত পথ, বেদ যার নাম দিয়েছে ঋত।[৮]

ধর্মের মূল বক্তব্য ধারণ না করে একে কেবল উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্তে ব্যবহার আবার বৈজ্ঞানিক ধ্যান ধারণাতেও ধর্ম একেবারে উপেক্ষিত হওয়া নিয়ে যে দ্বন্দ্ব তা উল্লেখ করে দেব তাঁর 'আমার জীবন-দর্শন' গ্রন্থে বলেন, সমস্ত ঐতিহাসিক ধর্মের মূল কথাই প্রেম। ধর্মের যাঁরা আদি প্রচারক তাঁদের হৃদয়ের এক গভীর অনুভূতি এই প্রেমের অফুরন্ত উৎস।পরর্বতীকালে র্ধম প্রচারকদরে দল নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য কেউ আচার-অনুষ্ঠানকে আবার কেউ অনুভূতিকে প্রাধান্য দেন অথচ প্রকৃত র্ধম এ দুটোকেই প্রাধান্য দিয়ে থাকে। ধর্মের এই অপব্যবহার এবং বিকৃত ব্যাখ্যার ফলেই আধুনিক বৈজ্ঞানিক সভ্যতার অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে স্বাধীন চিন্তার দাবীতে বুদ্ধিবাদ মাথা তুলেছিলে। কিন্তু সতেরো শতকে যে বুদ্ধিবাদের গোড়াপত্তন উনিশ শতকের মধ্যভাগ থেকেই তার প্রায়-নির্বাসনের সূচনা। হৃদয়ের বাণীকে অবলম্বন করে যে ধর্মবিশ্বাস সাধারণ মানুষের কাছে প্রচারিত হয়েছিল, নানা অপব্যবহার সত্ত্বেও তাতে মানুষের বিশ্বাস শতকের পর শতক অটুট ছিল। তাই আজ আবার সম্ভবত মানুষ সেই হৃদয়ের বাণীর দিকেই ঝুঁকে পড়েছে।[৯]

দেব ধর্মের মর্মবাণী উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন তাই তিনি সাধারণ মানুষের স্বার্থেই তিনি চেয়েছিলেন দর্শনের যুক্তির সাথে ধর্মের বিশ্বাস ও অনুভূতিকে যুক্ত করতে। গোঁড়ামি-বহির্ভূত ধর্ম ছিলো তাঁর একমাত্র ধর্ম যা প্রকাশ পেয়েছে তাঁর মানবতাবাদী ধর্মবিশ্বাসে। এ কারণেই তিনি হিন্দু-মুসলমান-বৌদ্ধ-খ্রিষ্টান নির্বিশেষে সকলকে এক গোত্রীভুক্ত করে ভালবাসতেন। চিরকুমার ড. দেবের পালিত পুত্র-কন্যারাই এর জাজ্বল্যমান স্বাক্ষর। তারা কেউ বা হিন্দু, কেউ বা মুসলমান, আবার কেউ বা তফশিল সম্প্রদায়ভূক্ত।[১০]

"যীশুখ্রিস্ট ও শ্রীরামকৃষ্ণের অন্যতম ঐক্য উভয়ের অপূর্ব মানবপ্রেম। মানবের হিতের জন্য, পতিত মানবকে কোল দিবার জন্য তাঁহারা নিজের শরীর মনপ্রাণ সবই বিসর্জন দিয়াছেন, জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত উহাদের মুখ হইতে মানবের প্রতি আশীর্বাণীই বর্ষিত হইয়াছে।ইহাদের আবির্ভাবের একমাত্র কারণই যেন পাপী-তাপীকে আশ্রয় প্রদান, লোকহিতায় জীবন দান|"[১১] ইসলাম ধর্মের প্রবাদ পুরুষ হযরত মোহাম্মদ (সা:) ধর্মপ্রচারের জন্য আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছেন, রক্তাক্ত হয়েছেন তারপরও আল্লাহর কাছে তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন, তাদের শুভবুদ্ধি উদয়ের জন্য প্রার্থনা করেছেন। বস্তুত জিসি দেব বলতে চান সমস্ত ধর্মের প্রধান প্রচারকগণই আমাদেরকে মানবতাবাদী শিক্ষাই দিয়েছেন।

ধর্ম নিয়ে উদার দৃষ্টিভঙ্গি ধারণ করা স্বামী বিবেকানন্দ সম্পর্কে দেবের "Swami Vivekanananda's Ethics of Renunciation and Service"- শীর্ষক প্রবন্ধে পাওয়া যায়,

> "গৌতম বুদ্ধের মতো দেব বিবেকানন্দের ত্যাগ ও সেবার মনোভাবের আদর্শ দ্বারা প্রভাবিত হন। বিবেকানন্দের বিশ্বজনীনতা, মানবতাবাদ এবং সাধারণ মানুষের আশা-আকাঙ্খার দর্শন দেবকে আকৃষ্ট করেছে বারবার। তিনিও তাঁর মতোই ত্যাগ ও সেবার মনোভাব নিয়ে নিপীড়িত নির্যাতিত মানুষের জন্য শোষণহীন সমাজব্যবস্থা গড়ে তুলতে চেয়েছেন। দেব তাঁর ব্যক্তিগত জীবনে বিবেকানন্দের দর্শন দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন।"[১২]

আবার দেব তাঁর 'রবীন্দ্র-দর্শনের গোড়ার কথা'নামক প্রবন্ধে বলেন, এক উদার সার্বজনীন, আসাম্প্রদায়িক দৃষ্টি নিয়ে সারা জগতের সব মানুষের দৈহিক ও আত্মিক ক্ষুধা মেটানোর চেষ্টা প্রাত্যাহিক জীবনের কর্মক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের জীবন-দর্শনের সবচেয়ে বড় কথা। কবির নানা কবিতায় যে অনুভূতি তা সাবর্জনীন, সার্বভৌম ও অসাম্প্রদায়িক। সে জন্যেই এ অনুভূতির মূলে যে ধর্মীয় প্রেরণা, কোন সাম্প্রদায়িক ধর্মের লেবেল তার উপর না চাপিয়ে কবি তার নাম দিয়েছেন "মানুষের র্ধম"।[১৩]

বস্তুত জিসি দেব যে ধর্মের সমর্থন ও অনুশীলন করেছেন তা কোন একটা গতানুগতিক ধর্মের মধ্যে সীমিত নয়। তাঁর ধর্ম এক সর্বজনীন মানব ধর্ম, যা অন্য কোন ধর্মের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ নয়। ধর্মে অনুসৃত প্রেম ও ঐক্যের অবলম্বনেই তিনি অনুপ্রাণিত ও সমৃদ্ধ করতে চেয়েছিলেন মানবজীবনকে। এই প্রেমের পথ বেয়েই তিনি অতিক্রম করতে পেরেছিলেন হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান প্রভৃতি বিশেষ ধর্মের সংকীর্ণতাকে।[১৪]

দেব তাঁর 'দর্শন ও একজগত' প্রবন্ধে বলেন, ঐতিহাসিক ধর্মগুলোর মারফত জগতের সব মানুষকে এক করে তোলার বিশেষ চেষ্টা বারবার হয়েছে। ব্যক্তিগত জীবনে মানসিক শান্তি অভ্যাস করা, সামাজিক জীবনে প্রেম অভ্যাস করা, সর্বোপরি জগতকে ভাল করবার অনবরত চেষ্টাই ধর্মের আসল কথা।[১৫] আসলে, ধর্ম যে মতের ব্যাপার নয়, আচরণের এবং জীবনের ব্যাপার তথাকথিত ধর্মপ্রচারকগণ সে কথা যেন ভুলেই গেছেন। সব ধর্মের মূল উদ্দেশ্য, সব মানুষের ভিতরে যে প্রেমের সম্বন্ধ স্থাপন, তথাকথিক ধর্মপ্রচার চলছে ঠিক তার উল্টো পথে।

আচার-অনুষ্ঠান ও অনুভূতি উভয়েরই মূল্য যে ধর্মে আছে তা বুঝানোর জন্য গোবিন্দ্র চন্দ্র দেব তাঁর "তত্ত্ববিদ্যা-সার"- গ্রন্থে বলেন, কেবল আচার-অনুষ্ঠান পালন করাই ধর্মের কাজ নয়, ধর্মের সার হচ্ছে অনুভূতি। তিনি বলেন, এই অনুভূতিই হলো ধর্মের সারকথা। জগতের অগণিত মানুষ, যাদের সেই অনুভূতি নাই তাদের কাছে ধর্ম শুধু একটা বিশ্বাসের ব্যাপার। তারা তাদের ধর্ম-গ্রন্থের মারফত, পীর-দরবেশ, সাধু-

সন্ন্যাসী ও ধর্ম প্রচারকদের মারফত ধর্মের কতগুলো কথা শুনেছে, আর ধর্মের নামে কতগুলো আচার-অনুষ্ঠান যান্ত্রিকভাবে যুগ যুগ ধরে বংশ পরম্পরায় পালন করে যাচ্ছে। তাই ধর্ম তাদের কাছে অন্ধ বিশ্বাসের এক বড় পুঁটলী।[১৬]

গোবিন্দ চন্দ্র দেবের চিন্তার প্রতিধ্বনি পাওয়া যায় বাংলাদেশের বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলনের বিশিষ্ট প্রবক্তা কাজী আব্দুল ওদুদ এর 'বিকাশধর্ম' নামক নতুন মতবাদে। তাঁর মতে,

> "তাই ধর্ম যা জীবনের বিকাশের সহায়ক, আর তাই অধর্ম যা তেমন সাহায্য করে না" তিনি ধর্মের আনুষ্ঠানিক দিকটিকে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেন নি। আর তাই যে ধর্মের পরিবর্তনে অনুমোদন নেই, যা কেবল আনুষ্ঠানিকতায় ভরপুর, সে ধর্মকে তিনি সমালোচনা করেছেন আচারপূজা বলে।"[১৭]

আবার আমরা দেখি আরজ আলী মাতুব্বর বিশেষত ধর্মের সঙ্গে যে সাম্প্রদায়িকতা ও বৈষম্যবোধ জড়িত হয়ে পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করছে তাতে তিনি ব্যথিত বোধ করেন এবং বলেন, "সম্প্রদায় বিশেষে ভুক্ত থাকিয়া মানুষ মানুষকে এত অধিক ঘৃণা করে যে, তদ্রুপ কোন ইতরপ্রাণীও করে না। হিন্দুদের নিকট গোময় (গোবর) পবিত্র, অথচ অহিন্দু মানুষমাত্রই অপবিত্র। পক্ষান্তরে মুসলমানদের নিকট কবুতরের বিষ্ঠাও পাক, অথচ অমুসলমানমাত্রই নাপাক।"[১৮]

> মূলত ধর্মের নানা অপব্যবহার ও কুসংস্কারবাদী আচারবাদী র্কমকাণ্ড বস্তুবাদকে উস্কে দেয়। তাই ধর্মের অধ্যাত্মবাদী চিন্তা থেকে বেড়িয়ে বর্তমান বস্তুবাদী ও বৈজ্ঞানিক পরিবেশে মানুষের পার্থিব প্রয়োজনের গুরুত্ব ব্যাপকভাবে স্বীকৃত। পার্থিব প্রয়োজনের স্বীকৃতিতেই এগিয়ে চলেছে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিকাশ যেখানে ধর্মীয় ভাবধারা অনেকটাই উপেক্ষিত। বিজ্ঞানমনস্ক আরজ আলী মাতুব্বর বিজ্ঞানের মহিমা প্রকাশে বলেন, মানুষের জীবনে এমন কোনো বিষয় নেই যে- বিষয়ে বিজ্ঞানীদের অবদান নেই। আবার মার্কসের মতে, ধর্মীয় অদৃশ্য শক্তির অনুকম্পা নয়, আপন প্রয়াসেই মানুষ ঘোচাতে পারে তার সব দুঃখ দুর্দশা। মানবকল্যাণের পক্ষে ধর্ম শুধু অনাবশ্যকই নয়, অনিষ্ঠকরও বটে। যুগ যুগ ধরে মানুষে মানুষে যে বৈষম্য গড়ে উঠেছে, তা ধর্মযাজকদের হিতোপদেশ ও সতর্কবাণীর মাধ্যমে অবসিত হবার নয়।[১৯]

দেব মনে করেন উগ্র আধ্যাত্মবাদ এবং উগ্র জড়বাদ কোনটিই আমাদের জীবন যাত্রাকে সফল করতে পারেনি। যে আশায় মানুষ বৈজ্ঞানিক জড়বাদের দিকে তাকিয়ে ছিল সে আশা অল্প সময়ের মধ্যেই খানিকটা নির্মূল হয়েছে। শোষণহীন সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তে সে চারপাশে দেখছে জাতিতে জাতিতে, দেশে দেশে, গোষ্ঠীতে গোষ্ঠীতে সংঘর্ষ। এই

সংঘর্ষের সমাধানের মহৌষধ জড়বাদে নেই। জড়বাদ বৈজ্ঞানিক সভ্যতায় যে প্রাণ-চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছে, তার প্রয়োজন খুব বেশী। সেই প্রাণ-চাঞ্চল্য, কর্ম-মুখরতা ছাড়া নতুন পৃথিবী গড়ে তোলার উপায় নেই। তবে সে পৃথিবীকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে শুধু শক্তির ভিত্তিতে নয়, প্রেমের ভিত্তিতে। এই শক্তি ও প্রেমের মিলনের নামই জড়বাদ ও অধ্যাত্মবাদের সমঝোতা। আর সেই মিলনের ফলে জড়বাদ ও অধ্যাত্মবাদের তথাকথিত দ্বন্দের সমাধান হবে। এই নতুন জীবন-দর্শনের ভিত্তিতেই আগামী দিনের সব মানুষের সুখ-সমৃদ্ধির ইমারৎ গড়ে তুলতে হবে।

সর্বশ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী নিউটন ও আইনস্টাইনের চিন্তাধারাই প্রমাণ করে দেবের সমন্বয়ী চিন্তা সঠিক। নিউটন বুঝালেন, প্রকৃতির নিয়মগুলো ঈশ্বরের ইচ্ছারই প্রকাশ। জগতের আদি কারণ ঈশ্বর খেয়াল বশে কিছু করেন না। তার নিজের গড়া নিয়ম তিনি মেনে চলেন। তাতে তার স্বাধীনতার ব্যাঘাত হয় না। অপর জগৎ বিখ্যাত বিজ্ঞানী আইনস্টাইনও মনে করেন যে, প্রকৃতির ভিতর একটা সামঞ্জস্য আছে এবং প্রাকৃতিক নিয়মগুলো সে সামঞ্জস্যেরই প্রকাশ। এটাই ধর্ম বিশ্বাসের মূলকথা। বিজ্ঞান আবার এই বিশ্বাসের দিকে ফিরে আসবে আইনস্টাইন এই আশাই পোষণ করেন।[২০]

জিসি দেব স্বপ্ন দেখেছিলেন এক অসাম্প্রদায়িক এবং মানবতাবাদী বিশ্বের। আর সে লক্ষ্যেই তিনি তাঁর সমন্বয়ী দর্শনে অসাম্প্রদায়িক ও মানবতাবাদী চেতনাকে প্রাধান্য দিয়েছেন সর্বাগ্রে। যে অসাম্প্রদায়িক চেতনা ধারণ করে বাংলাদেশের মুক্তিকামী মুক্তিসেনারা বাংলাদেশ স্বাধীন করেছিল, আজ স্বাধীনতার এত বছর পরেও সে স্বপ্ন যেন বৃথা হতে চলেছে। আজও বাংলাদেশে ধর্মীয় উগ্রবাদী শক্তি মাথাচাড়া দেয় বারংবার। ২০১২ সালের ২৯ শে সেপ্টেম্বর মধ্যরাতে ফেইসবুকে গুজব ছড়িয়ে উগ্রধর্মান্ধ গোষ্ঠী অগ্নিসংযোগ ও হামলা চালিয়ে ধ্বংস করেছিল কক্সবাজারের রামুর বৌদ্ধ বিহার ও বসতি। সম্প্রতি বাংলাদেশের কুমিল্লার একটি পূজা মন্ডবে হনুমানের প্রতিমার কোলে কোরআন রাখাকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন পূজা মন্ডপে ও মন্দিরে হামলা এবং ভাংচুর হয়েছে। অসাম্প্রদায়িক চেতনাকে আঘাত করা হচ্ছে এখন ফেইসবুকে গুজব ছড়িয়ে, মসজিদের মাইকে আহ্বানের মাধ্যমে। গুজবের পাখায় ভর করে মানুষের বসতিতে ঝাঁপিয়ে পড়ছে ধর্মান্ধ হায়েনার দল। গড্ডালিকা প্রবাহে গা ভাসানো বোধ-বিবেচনাহীন ধর্মান্ধদের গোবিন্দচন্দ্র দেব ভেড়ার পাল বলে আখ্যায়িত করেছিলেন। এসব সাম্প্রদায়িক কর্মকান্ড সত্যিই কি ইসলাম সমর্থন করে? গোবিন্দচন্দ্র দেবের ইসলামী দর্শন সম্পর্কে ধারণার প্রেক্ষিতে এবং কুরআন-হাদীসের আলোকে বিষয়টি বিশ্লেষণ করা যাক:

মুসলিম দর্শন ও ইসলাম ধর্ম প্রচারক ও এর স্বার্থক সমর্থকদের জীবন দর্শন অনুশীলন করে দেব অন্তত এই সিদ্ধান্তে পৌছান উগ্র পন্থা ইসলাম কখনোই সমর্থন করে না। দেব তাঁর 'বিশ্ব সভ্যতায় মুসলিম দার্শনিকদের দান'-নামক প্রবন্ধে বলেন; আজকাল আমরা যে বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের কথা বলি সেই জ্ঞান আহরণের জন্য রাসুলুল্লাহ্

(সা:) চীনের দুর্গম গিরি-কান্তার অতিক্রম করার আয়াসসাধ্য প্রয়াসের নির্দেশ দিয়েছিলেন। তাই লেখকের কলমের কালি শহীদের রক্তের চেয়েও অধিক গৌরব পেয়েছে হাদিসে।[২১]

'বিশ্বসভ্যতায় মুসলিম দার্শনিকদের দান'- প্রবন্ধে দেব তৎকালীন আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে জবরবাদ, কদরবাদ, মুতাযিলা, আশারিয়া এবং আল গাজ্জালি ও ইবনে রুশদের স্বকীয় ও স্বাধীন চিন্তার গুরুত্বের কথা বিশেষ উল্লেখ করেন। তিনি মনে করেন, যুক্তি, বিশ্বাস, স্বদাচার ও ধর্মাচারের কোন সংঘাত নেই। তাই এগুলোর সমন্বয়ের মধ্যেই মুসলিম দর্শন জগৎ সভায় গৌরবময় অবদান রাখতে পেরেছে।[২২]

দেব তাঁর "Koran Puts Emphasis on Secular Learning"-প্রবন্ধে বলেন- "The Koran, The bible of Islam, lays great emphasis on secular learning and a rational outlook. It advises man to pray: "Oh my Lord! Advance me in knowledge"... those who do not observe and understand are worse than cattle ... Whosoever has been given knowledge has indeed been given abundant good ..."[২৩]

উপরোক্ত আলোচনা থেকে স্পষ্ট হয় মুসলিম ধর্মে দেব সাম্প্রদায়িকতার কোন জায়গা দেখেননি। বস্তুত যারা ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতাতে বিশ্বাস করে এটা ধর্মের দোষ নয় বরং ব্যক্তির ধর্ম-ব্যবসা মনোবৃত্তির কারণে বা ক্ষমতায় টিকে থাকার দরুণ ঘটে থাকে বলে দেব বিশ্বাস করেন।

দেব মনে করেন, মুসলিম দার্শনিকেরা প্রত্যাদিষ্ট জ্ঞান এবং বুদ্ধির মধ্যে কোন বিরোধ দেখেননি। তাঁর মতে, বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তির অভাবিত উন্নতির যুগে ধর্মকে আজ দেখা হচ্ছে খন্ডিত দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে; ফলে ধর্ম-সম্পর্কে দেখা দিচ্ছে নানা বিভ্রান্তি, অপব্যাখ্যা-হচ্ছে ধর্মের। তিনি বলেন খন্ডিত দৃষ্টিভঙ্গি-দিয়ে নয়, সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়েই ধর্মকে দেখতে হবে; ধর্মকে দেখতে হবে মানব প্রেম ও মানবকল্যাণের ঐক্যের প্রতীক হিসেবে। ধর্মীয় সংস্কার সমূহকে সামনে রেখেই মানুষকে কুসংস্কার মুক্ত, গোঁড়ামী মুক্ত করে ধর্মের মূল ভাবনাকে মানুষের মধ্যে জাগিয়ে তুলতে হবে। তাই পূজা-পার্বণ-ঈদ ইত্যাদি ধর্মীয় অনুষ্ঠানের মধ্যে খুঁজতে হবে সামাজিক প্রত্যয়, মহামিলনের অসাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গি।[২৪]

কোরআন-হাদীসে সাম্প্রদায়িকতার কোন স্থান নেই। মদিনা সনদে বলা হয়, এ সনদে স্বাক্ষরকারী ইহুদি, খ্রিষ্টান, পৌত্তলিক ও মুসলিমরা মদিনা রাষ্ট্রে সমান নাগরিক অধিকার ভোগ করবেন এবং একটি জাতি গঠন (উম্মাহ) করবেন। রাসুল (সা:) উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা দিয়ে বলেছিলেন, "যদি কোনও মুসলিম কোনও অমুসলিম নাগরিকের ওপর নিপীড়ন চালায়, তার অধিকার খর্ব করে তাকে কষ্ট দেয় এবং তার থেকে

কোনও বস্তু বলপ্রয়োগ করে নিয়ে যায়; তাহলে কিয়ামতের দিন আল্লাহর বিচারের কাঠগড়ায় আমি তাদের বিপক্ষে অমুসলিমদের পক্ষে অবস্থান করবো।"[২৫]

মূলত প্রকৃত মুসলমানের পক্ষে মন্দির-প্রতিমা ভাঙ্গা তো দূরের কথা, মন্দির কিংবা প্রতিমা ভাঙ্গার চিন্তা করাও সম্ভব নয়। আল্লাহ বলেন, "হে ইমানদারগণ, তারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে যেসব দেব-দেবীর পূজা-উপাসনা করে, তোমরা তাদের গালি দিও না।..."[২৬]

আমাদের গোবিন্দচন্দ্র দেবের মতো সকল ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল দার্শনিকের দর্শনে উৎসাহিত হতে হবে। তিনি সাম্প্রদায়িক চেতনার বিরুদ্ধে অসাম্প্রদায়িক ও মানবতাবাদী দর্শনের প্রচার করেছেন যার নির্যাস গ্রহণ করেছেন গৌতম বুদ্ধ, যীশুখ্রিষ্ট, হযরত মুহাম্মদ (সা:), রামকৃষ্ণ, স্বামী বিবেকানন্দ প্রভূতি মহাপুরুষদের কাছ থেকে আবার তার রসদ সংগ্রহ করেছেন প্রাচ্য-প্রতীচ্যের দার্শনিকদের কাছ থেকে এবং যোগ করেছেন নিজস্ব সমন্বয়ী চিন্তাধারা। শহীদ বুদ্ধিজীবী দার্শনিক ড. গোবিন্দচন্দ্র দেবের সমন্বয়ী দর্শন একাডেমিক দর্শনে যেমন গুরুত্বপূর্ণ তেমনি বর্তমান বাংলাদেশে উঁকি দেয়া ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতা প্রতিরোধে তাঁর অসাম্প্রদায়িক, মানবতাবাদী ও সমন্বয়ী দর্শনই হতে পারে মুক্তির এক যথার্থ বার্তা।

তথ্য নির্দেশ :

১. ড. প্রদীপ রায় (সংগৃহীত ও সম্পাদিত), গোবিন্দচন্দ্র দেব: অগ্রন্থিত প্রবন্ধ ও অন্যান্য রচনা, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০২২, পৃ. ৩২ ।

২. হাসান আজিজুল হক (সম্পাদিত), গোবিন্দচন্দ্র দেব রচনাবলি (তৃতীয় খ-), বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৭৯, পৃ. ১০।

৩. ড. প্রদীপ রায় (সংগৃহীত ও সম্পাদিত), গোবিন্দচন্দ্র দেব: অগ্রন্থিত প্রবন্ধ ও অন্যান্য রচনা, পৃ. ৩২।

৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯।

৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯।

৬. ড. গোবিন্দচন্দ্র দেব, আমার জীবন-দর্শন, মল্লিক ব্রাদার্স, বাংলা বাজার, ঢাকা, ১৩৬৮ (বাংলা), পৃ. ১০।

৭. ড. প্রদীপ রায় (সংগৃহীত ও সম্পাদিত), গোবিন্দচন্দ্র দেব: অগ্রন্থিত প্রবন্ধ ও অন্যান্য রচনা, পৃ. ২০-২১।

৮. ড. গোবিন্দচন্দ্র দেব, আমার জীবন-দর্শন, পৃ. ১০-১২।

৯. ড. প্রদীপ রায় (সংগৃহীত ও সম্পাদিত), গোবিন্দচন্দ্র দেব: অগ্রন্থিত প্রবন্ধ ও অন্যান্য রচনা, পৃ. ২১-২২।

১০. হাসান আজিজুল হক (সম্পাদিত), গোবিন্দচন্দ্র দেব রচনাবলি (তৃতীয় খণ্ড), পৃ. ২৭-২৮।

১১. ড. প্রদীপ রায় (সংগৃহীত ও সম্পাদিত), গোবিন্দচন্দ্র দেব: অগ্রন্থিত প্রবন্ধ ও অন্যান্য রচনা, পৃ. ৫-৭।
১২. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩।
১৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮-৪৯।
১৪. ড. আমিনুল ইসলাম, গোবিন্দচন্দ্র দেব জীবন ও দর্শন, সূচীপত্র, ঢাকা, ২০০৮ (সংস্করণ), পৃ. ৬৯।
১৫. ড. প্রদীপ রায় (সংগৃহীত ও সম্পাদিত), গোবিন্দচন্দ্র দেব: অগ্রন্থিত ও অন্যান্য রচনা, পৃ. ১৯।
১৬. হাসান আজিজুল হক (সম্পাদিত), গোবিন্দচন্দ্র দেব রচনাবলি (তৃতীয় খণ্ড), পৃ. ১১৯।
১৭. ড. আমিনুল ইসলাম, গোবিন্দচন্দ্র দেব জীবন ও দর্শন, পৃ. ৬৩।
১৮. আরজ আলী মাতুব্বর, সত্যের সন্ধানে (দ্বিতীয় মুদ্রণ), ঢাকা, ১৩৯০ (বাংলা), পৃ. ৪।
১৯. ড. আমিনুল ইসলাম, গোবিন্দচন্দ্র দেব জীবন ও দর্শন, পৃ. ৬৫।
২০. ড. গোবিন্দচন্দ্র দেব, আমার জীবন-দর্শন, পৃ. ৬৫।
২১. ড. প্রদীপ রায় (সংগৃহীত ও সম্পাদিত), গোবিন্দচন্দ্র দেব: অগ্রন্থিত প্রবন্ধ ও অন্যান্য রচনা, পৃ. ২৭।
২২. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪-২৫।
২৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭।
২৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬-২৭।
২৫. সুনানে আবু দাউদ, ৩০৫২।
২৬. সূরা আনআ’ম: ১০৮।

জ্বলন্ত বাস্তবতার প্রতীক : ‘শনিবারের ছড়া’

শর্মিষ্ঠা সিন্‌হা
স্যাক্ট-২, বাংলা বিভাগ,
ক্ষুদিরাম বোস সেন্ট্রাল কলেজ, কলকাতা

‘শনিবারের ছড়া’ বইটি হাতে পেলাম। মঙ্গলবার ২৩.০৩.২০২১-এ। ছড়াকার অধ্যাপক প্রবীর ঘোষ রায়ের বিষয় বাণিজ্যবিভাগ জেনে কিছুটা বিস্মিতও হলাম যে, বাংলা সাহিত্য শাখার সঙ্গে সরাসরি সম্পর্কিত না হয়েও তিনি যেভাবে ছড়াচর্চায় নিজেকে নিয়োজিত রেখেছেন তাতে তাঁর কবিসত্ত্বার প্রবণতাকে শুধুই প্রাগাঢ় করেনি মৌলিক বৈশিষ্ট্যে নিজের অবস্থানকেও স্বতন্ত্র করে নিয়েছেন। ফেসবুকের ওয়েবসিরিজের ১৮০টি ছড়া নিয়ে এই গ্রন্থটি সংকলিত হয়েছে। লক্ষণীয় যে ছড়াকার প্রতিটি ছড়ার আলাদা আলাদা ভাবে নামকরণ করেননি বরং ‘শনিবারের ছড়া-১’,‘শনিবারের ছড়া-২’ এইভাবে... ‘শনিবারের ছড়া ১০০’ সংখ্যার দ্বারাই চিহ্নিত। ছড়ার বইটিতে উপরিপাওনা যে কোনো ছড়ার পরিপ্রেক্ষিত কি, উপপাদ্যবিষয় কি তা ছড়া শুরুর আগেই ২-৩-৪ লাইনে ছড়াকার তা নিজেই বলে দিয়েছেন যা আমার মতো পাঠকে ছড়াটি বুঝতে সুবিধা করে দিয়েছে। বিগত ২ বছরে আমাদের ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে ঘটে যাওয়া নানা সামাজিক অবক্ষয় ও সংস্কৃতির ভাঙন তাঁর ছড়ার মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে। যে ঘটনাগুলি আমরা আমাদের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দৈনিক পত্রিকাতে পেয়েছি কোথাও সাম্প্রদায়িকতার অসহিষ্ণু ক্ষোভ বিষেদ্‌গার সংঘর্ষ, ধর্মান্ধতার ব্যাভিচার নির্মম অত্যাচার, গণতন্ত্রের কন্ঠরোধ, দলিতের আর্তনাদ, দায়িত্বশীলপদে বসে থাকা ব্যক্তিত্বের কাণ্ডজ্ঞানহীন বাক্যকেও কষাঘাত করেছেন তিনি, মাতৃত্বের লাঞ্ছনা, ষড়যন্ত্রকরে মামলা চাপিয়ে জেলে পোড়া, মনুষ্যত্বের চরম অবমাননা তাঁর কলমের লেখনীবাণে তীব্র কষাঘাতে শাণিত করেছেন তিনি। নজর এড়ায়নি করোনাতঙ্ক এবং গোময়, গোমূত্র নিয়ে রাজনীতিবিদের উদ্ভট্‌তত্ত্বের। ব্যঙ্গ বিদ্রূপে উপযুক্ত জবাব দিতে ছাড়েননি। শাসকের রাঙা চোখের চাহনিকে ভয় পাননি। বরং সাহসিকতা ও বুকের জোরে দম রখেছেন। গরু নিয়ে ঘটে যাওয়া বুলন্দশহরের নৃসংশ ঘটনা, ছদ্মজাতীয়তাবাদের দাঙ্গার পৈশাচিকতা “পুলওমামা সেনাদের রক্তাক্তলাশে আমরা মর্মাহত, স্তম্ভিত।”(২৩) শোকার্ত মায়ের ক্রন্দন। অসহায়তা দুই সম্প্রদায়ের হিংসার বলীদানের জ্বলন্ত চিত্র ফুটে উঠেছে তাঁর ছড়ায়। গাড়ি বোঝাই বিস্ফোরক কী করে মিলিটারি কনভয়ে ঢুকে যায়। স্বেচ্ছাচারী শাসকের কুযুক্তির আশ্রয়ে ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি (৩৫/৩৯) ইতিহাস যাদের ক্ষমা করবে না কোনোদিন, ছড়াকারের কন্ঠেগর্জে উঠেছে—‘স্বৈরাচারী নিপাত যাও, যুবসমাজ ছাত্রসমাজ জেগে আছে। স্বৈরাচারীর পতন অনিবার্য, ব্রিটিশ পদলেহনকারীদের বীরের সম্মান দেবার উগ্র বৃষ্টামি! জনগণের টাকালুট করে বিদেশে পালানো কুসন্তানেরা,

রাষ্ট্রের মদতে বিশ্ববিদ্যালয়ের সন্ত্রাসবাদী নাকি গর্ভবতী রমণী। অগত্যা জেলে ঠাঁই তাঁর। বিগত কিছু সময় ধরে ঘটে যাওয়া সমাজের বীভৎস গভীর ক্ষত গুলির দিকে তিনি আলোকপাত করেছেন, রূঢ় বিদ্রূপে। বিশ্ব যখন মৃত্যু উপত্যকা করোনা বিধ্বংসী ছোবলে, মহামারীর বিষ প্লাবনের এই ভয়ংকর গ্রাসের দিশাহীন স্বরূপটি তথা লকডাউন এবং তার ফল পরিযায়ী শ্রমিকের করুণ অসহায়তা সবই উঠে এসেছে ছড়াকারের লেখনীতে। ছড়াকার উদ্বিগ্ন কে বেশি ভয়ংকর? রোগ না ক্ষুধা? কী বেশি দরকারী? ধর্ম না বিজ্ঞান? করোনার দিনগুলি কোন পথ দেখাবে শেষ পর্যন্ত? প্রেম না ঘৃণার! বিশেষত করোনা যে আমাদের গাহর্স্থ্য হিংসার প্রকোপকে বাড়িয়ে দিয়েছে যে বিষয়ে কোনো সংশয় নেই। করোনাকালে লকডাউনে মানুষকে ঘরে আবদ্ধ থাকতে হচ্ছে। কিন্তু যার ঘর নেই ফুটপাতে যার রাত্রিকাটে খোলা আকাশতলে, কার্ফুতে বন্ধ নিজ দিন-আনা দিন খাওয়া মানুষের রুজি। তাদের পেটে আগুন জ্বলছে। যে কৃষক সব্জি ফলায় মাঠে, ইস্টিশানে মোট তোলে যে কুলি, ভ্যান ঠ্যালে যে, রিক্সা চালায়, চা-দোকানের ঝাঁপ খোলে, বারবাণিতাদের অন্ধ জগত, সবারই মর্মান্তিক জীবননষ্ট জীবন মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে! ছড়াকার' বলেছেন রামেই মারুক কি রাবণে— এদের মরণ যজ্ঞ ঘনিয়ে এসেছে। আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেলেও কিংবা মহামারীর বিষ-প্লাবনে তাদের জন্য মহামান্য কোনো নেতার মুখে মধুর ভাষণ বা বক্তৃতাশোনা যায় না। দুষ্টের ছলের অভাব হয় না। তাই তার আশ্রয়দানের পরিবর্তে কৌশলীপন্থা অবলম্বন করেন। গুরু যদি অন্ধ হয় তাহলে ভক্তের পথ খানাখন্দ ভরা হবেই। ছড়াকার বলেছেন বুদ্ধি দিয়ে বুঝতে হবে তফাৎ ভালো মন্দে।

গরীব বলে কবির কথা বাসি হলেই ফলে,
ছদ্মবেশী ঘরভেদী-সব বাড়ছে দলে দলে।

করোনার কালে সর্বজ্ঞদেরও যে অসহায় দেখাচ্ছে ৮৫ নং ছড়াটি তার উদাহরণ। যারা নিজেদের এলেমে চলত এতদিন পাউডার লিপিস্টিক মেখে নিজেদের শিক্ষা দিক্ষার মাপকাঠিতে বিজ্ঞ বলে জানতো-অর্থ-সমাজ-রাজনীতি তারাও আজ দুর্গতদের মতো কেমন বোকাবাক্সের ভূত!

লকডাউনের জেরে আমাদের প্রত্যহিক জীবন যে কী ভীষণ বদলে গেছে। হাতে অবাধ সময় পেয়ে যাওয়ারটাও কোন গঠনমূলক কাজে লাগানো যাচ্ছে না, দৈনন্দিন একঘেঁয়েমি অসহ্য হয়ে উঠেছে। অতি প্রিয়জনের খুনসুঁটি ও এখানে (কবি পত্নীর) মনে হয় চিমটি! কোভিড আমাদের জনজীবনকে কেমন যেন রাতারাতি একসূত্রে গেঁথে দিয়েছে। তাই কবি বলে ওঠেন—"কোভিডের হাত ধরে ঘণা-অসূয়া পালাক।" (৮২)

দেশটা যখন পুরোপুরি আবোলতাবোলের প্রত্যক্ষ ভূমিতে পরিণত হয়েছে। আমাদের সকলের কিংকর্তব্য বিমূঢ় অবস্থা (৭০) ছড়াকার মহাকালের হাসির

নিষ্ঠুরতাকে ও তুলে ধরেছেন— প্রকৃতির ক্রূঢ়তা আমফান ঝড়ের তাণ্ডব ও বিধ্বংসীলীলা যখন বাতাস ভরে উঠে চেনা অচেনা বিষে—বিজ্ঞেরা বাঁকা হেসে বলেন ক্লিশে, তখন ছড়াকার প্রবীর ঘোষরায়ের প্রত্যয়—

'আসবে সে দিন, মানবতার সব অপমান
ঘুচিয়ে যখন সবাই হবে সবার সমনে।
চলতে পথে হাত ধরেছি, বন্ধু সবাই,
ক্ষুধার, মারীর সব অবরোধ পার হয়ে যাই।

শনিবারের ছড়া (৮৩)

পাশাপাশি তাঁর কবিতায় আরো একটি শান্ত স্রোতধারা বয়ে গেছে যা কিছু কল্যাণকর, শুভ সুন্দর তার জয়গান গেয়েছেন ছড়ায় ছড়ায়। (৩৪) ছড়াতে বউয়ের সঙ্গে দাম্পত্য, খুনসুটি, প্রেম, দাম্পত্য-কলহ আর পরকীয়া নিয়ে মজার রসাস্বাদন কবি প্রেমের অভিমান ধরা পড়ে— (৭৮) নং এ—

'আসবো বলেই যাওয়া আমার, যাবো বলেই আসা,
তুমি যাকে রাগ জানো তা আসলে ভালোবাসা।'

'যাবো বলেই আসা আমার, আসবো বলেই যাওয়া
যাকে তুমি শূন্য জানো, সে আমার সকল পাওয়া।

কালিদাসের কাল থেকে আষাঢ় ও মেঘদূতের বিশেষ সম্পর্ক-বার্তা।

ছড়াকার আজও উপলব্ধি করেন সত্যিই এদেশের বুকে আজ আঠারো নেমে আসা এবং দেশের হাল ধরা খুবই জরুরি।

a) রামরাজ্য পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হলেও প্রেম সর্বকালেই সত্য (৯৯) মঙ্গল, তাও ধ্রুবসত্যই। কিচ্ছু ভালোলাগে না—মানসিক অবসাদ, বিষাদ, চারিদিকে শুধু মনখারাপ করা খবর। সত্যিই বড়ো গভীর অসুখ আজ পৃথিবীর (৯৬) চিরনতুনের জন্মকদিনে কবি মান-অভিমান মিটিয়ে প্রেমের দোলা ভ্যালেন্টাইন ডে ! (৭৪) ভালোবাসার জয় চান কবি। কৃষ্ণ রাধার প্রসঙ্গ তাই স্বভাবতই এসেছে ছড়ায়।

C ২১ গানওয়ালার গান যৌবনের ভালোবাসার সেতু-নবীনা কিশোরী এক পগলীর দুঃখ এবং হতাশার মধ্যে ও চারিদিকে হাসিতামাশার খোরাক মিলতেই থাকে, ছড়ায় উপপাদ্য বিষয় সেখান থেকে নিতে গিয়ে ছড়াকার সাধুদের (৩৫) সাবধান করে দিয়েছেন। ছদ্মবেশীদের সাবধান করে অশুভের বিনাশ চেয়েছেন তিনি। বিষাক্তসাপ ফণা বিস্তার করলেও গোকূলে কৃষ্ণ বেড়ে ওঠার মতো কবি জানেন অশুভ শক্তির ও ধ্বংস করার শক্তি আছে তাই তিনি হাল ছাড়েননি। জন্মাষ্টমী ভারতীয় পুরাণের অন্যতম সেরা কূটনীতিবিদের জন্মতিথি (৪৯) কবি তার মধ্যেও পেয়ে যান নিজের লেখনীর অর্থ।

সুদিনের দূরতম আশাও দুরাশা মনে হয়। ভোর হয় আর আলো ফোটবার আগেই-তো সবচেয়ে গাঢ় হয় অন্ধকার। রক্তে কলম ডুবিয়ে কবি আঁকেন দিন-বদলের ছবি।

ঠিক আর রাজনৈতিক ভাবে ঠিক এই দুইয়ের পার্থক্য বোঝাতে ছড়াকারের বিচক্ষণতাও যথেষ্ট সুদৃঢ়। (১৫) মিথ্যার বেসাতি যারা করে মঞ্চের পিছনে তাদের জন্য মঞ্চ প্রস্তুত থাকে সে সর্তক বাণী ও গর্জে উঠেছে তাঁর কণ্ঠে। (৯৫) রাজনীতি বড়ো আজব জিনিস, ছরাকার সংশয়ে দ্বিধাগ্রস্ত—নীতিহীনতাই রাজনীতির মূল কিনা ! (৪৩)

স্বার্থান্বেষী স্বার্থের কারণে কে কখন কার সাথে হাত মেলায় শত্রু-মিত্র বদলে যায় তাকেও কটাক্ষ করেছেন তিনি—“আরে বাবা জানিরে, তোর হাতে ক্ষমতা,তোর পোষা তোতা পাখি তোর বুলি কাপচায়।”

C আবারশীতকালের অনুকূল জীবনচিত্রটি সুন্দরকরে এঁকেছেন— মেলায়-খেলায়-ছবিতে-নাটকে আহারে বিহারে (১৪)

প্রকৃতি ইছামতীর জল – মাঝিমল্লারের গান – দুর্গাবিসর্জন পাখীদের আনচান শরতের সুন্দর চিত্র ও পাঠকের মনকে করে তোলে সুখনীয়। শরতের আকাশে যে কালো মেঘের ভ্রূকুটি রয়েই যায় সেই অশুভের বিনাশচেয়ে শারদ শুভেচ্ছা জানিয়েছেন কবি।(৫৫) নির্বোধের কর্মকাণ্ড,বাঘের গলায় মালা পরানো ও তার ভয়ঙ্কর পরিণতি অন্যদিকে বোধিমানুষের হাসির উদ্রেগ, ভূতের অস্তিত্ব ও কাণ্ড কারখান নিয়ে মস্করা করতে তিনি ছাড়েননি। প্রকৃতিক দুর্যোগের কাছে মানুষ বড়ো বিপন্ন, অসহায়! ধনী গরিবের বিভেদ রেখার মধ্যে তা ধার ধারে না সে বক্তব্যই স্পষ্ট করেছেন (৮৮) সংখ্যক ছড়ায়। নাচতে না জানলে উঠোন বাঁকা— এই প্রবাদ বাক্যটিতে সত্য হয়ে উঠেছে ছড়াকারের— (৮৭) নং ছড়ায়।

‘জীবনের গান গাইতে জানে না মৃত্যুর পালাকার।’ এই মৃত্যুউপত্যকাই আজ কবির স্বদেশ! তাই ভীষণ ঘৃণার উদ্রেগ করে বিদ্রূপ করেছেন— ‘পাথর নিংড়ে রস চায় ওরা, ছেড়ে টসটসে ফল। (৮৬)

আবার সমাজমাধ্যমের কুফল বন্ধুত্বের বিজ্ঞাপন, মানুষের একাকীত্বের নিঃসঙ্গতার অবসাদের সুযোগ নিয়ে রঙিন স্বপ্নের হাতছানি—ফাঁদে পড়ে ন্যক্কারজনক পরিস্থিতির শিকাড়, বিপন্নতার আবহ ঘুণ ধরা সমাজের পৈশাচিক বর্বরতা শিশু চুরির ঘটনা। আবার সম্পূর্ণ কাল্পনিক চরিত্র নিয়ে লেখা বাস্তবের কোন চরিত্রের সঙ্গে মিল ঘটে গেলে কাকতালীয় বলে কবি আগেই ক্ষমা চেয়ে নিয়েছেন— (৯৭) ‘শাক দিয়ে ঢাকা আছে মাছ’— (৯৪) এমন সব কাণ্ড কারখানাও জর্জরিত করেছেন তীব্র কষাঘাতে। রক্ষকই ভক্ষক, ঠগ যোচ্চদের স্বরূপও চিনিয়ে দিয়েছেন। (৯৪)। (৭৬) চোরে চোরে মাসতুতো ভাইদের নিয়ে ঠাট্টাও করেছেন—

তোকে দেখে হাসি পায়, আমি ত জোকার,
দুনিয়ায় চলে রাজ যতেক বোকার।
তুই খাস চেটেপুটে, আমি খাই লুটে,
তুই খুব হিংসুটে আমি ও কুচুটে—।

আরো ভিন্ন ভিন্ন সুরে কিছু কিছু ছড়া স্থান পেয়েছে যা এক একটাএক এক স্বাদের। যেমন—কবিরা যেন নিজেদের ভালোটা বোঝার ক্ষমতা রাখেন, বেয়াদপ ভালো নয়। নিজের সীমা অতিক্রম করা উচিত নয়, তার শুদ্ধিকরণের পন্থা ও দর্শন হয়েছে (২৪)। শুভবুদ্ধিবাদীদের ফড়েরা যে দাবিয়ে রাখতে পারে না তার পরিচয় ও ছড়ায় স্পষ্ট। (৫৩) যে মেঘ কখনো বৃষ্টি ঝরায় না সে সময়ে কবি খুঁজে চলেছেন তাঁর স্বদেশে, কিন্তু 'যে মানুষের কোন স্বদেশ নেই,/ কোথায় পাবে সে তার পরিচয়/....../এপারে মন, শরীর চলে যাচ্ছে ওপারে মায়ের ভিটে টুকরো করে কাঁটাতারের বেড়া,/ রিক্ত জীবন আগুন জ্বেলে রাখতে যদি পারে,/ একদিন ঠিক মানুষের পাশে দাঁড়াবেই মানুষেরা"—সম্প্রতি NRC NPR নিয়ে রাষ্ট্র তথা শাসকদের মধ্যে যে বজ্রনির্ঘোষ ঘোষণা, দেশ ছাড়া হওয়ার সন্ত্রস্ত ভয় একশ্রেণির মানুষের মধ্যে কাজ করে বেড়াচ্ছে। ছড়াকার স্পষ্টতই সে দিকে ইঙ্গিত করেছেন। ভায়ের উঠোন যখন ভাইয়ের জমা লাশে ভরে ওঠে তখন একজন সত্যান্বেষী ই-তো উপলব্ধি করতে পারেন—'শাসকের বেশে পরিচয় ঢেকে ঘাতকেরা পথ চলে।' (৪৮) শাসক শক্তি গণতন্ত্রকে হত্যা করছে সেনার হাতে অস্ত্র তুলে, যে শাসক তাদের মেনিফেস্টোর সবার শেষে স্থান দেয় শিক্ষা-অন্ন-বস্ত্র তারা যে উন্নয়নের কোনো জোয়ার-ই আনতে পারে না, তার বিলিষ্ঠ উচ্চারণ তার ছড়ার পংক্তিতে পংক্তিতে। দুঃখ এবং হতাশার থেকেও হাসিতামাশার খোরাক খুঁজে নিয়েছেন—

'বিবি তোকে তালাক দেবো, এ ছাড়া আর উপায় নাই,
যে-যা ভাবুক, আমার ঘরে শ্বেত ললসা চাই-ই-চাই।'

নেহাতই শিশুপাঠ্য ছড়াও অনায়াসে স্থান করে নিয়েছে (৯৩) সংকলনে—(৪৫)। কখনো আবোল-তাবোল লিখে মনে হয় সপ্তাহত পপক্ষয় হল। (৪০)/৩৬

মৃত্যু উপত্যকাই কবির আজকের ভারতবর্ষ, তবু কেউ জানতে চাইলে ছড়াকার বলেন "ভালো আছি"! (৪১)

সাধারণ মানুষকে একেবারে বোকা ভাবাও ভুল! যা চোখ থাকতেও অন্ধ হয়ে থাকারই সামিল! তবু শুভবুদ্ধিসম্পন্ন কবি গণতন্ত্রের আশু জয় চানন। (৩৮)

ছড়াকার পিছুটানহীন নন, এ সংসার বর মায়াময়, সহজে কাটতে চায় না তাই প্রজ্ঞাবানকে বলেন— অভিশাপ টাপ না দিতে (৩২)।

সাম্প্রতিক আরো একটি ঘটনা লাভজেহাদি ভয়াবহ রূপনিয়েছে। রাষ্ট্রের তথা শাসকের সাম্প্রদায়িকতার ভাষায় ধীক্কার জানিয়েছেন—(৩০)

'লাভ-জেহাদি দেখাচ্ছে পথ, ভালোবাসায় পুড়ছে ঘর,
রাজার বচন না মানলে পস্তে মরণ জীবনভর।

কী খাবো আর কী পরবো সব তুমি দাও ঠিক করে,
ইঁদুর হয়ে গর্তে ঢুকি, লাল গগনে চিল ওড়ে।'

ব্রিটিশ শাসনে পরাধীনতার গ্লানি নির্মম অত্যাচার, বোঝা— বারুদের কাহিনি আর বর্তমান বিশ্বে জৈব ভাইরাসের আক্রমণ তথা আমাদের স্বদেশে ঘটে যাওয়া মর্মান্তিক কাহিনিগুলি অস্তিত্বের সংকট কোনো অংশে কম বলে মনে হয় না। বইটি খুঁটিয়ে পড়তে গিয়ে দেখা গেছে সংকলনে একই গতের বা ধারার ছড়াগুলি পর পর সাজানো নয়, অবিন্যস্ত এলোমেলোভাবেই ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে ভিন্ন স্বাদের ছড়াগুলি। একই গতের ছড়াগুলিকে যতটা পেরেছি একসাথে এনে আলোচনা করারই এখানে প্রয়াস পেয়েছি।

প্রেম (৯৯) ছড়াটি Imp

দুর্দান্ত প্রেমের ছড়া (২৭) সংখ্যক ছড়াটি। ছড়াকার বলেছেন এখন কাল মধুমাস, ফাগের দাস শরীর ও মনে। প্রেম দিয়ে গড়া এই ছড়ায়—

'ভালো চাও তো ওসব ছাড়ো,
এসো, আমার হাত ধরো,
লক্ষ্মী মেয়ের মতো আবার
এই মানুষের ঘর করো।'

শাসকের রক্তচক্ষুকে ভয় না পেয়ে দামাল কবি শাসককে হুঁশিয়ারি দিয়ে সতর্ক করেছেন—

ভুলোনা শাসক, জওয়ান কিন্তু—
চাষির ঘরের-ই ছেলে।
কী হবে হঠাৎ তোমার দিকেই—
নিশানাটা ঘুরে গেলে!

সাধারণ জনগণ সব দেখছে শুনছে এবং মনে ও রাখছে সবদেশের নামে যারা গরিবের রক্ত শুষছে। (৮৯)

দলিত মানুষের মাথা তুলে দাঁড়াবার জয়গান শোনা গেছে তাঁর শনিবারের ছড়া-সাড়ে ঊননব্বুইতে যার সাথে জর্জ ফ্লয়েডের কালো মানুষদের লাঞ্ছনার ইতিহাস ব্যক্ত। (P-৯৮)

(৯১) সেই সব দাঙ্গাবাজদের তীব্র ধীক্কার দিয়েছেন যে ঘাতক বিধর্মী ভ্রূণ গেঁথে নিয়েছে ত্রিশুলে এই স্ব-পৈশাচিক বর্বর উল্লাসের অসভ্যতা ভাষায় ব্যক্ত করতে কবি অপরাগ।

বর্তমান সমাজ অবস্থার প্রেক্ষাপটে কবি ঘোষ রায় (৭৭) বিগত কবি সুকান্তের মতোই এদেশের বুকে আঠারো নেমে আসার প্রার্থনা করেছেন— "পলাশ ফুটেছে তবু বসন্ত হারিয়েছে পথ/আবার আঠারো এসে মুঠি তুলে নেবে কি শপথ?"

তবে পরিশেষে বলা যায় সংকলন গ্রন্থে ছড়াগুলির মধ্যে বড়ো হয়ে উঠেছে : হারমোনি (harmony)।

সংকলনের কথা মুখে ইমানুল হকের কথায় বলা যায়—"সময়কে শাসন করতে উদ্যত তাঁর লেখনী। ভারতের মর্মবাণী সংহতি, সম্প্রতি ও সহিষ্ণুতা। মিশ্র সংস্কৃতি তাঁর চলার পাথেয়। আমাদের সময়কে ব্যাখ্যা করতে প্রবীর ঘোষ রায়ের কলম উদ্যত তীক্ষ্ণতরবারি। ছন্দে ধ্বনিমাধূর্যে স্বর ও সুর যোজনায় ছড়াগুলি কালাতীতের মানোত্তীর্ণ।

আমাদের শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক হক সাহেব ছড়াকার প্রবীর ঘোষরায় সম্পর্কে বলতে গিয়ে যে খাঁটি কথাগুলি বলেছেন তা আমার মনে হয়েছে এ যেন আমার নিজেরই কথা, এই বৃত্তের পরিমণ্ডলে বাইরে বেড়িয়ে আমি অন্যভাবে বা ঘুরপথে কী-ই-বা বলতে পারি। তবু কবি ছড়াকার অধ্যাপক ঘোষ রায় বলেছেন, ছড়ার মাধ্যমেই যদি উত্তর দিই তিনি তাহলে খুবই খুশি হবেন : তাই আমার লেখনীর নবতম সংযোজন—

সম্প্রীতি

শর্মিষ্ঠা সিন্‌হা

কেন আজ মিছে হানাহানি কর
কেন গো রক্তক্ষয়
প্রেম প্রীতি আর ভালোবাসা দিয়ে
করে গো বিশ্বজয়
হিংসা নয়, বিদ্বেষ নয়, নয় ধর্মীয় যুদ্ধ
নীল আকাশের তলে এসো
প্রীতি অগ্নিতে হই শুদ্ধ
চেয়ে দেখো ওই অসীমশূন্যে
পারাবত পিকাসোর
শ্বেত ডানা মেলে উড়ে যায়
নিয়ে শান্তির বাণীডোর
নবীনতর সভ্যতা আনো গড় প্রজন্মদীপ্ত—
এসো, সবাইকে ভালোবাসো
হই সাম্যে মৈত্রে তৃপ্ত।

কবি মন স্বতঃই প্রেমিক। বাধা বিপত্তি ঝর পেরিয়ে শ্বাশত প্রেমেই আমি বিশ্বাসী। তাই কবি প্রবীর ঘোষ রায়ের প্রেমের ছড়ার উত্তরে রইল—

।। **নির্জনতার সঙ্গসুখ** ।।

শর্মিষ্ঠা সিন্‌হা

ধূপ ছায়া পাহাড়ের নিসর্গ নির্জনতা
কত কথা বলে,
এক চিলতে রোদ, আঁকা বাঁকা পথ...
তুলো তুলো মেঘ
কত কি ছবি আঁকে।
দর্পিত নীল ক্রোকাসফুল,
হাওয়ায় মাথা নাড়ে...
এ নদীর কলতান
এ মনে কত গান আনে।
হিজিলের ছপাত ছপাত স্রোতে ভেসে যায়,
তোমার অনুপস্থিতিতে তোমার সাথে
কত কি যে কথা হয়...
যা তোমার উপস্থিতিতে সম্ভব নয়।
এ সময় আমায় কেউ বাঁধা দেয় না,
এ আমার একান্ত নির্জনতা,
এ আমার একান্ত ব্যক্তিগত ভালোবাসা
এ সময়ে মনে কত ফাগুন আসে...
এ নদীর কলতান এ মনে কত গান আনে।

আশা করি কবি প্রবীর ঘোষ রায় তাঁর উত্তর কবিতায় পেয়ে খুশিই হবেন। বিশেষত এই কথাগুলি আমরাই নিজের এবং কবি ঘোষ রায়কে মূল্যায়ণ করতে গিয়ে অধ্যাপক ইমানুল হকের কাছ থেকে এই কবিতার বর্ণ শব্দ, ভাব ধার নিইনি এখানেই আমার স্বাতন্ত্র্য ও মৌলিকতা বলেই ধরে নেব। এখানেই আমার নৈতিক জয়। কী বলুন কবি ও ছড়াকার প্রবীর ঘোষ রায় মহাশয়? ছড়ায় ছড়ায়তো পাঠকে প্রশ্ন করে গেছেন। কী হবে ঘুরে গেল সে প্রশ্ন আপনার দিকে গেলে?

ছড়াকার আশা রেখেছেন সকাল উন্মোচনের। কবি প্রত্যয়ী যে— 'ভুল স্বীকারে যান না মান'। পরিস্থিতি বিশেষে আপনি বাঁচলে বাপের নাম-ই হয় এই শেষ কথা বলে টা টা গুড বাই জানিয়ে শনিবারের ছড়ার আগাম প্রকাশিত হবার সম্ভাবনার বার্তা দিয়েছেন।

হ্যাঁ প্রবীরবাবু,

আপনি বলছিলেন ছড়াতে আপনাকে উত্তর দিলে আপনি বেশি খুশি হবেন। ছড়া পড়ার অভ্যাসবশত খুঁজে পেয়েছি আপনাকে জবাব দেওয়ার একটা উপযুক্ত ছড়া! থুরি শুধু আপনি বলছি কেন সমসাময়িক ভারতবর্ষের শাসকের জাতীয় ফুলের অবমাননার উপর আলোকপাত। আতস কাঁচটি বেশ খাসা!! ছদ্মনামে ছড়াকার পি হাঁড়ি পটার, ছড়ার বই—"ছাল ছাড়ানো ছড়া"—এই সংকলনে অন্তর্ভুক্ত"সাম্প্রদায়ী" (পৃ. ১৭) ছড়াটি সত্যই যথোপযুক্ত তীক্ষ্ণ শাণিত ছুরির ফলা—

সাম্প্রদায়ী

হায় ছিঃ ছিঃ
করলি একি
পদ্মফুলের জাত নিয়ে,
হরলি প্রাণ
ফুলের ঘ্রাণ
সম্প্রদায়ী গন্ধ দিয়ে।
ভারত কুল
জাতীয় ফুল
পদ্মে দিল অশেষ মনে,
আজকে তাই
অসম্প্রদায়
তোকে ছুঁড়ে দিয়েটান।।
দুর্গা দেবী
ভেবে সবি
ঠিক করেছে তার চরণে
চিরকালের
শতদলের
করবে ত্যাগ মনে প্রাণে।।
আজ পদ্ম
আচ্ছা জব্দ
সদ্য ভজে সম্প্রদায়
পুরোহিত
ভেবেহিত
চায়না দিতে দেবীর পায়।।
হায় ছিঃ ছিঃ

করলো একি
পদ্মফুলের জাত খেয়ে,
ছিলো নির্মল
হলো সিম্বল
দলের ধ্বজার নাম লিখিয়ে।।
দুর্গা দেবী
জেনে সবি—
পদ্মে হটায় জাতির ঘ্রাণে—
এমন ভুল
পদ্ম ফুল
করলো কেনো জেনে শুনে?
জাতীয় মানে
স্বসম্মানে
রাখতো যারে মাথায় তুলে,
সাম্প্রদায়ী
গন্ধে মাতি
কুল হারালো পদ্মফুলে।
এবার তাই।
অসম্প্রদায়
জোট বেঁধেছে হাতে-হাত
ধর্ম্ম যাক
কাটুক নাক
পদ্মফুলের— মারবেই জাত।

ঔপনিবেশিক নবচেতনার ভাষ্যে রামকাহিনির বিবর্তন: প্রসঙ্গ মেঘনাদবধ কাব্য

সুব্রত মণ্ডল
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
নবগ্রাম হীরালাল পাল কলেজ

ইংরেজ শাসিত ভারতবর্ষে ১৮৬১ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ৬৯ খ্রিষ্টাব্দ এই আট বছরে ছয়টি সংস্করণ প্রকাশিত হওয়ায় গ্রন্থটির অসীম জনপ্রিয়তা স্বতঃপ্রমাণিত। যদিও এই কালপর্বে অন্তত চার বছর কবির অনুপস্থিতির কারণে গ্রন্থখানি অমুদ্রিত ছিল। গ্রন্থটি নিঃসংশয়ে 'মেঘনাদবধ কাব্য' ।আজ সার্ধশতবর্ষ অতিক্রান্ত করেও গ্রন্থটি পাঠকের কাছে বাংলা কাব্যের আধুনিক বিশ্বে প্রবেশের দ্বার উন্মুক্ত করে দেয়। এই কাব্যটি একটি ভাষা সাহিত্যের ধারামুখ পরিবর্তনে যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে তা বোধ হয় বিশ্বসাহিত্যে বিরল। আর সেই জন্যই সমসময়ের আর এক মহৎ স্রষ্টা বঙ্কিমচন্দ্র কবি মধুসূদনের অসামান্য প্রতিভার স্বরূপটি যথাযথভাবে অনুধাবন করতে পেরেছিলেন। মধুসূদনের মৃত্যুর পর তিনি লেখেন—"এই প্রাচীন দেশে দুই সহস্র বৎসর মধ্যে কবি একা জয়দেব গোস্বামী। শ্রীহর্ষের কথায় বিবাদের স্থল হইলেও শ্রীহর্ষ বাঙালী নহেন। জয়দেব গোস্বামীর পর শ্রী মধুসূদন।"[১]এরূপ স্বীকৃতি বঙ্গসাহিত্যে অন্য কোনো কবির ক্ষেত্রে বিরল।

১৮৪৭ খ্রি. ২৪ ডিসেম্বর বিশপস্ কলেজের ছাত্র মধুসূদন মাদ্রাজ বন্দরে এসে উপনীত হলেন ভাগ্যান্বেষণে। এর আগে অবশ্য হিন্দু কলেজে পড়বার সময় ১৮৪৩ খ্রি. ৯ ফেব্রুয়ারি তিনি খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করলেন। হিন্দু সমাজ, হিন্দু কলেজ তাঁকে বর্জন করল; পিতা রাজনারায়ণও পুত্রের আচরণ 'ব্যায়াদপি' মনে করে ত্যাজ্যপুত্র করলেন। কিন্তু যে আশায় তিনি খ্রিস্ট ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন শেষপর্যন্ত সেই আশা পূর্ণ হল না। তার বিলাত যাওয়া হল না। মাদ্রাজে তার জীবনের নতুন অধ্যায় শুরু হল। দেশীয় খ্রিষ্টান ও অ্যাংলো ইন্ডিয়ান সম্প্রদায়ের সহযোগিতায় তিনি 'মাদ্রাজ মেল অরফ্যান অ্যাসাইলাম' নামক বিদ্যালয়ে ইংরেজি শিক্ষক হিসেবে নিযুক্ত হন। এরপর ১৮৫২ খ্রি. তিনি মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয় বিভাগের দ্বিতীয় শিক্ষকের পদে বৃত হন। শিক্ষকতার পাশাপাশি মধুসূদন সাংবাদিকতায় যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। 'Athenaeum', Spectatore, 'Madras circulator and General Chronicle', 'Hindu Chronicle',প্রভৃতি বিশিষ্ট পত্রিকায় তিনি সম্পাদকীয় ও নানা ধরনের প্রবন্ধ লিখতেন। Timothy Pen Poem ছদ্মনামে তিনি কয়েকটি গীতিকবিতা সনেট ও খণ্ডকাব্য রচনা করেন। তাঁর 'The Captive Ladie' এবং 'Vision of the Past' দীর্ঘ খণ্ড কাব্যদ্বয় এই সময়ে প্রকাশিত এবং Rizia : 'Empress of India' নামে

একটি পঞ্চাংক নাটকও রচনা করেন। কিন্তু ‘নেটিভ’এর রচনা হিসেবে এই গ্রন্থগুলি সাহিত্যরসিক ইংরেজের কাছে স্বীকৃতি পায়নি। বন্ধু গৌরদাস বসাকের মাধ্যমে মধুসূদন তার প্রথম কাব্য 'The Captive Ladie' বেথুন সাহেবকে পাঠিয়েছিলেন। বেথুন সাহেব এই কাব্যটি পাঠ করে কবিকে মাতৃভাষায় সাহিত্যচর্চার পরামর্শ দেন। ফলে মিলটনের মতো মহাকবি হওয়ার স্বপ্ন তাঁকে পরিত্যাগ করতে হয়।

যে মানুষ দিবাস্বপ্ন দেখেন না তিনি জানেন কীভাবে স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দিতে হয়। ফলে অলীক আশা আর আশাভঙ্গের মনোবেদনা তাঁর চতুর্দ্দশপদী কবিতায় স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তাঁর কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে--

> “পর-ধন-লোভে মত্ত, করিনু ভ্রমণ
> পরদেশে, ভিক্ষাবৃত্তি কুক্ষণে আচরি।
> কাটাইনু বহুদিন সুখ পরিহরি!”[২]

আর তাই বঙ্গভূমির পদে, বঙ্গভাষার ক্রোড়ে নিজেকে নিবেদন করলেন।

> “রেখো, মা, দাসেরে মনে, এ মিনতি করি পদে।
> সাধিতে মনের সাদ
> ঘটে যদি পরমাদ,
> মধুহীন করো না গো তব মনঃকোকনদে।”[৩]

বঙ্গভূমি যেমন তাঁকে মধুহীন করেনি, তেমনি বঙ্গসাহিত্যের ‘মনঃকোকনদ’ থেকে মধু আহরণের জন্য তিনি তাঁর মনকে প্রস্তুত করেছিলেন। গভীর আগ্রহে বাংলা কাব্যসাহিত্য নিয়ে পড়াশুনা করেছিলেন। শুধু বাংলা কাব্য-সাহিত্য নয়, ল্যাটিন, গ্রীক, সংস্কৃত, হিব্রু, তেলেগু প্রভৃতি ভাষাও শিক্ষা করেছিলেন। এবিষয়ে গৌর দাসকে একটি পত্রে লিখেছিলেন—"Perhaps you do not know that I devote several hours daily to Tamil. My life is more busy than that of school boy. Here is my routine : 6 to 8 Hebrew, 8 to 12 Greek, 2 to 5 Telegu and Sanskrit, 5 to 7 Latin, 7 to 10 English. Am I not preparing for the great object of embellishing the tongue of my father."[৪]বুঝতে অসুবিধা হয়না ভারত ঐতিহ্যকে মধুসূদন নতুনভাবে বোঝবার চেষ্টা করছেন। ১৮৫৬ খ্রি. মাদ্রাজ ত্যাগ করে কবি কলকাতায় স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করলেন। প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের ভিত্তির উপরেই গড়ে তুলতে প্রয়াসী হলেন নব্যবাংলা সাহিত্যের ইমারত।

মধুসূদনের আবির্ভাব এবং আত্মবিকাশ যে পর্বে তা মূলত ইউরোপীয় জ্ঞান বিজ্ঞানেরধারা সিঞ্চিত ঔপনিবেশিক কাল। বাঙালি জাতির মৃতপ্রায় জীবনে চেতনার অমৃতধারা সাহিত্য-শিক্ষা, ধর্ম-কর্ম, চিন্তাশীলতার ক্ষেত্রে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনেছিল। ইংরেজি শিক্ষিত বঙ্গ সন্তানরা এই চেতনায় শুধু উদ্বোধিত হয়েছিল তা নয়, এক আত্মজিজ্ঞাসার পাশাপাশি যুক্তিবোধ ও বিচার বিবেচনায় এনেছিল দৃঢ়তা। আর

তাই বীতস্বপ্ন মধুসূদন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ঐতিহ্য মথিত করে আত্মান্বেষণের পথ দেখালেন। মধুসূদনের কবি মানসে সমন্বিত হয়েছে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের নানা ধরণের কাব্যের ভাবকল্পনা ও বৈচিত্রমণ্ডিত উপাদান। একদিকে তিনি বাল্মীকি, কালিদাস, কৃত্তিবাস, ভারতচন্দ্র প্রমুখের রচনা থেকে, অন্যদিকে দান্তে, হোমার, মিল্টন, ট্যাসো প্রমুখ পাশ্চাত্য কবিদের কাছ থেকে তাঁর কবি মানসের উপযোগী বিভিন্ন কাব্যোপকরণ গ্রহণ করেছেন। তাই বন্ধুকে পত্রে তিনি জানিয়েছেন—"I must tell you my dear fellow that though as a jolly christain youth I don't care a pin's head for Hinduism, I love the grand Mythology of our Ancestors."[৫] বুঝতে বাকি থাকে না শৈশবে মাতা জাহ্নবীর প্রভাব ভারতীয় পুরাণাদি থেকে মধুসূদনের যে ভাবমানস গড়ে উঠেছিল তার ধারা আমৃত্যু বহমান ছিল। ফলে মধুসূদনের ঔপনিবেশিক দৃষ্টিতে রামকাহিনি নবরামকাহিনিতে রূপ পেল।

মহাকাব্য রচনায় মধুসূদনের আদর্শ ছিল হোমারের ইলিয়াড এবং মিল্টনের প্যারাডাইস লস্ট। রাজনারায়ণ বসুকে লেখা একটি চিঠিতে কবি জানিয়েছেন—"By the by, if the father of our poetry had given Ram human companions I could have made a regular Iliad of the death of Meghnad."[৬] 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র বিষয়বস্তু হিসাবে বাল্মীকি রামায়ণের কাহিনি গ্রহণ করলেও সেই কাহিনি পরিমার্জন ও পরিবর্তনে কবির খুব একটা দ্বিধা ছিল না। কাহিনিটিকে তিনি একটি যুগোপযোগী রূপ দিতে প্রয়াসী ছিলেন। তাই ১৮৬০ খ্রি. ২৪ এপ্রিল বন্ধু রাজনারায়ণ বসুকে তিনি পত্রেলেখেন—"I am going to celebrate the death of my favouriteIndrajit. Do not be frightened my dear fellow, I don't trouble my readers with virras (বীররস)....I enclose the opening invocation of my 'মেঘনাদ'--"[৭]নব উন্মেষশালিনী মন নিয়ে শিল্প সচেতন মধুসূদন পৃথিবীর নানা কবির 'চিত্ত ফুল বন মধু' আহরণ করে যে 'মধুচক্র' রচনা করলেন। সমকালী বহু সমালোচক-কবি সাহিত্যিক কর্তৃক সেই কাব্য উচ্চ প্রশংসিত হলেও বীরুপ সমালোচনাও কম হয়নি। কেননা, জাতীয় আদর্শ, ঐতিহ্যের ধারক রাম মধুসূদনের কাব্যে 'ভিলেনে' পরিণত হয়েছে। বাল্মীকির রামচন্দ্র আর্যের প্রতিভূ, বীর এবং শালপ্রাংশু। অবতার না হলেও অলৌকিক প্রতিভাসম্পন্ন। আর সেখানে রাবণ রাক্ষস বংশজাত অধর্মাচারী। বাল্মীকির পরবর্তী ভারতীয় কবিগণ যাঁরা রামায়ণ অবলম্বনে কাব্য রচনা করেছেন তাঁরা প্রায় প্রত্যেকেই বাল্মীকি প্রতিষ্ঠিত এই সিদ্ধরসের ব্যত্যয় ঘটাননি। একমাত্র দক্ষিণ ভারতীয় কবিকম্বন রাবণকে তাঁর কাব্যে নায়কহিসেবে উল্লেখ করেন। এই রাম কৃত্তিবাসের কাব্যে হয়ে উঠেছেন 'নরচন্দ্রমা', ভক্তবৎসল, পতিতপাবন, বাঙালির আত্মার আত্মজন-পুত্র বা ভ্রাতৃপ্রতিম। সেই রামকে কিনা মধুসূদন বলতে দ্বিধা করলেন না—"I despise Ram and his rabble; but the idea of Ravana elevates and kindless my imagination. He was a

grand fellow."[৮]এমনকী ইন্দ্রজিৎ কবির 'favourite' হয়ে উঠেছেন। আর ধার্মিক শ্রেষ্ঠ বিভীষণ মধুসূদনের লেখনীতে দেশদ্রোহীতে পরিণত হয়েছেন।

মধুসূদনের হাতে রামকাহিনির নব রূপায়ণ কেবলমাত্র শিল্প সৃষ্টির আহ্বানে এমনটা বলা যায় না। পাশাপাশি আত্মগ্লানি ও জাতীয়তাবাদের চেতনা থেকে এই সৃষ্টি। ১৮৫৭ খ্রিষ্টাব্দে পলাশীর প্রান্তরে ভারতের স্বাধীন অরুণ যে বিসর্জিত হয়েছিল এবং ক্লীবতা ভারতীয় চরিত্রকে ক্রমশ গ্রাস করেছিল তা মধুসূদন উপলব্ধি করেন। ১৮৫৭ খ্রিষ্টাব্দে সিপাহি বিদ্রোহে জাতীয়তা বোধের ও স্বদেশ প্রেমের বোধ জাগ্রত হয়েছিল বটে কিন্তু ইংরেজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের পক্ষে অস্ত্র ধারণ করতে দ্বিধাবোধ করেছিল বাঙালি। এই ঘটনার নেপথ্য কারণ প্রথমতঃ জাতীয় জীবনে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার মনোভাব তখনও গড়ে ওঠেনি। আর দ্বিতীয়তঃ নেতৃত্বদানে প্রকৃত বীর চরিত্র সম্পর্কে সাধারণ মানসে উৎসাহের অভাব। ফলে মেঘনাদবধ কাব্যে রাবণ হয়ে উঠেছেন স্বদেশপ্রেমিক, স্বাজাত্ববোধে ঋদ্ধ। আর মেঘনাদ প্রকৃত বীর, যে দেশসেবার জন্য, স্বদেশকে রামরূপী বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে রক্ষা করতে স্ত্রী-সঙ্গ সুখ বিসর্জন দিয়ে আত্মবলিদানে দ্বিধা করেনি। মধুসূদন রামায়ণের ঘটনাকে পুনরাবৃত্তি করতে চাননি, মূল ঘটনা ইন্দ্রজিৎ নিধন। তাই বাল্মীকির রামায়ণের দীর্ঘ কাহিনি-কালকে তিনদিন-দুইরাত্রির কালসীমায় সংঘটিত করলেন, যা থেকে গড়ে উঠল বিপরীত এক রাম কাহিনি।

'মেঘনাদবধ কাব্য' এর বিষয় মেঘনাদের মৃত্যু। এই ঘটনাটি অন্ত্যেষ্টি পর্যন্ত প্রসারিত। মেঘনাদের সৈনাপত্যে বরণ, যুদ্ধ, মৃত্যু ও অন্ত্যেষ্টি এই চারটি বিষয় সূত্রে গ্রথিত। কাব্যটির সূচনা হচ্ছে বীরবাহুর মৃত্যু সংবাদ দিয়ে।

> "সম্মুখ সময়ের পড়ি বীর চূড়ামণি
> বীরবাহু, চলি যবে গেলা যমপুরে
> অকালে,"[৯]

ঊনবিংশ শতাব্দীতে সম্মুখ সমরে আত্মবলিদান তো প্রকৃত বীরের মর্যাদা বহন করে। এই মর্মান্তিক সংবাদ শুনে রাবণ নিজেই যুদ্ধযাত্রার উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। তাই এই শোকাবহের মধ্যে কবিকে বলতে শুনি—

> "গাইব, মা, বীররসে ভাসি
> মহাগীত;"[১০]

মেঘনাদ প্রমোদ উদ্যানে বীরবাহুর মৃত্যু সংবাদ শুনে লঙ্কায় ফিরে আসেন এবং রাবণের কাছে যুদ্ধ পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। বাল্মীকি রামায়ণে ঘটনা কিন্তু এভাবে ঘটেনি। সেখানে বীরবাহুর কোনো উল্লেখ নেই। মকরাক্ষের মৃত্যুর পর মেঘনাদ সৈনাপত্যে বৃত হন। ফলে রাম নয়, মেঘনাদ ও রাবণ হয়ে উঠলেন এই কাব্যের ভরকেন্দ্র।

রাবণের পক্ষ থেকে ঘটনাটি দেশের স্বাধীনতা রক্ষার সংগ্রাম রূপে গৃহীত হয়েছে। এর ফলে যুদ্ধের মূল কারণ সীতা হরণকারী রাবণের নৈতিক অপরাধটি অনেকটা উপেক্ষিত হয়েছে। পরিবর্তে দেশপ্রেমের কথা সমগ্র কাব্যে স্পষ্ট রূপে প্রকাশ পেয়েছে। বীরবাহু হত হয়েছে তার মৃতদেহ দেখে শোকার্ত রাবণের উক্তিটিতে যে মনোভাবের প্রকাশ পেয়েছে তাতে বীরবাহুকে যথার্থ বীরের মর্যাদা দিয়েছেন তিনি।

"..রিপুদল বলে দলিয়া সমরে
জন্মভূমি রক্ষা হেতু কে ডরে মরিতে?
যে ডরে, ভীরু সে মূঢ়, শতাধিক তারে।"[১১]

জন্মভূমি রক্ষার জন্য শত্রুদলকে যুদ্ধে পরাজিত করে মৃত্যুবরণ প্রকৃত দেশপ্রেমিকের আদর্শ বলে মধুসূদন প্রকাশ করেছেন। রাবণ নিজেও যেমন পুত্রের বীরত্বপূর্ণ মৃত্যুবরণকে মেনে নিয়ে সান্ত্বনা পেতে চেয়েছেন, তেমনি বীরবাহু-জননী চিত্রাঙ্গদার হৃদয়ে পুত্রের বীরমূর্তি অঙ্কিত করে প্রবোধ দিয়েছেন।

"দেশ বৈরী নাশি রণে পুত্রবর তব
গেছে চলি স্বর্গপুরে, বীরমাতা তুমি
বীর কর্মে হত পুত্র হেতু কি উচিত
ক্রন্দন?"[১২]

এরপর চিত্রাঙ্গদা যুদ্ধের কারণ সম্পর্কে তীক্ষ্ণ প্রশ্ন তুললেও দেশপ্রেমের দিকটি আলোকিত করেছেন রাবণ। চিত্রাঙ্গদাও রাবণের সঙ্গে সহমত হয়ে বীর সন্তান জন্ম দিতে পারায় নিজেকে সৌভাগ্যবতী মনে করেছেন--

"দেশবৈরী নাশে যে সমরে,
শুভক্ষণে জন্ম তার; ধন্য বলে মানি
হেন বীরপ্রসূনের প্রসূ ভাগ্যবতী।"[১৩]

কিন্তু নিজেকে সৌভাগ্যবতী ভেবে আত্মতুষ্ট হননি বরং রাবণের কাছে প্রশ্ন রেখেছেন যে লঙ্কা ও অযোধ্যাপুরীর মধ্যে ব্যবধান কত তা ভেবে দেখার জন্য। অকারণে নিশ্চয়ইরামচন্দ্র লঙ্কা আক্রমণ করেনি। এখানে মধুসূদন চিত্রাঙ্গদার মধ্যে উনিশ শতকের আধুনিক নারীর প্রতিবাদী রূপ অঙ্কন করেছেন।

কেবলমাত্র চিত্রাঙ্গদা নয়, প্রমীলাও যেন আরও একধাপ এগিয়ে বীরাঙ্গনা রূপ ধারণ করেছেন। পরোক্ষভাবে হলেও তৃতীয় সর্গে প্রমীলার দম্ভোক্তির মাধ্যমে নিজের কুল, ঐতিহ্যের সম্বন্ধে যে পরিচয় দিয়েছেন তা মূলত জাতীয় মর্যাদার ইঙ্গিতবহ।

"দানবনন্দিনী আমি; রক্ষ-কুল-বধু;
বরাণ শ্বশুর মম, মেঘনাদ স্বামী
আমি কি ডরাই, সখি, ভিখারী রাঘবে?"[১৪]

এই মনোভাবের সর্বাপেক্ষা তীক্ষ্ণ প্রকাশ ঘটেছে ষষ্ঠ সর্গে ইন্দ্রজিৎ-বিভীষণের কথোপকথনের মধ্য দিয়ে।

"নিজ গৃহ পথ, তাত, দেখাও তস্করে?
চণ্ডালে বসাও আনি রাজার আলয়ে?"[১৫]

বিভীষণ এখানে ভারতীয়, ইংরেজ অনুচর, উনবিংশ শতাব্দীর ইংরেজ তোষামোদকারীদের প্রতিভূ। বিভীষণকে মেঘনাদ জাতীয়তাবাদে উদবোধিত করতে উচ্চারণ করেন—

"কোন্ ধর্ম্মমতে, কহ দাসে শুনি
জ্ঞাতিত্ব, ভ্রাতৃত্ব, জাতি এ সকলে দিলা
জলাঞ্জলি ? শাস্ত্রে বলে, গুণবান যদি
পরজন, গুণহীন স্বজন, তথাপি
নিগুণ স্বজন শ্রেয়; পরঃ পরঃ সদা।"[১৬]

এমনকী স্বজাতিকে 'বীর কেশরি' বলে আখ্যাত করে রামচন্দ্ররূপী বহিঃশত্রু ইংরেজকে শৃগাল হিসাবে চিহ্নিত করেছেন।

বহুদিন পরাধীনতার গ্লানি ভারতবাসীর মন থেকে স্বাধীনতা লাভের আকাঙ্ক্ষাকে ম্লান করে দিয়েছিল। তাই বঙ্কিমচন্দ্র যথার্থই বলেছেন—"পরতন্ত্রতা অপেক্ষা স্বতন্ত্রতা ভাল, এরূপ একটা তাহাদিগের বোধ থাকিলে থাকিতে পারে, কিন্তু সেটি বোধ মাত্র—সে জ্ঞান আকাঙ্ক্ষায় পরিণত নহে।"[১৭] কিন্তু ঔপনিবেশিক শিক্ষায় শিক্ষিত মধুসূদনের মন ও মননে জাতীয়তাবাদ প্রসূত স্বাধীনতা লাভের আকাঙ্ক্ষা যে প্রবল থেকে প্রবলতর হয়ে উঠেছিল তাঁর Grand fellow রাবণ কিংবা প্রিয় ইন্দ্রজিতের মধ্য দিয়ে প্রতিভাত হয়েছে।

তথ্যপঞ্জি:

১. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রচনা সংগ্রহ প্রবন্ধ খণ্ড প্রথম অংশ, পৃ-২৯৯, নিরক্ষরতা দূরীকরণ সমিতি, ১৯৭৩

২. মধুসূদন দত্ত, বঙ্গভাষা, চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী-৩, মধুসূদন রচনাবলী, পৃ-১৫৯, সাহিত্য সংসদ, ১৯৯৩

৩. মধুসূদন দত্ত, বঙ্গভূমির প্রতি, মধুসূদন রচনাবলী, পৃ-১৮৬, ঐ

৪. ঐ, পৃ-৫৩৮

৫. ঐ, পৃ-৫৪২

৬. ঐ, পৃ-৫৪৪

৭. ঐ, পৃ-৫৪৬

৮. ঐ,পৃ-৫৪৬

৯. ঐ, পৃ-৩৫

১০. ঐ, পৃ-৩৫
১১. ঐ,পৃ-৩৯
১২. ঐ,পৃ-৪০
১৩. ঐ,পৃ-৪০
১৪. ঐ,পৃ-৫৬
১৫. ঐ,পৃ-৮৭
১৬. ঐ, পৃ-৮৮
১৭. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রচনাসংগ্রহ, প্রবন্ধখণ্ড, প্রথম অংশ, পৃ-২৯৮, নিরক্ষরতা দূরীকরণ সমিতি, ১৯৭৩।

রূপক সংকেতের অন্তরালে 'চাঁদ বণিকের পালা'

মিঠুন রায়
গবেষক, কাজী নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়

পর্যবেক্ষণের আতস কাঁচে যদি শম্ভু মিত্রের নাট্যজীবনকে দেখা যায়, তবে একথা বোধ হয় দ্বিধাহীনভাবেই বলা যায় যে, শম্ভু মিত্র একজন সমাজ সচেতন লেখক। তাঁর কলমে বারবার উঠে এসেছে স্থবির-গলিত সমাজের চিত্র, মানুষের মানবিক মূল্যবোধহীন জীবন চিত্র, রাজনৈতিক লোভ ও হিংসার অন্ধকারে আচ্ছন্ন সাধারণ মানুষের দুর্দশার চিত্র। যে সময়ে দাঁড়িয়ে নাট্যকার নাটকটি রচনা করেছেন সেই সময়ের দিকে ফিরে তাকালে বুঝতে অসুবিধা হয় না মিথ নির্ভর কাহিনিকে ভেঙ্গেচুরে শম্ভু মিত্র নির্মাণ করেছেন এক আশ্চর্য বির্নিমিত ভাববিশ্ব, আমাদের চির পরিচিত লোক-পুরাণের কাহিনি হয়ে উঠেছে তৎকালীন জীবন যন্ত্রণার কাব্য। এক একটি ঘটনা এখানে এক একটি রূপক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে, এক একটি চরিত্র হয়ে উঠেছে এক একটি প্রতীক এবং উক্তি-প্রতুক্তিগুলি আসলে প্রকাশ করেছে স্বাধীনতা পরবর্তী ভারতবর্ষের ভয়াবহ রাজনৈতিক ও সামাজিক অরাজকতার চিত্র।

'চাঁদ বণিকের পালা' নাটকটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দে। কিন্তু 'বহুরূপী' পত্রিকায় 'বটুক' ছদ্মনামে লিখিত নাটকটি ১৯৬৫ থেকে ১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। নাটকটির রূপক ও সংকেত নিয়ে আলোচনা করার জন্য আমাদের তৎকালীন সময় ও সংকটগুলির প্রতি দৃষ্টিপাত করা একান্ত প্রয়োজন। তাই সেই সময়ের একটি সংক্ষিপ্ত চিত্র তুলে ধরা হলো -

- স্বাধীনতা লাভের মাধ্যমে মানুষ সুস্থ ও স্বাভাবিক দেশ গড়ার যে স্বপ্ন দেখেছিল তা স্বাধীনতার প্রায় তিন - তিনটি দশক অতিক্রান্ত হওয়ার পরেও বাস্তবায়িত হয়নি। স্বাধীনতার পরবর্তীতে দেখা গেল উদ্বাস্তু সমস্যা, বেকারত্ব, খাদ্যাভাব, ভারত চীন যুদ্ধ, ভারত পাকিস্তান যুদ্ধ, নকশাল আন্দোলন, কালোবাজারি, হত্যা, অশিক্ষার নানান সমস্যা। সুতরাং স্বাধীনতা পূর্ববর্তী একরকম অন্ধকার থেকে স্বাধীনতা পরবর্তী আরেক অন্ধকারে দেশ আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে।

এই সময় রাজনৈতিক ও অরাজনৈতিক সমস্যাগুলি আরও জেঁকে বসে, ব্যক্তিসংকট ও সমাজ-সভ্যতার ক্রমাবনতি ঘটতে থাকে। ফলস্বরূপ নৈতিক অশুচিতা, সামাজিক ব্যভিচার ও রাজনৈতিক অরাজকতার যে চিত্র ফুটে উঠেছিল তারই প্রতিফলন যেন দেখা যায় আলোচ্য নাটকে। মধ্যযুগের দৈবী ভাবনার চিহ্নটুকু পর্যন্ত এই নাটকে অনুভব করা যায় না। 'চম্পকনগরী' যেন হয়ে ওঠে স্বাধীনতা পরবর্তী ভারতবর্ষেরই প্রতিমূর্তি।

এই 'চম্পক নগরী'কে কেন্দ্র করেই নাট্যকার বিষয়গত দিক থেকে, ভাবগত দিক থেকে এবং চরিত্রগত দিক থেকে নাটকটিকে রূপক-সংকেত ও প্রতীকে ভরিয়ে তুলেছেন।

• বিষয় নির্ভর রূপক

'চাঁদ বণিকের পালা' নাটকের বিষয় মধ্যযুগে রচিত 'মনসামঙ্গল' কাব্যের চির পরিচিত কাহিনি। কিন্তু বুঝতে অসুবিধা হয় না মনসামঙ্গলের মধ্যযুগীয় দেবত্ববাদের প্রভাব কাটিয়ে আলোচ্য নাটক হয়ে উঠেছে তৎকালীন সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনের ভাষ্য। শম্ভু মিত্রের কন্যা শাঁওলী মিত্র নাটকের বিষয় সম্পর্কে তিনটি শব্দের উপর জোর দিয়েছেন - 'উদ্দেশ্য', 'বীর্য'/‘বীরত্ব’, এবং 'পাড়ি'। এই তিনটি শব্দকে বিশ্লেষণ করলেই আমরা বুঝতে পারি নাটকের বিষয় কিভাবে রূপকে পরিণত হয়েছে।

'উদ্দেশ্য' :

দেশবদল ও সমাজবদলের মাধ্যমে নতুন করে স্বপ্ন দেখার ও দেখাবার নাটক হয়ে উঠেছে 'চাঁদ বণিকের পালা'। চিরকাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা লাভের পর ভারতবাসী ভেবেছিল এইবার আমরা আমাদের দেশ খুঁজে পেয়েছি, যে দেশ এতদিন আমাদের ছিল না। সুজলা-সুফলা-শস্যশ্যামলা এই দেশ বোধ হয় আমাদের আশ্রয় দেবে, নিরাপত্তা দেবে, শিক্ষা দেবে, কর্মসংস্থান দেবে, সর্বোপরি মানুষের মতো বাঁচবার উপযুক্ত সন্মান দেবে। কিন্তু স্বাধীনতা লাভের তিনটি দশক অতিক্রম করার পর আসতে আসতে বুঝতে পারা যায়, যে দেশ মানুষ চেয়েছিল এ দেশ সেই স্বপ্নের দেশ নয়। এই দেশ আমাদের দেয় বেকারত্ব, খাদ্যাভাব, অশিক্ষা, অবসাদ। দেখা যায় কিছু রাজনৈতিক দালাল ক্ষমতার লোভ ও লালসায় মত্ত হয়ে কেবল এক নোংরা রাজনৈতিক খেলা খেলে চলেছে। এই রকম এক নিষ্ঠুর ও যান্ত্রিক রাষ্ট্র মানুষ চাইনি। 'চাঁদ বণিকের পালা' আমাদের সেই চির কাঙ্ক্ষিত স্বপ্নের দেশ খোঁজার নাটক হয়ে ওঠে, যেখানে মানুষ আবার নতুন করে স্বপ্ন দেখতে পারবে, যেখানে মানুষ তার সম্মান ও আত্মমর্যাদা ফিরে পাবে।

‘বীর্য’/‘বীরত্ব’ :

'বীর্য' বলতে বোঝানো হয়েছে বৈপ্লবিক_শক্তিকে। যে শক্তিকে অবলম্বন করে রাজনৈতিক নৈরাজ্য ও মানবিক বোধহীন অন্তঃসারশূন্য সমাজ তথা দেশ এর পালাবদল ঘটানো সম্ভব হবে। 'বীর্য' হল সেই আত্মশক্তি যা 'পাড়ি' দেওয়ার সাহস ও অনুপ্রেরণা দেয়। শম্ভু মিত্র আসলে চেয়েছেন এমন এক বিপ্লব, যার মাধ্যমে একটি পচা-গলা, অন্তঃসারশূন্য সমাজ তথা দেশ এর বদল ঘটিয়ে একটি সুস্থ ও স্বাভাবিক বাসভূমি নির্মাণ যাবে। আর এই কাজ তখনই করা সম্ভব হবে যখন মানুষ একত্রিতভাবে আত্মশক্তির মাধ্যমে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের নীড় ও নিরাপত্তার জন্য বৈপ্লবিক অভ্যুত্থান ঘটানোর সাহস অর্জন করবে।

'পাড়ি' :

'চাঁদ বণিকের পালা' নাটকের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত 'পাড়ি' একটি গুরুত্বপূর্ণ শব্দ হয়ে উঠেছে। সহজেই অনুমান করা যায় এর রূপকার্থ 'বৈপ্লবিক অভিযান'। চাঁদ বণিকের বারবার 'পাড়ি' দেওয়া আসলে হয়ে উঠেছে দেশ খোঁজার রূপক, এমন একটি দেশ - যে স্বপ্নের দেশ হয়তো আমরা হারিয়ে ফেলেছি কিম্বা এমন একটি দেশ, যে কাঙ্ক্ষিত দেশ হয়তো আমাদের কখনো ছিলই না। বারংবার পাড়ি দিতে দিতে সেই স্বপ্নের দেশ আমাদের খুঁজতে হবে। এই 'পাড়ি' দেওয়াতে ঝুঁকি আছে, জীবনের ঝুঁকি আছে, চিরকালের জন্য হারিয়ে যাওয়ার ঝুঁকি আছে, অর্থহানীর ঝুঁকি আছে, 'পাড়ি' দিয়ে অসমর্থ হয়ে ফিরে এলে সম্মান-হানীর ঝুঁকি আছে। তবু 'পাড়ি' দেওয়া প্রয়োজন, সম্মানের জন্য প্রয়োজন, ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে জবাব দেওয়ার জন্য প্রয়োজন। এই 'পাড়ি' আসলে --

'পাড়ি'

অন্ধকার ------- আলোর দিকে

অবিশ্বাস ------- বিশ্বাসের দিকে

অসম্মান ------- আত্মমর্যাদার দিকে

অসহায়তা ------ আত্মপ্রতিষ্ঠার দিকে

সুতরাং, একথা দ্বিধাহীনভাবেই বলা যায় নাটকের বিষয় প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত একটি বৃহৎ রূপকে পরিণত হয়েছে। 'চম্পকনগরী' ই যে তৎকালীন ভারতবর্ষ, নাটকটি পড়তে পড়তে, প্রতিটি বাক্যে বাক্যে একথা স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হয়ে ওঠে।

• **'ভাব নির্ভর রূপক' :**

'চাঁদ বণিকের পালা' নাটকে নাট্যকারের ভাবনার কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে দুই রকম ভাব - 'আলো' ও 'অন্ধকার'। মূলত আলো-অন্ধকারের এক অনিবার্য সংঘর্ষের মাধ্যমেই নাটকটি এগিয়ে গেছে। স্পষ্টতই বোঝা যায় আলো ও অন্ধকার এই নাটকে বৃহৎ রূপকে পরিণত হয়েছে।

'অন্ধকার':

নাটকে 'অন্ধকার' একাধিক ব্যঞ্জনায় বারবার ব্যবহৃত হয়েছে। চম্পকনগরীর এই অন্ধকারের চিত্রটি কেমন তা নাটকের সংলাপ থেকেই স্পষ্ট হয়ে যায় --

জ্ঞান = 'জ্ঞানের সম্মান নাই'

বিদ্যা = 'বিদ্যার মর্যাদা নাই'

আচরণ = 'সুভদ্র আচরণ নাই'

চিন্তা = 'মাংসসুখ ছাড়া অন্য কোন সুচিন্তা নাই'

সত্য = 'সত্য শুধুই অন্ধকার। মনসার সর্পিল আন্ধার।'

মহৎকার্য = 'ভুল্যে যাও, চন্দ্রধর, মহৎকার্যের কথা ভুল্যে যাও'।

আদর্শ = 'আদর্শের পাছে ছুট্যে কোন লাভ নাই'
সমাজ = 'সমাজটা যেন বিষ্ঠাকুণ্ড বলে মনে হয়'।
মানুষ = 'এই তো মানুষ! কৃমি নয়, কৃমি নয়, কৃমি হতে আরো নীচ জঘন্যজ কীট।'
নেতা = 'দেশটাই কোন নেতা নাই'।
চম্পকনগরী = 'কি নিষ্ঠুর! বীভৎস নগরী'

স্পষ্টতই, একটা 'বিষ্ঠাকুণ্ড' সমাজের মধ্যে দাঁড়িয়ে, যেখানে জ্ঞান-বিদ্যা ও আদর্শের কোন সম্মান ও মর্যাদা নেই, যেখানে মানুষ কৃমি থেকেও জঘন্যজ কীটে পরিণত হয়েছে, যেখানে মাংসসুখ ছাড়া অন্য কোন সুচিন্তা নেই সেই বীভৎস ও নিষ্ঠুর চম্পকনগরীর 'সর্পিল আন্ধার' - এর স্বরূপটি বুঝে নিতে আমাদের এতোটুকু অসুবিধা হয় না। চম্পকনগরী তথা তৎকালীন ভারতবর্ষের এই অন্ধকারকে মূলত তিন ভাগে ভাগ করে নেওয়া যেতে পারে –

'অন্ধকার' - এক. রাজনৈতিক নৈরাজ্য জনিত অন্ধকার।
দুই. ব্যক্তিজীবনের আত্মগ্লানি ও আত্মযন্ত্রণা জনিত অন্ধকার।
তিন. অন্তঃসারশূন্য সমাজ ও মানবিক মূল্যবোধের পতন জনিত অন্ধকার।

'আলো':

আলোচ্য নাটকে 'আলো' হয়ে উঠেছে বিপ্লবের মাধ্যমে অবক্ষয়িত সমাজ ও রাজনৈতিক নৈরাজ্য থেকে মুক্তির রূপক। চাঁদ বণিক কে কেন্দ্র করে নাট্যকার আসলে সমস্ত প্রতিকূলতার ঊর্ধ্বে উঠে স্বপ্ন দেখেছেন ও দেখিয়েছেন। চাঁদকে আমরা বলতে শুনি- **"তবু যদি আমরা সকলে আজ পাড়ি দিতি পারি তাহলে যে, তারই মধ্যে আরো কত পুত্র বেঁচ্যে যাবে। সেই বীজগুলো একদিন গাছ হবে, মহীরুহ হবে, ফল দিবে, ছায়া দিবে, আমর দেশের মুখ হাসিতে ভরাবে।"**

নাট্যকার দেখিয়েছেন চাঁদের শারীরিক শক্তি চলে গেলেও স্বপ্ন বেঁচে ছিল, স্বপ্ন শুধু এক হাত থেকে আরেক হাতে স্থানান্তরিত হয়, স্বপ্ন আসলে মরে না, মরতে চায় না। তাই যাবতীয় অন্ধকারকে অতিক্রম করে চাঁদ বণিক শেষ পর্যন্ত বলে গেছে - **'পাড়ি দেও, পাড়ি দেও - - - -।'**

• **চরিত্র কেন্দ্রিক রূপক :**

'চাঁদ বণিকের পালা' নাটকের প্রধান চরিত্রগুলি মনসামঙ্গলের কাহিনি থেকে গৃহীত হলেও নাট্যকার যুগ অনুযায়ী চরিত্রগুলির আমূল পরিবর্তন ঘটিয়েছেন। এক একটি চরিত্র হয়ে উঠেছে সমকালীন যুগ মানষের এক একটি প্রতীক, রূপক অথবা সংকেত। নাটকের গুরুত্বপূর্ণ কিছু চরিত্রকে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করলেই আমরা তা বুঝতে পারব।

ক. মনসা :

প্রত্যক্ষরূপে মনসাকে নাটকে না পাওয়া গেলেও পাঠকের বুঝতে অসুবিধা হয়না মনসা আসলে হয়ে উঠেছে অন্ধকারের প্রতীক। একাধিক সংলাপে এর প্রমাণ পাওয়া যায়। যেমন –

১. "যুক্তির অতীত তুমি জ্ঞানের অতীত।
তমসার রূপ মাগো আলোর অতীত।"

২. "সত্য শুধুই অন্ধকার। মনসার সর্পিল আন্ধার।"

৩. মনসার কাছে নেতৃত্বহীন, দিশাহীন মানুষেরা স্তব করেছে এইভাবে –

৩য় – জ্ঞানাতীতা, অন্ধকারাবৃতা, কূটগরলমণ্ডিতা
১ম - দয়া করো, দয়া করো, আন্ধারী মনসামাতা
২য় - মা অন্ধকারময়ী, দয়া করো, দয়া করো মাগো

আসলে দৈবশক্তির পরিবর্তে মনসা হয়ে উঠেছে রাজনৈতিক ক্ষমতা, কর্তৃত্ব ও আধিপত্যের অধিকারী। ছলে-বলে-কৌশলে মনসা চায় সকলেই তাঁকে পূজা দিক। আর এর জন্য সে সব কিছু করতে পারে – গুপ্তহত্যা, সম্পত্তিবিনাশ, বিপর্যয় সৃষ্টি সবকিছু।

খ. চাঁদ :

মনসার বিপরীতে চাঁদ হয়ে উঠেছে আলোক অভিযাত্রী। চাঁদ বণিক শিবের পূজারী। 'শিব' এখানে আলোর প্রতীক হয়ে উঠেছে। বলা যায় –

'শিব' = সত্য, মঙ্গল, সুন্দর, জ্ঞান।

সমস্ত বিপর্যয় সত্বেও পুত্রহারা, সম্পদহারা চাঁদ সদাগর তবুও শিবকে আশ্রয় করে নিয়েছে। তাঁকে বলতে শুনি - **"শিব ভক্ত আমি, সত্য পথে চল্যে জীবনে জ্ঞানের আলো প্রতিষ্ঠিতকরণের প্রয়াস পেয়েছি, এই মোর পরিচয়।"**

গ. সনকা :

ব্যক্তিস্বার্থসম্পন্ন অসহায় ভারতবাসীর প্রতীক হয়ে উঠেছে সনকা চরিত্রটি, যারা নিজেদের ক্ষুদ্রস্বার্থকে রক্ষা করার জন্য দেশের বৃহৎ স্বার্থকে গুরুত্ব দিয়ে দেখতে পারেনা। কিম্বা উপলব্ধি করতে পারলেও হয়তো অন্ধকারের বিপক্ষে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবার সাহস খুঁজে পায়না। সনকার মধ্যে অসহায়, মধ্যবিত্ত, ভীতু মানসিকতা সম্পন্ন সেই সব ভারতবাসীকে খুঁজে পাওয়া যায় যাদের মধ্যে সর্বক্ষণ এক ধরনের দোলাচলতা লক্ষ করা যায় – ন্যায় ও অন্যায়ের মধ্যে, আলো এবং অন্ধকারের মধ্যে। তারা আসলে বাধ্য হয় সাপের মতই কুটিল এবং জটিল রাজনৈতিক ফাঁদে পা দিতে।

ঘ. লখিন্দর :

'চাঁদ বণিকের পালা' নাটকে লখিন্দর কেবল চাঁদ ও সনকার সন্তান হয়ে থাকেনি, সে হয়ে উঠেছে স্বাধীনতা পরবর্তী ভারতবর্ষের বিপন্ন ভবিষ্যৎ প্রজন্ম। লখিন্দর হয়ে উঠেছে শিক্ষিত দিকভ্রান্ত যুব সমাজের প্রতীক। লখিন্দরের মধ্যে সব সময় এক ধরনের

আত্মযন্ত্রণা ও আত্মনিপীড়ণ কাজ করে চলে। এই আত্মযন্ত্রনার কারণ হল – ব্যর্থতা। পুত্র হিসেবে, স্বামী হিসেবে, ভবিষ্যৎ প্রজন্ম হিসেবে ব্যর্থ হতে হতে আসলে লখিন্দরেরা ক্লান্ত ও বিষন্ন।

ঙ. বেহুলা :

আলোচ্য নাটকের মধ্যে আমরা একটি সংলাপ খুঁজে পাই – "নারী চাই। নারী ছাড়া অন্ধকার গাঢ় লাগেনাক।" মদ ও মাংসের মতই 'নারী' ভোগ্যবস্তু হিসেবে গণ্য হয় অন্ধকারের পূজারীদের কাছে। এইরকম এক অন্ধকারাচ্ছন্ন সমাজের বুকে দাঁড়িয়ে বেহুলা হয়ে ওঠে লক্ষ লক্ষ অসহায় নারীর প্রতিনিধি চরিত্র। বেহুলাদের বারবার নারীত্বের লজ্জা ও অপমানবোধের গ্লানি সহ্য করে যেতে হয়। নারীদের বারবার কন্যা হিসেবে, স্ত্রী হিসেবে, পুত্রবধূ হিসেবে সতীত্বের বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জন করতে হয়। আসলে তৎকালীন ভারতবর্ষীয় নারীদের যে দুরবস্থা তাই যেন প্রকাশিত হতে দেখি বেহুলার মাধ্যমে।

চ. বেণিনন্দন, বল্লভাচার্য, ভৈরব, করালী প্রভৃতি :

নাটকে এরা সকলেই স্বাধীনতা পরবর্তী নোংরা, স্বার্থান্বেষী রাজনৈতিক দালাল রূপে চিত্রিত। দলগত ভিন্নতা থাকলেও এরা সকলেই মনসা তথা অন্ধকারের ভজনা করে। সর্বদায় এরা সুযোগসন্ধানী ও কুটিল, নিজেদের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার জন্য এরা সবকিছু করতে পারে। এদের কাছে ন্যায়, নীতি, আদর্শ বলে কিছু নেই। বলা বাহুল্য বেণিনন্দন, ভৈরব, কারলীরা আজও এইভাবে আমাদের চারিপাশে ঘুরে বেড়ায়, তাদের স্বভাবধর্মের এতটুকু পরিবর্তনও আমরা লক্ষ করতে পারিনা।

অন্যদিকে নরহরি, ন্যাড়া, ভুলু সর্দাররা হলেন রাজনৈতিক ও সামাজিক নৈরাজ্যে ভুক্তভোগী সাধারণ ভারতবাসী।

এই ভাবেই ' চাঁদ বণিকের পালা ' নাটকের বড় সম্পদ হয়ে উঠেছে নাটকে ব্যবহৃত রূপক, সংকেত, প্রতীকগুলি। আসলে সরাসরি যা বলা যায় না অথবা যা বলা সম্ভব ছিল না, শম্ভু মিত্র আলোচ্য নাটকে রূপক ও সংকেতের মাধ্যমে তাই বলতে চেয়েছেন। মিথ নির্ভর কাহিনীকে বিনির্মাণের মাধ্যমে তিনি গড়ে তুলেছেন একটি নির্দিষ্ট সময়কালের জীবনযন্ত্রণার ইতিহাস হিসেবে। তাই রূপক-সাংকেতিক নাটক হিসেবে 'চাঁদ বণিকের পালা' কালজয়ী একটি নাটকের রূপ পেয়েছে।

গ্রন্থঋণ :

১. চাঁদ বণিকের পালা আধুনিক উপাখ্যান – সম্পাদনা ড. অপূর্ব দে ।
২. চাঁদ বণিকের পালা প্রাসঙ্গিক কিছু ভাবনা - অনিরুদ্ধ আলি আকতার।
৩. শম্ভু মিত্রের চাঁদ বণিকের পালা - জগন্নাথ ঘোষ।

প্রত্নতাত্ত্বিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়: আঞ্চলিক ইতিহাসচর্চার আলোকে স্বদেশভাবনা

তপন ঘোষ
গবেষক,
ইতিহাস বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ : বিশ শতকের ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষে মহান ঐতিহাসিকদের মধ্যে স্বতঃসিদ্ধ পুরুষ ছিলেন প্রত্নতাত্ত্বিক রাখলদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। এই পর্বে ইংরেজরা ভারতবর্ষের যে ইতিহাস লিপিবদ্ধ করেছিল তাতে প্রকাশিত হয়েছিল ব্রিটিশের ন্যায়পরায়ণ, উদার ও জনকল্যাণকামী শাসনের অভিমুখ।

তাই উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে দেশাত্মবোধের প্রধান উদ্গাতা বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় নতুনভাবে বাংলার ইতিহাস নির্মাণের আহ্বান জানান। তাতে সাড়া দিয়ে দেশীয় ইতিহাসচর্চায় এগিয়ে আসেন রাজেন্দ্রলাল মিত্র, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, রমাপ্রসাদ চন্দ প্রমুখ। কিন্তু কেউই অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারেননি। এর পর আবির্ভূত হন পুরাতাত্ত্বিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি ব্রিটিশের দৃষ্টিভঙ্গিতে বাঙালির ইতিহাসহীনতা, পৌরুষহীনতার এই ব্রিটিশ মনোভাবের যোগ্য জবাব দিয়ে বাংলাভাষায় 'বাঙ্গালার ইতিহাস' রচনা করলেন। রাখালদাস বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে প্রত্নতত্ত্বের ওপর ভর করে বাংলা ও উড়িষ্যার ইতিহাস পুনর্গঠন করে স্বদেশের হৃতগৌরব উদ্ধার করলেন। প্রত্নতাত্ত্বিক উৎখনন, ইতিহাসাশ্রয়ী সাহিত্যচর্চা ও আঞ্চলিক ইতিহাসচর্চার মধ্য দিয়ে তিনি নবজাগ্রত ভারতীয় জাতীয়তাবাদকে সুপ্রতিষ্ঠিত করলেন। বিশ শতকের গোড়ায় রাখালদাসের আঞ্চলিক ইতিহাসচর্চার ভিতর দিয়ে বেজে ওঠে তাঁর স্বদেশভাবনা। মহেঞ্জোদারোয় খননকার্য চালিয়ে তিনি যে রিপোর্ট তৈরী করেন তা স্থানিক ইতিহাস হলেও তার ব্যাপ্তি বিশ্বব্যাপী। এছাড়া মধ্যভারতের ভূমারা, বাদামী ও ত্রিপুরি মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ উৎখনন করে তিনি সেগুলোর পৃথক পৃথক ইতিহাস লেখেন। তাঁর এই সমস্ত কাজকে একত্রিত করলে ঐক্যবদ্ধ ভারতের একটি সামগ্রিক চিত্র পাওয়া যায়; যার ভিতর দিয়ে মূর্ত হয়ে ওঠে রাখালদাসের স্বদেশভাবনা।

শব্দসূচক : ঔপনিবেশিক-প্রত্নতাত্ত্বিক-দেশাত্মবোধ-ইতিহাসচর্চা-ইতিহাসাশ্রয়ী-সাহিত্যচর্চা-হৃতগৌরব-জাতীয়তাবাদ

বিশ শতকের প্রথমার্ধে ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষে শ্রুতকীর্তি ও মহান ঐতিহাসিকদের মধ্যে স্বতঃসিদ্ধ এক পুরুষ ছিলেন প্রত্নতাত্ত্বিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। বিশালায়তন প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসের অন্তহীন বৈচিত্র্যের অনুষঙ্গে তার সামগ্রিকতার স্বরূপকে উপলব্ধির প্রয়াস, এককথায়, অনন্য মেধা-নিষিক্ত দক্ষতার পরিচায়ক। ঐতিহাসিক

অমলেশ ত্রিপাঠী[১] লিখেছেন, 'কত গভীর জ্ঞান থাকলে বিষয়বস্তু এমন সুবিন্যস্ত, রচনাশৈলী এত সহজসিদ্ধ ও চিত্রধর্মী হয়, কত ব্যাপক অভিজ্ঞতা থাকলে দেশকালের এমন স্বচ্ছন্দ তুলনা চলে! আবার পাণ্ডিত্যের চেয়েও লক্ষ্যণীয় তাঁর শিল্পীজনোচিত কল্পনাশক্তি, স্রষ্টাসুলভ অন্তর্দৃষ্টি'। ইউরোপীয় শিক্ষা ও সংস্কৃতির গরিমাময় দানে ঋদ্ধ ছিল তাঁর মনোজগৎ। আজীবন সার্থক অধ্যাপনা, দুরূহ অথচ মূল্যবান গবেষণার বিরল মণিকাঞ্চন সংযোগ ঘটেছিল তাঁর মিতায়ু জীবনে। 'কর্মজগতের সঙ্গে ঘনিষ্ট সম্পর্ক তাঁর অভিজ্ঞতাকে করেছিল ব্যাপক ও বাস্তব, অন্তর্দৃষ্টিকে মূলগামী, বিশ্লেষণ শক্তিকে তীক্ষ্ণ, সমন্বয় শক্তিকে সৃষ্টিধর্মী'।[২] তথ্যের প্রতি প্রগাঢ় নিষ্ঠা, বৈজ্ঞানিকদৃষ্টির নিরপেক্ষতা এবং সূক্ষ্ম বিচারবোধের মিশেলে গড়ে উঠেছিল রাখালদাসের আত্মপরিচিতি। তাঁর অস্মিতার এই অটলসৌধটি নির্মিত হয়েছিল আঞ্চলিক ইতিহাসচর্চা ও প্রত্নতত্ত্বের নিরন্তর গবেষণায়। সময়ের নির্মম অভিঘাতে রাখালদাসের স্মৃতি দেশের আপামর মানুষের কাছে আজ হয়তো ধূলিধূসরিত; এমনকি গবেষণার রীতি-পদ্ধতি পরিবর্তনের সুবাদে তাঁর রচনার ত্রুটি-বিচ্যুতি নির্ণয় বা তাঁর কোনো কোনো মন্তব্যের অসারতা প্রমাণ করা আজ হয়তো দুঃসাধ্য নয়। তবে প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস গবেষণায় সমকালীন যুগে তাঁর সমকক্ষ যে আর কেউ ছিলেন না_ সে কথা জোরের সঙ্গেই বলা যায়। রাখালদাস তাঁর হ্রস্ব জীবনে ভারতীয় ইতিহাসের যে দীর্ঘ ও বিপুল সারস্বত ফসল রেখে গেছেন, তা প্রায় এক শতাব্দী পরেও ইতিহাসমগ্ন পাঠক ও গবেষকদের কাছে পরম বিস্ময়ের।

অধ্যাপক অলোককুমার ঘোষ বাঙালির ইতিহাসচর্চা প্রসঙ্গে লিখেছেন, 'নীরদচন্দ্র চৌধুরীর *'আত্মঘাতী বাঙালী'* গত দু'দশক ধরেই তার আত্মহননের ব্যাপারে একই সঙ্গে সচেতন এবং উদ্যমী। একইভাবে সে আত্মপতন ও আত্মসমালোচনাতেও বেশ দড়। ইতিহাসচর্চায় বাঙালীর আত্মনিয়োগ এরই একটি দিক'।[৩] উনিশ শতকের প্রথমার্ধে বাঙালির ইতিহাসচর্চার আত্মিক প্রয়াস লক্ষ্য করা গেলেও পৌর্বাপর্য কখনোই তা চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছাতে পারেনি_ বলা যেতে পারে তেমন একটা সাফল্য লাভ করেনি। এই পর্বে ইংরেজরা ভারতবর্ষের যে ইতিহাস লিপিবদ্ধ করেছে, তাতে দেখা গেছে, তাদের উদ্দেশ্য আখ্যানের একটি ভিন্নজগৎ নির্মাণ করা; যে জগৎ প্রাক-ব্রিটিশ যুগের অত্যাচার ও নৈরাজ্য থেকে সম্পূর্ণ আলাদা এবং যার মধ্য দিয়ে বিম্বিত হয়ে উঠেছে ব্রিটিশের আলোকিত, ন্যায়পরায়ণ, উদার ও জনকল্যাণকামী সুশাসনের অভিমুখটি। ব্রিটিশশক্তি এদেশের সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী হওয়ায় এই আখ্যানধর্মী মেকি-ইতিহাস সহজেই স্বীকৃতি পেয়ে যায়। কিন্তু দেশীয় বৌদ্ধিক ও মননশীলগোষ্ঠী এই বৃত্তান্ত সম্পর্কে ঘোর সন্দিহান ছিলেন। ফলে ব্রিটিশের এই 'স্বীকৃত ইতিহাস'কে কক্ষচ্যুত করার প্রয়োজনীয়তা তাঁরা অনুভব করলেন তীব্রভাবে।

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে দেশাত্মবোধের প্রধান উদ্গাতা বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় আক্ষেপের সুরে লিখেছিলেন, 'সাহেবরা যদি পাখি মারিতে যান, তাহারও ইতিহাস লিখিত হয়, কিন্তু বাঙ্গালার ইতিহাস নাই। .....মার্শম্যান, স্টুয়ার্ট প্রভৃতি প্রণীত

পুস্তকগুলিকে আমরা সাধ করিয়া ইতিহাস বলি; সে কেবল সাধ-পুরানমাত্র'।[৪] ইউরোপীয়দের দ্বারা নির্মিত ইতিহাস বাঙালি জাতির কাছে অত্যন্ত কলঙ্কের বিষয়। ফলে এই 'ইতিহাসহীনতার কলঙ্ক বাঙালীর ভাগ্যে অনপনেয় হয়ে রয়েছে। বাঙালী কখনও কোনো একাভিমুখী ব্রতের সাধনায় জাগ্রত ও উদ্যত হয়ে ওঠেনি'।[৫] ইতিহাসের শাশ্বত বৈভবে উজ্জ্বল হয়েও আলস্যপ্রিয় ঐশী ভাবনামণ্ডিত ভারতবাসী তথা বাঙালির কাছে ইতিহাসের এই দীনতা প্রকৃতপক্ষে লজ্জার, 'ভারতবর্ষের নিশীথকালের একটা দু:স্বপ্নকাহিনীমাত্র'[৬]; যা এক অন্তর্গত বোধের তাড়নায় বঙ্কিমী আহ্বানে আমাদের অন্তস্থলে বেজে ওঠে_ 'বাঙ্গালার ইতিহাস চাই, নহিলে বাঙ্গালার ভরসা নাই। কে লিখিবে? তুমি লিখিবে, আমি লিখিব, সকলেই লিখিবে। যে বাঙ্গালী, তাহাকেই লিখিতে হইবে'।[৭] পরিণতিস্বরূপ এই পর্বে বাঙালি ইতিহাসবেত্তাদের মধ্যে ইতিহাস রচনার মানসিকতায় যে পরিবর্তন এলো, তা উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে আমূল পাল্টে যেতে লাগলো। এর অন্যতম কারণ পাশ্চাত্যদেশীয় ইতিহাসের আঙ্গিক ও পন্থার কাছে ভারতীয় ইতিহাস নির্মাতাদের ঋণী হয়ে পড়া। 'উনিশ শতকে আমাদের ইতিহাস লেখার পদ্ধতি যে মূলত ইউরোপ থেকেই গৃহীত ছিল একথা তর্কের অতীত। পাশ্চাত্যদেশের ইতিহাসই ছিল প্রাথমিক মডেল';[৮] যা এ দেশীয় ইতিহাসচর্চার ক্ষেত্রে এক নবযুগের সূচনা করে।

ইংরেজদের কাছে প্রাক-ব্রিটিশ ভারত ছিল একটি বর্বরক্ষেত্র; তাই সেখানে তাদের মূল লক্ষ্য ছিল ইউরোপায়ন। ১৮১৭ সালে জেমস মিল প্রণীত *'The History of British India'* শীর্ষক গ্রন্থ থেকে জানা যায়, 'বর্বরজাতিরা সুদূর অতীত পর্যন্ত নিজেদের ইতিহাসের বিস্তার করে এক অদ্ভূত আনন্দলাভ করে থাকে। প্রাচ্যজাতিদের বিশেষত্বই হচ্ছে এক অস্বচ্ছ আত্মম্ভরিতা, সেজন্য অধিকাংশ ক্ষেত্রে তারা নিজেদের এই দাবিকে অত্যুক্তির পর্যায়ে নিয়ে যায়'।[৯] উনিশ শতকের শেষদিকে ভারতবর্ষে জাতীয়তাবাদের উত্থান ঘটে। ভারতবর্ষের ইতিহাস পুনর্লিখন ও পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে জাতীয়তাবাদপ্রসূত ভাবাবেগ যে স্বতঃস্ফূর্ত জোয়ার আনে, তা ঔপনিবেশিক অনুধ্যানে লিখিত ভারতবর্ষীয় ইতিহাসের প্রতি প্রবল অনাস্থা জানায়। পরিণতিস্বরূপ 'সে সময় বাঙালি ইতিহাস লেখায় কিছুটা আত্মসচেতন হয়ে উঠেছিলেন। ইউরোপীয় লেখকদের আদলেই তাঁরা ভারতীয় ঐতিহ্যকে তুলে ধরতে চেয়েছিলেন'।[১০] 'যে বাঙ্গালী তাহাকেই লিখিতে হইবে'_ দুর্লঙ্ঘ্য এই বঙ্কিমী আহ্বানে বাংলার ইতিহাসচর্চার সাধনায় এগিয়ে এলেন রাজেন্দ্রলাল মিত্র, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, রমাপ্রসাদ চন্দ, অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় , নগেন্দ্রনাথবসু, দীনেশচন্দ্র সেন এবং সর্বোপরি রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। দুরূহ কাজের যোগ্য হওয়া সত্ত্বেও রাজেন্দ্রলাল মিত্র বা হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মতো পণ্ডিতদের কেউ-ই বাংলাদেশের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস লেখেননি বা স্বদেশের পুরাবস্তু উদ্ধারের চেষ্টাও করেননি। তাঁদের এই আরব্ধ কাজটি সফলতার সঙ্গে সম্পন্ন করেছিলেন হরপ্রসাদের

প্রিয়শিষ্য ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্বে সব্যসাচী রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। ফলে জনশ্রুতি, পুরানো ও মনগড়া ইতিহাসাশ্রয়ী বিভিন্ন গ্রন্থনা থেকে অতথ্যের নির্মোচন ঘটিয়ে প্রকৃত ইতিহাস উন্মোচিত হল। 'কেবল খনন-আবিষ্কারেই তাঁর সময় অতিবাহিত হয়নি বলেই কুলজী সাহিত্যের পরিবর্তে আমরা পেয়েছি বৈজ্ঞানিক গবেষণালব্ধ ইতিহাস'।[১১] এই সময় দেশের সর্বত্রই চলল খননকার্য, উদ্ধার হল অজস্র তাম্রশাসন, শিলালিপি এবং সর্বোপরি রাখালদাসের হাতে আবিষ্কৃত হল মহেঞ্জোদারোর পুরাকীর্তি।

স্বাদেশিকতার উত্তাল আবহে প্রত্নসূত্রের নির্ভুল অথচ ভিন্ন ব্যাখ্যায় রাখালদাস ইউরোপীয় ও দেশীয় প্রত্নতাত্ত্বিকদের প্রতিষ্ঠিত মতকে বিরোধিতা করে প্রশ্নের মুখে ফেললেন। মোটকথা, পাণ্ডিত্যে রাখালদাস তাঁদেরকে অনেকটা পেছনে ফেলে দিয়েছিলেন; যা তাঁর পরবর্তী জীবনে ভয়ংকর পরিণতি ডেকে এনেছিল। আঞ্চলিক ইতিহাসচর্চা, প্রত্নতাত্ত্বিক উৎখনন ও উপন্যাস সৃষ্টির মধ্য দিয়ে রাখালদাসের মৌল উদ্দেশ্য শুধু প্রাচীনভারত তথা স্বাদেশিক ঐতিহ্য ও হৃতগরিমা পুনরুদ্ধার করাই নয়, নবজাগ্রত জাতীয়তাবাদকেও সুপ্রতিষ্ঠিত করা। সেই সময় 'স্বাজাত্যাভিমানের উন্মেষের জন্য কাহিনির মধ্য দিয়ে অতীতের পুনর্গঠন ও ইতিহাসের তাত্ত্বিক অনুসন্ধান_ দুই প্রক্রিয়াই পাশাপাশি চলছিল'[১২] রাখালদাসের প্রচেষ্টায়। এই নিরিখে বলা যেতে পারে, বিংশ শতক থেকে 'ইতিহাস লেখা কোন 'সর্বজনিক যৌথক্রিয়া' নয়, নির্ভেজাল বুদ্ধিচর্চাও নয়; এটা একটা বিশুদ্ধ জ্ঞানচর্চা, এতে শুধু প্রশিক্ষিত প্রমাণতাত্ত্বিক ঐতিহাসিক পণ্ডিতদেরই অধিকার'।[১৩] রাখালদাস হলেন সেই প্রমাণতাত্ত্বিক ঐতিহাসিকদের অন্যতম; যাঁর লিখিত ইতিহাসকে প্রায় প্রশ্নহীন শ্রদ্ধার চোখে দেখা যায়। তবু যেন পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস নির্মাণের অপ্রতুল উপাদান রাখালদাসকে ব্যথিত করেছিল ভীষণভাবে। তিনি লিখলেন, 'যে দেশে শিলালিপি, তাম্রশাসন, প্রাচীনমুদ্রা ও সাহিত্যে লিপিবদ্ধ জনপ্রবাদ ব্যতীত ইতিহাস রচনার অন্য কোন বিশ্বাসযোগ্য উপাদান আবিষ্কৃত হয় নাই, সে দেশে ইতিহাসের কঙ্কাল ব্যতীত অন্য কিছু আশা করা যাইতে পারে না'।[১৪] তবুও এই অভাব অনেকটাই পূরণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন প্রত্ন-অণ্বেষী রাখালদাস তাঁর প্রজ্ঞাদীপ্ত ইতিহাসচর্চার মধ্য দিয়ে।

'উনিশ শতকের বাঙালি ইতিহাসবেত্তাদের মধ্যে রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ভারতবিদ্যাচর্চায় বিশেষত বাংলা ও উড়িষ্যার আঞ্চলিক ইতিহাসচর্চায় একজন পথপ্রদর্শক হিসাবে চিহ্নিত'।[১৫] তিনি এমন এক সময়ে বাংলার ইতিহাসচর্চা শুরু করেছিলেন, যে-যুগে শুধু বাংলা নয়_ সমগ্র ভারতবর্ষের ইতিহাসচর্চার ক্ষেত্রেও বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে বিভাজিকাসূত্র আবিষ্কৃত হয়নি বা ইতিহাসবেত্তারা তাঁদের গবেষণা ক্ষেত্রের তাৎপর্য সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা আত্মস্থ করতে পারেননি। রাখালদাস নিজেই লিখেছিলেন, '... ঐতিহাসিক উপন্যাস ব্যতীত বঙ্গদর্শনে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে প্রকাশিত কতক প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গদেশে প্রথম ঐতিহাসিক আলোচনার সূত্রপাত করেছিলেন। এই সকল প্রবন্ধ সাধারণত দুইটি বৃহৎ ভাগে বিভক্ত হইতে পারে_ 'ভারত কলঙ্ক' বা

‘বাঙ্গালার কলঙ্ক’ এবং ‘বাঙ্গালীর উৎপত্তি’।[১৬] বলাবাহুল্য বাংলার ইতিহাস রচনার আদিপর্বে বঙ্কিমচন্দ্র এমনই এক আবছা জগৎ থেকে বাংলার লুপ্ত ইতিহাসকে উদ্ধার করে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন বৈজ্ঞানিক প্রকৌশলের জগতে। এই যুগে বঙ্কিমচন্দ্রই প্রথম উনিশ শতকীয় ইউরোপীয় ইতিহাসচর্চার বিজ্ঞানভিত্তিক পন্থার সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটান। বঙ্কিমচন্দ্রের যোগ্য উত্তরসাধক হিসাবে রাখালদাস তাঁর জ্ঞান ও প্রজ্ঞার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে লেখেন, ‘এই যুগে বঙ্কিমচন্দ্রের লেখনী হইতে কতকগুলি ঐতিহাসিক সত্য নিঃসৃত হইয়াছিল, বিগত অর্ধ শতাব্দীর শত শত নূতন আবিষ্কারেও তাহাদিগের সত্যতা সম্বন্ধে কাহারও সন্দেহ উপস্থিত হয় নাই’।[১৭] বঙ্কিমচন্দ্রের ‘বিবিধ প্রবন্ধের’ পাঠজনিত ফসল হল রাখালদাসের ‘বাঙ্গালার ইতিহাস’ এবং এই গ্রন্থে তিনি বাংলার ইতিহাস সম্পর্কে বঙ্কিম-উত্থিত প্রশ্নগুলোর সদুত্তর দিয়েছেন। বঙ্কিমচন্দ্র স্বাজাত্যবোধ তথা স্বদেশভাবনার যে বীজ বপন করেছিলেন, তা স্বাদেশিক আবহে রাখালদাসের আঞ্চলিক ইতিহাসচর্চা ও প্রত্নতাত্ত্বিক উৎখননের মধ্য দিয়ে পত্র-পুষ্পে বিকশিত হয়ে উঠেছিল; যা ‘বহু যুগের মনীষীর কাজ’। ‘বাঙ্গালার ইতিহাস’ বা ‘প্রাচীন মুদ্রা’ রচনার ক্ষেত্রে তিনি ইংরেজী নয়, বাংলাভাষাকেই রচনার মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন, যা তাঁর স্বদেশভাবনার পরিচায়ক।

বখতিয়ার খলজির নেতৃত্বে সতেরজন অশ্বারোহীর বঙ্গবিজয় সম্পর্কিত প্রশ্নটির সন্তোষজনক উত্তর খুঁজতে গিয়ে রাখালদাস অকাতরে সময় ও শ্রম ব্যয় করেছিলেন। তারই ফলস্বরূপ ১৩১৫ বঙ্গাব্দে রাখালদাস লেখেন *‘লক্ষ্মণ সেন ও মুসলমান বিজয়’* শীর্ষক একটি প্রবন্ধ; যা বঙ্কিমচন্দ্রের ‘বঙ্গদর্শন’ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। উক্ত প্রবন্ধে তাঁর গৃহীত সিদ্ধান্তগুলো প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ও পুরাতাত্ত্বিক অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় অকুণ্ঠভাবে সমর্থন করেন। ‘ঐতিহাসিক ক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্রের দ্বিতীয় কীর্তি বাঙ্গালীর উৎপত্তির বিশ্লেষণ’।[১৮] তাঁর মতে, বাংলাদেশের বাঙালি অধিবাসীরা শুদ্ধ আর্যরক্তের অধিকারী নন অর্থাৎ বাঙালিরা খাঁটি আর্য নন। বঙ্কিমী এই ভাবনাপ্রাণিত রাখালদাস বাংলায় আদিম অধিবাসী এবং আর্যবিজয় সম্পর্কে বাঙ্গালার ইতিহাসের প্রথম খণ্ডের দ্বিতীয় অধ্যায়ে বিস্তারিতভাবে আলোকপাত করেছেন । ১২৮০ বঙ্গাব্দে বঙ্কিমচন্দ্র *‘বঙ্গে ব্রাহ্মণাধিকার’*[১৯] প্রবন্ধটি লিখেছিলেন। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীও আর্যাধিকারের আগে বাংলার অবস্থা নিরুপণের চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু রাখালদাসের দৃষ্টিতে ‘সে কেবল চেষ্টামাত্র’।[২০] সার্বিক বিচারে বলা যেতে পারে যে, বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবর্তিত এবং হরপ্রসাদের নির্দিষ্ট পন্থাবলম্বনেই রাখালদাস বাংলার সামাজিক ইতিহাস নির্মাণে নিয়োজিত হয়েছিলেন ঠিকই, কিন্তু তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গি মতো কুলজি সাহিত্যকে নির্ভরযোগ্য তথ্যসূত্র হিসাবে গ্রহণ করেননি। সুতরাং রাখালদাসের দৃষ্টিতে বাংলার ইতিহাস ‘কুলশাস্ত্রের ন্যায় স্বকপোল-কল্পিত রচনা অথবা পিতামহীর গল্প নহে’।[২১] রাখালদাস সেই সঙ্গে এই অকাট্য সত্যে উপনীত হয়েছিলেন যে, তাঁর সময়ে যদি বঙ্কিমচন্দ্র বেঁচে থাকতেন, তবে তাঁরই

কাঙ্ক্ষিত বিজ্ঞানভিত্তিক পন্থায় রচিত বাংলার সামাজিক ইতিহাস তাঁর পায়ে রেখে তিনি নিজে এবং তাঁর সমসাময়িক অক্ষয়কুমার ও রমাপ্রসাদ তাঁদের শ্রম সার্থক হয়েছে বলে মনে করতেন।

প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে মুসলমান বিজয়ের আগে পর্যন্ত সময়ে 'বাঙ্গালার ইতিহাস' লেখার জন্য রাখালদাস প্রায় অসাধ্য সাধন করেছিলেন। দশ বছর ধরে অক্লান্ত পরিশ্রমে বাংলার ইতিহাসের উপাদান সংগ্রহ করেছিলেন এবং সংগৃহীত উপাদানকে আশ্রয় করে ইতিহাসের যে কঙ্কাল যোজনা করেছিলেন, তাই-ই সার্থকরূপ লাভ করেছিল 'বাঙ্গালার ইতিহাসের' মধ্য দিয়ে। তবু প্রামাণ্য উপাদানের স্বল্পতার কারণে তিনি আক্ষেপের সুরে লিখেছিলেন, 'ইহার অবয়ব কখনও সম্পূর্ণ হইবে কিনা বলিতে পারি না'।[২২] বাংলার ইতিহাস রচনাকালে রাখালদাস প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় ইতিহাসের সীমারেখার মধ্যে নির্দিষ্ট কোনো প্রভেদ রাখেননি। এর পেছনে কারণ হিসাবে উল্লেখ করা যেতে পারে_ প্রথমত, তিনি নিজেই একজন প্রত্ন-প্রাজ্ঞিক ঐতিহাসিক ছিলেন, দ্বিতীয়ত, বঙ্কিমচন্দ্রের ইতিহাস ভাবনাকে আত্মস্থ করে তিনি বাংলার ইতিহাসের কঙ্কাল পুনর্গঠন করতে চেয়েছিলেন। থিয়োডোর মরিসন, জে. বি. বিউরি এবং এইচ. আর. হল প্রমুখ উনিশ শতকীয় পণ্ডিতরা রোমের ইতিহাস লেখার সময় সাহিত্যিক উপাদানের তুলনায় প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদানকে যেমন বেশী গুরুত্ব দিয়েছিলেন, তেমন রাখালদাসও বাংলার ইতিহাস পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে প্রত্নতত্ত্বকে বেশী গুরুত্ব দিয়েছিলেন। আচার্য যদুনাথ সরকার লিখেছেন, 'এই বাঙ্গালার ইতিহাসে প্রাচীনতম ঐতিহাসিক যুগ হইতে মুসলমান বিজয় পর্য্যন্ত প্রায় পনের শত বৎসরের রাজা ও রাজ্যপরম্পরায় সর্ব্বাপেক্ষা সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ এবং সর্ব্বশেষ নির্দ্ধারিত তথ্যযুক্ত বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। প্রকৃত বৈজ্ঞানিক প্রণালীর ইতিহাসে যাহা হওয়া উচিত, এই গ্রন্থে পদে পদে প্রমাণপঞ্জী অতি সূক্ষ্ম ও বিশুদ্ধভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে, এবং সমস্ত পূর্ব্বতন মত আলোচনা করিয়া তবে গ্রন্থাকারের মত স্থাপন করা হইয়াছে'।[২৩]

ছাত্রাবস্থা থেকে প্রত্নতত্ত্বের প্রতি তীব্র আকর্ষণ ছিল রাখালদাসের এবং পরবর্তীকালে তাঁর নিজের কথায়, শাস্ত্রী মশাইয়ের 'পদপ্রান্তে উপবেশন করিয়া প্রত্নবিদ্যার বর্ণমালা শিক্ষা করিয়াছি'।[২৪] শিক্ষাগুরু হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মাধ্যমে ভারতীয় জাদুঘরে পরিচয় ঘটে প্রখ্যাত জার্মান পণ্ডিত ও প্রত্নতাত্ত্বিক থিয়োডোর ব্লখের সঙ্গে; যা তাঁর জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দেয়। তাঁর বৌদ্ধিকগুরু থিয়োডোর ব্লখকে তিনি নিজের প্রথম কাজ *'The Origin of the Bengali Script'* গ্রন্থটি উৎসর্গ করেন। এটিও বাংলার লুপ্ত ইতিহাস উদ্ধারের আর একটি উল্লেখযোগ্য প্রয়াস। সুতরাং প্রত্নতত্ত্বে পোড় খাওয়া এমন একজন প্রত্ন-অন্বেষী ঐতিহাসিক রাখালদাস বাংলার ইতিহাস নির্মাণে যে 'নীরস পাথুরে প্রমাণের' আশ্রয় নেবেন, তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

'বাংলাদেশের ইতিহাস ভারতবর্ষের ইতিহাসের একটি ক্ষুদ্র অংশমাত্র। ভারতের ইতিহাসের দুইটি প্রকরণ আছে। প্রথম প্রকরণ উত্তরাপথের ইতিহাস; বাঙ্গালার ইতিহাস

এই প্রকরণের একটি অধ্যায়মাত্র'।[২৫] বাংলাভাষায় বাংলার ইতিহাস রচনার সময়ে রাখালদাস ভারতবর্ষের ইতিহাসের সঙ্গে তার নিবিড় সামঞ্জস্য রেখে এগিয়েছেন। বস্তুত বিশ শতকের গোড়ায় রাখালদাসের আঞ্চলিক ইতিহাসচর্চার মধ্য দিয়ে বেজে উঠেছে তাঁর স্বদেশভাবনা। এককথায়, '...while planning to write the history of Bengal Rakhaldas set a Pan-Indian vision and thus kept himself above regionalism'।[২৬] খ্রীষ্টীয় প্রথম ছয় শতক ধরে গৌড়, মগধ, অঙ্গ ও বঙ্গের ইতিহাস ছিল সমগোত্রীয়। অর্থাৎ কারোর ইতিহাসই স্থায়ীভাবে প্রাধান্য লাভ করেনি, তবে মগধ বেশীরভাগ সময়ই প্রাধান্য দেখিয়েছে। মুসলমান বিজয়ের অবশিষ্ট ছয়শত বছর ধরে গৌড় ও বঙ্গের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হলেও মগধ ও অঙ্গ কখনো দীর্ঘস্থায়ী স্বাতন্ত্র্য রক্ষায় সমর্থ হয়নি। রাখালদাস লিখেছেন, 'এই কারণে বাঙ্গালার ইতিহাসে মগধ ও অঙ্গের ঐতিহাসিক তথ্যও আলোচিত হইয়াছে'।[২৭]

ভূ-বিদ্যাবিশারদদের ধারণা বাংলাদেশের ভৌমিক পুনর্গঠনের কাজ আজো চলছে। অর্থাৎ সে এখনো শৈশব অতিক্রম করেনি। এমতাবস্থায় এই নতুন দেশে প্রাচীন আদিম মানুষের অস্তিত্বের নিদর্শন পাওয়া বিস্ময়ের। ভূ-বিদ্যাবিশারদ কগিন ব্রাউন ও হেমচন্দ্র দাশগুপ্তের অক্লান্ত শ্রম ও অধ্যবসায়ে বাংলাদেশের প্রাগৈতিকহাসিক যুগের ইতিহাস সংকলিত হয়েছে। বাঙ্গালার ইতিহাস লেখার সময় কগিন ব্রাউন পুরাপ্রস্তর ও নব্যপ্রস্তর যুগের প্রাপ্ত বিভিন্ন হাতিয়ার দিয়ে এবং হেমচন্দ্র পুরাযুগের মানুষ সম্পর্কে মূল্যবান তথ্য দিয়ে রাখালদাসকে সাহায্য করেছিলেন। ভারতীয় জাদুঘরের কর্মী হওয়ার সুবাদে হল্যাণ্ড সাহেব রাখালদাসকে জীবাশ্মবিদ্যা বিষয়ে সাহায্য করেন এবং আরবী ও ফরাসী ভাষায় লিখিত শিলালিপি পাঠে সাহায্য করেছিলেন রাখালদাসের শিক্ষক মৌলবী খয়ের-উল্-আনাম ও থিয়োডোর ব্লখ। এছাড়াও হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, জন মার্শাল, আবুল মহম্মদ জমাল-উদ্দীন, ফিলিপ স্পুনার, এন. এনানডেল প্রমুখ পণ্ডিতদের সহযোগিতাঋদ্ধ রাখালদাসের প্রজ্ঞার নির্যাসজনিত ফসল 'বাঙ্গালার ইতিহাস'; যেখানে প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে শুরু করে হিন্দুযুগ ও মুসলিম শাসনের অবসান পর্যন্ত ইতিহাস বর্ণিত হয়েছে। রাখালদাসের স্বতন্ত্র অপর একটি ইংরাজী গ্রন্থ *'The Palas of Bengal'* পালপর্বে বাংলার আঞ্চলিক ইতিহাসের এক অনবদ্য দলিল হিসাবে স্বীকৃত। এক্ষেত্রেও 'তাঁর ইতিহাস রচনার ভিত্তি পুরাতত্ত্বের দৃঢ় ভূমির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল বলে সেখানে সত্যের অপলাপের সম্ভাবনা কম'।[২৮] বাংলার ইতিহাসের পরিপূর্ণ অবয়ব দানে রাখালদাস বিভিন্ন সময়ে আরো বেশ কিছু প্রবন্ধ লেখেন, এগুলো হল_ দিনাজপুরের *'ঈশ্বর ঘোষের তাম্রশাসন', 'ঢাকার ইতিহাস', 'কুলশাস্ত্রের ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত', 'দশম শতকে গৌড়ীয় শিল্প', 'গৌড়ীয় শিল্পের পুনরুত্থান', 'গৌড়ীয় শিল্পে দাক্ষিণাত্য প্রভাব', 'দক্ষিণ পশিমবঙ্গের শিল্প', 'বাঙ্গালা', 'বাঙ্গালার মুদ্রা(১), 'মুসলমান মসজিদে হিন্দুকীর্তির অবশেষ', 'চন্দ্রকেতুগড়'* ইত্যাদি।

এভাবে প্রত্নতাত্ত্বিক রাখালদাসের সোনালি হাতের ছোঁয়ায় জন্মভূমি বাংলাদেশের আঞ্চলিক ইতিহাসচর্চার আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে ওঠেছে তাঁর অন্তর-লালিত স্বদেশভাবনা।

'রাখালদাস শুধু বাংলার ইতিহাস লিখেই দায়িত্ব শেষ করেননি, প্রতিবেশী প্রদেশেরও পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস লিখেছেন একই মনস্কতায়'।[২৯] ভাষার পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও উড়িষ্যার ইতিহাস লেখার ক্ষেত্রে মাদেলাপঞ্জিকে পরিহার করে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিয়েছেন। কখনোই ক্লাসিকাল সংযম ও শ্রেয়বুদ্ধির অভাব তো ঘটেইনি বরং একই ধরণের আবেগ ও অনুভূতি কাজ করেছিল। কারণ এর মূলে ছিল দেশের প্রতি প্রবল উন্মাদনা। ভারতীয় ইতিহাসের যে কোন বিভাগে রাখালদাসের ছিল অবাধ বিচরণ, লেখনী স্বতঃসিদ্ধ; যা অন্য কোন ইতিহাস গবেষকের ক্ষেত্রে সচরাচর চোখে পড়ে না। 'নিছক গবেষক রূপে এমন বিশাল ক্ষেত্রে তাঁর অনায়াস বিচরণ আমাদের চমৎকৃত করে'।[৩০] একটি বিশেষ পরিস্থিতিতে রাখালদাস উড়িষ্যার ইতিহাস লেখার দায়িত্ব নিয়েছিলেন। রাখালদাস ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব বিভাগে উচ্চপদে আসীন ছিলেন। কর্মের প্রতি একান্ত নিষ্ঠা, সহজাত ক্ষমতা, বহুমাত্রিক প্রজ্ঞা ও মেধা থাকা সত্ত্বেও শুধুমাত্র অপরিণামদর্শিতা ও ভারতীয় হওয়ার জন্য ইংরেজদের মাৎসর্যের শিকার হয়েছিলেন। পরিণতিস্বরূপ তিনি ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে কর্মচ্যুত হন। অমিতব্যয়িতার দরুন গচ্ছিত সম্পত্তির বিনষ্টি ও চাকুরি হারিয়ে কপর্দকশূন্য অবস্থায় দুরারোগ্য রোগের শিকার হন। এই দুর্দিনে রমাপ্রসাদ চন্দের পরামর্শে ময়ূরভঞ্জের মহারাজা স্যার পূর্ণচন্দ্র ভঞ্জদেবের আর্থিক সহায়তায় *'History of Orissa'* লেখেন। কখনো আবার রাজা কালীকৃষ্ণ ঠাকুরের পৌত্র রাজা প্রফুল্ল ঠাকুরের গৃহে গৃহশিক্ষকতা করেও জীবন নির্বাহ করেন। তাঁর লেখা বিপুলায়তন উড়িষ্যার ইতিহাস দু'খণ্ডে বিভক্ত। প্রথম খণ্ডটি ২২টি অধ্যায়সহ ৩৫০ পৃষ্ঠায় বিন্যস্ত; যাতে প্রাচীনতম কাল হতে সূর্যবংশীয় গজপতিরাজাদের শাসনের অবসান পর্যন্ত দীর্ঘ রাজনৈতিক ইতিহাস আলোচিত হয়েছে। গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে ৮টির মধ্যে ৬টি অধ্যায়ে রাখালদাস উড়িষ্যার মুসলমান, মারাঠী এবং ব্রিটিশ আধিপত্যের ইতিহাস বর্ণনা করেছেন। বাকী ২টি অধ্যায়ে প্রায় পাঁচশ'রও বেশী পৃষ্ঠা জুড়ে উড়িষ্যার ভাস্কর্য ও স্থাপত্য শিল্পের সমৃদ্ধ ইতিহাস আলোকপাত করেছেন । শ্রীদীনেশচন্দ্র সরকার লিখেছেন, 'গ্রন্থখানিতে সাহিত্য, সমাজ, রাষ্ট্রশাসন প্রভৃতি বিষয়ের স্বতন্ত্র আলোচনা স্থান পায় নাই। সেদিক হইতে দেখিলে ইহাকে অসম্পূর্ণ বলা যাইতে পারে। কিন্তু রাখালদাস উড়িষ্যার রাজনৈতিক এবং শিল্পকলা বিষয়ক ইতিহাসের যে কাঠামো দাঁড় করাইয়াছেন, উহা তাঁহার অসামান্য কৃতিত্বের পরিচায়ক'।[৩১] মাদেলাপঞ্জিকে অগ্রাহ্য করে শুধুমাত্র প্রত্নতত্ত্বের আলোকে উড়িষ্যার এরূপ সমৃদ্ধ ইতিহাস লেখা আগে কখনো হয়নি। রাখালদাসের ন্যায় সাহসী ও কৃতবিদ্য ঐতিহাসিক ছাড়া অন্য কারো পক্ষে এরূপ মহাগ্রন্থ লেখা সম্ভবপর নয়। রোগশয্যায় শায়িত থেকে দারিদ্রপীড়িত অবস্থায় তাড়াহুড়ো করে লেখার জন্য কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকলেও

উড়িষ্যার ইতিহাস রাখালদাসের এক অনন্য কীর্তির পরিচায়ক। ঐতিহাসিক গবেষণার ক্ষেত্রে আজও যে গ্রন্থটি অপ্রতিদ্বন্দ্বী_ তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

সার্ভের পশ্চিম সার্কেলের সুপারিন্টেন্ডন্ট হিসাবে রাখালদাসের মহেঞ্জোদারোর উৎখনন আর্যপূর্ব যুগের এক উন্নত ও যুগান্তকারী সভ্যতার উন্মোচন ঘটায়। যুগান্তকারী এই আবিষ্কারের রিপোর্টে প্রকাশিত হয়, 'এই সভ্যতা কেবল খ্রীষ্টপূর্ব দুই-তিন হাজার বছরের পুরাতনই নয়, এটি ভারত-ইতিহাসে প্রাগার্য যুগের সৃষ্টি'[৩২] এবং পৃথিবীর প্রাচীন সভ্যতাগুলোর মধ্যে শ্রেষ্ঠ। খননকার্যপ্রসূত মহেঞ্জোদারোর এই ইতিহাসটি স্থানিক ইতিহাস হলেও তার ব্যাপ্তি ছিল বিশ্বব্যাপী। এছাড়াও পুনায় পেশোয়ারের প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষগুলোয় খননকার্য চালিয়ে রাখালদাস বহু প্রাচীন পুরাকীর্তি উদ্ধার করেন। এই সময় ভূমারা, বাদামী ও ত্রিপুরীর মন্দির সম্পর্কে অনুসন্ধান করে তিনি যে রিপোর্ট তৈরী করেন, তা স্থানিক ইতিহাস হিসাবে পৃথক পৃথক তিনটি পুস্তিকায় স্থান পেয়েছে। রাজশাহীর পাহাড়পুরে খননকার্যের ফলে বৌদ্ধ-ইতিহাস উদ্ধার বাংলার ধর্মীয় ও শিক্ষার ইতিহাসে এক অনন্য সংযোজন। এছাড়া ইতিহাসকে আশ্রয় করে তিনি যে উপন্যাসগুলো (যেমন *'শশাঙ্ক', 'ধর্মপাল', 'সমুদ্রগুপ্ত', 'করুণা', 'ধ্রুবা'* প্রভৃতি) রচনা করেছেন তাতে যে বিশাল সাম্রাজ্যের ছবি পাই, তা প্রকৃতপক্ষে ভারতবর্ষের ঐক্যবদ্ধরূপ ছাড়া আর কিছুই নয়; যদিও আদতে সেগুলোর প্রতিটিই আঞ্চলিক ইতিহাসের সুরভিমাখা।

ইংরেজদের চোখে ভারতীয়রা অর্ধশিক্ষিত-বর্বর-নীচজাতি এবং তাদের কোনও সভ্যতা নেই; তারই বলিষ্ঠ প্রতিবাদ হিসাবে রাখালদাস প্রত্নতত্ত্বে-ইতিহাসে-উপন্যাসে প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন ভারতবর্ষ পৃথিবীর উন্নততম একটি সভ্যতা। তিনি তাঁর কর্মকৃতির মধ্য দিয়ে বাংলা তথা স্বদেশভূমি ভারতবর্ষের প্রাচীন গৌরব ও ঐতিহ্য উদ্ধারে মনোনিবেশ করেছিলেন। জাতীয়তাবাদের এক ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ প্রতিবেশে রাখালদাস জন্মেছিলেন জাতীয়তাবাদী ভাবধারাপুষ্ট এক বাঙালি পরিবারে। কৈশোরে তিনি প্রত্যক্ষ করেছিলেন স্বদেশী আন্দোলন ও ব্রিটিশের বিভেদনীতি। পরবর্তীকালে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ তাঁর জাতীয়তাবাদী ওজস্বিতার প্রকাশ। রাখালদাসের সময়কালকে, হিউ প্রিন্স এর ভাষায়, 'The great age of rediscovery' হিসাবে চিহ্নিত করাই সংগত। তাঁর 'আঞ্চলিক ইতিহাস-রচনার প্রয়াস_ যা জাতীয়তাবাদী ইতিহাস-রচনার প্রয়াসের অঙ্গ_ এক বিশেষ পর্বে শুরু হয়েছিল, এবং সে প্রয়াসের প্রাথমিক ঝোঁক ছিল রাজনৈতিক ইতিবৃত্তকে ঘিরে'।[৩৩] আঞ্চলিক ইতিহাসচর্চার ক্ষেত্রে রাখালদাস যে বিষয়বস্তু ও রীতি-পদ্ধতি গ্রহণ করেছিলেন, তাতে বিকশিত হয়ে উঠেছিল তাঁর জাতীয়তাবাদী সত্তা। বাংলা ও উড়িষ্যার আঞ্চলিক ইতিহাসচর্চা, প্রত্নতাত্ত্বিক উৎখনন ও প্রাচীনভারতীয় ইতিহাসের বীরচরিত্র নিয়ে সাহিত্যচর্চা_ এ সবই রাখালদাসের 'Micro Level'-এ ইতিহাসচর্চার উৎকর্ষ নিদর্শন।

এগুলোকে আমরা যদি একত্রিত করি, তবে ঐক্যবদ্ধ ভারতবর্ষের একটি সামগ্রিক চিত্র পাই_ এখানেই তাঁর জীবনের পরম সার্থকতা; আর এর মধ্য দিয়েই সত্য হয়ে ওঠে রাখালদাসের মর্মনিহিত স্বদেশভাবনা।

সূত্রনির্দেশ :

১. অমলেশ ত্রিপাঠী, ইতিহাস ও ঐতিহাসিক, কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ১৯৮৬, পৃষ্ঠা ১০৯ ।

২. তদেব, পৃ. ১০৯ ।

৩. অলোককুমার ঘোষ, ইতিহাসের তরজায় বাঙালি, পরিকথা: সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক পত্রিকা, সম্পাদক দেবব্রত চট্টোপাধ্যায়, ৩য় বর্ষ, ২য় সংখ্যা, মে ২০০১, পৃ. ১১২ ।

৪. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বাঙ্গালার ইতিহাস, বঙ্কিম রচনাবলী, কলকাতা: শুভম প্রকাশনী, ২০০১, পৃ. ৩৯১ ।

৫. প্রবোধচন্দ্র সেন, বাংলার ইতিহাস সাধনা, কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ১৯৯২, পৃ. ৬ ।

৬. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ইতিহাস, বিশ্বভারতী গ্রন্থবিভাগ, ১৪২০ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৫ ।

৭. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বাংলার ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি কথা, বঙ্কিম রচনাবলী, পৃ. ৪০০ ।

৮. মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়, উপন্যাসে অতীত: ইতিহাস ও কল্পইতিহাস, কলকাতা: থীমা, ২০০৩, পৃ. ৩৬ ।

৯. James Mill, The History of British India, vol. I, Book II, 3rd Edition, London: Baldwin, Cradock and Joy, 1826, P. 107 ।

১০. অলোককুমার ঘোষ, ইতিহাসের তরজায় বাঙালি, পৃ. ১১৪-১১৫ ।

১১. বিজিতকুমার দত্ত, বাংলা সাহিত্যে ঐতিহাসিক উপন্যাস, কলকাতা: মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৪০২, পৃ. ২৫৩ ।

১২. মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়, ঐ, পৃ. ১৫ ।

১৩. অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, বক্তৃতা: সাহিত্য পরিষৎ, সাহিত্য , বর্ষ ২৫, সংখ্যা ১, ১৯১৪, পৃ. ৪২-৫৪ ।

১৪. রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, বাঙ্গালার ইতিহাস, অখণ্ড সংস্করণ, ভূমিকা, ৪র্থ সংস্করণ, কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ২০১৪ । সেই সঙ্গে দেখুন: মানসী ও মর্মবাণী, ১৩২৫, পৃ. ৩১৮ ।

১৫. Srikanta Roychowdhury, From Bangalar Itihas to Bangalir Itihasa: History in Making, Maldah: Dipali Publishers, 2007, P. 65 ।

১৬. রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, ঐতিহাসিক গবেষণায় বঙ্কিমচন্দ্র, নারায়ণ, বঙ্কিমস্মৃতি সংখ্যা, বৈশাখ ১৩২২ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৫৯৭ ।
১৭. তদেব, পৃ. ৫৯৭।
১৮. তদেব, পৃ. ৫৯৮।
১৯. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বঙ্গে ব্রাহ্মণাধিকার, বঙ্কিম রচনাবলী, পৃ. ৩৭৮ ।
২০. রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, ঐতিহাসিক গবেষণায় বঙ্কিমচন্দ্র, পৃ. ৫৯৯ ।
২১. তদেব, পৃ. ৫৯৮।
২২. রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, বাঙ্গালার ইতিহাস, অখণ্ড সংস্করণ, ভূমিকা, ২০১৪ এবং মানসী ও মর্মবাণী, ১৩২৫, পৃ. ৩১৮।
২৩. রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, পরিশিষ্ট, বাঙ্গালার ইতিহাস, অখণ্ড সংস্করণ, ২০১৪, পৃ. ২২৭।
২৪. রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, ১ম সংস্করণের মুখবন্ধ: পাষাণের কথা, পরিবর্দ্ধিত সংস্করণ, কলকাতা: বসুমতি সাহিত্য মন্দির, ১৯২৩।
২৫. বাঙ্গালার ইতিহাস, অখণ্ড সংস্করণ, ভূমিকা, ২০১৪ এবং মানসী ও মর্মবাণী, ১৩২৫, পৃ. ৩১৮।
২৬. Srikanta Roychowdhury, ibid, p. 73।
২৭. বাঙ্গালার ইতিহাস, অখণ্ড সংস্করণ, ভূমিকা, ২০১৪ এবং মানসী ও মর্মবাণী, ১৩২৫, পৃ. ৩১৮।
২৮. চিত্ররেখা গুপ্ত, প্রত্নতাত্ত্বিক রাখাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, শতবর্ষের আলোয় রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, সম্পা. কল্যাণকুমার দাশগুপ্ত, কলকাতা: শরৎ সমিতি, ১৯৯০, পৃ. ৯৫।
২৯. রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, বাঙ্গালার ইতিহাস, অখণ্ড সংস্করণ, প্রারম্ভকথা , ২০১৪।
৩০. দিলীপকুমার বিশ্বাস, প্রাচীন ভারত-ইতিহাসচর্চায় রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, শতবর্ষের আলোয় রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, সম্পা. কল্যাণকুমার দাশগুপ্ত, পৃ. ১।
৩১. শ্রীদীনেশচন্দ্র সরকার, রাখালদাসের উড়িষ্যার ইতিহাস, কাঁসাই-শিলাই, সম্পা. প্রদীপ চক্রবর্তী, এপ্রিল-সেপ্টেম্বর, ২০০৫, পৃ. ১৩১।
৩২. দিলীপকুমার বিশ্বাস, প্রাচীন ভারত-ইতিহাসচর্চায় রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, শতবর্ষের আলোয় রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, ঐ, পৃ. ৮।
৩৩. রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, বাঙ্গালার ইতিহাস, অখণ্ড সংস্করণ, প্রারম্ভকথা, ২০১৪

মনোজ বসুর রাজনৈতিক চেতনা ও 'ভুলিনাই'

দেবজ্যোতি শীট
সহকারী অধ্যাপক, মহারাজা নন্দকুমার মহাবিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ:
সাহিত্যের রূপরীতি অনুসারে রাজনৈতিক উপন্যাস ও আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস তার নিজস্ব কিছু বৈশিষ্ট্যে স্বতন্ত্র। তবে সাহিত্য বিচারে সমালোচকের দৃষ্টিভঙ্গি আর সাহিত্যিকদের সৃষ্টিশীল স্বাভাবিকতা দুয়ে দুয়ে চার হয়না। তাছাড়া লেখক কাহিনীর কাটাছেঁড়ায় মগ্ন থাকেন না, কাহিনী ও রসময় আবেগের সমন্বয়ে থাকে তাঁর লক্ষ্য। সমালোচকের মন বিপরীত পথে অগ্রসর হলেও তা সাহিত্য সমালোচনা পদ্ধতির বিশেষ দিকে পরিণত হয়। অবশ্য সৎ বা অসৎ সমালোচকের তকমা দিলেও যুক্তি ও গ্রহণযোগ্যতা বিচারে সমালোচক পদ্ধতির নির্ণায়ক হয়ে ওঠেন। সব ব্যতিক্রমই আপাত অসহনীয় মনে হলেও তা স্বতন্ত্র। এদিক থেকে 'ভুলিনাই ' একদিকে রাজনৈতিক, অন্যদিকে 'আত্মজৈবনিক ' উপন্যাস। লেখকের নিজস্ব রাজনীতি ও নিরপেক্ষ রাজনৈতিক ভাবনার উত্তাপে উপন্যাসের সূচক বিশেষ গুরুত্ব লাভ করে। এই নিক্তিতে 'ভুলিনাই' উপন্যাসে মনোজ বসুর ব্যক্তিজীবন ও রাজনৈতিক মতাদর্শের রসায়ন আলোচিত হতে পারে।

সূচক শব্দ : রাজনৈতিক উপন্যাস, আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস, শনিবারের চিঠি, কল্লোল যুগ, flash back,law of Probability Necessity).

মানুষের জৈবিক ও সামাজিক জীবনপর্বে জড়িয়ে থাকে তার রাজনৈতিক চেতনা। নিজস্ব মতাদর্শ প্রতিটি মানুষের জিনগত বৈশিষ্ট্যে নির্দিষ্ট। সেই বৈশিষ্ট্যে একজন ঔপন্যাসিক যখন কোনও রাজনৈতিক বিষয়কে অবলম্বন করে তাঁর রচনাসৌধ নির্মাণ করেন, স্বভাবত তা অভিজ্ঞতা ও নিরপেক্ষ দৃষ্টির সমন্বয়ে গড়ে ওঠে। ঔপন্যাসিক মনোজ বসুর 'ভুলিনাই ' উপন্যাসটিতে লক্ষ্য করা যায় ব্যক্তির মতাদর্শ ও রাজনৈতিক ভাবনা যা তাঁর সৃষ্টিশীল অন্তর্গাত্রে শৈলীতে পরিণতি লাভ করেছে। 'ভুলিনাই ' একটি আত্মজীবনীমূলক রাজনৈতিক উপন্যাস। এক্ষেত্রে সমকাল, ব্যক্তিগত অনুভব ও বাস্তবতার অনুলিপি উপন্যাসটির আলোচনাপর্বে সহায়ক ভূমিকা নেয়। প্রাথমিকভাবে তাই ঔপন্যাসিকের মানসলোককে জানতে হবে।

কবিতা, ছোটগল্প ও নাটক রচনার মধ্য দিয়েই ঔপন্যাসিক মনোজ বসুর সাহিত্যের পথচলা শুরু। ১৩৪৮ সালে 'প্লাবন' নাটকটি প্রকাশিত হয়। এর দুবছর পরে লেখা 'ভুলিনাই' র মধ্য দিয়েই শুরু হয় তাঁর ঔপন্যাসিক জীবন। প্রথম উপন্যাস 'ভুলিনাই' তে অখন্ড বাংলার অস্থির এক রাজনৈতিক পরিবেশকে পটভূমিতে রেখে ,যে দলের হাত বয়ে স্বাধীনতা এসেছিল, সেই কংগ্রেসী কার্যকলাপকে আপন স্বদেশপ্রেমের

তীব্র অনুভূতির স্পর্শে নিজস্ব রাজনৈতিক চেতনা মতাদর্শকে তুলে ধরেছেন। আত্মজৈবনিক রীতির এই উপন্যাসে অভিজ্ঞতার টুকরো টুকরো ছবি গল্পিতভঙ্গীতে হয়েছে সূত্রায়িত, সময়কাল ছিল 'কল্লোল যুগ'। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়,তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মেজাজ-বৈশিষ্ট্যে স্বকীয়তার অনুঝুরি মনোজ বসুর উপন্যাস সম্ভার।

উপন্যাসের পথরেখায় ১৯১৭ থেকে ১৯৩৩ এর মধ্যে শরৎচন্দ্রের আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস 'শ্রীকান্ত ' এবং রাজনৈতিক উপন্যাস 'পথের দাবী ' র প্রকাশ ঘটেছে।১৯৪৩ এ সাহিত্যরীতির উপন্যাস ঘরানার দ্বিত্ব প্রভাবজাত মনোজ বসুর 'ভুলিনাই ' -একদিকে আত্মজীবনীমূলক, অন্যদিকে রাজনৈতিক উপন্যাস। মনোজ বসুর শৈশব ও কৈশোর জন্মভিটা ডোঙাঘাটার বনজভাবনায় মৃত্তিকাকর্ষী। যৌবন ও উচ্চশিক্ষার বিজ্ঞতায় পরবর্তীতে যোগ হয়েছে তাঁর রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের ইতিহাস। ১৯২১-১৯২২ থেকেই তাঁর তরুনরক্তে কল্লোলিত হয়েছিল তৎকালীন রাজনৈতিক কংগ্রেসী কার্যকলাপ, ১৯৪২ এর আগষ্ট আন্দোলনে স্বদেশপ্রেমের তীব্র অনুভূতি, মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলন। ১৯২২ এ আই,এ পরীক্ষার পাশের ফলে এলেন কলকাতায় সাউথ সাবর্বাণে।এখানে তাঁর ছাত্রজীবনের রাজনৈতিক রসায়ন 'ভুলিনাই ' উপন্যাস সৃষ্টির নেপথ্য ভূমিকায় উপাদান হয়ে ওঠে। উপন্যাসটি 'প্রবাসী ও 'শনিবারের চিঠি'
তে মনোজ বসুর চিত্তপট রূপে প্রকাশিত হয়েছিল। ১৯৭০ সালের পর রাজনীতির প্রত্যক্ষ যোগ থেকে সরে এলেও পরোক্ষ যোগসূত্র থেকেই যায়। যার প্রভাব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও শরৎচন্দ্রের মৃত্যুর পর প্রকাশিত 'ভুলিনাই ' উপন্যাসে লক্ষ্য করা যায় -

> "তিনি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মাঝে বসে, ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের সমাপ্তিপর্বে যখন রাজনৈতিক উপন্যাস লেখেন তখন তার সামনে তাঁরই মত গান্ধীবাদী আর- একজন লেখক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় অসহযোগ আন্দোলন করে (১৯২৯) জেলে গিয়েছিলেন এবং কংগ্রেস কর্মীরূপে সতীনাথ ভাদুড়ী তিনবার জেলে গিয়েছিলেন (১৯৪০,১৯৪২,১৯৪৫)। কিন্তু জেলে না গিয়েও মনোজ বসু তাঁর প্রথম রাজনৈতিক উপন্যাস 'ভুলিনাই '১৯৪২এ লিখলেন, সতীনাথ ভাদুড়ীর 'জাগরী'(১৯৪৫)লেখার তিন বছর আগে।"১

স্বাধীনতার আকুতি প্রতিটি ভূমিবাসীর অস্থিমজ্জাগত। নিজস্ব জীবনকে ছুঁয়ে-ছেনে দেখার অনুভূতিস্তম্ভে ভর করে 'ভুলিনাই' উপন্যাসের চরিত্রগুলো রাজনৈতিক রঙে ছুপেছে। বাগের হাট কলেজে পড়ার সময়ই মনোজ বসুর মধ্যে কংগ্রেসীচেতনা নীরবে যে ঊর্ণনাভের বিস্তার ঘটিয়েছে তা-ই আবেগমথিত স্মৃতিচারনায় উপন্যাসে টুকরো টুকরো ছবিতে গল্পরস সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে। ১৯২২ এর পরে মনোজ বসু সরাসরিভাবে

রাজনীতির সাথে যুক্ত না থাকলেও, বিপ্লবীদের গোপন তথ্য সরবরাহ থেকে পিছপা ছিলেন না। তাঁর রাজনৈতিক অভিজ্ঞতার ভান্ডার ১৯৪২ এর আগষ্ট পর্যন্ত ছিল পরিপূর্ণ। সমকালীন জীবন অভিজ্ঞতার বীজ অঙ্কুরিত হয়েছিল 'সৈনিক ','আগষ্ট ১৯৪২','বাঁশের কেল্লা,' এবং প্রথম উপন্যাস 'ভুলিনাই 'তে।

১৯৩৬ সাল পর্যন্ত সন্ত্রাসবাদ ও কংগ্রেস আন্দোলনের পটভূমিকে 'ভুলিনাই ' উপন্যাসের বিষয়রূপে ঔপন্যাসিক নির্বাচন করেছেন। সংগ্রামী শহীদদের কার্য-কলাপকে অতীত স্মৃতির সোনালী সূতোয় তুলে ধরা হয়েছে।উপন্যাসটির সূচনাপর্বে সম্বোধিত করা হয়েছে বহুবাচনিক অতীতচারী বক্তব্যে- ' কুন্তলদা তোমাদের ভুলিনি '। উপন্যাসের বিষয় ও কুন্তলদা চরিত্র নির্মাণের প্রেক্ষাপট লেখকের সাক্ষাৎকার থেকে পাওয়া যায়-

> "কুন্তল চক্রবর্তী, চারুঘোষ (এরা দৌলতপুর কলেজের ছাত্র) প্রমুখ সর্বত্যাগী বিপ্লবীদের কথা ক'জনই বা জানে। ইংরেজের কড়া শাসন চলেছে তখন। আমার চেষ্টা হল,কুন্তল নামটা অন্তত লোকে জানুক। 'ভুলিনাই' লিখলাম,বইটা বিপুল জনপ্রিয়তা পেয়েছিল। একবার ট্রেনে চড়ে যাচ্ছি। হঠাৎ দৌলতপুর স্টেশনে শুনতে পেলাম, এক প্যাসেঞ্জার বলে উঠল , কুন্তল দা,ভুলিনি তোমাদের-ভুলিনি। 'ভুলিনাই ' এর প্রথম কথা। আমার উদ্দেশ্য পুরেছে,অতএব ভারি তৃপ্তি পেলাম। "

'ভুলিনাই' উপন্যাসের সূচক বাচনের উৎসটি লেখকের সাক্ষাৎকার থেকে যেমন পাই,তেমনই তাঁর সাহিত্য কর্মের পরিচয় পেতে গেলে ঔপন্যাসিকের জন্মভূমি ডোঙাঘাটা ও তার আশপাশের এলাকার কথাও খেয়াল রাখতে হবে। কারন-

"ভুলিনাই 'র কাহিনীও ডালপালা গজিয়ে মহীরুহ হয়ে উঠেছে এ অঞ্চলে ঘিরেই। কুন্তলদা, আনন্দ কিশোর, রাণী , সোমনাথ, মায়া,মল্লিক,শঙ্কর ভুলিনাই ' র এসব চরিত্র মনোজ বসুর মনোজগতে জন্ম নিলেও এরা সকলেই এতদঞ্চলের মানুষের এক একজন প্রতিনিধি। চরিত্রগুলো কংগ্রেসের নিবেদিত প্রাণকর্মী। দেশকে স্বাধীন করার জন্যে তাদের প্রত্যেকের মধ্যে যে আকুতি ও আত্মত্যাগের স্পৃহা, তা পাঠকের অন্তর্জগতে আলোড়ন তোলে বৈ কি। বিশেষ করে কুন্তলদার বৈরাগ্য জীবন, তার নিঃস্বার্থ দেশপ্রেম, শেষপর্যন্ত দেশের জন্যে তিলে তিলে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়া তাকে ভুলিনাই 'র নায়কই শুধু করেনি একটি অনুসরনীয় দেশপ্রেমিক দেবতাও বানিয়ে ফেলেছে।"২

লেখকের জবানবন্দি,আলোচক-সমালোচকদের মন্তব্য থেকেই উপন্যাসটির চরিত্রগুলো যে সমকালীন বাস্তব সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। বাস্তবের সত্য আয়নার মত উপন্যাস সত্যে পরিণত হয়না।তাই চরিত্রগুলি ঘটনার সাম্যতায় নাম পরিবর্তন করেছে--

> "প্রসঙ্গ সূত্রে লেখকের মুখে শুনেছি বাগের হাট কলেজের অধ্যক্ষ কামাখ্যা চরণ নাগ এই গ্রন্থের ডাকসাইটে প্রিন্সিপাল নীলকান্ত রায়ের প্রতিরূপ। গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলনে সাড়া দিয়ে মনোজ বসু

> যখন কলেজ পরিত্যাগ করেন তখন কামাখ্যাবাবু তাঁদের সকলকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন-তাঁরই স্মৃতি নীলকান্ত রায় এবং প্রিয় ছাত্র কুন্তলের কথোপকথনে উপস্থাপিত হয়েছে।--------------------------মুগ্ধতার ছবি আছে সরোজ পাকড়াশি ও নিরূপমা-শঙ্করের চরিত্রে। বিপ্লবী শ্রী ভূপেন্দ্র কুমার দত্ত গুলির ক্ষতের ব্যান্ডেজ ইচ্ছাকৃত ছিঁড়ে মৃত্যুবরণের পন্থা গ্রহণ করেছিলেন ; সরোজ পাকড়াশিও উপন্যাসে তাই করেছে।অপর পক্ষে সুহাসিনী গাঙ্গুলি এবং শশধর আচার্য পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে দলের কাজ করার জন্য চন্দন নগরের একটি বাড়িতে স্বামী-স্ত্রীরূপে অভিনয় করেছিলেন; নিরূপমা ও শঙ্করের অজ্ঞাতবাসে লেখক তার ছবিই এঁকেছেন। "৩

মনোজ বসুর 'ভুলিনাই ' উপন্যাসটির শিরোনামের মধ্যে নিহিত আছে স্মৃতিসঞ্চয়িত আত্মজীবনীমূলক বয়ান । বাংলাসাহিত্যের এই নবধারারসূচনা পূর্বে শরৎচন্দ্রের 'শ্রীকান্ত ' ও 'পথের দাবী' র প্রভাব 'ভুলিনাই' র মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। 'পথের দাবী' র সব্যসাচী এবং 'শ্রীকান্তে' র ইন্দ্রনাথ চরিত্র দুটোর রাজনৈতিক কৌশল ও সাহস,দক্ষতার যুগ্ম সমন্বয় কুন্তলদা চরিত্রে কিছু প্রভাব আছে। যদিও কুন্তলদা চরিত্রটি অপর দুটি চরিত্রের মত এতখানি কাহিনীর মাপে সংগঠিত নয়। কারন যে রাজনৈতিক সক্রিয়তা ,ঘটনার প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রক ভূমিকা দরকার ছিল কুন্তলদা সেই কেন্দ্রীয় ভূমিকা নিতে পারেনি। এছাড়াও কাহিনী এখানে গল্পঢঙ্ নিয়ে চরিত্রগুলোর বর্ণনায় ব্রিটিশ-বিরোধী তরুনদের আত্মবলিদানের ছায়ারূপ ধরে কাহিনীতে এসেছে।

গঠনশৈলীর নিরিখে 'ভুলিনাই ' সাতটি পরিচ্ছেদে বিভাজিত। প্রথম পরিচ্ছেদটি- 'কুন্তলদা তোমাদের ভুলিনি' উক্তিতে শিরোনামহীন। অন্যান্য পরিচ্ছেদ যথাক্রমে- রাণী,আনন্দ কিশোর, নিরূপমা,সোমনাথ ও মায়া , কুন্তলদার মৃত্যু এবং শেষ প্রসঙ্গ মল্লিকার কাহিনীতে পরিসমাপ্তি ঘটেছে। শিরোনামযোগে চরিত্রগুলি গল্পরসে আবেগ-বেদনায় উপস্থাপিত। ভালোবাসার সৃষ্টি করলেও সর্বত্যাগী সহিষ্ণুতায় বিপ্লবের সংঘাত-সমরক্ষেত্র রচনা করতে পারেনি। তবে বিপ্লববাদের বহুবিনষ্টির মধ্য দিয়েই স্বাধীনতার উত্তরণ ও স্বপ্নবীজ বোনার ক্ষেত্রকে উর্বর করেছে। উপন্যাসটির নায়ক শঙ্কর প্রথম অধ্যায়ে পাতানো বউ নিরু ওরফে নিরূপমা ,জগৎ দত্ত ও উমারানীর অনুসঙ্গে ডাকসাইটে প্রিন্সিপাল নীলকান্ত রায়ের পুত্র হিসেবে পিতার, ছাত্র কুন্তলদা স্বাধীনতা আনার স্বপ্ন ও আত্মত্যাগের কথা আবেগ-অনুভূতির তন্নতন্নরূপ কাহিনীর অন্য মাত্রা সৃষ্টি করেছে। মুখবন্ধে লেখক বকলমে নিজের রাজনৈতিক জীবন ও ভাবনার দোয়াতে কাহিনীর কলম ছুপিয়েছেন। শঙ্করের পরবর্তীকালের জীবন শৈশবে পাওয়া বাবার ত্যাগমন্ত্রে সোচ্চার রূপ লাভ করেছে- 'বড় কঠিন পথ পারবে তোমরা?'

এ প্রশ্নের উত্তরচিহ্ন সরোজের আত্মদান।যার সাথে বিনয়-বাদল-দিনেশের কর্মপদ্ধতি ও জীবন -পরিণাম সাদৃশ্য দেখতে পাই। ১৯৩০এর ৮ই ডিসেম্বর বিজয়কৃষ্ণ বসু গুলিবিদ্ধ ক্ষতস্থান যেভাবে ছিঁড়েফেলে মৃত্যুর দিকে অগ্রসর হয়েছিলেন উপন্যাসে সরোজও একই পন্থা অবলম্বন করেছে। আবার হিরণ পুলিশের হাতে ধরা পড়লে 'নির্ঘাত দ্বীপান্তর' জেনে, পুলিশের স্ত্রী শান্তিদিদি, বিপ্লবী হিরণ যাতে ধরা না পড়ে তারজন্য ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা জানিয়েছেন। কুন্তলদার ত্যাগ ও ভোগের বিস্তরফারাক তুলেধরে শঙ্কর আগামীর ভবিষ্যতের প্রশ্নে তুলেধরতে চেয়েছে -"সুরমা বলেছিল, নূতন পৃথিবীর নূতন স্বপ্ন দেখছেন কুন্তলদা যেখানে সবাই সুখী সবাই ভোগী। কিন্তু আপনি নিজে কি ভোগ করে গেলেন, বলুন তো?"৪

'রাণী' শিরোনামের পরিচ্ছেদটি বিপ্লবের উতপ্ত আঁচে এসেছে উমারানীর প্রসঙ্গটি। সে নিজের সাধ-আল্হাদকে বিসর্জন দিয়ে বৃদ্ধ রায়বাহাদূর অনন্ত প্রসাদ চক্রবর্তীকে বিবাহ করে বিপ্লবী দলকে রক্ষা করেছেন। শঙ্করের সঙ্গে নিজস্ব সম্পর্ককে অন্তঃসলিলা ফল্গুর মত নীরবে বহন করেছে। রায়বাহাদূরকে নিয়ে দূরে পরিচিতদের ভিড়থেকে অন্তরালে অনিচ্ছুক জীবনকে নীরবখাতে বয়ে নিয়ে চলেছে। একসময় সে জগৎদত্তের বাড়িতে বমাল পৌছে দিতে পুলিশকে বিপ্লবীদের আস্তানার সন্ধান থেকে বিরত রাখতে নদীর জলে ঝাঁপ দেয় এবং নিরুদ্দেশ হয়ে যায়। কুন্তলদার স্বদেশমন্ত্রের অগ্নিপ্রেমে প্রাণীত হয়ে মহামানবরূপে তাকে পূজা করতেও দ্বিধা সে করেনি। একসময় কুন্তলদাও অনুযোগপূর্ণ স্নেহস্বরে বলেছে -

> "বুঝলি শঙ্কর ,দেশ স্বাধীন হলে আমায় যদি রাজা করিস এই সেন্টিমেন্টাল মেয়েগুলোকে সকলের আগে আন্দামান পাঠাবো ।...................শোন রাণী তোমার বাবাকে বলেদেব কিন্তু।-সত্যি বামুনের মেয়ে হয়ে কায়েতকে প্রণাম করছ,জাত জন্ম রইল না আর।""৫

স্মৃতিকথার আত্মজৈবনিক ব্যাখ্যানে আনন্দকিশোরের অধ্যায়টিও এসেছে।বছর কুড়ির বেহালাবাদক আনন্দকিশোরকে 'সাধুমহারাজ' বলে সঙ্গী সঙ্গীসাথীরা ক্ষেপায়। সে কাজ চায় কুন্তলদার কাছে। ক্ষীয়মান শরীর সত্ত্বেও বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের অংশীদার হতে চায়।হিরণ তাই ব্যঙ্গ করে 'যাত্রাদল' খুলতে বলেছে।উঠতি বিপ্লবী হতে চেয়ে কারোরই প্রশ্রয় নাপেয়ে সরোজ জেলে থাকার সময় নিরুপমার ঘরে রিভলভারের ভয় দেখিয়ে গয়না হাতাতে গেছে ,বিপ্লবীদলের জন্য। এই ঘটনা নিরুপমা আগে থেকেই দলের থেকে জানতে পেরে রসিকতা করেছে।লেখক এখানে Serious Suspense ভেঙে এই কৌতুক রাজনৈতিক উপন্যাসের গাম্ভীর্য কে বেশকিছুটা লঘু করেছে। এই সাধারণ আনন্দ কিশোর বোমা তৈরী করতেগিয়ে পুলিশের গুলিতে মারা পড়লে করুন আবহের সৃষ্টি হয়েছে। নিঃশব্দ দেশপ্রেম ও দলপ্রেমের নজির হিসেবে বুকপকেটে 'কুন্তল' নামের চিরকূট ভরে রাখে,যাতে দলনায়ক কুন্তলের হদিশ আর

পুলিশ না পায়। কুন্তল বা বিপ্লবের জন্য আত্মত্যাগ আনন্দ কিশোর চরিত্রটি আলাদামাত্রা পেয়েছে।

পরবর্তী অধ্যায়ে এসেছে নিরুপমা-শঙ্করের প্রসঙ্গ। দলের কাজ করতে পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে পাতানো বর-বউ সেজে গা ঢাকা দিয়েছে। শঙ্করের মল্লিকার সাথে বিয়ের আগে নিরুপমার নীরব ভালোবাসার ত্যাগ-তিতিক্ষা চোরাস্রোতে আবহমান হয়ে উঠেছে। বিপ্লবের কঠিন পথ দুজনের মিলনকে করেছে অধরা। দলের কাজে শঙ্কর-নিরুপমার প্রথম দিনের পরিচয় স্মৃতি, রঙ্গরসিকতা 'ভুলিনাই ' রাজনৈতিক উপন্যাসের Serious ভাবনায় ভিন্নতার স্বাদ এনেছে--

> "আমি বললাম, অত সহজে কুন্তলদাকে পাওয়া যায়না। কি করতে হয়? সাধনা।দেখছিনা,সরকার বাহাদুর বছরের পর বছর কি অসামান্য সাধনায় লেগে আছেন।"৬

উপন্যাসটিতে ব্যক্তিজীবন ও গণজীবনের চালচিত্রে নারী -পুরুষের গোপন ডেরা, গল্প-গুজব, নানান অভিজ্ঞতার বিচিত্র প্রকাশ গল্পের আকারে তুলে ধরা হয়েছে। শঙ্করের স্মৃতিচারণায় কাহিনীর পরিণতি অগ্রসর হলেও নায়ক শঙ্করের এককত্বে কাহিনীর গতি বিশেষত্ব লাভকরেনি, গোষ্ঠীকর্মের দলিলে পরিণত হয়েছিল। বাস্তবের সাথে কাল্পনিক চরিত্রগুলি বিশেষ তাৎপর্য উপস্থিত হয়েছে। যেমন ভূপেন্দ্র দত্তের প্রতিভূ চরিত্র সরোজ পাকড়াশি। সুহাসিনী গাঙ্গুলী ও শশধর আচার্যের পুলিশের চোখ এড়িয়ে পালিয়ে যাওয়ার ঘটনার সাথে মিলেযায় নিরুপমা - শঙ্করের অজ্ঞাতবাস। দৌলতপুর কলেজের ছাত্র কুন্তল চক্রবর্তী ও চারুঘোষ ইংরেজের কড়া শাসন - আমলের দুটিচরিত্র উপন্যাসের কুন্তল চরিত্রে সমন্বিত-

> "নিঃশব্দ রাত্রে তোমরা এসে হাজির হও.... ..অভিমানহত আনন্দ আসে,........স্তব্ধ মূর্তি সোমনাথের ছায়াদেখে তাড়াতাড়ি যুক্তকরে প্রণাম করি।.........জগৎদত্ত,উমারানী,মায়া,সরোজ পাকড়াশি,জানা অজানা কত সাথী যেন যুগান্তরের ঘুম ভেঙে উঠে আসেন। "৭

'ভুলিনাই' উপন্যাসে প্রত্যক্ষ সংগ্রাম না থাকলেও সংগ্রামী ব্যক্তিত্বদের বঞ্চনা,ত্যাগ, নিঃস্ব-রিক্ততার ছবি আবেগময় পরিবেশে অন্যান্য আর চারটি রাজনৈতিক উপন্যাসের কাছাকাছি হলেও একটু অন্যমাত্রা যোগ করে।উপন্যাসের বাইক শঙ্করের স্মৃতিবাহিত হয়েছে আনন্দ কিশোর, নিরুপমা,সোমনাথ ও মায়াদের কথা। বিপ্লবীদলকে বাঁচাতে গিয়ে উমারানী নিরুদ্দেশ হয়েছে,আনন্দ উৎসর্গ করেছেন প্রাণ,নিরু গোপন চাওয়া-পাওয়া অশ্রুরুদ্ধ করে স্ত্রীত্বের অভিনয় করে গেছে।সোমনাথ ও মায়া স্বদেশমন্ত্রের অলক্ষ্যে সম্পর্কের লুকোচুরি খেলেছে। সবারই লক্ষ্য ইংরেজের বিরুদ্ধে আন্দোলনের রূপরেখা ও সক্রিয় ভূমিকার সম্পাদনা-

> "এই গ্রন্থে লেখক তাদের শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেছেন। অনেককালের পুরানো কথা- সেই সব মানুষ নেই, সে পৃথিবীও নেই, কেবল আছে কতকগুলো স্মৃতি। স্মৃতির সমুদ্র মন্থন করে লেখক 'ভুলিনাই ' এর যে চিত্র আঁকলেন তা বিচিত্র রমনীয়।"৮

'ভুলিনাই ' উপন্যাসের চরিত্রগুলি বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ ' এর সন্তানদলের ছাঁচে ঢালা। এর কাহিনীতে flash back এর মধ্যদিয়ে বহু ঘটনার অবতারণা ঘটেছে। স্বদেশপ্রেমের বীজ মন্ত্র আনন্দমঠ, বিবেকানন্দ, গণেশ দেউস্কর প্রসঙ্গে উপ্ত করেছেন মনোজ বসু। কাহিনীর পরিণামে কুন্তলদার মৃত্যুর মধ্যদিয়ে ট্র্যাজিক বেদনা ঘনীভূত হয়েছে। শঙ্কর-নিরুপমার নীরব ভালোবাসা আবেগ-অনুভূতির সাথে হাস্যরস রাজনৈতিক ও ব্যক্তিজীবন এক দ্বান্দ্বিক টানাপোড়েন আত্মজীবনীমূলক-রাজনৈতিক উপন্যাসে বিশেষ বৈশিষ্ট্যে উপস্থিত। জগৎ দত্ত মৃত্যুর নিশ্চয়তার মাঝখানে বিপ্লববাদের নতুন স্তোত্রে নির্বিকার-

> "আসামী জগৎলাল কাঠগোড়ায় চেয়ারের উপর নিতান্ত নির্লিপ্তের ন্যায় বসিয়া আছে । আলস্যে মাঝেমাঝে তাহার তন্দ্রাবেশ হইতেছে-এইরূপ একটি ভাব- বহুবাগাড়ম্বরের পর হুকুম জানিতে পারা গেল ,ফাঁসি। জগৎ হাসিমুখে জনকে নমস্কার করিল। " ।৯

যুগনির্মিত মনোজ বসু মূলত যে গল্পকথক তা উপন্যাসের কাহিনীর নির্মিতিতে বোঝা যায়। ফরাসী বিপ্লব ,রুশ বিপ্লবের ভুবনপারে দাঁড়িয়ে মনোজ বসু প্রাদেশিক আবহে বিষয় পরিমন্ডল গড়ে তুলেছেন তাঁর নিজস্ব ভাষা ও ভাবনার প্রয়োগে-

> "মনোজ বসুর উপন্যাসে তাঁর সমকালীন গজেন্দ্র কুমার মিত্র এবং উত্তরকালীন মহাশ্বেতা ভট্টাচার্যের ভাষা অনেকটাই আমরা লক্ষ করি। আঙ্গিক বিচারের সময় আমরা যেমন ঘটনার বাঁধুনি লক্ষ করি,তেমনই আবার law of Probability or Necessity অনুসারে উপন্যাস সুলভ বাস্তবের সঙ্গে কল্পনার মিশ্রন ঘটানোর ভাষা যে অন্যতম মাধ্যম সেটাও আমাদের মেনে নিতে হয়।"১০

মনোজ বসুর উপন্যাস, ঔপন্যাসিকের নিজস্ব চেতনার নিসর্গপ্রীতিতে মেঘনা পাড়,পাটের ক্ষেত,জোঁক ইত্যাদির বঙ্গীয় গ্রামজভাবনা, স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গীতে 'ভুলিনাই ' র রাজনৈতিক Serious Suspense কে আলতো ছুঁয়েছে। লৌকিক দেব-দেবীর অন্যতম ওলাবিবির প্রসঙ্গ এসেছে, কুন্তলদার মৃত্যুতে শোকাবহ পরিবেশ , শ্রাদ্ধবাসরের নিরুচ্চারিত ভীতিময় নিস্তব্ধতা ও ওলাবিবির প্রসঙ্গ উপস্থিতিতে রয়েছে ভয়ের ব্যঞ্জনা। বাক্যগঠনে আনুপ্রাসিক ভাবব্যঞ্জনাও লেখক ব্যবহার করেছেন-' সুরমা বলে, আপনারা যে ভোলবার নন,ভুলি কেমন করে'।ইতিহাস ও ভূগোল পরিক্রমায় স্থান নাম গুলি এসেছে-ঢাকা,ব্রহ্মপুত্রের খাল,সোনাগাঁ,মেঘনার কথা।'ভুলিনাই ' উপন্যাসে নাটকীয়তাও দূর্লক্ষ্য নয় -

> "শান্তমুখে মা জলের সেঁক দিচ্ছেন, সকলে নিঃশব্দে ফাইফরমাস খাটছে। তারপর গম্ভীর গলায় ডাক্তার বলে উঠলেন, স্টপ-বাজনা থামালাম। ডাক্তার বললেন ,আর কাজ নেই,আর শুনবেননা ইনি।"১১

ম্যাক্সিম গোর্কীর Mother এর মায়ের ছায়া কুন্তলদার মায়ের মধ্যে স্বল্পতম কয়েকটি আঁচড় লক্ষ্য করাযায়।কুন্তলদা কর্মক্ষেত্রে ঐন্দ্রজালিক মোহে অন্যান্য স্বদেশীকর্মীদের মুগ্ধতার আবেশে বশ্ করে রাখেন।অবশ্য উপন্যাসের কোথাও তার নিজস্ব সক্রিয়তা দেখাযায়না।দলের অন্যান্যদের মুখেই শুধু কুন্তলদার গতিবিস্তার পরিমাপ করে ক্ষান্ত হতে হয়।কথার চেয়ে কাজের তীব্রতায় চরিত্রটি পাকাপোক্ত না হয়ে ফাঁপা আদর্শবাদীতে পরিণত হয়েছে।বিবর্ণ, ক্লান্ত সৈনিকের পদচারনা ত্রুটিমুক্ত রাজনৈতিক উপন্যাসে উন্নীত হতে পারেনি। দেশাত্মবোধ ও জাতীয়তাবাদের সমতল ঘটনার প্রবাহ একঘেয়ে ক্লান্তির সৃষ্টি করেছে।

ঔপন্যাসিকের অভিজ্ঞতার নিজস্ব উত্তাপে চরিত্রগুলো হয়ে উঠেছে গতিময়। দেশেরপ্রতি মানুষের যে ভালোবাসার উদ্রেক হয়,তাকেই লেখক আসলে উপজীব্য করে গড়েতুলতে চেয়েছেন। উপন্যাসের রস আধারে আবার মুসলিম কোনো চরিত্র নেই, সবই হিন্দু ।হিন্দু বিপ্লবীচরিত্রের প্রসঙ্গ থাকলেও কোনো মুসলিম বিপ্লবীচরিত্র নেই। রাজনৈতিক উপন্যাস হওয়ার ক্ষেত্রে যে শৈল্পিক বৈশিষ্ট্য থাকে-তার সবগুলোই যে এখানে আছে তা বলা যাবেনা।তবুও বলতে পারা যায়-

> "দেশপ্রেমের সামগ্রিক কোনো চিত্র তুলে ধরার প্রয়াস এই উপন্যাসে নেই, নেই ধারাবাহিক গল্পধারা। স্বভাবতই বিচ্ছিন্ন গল্পের টুকরো টুকরো চিত্র উপন্যাসের গতিকে কিছুটা খর্ব করেছে"।১২

তথ্য সূত্র :

১) ঔপন্যাসিক মনোজ বসু:জয়দীপ ঘোষাল-বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ। পৃষ্ঠা-৩০।

২) দৈনিক ইনকিলাব-ডেস্কটপ ভিউ- ই পত্রিকা ,১৬ই ডিসেম্বর ২০১৭।-সায়ীদ আবুবকর, বাংলাদেশ।

৩) মনোজ বসু/ জীবন ও সাহিত্য-ড. দীপক চন্দ্র, বেঙ্গল পাবলিশার্স, নতুন সংস্করণ, পৃষ্ঠা-৩১ ।

৪) মনোজ বসুর শ্রেষ্ঠ রচনাসম্ভার-সুবর্ণ খন্ড -সম্পা.মনীষী বসু।পৃষ্ঠা-৮ ।

৫) ঐ,পৃ ১২

৬) ঐ, পৃ ২৫

৭) ঐ, পৃ ৫

৮) মনোজ বসু/জীবন ও সাহিত্য-ঐ,পৃ ৩২ ।

৯) মনোজ বসুর শ্রেষ্ঠ রচনাসম্ভার-ঐ,পৃ ৩৪ ।

১০) মনোজ বসু/জীবন ও সাহিত্য-ঐ,পৃ ১১১ ।

১১) মনোজ বসুর শ্রেষ্ঠ রচনাসম্ভার-ঐ,পৃ ৫৬ ।

১২) ঔপন্যাসিক মনোজ বসু,-ঐ,পৃ-৫০ ।

শর্মিষ্ঠা সিন্‌হার কাব্যগ্রন্থ ‘প্রত্যয়’ঃ একটি আদ্যন্ত অনুভব

রামকৃষ্ণ ঘোষ

স্যাক্ট-২, বাংলা বিভাগ, ক্ষুদিরাম বোস সেন্ট্রাল কলেজ

হৃদয়ের নির্জন বেলাভূমি থেকে যখন ডাকদিল লেখনীকে তখন তা কবিতা হয়েই ফুটে উঠল পংক্তিতে পংক্তিতে”- ২০২১ সালের ডিসেম্বর মাসে প্রকাশিত শর্মিষ্ঠা সিন্‌হার কাব্যগ্রন্থ ‘প্রত্যয়’-এর ভূমিকা অংশে এই স্বীকারোক্তিটি রয়েছে। কাব্যনাম ‘প্রত্যয়’ শব্দটি আজকের এই দ্বিধা-দ্বন্দ্বময় সময়ে যেন এক টুকরো আলোক উৎস। কাব্যটির গঠনগত দিক থেকেও অভি নবত্ব এনেছেন কবি। পঞ্চদশ পর্বে বিভক্ত এই কাব্য। প্রতিটি পর্বের ভাবগত ব্যঞ্জনা ও বিষয়ের নিরিখে নামকরণ করা হয়েছে। যথা- প্রথম পর্ব -‘‘স্মৃতিচারণা’, দ্বিতীয় পর্ব- সমন্বয় পর্ব’, তৃতীয় পর্ব, ‘প্রেম পর্ব’, চতুর্থপর্ব ‘ঘুরে দাঁড়ানো’ পঞ্চম পর্ব- ‘বিরহ’, ষষ্ঠপর্ব ‘প্রকৃতি’, সপ্তম পর্ব, ‘আত্ম শুদ্ধির জন্য প্রার্থনা’, অষ্টপর্ব- ‘তাৎক্ষনিক আনন্দের রেশের কবিতা’, নবম পর্ব- ‘নিঃসঙ্গতার কবিতা’, দশমপর্ব, ‘বিদ্রোহী সত্তা’, একাদশ পর্ব- মনস্তাত্বিক’, দ্বাদশপর্ব- ‘কায়িক জীবন আখ্যান’, ত্রয়োদশপর্ব- ‘হিংসাত্মক’, চতুর্দশ পর্ব- ‘অনন্য অনুভূতি’, পঞ্চদশপর্ব- ‘আত্মপ্রত্যয়ী’। ‘স্মৃতিচারণা’ নামক পর্বে ছটি কবিতা, ‘প্রেম পর্বতে পনেরটি, ‘বিরহ’ পর্বে ছটি, প্রকৃতি পর্বে ছটি, নিঃসঙ্গতার কবিতা’তে তিনটি, বিদ্রোহী সত্তাতে পাঁচটি, ‘মনস্তাত্ত্বিক’ অংশে দশটি ও অন্যান্য অংশে একটি করে কবিতার এক লিপিমালা হয়ে উঠেছে কাব্যগ্রন্থ ‘প্রত্যয়’।

বানীময় এই জগতে বানীর প্রকাশ হয় নানা ভাবে। কবিতা হল সেরকমই একটি প্রকাশ। সব বানীকে সবসময় ধরা যায় না, কিংবা সব বানী আমাদের কাছে ধরা দেওয়ার জন্য কবির কাছে দায়বদ্ধও নয়, অথবা সমস্ত বাণী সর্বদা চিত্রময়, রূপময়, ব্যঞ্জনাময়, বিশ্বজনীন হয়ে ওঠে না-- তবু কবিতার জন্ম হয়- শুধুমাত্র দুজনের আনন্দে। জীবনের সারাৎসার উপলব্ধি, ‘অনুভূতি, কল্পনা, বাসনা ইত্যাদি এক হয়ে একটি উর্বর মেঘ হয়ে ওঠে আর তখনই সে ধরিত্রীকে বর্ষন ধৌত করার জন্য উন্মুখ হয়--এভাবেও একটি কবিতার জন্ম হতে পারে। কিছু কবিতার জন্ম হওয়া মানেই একটি বোধের জন্ম। সেই বোধ জীবনানন্দের ‘বোধ’ কিনা সেটা পাঠকমহলের ব্যক্তিঅভিরুচি। কবিতাটি বিষয় ও শৈলীর নিরিখে কতটা কবিতা’ হয়ে উঠেছে, কবিতাটির ‘ধ্বনি’ কালের ধ্বনির সমকম্পাঙ্কের নাকি নিম্ন কম্পাঙ্কের না ধ্বনির পরিপন্থী এই দুটি বিষয়ের কথা বললে বলতে হয়- প্রথমটির বিচারক একজন একাধারে কবি ও ‘কাব্যের ভুত-বর্তমান জ্ঞান ঋদ্ধ অধ্যাপক’ এই নির্ধারিত ডিগ্রি হয়ত অনকের থাকতে পারে কিন্তু ও দুটোর কোনোটাই আমার অন্তত পূর্নমাত্রায় নেই। দ্বিতীয় যে

বিষয়টির উল্লেখ করেছি এইটিই হল কবিতার বিচারের সঠিক কষ্ঠিপাথর কিন্তু সমস্যা হচ্ছে মানুষ নয়, স্বয়ং কাল'ই এর বিচারক। সুতরাং পাঠকবর্গের কাছে আমার অনুরোধ আমার এই লেখাটিকে কেউ সমালোচনা ধর্মী লেখা হিসাবে গ্রহণ করবেন না; শর্মিষ্ঠা সিন্‌হার সদ্যপ্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ 'প্রত্যয়' এর এটি একটি পাঠ প্রতিক্রিয়া মাত্র।

স্মৃতিচারণা পর্বের কবিতাগুলিতে ইহলোক ছেড়ে চলে যাওয়া কয়েকজন মানুষের বিয়োগ ব্যথায় কবিচিত্ত আন্দোলিত হয়েছে। এইসব কবিতায় নিতান্তই কবির ব্যক্তিগতশোক ফুটে উঠেছে একজন রক্তমাংসের মানুষের মধ্যে যে হৃদয় থাকে, সে হৃদয় কিছু প্রিয়জনের, চেনা মানুষের চলে যাওয়ায় শুধুই চোখের জল, আক্ষেপ আর স্মৃতি চারণা ছাড়া কিছুই নিতে পারেনা সেইরকম হৃদয়ের শোক। আমরা যে লোকে অবস্থান করি সেটি হল মরলোক অর্থাৎ এখানে আমরা সবাই মৃত্যুকে প্রাপ্ত করি, এক একটা করে জন্মদিন আসে, আর আমাদের সঞ্চিত পরমায়ু ফুরাতে থাকে- আমরা ক্রমশ মৃত্যুর দিকে এগোতে থাকি। বেশ কিছু মৃত্যু কান্ডজ্ঞানহীনের মত এসময়ে আসে-তখন যেন বিধাতার উপরেই আমাদের একটা অভিমান ফুটে ওঠে। তবু আমাদের মনের ভাব ক্ষণিক আলোড়নের ভিতর সেইসব মৃত্যু জীবন্ত হয়ে ওঠে। 'পিতৃশ্রদ্ধাঞ্জলি' কবিতায় কবি লিখছেন-

''যে দায়িত্বের বীজ থেকে
প্রতিনিয়ত শিকড়গুলো বের হতে থাকে,
তার এক একটির মধ্যে তোমার অতি
প্রিয় স্পর্শের ছাপ আর ঘ্রান মিশে''..

কোনো মানুষের জীবনকে যখন আমরা স্মৃতিপটে দেখি তখন খুব ছোট ছোট হৃদয়াবেগ গুলো বড় হয়ে ভাস্বর হয়। যেমন--

''তোমার কিনে দেওয়া সেই সুন্দর জুতোটা
মাষ্টারমশাই দেখে বলেছিলেন,
যেন গ্রীক ভাস্কর্যের সৌন্দর্য খোদাই করা।''

''বুদ্ধিয়ীসম্' নিয়ে গবেষণারতা 'সায়ন্তনী'র অকালে ঝরে যাওয়া কবির পাতায় কবিতা হয়ে উঠেছে। 'সায়ন্তনী ফিরবে বলে আলো জ্বেলে রেখো' কবিতাটির শিরোনাম বেশ ব্যাঞ্জনাগর্ভ।

সমন্বয় পর্বের 'সম্প্রীতি' কবিতায় কবি 'এই পৃথিবীর রণ-রক্ত সফলতা' ভুলে গিয়ে মানুষকে প্রীতি ও ভালোবাসার চিরন্তন সম্প্রীতির মন্ত্র সাধনা করতে বলেছেন। সাম্য ও মৈত্রীর মাধ্যমে এক নতুন সমাজ গড়ার স্বপ্ন দেখেছেন কবি। কবিতাটির মধ্য থেকে কয়েকটি লাইন জ্বলজ্বল করে ওঠে--

"নীল আকাশের তলে এসো
প্রীতি অগ্নিতে হই শুদ্ধ
চেয়ে দেখো ওই অসীম শূন্যে
পারাবত পিকাসোর--"

তৃতীয় তথা প্রেমপর্বটি কাব্যের সব থেকে বৃহৎ অংশ। 'নির্জতার সঙ্গ সুখ' কবিতায় কবি প্রেমকে নির্জন প্রকৃতির মধ্যে একান্তভাবে খুঁজে পেয়েছেন, প্রিয় মানুষটি শরীরে উপস্থিত থাকলে হয়ত যে কথা বলা সম্ভব হত না, সেই সব কথা সহজ হয়ে ওঠে তার অনুপস্থিতিতে। নীল ক্রোকাস ফুলের মাথা নাড়া, কিংবা হিজিল নদীর স্রোতের ছন্দে কবির প্রেম কথা বলে--

"দর্পিত নীল ক্রোকাস ফুল,
হাওয়ায় মাথা নাড়ে--
হিজিলের ছপাৎ ছপাৎ স্রোতে ভেসে যায় (নির্জনতার সঙ্গসুখ)
তোমার অনুপস্থিতিতে তোমার সাথে
কত কি যে কথা হয়..."

'শর্তহীন' কবিতায় ফুটে উঠেছে নারী হৃদয়ের দুরন্ত বাসনার ' স্পর্ধিত আবেদন। যেখানে স্বাভাবিকভাবে পুরুষ নারীর কাছে যৌবন চেয়ে থাকে বিনিময়ে পায় কত বিনীদ্র নিঃসঙ্গ ও দাহ, সেখানে এই কবিতায় একজন নারী শর্তহীনভাবে তার নিজের নিঃসঙ্গতাকে অতিক্রম করতে চেয়েছে নিজেই, প্রেমিকের জন্য তাঁর খোলা প্রস্তাব শানিত তরবারির মত ঝলসে উঠেছে।

"এই নাও শর্তহীন
অসম্ভব কিছু মুহূর্ত্ত তোমায় দিলাম, (শর্তহীন)
এই নাও মোহনীয় গোলাপী সুরা সন্ধ্যা
এখন মাতল হবার সময়-"

এই পর্বের কবিতাগুলি পড়তে পড়তে হঠাৎই পেয়ে গেলাম একটি চমৎকার লাইন ও বেশ কয়েকটি রোমান্টিক শব্দবন্ধ। 'অমৃতগরল' কবিতার লাইনটিকে 'চমৎকার' বললাম কারণ এই লাইনটি একটি শাশ্বত দার্শনিক চিন্তার প্রতিফলন ঘটাতে পেরেছে। কবির মনে হয়েছে- 'দেবতা ও দানবের সঙ্গমে মানুষের জন্ম।' প্রত্যেকেই আমরা নিজেদের মধ্যে দানবিয় তমগুন ও দেবসুলভ সত্ত্বগুন লক্ষ্য করি, অর্ধজাগার বিবেকের কাছে 'সুমতি' আর 'সুমিতি' অজনা জপের মতোই অবিরাম যন্ত্রনা দিয়ে যায়। দ্বন্দ্বের এই অস্থিরতা এলে হয়ত আমরা স্মরণ করবো এই লাইনটি "দেবতা ও দানবের সঙ্গমে মানুষের জন্ম'। আমরা দেবত্বে

উপনীত হওয়ার চেষ্টা যদি একেবারেই না করি তবে ধীরে ধীরে সম্পূর্ণ দানবে পরিণত হই এই ভয় আমাদের তাড়া করতে থাকে। পাছে আর মনে হয় এই তাড়াটা পিছন থেকে আছে বলেই আমরা 'মানুষ'। 'অমৃত গরল' কবিতারই আরো কিছু ভালোলাগা লাইন তুলে ধরলাম যেগুলি রোমান্টিক চেতনায় সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে- সেই রোমান্টিকতা অবশ্যই এই বৈপরীত্যের দ্বন্দ্ব সংঘাতকে সাথে নিয়েই বিকশিত হয়েছে।

''চাপ ও তাপে অসম অভিশাপে শরীরের রূপ।
মনে খেয়ালী বাষ্পীভবনে সুধা ও গরলের
তারতম্য জনে জনে,
তার ওপর গঙ্গা বা জর্ডনের জল ছিটিয়ে- (অমৃত গরলে)
স্যাঁত স্যাঁতে আত্মায় জন্মেছে কিছু কৃষ্ণচূড়া,
যার শুকনো পাঁপড়ি পুড়িয়ে কবিরা নেশা করে
প্রেম করে মানব-মানবী।''

'রক্তগোলাপ' কবিতার কয়েকটি লাইনের মধ্যে কবির হৃদয়বত্তা ও ভালোবাসার আত্মপ্রত্যয়ী মনোভাব ব্যক্ত হয়ে উঠেছে।

''পৃথিবী কালো হয়ে যাক।
আকাশ নীল হারাক, (রক্ত গোলাপ)
আমার রক্তগোলাপ, রক্তগোলাপই থাকবে।''

প্রেমপর্বের কবিতাগুলিতে এক নিঃসঙ্গতা,বাসনা, ব্যক্তিগত কথোপকথন, যন্ত্রনা ও যৌনতার সুর পেলাম। প্রতিটি কবিই কোনো না কোনো দিক থেকে প্রেমিক, এমন কবি খুঁজে পাওয়া যাবে না যিনি একটিও প্রেমের কবিতা লেখেননি বা কবিতায় কোনো না কোনো সূত্রে প্রেম আসেনি। আর প্রেমের সাথে বিরহ- এতো খুবই স্বাভাবিক কারন। কাছে পাওয়ার থেকে দূরে পাওয়া প্রেমাস্পদকে অনেক বেশি করে হৃদয়ের কাছে টেনে আনে। যন্ত্রনার দাহ থেকেই প্রেম ভাষা পায়-- হৃদয়ের বিস্তার ঘটে। প্রেম অনেক রকমের হতে পারে--প্রকৃতি প্রেম, মানব-মানবীর প্রেম, বৈধ-অবৈধ প্রেম, ঈশ্বরের প্রতি প্রেম, জীবের প্রতি প্রেম, দেশপ্রেম, জীবনের প্রতি প্রেম ও আরো নানা রকমের। কবি কোনটি নির্বাচন করবেন তাঁর কবিতায় সেটি একান্তই তাঁর ব্যক্তিগত। আমার মনে হয় প্রেম একটি চর্চা, চর্যা। ছোট ছোট প্রেমের-বিরহের অনুভূতি থেকে আমরা সবাই অলিগলি বেয়ে বড়োপ্রেমের দিকে চলেছি। সেদিক থেকে দেখলে কোনো প্রেমই ছোট নয়--এমনকি মানব-মানবীর যৌনপ্রেমও। দেহকে নিয়ে যারা গরুখোঁজায় বুঁদ হতে পারে তারাই একদিন দেহতত্ত্ব বুঝতে পারে। সুতরাং দেহছাড়া প্রেমে পৌঁছানো যায় না, প্রেম ছাড়া পরমপ্রেমে পৌঁছানোর কোনো

উপায় নেই। আর প্রকৃত প্রস্তাবে আমরা প্রত্যেকেই প্রত্যক্ষ বা পরক্ষ ভাবে জৈবিক মানুষ। শর্মিষ্ঠা সিনহার প্রত্যয়' কাব্যগ্রন্থের প্রেমপর্বের কবিতাগুলিতে সেই জৈবিক সত্তাটি বেশ প্রতিষ্ঠিত।

তারপরেই চতুর্থপর্ব 'ঘুরে দাঁড়ানো'। এই পর্বে রয়েছে একটিই কবিতা-'অবক্ষেপন' এখন প্রশ্ন কোথা থেকে ঘুরে দাঁড়ালেন কবি? এক ব্যর্থতা থেকে। কিন্তু এই ঘুরে দাঁড়ানোটাই তো ইতিবাচক মনোভঙ্গির পরিচায়ক। সেখানেই তো জেগে ওঠে 'প্রত্যয়'। কবি যেন নিজের অতীতকে দিলেন উপলব্ধির এক পলিমাটি ভবিষ্যতের বেঁচেযাওয়ার জন্য--

''তবু সে আবর্তে যে
শেষ হয়ে যাইনি আমি
সেটা পরাজয় নয় (অবক্ষেপন)
সেও এক অভিজ্ঞতার সঞ্চয়,
এই পলিতে ফেলে রেখে যাব।

জীবনের নদীতে যে প্রেম জোয়ারের মত আসে ভাাটিতে সেই প্রেম আবার সমুদ্রে চলে যায়, পড়ে থাকে রিক্ত নদী আর মাঝিদের ভাটিয়ালী। তবু জীবনে ক্ষণিকেরও মূল্য আছে, বালির আঁক একসময় মিলিয়ে গেলেও জীবনের আঁকগুলো থেকে যায় জীবনের শেষদিন পর্যন্ত; সুখের সময়ে মনে পড়ে না কিন্তু একাকীত্বের সময়ে সারসের ডানার মত ধূসর হয়ে দূর দিকচক্রবাল থেকে উড়ে উড়ে আসে হৃদয়ের জলায়-- পড়ন্তবেলার অভিমানি রোদ্ গায়ে মেখে ওরা হয়ে যায় কবিতা। বিরহ পর্বের কবিতা গুলি কবির ফেলে আসা প্রেমের বিরহ সংগীত--নিতান্তই ব্যক্তিগত হৃদয়ানুভবের বহিঃপ্রকাশ। জীবনের না-চাওয়াগুলো আবার কোনো প্রাপ্তির বর্ণে, গন্ধে বিভোর হয়ে ফিকে হয়ে আসে-আসলে দেখা যায় জীবন এমনই সমুদ্র সৈকতের পলল স্তরের মত, এক সময়ের জীবন্ত জীব তার ভিতর ফসিল হয়ে থাকে। এই পর্বেও কবি বিরহের কবিতা লেখার পাশাপাশি নিজের আত্মপ্রত্যয়ী মনোভাব খুবই দৃঢ় এবং সেই দৃঢ়তার মূল কবির উপলব্ধির নির্যাস।

'' বছর আটেক হল জিনিয়া মারা গেছে,
ওর মৃত্যুর দিনে মনে হয়ছিল
ওকে ছাড়া বেঁচে থাকাই
সম্ভব নয়। (নস্টালজিক)
অথচ কি নির্দয় ভাবে
এতগুলো বছর বেঁচে আছি, বাঁচব--''

আমাদের মধ্যে একটা একটা ভ্রান্ত ধারনা আছে যে বাইরের গাছপালা -আকাশ-ফুল পাখি-নদী-পাহাড় এগুলোই প্রকৃতি; আসলে প্রকৃতি হল একটি আধার যার অসীমতায় বীজ, রূপ-রস-বর্ণ-বাঙ্ময় হয়ে প্রকাশিত হয়।

আসল কথা হল আমাদের এই দেহটাও প্রকৃতিরই একটি অংশ। তবে বস্তুময় প্রকৃতি ছাড়াও এক চৈতন্যময় প্রকৃতি আছে। চৈতন্যময় প্রকৃতির সাক্ষাৎ সাধারণ মানুষ পায় না, আমরা পরিচিত ভাষায় বলি অন্তঃকরণ বা অন্তঃপ্রকৃতি, জীবনের আসল সুরগুলো এখানেই বাজে। প্রাত্যহিক জীবনের চাওয়া, না-পাওয়া গুলো যখন বাদুড়ের ঝাঁকের মত ঘিরে ধরে, গতানুগতিক জীবন একঘেয়ে ভ্যাপসা হয়ে ওঠে, তখন সেই অন্তঃপ্রকৃতির নিজস্ব সুর গুলো আর শোনা যায়না বা খুব ক্ষীণ হয়ে পড়ে। এমন সময় বাহ্যপ্রকৃতির একটু বড় রকমের কোনো দোলা পেলে আবার ঠিক হয়ে যায়-বাইরের গাছ-পাখি-নদী-পাহাড় গুলো সেই উপলক্ষ্য মাত্র কবির প্রকৃতি পর্বের কবিতা গুলিতে বহিঃপ্রকৃতির বেশ কিছু মনোমুগ্ধ কর উপাদান আমরা পেয়ে যাই। যেমন-বৃষ্টি, অরণ্য, পরিযায়ী পাখি, আড়শেওড়া, ঘেসো জমি, নদী, পায়রা, কাক, ঝর্ণার কুলকুল, ছোট ছেলেদের ঘুড়ি ওড়ানো, কাকের অসময়ে ওড়াউড়ি, উড়ে আসা শুকনো পাতা, রক্তিম সূর্যাস্ত, কোকিল, বনফুলের শিষ ইত্যাদি।

> ‘‘এক একটা দিন সকাল থেকেই আমার সব ওলট-পালট হয়ে যায় চারিদিকের গাছপালা একটু বেশিরকম সবুজ আকাশটা একটু বেশিরকম নীল দেখায় দুপুর রোদে নাইট্রোজেন আলট্রাভায়োলেত মাঝেমাঝে কাকের অসময়ে ডাক উড়ে আসা শুকনো পাতা...” (বেহিসাবি)

কাব্যনাম নিয়ে আমি আর আলাদা করে কিছু লিখলাম না। কারণ ভিন্ন ভিন্ন স্বাদের কবিতা পড়তে পড়তেই প্রত্যয়ের সুর খুঁজে পাচ্ছি। যেমন-সপ্তম পর্বের ‘‘আত্ম-শুদ্ধির জন্য প্রার্থনা অংশে কবি একটি কবিতাকেই লিপিবদ্ধ করেছেন, যার নাম--‘পাপী তাপী মানুষকে দিতে হবে পবিত্রতার আলো’। মানব সমাজের মিথ্যা, প্ররোচনা, ছল, স্বার্থচারিতার্থতাকে এখানে কবি তীব্র শ্লেষাত্মক ভাষায় কুঠারাঘাত করে মানুষকে মনুষ্যত্বের পরাকাষ্ঠায় এনে দাঁড় করাতে চেয়েছেন-- মানুষের অজ্ঞানতার অন্ধকারে দিতে চেয়েছেন পবিত্র আলোর পরশমণি। এখানে কবি যখন ছদ্ম মনুষ্যত্বের বিদ্রোহী তখন তাঁর কবিতায় ধ্বনিত হয়--

‘শুধু জল দিয়ে পূর্বপুরুষদের
তৃপ্ত করা যায় না,
প্রয়োজন ভালো কাজের
মঙ্গল চিন্তা করা
সৎ হতে শেখা’

কবিতার শেষে কবি যীশুর কাছে অনাবিল পবিত্র আলোর প্রার্থনা করেছেন--

‘-হে যীশু তুমি তো
তোমার শত্রুদের ভালোবেসেছো!
যীশু তোমার বাণীতে শক্তি দাও--
হে পিতা, তুমি এদের ক্ষমা করো,
এরা জানে না এরা কী করছে।’

অষ্টম পর্বে ‘তাৎক্ষণিক আনন্দের রেশের কবিতা ‘শিরোনামে রয়েছে একটিই কবিতা ‘লং-ড্রাইভ অন্ কলকাতা’। ব্যক্তি জীবনে বোঝাই যাচ্ছে কবি লং-ড্রাইভে বের হতে খুবই ভালোবাসেন এবং স্বচ্ছন্দ্য তবে তা তার কাজের প্রয়োজনেই। চারিপার্শ্বস্থ-দৃশ্য তাঁকে এমন নয়নাভিরামে ভরিয়ে তোলে যে তিনি অত্যন্ত মুগ্ধ হয়ে তাঁর হৃদয়চ্ছোসিত আনন্দ পাঠকের সঙ্গে যেন শেয়ার করে নিতে চেয়েছেন। নবম পর্বের নিঃসঙ্গতার কবিতা পেরিয়ে আমি এসে পৌঁছব দশম পর্বের ‘বিদ্রোহী সত্তা’র কবিতা মালায়। বুঝতে পারি প্রেম, বিরহ, প্রকৃতি পেরিয়ে কবি তাঁর লেখনীতে শান দিচ্ছেন হাতিয়ার করে তোলার জন্য।

‘‘সৌদামিনী তুমি জ্বলে ওঠো
যদবধি যমান্তক মাৎসর্য
একটা জাঙ্গাল সৃষ্টি না করে। (বীপ্সা)

একাদশ পর্ব- মনস্তাত্ত্বিক-এ কবির শব্দচয়ন একটি বিশেষ মাত্র পেয়ে যায়। এটা একটু বিশেষ করেই বলতে হবে। বিশেষত ‘দহন’ ও ‘প্রগলভ্’ কবিতায়। শব্দ গুলো একটু তুলে ধরছি--‘মন থেকে চিন্তাগুলো ভার্টিক্যাল গতিতে/মাথার মধ্যে বিসর্পিল জট পাকায় থাকায়’ ‘বার দরিয়ায় নাগরিকগনের সার্বজনীন/মিলন গৃহ কম্পিত হয় টপ্পায়/ব্রহ্মার মানসপুত্র মৃগতৃষ্ণিকা মনে হয়!’ কিংবা ‘প্রধূমিত বিরংসাকে/দাও, প্রপতন। অনেকটা রেখার মতো..‘‘কবিতায় পেলাম একটি প্রশ্নের অপূর্ব মনস্তাত্ত্বিক বীক্ষণ--

‘‘স্বপ্ন এসেছিল--
সমান্তরাল সরলরেখায় নয়,
ত্রিভূজের মতো।
যেখানে তিনটি বিন্দু সঙ্গমে মেশে
সেই উচুঁ চূড়া, থেকে ঘুমন্ত চোখে,
বিশ্বাত্মার সমস্ত সৌন্দর্য প্রত্যক্ষিত হয়’’

দ্বাদশ, ত্রয়োদশ, চতুর্দশ, পঞ্চদশ পর্বে একটি করে কবিতা। পঞ্চদশ তথা শেষ পর্বে রয়েছে কাব্যের নামে কবিতা 'প্রত্যয়'। সবকিছু অতিক্রম করেও একটি আত্মপ্রত্যয়ী মুখ যেন কবিকে, তাঁর পাঠককে এবং বর্তমান সমাজকে কোনো এক ইতিবাচক সময়ে সংকেত দেয়।

'যমকে শাসন করে এখন দাঁড়াও তুমি
এখন আমায় ডাকলেও,
যাবার কোনো উপায় নেই,
অনেক কাজ আছে!
কিছুতো গুছিয়ে রেখে যেতে হবে
অতঃপর উত্থান-পতনে-পতন-উত্থানে (প্রত্যয়)
চলতে চলতে..
এক সময় তার কিছু চাওয়াকে,
সে মিলিয়ে নিতে পারে।
বড়ো আত্মপ্রত্যয়ী মুখ ভেসে ওঠে।"

যাইহোক, মন্থন চলুক--জীবনের যত ভাঁড়ার আছে সব কিছুর স্বাদ নিয়ে-সব রকমের দ্বিধা-সংশয়-প্রাপ্তি-ব্যর্থতা-সুখ-দুঃখকে সাথে নিয়ে-- অনুকুল- প্রতিকূল স্রোতে জীবন, ঠিকই এগিয়ে চলবে জীবনের পথে--'অমৃত' কিংবা 'গরল' উদ্যমে আমাদের গ্রহণ করার শক্তি অর্জন করতে হবে-- আত্মবিশ্বাসের সাথে ঈশ্বরের প্রতি এই বিশ্বাস মিলে গেলেই আমরা আমাদের হারিয়ে যাওয়া প্রত্যয় ফিরে পাব বলেই আমি মনে করি। তবে কবিতাও কখনো কখনো প্রত্যয়' এনে দেয়।

বাংলা সমালোচনা সাহিত্য বিকাশে তিন প্রতিবেশী রাজ্য : অসম, ঝাড়খণ্ড ও ত্রিপুরা

অনির্বাণ সাহু
সহকারী অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান
বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ
ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী বিশ্ববিদ্যালয়, রাঁচী, ঝাড়খণ্ড (ভারত)

সাহিত্য সমালোচনা একপ্রকার মহৎ শিল্পনৈপুণ্যের প্রকার। যে কোন সাহিত্যিকের রচিত বিশেষ সাহিত্যগ্রন্থের পূর্নমূল্যায়নে গড়ে ওঠে ঐ সাহিত্যিকের রচিত গ্রন্থের বিষয়বস্তু নির্মাণের সাহিত্য সাধনার শ্রেষ্ঠত্ব। আমার এই সাহিত্য সমালোচনা পর্বে আলোচিত হয়েছে তিন প্রতিবেশী রাজ্যের মোট পাঁচজন সাহিত্যিকের ভিন্ন ধারায় রচিত গ্রন্থগুলি। অসমের লেখক ও সাহিত্য সমালোচক তপোধীর ভট্টাচার্য রচিত 'উপন্যাসের ভিন্নপাঠ', ঝাড়খণ্ডের সাহিত্য সমালোচক চিত্তরঞ্জন লাহার 'এবং রবীন্দ্রনাথ', সমালোচক অর্ধেন্দুশেখর বাশুরীর 'প্রবন্ধকার রবীন্দ্রনাথ', অধ্যাপক সুব্রতকুমার পালের 'বাংলা ও হিন্দি পৌরাণিক নাটক' এবং ত্রিপুরার সমালোচক শিশিরকুমার সিংহের 'চলিত ভাষার বিবর্তন ঃ উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্য' গ্রন্থের বিচিত্র অনুভূতির স্বচ্ছ প্রকাশ, অবসান ও পুনর্গঠন মিলিয়ে আগ্রহশীল পাঠককে কালের প্রবাহে ঋদ্ধ করে তুলবে আলোচিত এই গ্রন্থগুলির সাহিত্য সাধনার মধ্য দিয়ে — এ বিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। বঙ্গের সমালোচনা সাহিত্যের ইতিহাস আজ অলঙ্ঘ্য না হলেও, বর্হিবঙ্গ ভারতে সমালোচনা সাহিত্যের ইতিহাস আজও অতল অন্ধকারের অপ্রকাশে আচ্ছন্ন। বর্হিবঙ্গ ভারতে সমালোচনা সাহিত্যকে অন্ধকার থেকে আলোয়, অপ্রকাশ থেকে প্রকাশের জগতে আনার স্বপ্ন ও সাধকে বাস্তবে রূপায়িত করার একটি ক্ষুদ্র প্রয়াস করা হল আমার এই প্রবন্ধে।

বহির্বঙ্গ ভারতে বাংলা সমালোচনা সাহিত্যে সাম্প্রতিককালে এক উজ্জ্বল জোতিষ্কেরআসাম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য অধ্যাপক তপোধীর ভট্টাচার্য। বাংলা সাহিত্য সমালোচনায় বহির্বঙ্গের সমালোচক গোষ্ঠীর অন্যতম বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব তপোধীর ভট্টাচার্য। তাঁর সমালোচনার রূপ-রীতি সম্পূর্ণ নিজস্ব ও অভিনব। সেই সঙ্গে বিষয় নির্বাচনেও তার মৌলিকত্ব অনস্বীকার্য। বিষয়বস্তুর মৌলিকতায় সমালোচনার অভিনবত্বে তিনি এক নিজস্ব জগৎ গড়ে তুলেছেন। তাঁর অজস্র রচনার মধ্যে একটি বিশিষ্ট গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত আলোচনা এখানে তুলে ধরা যেতে পারে। তাঁর 'আধুনিকতা, জীবনানন্দ ও পরাবাস্তব', 'আধুনিকতাঃ পর্ব থেকে পর্বান্তর', 'উপন্যাসের প্রতিবেদন', উপন্যাসের সময়', 'ছোটগল্পের বিনির্বাণ' — এই সবই তাঁর মৌলিক চিন্তার ফল। তন্মধ্যে

'উপন্যাসের ভিন্ন পাঠ' গ্রন্থটি তপোধীরের মৌলিক গবেষণায় এক অনন্য মাত্রা এনেছে। এখানে উপন্যাস সমালোচনায় তিনি গতানুগতিক পথে না চলে, নিজস্ব পথ নির্মাণ করেছেন। তপোধীর আলোচনার ক্ষেত্রে বর্ণনাত্মক রীতি গ্রহণ করেননি, ফলে তার আলোচনা প্রচলিত আলোচনাকে একরকম অস্বীকার করে নতুন পথ নির্মাণে এগিয়ে নিয়ে গেছে। তাতে বাংলা সমালোচনাও সমৃদ্ধ হয়েছে। এই গ্রন্থে যেসব আলোচনা করা হয়েছে সেগুলি হ'ল —

১। চোদ্দ শতকের বাংলা উপন্যাস

২। বাংলা উপন্যাস, এ সময়ে তত্ত্ব ও প্রয়োগের দ্বিরালাপ

৩। ঐন্দ্রজালিক বাস্তবতা অথবা বাস্তবের ইন্দ্রজাল

৪। অন্তঃশীলা আখ্যানের বিনির্মিত পাঠ

৫। ইচ্ছামতী রূপান্তরে ব্যক্তি স্বরূপ

৬। অমিয় ভূষণ, জীবন থেকে শিল্পে

৭। মহাশ্বেতার আখ্যান-বিশ্ব ইতিহাসের মনন

৮। স্বামী-স্ত্রী যৌথ শবাগারের বয়ান

৯। আখ্যানের অন্যমাত্রার খোঁজে / অথবা আখ্যান নির্ভর রচনা

১০। উপন্যাস সমালোচনার সাম্প্রতিক প্রবণতা

ধূর্জটিপ্রসাদের 'অন্তঃশীলা' উপন্যাসের সামগ্রিক বৈশিষ্ট্য আলোচনায় তিনি বলেছেন, "সন্দেহ নেই যে জীবনতত্ত্ব আর উপন্যাসতত্ত্ব এখানে যুগলবন্দি ধারা। কাহিনী তো বহির্বৃত্ত আকরণ মাত্র; একে খোলস বলে জানেন যিনি, তাঁর কাছে শাঁসই কাম্য কেননা কাহিনী মানে কৃত্রিমতার চতুর বিভঙ্গ, বাস্তবতার নামে বানানো বাস্তবের প্রদর্শনী জৈব সংস্থান মানুষের অভিজ্ঞান নয়; বৌদ্ধিক সামর্থ্যেই মানুষ নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে।"

তপোধীরবাবু চরিত্র বর্ণনা বা বিশ্লেষণে অগ্রসারিত হন নি - চরিত্রকে ততখানিই এনেছেন যতখানি প্রয়োজন হয়েছে। (কথাকার) অমিয়ভূষণ, জীবন থেকে শিল্পে - অধ্যায়ে অমিয়ভূষণের মানসজগতের সঙ্গে তার কথা সাহিত্যের সাধর্ম, তাঁর স্ববিরোধী মানসিকতার ছায়াপাত - তার সৃষ্টিতে সমালোচক জাগ্রত দৃষ্টিতে লক্ষ্য করেছেন। মহাশ্বেতার উপন্যাসে তপোধীর লক্ষ্য করেছেন ইতিহাস ও মননের যুগ্ম প্রবাহ। এখানে তিনি মহাশ্বেতা দেবীর সৃষ্টির বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্যকে সংক্ষেপে অথচ অত্যন্ত মূল্যবান বয়ানে তুলে ধরেছেন — "পাঠকেরা নিশ্চয় একমত হবেন, মহাশ্বেতার সৃষ্টিজীবনেও রয়েছে পর্ব থেকে পর্বান্তর আর আকরণের রুদ্ধতা থেকে আকরনোত্তর মুক্তির দিকে অভিযাত্রা। প্রচলিত পথে ঔপন্যাসিক হয়েছিলেন বলেই সেই পথের অন্ধবিন্দুগুলি সম্পর্কে তিনি ক্রমশ সচেতন হয়ে উঠেছিলেন।"

'উপন্যাস সমালোচনার সাম্প্রতিক প্রবণতা' অধ্যায়ে মহাশ্বেতা উপন্যাস সমালোচনায় আধুনিক সমালোচকদের গতিপ্রকৃতির পরিচয় দিয়েছেন। এখানেও তাঁর

বিষয় মৌলিক হয়ে উঠেছে। 'উপন্যাসের ভিন্নপাঠ' সত্যই উপন্যাস সমালোচনার ভিন্নপাঠ। স্বাদে-গন্ধে নতুনত্বের সৌরভ।

ঝাড়খণ্ড সাহিত্যাকাশের উজ্জ্বলতম জ্যোতিষ্ক সমালোচক চিত্তরঞ্জন লাহা। বঙ্গভারতীর আরাধনা ও উপাসনায় ঝাড়খণ্ড-বিহার শুধু সৃজনী সাহিত্যেই নয়, সমালোচনা সাহিত্যেও যে অবিস্মরণীয় অর্ঘ ও অঞ্জলি অর্পণ করেছে তার এক অত্যুজ্জ্বল উদাহরণ চিত্তরঞ্জন লাহা।

নদীমাতৃক দেশে জলের অভাব হয় না, জলের অভাব হয় মরুভূমিতে। মরুর বুকে যে নদীর স্রোত বইয়ে দেয়, ফুল ফোটায় তাকেই বলে স্রষ্টা। সমালোচক লাহা সেই স্রষ্টার ভূমিকায় অবতীর্ণ এক দুর্লভ ব্যক্তিত্ব। ঝাড়খণ্ড-বিহারের নীরস প্রতিকূল সাহিত্য সমালোচনার বলয়ে তিনি সৃষ্টি করেছেন এক অভিনব বিশ্ব। নিরলস ও অতন্দ্র এই জ্ঞানতপস্বী গবেষণার জগতে নতুন নতুন পরিকল্পনা ও সেই পরিকল্পনাকে বাস্তবে রূপায়িত করার নিরন্তর সাধনায় সতত নিমগ্ন।

ঝাড়খণ্ডের রবীন্দ্র সমালোচনার ইতিহাসে সমালোচক লাহা একজন স্মরণীয় ব্যক্তিত্ব। তাঁর অসাধারণ মনন কর্ষণে যে সোনার ফসল জন্মেছে সেগুলির মধ্যে 'এবং রবীন্দ্রনাথ' (প্রকাশকাল - মে, ১৯৯৬) প্রধান। গ্রন্থটি অরুণ আলোর মতো স্বচ্ছ ও স্বচ্ছন্দ চিন্তার আলোকে আলোকিত, চন্দ্রালোকের মতো স্নিগ্ধ ও মধুর সাহিত্যরসে পরিপূর্ণ। তাঁর আলোচনা সম্ভারের পরিচয় সূত্রে এক আশ্চর্য মনীষা, বিদগ্ধতার পরিচয় তুলে ধরা যেতে পারে আলোচ্য এই গ্রন্থের মধ্যদিয়ে। লাহার 'এবং রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থটি এখনো পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে লেখা ঝাড়খণ্ডের সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। রবীন্দ্র সমালোচনার গতানুগতিক ধারায় এক ব্যতিক্রমী গ্রন্থ। রবীন্দ্র আলোচনার বৈচিত্র্যবয়ণ ও গভীরতা নির্মাণে অপূর্ব সফলতা অর্জন করেছে।

রস সাহিত্যিক ও সমালোচকের যুগল সত্তা যদি কোনো সমালোচকের মধ্যে প্রকাশ পায় তাহলে যে দুর্লভ বস্তু পাওয়া যায় তা অতুলনীয় কীর্তিরূপে 'কালের কপোলতলে' চিরন্তন হয়ে থাকে। রাঁচী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের প্রাক্তন অধ্যাপক চিত্তরঞ্জন লাহার 'এবং রবীন্দ্রনাথ' সেই অতুলনীয় গবেষণারূপে মহাকালের সোনারতরীতে চিরকালের জন্য স্থানলাভ করতে সমর্থ হবে। বাংলা সারস্বত সমাজের শ্রেষ্ঠ রত্নরা এই গ্রন্থের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। এই গ্রন্থটি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত বিভিন্ন প্রবন্ধের সঙ্কলন। গ্রন্থটির নামকরণ অভিনব। শুধু নামকরণেই নয়, এর অন্দর মহলও অভিনব ও অনুপম। গ্রন্থটি গড়ে উঠেছে তেরোটি প্রবন্ধ নিয়ে। সেগুলি হলো —

(ক) বাংলা কথাসাহিত্যে বিহারের মাটি ও মানুষ

(খ) কালীকৃষ্ণ দাসের "মানভঞ্জন"

(গ) বঙ্কিম রহস্য

(ঘ) বাংলা ও ভোজপুরী বিবাহগীত
(ঙ) রবীন্দ্র ভাবনায় বর্ষা
(চ) রবীন্দ্রনাথের শরৎ ভাবনা
(ছ) শৈবলিনী থেকে আরতি
(জ) বাংলা ও হিন্দী নাটকে রামকথা ও কৃষ্ণকথা
(ঝ) বাংলা ও হিন্দী ঐতিহাসিক নাটক
(ঞ) মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য ও রবীন্দ্রনাথ
(ট) সীমান্ত বাংলার লোকগীতে ননদিনী কথা
(ঠ) ত্রিভুজে ত্রয়ী এবং
(ড) চিত্রাঙ্গদা— শতবর্ষের আলোকে।

এই তেরোটি প্রবন্ধের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গে রয়েছে তিনটি প্রবন্ধ — যা রবীন্দ্র গবেষণার এক অভিনব দিগন্তের উন্মোচন করেছে। প্রথম প্রবন্ধ — 'বাংলা কথাসাহিত্যে বিহারের মাটি ও মানুষ' প্রকাশিত হয়েছিল শারদীয়া বসুমতীতে ১৩৯২ সালে। এই প্রবন্ধটি ভাবে - ভাষায় অনুপম। সমালোচনা সাহিত্যে নবমেঘদূত। বঙ্গভারতীর পূজায় বিহারের ভূমিকা যে ঈর্ষণীয় ও অবশ্য স্মরণীয় তা প্রবন্ধটিতে সরব ও সোচ্চার হয়ে ওঠে। গ্রন্থকারের ভাষায়, 'বিহার ..... বাংলা সাহিত্যের শুধু সিদ্ধিক্ষেত্র নয়, সাধনক্ষেত্রও। বিহার বঙ্গ-ভারতীর সাহিত্যযজ্ঞে শুধু ঋত্বিক দেয়নি, সমিধও দিয়েছে। ক্ষেত্র বিশেষে মিস্ত্রী ও মালমশলা দুইই বিহারের।' বঙ্গজননী ও বিহারজননীর সন্তানেরা বিহারের মাটি ও মানুষের ছবি কীভাবে এঁকেছেন তার অপূর্ব রসজ্ঞ পরিচয় পাই এই প্রবন্ধটিতে। তথ্য ও রসের অপূর্ব মিলনে গড়ে উঠেছে। শুধু পাণ্ডিত্যই নয়, লেখকের মধ্যে এক অপূর্ব শিল্পীমন যে সদাজাগ্রত তা প্রবন্ধটির প্রতিটি ছত্রে তার প্রমাণ পাওয়া যায়।

কালীকৃষ্ণ দাসের "মান ভঞ্জন" প্রবন্ধটি অজানা তথ্য পরিবেশনের আনন্দে পূর্ণ। "বাংলা ও ভোজপুরী বিবাহগীত" শুধু তথ্যপূর্ণই নয়, রসমধুরও। "রবীন্দ্রভাবনায় বর্ষা" রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গে লেখা প্রথম প্রবন্ধ। রবীন্দ্র কাব্য, উপন্যাস, ছোটোগল্প ও প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের বর্ষাভাবনার রসগর্ভ পরিচয়। রবীন্দ্র ভাবনায় বর্ষার অনুষঙ্গে মানব বিরহের ভাবনা যে কতরূপে ফুটে উঠেছে সে সম্পর্কে সমালোচক লাহা খুব সুন্দর আলোচনা করেছেন। রবীন্দ্র বর্ষা ভাবনায় বিরহ ও মিলন দুটি দিকই প্রকাশিত — তা লেখকের দৃষ্টি এড়ায়নি। রবীন্দ্রনাথের বর্ষা ভাবনায় সঙ্গীতের ভূমিকাও যে গুরুত্বপূর্ণ তাও তিনি উল্লেখ করেছেন। তার পাশাপাশি বর্ষার সঙ্গে সঙ্গীতের পার্বতী পরমেশ্বরের যোগটিও তিনি আবিষ্কার করেছেন, 'রবীন্দ্রভাবনায় বর্ষার সঙ্গে সঙ্গীতের পার্বতী পরমেশ্বর সম্বন্ধ। বর্ষা প্রসঙ্গে তাঁর মননে এবং সৃষ্টিতে, সেই সঙ্গে বাস্তবজীবনেরও, সঙ্গীতের শতদল নানারূপে ও রসে পাপড়ি মেলেছে।' লেখক রবীন্দ্রনাথের বর্ষার বিরহ সম্পর্কে

বলেছেন, 'রবীন্দ্রনাথের বর্ষায় বাল্মীকির বিরহ বেদনা নয়, কালিদাসের যৌবন - বেদনার কথা। প্রথমটি বিষণ্ণ-বিধুর, দ্বিতীয়টি আনন্দ-মধুর।'

রবীন্দ্রনাথের শরৎভাবনা প্রবন্ধটিও অভিনব। রবীন্দ্র কবিতা, নাটক, উপন্যাস, গল্প সকল ক্ষেত্রেই শরতের অবস্থান ও ভূমিকার কথা লেখক বিদগ্ধ ভাষায়, গভীর ব্যঞ্জনায় প্রকাশ করেছেন। বর্ষা ও শরতের চলনশৈলী সম্পর্কে তিনি বলেছেন, 'বর্ষার চলা অভিসারের, শরতের চলা অভিমানের। বর্ষার চলা অনুরাগের, শরতের চলা বৈরাগ্যের।' 'মহুয়া'র 'লগ্ন' কবিতায় সেই চলাকে তিনি দেখেছেন। রবীন্দ্রনাথের ঋতু-ভাবনার একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্যের কথাও সমালোচক এই প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন, 'পৃথিবীর বুকে ঋতুমাল্যের যে আবর্তন তা মূলতঃ যেই অদৃশ্য নটরাজেরই বিভিন্ন নৃত্যরূপ, অথবা বলতে পারি পৃথক তালে একই নাচের নানা রূপ। এই ভাবেই শীতের জীর্ণ বস্ত্র ফেলে দিয়ে বসন্তের আনন্দিত আবির্ভাব, বাদল লক্ষ্মীর পোষাক ছেড়ে শরৎলক্ষ্মীর শুভাগমন।'

'বাংলা ও হিন্দী নাটকে রামকথা ও কৃষ্ণকথা' এবং 'বাংলা ও হিন্দী ঐতিহাসিক নাটক' প্রবন্ধ দুটি তুলনামূলক সাহিত্যের অপূর্ব ও অনুপম আলোচনা। 'মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য ও রবীন্দ্রনাথ' রবীন্দ্র দৃষ্টিতে বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগের অবলোকন। এই প্রসঙ্গে লেখকের অভিমত, 'মনন এবং গ্রহণ উভয়ক্ষেত্রেই রবীন্দ্রনাথ পথ হেঁটেছেন নিজস্ব প্রতিভার আলোকে। এই কারণেই মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য সম্পর্কিত রবীন্দ্রনাথের উক্তিগুলির মধ্যে আমরা শুধু মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের নয়, তাঁর মুখটিকেও প্রত্যক্ষ করি।' রবীন্দ্রনাথ রাজনৈতিক দুর্যোগের পটভূমিকায় মঙ্গলকাব্যে মানুষের দৈন্য ও দুর্গতির উৎস অনুসন্ধান করেছেন বলে লেখক তাঁর অভিমত প্রকাশ করেছেন। অন্নদামঙ্গল ও চণ্ডীমঙ্গলের কথা রবির চিন্তাভাবনায় বারংবার ছায়াপাত করলেও এই কাব্যদুটি সম্পর্কে খুব একটা প্রশংসার কথা তাঁর কণ্ঠে শোনা যায় না বলে সমালোচকের অভিমত। রবীন্দ্রনাথের 'অন্নদামঙ্গল গান রাজকণ্ঠের মণিমালার মতো' এই ব্যাখ্যার অনুসন্ধান করতে গিয়ে সমালোচক বলেছেন 'ভারতচন্দ্রের কাব্যের শিল্পসুষমার প্রশংসা করেছেন কবি কিন্তু প্রকারান্তরে এই কাব্যের অন্তঃসার-শূন্যতার প্রতি অঙ্গুলিনির্দেশও করেছেন।' কবির চণ্ডীদাসকেই শ্রেষ্ঠ কবি বলা প্রসঙ্গে লেখক যে মনোভাব এখানে ব্যক্ত করেছেন তা উল্লেখযোগ্য, 'বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস, বলরামদাস ইত্যাদি বৈষ্ণব পদকর্তাগণের কথা ও উদ্ধৃতি নানাভাবে ও অনুভবে রবীন্দ্র মনন ও সৃষ্টিতে সোচ্চার ও সমুজ্জ্বল। বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস সম্পর্কে একাধিক প্রসঙ্গে নিজের অভিমত প্রকাশ করেছেন তিনি এবং উভয়ের মধ্যে চণ্ডীদাসকেই তিনি শ্রেষ্ঠ কবি বলে ঘোষণা করেছেন। যে ব্যঞ্জনাধর্ম মহৎ কাব্যের প্রাণ চণ্ডীদাসের পদে তা প্রতি পদে উপলব্ধ এবং সেটাই কবির প্রীতি ও প্রশংসার প্রধান কারণ।' এই প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের লোকসাহিত্যচর্চার প্রসঙ্গটিও লেখক সুকৌশলে

ব্যবহার করেছেন। এবং আবশ্যক বলেই মনে করেছেন। শুধু তাই নয়, ্রদ্ধার সঙ্গেই তিনি বলেছেন রবীন্দ্রনাথ লোকসাহিত্যচর্চার উৎসাহী পথিকৃৎ। এই প্রসঙ্গে তাঁর আরও অভিমত, 'লোকসাহিত্য সৃষ্টির সুনির্দিষ্ট সন তারিখ খুঁজে বের করা আদৌ অসম্ভব। তবে বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে, বাংলা ভাষার উৎপত্তির ইতিহাসটি স্মরণে রেখে, এগুলিকে মধ্যযুগের সৃষ্টি বলে গ্রহণ করলে খুব একটা অপরাধ হবে না বলেই আশা করি।' এই উক্তির আলোকে আমরা লেখকের অসাধারণ বিদগ্ধতার পরিচয় খুঁজে পাই। বাউল গানের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ শুধু যে হৃদয়ের সহজ অনুভূতি ও সহজ সত্য এবং শাশ্বত মানবধর্মের অনুপম উপলব্ধির কবিত্বময় প্রকাশ লক্ষ্য করেছেন তাই নয়, এর মধ্যে ভারত ইতিহাসের মৌল অভিপ্রায়টির অপূর্ব সুন্দর প্রকাশও লক্ষ্য করেছেন তিনি অপূর্ব বিদগ্ধতার আলোকে। এই প্রসঙ্গে তাঁর আরও অভিমত, 'বাউল দর্শনটি রবীন্দ্রনাথের চিত্তকে কত গভীরভাবে আকৃষ্ট করেছিল তাঁর 'The Religion of Man' এবং 'মানুষের ধর্ম' গ্রন্থ দুটিতে তার অজস্র প্রমাণ ও পরিচয় ছড়িয়ে আছে।' সমালোচক লাহার 'সীমান্ত বাংলার লোকগীতে ননদিনী কথা' প্রবন্ধটি লোকসাহিত্যের নবদিগন্তের উন্মোচন। 'ত্রিভুজে ত্রয়ী' -বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ ও সমরেশ বসুর কালজয়ী চরিত্রের প্রতি নতুনভাবে অবলোকন।

চিত্তরঞ্জন লাহার আলোচ্য গ্রন্থ আলোচনা প্রসঙ্গে একথা বলা যায় যে, সমালোচকের মধ্যে কবিমন ও সূক্ষ্মবুদ্ধি, তীব্র ও অতন্দ্র অনুসন্ধিৎসার মিলনে গ্রন্থটি শুধু মননকেই তৃপ্ত করে না, হৃদয়কেও করে পরিতৃপ্ত। লেখকের বিশ্লেষণের গভীরতা তাঁর নানা মন্তব্যে প্রকাশ পেয়েছে গভীর আন্তরিকতায়। বলাবাহুল্য, 'এবং রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থটি শুধু তথ্যপূর্ণ নয়, ভাষার অপূর্ব কারুকার্যে ও ভাবের গভীরে অর্থদ্যোতনায় অনবদ্য। সেই সঙ্গে গবেষণার অসাধারণ মৌলিকত্বে উজ্জ্বল ও নবীন পথের দিশারী।

রাঁচি বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রাক্তন অধ্যাপক রবীন্দ্র সমালোচক অর্ধেন্দুশেখর বাশুরীর 'প্রবন্ধকার রবীন্দ্রনাথ' রবীন্দ্রগবেষণার একটি মূল্যবান সংযোজন। এই গ্রন্থে তিনি রবীন্দ্র প্রবন্ধগুলিকে বিষয় ও যুগ অনুসারে বিভক্ত করে আলোচনা করেছেন। এগুলির মধ্যে ধর্ম ও দর্শন এবং সাহিত্য বিষয়ক প্রবন্ধগুলির আলোচনায় অর্ধেন্দুবাবুর মৌলিক চিন্তাশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। গ্রন্থকার বলতে চেয়েছেন যে, রবীন্দ্রনাথের ধর্মচিন্তা তাঁর জীবনানুরাগের ফসল ও তাই তা সাহিত্যগুণসম্পন্ন, "রবীন্দ্রনাথের ধর্মবোধ জীবন সংপৃক্ত বলেই তার ধর্মবিষয়ক প্রবন্ধ সাহিত্য হয়ে উঠেছে।"

এই আলোচনায় রবীন্দ্রনাথের ধর্মচিন্তায় ঐক্যের ভাবটিও ধরা পড়েছে, "বিভিন্ন সাধন ধারাকে আপন অন্তরের অনুরঞ্জনে রসায়িত করে তিনি গ্রহণ করেছেন।" রবীন্দ্র ধর্মসাধনায় জ্ঞান-ভক্তি ও কর্মের সমন্বিত রূপটিও তাঁর দৃৃষ্টিগোচর হয়েছে। দুঃখের মধ্যেও আছে এই ঐক্যানুভূতি।

সাহিত্য বিষয়ক প্রবন্ধগুলির প্রসঙ্গে তিনি রবীন্দ্রনাথের অধ্যাত্মবাদের ছায়া খুঁজে পেয়েছেন, "অধ্যাত্মবাদ তাঁর জীবন দর্শনের মূলে। এই অধ্যাত্মবাদ তাঁর শিল্প-দর্শনেরও মূলে।" রবীন্দ্র-সাহিত্য চিন্তায় অর্ধেন্দুবাবু রসবাদ, প্রকাশবাদ ও ঐক্যবাদকেই প্রধান বলে মনে করেছেন।

রবীন্দ্র-প্রবন্ধের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কেই তাঁর অভিমত প্রণিধানযোগ্য। অলঙ্করণ-রীতি, স্নিগ্ধ মধুর ও বুদ্ধিদীপ্ত হাস্যরস, ভাবধর্মী ও বিচারশীল সমালোচকের অপূর্ব মিলনের ফসল যে রবীন্দ্র-প্রবন্ধ তা তিনি তাঁর আলোচনায় সগর্বে ঘোষণা করেছেন।

অর্ধেন্দুবাবুর আলোচনায় ভাষার বৈদগ্ধ ও চিন্তাশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়।

অবশ্য রবীন্দ্রনাথের প্রাচীন সাহিত্য, লোকসাহিত্য প্রভৃতির আলোচনায় অধ্যাপক বাশুরীর নিজস্ব কথা খুব একটা শোনা যায় না।

রাঁচি বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের প্রাক্তন প্রধান অধ্যাপক ও সমালোচক সুব্রতকুমার পাল বাংলা সমালোচনা সাহিত্যে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছেন। তাঁর "বাংলা ও হিন্দী পৌরাণিক নাটক" গ্রন্থটি বহির্বঙ্গ ভারতে বাংলা সমালোচনা সাহিত্যের এক স্মরণীয় সংযোজন। এই গ্রন্থে সমালোচক পাল বাংলা ও হিন্দী সাহিত্যের পৌরাণিক নাটকের সমালোচনা করেছেন। উষালগ্নের বাংলা পৌরাণিক নাটক থেকে শুরু করে মন্মথ রায় পর্যন্ত নাটকের আলোচনা করেছেন। লেখক তাঁর আলোচনায় কখনো গ্রহণ করেছেন বর্ণনামূলক দৃষ্টিভঙ্গী আবার কখনো বা বিশ্লেষণাত্মক দৃষ্টিভঙ্গী। তিনি দেখিয়েছেন যে বাংলা ও হিন্দী ভাষার পৌরাণিক নাটকগুলি প্রধানতঃ রামায়ণ ও মহাভারত অবলম্বনে রচিত। আর্য রামায়ণ নয় আঞ্চলিক ভাষার রামায়ণই এদের আশ্রয়স্থল। বাংলা পৌরাণিক নাটকগুলিতে যে ভক্তিরসের সঙ্গে স্বাদেশিকতাও মিশ্রিত হয়েছে সে কথা তিনি সরবে ঘোষণা করেছেন।

গিরিশচন্দ্রের পৌরাণিক নাটকে সীতার মধ্যে তিনি কৃত্তিবাসের ছায়াই আবিষ্কার করেছেন, "রামায়ণ কাহিনী অবলম্বনে রচিত গিরিশচন্দ্রের নাটকগুলিতে যে রামচন্দ্রের সাক্ষাৎ পাই তিনি আর্য রামায়ণের পৌরুষদীপ্ত রামচন্দ্র নন, পক্ষান্তরে কৃত্তিবাসী রামায়ণের সত্যনিষ্ঠ, ভক্তবৎসল, করুণাময় রামচন্দ্র। সীতা চরিত্র সম্পর্কেও এই কথা। সংস্কৃত রামায়ণের সীতা তেজস্বিনী ক্ষত্রকন্যা, কৃত্তিবাসী রামায়ণের সীতা করুণ কোমল বাঙালী কুলবধূ। গিরিশচন্দ্রের নাটকগুলিতে সীতা তাঁর এই শেষোক্ত চরিত্র বৈশিষ্ট্যই রক্ষা করেছে।"

মন্মথ রায়ের 'কারাগার' নাটকে অধ্যাপক পাল শুধু পৌরাণিক রঙই নয়, সমকালীন সমাজ জীবনেরও জলছবি আবিষ্কার করেছেন।

হিন্দী পৌরাণিক নাটকের মধ্যে ভক্তিরস, শৈব-বৈষ্ণব-দ্বন্দ্ব ও আর্য-অনার্য মিলন সেতুটিকেও তিনি সাগ্রহে অবলোকন করেছেন।

উপসংহার অংশে লেখক বাংলা ও হিন্দী পৌরাণিক নাটকের মধ্যে সাদৃশ্য আবিষ্কার করেছেন। উভয় নাটকে তিনি দেখেছেন ভক্তিসাধনা ও গীতিধর্মের প্রকাশ। সমকালের আর্থ সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ উভয় ভাষার পৌরাণিক নাটকগুলিতে যে মুখরিত সে বিষয়েও তাঁর দৃষ্টি সজাগ ও সতর্ক।

অধ্যাপক পালের ভাষা মার্জিত-প্রাঞ্জল কোথাও-কোথাও কবিত্বগুণ সম্পন্ন। তাঁর চিন্তা- ভাবনায় মৌলিকত্বের অভাব নেই। অবশ্য তিনি উভয় ভাষার পৌরাণিক নাটকের তুলনামূলক অধ্যয়নের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেননি। মধুসূদনের নাটকে তিনি পৌরাণিক রস, বাৎসল্য রস ও হাস্যরসই উপভোগ করেছেন, নিরন্তর প্রবাহ দেখার প্রয়াসী হননি।

ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের খ্যাতনামা অধ্যাপক সমালোচক শিশিরকুমার সিংহ বহির্বঙ্গে বাংলা সমালোচনার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। তাঁর "চলিত ভাষার বিবর্তন ঊনিশ শতকের বাংলা সাহিত্যে" গ্রন্থটিতে ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যে চলিত ভাষার বিবর্তনের পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা আছে। উইলিয়াম বেরীর কথোপকথনের

কথ্যভাষা থেকে আরম্ভ করে বিবেকানন্দ ও অবনীন্দ্রনাথের রচনায় বাংলা চলিত ভাষার পরিণতির ধারাবাহিক ইতিহাস রচনা করেছেন ড. সিংহ। তাঁর ভাষায় উইলিয়ম বেরীর 'কথোপকথনে'-এ কথ্য ভাষায় সাহিত্য সৃষ্টির যে সূচনা হয়েছিল তার পরিণতি বিবেকানন্দের 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে' এবং অবনীন্দ্রনাথের 'শকুন্তলায়' ও 'ক্ষীরের পুতুল'-এ প্রতিভাত।

গ্রন্থটির প্রধান আলোচ্য বিষয় বাংলার বিশিষ্ট গদ্য লেখকদের ঊনিশ শতকে রচিত গ্রন্থের ভাষা সম্পর্কিত আলোচনা।

কালীপ্রসন্ন সিংহের 'হুতোম প্যাঁচার নক্সা'-র ভাষা সম্পর্কে তিনি বলেছেন "আমরা হুতোমী ভাষা বিশ্লেষণ করে বুঝতে পারছি যে সে ভাষা দরিদ্র নয়, তা এক শক্তিশালী, দ্রুত গতিসম্পন্ন চলিত ভাষা।"

বাংলা গদ্য ভাষায় চলিত শব্দের ব্যবহারে বিবেকানন্দ অক্লান্ত ও নিপুণ শিল্পী। বিবেকানন্দের 'পরিব্রাজক' এবং 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' গ্রন্থে ব্যবহৃত ক্রিয়াপদ প্রসঙ্গে ড. সিংহ বলেছেন — "বিবেকানন্দের ক্রিয়াপদ ব্যবহারের বিশিষ্টতা হল কথ্য ক্রিয়াপদের ব্যবহার। সেকালের কলকাতায় যেভাবে ক্রিয়াপদগুলো ব্যবহৃত হত হুতোমের মত তিনি সেভাবেই ব্যবহার করেছেন।"

অবনীন্দ্রনাথের ভাষা প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, "বিষয় বস্তুর উপযোগী এমন সুন্দর ভাষা বোধহয় তাঁর মত একজন গল্প-কথক ও চিত্রশিল্পীর হাত থেকেই বের হতে পারে।"

শিশিরকুমারের গবেষণার দৃষ্টি প্রখর ও সত্যসন্ধানী। মধুসূদন ও বঙ্কিমের প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, "মধুসূদন ও বঙ্কিম দু'জনেই এ সত্য উপলব্ধি করেছিলেন যে,

কথ্যভাষাকে সাহিত্যের সবরকমের ভাব প্রকাশের ভাষারূপ গড়ে তোলার জন্যে প্রয়োজনবোধে 'তৎসম' শব্দের ব্যবহার করা প্রয়োজন।

রবীন্দ্রনাথের গদ্য ভাষার নিজস্বতা গবেষক শিশির কুমারের দৃষ্টি এড়ায়নি। রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, "প্রথম দিকে বঙ্কিমচন্দ্র বাক্য বিন্যাসের রীতি এবং অনাবশ্যক ক্রিয়াপদ বর্জনের রীতি গ্রহণ করেছেন, কিন্তু তিনি ধীরে ধীরে একটি কাব্যগুণযুক্ত মাধুর্যপূর্ণ গদ্যরীতি নির্মাণ করেছেন।"

পরিশেষে বলা যায় শিশির কুমারের গবেষণা বিজ্ঞান দৃষ্টিসম্পন্ন ও বিশ্লেষণাত্মক। বস্তুধর্মীতা তাঁর আলোচনার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। তাঁর ভাষা প্রাঞ্জল, স্বচ্ছ ও চিন্তামূলক। কিন্তু চলিত গদ্যের ক্রিয়া পদের দিকে তিনি যতটা লক্ষ্য করেছেন, Stylistic-এর দিকে তাঁর দৃষ্টি ততটা পড়ে নি।

যাইহোক, উক্ত গ্রন্থগুলিতে সমালোচকগণ শুধুমাত্র প্রকরণকে প্রাধান্য দেননি - বিষয়কেও যে দিয়েছেন সেটা স্পষ্ট। তবে একথা ঠিক মূল সাহিত্যিকগণের সৃজনশীলতা চর্চা আর সাধনা একাধারে সমার্থক। এই সাহিত্যসাধনা যতই গভীরে অন্তর্লীন হবে ততই তা হবে বিচিত্রমুখী। মূল গ্রন্থগুলি গবেষণার ক্ষেত্রেও একটি অভিনন্দনযোগ্য পদক্ষেপ। শব্দের পর শব্দের মালা গেঁথে উল্লিখিত সাহিত্যিকগণ যে মহৎ সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন - তা চিরকালের আবহে চিরবন্দিত হয়ে থাকবে।

বাংলা সমালোচনা সাহিত্যে বহির্বঙ্গ ভারতের অবদানের সংবাদ পরিবেশিত হয়েছে এই আলোচনায়। পথ পরিক্রমা করে পথের বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্যের পরিচয় অজানা থাকেনি। বঙ্গের বাইরের বিভিন্ন রাজ্যের সমালোচক ও সমালোচনা, বাংলা সমালোচনা সাহিত্যকে কীভাবে সমৃদ্ধ করেছে, নতুন নতুন দিকগুলি উন্মোচিত করেছে তার পরিচয় লিপিবদ্ধ হয়েছে। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়কে অবলম্বন করে বহির্বঙ্গ ভারতে সমালোচনার ভান্ডারটি গড়ে উঠেছে। এদের মধ্যে অসম, ঝাড়খণ্ড ও ত্রিপুরা রাজ্যের অবদান অনস্বীকার্য। কাব্য, নাটক, উপন্যাস, ছোটগল্প, প্রবন্ধ সর্বত্রই বহির্বঙ্গ ভারতের সমালোচকদের অবাধ বিচরণ। বিশেষতঃ সমালোচনায় সমগ্র ভারতবর্ষের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠত্বের দাবি করতে পারে এই অঞ্চলের সমালোচনা সাহিত্য। কাব্য-উপন্যাস-ছোটগল্পেও এঁদের অবদান অনস্বীকার্য। পরিশেষে বলতে হয়, প্রতিবেশী রাজ্যগুলির বাংলা সমালোচনা সাহিত্যের ধারা বাংলা সমালোচনা সাহিত্যকেও পুষ্ট করেছে।

গ্রন্থপঞ্জী

আকর গ্রন্থ :

১. তপোধীর ভট্টাচার্য ঃ উপন্যাসের ভিন্ন পাঠ, প্রথম প্রকাশ - ১লা বৈশাখ ১৪২২, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা।

২. চিত্তরঞ্জন লাহা ঃ এবং রবীন্দ্রনাথ, প্রথম প্রকাশ - ১৯৯৬, পুস্তক বিপণি, কলকাতা।
৩. অর্ধেন্দুশেখর বাশুরী : প্রবন্ধকার রবীন্দ্রনাথ, প্রথম প্রকাশ - মাঘ ১৪০২, সুহৃত পাবলিকেশন, কলকাতা।
৪. সুব্রতকুমার পাল : বাংলা ও হিন্দী পৌরাণিক নাটক, প্রথম প্রকাশ ১৪ এপ্রিল ১৯৯২, পুস্তক বিপণি, কলকাতা।
৫. শিশিরকুমার সিংহ : চলিত ভাষার বিবর্তন : ঊনিশ শতকের বাংলা সাহিত্য, প্রথম প্রকাশ — আগস্ট ২০০১, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা।

সহায়ক গ্রন্থ :

১. দাশ শ্রীশচন্দ্র, সাহিত্য-সন্দর্শন চক্রবর্তী চাটার্জ্জি এণ্ড কোং, লিঃ এবং দাশগুপ্ত এণ্ড কোং.লিঃ ১৯৫৭- ৩য় সংস্করণ
২. বসু সুদীপ, বাংলা সাহিত্যে সমালোচনার ধারা,পুস্তক বিপণি, ১৯৯৭- ১ম সংস্করণ
৩. বসু শুদ্ধসত্ত্ব, বাংলা সাহিত্যের নানারূপ, বিশ্বাস বুক স্টল, ১৩৮৫- ১ম সংস্করণ
৪. ভট্টাচার্য সাধনকুমার, শিল্পদর্শন ও সাহিত্য সমালোচনা, দে'জ পাবলিশিং, ২০০৪ - ১ম সংস্করণ
৫. ভট্টাচার্য ব্রজেন্দ্রচন্দ্র, সাহিত্য ও পাঠক, বামা পুস্তকালয় ও পুস্তক বিপণি—
৬. মুখোপাধ্যায় অরুণকুমার, বাংলা সমালোচনার ইতিহাস, দে'জ পাবলিশিং, ১৯৬৫- ১ম সংস্করণ
৭. মজুমদার উজ্জ্বলকুমার, সাহিত্য ও সমালোচনার রূপরীতি, দে'জ পাবলিশিং, ২০০৩- ১ম সংস্করণ
৮. মুখোপাধ্যায় বিমলকুমার, সাহিত্যে বিবেক, দে'জ পাবলিশিং, ১৯৭৬- ১ম সংস্করণ
৯. মিশ্র অশোককুমার, সাহিত্যের রূপরীতি কোষ, সাহিত্য সঙ্গী, ১৪০৪- ১ম সংস্করণ
১০. চট্টোপাধ্যায় হীরেন, সাহিত্য প্রকরণ বামা পুস্তকালয়, ১৪০২- ১ম সংস্করণ
১১. চট্টোপাধ্যায় কুন্তল, সাহিত্যের রূপ-রীতি ও অন্যান্য প্রসঙ্গ, রত্নাবলী, ১৯৯৫- ১ম সংস্করণ
১২. রায় নীহাররঞ্জন, রবীন্দ্র সাহিত্যের ভূমিকা, নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১৩৪৮- ১ম সংস্করণ

রাভা জনজাতি : উৎস ও পরিচয় সংক্রান্ত মতবাদসমূহ

শঙ্করী অধিকারী চন্দ্র
স্নাতকোত্তর, ইতিহাস বিভাগ
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ : ভারতে অবস্থিত জনগণ শুধুমাত্র ভারতীয় নামেই পরিচিত নন। এঁদের একটা অংশ প্রতিনিয়ত জাতি-উপজাতি-র তকমায় অলংকৃত হচ্ছে। যদিও ভারতীয় সংবিধানের পঞ্চম তফসিলে তারতের জাতি উপজাতি সম্প্রদায়ের স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। তথাপি অলঙ্কারের ভার ও সৌন্দর্য, ক্ষেত্র বিশেষে ভিন্ন ভিন্ন মাত্রায় সংযোজিত হচ্ছে। যার ইতিবাচক ও নেতিবাচক দিক নিয়ে পন্ডিতমহলে বাকবিতণ্ডার অন্ত নেই। তবে স্পষ্ট ধারণা পেতে গেলে প্রাথমিক পর্যায়ে নির্দিষ্ট জাতি-উপজাতির উৎস সম্পর্কে অবগত হওয়া প্রয়োজন। তাই ইতিহাসচর্চার ধারবাহিকতার অন্তরালে চাপা পড়া সত্ত্বেও বিগত কয়েক দশক ধরে জাতি-উপজাতি-ইতিহাসচর্চার একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে পরিনত হয়েছে।রাভা জনজাতি- নামে পরিচিত তেমনি এক উপজাতির প্রতি ঐতিহাসিক মহলের বিভিন্ন দৃষ্টিকোণকে প্রাধান্য দিয়ে উক্ত জনজাতির উৎস ও পরিচয় সংক্রান্ত বিষয়গুলোকে জনসম্মুখে তুলে ধরে তাঁদের প্রকৃত সত্তা উদ্ঘাটন করা বর্তমান আলোচনার মূখ্য উদ্দেশ্য। মঙ্গোলীয় ব্রক্ষ্মশাখার অন্তর্ভুক্ত এই জনজাতি ভারতবর্ষের আসাম ও পশ্চিমবঙ্গের কয়েকটি আদিম জনজাতির সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে রাভা জনজাতি নামে নিজেদের একটা পরিচিতি তৈরি করেন। যদিও দীর্ঘকালব্যাপী অন্যান্য জাতি-উপজাতির মতো এই জনজাতির অবস্থানও সমাজের মূলস্রোতর বাইরেই। সাম্প্রতিককালে খ্রিস্টান ধর্ম, বা বিশেষ করে হিন্দু ধর্মের সংস্পর্শে আসায় সমাজের সঙ্গে নিজেদের মানিয়ে নেওয়ার প্রয়াস করছেন। লক্ষনীয় বিষয় রাভাদের একটা বৃহৎ অংশ আধুনিকতার ছোঁয়ায় নিজেদের সংস্কৃতি ও হিন্দু সংস্কৃতির সংমিশ্রণে এক নতুন বৈশিষ্ট্য অবলম্বন করেছেন। যদিও ক্ষেত্রবিশেষে কোথাও যেন তাঁদের মধ্যে সেই আদিসত্তা আজও বিরাজমান।

সূচক শব্দ : উপজাতি, রাভা, উৎস ,পরিচয় ,মঙ্গোলীয়,সংমিশ্রণ,ঐতিহাসিক, মতবাদ, পরিবর্তন।

মূল আলোচনা : বর্তমানে শুধুমাত্র ভারতবর্ষেই নয় সমগ্র বিশ্বে উপজাতির উৎস ও পরিচয় সংক্রান্ত বিভিন্ন আঙ্গিকের চর্চা বহমান। এই উপজাতি গুলির বেশিরভাগই দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাস করে এবং সামাজিক বৈষম্যের শিকার হয়ে আসছে। ফলস্বরূপ তাঁরা সামাজিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠার জন্য একত্রিত হয়ে জাতিসংঘের কাছে আবেদন রাখায় জাতিসংঘ কিছু ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণ করে। তবে তার পূর্বেই ভারতবর্ষ তার উপজাতি জনগোষ্ঠীর সামগ্রিক অবস্থানের উন্নতিকল্পে পঞ্চবার্ষিকী

পরিকল্পনাগুলিতে কিছু কর্মসূচি গ্রহণ করেছিল। ভারতীয় সংবিধানের পঞ্চম তফসিলে ভারতের উপজাতি সম্প্রদায়ের স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। এই উপজাতি সমূহের মধ্যে বিশেষ করে আসাম ও পশ্চিমবঙ্গে বসবাসকারী মঙ্গোলীয় ব্রহ্মশাখার একটি জনগোষ্ঠী রাভা উপজাতি হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। ১৬০৮ থেকে ১৬২৪ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে রচিত মির্জা নাথান আলাউদ্দিনের ফরাসি গ্রন্থ বাহারিস্তান ঘায়রীতে প্রথম 'রাভা' নামের উল্লেখ পাওয়া যায়।[১] আমার এই ক্ষুদ্র আলোচনা পরিসরে উক্ত জনজাতি বা উপজাতির উৎস ও পরিচয় সংক্রান্ত বিভিন্ন ঐতিহাসিক মতবাদকে জনসম্মুখে তুলে ধরে, তাদের প্রকৃত সত্তা সম্পর্কেএকটা রূপরেখা প্রণয়ন করার প্রয়াস করা হল।

২০০১ সালের আদমশুমারি অনুসারে দেশের মোট জনসংখ্যার ৮% ছিল উপজাতি এবং এই জাতির সংখ্যা ছিল ৪৬১টি। আসাম ও উত্তরবঙ্গে যে নয়টি উপজাতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে তার মধ্যে একটি হলো এই 'রাভা' জনজাতি[২] এঁদের উৎস সম্পর্কিত বিষয়টি বেশ বিতর্কিত। কথিত আছে যে একজন হিন্দু পুরুষ একজন কাছারি মহিলাকে বিবাহ করে নিজ বর্ণের মর্যাদা হারিয়েছিলেন।[৩] গিয়ারসন মত প্রকাশ করেছেন যে, 'Rabha appears to be a Hindu name for the tribe (Garo) and many men so called are Kacharis'. অর্থাৎ আমরা বলতে পারি রাভা পরিচয়ের সাথে প্রাথমিকভাবে কাছারি ও হিন্দু শব্দ দুটি ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

নৃতাত্ত্বিক পণ্ডিতগণের মতে, নিগ্রোট অস্ট্রিক, ভূমধ্যসাগরীয় মানবগোষ্ঠীসহ আর্য জাতির বিভিন্ন শাখার মতো মঙ্গোলীয় জনগোষ্ঠী ভারতে এসেছেন বহির ভারতীয় অঞ্চল থেকে। এই মঙ্গোলীয় জাতির উৎস স্থল সাধারণভাবে মঙ্গোলীয় ভূখণ্ডকে চিহ্নিত করা হলেও রাভা জনজাতির সূতিকাগৃহ হিসেবে পণ্ডিতবর্গ সুমেরু বৃত্তের অভ্যন্তরে অবস্থিত সাইবেরিয়া ভূখণ্ডকে উল্লেখ করেছেন। ব্রিটিশ লেখক হাডসন ও পেরিয়ার রাভা জনগোষ্ঠীকে বৃহৎ 'বড়ো' পরিবারের লোক বলে উল্লেখ করেছেন।[৪] কিন্তু সি. ই .এ গ্রেইট ভিন্নমত পোষণ করেন । তাঁর মত অনুসারে আসামের গোয়ালপাড়া অঞ্চলের রাভাগন গারো জাতির একটি প্রশাখা এবং কামরূপ ও দারাঙ্গ অঞ্চলে বসবাসকারী রাভাগন হিন্দু ধর্ম ও হিন্দু সংস্কৃতি গ্রহণ করে, হিন্দু সংস্কৃতির প্রভাবে কাছারি হিসেবে নিজেদের পরিচয় দিয়ে থাকেন। তবে রাভাগন যে বড়ো পরিবারের অংশ এ প্রসঙ্গে কারো মনে কোন সন্দেহ নেই।

চারুচন্দ্র সান্যাল এর মতে, মঙ্গোলীয় কোচ রাভা জনগোষ্ঠীর লোকেরা পাটকাই পর্বতমালার ভেতর দিয়ে নোয়া ডিহিং নদীর গতিপথ ধরে পূর্বোত্তর ভারতে প্রবেশ করেছেন এবং সাদিয়া ও শোনিতপুরর কাছে প্রথম বসবাস শুরু করেন। এখান থেকে একদল ব্রহ্মপুত্র নদের উত্তর পাড় ধরে পশ্চিম দিকে অগ্রসর হতে হতে জঙ্গল ঢাকা উত্তরবঙ্গের উত্তরাংশ ,পূর্ব নেপাল ও বিহারের পূর্ব অংশে ছড়িয়ে পড়ে। অপর দলটি ব্রহ্মপুত্র নদ অতিক্রম করে দক্ষিণে অবস্থিত গারো পাহাড়ের উত্তরাংশে বসতি শুরু করে।[৫] ডঃ কে .এস সিংহ জনজাতির পরিচয় ও উৎস সম্পর্কে তার গ্রন্থ 'The

Scheduled Tribe'; এ মত প্রকাশ করেছেন যে, 'a community distributed in the states of Meghalaya, Assam and West Bengal . The Rabha recall their migration from the north . This population figure for the state at Meghalaya is not available, as they have been declared a scheduled tribe in this state only recently.'[৬]

ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, তাঁর কিরাত জনকৃতি; গ্রন্থে দাবি করেছেন যে আর্য জাতি যখন উওর-পশ্চিম ভারতের পথ ধরে ভারতে প্রবেশ করেছিল, ঠিক একই সময়ে পূর্বোত্তর ভারতের পথে মঙ্গোলীয় জাতির লোকেরা অসমে প্রবেশ করেছিল। অন্যদিকে আমরা লক্ষ্য করি ধনঞ্জয় রাভা, তাঁর জনপ্রিয় গ্রন্থ-'রাভা জাতির সমগ্র ইতিহাস'-এ বলেছেন যে, তিব্বত থেকে মঙ্গোলিয়ান গোষ্ঠীর একটা অংশ ভারতবর্ষের উত্তরপূর্বে আসে এবং মাইগ্রেশনের সময় একটা অংশের নাম হয় 'রাব-হা' (Rab-ha)। এখান থেকে আসামে প্রবেশ করে গারো পাহাড়ে যায়। তাঁরাই রাবা-নামে পরিচিত হয়। আর 'রাবা' শব্দটি ক্রমশ মুখের ভাষায় পরিবর্তন হতে হতে 'রাভা'-য় পরিণত হয়। মানব বিজ্ঞানীগণ রাভা জনজাতিদের মঙ্গোলিয়ান ব্রহ্মশাখার কোচ গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত বলে মনে করেন।[৭] H.H Hodgson -এর মতে, রাভারা বৃহৎ বড়ো গোষ্ঠীর অধীনে ছিল এবং পরে 'গারো'-দের সংস্পর্শে আসে। পেরিয়ার তাঁর মতকে প্রতিধ্বনি করে বলেছেন যে, রাভা জনগোষ্ঠী বৃহৎ বড়ো পরিবারের মানুষ।

L. A. Waddell এর মতানুসারে রাভারা 'কাছারি'-দের একটি প্রশাখা ছিল, যাঁরা হিন্দু ধর্ম গ্রহণ করে, কিন্তু এঁদের পরিবর্তন 'কোচ'-দের অপেক্ষায় ধীর গতি সম্পন্ন ছিল। আবার E. Dalton এর মতে, রাভারা কাছারিদের শাখা এবং গারোদের সাথে সম্পর্ক যুক্ত। ডঃ অনীল কুমার সরকার , তাঁর গ্রন্থ –'TRIBES OF SUB-HIMALAYAN REGION' - এ মত প্রকাশ করেছেন যে, 'the Rabhas are basically of Mongoloid origin and as such all the physical features of the mongoloid people can be found in them.' অর্থাৎ উপরিউক্ত ঐতিহাসিকদের মতানুসারে আমরা এই ধারনা পোষণ করতে পারি যে, মঙ্গোলিয়ান ব্রক্ষশাখার একটি অংশ উত্তর ভারতের গিরিপথের মধ্যে দিয়ে এসে ব্রক্ষ্মপুত্র উপত্যকার ত্রিপুরা, মনিপুর, গারো পাহাড় ও আসামের সমতল ভূমিতে বসবাস শুরু করে এবং এঁদের কিছু অংশ উত্তরবঙ্গের আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার, জলপাইগুড়ি ইত্যাদি জেলায় বসবাস শুরু করে।

রাভা জনজাতির উৎস ও পরিচয় সংক্রান্ত আলোচনায় এভাবে পণ্ডিতবর্গের বিভিন্ন মতামত উঠে এসেছে। ফলস্বরূপ বলা যায় রাভারা অবশ্যই অন্য কোনো গোষ্ঠীভুত । তবে এঁদের মধ্যে বিভিন্ন ভাগ আমরা লক্ষ্য করতে পারি। গেইট –এর মত অনুসারে, রাভারা পাঁচ ভাগে বিভক্ত, যথা - রংদানিয়া (Rangdaniya) ,পাতি (Pati)

,মাইতুরিয়া (Maitaria) , ডাবুরি (Daburi) এবং কাছারি (Kachari) ।যদিও ডঃ এন্ডেল রাভাদেরকে সাতটি ভাগে ভাগ করেছেন (১৯১১) । তাঁর মতে, প্রথম তিনটি ভাগ উচ্চতর অবস্থানে আছে । ডঃ দাশও এন্ডেল- এর সাথে সহমত পোষণ করে বলেছেন, রাভা-দের আর একটি ভাগ হল ‘টোটলা’ (totla)। তাঁর মতে, রাভাদের প্রধান তিনটি ভাগ হলো রাভা জনজাতির সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ। যদিও উত্তরবঙ্গে রাভাদের এই ভাগ গুলো বর্তমানে মিশে একাকার হয়ে আছে।[৮]

ঐতিহাসিক প্লেফেয়ার ‘রাভা’, ‘কোচ’, ‘আটং’ এবং ‘রুগা’-দের মধ্যে সখ্যতা বা সম্বন্ধ খুঁজে পেয়েছেন। তাঁর মতে, রাভারা গারো পাহাড়ের মূল বাসিন্দাদের মধ্যে অন্যতম এবং তাঁরা পার্শ্ববর্তী অ-উপজাতি সম্প্রদায়ের সাথে খুব তাড়াতাড়ি মিলেমিশে গেছিল। তাছাড়া এন্ডেলের মতানুসারে রাভারা মাঝে মধ্যে নিজেদের ‘টোটলাস’ বা ‘দাতিয়াল’ বলে ডাকে। যদিও তিনি রাভা ও কাছারি দের মধ্যে পার্থক্যের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন যে, নিম্ন আসামের রাভারা মনে করে , তাঁরা গারোদের শাখা। অন্যদিকে কামরূপ ও দারাং এর রাভারা মনে করে তাঁরা হিন্দু ধর্মীয় কাছারি।[৯]

বুকানন হ্যামিল্টনও তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থের মধ্যে রাভাদের উল্লেখ করেছেন। সেখানে তিনি তাঁদের দুটি ভাগে ভাগ করেছেন। যথা- পাতি রাভা(অধঃপতিত) এবং রংদানিয়া রাভা। পাতি রাভারা বাংলা ভাষায় কথা বলে। অন্যদিকে রংদানিয়ারা কোচ-দের সাথে সাদৃশ্য রেখে মূল ভাষার অস্তিত্বকে বজায় রেখেছে। ডঃ ফ্রান্সিস বুকানন-এর মতে, সামাজিক ধর্মীয় ও ব্যবহারিক জীবনের দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে রাভাদের সাথে ‘পানি- কোচ’-দের অনেক মিল আছে। অন্যদিকে এ. প্লেফেয়ার-এর মতে, রাভা এবং গারোদের মধ্যে ভাষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে অনেক মিল আছে এবং এটং(A Tong) ও রংদানিয়া ভাষার মধ্যে মারাত্মক মিল আছে।[১০] অর্থাৎ উপরিউক্ত মতামতের পরিপ্রেক্ষিতে আমরা বলতে পারি যে, বিভিন্ন উপজাতির মধ্যে কম-বেশি সাংস্কৃতিক মেলবন্ধন তৈরি হয় এবং রাভা জনজাতির ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি।

এম.মার্টিন রাভাদের সম্পর্কে লিখেছেন যে, রাভারা কামরূপে একটি ‘উপজাতি’ হিসেবে পরিচিত এবং তাঁরা কোচ গোত্রের একটি শাখা - ‘পানি কোচ’ নামে পরিচিত। এবং এঁরা আসামের সর্বোত্র ও ভূটানের নিম্নাংশে অবস্থান করে আছে ।[১১] রাভাদের উৎপত্তি সংক্রান্ত প্রশ্নে শ্রী বি.এম দাস, তাঁর ‘Ethnic Affinities of the Rava’-প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন, মঙ্গোলীয় জাতি উত্তর ও পূর্বোত্তর অঞ্চল থেকে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে অসমে প্রবেশ করেছেন।তাঁরা এই অঞ্চলের আদিম বাসিন্দা ‘অস্ট্রিক’ জাতিগোষ্ঠীকে কোথাও পরাজিত ও কোথাও ধ্বংস করে পূর্বোত্তর ভারতে বসতি বিস্তার করেছেন এবং স্থানীয় প্রভাব ও রক্তের মিশ্রণে ‘রাভা’, ‘গারো’, ‘কাছারি’, ‘লালু’ ইত্যাদি নানা গোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়ে পড়েন। তবে রাভাদের সম্পর্কে Rev. Sidney Enddle,

তাঁর গ্রন্থ 'THE KACHARIS'-এ মন্তব্য করেছেন –'the name of this tribe(Rabha)is of uncertain derivation'।

উপরিউক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে আমার লক্ষ্য করলাম যে, রাভাদের উৎস সংক্রান্ত মতামতের মধ্যে একটা মিল বর্তমান। রাভারা যে মঙ্গোলিয়ান ব্রহ্মশাখার একটি অংশ সে বিষয়ে প্রায় সকল ঐতিহাসিক সহমত পোষণ করেছেন।অন্যদিকে এঁদের পরিচয় ও বিভিন্ন উপজাতির সাথে সাদৃশ্য-বৈশাদৃশ্যের প্রশ্ন কিছুটা বিতর্কিত। তবে এই সব তর্ক- বিতর্কের উর্দ্ধে গিয়ে রাভারা নিজেদেরকে শিবপুত্র বলে বিশ্বাস করেন। তাঁদের ধারণা শিব বা মহাকাল-ই তাঁদের এই পৃথিবীতে এনেছেন। তাঁরা বিশ্বাস করেন , স্বর্গের ঋষি বা মহাকাল বা শিব বিংগা (Bingga), রিংগা (Ringga) এবং রাবা (Raba) -এই তিন জন ভাইকে সৃষ্টি করে পৃথিবীতে বসবাস করার জন্য পাঠান এবং এঁদের থেকেই রাভাদের বংশবৃদ্ধি হয়।[১২]

রাভাদের সম্পর্কে একটি লোককাহিনী প্রচলিত আছে। গারোদের শক্তিশালী নেতা ছিলেন হুসেং। তাঁর নেতৃত্বে দক্ষিণ গোয়ালপাড়া অঞ্চল গারোরা দখল করে নিয়েছিল। তবে এঁরা ভাল কৃষিকাজ জানতো না । বিশেষ করে বলদে টানা লাঙল দিয়ে ভূমি চাষ করার পদ্ধতি তাঁদের অজানা ছিল। কিন্তু কোচেরা ছিল ভাল কৃষক।তাই গারো দলপতি গারোদের কৃষিকাজে শিক্ষা দেওয়ার জন্য কোচদের ব্রম্মপুত্রের উত্তরপাড়া থেকে এনে সোমেশ্বরী নদী উপত্যকায় তাদের জন্য বসতি স্থাপন করে দেন। সেই সময় থেকে এই অঞ্চলের কোচদের বলা হত 'রাবা' এবং এর বিবর্তিত নাম 'রাভা'।[১৩]

কোচ ও রাভা জনজাতি মূলত দুটি ভিন্ন গোষ্ঠী হিসেবে পরিচিত হলেও উভয় জনজাতির উৎস এক ও অভিন্ন ।[১৪] মনিরাম রাভা প্রনীত রাভা বুরুঞ্জীর প্রতিধ্বনী- থেকে জানা যায় রাজা দদান ব্রহ্মপুত্র নদীর দক্ষিণ পাড়ে যুদ্ধজয়ের উদ্দেশ্যে খাকচি বা রায়খো দেবতার থান স্থাপন করেন। এই থান প্রতিষ্ঠার উৎসবে যারা যোগ দেন তাঁদের রাভা এবং যাঁরা যোগ দেয়নি তাঁদেরকে কোচ বলে চিহ্নিত করা হয়।[১৫]

উপরিউক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা বলতে পারি যে, মঙ্গোলীয়দের একটা অংশ ভারতের উত্তর দিক থেকে গিরিপথে এসে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার মনিপুর , ত্রিপুরা, গারো পাহাড় ও অসমের সমতল ভূমিতে বসবাস শুরু করে। তাঁদের বেশিরভাগই আসামের গোয়ালপাড়া কামরূপ, ধুবড়ি, নলবড়ি, দারাং, কোকরাঝরে বসতি স্থাপন করে । অন্যদিকে পশ্চিমবঙ্গের কোচবিহার (বক্সির হাট থানার ভাড়েয়া, বাশরাজা, হরিপুর, তল্লিগুড়ি, বোচামারি, রসিকবিল, চেংটিমারি, তুফানগঞ্জের ছাটরামপুর গ্রাম,বড়োশালবাড়ি), জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার (কামাখ্যাগুড়ি, পূর্ব শালবাড়ি, পোড়ো বস্তি, হেমাগুড়ি, নারারখয়, কালচিনি থানার নিমতি, মেন্দাবারি, ইন্দুবস্তি, মাদারিহাট,রায়ডাক) ইত্যাদি জেলাতেও এই জনজাতির মানুষদের অবস্থান লক্ষ্য করা

যায়। এছাড়া মেঘালয়ের গারো পাহাড়ে তো অবশ্যই এঁদের একটা সংখ্যা আছে। এই সমস্ত এলাকার রাভাদের সাথে বড়ো গ্রুপের অন্তর্ভুক্ত অন্যান্য উপজাতি যেমন - গারো, কাছারি, মেচ, কোচ, হাজং প্রভৃতি উপজাতির অনেক মিল আছে।[১৬]

১৯৬১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী আসামে ১০৮০২৯ জন এবং পশ্চিমবঙ্গে ৬০৫৩ জন রাভা বাস করত। অর্থাৎ এই দুই রাজ্যের মোট রাভা জনসংখ্যা ছিল ১১৪০৪২ জন। পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে জলপাইগুড়ি (৬৮.২৬%) এবং কোচবিহার (২৬.৬৫%) জেলায় সব থেকে বেশি জনঘনত্ব লক্ষ্য করা গেছে। ২০১১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী আসামের রাভা জনজাতি বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছিল ২৭৭,৫১৭ জন। অন্য দিকে ১৯৯৯ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গের রাভা জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছিল ৬৩,২৩৫ জন। বর্তমানে এই বৃদ্ধির হার অব্যাহত আছে।

রাভা জনজাতির পরিচয় সংক্রান্ত আলোচনায় তাঁদের ভাষা সম্পর্কে অবগত হওয়ার প্রাসঙ্গিকতা রয়েছে। বেশিরভাগ রাভারা অসমীয়া ও বাংলা ভাষায় কথা বলে এবং সাধারণত অসমীয়া লিপি ব্যবহার করে।[১৭] ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দের আদমশুমারি অনুসারে এই উপজাতির ৪৪,৪১০ জন রাভাভাষায় কথা বলতো এবং তার মধ্যে ২৭,১২৩ (৬১.৯%) জন রাভা ছিল দ্বিভাষী। আবার এই দ্বিভাষীদের মধ্যে ২৪,৮৭৮ (৯১.৭১%) জন দাবি করেছিল যে, অসমীয়া তাঁদের দ্বিতীয় ভাষা এবং বাকি ২২৫০ (৮.২৯%) জন অন্যান্য ভাষায় কথা বলতো।[১৮] তবে আশ্চর্যের বিষয় হল ১৯৮১ খ্রিস্টাব্দের আদমশুমারি অনুসারে মাত্র ১৯,২৭০ জন রাভাভাষায় কথা বলতো। অর্থাৎ এই ক্ষেত্রে আমরা লক্ষ্য করলাম ক্রমশ রাভা ভাষায় কথা বলা মানুষের (রাভা) পরিমাণ কমে যাচ্ছে। বর্তমানে বেশিরভাগই বাংলা ভাষায় কথা বলে। তবে রাভা ভাষার মধ্যে রংদানিয়া, মাইতুরি বা মাইতোরিয়া, পাতি এবং ধুরি-এই চারটি ভাগ বা উপভাষা লক্ষ্য করা যায়। তবে মেঘালয়ে পাতি এবং ধুরি ভাষী নগণ্য বলা যায়। উত্তরবঙ্গেই পাতি রাভাদের বসতি বেশি।[১৯]

মাতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যাবস্থায় বিশ্বাসী রাভা জনজাতি বর্তমানে পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থাকে প্রাধান্য দিচ্ছে।পূজার্চনার ক্ষেত্রেও পূর্বের রীতি-নীতিকে অনেকাংশে বর্জন করে মূর্তি পূজায় মেতে উঠছে। অন্য দিকে নিজ 'কলা- সংস্কৃতি'-তে সমৃদ্ধশালী এই উপজাতির সমাজ নৃত্য-গীত, লোকউৎসব, লোককথা, লোক-সংস্কৃতিতে ভরপুর। বনরক্ষক হিসেবেও এই জনজাতি বিনা পারিশ্রমিকে পূর্বকাল থেকেই এক গুরুদায়িত্ব পালন করে চলেছে। প্রসঙ্গত বলা যায় ঔপনিবেশিক শাসনকালে ডুয়ার্স অঞ্চলের বনভূমির তদারকি, রক্ষনাবেক্ষন বনকর্মীদের সহায়তা করার জন্য অনেক বনবস্তি তৈরি করা হয়েছিল। তার মধ্যে ধাওলা-রায়ডাকের সঙ্গমস্থলের দুই পাড়ে দুটি ফরেস্ট ভিলেজ বা বনবস্তি গড়ে তোলা হয়। তার একটি ছিপড়া বিট রাভা বস্তি। বংশ পরম্পরায় রাভা পরিবারগুলো এখনও এখানে বাস করে।[২০]

সর্বোপরি বিচারে আমরা এই সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে, মঙ্গোলীয় গোষ্ঠীভূত রাভারা ভারতবর্ষে প্রবেশ করার পর এখানকার কয়েকটি আদিম উপজাতির সঙ্গে মিলে মিশে গেলেও নিজের একটা স্বতন্ত্র সত্তা তৈরি করেছিল। পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার পর ভারত সরকার দ্বারা নির্দিষ্টকরণ ‘ জাতি-উপজাতি’ সমূহের মধ্যে এই জনজাতি বহু যুগ ধরে তার নিজ সত্তা বহনমান রেখে উপজাতি তথা ভারতবর্ষের ইতিহাসে এক ভিন্ন মাত্রা সংযোজন করেছে। বর্তমানে, সময় ও সমাজের সাথে তাল মিলিয়ে চলার পরিপ্রেক্ষিতে তাদের ‘বাস্তু-সাংস্কৃতিক’ জীবনে কিছু পরিবর্তন সাধিত হয়েছে।বন জঙ্গলে শিকার ধরা আর অনুন্নতত পদ্ধতিতে অস্থায়ীভাবে চাষাবাদ করে কোনরকমে দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজন মেটানো রাভা জনজাতি বর্তমানে স্থায়ীভাবে উন্নত প্রযুক্তির সাহায্যে চাষাবাদ করছে। নিজেদের গ্রামের গণ্ডি ছাড়িয়ে ব্যবসার জন্য অন্য গ্রামে এমনকি শহরেও যাচ্ছে। বিভিন্ন রকম কুটির শিল্পের মাধ্যমে নিজেদেরকে আর্থিক দিক থেকে সচ্ছল করে তুলছে। শুধু এখানেই থেমে নেই, এঁদের মধ্যে শিক্ষার প্রসার ঘটায়, সংখ্যায় কম হলেও সরকারি অফিসে কাজ করছেন, শিক্ষকতা করছেন। বিভিন্ন অনুষ্ঠানে রাভা ‘নৃত্য-গীত’ বিনোদনের ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা পালন করছে।এত কিছু সত্ত্বেও কিন্তু একটা প্রশ্ন থেকেই যায়, সমাজের মূলস্রোত কি তাঁদের আলিঙ্গন করছে ?

তথ্যসূত্র :

১) রায়, প্রদীপ, (২০২০), রাভা জনজাতির পরিচয়, পিএইচডি থিসিস, (অপ্রকাশিত), পৃ.১

২) Sarkar, A.K. (2021) .TRIBES OF SUB-HIMALAYAN REGION: Meches, Rabhas, Totos and Garos , Mittal Pablications . New Delhi. P. 19

৩) Raychaudhuri , B. (2007) . The Rabhas of North Bengal. Anthropological Survey of India . P.P.2-3

৪) দেবনাথ, মহেন্দ্র , (২০১৪), উত্তরবঙ্গের প্রান্তভূমির জনজাতি : ইতিহাস ও সংস্কৃতি , প্রগতিশীল প্রকাশন, কলকাতা,পৃ. ২৫

৫) পূর্বোক্ত

৬) Singh, K. S. (1994). The Scheduled tribe. Anthropological Survey of India . Delhi . P. P. 302-385

৭) রাভা, সুশীল কুমার ,(১৪০৮ বঙ্গাব্দ) , রাভা সংস্কৃতি ও জীবনধারা, জলপাইগুড়ি জেলা সংখ্যা, অজিত ঘোষ (সম্পা) তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, কলকাতা, পৃ. ১৫৭

৮) Raychaudhuri , B.(2007) . The Rabhas of North Bengal, lpid, P.3

৯) lpid

১০) Sarkar , A.K .(2021).TRIBES OF SUB-HIMALAYAN REGION: Meches, Rabhas, Totos and Garos . lpid . P. 20

১১) lpid

১২) Rabha , M .(2007) Castomary Law and Penal code of the Rabhas . Goalpara .P. 19

১৩) দেবনাথ, মহেন্দ্র , (২০১৪) , উত্তরবঙ্গের প্রান্তভূমির জনজাতি : ইতিহাস ও সংস্কৃতি, পূর্বোক্ত, পৃ .২৮

১৪) পূর্বোক্ত

১৫) পূর্বোক্ত, পৃ . পৃ . ২০-৩৯

১৬) Sarkar, A. K .TRIBES OF SUB-HIMALAYAN REGION: Meches, Rabhas ,Totos and Garos . Ipid . P. 19

১৭) Singh , K. S. The Scheduled tribe . lpid . P. 14

১৮) lpid . P. 15

১৯) Raychaudhuri, B . The Rabhas of North Bengal . lpid . P. 1

২০) বর্মণ, রূপকুমার ,(২০২২), পরিবর্ত অনুসন্ধান : রাষ্ট্র নাগরিকত্ব বাস্তুচ্যুতি ও ইতিহাসচর্চা, গা ঙ চি ল প্রকাশন, কলকাতা ৭০০ ০০৭, পৃ . ২২

নবদ্বীপের কাঁসা শিল্পের সমস্যা ও সম্ভাবনা

সুমিত কুমার মণ্ডল
সহকারী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ,
গোবিন্দ প্রসাদ মহাবিদ্যালয়,
অমরকানন, বাঁকুড়া

সুপ্রাচীন কাল থেকেই নানা বিবর্তনের মধ্য দিয়ে অবিভক্ত বাংলার এবং পরবর্তী ঔপনিবেশিক শাসনে বাংলা প্রেসিডেন্সির অন্যতম এবং সর্বপ্রথম গঠিত জেলা হিসেবে নদীয়া জেলার আত্মপ্রকাশ ঘটেছিল। নদীয়া জেলার কাঁসা শিল্প কেন্দ্র গুলির মধ্যে অন্যতম ছিল নবদ্বীপের কাঁসা শিল্প। কাঁসা শিল্প নবদ্বীপের খুবই প্রাচীন ও ঐতিহ্যবাহী শিল্প। প্রথম থেকেই কাঁসা শিল্পের যথেষ্ট চাহিদা ও জনপ্রিয়তা ছিল সকল মানুষের মধ্যেই। সারা বাংলার পাশাপাশি দেশে ও বহির্দেশে এই নবদ্বীপের কাঁসার তৈরি বিভিন্ন উৎপাদিত দ্রব্যাদির চাহিদা ছিল। নবদ্বীপের শিল্পের একটা আলাদা বৈশিষ্ট্য ছিল, তাহল গুণগত মান, যা অন্যান্য শিল্পের থেকে অনেক বেশি। কাঁসার পুনর্বিক্রয় মূল্য বা Resale value আছে বলে এর চাহিদা প্রাচীনকাল থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত রয়ে গেছে একই ভাবে।[i] এই শিল্পের কাঁচামাল সংক্রান্ত দ্রব্যাদি ফেলে দেওয়া হয় না, কাঁচামাল দিয়ে পুনরায় কাঁসার দ্রব্যাদি তৈরি করা হয়। কাঁসা শিল্পের ব্যবহারিক গুণও অন্যান্য সব শিল্পের থেকে অনেক বেশি। কাঁসা শিল্পের ক্ষয়প্রাপ্ত হলেও পরে বিক্রয় করা যায়, ফলে চাহিদা সব সময় থেকেই যায়।বড়লোকদের তুলনায় সমাজে গরীব ও নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে চাহিদা ও গ্রহণ করার প্রবণতা অনেক বেশি লক্ষ্য করা যায়। বড়লোকদের মধ্যে ফ্যাশন আছে যেহেতু ধাতু মূল্যের কাঁসার চাহিদা আন্তর্জাতিক বাজারে অনেক বেশি আছে, সেহেতু বিক্রি বাড়ছে কিন্তু দাম তেমন ভাবে পাওয়া যাচ্ছেনা। তা ছাড়া বর্তমান বাজারে কাঁসার উৎপাদিত দ্রব্যাদি কাঁচামালের মূল্য বৃদ্ধির জন্য সকল মানুষের মধ্যে চাহিদা আগের থেকে অনেকটাই কমে যাচ্ছে। নদীয়া জেলার অন্যতম শিল্প কেন্দ্র হিসেবে পরিচিত হয়ে আসছে নবদ্বীপ। নবদ্বীপে প্রাচীনকাল থেকেই বংশানুক্রমিকভাবে চলে আসছে কাঁসা শিল্প তৈরীর কাজ। অনেকে আবার পেশা ও জীবিকার তাগিদে এই শিল্পের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়ছেন।বহু ব্যবসায়ী ও বণিক গোষ্ঠী বিশেষ করে কংস বণিক সম্প্রদায় প্রাচীনকাল থেকেই বংশানুক্রমিকভাবে যুক্ত হয়ে পড়েছিল। মূলত কংস বণিক সম্প্রদায় ছিল কাঁসা শিল্পের প্রধান পৃষ্ঠপোষক। এছাড়া অন্যান্য সম্প্রদায় যেমন কায়স্থ, ব্রাহ্মণ, নমঃশূদ্র, বারুজীবীরাও এই শিল্পের সঙ্গে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে যুক্ত হয়ে পড়েছিল।বাংলা থেকে কাঁসার উৎপাদিত দ্রব্যাদি থালা-বাটি বড় গামলা আসাম, বিহার, মধ্যপ্রদেশ, উত্তরপ্রদেশ, উড়িষ্যা প্রভৃতি রাজ্যে নিয়ে যাওয়া হত। তৎকালীন সময়ে কাঁসার চাহিদা ছিল অনেক বেশি।[ii] নবদ্বীপে

যেসকল ব্যক্তিবর্গ কাঁসার ব্যবসা করতেন তাদের মধ্যে অন্যতম ছিল শ্রী গুরুদাস দাস মহাশয়।গুরুদাস বাবুর আমল থেকেই নবদ্বীপে কাঁসা শিল্পের ব্যবসা দাদন প্রথা অর্থাৎ অগ্রিম অর্থ দিয়ে কাজ করার প্রবণতা চলে আসছে। তিনি নবদ্বীপে প্রায় সকল ব্যবসায়ীকে দাদন অর্থাৎ অগ্রিম অর্থ দিয়ে কাজ করাতেন। নবদ্বীপের ব্যবসা-বাণিজ্যে তিনি নিজের হাতে এনে সিরাজগঞ্জে একটি বড় ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেছিলেন।এই অঞ্চলের তিনি ব্যবসায়ীদের দাদন অর্থাৎ অগ্রিম অর্থ দিয়ে তাদেরকে হস্তগত করতেন। এই সিরাজগঞ্জ অঞ্চলের প্রায় সকলেই কাঁসার কাজ করতে জানে। আগে এই কাঁসা শিল্প কুটির শিল্প আত্মপ্রকাশ করেছিল। পরবর্তী সময়ে তা বিস্তৃত অঞ্চলের বৃহত্তম শিল্প হিসেবে ছড়িয়ে পড়েছিল। এই কাঁসা-শিল্প যেহেতু অন্যান্য শিল্প থেকে অনেক বেশি লাভজনক শিল্প ছিল তাই বহু মানুষ জন প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে যুক্ত হয়ে রয়েছেন প্রাচীনকাল থেকেই। নবদ্বীপের কাঁসা শিল্পের কিছু ভালো দিক ছিল তা হল এর গুণগতমান অনেক বেশি ছিল।

নবদ্বীপের কাজের শিল্প প্রাচীনকাল থেকেই অতিরিক্ত কর্মসংস্থান অনুকূল ক্ষেত্র তৈরি করতে পেরেছিল শিল্পটি স্বল্প পুঁজি ভিত্তিক শিল্প হিসেবে পরিচিত ছিল সকল শ্রমিকের কর্মসংস্থান তৈরি করেছিল।[iii]কাঁসা শিল্প কে কেন্দ্র করে নবদ্বীপের পাশাপাশি বাংলার সমস্ত জেলাতেই একটা পরিবর্তন সাধন হয়েছিল। বাংলার সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে প্রাক-ঔপনিবেশিক সময় কাল থেকেই। কাঁসা শিল্প বাংলার অন্যান্য শিল্পের মতই গুরুত্বপূর্ণ শিল্প হিসেবে সুনাম অর্জন করে রয়েছে। যুদ্ধ ও আর্থিক মহামন্দার ফলেযখন সারা বিশ্বে তথা ভারতবর্ষ ও বাংলায় বেকার সমস্যা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছিল, মানুষ ক্রমশ কর্মহীন হয়ে পড়েছিল, ঠিক তখনই গ্রামীণ অর্থনীতির শরীক হিসেবে কাঁসা শিল্পের আত্মপ্রকাশ ঘটেছিল। কাঁসা শিল্পের হাত ধরেই মানুষের কর্মসংস্থান নতুনভাবে সৃষ্টি হয়েছিল।[iv]কাঁসা-শিল্প যেহেতু বিদেশি শিল্প হিসেবে পরিচিত ছিল না, গ্রামীণ শিল্প হিসেবে পরিচিত ছিল, সেহেতু এই শিল্প তার নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখতে পেরেছিল এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ ও স্বনির্ভর হয়েছিল।প্রত্যক্ষ-পরোক্ষভাবে গ্রামীণ অর্থনীতিকে এক নতুন রূপ দান করেছিল।এই কাঁসা শিল্পের উৎকর্ষ অপকর্ষ একান্তভাবে কারিগর, শিল্প-শ্রমিকদের নিপুণতার ওপর নির্ভরশীল ছিল। নবদ্বীপে কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পের বিশেষ করে কাঁসা শিল্পের কতগুলি সমস্যা ছিল, যা শিল্পের গতিশীলতাকে ব্যাহত করেছিল। যথা-

১) মূলধন জনিত সমস্যা।
২) কাঁচামালের সমস্যা।
৩) কয়লার সমস্যা।
৪) বিদ্যুতের সমস্যা।
৫) দক্ষ কারিগরের সমস্যা।
৬) উৎপাদিত কাঁসার জিনিসের বাজারজাত করার অসুবিধা।

৭) বিক্রয় করের সমস্যা।

৮) সরকারি বিভিন্ন আইন এর জটিলতা।

৯) আমলাতান্ত্রিক সমস্যা।

১০) পুলিশ প্রশাসনের হয়রানি সংক্রান্ত সমস্যা।

১১) মহাজন' সম্প্রদায়েরশোষণ।

১২) কংস বণিক সম্প্রদায় গুলির শিল্পের প্রতি অনীহা।

১৩) উৎপাদিত দ্রব্যের অত্যধিক মূল্য বৃদ্ধি।[v]

যে কোন অঞ্চলে শিল্প গড়ে ওঠার ক্ষেত্রে কিছু কিছু কারণ থাকে, তা হল

ক) সংশ্লিষ্ট শিল্পের প্রয়োজনীয় উপকরণ গুলি যোগানের সুবিধা।

খ) উৎপাদিত দ্রব্যাদির চাহিদা।

গ) উৎপাদিত দ্রব্যাদি বিক্রির জন্য বাজারের সুবিধা।

ঘ) শিল্প গড়ে ওঠার অনুকূল প্রাকৃতিক পরিবেশ।

ঙ) দক্ষ অভিজ্ঞ শিল্প শ্রমিক।

এছাড়া ছিল পূর্বপুরুষদের স্মৃতিবিজড়িত অর্থাৎ বংশ-পরম্পরা গত ভাবে শিল্পের সঙ্গে যুক্ত সম্প্রদায়ের আগ্রহ ও সহযোগিতা। নবদ্বীপের কাঁসা শিল্পের সমস্যা সমাধানে কিছু সরকারি ও বেসরকারি সংস্থা ও সমবায় সমিতি গুলি সদর্থক ভূমিকা পালন করলে শিল্প তার হত গৌরব ফিরে পাবে।উপরোক্ত সমস্যাগুলি দূর করতে হলে চাই স্থানীয় মানুষজনও শিল্প শ্রমিকদের সাহায্য-সহযোগিতা, জেলার শিল্প আধিকারিক, ইন্ডাস্ট্রিয়াল ফিনান্স করপরেশন, স্থানীয় সমবায়-সমিতি, ব্যাংক, লোকাল বি.ডি.ও, এম.এল.এ. পৌর প্রধান, গ্রামপ্রধান, পুলিশ-প্রশাসনের সাহায্য-সহযোগিতা। সরকারি উদ্যোগ,স্থানীয় মহাজন,স্থানীয় ব্যবসায়ী শ্রেণীর সাহায্য-সহযোগিতা। স্বাধীনতার পরবর্তী কালে কাঁসা শিল্পের উন্নয়নে সমবায় সমিতি এবং কাঁসা শিল্প সমিতি গুলি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করলেও কালে কালে অনেক সমবায় সমিতি উঠে গেছে। এই সমিতিগুলি উঠে যাওয়ার কারণ গুলি হল-

১) সমবায় সমিতিতে অন্তঃকলহ সমিতির কর্মকর্তা ও সদস্যদের মধ্যে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে বিরোধ লেগেই থাকত।

২) ব্যাংক থেকে ঋণ শোধ করার ক্ষেত্রে আগ্রহের অভাব।

৩) সরকারি ঋণের ক্ষেত্রে অনীহা প্রকাশ, আবার ঋণ প্রদান করার ক্ষেত্রে ব্যাংকের নানা জটিলতা।

৪) সমবায়-সমিতিগুলি সব সময় বার্ষিক সাধারণ সভা না করা। এই সকল বিষয় গুলির সমিতি গুলিকে অবক্ষয়ের দিকে নিয়ে যাচ্ছে।

৫) সমিতিগুলি পরিচালনা করার মতো সাহসী লোকের অভাব।

৬) শিক্ষার অভাব, গ্রাম্য নোংরা রাজনীতি, জাতিভেদ প্রথা, সরকারি কর্মচারীদের হস্তক্ষেপ এবং শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকদের সাহসিকতার অভাব। এর ফলে সমিতিগুলিতে নানা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হচ্ছে।

৭) কার্যকরী মূলধন এর অভাব।

৮) রিজার্ভ ব্যাংক, স্থানীয় স্তরে বন্ধন ব্যাংক, নাবার্ড ব্যাংক প্রভৃতি কাঁসা শিল্পের উন্নয়নে সদর্থক ভূমিকা গ্রহণ করতে পারছে না।[vi] ফলে শিল্পে বিনিয়োগের অভাব দেখা দিচ্ছে। অনেক সময় মহাজন,জমিদার, বড় বড় ব্যবসায়ীদের অন্যায় দেখলে শিল্পী ও কারীগরেরা প্রতিবাদ করতে সাহস পেতো না, ভয় পেত। সমবায়-সমিতিগুলির সদস্যগণ মহাজন,জমিদার নির্ভর হওয়ার ফলে বহু শিল্পী ও কারিগররা মহাজনদের বিরুদ্ধে কোনো প্রতিবাদ, আন্দোলন তেমনভাবে গড়ে তুলতে ভয় পেত। সমবায়-সমিতি গুলি সমানভাবে দায়িত্ব পালন করতে অপারগ। অনেক সময় দেখা যাচ্ছে যে, সরকার পক্ষ থেকে সাহায্য-সহযোগিতা, লোনের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। প্রকৃত দুঃস্থ অসহায় শিল্পী ও কারিগররা তার সুবিধা পাচ্ছে না, অন্যরা পাচ্ছে, যাদের প্রয়োজন নেই।যাদের কারখানা নেই। এক্ষেত্রে সমবায়-সমিতি গুলি কার্যকরী সদর্থক ভূমিকা গ্রহণ করতে পারছে না।বর্তমানকালে সমবায় সমিতি গুলি বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের ছত্রছায়ায় চলে আসছে। রাজনৈতিক দলগুলো বিভিন্ন প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে ফলে অনেক ভূয়ো-সমিতি গঠিত হচ্ছে রাজনৈতিক সুবিধা আদায়ের জন্য। আসল সমিতিগুলি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। সর্বোপরি সমবায় সমিতি গুলি মহাজনদের বিরুদ্ধে তেমন কিছু বলতে পারছে না, এছাড়া কংস বণিক সম্প্রদায় গুলি কাঁসা শিল্পের উন্নয়নে সদর্থক ভূমিকা গ্রহণ করছে না।[vii]1993সালে ভারতে গ্যাট চুক্তির স্বাক্ষর এবং প্রাক্তন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী ডঃ মনমোহন সিংহের নয়া শিল্পনীতির ফলে ভারতের শিল্প ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তন আসতে চলেছে বলা হয়েছিল। গ্যাট চুক্তি ও নয়া শিল্পনীতির সুফলের কথা মাথায় রেখে পশ্চিমবঙ্গ সরকার শিল্প উন্নয়নে পরিকাঠামো তৈরি করে তা বাস্তবায়িত করার চেষ্টা করেছিল। সরকারের শিল্পের বিকেন্দ্রীকরণের সুফল নদীয়া জেলা তথা নবদ্বীপের শিল্পসমূহ পাবে বলে আশা করা হয়েছিল। পশ্চিমবঙ্গ সরকার নদীয়া জেলার পর্যটনশিল্প সেইসঙ্গে নবদ্বীপের শিল্পের উন্নতি সাধনের জন্য কিছু কর্মসূচি গ্রহণ করেছিল বাস্তবে তেমনভাবে রূপায়িত হয়নি।[viii] পরিশেষে এ কথা বলা যায় যে, নবদ্বীপের শিল্প স্থাপনের যে সমস্যা তথা অসুবিধা গুলি রয়েছে সেগুলি দূর করতে পারলে নবদ্বীপের শিল্প বিশেষ করে কাঁসা-শিল্প পুনরায় তাঁর হতগৌরব ফিরে পাবে এবং নবদ্বীপ তথা নদীয়াজেলা অর্থনৈতিক দিক দিয়ে ভারতের মানচিত্রে একটা জায়গা করে নেবে এতে কোন সন্দেহ নেই।

কাঁসা শিল্পের মন্দার কারণগুলি হল-

১) কাঁসার স্থলে বাজারে এলো অন্য ধাতব শিল্প যেমন স্টিল, অ্যালুমিনিয়ামের বাসনপত্র। যেগুলি কাঁসার তুলনায় সস্তা এবং অধিকতর চকচকে উজ্জ্বল। মানুষের আকর্ষণ দেখা দিয়েছে সস্তা উজ্জ্বল ধাতু শিল্পের প্রতি।

২) অন্য ধাতব শিল্পের আগমনে মহাজনেরা নিজেদের ও তাদের বংশধরদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে চিন্তিত হলেন।অনিশ্চয়তা থেকে ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে অন্য পেশায় ঠেলেও দিলেন এবং নিজেদের এই ব্যবসায় পুণরায় অর্থ বিনিয়োগ করলেন না।

৩) নতুন নতুন প্রকার(Variety) সৃষ্টির কথা ভাবাই হলো না। একমাত্র ভ্যারাইটি বা প্রকারের কারণে শিল্পে বৈচিত্র ও নতুনত্ব থাকলো না।

৪) 1971 খ্রিস্টাব্দে পৃথক রাষ্ট্র বাংলাদেশ গঠিত হলো। সেই দেশে মাল সরবরাহ করা গেল না। ওই দেশের বাজার আমাদের হাতছাড়া হল।

৫) কারিগরদের নিজস্ব মূলধন এর অভাবে মহাজনদের কাছ থেকে ঋণ গ্রহণ করতে হয়। চড়াসুদ দিতে হয় শিল্পীদের।

৬) সরকারি ঋণ প্রাপ্তিতে সুবন্দোবস্তের অভাবে শিল্প ও ব্যবসায় ঘাটতি এনেছে।[ix]

কাঁসা শিল্পের উন্নয়নের কয়েকটি উপায় বা ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। যথা-

১) যেসব এলাকায় কাঁসার শিল্পীরা বাস করেন,বা কাজ করেন, সেই সব স্থানে আরো উন্নত সমবায় সমিতি গঠন ও সুষ্ঠু পরিচালনার ব্যবস্থা করতে হবে।

২) সমবায় সমিতির মাধ্যমে শিল্প কুটির শিল্পের যথাযথ বিক্রয় মূল্য ধার্য করতে হবে এবং কারিগররা যাতে সহজ নিয়মে ঋণদাতার থেকে ঋণ পেতে পারে তার ব্যবস্থা করতে হবে।

৩) উৎপাদিত শিল্পজাত দ্রব্যের বাজার সম্প্রসারণ করতে হবে। বিভিন্ন এলাকায় উৎপাদিত শিল্প যাতে দেশের বিভিন্ন এলাকায় পৌঁছায় তা দেখতে হবে।

৪) উৎপাদিত দ্রব্যের গুণগতমান যাতে ঠিক থাকে সেজন্যশিল্পী ও কারিগরদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।

৫) শিল্পজাত দ্রব্যেরগুণগত মান অনুযায়ী শিল্পীদের মজুরি বৃদ্ধির ব্যবস্থা করতে হবে।

৬) যথাযথ পরিমাণে কাঁচামাল সরবরাহের ব্যবস্থা করা দরকার। কাঁচামালের অভাবে নতুন শিল্প সৃষ্টি হচ্ছে না। সরকার যদি কন্ট্রোল রেটে কাঁচামাল সরবরাহ করেন, তবে ভালো হয় শিল্পীদের।

৭) শিল্পীদের ব্যক্তিগতভাবে আর্থিকঋণ বা অনুদানের ব্যবস্থা নিতে হবে।

৮) কয়লার পরিবর্তে বিদ্যুৎ গ্যাস এ কাজ করতে পারলেও খরচ কমবে।কয়লার খরচ কমে গেলে স্টিলের বাসনপত্রের সঙ্গে কাঁসা শিল্পের শিল্পীরা প্রতিযোগিতা করতে পারবেন।

৯) কারিগররা নিজেরা যদি মাল সরবরাহ করতে পারেন তবে লাভ বেশি হবে। উৎপাদিত দ্রব্যেরও মূল্য কমে যাবে। কিন্তু মাল সরবরাহ করতে হলে একসঙ্গে অনেক অর্থের দরকার, যেটা কারিগরদের নেই।

১০) কাঁসা শিল্পের ক্ষেত্রে সরকারি প্রশাসনিক নিয়মকানুন কিছুটা শিথিল করা প্রয়োজন। এর ফলে ভাঙ্গা কাঁসার বাসনপত্র এক জায়গা থেকে অন্যত্র নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে অসুবিধা কমবে। শিল্পীদের আর্থিক শ্রীবৃদ্ধি ঘটবে।[x]

পরিশেষে একথা বলতে পারি যে, কাঁসা শিল্পের ভবিষ্যৎ সম্বাবনা ছিল অতি উজ্জ্বল। কাঁসা শিল্পীদের কাজে উৎসাহ বৃদ্ধি করতে হলে সরকারী তথা বেসরকারী সংস্থার সহযোগিতার প্রয়োজন। তার সাথে বাস্তব ভিত্তিক পরিকল্পনারও আবশ্যকতা রয়েছে। শিল্পীরা যাতে আরও উন্নত মানের জিনিস পত্র তৈরী করতে পারে, তার জন্য উন্নত ধরনের প্রযুক্তির কথা চিন্তা ভাবনা করতে হবে। শিল্পে উৎপাদিত দ্রব্যসামগ্রী দেশের অভ্যন্তরে ও বিদেশে বিক্রয় তথা প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করতে হবে। তাহলেই এই শিল্পের অগ্রগতি সম্ভব।

তথ্যসূত্র :

i মল্লিক কুমুদনাথ। ,*নদীয়া কাহিনী।* পুস্তক বিপনী .পৃ **।১৯৮৬** ,কোলকাতা ,৪১

ii তদেব। পৃ৪২ .

iii তদেব। পৃ৪৪ .

iv West Bengal District Gazetteer, Nadia, 1919. Page. 110

v দত্ত **।**(সম্পা) আশুতোষ ,*কংসবণিক পত্রিকা।* তৃতীয় বর্ষ .বঙ্গাব্দ। পৃ **১৩৩৩** ,৩৫

vi তদেব। পৃ৩৮ .

vii ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার নদীয়া। ,নবদ্বীপ ,কাঁসাশিল্পী ,অসিত পাল ,

viii West Bengal District Gazetteer, Nadia, 1919. Page. 112

ix দত্ত **।**(সম্পা) আশুতোষ ,*কংসবণিক পত্রিকা চতুর্থ* বর্ষবঙ্গাব্দ। প **১৩৩৪** ,ৃ৪১ .

x তদেব। পৃ৪ .৫

ভগীরথ মিশ্রের উপন্যাস

প্রভাস চন্দ্র দেহুরী
গবেষক, বাংলা বিভাগ,
কোলহন বিশ্ববিদ্যালয়, ঝাড়খণ্ড

সত্তর-উত্তর বাংলা কথাসাহিত্যের এক উজ্জ্বল নক্ষত্র ভগীরথ মিশ্র। বাংলা কথাসাহিত্যে স্বতন্ত্র ধারার স্বাক্ষর রেখেছেন। নতুন পথের সন্ধান দিয়েছেন। আবাহন করেছেন নতুন ধারার। ভাবনার প্রকাশ ঘটিয়েছেন বিচিত্র ধারায়। একই বিষয়ের পুনরাবৃত্তি ঘটাননি কখনও। গ্রামকেন্দ্রিক লোকায়ত জীবনভাবনায় তাঁর উপন্যাস বলিষ্টতা অর্জন করেছে। কোনো বিষয়কে এড়িয়ে যাননি তা সে যত কঠিনই হোক। একজন সমাজতান্ত্রিক বাস্তবাদী লেখক হিসাবে উপন্যাসের অন্দর মহলে প্রবেশ করে ঘটনার বিকাশ, বিশ্লেষন করেছেন বাস্তবতার পুঙ্খানুপুঙ্খ। ভাষা প্রয়োগের দিক থেকে অত্যন্ত বলিষ্ট চিন্তার স্বাক্ষর রেখেছেন। সমাজে যা কিছু প্রত্যক্ষ করেছেন তাকেই ভাষা ও ভাবনার মিশ্রণে তুলে ধরেছেন হৃদয়গ্রাহি করে। আর ঠিক এইখানেই তাঁর অন্যোন্যতা।

উপন্যাস ঊনবিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। বাংলা সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্রের মধ্য দিয়ে যার সূচনা। পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র এবং বহু খ্যাতনামা ঔপন্যাসিক বাংলা পত্রপুষ্পে আলোকিত করেছেন। এই শিল্প সাধনায় আঙ্গিকের বিচিত্র প্রয়োগ দেখানো হয়েছে। এক একজন লেখক এক এক ধরনের কৌশল প্রয়োগ করেছেন। কাহিনি, ঘটনা, চরিত্র যেমন বিচিত্র ধারায় বিশ্লেষিত হয় ঠিক তামনি উপন্যাস রচনার জন্য প্রয়োজন প্রেক্ষাপট বা পটভূমি। উপন্যাস রচনায় প্রেক্ষাপটের প্রয়োজনীয়তা কথাকারের কাছে খুব গুরুত্বপূর্ণ। তেমনি পাঠকেরও উপন্যাস পাঠের এবং জানার জন্য সহজ হয়ে যায়। পটভূমি বা প্রেক্ষাপট ঔপন্যাসিককে উপন্যাস লেখার জন্য রসদ যোগান দেয়। তার আবার রকমফের আছে। কখনও চরিত্রের মনোভূমি হয়েও প্রেক্ষাপট। আবার কখনও গুরুত্বপূর্ণ—আন্দোলন বা আলোড়ন সৃষ্টিকারী ঘটনাও প্রেক্ষাপট হয়ে ওঠে। কখন স্থানকে কেন্দ্র করে আবার কখনও সময় বা কালকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে। আমরা প্রেক্ষাপট রচনার ক্ষেত্রে ভৌগলিক সীমানা বা স্থান এবং কাল বা সময়কে বিচার্য ধরে উপন্যাস কাহিনির প্রেক্ষাপট আলোচনায় অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করব।

এখানে আমরা ভগীরথ মিশ্রের উপন্যাস রচনার প্রেক্ষাপট বা পটভূমি আলোচনা করব। ভগীরথ মিশ্র তাঁর সমস্ত উপন্যাস রচনা করেছেন গ্রাম এবং গ্রামীন মানুষের জীবন নিয়ে। ফলে তাঁর উপন্যাসের কাহিনিবৃত্তে উঠে এসেছে গ্রামীন মানুষের জীবন যাত্রার পুঙ্খানুপুঙ্খ জীবনচিত্র। একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি না ঘটিয়ে ভিন্ন ভিন্ন ঘটনাকে সামনে রেখে কাহিনি বিশ্ব তৈরি করেছেন। ফলে প্রতিটি উপন্যাসে ভিন্ন ভিন্ন স্থান বা অঞ্চলের মানুষের ছবি প্রত্যক্ষ গোচর হয়। লোকায়ত জীবন ভাবনায় একাধিক

অঞ্চলের মানুষকে আবিষ্কারের বা অনুসন্ধানের অভীপ্সাও লক্ষ করা গেছে। ফলে তাঁর উপন্যাসে স্থানের যথেষ্ট গুরুত্ব আছে প্রেক্ষাপটের নিরীখে। আবার সময়কেও তিনি গুরুত্ব সহকারে উপন্যাসে স্থান করে দিয়েছেন। ভৌগলিক স্থান এবং সময়ের এই যুগলবন্ধনে তাঁর উপন্যাস সফল হয়ে উঠেছে। তাই প্রেক্ষাপট হিসাবে আমরা আলোচনা করব—

ক) ভৌগলিক বা স্থানিক প্রেক্ষাপট।

খ) সময় বা কালগত প্রেক্ষাপট।

তাঁর রচিত প্রথম উপন্যাস 'অন্তর্গত নীলস্রোত'। প্রথম প্রকাশ ১৯৯০ সাল। উপন্যাসে দেখি, লেখক ভৌগলিক বা স্থানিক প্রেক্ষাপট হিসাবে নির্বাচন করেছেন অবিভক্ত মেদিনীপুর বর্তমান পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার কেলেঘাই ও সুবর্ণরেখা নদী তীরবর্তী প্রান্তিক এলাকা কেশিয়াড়ি ও নারানগড় এলাকার গ্রাম সমূহ। উপন্যাসে যে সমস্ত চরিত্র উপস্থিতি তা উক্ত অঞ্চলেরই। কথাসাহিত্যিক ভগীরথ মিশ্র যে এলাকার মানুষ যেখানে তাঁর শৈশব কৈশোর এবং যৌবনের অনেকটা সময় কাটিয়েছেন স্থানিক প্রেক্ষাপট হিসাবে তাই সেই বিচরণভূমিকে নির্বাচন করেছেন প্রথম উপন্যাসে। এখানে নিজের এলাকার সম্পর্কে সম্যক ধারণাকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন।

> "গুরুপদর গাঁ যমুনা চাতবীভাড়া থেকে পাঁচ কিলোমিটার মতো। মধ্যে ফাঁকা মাঠ, লোধাদের গাঁ বীরকাঁড়, কেলেঘাই নদী, মেট্যালহাইস্কুল, রাস্তাটা নিরাপদ নয়।"
>
> (অন্তর্গত নীলাস্রোত, দে'জ পাবলিশিং, পৃ. ৯)

এই বর্ণনায় লেখকের ধারণা পরিস্কার হয়ে যায়। সমগ্র উপন্যাস জুড়ে স্থানিক মানুষের তীব্র উপস্থিতি। আর সময় হিসাবে লেখক দেখিয়েছেন স্বাধীনতা পরবর্তী সময়। বাংলায় তখন বামেদের শাসন। গুরুপদ একজন প্রান্তিক মানুষের সন্তান। শোসিত, অবহেলিত। অনেক ঘাত-প্রতিঘাত, দ্বন্দ্ব-সংঘাতের পর সরকারি কর্মচারী। রাইটার্সেরD-Group-এর কর্মী। প্রথমে সে শোসিত আবার অবস্থার পরিবর্তনের সেই-ই শোষক হিসাবে গ্রামের মানুষের কাছে প্রতিষ্ঠিত। শোষক ও শোসিতের এই দ্বন্দ্বমূলক অবস্থাকে তুলে ধরার জন্য লেখক সময়কে সচেতনভাবে ব্যবহার করেছেন। দীর্ঘ আন্দোলনের পর বামশাসন প্রতিষ্ঠা পেয়েছে বাংলায়। ৭৮-এ পঞ্চায়েত ব্যবস্থার প্রচলন হয়েছে। মানুষের অনেক প্রত্যাশা, মানুষও অনেকখানি সচেতন হচ্ছে। সরকারি আনুকূল্যে মানুষের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তন হচ্ছে-এই রকম একটা সময়কে লেখক তুলে ধরেছেন।

ভৌগোলিক স্থান ও সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে লেখকের ভাবনায় উঠে এসেছে চরিত্রের মনস্তাত্ত্বিক দিকটিও গুরুপদ সমগ্র উপন্যাস জুড়ে কাহিনি বা ঘটনাকে নিয়ন্ত্রণ করেছে। মানসিক দ্বন্দ্ব সংঘাতে দীর্ণ, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক শোষণ এবং সামাজিক বৈষম্য—তার চরিত্রকে বলিষ্ঠ করেছে। তাতে সে ক্ষত-বিক্ষত হয়েছে—ফলে চরিত্রের

মনস্তাত্ত্বিক দিকটিও প্রেক্ষাপট হিসাবে কাজ করেছে। কুসুমের প্রতি মোহভঙ্গ সমাজ সংসারের প্রতি দায়বদ্ধতা গুরুপদকে সংবেদনশীল করে তুলেছেন।

'তস্কর' তাঁর দ্বিতীয় উপন্যাস। এই উপন্যাসেও আমরা দেখতে পাই নারানগড় থানা এলাকার, মেট্যাল গ্রাম, ডিহিপার, খলিনা, কোটালচক প্রভৃতি গ্রাম সমুহের নাম। স্থানিক পরিবেশ পশ্চিম মেদিনীপুর-এর প্রান্তিক অঞ্চল। এখানে শোষক বানেশ্বর ঘোষ, আর শোষিত গোক্ষুর ভক্তা। শোষক ও শোষিতের সম্পর্ক চিহ্নায়নে যে কাহিনির বা ঘটনার বিবরণ দিয়েছেন তাতে উক্ত অঞ্চলের মানুষের পরিচয় বেরিয়ে আসে এবং স্থানিক ধারণাও পরিষ্কার হয়ে পড়ে। লোকায়ত জীবনভাবনায় প্রতিভাত হয় স্থানিক বৈচিত্র্য।

উপন্যাসের শুরুতে দেখি—"আশ্বিনের শেষ। গভীর নিশিরাত। বানেশ্বর ঘোসের শোবার ঘরের জানালার পাশটিতে এসে নিঃশব্দে দাঁড়াল গোক্ষুর ভক্ত। সারা গা ভিজে গিয়েছে ঘামে। (পৃ. ১) এবং কাহিনির শেষে দেখি হিমেওষে ধরিত্রী তখন বরফের মতো শীতল। তার ওপর প্রবল আক্ষেপে লুটোপুটি খাচ্ছে গোক্ষুর। গাঁজলা উঠছে মুখে। প্রবল শীতে ঠকঠকিয়ে কাঁপছে। রাত বাড়ছে। হিম ঝরছে। হু হু করে বইছে উত্তরে হাওয়া। পাতা খসানোর শব্দ। পাতা ঝরছে শীতের রাতে। নিঃসঙ্গ পাতা ঝরছে। রাত ফুরলেই হাসপাতালে যাবে গোক্ষুর ভক্তা। (পৃ. ২০৭)

উপন্যাসের কাহিনীবৃত্ত তৈরি হয়েছে তসকর গোক্ষুর ভক্তাকে কেন্দ্র করে। তাতে শুরু এবং শেষে যে সময়কে আমরা পাই তা সাধারণত নিশিরাত। আশ্বিন-পৌষ মাঘ এই সময়সীমা। আবার লেখকের বক্তব্য থেকে পাই— "পরপর দুটো যুক্তফ্রন্টই দেশ গাঁয়ের বারোটা বাজিয়ে দিয়ে গেছে। সেই সে হরেকিষ্টো কোঙার মেদুনপুর শহরে মিটিং করে সব্বাইকে লাঠি সড়কির ডগায় বেনাম জামিনের দখল নিতে বলল, দেশ গাঁয়ের অধপতন শুরু হলো তখন থেকেই। ...কম জ্বালিয়েছে সাতষট্টি থেকে একাত্তর।"

"ভাগ্যে বাহাত্তরে জিতল দল, ভাগ্যে জরুরী অবস্থাটা আইল দেশে। লচেত, অ্যাদিনে গাঁ ঘরের সব ভদ্দর সজ্জনদের মড়া চিরে ঘাস গজাইতো।"

সারা বাংলা উত্তাল যুক্তফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত, ১৯৬৭-৭১ সাল। সর্বত্র ক্ষমতার দখলদারি। বামেদের উত্থান, কৃষক ক্ষেতমজুর মানুষের রাজনীতিতে অংশগ্রহণ, নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াই—এই রকম একটা সময়কে লেখক প্রেক্ষাপট হিসাবে ব্যবহার করেছেন।

গোক্ষুর লোধা সম্প্রদায়ের মানুষ। প্রান্তিক, পিছিয়ে পড়া, অন্ত্যজ শ্রেণির প্রতিনিধি। শিক্ষা-দীক্ষা থেকে বহু যোজন দূরে তার অবস্থান। জীবিকা চাষবাস ও বনজ সম্পদ আহরণ করে স্থানীয় হাট বা গ্রামে বিক্রি করা। প্রথমে আমরা তকে দেখি একজন নামকরা (তমকর) চোর হিসাবে। স্ত্রী সন্তান মারা যাওয়ার পর মানসিক

পরিবর্তন হয়। দেখা দেয় মানবিক গুণের বিকাশ। কিন্তু যে মানসিক, সামাজিক পরিবেশে সে জীবন যাপন করেছে যে তা লালন পালন করা অত সহজ নয়।অনেক ঘাত সংঘাত পেতে হয়েছে। কারণ যে ভালো, সুস্থ, স্বাভাবিক জীবন যাপন করতে চাইলেও সমাজ তাকে সে সুযোগ দেয়নি। সমাজের স্বার্থন্বেষী মানুষ স্ব-স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য তাকে ব্যবহার করেছে। এক্ষেত্রে পুলিশ প্রশাসনও পিছিয়ে নেই। সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং আইনী চক্রব্যুহে সে আটকে পড়েছে। বেরিয়ে আসতে পারেনি। শেষ পর্যন্ত জীবন দিতে হয়েছে ছলনার কাছে, কূট কৌশলের কাছে, স্বার্থের কাছে।

ভগীরথ মিশ্র মেদিনীপুরের প্রান্তিক এলাকার প্রান্তিক মানুষটির যন্ত্রণা দগ্ধ ছবি আঁকার জন্য যে কাহিনির বা ঘটনা বিধৃত করেছেন, তাতে গোক্ষুর চরিত্রের মধ্যে সংগ্রামের মধ্য দিয়ে বেরিয়ে আসার একা তীব্র আকাঙ্ক্ষা প্রতিভাত হয়েছে। এক্ষেত্রে প্রেক্ষাপট হিসাবে ভৌগলিক অবস্থান সময় ও চরিত্র সমান্তরালভাবে বিকশিত হয়েছে।

'অন্তর্গত নীলস্রোত' এবং 'তস্কর' উপন্যাস দুটিতে লেখক গুরুপদ ও গোক্ষুর ভক্তার জীবনের মধ্য দিয়ে ভাঙাচোরা সামন্ততন্ত্রের শোষণ শাসনের এবং রাজনীতির মারপ্যাঁচের ছবিটি পরিস্কার করে তুলে ধরেছেন। যুক্তফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার ফলে মানুষের যে চাহিদা, প্রয়োজনীয়তা, আকাঙ্ক্ষা দেখা দিয়েছিল, বা সচেতনতা দেখা দিয়েছিল উক্ত সময়ের ছাপ উপন্যাসে যেমন প্রতিফলিত তেমনি রাজনীতিক দায়বদ্ধতা থেকে সরে যাওয়া রাজনীতিকের আদর্শ বিসর্জন দেওয়া বা জোতদারের শোষক রূপ তুলে ধরেছেন।

'আড়কাঠি' উপন্যাসের মূল বিষয় লোকসংস্কৃতি। বাঁকুড়া জেলার লোকায়ত জীবন ভাবনার প্রকাশ ঘটিয়েছেন লেখক। বাঁকুড়ার প্রত্যন্ত গজাশিমুল গ্রাম এর ভিত্তিভূমি। চারিদিকে জঙ্গল। অশিক্ষিত, অদ্ধ আচ্ছাদিত মানুষের বসবাস। বসু শবর সম্প্রদায়ের প্রান্তিক, অন্ত্যজ শ্রেণির মানুষসব। বহুকাল আগে কোনো এক সময়ে এরা এসে এই জঙ্গলের মধ্যেবাস করতে শুরু করে। জঙ্গলের ফলমূল, কচিপাতা, সংগ্রহ এবং সামান্য চাষাবাদ করে জীবিকা বির্বাহ করত। মাঝে মধ্যে রংলালের মতো কুলি কামিন পাচারকারী আড়িকাটির প্রলোভনে পড়ে আসামের চা বাগানে পাচার হয়ে যেত। কেউ হয়তো ফিরেছে কেউ ফেরেনি। অসহায় বনচারি মানুষের অভাব অনটনের মধ্যেও বেঁচে ছিল তাদের লৌকিক সংস্কৃতি। দারিদ্র্য অভাবী মানুষগুলো অর্ধনগ্ন, অভুক্ত থেকেও তাদের সেই সংস্কৃতি বাঁচিয়ে রেখেছিল। সারাদিনের পরিশ্রম ক্লান্ত শরীর নিয়েও দিনের শেষে আসর বসত, প্রথাগত প্রচলিত সংস্কৃতি মুখে মুখে প্রয়োগ ঘটাবে সময় কাটাত, ক্ষিদের যন্ত্রণা ভুলে থাকত। আদিম লৌকিক সংস্কৃতির ধারক ও বাহক এরা। বাঁকুড়া জেলার বাঁকুড়া সদর শহর, রানিবাঁধ, ধাতড়া, ঝিলিমিলি, শুশুনিয়া প্রভৃতি স্থানের পরিচয় পাওয়া যায় ভৌগলিক স্থান সমূহ উপন্যাসের কাহিনি বা ঘটনাবৃত্তে এসেছে। এসেছে গজাশিমুল গ্রামের নাম। কাহিনিবৃত্তে এসে হাজির হয়েছে রাজীব চৌধুরীর

মতো শিক্ষিত যুবক, কলেজের অধ্যাপক। তিনি এই সমস্ত মানুষের মধ্যে থেকে তাদের সংস্কৃতিক সত্তাকে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। গড়ে তুলেছেন গজাশিমুল সংস্কৃতি সংঘ। রাজ্যে তথা দেশের বিভিন্ন প্রান্তে তারা তাদের লোকনৃত্য, লৌকিক কাহিনি সমন্বিত বিভিন্ন নাচগান পরিবেশন করেছে। নাম হয়েছে, অর্থ প্রাপ্তি ঘটেছে। কিন্তু একসময় তালভঙ্গ হল। তারা রাজীব চৌধুরীর উদ্দেশ্য আবিষ্কার করে ফেলল। রাজীবের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করল। গজাশিমুল গাঁয়ে ফিরে আসল। লোকসংস্কৃতির পন্যায়িত হওয়া তারা মেনে নিতে পারেনি। পারেনি বিশ্বাসঘাতক মানুষের সঙ্গে একাসনে থাকতে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী সময়ে মানুষের চরিত্রের যে অবলুপ্তি ঘটেছিল, আদর্শ বিসর্জন দিয়েছিল, রাজীব যেন তার ফল। মধ্যবিত্ত সুলভ লোভ সংবরন করতে পারেনি। তাই বড়ো হওয়ার বাসনায় নিজের পেশার প্রতি নিষ্ঠা দেখাতে পারেনি। লেখক ভগীরথ মিশ্র এই উপন্যাসে এমন একটা সময়কে চিহ্নিত করেছেন যখন দলিত, নিম্নশ্রেণির সাহিত্যের প্রতি একটা ঝোঁক মানুষের মধ্যে দেখা দিয়েছে। সমগ্র বিশ্বজুড়ে লোকসংস্কৃতি চর্চার প্রভাব ও চিন্তার দেখা দিয়েছে। ক্যাথি বার্ড এবং আমাদের দেশের রাজীব চৌধুরীরা তাকে বাজার পন্য হিসাবে তুলে ধরে নিজের স্বার্থ সিদ্ধি করতে চাইছে। পুঁজিবাদী ধনবাদী সমাজের সামন্ততন্ত্রের প্রতিনিধি প্রভু দয়াল সিং-এর অত্যাচার, বাগান বাড়িতে মেয়ে মানুষকে আটকে রেখে তাদের ওপর মানসিক ও শারীরিক অত্যাচারেরও পরিচয় পাওয়া যায়। অর্থাৎ জোতদার জমিদার ভূ-স্বামীদের যে অত্যাচারেরও পরিচয় পাই। অর্থাৎ জোতদার জমিদার ভূস্বামীদের যে অত্যাচারী মনোভাব তার প্রকাশ ঘটিয়েছেন। গোঠের মালিক-এর মধ্যেও অপরকে শোষণ করার একটা প্রবণতা লক্ষ করা যায়। ভূ-স্বামীর অত্যাচার থেকে পরিত্রান পাওয়ার জন্য লালপার্টি গঠিত হয়েছে। এই লালপার্টির নেতৃত্বে পুলিশ প্রশাসন ও জোতদার জমিদারের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে উঠেছে। লেখক এখানে ভেড়াচারোয়া ভেড়িহারদের জীবনছবি তুলে ধরার সঙ্গে সঙ্গে একটা সময়কে উপন্যাসে ধরতে চেয়ছেন— তা হল জমিদারী শাসনের কবল থেকে বেরিয়ে দেশ নতুন পথের দিশ অনুসন্ধান করছে— সমাজতান্ত্রিক ভাবনার বিকাশ হচ্ছে মানুষের মধ্যে সচেতনতার আবহ তৈরি হয়েছে— নকশাল আন্দোলন প্রতিষ্ঠা লাভের চেষ্টা চলছে, কৃষি ব্যবস্থার উন্নতির জন্য নাহার কাটা (ক্যানাল তৈরি) সরকারি বদান্যতা দেখা দিয়েছে এমনই একটা সময়ের ছবি আঁকা হয়েছে চারণ ভূমিতে। তার মধ্যে রয়েছে স্বরূপ বা খণ্ডকালের ছবিও। যেমন ভেরিহারবা শীতগ্রীষ্ম বর্ষা অর্থাৎ বছরের গোটা সময়টা ভেড়ার দলের পিছনে ধাবিত হলেও সময় যেন কোথায় তাদের জীবনে থমকে আছে। অর্থাৎ তারা যে অবস্থায় ছিল সেই অবস্থার কোনো পরিবর্তন হয়নি। এটাও একটা সমর-র উদাহরণ চারণভূমিতে তাদের পদসঞ্চারের অন্ত নেই। কিন্তু তবুও তারা বদ্ধ, জীবনে চলার পথ মসৃন নয়,

সময় সেখানে চলমান হলেও তাদের জীবন প্রবাহে কোনো পরিবর্তন নেই। এইভাবে লেখক স্থান ও সময়ের যুগল মিলনে তৈরি করেছেন চারণভূমির গল্প বিশ্ব।

'জানগুরু' উপন্যাসের পটভূমিতে আমরা বাঁকুড়া, পুরুলিয়া জেলার বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডের ছবি পাই। আদপে লেখক এখানে স্থানের নাম উল্লেখ করলেও এটা কোনো নির্দিষ্ট স্থানের ঘটনা নয়, এঘটনটা সমগ্র ভূ-ভারতের সমস্ত গ্রামীন অঞ্চলের মধ্যে প্রকটিত। তবুও আমরা উপন্যাসের প্রেক্ষাপট আলোচনায় ভৌগলিক স্থানের নামোল্লেখ আলোচনা করব। সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক দিক থেকে পিছিয়ে পড়া শ্রেণির মানুষ এরা। এদের কথাই উপন্যাসে মুখ্য। এই অশিক্ষিত অর্ধশিক্ষিত বাউরী, বাগদি, সাঁওতাল আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষদের ওপর কীভাবে আবহমান কাল ধরে অত্যাচার অবিচার হয়ে আসছে সামাজিকভাবে, লেখক তারই মর্মান্তিক ছবি এঁকেছেন। ফলে এলাকা বা স্থানের গুরুত্ব এখানে থেকেই যায়। রাঢ় বাংলার এই সমস্ত জেলায় অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে, সামাজিকভাবে পিছিয়ে পড়া মানুষগুলোর অবস্থান চিহ্নিত হয় স্থানিক পরিচয়ে। বাঁকুড়া পুরুলিয়া অঞ্চলে এমনকি বহু গ্রামীন অঞ্চলে তার ছায়া এখনও প্রতিফলিত। ডাইনি ভূত প্রেত স্থানীয় ওঝা-বানমারা প্রভৃতি অতিলৌকিক বিষয়ে মানুষের মধ্যে প্রচার করে গুনীন ওঝারা কীভাবে সমাজে শোষণ কায়েম করে রেখেছেন তার বর্ণনা পাই উপন্যাসে। এখানে অখণ্ড সময় ধরে, আবহমানকাল ধরে চলে আসছে এই প্রথা—যার হাত থেকে লেখক বেরিয়ে আসার সুদূরপ্রসারী প্রভাব দেখতে পাচ্ছেন না। লেখক সমাজতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি এর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার প্রয়াস চালিয়েছেন উপন্যাস জুড়ে। এক্ষেত্রে মনসারমের মতো বা গণসচেতনতার মতো সংগঠন তৈরি করে এই সমস্ত কুপ্রথা কুসংস্কার, আচার বিরুদ্ধাচারণ করেছেন। কাউকে ডাইনী বলে প্রচার করে দেওয়া, এর মধ্যে অর্থনৈতিক শোষনের ছবি তুলে ধরেছেন লেখক। আবাব ভূত ধরেছে— রটিয়ে দিয়ে তা তার গা থেকে ছাড়ানোর নামে গুপ্ত শিবের পুজার নামে নারী শরীর ভোগ করার বাসনার দিকটি যেমন তুলে ধরেছেন তেমনি ধর্ষিত নারীর পক্ষে দাঁড়িয়ে এই নির্মম প্রথার ভয়ঙ্কর চেহারাটাও উন্মোচন করেছেন।—সামাজিকভাবে নারীর পাশে দাঁড়িয়েছেন। ফুলমতির মতো নারীরা সহজেই সমাজ থেকে হারিয়ে গেছে—সামাজিক কুপ্রথার শিকার হয়ে।

লেখক এখানে স্থানের মাহাত্মের থেকেও সময়কে বেশি গুরুত্ব আরোপ করেছেন। আমরা দেখতে পাচ্ছি আবহমানকাল ধরে চলে আসা সামাজিক কুপ্রথা আজও সমানভাবে বহমান। সমাজ বিজ্ঞানীর দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে লেখক বিশ্লেষণ করেছেন সমাজের আসল রোগ কী এবং কারা একে বাঁচিয়ে রেখে নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধি করতে চায়। তাই আজও আমরা এতদঅঞ্চলের মানুষ চমকে উঠি এই একবিংশ শতকেও যখন ডাইনি বা ভূত প্রেতের নাম করে গুনীন ওঝাগিরির তাণ্ডব দেখি। আমরা এখানেই থমকে। কিন্তু সময় বাঁধনহীন। লেখক সেই চলমান সময়কে ধরার চেষ্টা করেছেন—স্থানিক মানুষের মানস লোকের চেতনার বিকাশ ঘটিয়ে।

'মৃগয়া' ভগীরথ মিশ্রের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। এমন একটি উপন্যাস যার বিস্তৃতি পাঁচ খণ্ডে। ১৯94-২000 সাল এই সময় সীমার মধ্যে প্রকাশ। কাহিনি পরিকল্পনা দীর্ঘদিনের। প্রায় ২০ বছরের ভাবনার ফল। দীর্ঘদিন ধরে ভাবনাগুলোকে জাড়িত করে তারপর লেখক তা প্রকাশ করেছেন। এই রকম মহাকাব্যিক উপন্যাস বাংলা কথাসাহিত্যে দুর্লভ। যেমন তার ব্যাপ্তি, তেমনি বিষয়বস্তু। নামকরণের মধ্যেদিয়ে তিনি বিচরণ করেছেন গ্রামবাংলার মানুষের অন্দরমহল। কর্ষণ করেছেন চরিত্রের খুঁটিনাটি দিকগুলো। এই এতবড়ো মাপের উপন্যাস রচনা করার জন্য যে রসদ প্রয়োজন তা তিনি সংগ্রহ করেছেন গ্রামীনভারত থেকে। ভৌগলিক প্রেক্ষাপট হিসাবে তাই উঠে এসেছে সমগ্র রাঢ় বাংলার লোকায়ত জীবন। পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, বীরভূম, মেদিনীপুর বর্ধমানের কিয়দংশ নিয়ে সে রাঢ় অঞ্চল তার সামগ্রিক চালচিত্র যেন মৃগয়ায় প্রতিভাত। এ চিত্র অঙ্কন করতে গিয়ে লেখক সমস্ত শ্রেণির মানুষের কথা বা প্রসঙ্গ অবতারণা করেছেন। উচ্চশ্রেণির ও নিম্নশ্রেণিড় সমস্ত মানুষ জায়গা করে নিয়েছে উপন্যাসে। ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈশ্য, শুদ্র— কেউ বাদ যায়নি। রাঢ় অঞ্চলের বাউরী বাগদি, মাড়ো, মাদড়, লোহার, কাহার মাহালি, সাঁওতাল মুন্ডা আদিবাসী নিম্ন হিন্দু এবং বর্ণহিন্দুদের সামগ্রিক চালচিত্র— মিথ, পুরাণ, কিংবদন্তী সমস্ত কিছু উঠে এসেছে। মেলাপার্বণ আচার রীতি, ব্রত কোনো কিছুই বাদ রাখেননি। একটা গোটা অঞ্চলও অঞ্চলের মানুষের দৈনন্দিনতাকে উপন্যাসে ধরেছেন।

ভগীরথ মিশ্র বৃহত্তর গ্রাম ভারতকে, গ্রাম ভারতের রাজনীতি, অর্থনীতি, সামাজিক দিকগুলি সুনিপুণ দক্ষতার সঙ্গে তুলে ধরেছেন। নদী, খাল, বিল, ঢাঁড়, টিকর, ডুংরী, টিলা, পাহাড়, সমতল, বর্ণনাগুণে প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে। সমাজ সচেতন ও সময় সচেতন লেখক হিসাবে ভাগীরথ মিশ্র 'মৃগয়া' উপন্যাসে সময়ের প্রেক্ষাপট হিসাবে ধারণ করেছেন অখণ্ড একটা সময় কালকে। জমি আন্দোলনের সেই গোড়ার কাল থেকে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় থেকে প্রায় শতাব্দীকালের ঘটনা। গ্রামভারতে ছবি আঁকতে গিয়ে লেখক মৌলিক যে বিষয় জমি, তাকেই তুলে ধরেছেন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে জমির ওপর যে বিধি আরৌপিত হল তাকে নিয়ে বহু আন্দোলন সংগঠিত হল। সেইকাল থেকে তেভাগা আন্দোলন, বাঁধগাবা আন্দোলন, নকশাল আন্দোলন, বিভিন্ন কৃষক আন্দোলন সমস্ত এই সময়কালীন বিষয়কে লেখক তুলে ধরেছেন। সামন্ততান্ত্রিক অত্যাচার অবিচার অন্যায়ের কাহিনি নিবিড়ভাবে উঠে এসেছে। কৃষকরা ফলসলের নায্য পাওনার জন্য সংগঠিত হয়ে তেভাগা আন্দোলনে সামিল হয়েছে, নকলশাল বা কৃষকের পক্ষঅবলম্বনে নকশালবাড়ি আন্দোলন সংগঠিত করেছে। দেশ স্বাধীন হয়েছে। সামন্ততন্ত্র লোপ পেয়েছে। কিন্তু জমিদারী শাসন শোষণ চলে যায়নি। স্বাধীনতার মানে সাধারণ মানুষের কাছে অর্থহীন হয়েগেছে। যে প্রত্যাশা নিয়ে মানুষ স্বাধীনতার জন্যে লড়াই করেছিল তা অর্থহীন হয়ে গেছে। কংগ্রেসী শাসনে তার

নেতাদের দুর্নীতিতে আখণ্ড ডুবে থাকা নিজের আখের গুছিয়ে নেওয়া, তোষণ স্বজন পোষনে মানুষ সেই আশা ত্যাগ করেছে। সরকারি কর্মচারীদের ঘুষ নেওয়া, সাধরণ মানুষকে হেনস্তা করা, কাজের গতি না আনা, সময়ের কাজ সময়ের মধ্যে শেষ না করা গ্রামীন জোতদার সম্পন্ন ব্যক্তিদের অত্যাচার, সামাজিক দিক থেকে পিছিয়ে পড়া মানুষগুলোকে শাসন-শোষণ করেছে। তার শিকার করেছে। মৃগয়াতে সামন্ততান্ত্রিক কালের ছবি যেমন ধরা পড়েছে, তেমনি স্বাধীনতা পরবর্তীকালের অবক্ষয়ের ছবিও ধরা পড়েছে। আবার বাংলার বামপন্থী শাসনকালের ছবিও ধরা পড়েছে। বামপন্থীদের চারিত্রিক অবক্ষয় লেখককে নাড়া দিয়েছে— তিনি পীড়িত। এক শতাব্দীকালের জীবন ইতিহাস কবি সময়ের কোঠায় নির্বাচিত করে লেখক মৃগয়ার বিশ্লেষণ করেছেন। তাই এই উপন্যাস স্থানিক ও সময় বা কালের প্রেক্ষাপটে গোটা রাঢ়-বঙ্গের সামাজিক এবং সময়ের দলিল।

'ফাঁসবদল' উপন্যাসে মেদিনীপুর জেলার একটি অঞ্চল ধরা পড়েছে সমগ্রতার রূপে ধরে। নারানগড়, বেকাদা, দাঁতন, বাখরাবাদ, কলিনা, মাডোতলা, খাকুড়দা, এগরা প্রভৃতি অঞ্চল ভৌগলিক সীমারেখার মধ্যে ধরা পড়েছে। এই সমস্ত এলাকার হিন্দু ও মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের মানুষের কথা উঠে এসেছে উপন্যাসে। উপন্যাস একটা অখণ্ড শিল্প প্রকরণ। ফলে এখানে একটা গোটা অঞ্চলের মানুষের কথা প্রকাশ করার সুযোগ থাকে। মাড়োতলা গ্রামের হিন্দু ও মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষের জীবনযন্ত্রণার ছবি তুলে ধরার জন্য স্থানীয় অঞ্চলের জীবিকা আনন্দ-বিনোদন, মঠ, মন্দির মসজিদ, মানুষের দৈনন্দিন কর্মপন্থা সমস্ত কিছুই তুলে ধরেছেন। আসলে কোনো স্থান যখন উপন্যাসের স্থানিক পরিচয় পায় তখন ঔপন্যাসিক সেই ভৌগলিক অবস্থানের চালচিত্র চুলচেরা বিশ্লেষণ করে দেখান। যেখানে স্থানিক পরিবেশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়।

দেশ স্বাধীন হওয়ার পর দ্বিধাবিভক্ত সংখ্যালঘু মানুষ মহাবিপদে পড়ে যায়। কেউ ভাবতেও পারেনি এই রকম অবস্থার সন্মুখীন হবে। সাম্প্রদায়িক হিংসা হানাহানি মানুষকে কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে ফেলে দেয়। বাংলাদেশের রাষ্ট্র তৈরি হওয়ার আগে পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্থান নামক অঞ্চলতিতে ভাষাগত এবং প্রশাসনিক জটিলতা ছিল। বাংলা ভাষাভাষী মানুষ পাকিস্থানী অত্যাচারে অতিষ্ট হয়ে পড়েছিল। সংখ্যালঘু হিন্দুরা হারিয়ে ফেলেছিল বেঁচে থাকার বিশ্বাস। স্বাধীনতার পর থেকে বাংলাদেশে রাষ্ট্রগঠন হওয়ার সময় পর্যন্ত (১৯৪৭-১৯৭১) এবং তারও পরে সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের এমন মুসলিম বাঙালিও এপার বাংলায় চাল আনতে শুরু করে এবং বহুভারতীয় মুসলিম স্বাধীনতার (১৯৪৭) পরপর এই দেশ ছেড়ে চলে যায়। ফলে উভয় দেশে দেখা দেয় উদ্বাস্ত সমস্যা। আমরা উপন্যাসে এমন একটি সময় পর্বকে পাই। স্বাধীনতা-পরবর্তীকাল থেকে শুরু করে ৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ এবং বাংলাদেশ গঠনের সময় পর্যন্ত একটা বিস্তৃত সময়ের উদ্বাস্ত মানুষের আশ্রয়হীন অবস্থার বর্ণনা যেমন পাই ঠিক উভয় সম্প্রদায়ের হানাহানির ছবি ফুটে উঠেছে। এছাড়া সামন্ততন্ত্রের অবলুপ্তির পরও সামন্ততন্ত্রের

আগ্রাসী ছায়া লোপ পেয়ে যায়নি। তার নমুনা আমরা দেখতে পাই গ্রামের জোতদার সম্পন্ন ব্যক্তিরা কীভাবে সাধারণ মানুষের ওপর শাসন শোষণ চালিয়েছে। দাদন নামক ভয়ংকর মহাজনী প্রথার কবলে পড়ে অসহায় নিরন্ন মানুষ সেখান থেকে বেরিয়ে আসতে পারেনি। এছাড়া মানুষ তার অধিকার বোধ সম্পর্কেও সচেতন হয়েছে। হিন্দু মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে মহল্লা বা পাড়া বিভাজিত হয়েছে। মুসলিম 'বস্তি' এই শব্দটায় আপত্তি প্রকাশ করে নিজেদের পাড়ার/মহল্লার নাম রেখেছে মোমিন পুর। দেখা যাচ্ছে লেখক জিমিদারী শাসন শোষণের অন্তরালে একটা বিস্তীর্ণ সময়কে তুলে ধরেছেন।

'আরশিচরিত' উপন্যাসে দেখানো হচ্ছে একটারপর একটা কলকারখানা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। দেশীয় কলকারখানার উৎপাদিত পণ্যের বাজারি চাহিদা কমে যাচ্ছে। মানুষ বিদেশি সমস্ত পণ্যদ্রব্যের ব্যবহারের উপর ঝুঁকে পড়ছে। ফলে বিদেশি সব পণ্য দেশীয় বাজার ভরে যাচ্ছে। বিদেশিয় পণ্যের সঙ্গে দেশীয় পণ্য প্রতিযোগীতায় এঁটে উঠতে পারছে না। ফলে দেশীয় কলকারখানা লোক আউট বা বন্ধের নোটিশ ঝুলছে। লেখক উপন্যাসে এই সময় পর্বকে তুলে ধরেছেন। সুরকারি নীতি উদাসিনতার কথা রাজনীতির দেউলিয়াপনা, সামাজিক অবক্ষয় এই উপন্যাসের প্রেক্ষাপটে পরিলক্ষিত হয়।

'শিকড়ের ঘ্রাণ' রাজনৈতিক অবক্ষয়ের, মধ্যবিত্ত মানুষের চারিত্রিক অধপতনের ছবি। ভৌগলিক অবস্থান হিসাবে পশ্চিমবঙ্গে সূর্যসেন কলোনির কথা উঠে এসেছে। ২৪ পরগনা জেলার। কিন্তু যারা উপন্যাসের আলোচনায় উঠে এসেছে তারা বাংলাদেশ থেকে আগত আশ্রয়হীন মানুষ ছড়িয়ে পড়েছে বাংলার বিভিন্ন জেলায়। নদীয়া, হাওড়া, হুগলি, ২৪ পরগনা, মেদিনীপুর, ত্রিপুরা, আসাম-বিভিন্ন জায়গায়। ফলে ভৌগলিক সীমারেখা ব্যপ্তি বিস্তৃত। এই বিস্তৃত সীমানার মধ্যে সূর্যসেন কলোনী একটি প্রতীক মাত্র যা উপন্যাসের প্রেক্ষাপটে স্থানিক পরিচয় ধরা পড়েছে।

আর সময়ের প্রেক্ষাপটে দেখা যাচ্ছে স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে হিংসা দ্বন্দ্বদীর্ণ, প্রত্যাশা ও প্রাপ্তির দিশাহীন অবস্থান, সাম্প্রদায়িক দলাদলির, জোতদার জমিদার সম্পন্ন মানুষের শাসন শোষণ পরেও শিকড়হীন মানুষের আশ্রয়লাভের সংগ্রামের কথা উঠেছে এখানে। বামপন্থী আন্দোলন, যুক্তফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠা, কংগ্রেসী শাসনের সীমাহীন দুর্নীতি এবং পরবর্তী কালে ৭৭সালে বামফ্রন্ট বাংলার ক্ষমতায় ফিরে আসা—এই রকম একটা বিস্তীর্ণ সময় ধরে আছে উপন্যাসে। ৬৬-৭১ এবং ৭২-৭৭, এবং ১৯৭৭ সালের পর বামরাজনীতির বিভিন্ন দিক লেখক তুলে ধরেছেন। বামপন্থী আদর্শে দীক্ষিত হয়ে যাকে দেখেছি মানুষের সমস্যায় ঝাঁপিয়ে পড়তে সেই অনিমেসদা—নামক বামপন্থী রাজনীতিকের অধপতন। প্রোমোটারদের সঙ্গে, জমির মাফিয়াদের সঙ্গে কারখানার মালিকদের সঙ্গে ওঠাবসা করতে, তাদের হয়ে সরকারি বদান্যতা প্রকাশ করতে।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি :

১. মুখোপাধ্যায় অরুণকুমার, বাংলা উপন্যাসের রূপ ও রীতির পালাবদল, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা।

২. মুখোপাধ্যায় ড. প্রশান্ত, বাংলা উপন্যাসে সমাজ বাস্তবতা, এডুকেশন ফোরাম, কলকাতা।

৩. বীতশোক ভট্টাচার্য, বাংলা উপন্যাস সমীক্ষা, এবং মুশায়েরা, কলকাতা।

৪. চট্টোপাধ্যায় কুন্তল, সাহিত্যের রূপ-রীতি ও অন্যান্য প্রসঙ্গ, রত্নাবলী, কলকাতা।

মানভূমের ভাষা আন্দোলনে লোকসেবক সংঘের অবদান

পূর্ণচন্দ্র মহাপাত্র
স্নাতকোত্তর, ইতিহাস বিভাগ
সিধো কানো বিরসা বিশ্ববিদ্যালয়

সারাংশ : সময়ের সাথে সাথে যেমন বিভিন্ন জায়গার নাম পরিবর্তন হতে থাকে তেমনি আমাদের সুন্দরী পুরুলিয়া জেলা পূর্বে মানভূম নামে পরিচিত ছিল। ভৌগোলিকভাবে এটি প্রাচীন ভূমি গন্ডোয়ানার পূর্ব প্রান্তে অবস্থিত. 1805 সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি প্রশাসনিক ক্রিয়াকর্মের অজুহাত দেখিয়ে এই অঞ্চলকে জঙ্গলমহল নামে অভিহিত করে, এবং এই জঙ্গলমহল পরবর্তীকালে মানভূম নামে পরিচিতি লাভ করে যা হল বর্তমানে পুরুলিয়া জেলা। এই পুরুলিয়া জেলাতে চুয়াড় বিদ্রোহ থেকে শুরু করে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম পর্যন্ত নানা ধরণের বিদ্রোহের অগ্নিগর্ভে পরিণত হয়েছিল, যা স্বাধীনতার পরবর্তী সময় পর্যন্ত জীবিত ছিল৷ তাই স্বাধীনতার পরবর্তীকালে বাংলা ভাষা কে কেন্দ্র করে মানভূমে ভাষা আন্দোলন শুরু হয়, এর প্রেক্ষাপট রচনা হয় ব্রিটিশ বিরোধী কার্যকলাপ বন্ধ করার জন্য ব্রিটিশ সরকার মানভূম জেলা কে বিহার সাথে যুক্ত করে বাংলা ও বিহার কে পৃথক করে দেয়৷ এরপর থেকেই শুরু হয় বাঙালির বাংলায় ফিরে যাওয়ার আন্দোলন। তবে সূচনাপর্বে এই আন্দোলন ছিল মূলত নরমপন্থী কংগ্রেস দলের কার্যকলাপের মত আবেদন-নিবেদন নীতি এবং দাবিপত্র পেশে র মাধ্যমে সীমাবদ্ধ একটি আন্দোলন। এই আন্দোলনকে সঙ্ঘবদ্ধ করার ক্ষেত্রে লোক সেবক সংঘ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, এই লোক সেবক সংঘ সম্পর্কে প্রবন্ধ যথেষ্ট আলোকপাত করা হবে, বিশেষ করে বিহার সরকারের জোর করে হিন্দি ভাষা চাপানোর চেষ্টা শেষ পর্যন্ত হিংসাত্মক রূপ ধারণ করলেও গান্ধীজীর আদর্শে আদর্শিত মানভূম বাশি অত্যাচারের পরোয়া না করে অহিংস আন্দোলন চালিয়ে গিয়েছিল, স্বাধীনোত্তর ভারতে এই আন্দোলন তীব্রতর ও ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছিল৷ শেষ পর্যন্ত 1st Sept 1956 সালে মানভূমের কতগুলি থানা নিয়ে গঠিত হয় পুরুলিয়া জেলা এবং পশ্চিমবঙ্গের সাথে যুক্ত হয় ,তবে ভাষা আন্দোলনে সার্থকতা নিয়ে এক প্রশ্ন চিহ্ন থেকেই যায়, ভাষা কে কেন্দ্র করে জনমত সংগ্রহ লোকসেবক সংঘ এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে৷

সূচক শব্দ : বাংলা ভাষা, জঙ্গলমহল, মানভূম, লোক সেবক সংঘ, জনমত৷

সমগ্র ভারতবর্ষে যখন দেশকে স্বাধীন করার জন্য এবং জাতীয় ঐক্যকে সুগঠিত করার জন্য বিভিন্ন সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, ঠিক তেমনি ভাষা আন্দোলন কে সংগঠিত করার জন্য মানভূমে লোক সেবক সংঘের প্রতিষ্ঠা হয়েছিলl এই লোক সেবক সংঘ কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে এসে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, মানভূম জেলা কংগ্রেস কমিটি1948 সালের30 এপ্রিল বান্দোয়ান থানার গ্রামে বিশেষ সম্মেলন আহবান করেl এই বিশ্বাস সম্মেলন আহবান এর কারণ প্রসঙ্গে কংগ্রেস কমিটির ঘোষণায় বলা হয়েছিল-" দলের বর্তমান পরিস্থিতিতে কর্তব্য নির্ধারণ করার জন্য মানভূম জেলার কংগ্রেস কর্মীদের একটি সম্মেলন করা একান্তভাবে প্রয়োজন হয়ে পড়েছেl নানা প্রশ্ন, নানা সমস্যা ও নানা বিচিত্র পরিস্থিতি জেলার কর্মীদের চিন্তাধারা ও কার্যক্রম দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়েছেl সর্বোপরি মহাত্মা গান্ধীর মৃত্যুর পরে কর্মীদের দায়িত্ব আরো গুরুতর হয়ে পড়েছেl সুতরাং এ বিষয়ে সকলের মিলিত হয় সুস্পষ্টভাবে কর্তব্য নির্ধারণ করা এবং কার্যক্রম স্থির করার জন্য একটি কর্মী সম্মেলন আহ্বান করা হচ্ছেl"

জিতান সম্মেলন প্রসঙ্গে মুক্তি পত্রিকায়24/5/48 তারিখে স্পষ্টভাবেই বলা হয় " ভাষা ও প্রাদেশিক বিষয় নিয়ে যে অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে এবং হচ্ছে তার সম্বন্ধে সচেতন হয়ে কংগ্রেস, গান্ধীজি ও জাতীয়তার আদর্শ অক্ষুন্ন রেখে কর্মীদের কর্মপন্থা নির্ধারণ করতে হবেl" পূর্বনির্ধারিত ঘোষণা অনুসারে 30 শে এপ্রিল,1948 সন্ধ্যায় জিতান গ্রামে মানভূম জেলা কমিটির সভাপতি অতুল চন্দ্র ঘোষ এর সভাপতিত্বে জেলা কংগ্রেস কমিটি র অধিবেশন শুরু হয়l অধিবেশনে জেলার বিভিন্ন স্থান থেকে 45 জন সদস্য যোগ দেনl এই সম্মেলনে মোট আটটি প্রস্তাব উপস্থাপন করা হয় যেগুলি নিম্নরূপl

প্রস্তাব -1 গান্ধীজীর মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করাl 2 - নির্সা থানা র কংগ্রেস কর্মী শ্রীপতি নাথ দাস এর মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করা হয়l এছাড়া আরো অন্যান্য প্রস্তাব উপস্থাপন করা হয়l

1948 সালের লোক সেবক সংঘ প্রতিষ্ঠার পর থেকে মানভূমের বাংলা ভাষায় জনগণের উপর বিহার সরকারের অত্যাচারের তীব্রতা ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকেl কেননা বিহার সর্কার বাসার ভাবির ব্যক্তি তাদের রাজ্য অঙ্গচ্ছেদের আশঙ্কায় আতঙ্কিত হয়ে উঠেছিল, অথচ লোক সেবক সংঘ গান্ধীজীর আদর্শের ভিত্তিতে একমাত্র মানভূম জেলা তে গঠিত হয়েছিল. গান্ধীজী বলেছিলেন-" ব্রিটিশ শাসনের কংগ্রেসের আদর্শ ছিল বিদেশি শাসন দূর করে স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা করাl" তখন কংগ্রেসের যে লক্ষ্য ছিল ভারতবর্ষের স্বাধীনতা হওয়ার পর তারা থাকতে পারেনাl বাস্তবিকপক্ষে গান্ধীজী

বলেছিলেন কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান হিসাবে কোন কংগ্রেসের অস্তিত্বের কোন প্রয়োজন নেই, তিনি কংগ্রেসকে পরিবর্তন করে লোক সেবা সংঘ প্রতিষ্ঠা করতে বলেন৷ এই সংঘের লক্ষ্য হবে ভারতের জন শক্তি কে ঠিক পথে শিক্ষিত , সঙ্ঘবদ্ধ আত্মসচেতন ও কর্মনিষ্ঠ করে তোলা, যাতে বাস্তবিকপক্ষে জনসাধারণকে শাসন করার যোগ্যতা লাভ করে ভারতে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করতে পারে৷

লক্ষণীয় যে, মানভূমের লোক সেবক সংঘ গান্ধীজীর উপরোক্ত নীতি গুলিকে তাদের আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করেছিল৷ পরবর্তী সময়ে গান্ধীজি প্রার্থনা তান্ত্রিক ভাষণে বলেছিলেন-" কংগ্রেস পরিকল্পিত ভারতবর্ষের স্বাধীনতা পল্লী পঞ্চায়েতের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত৷" কিন্তু গ্রামসমূহ কে কেন্দ্র করে প্রাণশক্তি আহরণ করতে হবে, তেমনি কেন্দ্রকে তার কর্তৃত্ব ও শাসন ক্ষমতা আহরণ করতে হবে গ্রামসমূহ থেকে৷ কিন্তু এতে যদি প্রাদেশিক সংকীর্ণতার ভাব জাগ্রত হয়, পরস্পর ঝগড়া-বিবাদ ও রেষারেষি চলে তাহলে পরিনাম মারাত্মক হবে৷

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে ,১৯১২ থেকে মানুষের মনে থাকা ক্ষোভ রাজনৈতিক স্পর্শে তীব্রতা পায়। টুসুগানের মাধ্যমে মানভূমে বাংলা ভাষী প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে ঘরেঘরে অরন্ধন পালিত হয়। এই আন্দোলনের তীব্রতায় বিহার সরকার ঘাবড়ে যায়। বিধানসভায় ভাষা আন্দোলন থামাতে Biher Maintenance of Public Order 1950 পাশ করা হয়। এই আইনবলে যত্রতত্র ধরপাকড়, জরিমানা সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়। পরবর্তীতে আন্দোলন টুসু সত্যাগ্রহে রূপান্তরিত হয়। বিহার সরকার আরও মরিয়া হয়ে ওঠে । হাটে বাজারে সমস্ত প্রকাশ্য যায়গায় হাল জোয়াল মই ইত্যাদি কৃষি যন্ত্রপাতি বিক্রি বন্ধ করে দেয়। লোকসেবক সংঘ এর প্রতিবাদে চাষীদের স্বার্থে প্রকাশ্য স্থানে কৃষি যন্ত্রপাতি বিক্রি করতে শুরু করার কর্মসূচি নেয় এবং টুসু সত্যাগ্রহ হাল জোয়াল সত্যাগ্রহে রূপান্তরিত হয়।বিহার সরকার এরপর আরো ভয়ঙ্কর পরিকল্পনা নেয়। পাশাপাশি জেলার মধ্যে খাদ্য সামগ্রী আমদানীর উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে। মানভূমবাসী এরপর খাদ্য সত্যাগ্রহ শুরু করে। লোকসেবক সংঘ মানুষের কথা ভেবে জোড় করে বাঁকুড়া থেকে ট্রাকে ট্রাকে চাল এনে সরবরাহ অব্যাহত রাখে।

লোক সেবক সংঘ ভাষা আন্দোলন কে সংগঠিত করার জন্য বেশ কয়েকটি পদক্ষেপ গ্রহণ করেন যেগুলি হল, 1-নিয়মিত খাদি পড়তে হবে,2- গান্ধীজীর প্রদর্শিত সত্য ও অহিংসার পথে কাজ করায় বিশ্বাস থাকবে,3- গান্ধীজীর গঠনমূলক কাজে

বিশ্বাস থাকবে, 4- কংগ্রেসের নীতি ও আদর্শের বিরোধী কোনো কাজ করবেন না,5 - নিজস্ব চরকা থাকবে এবং মাসে অন্তত এক লাচ্ছি সুতা কাটবেন,6- সেবির নিজে অঞ্চলের অধিবাসীদের সঙ্গে ব্যক্তিগত পরিচয় ও তাদের মধ্যে সেবার ক্ষেত্রে থাকা চাইl7- সব ধর্মে ,সব জাতিতে, সব সম্প্রদায় ও সব ভাষার নারী এবং পুরুষের সমান শ্রদ্ধা ও সমান অধিকার ও সমান সুযোগ লাভের জন্য বিশ্বাস চেষ্টা ও আচরণ প্রয়োজনl এই সমস্ত গঠনতন্ত্রের মধ্যে গান্ধীজীর জনসেবার আদর্শ, গ্রাম গঠন, ইত্যাদি বিষয়গুলিকে কাজে লাগিয়ে লোক সেবক সংঘের নেতারা কংগ্রেসের থেকে বেশি সাধারণ মানুষ ও কর্মীদের সমর্থন বহুগুণে বৃদ্ধি পেতে থাকেl

মানভূম জেলার এই বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির মধ্যে লোক সেবক সংঘ ধীরে ধীরে তাদের কার্যকলাপ বৃদ্ধি করতে শুরু করেনl জেলার জনসাধারণের দুঃখ-দুর্দশা দূর করার জন্য বিভিন্ন সেবামূলক কাজ এবং সেইসঙ্গে হিন্দি আগ্রাসনের বিরোধিতা করার প্রস্তুতি চলতে থাকেl নিমডি নামক গ্রামে লোক সেবায়তন তৈরি করে জনসেবার কাজ শুরু হয়l পুরুলিয়া শিল্পাশ্রম সেবামূলক কাজ ও রাজনৈতিক মতামত প্রচারের কেন্দ্র হয়ে উঠেছিলl পাশাপাশি সমাজ সংস্কারের কাজ এবং মানুষের মধ্যে সচেতনতা গড়ে তোলার জন্য লোক সেবক সংঘের কর্মীরা অক্লান্ত পরিশ্রম চালিয়ে যানl দরিদ্র ও অসহায় মানুষদের পাশে দাঁড়িয়ে এমনকি পায়ে হেঁটে পাহাড়ি অঞ্চলে ও তারা মানুষকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেনl গান্ধীজীর আদর্শকে অনুসরণ করে জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে চরকা কাটা এবং খাদি কেন্দ্র গড়ে তোলেনl আদিবাসী, হরিজন এবং অনুন্নত মানুষদের সমাজে মর্যাদা দেওয়ার প্রচেষ্টা চালানl হাতের কাজ, সাক্ষরতা প্রভৃতির মাধ্যমে সমাজকল্যাণের প্রচেষ্টা সেবক সংঘের কর্মীরা গ্রহণ করেনl

এই অবস্থায় লোক সেবক সংঘের সভাপতি অতুল চন্দ্র ঘোষ গান্ধীজীর জন্মদিনে লোক সেবক সংঘের জেলা সম্মেলন আহবান করেনl তিনি2may Oct তারিখে মাগুরাতে এই সম্মেলনে লোক সেবক সংঘের কর্মীদেরকে যোগদানের কথা বলেনl লোকসভার সংঘের সঙ্গে শক্তি গড়ে তোলার পরবর্তী কর্মপন্থা নির্ণয় জেলার পরিস্থিতি সম্পর্কে বিচার ও কর্তব্য নির্ণয়, জেলার গঠনমূলক কর্মের প্রচার, গান্ধীজীর প্রদর্শিত কর্ম নির্দেশ কার্যকরী করা প্রভৃতি বিষয়ে আলোচ্যসূচিতে রাখা হয়েছিলl

লোক সেবক সংঘের এ গঠনমূলক উদ্যোগকে ব্যর্থ করার জন্য জেলার হিন্দি প্রচারক ও কংগ্রেস কর্মীরা গোপনে এবং প্রকাশ্যে বিভিন্ন প্রকার বিরোধিতা শুরু করেl বিশেষত: মাগুড়িয়া গ্রামের সাধারণ মানুষদের দ্বারা লোকসভার সংঘের বিরোধিতা

করানোর জন্য চেষ্টা শুরু হয়। এক্ষেত্রে মাগুড়িয়া গ্রামের অধিবাসী ও কংগ্রেসের নবনির্বাচিত জেলা কমিটির সদস্য চিত্তরঞ্জন মাহাতো কে2 আশ্বিন তারিখে লেখা পরিচয় থানার কেন্দা হরিহরপুর গ্রামের হিন্দি প্রচারক চন্দ্রশেখর মাহাতো একটি চিঠির উল্লেখ করা যায়। চিঠিতে লিখেছেন- " শ্রীমান চিত্তরঞ্জন, ভালোবাসা গ্রহণ করিবে। সুনিগাম মাগুরাতে নাকি লোক সেবা সংঘের উদ্যোগে আগামী 15 16 17 আশ্বিন এক মিটিং হইবে। তোমরা ইহার কোনরূপ সমর্থন করিও না। এই প্রতিষ্ঠান বর্তমান জেলা কংগ্রেস কমিটির উদ্যোগে এবং বর্তমানে প্রাদেশিকতা প্রচারে ব্যস্ত। সুতরাং তুমি জেলা কংগ্রেস কমিটির মেম্বার হিসাবে তোমার কর্তব্য আছে যাতে উক্ত মিটিং না হয়। এই মিটিং বন্ধ করিতে হইলে জনসাধারণের পক্ষ হইতে ডিসি মহোদয়ের নিকট আবেদন করিয়া 144 ধারা প্রয়োগ করাইবে।"

ইতি তোমার

চন্দ্রশেখর।

বস্তুত: উপরোক্ত চিঠিটি ছিল মানভূম জেলা কংগ্রেস নেতা ও হিন্দি প্রচারকদের ভাবনা-চিন্তার ফলশ্রুতি। লোক সেবক সংঘের এই কর্মসূচিকে বাতিল করার জন্য মানভূমের এই প্রভাবশালী অংশ সক্রিয় হয়ে ওঠে। ফলে দেখা যায় মাগুড়িয়া গ্রামের কিছু লোক এই মিটিং করার বিরোধিতা করে। আর এই সুযোগে প্রশাসন ও আইন-শৃঙ্খলা বিঘ্নিত হওয়ার যুক্তি দেখিয়ে মাগুরাতে লোক সেবক সংঘের মিটিং করার কোন অনুমতি প্রদান করেনি।

প্রসঙ্গত: লোকসভার সংঘের সভাপতি অতুল চন্দ্র ঘোষ 21 সেপ্টেম্বর 1948 সালে হুড়া থানার মাগুরাতে 2 বা 3 অক্টোবর লোকসভার সংঘের সম্মেলনের জন্য ডেপুটি কমিশনারের কাছে অনুমতির জন্য চিঠি দেন। কিন্তু কয়লা অক্টোবর রাত্রে তার উত্তর পাওয়া যায় এবং তাতে সম্মেলনের জন্য অনুমতি দেওয়া হয়নি। কিন্তু সরকারি অনুমতি না পাওয়ার বিষয়টি সদস্যদের জানা ছিল না, ফলে প্রায় 250 জন লোক সেবক সংঘের কর্মী এবং গ্রামের বহু সাধারণ মানুষ এখানে উপস্থিত হন। তখন হুড়া থানার ভারপ্রাপ্ত অফিসার সেখানে এসে জানান- সভা ও সম্মেলন করার কোন অনুমতি নেই। এমনকি উপস্থিত কর্মী ও জনগণের সামনে পার্শ্ববর্তী গ্রামের কিছু লোক কালো পতাকা নিয়ে বিক্ষোভ দেখায়। তারা 'বিশ্বাসঘাতক দূর হোক', 'হিন্দী সীখেঙ্গে বিহার মে রহেঙ্গে', 'বাঙালি ষড়যন্ত্র বন্ধ হোক' ইত্যাদি শ্লোগান দিতে থাকে। এইভাবে পরিকল্পনামাফিক সেবক সংঘের মাগুড়িয়া সম্মেলন বন্ধ করা হয়।

শুধুমাত্র মাগুড়িয়া সম্মেলন নয়- ইতিপূর্বে বহু সভা ও অনুষ্ঠানের অনুমতি সরকার প্রদান করেননি অথবা শর্তসাপেক্ষে অনুমতি দিয়েছেন। এক্ষেত্রে 1946 সালের বিহার জন নিরাপত্তা আইন কে প্রয়োগ করা হয়। এই আইনে বলা হয়েছিল প্রদেশ এ দেশে বর্তমানে সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতির জন্য এই নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে যে, ক্ষেত্রবিশেষে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট অথবা অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের অনুমতি ছাড়া কোন শোভাযাত্রা বা সভা করা যাবে না।

1947 সালে বিহার জননিরাপত্তা আইন স্থায়ী আইনে পরিণত হয়। সরকার এই মানভূম জেলার এই আইনের অপপ্রয়োগ করেছিল। এর কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া যায়-

এইভাবে মানভূম জেলার জনন নিরাপত্তা আইনের অপপ্রয়োগ করে লোক সেবক সংঘের বিভিন্ন কার্যক্রম বন্ধ করে দেওয়া হতে থাকলে সংঘের কর্মীরা মানভূম জেলায় এরূপ অন্যায়ের প্রতিবাদ করার সংকল্প নেন। 10ই অক্টোবর 1948 সালে সংঘের সভাপতি অতুল চন্দ্র ঘোষ নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সভাপতি এবং ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যদের কাছে একটি জরুরী বার্তা পাঠান। তাতে বলা হয় জেলার অবস্থান দ্রুত খারাপ হচ্ছে এবং প্রতিকারের জন্য বিলম্ব করা উচিত নয়। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। পূর্ণ অহিংসার পথে অন্যায়ের বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহ পরিচালনা করায় তার কর্ম লক্ষ্য হবে। এরপর লোক সেবক সংঘের সাধারণ মানুষের সঙ্গে যোগ সূত্র আরও দৃঢ় করার জন্য উদ্যোগী হয়।19 অক্টোবর 1948 সালে পুরুলিয়া মুক্তি পেয়েছে মানভূম জেলা পঞ্চায়েতের সাধারণ সদস্যদের জন্য একটি অধিবেশন ডাকা হয় সেখানে জনগণকে স্বরাজ এর উপযুক্ত নাগরিক হিসাবে গড়ে তোলার জন্য কতগুলি প্রস্তাব গৃহীত হয়।

মানভূম জেলার সংকটজনক পরিস্থিতির ইঙ্গিত পেয়ে বিহারের রাজস্ব মন্ত্রী কৃষ্ণবল্লভ সহায় পুরুলিয়াতে এসে উপস্থিত হন। তিনি জেলার কিছু কিছু বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে জেলার বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে আলোচনা করেন। সেখানে উকিল জগদীশ মুখার্জি এবং অন্যান্যরা বাংলা ভাষার পরিবর্তে হিন্দি চালু করার জন্য যে নানাবিধ অপকার চলছে তা তুলে ধরেন এবং ন্যায়সঙ্গত: এই আন্দোলনকে দমন করার জন্য স্থানীয় আদিবাসীদের উপর অত্যাচারের চিত্র তুলে ধরেন। কৃষ্ণ বললাম সহায় বলেন উচ্চতম কর্তৃপক্ষের কাছে এ বিষয়ে বিচারের সময় উভয় পক্ষই নিজেদের বক্তব্য তুলে ধরতে পারবেন, এবং কর্তৃপক্ষের বিচারের পূর্বে জাতীয় উভয়পক্ষই এই

দাবির পক্ষে বা বিপক্ষে আন্দোলন না করে সে সম্পর্কে আলোচনা করা হয়l বাংলা ভাষার দমন বা উচ্ছেদ কোন রূপে করা হবে নাl কেন্দ্রীয় সরকারের নীতি অনুসারে নিজস্ব ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা লাভ করতে পারবেনl কৃষ্ণ বল্লভ সহায় স্বীকার করেন- তাদের কাজের জন্য অন্যায় হয়েছে এবং তিনি অভিযোগগুলি বিবেচনা করার আশ্বাস দেনl

কিন্তু কৃষ্ণবল্লভ সহায় এর আশ্বাস সত্ত্বেও মানভূমের বাংলাভাষী ও জনগণের উপর অত্যাচার হ্রাস পাইনি বরং তা ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকেl শুধুমাত্র বাংলাভাষী হওয়ার অপরাধে পুরুলিয়া সদর মহকুমার চারজন স্কুল পরিদর্শককে বিহারের হিন্দিভাষী অঞ্চলে বদলি করা হয়l এছাড়া আরও বাংলাভাষীর স্কুল পরিদর্শক এর হিন্দিভাষী অঞ্চলে বদলি করা হবেl মানবাজারের দারোগা বজরং বাবু সেখানকার সমস্ত দোকানদারদের থানায় ডেকে দোকানের সামনে হিন্দি সাইনবোর্ড দেওয়ার জন্য বলেনl মানবাজারের কাপড়ের দোকানদার, মনিহারি ও সোনা রুপার দোকানদার ভয়ে হিন্দিতে সাইনবোর্ড দেনl এছাড়া বন্দুকের লাইসেন্স প্রাপ্ত ব্যক্তিদের বাড়ির সামনে হিন্দিতে সাইনবোর্ড টানতে বাধ্য করা হয়l

বান্দোয়ান থানার চিরুডি গ্রামে মানভূম জেলার ডেপুটি কমিশনার ও পাবলিসিটি অফিসারগণ প্রকাশ্যে সভায় লোকসভার সঙ্গীর কাছ থেকে জনগণকে দূরে থাকার নির্দেশ দেনl এ ঘটনা সম্পর্কে কানুরাম শবর লিখেছেন -22 নভেম্বর বেলা চারটার সময় ডেপুটি কমিশনার ভাষণে বলেন যারা তোমাদের জেলা কংগ্রেস কমিটির সভাপতি ও সম্পাদক ছিল তারা এখন কংগ্রেস কমিটির বাইরে গেছে এবং বদমাইশ সাব্যস্ত করে জেলা থেকে বার করে দেওয়া হয়েছেl সুতরাং তোমরা আর ওদের কথা শুনবে না এবং তাদের সঙ্গে কোনো পরামর্শ করবে নাl তারা সমবায় সমিতি পরিচালনা করবে বলে জনগণের কাছ থেকে টাকা আদায় করে আত্মসাৎ করেছেl তোমরা ভাল ভাবে হিন্দু শিক্ষা লাভ করলে 100 থেকে 150 টাকা বেতন হবে এবং গ্রামে গ্রামে জলাশয় তৈরি করে দেবl

যার ফলে পুরুলিয়া তথা মানভূমের জনগণ ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে এবং লোকসভা কেন্দ্রের পরিচালক এই অবস্থায় উদয় চন্দ্র ঘোষ জনগণকে শান্ত থাকার আবেদন জানানl এরপর 15 ই মার্চ লোকসভার সংঘের ব্যবস্থা পরিষদের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়l সেখানে বাংলাভাষী মানুষের উপর অত্যাচার হিন্দি আগ্রাসন নীতি সাধারণ মানুষ ও সংঘের কর্মীদের উপর লাঞ্ছনা এবং সবশেষে পুরুলিয়া শহরের বাঙ্গালীদের উপর

অত্যাচার ও সম্পত্তি ধ্বংস করার পরিপ্রেক্ষিতে আগামী 6 এপ্রিল থেকে সত্যাগ্রহ শুরু করার কথা ঘোষণা করেন। ইতিপূর্বে মানভূমের জনগণ বিহার সরকারের অত্যাচারের চিত্র বিভিন্ন পত্রের মাধ্যমে লোক সেবক সংঘ নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির নিকট প্রেরণ করেন। 1948 সালের 27 শে নভেম্বর নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সাধারণ সম্পাদক কালাভেঙ্কট রাও এর কাছে মানভূমের পরিস্থিতি সুরাহার জন্য শেষবারের মতো আবেদন পত্র পাঠিয়ে তাতে পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, মানভূমের হিন্দি সম্রাজ্যবাদী ভাত্তাচার বন্ধ না হলে সংঘ শীঘ্রই সত্যাগ্রহ আন্দোলনে নামবে।

সমস্ত অনুরোধ বিফল যাওয়ার ফলে লোকসংখ্যার কাছে সত্যাগ্রহ ছাড়া আর কোনো রাস্তা খোলা রইল না। লোকসভা কেন্দ্রের পরিচালক চন্দ্র ঘোষ উনিশে এবং 23 শে মার্চ মানভূম কংগ্রেস কর্তৃপক্ষ এবং নিখিল ভারত কংগ্রেস কার্যকরী পরিষদের কাছে বিহার সরকারের অন্যায় আচরণ এবং সত্যাগ্রহ করার সিদ্ধান্ত জানিয়ে চিঠি পাঠান। সেখানে ভাষা ভিত্তিক প্রদেশ গঠনের নীতিকে এড়াবার জন্য মানভূম কে অবৈধভাবে হিন্দিভাষী প্রমাণের উদ্দেশ্যে সংঘটিত কার্যকলাপের বিবরণ দেওয়া হয়। অতুল চন্দ্র ঘোষ সত্যাগ্রহের ঘোষণাকে মানভঞ্জন মুক্তি আন্দোলনের সূচনা বলে অভিহিত করেন। ঘোষণায় তিনি বলেন-" মানভূমের জীবনে আজ যে দুঃখ ও বেড়ি সমূহ দেখা দিয়েছে তাহার কারণ ব্যাপক ও গভীর। স্বার্থ প্রসার বুদ্ধি, শোষণ বুদ্ধি, এবং সংগঠিত রূপে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী- তাহাই আজ যে সকল পথের সম্ভব মানভূমের সর্বনাশে অগ্রসর হইয়াছে এবং জনগণের প্রতিনিধিত্ব নামে জনগণ বঞ্চিত, দলিত হইতেছে। জনচেতনা ও জনশক্তিকে জাগ্রত করিয়া তাহার প্রতি শোষণের পথ গুলির দ্বার রুদ্ধ করিয়া জন্ম দিক আর গঠনের পথে আমাদের অগ্রসর হইতে হইবে। ইহাই মানভূমের গণমুক্তির প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম। স্বরাজ জীবনের যথার্থ অধিকারের গঠন ধারা স্বরচিত না হওয়া পর্যন্ত সমগ্র ভারতের জীবনে এই সংগ্রামের ক্ষেত্রে রচনা হইতেছে। মানভূমের আন্দোলন তাহার একটি অধ্যায়। শান্তিপূর্ণ অহিংস শক্তির পথে জনগণকে নিয়ে আমরা অগ্রসর হইলাম।"

এইভাবে লোক সেবক সংঘ সত্যাগ্রহ আন্দোলনে মানভূমের প্রধান দাবি বাংলা ভাষার অধিকার এবং ভাষা ভিত্তিক প্রদেশ গঠনের দাবিতে সত্যাগ্রহ আন্দোলন শুরু করেন। এই সত্যাগ্রহ আন্দোলন মাগুড়িয়া, মানবাজার, রঘুনাথপুর, গোপালনগর, জয়পুর প্রভৃতি মানভূমের অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। তাই বাংলা ভাষার অধিকার আদায়ের দাবিতে

লোক সেবক সংঘের এই সত্যাগ্রহ ঘোষণা ছিল মানভূমের ভাষা আন্দোলনের অন্যতম পর্যায়। আর তাই এই সত্যাগ্রহ কে "ভাষা সত্যাগ্রহ আন্দোলন" বলা যেতে পারে।

গ্রন্থসূচী:

1. বিভূতিভূষণ দাশগুপ্ত," Manbhum Tusu Satyagraha and our stand, Purulia, 1954.
2. Bihar 1956-57,public Relation department, Bihar, 15th August, 1957.
3. H.H Risley, The tribes and castes of Bengal. Calcutta, 1981.
4. অতুল চন্দ্র ঘোষ সম্পাদিত, নিবারণচন্দ্র দাশগুপ্তের জীবন কথা, মুক্তি প্রেস, পুরুলিয়া, ১৯৩৯
5. অরুণ চন্দ্র ঘোষ (প্রকাশক) টুসু গানে মানভূম, লোকসাহিত্য ভবন, পুরুলিয়া, ১৯৫৮
6. পুরুলিয়া, জন শিক্ষা প্রচার কেন্দ্র কলকাতা।
7. বিনয় মাহাতো, লোকায়ত ঝাড়খন্ড, নবপত্র প্রকাশন, কলকাতা,১৯৮৪
8. ভজহরি মাহাতো ও পদক মাহাতো, স্বাধীনতা আন্দোলনে রক্তে রাঙ্গা মানভূম, পদক চন্দ্র মাহাতো, হেরবনা, পুরুলিয়া,১৯৯৫
9. তপন কর, অসামান্য মানভূম, আনন্দ, কলকাতা,১৯৯৮
10. সুরজ রঞ্জন চৌধুরী, মানভূমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ, পুরুলিয়া, ১৯৩৮

ব্রাত্যজনের গল্পকার হরিশংকর জলদাস

তরুণকান্তি মন্ডল
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, সরসুনা কলেজ

সারসংক্ষেপ: বাংলাদেশের নিম্নবর্গের মানুষদের নিপীড়ন, শোষণের কথা ফুটে উঠেছে ব্রাত্যজনের গল্পকার হরিশংকর জলদাসের কলমে। তার ছোটগল্পের মাধ্যমে আমরা প্রান্তিক জীবনের যে বর্ণনা দেখতে পাই, তা আসলে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার প্রতিফলন। সমাজের অবহেলিত, অত্যাচারিত, নিপীড়িত মানুষরাই— তোমার গল্পের চরিত্র হয়ে উঠেছে। হরিশংকর অন্ত্যজ ও মানুষের চোখ দিয়ে জীবনকে ব্যাখ্যা করেছেন। নিম্নবর্গের প্রতিবাদ, প্রতিরোধ গুরুত্বসহ উপস্থাপন করেছেন লেখক।

সূচক শব্দ: নিম্নবর্গ, ব্রাত্যজন, নিপীড়ন, প্রতিরোধ

মূল আলোচনা:

বাংলাদেশের ব্রাত্যজন ও প্রান্তিক জীবনকে নিয়ে নিবিড়ভাবে যিনি সাহিত্যচর্চা করে চলেছেন তিনি হলেন বিশিষ্ট ছোটগল্পকার জলদাস। তাঁর লেখার মাধ্যমে আমরা প্রান্তিক জীবনের যে বর্ণনা দেখতে পাই, এটা আসলে হরিশংকর জলদাসের নিজের জীবনের স্মৃতি সঞ্চয়। ব্রাত্যসমাজে জন্ম বলে খুব ছোটবেলা থেকেই সমাজে প্রান্ত মানুষদের একেবারে কাছ থেকে দেখে বড় হয়েছেন। তার গল্পে সমাজের বিবর্ণ, অবহেলিত, রক্তক্ষরিত, বিপন্ন মানুষদের আর্তনাদ বারবার ফুটে উঠেছে।

হরিশংকর জলদাসের গল্পগুলো আমাদের ভাবায়, মনে দাগ কাটে; আমাদের অনুভূতিশীল মনকে জাগ্রত করে। নির্বাচিত কিছু ছোটগল্প নিয়ে আলোচনায় অগ্রসর হওয়া যাক। প্রথমেই 'কোটনা' গল্পটির নাম করা যায়। গল্পটিতে দেখানো হয়েছে ব্রাত্য সমাজের মানুষজন অর্থাৎ মুচি, জেলে, মেথর সন্তানদের শিক্ষা লাভের পথে যে কত বাধা-বিপত্তি থাকে। পাশাপাশি তাদের সমাজের আদিম যৌনতা গল্পকার তুলে ধরেছেন। গল্পে আমরা দেখতে পাই, সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ভবতোষ চৌধুরী মুচির ছেলে অশোককে কিছুতেই স্কুলে ভর্তি করতে রাজি হননি। যদিও ধর্মশিক্ষক মৌলভী আব্দুল হাফিজের নির্দেশে শেষ পর্যন্ত তাঁকে ভর্তি নেওয়া হয়। ভর্তির দিনই চক্রবর্তী মহাশয় বলেছিলেন—

> "ক্লাসের একেবারে শেষ বেঞ্চে বসবি তুই, খবরদার সামনে বসার চেষ্টা করবি না কখনো।"[১]

গল্পে অশোকের প্রতি চক্রবর্তী মশাইয়ের এরূপ আচরণ আসলে গল্পকারের দলিত জীবনে ঘটে যাওয়া বিচিত্র অভিজ্ঞতারই এক প্রতিফলন বলা যায়। ব্রাত্যসমাজের মানুষেরা এই ভাবে দিনের পর দিন উচ্চবর্ণের দ্বারা লাঞ্ছিত, অপমানিত হয়ে আসছিল। গল্পে দেখা যায়, অশোক ভর্তি হওয়ার একমাস পরেই জেলের ছেলে ক্ষীরমোহন এসে

ভর্তি হয়। গা দিয়ে মেছো গন্ধ বেরনোর পরও ক্ষীরমোহনই হয়ে ওঠে অশোকের সবচেয়ে ভালো বন্ধু। বাবাকে মাছ ধরার কাজে সহায়তা করার জন্য ক্ষীরমোহন স্কুলে আসা বন্ধ করতে বাধ্য হয়। ক্ষীরমোহনেক ছাড়াই অশোক স্কুল জীবনে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে।

'দইজ্যা বুইজ্যা' গল্পে দেখা যায় ব্রাত্য সমাজের মানুষের ওপর পাকিস্তানি সেনাদের নিপীড়নের চিত্র। পাকিস্তানি ক্যাপ্টেন ফোর্সদের দ্বারা জগমোহন জলদাসের ষোলো বছরের মেয়ে পারুলবালা ধর্ষিত হয়। পতংগার এই জেলে পাড়াটি পাকিস্তানি সেনা ও রাজাকারদের দ্বারা নানা ভাবে শোষিত ও অত্যাচারিত হয়।
গল্পকার জানিয়েছেন যে, ফিরে যাওয়ার সময় পাকিস্তান সৈন্য কীভাবে লুঠতরাজ চালিয়েছিল—

> "মধুসূদনের ছাগলটা, মালতীর হাঁস চারটি, বুড়া হারানের বাপের প্রসবোন্মুখ গরুটি নিয়ে যায়। জেলেদের মুখে প্রতিবাদের ভাষা নেই। শুধু মনে আগুন জ্বলে, রাগে-ক্ষোভে শরীর কাঁপে। সেই কাঁপুনি অতি কষ্টে জীর্ণ কাপড়ের তলায় ঢেকে রাখে তারা।"[২]

'সুবিমলবাবু' গল্পেও সমাজের উচ্চবর্ণের দ্বারা নিম্নবর্ণের মানুষদের নির্যাতন ও অবহেলার, ছবি খুঁজে পাই। গল্পে দেখা যায়, উচ্চবর্ণের সুবিমলবাবু নিম্নবর্গের মানুষদের একদমই সহ্য করতে পারেতন না। তিনি কৌলিন্যকে প্রাধান্য দিতেন, সেই কারণে তাঁদের বোনেদের বিবাহ হয়নি। তাই মনের দুঃখে তিনিও বিয়ে করেননি। কিন্তু শরীরের কামনা মেটাতে উচ্চশিক্ষিত এই অধ্যাপক বেছে নিয়েছিলেন নিচুবর্ণের মালতী জলদাসকে। দিনের পর দিন উচ্চবর্গের লালসার শিকার হয়েছেন নিম্নবর্গের নারীরা।
'কুন্তীর বস্ত্রহরণ' গল্পেও নিম্নবর্গের নারীর শোষণের দিকটি উঠে এসেছে। গল্পে দেখা যায় মালো পরিবারের পুত্রবধূ কুন্তী একসময়ের রাজাকার ও বর্তমানে ইউনিয়ন পরিষদের চেয়রাম্যান আবুল কাশেম ও তাঁর দলবলের রোষদৃষ্টিতে পড়েছিল। আবুল কাশেমের ইচ্ছা ছিল মালোপাড়ার বহু পুরানো শ্মশানটিতে একটি বাগান বাড়ি বানানোর। কিন্তু এই প্রস্তাবে বাধ সাধে কুন্তী। সে বলে—

> "পূর্বপুরুষের শ্মশান আমাদের। আমাদের বাপ-দাদা, তাদের মা-বাপ, কত শত আত্মীয়স্বজনের স্মৃতি জড়িয়ে আছে ওই শ্মশানের সঙ্গে। আপনি কী করে বলেন ওই শ্মশান ছেড়ে দিতে!"[৩]

এই প্রতিবাদের পরিণাম হয় মারাত্মক। অজয় মণ্ডলের মৃতদেহ নিয়ে কুন্তীসহ অনেক মালো শ্মশানঘাটে এসে উপস্থিত হলে আবুল কাশেম দলবল নিয়ে হাজির হয় এবং দাহকার্য করতে বাধা দেয়। কিন্তু কুন্তী না শুনলে কাশেমের লোকজন মালোদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। নিজের সম্ভ্রম রক্ষার চূড়ান্ত পর্যায়ে কুন্তী চোখ বুজে ভগবানের নাম উচ্চারণ করে শ্মশানের পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া ভৈরব নদে ঝাঁপিয়ে পড়ে। কুন্তী একাই

লড়েছে উচ্চবর্গের মানুষদের বিরুদ্ধে। সে প্রতিবাদ করতে জানে। এইভাবে ব্রাত্যসমাজের থেকে উঠে এসে উচ্চবর্গের অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছিলেন কুন্তী। অত্যাচারী আবুল কাশেমের দলের কাছে সে নিজেকে আত্মসমর্পণ করেনি। তাঁর সর্বনাশ হওয়ার আগেই সে ভৈরব নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ে নিজের সম্ভ্রমকে বাঁচিয়েছে। এই ভাবে গল্পকার জেলে সমাজের অসহায়তার ছবিকে যেমন তুলে ধরেছেন, অনুরূপভাবে নারীদের প্রতিবাদকেও ভাষা দিয়েছেন।

'দুলারি এবং কয়েকজন' গল্পেও দেখা যায়, ব্রাত্যসমাজের এক নারীর অসহায়তার ছবি। গল্পে দেখা যায়, শ্যামল দত্ত নামে এক উচ্চবর্গীয় মানুষ দুলারিকে বিয়ে করে। দেড়বছর পরে দুলারি জানতে পারে তাঁর স্বামী বিবাহিত এবং তাঁর দুটো সন্তান আছে। দুলারি স্বামীর কাছে এরূপ আচরণের কারণ জানতে চাইলে শ্যামল ঔদ্ধত্যের সুরে জানায়—

> "তোমাকে এই শ্যামল দত্ত বিয়ে করেছে এই তোমার সৌভাগ্য।... জাইল্যার মাইয়ারে বিয়ে কইরা এই শ্যামল দত্ত তো তোমাকে জাতে তুলেছে।"[৪]

শ্যামল দুলারিকে চড় মেরে তাড়িয়ে দেয়। অসহায় দুলারিকে বহদ্দরহাটের বস্তিতে আশ্রয় নেওয়ার প্রথম রাতেই সে ধর্ষিতা হয়। সন্তানদের নিয়ে বিভিন্ন জায়গায় ভেসে চলতে চলতে এক সময় এক অধ্যাপকের বাড়ির গেটের সামনে আশ্রয় নেয়। সেখানেও পাড়ার মস্তান জগলু দ্বারা ধর্ষিত হয়। দুলারি চেয়েছিল একটি সুখি দাম্পত্যজীবন ও কিন্তু শ্যামল তা হতে দেয়নি, তাঁর সঙ্গে প্রতারণা করেছে। ভোগ করেছে তাঁর শরীর, অর্থ সবকিছু।

নারীরা যে চিরকালই ভোগের সামগ্রী এবং নিম্নবর্গের নারীদের ওপর উচ্চবর্গের শোষণ, নিপীড়ন ও অত্যাচারের মাত্রা যে কত ভয়ঙ্কর হতে পারে তার প্রমাণ 'চিঠি' গল্পটি। চিঠির ভঙ্গিতে লেখা এই গল্পে দেখা যায়, মুসলিম ঘরের এক মেয়েকে তাঁর বাবা শিক্ষিত করে তোলার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে। চাষাবাদ করে অক্লান্ত পরিশ্রমে উপার্জিত অর্থ সে তাঁর একমাত্র মেয়ের জন্য খৰচ করে। কিন্তু বাবার স্বপ্ন অধরাই রয়ে যায়। কারণ স্কুলের ইংরেজি শিক্ষক হান্নান স্যারের কামনার শিকার হয় মেয়েটি। তাই শেষ পর্যন্ত এই অপমান ও লাঞ্ছনা সহ্য করতে না পেরে মেয়েটি বাড়ির উঠোনের আমগাছের ডালে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করে। মৃত্যুর আগে মেয়েটি তার বাবাকে এই সমস্ত ঘটনার কথা একটি চিঠির মাধ্যমে জানিয়ে যায়। মেয়েটি জানায় তার মনের গোপন বেদনার কথা—

> "গোটাটা দিন নিজের সঙ্গে অনেক যুদ্ধ করেছি বাবা। মা এবং তোমার মুখের দিকে তাকাতে পারছিলাম না আমি। ... মাকে বলতে চাইছিলাম সবকিছু কিন্তু পারলাম না আমি। ... আমি চলে গেলাম বাবা। তুমি আমার ওপর রাগ কর না। মাকে বল, না কাঁদতে।"[৫]

শিক্ষক সমাজগড়ার কারিগর। কিন্তু তিনিই হয়ে পড়েন ধ্বংসযজ্ঞের হোতা। মেয়েটি মা-বাবা, ভাইয়ের লজ্জার কথা মাথায় রেখে সে বেছে নিয়েছিল আত্মহত্যার পথ। আর এই পথ শুধুমাত্র মেয়েটির মৃত্যুতেই পাঠকের সামনে উপস্থান করে তা নয়, বিপন্ন সমাজব্যবস্থার প্রতিও কটাক্ষ করে।

হরিশংকরের গল্পে নিম্নবর্গের মানুষজনের অবহেলা, বঞ্চনা, শোষণের চিত্রটাই উঠে এসেছে। তাঁর গল্প ব্রাত্যসমাজের হাহাকার, বঞ্চনা, অবহেলা ফুটে উঠেছে। সামাজের অবহেলিত, বঞ্চিত, অত্যাচারিত, নিপীড়িত মানুষেরা তাঁর গল্পের চরিত্র হয়ে উঠেছে। নিম্নবর্গের প্রতিবাদ, প্রতিরোধ গুরুত্বসহ উপস্থাপন করেছেন হরিশংকর। অতিক্রান্ত সময়ের ব্যবধানে লেখা তাঁর ছোটগল্পগুলিতে বারেবারে তাঁর যাপিত জীবনে ঘটে যাওয়া বহুবিধ অভিজ্ঞতার প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়। ছোটগল্পের বিষয় বৈচিত্র্য ও চরিত্রসৃষ্টির অভিনবত্বে গল্পকার হরিশংকর জলদাস কেবলমাত্র বাংলাদেশের ছোটগল্প নয়, বৃহত্তর বাংলা ছোটগল্পের ধারায় একজন বিশিষ্ট ছোটগল্পকার।

তথ্যসূত্র :

১. জলদাস হরিশংকর, কোটনা, গল্পসমগ্র ১, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ২০১৬, পৃষ্ঠা ১১৫
২. জলদাস হরিশংকর, দইজ্যা বুইজ্যা, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ২৬
৩. জলদাস হরিশংকর, কুন্তীর বস্ত্রহরণ, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৩০৭
৪. জলদাস হরিশংকর, দুলারি ও কয়েকজন, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৯৩
৫. জলদাস হরিশংকর, চিঠি, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১৩৬

মার্কসবাদী 'প্রোপাগাণ্ডিস্ট' উৎপল দত্ত

কমলেশ মণ্ডল
গবেষক, বাংলা বিভাগ, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

ভূমিকা : বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাংলা নাট্যধারায় উৎপল দত্ত একটি ব্যতিক্রমী, উজ্জ্বল ও বিশিষ্ট নাম। অর্ধ শতাব্দীব্যাপী নাট্যচর্চায় তাঁর অভিনিবেশ ছিল রেভ্যুলিউশনারি (বিপ্লবী) থিয়েটার অভিযাত্রায়। নাট্যজীবনের শুরু থেকেই উৎপল দত্ত শোষিত বঞ্চিত মানুষের অধিকার ও মর্যাদা রক্ষার লড়াইকে নাট্যসাধনার কেন্দ্রীভূত বিষয় হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। বঞ্চিত শোষিত লাঞ্ছিত মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলন এবং সেই আন্দোলনের পথিকেরা তাঁর নাটকের মূল বিষয়বস্তু। কেবলমাত্র নাট্যবিষয় নয় নাট্যনির্মাণের ক্ষেত্রেও তাঁর নাটকসমূহ বাংলা নাট্যভুবনে নবমাত্রা সংযোজন করেছে। উৎপল দত্ত আপাদমস্তক ছিলেন মার্কসবাদী, মার্কসবাদী আদর্শ, ভাবধারাকে সদাসর্বদা নাট্যাঙ্গানে আনায়নের মধ্য দিয়ে শোষিত, লাঞ্ছিত, বঞ্চিত মানুষের পাশে দাঁড়ানোর চেষ্টা করেছেন। উৎপল দত্তের নাটক মানুষের সংগ্রামের সঙ্গে মিলেমিশে গেছে। তিনি ছিলেন 'প্রোপাগান্ডিস্ট'। তিনি তাঁর থিয়েটার-এর মধ্য দিয়ে মার্কসবাদের প্রোপাগান্ডা করে গেছেন। রাজতন্ত্র, ধনতন্ত্র, পুঁজিবাদ, সাম্রাজ্যবাদ সাম্প্রদায়িকতা – এসবকিছুর বিরুদ্ধে উৎপল দত্ত সদাসর্বদা কলম ধারন করেছেন। "নাটক হবে অসংখ্য সাধারণ মানুষের জন্য, নাটক কইবে সংগ্রামের কথা" – এই বাণী সমস্ত জীবন ধরে তাঁর থিয়েটার কর্মের মধ্যে উৎপল দত্ত প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন। মার্কসীয় সমাজতত্ত্বে বিশ্বাসী উৎপল দত্ত হাজার বছরের ঐতিহ্য লালিত বাংলার নাটকে শ্রেণীসংগ্রাম ও শ্রেণীচেতনার নিরিখে বিপ্লবী থিয়েটার চর্চার ধারার স্রোতে মিলিয়ে নেওয়ার চেষ্টা ব্রতী হয়েছেন। পৃথিবীর যেখানেই, যে প্রান্তেই মানুষের সংগ্রামের কথা, তাঁর ইতিহাস ও ঐতিহ্য দেখেছেন সেখান থেকেই নাটকে মানুষের সংগ্রামের শক্তি আরোহন করেছেন, মার্কসবাদী আদর্শে ও চিন্তাধারায় বিচার-বিশ্লেষণ করেছেন। মার্কসবাদের প্রোপাগান্ডা করেছেন।

সূচক শব্দ : শ্রেণিসংগ্রাম, স্তালিনবাদী, প্রোপাগান্ডিস্ট, ফ্যাসিবাদ, সাম্রাজ্যবাদ, পার্টিজান, মার্কসবাদ, এজিটেশন, পুঁজিবাদ, শ্রমিক আন্দোলন, শ্রেণিসত্য।

মূল আলোচনা :

উৎপল দত্ত একটি সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন— "আমি মনে করি, আমি প্রকৃত স্তালিনবাদী।"[১] তাঁর স্মৃতিচারণামূলক প্রবন্ধ 'লিট্‌ল থিয়েটার ও আমি' সেখানে তিনি মন্তব্য করেছিলেন—

> "বারম্বার রাজনৈতিক দলের পাশে দাঁড়িয়ে রাজনৈতিক নাটকই আমরা করে যাব। এবং ক্রমান্বয়ে রাজনীতি শিখব দম্ভ ও গরিমা ত্যাগ করে।"[২]

বাংলা নাটকে যারা সাহসিকতার সঙ্গে রাজনীতিকে মঞ্চে নিয়ে এসেছেন এবং জনপ্রিয় করে তুলেছেন, তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন উৎপল দত্ত। বাংলা নাটকে রাজনীতি নিয়ে কথা বলার ক্ষেত্রে সর্বভারতীয় প্রেক্ষাপটে উৎপল দত্তের অবদান সবচেয়ে বেশি। অনেকে রাজনৈতিক নাটক এবং উৎপল দত্তকে সমার্থক হিসেবে ব্যবহার করতে কুণ্ঠাবোধ করেন না। উৎপল দত্ত প্রথম নাট্যকার যিনি রাজনৈতিক ঘটনা নিয়ে সরাসরি নাটক লিখেছেন। পূর্বসূরিদের থেকে উৎপল দত্ত এখানেই একেবারে স্বতন্ত্র। উৎপল দত্ত একান্তভাবেই সাম্রাজ্যবাদ, ফ্যাসিবাদ, উপনিবেশিকতাবাদ-এর বিরোধী এক বিশিষ্ট রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির নাট্যকার। এই সাম্রাজ্যবাদ, ফ্যাসিবাদ ও শোষণের বিরুদ্ধে তাঁর কলম গর্জে উঠছে সদা সর্বদা।

উৎপল দত্ত ছিলেন 'পার্টিজান'। তার 'Towards A Revolutionary Theatre' গ্রন্থে লিখেছেন—

> "I am Partisan, not neutral, and I believe in political struggle the day I cease to participate in political struggle, I shall be dead as an artist too."[৩]

উৎপল দত্ত আদ্যন্ত মার্কসবাদী আদর্শে বিশ্বাসী একজন নাট্যকার ছিলেন। মার্কসীয় দর্শন সমস্ত জীবন ধরে তিনি লালন-পালন ও বহন করে গেছেন। তাঁর নাটকের প্রতিটি আঙ্গিকে মার্কসীয় ধ্যান-ধারণা, চিন্তাভাবনা ও তাঁর আদর্শের কথা পরিলক্ষিত। ছোটো থেকেই উৎপল দত্ত মার্কসীয় আদর্শ ও দৃষ্টিভঙ্গির প্রতি বিশেষ আকর্ষণ অনুভব করতেন। মার্কসবাদের প্রতি আকর্ষণ ও রাজনৈতিক চেতনা অঙ্কুরিত হয়েছিল স্কুলে পড়ার সময় থেকেই—

> "ইস্কুলে থাকতেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে লাল ফৌজের মহান প্রতিরোধ ও প্রত্যাক্রমণের কাহিনী পড়ে চমকিত হতাম। স্তালিনের সহজ ও তীক্ষ্ণ ভাষায় লেখা প্যামফ্লেট ও বই তখন থেকে পড়েছি। ইস্কুল শেষ হতে না হতে লেনিন, মার্কস, এঙ্গেলস— এমনকি হেগেল, ফয়েরবাখ, কান্টে প্রমোশন নিয়েছি।"[৪]

উৎপল দত্ত ছিলেন প্রোপাগান্ডিস্ট-মার্কসবাদের প্রোপাগান্ডিস্ট। তিনি সগর্বে সব সময় বলতেন—

> "আমি শিল্পী নই। নাট্যকার বা অন্য যে কোন আখ্যা লোকে আমাকে দিতে পারে। তবে আমি মনে করি আমি প্রোপাগান্ডিস্ট। এটাই আমার মূল পরিচয়।"[৫]

নিজেকে 'প্রোপাগান্ডিস্ট' বলতে তাঁর কোনোরকম দ্বিধাবোধও ছিল না। তাঁর নাটক বিপ্লবের বিশ্বাসে ভরা এবং তাঁর মনটি ছিল সদা সর্বদা প্রতিবাদ ও প্রতিরোধে পূর্ণ। যখনই যেখানে শ্রমিক-কৃষক-মজদুর শ্রেণির স্বার্থ বিঘ্নিত তখনই তিনি তাঁর লেখনী

ধারণ করেছেন, গর্জে উঠেছে তাঁর কলম। বামপন্থী আদর্শ সদা সর্বদা জাগ্রত ছিল তাঁর লেখনীতে।

শিল্প-সাহিত্য আলোচনা প্রসঙ্গে লেনিন দুই রকমের প্রচারের কথা বলেছিলেন— 'প্রোপাগান্ডা' এবং 'এজিটেশন'। 'প্রোপাগান্ডা' হল আমাদের সমাজ ব্যবস্থা সম্পর্কে মানুষের মনে প্রতিবাদ, প্রতিরোধ ও ঘৃণা জাগ্রত করা। শিল্প-সাহিত্যের মাধ্যমে মানুষের মনের মধ্যে এই প্রকার প্রচার করে যাওয়া হল 'প্রোপাগান্ডা'। শিল্প-সাহিত্যের মাধ্যমে মানুষের মনের গভীরে প্রবেশ করে সমাজ সম্পর্কে ঘৃণা জাগ্রত করাই হল 'প্রোপাগান্ডা'র মূল উদ্দেশ্য। 'এজিটেশন' হল কোনো একটা তাৎক্ষণিক বিষয়ের উপর মানুষকে সচেতন করে রুষ্ট করে তোলা। বিভিন্ন পথনাটিকা এই 'এজিটেশন'-এর অংশ। 'প্রোপাগান্ডা'-তে জীবন ও মানুষের চরিত্রের মধ্য দিয়ে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণে পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে, শোষণ ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে, সামাজিক নিপীড়নের বিরুদ্ধে মানুষের জীবন সংগ্রামের কথা থাকবে। মানুষকে ভাবিত করে তার চেতনার বিকাশ ঘটাবার প্রচেষ্টা থাকে। মানুষের মনের গভীরে কাজ করে যাওয়া এই প্রচারকেই বলে 'প্রোপাগান্ডা'। 'প্রোপাগান্ডা' মানুষকে ভাবিত করে মনের গভীর পৌঁছে মানসিকতার পরিবর্তন ঘটায়।

উৎপল দত্তের রাজনীতি ছিল মার্কসবাদী রাজনীতি, শ্রেণি সংগ্রামের রাজনীতি, সমাজ শোষণ ও রাজনৈতিক অত্যাচারের বিরুদ্ধে জাগ্রত জনতার সমবেত প্রতিবাদ, প্রতিরোধ ও সংগ্রামের রাজনীতি। সমস্ত জীবন তিনি মার্কসবাদী ধ্যান-ধারণা বহন করে চলেছিলেন। স্কুল ও কলেজে যে সমস্ত বামপন্থী বইপত্র পড়েছিলেন সেগুলি তাঁকে বামপন্থী রাজনীতির প্রতি গভীরভাবে আকৃষ্ট করে তুলেছিল। কলেজ ছাড়ার পর মার্কসবাদ সম্পর্কে আরও গভীরভাবে পড়াশোনা শুরু করেন। গণনাট্যে যোগদান করে তিনি সরাসরি যুক্ত হয়ে পড়েন সেইসময়কার আন্তর্জাতিক বিভিন্ন পরিস্থিতি নিয়ে বাক্‌বিতন্ডা, মতপার্থক্য ও বিভিন্ন বিষয়ের বিচার-বিশ্লেষণে। সে সময় তাঁর চোখের সামনে ঘটতে থাকে কমিউনিস্ট পার্টির উপরে নানা রকম অত্যাচার ও বে-আইনিকরণ। বন্দিদের উপর গুলি চালানো, কাকদ্বীপে নারী হত্যা; ডিব্রুগড়ে গণনাট্য সংঘের অনুষ্ঠানে গুলি বর্ষণ, বউবাজারে নারী মিছিলের উপরে বেপরোয়া গুলি বর্ষণ— এইসব ঘটনাবৃত্তান্ত প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রভাব ফেলে তাঁর ব্যক্তিজীবনে ও তাঁর নাট্যশিল্পকর্মে। উৎপল দত্তের অভিজ্ঞতা থেকে জানা যায়—

> "তখন একেবারে উত্তাল কলকাতার রাস্তা এবং আক্রান্ত হচ্ছে কমিউনিস্টরা। ... কংগ্রেসীরা আক্রমণ করছে কমিউনিস্টদের। এই প্রথম আমার চোখের সামনে কালীঘাটের পার্টি অফিস আক্রান্ত হয়। এবং সেখান থেকে কমরেডদের টেনে বার ক'রে ক'রে রাস্তায় ফেলে মারছে, এইসব আমি দেখি। কলেজ যাতায়াতের পথে।"[৬]

এইসব ঘটনাবৃত্তান্ত দেখে উৎপল দত্তের মনে অত্যাচারীদের প্রতি গভীর ঘৃণা ও অত্যাচারিতদের প্রতি সমবেদনা ও সহমর্মিতা জাগ্রত হয়। উৎপল দত্তের ভাষায়—

> "এইভাবে প্রথমে just একটা sympathy হয়।"[৭]

মার্কর্সবাদের প্রতি তাঁকে আরও আকৃষ্ট করে তোলে। বামপন্থীদের বিভিন্ন কর্মপন্থা, যথা— বিভিন্ন আন্দোলন, প্রতিবাদ, প্রতিরোধ প্রভৃতি অনেক কাছ থেকে গভীরভাবে লক্ষ করেন; এবং মার্কসবাদকে তাঁর সত্তায় ধারণ করেন। তিনি মার্কসবাদীদের বিভিন্ন কর্মপন্থাকে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ ও অনুধাবন করেছেন এবং সেই বামপন্থী আদর্শকে তাঁর নাট্যসৃষ্টির মধ্যে অতি নিপুণ ও দক্ষতার সঙ্গে তুলে ধরেছেন। তাঁর শিল্পকর্মের মধ্যে আজীবন মার্কসবাদকে বহন করে গেছেন, প্রোপাগান্ডা করে গেছেন মার্কসবাদী আদর্শকে।

পথনাটকের রচনা ও অভিনয়ের ক্ষেত্রে যুগস্রষ্টা ছিলেন উৎপল দত্ত। তিনি মার্কসবাদী হিসেবে প্রতিটি নির্বাচনে কমিউনিস্ট পার্টির প্রচারে পথনাটককে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করেছেন। ১৯৫০ সালে মহেশতলা উপনির্বাচনে কমরেড সুধীর ভাণ্ডারীর প্রচারে উৎপল দত্ত ও তাঁর সহযোগীরা দিনরাত পরিশ্রম করে পথনাটক অভিনয় করেন, যা নিহারেন্দু দত্ত মজুমদারের হারের অন্যতম কারণ হয়ে উঠেছিল। মহেশতলা উপনির্বাচনের ফলাফল যখন কংগ্রেসের নিহারেন্দু দত্ত মজুমদার বিপুল ভোটে পরাজিত হলেন তখন কমিউনিস্ট পার্টির তরফ থেকে উৎপল দত্তকে ও তাঁর সহযোগীকে বিশেষ প্রশংসা করা হয়েছিল এবং নির্বাচনে জয়ের প্রধান কৃতিত্ব তাঁকে দেওয়া হয়েছিল। উৎপল দত্তের অভিজ্ঞতা থেকে জানা যায়—

> "সারাদিন এলাকা ঘুরে ঘুরে অভিনয়। ... পরদিন ভোর থেকে আবার টহল— হেঁটে, লরিতে, জগদ্দলের মতন এক বিস্ফোরক মোটরগাড়িতে। বাটা কারখানার গেটে, নুংগিতে, বজবজে, দশ-বারো মাইল দূরের গাঁয়ে, মহেশতলার প্রতি পথের মোড়ে।"[৮]

মার্কসবাদ হচ্ছে শ্রমিক শ্রেণির মতবাদ। মার্কসবাদী রাজনীতি শ্রমিক শ্রেণির রাজনীতি। প্রকৃতপক্ষে মার্কসবাদকে বুঝতে গেলে শ্রমিক শ্রেণির দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বুঝতে হয়। 'ব্রেখ্‌টও মার্কসবাদ' প্রবন্ধে উৎপল দত্ত বলেছেন—

> "দার্শনিকদের তথাকথিত নিরপেক্ষ ও শীতল মস্তিষ্ক বিশ্লেষণে জগতের আসল সত্য ধরা পড়ার কোনো সম্ভাবনাই নেই। শ্রমিকের একপেশে ও জঙ্গি উপলব্ধিতেই বরং জগৎকে বোঝা সম্ভব। এবং বুঝে তাকে পরিবর্তিত করাও সম্ভব। মার্কসবাদ হচ্ছে শ্রমিক শ্রেণির মতবাদ। শ্রমিকশ্রেণির সঙ্গে নাট্যশালার সাযুজ্য ঘটাবার ব্রেখ্‌টীয় দাবি তাহলে শুধু একটা রণধ্বনি নয়, সেটা হচ্ছে জগৎ, মানুষ, সমাজ, উৎপাদন-সম্পর্ক

> সব বুঝবার একমাত্র পথ। সেটা হচ্ছে সত্যে পৌঁছুবার একমাত্র উপায়।"[৯]

উৎপল দত্ত শ্রমিক শ্রেণিকে তথা শ্রমিক আন্দোলনকে নাট্যাঙ্গনে নিয়ে এলেন। শ্রমিক শ্রেণির দুর্দশা, তাদের প্রতি শোষণ অত্যাচারের কাহিনি নিয়ে লিখলেন কালজয়ী নাটক 'অঙ্গার'। স্কুলে ও কলেজে পড়ার সময় বামপন্থী সম্পর্কে, কমিউনিজম সম্পর্কে যে পুথিগত শিক্ষা অর্জন করেছিলেন তা সরাসরি নাটকের মধ্যে প্রয়োগের মধ্য দিয়ে তার বাস্তবায়ন ঘটিয়ে ছিলেন, 'শ্রমিক শ্রেণিকে নাটকে আনয়ন'-এর মধ্যে দিয়ে। এ বিষয়ে উৎপল দত্তের স্পষ্ট বক্তব্য ছিল—

> "বাংলার পেশাদার নাট্যশালায় তখনো পর্যন্ত শ্রমিক শ্রেণি আসেনি, শ্রমিককে অচ্ছুৎ করে রাখা হয়েছিল পেশাদার থিয়েটারে, এমনকি গণনাট্য সংঘের নাটকগুলিও তখন আবর্তিত হচ্ছিল 'কিছু চাষীর কান্না বা মধ্যবিত্ত পরিবারের বিলাপের মধ্যে'।"[১০]

বিহারের ধানবাদ অঞ্চলে বড়াধেমো কয়লা খনির দুর্ঘটনাকে কেন্দ্র করে 'অঙ্গার' নাটকটি লেখা হয়। সেখানকার কয়লা খাদানে আগুন লেগে যাওয়া ও জল ঢুকে যাওয়ার ফলে খনি শ্রমিকদের মর্মান্তিক অবস্থা নিয়ে নাটকটি লিখিত হয়। উৎপল দত্ত ও তার কয়েকজন সহকর্মীরা বড়াধেমোয় গিয়ে বাস্তব অবস্থা দেখলেন, যেসব শ্রমিকরা বেঁচে ফিরেছিল তাদের সাক্ষাৎকার নিলেন, শ্রমিকদের বাস্তব জীবন ও তাদের শোষিত অবস্থার নির্মম অভিজ্ঞতাগুলি উপলব্ধি করলেন। নাটকটির শেষ দৃশ্যে কয়লাখনি গহ্বরে জল ঢুকে যাওয়া, স্রোতের সঙ্গে ডুবন্ত শ্রমিকদের প্রাণ বাঁচানোর মর্মান্তিক লড়াই বাংলা থিয়েটারের কিংবদন্তি হয়ে আছে, অমর হয়ে আছে শ্রমিক আন্দোলন ও তাদের বাঁচার লড়াই।

উৎপল দত্ত চেয়েছিলেন শ্রেণি-সংগ্রামকে নাটকে ব্যবহার করতে হবে। 'অঙ্গার' নাটকে শ্রমিক শ্রেণিকে মঞ্চে তুলে ধরলেন। এরপরে নাটক 'ফেরারী ফৌজ', যেখানে দেখা গেল বিপ্লবীদের কার্যকলাপ। 'তিতাস একটি নদীর নাম'-এর নাট্যরূপ দিলেন, সেখানে দেখা গেল শ্রমজীবী মানুষের জীবন সংগ্রাম ও বেঁচে থাকার লড়াই। এর থেকে স্পষ্ট হচ্ছিল উৎপল দত্তের শ্রেণি দৃষ্টি বা শ্রেণি সংগ্রাম একটি সুনির্দিষ্ট দিকেই অগ্রসর হচ্ছে। এই শ্রেণি সংগ্রামের পথ ধরেই ১৯৬৫ সালে এল কালজয়ী নাটক 'কল্লোল'।

উৎপল দত্ত মার্কসবাদী শিল্পীর শিল্প সৃষ্টির প্রক্রিয়াকে শ্রমিক শ্রেণির দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে অন্বিত করলেন। কমিউনিস্ট পার্টি যেহেতু শ্রমিক শ্রেণির পার্টি, তাই শ্রমিকের চেতনার জগৎ ও মানসিক জগৎকে জানতে ও বুঝতে গেলে পার্টির সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে চলা অতি আবশ্যকীয়। কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে যোগাযোগ রাখলে মার্কসবাদী শিল্পীর চেতনা আবিলতায় আচ্ছন্ন তো হয় না বরং শ্রমিকদের চেতনার জগৎকে বোঝা সম্ভব হয়। উৎপল দত্তের ভাষায়—

> "কোনো দলের নেতৃত্ব স্বীকার করলেই যে শিল্পী স্বাধীনতা হারিয়ে ফেলে তার স্বাধীন থাকারই কোন প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না। নির্দেশ কোনো পার্টিই দেয় না, দেয় রাজনৈতিক লাইন। সে লাইন সাংস্কৃতিক জগতে প্রয়োগ করার ভার নাট্যদলগুলির। সে-লাইন অনুসরণ না করলে শ্রেণি সংগ্রামে নাটককে শামিলই করা যাবে না।"[১১]

উৎপল দত্ত বিশ্বাস করতেন শ্রেণিবিভক্ত সমাজে শাসকশ্রেণির দ্বারা শোষিত মানুষের ওপরে নানা অত্যাচার ও দমন-পীড়ন, শ্রেণি হিংসা এক অনিবার্য সত্য। সারা বিশ্বে একই চিত্র। উৎপল দত্ত মনে করেন সব দেশের মতোই ভারতের ইতিহাস শ্রেণি সংগ্রামের ইতিহাস, অনবরত রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের ইতিহাস, যুগে যুগে শাসকের অত্যাচার, নিপীড়ন, নির্যাতন ও শোষিতের প্রতিরোধের ইতিহাস। তিনি মনে করতেন ভারতবর্ষের মানুষকে জানাতে হবে তাদের ইতিহাসকে, অত্যাচারিত-শোষিত-নিপীড়িত শ্রমিক শ্রেণির কাছে তুলে ধরতে হবে তাদের সংগ্রামী ঐতিহ্য। সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রামের প্রায় প্রতিটি অধ্যায়কেই তিনি মার্কসবাদের দৃষ্টিভঙ্গিতে তাঁর শিল্পকর্মে তুলে ধরেছেন। তাঁর নাটকে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলনের বিষয়গুলি একাধিকবার ফিরে এসেছে,— 'ফেরারী ফৌজ', 'কল্লোল', 'টোটা', 'তিতুমীর' প্রভৃতি। যাত্রার সংখ্যাটা আরও বেশি— 'রাইফেল', 'সন্ন্যাসীর তরবারি', 'কুঠার', 'জালিয়ানওয়ালাবাগ', 'নীলরক্ত', 'দিল্লী চলো', 'স্বাধীনতার ফাঁকি', 'বৈশাখী মেঘ' প্রভৃতি। কেননা তিনি মনে করতেন—

> "সশস্ত্র বিদ্রোহের দীর্ঘ ঐতিহ্যটাকে রক্ষা করতে হবে। কারণ আগামী বিপ্লবটা তারই পরিণতি, ফলশ্রুতি, উত্তরাধিকারী।"[১২]

নাটকে ও যাত্রাপালায় সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রামের ইতিহাস বারে বারে ফিরে আসা নিয়ে এক সাক্ষাৎকারে তাঁর কাছে জানতে চাওয়া হয়েছিল যে, "অতীত ইতিহাসের একটা Period নেওয়া এবং সেটাকে closely project করা"— এটা আপনাকে বারে বারে আকর্ষণ করে কেন? জবাবে উৎপল দত্ত বলেছিলেন—

> "মার্কসবাদী দৃষ্টিতে ইতিহাসকে না দেখলে মার্কসবাদী দৃষ্টিতে বর্তমানকেও দেখা যায় না। এটা আমরা বিশ্বাস করি, এবং নাটকের একটা অন্যতম প্রধান কাজ হচ্ছে অতীতকে সঠিকভাবে মার্কসবাদী আলোকে তুলে ধরা। কেননা, আগের সমস্ত বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানেরই ঐতিহ্য বহন করছে আজকের কমিউনিস্টরা। কমিউস্টিরা কোনও ভুঁইফোড় শক্তি নয়। তারা পৃথিবীতে যত বিপ্লব আগে হয়ে গেছে, সে সমস্ত ঐতিহ্যের তারা হচ্ছে উত্তরসূরী।"[১৩]

আন্তর্জাতিক নাটক ও পালাগুলিতে বিষয় হিসেবে চয়ন করেছেন বিভিন্ন দেশের শ্রেণি সংগ্রামের ইতিহাস। 'মে দিবস', 'রক্তাক্ত ইন্দোনেশিয়া', 'লেনিন কোথায়', 'স্তালিন', 'অজেয় ভিয়েতনাম', 'মানুষের অধিকারে', 'নীল সাদা লাল' প্রভৃতি

নাটকগুলির মধ্য দিয়ে উৎপল দত্ত ভারতবর্ষের নিরক্ষর শ্রমজীবী মানুষের কাছে পৃথিবীর শ্রমিক সংগ্রামের ইতিহাস পৌঁছে দেওয়ার জন্য সদা সর্বদা প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। রাজনৈতিক উদ্দেশ্য তাঁর প্রধান উপজীব্য বিষয়। ভারতবর্ষের শ্রমজীবী মানুষের যে সংগ্রাম, তা সারা পৃথিবীর শ্রমজীবী মানুষের সংগ্রামের অংশ। এই সত্য উৎপল দত্ত বারে বারে পৌঁছে দিতে চেয়েছেন এদেশের শ্রমিকের কাছে, যাতে তারা বুঝতে পারে যে, তারা বিচ্ছিন্ন নয়, তারা পৃথিবীর সমস্ত শ্রমিক শ্রেণির শরিক। তাদের দুঃখ, যন্ত্রণা ও কষ্ট বিচ্ছিন্ন নয়। তাদের দুঃখ-কষ্টের ভাগীদার পৃথিবীর সমস্ত শ্রমিক শ্রেণি। নাটক ও পালার মধ্য দিয়ে ভারতবর্ষের সর্বহারা শ্রমজীবী মানুষ এই বিশ্বাস অর্জন করবে যে, বিশ্বজুড়ে রয়েছে তাদের সহযোদ্ধারা। কারণ উৎপল দত্ত শ্রমিক আন্তর্জাতিকতায় বিশ্বাস করতেন। তাঁর ভাষায়—

> “আমরা শ্রমিকশ্রেণীর আন্তর্জাতিকতায় বিশ্বাস করি।... আমি ১৯১৭ সালের ভাষায় কথা কইছি— যখন লেনিন ছিলেন। যখন পৃথিবীর কোথাও কোনো শ্রমিকের ওপর আক্রমণ হলে সেটা সোভিয়েত দেশ নিজের ওপর আক্রমণ ব’লে মনে করতো।”[১৪]

উৎপল দত্তের কাছে নাট্য জগৎটা ছিল যুদ্ধক্ষেত্রের মতো, শ্রেণি সংগ্রামের রণক্ষেত্র। যেখানে তিনি বামপন্থী আদর্শে বিশ্বাসী একজন যোদ্ধা, শ্রেণি সংগ্রামের যোদ্ধা। উৎপল দত্তের নাটকে বারে বারে তিনি শ্রেণি সত্য বা ‘class truth’ বিষয়টি তুলে ধরতে চেয়েছেন। মঞ্চের ওপরে সারা জীবনে নাট্যচর্চার মাধ্যমে যে চূড়ান্ত লক্ষ্যে পৌঁছাতে চেয়েছেন তা হল— শ্রেণি সত্য। তিনি ‘শ্রেণি সত্য’ ধারণাটিকে তাঁরা থিয়েটারের দার্শনিক ভিত্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তাঁর সব শিল্পকর্মই সৃষ্টি হয়েছিল ‘শ্রেণি সত্য’-এর দৃষ্টিভঙ্গি থেকে। তিনি এক মুহূর্তের জন্য শ্রেণি সত্যের ঊর্ধ্বে কোনো বিমূর্ত সত্য, আধ্যাত্মিক সত্য বা শাশ্বত সত্য বিশ্বাস করতেন না। তাঁর মতে—

> “সত্য সর্বসময়ে শ্রেণি সত্য— ক্লাস ট্রুথ। হয় আপনি এ-শ্রেণীর সত্য বলবেন, না-হয় ও-শ্রেণীর সত্য। হয় আমরা কৃষকের পক্ষে কথা কইব, নইলে জোতদারের। হয় শ্রমিকের সত্য উচ্চারণ করবো, নইলে মালিকের। মাঝামাঝির দালালি তো সত্যর ক্ষেত্রে খাটে না। রাজনৈতিক নাটকের অবলম্বনই শ্রেণি সত্য।”[১৫]

‘রাজনৈতিক নাটক, একটি কলহ’ প্রবন্ধে তিনি দেখিয়েছেন কীভাবে রাজনৈতিক নাটককে বাস্তবের তথ্য থেকে শ্রেণি সত্যে উপনীত করতে হয়।

> “ ‘মালো পাড়ার মা’ নাটকের ‘অখ্যাত মালো পাড়াকে নিকারাগুয়া, এল সালভদরের সঙ্গে যুক্ত করে দেয়’।”[১৬]

উৎপল দত্তের নাটক ছিল শ্রমিক শ্রেণির দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সৃষ্ট বিপ্লবী নাটক। তাঁর মতে একমাত্র শ্রমিকের দৃষ্টিভঙ্গি অর্জন করলেই তবেই মার্কসবাদী শিল্পচিন্তার মর্মবস্তুকে হৃদয়াঙ্গম করা সম্ভব। তাঁর শিল্পকার্যে মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গির মূল নীতিগুলি

সফলভাবে প্রয়োগ করেছিলেন। মার্কসবাদ সম্পর্কে প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ও রাজনৈতিক মতাদর্শের প্রতি অবিচল দায়বদ্ধতা ছিল তাঁর শক্তির উৎস। নিজের রাজনৈতিক প্রজ্ঞায় তিনি হয়ে উঠেছিলেন এক স্বাধীনচেতা ও স্বনির্ভর মার্কসবাদী বুদ্ধিজীবী। তিনি বলতেন—

> "আমি প্রোগাগান্ডা করে বেড়াই আমার আদর্শকে, আমার কমিউনিজমকে। আমার নাটকের মাধ্যমে, বক্তৃতার মাধ্যমে আমি আমার আদর্শকে প্রচার করে যেতে চাই। এটাই আমার ধর্ম।"[১৭]

—একথাগুলি সার্থক ও যুক্তিযুক্ত।

উৎস নির্দেশ :

১. উৎপল দত্ত, সাক্ষাৎকার, 'অনুষ্টুপ' পত্রিকা, গ্রীষ্ম সংখ্যা, ১৩৯০ বঙ্গাব্দ, পৃ ২৩

২. উৎপল দত্ত, 'লিট্‌ল থিয়েটার ও আমি', 'এপিক থিয়েটার', মার্চ, ১৯৯৪, পৃ ৬৫

৩. Utpal Dutta, "Political Theatre", 'Towards A Revolutionary Theatre', M. C. Sarkar & Sons Pvt. Ltd., 1995, P. 34

৪. পূর্বোক্ত, 'লিট্‌ল থিয়েটার ও আমি', পৃ ৪৭

৫. শোভা সেন, 'ব্যারিকেডে দাঁড়িয়ে তুমি আর আমি', 'উৎপল দত্ত এক সামগ্রিক অবলোকন', সম্পা : নৃপেন্দ্র সাহা, উৎপল দত্ত নাট্যোৎসব ২০০৫ কমিটি, ৭ নভেম্বর ২০০৫, পৃ ১৩৩

৬. উৎপল দত্ত, সমীক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎকার, 'শুদ্রক', 'শরৎ' ১৪০০, পৃ ১২৫

৭. তদেব, পৃ ১২৫

৮. পূর্বোক্ত, 'লিট্‌ল থিয়েটার ও আমি', পৃ ৫৩

৯. উৎপল দত্ত, 'ব্রেখ্‌ট্‌ ও মার্কসবাদ', 'স্তানিস্‌লাভ্‌স্কি থেকে ব্রেখ্‌ট্‌', উৎপল দত্ত, গদ্য সংগ্রহ (প্রথম খণ্ড), সম্পা : সমীক বন্দ্যোপাধ্যায়, দে'জ পাবলিশিং, জানুয়ারি ১৯৯৮, পৃ ২৮৫

১০. পূর্বোক্ত, 'লিট্‌ল থিয়েটার ও আমি', 'এপিক থিয়েটার, মার্চ ১৯৯৪, পৃ ৫৪

১১. উৎপল দত্ত, 'রাজনৈতিক নাটক, একটি কলহ', 'জপেন দা জপেন যা', উৎপল দত্ত গদ্য সংগ্রহ (প্রথম খণ্ড), পৃ ২৩১

১২. উৎপল দত্ত, 'শিকড়', 'জপেন দা জপেন যা', উৎপল দত্ত গদ্য সংগ্রহ (প্রথম খণ্ড), পৃ ১৮৩

১৩. উৎপল দত্ত, সমীক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎকার, ‘শূদ্রক’, শরৎ, ১৪০০, পৃ ১৪৫

১৪. উৎপল দত্ত, সাক্ষাৎকার, ‘দেশ’, ৩০ মার্চ, ১৯৯১, পৃ ৪৪

১৫. পূর্বোক্ত, উৎপল দত্ত, ‘রাজনৈতিক নাটক, একটি কলহ’, পৃ ২২৯

১৬. তদেব, পৃ ২৩১

১৭. পূর্বোক্ত, ‘ব্যারিকেডে দাঁড়িয়ে তুমি আর আমি’, পৃ ১৩৩

সুব্রতা ঘোষ রায়ের কবিতা ঃ ‘জল যেন কবিতা’ স্বগতোক্তির বহিঃপ্রকাশ

দেবাশিস ঘোষ
স্যাক্ট-১, বাংলা বিভাগ, উলুবেড়িয়া কলেজ

উদার আকাশ প্রকাশনা থেকে প্রকাশিত ১৫ এপ্রিল ২০২১ সুব্রতা ঘোষ রায়ের কাব্যগ্রন্থ --‘জল যেন কবিতা’ যেন স্বগতোক্তির বহিঃপ্রকাশ স্বগতোক্তির ভাষণ! যাঁরা এখনও কবির সঙ্গে পরিচিত হয়ে ওঠার সুযোগ পান নি তাঁদের জন্য এখানে আগে একটু কবি-পরিচিতি দিয়ে নেওয়ার প্রয়োজনীতার উপলব্ধি করলাম।

সুব্রতা ঘোষ রা ‘কবিতার জগতে প্রথম আত্মপ্রকাশ করেন ২০০৫ সালে সুধীর চক্রবর্তী সম্পাদিত ধ্রুবপ্রদ পত্রিকার নারীবিশ্ব সংখ্যায়। তাঁর ‘গৃহবধূর পাঁচালী’ মনোযোগী পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষন করে প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই। পরে এই রচনাটি গ্রন্থাকারে ‘‘গৃহবধূর কাব্য’’ নামে প্রকাশ করেন ‘প্রতিভাস’। কবিতার সঙ্গে সঙ্গে সুব্রতা নিয়মিত লিখতে থাকেন ছোটগল্প। প্রবন্ধ এবং বিভিন্ন দৈনকি পত্রিকায় সমাজ ও রাজনীতি বিষয়ে উত্তর - সম্পাদকীয় সিঙ্গুর জমি আন্দোলনের পটভূমিকায় তাঁর আত্মকথনমূলক রচনা ‘সিঙ্গুরের মেঘ ও ব্যর্থ কবিতা’ প্রকাশিত হয় ২০০৮ সালে। এই সময়ের তাঁর প্রতিবাদী রচনাগুলি দিনবদলের অন্যতম হাতিয়ার হয়ে ওঠে।

আজকাল, প্রাত্যহিক খবর, দৈনিক স্টেটসম্যান প্রতিদিন, বর্তমান ইত্যাদি পত্রিকায় প্রকাশিত বিভিন্ন স্বাদের নিবন্ধ নিয়ে বুকস ওয়ে থেকে ২০১২ তে বেরিয়েছে সুব্রতার বই ‘হা পুরুষ বাহ্ নারী’। উগ্র নারীবাদের বিপরীতে দাঁড়িয়ে সমাজে নারী পুরুষের সহাবস্থান ও সমানাবস্থানের পক্ষে সুব্রতা তাঁর লেখায় জোরালো সওয়াল করেন। তাঁর অন্যান্য দৃষ্টিভঙ্গি পাঠক সাধারণে সমাদর লাভ করেছে। নিবন্ধের তুলনায় কম হলেও সুব্রতা নিয়মিত গল্প কবিতা লিখে চলেছেন। তাঁর লেখা ছড়িয়ে আছে ধ্রুবপদ, অনুষ্টুপ, অমৃতলোক, আজকাল, ভাষাবন্ধন, কবিসম্মেলন, কবিতা প্রতিমাসে, বিজল্প, ধারাবাহিক, সোনালী দুঃখ একদিন ইত্যাদি নানা পত্রপত্রিকায়।’

কবি সুব্রতার কথায় ---‘‘নিজের সঙ্গে নিজের কথা বলা কবিতা । প্রকৃতির সঙ্গে কথা বলা কবিতা । সময়ে সঙ্গে কথা বলা --কবিতা। অতীতের সঙ্গে কথা বলা কবিতা। ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে কবিতা। প্রেম, বিরহে কবিতা। রাগে, দুঃখে, প্রতিবাদে--কবিতা। ব্যক্তিগত জীবন - কবিতা। সমষ্টিগত জনীবন -- কবিতা সামাজিক যাপন - কবিতা। রাষ্ট্রীয় টানা পোড়েন - কবিতা। অপত্যস্নেহ কবিতা। পরম্পরায় আস্থা - কবিতা। বয়ে চলায়

কবিতা। সংঘাতে কবিতা। ঘুরে দাঁড়ানোয় -- কবিতা জেগে ওঠায় - কবিতা। স্বপ্নে কবিতা। লতায়, পাতায়, শেকড়ে, সাত রঙে - কবিতা। পাহাড় গিরিখাত, পাকদন্ডী জল। জঙ্গল, সমতল, মোহনা, মালভূমি, মরুভূমি সবত্র -- কবিতা। কে লেখে কবিতা? হয়তো কবিতাই কবিতাকে লিখিয়ে নেয়। কবির কিছু নির্বাচিত নরম মনকেমনের কবিতারা এই দুই মলাটকে বেছে নিল চলতে চলতে -- ৮০ টি কবিতায় গ্রথিত ''জল যেন কবিতা'' কাব্যগ্রন্থটি পাঠকের সঙ্গে মিলেমিশে কবির স্বগতোক্তি ভাষণ হয়ে ওঠে-- পাঠকেরই কথা।

বিভিন্ন ভাব-ভাবনার কথা বিভিন্ন কবিতার মধ্যে আশ্চর্য সুচারুভাবে কবি তাঁর বক্তব্যকে পেশ করেছেন। কাব্যগ্রন্থের প্রথম কবিতা-- 'জীবন' কবিতায় কবিসুব্রতার উপলব্ধি--

''দু-দিনের পালাগান, মুর্ছনায় আলো-হাওয়াজল বয়ে যাক- বয়ে যাক.. এটুকুই থাকুক সম্বল...''

'আমাদের জীবনে সময় কোথা দিয়ে বয়ে চলে যায়। তার নিজস্ব নিয়মে। কে কাকে সময় দেবার ? কবি কণ্ঠ আকুল জিজ্ঞাসায় প্রশ্ন রেখে যান- 'কোন নদীতে ভাসল তরী, কোনখানে দাঁড়, পাল বা কোথায় নিরুদ্দেশে চলছে তরী, এই তো সময়, এই তো সময়..

সময় চাইলে আমার কাছে...আমি কে আর সময় দের?

সময় তোমার মনের মধ্যে, একটু চাওয়া, একটু পাওয়ার-।''

এ যেন পাঠকেরও সূক্ষ্ম অনুভূতি! সময় এমনই সংরূপ যদি দুটি হৃদয় মনে করে পরস্পরকে সময় দেবে তাহলে শত ব্যস্ততার মাঝে ও সময় বের করে নেওয়া যায়।

কবির প্রেমের কবিতাগুলির মধ্যে ''একটি নিছক প্রেমের চিঠি''ঃ-

''শব্দ কাটাকুটি আর পৃষ্ঠা হয় দলা, কথা শুনে মনে থাকে হয় না তো বলা।

ভেবেছি আমার কথা বলে দেবে তুমি, এই ভেবে দিন গেছে অপেক্ষাতে আমি।''

'একটু মৌন'-- কবিতায় কবির মূল্যায়ণ জীবন কখনো হিসেবের গতে চলে না—

''আমার আগুনে পুড়তে চেয়েছো তুমি,
তবু কেন জানি কোথা থেকে ফোটে ফুল,
যোগ ভাগ গুণ সব খেয়ে বসে আছি,
হিসেব কী করে হয়ে যাবে নির্ভুল?'

' গান' কবিতায় প্রেমাসম্পদের জীবনের কথা শুনতে কবির অধীর আগ্রহঃ—

''তুমি কি চিনেছ? আমি কি চিনি তোমাকে?
চেনা অচেনার শব্দ ছন্দ সুর......
কোন জাদুবলে গান হয় ভরপুর.....
গেয়ে ওঠ গান, যত থাক আজ ব্যথা....

বল তুমি বল, শোনাও তোমার কথা.... ।”

'মন' কবিতায় কবির স্বগতোক্তিঃ-

'ভালোবেসে মনও ডোবে গভীরে, অতলে...'।

'অতিথি' কবিতায় কবি কবিতা ও প্রেমাসম্পদকে স্বপ্নে পরিপূরক হিসেবে দেখেছেন--

“কাল রাতে তুমি যখন এসেছিলে
কবিতা ও এসেছিল
আমি তোমাকে ছুঁয়ে ছিলাম।
কবিতাকে ছুঁই নি।
কবিতা চলে গেল।
আজ রাতে তুমি এসো কিন্তু-
দেখি কবিতাও আসে কিনা,
ও এলে....
ওকে বলবো,
থাকো।।”

এ যেন কবির সঙ্গে প্রেমিক কবিতার মান-অভিমানের পালা!

'প্রথম বাড়াবাড়ি ' কবিতাটিতে দয়িতকে কবি প্রেমিকা শিল্পিত রূপে দেখেছেন। পূর্বরাগ, অনুরাগ, প্রণয়ের গভীরতার মন্থনে জাল বিছানো--

“তোমার সঙ্গে চোখে চোখে কথা-
তোমার সঙ্গে চোখে চোখে আড়ি,
তুমি আমার প্রথম গোপন প্রেম,
তুমি আমার প্রথম বাড়াবাড়ি!”

তার পর সেই দায়িতই হয়ে ওঠেন প্রণয়নীর কাছে গীতিকাব্যিক ২৫শে বৈশাখঃ-

“তুমিই আর প্রথম ছবির মালা-
তুমিই আমার আগুন, হৃদয় খাঁক...
তুমি আমার ছয়ছয়টি ঋতু,
তুমিই আমার ২৫শে বৈশাখ।।”

'চিলেকোঠা'--এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে কত গল্প কথা, রূপকথা, মেঘ বৃষ্টির খেলা আবার 'মনখারাপের তপ্ত প্রহর বেলা।'

“তপ্তদিনে চিলেকোঠা বৃষ্টি নামে মেয়ে--
আনমনা কেউ আসবে যদি প্রহর থাকে চেয়ে-
আসবে বলে চলে গেছে দিন আসে দিন যায়--

অপেক্ষারা জমতে থাকে ঘরে থাকাই দায়--
চিলেকোঠা তেমনি আছে, পাক ধরেছে কেশে।
কোন কিশোরী তবুও মরে যুবক ভালবেসে?"
'স্বামী স্ত্রী (বি) সংবাদ' কবিতায় কবি সুব্রতা হয়ে ওঠেন কৃষ্ণের রাধিকা—
''আমিই তোমার শ্রীরাধিকা,
তুমি আমার প্রেমাস্পদ!"

'তবু প্রেম' কবিতায় কবি জীবনের বিভিন্ন বয়সের সন্ধিক্ষণের প্রেমের অসাধারণ চিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন। বাল্য কৈশোর দুর্বার দুরন্ত সময়ের প্রেম, পরিণত প্রেম, অবৈধ প্রেম, পুরোনো প্রেম আর অন্তিম বয়সের প্রেমের স্বরূপগুলি সজীব হয়ে উঠেছে কবির কলমের তুলির আঁচড়ে।

''শেষ বেলাকার প্রেম গড়ে বালিঘর..সন্ধেবেলায় সমুদ্রতটে এসে....
কিছুখন পর সূর্য অস্তাচল...রক্তিমরাগে অন্তিম হাসি হেসে!'
'ধাবমান' কবিতাটি শাশ্বত জীবন বন্ধনেরই ।
জয় গাঁথার প্রকাশ-- ''চলেছি আমরা, ধানক্ষেতে আসে পাক
হলদে, সোনালী মন জুড়ে দোল আসে,
আমাদেরই পথে জীবন চলেছে ব'য়ে-
তোমার আমার ধারাপাতে বারোমাসে।"

'সোনালী মন জুড়ে দোল আসে'-এত জীবনের অনুধ্যান জীবনের অস্তিত্ব আর প্রেম পরস্পরের পরিপূরক। প্রেমকে ঘিরেই যাপিত জীবন কেন্দ্রীক সব কিছু আবর্তিত হয়। কবি সুব্রতা ঘোষ রায় প্রেমের সদর্থক লক্ষণগুলি হৃদয়ের গভীরের অতল স্পর্শ করে উপলব্ধি করেছেন এবং তার কাব্যিক রূপায়ন করেছেন নিপুন ভাবে, 'এবার তাকানো যাক কবির প্রকৃতি ভাবনার দিকে- ''নিসর্গ" কবিতায় নিসর্গ প্রকৃতির অসাধারণ চিত্র এঁকেছেন কবি। ঋতু অনুযায়ী পরিযায়ী পাখির ঠিকানা বদলের অবস্থান, বিচিত্র রঙে যেন প্রকৃতির ছবি আঁকা, হটাৎ হাওয়ায় ভেসে আসা ধন যেন উড়ে চলে যায় হাওয়ায় হাওয়ায়। বিশ্বপ্রকৃতির রূপে মুগ্ধ কবি বলে

ওঠেন--''নিসর্গ থাকে,
বে-রঙিন রঙ নিয়ে,
পৃথিবী ও বিচিত্র মহাশূণ্যতায়!"

প্রকৃতি কেন্দ্রীক কবিতাগুলির মধ্যে 'ইচ্ছামতির গল্প' এবং 'নকশীকাঁথা' বেশ আকর্ষনীয়।

'ইছামতির গল্প' কবিতায় কবি গল্প শোনান--

''সম্বল জোনাকির আলো, / টিমটিমে, কখনো তা জলে/ অভিমানী দেখে যায় খেলা, জেনো কি কে নিয়ে, দিশেহারা ! দিনের .. রাতের কবিতারা ঝাঁপ দেয় ইছামতি ঘাটে../ কথা কবিতারা বয়ে যায় ... বয়ে যায় ইছামতি - ধারা../ অলস বিকেল থেমে যায়, তারও কাজ হয়ে গেছে সারা।''

কবি কথায় ইছামতী নদী যেমন বয়ে, সমস্ত কাজ চুকিয়ে অলস বিকেল যখন স্তব্ধ হয়ে থাকে, সন্ধা হতে চলেছে জোনাকির আলো জানান দেয় এমন সন্ধিক্ষণে যেন দিন রাতের কবিতারা ঝাঁপ দেয় ইছামতি ঘাটে.. অর্থাৎ এই ইছামতি নদীকে কেন্দ্র করেই বাংলা সাহিত্যে উঠেছে কত কবিতা গল্প - উপন্যাস !

'নকশীকাঁথা' কবিতাটিও জীবনের ভাঙা গড়ার 'অনবদ্য চিত্রনাট্য হয়ে উঠেছে--

''তুচ্ছ গল্প কথন হয়ে ওঠে গাথা--
কান্না হাসির সময় পেরিয়ে মন--
শুধু বুনে যায় জীবন--নকশীকাঁথা !
শুধু বুনে যায় জীবন - নকশীকাঁথা !

'বিবর্ণ ক্যানভাস' কবিতাটিতে কবি সুন্দর চিত্রকল্প দক্ষতার সঙ্গে এঁকেছেন--

''শঙ্খ চিলের দু ডানায় সাত রঙ-
পৌঁছে যাবেই সব পেয়েছির দেশে ?
পথিকের কথা ছবি হবে ক্যানভাসে--
এভাবেই নদী সাগরের জলে মেশে।''

'বৃষ্টি', 'টাপুর টুপুর', 'ধারাপাত-' কবিতাগুলি যেন 'বর্ষার ঋতুর আখ্যান কাব্য ।

'বৃষ্টি' কবিতার ধ্বনি মাধুর্য খুবই শ্রুতিমধুর।

অনুপ্রাস অলংকারের প্রয়োগের মাধ্যমে ঝঙ্কার তুলেছেন কবি--

''বৃষ্টি বৃষ্টি অঝোর বৃষ্টি কেবল বৃষ্টি পড়ে
বৃষ্টি বৃষ্টি ঝরে বৃষ্টি বছর বছর ধরে
ঋতু কেবল বর্ষা ঋতু নেই অন্যের স্থান
শুরু হয়ে যায় গাছ ও পাখির নতুন আখ্যান.... ।''

'টাপুর-টুপুর' কবিতায় --''বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর...

পথে এলো বান, পুরানো সেই দিনের কথা অতীত কোন গান, / কলকাতে বৃষ্টি পড়ে, সিনেমা চলে হলে কমল হাসান অন্ধকারে দেশের কথা বলে...ঘুষ নিও না, ঘুষ দিও না 'হিন্দুস্থানী মুভি'-- সিনেমা শেষে বাইরে এসে কলকাতার ছবি/একলা বসে বন্ধ ঘরে, নেই আলো, বাইরে তবু বৃষ্টি পড়ে, আজও দিনটি ভালো। বৃষ্টি আসে, বৃষ্টি যে যায়...টাপুর টুপুর দিন... হৃদমাঝারে সেই থেকে যায় বৃষ্টি দিনের ঋণ... ।'' সম্পূর্ণ গদ্যছন্দের প্রয়োগে

বৃষ্টির দিনে রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা কবি সুব্রতা ঘোষ রায় পাঠকের সঙ্গে ভাগ করে নিয়েছেন এ যেন সব পাঠকেরই হৃদয় অনুরনণ।

'চিল্কা জলে' কবিতাটিও প্রকৃতি কেন্দ্রিক মানব জীবন উপাখ্যান-- এক মাঝি এক জল, ছল ছল চলছে/ যাত্রীরা সাতজন, জল কথা বলছে../ আরো নাও, আরো নাও, লোক নয় অল্প ! চিল্কার জল তার নিয়ে নেয় গল্প../হাতে তার ক্যামেরা, কল্পনা চোখে তার/ ডলফিন, ডলফিন আসে বুঝি এইবার ! চুপ করে বসে কেউ, ছোট ঢেউ বয়ে যায় ! মনে মনে কথা তার চিল্কায় বলে যায়..। চিল্কা হ্রদের জলে আমরাই যাত্রী.. আমাদের দিন আর আমাদের রাত্রি -- দিন আর রাত্রির কথা নিয়ে তরী যায়-- আমাদের পথ চলা শেষ হবে' মোহনায়..।'

গদ্যছন্দে ও যে কবি সুব্রতা ঘোষ রায় পারঙ্গম তা বোদ্ধা মননশীল পাঠকের বুঝে নিতে অসুবিধে হয় না। এ যেন কবি গদ্যছন্দে জীবনের গল্প কথা কাব্য করে বলে চলেছেন।

''প্রেম আর প্রকৃতি সব কবিরই সাধারণ অধ্যায়। কবি সুব্রতা ঘোষ রায় ও তার ব্যতিক্রম নন। কিন্তু তিনি অবশ্যই ব্যতিক্রমী তাঁর নিজস্ব সত্তা মৌলিক অবস্থানে। প্রকৃতিই যেন জীবন্ত মানুষের প্রতিনধি হয়ে ওঠে তাঁর কবিতায়, প্রকৃতির সঙ্গে অনায়সেই কথা বলে চলা যায় --।

''বসন্ত এসেছিল পলাশের ডালে,
আনমনা মেয়ে তার
কোন ব্যথা নিয়ে-
কাঁদে আড়ালে আড়ালে...
যাওয়া আসা স্রোতে ভাসা-
তবু কিছু কথা তোলা থাকে...
বসন্ত চলে যায়, পলাশের কাছে তার
মনের গোপন গান জমা দিয়ে রাখে...

আবার ''দ্রবণ'' কবিতায় কবি চাঁদনী রাত, জোৎস্না, জলের ধারা, বসুন্ধরা, নীল আকাশ, নিকষকালো আকাশ, বিশ্বপ্রকৃতির এই সকল অঙ্গের সঙ্গে দ্রবনের মধ্যে মিশে যান স্বচ্ছ ফটিকের মত।

কবি কণ্ঠে শোনা যায়--

মনের কথা চাঁদের কাছে--
লিখে রাখলাম.../চাঁদ ডুবল
সকালবেলা, কাব্যি ডোবে ডোরে... /ভালোবাসার গপ্পো
ডোবে / কালের বৈভবে..।''

নানা স্বাদের কবিতায় কবি সুব্রতা ঘোষ রায়ের কাব্যগ্রন্থটি ভরপুর।

জাত পাতে- শ্রেণী বৈষম্য তাঁকে বেদনার্ত করেছে। অন্ত্যজ, অস্পৃশ্য বালকবেলার বুদ্ধিনাশে কোন এক যুবক প্রেমে পড়েছিল উচ্চবর্ণের তরুনীর সাথে। সময়ের সাথে সাথে সব সুর ভ্রষ্ট, তাল-লয় ভুল হয়ে যায়, তুচ্ছ হয় সেদিনের স্মৃতি, ক্ষত সৃষ্টি হয়।

কবির খেদোক্তি--

‘‘অস্পৃশ্য পাড়ায় বসবাস, উচ্চবর্গ অন্যদিকে থাকে
কথা হয়েছিল, - একদিন, আজকে বা তাকে ধরে রাখে
বালক বেলার বুদ্ধিনাশ ! কে যবন মুচি ডোম-হাড়ি !
চোখ জুড়ে প্রেম -সম্ভাষন, আমি ও জলে নামতে পারি
ক্ষয়ে যাওয়া মনে বসবাস, অস্পৃশ্য পাড়ায় বসতি,
ছিন্ন পত্র তরনী সাজাই... একা খেলা, পোহাইবে রাতি !’’

আবার মায়ের স্নিগ্ধ মমতাতেই যে মায়ের কোলেই শৈশব থেকে শুরু হয় আমাদের জীবনের চলা, অ অ ক খ পাঠ, মায়ের হাতে মেপে দেওয়া ভাত, মায়ের শাসন, মায়ের আদর, জ্বরের শেষে কপালে মাথায় মায়ের হাত বুলিয়ে দেওয়া, মায়ের কাছেই জীবনভর ভুলের হিসেব জমা, মায়ের কাছেই ক্ষমা - এসবই মাকে ঘিরে কবির হৃদয় আর্দ্র হয় ওঠে।

‘মা’ কবিতাটি হয়ে ওঠে বিশ্বজনীন রূপ।

‘‘মায়ের সঙ্গে জুড়ে থাকা, / মায়ের কোলেই সব / এসব
করেই ঠিক চলে যায় / আমাদের শৈশব...।/...
বিশ্বজুড়ে মন্দ ভাল .../কুমাতা বিরল, / মায়ের
ছায়ায় মায়ায় / চলে জীবন, চলাচল ...।/
নাড়ির টানে মায়ের কাছেই .../ বারে বারে আসি,
মনে মনে আমরা / মা কেই সবচে ...ভালোবাসি।’’ নিজের ভাষা প্রতিটি মানুষের মজ্জায় মজ্জায়। কবিও নিজের মাতৃভাষা ‘বাংলা’ কে নিয়ে গর্ববোধ করেন। এবং এই ভাষাতেই আমরা বাঙালিরা সমৃদ্ধ তা কবির বয়ানে উজ্জ্বল রূপে প্রতিভাসিত হয়ে উঠেছে।

‘‘চোখ মেলেছি বাংলা ভাষায় / মন দিয়েছি বাংলায়,/
বাংলা ভাষায় ডাকছে পাখি-/আমার ছোটজানলায়।/
বাংলাভাষায় হাঁটি হাঁটি / বাংলা ভাষায় ছুটতে শেখা /-
এরই মধ্যে কখন যেন / বাংলা ভাষায় পদ্য- লেখা / বাংলা/
ভাষায় প্রেম নিবেদন / এপার ওপার পদ্মানদী / মাঝির
ভাষা বাংলা জানি, / বাংলা আমার ভাটিয়ালি / লালন
লেখেন বাংলা গান / আমার গর্ব বাংলা ভাষা / বাংলা আমার

নীল আসমান, / মেশে যখন সাগর নীলে / বাংলা আমার
দিগন্ত / বাংলা আমার প্রকৃতিতে / আদি এবং অনন্ত !/
মরণ বাঁচন বাংলা জানি / আস্থা আমার বদ্ধমূল, /
বাংলা ভাষায় প্রতিবাদে / আশায় বাঁচি শ্রমিক চাষা/
মুঠোয় এবং উচ্চারণে / অদ্বিতীয় বাংলা ভাষা !"

'নিও নর্মালে ' কবিতাটিতে অতিমারীতে জনজীবনের স্তব্ধতার ছবি ফুটে উঠেছে-

''বজবজ, লক্ষ্মী, ক্যানিং
লিলুয়া, শ্রীরামপুর, হাবড়া বা বনগাঁ লোকালে..
প্রতিদিন প্রতিক্ষণে কত কত গল্পরা
ডুব দিত সন্ধ্যা সকালে !
মহামারী, অতিমারী ছন্দপতন হয়ে গেল !
কাছে যে মানুষ ছিল,
নতুন নিয়মে যেন কত দূর,
দূরে চলে গেল !
শ্বাস প্রশ্বাসে সন্দেহ, সন্দেহ সুখে ও অসুখে
পথ হেঁটে কারা ফেরে বাড়ি ?
কাজ হারিয়েছে কারা
সেই কথা লেখা আছে কোন ফেসবুকে?'
ভাবনায় রাত জেগে--
মেয়েটি কাব্য লেখে নিও নর্মালে !!"

ভালো লাগে কবির 'বিষাদের দিনলিপি,' 'ত্রিনয়ন', 'আদিম, 'বিষন্ন রূপকথা', 'আগমনী', '৬ এপ্রিল,' 'অচেনার দেশ', 'ঋণ' 'শব্দকল্পদ্রুম,' 'বিষন্ন বিজয়া', 'কাঞ্চনজঙ্ঘা, 'বদল', ইত্যাদি নানা ভাব - বিষয় অবলম্বনের কবিতাগুলি।

নির্দিষ্ট শব্দ সীমার পথে আবদ্ধ হাত পা বাঁধা লেখককে এবার তাই আলোচ্য প্রবন্ধের পরিশেষ টানতেই হচ্ছে। কবি সুব্রতা ঘোষ রায়ের ''জল যেন কবিতা" কাব্যগ্রন্থটি কবির সুচিন্তিত ভাবনার ফসল।

জলের দিকে তাকালেই তো হৃদয় নেচে ওঠে কাব্যময় ছন্দে! কবি সুব্রতা ঘোষ রায় এর 'নদী" কথা দিয়ে উপসংহার শেষ করবো ''জল যেন কবিতা" কাব্যগ্রন্থের ঃ-

''চোখ বন্ধ করলেই দেখা যায় কেমন এক হলদে সবুজ মাঠ, কিছু ঘাসে হলদে ভাব, কিছু কিছু জায়গায় পিঁপড়ে ছোট ছোট গর্ত করে গোল গেলি গুঁড়ি গুঁড়ি মাটি তুলে রেখেছে, মাঠ যেখানে আকাশে মিলেছে। ধূলিকণা আস্তে আস্তে আলোক মেখে নিয়ে দিনকে ফুটিয়ে

যেই না 'তুলেছে, ওমনি কোথা থেকে এক এক তিরতিরে নদী বেঁকে যেন সামনে চলে এসে মেয়েকে বলল- ভাসবি ??

মেয়ে হঠাৎ নদীকে দেখে হতবাক। নদীর কথায় নদীকে বলে আমি কী করে ভাসব? আমি তো সাঁতার জানি না, ভাসব কি? ডুবে যাব যে ...বলতে বলতে দূরের হাওয়া নদীতে নিয়ে এসেছে এক বজরা। মাঝি মেয়েকে বলে, ভাসতে গেলেই ভাসা যায়, সাঁতার না জানলে ভাসা কি বন্ধ হয়? ওঠো বজরায়, নৌকো বিহার হবে। মেয়ের বজরায় উঠতে গিয়ে মনে হল, ঘরের দোর না দিয়েই চলে এসেছে যে! কবিতার খাতা ও খোলা। আস্তে আস্তে মেয়ে ঘরে এসে দেখে কবিতার খাতার পাতায় যেন এক অবিকল নদী। ভাসিয়ে দিচ্ছে কবিতার পৃষ্ঠাগুলো ... ।"

কবি সুব্রতা ঘোষ রায় ও তাঁর কাব্যগ্রন্থ ''জল যেন কবিতা" যথার্থ অর্থেই- সমোচ্চারিত নাম হয়ে উঠেছে।

তথ্যসূত্র ঃ

সুব্রতা ঘোষ রায়, 'জল যেন কবিতা', প্রকাশক- ফারুক আহমেদ, উদার আকাশ, ঘটকপুকুর, ডাক ভাঙর, গোবিন্দপুর - ৭৪৩৫০২, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ।

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় ঃ অনন্য মনীষা, শিক্ষাদান ও বিজ্ঞান সাধনা

মনোজ কুমার পাত্র
প্রধান শিক্ষক,
দক্ষিণেশ্বর আদ্যাপীঠ অন্নদা বিদ্যামন্দির (উঃ মাঃ)

সংক্ষিপ্তসার ঃ রসায়ন শিক্ষায় শৈলশিখরে প্রদীপ্যমান ও ভাস্বর রসায়নবিদ্ হয়ে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় লিখেছেন-'আমি রসায়নবিদ্ হয়েছি নেহাতই ভুলবশত। আমার অনুরাগ ছিল ইতিহাস, জীবনী সাহিত্য ও সাধারণ সাহিত্যে'। মাত্র দশ বছর বয়সে গ্রিক ও ল্যাটিন ভাষা শেখেন তিনি। মাত্র সাতাশ বছর বয়সে তিনি D.Sc. ডিগ্রী অর্জন করেন। ১৮৮৮ সালে দেশে ফিরে দেশবাসীর দুরবস্থা দেখে তিনি বিচলিত হন এবং ইউরোপীয় পোশাক ছেড়ে তিনি ধরলেন খদ্দর আর ভারতের বুকে শিল্প প্রতিষ্ঠার ভাবনা তাঁর মাথায় নিয়ে এলেন - ফলে আমরা পেলাম রসায়ন জগতে তাঁর সবচেয়ে বড় অবদান-'বেঙ্গল কেমিক্যাল এন্ড ফার্মাসিটিক্যাল ওয়ার্কস্'। ১৮৮৯ সালের জুন মাসে প্রফুল্লচন্দ্র প্রেসিডেন্সি কলেজের রসায়ন বিভাগে যোগ দেন এবং ১৯১৬ সালে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে অবসর নেওয়ার পর Calcutta University College of Science-এ পালিত অধ্যাপক হিসাবে যোগ দেন। সরল ইংরেজিতেই বক্তৃতা। বাগ্মিতার কোনও চেষ্টা ছিল না। বরং নানা কথা বলে হাসি ঠাট্টার মধ্য দিয়ে ড: রায় চাইতেন রসায়নের মূলকথা যাতে ছাত্রদের মনে গেঁথে যায়। বেঙ্গল কেমিক্যাল প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে প্রফুল্লচন্দ্র একদিকে যেমন ভারতীয়দের শিখিয়েছিলেন কি করে বিজ্ঞানের ব্যবহারিক প্রয়োগের মাধ্যমে সমাজের বিপুল সংখ্যক মানুষের উপকার করা যায়, তেমনি অন্যদিকে দেখিয়ে দিয়েছিলেন কিভাবে পরাধীন দেশের একটি শিল্প প্রতিষ্ঠান ধীরে ধীরে স্বাধীনতা ও স্বনির্ভরতার প্রতীক হয়ে উঠতে পারে। তাত্ত্বিক বিজ্ঞানী ছিলেন না প্রফুল্লচন্দ্র। বাঙালির চাকরির নেশাকে উদ্দেশ্য করে তিনি দুঃখ প্রকাশ করেন। ব্যবসায় অবহেলা, পূর্ব পুরুষের বৃত্তিকে অবহেলা করে আধুনিক হবার স্বপ্ন দেখাকে তিনি কোনদিনই মেনে নেননি। ৮০ বছর বয়সেও প্রফুল্লচন্দ্র আবেদন জানিয়েছেন,—'এখনও ফেরো, সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে শিক্ষা, বাণিজ্য-ব্যবসায়ে মন দাও, তবে যদি বাঁচতে পারো.....।' মাত্র ৩৪ বছর বয়সে ১৮৯৬ সালে মারকিউরাস নাইট্রাইটের আবিষ্কার তাঁর জীবনে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করে। প্রখ্যাত ফরাসী রসায়নবিদ্ বার্থেলোর

অনুপ্রেরণায় তাই সুদীর্ঘ বারো বছর ধরে অক্লান্ত পরিশ্রম করে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে থাকা প্রাচীন পুঁথি, নেপালের রাজপরিবার, বিট্রিশ সংগ্রহশালা থেকে তথ্য সংগ্রহ করে তিনি সৃষ্টি করেন দুই খন্ডের বিখ্যাত 'The History of Hindu Chemistry', এই পুস্তকটি প্রাচীন ভারতে বিজ্ঞান চর্চার বিভিন্ন দিক, সীমাবদ্ধতা, পাশ্চাত্যে বিজ্ঞান চর্চার সঙ্গে এর মৌলিক পার্থক্য, এসবের ওপর এক প্রামাণ্য গ্রন্থ। প্রফুল্লচন্দ্র উপলব্ধি করেছিলেন যে, দেশ স্বাধীন না হলে তার আদর্শের বাস্তবায়ন সম্ভব নয়। প্রফুল্লচন্দ্র চেয়েছিলেন শিক্ষাকে জীবনের সঙ্গে যুক্ত করতে। তিনি দুঃখ করে লিখেছেন, "পাশ করা ছেলে কার্যক্ষেত্রে নেমে হাতড়ে বেড়ায়, কোথাও কুল পায় না।" তাঁর মতে—'লেখাপড়ায় আনন্দ যদি না পাওয়া যায় তো সে লেখাপড়া মিথ্যা'। ছাত্রদের নির্দিষ্ট খাদ্যাভ্যাস এবং নিয়মিত ব্যায়াম সম্বন্ধে সচেতন করতেন। সাহিত্য ক্ষেত্রেও প্রফুল্লচন্দ্রের অনায়াস বিচরণ ছিল। রামমোহন-বিদ্যাসাগরের হাতে এ দেশে সমাজ সংস্কারের রেনেসাঁসের সূচনা হয়েছিল আর প্রফুল্লচন্দ্রের হাতে বিজ্ঞান চেতনার রেনেসাঁস শুরু হয়। ১৯৪৪-এর ১৬ জুন আজীবন বিজ্ঞানসাধক, দেশপ্রেমিক, শিল্পোদ্যোগী, ছাত্রদরদী আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সায়েন্স কলেজে তাঁর ঘরে গুণমুগ্ধ ছাত্র-পরিবৃত অবস্থায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর চিন্তা, সাহস ও শিল্পোদ্যোগ দেশকে স্বনির্ভর করে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে এক নতুন পথের সন্ধান দিয়েছে।

মূল আলোচনা :

"যে ধ্রুবপদ দিয়েছ বাঁধি বিশ্বতানে
মিলাব তাই জীবনগানে"

এক ইউরোপীয় সাংবাদিকের লেখা থেকে আমরা জানতে পারি— 'If Mr. Gandhi had been able to create two more Sir P. C. Ray, he would have succeeded in getting Swaraj within this year'. গান্ধীজীর ডাকে প্রফুল্লচন্দ্র অসহযোগ আন্দোলনে অংশ নেন এবং তাঁর কণ্ঠে ধ্বনিত হয়—"Science can afford to wait but Swaraj can not"–আর এই কথা দিয়ে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র তাঁর ছাত্রদের ভিতরের চেতনাকে নাড়িয়ে দিয়েছিলেন এবং তিনিই হলেন ভারতে রাসায়নিক শিল্পের প্রাণপুরুষ এবং 'Indian School of Modern Chemistry'-র প্রতিষ্ঠাতা। নিজেই তিনি লিখেছেন—'আমি রসায়নবিদ্ হয়েছি নেহাতই ভুলবশত। আমার অনুরাগ ছিল ইতিহাস, জীবনী সাহিত্য ও সাধারণ সাহিত্যে'। অতি সাধারণ মানুষ ছিলেন তিনি।

১৮৬১ সালের ২ আগস্ট পূর্ব বাংলার (অধুনা বাংলাদেশ) যশোহর জেলার রাড়ুলি গ্রামে বাবা হরিশ্চন্দ্র রায়চৌধুরী এবং মাতা ভুবনমোহিনীর ঘর আলো করে যে-শিশুসন্তানের জন্ম, তাঁকে ছোটবেলায় সবাই আদর করে ডাকতেন 'ফুলু' নামে। হরিশ্চন্দ্র ছিলেন বিদ্যানুরাগী, সংস্কৃতিমনস্ক ও উদার মনোভাবাপন্ন একজন জমিদার। তিনি কৃষ্ণনগর কলেজে ইংরেজি সাহিত্য নিয়ে পড়াশোনা করেন। তাঁর বাবা আনন্দলালের মত তিনিও যশোহরের সেরেস্তাদার হন। একজন মৌলবির কাছে তিনি পারসি ভাষাও শেখেন। আরবিও জানতেন। সংস্কারমুক্ত মন ছিল তাঁর। তার প্রভাব পড়েছিল প্রফুল্লচন্দ্রের উপর। কবি হাফিজ প্রফুল্লকে অনুপ্রাণিত করেন ইংরেজ কবিদের রচনা, দার্শনিকদের প্রবন্ধ সাহিত্য পড়তে। বাড়িতেই ছিল গ্রন্থাগার। ছিল নানা বিষয়ের বই ও পত্র-পত্রিকা। ছিল বাংলা ভাষার প্রথম সংবাদপত্র 'সমাচার দর্পণ'-এর প্রতিটি সংখ্যা। এইসব পত্রিকার গ্রাহক ছিলেন হরিশ্চন্দ্র। এছাড়াও ছিল ডঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্রের সম্পাদিত বিবিধার্ত সংগ্রহ, অমৃত বাজার পত্রিকা, হিন্দু পত্রিকা, সোমপ্রকাশ। হরিশ্চন্দ্রের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, দিগম্বর মিত্র, কৃষ্ণদাস পাল ও যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের। রাড়ুলি গ্রামে হরিশ্চন্দ্র দু-দুটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন-'মিডল্ ইংলিশ স্কুল'—ছেলেদের জন্য এবং 'ভুবনমোহিনী স্কুল'—মেয়েদের জন্য প্রফুল্লচন্দ্রের মায়ের নামে। ন' বছর বয়স পর্যন্ত বাবার প্রতিষ্ঠিত 'মিডল্ ইংলিশ স্কুল'-এ লেখাপড়া করেন। ১৮৭০ সালে হরিশ্চন্দ্র তাঁর ছেলেদের উচ্চশিক্ষার জন্য সপরিবারে কলকাতায় বসবাস করতে শুরু করেন।

প্রফুল্লচন্দ্র হেয়ার স্কুলে ভর্তি হলেন। হেয়ার স্কুলের সহপাঠীরা প্রথমদিকে তাঁকে 'বাঙাল' বলে বিদ্রুপ করত। আত্মজীবনীতে প্রফুল্লচন্দ্র উল্লেখ করেছেন— 'When my classmates came to know that I hailed from the district of Jessore, I at once became their laughing–stock and the butt of ridicule. I was nicknamed 'Bangal' and various faults of ommission ascribed to the unfortunate people of East Bengal began to be laid at my door"–সহপাঠীদের এই আচরণ তাঁর কিশোরমনকে ব্যথিত করলেও বিদ্যার্জনে বাধা হয় নি। স্কুলের পড়া তিনি নিয়মিত করতেন। মাত্র দশ বছর বয়সে গ্রিক ও ল্যাটিন ভাষা শেখেন। স্কুলে পড়ার বাইরে ইতিহাস পড়তে, বড়ো মানুষদের জীবনী পড়তে তাঁর খুব ভালো লাগতো। মাত্র বারো বছর বয়সে গ্যালিলিও ও নিউটনের জীবনী পড়ে ফেলেন। এশিয়াটিক সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা উইলিয়াম জোন্স-এর জীবনী পড়ে তিনি অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। অনেক রাত পর্যন্ত জেগে পড়াশুনা করতেন, ফলে এত অল্প

বয়সে অত পরিশ্রম প্রফুল্লের সহ্য হল না। চতুর্থ শ্রেণিতে পড়ার সময় ভয়ংকর আমাশয় রোগে আক্রান্ত হয়ে বিদ্যালয় ত্যাগ করলেন এবং দু' বছরের জন্য তাঁর পড়াশুনা বন্ধ হয়ে যায়। তিনি সেই দুটি বছরের সদ্ব্যবহার করেন। শুধু তাই নয়, এই অসুস্থতা স্থায়ীভাবে তাঁর স্বাস্থ্যের হানি ঘটায় এবং সারাজীবন তিনি দুরারোগ্য অজীর্ণতা এবং অনিদ্রার শিকার হন। কিন্তু জ্ঞানার্জনের অদম্য আগ্রহে ১৮৭৬-এ কলকাতা ফিরে এলবার্ট স্কুলে ভর্তি হন। ১৮৭৯-এ তিনি এন্ট্রান্স পাশ করেন এবং মেট্রোপলিটন ইন্‌স্টিটিউট (বর্তমানে বিদ্যাসাগর কলেজ)-এ ভর্তি হন। হরিশ্চন্দ্রের অর্থনৈতিক অবস্থা তখন ক্রমাবনতির দিকে। এই কলেজেই প্রফুল্লচন্দ্র সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি, প্রশান্ত কুমার লাহিড়ীর মতো মহান শিক্ষকদের সংস্পর্শে আসেন এবং তাঁরা তাঁর মনে ভারতের স্বাধীনতার স্পৃহা এবং ভারতীয়দের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নতির ইচ্ছাকে উস্কে দেন। সেই সময় মেট্রোপলিটন ইন্‌স্টিটিউট-এ বিজ্ঞান পড়ার সুযোগ ছিল না। তাই তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজে 'বাইরের ছাত্র' হিসেবে 'নাম মাত্র ফি'-এর বিনিময়ে এফ. এ. (ফার্স্ট আর্টস) পড়ার সময় রসায়ন এবং বি.এ. পড়ার সময় রসায়ন ও পদার্থবিদ্যার ক্লাস শুনতে যেতেন। সেই সময়ের প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক আলেকজান্ডার পেডলার (পরবর্তীকালের স্যার আলেকজান্ডার পেডলার)-এর ক্লাসও তিনি করতেন। সাথে সাথে গবেষণামূলক পরীক্ষাকার্যের দক্ষতায় তিনি রসায়ন শাস্ত্রের প্রতি আকৃষ্ট হন। বাবার আর্থিক অনটন, নিজের শারীরিক অবস্থার অবনতি, এফ.এ. পরীক্ষার খারাপ ফল সবই হার মানে তাঁর অদম্য জেদ, তীক্ষ্ণ মেধা ও অধ্যবসায়ের কাছে। তিনি Gilchrist Scholarship–এর জন্য নিজেকে তৈরি করতে থাকেন। এটি ছিল একটি সর্বভারতীয় পরীক্ষা এবং এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্ররা বৃত্তি নিয়ে এডিনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সুযোগ পেতেন। এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য অন্ততঃ চারটি ভাষার দক্ষতা থাকা প্রয়োজন ছিল। সাফল্যের সঙ্গে উত্তীর্ণ প্রথম দু'জন ভারতীয়ের মধ্যে প্রফুল্লচন্দ্র একজন।

প্রসঙ্গত উঠে আসে বর্তমান বাংলার রূপরেখা। আজ পরিবর্তিত হয়েছে দেশ, দেশাচার, জনগণের মানসিকতা। দ্রুত বাড়ছে জনসংখ্যা। আধুনিকতার ছোঁয়া লেগে পল্লীগ্রামের রূপ বদল হলেও আজও অসহায় নিরন্ন মানুষের সংখ্যা কম নয়। কর্ম সংস্থানের জন্য ছুটে বেড়াচ্ছে বঙ্গসন্তান। প্রফুল্লচন্দ্র বাঙলা আর বাঙালির পিছিয়ে পড়া ছবিটি তুলে ধরতে চেয়েছেন। আমাদের দুর্ভাগ্য বাঙালি আজও উন্নাসিক। আজ আমরা আন্তর্জাতিক সমস্যা নিয়ে ভাবি, অথচ সাম্প্রদায়িকতার মোহমুক্তি ঘটাতে পারিনি। আচার্যের প্রতিবাদ ছিল এখানেই। শিক্ষার সুযোগ পেয়ে বঙ্গসন্তান

বংশগত ব্যবসা ভুলে গিয়ে পাড়ি জমাচ্ছে অন্য রাজ্যে বা বিদেশে। বিশ্বায়ন বলতে তিনি বাঙালিকে বিজ্ঞাপনের মোহজালে আবিষ্ট দেখতে চাননি। দেখতে চাননি আত্মকেন্দ্রিকতা কিভাবে ভবিষ্যৎ নাগরিক সমাজে স্বার্থপরতার জন্ম দিচ্ছে।

S. S. California জাহাজে করে ১৮৮২-এর মাঝামাঝি তিনি ইংল্যান্ডে গেলেন। সেখানে জগদীশচন্দ্র বসুর অতিথি হয়ে তিনি কিছুদিন ছিলেন। জগদীশচন্দ্র তখন কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনা করছিলেন। এডিনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রফুল্লচন্দ্র B.Sc. তে ভর্তি হন। ১৮৮৫ তে D.Sc. করার জন্য গবেষণা শুরু করেন। তাঁর গবেষণার বিষয় ছিল ঃ "Conjugated Sulphates of the Copper–Magnesium Group : A Study of Isomorphous Mixtures and Molecular Combinations"। সাতাশ বছর বয়সেই তিনি D.Sc. ডিগ্রি অর্জন করেন। এই সময়ে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে 'Hope' পুরস্কার বৃত্তি লাভ করেন, যা তাঁকে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে আরো একবছর কাজ করার সুযোগ করে দিয়েছিল। পরে তনি 'Edinburg Chemical Society'-এর সহ সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন। বিদ্যাচর্চার জন্য ইউরোপীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সহায়তা নিলেও দেশকে কখনও তিনি ভোলেন নি। তাই এডিনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয় আয়োজিত প্রবন্ধ প্রতিযোগিতায় তাঁর প্রবন্ধের বিষয়বস্তু ছিল "India before and after the Mutiny"। এই প্রবন্ধ প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে একদিকে যেমন তিনি ভারতের অর্থনীতি, শিক্ষানীতি, দারিদ্র ও দুর্ভিক্ষের কারণ ইত্যাদি বিষয়ের ওপর ব্রিটিশ শাসনের পূর্ব এবং তৎকালীন অবস্থার তুলনামূলক আলোচনা করেন, তেমনি অন্যদিকে শ্লেষাত্মক ভাষায় ব্রিটিশ শাসনকে স্বার্থপর, কঠোর ও নিষ্ঠুর বলে সমালোচনা করেন। প্রবন্ধটি প্রশংসা পেলেও পুরস্কৃত হননি প্রফুল্লচন্দ্র। পরে তিনি এটি 'এসে অন ইন্ডিয়া' নাম দিয়ে পুস্তিকাকারে ছাপিয়ে বিলি করেন। এতে ছিল ব্রিটিশ শাসকদের প্রতি সতর্কবাণী—'সময় থাকতে অত্যাচারী শাসন নীতি পাল্টাও, নাহলে সমূহ বিপদ।'

ছয় বছর পর ১৮৮৮ সালে দেশে ফিরে দেশবাসীর দুরবস্থা দেখে তিনি বিচলিত হলেন। ইউরোপীয় পোশাক ছেড়ে তিনি ধরলেন খদ্দর আর ভারতের বুকে শিল্প প্রতিষ্ঠার ভাবনা তাঁর মাথায় নিয়ে এলেন। ফলে আমরা পেলাম রসায়নের জগতে তাঁর সবচেয়ে বড়ো অবদান 'বেঙ্গল কেমিক্যাল এণ্ড ফার্মাসিটিক্যাল ওয়ার্কস্'। তাঁর গবেষণার প্রথম বিষয় ছিল 'বাঙলার তেল-ঘি'।

১৮৮৯ সালের জুন মাসে প্রফুল্লচন্দ্র প্রেসিডেন্সি কলেজের রসায়ন বিভাগে যোগ দেন। কৃতিত্বের সঙ্গে অধ্যাপনা ও গবেষণা করতে থাকেন। প্রফুল্লচন্দ্রের

ছাত্রদের মধ্যে যে দুজন বিশ্বদরবারে সবচেয়ে বেশি প্রতিষ্ঠিত তাঁরা হলেন সত্যেন্দ্রনাথ বসু এবং মেঘনাদ সাহা। প্রফুল্লচন্দ্র ১৯১৬ সালে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে অবসর নেওয়ার পর Calcutta University College of Science-এ পালিত অধ্যাপক হিসাবে যোগ দেন।

কেমন ছিলেন শিক্ষক প্রফুল্লচন্দ্র? শোনা যাক সত্যেন্দ্রনাথ বসুর স্মৃতিচারণা—

"........অনেক সময় অন্য কলেজের ছাত্ররা এসে ছুটতো ডঃ রায়ের বক্তৃতা শুনতে। সরল ইংরেজিতেই বক্তৃতা। বাগ্মিতার কোনও চেষ্টা ছিল না। বরং নানা কথা বলে হাসি ঠাট্টার মধ্য দিয়ে ড: রায় চাইতেন রসায়নের মূলকথা যাতে ছাত্রদের মনে গেঁথে যায়।"

তাঁর আত্মজীবনীতে প্রফুল্লচন্দ্র লিখেছেন—"একটা বৃহৎ রাসায়নিক শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা আমার যুবা বয়সের স্বপ্ন ছিল।" পরাধীন দেশে ভেষজ রাসায়নিক শিল্পে স্বনির্ভর একটি পরিকাঠামো গড়ে তোলাই ছিল তাঁর লক্ষ্য। স্বদেশী আন্দোলনের ঢেউয়ে সারা দেশ যখন উত্তাল, তখন আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র ও তাঁর সহযোগীরা স্বদেশে কারখানা স্থাপন করে স্বনির্ভরতা অর্জন করতে চাইলেন। ৯১, আপার সার্কুলার রোড (বর্তমানে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড)-এর দু'-তলা বাড়ির একটি ছোট ঘরে যে 'বেঙ্গল কেমিক্যাল'-এর যাত্রা শুরু হয় ১৯০১ সালে ২৫,৩৭১ টাকা বার্ষিক বিক্রয় দিয়ে, ১৯১৫ সালে তা' বেড়ে দাঁড়ায় পাঁচ লক্ষ টাকা। পরবর্তী কালে মানিকতলা ও পানিহাটিতে দুটি বৃহৎ কারখানা তৈরি হয়। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় বেঙ্গল কেমিক্যাল ব্রিটিশ সরকারকে যুদ্ধের নানা প্রয়োজনীয় উপকরণ সরবরাহ করে। এই সাহায্য ও বিজ্ঞানের মৌলিক গবেষণার জন্য ব্রিটিশ সরকার প্রফুল্লচন্দ্রকে 'নাইট' বা 'স্যার' উপাধি প্রদান করেন। রাসায়নিক ও ভেষজ দ্রব্যের পাশাপাশি নানান জৈব বা রাসায়নিকও উৎপাদিত হতে শুরু হয় ওই দুটি কারখানা থেকে। বেঙ্গল কেমিক্যাল প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে প্রফুল্লচন্দ্র একদিকে যেমন ভারতীয়দের শিখিয়েছিলেন কি করে বিজ্ঞানের ব্যবহারিক প্রয়োগের মাধ্যমে সমাজের বিপুল সংখ্যক মানুষের উপকার করা যায়। তেমনি অন্যদিকে দেখিয়ে দিয়েছিলেন কিভাবে পরাধীন দেশের একটি শিল্প প্রতিষ্ঠান ধীরে ধীরে স্বাধীনতা ও স্বনির্ভরতার প্রতীক হয়ে উঠতে পারে। শুধু বেঙ্গল কেমিক্যাল নয় যে কোনো শিল্পোদ্যোগ দেখলেই তিনি উৎসাহিত হতেন এবং নানাবিধ সাহায্য করতেন। প্রধানত তাঁর উদ্যোগেই 'বঙ্গশ্রী কটন মিলস'-এর প্রতিষ্ঠা এবং প্রসার লাভ। ১৯৪০ সাল। তখনকার প্রচলিত আকাশবাণী নয়, অল ইন্ডিয়া রেডিওর ভাষণে প্রফুল্লচন্দ্র বললেন। "......সত্তর পঁচাত্তর বছর আগে বাঙলার যে চেহারা আমার চোখে পড়েছে আজ তার অনেক

পরিবর্তন হয়েছে। তখন বাঙালির ছিল গোলাভরা ধান, দেহ জোড়া স্বাস্থ্য, গোয়াল ভরা গরু, পুকুর ভরা মাছ। কামার, কুমোর, ধোপা, নাপিত সব ছিল বাঙালি। গেরস্ত ঘরে ঝি-চাকর সবই ছিল বাঙলা দেশের লোক। জাতিগত বৃত্তি মেনে তারা সুখে না হলেও স্বচ্ছন্দে দিন কাটাত। ...মনিহারী দোকানেরও তখন সৃষ্টি হয়নি। সত্যি কথা বলতে কি তখন লোকের এত মনিহারী জিনিসের দরকার হোত না। বিলাসিতার মোহ পঁচাত্তর বছর আগে বাঙলাকে এমন করে পেয়ে বসেনি। লোকের আয় ছিল কম, ব্যয়ও ছিল কম। অল্প আয় নিয়েই তখনকার লোকেরা ছোট বড় সবাই বারো মাসে তের পার্বণ করত। দিনের যে কোন সময়েই অতিথি অভ্যাগত আসুক না কেন, অপরিচিত লোকের বাড়িতেও দু-চারটে ডালভাত মিলত।”

প্রফুল্লচন্দ্র তৎকালীন সমাজ ব্যবস্থা প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে সেই সব সাধারণ মানুষের কথা বলেছেন যারা সাংসারিক প্রয়োজনে অবসর সময়ে দড়ি পাকাতে পারে, বৃষ্টির দিনে মাথা বাঁচাতে গোলপাতার টোকা তৈরি করতে পারে। চরকায় সুতো কেটে পাঁচজন এক জায়গায় বসে কাজ করতে করতে গল্প করতে পারে। এতে শুধু আনন্দ নয়, কিছু উপার্জনও হতো।

তাত্ত্বিক বিজ্ঞানী ছিলেন না প্রফুল্লচন্দ্র। বাঙালির চাকরির নেশাকে উদ্দেশ্য করে তিনি দুঃখ প্রকাশ করেন। ব্যবসায় অবহেলা, পূর্ব পুরুষের বৃত্তিকে অবহেলা করে আধুনিক হবার স্বপ্ন দেখাকে তিনি কোনদিনই মেনে নেননি। আধুনিক হবার স্বপ্ন দেখে যুবসমাজ বিলাসী হল, আয়েসী হল। ব্যবসা নিন্দনীয় এই বুদ্ধির দোষে তারা পরের গোলামিতে মেতে উঠল। ৮০ বছর বয়সেও প্রফুল্লচন্দ্র আবেদন জানিয়েছেন,—‘এখনও ফেরো, সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে শিক্ষা, বাণিজ্য-ব্যবসায়ে মন দাও, তবে যদি বাঁচতে পারো.....।’

সত্যি সত্যি আমাদেরকে বিস্ময়ে হতবাক হতে হয় এই ভেবে যে তিনি একজন বড় বিজ্ঞানী না একজন প্রকৃত দেশপ্রেমিক, কোনটি ছিলেন। প্রকৃতপক্ষে তিনি ছিলেন এক বড়ো মাপের মানুষ—তিনি তৃতীয় শ্রেণির টিকিটে রেল ভ্রমণ করতে চাইতেন যাতে দেশের সাধারণ মানুষের দুঃখ ও যন্ত্রণার প্রত্যক্ষ ছোঁয়া পাওয়া যায়। বাস্তবে তিনি স্যার জগদীশচন্দ্র বোস ও চন্দ্রশেখর ভেঙ্কটরমন-এর সমসাময়িক দেশপ্রেমিক বিজ্ঞানী ছিলেন।

১৮৯৬ সালে মারকিউরাস নাইট্রাইটের আবিষ্কার তাঁর জীবনে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করে। তখন প্রফুল্লচন্দ্রের বয়স ৩৪ বছর। যেসব মৌলিক পদার্থ দিয়ে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড গঠিত তার একটি অসম্পূর্ণ তালিকা বানিয়েছিলেন রুশ বিজ্ঞানী দিমিত্রি মেন্ডেলিফ। কিন্তু প্রকৃতির কিছু মৌলের খোঁজ তিনি পাননি। প্রফুল্লচন্দ্র

চেয়েছিলেন সেই শূন্যস্থানকে পূর্ণ করতে। ভারতীয় ভূতাত্ত্বিকদের কাছ থেকে দুষ্প্রাপ্য খনিজ দ্রব্য সংগ্রহ করে বিশ্লেষণ করতে শুরু করেন। প্রেসিডেন্সির পরীক্ষাগারে ক্যালোমেল নামে একটি রাসায়নিক তৈরির চেষ্টা চালান। এটি হল মারকিউরাস ক্লোরাইড। এরই প্রয়োজনীয় উপাদান মারকিউরাস নাইট্রেট। এটি তৈরি করতে তিনি পারদের সঙ্গে লঘু নাইট্রিক অ্যাসিডের বিক্রিয়া ঘটান। ফলে দুটি অস্থায়ী জিনিস একত্রিত হয়ে যে স্থায়ী যৌগ তৈরি হতে পারে তা প্রমাণিত হল। একটি বই-এ তিনি পড়েছিলেন যে, "H_2SO_4 is the mother of industries", তাই তিনি তাঁর ঘরের একটি ছোট্ট ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষা শুরু করলেন। তিনি গবাদি পশুর হাড়ের ছাইকে সালফিউরিক অ্যাসিডের সুপার ফসফেট অব্ লাইম-এর সঙ্গে বিক্রিয়া ঘটালেন এবং পরে সোডার সাথে মিশিয়ে ফসফেট দ্রবন তৈরি করলেন। এই দ্রবন একটি বড় পাত্রে ঢেলে ফোটানো হল যা কিনা সোডা ক্রিস্টালের ফসফেটের রূপ নিল। তখন তিনি খানিকটা অংশ মুখে ভরে চিবোতে লাগলেন আর সহাস্য মুখে জানালেন গবাদি পশুর হাড়-গোড় যা কিনা ফেলে দেওয়া হয়, তা থেকে স্নায়ু রোগের এক ঔষধ তৈরি করা গেল। আরও যেসব যৌগ তৈরির কাজে তিনি সফল হয়েছিলেন সেগুলি হল অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট, সালফার ঘটিত জৈব পদার্থ এবং প্লাটিনাম, ইরিডিয়াম বা সোনা সম্বলিত জৈব রাসায়নিক। এইভাবেই ঘি-তেল-মাখনের রাসায়নিক বিশ্লেষণ করেন তিনি। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল এর মধ্যে ভেজাল মেশানোর প্রক্রিয়া ধরা। দেশ-বিদেশের জার্নালে প্রায় ১৪০টি পেপারের সেই গবেষণাপত্র ছাপা হয়েছিল। এই ভাবে শুধু ছাত্রদের তিনি রসায়ন শাস্ত্র শেখাতেন তা নয়, যুক্তিবাদী মনটাও তৈরি করে দিতেন। ইতিহাস ও ঐতিহ্য ছাড়া কোনো জাতি বড়ো হয় না, এই চরম সত্যটা তিনি বুঝতেন। প্রখ্যাত ফরাসী রসায়নবিদ বার্থেলোর অনুপ্রেরণায় তাই সুদীর্ঘ বারো বছর ধরে অক্লান্ত পরিশ্রম করে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে থাকা প্রাচীন পুঁথি, নেপালের রাজপরিবার, বিট্রিশ সংগ্রহশালা থেকে তথ্য সংগ্রহ করে তিনি সৃষ্টি করেন দুই খন্ডের বিখ্যাত 'The History of Hindu Chemistry', এই পুস্তকটি প্রাচীন ভারতে বিজ্ঞান চর্চার বিভিন্ন দিক, সীমাবদ্ধতা, পাশ্চাত্যে বিজ্ঞান চর্চার সঙ্গে এর মৌলিক পার্থক্য, এসবের ওপর এক প্রামাণ্য গ্রন্থ। এই গ্রন্থে তিনি লিখলেন— “প্রাচীন ভারতে উন্নতির শিখরে ওঠা বিজ্ঞান চর্চা কীভাবে অবক্ষয়ের অস্তাচলে চলে গেল। জাতিভেদ প্রথা এবং শঙ্করাচার্যের মায়াবাদের প্রভাব—এ দুটিকেই তিনি অবক্ষয়ের কারণ হিসেবে চিহ্নিত করলেন। প্রফুল্লচন্দ্র লিখেছেন—‘মনুর বিধান ও পুরাণ পুরোহিতশ্রেণির শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণে ব্যস্ত, এর ফলে অত্যন্ত ক্ষতিকারক পরিস্থিতি

তৈরি হয়েছে। চিকিৎসা বিজ্ঞানের আকর গ্রন্থ সুশ্রুত-এ পরিষ্কার বলা হয়েছে যে, শল্য চিকিৎসা শিখতে ইচ্ছুক কোনো ছাত্রের সত্যিকারের জ্ঞান অর্জনের জন্য নিজের হাতে শব ব্যবচ্ছেদ করা প্রয়োজন।' এই গ্রন্থে জ্ঞান অর্জনের জন্য পর্যবেক্ষণ এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষার ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। অথচ মনুর মতে এসব চলতে পারে না। মৃতদেহের স্পর্শে পবিত্র ব্রাহ্মণ দেহ অশুচি হয়ে যায়। বেদান্তের পর থেকেই মৃতদেহ ছোঁয়া খারাপ কাজ বলে গণ্য করা শুরু হয়। এর ফলে মানব দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সম্পর্কে জ্ঞান এবং শল্য চিকিৎসা হিন্দুদের জন্য কার্যত লুপ্ত হয়ে যায়। তাঁর মতে যে দেশে মানুষ স্বভাবতই কল্পনাপ্রবণ এবং তর্কশাস্ত্রের কূটকাচালিতে অভ্যস্ত, তাদের মধ্যে সত্য অন্বেষণের ইচ্ছাটা ক্রমে হারিয়ে যায়, ফলস্বরূপ আমাদের দেশ থেকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং পর্যবেক্ষণভিত্তিক বৈজ্ঞানিক সত্য অনুসন্ধান পদ্ধতির ঐতিহ্য লুপ্ত হয়ে যায়। আমাদের দেশের মাটি একজন ডেকার্তে, একজন নিউটন, একজন বয়েলের জন্ম দেওয়ার অনুপযুক্ত হয়ে ওঠে। এই বেদনাবোধ থেকে প্রফুল্লচন্দ্র আজীবন জাতিভেদ প্রথা, অস্পৃশ্যতার মতো সামাজিক কুসংস্কারগুলির বিরুদ্ধে তীব্র ঘৃণা বর্ষণ করেছেন। প্রফুল্লচন্দ্র তাই শ্লেষভরে মন্তব্য করেছেন, "আমাদের বহু হিন্দু পুনরুত্থানবাদীরা গীতায় উচ্চাঙ্গের অধ্যাত্মতত্ত্ব সম্বন্ধে বক্তৃতা করিবেন, হিন্দু ধর্মের সার্বভৌমিক উদারতা এবং অন্য ধর্মের চেয়ে তাহার শ্রেষ্ঠত্ব ব্যাখ্যা করিবেন, কিন্তু যখনই এই তত্ত্ব ও উপদেশ কার্যে পরিণত করার সময় উপস্থিত হয়, তখন তাঁহারাই সর্বাগ্রে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেন।"

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের ৭১তম জন্ম দিবস উপলক্ষে আয়োজিত সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর ভাষণে বলেছিলেন, "আমি প্রফুল্লচন্দ্রকে তাঁর সেই আসনে অভিবাদন জানাই, যে আসনে প্রতিষ্ঠিত থেকে তিনি তাঁর ছাত্রের চিত্তকে উদ্‌বোধিত করেছেন, কেবলমাত্র তাঁকে জ্ঞান দেননি, নিজেকে দিয়েছেন, যে দানের প্রভাব সে নিজেকেই পেয়েছে।"

প্রফুল্লচন্দ্র উপলব্ধি করেছিলেন যে, দেশ স্বাধীন না হলে তার আদর্শের বাস্তবায়ন সম্ভব নয়। তাই তিনি লিখেছিলেন—'ভিক্ষানীতিতে আমি বিশ্বাসী ছিলাম এবং শিশুসুলভ সরলতার সহিত আমি ভাবিতাম যে, ভারতের দুঃখ দুর্দশার কথা যদি ব্রিটিশ জনসাধারণের গোচর করা যায়, তাহা হইলেই সেগুলির প্রতিকার হইবে। আমার এ মোহভঙ্গ হইতে বেশিদিন লাগে নাই। পৃথিবীর ইতিহাসে এমন একটি দৃষ্টান্ত নাই যে, প্রভুজাতি স্বেচ্ছায় পরাধীন জাতিকে কোন কিছু অধিকার দিয়াছে'।

প্রফুল্লচন্দ্র চেয়েছিলেন শিক্ষাকে জীবনের সঙ্গে যুক্ত করতে। তিনি দুঃখ করে লিখেছেন, "পাশ করা ছেলে কার্যক্ষেত্রে নেমে হাতড়ে বেড়ায়, কোথাও কুল পায়

না।” তাঁর মতে—‘লেখাপড়ায় আনন্দ যদি না পাওয়া যায় তো সে লেখাপড়া মিথ্যা’। এই নিরানন্দের অন্যতম কারণ হিসেবে তাঁর মনে হয়েছিল—‘আমাদের দেশে শিক্ষালাভের একটা প্রধান বাধা এই যে, আগে ইংরেজি ভাষা শিখে তারপর অন্য সব শিক্ষা করতে হবে।’ রাজা রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রদর্শিত পথে তিনি ভারতে আধুনিক বিজ্ঞান শিক্ষার প্রসার চেয়েছিলেন। তিনি লিখেছিলেন, ‘দীর্ঘকাল ধরে এক বৌদ্ধিক অচল দশা চলছে। শাস্ত্রের কর্তৃত্ব মেনে নেওয়ার অভ্যাস ছাড়তে পারছি না, যুক্তি সেখানে বিশ্বাসের চাকায় বাঁধা। প্রশ্ন বারণ, সমালোচনা বারণ আমাদের এই বৌদ্ধিক বন্দীদশাকে মুক্ত করতে বিজ্ঞান চেতনার প্রসার ঘটুক।’

তিনি চিররুগ্ন হলেও নিজের শরীর সম্বন্ধে যত্নশীল থাকতেন, যাতে তাঁর কাজকর্ম পরিচালনা করতে কোনো অসুবিধা না হয়। ছাত্রদের নির্দিষ্ট খাদ্যাভ্যাস এবং নিয়মিত ব্যায়াম সম্বন্ধে সচেতন করতেন। সাহিত্য ক্ষেত্রেও প্রফুল্লচন্দ্রের অনায়াস বিচরণ ছিল। এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ এবং প্রফুল্লচন্দ্রের পত্র বিনিময় উল্লেখের দাবি রাখে। ইতিহাস ও সাহিত্যে ছিল তাঁর স্বচ্ছন্দ গতি, জ্ঞান ও স্পৃহা। তাঁর অদম্য মন ছিল দিব্য দৃষ্টিতে ভরা। রামমোহন-বিদ্যাসাগরের হাতে এ দেশে সমাজ সংস্কারের রেনেসাঁসের সূচনা হয়েছিল আর প্রফুল্লচন্দ্রের হাতে বিজ্ঞান চেতনার রেনেসাঁস শুরু হয়। মহারাষ্ট্রের বিখ্যাত শিক্ষাবিদ্ ও সমাজ সংস্কারক গোপালকৃষ্ণ গোখ্‌লে (১৮৬৬-১৯১৫) প্রফুল্লচন্দ্র রায় ও জগদীশচন্দ্র বোস সম্পর্কে বলেন ঃ Where will you find another scientist in all India to place by the side of Dr. J.C. Bose or Dr. P. C. Ray?

১৯৪৪-এর ১৬ জুন আজীবন বিজ্ঞানসাধক, দেশপ্রেমিক, শিল্পোদ্যোগী, ছাত্রদরদী আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সায়েন্স কলেজে তাঁর ঘরে গুণমুগ্ধ ছাত্র-পরিবৃত অবস্থায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর চিন্তা, সাহস ও শিল্পোদ্যোগ দেশকে স্বনির্ভর করে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে এক নতুন পথের দিশা দিয়েছে। কৃষি উন্নয়ন, গ্রামে কুটির শিল্প গড়ে তোলা, জৈব সার তৈরি, শিল্পের প্রসার, কলকারখানা স্থাপন, ব্যবসা বাণিজ্যে যুবকদের অংশগ্রহণ ইত্যাদি সব ব্যাপারে তাঁকে নেতৃত্ব গ্রহণ করতে দেখা গেছে। এ এক বিরল দৃষ্টান্ত। তাঁর শিল্প প্রসারের আশা যদি এই নতুন শতাব্দীতেও সার্থক রূপ নিতে পারে তাহলে দেশ প্রগতি ও সমৃদ্ধির এক গৌরবোজ্জ্বল পথে এগিয়ে যেতে সক্ষম হবে—এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। আচার্য দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের স্ত্রী বাসন্তী দেবীকে একটি পত্রে লিখেছিলেন ‘.......যখন আমি বিজ্ঞানচর্চা করি তখন বিজ্ঞানের মধ্য দিয়া দেশকেই

সেবা করি'। উপনিষদে কথিত আছে, যিনি এক, তিনি বললেন, আমি বহু হব। সৃষ্টির মূলে এই আত্মবিসর্জনের ইচ্ছা। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের সৃষ্টিও সেই ইচ্ছার নিয়মে। তাঁর ছাত্রদের মধ্যে তিনি বহু হয়েছেন, নিজের চিত্তকে সঞ্জীবিত করেছেন বহু চিত্তের মধ্যে। নিজেকে অকৃপণ ভাবে দান না করলে এ কখনো সম্ভবপর হোত না। এই যে আত্মদানমূলক শক্তি, এই হল দৈবীশক্তি। আচার্য নিজের জয় কীর্তি নিজে স্থাপন করেছেন উদ্যমশীল জীবনের ক্ষেত্রে, পাথর দিয়ে নয়, প্রেম দিয়ে। শিষ্যদের কৃতিত্ব তাঁকে এড়িয়ে যাবে এ ছিল তাঁর আকাঙ্ক্ষা, তাই তিনি অনেক বার বলেছেন—"সর্বত্র জয়মন্বিষেৎ পুত্রাদ্ (শিষ্যাদ্) ইচ্ছেৎ পরাজয়ম্।" এই নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধে তাঁর প্রতি আমার অন্তরের শ্রদ্ধাঞ্জলি। শুরুর মতো শেষও করি কবিগুরুর কবিতার ছত্রে—

"প্রেম রসায়নে, ওগো সর্বজনপ্রিয়
করিলে বিশ্বের জনে আপন আত্মীয়।"

তথ্যসূত্র ঃ

১. আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের চিন্তাধারা—রতনমুনি চট্টোপাধ্যায়।
২. আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় ঃ রচনা—বিচিত্রা। সম্পাদনা—বারিদবরণ ঘোষ। সাহিত্যম্, কলকাতা (নভেম্বর, ২০১০)।
৩. আচার্য প্রশস্তি—সত্যেন্দ্রনাথ বসু।
৪. কবিতা সমগ্র, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, আনন্দ, সম্পাদক—অনাথ নাথ দাস, ৫ম খন্ড, ২০১০।
৫. কর্মযোগী আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়—অজয়কুমার নন্দী।
৬. রবিবাসরীয় আনন্দবাজার, আগস্ট ২০১০-পথিক গুহ।
৭. History of Hindu Chemistry, Vol. I, Sir Prafulla Chandra Ray, 1st May 1902, London.
৮. History of Hindu Chemistry, Vol. II, Sir Prafulla Chandra Ray, London.
৯. Speeches, Calcutta Natesan and Co. 1920.

Women in Nineteenth Century Bengal: An Analysis Through The Prism of The Kartabhaja Sect

Chanchal Chowdhury
Senior Joint Commissioner of Revenue,
West Bengal

Abstract: The Kartabhaja sect was a minor religious community founded around the mid-eighteenth century.Majority of the Karatabhaja followers were poor and illiterate rural women who were either helpless widows or social outcastes.The mainstream orthodox society of Bengal has always held the Kartabhajas with contempt. Free assembly between men and women, violation of caste regulations, immoral sexual relation, and prostitution were the major complaints against the Kartabhajas. These complaints were not totally untrue though exaggerated.The social and religious practices of the Kartabhaja sect and the repercussion of the orthodox society against their activitiesreflect a pattern of the persecuted women's position in nineteenth century Bengal. The contemporary Government records and other written sources reveal that domestic neglect, purdah system, illiteracy, untouchability, child marriage, polygamy, perpetual widowhood, practice of Sati, and prostitution were the general features of women's life in nineteenth century Bengal.

Keywords: Kartabhaja, Poverty, Widowhood, Concubinage, Prostitution.

As an alternative ideology of religious beliefs and practices, the Kartabhaja sect was founded around the mid-eighteenth century and took its origin at the village of Ghoshpara under Chakdaha Police Station in Nadia District of present West Bengal. The principal ideologies of this sect weredenialof theBrahmanical dictums and tenets of the Shariat, floutingthe prevailing age-old customs of the society, and fabrication ofan alternative space for observing their own socialpractices and religious activities. The Kartabhajas outstripped the religious barriers and ignored the Brahmanical caste regulations. They dismissed the purdah system imposed on women and approved free assembly of both sexes. The attitude of the orthodox society of Bengal towards the followers of this sect was highly malicious. Notwithstanding, the Kartabhajas belonging tolower class rural men, and women like helpless widows,

outcastes, and women abandoned by their husbands and kinsmenfound an asylum within the community and obtained peace of mind against their realmaterial needs and social oppression.

The Kartabhaja sect was founded by Ram Saran Pal, who was by birth a Sadgop and by profession a cultivator.[i] He propagated and popularized the ideologies of the community. But the real founder of the sect was Aulechand, a *Fakir* about whom different anecdotes have been in circulation. Ram Saran Pal and twenty-one others, mostly lower caste Hindus, were fascinated by the miraculous power of Aulechand, and became his disciples around 1756.[ii] Aulechand would talk in Bengali language while delivering his sermon and eat food cooked by the Hindus, Muslims and Untouchables by discarding caste restrictions.[iii]After the death of Ram Saran Pal in 1783, the leadership of the sect was taken over by Ram Saran's widow, Saraswati Devi, popularly known as *Sati Ma*. Dulal Chand or Ram Dulal, the son of Ram Saran Pal and Saraswati Devi, became the *Karta* of the community when he attained sixteen years of age. Ram Dulal died suddenly in 1840 when he was only 50 and Saraswati Devi assumed the leadership of the sect again.[iv]Dulal Chand composed more or less 650 songs which encoded the theology of the Kartabhaja sect. The collection of these songs is known as *Bhaber Geet*. The followers of the Kartabhaja sect consider the *Bhaber Geet as* their law book.[v]

The Kartabhaja religion spread mainly among the poor and ignorant segment of the society. Their followers were mainly from among the lower classes comprising the Hindus and Muslims who would not observe any caste regulation.[vi] All members of the sect belonging to Muslim, Vaishnava, and low caste Hindu like the Hari and Muchi used to partake rice from the same dish.[vii]The Kartabhaja followers were mainly illiterate and superstitious. During the festivals of the sect at Ghoshpara, hundreds of patients having serious maladies paid a visit there and offered their devotion to the pomegranate tree in order to get rid of their diseases. They also bathed in the tank commonly known as *himsagar* with the hope that this would cure their illness. Sterile women paid a pilgrimage to Ghoshpara hoping to have a child.[viii] Even the patients suffering from serious physical deformities like leprosy, blindness, and deafness believed that they would be cured by the miraculous power of the Kartabhaja Guru within a few moments.[ix]

The female members of the Kartabhaja sect were poor and unprotected widows or women abandoned by their husbands. These women were easy recruits for the Kartabhaja Mahashayas.[x] They attended the religious fair at Ghoshpara in large numbers in order to have blessings of the Karta. After visiting the Ghoshpara fair during *doljatra*, a person described his observation by writing a letter to the editor of the *Sambad Prabhakar* which was published in its issue of March 30, 1848. The eyewitness reported that he had found young women and housewives of the Kartabhaja community sitting on the same mat together with male outsiders without showing any shame or social restriction though the women of Bengal ordinarily lived within the four walls of their family.[xi]The strength of the women followers of the sect was more than three times in comparison to that of its male followers.[xii] Social position of majority of these women was that they belonged to the lower strata of the caste hierarchy or were outcastes on account of their transgression of caste restrictions.[xiii] The mainstream orthodox society would never approve the socio-religious assembly of the Kartabhajas in open mind. It was reported in the *Somprakash* in its April 4, 1864 issue that fourteen visitors out of sixteen in the Ghoshpara fair were females. Majority of these females were prostitutes if compared to housewives.[xiv] In the contemporary written sources, we find references of rampant immoral sexual practices among the Kartabhaja followers.

In nineteenth century, the peasants, artisans, craftsmen, and agricultural labourers of Bengal were plunged into severe poverty and poverty-related distresses. Female members in poor families have always been worst sufferers of paucity. Compelled by distress and hunger, the parents of the province sold their boys or girls at trifling prices.Calcutta was an important centre where slavery was practised at a large scale. There was hardly any household in the town without any slave child.[xv] The demand for slave girls was very high in affluent families. They purchased girls from the poor families taking advantage of their scarcity. It is found from a Bengali *Samacharpatra* dated June18, 1825 that a *Vaishnavi* of Burdwan sold her twelve year old beautiful daughter to Raja Kissanchand Ray for one hundred and fifty rupees.[xvi] The position of these slave girls was just like sex slaves.

The practice of 'purdah' or seclusion of women was an important feature in the society of Bengal. The purdah system was strictly observed

by Muslim women all over India. The upper class orthodox Hindu aristocracy of Bengal also maintained this practice. Purdah system and early marriage were the major obstacles for the girls to attend schools. There was deep-rooted prejudice against girls' education in the society. In general, the women were denied the privilege of receiving education. It was believed that an educated women would inevitably become a widow. From the following census report the deplorable condition of female education in Bengal can easily be understood:

Table-1: Female Illiterates of Bengal per 10,000 population as perCensus Report of 1891[xvii]

Divisions	Female Illiterate per 10,000 of the population	
	Hindus	Musalmans
Northern Bengal	9965	9993
Darjeeling	9962	9891
Kuch Bihar	9969	9981
Eastern Bengal	9893	9987
Western Bengal	9896	9997

Child-marriage, Kulinism, and polygamy became widespread social practices in Bengal during the eighteenth-nineteenth century. It was ruled that members of Kulin groups could marry only the daughters of some specific Kulin families which created a social barrier for them. Under compulsion of Kulinism, sometimes little boys married aged women and sometimes little girls were married to middle-aged men.[xviii] At the same time, polygamy became a general practice among them. Santipur in Nadia district and Lakshmipassa in Jessore district were the condensed abodes of pure Kulin Brahmins.[xix] The Kulins of these places developed polygamous marriages as their profession. They did not maintain their wives, but left their wives together with their children to be provided for by their respective fathers-in-law.[xx]

Some Kulin Brahmins having large number of wives would maintain a register noting therein the names of their wives, children, fathers-in law and their addresses for refreshing their memories.[xxi] We discover a shocking news of Kulin marriage from the *Samachar Darpan* dated December 7, 1839. It was reported in that issue: "Some days ago, a Kulin Brahmin, named Govindachandra, a villager of Bally, has departed for his heavenly abode, leaving behind his one hundred widows in this world."[xxii] From another report prepared by Deputy-Collector of Dacca in

1871, it is learnt that there was a Kulin Brahmin at Bikrampur who had upwards of one hundred wives, while his three sons had fifty, thirty-five, and thirty.[xxiii] Outside the community of Kulin Brahmins, the practice of polygamy was a rare incident.[xxiv] Polygamy was also practised among the Muslims. The higher classes of Muslims practised polygamy to show off their wealth and influence. In nineteenth century, child marriage, Kulininism and polygamy produced a large number of young widows in the society.

Widow re-marriage was not permitted among the upper caste Hindus. Among the Muslims re-marriage of widows was not prohibited. The low caste Hindus like the Chandals, Rajbansis, barbers, washermen, fishermen, and shoemakers practiced widow remarriage though in limited numbers.[xxv] The condition of the upper caste Hindu widows was extremely deplorable. They were deprived of every kind of social privileges and they were compelled to live an isolated life in the family. Their presence in any auspicious ceremony was considered to be uncalled for.[xxvi] George Forster, in his book, *A Journey fromBengal to England*, observed about the condition of the Hindu widows: "… on all occasions, after the husband's death, the widow is classed in the house as a slave or a menial servant."[xxvii] Raja Raj Ballabh of Dacca and Rani Bhabani of Rajshahi made an attempt to introduce remarriage of widows in Hindu society but could not succeed.[xxviii] From the following tabular data, the horrible condition of widowhood in Bengal are represented:

Table-2: Percentage of widows in Bengal with their age group[xxix]

Percentage of widows amongst women aged (years)	Northern Bengal		Eastern Bengal		Western Bengal	
	Hindus	Musalmans	Hindus	Musalmans	Hindus	Musalmans
10-14	4.28	2.26	3.48	1.46	4.29	2.56
15-19	9.88	3.63	9.23	3.04	10.63	5.83
20-24	16.59	5.99	15.86	4.81	17.62	8.91
25-29	24.11	11.28	25.41	8.95	25.86	15.86
30-39	41.58	26.93	43.29	22.63	42.39	32.39

The upper caste Hindu women were required to relinquish their widowhood by way of burning themselves alive on funeral pyres of their

dead husbands. Raja Ram Mohan Roy himself witnessed the burning of his sister-in-law after death of his elder brother, Jaganmohun on April 8, 1810.[xxx] Even the young wives of tender ages were not spared from burning with their dead husbands. Sati burning was frequently occurred along the banks of the river Hooghly. To occupy her property helpless widows were murdered in the name of Sati rites. In most occasions, widows were forcefully tied with ropes and were thrown into the flames of the burning funeral pyres of their deceased husbands. A horrible act of mass-burning of widows was committed around the second decade of the nineteenth century at Santipur. On the death of Chandra Banerjee, a Kulin Brahmin of Santipur, eight of his wives became Sati on his funeral pyre.[xxxi] In a report of the East India Company Government in Bengal, it was published that 706 instances of Sati burning had taken place in Bengal in the year 1817 and 650 instances in the year 1819.Among these instances, 421 instances took place only in Calcutta Division.[xxxii] In the District of Dacca, one hundred and ninety-five widows burned themselves on the funeral pyres of their deceased husbands during the period between the years 1815 and 1828.[xxxiii] Even at Cossipore, Chitpore and other places in the vicinity of Calcutta, sati burnings were executed up to 1882.[xxxiv] The Muslims of Bengal did not glorify the act of Sati among them. Yet, isolated instances of Sati practice among the Muslims were found. It was reported in the Calcutta Gazette of the 29th July, 1790 that a Muhammadan lady buried herself alive with the corpse of her husband.[xxxv]

In nineteenth Century, widows and women abandoned by their husbands or family members suffered serious social impediments. Harsh regulations were imposed on their daily lives. To avoid these hardships women having high spirit often preferred to burn themselves on the funeral pyre of their dead husbands. A section of the widows renounced their caste and sought refuge in brothels in order to escape these strict regulations.[xxxvi] As a matter of fact, concubinage, immorality and prostitution became rampant in nineteenth century Bengal. In the society, there was a large number of young widows. Remarriage of these widows was prohibited. On the other hand, a similar number of men could not get marriageable girls for them. The inevitable consequence must be

widespread immoral sexuality. The Muslim women of Bakarganj, deserted by their wandering and boatmen husbands, often fell into intrigues. The better-off Chandals (Namasudras) kept widows in the family and lived with them like husband and wife.[xxxvii] In every big towns including Dacca, large number of prostitutes were found.[xxxviii] There were 2,458 brothel keepers in Calcutta on the register in 1880.[xxxix]In Barisal town, a large number of professional prostitutes offered services from the brothels.[xl] An official report in mid-nineteenth century estimated that nearly 12,000-odd prostitutes lived in Calcutta, out of them more than 10,000 were widows and daughters of Kulin Brahmins.[xli] Following are the Bengal Districts where more than 1,000 servicing prostitutes were enumerated in 1872:

Table-3: District & number of prostitutes (over 1,000)[xlii]

Name of District	Number of Prostitutes
Backergunge	1189
Moorshedabad	1269
Rungpore	1275
Midnapore	1339
Pubna	1719
Dacca	1738
Rajshahye	1941
Nuddea	2111
Mymensing	2218
Hooghly with Howrah	3124
24-Pergunnas	15380

The most ignominious chapter of nineteenth century Bengal society was suffering of women and social indignity inflicted on them. The women enjoyed neither any freedom nor any right or privilege. Their status in the society was so deplorable that nearly all the significant social reforms in nineteenth century were centered around them. These social reforms were suitable for the age but inadequate.The socio-religious behaviours of the Kartabhaja community were antagonistic to age-old norms of the society. Theirfollowers, vast majority of whom were helpless widows or women abandoned by their husbands, were severely criticised by mainstream

orthodox society for their free assembly of men and women, violation of caste rules, loose morality and prostitution. From the social conflict between the Kartabhajas and the orthodox society,a miserable socio-economic position of women in nineteenth Bengal can be perceived. The contemporary historical sources corroborate the same portraiture.

Notes and References:

[i]. J. H. E. Garrett, *Bengal District Gazetteers: Nadia,* Bengal Secretariat Book Depot, Calcutta (1910), p.47.

[ii]. Sudhir Chakrabarti, *Sahebdhani Sampradaya Tader Gan*(in Bengali), Pustak Bipani, Kolkata (1985), pp.28, 32.

[iii].Akshay Kumar Datta, *Bharatbarshiyo Upasok Somproday* (in Bengali), Vol. I., Sanskrit Press Depository, Kolkata (Second Edition), p.189.

[iv]. J. H. E. Garrett, *op. cit.*, p.48; Sudhir Chakrabarti, *op. cit.,*p.33.

[v]. Sudhir Chakrabarti, *op. cit*., pp.33-34.

[vi]. Kumudnath Mullick, *Nadia Kahini*, Ranaghat (1317 B.S.), p.234; Nabinchandra Sen, *Amar Jiban*, Vol. IV., Sanyal & Co., Calcutta (1318 B.S.), p.438.

[vii]. W.W. Hunter, *A Statistical Account of Bengal*, Vol. II., Trubner & Co., London (1875), p.54.

[viii]. Akshay Kumar Datta, *op. cit.*, p.197.

[ix]. Jogendra Nath Bhattacharya, *Hindu Castes and Sects*, Thacker, Spink and Co., Calcutta (1896), p.486.

[x]. *Ibid*.

[xi]. Ghoshparar Mela, Sambad Prabhakar dated 30.03.1848, Binay Ghosh (ed), *Samaikpatre Banglar Samajchitra* (in Bengali), Vol. I., Bengal Publishers Pvt. Ltd. (1960), pp.165-166.

[xii]. Kumudnath Mullick, *op. cit.*, p.233.

[xiii]. Akshay Kumar Datta, *op. cit.*, p.196.

[xiv]. Someprakash dated April 4, 1864 cited by Sudhir Chakrabarti, *op. cit.*, p.31.

[xv]. Syud Hossain, "Slavery Days in Old Calcutta" in Rev. W.K. Firminger (ed), *Bengal: Past & Present*, Volume II., Part-II (1908), p.273.

[xvi]. Bangala *Samacharpatra* dated June 18, 1825, quoted in Sri Brajendranath Babyopadhyay edited *Sambadpatre Sekaler Katha*, (in Bengali), Part III., Bangiyo-Sahitya-Parishad Mandir (Asar 1342 B.S.), p.48.

[xvii]. C.J. O'Donnell, *Census of India, 1891*, Vol. III., The Lower Provinces of Bengal and their Feudatories, The Report, Bengal Secretariat Press, Calcutta (1893), p.223.

[xviii]. J. Westland, *A Report on the District of Jessore, its Antiquities, its History, and its Commerce*, Bengal Secretariat Office, Calcutta (1871), p.280.

[xix]. *Ibid,* p.279.

[xx]. W.W. Hunter, *op cit*., Vol. V. (1875), p.55.

[xxi]. L.S.S. O'Malley, *Indian Caste Customs*, Cambridge University Press (1932), p.10.

[xxii].*Samachar Darpan* dated December 7, 1839, Brajendranath Babyopadhyay(ed) *Sambadpatre Sekaler Katha*, (in Bengali), Part II., Bangiyo Sahitya Parishad (Paush 1401 B.S.), p.254.

[xxiii]. W.W. Hunter, *op. cit*., Vol. V., p.55.

[xxiv]. B.C. Allen, *Eastern Bengal District Gazetteers: Dacca*, The Pioneer Press, Allahabad (1912), p.60.

[xxv]. W.W. Hunter, *op. cit*., Vol. VI. (1876), p.282; Arthur Coulton Hartley, *Final Report of the Rangpur Survey and Settlement Operations 1931-1938*, Bengal Government Press, Alipore (1940), para.21, p.12.

[xxvi]. Abbe J.A. Dubois, *Hindu Manners, Customs and Ceremonies*, Translated from the French by Henry K. Beauchamp, Clarendon Press, Oxford (Third Edition), p.353.

[xxvii]. George Forster, *A Journey from Bengal to England*, Vol. I., London (1808), p.68.

[xxviii]. Binay Ghosh, *Vidyasagar O Bangali Samaj* (in Bengali), Vol. III., Bengal Publishers Private Limited, Calcutta (1338 B.S.), pp.164-165; S.M. Rabiul Karim, *Rajshahi Zamindars: A Historical Profile in the Colonial Period (1765-1947)* [an unpublished thesis], University of North Bengal, pp.115-116.

[xxix]. C.J. O'Donnell, *op. cit.*, p.186.

[xxx]. Sophia Dobson Collet (ed), *The Life and Letters of Raja Rammohun Roy*, Calcutta (Second Edition, 1914), p.50.

[xxxi]. James Long, "The Banks of the Bhagirathi", *The Calcutta Review*, Vol. VI, 1846 (Second Part), p.416.

[xxxii]. The Administration of the East India Company, quoted by Harihar Seth in *Puratani* (in Bengali), Vol. I., Chandannagar (1335 B.S.), pp.6-7.

[xxxiii]. James Taylor, *A Sketch of the Topography & Statistics of Dacca*, G.H. Huttmann, Military Orphan Press, Calcutta (1840), p.285.

[xxxiv]. W.H. Carey (ed), *The Good Old Days of Honorable John Company*, Vol. II., R. Cambray & Co., Calcutta (1907), p.130.
[xxxv]. Purna Ch. Majumdar (ed), *The Musnud of Murshidabad (1704-1904)*, Murshidabad (1905), p.157.
[xxxvi]. Walter Hamilton, *The East-India Gazetteer*, Vol. I., Wm. H. Allen and Co., London (Second Edition), p.205; Shib Chunder Bose, *The Hindoos as They Are: A Description of the Manners, Customs, and Inner Life of Hindoo Society in Bengal*, Calcutta (Second Edition, 1883), p.236.
[xxxvii]. H. Beveridge, *The District of Bakargange: Its History and Statistics*, Trubner & Co., London (1876), pp.257-258.
[xxxviii]. B.C. Allen, *op. cit*., p.60.
[xxxix]. B. Joardar, *Prostitution in Nineteenth and Early Twentieth Century Calcutta*, Inter-India Publications, New Delhi (1985), p.21.
[xl]. J.C. Jack, *Bengal District Gazetteers: Bakarganj*, Bengal Secretariat Book Depot, Calcutta (1918), p.234.
[xli]. Sumanta Banerjee, *Dangerous Outcaste: the Prostitute in Nineteenth Century Bengal*, Seagull Books, Calcutta (2000), p.81.
[xlii]. H. Beverley, *Report on the Census of Bengal 1872*, Bengal Secretariat Press Calcutta (1872), General Statement VI., pp.clviii-clix.

Discussion on Some Aspects of Tribal Migration and Their Engagement of Modern Economic Sectors in North-East India during the British Regime

Shipra Mondal
Research Scholar, Department of History,
Jadavpur University

Abstract : Voluntar migration is mainly led by the push-pull factors. And mainly economy is the most powerful element for this migration (Internal or External). By the hand of western colonial powers, the concept of 'worker migrants' was emerged. After the formation of colonies in South Asia, the colonial powers used to provide workers from India to their European colony with the help of the Indenture System. During this period, labourers (mostily from tribal) were exported from India to Fiji, Natal, Guyana, Mauritius, Suriname and other places to work on factories of sugar, cotton, tea plantation and construction. Similarly, the European planters and Industrialists were also imported labourers from different parts of the country into Assam. In this research paper, I have highlighted three points. These are:

I) What were the main push-pull factors that led to enhanced tribal migration in Assam?

II) Form where did the tribal people come to this region? In which area of the working sector did they engage themselves?

III) Has anything really changed in their lives after they coming here?

Key words: Tribal Immigrants, Tea garden 'Coolies', Ex-tea garden labour, Indenture System, 'Arkattis', 'Sardari', Time-expired tribal Labourers.

Introduction

Various factors responsible for Immigration – like socio-political, economic, administrative, geo-climate change etc. It can be said that socio- economic barriers was basically main reason for tribal migration. They migrated to overcome their economic difficulties and to make their lives better, therefore it was a voluntary migration. Their economic

difficulties arose when they came into contact with modern world, which drastically changed their lives. The colonial Government has first imposed taxes on their agricultural and pasture lands also even the forest and restricted them to use forest resources, who look after the forest as a 'mother' and considered use of forest resources as 'blessing'. Because of the lack of rhythm of the modern world with old living, many of them migrated. Their contract with outsiders (Middlemen, Tax collectors, Moneylenders, Planters, Zaminders) was mainly for two reasons – tax collection and commercial agriculture. They have been victims of many injustices, persecution and deprivation and they did not hesitate to protest against this. But many of them came to Assam to avoid this situation and expected that a better life was waiting for them. We got it from the song, "*Chol Mini Asom Jabo, Dese Baro Dukh Re.....*" Was there any change in their lives after coming here? The answer to this question can be said that their condition was not very good during the contractual period (mainly 3, 5 or 7 years). It can be understood from the same song line, *"Sardar Bole Kam Kam, Babu Bole Dhari An, Saheb Bole Lib Pither Cham … Phaki Diye Anilo Assam"* (in 1970s, sang by Bhupen Hazarika in a movie name 'Chameli Mamsaab' came out both Assamiya and Bengali language). After the completion of the contractual period, they were motivated to live in Assam's uninhabited lands and told to turned uncultivated land into arable land.

1.2 Background

The growth and development of the tea industry in Assam during the British regime is the most significant part of the history of Assam. The other developments are either subsidiary or consequential practically as everything else was either contributory or resultant of the growth of the Tea industry. The first few years of the tea enterprise, Charles Bruce and his colleagues depended on Chinese growers. But once the British learnt how to cultivate tea, Chinese growers became expendable. Under the white man's supervision the plantation's prime recruitment became a cheap, docile, easily reproducible labour. British planters were at that time importing a large number of labours annually into Assam from various regions in India; such as Bihar, Orissa, Bengal, Chhota Nagpur, United Provinces, Central Province, Nepal, Madras and Bombay. Local people from the Singpho, Boro, Moran and Kachari tribes are also involved in growing and harvesting tea. The number of gardens had risen greatly in 1905 to 1947 and employment of labour in the Assam valley tea plantations increased from 107,847 in 1885 to 247,760 in 1900 and 40, 9000 persons were employed in the tea plantation in 1903 and by

1938 the number of persons employed in these rose to 531,000 persons. [Bose: 1989: 58]

2. Some Aspects of Tribal Migration

The discovery of tea, its profitability and potentiality had awakened growing interest of the British capitalists in the cultivation of tea in the Assam Valley and it was started growing rapidly from the 1850s. Because of the scarcity of the local labourers, the planters had to face serious difficulties in expanding the cultivation of tea. C.A. Bruce, Superintendent of Tea Culture in Assam voiced in the thirties of the 19th century, *"They want of population, labourers and tea makers are acute. They will have to be imported and settled on the soil."* [Bruce: 1838: 12] The Royal Commission on Labour in India also spoke on similar lines, 'From the point of view of the employer, the outstanding problem during the whole history of tea planting in Assam has been the scarcity of labour'. [Mills: 1854: XXX]

The Assam Labour Enquiry Committee in 1906 calculated that the Assam Valley labour force was short by about 50,000 and that the annual intake was about 3,000 less than what was required; both calculations were made on the assumption that for every garden and every acre one and a half labourers were required. The following are some of the relevant reasons for importing large quantities of labour from outside each year:

2.1 Disadvantage of Chinese labour: In the early stages of tea plantation in Assam, the planters were started planting and growing of tea with the help of Chinese. The initial difficulty was tied over by a few skilled tea makers imported from China. C. A. Bruce in 1838 and the Assam Company in 1839-40 procured several batches of Chinese artisans and labourers on contract to work in their gardens. But the recruitment of Chinese tea makers was a costly affair as they charged higher wages. An ordinary Chinese labourer on contract for 3 years demanded Rs. 16 per month and a Chinese artisan Rs. 40 per month, while their Assamese counterparts demanded Rs. 4 and Rs. 10 respectively. Moreover, the Chinese labourers were most quarrelsome and of un-submissive nature. [Antrobus: 1957: 343] To attract local labour to gardens was the raising of monthly wage-rates from a rupee in 1824-25 to Rs. 2.50 in 1839 and further to Rs. 4.50 in 1858-59. But still the 'Duffadars' (the local recruiting agents) failed to induce the local people, except for a few plain tribes, to work in the tea gardens. [Goswami: 1985: 93]

2.2 Depopulation: The large scale depopulation and the extensive vegetative growth had greatly changed the climatic conditions of the

Valley, making it unhealthy, damp and enervating. The area became a hotbed of germs causing cholera, malaria, small-pox, dysentery, 'kalaazar' and other tropical diseases which took heavy tolls every year. Cholera, in an epidemic form in 1839, 1847 and 1852 and small pox further reduced the population. High mortality thus impeded the progress of population in the Valley which suffered large-scale depopulation few decades back. Beside, the growth of population had been stopped in Assam during the Ahom rule because of the Burmese war caused a steep fall, about75% by 1835. Moreover, due to high rate of opium consumption, the common Assamese did not want to undertake hard labour with only exception of Cacharis. Owing to scarcity of labour, the planters and official circles stigmatised the local inhabitants as lazy and ease loving since they would not work on the tea gardens. A Report characterised the Assamese people as "*Naturally indolent and largely addicted to the use of opium*".

2.3 Self-sufficient: The bulk of the tea gardens were established in the submontane belt of the Valley which was uncultivated and mostly uninhabited. So the plantations need not uproot any local cultivator who might have worked as labourer in the gardens. The population of the Central belt were all cultivators containing no landless labouring class. [Hunter: 1879: 134] They were comfortably self-sufficient and hardly in need of cash except for the payment of land revenue which was nominal. [Reassessment Report 1893: 14]Moreover, they were under the Ryotwari System, so they paid taxes directly to the government. As a result, they did not have to be exploited by middlemen. So, the indigenous Assamese could not be persuaded to leave their farms and villages to work on the gardens. The settled agricultural people of the valley were averse to seek employment in the gardens as tea garden work was meant for unskilled people. The labourers were without any craft tradition or pride in efficient workmanship. An Assamese gentleman thought that 'it is only the most inefficient who will work for hire.' Further, the local people were reluctant to work as garden-labourers because the treatment meted out to garden labourers by the then management was most inhuman and cruel and extremely discouraging for the local peasantry. [Cotton: 1901: 31] Only during the slack agricultural seasons, Assamese cultivators like the other Indians preference leisure to working in the gardens.

2.4 Zamindari System: Social anarchy and economic pressure were undoubtedly the main reasons for migration of poor and weaker section of the society in the neighbouring provinces of UP, Bihar and Central Province. Even an agricultural worker would be unwilling to migrate

from their native village as their peasant masters who utilise their services for the cultivation of land is able to and willing to support them in times of distress while the tenant farmers under the Zamindari system did not enjoy such protection. The principal recruiting areas of garden labourers were those where the exploitation system of land tenure and revenue assessment owing to Permanent and Temporary Zamindary Settlements, created large armies of landless labour class, such as in Bengal, Bihar, Orissa, Chotanagpur, Central Provinces (now Madhya Pradesh), United Provinces (now Uttar Pradesh).

Proportion of Agricultural Labourers to the Total Agricultural Population, 1930

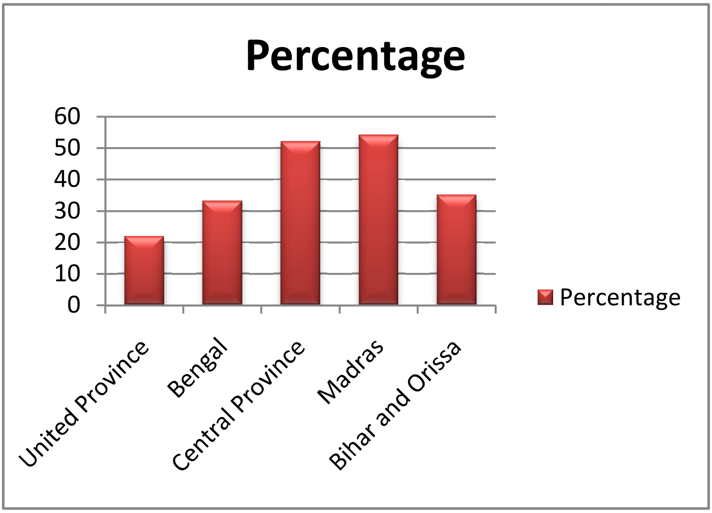

Source: Report of Indian Statutory Commission 1930-31, p. 40-41

The early migration to Assam was conveyed by the feudal lords and Zamindars, as a result of excessive exploitation and economic harassment of the lower castes peasants and landless workers. Soon, the tea gardens were occupied by the poor and lower caste especially tribal, who were the victims of exploitation. Sometimes, due to occurrence of natural disasters like droughts and floods, the economic failure of the people to fulfil their limited desires and then epidemics, leading to migration.

2.5 Peasant Movement: There were frequent famines in Bihar in 1866, 1874, 1896 and the British government focused on the development policies and neglected the relief measures or other crash programmes. [Kumar: 2006: 38] Not only did the poor peasants migrate for survival during the famine, but the British government's coldness to the tenants increased the tension in the rural areas and frequent peasant uprising led to immigration. Lot of peasant movement was occurring in different places of Bihar and Bengal during the period of 1860-80. At one time almost 10% of the adult population of Siwan and Gopalganj (Bihar) migrated. The tribes also suffered a lot due to the recurrent unrest in the Chotanagpur plateau. The 'Sardari larai', 'Birsa Movement' and 'Tana Bhagat Movement' in Chotanagpur division and the 'Kharwar Movement' in Santhal Pargana created a great turmoil. Some of these took on devastating proportions that did not stop without destroying men and crop. Innocent people were starving and dying. In such a crisis, the recruiters took irrational advantage of the situation by making false promises to recruit them.

2.6 Push-pull Theory: Thus, while the demand for labour to work in the tea gardens of the Valley generated a 'push-effect' (repulsive force) to migration. It is said that economic push and pull happen to be the main causes of the great majority of population, particularly migratory movement. The unfortunate simple tribes were neglected by the new master, oppressed by the aliens and deprived of the means they had formerly possessed in obtaining redress through their own chief. To escape from social and economic oppression at home, the innocent tribal has no other alternative than to accept tea plantation work. In some villages, the tribes had completely lost their proprietary rights. Under the 'Kamiauni' system, they almost became slave for life. Sometimes even their children had to serve for the debt they had not cleared. In such a deplorable situation emigration was a good way to escape from the claws of the Mahajan (money lenders). [Hunter: 1879: 254]

The colonial government knew the nature and aptitude of the cheap and docile tribal workforce of Chotanagpur, simple plain people of Bihar, UP who had proved themselves very successful in sugar plantation in Mauritius and the West Indies. Beside, since when tribal died in large

number during their voyage to the European colonies, they preferred the tea garden in Assam. Therefore, the same British colonial administrators started importing labourers to the N.E India from the same regions.

3. Immigrated Tribal groups and their origin (birth place)

The competition from colonial emigration department, jute and the mining industries also came in the way of labour recruitment for tea plantation in Assam. Mostly the tribals – Kol, Gonds, Pannika etc. emigrated from Raipur and Bilashpur. But much more than that was contributed by Ranchi and other districts of Tribal Bihar in the first decade of the 20th century. From the Ranchi district alone in around 1906 as many as 91000 labourers immigrated to Assam. The tribal communities like the Santhals, Mundas, Oraons, Kharias, Gond, Khond, Kisan and Nagesia were mainly recruited. Among others Savaras, Gondvas, Projas, Pankhas, Turies and Bauries were the recruits. [Roy barman: 1968: 8]

The chief recruiting centres in Bihar were Shahabad (Arrah), Munger, the tribal areas of Santhal Parganas, Gaya and Bhagalpur. In other tribal areas of Bihar (Chotanagpur division) the centres were Hazaribagh, Manbhum, Lohardaga, Singbhum. In Bengal it was Burdwan, Midnapur and Birbhum. The Ganjam district of Orissa supplied a good deal of labour to Brahmaputra Valley and Barak Valley. The recruiting centre was Berhampur and Madras. [Immigrant Labour Report: 1877-1932] These people were tribal and preferred to work in the gardens and not in the mines or railway. They had a good physique, better work culture and they were more willing to emigrate. [Foley: 1906: 47]

4. Except tea garden Coolies; Tribal labourers on other work

4.1 Construction: The process of economic development in Assam towards the second half of the 19th century necessitated various kinds of constructional works in the form of roads, railways, steamer-ghats, airfields, tea garden employees' residences, tea-factories, plywood factories, military outposts, industrial establishments, godowns, administrative offices, educational institutions and various other establishments.

There was acute shortage of labour in Assam, not only in the tea gardens but also for other works. Griffiths reported that the Public Works

Department also entered the labour market in competition with planters. During the period of growth of the tea industry demand for labour had also come from Railways and Mines. It is natural that the time-expired labourers (and also deserters) found avenues for employment as casual labourers both in the P.W.D and railways. Large number of ordinary unskilled labourers was employed throughout the entire length of the railway over the rest of India amongst the poorer classes of cultivators. Many came voluntarily from the Makran Coast near Karachi, Kabul and North-West frontier. Initially attempts were made to import men from the labour districts of Bihar, from where the bulk of the plantation labourers came. [Hilaly: 2007: 175] It was under this new 'Emigration Clause' that labourers for the railways in Assam were recruited. Between 1895 and 1897, there was a marked increase in the number of free immigrants recruited by contractors, due to a demand for construction on the Assam-Bengal Railway. It rose from 15,054 in 1895 to 95,014 in 1896, slightly declining in 1897 to 54,934. During the corresponding period, recruitment through *sardars*, licensed contractors and special agents was 21,234 in 1896 and 39,657 in 1897. [General: 1898: 23]

4.2 Private Enterprises; Oil and Coal: From the nineteenth century, under colonial intervention, private enterprises in the mining industries had begun in Assam, notable among them being oil and coal. Since labour was not available locally, the coal industry had to depend on migrant labour. In 1921 Census of India Reported: 'The coal mines, oil wells and saw-mills of the Assam valley generally recruit their labourers by 'Sadari' method also, and from the same districts, though the coal mines employ also a certain number of Chinese, makranis and pathans. The number of workers and dependents in these industries is over 10,000; but there are no separate statistics to show their birthplaces.' [Census: 1923: 36]

The coal-mining industry in Upper Assam as undertaken by the Assam Railway Trading Company which operated railway line between Dibrugarh and Sadiya from 1882. Coal was necessary to run the railway. Steamships and tea gardens required coal from the Margherita-Ledo area. Coal-mines in Upper Assam were discovered as early as 1825 but production was undertaken only after the completion of railways in

Upper Assam and development of plantation industries. As the tea industry faced the problem of labour, so also the coal industry, the labour, mainly Nepalis, who were thrown out of employment after the completion of railway lines, was absorbed in coal industry. The system of recruitment of Nepalis as coolies in the coal mine of Assam was known as the Short Term Contract System. Under this system the labourers were recruited temporarily for a period not exceeding one year within which they were to be repatriated at their employer's expenses. But the nature of employment did not attract the Nepali immigrants to go for such employment. Therefore recourse was taken to importation of tribal people from Telegu territories of the south and in course of time mining became practically dependent on Telengi labour. The number employed by all the coal-mines of Assam rose to 7,325 in 1941.

Conclusion

They left their homeland and come here with many hopes and dreams. Thought the sad days would be over, but even after coming here, they had to work hard for two times meals like before. They need to face many obstacles for better lives and seem to be still today. The documentary film "Kora Rajee" shows that even after coming to work in the tea garden, they were deprived of their expected life and how difficult it was to sustain lives when the tea factories were closed. Gradually in the North-East, they were given a distinct identity as the 'Tea Tribe Community', but they did not receive any status. They have been fighting a long time for the Schedule Tribe (ST) status. But they haven't achieved that yet. They were given the title "Tea Tribe Community" as a nickname to indicate that they were different from other indigenous or tribal groups in the North-East, but did they still have their status, their right? The answer is no. Every political party promises to hit the vote bank before the vote but at the end of the vote they have to be satisfied only – 3 rupees per kg of rice or free rice or sugar. They have given so much in this land – labour, blood even life. What did they get in lieu of? Every worker class people serves all their life, instead do they get the equitable right?

References

Antrobus, H.A. (1957) *A History of the Assam Company 1839-1953*, T. and A. Constable Ltd., Edinburgh.

Assam Branch ITA to Govt. of Eastern Bengal and Assam(1908), ITA, Annual Report, Shillong.

Assam Valley Reassessment Report (1893), Government of Assam, Shillong.

Bose, M.L. (1989), *Social History of Assam; Being a study of the origins of ethnic identity and social tension during the British Period 1905-1947,* Concept publishing company, New Delhi.

Bruce, C.A. (1838), Report on the Manufacture of Tea and on the Extent and Produce of Tea Plantation in Assam, Government of Bengal, Calcutta.

Census of India 1921(1923), Vol-III, Assam, Part –I, The Govt. Press, Shillong.

Das, Rajani Kanta(1931), *Plantation Labour in India*, Government of India, Calcutta.

Dasgupta, Keya(1986), Wastelands Colonization Policy and the Settlement of Ex-Plantation Labour in the Brahmaputra Valley: A Study in Historical Perspective, CSSS, , Occasional Paper, No. 82, Calcutta.

Foley, B. (1906), Report on Labour in Bengal, Calcutta.

General Department(1898), Emigration Resolution no. 2421, Calcutta.

Goswami, Homeswar(1985), *Population trends in the Brahmaputra valley, 1881-1931: A study in historical demography*, Mittal publications, Delhi.

Henry Cotton, Labour Immigration Report of Assam for the year 1900, Government of Assam, Shillong.

Hilaly, Sarah(2007), *The Railways in Assam 1885 – 1947*, Pilgrims Publication, Varanasi.

Hunter, W.W. (1879), *A Statistical Account of Assam*, vol-2, Trubner & co., London.

Hunter, W.W. (1879), Statistical Account of Bengal – Hazaribagh and Loherdaga district, Calcutta.

Kumar, Purnendu(2006), *State and Society in North-East India; a study of immigration tea plantation labourers*, Regency publications, New Delhi.

Mills, A.J.M. (1854), Report on the Province of Assam, 1853 on 19th July, Government of Bengal, Calcutta.

Phukon, Umananda(1984), *The ex-tea garden labour Population in Assam: a Socio-Economic Study*, B.R. Pub. Corporation, Delhi.

Report of the Assam Labour Enquiry Committee (1906), Government of Eastern Bengal and Assam, Calcutta.

Report on Immigrant Labour in the Province of Assam (Annual files 1877 to 1932), Assam Govt. Press, Shillong.

Roy Burman, B.K. (1968), *Socio-economic Process in Tea Plantations with Special Reference to Tribal Labourers*, Delhi.

The Colonization of Wastelands in Assam (1898), Government of Indian and chief commissioner of Assam, Calcutta.

Preventive conservation of the traditional fishing tools by the fishermen of sunderban in West Bengal

Ashis Majumdar
Research Scholar, Department of museology
University of Calcutta

Introduction:

The fishing communities are dependent on the resources of fish in sundarban of West Bengal. They earn their livelihood by fishing and related occupations. Every day or seasonally they go to the river or estuaries in sundarban for catching fish and crab. Generally, they use most wonderful indigenous method and technique for the purpose.

The fishing tools can be classified into four categories depending on the material used for their construction. These fishing tools are made of (**a**)bamboo(**b**)hooks(**c**)bamboo and nets and(**d**)nets. The fishermen of sundarban use different tools,such as ghuni, antol, polo, kenko, doar, paron, gungi or toradang, konchor raksha, eknala, tera, kole. They use various types of fish hooks.There are also different types of net-min jal,shangla jal,vesajal,kaijal,chhankni jal,khepla jal,batajal,chandi jal,use by those fishermen who used to catch fish in the khanris in sundarban. Those fishermen who are going to fishing by trolar and large eangine boat in deep seas use net such as hilsa net,Which are different type of shapes like "fart jal and ghano jal".Fart jal is used for big hilsa and ghano jal for small hilsa in comparatively.In local market small hilsa are called 'khoka'hilsa.There is pomfret net for pomfret fish..Trolar and engine boat are most important equipment than another equipment.

Community:-

A large number of fishermen of sundarban are depended on fishing in river,coves and estury. The people of Malo and Rajbonsi lead their livelihood.In catching fish from ancestral time. They are originally belong to fishing community. After the partition of nation they had come as a refugee and lived in different parts of sundarban. Most of the fisherman came in sundarban from Khulnadistrict in Bangladesh. Then

the people of rajbonshi live at the places satjeliya, goosaba, masjidbari, jharkhali, molla khali, amlameti, kultai, namkhana, raidhigi, kachukhali, hasnabad, nyajat, haroya, hingalgonj, etc. Bagdis are also fishermen who came from rarod anchal.The people of bagdis are divided into five categories-tetuliya,dule,jele,tibarand mete bagdi.One part of kayabarto category lead their livelihood through fishins.At present a large number of people of the islands in sundarban involve in catching fish.The people of rajbansi and malorai must demand themselves as a category of original fishermen.The 80% islanderof sundarban is involved in this occupation.

Technique:-

A large number of fishermen of sundarban island are used fishing boat and net for fishing.In ancient time they used traditional equipment. Now they use country boat (nouka)and modern motorized fishing trolar with the permission from the forest gopal.They also use their traditional knowledge and technique for fishing.They apply their own science in which river,sea and nature of fish are observed directly through generation to next generation.The people of the fishermen observe the weather by analyzing water color,speed of wind and nature of wave and also able to mark the presence of fish in the water and also their different varieties.

Traditional fishing tools use and preventive conservation of the traditional fishing tools:-

Ghuni, attol, polo, kenko, doar, gungi, etc. tools are used in rainy season for fishing.This tools are made by bamboo,cane and jute rope.**Ghuni:**-there is also a special type of trap.It is made of thin bamboo sticks tide together with can strings in shape of a rectangular box.There are small vertical sides.One in one side and two in the other.But some cases one in one in each side and also two in one side and three in the other found.The first one is known as ghuni in Bengal and the second is toobo of the bunas of Bengal and the jhumri.The thronlined trap is known as the paron in Bangaladesh.

Polo:-The parois(fisherman) of Bengal are usually found to catch before rains in the soft muddy place and sometimes in shallow water, with the help of this trap instead of using bare hands. Such type of cage trap is known in Bengal as the polo.The tool resembles the shape of a dome with short stem of about 6'' diameter open at the top. The diameter at the bottom varies from 2 ft-$3^{1/}{}_{2}$ ft.and even upto 4 ft.and the height varies from 2- 3ft. It is prepared out of small bamboo strips fastened with fine and flexible cane slips.The man who uses it hold it by the side of the stem, presses its rim on the mud,then pulls it back and lifts above or up to the level of water and again presses it as before while moving on through water.Whenever any fish is caught, he puts his hand inside through the stem to catch hold of the fish.

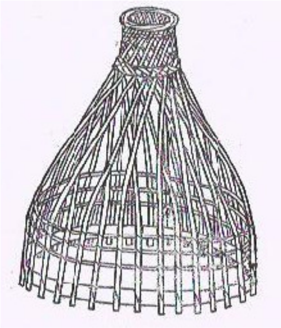

Khaloi:-The 'khaloi' is prepared with bamboo strips which is used for temporary keeping of fishes during hand-net fishing.The strips required for the weft are very long,while those for the warp are short. The 'khaloi' is woven in the shape of an earthen 'kalasi' or pitcher.

Vombuchanhai:-There is another variety which has also two valves but placed in opposite directions to allow fishes coming against and with the current of water to get into the trap. This is illustrated by the specimen known as the vombuchai used by the chakmas of Chittagong hill tracts.

Doar:-It is the most important equipment for the fishermen of Bangaladesh sundarban area.It has two valve.After rainy season when the pond and paddy field are dry up,the fishermen are conserved those equipments with well wash in fresh water,then drying and repairing from any damage part.And those are queuedly tide and hanging in the crossbeam of straw mud house preventing from sunlight and water.In marginal area of sundarban these equipments are preserved in straw

thatching hut very carefully. In this way if conservation equipments are remained well and strength.Pitch used to conserved the equipments of bamboo in recent time. Moreover kerosene is used in those equipment to protect from insect.

Harpoons-There is another traditional fishing tools is harpoons.It has different type. which have their head points detachable but after their detachment they remain together by a string tide to both of them. The shaft floats on water and there by indicates the position of the head within the water.The head points of these weapons vary from one to many – when the weapon has one head it is called the *eknala*,three head points called *tera.*

Arrows - there a special fishing equipment is arrows.It is short with the helpsimple brow and are used by the fishermen of sunderban area.and the Andaman island fishermen and sandals of Mayurbhanj. Shooting with arrows is a device found in many places while shocking the fish with the help of a dynamite and then collecting them is certainly a moment device.

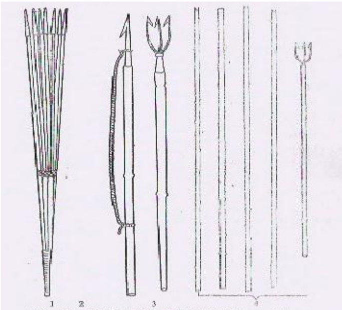

Figs. 26-29. (1) Eknala ; (2) Teta ; (3) Konch ; (4) Kole.

Konch, raksha,tota,eknala,tera,kole,choki,arrows,harpoon and different type of fish hook are important fishing tools.Those metal fishing equipment are conserved very carefully.The fishermen of sundarban follow the ancient technique and apply there long experience for conservation.Those equipments are very sharp and pointy.At the using time if damage they are repair it in their own technique.After using those are cleaned and smeared with oil.There are two parts of those tools one part is wooden or bamboo handle and other part metal.The wooden part of the tools is smeared with oil like-mustard oil,kerosean ,mobil and pitch.Metal part of the tools are used pitch and covered with oil cloth for protecting from rust .In resent time this metal part is colouring and smearing of nickel for protecting from rust.

Fish-hook:-Fish hooks are small curved rigid steel wire or without barber point.They are attached to a string known as line tied to one end of a fishing rod.This is the *barsi* of Bengal. The Rod and line method of fishing is comparatively a recent device.Here the fish is lured with the help of a bait, which when swallowing the bait is caught big in the hook.In recent times developed rod and line such as the wheel rod and the line are used in catching big fish.In rod and line method through knowledge about the habits of fish is essential. Some times a number of hooks are attached in bunch or each at an interval to a very long string provided with a float at the upper end.This is called the *done barsi* (use by the jaliya kaibarto and malos of sundarban)Hooks are always provided with baits at the point to allure a fish.

Fish-hook

Fish hookes are cleaned very carefully with sand and water to remove rust(Fe_2O_3).Then water is removed from its and those are sinked in the coconut oil or mustard oil or kerosean.

Net-Among the tools of fishing, net is the most important equipment. Fishermen are applied different method to conserved those net. **Min jal** is generally use from the time of astomitithi to full moon for catching prawn.Its rectangular shape is made bamboo.It is pulled opposite of current in the river bank to catch the seeds that come with the tide. Women and children focuses on pulling nets along the bank of a river. A three or four feet wide or six feet long mosquito net fitted in to wooden frame is what they use to collect prawn seed.However, this is a more predominant method and is more popular among women as it enables them to remain close to their neighbourhood and return to their

household chores whenever they want to. Children on their way to school or way back find it convenient to spend time to catching prawn seed along the riverbanks. Most of the poor families, who fish along the riverbanks, live in proximity to the river because their houses are located either on embankments or closer to the edge of embankment.Prawn seed catching constitutes an important source of income for poor families in the sundarbans.Surprisingly,prawn is also a source of quick and huge money for the islanders.For many sundarbans islanders,prawn was like a lottery as it helped change their fortune almost overnight. In Bangladesh and West Bengal, the growth of an export-oriented brackish water prawn aquaculture industry started in the 1960s. The industry picked up very rapidly and by the late 1970s,prawn seed collection had become very popular in the sundarban.This net is conserved with traditional way.After catching fish they are clean with pond water and then repaired, if there is any slot.Chhakni jal,khepla jal,chakna jal,tora jal,thela jal,bera jal,kai jal, etc are preserved in the same method.

3: Women catching tiger prawn seeds along the river bank

Chhaknijal/Hand operated nets----with or without bamboo frame.*chhaknijal* attach with a round bamboo frame. It used by lower sundarbans islander and oraons of chotanagpur, are used this net.

Jhankijal/Cast net- with sinkers at the edges which when thrown spread on the water in a circle .This type of net is called *khepla, kwela* or *jhanki jal* in Bengal.

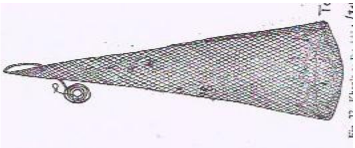

Berajal/Sein net—there is long net provided with floats along the upper edges while along the lower edges sinkers are tide.The example is *berajal* used by the nuliyas of Orissacost and the fishermen of West Bengal in matla river,raimongal ,namipukur,chiturikhal.

Shanglajal/Trawl net- this is a bag like net provided with a bamboo frame which by a string arrangement can be

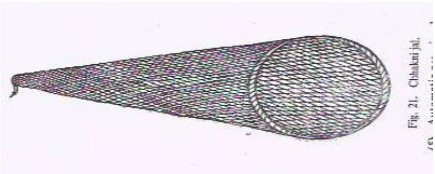

operated or closed.The fishermen of sundarban are used this type of net by boat .In local language this net is called *shangla jal***.**

Koijal/Automatic net-this is a long net with floats along the upper edges stretched across a current or stream. The *koijal* used for catching specially *koi* fish in the paddy fields or pond duringthe rainy season in an illustration.This jal used generally in rainy for catching the fish like *koi,singi,mangur,shoal,latha,punti,fishes* are caught by this jal.

Fig. 24. Kaihl.

Vesajal-It is almost triangular in shape.The threesides of the net are bound to the bamboo poles.The two sides forming an acute along are placed on the gunwale of the boat or attached to the fixed bamboo poles set up in the river or water logged area andare entirely of long bamboo,but the extreme side of the net is secured by a double split bamboo.This net is known locally as the *vesal.*

Pomfret net:- The pomfret net usually use fishing for pomfret fish in the Bey of Bengal. Especially this net is used in winter season. The fishermen are prepared the pomfret net for fishing in the middle of November. They have taken 10 to 15 days for preparing this net. This net is larger in 2000 – 2500 meter. This pomfret net is not only used for pomfret fish but also unfortunately is caught different type of fish. The fishermen are used this net from middle of October to February. At the end of the season the pomfret net is conserved by the fishermen, for next season. After catching the fish the pomfret net is washed in the fresh water. In the sunshine they are dried. The fishermen usually repair any slot of the net. Pomfret net are folded step by step. Those nets are kept on a wooden platform with shade. There for the pomfret net is conserved for long time and is permanently useable for a long time. The pomfret net is conserved by fishermen in their own indigenous knowledge and ancient technique.

Hilsa jal-The fishermen of sundarban who are going to deep sea for fishing with trolar and engine boat,catch hilsa fish in rainy season. Monufilamant jal and nakura jal are used for fishing hilsa fish from june to October.At the end of season the fishermen conserve those net for next season.At first fishermen from trolar or engine boat carry the net to nearby pond for washing by 10 to 12 team members.Then the frayed of the net are repaired by the hiring labours.Then those are bundled in part by part.Those are kept on the brick in certain places.The thatching of straw is used for keeping the **nakura** jal.Insecticides are used for protecting insects,rat etc.In certain time platform is made on the water in the pond for conserving this type of net.This method is controlled humidity and prevent from rat.There is use electronic bell for prevent the rat.

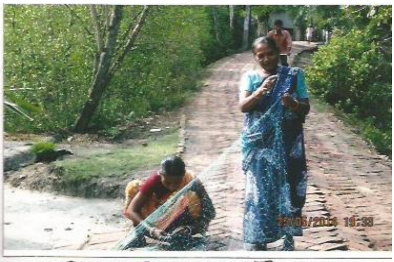

মহিলারা ইলিশ জাল সেলাই করছেন।

Boat and trolar:-Fishermen are pull the boat and trolar on ashore from the river end of season for repairing and conserving.Then boats are washed with detergent brush and water.Then the pitch layer of the boats are removed by burning fire. The joints of plank are covered with cotton and layer with putting and smeared with new pitched to protect from water.The putting is made by resin and turpentine and different type of materials.It is preventing from saline water.So the water cannot get into the boat.This traditional system is carried by them for a long time to till now.At present modern technique i.e fiber system is used instead of traditional technique. Propagators at boat and trolar desire to use fiber system in recent time

instead of traditional system.The fishermen of sundarban in West Bengal conserved the fishing tools following the traditional method.

Challenges: The fishermen of sundarban from ancestral time used to conserve the equipments of catching fish in ancient traditional way.But this conservation to them is a great challenge now a days.Becouse now it depends on basically the weather of environment. In recent time technique of their conservation has been changed due to the change of weather and climate.for this reason different type of chemical are used in modern time.There fore they have to spend enough money for conservation in modern time. Beside this they have to face for adopting modern technique of conservation of fishing tools.They do not know how to use the modern equipment of catching fish.If the fishermen wrongly use the technique of conservation of modern fishing object,those tools are probably damaged soo.

Conclution: The labourer of sundarban especially fishing community are very courageous, sufficed the lead their livelihood.Through struggling of disaster of nature and frightful situation of water and jungle in other way they are deprived from the advantages of society.They are combative strongly minded because they fight against all kinds of disasters.They donot care any danger of life. Above all, they fight for their life and livelihood.They think themselves catch other to relatively. They loved eatch other .The close relationship of each category of people is the base of society.

This study attempts to fiend how the fishermen people of sundarban use their knowledge and technique for preserving the traditional fishing tools.This paper focuses on the preventive conservation methods used by the fishermen in sundarban with their indigenous knowledge for conservation of these traditional tools.These include

cleaning in fresh water,sun-drying,use of kerosene,insecticides or pesticides, putting up the nets on the mancha the thatched huts roof,and so on.

Bibliography

Bhattacharya, Kapil, sadhin varoter nadnadi parikalpana, kalam,Kolkata,(first issue)1986.
Choudhuri, Kamal,24 pargana narth and south Sundarban, Dey's publication, Kolkata,2013.
Das, Nirmlendu, Sunderbaner lokosanaskriti,Gnan prkasan,Kolkata,(first issue)1996.
Ghosal,Indrani,Bangalar nadikendrik upanyas, Grantha prakasani, Kolkata,2004.
Gudiya, Mohadeb, 24-pargana samagra, Pandulipi publication, Kolakata bookfair,2013.
Hunter,w.w.,a statistical account of Bengal. Vol.1 districts of 24 Parganas and Sundarbans. Trubner and co.London 1875.
Islam,Sekh Rejwanul,Sundarbanervprantik jibon o Aitihya, Dey's publishing,Kolkata, 2013.
Jalil, a. f. m., Sundarbaner itihash, new sarada press, Kolkata,2000.
Mandal, Anjali bikash, Sunderbaner sekal-akal, Rupkatha publishing, kolkata,(first issue),2011.
Mandal, Swpan kumar, Sundarban Vraman bretanta, Katha publishing, Kolkata,,(first issue)2011.
Mathur,R.P.G., Ecology,Technology,continuity and change among the ....
Mitra, Satishchandra, Jessor-khulanar itihas, dey's publishing, Kolkata, (first issue) 2001.
Mondal, Najibul islam, Sundarbaner lok sanskruti bisesh sankhya, Dey's publishing Kolkata,2014.
Mukhopadhyay,Amitesh, Living with Disasters communities and Development in the Indian Sundarbans,Cambridge University press,2016.
Naskar, Durjuti,Dakhin chabbisparganar loukik devdevi-bibigazi-pirpirani o loksamaj,West Bengal, Dakhinchabbispargana jela sankha, information o culture department,government of West Bengal.

Pramanik, S.K., Fishermen community of Coastal villages of West Bengal.Rawat publication, jaipur-302004,1993.
Pramanik, S.K.,and Nandi,N.C.,Fisheries sociology of Indian sundarban. Narendra Publishing house, Delhi-110006,2011.
Pramanik, Sankar Kumar, Sundarbaner kankdamara, Vibekananda bookstall, Kolkata, 2014.
Roche patrick A,Fishermen of Koromandal a social study of the paravas
Roy, Niharranjan, Bangalir itihas adi parbo, dey's publishing,kolkata,
Roychowdhury,Arunima,Pragaitahasik Bharatbarser praster jug theke loha jug, ,Mitram publication, Kolkata,2011.
Singh,Sukumar, Sundarbaner itikatha o a-sarakari unnayan sanstha, mass education, Kolkata,2002.
Sur,Sujit,Bangalar prachintamo lokopuran- Manasamongal.

A Study of Diasporic Writing of Indian Women Novelist

Somnath Kar
Assistant Professor, Ranaghat College
Ranaghat, Nadia

Abstract : In the last some decades, there has been an astonishing flowering of writing in English by women of the Indian Diaspora. They mostly articulate their discontent with the dilemma of the upper-caste traditional women who are trapped in repressive institutions such as child-marriage, dowry, and prohibitions on women's education, arranged marriages and imposed widowhood.

Apart from illuminating the true state of Indian society and its treatment of women, their work is marked with themes such as East/West confrontation, Diaspora, and the experiences of immigrants. The clash between tradition and modernity, finding identity in exile, and adjustmentto the new surroundings is the impulse behind the works of acclaimed migrant writers. Thepresent paper examines the Diaspora consciousness as found in the literary work of Indian descendent women.

Keywords: Indian Diasporic writing, Diasporic women writers, Issues and confrontation of Diasporic writing.

"Sometimes we feel we straddle two cultures; at other times, that we fall between two stools." — Salman Rushdie, Imaginary Homelands: Essays and Criticism 1981-1991

However, there is no way to dismiss the diasporic Indian English writers merely as neocolonizers who achieve fame at the cost of the history, culture and customs of their country. Diaspora writing all over the world is an acknowledged stream in literature, social studies andanthropology. Diasporic writes experience a poignant transition where they have to assimilatedifferent cultural identities to create a hybrid and cosmopolitan self.

Migration has become a widespread phenomenon in the current world. Immigrants, the people who come to live permanently in a foreign land play a significant role in this process. A Diasporais the group of

people who are living away from their original homeland and share common experiences. Diasporic literature or immigrant literature is generally referred to the literary work done by immigrants. Diasporic Indian English literature in the universal Diasporic literature has gained much credit during the last few decades. There is a significant place for Diasporic Indian English fiction in portraying mainly about Indian Diaspora in a wide span.

The origin of English literature written by Indians can be traced back to the era of colonization inwhich India was under British rule. J. V. Desani's novel All about H. Hatter (1948) and Ved Mehta's novel Delinquent Chacha (1969) have the first references of immigrant experience in Indian English literature yet they lacked the depiction of life struggles or despair of Indian immigrants. Thus The Nowhere Man (1972) of Kamala Markandaya and Wife (1975) of Bharati Mukherjee are considered to be among the first few novels which depict the discrimination,disappointment, despair and isolation faced by Indian immigrants who are living in foreign contexts. Hence the establishment of Diasporic Indian English literature as an independent genre of Indian English literature is regarded at the end of 1980s.

Indian women Diaspora writing made its landmark entry with the writings of Bharati Mukherjee,ChitraDivakaruni and JhumpaLahiri who have all made their names while residing abroad. One of theimportant aspects of these writers is that they write predominantly the experiences of migration. They have given more poignancy to the exploration by dealing not only with a geographical dislocation but also a socio-cultural bond with their homeland. The contemporary life in India and of Indians living abroad is the primary concern of the Indian descendant women short story writers. They are significant because they are highly educated, intellectually strong, powerfully vocal and expressive of their vision

Writers of Diasporic Indian English literature can be divided into two categories: first generation immigrants and second generation immigrants. First generation immigrant writers become representatives of immigrants who have lived a considerable period of time in their motherland and now are trying to adapt into new contexts after immigration whereas second generation immigrant writers represent the

descendants of first generation immigrants for women, dealingwith issues of sensibility, emotional complexes, the generation gap, cultural clashes, and multiculturalism. They explore new sexual mores, fresh possibilities in human relations, marriage and motherhood. They have been prolific in their output and have also won many distinguished fellowships and awards. They have made the short story an effective tool for the promotion of secularized democratic Indian culture in the west and formed a bridge between the native and the Indian Diaspora.

When you live in a country where your own language is considered foreign, you can feel a continuous sense of estrangement. You speak a secret, unknown language, lacking any correspondence to the environment. An absence that creates a distance within you .

- Jhumpa Lahiri

The Indian descent writer of the new generation who deserves a place of high respect is JhumpaLahiri. Her debut collection of stories, Interpreter of Maladies won universally good reviews and the 2000 Pulitzer Prize for fiction. In these stories, Lahiri captures the small moments of displacement of the Indians living in a foreign culture. Her second collection of short stories Unaccustomed Earth (2008) deals with emotional complexes of characters suffering in an alien land. Lahiri feels fortunate that she was able to absorb the Indian culture in a natural way. She learned about her Bengali culture at an early age, travelling regularly to Kolkata spendingconsiderable time with her extended family. The disinterest of her teachers and friends in the US about her frequent absence from school made her experiences in India more natural.

A recurring theme in many of the short stories of Indian Diaspora women writers of the recent years is a sense of consciousness to the homeland. The concept of home, nation and belongingness to the place of origin find an important role in moulding their personality. In theolder generation immigrants' writings, the question of identity, feeling of alienation, rootlessness is predominantly explored. But those writers born and brought up in the host cultures are torn between two different nations and countries and hence they are described as having a hybrid identity. They adopted and assimilated the elements of both home and host cultures and same is demonstrated through their writings. However the

Diaspora women short story writers have enhanced the literature with their universally appealing themes and basic human values. They have strengthened the tradition of the short story in Indian Diaspora Literature. It is considered that the portrayal of Indian immigrants in fiction written by Diasporic female Indian writers has more subtlety and sensibility.

Language, identity, place, home: these are all of a piece - just different elements of belonging and not-belonging.

- Jhumpa Lahiri

Kamala Markandaya is considered to be among the first few Diasporic female Indian writers.She was born in Maisoor in 1924 and later immigrated to England. The protagonist of her novelThe Nowhere Man (1972) is oppressed by the discrimination even after living about thirty yearsin England. He lives in a dilemma as he can neither accept India nor England as his homeland.

Anita Desai, who was born in 1937 in Dehradun and immigrated to England and America respectively is another prominent Diasporic female Indian writer. Her novel Bye Bye Black Bird (1971) portrays the immigrants who are in search of their identity in another land.

Bharati Mukherjee, another famous Diasporic female Indian writer who was born in 1940 in Kolkata and later immigrated to America. Her novel Wife (1975) depicts the transformation of amodest, onventional Indian wife to the murderer of her husband. Her fantasies about a high standard of life in America catastrophically shatter after the immigration and she becomes a victim of mental trauma, which leads her to commit the murder. In contrast to her novel Wife, the naive, dependent female protagonist of her novel Jasmin wisely uplifts herself to be an independent, brave woman after the conflicts she faced in an unfamiliar context.

Born in Kolkata in 1956, Chitra Banerjee Divakaruni immigrated to America and came into spotlight as a female writer in Diasporic Indian English literature. Her award-winning novel TheMistress of Spices (1997) portrays an Indian girl who works in a spice shop in Oakland, America and helps other immigrants to resolve their problems with the magic of her spices.

JhumpaLahiri is a second generation Indian American who was born in London, 1967. Her parents were immigrants from the state of West Bengal, India. Her award-winning novel The Namesake (2004) is considered to be one of the best fictions written about immigrant life. In this novel, Lahiri has successfully engaged aspects like the generational gap between first and secondgeneration immigrants, conflict of east-west beliefs, cultural displacement, and nostalgia, loss of identity, alienation and despair. The movie which was adopted by this novel too gained muchattention worldwide.

Kiran Desai, the daughter of Anita Desai is also a famous writer in Diasporic Indian Englishliterature. She was born in Chandigarh on 3rd September, 1971. She immigrated to England and then to America with her mother, who inspired her towards literature. Kiran Desai in her second novel The Inheritance of Loss (2006), subtly portrays the life struggles of Indian Diaspora as well as the aspects of globalization, racial intolerance, terrorism and multi-cultural societies. This novel brought her much credit through awards like 'National Book Critics Circle Award' and'Booker Prize', making her the youngest female recipient of 'Booker Prize' so far.

In conclusion, it is apt to say that Diasporic Indian English fiction is an important genredepicting the experiences and mentalities of Indian Diaspora in a broad sense. It makes space forthe discussions about Indian immigrants and offers emotional security to that particular Diaspora. Being the representatives of the Indian Diaspora, Diasporic female Indian writers are successful in addressing the readers of Indian English literature in a sensitive, unpretentious style while carrying a sense of the universal experience of immigration. Furthermore, Diasporic Indian English fiction keeps their writers linked with India and the entire world.

"When one was reinventing oneself, anywhere could be home. Pull up your shallow rootsand move. Find a new place, new friends, a new family. It had been possible once, it would be possible again."

-Manju Kapur

Work Cited:

1. Desai Kiran. The Inheritance of Love.Hamish Hamilton Ltd. 2006.

2. Kapur, ManjuThe Immigrant. New Delhi: Random House India, 2008.London: Faber and Faber, 2009. Print.
3. Chandra Mohanty, Talpade. Feminism without Borders. New Delhi: Zubaan, 2003 p. 26.
4. Meenakshi Goyal, Themes of Alienation and Displacement: A Study of AnitaDesai's Voices in the City and Kiran Desai's The Inheritance of Loss. Language in India. ISSN 1930-2940 Vol. 13:9 September 2013
5. Narayan, R.K. Remapping the Female Map: JhumpaLahiri and Manju Kapur.Jaipur: Ybooks. 2012. Print.

Music of the Root: Staging of Devotional Folksongs in the Theatres of Birbhum

Bidhan Mondal
Assistant Professor
Dept. of English, Kandra R. K. K. College

Abstract: In the preceding decades after 1970, several playwrights, directors, actors and designers of Birbhum have begun groping for a new vocabulary, idiom, styles and forms of *lokonatya* in their region. Folksongs or hymns are essential part of regional *lokonatya* or folk dramas, consisting of the mythical/ spiritual stories that address the divine characteristics of local as well as mainstream deities. But due to the current tendency of emulating whatever is accepted in media (western/bollywood/popular) in terms of music or other performing arts, this rich tradition of folksongs is getting deteriorated. Recognizing the layers of difference and subjugation that existed in the regions, these theatre groups of Birbhum have been seeking to highlight the crisis and tensions of the traditional artists by forming their staged identity. Explicating this new impetus in Birbhum's theatre, the study explores the devotional folksongs included in the select folk plays in Birbhum.
Keywords: Theatre, folksongs, devotional, performance, traditional
Birbhum is richly imbued with religious sentiment and belief where religious outlook defines someone's identity that shapes the cultural identity of an individual in every aspect of life. Therefore, religious festivals and rituals construct the dramatic identity of this district. Several types of religious *natya* or *pala*(mostly known as *lokonatya*) in Birbhum have been evolved from these festivals. *Lokonatya* is performed on open streets or staged on an open field, performers take recourse of songs, dance, and narratives to reach the audience. Themes are mostly based on religion and mythology to connect with the understanding of simple, uneducated village folk, and match their spirit of religiosity. Folksongs or hymns are essential parts of these dramas, consisting of the mythical/ spiritual stories that address the divine characteristics of local and mainstream deities.The artists being craftsmen, express their poetic

conceptions in lyrics. These lyrics are dictated to them orally through the community to reveal the devotional faith of the society.The villagers join the artists singing/chanting with total devotion to please and obtain the divine blessing of the deities. The following Bolan song presents a pluralistic folk repository of Birbhum mentioning a series of folksongs: "*Birbhumer ei rangamati rangakoir gram, Bhadu, Baul, Tusugane moje mounosthan/ bohurupir bohurupe mugdho sakal mon, bhalkuti aar bisaypure thake sarbojon* (de dene nana…de dene nana…*)/Bhajo gaane broto pujo bongonarir bhusan Haabu r Raibeshei moje ache kojon/ Dhaak dhol r Baul gaane moje kichukkhan Bolan gaaner khobor dite esechi ekhan…*"[1]. But due to the current tendency of emulating whatever is accepted in media (western/Bollywood/popular) in terms of music or other performing arts, this rich tradition of folksongs is deteriorating. The talented village artists are suffering from tremendous poverty as their performing art is dragged towards the margin due to lack of publicity in this age of globalisation and rapid urbanisation. Being under the pressure of globalisation and popular culture, they often compromise by changing the identity of their performing art to create publicity, thereby losing the root. Adapting folk idioms from marginalised regional *lokonatya* forms and elements of folksongs,these theatre groups in Birbhum district have endeavoured to restore their identities on stage.

In his article, Swapan Ray (veteran theatre director of Birbhum) estimates that 25-26 groups presently regularly practise theatre in Birbhum. Among them, 11-12 groups have endeavoured to construct plays with the form and content of folk theatre and other performing arts (Ray 230). This is significant concerning the revival of Birbhum's folklore and securing the neglected forms of devotional songs from the possibility of complete extinction. With the guidance and direction of Ujjal Mukhopadhyay, Labpur's theatre group Birbhum Sanskriti Bahini has been making the leading contribution among the theatre groups of Birbhum. They are trying to regenerate folk identity in theatre, experimenting with form and content of folk performing arts that are struggling to survive. Dr. Mukhopadhyay, renowned theatre researcher, practitioner, director, and founder of Birbhum Sanskriti Bahini, is composing scripts that are identifying the life of the downtrodden artists

of these marginalised folk performing arts. Dr.Ujjal Mukhopadhyay appropriates the folk myths from the *Mangalkavyas* to create a mythopoeic world on stage. The director incorporates a folk song known as "Bisaharir gaan"[2] (a song that narrates the story of *Manasamangal*) to depict the identity of snake-goddess Manasa in the human puppet drama *Behula Lakhindar Pala*. Shalaka mentions the name of specific snakes that ornate the goddess through a piece:

> *Sankhachiti hoilo maaer simanter sendur/ kajuliya chitimaer nayaner chikur Jhalukiya naag maaer jaggo upabita/ Dhumranaag hoilo maaer kaganiyamrita Dhundu naag hoilo maaer bam hater jhari/ karsarpa hoilo maer komorer beri…*

The director also includes a specific scene where the *Bede* communities are worshipping Maa Manasa on the occasion of Naag Panchami. Together they sing a “Bisaharir Gaan”:

> *Kamala pujibo sata daulego maa/ jhaat jhara diye sthan porisakro kori Tahe orpilo maa Manasar beri/ malati madhabi lata jui chapa koli Nana puspo dicche maa-ke anjali/ kalo dholo chaag koto bolidaan dilo Mesh mahishe rakte gangur bheshe gelo/ je mukhe bolto raja chang muri kani Sei mukhe bole raja jay maa brahmani/ jay jay maa Manasa jay Bisohari goTomar charan smaran kore bandana je kori go….*

Again they have adapted *Dharmamangal* (the epic of Rarh) into a complete version of a play with the same title. The production brought recognition and appreciation in 2012. *Bauls* are popular in Birbhum as folk artists and minstrels who compose their philosophy and mystic way of life through codes in their songs. The story of *Dharmamangal* in this play is introduced by local Bauls who narrate the mythical plot through a medley of Baul songs and *panchali*(rhyming devotional folksong of Medieval Bengal) songs dedicated to the lord Dharma. The festival of Dharmapuja is celebrated in this southern Rarh district of Birbhum by the tribal communities of *bauris*, *hadi*s, *chandals*, *doms* and others. Adapting Anupam Dutta’s drama *Dwadash Bhakta Chadum*, Dubrajpur *Victorjara* in 1998 and later Suri *Anan* performed the play with the same title in

Birbhum with an attempt to trace the folk-trajectory of Dharma that has incorporated *Dharmer Panchali* in connection with the songs of *bhakta* and the song-performance of *swaang* that had turned out the Dharma-cult to be a major attraction in the puja of *Charak* during the *Gajana* festival. *Swaang* is a folk art performed by the village artists who entertain people by disguising mostly Hindu deities or animals, singing songs and performing popular incidents from myths and epics.The *swaang* sings in the *kathakata* (Bengali folk ballads narrated by a *kathak* or storyteller) style to narrate the specific portion of *Dharmamangal*. The aged king Kannasena's wife Ranjabati, the queen of Dhekurgarh, is about to kill herself to be relieved from the pain of not having any son:

Swaang1: Hay hay dhekurgarer buro raja Kannasena/ tar rani Ranjabati baro dukkho mone peyechen.

Swaang2: (beating dhol) boli, keno keno keno re bhai/ sei kotha ti bolte hobe, shunte chai, sobai mile jante chai.

Swaang1: tahole besh, shunun shunun jato narijon ar shunun upostit narojon/ Dharmamangaler katha kichu kori bibaran.

Swaang2: Aha, hok bibaran koro bibaran….

Swaang1: tabo namo kore ami shale dibo bhar/ jodi na parahu tumi dao putrabor/Ranjabati nam mor briddha raja swami/ putrohine dukkho boro kosto pay ami…

Dohar: (repeating) putrohine dukkho boro kosto pay ami, hay hay eh ki holo!!/ lohar shul tairi holo/ putro karon moron lagi/ jato lohar shul tairi holo…

Swaang1: dekhe shun etui ogo dharma niranjan/ ekhono aj je chup, olo ki karon, Mahamad mor dada/ atkura koy putro nai opoman prane nahi soy.

Dohar: (repeating) bhakta molo bhaloi holo/ eh namer mohima gelo/ oki holo hay hay re—Ranjabati ebar bujhi shulete jhapay re…[3]

'Jhumur' is a folk song and because of the predominance of Vaishnavism, Jhumur songs in Birbhum mainly consist of the themes derived from *Srikrishnakirtan*. Often the performers would organise the Jhumur as a *pala* presenting specific episodes from "Vaishnav Padabali", playing the roles of Radha, Krishna and Barui (Mukhopadhyay 82). The elements of drama made it popular in Birbhum as a *lokonatya* often

equated with *Kirtan* (another Vaishnava folk performing art). But unfortunately, with time Jhumur artists had disappeared, submitted to the popularity of Baul and Kirtan as mainstream folk entertainment. "Jhumur" is one of the key performances of *Anan* (a group theatre of Suri, Birbhum) that highlights the skill of an amateur Jhumur artist in a village who challenged and defeated a veteran female Jhumur artist that led to their marriage at the end. Sailesh Guha Niyogi, the playwright, has incorporated many Jhumur songs and attempts to present the whole picture of a Jhumur performance, especially *Jhumur Larai* in a village fair. Santosh and Radhabala, being competitors, are shown arguing and countering arguments based on the duality of Radha and Krishna. They also use the duality of Shiva and Kali for posing arguments, Fatik attempts to defeat Radhabala by arguing that Mahadeb is superior to Kaali being her husband. Unfortunately, Radhabala again proves her potential by outwitting Fatik with her argument that lying under the feet of Kaali, Mahadeb himself validates his wife as the greatest:

Fatik: Jotadhari trishul hate sarpo niye gole, Jar roop dekhe Kaali tomar ek paloke bhole. Dohar: Jar roop dekhe ekpaloke bhole….

Radhabala: Kaalir amar sato roop konta choto kao?Kon roope te se na boro, je pathete jao.

Fatik: Dhongso kora rokto khawa praner Kaali je tomar, Soumyo shanto murti dekho Mahadeb amar.

Dohar: Dekho Mahadeb amar….

Radhabala: Mahadeb subho kaje kolke rakhe saath, Siddhi gaja tene tene bom bholenaath.

Dohar: Bom bholenaath aha bom bholenaath….

Fatik: Jotoi tanuk ganjar kolke, Mahadeb tobuo je boro, Swamir kache stree thake je bhoye jorosoro, Mahadeb swami taai Kaalir cheye boro.

Dohar: Jotadhari trishul haate ek paloke bhalo….

Radhabala: Jotoi baro hok Mahadeb, Kaalir payer tale, Mahadeb baro tobu murkho lokei bole. Bhalo katha bolchi bos, noile debo shule Baje katha joto tomar dari chachai chole.

Dohar: Dari chachai chole aha dari chachai chole…[4]

Bhanjo is one of the Bengali folk festivals celebrated predominantly by the maidens during the month of 'Bhadra'. Maintaining

brata or penance, they worship the goddess of harvesting as their family member or relative to share their stories through rhyming songs and dance to express their desires. This is primarily a seasonal ritual like *Bhadu* in which the maidens celebrate to please the clay-model of village deity of the crops, placing it in the middle while dancing in a circle. *Pratikkha* is a play by Dishar*i* (a theatre group of Labpur, Birbhum) under the script and direction of Parthapradip Singha. This play is dealt with the competition between two teams of Bhanjo performers representing two villages Muchipara and Naugram. *Bhadu* is a song-centric folk festival that is observed in the rural districts of southern Bengal throughout the Bengali month of "Bhadra". This is also a seasonal ritual based on the myth of Bhadravati (princess of Purulia), celebrated mainly by the women folk of villages who worship the clay idol of Bhadu as a living embodiment of Lakkhi, the goddess of crop. Songs are believed to be sung by Bhadu in search of her lover that primarily focused on marriage. These songs of unrequited love create the main attraction in the festival in which both professional groups and amateurs take part. *Boglo Bayen* is another play by Labpur's Birbhum Sanskriti Bahini that gives expression to the misery of *dhakies* (Bayens of Bengal who earn by eating drums in festivals). Ujjal Mukhopadhyay in this play incorporates a famous Bhadu song of Birbhum:

Bhadu thakbe na ghare
du-din pore jabe Bhadu paka saore
Bhadu thakbe na ghare…
baaper kaj ar korbe na ko go
taai to Bhadu ga chare
du-din pore jabe Bhadu, du-din pore
du-din pore jabe Bhadu tene chore
Bhadu thakbe na ghare
Ou koto kore bojhai sobai go Bhadu kotha sone na
ganye thakte chai na Bhadu, ganye thakte
ganye thakte chay na Bhadu daye pore
Bhadu thakbe na…
Bhadur paye sendur debe go Baban Kumar gaane bole
sukhe thakbe sobai mile sukhe thakbe

sukhe thakbe sobai milbe sangsare
Bhadu thakbe na ghare…[5]

"Bolan" is a popular folk drama of South Bengal, Bhabanipur Saptapradip's play *Bolan Phirbe?* is based on the life of Bolan artists. This art forms is wonderfully executed by the team through the script and direction of Subrata Ghatak. In Birbhum this performance is held during the Hindu *Gajan* utsav (festival) to worship Lord Shiva. Generally it is popularly known as a *pala* or folk drama. But today it is a popular folk drama as well as a performing art. Acting, songs, dance and dialogues are the key elements that structurise Bolan. Like Gambhira, Bolan[6]is a folk song that originally is a traditional tool of social communities to voice their woes and grievances to Shiva addressed as *Nana* (grandfather) and to Shakti or Kali as *Nani* (grandmother). Here also Shibu is addressing his grievances to Lord Shiva, considering him as the leader of poor rural villagers:

Biswamajhe birajito tumi adi dev/ moder majhe tumi leta tumi Mahadev Aj jara go leta bane kalke moder Bhole/ sara bochor pore oder dekha nahi mele Dukkher kotha bolbo kato haay…. dukkher kotha soja kore bolte gele bhaai, Kal sokale police eshe pongay debe kaai/ gaane gaane swaran kori Mahadever Kotha/ eri faake mishe gaylo khepa Kaalir byatha….. Khash jomir ashay pore/ desher gorib galo more/ dhuklo kato hajat ghare/ bau barite kende maure Mathay jawta, kopin anta bhaswa makha gaye/ Mahadev hoye tumi thako Kalir paye….

Prof. Tapan Ray writes: "There are different types of Bolan performances—1) Dak Bolan, 2) Sashan Bolan, 3) Santale Bolan, 4) Palabandi Bolan, 5) Rang Panchali" (Ray 194). Sashan Bolan songs are completely dedicated to the worship of Lord Shiva and the feat of goddess Kali who is addressed as "Nani", being the consort of Lord Shiva. The terrible visage of black goddess Kali is portrayed here:

Oh maaer rong bojha daye/payer tolay swami liye darin thake bhai Karal badan Kali mohamaya rupi/ kharga hate darin gele lage bahurupi Kali bahurupi bhai…. Tribhubone emon kancha devi laai. Jaar mundomala golay liye chirojibon khela/ trivubone sob hridoye koreche se khela Bokkhodeshe dharan kore koto cheler byatha/ Swashan Kali vojle pabe notun disha Kali bahurupi bhai…. Tribhubone emon kancha devi laai.

Due to the increasing inventions of modern music, instruments, public faith, and interest in these traditional devotional songs are declining day by day. They prefer other alternatives in the festivals. Again, the source of meagre income from this profession is further reduced. This has created reluctance in the younger generation of artists. They are unwilling to carry on the legacy and identity of the ancestral tradition. Actually, people are getting so much engaged in their daily life that they have the least time to bother about being entertained by listening to these devotional songs. Further abundant number of mediums exist today for public entertainment like T.V., Video, Home Theatre, Mobile and others that challenge the popularity of these songs. Therefore these songs and the artists need to be preserved through other popular mediums like theatre for recovering the root.

Appadurai comments that "the ability of any group to assume control over those local practices and interactions in which constructions of identity are most likely to be constituted and authenticated in many respects a factor of differential access to the arenas in which national culture is produced and enacted through, among other things" (Appadurai 159). Theatre groups of Birbhum are seeking to find out root or folk identity on stage to enhance interaction, cultural presentation, heritage preservation and identity formation. The performances of folk-drama and devotional folksongs are running parallel on the stages of several small towns and villages in Birbhum district. Their plays have become popular to the spectators by offering them a sacred space or platform to explore this district's cultural resources and communicate with the local artists. In addition to this, through the content of their plays, they also provide a window to observe the present condition of the artists who have been dealing with poverty and crisis in this contemporary age of globalization and negotiations. Thus, the group theatres of Birbhum have opened up a possibility of enriching cultural tourism in the district by preserving the neglected devotional folksongs of Bengal.

Notes

1. This song is collected from a village fair in the occasion of Dharampuja.
2. Two quoted songs are collected from an interview of Dr. Ujjal Mukhopadhyay.
3. The quoted lines of the song are collected from the script of the play.
4. The quoted lines of the song are collected from the live performance of the play.
5. The quoted song is collected from an interview of Dr. Ujjal Mukhopadhyay.
6. The two specific songs quoted here are collected from the live performance of the play.

Works Cited

1. Appadurai, Arjun. *Modernity at large: Cultural Dimensions of Globalisation*. University of Minnesota Press, 1996. pp. 159.
2. Mukhopadhyay, Harekrishna. *Padabali Parichay*. Dey's Publishing, 2010. pp. 82.
3. Ray, Dr. Tapan. "The Origins and the Gradual Changing in Bengali Folk Drama 'Bolan'". *The Echo: A Journal of Humanities & Social Science*, Vol 2,3, January 2014. pp. 194.
4. Ray, Swapan. "Natak o Natyacharchay Birbhum". *West Bengal (Birbhum edition)*. Gov. of West Bengal, Information & Culture dept, 2006. pp. 230.

Resource Conflicts In South Asia Securitizing The Transboundary Waters

Adil Qayoom Mallah
Research Scholar, University of Kashmir,
Jammu and Kashmir, India
Mahamudul Hasan Gayen
M.A. Student of International Relations,
Jadavpur University, Kolkata

Abstract : Natural resources have defined the spheres of life since times immemorial and water as resource has been the booster for settled life on the planet. Disputes over water are central to the political economy of development in South Asia. However, over the last two decades or so, water has been securitized and transformed into an important source of disagreement between nations. Transboundary waters in South Asia, especially its rivers have transformed into an issue of high politics between nations. Owing to climate change, structural scarcity, river intervening structures and unilateral management of transboundary water sources; water security has acquired an important place in the bilateral political arena between the south Asian states.

The myriad issues created by water resource management are currently garnering increased attention from governments all around the world. These issues arise from the reality that water resources are both qualitatively and quantitatively limited, with numerous chances for their use. As a result of these considerations, there is a growing need to take an integrated strategy to water resource development. In this context, the triangular connections in South Asia between Bangladesh, India, and Nepal present an intriguing and unusual set of circumstances that demonstrate the impact that one country's actions might have on neighboring countries. India has had a tremendous impact on India's international economic relations with Bangladesh and Nepal, particularly in terms of water resource development and cooperation. This paper is an attempt to understand the Hydropolitics in South Asia (particularly Indian subcontinent) from a resource-conflict perspective and securitization of

transboundary waters to the domain of high politics. The paper also explores the interesting political twists and turns of events, as well as the essential features of treaty implementation, and assesses the prospects for cooperation between India, Bangladesh, and Nepal in the domain of water resources management afforded by the treaties.

Key words: *Water, Transboundary, Hydropolitics, South Asia, Resource, Conflict.*

Introduction:

Since the start of civilization, natural resources have been the lifeblood. Only the richness of natural resources allowed early life to thrive. The growth of a country is heavily influenced by its resources. It is relatively easy for a country with abundant natural resources to meet its residents' daily needs. Humans, on the other hand, need on natural resources to survive, and life can only exist as long as natural resources are available. Natural resources provide the foundation for everything in our civilization. All manufacturing is a transformational process, with anything found in or grown from nature serving as the beginning point for the series of transformations. Natural resources make it easier for people to live in peace and harmony. No global security can be built unless natural resources are used sparingly. Access to resources has been a primary driver of armed interventions and battles throughout history, including nineteenth- and twentieth-century colonial conquests in Asia, Africa, and the Americas. The premise in academic literature is that international resource conflicts are primarily caused by supply and demand for resources. Natural resource availability has been connected to past and potential international wars, particularly in countries where resource demands are expanding and resources are dwindling. Resource conflict usually occurs in where there exist both resource scarcity and insufficient institutional capacity to deal with it. In particular, conflict is most likely to emerge in those areas where, (1) resource sovereignty is ill-defined or non- existent, (2) existing institutional regimes are destroyed by political change, (3) rapid changes in resource environments outpace the capacity of institutions to deal with the change (Giordano et al.).

Resource as a source of Conflict:

As resource-dependent nations become desperate to maintain access to foreign-based resources, the combination of growing resource demand and volatile population growth is likely to intensify conflicts worldwide (Sharp, 2007). According to Thomas Homer Dixon, "Resource scarcity is an omnipresent feature of our existence. It can arise in three ways: through a drop in the supply of a key resource, through an increase in demand, and through a change in the relative access of different groups to the resource. I call these respectively *supply-induced*, *demand-induced*, and *structural* scarcities (Dixon). Population growth, urbanization, rising consumption, climate change, environmental degradation, and new technologies for extraction and processing of resources is changing the patterns of resource supply and demand. This has profound implications for the political economy of resource use - both globally and locally. By the middle of this century, for example, it is predicted that the world's population will have exceeded nine billion, global energy use will have doubled, and global water demand will have increased by 55 percent over 2012. Resource dependence can also be an important cause of conflict. In their search for resource security and strategic advantage, industrial countries continued to take a diversity of initiatives including military deployment near exploitation sites and along shipping lanes, stock piling of strategic resources, diplomatic support, gunboat policies, proxy wars or *coup d'état* to maintain allied regimes in producing countries, as well as support to transnational corporations and favorable international trade agreements. While the Persian Gulf area has received most attention as prominent terrain for resource wars due to foreign oil supply interests, tensions and civil unrest in the region also testify in part to the problems of historical trajectories as well as political economy and governance of resource dependent countries.

A clear link between resources, environment and war and conflict was outlined in 1987 by the groundbreaking World Commission on Environment and Development, better known as Brundtland Commission after its Norwegian chair, Gro Harlem Brundtland, which stated: 'nations have often fought to assert or resist control over war materials, energy supplies, land, river basins, sea passages and other key environmental resources' (Duffield 2001). Since then there have been two important

developments in the resource-conflict relationship. First resource issues have increasingly underlain conflict: one recent report suggests that 18 of 35 conflicts recorded since 2000 have been about or fuelled by issues to do with the exploitation and control of natural resources, as opposed to wars fought over issues of ideology or territorial sovereignty (Bauman, 2001). Second, the coinage of the term resource war has been steadily debased to the point where it is now applied to minerals, oil and land; to rhino horn and ivory, to water, timber, wildlife and more (Humphreys 2012).

In history, states seeking power tried to dominate over material resources that were in demand allowing them increased control over economic affairs. In addition energy resources were and are important elements of military capabilities. When states had insufficient material resources they initiated military actions in order to gain them. This was true in the French- German war for the Ruhr areas in 1870, Nazi Germany's invasion of Norway and then the Soviet Union, Japan's invasion of the Philippines and its subsequent attack on the Pearl harbor, United States' presence in Iran till 1979, or the invasion of Iraq in 1990, where the main objective was to defend Saudi Oil fields from possible Iraq invasion. President of the United States of America Jimmy Carter in 1980 announced his doctrine, where the Persian Gulf was called a vital national interest of US. This indicates that energy resources are acknowledged as elements of power vital to global dominance. A recent study by Professor Michael Klare of Hampshire College argues that as demand for fuels, minerals, water and other primary commodities continues to rise rapidly, disputes over ownership are multiplying, and the likelihood that industrial powers will intervene to secure their supplies of raw materials is increasing. Research during 1990s has contributed a growing number of case studies of local and regional disputes that revolve around the degradation of arable land, depletion of water for irrigation and human consumption, decimation of forests, and access to other scarce resources. The rising significance of natural resources in international politics is largely due to the 'global resources boom' from 2004 to 2013. Driven by industrialization and urbanization in the developing world, demand for minerals and energy

has grown strongly. In the decade to 2012, global consumption of oil increased by 12 percent, natural gas by 28 percent, coal by 44 percent, and steel by 58 percent (Wilson 2017). The combination of rising resource consumption and unpredictable population growth is liable to exacerbate conflicts throughout the world as resource dependent nations become desperate to retain access to foreign-based commodities (Sharp 2007).

Resource security has resurfaced on the international scenario as a challenge of high politics, since 1970s energy crisis. Resources have emerged as a key policy concern since the turn of the current century and the ma reasons have been the continuous rise in international prices, swelling demand from developing nations and the growing concerns of countries regarding scarce resources. International resource politics has become quite highly charged in South Asia. Nevertheless, there has been strong interdependence between the South Asian nations, despite that; resource-induced conflicts have surfaced in the south Asian regional landscape on regular basis. Linking resources to national security and transforming it into an international issue has thronged nations into a made race for acquiring resources.

Water as a source of conflict

Early civilizations started and were nourished around rivers. The compelling need for water—for domestic purposes and for growing food—prompted people to live close to those rivers; and gradually communities grew into cities, and cities into nations. Soon competing demands for the waters of rivers started to grow, particularly between nations. In recent history, shared rivers have become sources of conflict, as well as catalysts for cooperation (Salman and Uprety 2002).

Water is not necessary to life, but rather life itself. The battles of yesterday were over land, those of today are over energy, but the battles of tomorrow may be over water. Nowhere is the danger greater than the water distressed Asia. Conflicts over shared rivers between various stakeholders usually arise because of the depletion of water flows due to diverse factors and circumstances broadly classified as (a) geographic, hydrological, climatic, ecological and other factors of natural character; (b) the socio-economic needs of the population; (c) the

quantum of population dependent upon the river; (d) the effects of the use or uses of river by one stakeholder on another; (e) existing and potential uses of the river;(f) conservation, protection, development and economy of use of the river waters and costs of measures taken to that effect; and (g) availability of alternatives, of comparable value to a planned or existing use of the river (Hegde 2018). Disputes over the sharing of river water have also arisen within the domestic context of the states. The different federal units of a state through which a river flows, for example, may have differences and contentions with regard to sharing of the river water.

Water stress is set to become Asia's defining crisis of the twenty first century, creating obstacles to continued economic growth, stoking interstate tensions over shared resources, exacerbating long time territorial disputes and imposing further hardships on the poor (Chellaney 2007). Asia is home to many of the great rivers and lakes, but its huge population and exploding economic and agricultural demand for water make it the most water stressed on the per capita basis. Scarcity compounded by the complex interdependence ascribed to river riparians also places parties in a precarious and potentially volatile situation. The claims and counterclaims among states involved in disputes over surface waters follow a set pattern that diverge sharply according to the riparian status of the state (Dellapena,2006). Many of Asia's water sources cross national boundaries, and as less and less water is available, international tensions will rise. Rivers in South Asia as they crisscross the political boundaries introduce interdependencies that can either reinforce or reduce differences. Transboundary river basins are a prominent feature of the South Asian physical landscape, cutting across political boundaries and are therefore of paramount importance to the region's geo-political stability (Sinha, 2016). Water is a point of friction on the Indian sub-continent, which is home to more than 21 percent of the world's population yet, must do with barely 8.3 percent of global water resources (Chellaney, 2011). Taking into consideration, the amount of pressure water demand experiences, it looks likely that resource nationalism will dominate the hydrological contours of South Asia.

Murky Hydropolitics in South Asia

Water is a point of friction on the Indian subcontinent, which is home to more than 21 per cent of the world's population yet must make do with barely 8.3 per cent of global water resources (Chellaney 2011). Now burgeoning populations—a result of rapid development of the region—are increasing demand for water at an unsustainable rate. Climatic changes affecting glacial melt in the Himalayas exacerbate the problem of water availability (Renner2009). Scarcity in itself, however, is not the only trigger of water conflict here; major controversies also exist in the region as to the location and construction of dams (Hill 2009). Moreover, mutual suspicions and reluctance to cooperate between riparians may impair timely approaches to the collective action problems of non-traditional security threats such as water conflict (Renner). Indeed, fears are rising about the possibility of ‘water wars’.

Debates over water in South Asia particularly transboundary rivers of the region is vociferous, antagonistic and increasingly associated with national security. Since 1960s, there has been a drastic decline in the renewable water resources on per capita basis. Both, India and Pakistan have crossed the “water stress” mark. Fast depleting groundwater in India and Pakistan is not receiving any impetus from the supply side. Management and governance of water has not caught up with the ever increasing pressures of demography. Himalayan Asia is in the midst of a looming freshwater crisis, and this crisis is unfolding in a multitude of forms and with varying severity in all the countries of the region, and the combined results of this crisis are increasingly reshaping interstate relations between regions in terms of water resource rivalry- a development that threatens both to widen the region’s existing geopolitical cleavages as well as to stall its already snail paced progress towards greater regional cooperation. This development is explicit in the bilateral relations of major South Asian co-riparians like Bangladesh, India and Pakistan.

The mounting scarcity of water (both physical and structural) all over the planet demands a subtle and deeper analysis for understanding of transboundary water conflicts. The predicament underlying the transboundary hydro-political dyads is to devise a mechanism that can foster trust and cooperation between the riparians and eliminate water as

a source of conflict; and at the same time ensure ecologically sustainable and sufficient management and usage of water. Water issues in South Asia are especially threatening because the political equation between a number of countries in the region is highly volatile. Half a century of South-Asia's construction led water development has failed to address the basic sources of suffering of the people (Ahmed et al, 1997). The region's geography was inconsistent with the current belief; thus, the necessity was to modify, not the belief, but the geography itself. The present disputes between the nation states over transboundary (shared) waters are the outcomes of scarcity dilemma, which overlap and transform into security dilemma (Tripathi 2011). Transboundary waters, not only defying current political borders, pose a formidable challenge in the conceptualization of interstate relations, especially on issues of water sharing. In the Indian subcontinent, water has emerged as a persistent point of contention between the riparian nations. Indian subcontinent has predominantly been an agrarian region and has witnessed tremendous growth in the agricultural sector over the years; however at the same time it has resulted in high consumption rates. Irrigation is taking a lion's share and has been a major consumer of water. However the region is experiencing a strange paradox; despite experiencing high economic growth, the per capita income is recorded as one of among the lowest in the world.

The Hydropolitics of the region particularly revolves around the water contestations between Bangladesh, India, Pakistan and Nepal. Right from the word 'go', India and Pakistan have tasted bitter relations and one of the strong reasons has been the issue of water sharing. Indus water dispute has taken the bulk of attention in the early years of their inception after the partition. However, there is no denying the fact, that the Indus Water Treaty has stood out as the only leap of success between the two South Asian nuclear giants and has survived three wars. Despite that, whenever tensions or uneasiness befall over the relations of the two nations, Indus waters become the first to be brought to the anvil. Moreover, scholars are of the opinion that, more than dividing the water of the Indus basin, it has divided the rivers,(The Ravi, Beas and Sutlej to India and the Jhelum, Chenab and Indus to Pakistan) which keeps the

treaty on a slippery ground, keeping into consideration the already tense and hostile relations between the two nations. India and Bangladesh are also involved in tense hydro political deadlock. As they share 54 rivers between them, there is strong feeling in Bangladesh that India does not provide them an adequate and fair share of their water. The main sources of contention are the two important rivers, - the Ganges and the Teesta. At the moment, the Teesta has emerged as the main source of conflict between the two nations, because the Ganges dispute has been solved, at least up to 2026, courtesy the 1996 the Ganges water treaty.

India and Nepal are also having a tough time in the domain of sharing of transboundary waters. Although the potential for water resources development between India and Nepal is considerable, the cooperation between these two countries on the issues related to water has not been easy and forthcoming, in particular because of the extreme sensitivities and divergent interests and approaches of the political parties. Their bilateral relations have been heavily influenced by politics. Most of the rivers in Nepal are inherently linked to potential international water rights issues with Nepal's upstream and downstream neighbors because all of the rivers flow in or out of the country. The rivers that flow from Nepal to India account for a large volume of water resources in the region.

Conclusion

South Asian countries have nationalized their water resources, particularly rivers and seas. They see water within their borders as "state property," even if it is only temporarily under the control of a national state. Unilateral water policies have proved to reduce the role and prospect of water treaties and international water sharing regimes, and led to political tensions and conflicts. Having a deeper look at the nature of transboundary Hydropolitics between the South Asian states reveals that, stalemate emerges from three stubborn realities characterizing these states; first, the existing among them of fundamental differences in natural river resource endowments; second, the pressure on all of their governments to give highest priority to their own country's requirements; and third, their resolute adherence to diplomatic strategies that are in large part irreconcilable. The existing literature on the said issue holds

that, the stalemate is unlikely to be overcome; barring a dramatic change in the way the region's river resources are conceptualized and managed. A hydro political strategy at the regional level can help in addressing the long-pending issue of transboundary water issues in the region.

References

1. Bauman, Zygmunt. "'Wars of globalization era'." *European journal of social theory*, 2001: 11-28.
2. Ahmed Imtiyaz, Dixit Ajaya and Nandy Ashis. Water, Power and People: A south Asian Manifesto on the politics and knowledge of Water. Colombo Regional Centre for Strategic Studies 1997. http://www.rcss.org/admin/fckImages/SAManifesto%20on%20water.pdf
3. Chellaney, Brahma. *Water: Asia's New Battleground.* Washington DC: Georgetown University Press, 2011.
4. Chellaney,B (2007). Climate Change and Security in South Asia: Understanding the national security implications. The RUSI Journal, 152(2), pp.62-69.
5. Dellapena J. W (2006). The Berlin rules on Water resources: The new paradigm for international water law. VillonovaUniversity School of Law. https://ascelibrary.org/doi /10.1061/ 40856% 28200%29250
6. Dixon, Thomas Homer. *Environment,scarcity and violence.* New Jersey: Princeton university press, 1999.
7. Douglas Hill, 'Boundaries, Scale and Power in South Asia', in Devleena Ghosh, Heather Goodall and Stephanie Hemelryk-Donald (eds), Water, Sovereignty and Borders in Asia and Oceania (New York: Routledge, 2009), p. 96.
8. Duffield, Mark. *Global governance an dnew wars: The merging of development security.* London: Zed, 2001.
9. Hegde, V.G. "National and Internastional Legal aspects of water sharing: A South Asian experience." In *South Asian Rivers: A Framework for Cooperation*, by Imtiyaz Ahmed, 11-43. Springer, 2018.

10. Humphreys, Jasper. "Resource wars: searching for a new definition." *International Affairs (Royal Institute of International Affairs 1944-)*, 2012: 1065-1082.
11. Mark Giordano, Meredith Giordano and Aaron T. Wolf. "Internatinal resource conflict and mitigation." *Journal of peace research*, 2005: 47-65.
12. Michael Renner, 'Water Challenges in Central-South Asia', Noref Policy Brief No 4 (Oslo: The Norwegian Peacebuilding Centre, December 2009), p. 8.
13. Renner, 'Water Challenges in Central-South Asia', p. 8.
14. Sharp, Travis. "Resource Conflict in the Twenty-First century." *Peace Review: A journal of Social Justice*, 2007: 323-330.
15. Sinha, Uttam Kumar. *Riverine Neighbourhood: Hydropolitics in South Asia.* New Delh: Pentagon Press, 2016.
16. Tripathi, Narendra Kumar. "Scarcity dilemma as security dilemma: Geopolitics of water goverenance in South Asia." *Economic and Political weekly*, 2011: 67-72.
17. Wilson, Jeffrey David. *International Resource Politics in the Asia-Pacific: The Political Economy of Conflict and Cooperation.* London: Edward Elgar Publishing Limited, 2017.

Environmental Dynamics of Santali language : Ol-Chiki

Partha Mondal
Research Scholar, Department of History,
Jadavpur University

Abstract : One of the most effective ways of communication is a Language which provides us the essay access to the identity and solidarity of any group or community. The existence and the development of the people also rely on the Language. In this respect, Santali Language seems to be the oldest and most vital in Astro-Asiatic branches consisting of two divisions – Northern and Sothern (more polished) Santali. The Language is remarkably rich in sound and sing symbolism greatly influenced by nature and natural phenomena. Santals are truly called the sons of environment and their Language imposed from the bosom of nature. Until the arrival of Roman script after 1855, it was practiced orally. Then Sadhu Ramchand Murmu took the first initiative for the script "Maj Dader Ank" in 1923. And finally, fairly sophisticated script, 'Ol-chiki' discovered by Pt. Raghunath Murmu in 1930. 'Ol' means soundless and 'chiki' means pictorial representation. The script has thirty letters in all with various natural shapes and sounds. It helps to identify their lifestyle, body posture and their class contact with the nature (flora and fauna). The five fundamental components of earth-fire, soil, water, air and sky are the main raw materials for shaping the script which are familiar and the driving forces to the Santali generation for the ages to come, to survive and also to swage through their struggles.

Keyword – Ol-chiki, Nature, Identity, Environment, Language

Introduction :- "Language is the road map of a culture . It tells you where its people come from and where they are going."

- Rita Mac Brown

Language is a by product of a society and as such its development also is much related with the development of history. It is true for every language. Language is one of the important medium to convey the beliefs, thoughts, and cultural heritage of a community. Language is a

very powerful instrument to preserve the identity and solidarity of any group or community, not to speak of the Tribes alone. Santali language is one of the oldest Indian languages and of wide use. Although, as tribe is not a homogeneous community, similarly their language differed accordingly. Development of any community is largely depends on their own language. It may be argued that the Santals distinct ethnic identity is clearly marked by its own Language. All the languages of Austro-Asiatic kol branches, the Santali language seens to be the oldest and most ideal representative of all Munda speaking Tribes. Rev. HoffMan said in the preface of his book Encyclopaedia Mundarica "since the Mundas can not continue much longer as a separate people their language is doomed to as appear all together from the list of living languages in a comparatively short time.[1] Suhrid Kumar Bhowmik also aspects "that the Ho language is a by product of Munda language, just like Prakrit from to Sanskrit".[2]

Family of Santali Language :- It can be said safely that the Santali's distinct identity is clearly mark in their language. Of all the language of Austro-Asiatic kol branches, the Santali language seems to be the oldest and most vital representative of all Munda speaking tribe. Culshaw asserts that- "the Santals are the large tribe in india to retain an aboriginal language to the present day".[3] Through generations it has been preserved verbally and memories which can be compared with the famous Indian ancient religious book like the Vedas, the other name of which was 'Shruti'.

According to P.W. Schmidt Santali is a member of the Austro-Asiatic sub family of the Austric family. The Munda languages with the exception of Kharia, Korku, Juang, savara and Gadba are generally grouped together under the common term kherwari[4]. Though the Santali Language has two sub-divisions - Northern Santali and southern Santali . Northern Santali regarded as standard form of language as Southern Santali has been termed a dialect. As Prof. Khogeswar Mahapatra has classified the proto-Munda group of Language in the following manner[5]

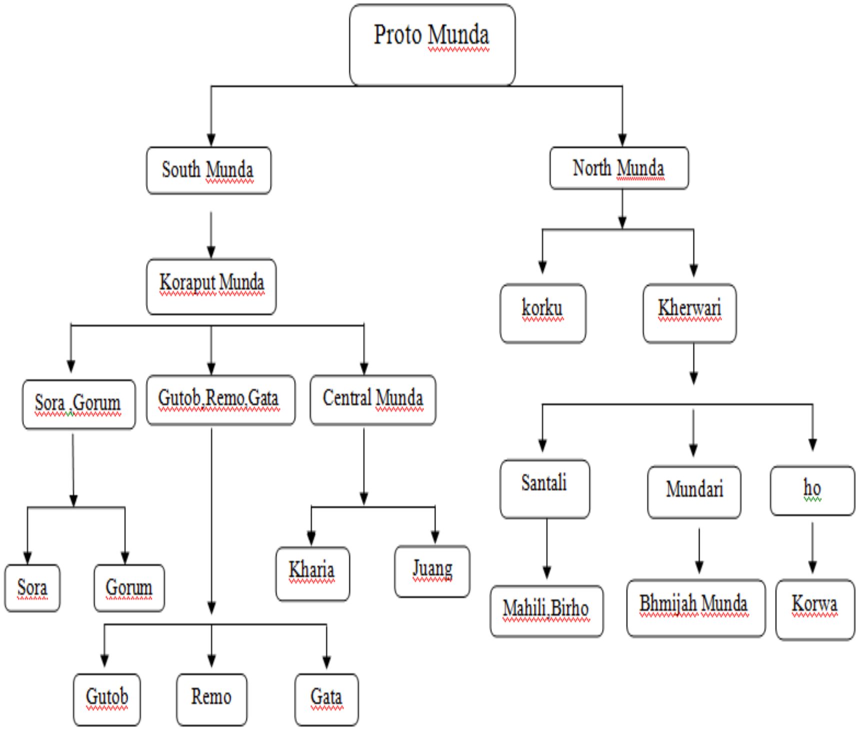

Origin Of Santali Language :- If We look into the origin of Santali language or Ol-Chiki scripts, We can find that the Santals are a community with rich cultural heritage and they have unique social practices, beliefs, rituals, life style and culture. One of the main forces behind the development of a particular language or scripts for a community of their own is to be conserved the rich traditional cultural heritage. Language has been a distinct ethnic marker among the tribal communities whose identity and solidarity has been dangered by exogenous factors. Language is very crucial for the individual and also it interconnects the individuals identity with collective identity. Several environmental conditions also helps to promote these inter connections. This identity creates a class consciousness among the Santal which is called solidarity by Dr.Ranajit Guho.[6] Language is also preserve life style and history of any human group and community. As Prof Mahapatra rightly says "The major fundamental characterestics of human verbal

behaviour are preserved in their languages which are distinctively observed in the vocabulary, Sound-symbolism, grammatical structures or such aspects”.[7]

Even the ethnography of the Santals is never complete without reference to the ethno- linguistic aspects of their culture. Santali language is remarkably rich in sound symbolism. So it is clear to understand that the Santals has their rich traditional culture, unique ethnic identity and solidarity. To preserve this cultural heritage they have need of a good script. Ol-chiki scripts fulfil all the criteria which is needed to the Santals. Incidentally, Sitakant Mahapatra remarked “The most fascinating aspect of Ribal poem is their symbolism, society and time are generally connected in many of the santal poems. Time is not merely a sequence on reasons of cycles of activities it is also life and death, pain and pleasure. An exampler ;

Asad comes
And how she goes
And where ?
Where does time go ?
It comes only to go
And your back
Death watches you
From dawn to dusk
He keeps watch on you”[8]

Discovery of Ol-Chiki script :- It is known to all that till the beginning of the 19^{th} century the Santals had no script of their own. Their language survived from generation to generation through oral traditions. After the Santals rebellion of 1855, the Christian missionaries gave them a Roman script. But there are some problem in using this script. In 1863 Dr.C.R. Lapes make some changes by adding some phonetic sign and creates a standard script[9]. First endeavour from the Santals community to discover a suitable script was taken by Sadhu Ramchand Murmu. In 1923 he has invented a Santali script which is known as “Maj Dader Ank”[10]. But it vain, the Santals who were living in Orissa and Bengal followed Oriya and Bengali script respectively. From 1855 onwards the Santals had to experience many vicissitudes and as a result an identity

consciousness and a sense of little nationalism slowly and steadily grew among them. Finally, It was Pt.Raghunath Murmu who discovered the Ol-Chiki script of the Santali Language. Raghuath murmu says about Ol-Chiki script –

"Ol-Menac' Tama, Aran Menac' Tama,
Dhoram Minac' Tama, Amhon - Minam,
Ol-Em Adlere, Ror Em Adlere,
Dhoram Em Adlere
Amhom Adoc' "[11]

(GIST : You have own Language, own script, own religion and so you exist but if you lack or lose your mother tongue, own alphabet, religion and culture you will be lost and extinct).

Environmental Dynamics of Ol-Chiki :- Relationship between the human beings and the external nature have always been structured through the means of physical and cultural aspects . As we all known that the Santals loves to live in contact with the natural environment and obviously in the dense forest of hilly area . So the Santals are truly regarded as the sons of environment.

Hence in their script we find reflections of nature and their cultural practices. Raghunath Murmu himself pointed out the sources of the script. These are as follows :-

1) The tattoo marks called 'khoda' are often very artistic. They convey specific meaning.
2) The Santals had the practice of branding their domestic animals as symbols of possessions. It is called khoda. This branding had a history of its own. During and before the rebellion the cattle lifting by the money landers was one of the causes of the rebellion. It seems that to avoid this system was started. Some times money lenders attached the cattle of the Santals with court order for non-payment of loan. But it so happened the attached cattle belonged to another Santal who had no connection with the loan.
3) It is needless to say as has been viewed by Charles Grant, that the aboriginal tribes, retreated into the mountains and dense forests under the impact of "more powerful and highly organised races"[12]. Since then the forests had been their natural friends. Whatever knowledge

they had gathered was from the environment of the forest. So, Sitakant Mahapatra argued, 'In the past, the Santals lived in dense forests and they used different symbols on stones or on trees to convey some special meaning or secret information like danger, safety, run away, let us meet there etc'[13].

4) Pt. Raghunath Murmu carefully selected the shapes of the script from the nature and the surroundings which are familiar to the Santals. The famous novelties and usages in Santali language are the result of the natural derivation. Pt Murmu tried to infuse the concept of natural formation of Santali words into Ol-Chiki .
5) Main sources for the shaping of Ol-chiki script are five basic component of the Earth that is fire, soil, water, air and sky. According to Hindu Religious Scripture these sources known as kshiti, op, teja, Marut and Byoma.
6) The Santals are mostly dependent on agriculture, which was the basis of their livelihood. Agricultural equipments are also the sources for the shapes of the script for example plough, spade, sickle are the basic equipment for cultivation, which was inflected very much Pt. Raghunath Murmu for shaping Ol-chiki script.
7) Finally we can say actually Pt. Raghunath Murmu had taken into consideration various natural phenomena, different sound of the animals or objects, their lifestyle, different body posture, while shaping Ol-chiki script . Pt. Raghunath Murmu always tried to shapes ol-chiki script with a common idea or sense or feelings of the Santals.

Ol-chiki script :- Meaning of the term ol-chiki is "OL" means without creating any sound, only looking through eyes by drawing the picture of things in mind and "CHIKI" usually means "Pictorial representation"[14]. The ol-chiki script also known as "Ol-chemet" which means learning of writing . Ol-chiki script publicized for the first time in 1939 at a mayurbhanj State exibition[15] . This script is written from left to right. It has 30 letters of which 6 letters are vowel (Raha Alang) and 24 are consonants (keched Alang). Ol-chiki has basic diacritics and combination of diacritics. There are five significant tones in the alphabet which is used after the letters to give different sound effects – 1) Nasalization 2) low pitch 3) prolongation of vowels 4) separation between checked

consonants and others consonants or vowels 5) Force (cheek valve) to open the checked consonants and make them simple consonants . It is thus a fairly sophisticated script and meets most of the phonetic requirements.[16]

Geographically speaking almost all the letters of Ol-chiki represent the various dynamics of environment. Here is the example to it.[17]

ᱚ	Shape of burning fire
ᱛ	Shape of Earth
ᱜ	Shape of mouth during vomiting which produces the same sound as the name of the letter.
ᱝ	Blowing air.
ᱞ	Writing. Shape of pen.
ᱟ	The shape of working in the field with a spade.
ᱠ	Sound of swan or shape of a bird.
ᱡ	The shape of a person pointing towards a third person with right hand (saying he).
ᱢ	The shape of a person pointing towards a second person with left hand (saying you).
ᱣ	Opening lips.

	Bending shape.
	The shape of plough.
	Shape of hands ups.
	The shape of a person pointing towards himself or herself or herself with left hand.
	The shape of sickle used for cutting or reaping.
	Shape of gourd used for serving food (serving spoon).
	Shape of a peak
	Shape of mushroom.
	Flying bee sound.
	A dumb (konda) cook while responding to someone by putting his both hands over his ears.
	Overflowing rivers changing course. Sliding of land,clay etc .
	Taken from the when a person gives something to another.
	Derived from the word “Onday noonday” means “there and here using finger indicates here and there.
	The picture of thrashing grains with two legs.

ᱲ	A picture of a path that turns to avoid an obstruction or a danger.
ᱳ	Shape of mouth when sounding this.
ᱴ	The hump of a camel.
ᱵ	Curly hair.
ᱶ	Nasalized
ᱷ	Sign of pain

As we have already mentioned Ol-chiki has 5 basic diacritics which are placed after the letter to express actual meaning these diacritics are – (1) Gahla Tudag (●) this is base line dot use to extend there vowels letters for the Santal pargana dialect of Santali . (2) Mu Tudag (●) this is raised dot which indicates nasalization of the preceding vowel (3) Mu Gahle Tudag (**:**) this mark is used to mark nasalized extended vowel. (4) Rela (~) it indicates the prolongation of any oral or nasalised vowel. (5) pharka (-) this hyphen like mark serves as a glottis protector[17] . As it has been mentioned above morphemes is Santali language was drived from different natural sounds,birds such as 'sar-sor' became sade(any sound), 'huhu' became 'hoi'(wind), 'hud-hud' became hudur(thunderbolt). Same as names of the birds and animals has also been drived from their sounds, example - chened chened it is 'chene'(bird), 'kah-kah' became 'kahu'(crow), etc[18].

Conclusion :- From the above discussion we can say that Ol-chiki script comes from the heart of nature. As Santals are the real son of nature and they always attached with natural phenomena. That is why Pt.Raghunath Murmu during the discovery of the script and it formation kept in mind that the shape of the Ol-chiki alphabet should be common to the Santal and must attached with nature . Through the Ol-chiki script their traditional cultural heritage should be preserved. Because Language is an important medium of communication and learning. To enrich their culture a suitable script is needed which is fulfilled by Pandit Raghunath

Murmu . Finally we can conclude with the quotation of a famous linguistic Norman side. “the shapes of the letters are not arbitrary but reflect the names for the letters, which are word usually the names of objects or actions representing conventionalized from in the pictorial shape of characters[19].

There is no denying of the fact that the script of a Language is a life force of any culture. But is the present day context the introduction of Ol-Chiki as a medium of instruction has raised a number of questions. It is conscious effort of the educated Santals to debate over it trust of all how face the utility of Ol-Chiki in the era of globalisation is tenable. When is Bengal most of the Bengali Students are aspiring for English medium school, to what extent the Santali Student would be benefitted from Ol-Chiki script. Once the nation like China, Japan, and even France abhorred English Language. Now however, they are opting for English. The political dimension of Ol-Chiki is to satisfy the vanity of the Santals, but to what extent? It does not. However, mean that a Tribal Community should not try to devlop its own script to make a meaningful identity of themselves. The Santls would have to realise themselves what faithful objective they can achieve only through spreading Ol-Chiki script. This is a present question which needs serious attention.

Reference

1. Quoted in P.O. Bodding’s *Santal Medicines*, S.K. Bhowmik on Bodding, cal, 1983, p-11
2. Ibid, p.15. `
3. Culshaw, W.J., *Tribal Heritage : A Study of the Santals*, Gyan Publishing House, New Delhi, 1949, p. 1.
4. Grierson, G.A., *Linguistic Survey of India*, Office of the superintendent of Government printing, culcutta, 1898, p. 27.
5. Mahapatra, khageswar, *Tribal language and culture of Orissa*, (Ed.) Bhubaneswar Academy of tribal Dialects and culture, Govt of Orissa, 1997, p. 4.
6. Guha, R., *Elementory aspects of peasant Insurgency in Colonial India*, Duke University Press, 1999, pp. 69-170.

7. Mahapatra Khageswar, *Basic sounds* : *A study in sound symboling of santhals* in Nita Mathur (Ed) *santhal World view*, concept publishing company, New Delhi, 2001, p.67.
8. Mahapatra, Sitakant., *The Tangled web : Tribal life and culture of Orissa*, 1993, Orissa sahitya Academy, pp. 125-126.
9. Baske, Kushal, chandro, *santhali vashar somoshya*, baske publishication, Kolkata, 2008, p. 19.
10. Partha Mondal, *santhal parganar santhal upojatir samajik – sanskritik biborton o songkot (1855-1947),* unpublished M.Phil Thesis, Jadavpur University, 2019 ,p.95.
11. Kisku, Panchanan, *Saviour of The Oldest Cultural Heritage of India*, Kherwal Publication, Bankura, 2001, p.45.
12. Guha, Sumit, *Environmental and Ethniety in India*, Cambridge university press, USA, 1999, p. 11.
13. Mahapatra, Sitakant & Raghunath Murmu's movement for Santal solidarity in K.S. Singh (Ed) – *Tribal Movement in India : Vol – II*, Manohar, New Delhi, 1982, p. 141.
14. Murmu, Arjun Guru Gomke : Pt. Raghunath Murmu, *ol Itun asra*, kulgi, odisha, 2000.
15. Hembram, Patik Chandra *santhali, A natural Language* , U.Hembram publishing House, New Delhi, 2001, p. 165.
16. Singh, K.S., *Tribal Movements in India*, *Vol – II* (Ed), Monohar Publishing, New Delhi, 1982, p. 142.
17. https://www.wikipedia.org
18. Murmu, Suresh Chandra, *Natural based OL CHIKI and santal Ethno-Nationdism journal* 'Adivasi' vol – 52 , no – 1,2 june and Dec - 2012 sestrti, Bhunaneswar Odisha, India
19. http://www.wikipedia.org

Using Health Communication in Advertising as a mean of Brand Image

Jyoti Dutta
Research Scholar Department of Mass Communication
St. Xavier University Kolkata
Dr. Manali Bhattacharya
Assistant Professor in Mass Communication
St. Xavier University, Kolkata

Abstract : Brands are marketing tools that create mental representations in the minds of consumers about products, services, and organizations. Brands create schema that help consumers decide whether to initiate or continue use of a product or service. Health branding determines behavioural choice by building consumer relationships and identification with health behaviours and their benefits. Advertising covers every thought process and action and is considered to be highly sophisticated communication force and a powerful marketing tool. Changing social, political and economic orders have also contributed to the appreciation and utilisation of advertising as a vital communication tool. Brand equity is a science of brand building which take all possible contingencies into consideration. Several learning have inspect brand equity as a arbitrate factor associated with health behaviour switch campaigns. Consequently, branding is contemplated an important tool in imparting the value of health and come up with towards healthier food option.

Keywords: Brand, health Communication, Advertising brand equity, brand image, target audience.

1.1 Introduction

Health is essential to human existence as it "provides a person the potential to have the opportunity and ability to move toward the life he or she wants" (Becker et al., 2010: 26). On a very basic level, health communication wants to inform individuals, motivate them to take action and achieve some kind of behavioral change. Through information, not only individuals' understandings of the health condition should be fostered, enabled respectively improved, but also health-related knowledge should be increased, ultimately engaging and empowering

people (Kreps, 2012; Campbell and Scott, 2012; Hornik, 2008; CDC, 2011; Muturi, 2005). Therefore, health communication objectives can be either of behavioral, social and/or organizational nature (Schiavo, 2014). Through communicative means, several health goals should be obtained: messages intend to raise awareness for medical conditions and their symptoms respectively, in-crease consumer knowledge on treatment options, change recipients' health-related attitudes (from health-compromising to health-enhancing behaviors), facilitate com-municative exchanges between different parties (e.g., patients, experts, policy-makers, and like-minded individuals), and enhance people's literacy rates as well as (health) skills (Schiavo, 2014). Through health communication, they are made aware that "health and well-being are affected by interaction among multiple determinants including biology, behavior, and the environment. Interaction unfolds over the life course of individuals, families, and communities, and evidence is emerging that societal-level factors are critical to understanding and improving the health of the public" (Gebbie et al., 2003 : 32).

1.2 Background

Conveying and merchandise are quickly becoming acknowledge as central functions, or core accomplishment, in the field of public wellness. Transmission, i.e., the supplying of details, can be used in a diversity of ways to encourage beneficial substitute among both people (e.g., switch on social support for smoking termination among peers) and places (e.g., compelling city formal to ban smoking in public place). Similarly, marketing, i.e., the evolution, disseminating and aid of products and services, can be used to foster profitable change among people. A structure through which to recognize how to effectively equipment the instrument of communication and marketing in the exercise of public health.

2. Literature Review

Little peer-reviewed research is available on the effects of mass media campaigns to change behaviours. Stevenson, Michael & Quick L. Brain "Parent Ads in the National Youth Anti-Drug Media Campaign" (2007), To reach a deeper understanding about the substance of the parental ads,

we content analyzed the message strategies employed in the campaign's parent ads.

Deshpande, Aparna, Menon, Ajit "Direct-to-Consumer Advertising and its Utility in Health Care Decision Making: A Consumer Perspective" (2010) examine the growth in direct-to-consumer advertising (DTCA) analyze whether consumers use DTC ad information in health care decision making and who are the key drivers of such information utilization.

Sood, Suruchi, Skinner, Joanna, Rogers, Shefner, Corinne "Health Communication Campaigns in Developing Countries" (2014) examine effectiveness of health communication campaigns, there is general agreement that communication interventions are necessary to bring about and maintain large-scale behaviour and social change Robinson N, Maren Tansil A. Kristin "Broadcasting Health Communication operation Combined with Health-Related Product dispersal A Community Guide methodical assessment " (2014) analyse Health imparting drive including mass media and health-connected product issuing have been used to lessen goodness and morbidity through etiquette change.

Loken, Barbara, Hornik, C. Robert "Use of mass media campaigns to change health behaviour" (2014) analyse the outcomes of mass media campaigns in the context of various health-risk behaviours.

Koinig, Isabell "Effects of Health Communication and Pharmaceutical Advertising" (2016) analyze Through communicative means, several health goals should be obtained: messages intend to raise awareness for medical conditions and their symptoms respectively, in-crease consumer knowledge on treatment options, change recipients' health-related attitudes.

Shembekar, Jinia ,Barclay Sarah, Muennig, Peter "The efficacy of public health advertisements to encourage health: an arbitrary-controlled trial on 794,000 participants" (2018) analyse the potency of the commercial may be much improved by selecting individuals based on their lifestyle liking and/or socio demographic attribute and to measure and ameliorate the success of online public health interference.

The literature survey starts with the name of Zhao, Xiaoquan "Wellness conveying campaigns: A brief initiation and call for conversation" (2020) examine health transmission campaigns as an extensive procedure for health assistance.

Ekiyor Aykut and Altan ,Fatih "Marketing Communication and Promotion in Health Services" (2020), examine Merchandise communication in the health section is the reporting of the products or services manufacture by health organizations to the possible users and compelling them about the interest to be provided.

3. Objective

(1) To provide a line of insight on how marketing mix elements are used to convey a healthy brand image.

(2) To explore how brands that are positioned as healthy are dealt with in the public discourse.

4. Methodology

This paper is based on primary and secondary data. To study the impact on health communication as a mean of Brand Image primary data is collected through various advertisement. Quantitative method comprising of survey was done to evaluate the impact of health communication strategies in building brand image on consumer's mind.

5.1 Brand Image

A brand is a product, service, or concept that is publicly distinguished from other products, services, or concepts so that it can be easily communicated and usually marketed. A brand name is the name of the distinctive product, service, or concept. Branding is the process of creating and disseminating the brand name. Branding can be applied to the entire corporate identity as well as to individual product and service names. Source: https://whatis.techtarget.com

The theory of brand image, popularised and executed in the 1950s with unparalleled success by David Ogilvy, it was not really new, confessed Ogilvy himself. "*Claude Hopkins had described it 20 years before*". Since it was Ogilvy who orchestrated the stray tune into harmonious composition – and it was he who explained the intricacies of this creative approach, the brand image theory in all fairness has been practically been identified with him. In his words: "*Every advertisement*

should be thought of as a contribution of the complex symbol which is the brand image" Ogilvy also emphasised the importance of identification of the 'image' specially when different brands in the same product category are basically similar. He goes on to say: "*The greater the similarity between the brands, the less part reason plays in brand selection. There isn't any significant difference between the various brands of whisky, or cigarettes or beer, they are all about the same. The manufacturer who dedicates his advertising to building the most sharply defined personality for his brand will get the largest share of the market at the highest profit* "

To Ogilvy image means personality. Product, like people, have personalities and they can make or break them in the market place. The personality of a product is an amalgam of many things- its packaging, its price, the style of its advertising, above all, the nature of the product itself. Source: Advertising Today (In the Indian Context) By Datta Sarojit.

5.2 Health Communication and Brand Image

Health communication links the fields of marketing communication and health care and is increasingly recognized as a necessary element of marketing efforts to improve personal and public health. Advertising, if well devised and deployed, offers healthcare providers opportunities to dramatically improve their fortunes by successfully engaging current and prospective patients, hastening exchange and building vital market share. Health information transmission includes verbal and non-verbal strategies to impact and authorize individuals, populations, and communities to make healthier choices.

The pervasiveness and purpose of advertising makes it seem powerful and useful for health promotion. Advertising strategies for health promotion range over a spectrum from individually oriented public service advertising to socially oriented counter advertising.

Public service advertising can save money and lives by encouraging behaviours that prevent disease before it happens. With the objective of advertising (e.g., motive people to quit smoking) differs from those of product advertisers (encouraging people to purchase a good or service), the central idea is the same to change behaviours.

Health communication campaigns that incorporate social marketing concepts were first used in family planning to promote use of contraceptives. Health communication campaigns and social marketing concepts have been used widely in the field of public health to disseminate health promotion messages designed to change behaviours and reduce morbidity and mortality.

Health communication campaigns promoting behaviour change through multiple communication channels, including mass media, with the distribution of free or reduced-price products that facilitate the adoption or maintenance of health promoting behaviours (i.e., increased physical activity through pedometer distribution combined with walking campaigns); facilitate or help to sustain the cessation of harmful behaviours (i.e., smoking cessation through free or reduced-cost over-the-counter nicotine replacement therapy [NRT]); and protect against behaviour-related disease or injury (i.e., condoms, child safety seats, recreational safety helmets, and sun-protection products).

Transmission and merchandise is rapidly becoming recognized as core functions, or core competencies, in the field of public health advertisement.

5.3 Image and Personality

Ogilvy regards 'Image' and personality as synonymous but Christine Restail made a distinction between the two. She wrote : " Brand image refers to rational measurement like quality, strength flavour. Brand personality explains why people like some brand more than others even when there is no physical difference between them".

Subroto Sengupta is more categorical on identifying the distinction between 'brand image' and 'personality' having different connations. To Sengupta "the brand image is indeed the totality of the brand in the perception of the comsumer. It is truly a 'complex symbol' and defined over simplification that equate it to one its bits-like its physical features, personality ,brings up in the consumer's mind its emotional overtones and its symbolism – its characterisation"

Brand personality is the real discriminator. 'The brand image', according to Sengupta, "represents the totality of impressions about the brand as selected and adapted by the consumer's perception. It embrace

the brand's physical and functional and also its symbolic meanings. The brand personality, on the other hand, dwells mainly in these symbolic aspects"

Source: Advertising Today (In the Indian Context) By Datta Sarojit.

Public Service Advertisement and healthy practises

Public Service advertising is also known as social service advertising. Government and other bodies are interested to persuade the target audience to change their habits, attitudes and approaches for improvement in their quality of life. There are large number of approaches and attitudes, behaviours and practises in the society which create hindrance in total development of the society and the nation. For example, problems of illiteracy, poverty, poor health practise, casteism division attitudes etc, in India are required to be tackled with the changed behaviour of the mass. These demand a long-term efforts as we see in the family planning, literacy campaigns, national integration campaigns, etc. Similarly, large number of global issues like environment and wild life protection, anti- drug and anti- smoking campaigns, safeguards against AIDS etc. are used through social service or public service advertisement. All these problems are deep rooted and some being practically ingrained in popular practices over a long period of time, it is necessary to use long term campaigns to generate awareness about problems and persuade the mass to change their perception and habits for enjoying brighter and fuller life. Source: Advertising Today (In the Indian Context) By Datta Sarojit.

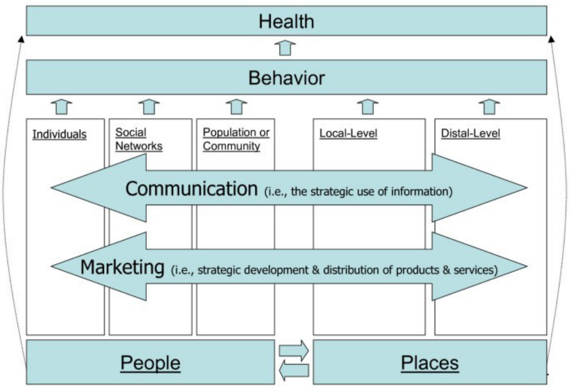

Therefore, Public Service advertising is considered as an instrument to promote ideas important to society or to specific groups and shaping the desired attitudes and behaviour.(Source : https://zenodo.org)

6. Brand Identity

Brand identity is the visible elements of a brand, such as colour, design, and logo, that identify and distinguish the brand in consumers' minds. Brand identity is distinct from brand image. (Source: https://www.investopedia.com)

Building brand image via health communication help to build a strong, comprehensive, better brand identity. It is a multidisciplinary strategies effort, and effect needs to support the overall message and business goal. The image and appeal must be related to the way consumers possibly think about a brand and thus position it in minds. In order to develop a clear position, the communicator must somehow put together all aspects of product, consumer, and trade competition and communication situation way for that brand. Good positions are difficult to maintain, and a company must be prepared to defend its position sometimes at great cost.

Positioning in the consumer's mind is end product of the process of filtering information about: The product attributes, the packaging, the pricing and the image of the product created by advertising. This may be different from the products' functional or physical attributes. This subtle distinction is increasingly important in competitive market place where thousands of advertisements fight for the attention of the consumer. Here brand identity attached with health communication is way better remembered by patient consumer. (Source: Foundations of Advertising Theory and Practice By S.A Chunawalla & K.C Sethia

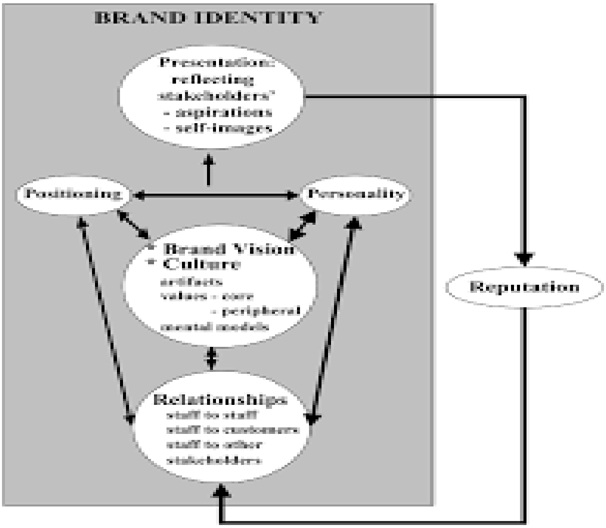

The process of managing a brand (De Chernatony, 1999. p. 443)

6.1 Brand recall & Awareness

Brand recall is also known as unaided recall or spontaneous recall and refers to the ability of the consumer to correctly generate a brand from memory when prompted by a product category. (Source: https://en.wikipedia.org)

Two brand awareness to measure brand recall are: Aided Brand Recall & Unaided Brand Recall.

Aided-recall method, the test is issue is kept closed, and the respondent is required to answer, entirely on the basis of his memory, whether an individual advertisement has been read or not. In recognition method, respondent first qualify as reader of a particular issue. Though the possibility of error in the recognition method is greater, the aided recall method is much more complicated. The aided- recall tests are popular in television advertising because of the relative ease with which such tests are conducted.

In Unaided recall tests, the respondents are not given any help to recall the ad. Thus, it is more demanding than the aided recall, and shows a greater degree of penetration of the ad.

Routes of Unaided Recall: Day-After-Recall (DAR): Here the reader/viewer are questioned the day after the ad appears.

Total Prime Time (TPT): Here, the viewer's television viewing is researched.

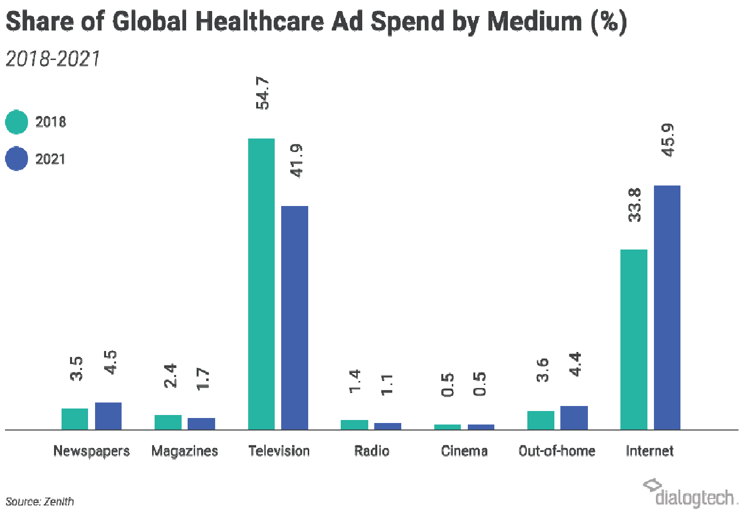

Healthcare branding positioning in competitive market

Positioning is amenable to the following definitions:

- The position of a brand is the perception it bring about in the mind of the target consumer.
- This perception reflects the essence of the brand in terms of its functional benefits in the judgement of that consumer.
- It is relative to the perception held by a consumer of the competing brands. The competing brands can be denoted as points or positions in the perceptual space of the consumer and together make up a product class.

It takes image characteristics of the brand and renders them in human terms as seen by the consumer. Brand image is broader than brand personality because by the time we enter the personality realm, we are dealing with feeling and emotions that the consumer take away from communication. A well-established brand has a clear brand personality. Positioning is a creative exercise which starts with the product. But positioning is not what you do to a product. Positioning is what you do, to

mind of the prospect. Product positioner does something to the product, as well as something to the mind. Our market are full of me-too products, with little to differentiate them from one-another. The messages are over communicated, and therefore the marketer's task is to achieve distinctiveness in the consumer's mind. (Source: Foundations of Advertising Theory and Practice By S.A Chunawalla & K.C Sethia

7. Recommendation

- Advertising draws the consumer's attention to the product by a brand name which is remembered by the consumer for identifying his requirement at the point of purchase.
- Stronger identification and retention of the name becomes more necessary when the product is sold through self-service.
- Very strong identification of the brand name becomes all the more necessary for mass marketing and national advertising.

Conclusion

- 'The brand image', accordingly to Sengupta, "represents the totality of impressions about the brand as selected and adapted by the consumer's perception. It embraces the brand's physical and also its symbolic meanings".
- The brand personality, on the other hand, dwells mainly in these symbolic aspect.
- To Ogilvy 'image' and 'personality', products, like people, have personalities and they can make or break them in the market place.
- "Brand image refers to rational measurement like quality, strength, flavour. Brand personality explains why people like some brand more than others even when there is no physical difference between them".
-

References

1. _Advertising Today (In the Indian Context) By Datta Sarojit.
2. Foundations of Advertising Theory and Practice By S.A Chunawalla & K.C Sethia
3. Atkin, Charles & Lawrence Wallack (ed). (1990). Mass Communication and Public Health: Complexities and Conflicts,New Delhi, Sage Publications

4. Dawar, N., & Lei, J. (2009). Brand crises: The roles of brand familiarity and crisis relevance in determining the impact on brand evaluations.
5. https://whatis.techtarget.com
6. Kim, C., Kim, S., Im, S., & Shin, C. (2003).The effect of attitude and perception on consumer complaint intentions. Journal of Consumer Marketing, 20(4), 352-371.
7. https://en.wikipedia.org
8. Nelson, C., & Goldstein, A. (1989). Health Care Quality: The New Marketing Challenge. Health Care Management Review, 14(2), 87-95.
9. Lim, K., & O'Cass, A. (2001). Consumer brand classifications: An assessment of culture-of-origin versus country-of-origin. Journal of Product & Brand Management, 10(2), 120-136.
10. https://zenodo.org
11. Wagner, M. (1985). Physicians Write Advertising Prescription. Advertising, 33-34.
12. https://www.investopedia.com

A Peer-Reviewed Multi-Disciplinary Academic Journal Published Thrice aYear

DOI : 10.5281/zenodo.6577044

পত্রিকা দেখুন ওয়েবসাইটে

www.ebongprantik.in

Ebong Prantik 2582 3841

Ebong Prantik 2348 487X

Published By : Ashis Roy, Chandiberiya Sarada Palli, Kestopur, Kolkata - 700 102
Ph : 9804923182, 8250595647
Email : ebongprantik@gmail.com
Website : www.ebongprantik.in

₹ 800/-